ভারতী

পবিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৪ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৪ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
[illegible] (গল্প)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	...	৩৫৩
অলৌকিক	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার	...	২৩৬
আমাদের সম্পদ	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ	...	২৪৭
আমাদের নিজস্ব সম্পদ কোথায়		শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়	...	৩৪৩
আলেয়ার আলো (উপন্যাস)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়		২০, ১১৭, ২১১, ৩২৭, ৪৩৮, ৫৪০
আধুনিক সাহিত্যের একটা লক্ষণ		শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	...	৪৭
আধুনিক নাট্যসাহিত্য	...	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	...	২৫৪
আর্টে প্রেম (সচিত্র)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৬০
আর্টের সেকাল-একাল (সচিত্র)		শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	২৭১
'আঁধারে-আলোকে'	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ,	...	৫৩৭
ইউসুফের প্রতি জুলেখা (কবিতা)		শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	...	১১৬
ইচ্ছার মুক্তি এবং আত্মার মুক্তি		শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩
একতারা (সমালোচনা)	...	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	...	৫৫৩
কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪৬০
কণিকা	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৩২৩
কবি ও সমালোচক (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	...	৩৫২
খ্যাতি (গল্প)	..	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৫৬৯
গান	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮৯
গান	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪৭৯
গুরুজী (গল্প)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	...	১০৯
ছিটেফোঁটা	...	শ্রীঅসিতকুমার হালদার	...	২২৫
টুপি (গল্প)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	...	৪১১
তোড়া (কবিতা)	...	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	২০২
তেলুগু গান (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৫৮২
দণ্ডনীতির প্রথম ইতিহাস	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ	...	৪০৭
দাঁতের ব্যথা (গল্প)	...	শ্রীমতী রেণু রায়	...	৮৫
দোশালা (গল্প)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	...	৫৩৩
নারীর অবস্থা	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৬১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নীলপাখী (নাটক)	শ্রীযামিনীকান্ত সোম	৪২৩,৫১৬
পরম ক্ষণ (কবিতা)	শ্রীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায়	৫১
পঞ্চশরে পঞ্চত্ব (গল্প)	শ্রীমতী রেণু রায়	২৮৭
পিতা-পুত্র (সচিত্র)	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ,	২৪০
পুরাতন পূজার সাজ (সচিত্র)	শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম-এ	৩৭৪
পূর্ণতা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	২০৭
পূজা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	৪৩৭
প্রতারণা (গল্প)	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	৩১৮
ফিলিপাইনে শিক্ষাবিস্তার	রায়বাহাদুর মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৭১
বসন্তসেনা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ	১০
বংশানুক্রমের গোড়ার কথা	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার	৪৩৩
বাদ্‌লার গল্প (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৩৬৭
বাঙ্গালীর রসবোধ	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	২৯২
বাঙ্গালী সেপাইয়ের রোজ-নামচা	হাবিলদার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন	২৯৩
বিচার-বিবেচনা	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	২২৭
বিবেকানন্দ-সঙ্গমে	শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	৩৩৮
বিরূপবজ্র সমালোচনা (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৪৮১
ব্যায়োগ	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ	৫০৫
ভারতীয় পরিবার মণ্ডলীর উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫০
ভারত-রমণীর অবস্থার উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৬৩
ভাষার কথা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৫
ভাস্কর্য্য (সচিত্র)	শ্রীঅসিতকুমার হালদার	৫৭২
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমালোচক	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	৩১১
মাসকাবারী—	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	
আমাদের শিক্ষা	...	১০৩
আর্টের আদর্শ	...	৪৯৯
আর্টের তত্ত্ব	...	৫৯০
উত্তর-প্রত্যুত্তর	...	৩৯৬
কর্ম্মপ্রেরণা	...	১০০
চিত্তরঞ্জনের "বাঙ্গালার কথা"	...	১৭৫
জন্মের হার	...	৯৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মাসকাবারী—	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ,	
জাপানের কথা	...	৩৯৪
জাতীয়তার আদর্শ	...	৫৮৫
নবীন সাহিত্য সম্বন্ধে অভিযোগ	...	৩০৪
"বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি"	...	৪০৩
বাঙ্গলার কথা	...	২৯৮
বৈষ্ণব-কবিতা ও "রূপান্তর"-বাদ	...	৯০
রাষ্ট্র ও ব্যক্তি	...	৪৯৫
শক্তির ধর্ম্ম ও আনন্দের ধর্ম্ম	...	৫৮২
সাহিত্যে ভদ্রতার আদর্শ	...	২৯৬
"সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য"	...	৩৯১
স্বামী বিবেকানন্দ	...	৯৩
মাতু (গল্প)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	৫
মিশরের আর্ট (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৮৮
মিশরবাসীর পূর্ব্বপুরুষ (সচিত্র)	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	৪৮৯
মুসলমান-সমাজ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৯
রংছুট (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫২
রূপসী (নাটিকা)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৩৯,১৫৪,২৫৯,৩৭৯
শয়তানের হাত (গল্প)	শ্রীমতী রেণু রায়	২০২
শেমুষী (গল্প)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই	২৩০
সমালোচনা	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	১০৬, ২০৮, ৫৯১
সামাজিক পরিবর্ত্তন	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৫২৭
সাহিত্যের গোড়ার কথা	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	১৪১
সাহিত্যের গণ্ডগোল	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	৪৫১
সার্ব্বজনীন কল্যাণ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৪১৫
"সুপ্তিতে ফিরিয়া এল জাগরণ"(কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	৮৮
সুন্দরের বরণ (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	৩৬৬
সেকালের গৃহস্থালী	শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	৭৩, ১৩০
স্বরলিপি	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩৪
স্বপ্ন-সুন্দরী (গল্প)	শ্রীমতী রেণু রায়	৪৫৫
হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬
হিন্দু, মুসলমান ও পার্শী রমণী	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪১৯
হিন্দোল-বিলাস (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৪১৯

চিত্র সূচী

চিত্র	পৃষ্ঠা
আলেকজান্দারের মৃত্যু (বহুবর্ণ) ...	১০৮
ইউকেটানের ধ্বংসাবশেষের একাংশ	৪৯১
ইউকেটানে প্রাপ্ত একটি মুখ ...	৪৯৩
একটি মূর্ত্তির মুখ	১৯৩
এলিফেণ্টার ত্রিমূর্ত্তি	৫৭৩
Aphrodite-এর আর একটি মুখ ...	২৭৬
ওঙ্কারধামের মন্দির	২৮৫
কপিল	৫৭৬
কর্পূরদান—সম্মুখ	৩৭৫
কর্পূরদান—পার্শ্ব	৩৭৬
কেরাণী	১৯
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদার অঙ্কিত	৪৮৩
গান-শেষে	৬৪
গ্রীক ভাস্কর্য্যের একটি রমণী মূর্ত্তির মুখ	২৭৭
চারিটি মুখ	২০০
চুম্বন	৭১
ছাদে শিবের মুখ—ওঙ্কারধাম ...	২৮৬
তন্দ্রাভিভূতা (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত ...	৫০৪
তাম্রকুণ্ড	৩৭৭
থিব্‌সের মন্দির	১০৫
দাক্ষিণাত্যের নটরাজ	৫৭৪
দ্বিতীয় রামেসিসের মমি	৪৯০
দুটি হাঁস	১৯৭
দোলনায়	৭০
নব-দম্পতী	৬৮
নগরাধ্যক্ষ	১৯১
নিমন্ত্রণ বাড়ী	২০০
পার্থেননের একাংশ	২৮০
পানিশঙ্খ	৩৭৮
পানিশঙ্খের আধার	৩৭৮
পূজারিণী (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২
পিতা-পুত্র (বহুবর্ণ)	২৪
প্রণয়ী	৬
প্রাচীন গ্রীসের একটি পাত্র ...	২৭
প্রিয়ের উদ্দেশে	৬
প্রেমালাপ	৬
প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়ামূর্ত্তির নমুনা ...	২৭৫
প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া Aphrodite-এর একটি নকল-প্রতিমূর্ত্তির মুখ ...	২৭৫
প্লাষ্টারের মুখ ...	১৯৩,১৯৫
প্লাষ্টারের মুখ ও মড়ার মাথা ...	১৯৪
"বস্তুহীন কবিতায় ভরেনাক' ভুঁড়ি ; ঝুড়িতে আসল কাব্য ছ'পন ছ'বুড়ি ?" শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৩৫৯
বাজী	১৯৯
"বিজয়িনী ভেনাস"	২৭৬
ব্যঙ্গ (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৩১০
ব্যঙ্গোক্তি (?) শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২১০
ভগ্নমূর্ত্তির মুখ	১৯৪
ভালোবাসো ?	৬৩
"ভেনাস অফ দি ক্যাপিটল" ...	২৭৬
মেক্সিকোর আর-একটি প্রাচীন মূর্ত্তি	৪৯৪
রমণী-মূর্ত্তি	১৯১
রাজা খাফ্‌রা	১৯২
রিমসের গির্জ্জা	২৮৩
রোমের পান্থিয়ণ	২৮৪
সমাধি-ভবনের দেওয়ালের অঙ্কিত ছবি ও চিত্রাক্ষর	১৯৮
সারনাথের বুদ্ধ	৫৭৭
সিংহলের কোন তামিল সাধু ...	৫৭৫
সিংহলের বুদ্ধমূর্ত্তি	৫৭৮
হাউই কহিল মোর কি সাহস ভাই (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৪০৬

ভারতী

৪১শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২৪ [১ম সংখ্যা

ইচ্ছার মুক্তি এবং আত্মার মুক্তি

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অর্থ যদি হয় ঈসা-মহাত্মার স্বাভিপ্রেত ধর্ম্ম, তবে সেই এ-দেশীয় ধাঁচার ভাগবত ধর্ম্ম ঈসা-মহাত্মার মর্ত্ত্য জীবনের অবসান-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অবসান প্রাপ্ত হইয়া "আহ্‌হ্‌হ্‌" বলিয়া বাঁচিয়াছে ! এ খ্রীষ্টধর্ম্ম—অর্থাৎ ভাগবত খ্রীষ্টধর্ম্ম—পাশ্চাত্য ভূগোল-খণ্ডে ভুল-ক্রমেও একটিবার চরণ-ধূলি প্রদান করেও নাই, আর, কস্মিন্ কালেও করিবে-যে তাহার কোনোও লক্ষণ ঘুণাক্ষরেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। দোর্দণ্ড-প্রতাপ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম এ-যাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান, ইহার সহিত ঈসা-মহাত্মাকে জড়াইলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধুনাতন কালের না-পারে-এমন-কাজ-নাই-গোচের খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে ছিল পাষণ্ড-চূড়ামণি Constantine-সম্রাটের রাজধর্ম্ম * ; তাহার পরে তাহা হইয়াছিল মহা-প্রতাপশালী পোপদিগের একাধিপত্য-ধর্ম্ম ; এক্ষণে তাহা হইয়া উঠিয়াছে বিষম একটা বিট্‌কাল ধর্ম্ম—সারা পৃথিবীময়

---

* বলিলাম "পাষণ্ড-চূড়ামণি"। এই বিকট বিশেষণটিকে কেহ যদি মনে করেন—লেখকের একটা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা, তবে, বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন সুবিদ্বান্ পুরাতত্ত্ব-সমালোচক কী বলিতেছেন শ্রবণ করুন্ :—

"The church claims Constantine as the first Christian Emperor,.....Just about the time when the first Church-Council met at Nicæa, he put to death his eldest son, Crispus, on a mere suspicion of treason ; and on his own death bed, immediately after his baptism by Eusebius, he dictated an order to another son to execute six members of his family whom he suspected of a conspiracy to poison him.

Barclay Lewis Day
(Author of "Our heritage of Thought")

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

"সামাল্ সামাল্" ধ্বনি উত্থাপন-কারী **সভ্যতাভিমান-ধর্ম্ম**! এই সভ্যতাভিমান-ধর্ম্মের প্রধান পুরুষার্থ হ'চ্চে Freedom of will। এ দেশীয় ঋষিমনীষীদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রধান পুরুষার্থ = Freedom of **আত্মা**। কিনা আত্মার মুক্তি। ইহা বলা বাহুল্য যে, আত্মা = মস্তক; Will = হস্তপদ। হস্তপদ যদি মস্তকের অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করে, তবে তাহা হস্তপদের freedom খুবই—কিন্তু মস্তকের তাহা সর্ব্বনাশ! Will-এর Freedom = আত্মার সর্ব্বনাশ। পক্ষান্তরে হস্তপদ যদি মস্তকের অধীনে পরিচালিত হয়, তাহাতে মস্তকেরও freedom হয়, আর সেই সঙ্গে হস্তপদের ন্যায্য freedomও বজায় থাকে। তবেই হইতেছে যে, Willএর সংযম = আত্মার Freedom। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছেও তাই; বলা হইয়াছে—"বিজ্ঞান-সারথি র্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।" বিজ্ঞান যাঁহার সারথি এবং মনোরজ্জু (অর্থাৎ ইচ্ছা) যাঁহার বশীভূত তিনি সংসারের পার-স্বরূপ বিষ্ণুর পরম ধাম প্রাপ্ত হ'ন। তবেই হইতেছে যে, ইচ্ছার সংযম = আত্মার মুক্তি; আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ইচ্ছার মুক্তি (freedom) = আত্মার বন্ধন।

আত্মার freedom কাহাকে বলে তাহার নমুনা যদি দেখিতে চাও, তবে পূর্ব্বাহ্ণেই আমি বলিয়া খালাস হইতেছি যে, তাহার নমুনা দেখানো আমার সাধ্যের অতীত। **সাধ্যাতীত** তাহা আমার এইজন্য—যেহেতু দেশীয় ধাঁচার সাধু মহাত্মাদিগের সংখ্যা এক্ষণে অত্যন্ত বিরল। দেশীয় প্রকৃতির সাধু পুরুষ আমি যে একেবারেই চক্ষে দেখি নাই তাহা বলা আমার অভিপ্রায় নহে; আমি কেবল বলিতে চাই এই যে, দেশীয় ধাঁচার সাধুমহাত্মা দুজন-একজন যাঁহাদিগকে আমি দেখিয়াছি, তাঁহাদের চরিত্রের ছবি আঁকিয়া দেখাইতে আমি নিতান্তই অপারগ; তা ছাড়া—অনেক কষ্টে যদি তাহার একটা অস্ফুট আলেখ্য আমি আঁকিয়া দেখাইও বা, তবে তাহা এক্ষণকার কালের বিলাতী-চস্মাধারী দিশী সমজদারদিগের পছন্দ না হইবারই কথা!

Freedom of Will কাহাকে বলে তাহার যদি নমুনা দেখিতে চাও তবে অতি সহজে তাহা দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহা দেখানো নিতান্তই একটা বাহুল্য কার্য্য; কেননা তাহা ফলেন পরিচীয়তে। ইচ্ছাকে জ্ঞানধর্ম্মের বশীভূত করিলে তাহার ফল হয় যেমন **আত্মার মুক্তি**; তেম্নি, জ্ঞানধর্ম্মের বন্ধন হইতে ইচ্ছাকে মুক্তি প্রদান করিলে (freedom দিলে) তাহার ফল হয় স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচারের নমুনা দেখাইতে গেলে ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে, অতএব তাহাতে কাজ নাই—এইখানেই ইতি করা যা'ক্।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতু

আজকের সকালটা একেবারে কুয়াশায় ঢাকা,—এমন কুয়াশা এ-শীতে একদিনও হয়নি;—জলস্থল-আকাশ দুধে-গোলা আলোর মধ্যে ডুবে রয়েছে; যেদিকে দেখি, মনে হচ্ছে যেন নাকের সাম্নে প্রকাণ্ড একখানা ঘোলা কাঁচ ঝুলছে। জাহাজের সব বেঞ্চিগুলো শিশিরে ভিজে উঠেছে,—কোথাও একটু বস্‌বার স্থান নেই। সাতটা-পঞ্চাশে জাহাজ ছাড়বার কথা, আটটা-পঁচিশ হয়ে গেল তবু আজ সহযাত্রী কারুর দেখা নেই। জাহাজের সারেং কান-ঢাকা টুপি, পশমের পাঁচ-ঢাকা গলাবন্ধ আর লক্ষ্ণৌ ছিটের ময়লা একখানা বালাপোশ জড়িয়ে একটা মেছুনির ঝুড়ি থেকে বেছে-বেছে ভালো মাছগুলি লালরঙের একটা বাল্‌তিতে নিজের জন্যে তুলছে। জাহাজ আজ ঘুমন্ত হাঁস;—যেন ডানার ভিতরে মুখগুঁজে জলের ধারটিতে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি ওভার-কোটের কলারটা দুই কানের উপরে বেশ-করে টেনে দিয়ে বসে রয়েছি। বাদলার দিনে স্কুলের খালি বেঞ্চখানায় বসে যেমন, ঠিক তেমনি আজ মনে হচ্ছে—গাড়ি পাই তো বাড়ি পালাই। এমন সময় সামনে কুয়াশার ভিতর থেকে শুনলুম কচি গলায় কে ডাকলে—'মা'!

বড়বাজারের এই ঘাটটা—যেখানে সূর্য্যোদয়ের আগে থেকে সূর্য্যাস্তের অনেক পরেও কর্ম্মকোলাহলের বিরাম নেই, সেখানে আজ সব জাহাজগুলো ভেঁপু থামিয়ে কুয়াশার ভিতরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কি-রকম নিঝুম তা বুঝতেই পারছো। এরি মধ্যে কচি-গলার সেই 'মা' শব্দ—সে যে আমার অন্তরের অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছল, তা কি আর বলতে হবে! আমি যেন ঘুম থেকে চম্‌কে উঠে সাম্নের দিকে চেয়ে দেখলুম—ঠিক আমাদের ফার্ষ্টক্লাসের ডেকের দিকে মুখ-করে দুখানা বড়-বড় দোতালা জাহাজ দুটো প্রকাণ্ড গোল বারাণ্ডা নিয়ে কুয়াশা ঠেলে আধখানা বার হয়েছে; একটা বারাণ্ডার নীচে বড়-বড় ইংরিজি কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে—'মাতু' আর একটায়—'কুয়িস্তান'। শেষের জাহাজখানায় লোক দেখলেম না; কিন্তু 'মাতু' বলে যে জাহাজ তার ওই বারাণ্ডার নীচে, যেখানে জাহাজের রান্নাঘর, সেখানে দেখছি, ঝক্‌ঝকে কতকগুলো তামার ডেক্‌চির কাছে বসে নীল পাজামা-পরা একটা ছোকরা-খালাসি রং-করা একটা পাখীর খাঁচা বেশ-করে জল দিয়ে-দিয়ে ধুচ্ছে। ঠাণ্ডা জলের ছিটে যতবার পড়ছে, ততবারই খাঁচার পাখী সে মা মা বলে চীৎকার করে উঠছে; আর সেই ছোকরা খালাসি তাকে কথ্য এবং অকথ্য ভাষায় গাল পেড়ে চলেছে।

পাখী-পোষবার সখ আমার চিরদিনই আছে—তার উপর পড়া-পাখী—আমি একেবারে আমাদের ডেকের নাকের ডগায় গিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের আর পাখীর রঙ্গটা দেখে নিচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে অবিন আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে বল্লে—"পাখীটা

ভালো-করে দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো।”

আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে অবিন আমাকে আবার বল্লে—“এই ঠাণ্ডায় কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? আমাদের এ জাহাজ সাড়ে-ন'টার আগে ঘাট ছেড়ে নড়ছে না। চল, ওই জাহাজখানার বুড়ো মালেকের সঙ্গে বেশ আলাপ আছে, সেখানে বসে বেশ আরামে তামাক খাওয়া যাবে আর গল্পগুজবও হবে। মীরসাহেব লোক বেশ, আলাপ করে খুসি হবে, আর ঐ 'মাতু' জাহাজখানার মতো অমন জাঁকালো জাহাজ আর নেই,—আগাগোড়া গিল্টি আর আয়না দিয়ে মোড়া। ওর ক্যাবিন্‌গুলো দেখবার জিনিষ।”

আমি অবিনের সঙ্গে আর-একটা প্রকাণ্ড জেটি আর পাটের গোডাউন পেরিয়ে মাতু জাহাজে গিয়ে উঠলুম। জাহাজ তো নয় যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি জলে ভাস্‌ছে! এক-একটা ডেক্ যেন এক-একটা কন্‌গ্রেসের প্যাণ্ডাল—এদিক থেকে ওদিকে নজর চলে না। পিতলের চাদর আর রবার-সিট্ দিয়ে মোড়া দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আমরা দৈত্যপুরীর সাতমহলের মতো সোনা আর স্ফটিকে মোড়া সেই জাহাজের ক্যাবিনগুলো একে-একে দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক খালাসি এসে বল্লে—“মীর সাহেব আপনাদের ছেলাম দিয়েছেন।”

আমি অবিনের সঙ্গে মীর-সাহেবের খাস-কামরায় গিয়ে দেখলেম—এক বুড়ো নাখোদা নেওয়ারের এক খাটিয়ায় বসে তামাক টানছেন; পাশে এক ডাবা পানের খিলি। তাঁর পিছনে খোলা জানলার কাচের ভিতর দি[illegible] পাটের গোডাউনের টিনের ছাদের এক[illegible] আবছায়া দেখা যাচ্ছে। দস্তরমত আদ[illegible] আপ্যায়নের পর মীর-সাহেব অবিনের দি[illegible] চেয়ে হেসে বল্লেন—“এবার অনেক দিন প[illegible] এ অঞ্চলে এলেম;—সেই দুবছর পূ[illegible] আপনার সঙ্গে দেখা, আর আজ এই!” [illegible]

অবিন আমাকে দেখিয়ে বল্লে—“[illegible] বন্ধুটিকে আপনার কাছে নিয়ে এলেম; এ[illegible] বড় পাখীর সখ; এঁর জন্যে সিঙাপুর থে[illegible] এবার একটা কাকাতুয়া এনে দিতে হবে[illegible] যাহোক এবার আপনার সফরের গল্পটা বলুন।”

—বলেই অবিন খপ্ করে মীর-সাহেবের বি[illegible] অনুমতিতে ডাবা থেকে এক-থাবা পা[illegible] তুলে নিয়ে দুটো নিজের গালে, আর গো[illegible] চারেক আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চো[illegible] বুজে সোজা-হয়ে বেশ জমিয়ে বস[illegible] আমি পান কটা হাতে নিয়ে ইতস্ত[illegible] করছি দেখে মীর-সাহেব বল্লেন—“পান খা[illegible] না হলে গল্প জম্‌বে না”—বলেই মীর-সাহে[illegible] সুরু কল্লেন—“এদিকে সিঙাপুর, হংকং[illegible] ওদিকে সেকেন্দ্রা আর কুস্তন্‌তুনিয়া এইটুকু[illegible] মধ্যে কত ঘাটেই না আমার জাহাজ ভিড়লে[illegible] দিনে-রাতে সুদিনে-দুর্দ্দিনে আলোতে-অন্ধকা[illegible] এই পঁচাশী বৎসর কত নদীতেই না পা[illegible] দিলুম, কত দরিয়াই না পার হলুম! কি[illegible] এই ভাগীরথী—এ আমার মনকে কেম[illegible] যে টানে তা আমি বোঝাতে পারবো না[illegible] এই গঙ্গাতীরেই আমার জন্ম, আর এ[illegible] বাংলার মাটিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি[illegible] আমার কবর এই মাটিতে, কি দরিয়া[illegible] অগাধ জলের নীচে, খোদাতালা ঠি[illegible]

[illegible]রেছেন তা তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু [illegible]আমার মন চায় যে এই নদীর ধারে যেন [illegible]আমার শেষ-যাত্রার জাহাজখানা এসে ভেড়ে। [illegible]-বোশেখির ঝড়ের আগে-আগে তুফান [illegible] যখনি যেখানে আমি জাহাজ [illegible]য়েছি তখনি এই নদীতীরের ছবি—[illegible]টি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সবুজ [illegible]ওলায়-ছাওয়া, আমার নিজের কবরের [illegible]টি আমার মনে জেগেছে। ঘরের ছবিটি [illegible]মার বাংলাদেশের সঙ্গে গাঁথা নেই। [illegible]খানেই আমাদের ঘর-বাড়ি ছিল কিন্তু সে [illegible]মন ছিল, নদীর এপারে ছিল কি ওপারে, [illegible]আমার কিছু মনে পড়েনা। ঘরে আমার [illegible]বা ছিল—ভাই-বোন কাউকে মনে [illegible]ই। কেবল মনে আছে মাকে। অন্ধকারের [illegible]ধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে তাঁর রূপ—আর কিছু [illegible]। এইটুকু আমার খুব ছেলেবেলার স্মৃতি, [illegible]ধ হয় যখন মায়ের কোলে মানুষ [illegible]ছিলেম তখনকার।

এরপর থেকে ঘটনাগুলো অনেকটা স্পষ্ট [illegible]রে আমি দেখতে পাই। তখন আমার বয়স [illegible]ত বলতে পারিনে, গঙ্গার উপরে কতকগুলো [illegible]কালো-কালো ডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে, আমি [illegible]তীরের উপরে বসে মা মা বলে চীৎকার [illegible]করে কাঁদছি। পরণে আমার একটুক্‌রো [illegible]কাপড় নেই; মুঠোর মধ্যে আমার দুটো [illegible]কা। টাকা দুটো রেলের টিকিট কেনবার [illegible]জন্যে—এটুকু আমার বেশ মনে আছে। তার [illegible]র এক সন্ন্যাসী—তার মাথায় জটা, গায়ে [illegible]াই, কটা-কটা দাড়িগোঁপ—সে আমাকে [illegible]সে বল্লে—বেটা রোতা কাহে? [illegible]আমি তাকে কেঁদে বল্লেম—আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে এস, আমি দিল্লী যাব। সন্ন্যাসী একটু হেসে আমার কাছে টাকা আছে কিনা শুধোলেন। আমি তাঁর হাতে আমার টাকা-দুটো দিয়ে দিলেম, আর তাঁর হাত-ধরে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকলেম। তারপর কি হল মনে পড়েনা। আমার জীবনের ঘটনাগুলোর মধ্যে আর-কোথাও ফাঁক নেই—এইটুকু ছাড়া।

এর পরে একদিন নতুন কাপড় পোরে, দিল্লী যাব বলে, লোটা-কম্বল পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা টিনের ছাদের নীচে কাঠগড়া দেওয়া একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার চারিদিকে স্ত্রীপুরুষ, ছেলেবুড়ো, আরো কত লোক;—কেউ বসে, কেউ আগা-গোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরখানার দুটো লোহার থামের মাঝ দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ঠিক এমনি-একখানা বড় জাহাজ এসে সেই ঘরখানার গায়েই লাগ্‌লো। সেটা এত বড় যে মনে হলনা সে জলে আছে। একটা সাহেব এসে আমাদের সবার হাত-পা, বুক-পিট টিপে-টুপে দেখে বড়-একখানা কাগজে কি লিখে দিয়ে গেল, আর অমনি কাঠগড়ার দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে লোক গোরুর পালের মতো জাহাজে গিয়ে উঠল। সন্ন্যাসী আমার পিঠ-চাপড়ে বল্লে—যা বেটা দিল্লী! বলেই আমার হাত ধরে জাহাজে উঠিয়ে দিলে। আমি জাহাজে উঠেই ফিরে দেখলেম সন্ন্যাসী ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেছে। দিল্লী যাবার উৎসাহে আমার মন এতক্ষণ

আনন্দে দুলছিল, সন্ন্যাসীকে লুকুতে দেখে হঠাৎ যেন আমার ভিতরটা একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কতক্ষণ এমন ছিলেম বলতে পারিনে, হঠাৎ একসময় জলের হুস্ হুস্ শব্দ শুনে চম্‌কে দেখি জাহাজ চলেছে;—আলো-অন্ধকারে জলের উপরটা যেন বোরা-সাপের পিঠের মত দেখাচ্ছে। একটা সাদা টুপি, খয়েরী কোটপরা কালো সাহেব এসে আমাকে জাহাজের একদিকে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে। সেখানে একদল মেয়েমানুষ আমাকে দেখে হঠাৎ চীৎকার করে বুক-চাপড়ে—কেউ বেটার নাম কোরে, কেউ বাপ বোলে, কেউ ভাইরে বোলে কাঁদতে লাগল। সাহেব তাদের এক ধমক দিয়ে চলে গেল। সেই সব সহযাত্রীর কথায়-বার্ত্তায় জানলুম এখানা কুলীর জাহাজ। কিন্তু তখন আমি এত ছোট যে কুলী কাকে বলে বুঝতেম না। সেই নদীর জল, আকাশের আলো, দূরে দূরে তীরের বন, বালির চড়ার উপরে সূর্য্যের উদয়-অস্ত দেখতে দেখতে কদিন আমার আনন্দে কেটে গেল।

তারপর চা-বাগানের ইতিহাস। সেখানে মানুষের মেরুদণ্ড মানুষ হয়ে কেমন-করে যে তিলে-তিলে মুচড়ে ভাঙে তা দেখেছি, মানুষের উত্তপ্ত রক্ত চাবুকের চোটে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে কি-কোরে যে মানুষ ভার-বাহী জীবের মতো মাটির দিকে ঝুঁকে-পোড়ে পরের বোঝা টান্‌তে-টান্‌তে শেষ-একদিন তপ্ত বালির উপরে মুখ-গুঁজড়ে বুক-ফেটে মরে—তাও দেখেছি; কিন্তু তবু ঘর মনে হলে এই চা-বাগানের ছবিটাই আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এখানে দুঃখও অনেক, সুখও অশেষ। মায়ের সন্ধা এখানে এসে, শিশুকালে মাকে না দে আমার কি যে কান্না প্রাণের ভিত গুম্‌রে উঠেছিল তা বোঝানো যায় না আবার যেদিন এক-এক-দল ছেলেহারা আনারসের কাঁটাগাছের বেড়ার আড়া তাদের কাদা-মাখা রোগা হাতে আমা বুকে জড়িয়ে ধোরে দুপুরের রোদে-পো মাটির উপরে চোখের জল ফেলতো, য কোনো-কোনো দিন রাঙা সাড়ি, গালার চু পরা ছোট এক-একটা কালো মেয়ে চা পাতা ছেঁড়বার সময় হঠাৎ আমার পি ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাই-বোলে আমার গ জড়িয়ে ধরতো, তখনকার সুখ—সে বর্ণনা করা যায় না! তার পর বসন্তকা যখন ফুলে-ফলে, পাখীর গানে, সোনা রোদে, সবুজ পাতায় বাগানের চারিদিকে বন ভরে উঠেছে, তখন কাজের অবস যখন এক-একবার চেয়ে দেখেছি তখনি আমার মাকে না দেখে আমি থাক পারিনি। ষাট-বছরের মধ্যে আমার শরী মন একদিনের জন্যে অবসন্ন হতে দিইনি এ-শক্তি আমার নিজের মধ্যে ছিল কিন্তু আমার মা যিনি, তিনিই আমা দিয়েছিলেন। এইজন্যে বাগানের সা মালিক আমায় ভালোবেসেছিল আর মরব সময় আমাকে তার চা-বাগানখানা লি দিয়ে গেল। তার আর-কেউ ছিল না। ভালোবাসবার মধ্যে একমাত্র বাগান কাজকে এবং সেই কাজ চালাতে স উপযুক্ত আমাকে ভালোবেসেছিল। কি সাহেব ভুল বুঝেছিল। আমি বাগানখানা

লোবেসেছিলেম—তার কেয়ারীকরা সাজানো
চায়ের গাছগুলোর জন্যে নয়—ওই কাঁটা
গাছের বেড়ার ধারে-ধারে যে স্নেহ, ভালো
র লতাগুলো জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠেছিল
র জন্য। ওই বনের গাছ যেখানে ঝুঁকে
ড়ে মায়ের মতো পথের ধূলোকে চুম্বন দিত,
ই ছায়াশীতল বন-পথগুলির জন্য আমি
মার সমস্ত ভালোবাসা পুষেছিলেম—ষাট
র ধরে। চা-বাগানের ঠিক মাঝে,
াগানের যিনি মালিক, তিনি নিজের কবর
নিজেই বানিয়ে গিয়েছিলেন—কালো পাথরের
চোলো একটা পালিস-করা থাম, তার
গায়ে সোনার অক্ষরে বড়-বড়-করে তাঁর
নাম আর জন্মের তারিখ। তারি গায়ে তাঁর
মরণের তারিখ লিখে আমি আমার বাগানের
কাজ বন্ধ কল্লুম।

শেষকুলীর দল মাদোল বাজাতে-বাজাতে
বন্দরের দিকে দেশের জাহাজ—ঘরমুখো
জাহাজ ধরতে চলে গেছে। সন্ধ্যাবেলার চাঁদ
নীরব বাগান, নিঝুম বনের গায়ে চমৎকার
আলো ফেলেছে। আমি ঘরে আলো নিভিয়ে
বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময়
মাথার উপরে কচিগলায় কে ডেকে গেল—
মা, মা, মা! তার পর ছায়ার মতো একটা
কে আমার ঘরের দরজা দিয়ে বনের দিকে
ছুটে গেল,—মনে হল একটি ছোট ছেলে।
আমি লাঠি-হাতে বেরিয়ে পড়লুম। বনের
ধারে যেখানে একটা গুহা—যেখানে অন্ধকার
মুখ মেলিয়ে রয়েছে—সেইখানে সেই ছোকরার
দেখা পেলুম। সে একজন কুলী। আমি
তাকে শুধোলুম—সবাই গেল তুই যে
এখানে? সে বল্লে—মা পালিয়েছে, তাকে
ছেড়ে আমি যাই কেমন করে? আমি
এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছি কোথায় তার মা,
এমন সময় ছেলেটা চেঁচিয়ে বল্লে—মীর-সাহেব,
ওই যে মা! অন্ধকারে একটা ফুলের ডাল
গুহার মুখে ঝেঁপে পড়েছে দেখলেম,—আর
কিছু না। ছেলেটা অকথ্য ভাষায় তার
মাকে উদ্দেশ-করে গাল-পাড়ছে শুনে
আমি যখন অবাক হয়ে রয়েছি, সেই সময়
একটা কালো পাখী উড়ে এসে তার কাঁধে
বসল—"

মীরসাহেবের গল্পে বাধা দিয়ে আমি বল্লেম—"গোল-বারাণ্ডার নীচে সকাল-বেলায় আপনার এই জাহাজে ঠিক তেমনি একটা ছেলেকে আমি দেখেছি।"

মীরসাহেব হেসে বল্লেন—"সে আমারি সঙ্গে আছে বটে। ছেলেটা সেই কালো পাখীটাকে দুই মুঠোর ভিতরে নিয়ে তাকে কেবলি চুমু খাচ্ছে আর গাল পাড়ছে; আর পাখীটাও বলছে—মা, মা মা! এমন সময় বন্দর থেকে শুনলেম কুলীর জাহাজ বাঁশী বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ছেলেটাকে বল্লুম—জাহাজ তো বেরিয়ে গেল, তুই এখন কেমন করে দেশে যাবি? ছেলেটা খানিক আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে বল্লে—দেশ তো আমার নেই।

—তবে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিলি?

—যেখানে সবাই চলেছে।

আমি ছেলেটাকে আমার সঙ্গেই রাখলেম। মীর-সাহেব, আপনার দেশ কোথায়—এই প্রশ্ন করলে আমি ছেলেটাকে বলি, দেশ নেই। সে

এখনো জানে এই জাহাজে করে সে আর আমি আমাদের দেশ খুঁজতে বেরিয়েছি।”

আমি মীর-সাহেবকে বল্লুম—“ছেলেটা পাখীকে অমন অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, আপনি ওর কাছ থেকে পাখীটা কেড়ে নিয়ে ধম্‌কে দেন না কেন? আহা পাখী যে এমন সুন্দর মা বলে ডাকে এ আমার কখনো শোনা ছিল না।”

মীর-সাহেব বল্লেন—“বাবুজী, ওই ছেলেটারই কচি গলার ‘মা’ সুর, পাখীটা সেই চা-বাগানের বড়দুঃখের কান্নার মাঝ থেকে শিখে নিয়েছে,—ছেলেটার সবটাই গালাগালিতে ভরা নয়।”

এমন সময় সেই ছেলেটা নীল কোর্ত্তা পোরে ছুটে এসে আমাদের বল্লে—“আপনাদের জাহাজ এখনি ছাড়বে, শীঘ্র যান্—কুয়াশা কেটে এখন রোদ উঠেছে।”

‘মাতু’ জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদের জাহাজ বেরিয়ে গেল। দেখলেম মীর-সাহেবের জাহাজের তিনটে চোঙা দিয়ে পাখীর বুকের পালকের মতো হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠচে। ফিরে এসে যখন আবার আমাদের জাহাজ ঘাটে লাগ্‌ল তখন মীর-সাহেবের জাহাজ যেখানে ছিল সেখানে মস্ত-একটা ফাঁক দেখলুম। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কুলীর দল পাটের বোঝা বয়ে পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে মালখানার দিকে চলেছে; আর একটা সোলার টুপি-মাথায় সাহেব ছড়ি-হাতে তদারক করে বেড়াচ্ছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্তসেনা

“অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজস্বার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা॥”

উজ্জয়িনী নগরীর বণিক চারুদত্ত ও তাঁহার গুণানুরক্তা বসন্তলক্ষ্মীর ন্যায় রূপশালিনী বসন্তসেনার কথা সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠকের অবিদিত নাই। “মৃচ্ছকটিক” হইতেই প্রথমে বসন্তসেনার কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগীর নিকট পরিচিত হইয়া পড়ে। তাহার পর ভাসের “চারুদত্ত” নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই দুইখানি গ্রন্থ ভিন্ন চারুদত্ত ও বসন্তসেনার উপাখ্যান যে জৈন-সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া স্থানলাভ করিয়াছে এ কথা বোধ হয় অতি অল্প-লোকেই বিদিত আছেন। জৈনসাহিত্যে প্রচলিত বহু উপাখ্যানই রূপান্তরিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া জৈন-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদকরূপে জৈনসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা, অশোকবনে রাবণ ও সীতা প্রভৃতি চিত্রসম্বলিত জৈন পুঁথিগুলির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলে এমন বোধ হয় না যে আমরা

প্রচলিত রামায়ণের কাহিনী ভিন্ন অন্য কোনও কাহিনী-সম্বলিত পুঁথি অবলোকন করিতেছি। পুঁথি পাঠ করিলেও এই সাদৃশ্য এত অধিক পরিমাণে উপলব্ধি হয়, যাহাতে ইহাকে পৃথক কাহিনী বলিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। তবে জৈন লেখকগণ সকল উপাখ্যানের মধ্য দিয়াই ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির মধ্যে জৈনরচিত মহাকাব্যও আছে। সেগুলির মধ্যেও একটি না একটি সর্গে জৈনধর্ম্মের সারতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পুরাণের মত জৈনদেরও বহু পুরাণ আছে। তাহাতেও সুপরিচিত পৌরাণিক বহু উপাখ্যান স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই জৈনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনকল্পে যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। জৈনলেখক-রচিত চারুদত্ত ও বসন্তসেনার উপাখ্যানেও এইরূপ জৈনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইয়াছে।

জিনসেনাচার্য্য রচিত হরিবংশ-পুরাণ নামক সংস্কৃত ছন্দে লিখিত একখানি সুবৃহৎ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের একবিংশতিতম সর্গে চারুদত্তের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। “হরিবংশপুরাণে”র সহিত মহাভারতের অন্তর্গত “খিল হরিবংশে”র নাম-সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য করিবেন। এই হরিবংশপুরাণের সহিত খিল হরিবংশের কাহিনীরও অনেক সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণ-বলদেবের কাহিনী, যদুবংশধ্বংস প্রভৃতি বহু কাহিনী উভয়ত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে জৈনগ্রন্থে কাহিনীগুলি কিছু ভিন্নপ্রকারের। এই সকল কাহিনী ভিন্ন অন্যান্য বহু উপাখ্যান জৈন হরিবংশপুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি কেবল জৈনধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কতকগুলি কিম্বদন্তীমূলক প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। চারুদত্ত ও বসন্তসেনার উপাখ্যান এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভারতীয় জৈনসিদ্ধান্ত-প্রকাশিনী সংস্থা জৈনহরিবংশ-পুরাণ মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মুদ্রণের জন্য তাঁহারা তিনখানি পুঁথি মিলাইয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একখানি এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে, অপরখানি সোলাপুর হইতে প্রাপ্ত ও শেষোক্তটি তালপত্রে কর্ণাট-দেশীয় লিপিতে লিখিত। এই তিনখানি পুঁথি মিলাইয়া যে পাঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি গৃহীত হইল। এ যাবৎ এ অংশগুলি কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। বন্ধুবর শ্রীপান্নালাল বাকলী বালজী পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রদান করাতে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইল। সেইজন্য এই অবসরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, চারুদত্ত-চরিত্র নামক স্বতন্ত্র জৈন গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। হিন্দী ভাষায় পদ্যে লিখিত ঐ বিষয়ক একখানি মুদ্রিত পুস্তক পান্নালালজীর নিকট আছে। কিন্তু এই গ্রন্থোক্ত উপাখ্যান জৈনহরিবংশপুরাণ হইতেই গৃহীত। সুতরাং হরিবংশপুরাণের উপাখ্যানের আলোচনা করিলেই জৈনসাহিত্যে রূপা-

স্তরিত বসন্তসেনার কাহিনী আমরা অবগত হইতে পারিব।

হরিবংশপুরাণের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে দুই এক স্থলে তাহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইবে।

"আসীৎ কলিঙ্গসেনাহত্র গণিকা গণনায়িকা।
সুতা বসন্তসেনাহস্যা বসন্তশ্রীরিব শ্রিয়া॥"

[হরিবংশপুরাণ। ২১ সর্গ ৪১ শ্লোক]

কলিঙ্গসেনার দুহিতা বসন্তসেনা। মৃচ্ছকটিকে শূদ্রক "বসন্তশোভেব বসন্তসেনা" বলিয়া বসন্তশোভার সহিত বসন্তসেনার রূপের তুলনা করিয়াছেন। জিনসেনও বসন্তসেনার রূপবর্ণনে সেই উপমাই ব্যবহার করিয়াছেন।

এই বসন্তসেনা নৃত্যগীতাদি বিবিধ কলায় পারদর্শিনী ছিলেন। নবযৌবন-সমন্বিতা হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১)

মৃচ্ছকটিকে চারুদত্ত উজ্জয়িনীর অধিবাসী, কিন্তু জিনসেন চারুদত্তকে চম্পার অধিবাসী করিয়াছেন। জিনসেনের কাহিনীতে বৈশ্যবংশীয় মহা ধনশালী ভানুদত্ত চারুদত্তের পিতা ও সুভদ্রা চারুদত্তের মাতা। যৌবনাগমে মাতুল সর্ব্বার্থের ঔরসে সুমিত্রার গর্ভে জাতা মিত্রবতীর সহিত চারুদত্তের বিবাহ হয়। কিন্তু শাস্ত্রচর্চ্চায় চারুদত্ত এত নিমগ্ন ছিলেন যে নিজ পত্নীর প্রতিও তাঁহার আসক্তি জন্মিতে পারে নাই। শাস্ত্রে অনুরাগ অন্য বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার আসক্তির প্রতিরোধক। চারুদত্তের পিতৃব্য রুদ্রদত্ত বহু ব্যসনে আসক্ত ও কামুক ব্যবহারে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। চারুদত্তের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে রুদ্রদত্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (২)

রুদ্রদত্ত চারুদত্তকে বসন্তসেনার প্রতি অনুরক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

এই অভিপ্রায়ে রুদ্রদত্ত একদিন সভ্যজনপূর্ণ নৃত্যমণ্ডপে চারুদত্তকে লইয়া গেলেন, সেখানে বসন্তসেনার নৃত্য করিবার কথা ছিল। (৩)

(১) "কন্যাসৌ নৃত্যগীতাদিকলাকৌশলশালিনী।
সৌরূপস্য পরা কোটির্যৌবনস্য নবোন্নতিঃ॥" (হ—পু ২১।৪২)

(২) "আসীদত্রৈব বৈশ্যেশ শ্চম্পায়াং সুমহাধনঃ।
ভানুদত্ত ইতি খ্যাতঃ সুভদ্রা তস্য ভামিনী॥...
উঢ়া চ যৌবনস্থেন নাম্না মিত্রবতী ময়া।
সর্বার্থস্য সুমিত্রায়া মাতুলস্য তনূভবা॥
শাস্ত্রব্যসনিনো মেঽ ভূন্নাত্মস্ত্রীবিষয়েঽপি ধীঃ।
শাস্ত্রব্যসনমন্যেষাং ব্যসনানাং হি বাধকম্॥
রুদ্রদত্তঃ পিতৃব্যো মে বহুব্যসনসক্তধীঃ।
সম্মান্য যোজিতো মাত্রা কামুকব্যবহারবিৎ॥" (হ-পু ২১।৫, ৩৮—৪০)

(৩) "নৃত্যারম্ভেঽ ন্যদা তস্যা রুদ্রদত্তেন সঙ্গতঃ।
সসাহিত্যজনাকীর্ণে স্থিতোঽহং নৃত্যমণ্ডপে॥" (হ—পু ২১।৪৩)

বসন্তসেনা সূচীনৃত্য (৪) আরম্ভ করিলেন।

এই নৃত্য-সময়ে চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার প্রথম পরিচয় হইল। উভয়েই সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যায় সুচতুর। নৃত্য-গীত-ভঙ্গীর দ্বারাই উভয়ে আপন-আপন কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। বসন্তসেনা অঞ্জলি দ্বারা বিকাশের পূর্ব্বাবস্থায় জাতি-কুসুম-মুকুলের অভিনয় করিলেন। তাহাতে কয়েকজন সভ্য সাধুবাদ দিলে চারুদত্ত বিকাশ-কালজ্ঞ মালাকরের ইঙ্গিত করিলেন। বসন্তসেনা অঙ্গুষ্ঠ অভিনয় করিলে চারুদত্ত নখরঞ্জনকারী নাপিতের ইঙ্গিত করিলেন। সুবিজ্ঞ সভ্যগণ তাহাতে প্রশংসাবাদ করিলেন। পরে বসন্তসেনা কুক্ষিদেশের ভঙ্গীক্রমে গো ও মক্ষিকার অভিনয় করিলে সভ্যগণ সাধুবাদ দিলেন। তাহাতে চারুদত্ত গো-পালের ইঙ্গিত করিলেন। তখন বসন্তসেনা প্রীতা হইয়া হাবভাব দ্বারা মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া নিজের অঙ্গুলি-শব্দ দ্বারা চারুদত্তকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। তাহার পর বসন্তসেনা সমগ্র লোকের সমক্ষে অনুরাগ-বশে চারুদত্তের সম্মুখে আসিয়া মনোহর নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৫)

জিনসেন চারুদত্তকে সচ্চরিত্র ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছেন। চারুদত্তের উপাখ্যানের মধ্য দিয়া জৈনধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন তাঁহার উদ্দেশ্য। কাজেই তিনি যখন চারুদত্তের চরিত্র অঙ্কিত করিলেন তখন প্রথম হইতেই চারুদত্ত শাস্ত্রানুরাগী ও স্ত্রীবিষয়ে পরাঙ্মুখ ছিলেন ইহাই দেখাইলেন।

(৪) "হরিবংশপুরাণে"র হিন্দী অনুবাদে সূচী নৃত্যের অর্থ করা হইয়াছে "ছুঁচের উপর নাচ"। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। সূচী একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীর নৃত্য। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে উহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"কুঞ্চিতং পাদমুৎক্ষিপ্য জানুরূর্দ্ধং প্রসারয়েৎ।
পাতয়েচ্চাগ্রযোগেন সা সূচী পরিকীর্ত্তিতা॥"
(নাট্যশাস্ত্রম্। ১০ম অধ্যায়ঃ। শ্লোকাঃ ৩২—৩৩

(৫) "সূচিনাটকসূচ্যগ্রে সা জাতিমুকুলাঞ্জলিম্।
ব্যকিরৎ প্রবিকাশাৎ প্রাক্ প্রাপ্তেষু মুকুলেষু চ॥
সুষ্ঠুক্কারে প্রযুক্তেঽ স্যা কৈশ্চিৎ সাহিত্যবর্ত্তিভিঃ।
ময়া বিকাশকালজ্ঞ মালাকারস্য যোজিতে॥
তস্যা দত্তে বুধৈস্তস্মিন্নঙ্গুষ্টেঽ ভিনয়ে কৃতে।
নাপিতস্য ময়া দত্তে নখমণ্ডলশোধিনঃ॥
কুক্ষের্গোমক্ষিকায়াশ্চ ব্যুদাসাভিনয়ে কৃতে।
পূর্ব্ববৎ তৈঃ কৃতে প্রাপ্তগোপালস্য ময়া পুনঃ॥
হাবভাববিবেকস্য ব্যঞ্জিকা সা চ সম্প্রতি।
সুষ্ঠুকারমদাৎ প্রীতা স্বাঙ্গুলিস্ফোটকারিনী॥
ততঃ সর্ব্বস্য লোকস্য পশ্যতো মম সম্মুখম্।
ননাট নাটকং হারি সানুরাগবশা চ সা॥ (হ—পু।২১। ৪৪—৪৯)

অঙ্গের কৌশলে তাঁহার মতিভ্রংশ হইল, জিনসেন ইহাই প্রকটিত করিতে সচেষ্ট।

মৃচ্ছকটিকে কিন্তু সে ভাব নাই। মৃচ্ছকটিকে যে যুগের চিত্র বিদ্যমান তাহাতে নাগরিকগণের বারাঙ্গনার সহিত প্রণয় দূষনীয় ছিল না। থাকিলে বসন্তসেনা আসিয়া চারুদত্তের গৃহে রাত্রি যাপন করিতে পারিতেন না। নাটকশেষে চারুদত্ত-পত্নী ধূতা বসন্তসেনাকে 'ভগিনী' সম্বোধন করিতেন না। রাজা আর্য্যকও বসন্তসেনাকে 'বধূ' আখ্যা দিতে পারিতেন না।

কাজেই শূদ্রক বিনা সঙ্কোচে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার অনুরাগ-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এ অনুরাগ যে সামাজিক হিসাবে নিন্দনীয় বা নৈতিক হিসাবে দুষ্ট তাহার কিছুমাত্র আভাস নাটকের কোনস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ মৈত্রেয় দূত হইয়া বসন্তসেনার গৃহে যাইতেছে। সেখানে পানাহার করিতে কেহ তাহাকে অনুরোধ করে নাই বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে। প্রকাশ্যেই চারুদত্ত ও বসন্তসেনা পরস্পরের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিতেছেন।

কিন্তু জিনসেন যে সময় হরিবংশপুরাণ রচনা করিলেন তখন সামাজিক অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। বারাঙ্গনা-গৃহে গমন, বারাঙ্গনার সহিত প্রণয় সর্ব্বথা নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই জিনসেনের কাহিনীতে চারুদত্ত সচ্চরিত্র হইয়াও মাতুল রুদ্রদত্তের কৌশলে বসন্তসেনার মোহে পড়িলেন এই বৃত্তান্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এরূপ বর্ণনার আরও একটি কারণ আছে। জৈনধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তিত। নিজপত্নী ব্যতীত অন্য রমণীতে অনুরাগ ত ঘৃণিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেই, অধিকন্তু নিজপত্নী বিষয়েও অত্যাসক্তি সর্ব্বত্র বারিত হইয়াছে। জিনসেন জৈনধর্ম্মতত্ত্বের প্রকটনকল্পেই হরিবংশপুরাণ রচনা করিয়াছেন। তাই বসন্তসেনার প্রতি চারুদত্তের অনুরাগ তিনি অনুমোদন করিতে পারেন নাই। উভয়ের অনুরাগোৎপত্তি, ও পরস্পরের সহিত বক্ষ্যমাণ ব্যবহারও জিনসেন এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

নৃত্যাবসানে বসন্তসেনা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও তথায় কাতরভাবে মাতার নিকট এইরূপে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিলেন :—"মা! এ জীবনে চারুদত্ত ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি প্রার্থনা করি না। তুমি চারুদত্তের সহিত আমার মিলন করাইয়া দাও।"

তাহার মাতা কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইয়া চারুদত্তের সহিত তাহার মিলন ঘটাইবার জন্য দান-মানাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া রুদ্রদত্তকে নিযুক্ত করিলেন। রুদ্রদত্ত একদিন এক কৌশল করিলেন। চারুদত্তকে লইয়া পথে যাইতে যাইতে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি হস্তী উত্তেজিত করিয়া তাহাদের পীড়নাশঙ্কাতেই যেন ব্যস্ত হইয়া চারুদত্তকে লইয়া বসন্তসেনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই কলিঙ্গসেনাকে সঙ্কেত করা ছিল। তিনি উভয়কে স্বাগত বাক্যে আহ্বান করিয়া আসনদান প্রভৃতি অভ্যর্থনা করিলেন। (৬)

তথায় রুদ্রদত্ত কলিঙ্গসেনার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীড়ায় রুদ্রদত্ত নিজ উত্তরীয় পণ রাখিয়াছিলেন। কলিঙ্গসেনা সেই উত্তরীয় জিতিয়া লইলেন। তখন চারুদত্ত রুদ্রদত্তকে সরাইয়া নিজে কলিঙ্গসেনার সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দ্যূতক্রীড়ানিপুণ বসন্তসেনা নিজ মাতাকে সরাইয়া চারুদত্তের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে চারুদত্ত অত্যন্ত পিপাসিত হইলেন। তখন যাহাতে মতিভ্রংশ হয় এইরূপ সুগন্ধি শীতল সলিল চারুদত্তকে পান করিতে দেওয়া হইল। অতি ঘনিষ্ঠ আলাপে বসন্তসেনার প্রতি চারুদত্তের অনুরাগ উৎপন্ন হইলে কলিঙ্গসেনা চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার পাণিগ্রহণ করাইলেন। (৭)

প্রাচীনকালে এইরূপ প্রথা ছিল। বাৎস্যায়ন-রচিত কামসূত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা একরূপ চুক্তিবদ্ধ মিলন। একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বারাঙ্গনাদের এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল।

এই অনুরাগোৎপত্তির বর্ণনাতেও চারুদত্তকে কৌশলে পানীয় পান করাইয়া মোহিত করা হইল এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে। এ অনুরাগ যে কেবল মোহমাত্র,

---

(৬) "উপসংহৃতনৃত্যা চ নিজপ্রাসাদবর্ত্তিনী।
স্বমাত্রেহ কথয়দ্‌ভাবমিতি সা কন্যকাতুরা॥
ইহ জন্মনি মে মাতশ্চারুদত্তাৎ পরস্য ন।
সঙ্কল্পস্তেন তেনায়ং মাং যোজয়িতুমর্হসি॥
মাতা জ্ঞাত্বা সুতাচিত্তং চারুদত্তস্য যোজনে।
দানমানাদিনাভ্যর্চ্চ্য রুদ্রদত্তমযোজয়ৎ॥
তেন চাহমুপায়েন পৃষ্ঠতশ্চাগ্রতঃ পথি।
গজৌ প্রযোজ্য তদ্বেশ্যাবেশ্ম জাতু প্রবেশিতঃ॥
কৃতসঙ্কেতয়া পূর্ব্বং কৃতঃ কালিঙ্গসেনয়া।
স্বাগতাসনদানাদ্যৈরুপচারোহ ত্র চাবয়োঃ॥ (হ—পু।২১।৫০—৪৪)

(৭) "দ্যূতে তত্রোত্তরীয়ঞ্চ রৌদ্রদত্তং জিতং তয়া।
ততোঽহমুদ্যতো রন্তুমপসার্য্য তমেতয়া॥
বসন্তসেনয়া দ্যূতাদপসার্য্য স্বমাতরম্।
কৃতা দ্যূরোদরক্রীড়া ময়া সহ বিদগ্ধয়া॥
আসক্তশ্চ চিরং তত্র পায়িতোঽতিপিপাসিতঃ।
মতিমোহনযোগেন বাসিতং শিশিরোদকম্॥
অতিবিশ্রম্ভতস্তস্যামনুরাগে মমোদ্গতে।
কর গ্রহণমেতস্যা জনন্যা কারিতোঽস্মাহম্॥ (হ—পু।২১। ৫৫—৫৮

তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। জিনসেন এ স্থলেও সতর্কতা অবলম্বনে অনবহিত নহেন।

গজতাড়না মৃচ্ছকটিকেও আছে। তবে সেখানে ব্যাপারটা অন্যরূপ। বসন্তসেনার ভৃত্য কর্ণপূরক একটা উন্মত্ত গজের আক্রমণ হইতে একজন পরিব্রাজককে রক্ষা করাতে চারুদত্ত তাহাকে নিজ উত্তরীয় পুরস্কার দেন। এই উত্তরীয় একবার বসন্তসেনাকে দাসী ভাবিয়া চারুদত্ত ধরিতে দিয়াছিলেন। কর্ণপূরককে পুরস্কৃত করিয়া বসন্তসেনা চারুদত্ত-প্রদত্ত উত্তরীয় তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করেন।

জিনসেনও একটি উত্তরীয়ের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তবে এ প্রসঙ্গ অন্যরূপ।

দ্যূতক্রীড়া মৃচ্ছকটিকেও আছে। তবে ক্রীড়ক সেখানে অন্য লোক। কিন্তু চারুদত্ত যে দ্যূতক্রীড়া করিতেন তাহার উল্লেখ মৃচ্ছকটিকেও পাওয়া যায়। বসন্তসেনার অলঙ্কার অপহৃত হইলে চারুদত্ত মিথ্যা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি দ্যূতক্রীড়ায় সেগুলি পণ করিয়া হারিয়াছেন। এজন্য বসন্তসেনা পরে রঙ্গ করিয়া চারুদত্তকে 'জুয়ারী' বলিয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়া প্রাচীনকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল। জিনসেন কিন্তু এ ক্রীড়ার সমর্থন করিতে পারেন না। তাই তিনি অনিষ্টকর দ্যূতক্রীড়ায় রত হওয়াতে চারুদত্তের মতিভ্রংশ হইল এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

তাহার পর দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া চারুদত্ত বসন্তসেনার গৃহে বাস করিলেন। পিতা, মাতা, পত্নী মিত্রবতী সকলকে ভুলিয়া গেলেন; অন্য কার্য্যের ত কথাই নাই। দুর্জ্জন কর্ত্তৃক সজ্জন যেমন আচ্ছন্ন হন পূজনীয় ব্যক্তিগণের সেবাদ্বারা চারুদত্তের যে সকল গুণরাশি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, রমণী-সেবায় উপজিত দোষ দ্বারা সে সকল সেইরূপই আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কলিঙ্গসেনার গৃহে চারুদত্তের ষোড়শ কোটী স্বর্ণ প্রবিষ্ট হইল। শেষে চারুদত্ত-পত্নী মিত্রবতীর অলঙ্কারও তথায় গেল। তাহা দেখিয়া মন্ত্রনিপুণা কলিঙ্গসেনা একান্তে বসন্তসেনাকে বলিলেন, "বাছা! তোমার ভালর জন্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে গুরুর বাক্যামৃতরূপ মন্ত্র সদা অভ্যাস করে, সে কখন অনর্থে পড়ে না। তুমি জান, আমাদের জীবিকা কি জঘন্য। যে অর্থশালী, সেই আমাদের প্রিয়। অর্থহীন ব্যক্তি রসহীন ইক্ষু বা অলঙ্কারের ন্যায় আমাদের ঘৃণ্য। চারুদত্তের পত্নী নিজের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি করুণাবশে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছি। সুতরাং এই গৃহীতসার চারুদত্তকে পরিত্যাগ কর। রসপূর্ণ নব ইক্ষুর ন্যায় ধনবান অন্য পুরুষের ভজনা কর। (৮)

বসন্তসেনার কর্ণে যেন শেলাঘাত হইল। তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া মাতাকে

(৮) "বসতা তত্র বর্ষাণি ময়া দ্বাদশ বিস্মৃতৌ।
পিতরৌ মিত্রবত্যামা কার্য্যেষন্যেষু কা কথা॥
বৃদ্ধসেবাবিবৃদ্ধা মে গুণাস্তরুণিসেবয়া।
দোষৈরুপচিতৈশ্ছন্নাঃ সজ্জনা ইব দুর্জ্জনৈঃ॥

বলিলেন, "মা! তুমি কি বলিলে? আমি বহুদিনসেবিত কৌমার-পতি চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া কুবেরকেও চাহি না। অন্যের ত কথাই নাই। নাথ চারুদত্তের বিহনে প্রাণবিয়োগ হইবে। মা! যদি আমার জীবন তোমার প্রিয় হয়, তাহা হইলে আর এরূপ কথা বলিও না। চারুদত্তের গৃহ হইতে আগত কোটি কোটি সুবর্ণে তোমার গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। তথাপি তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক। নারীজাতি বাস্তবিকই অকৃতজ্ঞ। কলা বিদ্যার পারগামী, অতিশয় রূপবান্, সদ্ধর্ম্মের অনুশীলনকারী, দাতা সেই চারুদত্তকে আমি কিরূপে ত্যাগ করিব?" (৯)

মৃচ্ছকটিকে চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রতি অনুরক্ত বটে কিন্তু সে অনুরাগ তাঁহার পত্নীকে ভুলাইতে পারে নাই। মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের সহিত যখন বসন্তসেনার সাক্ষাৎ, তখন চারুদত্ত দরিদ্র। সুতরাং ঐ অবস্থায় চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ চারুদত্তের গুণবশতঃই উৎপন্ন হইয়াছিল বলিতে হইবে। জিনসেনের উপাখ্যানে বসন্তসেনার গৃহে চারুদত্তের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আগত হইল। পত্নীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত

স্বর্ণষোড়শকোটীষু প্রবিষ্টাসু নিজং গৃহম্।
দৃষ্টা কালিঙ্গসেনান্তে মিত্রবত্যা বিভূষণম্॥
জগৌ বসন্তসেনাং তামেকান্তে মন্ত্র কোবিদা।
দুহিতর্হিতমাভাষে কর্ণে মদ্বচনং কুরু॥
গুরুবাক্যামৃতং মন্ত্রং সদাভ্যস্যতি যো জনঃ।
তমনর্থ গৃহাদূরাৎ ঢৌকণ্ডে ন কদাচন॥
জানাস্যেব জঘন্যা নো বৃত্তির্যদ্বিত্তবান্ প্রিয়ঃ।
হেয়ঃ পীলিতসারঃ স্যাদিক্ষ্বালকস্তবন্নরঃ॥
তন্মূলগ্নমলঙ্কারং চারুদত্তস্য ভার্য্যয়া।
প্রেষিতং প্রেষ্যকারুণ্যাদ্ ব্যসর্জ্জয়মহং পুনঃ॥
তদস্য পীতসারস্য কুরু তাবদ্বিমোক্ষনম্।
সারবন্তং নরং ত্বন্যং নবেক্ষুমিব ভক্ষয়॥ (হ—পু।২১।৫৯—৬৬)

(৯) "শঙ্কুনেব ততঃ কর্ণে তাড়িতা সাহ তিপীড়িতা।
জগাদ মাতরং মাতঃ কিমিদং গদিতং ত্বয়া॥
কৌমারং পতিমুজ্ঝিত্বা চারুদত্তং চিরোষিতং।
কুবেরেণাপি মে কার্য্যং নেশ্বরেণ পরেন কিম্॥
প্রাণৈরপি হি মে নাথশ্চারুদত্তো বিযোজকৈঃ।
মৈবং বোচঃ পুনর্মাতর্যদি মে জীবিতং প্রিয়ম্॥
পূরিতং কোটিশো দ্যূনৈর্গৃহং তে তদ্গৃহাগতৈঃ।
তথাপি তজ্জিহাসাভূদকৃতজ্ঞা হি যোষিতঃ॥
কলাপারমিতস্যাঞ্চ রূপাতিশয়যোগিণঃ।
সদ্ধর্ম্মদর্শিনো মেহ স্য স্যাত্যাগস্ত্যাগিনঃ কুতঃ॥" (হ—পু।২১।৬৭—৭১)

শেষে আসিয়াছিল। ইহা হইতে বসন্তসেনার জননীর ধনলোভ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তবে চারুদত্ত-পত্নীর অলঙ্কার প্রত্যর্পণে কলিঙ্গসেনার কিছু উদারতা প্রকটিত।

নির্ধন চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ জিনসেনের কাহিনীতেও বর্ণিত হইয়াছে। এই অনুরাগই বসন্তসেনার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। মৃচ্ছকটিকে রাজশ্যালক সংস্থানক দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার প্রেরণ করিয়া শকট পাঠাইলে বসন্তসেনার মাতা বসন্তসেনাকে সংস্থানকের নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে বসন্তসেনা মাতাকে জানাইয়া ছিলেন "যদি আমাকে জীবিত দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে আর কখনও এরূপ আজ্ঞা করিবেন না।" (১০) জিনসেনের উপাখ্যানেও বসন্তসেনার ঠিক এইরূপ উক্তি বিদ্যমান। বারাঙ্গনা হইলেও প্রণয়ীর প্রতি গাঢ় অনুরাগ, অর্থের প্রতি নিস্পৃহতা উভয়ত্রই সমানভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বসন্তসেনা যখন চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, তখন কলিঙ্গসেনা বুঝিলেন যে বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার মতেই মত দিয়া উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপবেশন, শয়ন, স্নান, ভোজন সকল সময়েই উভয়কে একত্র দেখিয়া একদিন যোগ দ্বারা উভয়কে নিদ্রিত করাইয়া রাত্রিকালে চারুদত্তকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। (১১)

চারুদত্ত তাহার পর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতা নাই। তাঁহার মাতা ও পত্নী তাঁহাকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন চারুদত্ত অর্থোপার্জ্জন অভিলাষে পত্নীর অলঙ্কার মূলধন করিয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে উশীরাবর্ত্ত দেশে গমন করিলেন। (১২)

ইহার পর চারুদত্তের বহুবর্ষব্যাপী ক্লেশ, অর্থনাশ, মনস্তাপ প্রভৃতির কাহিনী জিনসেন কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বাণিজ্যে প্রবৃত্ত চারুদত্ত যে সকল অদ্ভুত বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার সহিত আরব্য উপন্যাস বর্ণিত সিন্ধবাদ নাবিকের বিপদ্ উপমিত হইতে পারে। চারুদত্তের দুই একটি বিপদের

(১০) "জই মং জী অত্তীং ইচ্ছসি, তা এব্বং ণ পুণো অত্তাত্র আণ্ণাবিদব্বা।" (মৃচ্ছকটিকম্। চতুর্থোঽঙ্কঃ)

(১১) "অত্যাসক্তামিতি জ্ঞাত্বা কৃত্বা তদনুবর্ত্তনম্।
চিন্তয়ন্তী স্থিতোপায়মাবয়োঃ সা বিযোজনে॥
আসনে শয়নে স্নানে ভোজনে চাপি যুক্তয়োঃ।
যোগেনাযুজ্য নৌ নিদ্রামহং রাত্রৌ বহিষ্কৃতঃ॥" (হ—পু।২১।৭২—৭৩)

(১২) "নিদ্রাপায়ে গৃহং গত্বা ভর্ত্তৃনিষ্ক্রান্তদুঃখিনীম্।
অপশ্যং মাতরং দুঃখী ভার্য্যাঞ্চ কৃতরোদনীম্॥
ততঃ কৃততদাশ্বাসঃ প্রিয়ালঙ্কারহস্তকঃ।
উশীরাবর্ত্তমায়াতো মাতুলেন বণিজ্যয়া॥" (হ—পু।২১।৭৪—৭৫)

কাহিনী সিন্ধবাদের দুই একটি কাহিনীর সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল বসন্তসেনা চরিত্রের আলোচনা বলিয়া আমরা এ প্রসঙ্গে বিরত হইলাম।

কিন্তু চারুদত্ত যখন বহুবর্ষ পরে প্রভূত ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলেন তখন যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তিনি বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। দেখিলেন—বসন্তসেনা তাঁহার গৃহে। শুনিলেন যে তাঁহার বিদেশ গমনের পর হইতেই বসন্তসেনা আসিয়া তাঁহার মাতার সেবা করিতেছে। জিনসেন দুইটি পংক্তিতে মাত্র এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) বসন্তসেনা চারুদত্তবিরহে তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও জননীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া যে চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ও বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হইলেও একমনে নিজের জীবন এই সেবাব্রতেই উৎসর্গ করিয়াছে, এ কথা এই দুই পংক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। জিনসেন শেষটা বসন্তসেনার প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। জিনসেন যেরূপভাবে কলিঙ্গসেনার বারাঙ্গনাসুলভ অর্থপ্রিয়তা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে বসন্তসেনার উপরও আমাদের হয়ত সন্দেহ হইতে পারিত যে, সে-ও বুঝি প্রথমে অর্থলোভেই চারুদত্তের অনুরাগিনী হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু জিনসেন দেখাইয়াছেন যে নৃত্যকালে চারুদত্তের কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতাই বসন্তসেনার অনুরাগোদ্দীপন করিয়াছিল, অর্থলোভের সহিত এই অনুরাগের কিছুমাত্র সংযোগ নাই। নির্ধন চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অবিচল আসক্তি হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে প্রণয়ীর প্রবাসে, বহুবর্ষব্যাপী অদর্শনে, প্রণয়ী জীবিত আছে কি না তাহাও যখন সন্দেহের স্থল, তখন তরুণ যৌবনে সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া, জগতে একমাত্র আপনার বলিয়া পরিচিত মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়ীর গৃহে পরিচর্য্যাবৃত্তি অবলম্বন করাতে বসন্তসেনার চরিত্র জিনসেনের তুলিকাতেও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেষে এই অনুরাগ-প্রাবল্যে, নিষ্ঠাবাহুল্যে মোহিত হইয়া জিনসেন লিখিয়া গিয়াছেন, চারুদত্ত প্রীত হইয়া বসন্তসেনাকে গ্রহণ করিলেন। বসন্তসেনা নিশ্চয়ই তখন চারুদত্তের পরিবারভুক্তা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মৃচ্ছকটিকে ও জিনসেনের উপাখ্যানে দুইটি বিষয় অবিকল একই দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তসেনার গাঢ় অনুরাগ ও আসক্তি ও শেষে চারুদত্ত কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া তাঁহার পরিবারমধ্যে স্থান-লাভ ইহা উভয়ত্রই বর্ণিত হইয়াছে। তবে মৃচ্ছকটিকে অতি নিপুণ তুলিকায় বসন্তসেনার অনুরাগের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। চারুদত্তের চিত্রদর্শন ও উত্তরীয়-স্পর্শে সন্তোষ, চারুদত্তের ভৃত্যের প্রতি স্নেহ, চারুদত্তের পুত্রকে আপনার করিতে নিজের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত ঘটনার দ্বারা শূদ্রক বসন্তসেনার অনুরাগ ফুটাইয়া

(১৩) "তাং শুশ্রূষকরীং শ্বশ্রূং মদনুবৃতসংগতাম্।
শ্রুত্বা বসন্তসেনাঞ্চ প্রীতঃ স্বীকৃতবানহম্॥" (হ—পু।২১।৭৬)

তুলিয়াছেন। কিন্তু জিনসেন সে প্রয়াস পান নাই। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য অন্য-রূপ। বসন্তসেনার প্রণয়-কাহিনী মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রধান বস্তু। কাজেই এই বস্তুকে জীবন্তভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য চরিত্রগুলির যেরূপ উন্মেষ প্রয়োজন তাহাতে শূদ্রক বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জিনসেন নিজ উপাখ্যানে এ অংশ বিশদভাবে দেখাইতে অভিলাষী ছিলেন না। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় জৈনধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা, তাহা চারুদত্তের ক্লেশবহুল বিদেশে যাপিত জীবনের ঘটনাগুলি দ্বারা সাধিত হইয়াছে। চারুদত্তের বিদেশ-গমনের হেতু উল্লেখ করিবার জন্যই বসন্তসেনার কাহিনী প্রারম্ভে সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু যে অল্পপরিসরে জিনসেন বসন্তসেনার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই যতদূর সম্ভব তিনি বসন্তসেনার গাঢ় অনুরাগের পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হইয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে বারাঙ্গনা চরিত্রে সদ্‌গুণের উল্লেখ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি অতি অল্পস্থলেই আছে। প্রাচীন কিম্বদন্তীতে বোধ হয় বসন্তসেনা চরিত্রের এই বিশেষত্ব প্রচলিত ছিল—গল্পটি আমূল কাল্পনিক না হইতেও পারে। এই কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া পরে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। সুখের বিষয় তাঁহাদের সকলেরই সহানুভূতি বসন্তসেনার দিকে। শূদ্রক মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার যে অনুপম আলেখ্য বিন্যাস করিয়াছেন, জিনসেন হরিবংশ-পুরাণ মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের উপযুক্ত কাহিনী সন্নিবিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও সে চিত্রে কলঙ্করেখা পাত করিতে উদ্যত হন নাই। জিনসেনের ন্যায় জৈনাচার্য্যের পক্ষে ইহা কম উদারতার পরিচায়ক নহে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

আলেয়ার আলো

সূত্রপাত

এক

বাদলার ভিজে, স্যাঁত্‌সেতে দিন। সন্ধ্যার মুখে বৃষ্টি ধরিয়া আকাশটা একটু পরিষ্কার হইয়াছে। এই সুযোগে মোহনলাল আর হরেন্দ্রনাথ বিকালের বেড়ানো শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

মোহন আর হরেন, দুজনে সমবয়সী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। মোহনকে দেখিতে বেশ সুশ্রী, তাহার রং ফরসা, মুখচোখ মানানসই, একহারা ছিপছিপে চেহারা, কোমল কণ্ঠ, বিনীত ভাব-ভঙ্গী। কিন্তু হরেনের চেহারা ঠিক তাহার বিপরীত। লম্বায় সে ছয়ফুট, মস্ত চওড়া তাহার দেহ, চ্যাটালো বুক, গায়ের পেশীগুলা যেন লোহা-দিয়া বাঁধানো।

সে পা ফেলে জোরে-জোরে, কথা কয় জোরে-জোরে, হঠাৎ হাসিলে কাছের লোক চম্‌কাইয়া উঠে।

মোহন ধনীর সন্তান; তাহার পিতা কলিকাতায় একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, সেও ডাক্তারী পড়িতেছে। হরেন তাহার সহপাঠী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে।... ...

রাস্তার চট্‌চটে কাদায় জুতা বসিয়া যাইতেছিল; মোহন বিরক্ত হইয়া বলিল, "দেখ-দিকিন হরেন, এ না-জল না-স্থল,—জলচর কি স্থলচর কোনপ্রকার জীবের পক্ষেই রাস্তার এই অবস্থাটা—"

"—আরামপ্রদ নয়। কিন্তু গাড়ী-চর জীব, যাঁরা গরিবকে দশহাত তফাতে রাখতে চান, তাঁদের সুবিধের জন্যেই জগতে কর্দ্দমের সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার কর্দ্দমাক্ত পথে যখন ঘর্ঘর-রবে তাঁদের মোটরের সুদর্শন-চক্র ঘুরতে থাকে, তখন কাদা ছিট্‌কোবার আগেই বিশ্রী গরিব-বেচারীরা মানে-মানে আপনা থেকেই তফাতে ছিট্‌কে পড়ে! আরে মলো, কি আপদ! মোহন, সর—সর—!"

বলিতে-বলিতেই একখানা গাড়ী তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু অল্পদূর গিয়াই থামিয়া পড়িল।

গাড়ীর চাকার কাদা ছিট্‌কাইয়া দুইবন্ধুর জামাকাপড় চিত্রবিচিত্র করিয়া দিল। মোহন নীরবে গা-হইতে কাদার ছোপ যতটা সম্ভব ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল; হরেন কিন্তু মহা ক্ষাপ্পা হইয়া গাড়ী এবং তাহার চালক ও আরোহীর উদ্দেশে অনেকগুলা শক্ত অভিশাপ বর্ষণ না-করিয়া থাকিতে পারিল না।

হঠাৎ কে ডাকিল, "ও মশাই, শুনছেন! বলি, ও মশাই!"

দুজনেই মাথা তুলিয়া দেখিল, গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া এক শ্বেতকেশ বৃদ্ধ হাত-নাড়িয়া তাহাদিগকেই ডাকিতেছেন।

মোহন বলিল, "কি হে, আমাদের ডাকে যে!"

হরেন চটিয়া বলিল, "চুলোয় যাক গে!"

মোহন বলিল, "আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি এগিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি!"

মোহন গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র ভিতর হইতে বুড়ালোকটি বাহিরে নামিয়া আসিলেন; বলিলেন, "মশাই, ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছি! গাড়ীখানা তীরের মত কোথা দিয়ে যে কোথায় এসে পড়ল, কিচ্ছু ঠাহর করতে পারছি না!"

লোকটির রকম-সকম দেখিয়া মোহন বুঝিল, ইনি কলিকাতার বাসিন্দা নন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি দরকার?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এখানে পরশুদিন এসে একখানা বাড়ী ভাড়া করে গিয়েছিলুম, আর আজকে সে বাড়ী খুঁজে পাচ্ছি না। সুতরাং—বুঝতেই পারছেন?"

মোহন বলিল, "রাস্তার নাম আপনার মনে আছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, তা আর মনে নেই? হরিবাবুর গলি।"

মোহন বলিল, "ওঃ! বুঝেছি।"—সে বৃদ্ধকে কোন্‌দিক দিয়া যাইতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিল।

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য,

কিচ্ছু বুঝলুম না। সুতরাং—বুঝতেই পারছেন?"

মোহন, বৃদ্ধের কথা কহিবার ধরণ দেখিয়া, একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি?"

—"অর্থাৎ, আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। আপনি গাড়ীর উপরে দয়া করে উঠে বসুন!"

মোহন একটু ইতস্তত করিতেছিল, হঠাৎ গাড়ীর ভিতরে তাহার চোখ পড়িল। অন্ধকারের মধ্য হইতে মৌন মিনতি-ভরা দুখানি উজ্জ্বল নয়নের মধুর দৃষ্টি তাহার পানে স্থির হইয়া আছে!

মোহন বলিল, "হরেন, তুমি এগিয়ে যাও—এঁদের পৌঁছে দিয়ে আমি যাচ্ছি!"

হরেন তাহার গা-টিপিয়া চুপিচুপি বলিল, "শিভাল্‌রির সুযোগ পেলে ছেড়ো না হে!"

মোহন চোখ রাঙ্গাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"চুপ!"

বৃদ্ধকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া মোহন গাড়ীর চাল হইতে নামিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ ত খুব সোজা পথ দেখচি! অথচ আমি কিছুতেই চিনতে পারছিলুম না।"

মোহন বলিল, "আপনি বুঝি কলকাতায় থাকেন না?"

—"না। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক।"

—"আপনাদের দেশ?"

—"আমাদের দেশ হচ্ছে—"

গাড়ীর ভিতর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে বিরক্ত স্বরে কে বলিল, "বাবা—"

বৃদ্ধ থতমত খাইয়া থামিয়া গেলেন—দেশের নাম বলিতে-বলিতে আর বলিলেন না।

মোহন দুটি কথা বুঝিল। প্রথম, গাড়ীর ভিতরে যিনি আছেন, তিনি বৃদ্ধের কন্যা। দ্বিতীয়, দেশের নাম বলিতে এঁদের যখন আপত্তি, তখন ভিতরে কিছু রহস্য আছে।

গাড়ী হইতে বৃদ্ধের কন্যা নামিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। আসবাব-পত্র নামানো হইতেছে, এমনসময় ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি আসিল।

মোহন বলিল, "আচ্ছা মশাই, নমস্কার!"—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ীমুখো হইল।

বৃদ্ধ খপ্ করিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য। ছাতা নেই—এ বৃষ্টিতে যাবেন কি করে!"

মোহন বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও ত ভিজতে হবে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বাঃ, ভিজবেন কেন, আমার বাড়ীর ভিতরে আসুন না! আমাদের জন্যেই ত আপনি এই বিপদে পড়লেন! সুতরাং—"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। মোহনকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গিয়া বৃদ্ধ ডাকিলেন, "ওমা সরমা, এদিকে একটা লণ্ঠন দিয়ে যা ত!"

একটি হারিকেন ল্যাম্প হাতে করিয়া বৃদ্ধের কন্যা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে-আসিতে বলিল, "বাবা, সে ভদ্রলোকটি চলে গেছেন?—ওমা—"

পিতার সঙ্গে মোহনকে বাড়ীর ভিতরে

দেখিয়া আলোটা মাটির উপরে দুম্-করিয়া বসাইয়া দিয়া সরমা একছুটে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

কিন্তু মোহনের সাবধানী চোখ, চকিতের মধ্যেই সরমাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার চোখ যেন ধাঁধিয়া গেল—এ যে উদ্দীপ্ত চপলা! এমন রূপ ত সহজে চোখে পড়ে না!

বৃদ্ধ, মোহনের কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়াই বলিলেন, "এখানে খাবারের দোকান কোথায় আছে বল্‌তে পারেন? আজ ত আর রান্না চড়বে না, কিনে খেতে হবে; সুতরাং—"

উপকার করিবার এমন সুযোগ হাতে পাইয়া মোহন তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনাদের একটা ছাতা আমাকে দিন না—আমি খাবার-দাবার সব এনে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ কুণ্ঠিতভাবে আরো-দুচারবার না না করিয়া শেষে একটি ছাতা আনিয়া দিলেন।

মোহন ছাতা লইয়া চলিয়া গেল।

সরমা বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা, ভদ্রলোকের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে! এই বৃষ্টি মাথায় করে আমাদের জন্যে উনি খাবার আনতে গেলেন!"

—"কি করব মা, উনি যে শুনলেন না!"

—"পয়সা দিয়েছেন ত?"

—"ওই যাঃ!—কি আশ্চর্য্য!"—মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া অত্যন্ত অপরাধীর মত বৃদ্ধ মাথা চুলকাইতে সুরু করিলেন।

সরমা হাসিয়া বলিল, "দিন-কে-দিন তুমি যেন কী হচ্ছ! তোমার ছেলেমানুষী আর গেল না। যাহোক, উনি ফিরে এলে হিসেব করে পয়সাগুলো দিয়ে-দিও!"—তার পর একটু থামিয়া কি-ভাবিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা বাবা, আমাদের ত একটা ঝীয়ের দরকার হবে, ওঁকে বললে হয় না? উনি আমাদের এ উপকারটুকুও করে দেবেন বোধ হয়।"

—"আচ্ছা মা, বলে দেখব।"

এমনি-সব কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় খাবারের চাঙ্গারি হাতে করিয়া মোহন আসিয়া হাজির হইল।

দুই

ভোরবেলা। বৈঠকখানার জানলার কাছে বসিয়া মোহন, বর্ষণক্ষান্ত নীল-নির্মেঘ আকাশের দিকে আনমনে চাহিয়াছিল। পৃথিবীতে আমাদের চোখের সুমুখ দিয়া নিত্য-নূতন লোকের মুখ চলিয়া যায়; তাহারই মধ্যে আকস্মিক বিস্ময়ের মত মাঝে-মাঝে এমন এক-একটি সুন্দর মুখ আমাদের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে যে, সেই মুহূর্ত্তের দেখা আমরা আর সহজে ভুলিতে পারি না। মোহনও কাল পথের মাঝে এমনি একখানি মুখ দেখিয়াছে, সে মুখের মোহিনী-শক্তিতে এখনো সে অভিভূত হইয়া আছে!

এমনসময়ে হরেন বাহির হইতে ডাকিল, "মোহন আছ হে!"

—"আছি। ভিতরে এস।"

হরেন হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তারপর!"

—"তারপর মানে?"

—"এও ব্যাখ্যা করতে হবে? তারপর—অর্থাৎ, কালকের ব্যাপারটা!"

মোহন একটু হাসিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

হরেন মুরুব্বিয়ানা চালে মোহনের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, "বাহাদুর, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ভদ্রলোকের নাম জেনেছ?

—"মুরারি-বাবু।"

—"জাতি?"

—"আমাদেরই।"

—"সুসংবাদ! অতঃপর প্রাণপণে সুন্দরীর হৃদয়-দুর্গ অবরোধ কর—আত্ম-সমর্পণ না করলে কিছুতেই ছাড়বে না।"

মোহন কোন জবাব দিল না। একটা সিগারেট ধরাইয়া আস্তে-আস্তে টানিতে লাগিল।

হরেন বলিল, "বেশ ভাল করে দেখে এসেছ ত, নায়িকার কপালে সিঁদুর নেই? ঐ একফোঁটা সিঁদুরের উপরেই কিন্তু সমস্ত নির্ভর করছে!"

—"না, সে আমি দেখেছি।"

—"মোহন, ওঠ—জাগ! জীবনে সুযোগ দু-বার আসে-না। অনূঢ়া তরুণীর হৃদয়টা হচ্ছে শিরোনামা-হীন প্রেমপত্রের মতন। একটু চেষ্টা করলেই এ পত্রের শিরোনামায় তোমার নাম বসে যেতে পারে!"

—"কিন্তু তুমি যে এখন থেকেই কাল-নেমির লঙ্কাভাগ সুরু করে দিলে হে! কোথাও কিছু নেই, একেবারে বিবাহ! আর, আমি যে বিবাহ করব, তাই বা তোমাকে কে বল্‌লে?"

—"আরে রাখ, রাখ! বয়স যখন চব্বিশ, প্রাণ তখন শুক্‌নো খড়ের গাদার মতন। কাছে আগুন আন্‌লে আর কি বাঁচোয়া আছে? যৌবনলাভ করে মানুষের জ্ঞান-চক্ষু ফুটলেই সে সব-চেয়ে যে অজ্ঞানের কাজ করে, তার নাম হচ্ছে, বিবাহ!"

—"সবতাতেই তোমার হাসি-তামাসা?"

—"হ্যাঁ। বন্ধু, মাতৃগর্ভ ত্যাগ করেই আমরা যে কান্না সুরু করি, সে কান্না মরণের আগে আর থামে না। এর মধ্যে যখনি অবকাশ পাবে, প্রাণপণে হেসে নেবে। হাসি হচ্ছে জীবনের সার, মানুষের প্রাণ!"

—"হাসি-তামাসা বরং সওয়া যায়—কিন্তু অসময়ে দার্শনিকতার লেক্‌চার—এ একেবারে অসহ! তুমি থাম।"

—"আমি থামলে, তোমাকে সুরু করতে হয় যে। একঘরে দুজনে চুপচাপ বসে থাকা, দার্শনিকের লেকচারের চেয়েও আরো-বেশী অসহ।"

—"বসে থাকবারই বা সময় কৈ! ঝীকে বলে দিয়েছি, সে এখনি একটা লোক নিয়ে আসবে, তাকে সঙ্গে করে আমাকে মুরারিবাবুর বাড়ী যেতে হবে।"

—"সেক্ষেত্রে, আমার পক্ষে চট্‌পট্ উঠে পড়াই হচ্ছে উচিত কার্য্য।

—"তা কেন, তুমিও চলনা—মুরারি-বাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসবে।"

—"এখানে আলাপ মানে বিলাপ।"

—"কেন?"

"বন্ধু, একটিমাত্র রসগোল্লা দুটি বালকের হাতে দিলে কাড়াকাড়ি হয়; একটিমাত্র রমণীও দুটি যুবকের ভাগে পড়লে

কাড়াকাড়ি, আড়াআড়ি এবং ছাড়াছাড়ি অনিবার্য্য। অতএব, বিদায়!"

মোহন যখন মুরারিবাবুর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল, তখন তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া আপনমনে এস্রাজ বাজাইতেছিলেন।

মোহনের গলা পাইয়া তিনি তখনি বাজনা থামাইলেন। তারপর অত্যন্ত স্নেহভরে আল্‌ত ভাবে এস্রাজটিকে তক্তাপোষের উপরে শোয়াইয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন, আমি আপনারই অপেক্ষায় ছিলুম।"

মোহন সঙ্গের দাসীকে দেখাইয়া বলিল, "এই স্ত্রীলোকটি আপনার বাড়ীতে কাজ করবে, এ-কে সব বুঝিয়ে দিন।"

—"কি আশ্চর্য্য! আপনি একেবারে সঙ্গে করেই লোক নিয়ে এসেছেন? ভগবান আপনাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, নৈলে আমাদের কি মুস্কিলেই যে পড়তে হোত!"

মোহনকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া, মুরারি-বাবু দাসীকে লইয়া ভিতরে গেলেন।

মোহন দেখিল, ঘরের ভিতরে একটি এস্রাজ, একখানি বেহালা ও একটি পাখোয়াজ রহিয়াছে। যন্ত্রগুলি যে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়, তাহাদের চাকচিক্য দেখিলে সেটা বুঝিতে দেরি হয় না। মোহন জানিতে পারিল, মুরারিবাবুর গান-বাজনার বেশ সখ আছে। ইহাতে তাহারও মন ভারি খুসী হইয়া উঠিল; কারণ সেও ছেলেবেলা হইতে গান-বাজনা ভালবাসে—আপনার স্বাভাবিক সুকণ্ঠকে চর্চ্চার দ্বারা সে আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

মুরারিবাবু ঘরে আসিয়া ঢুকিলে, মোহন যন্ত্রগুলির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আপনার দেখছি বাজ্‌না-টাজ্‌নাও আসে।"

মুরারিবাবু বসিয়া দুলিতে-দুলিতে বলিলেন, "সামান্য। দুনিয়ার হের-ফেরে মনটা যখন দমে যায়, তখন ঐ এস্রাজের সঙ্গে আমি আমার প্রাণের কথা কই—ও সুধু আমার দুঃখের দোসর নয়,—সুখের সময়ও ও আমার একমাত্র প্রাণের সখা!"

মোহন বলিল, "আপনি কি এখানে একলা থাকবেন, না আর কেউ আসবেন?"

মুরারিবাবু জানলা দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া একটু ভারি গলায় বলিলেন, "কে আর আসবে, কে আর আমার আছে? আপন বলতে যারা ছিল, তাদের সবাইকে একে একে চিতায় তুলে দিয়েছি, এখন আছে সুধু ঐ মেয়েটি—তা ও অভাগীর থাকা না থাকা দুই সমান!"

—"কেন?"

—"সরমা বিধবা।"

মোহন অনেক কষ্টে আপনাকে সামালাইয়া লইল; এতক্ষণ সে মনে মনে যে রঙ্গিন ছবি আঁকিতেছিল, কে যেন তাহার উপরে হঠাৎ এক-ধ্যাবড়া কালি ঢালিয়া দিল। অত্যন্ত দমিয়া গিয়া হেঁট্‌মাথায় সে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিল।

মুরারিবাবুও স্তব্ধভাবে বসিয়া-বসিয়া আপনার দীর্ঘ দাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

খানিক পরে মোহন কথা কহিল।

দুঃখিতভাবে বলিল, "আহা, এত অল্পবয়সে বিধবা!"

তাহার সমবেদনায় গলিয়া গিয়া মুরারি-বাবু বলিলেন, "বাবা, এ বুড়োর বুক ভেঙ্গে গেছে। আজ যদি আমি যাই, কাল ওর দশা কি হবে,—আমি তাই ভাবি। আমার সরমাকে কে দেখ্‌বে? সমাজ সুধু শাস্তি দিতেই জানে, দয়া করা তার ধর্ম্ম নয়!"

মোহন বলিল, "কেন, আপনার মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে কি কেউ নেই?"

—"সে না-থাকারই মধ্যে। জামাইয়ের দুই ভাই আছেন, কিন্তু জামাই যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন-ই ভায়ে ভায়ে সদ্ভাব ছিল না, সুতরাং—" মুরারিবাবু হঠাৎ কি-ভাবিয়া থামিয়া গেলেন,—মোহন সেটা বুঝিয়াও কোন কথা কহিল না।

খানিক পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুরারিবাবু অন্যমনস্কভাবে এস্রাজটি কোলের উপরে তুলিয়া লইলেন। ছড়ির দু-একটি টানে এস্রাজের তারে-তারে যে করুণ সুরের রিঞ্জিনী ফুটিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়াই সুরজ্ঞ মোহন বুঝিল, বাজনায় এঁর অসাধারণ হাত!

এস্রাজ যেন কথা কহিতেছে,—সুরের কান্নার সঙ্গে বাদকের প্রাণের আবেগও যেন ধীরে-ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে! হঠাৎ বাজনা থামাইয়া মুরারিবাবু বলিলেন, "মশাই, বুড়োর বক্‌বকানিতে কিছু মনে করবেন না। মনের দুঃখ হাসি-খুসিতে চেপে রাখতে চাই, কিন্তু পারি না—মুখ ঠেলে আপনি বেরিয়ে পড়ে।"

—"মুরারিবাবু, আপনার দুঃখে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। এতে আমার বিরক্ত হবার কি আছে? অন্যের দুঃখে যে বিরক্ত হয়, তাকে মানুষ বলে মনে করা চলে না; —মানুষ, মানুষের কাছ থেকে যদি একটু সমবেদনাও না পায়, তাহলে সংসারে আর অরণ্যে তফাৎ কি?"

—"আপনার মত প্রাণ ত সকলের নয় মোহনবাবু! আমার ব্যথার ব্যথী হওয়া দূরের কথা, অনেকেই আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে ত্রুটি করে-নি"—বলিতে-বলিতে আবার হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া মুরারিবাবু কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আবার আমি নিজের কথাই পাঁচকাহন করছি! ছোকরারা এইজন্যেই বুড়োদের দূর থেকে নমস্কার করে!"

মোহন বুঝিতে পারিতেছিল যে, মুরারিবাবু তাহার কাছ হইতে কোন-একটা কথা চাপিয়া রাখিতে চাহিতেছেন। প্রথম সাক্ষাতের সময় মুরারিবাবু যখন তাঁহার দেশের নাম বলিতে যাইতেছিলেন, তখনও তাঁহার কন্যা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন! এইসব নানাকারণে মুরারি-বাবুর কথা জানিবার জন্য মোহনের মনে কেমন-একটা কৌতূহল হইতেছিল। কিন্তু এ অন্যায় কৌতূহলকে দমন করিয়া সে বলিল, "আমি কিন্তু আপনাকে কাছ থেকেই নমস্কার করে আজকের মতন বিদায় হচ্ছি।"

নমস্কার করিয়া মোহন উঠিতে যাইতে-ছিল, কিন্তু মুরারিবাবু তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! বড্ড ভুলে গেছি মোহনবাবু, বড্ড ভুলে গেছি!"

—"কি?"

—"আপনার বিদায়ী নমস্কার ত এখনি নেওয়া হতে পারে না মশাই!"

—"কেন?"

—"সরমা বলে দিয়েছে, আপনাকে সামান্য-কিছু জলযোগ করতে!"

—"জলযোগ? এ-সব গোলযোগ কেন মুরারিবাবু?"

—"কাল আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আজ যদি আমাদের কষ্ট দিয়ে আপনি তার শোধ তুলতে চান, তাহলে যেতে পারেন।"

মোহন একটু হাসিয়া আবার বসিল। মুরারিবাবু খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "সরমা একলাটি খাবার তৈরি করছে; একটু দেরি হতে পারে। এটুকু সময় চুপ করে বসে থেকে কি হবে? সুতরাং—!" বলিয়া তিনি এস্রাজের তারে আবার ছড়ির টান লাগাইয়া দিলেন; সুরের মূর্চ্ছনা, তান ও গিট্‌কিরির ভিতর দিয়া সিন্ধুভৈরবীর মধুর আলাপ মোহনের প্রাণটিকে একেবারে মাত্ করিয়া তুলিল।

তিন

সেদিন মুরারিবাবুর বাড়ীতে জলযোগ করিতে বসিয়া, মোহনের মনে যে দুঃখ-মিশ্রিত আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, আজও সে তা ভুলে নাই। ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সরমা তাহাকে পরিবেষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পিছনে এলানো কালো কেশের রাশি, চাঁপাফুলের মতন গায়ের ফুট্‌-ফুটে রং, নত নেত্রের শান্ত দৃষ্টির আভাস—কাপড়ের আবরণে এ-সব কিছুই ঢাকা পড়ে নাই! আর, সেই যে দুখানি ছোট ছোট নদীর মত নরম হাত—যে হাতদুটি খাবারের থালা আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়াছিল, সে হাত-দুখানিও কি সুডৌল, কি সুশ্রী! সেই নধর হাতের ফুলের পাপড়ির মত নুয়ে-পড়া আঙ্গুলগুলি, আঙ্গুলের ধারে-ধারে গোলাপী রঙ্গের নখগুলি, এ সমস্তই মোহনের মনে একেবারে ছবির মত গাঁথিয়া গিয়াছে। সামনে ডাক্তারী বই খোলা রহিয়াছে, ছাপার হরফ আড়াল করিয়া সেদিনকার ছবি মোহনের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া তুলিয়াছে! ইহার মধ্যে হরেন আসিয়া কখন্ যে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—মোহন তাহা একটুও টের্ পায় নাই। হরেন কৌতুকভরে খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সুর-করিয়া বলিল—

'কে যোগেন্দ্র, যোগাসনে,
ঢুলুঢুলু দুনয়নে,—
কাহারে ধেয়াও?'

"হ্যাঁ হে মোহন,—শুনতে পাচ্ছ কি? না, তোমার তপোভঙ্গের জন্যে আবার মদনের সন্ধানে যাত্রা করতে হবে?"

সচকিতে ফিরিয়া মোহন দেখিল, হরেন। হাসিয়া বলিল, "এই যে, তোমায় আমি দেখতেই পাই-নি।"

—"দেখতে যে পাবেনা, এ ত ধরা কথা!"

—"কেন, কেন?"

—"কারণ, কিউপিড যে অন্ধ! তুমি এখন তাঁরই মন্ত্রশিষ্য কি না!"

—"ভাই, ভগবান যে চোখ দিয়েছেন, তা সুমুখ ছাড়া পিছনদিকে ব্যবহার করা অসম্ভব। তুমি আছ পিছনদিকে, কাজেই তোমাকে দেখতে না পাওয়া আমার পক্ষে কিছুই অন্যায় হয়-নি।"

—"তোমার যুক্তি অকাট্য। যাক্ সে কথা। বলত, এ ক-দিন তোমাকে দেখিনি কেন? কলেজেও যাও-নি, ব্যাপার কি?"

—"শরীরটা তেমন ভাল ছিলনা।"

—"তারপর, ওদিককার খবর কি? আশাজনক?"

মোহন তিক্তস্বরে বলিল, "ভাই, ও-সব কথা আর ভেবে কাজ নেই।"

—"কেন?"

—"সরমা বিধবা।" মোহন সমস্ত খুলিয়া বলিল।

হরেন স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর বলিল, "যাক্‌গে, কি আর হবে! বিবাহের আগে মানুষ, মানুষই থাকে; কিন্তু বিবাহের পরে সে কেবলমাত্র 'স্ত্রীর স্বামী'তে পরিণত হয়। এ দুর্ভাগ্য থেকে তুমি বেঁচে গেছ হে!"

মোহন নিরুত্তর হইয়া অন্যমনস্ক ভাবে ডাক্তারী বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

খানিক পরে কি ভাবিয়া হরেন বলিল, "আচ্ছা, মুরারিবাবু কোন্ শ্রেণীর লোক বলতে পার?"

—"তোমার কথার মানে?"

—"তিনি গোঁড়া হিন্দু, না নব্যতন্ত্রের লোক?"

—"সেটা আমি ঠিক করে বলতে পারব না। তবে, এই অল্প আলাপেই তাঁর মেয়ে আমার সামনে বেরিয়েছিলেন—অবশ্য, ঘোমটায় মুখ ঢেকে।"

—"এতে কিছুই বোঝা গেল না। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতাকে ঘোমটার ঢাক্‌নীতেই অক্ষুণ্ণ রেখে নিশ্চিন্ত থাকেন। দেখ মোহন, তুমি মুরারিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও। দেখা যাক, তিনি কোন্ মতের লোক।"

—"তাতে লাভ?"

—"মুরারিবাবু নব্যতন্ত্রের লোক হলে এখনো তুমি আশা করতে পার।"

"—কি-রকম?"

—"হিন্দুসমাজে এখন বিধবা-বিবাহ অচল নয়।"

—"সে কি!"

—"হ্যাঁ। তোমার মাথার উপর তোমাকে বাধা দেয়, এমন কেউ নেই। অনেকের পক্ষে যা অসম্ভব, তোমার পক্ষে তা খুবই সম্ভব।"

মোহন আনমনে ভাবিতে লাগিল—কিছুই বলিল না।

হরেন বলিল,—"মুরারিবাবু যদি একেলে মতের লোক নাও হন, তাহলেও তুমি তাঁর অন্ধ পিতৃস্নেহের উপর নির্ভর করতে পার। তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর মেয়ের কি হবে, সে ভাবনা তাঁর পক্ষে যতটা গুরুতর, বিধবা-বিবাহের ভাবনা ততটা নয়।"

—"কিন্তু—কিন্তু, বিধবাবিবাহের ফল কি ভাল হবে?"

—"কেন হবে না?"

এমনি কথাবার্ত্তা হইতেছে, হঠাৎ

বাহির হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে কে ডাকিল, "বাবু ঘরে আছেন?"

মোহন বলিল, "কে?"

—"আমি মুরারিবাবুদের ঝী।"

মোহন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ভিতরে এস।"

একটি স্ত্রীলোক উদ্বিগ্নমুখে ব্যস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে আসিল। মোহন চিনিল—সেই-ই ইহাকে সঙ্গে করিয়া মুরারিবাবুর বাড়ীতে কাজ করিতে লইয়া গিয়াছিল।

মোহন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ঝী?"

—"কি-জানি বাবু, কে একটা লোক মদ খেয়ে এসেছে, তার সঙ্গে আর-একটা গুণ্ডার মত লোক, বাবু তাদের যেতে বললেও নড়্‌চে না। তাই দিদিমণি আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন।" সে একখানা কাগজ বাহির করিয়া মোহনের হাতে দিল।

মোহন তাড়াতাড়ি কাগজখানা তাহার হাত হইতে গ্রহণ করিল। পরিষ্কার, ছোট ছোট অক্ষরে সুধু লেখা আছে—

"বড় বিপদ। দয়া করে আসুন।"

মোহন বিস্মিতভাবে হরেনের মুখের দিকে চাহিল।

হরেন তখনই জুতা পরিতে-পরিতে বলিল, "হাঁ-করে চেয়ে দেখছ কি! চল, চল, আমিও সঙ্গে যাব।"

মোহন তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় হরেন ঘরের কোন্ হইতে একগাছা মোটা লাঠি লইয়া গেল।

চার

দুই বন্ধুতে যখন মুরারিবাবুর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল, তখন সন্ধ্যা। মুরারিবাবুর বৈঠকখানার ভিতরে অচেনা গলায় কে বলিতেছিল, "আপনি আমার কথায় কেন যে রাজি হচ্চেন না, তা ত বুঝতে পারচি না।"

—"কি আশ্চর্য্য! বাপ কখনও এমন কথায় রাজি হতে পারে?"—এ মুরারি-বাবুর গলা।

—"আচ্ছা, আপনি ত বুড়ো হয়েচেন, কখন্ আছেন কখন্ নেই, আপনি যখন থাকবেন না তখন আপনার মেয়েকে ত ঘর ছেড়ে পথেই দাঁড়াতে হবে?"

—"তখন ভগবান আছেন!"

ভগবানের নামে ঘরের ভিতর হইতে আর-একজন কে ব্যঙ্গভরে কর্কশস্বরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোহন ও হরেন আর দাঁড়াইল না—একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। একদিকে মুরারি-বাবু শান্তমুখে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন,—আর-একদিকে আর-দুজন লোক। একজনের চেহারা সৌখীন ভদ্রলোকের মত; আর-একজন যেন সাক্ষাৎ সয়তান।

আচম্‌কা মোহন ও হরেনকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাহারা দুজনেই দাঁড়াইয়া উঠিল। ভদ্রবেশী লোকটি বিস্মিত ও বিরক্ত ভাবে বলিল, "কে আপনারা?"

হরেন হাতের লাঠিগাছটা ঠক্-ঠক্ শব্দে মেঝের উপর ঠুকিতে-ঠুকিতে আগাইয়া গেল; জোর-গলায় পরিষ্কার স্বরে বলিল,

"আপনারাও যা, আমরাও তাই। অর্থাৎ —এককথায় বলতে গেলে, মনুষ্য!"

—"এখানে কেন?"

—"তাতে কি মহাশয়ের আপত্তি আছে?"—বলিতে-বলিতে হরেন একেবারে তাহার সামনে বুক ফুলাইয়া মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল।

হরেনের সেই ছয়ফুট বিশাল দেহ ও সপ্রতিভ ভঙ্গী দেখিয়া লোকটা থতমত খাইয়া দু পা পিছাইয়া গেল।

হরেন ফিরিয়া মুরারিবাবুকে বলিল, "আপনারই নাম বোধহয় মুরারিবাবু?"

মুরারিবাবু হতভম্বের মত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন অত্যন্ত উদ্ভট একটা স্বপ্ন দেখিতেছেন!

—"এঁরা কি আপনার চেনা লোক?"

মুরারিবাবু ভয়ে-ভয়ে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এঁরা জোর করে আমার বাড়ীতে ঢুকেছেন।"

—"সেক্ষেত্রে আমাদেরও উচিত হচ্ছে এঁদের আবার জোর করেই বাইরে বার করে দেওয়া।"

গুণ্ডার মত লোকটা এতক্ষণ সামনের দিকে হুমড়ি খাইয়া, বাঘের মত চোখ পাকাইয়া বসিয়াছিল। হরেনের কথা শুনিবামাত্র সে তড়াক্ করিয়া একলাফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কী, জোর করে বার করে দেবে?"

হরেন স্থির স্বরে বলিল, "বাবাজী, আগে আমার কথা শোন, তার পর যত-খুসী লাফালাফি কোরো। প্রথমত, আমি আজ আট বৎসর রোজ নিয়মমত কুস্তী লড়ে আসছি। দ্বিতীয়ত, আমি দুহাতে দুমণ করে চারমণ জিনিষ অনায়াসে তুলতে পারি। আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে, তুমি কি তা পরখ করতে চাও?"—বলিয়া হরেন, শান্ত ভাবে অথচ তাচ্ছীল্যের সহিত জামার আস্তীন গুটাইতে লাগিল।

লোকটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতে-করিতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে হরেনের হাতের স্ফীত ও দৃঢ় মাংসপেশীর দিকে চাহিয়া রহিল। হরেন বলিল, "মোহন, লাঠিগাছটা তুমি নিয়ে বেশ করে বাগিয়ে ধর ত! আমি এদের দুজনকে দুহাতে ধরে দেয়ালের সঙ্গে চেপে রাখব, আর তুমি লাঠিগাছটা এদের দেহের উপর আচ্ছা-করে ঠুকে দেখবে, লাঠিটা আগে ভাঙ্গে, না এদের হাড়গোড়গুলো আগে গুঁড়ো হয়,"—তারপর আগন্তুকদের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, "মহাশয়গণ, আমার বক্তব্য আপনাদের কর্ণগোচর হয়েছে, আশা করি। এখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগে আর-একবার আপনাদের সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছি—আপনারা থাকতে চান, না যেতে চান?"

হরেনের কথাবার্ত্তা কহিবার ধরণ-ধারণ দেখিয়া লোকদুটি দস্তুরমত ভড়্কাইয়া গেল। তারপর দু-একবার এ-উহার মুখের পানে চাওয়া-চাওয়ি করিয়া তাহারা আস্তে-আস্তে শুষ্কমুখে ঘর হইতে সরিয়া পড়িল।

একটু পরেই রাস্তা হইতে শোনা গেল, "আচ্ছা বাবা, এক পোষে শীত পালায় না —আমরাও ছাড়ব না, দেখে নেব!"

হরেনও জানলায় মুখ বাড়াইয়া তাহাদের

শুনাইয়া বলিল, "তোমরা ছাড় না ছাড়, এটা ঠিক জেনো যে ফের এ-মুখো হলে আমরাই আর তোমাদের ছাড়ব না, টুঁটি ধরে পুলিশে পাঠাব। এ মগের মুল্লুক নয়, এ কলকাতা!"

বাহির হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মুরারিবাবু এতক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়া ছিলেন। এখন উঠিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "মশাইরা, আপনাদের আর কি বলব—আপনাদের জন্যেই আজ আমি মানে-মানে বেঁচে গেলুম!"

মোহন বলিল, "এরা কে মুরারিবাবু?"

—"এরা সয়তান, এদের জন্যেই আজ আমি দেশছাড়া। কিন্তু এখানেও এরা আমাকে খুঁজে বার করেছে।"

—"মুরারিবাবু, আপনি আমাদের কাছে কিছু লুকোবেন না, আমাদের দিয়ে আপনার কোন অপকার হবে না। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এরা কেন আপনার পিছনে লেগেছে, আর কেনই-বা আপনি দেশ ছেড়েছেন?"

মুরারিবাবু খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কাছে আমি ঋণী—আপনারা যে আমার বন্ধু, তাও আমি জানি। আমি আর কিছুই লুকোবো না, সমস্তই বলব। কিন্তু আপনাদের ধৈর্য্য থাকবে কি?"

—"নিশ্চয়। আপনি বলুন।"

পাঁচ

মুরারিবাবু যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই :—

"আমার দেশ শান্তিপুরে।

সরমা যখন চার-বছরের, তখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সে আজ ষোলবছরের কথা।

সরমা আমার বৃদ্ধবয়সের সন্তান—তাই বড় আদরের। বিশেষ, সে ছাড়া আমার আর কোন সন্তানও হয়-নি।

এই মা-হারা মেয়েটিকে আমি একলা সারা প্রাণ দিয়ে মানুষ করে তুলেছি। পৈত্রিক সামান্য যা-কিছু পেয়েছি, তাইতেই যেমন-তেমন করে আমার সংসার চালিয়ে এসেছি। বড়মানুষী করতে পারি না বটে, কিন্তু না-খেয়ে মরবার ভয়ও নেই।

সরমা আমার রূপে-গুণে লক্ষ্মীর মত। আমি তাকে লেখাপড়া শেখাতেও ত্রুটি করি-নি। ঘরকরণার কাজ সে নিজে-নিজেই সমস্ত শিখেছে; রান্নায় তার এমনি হাত যে, দ্রৌপদীর সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে।

আমার এই একমাত্র সন্তান যাতে সৎ-ঘরে, সৎপাত্রে পড়ে সে চেষ্টা করতেও আমি কিছু কসুর করি-নি। অনেক দেখে-শুনে, আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ব্যয় করে, সরমাকে আমি এক বনেদী ঘরের পাশ-করা ছেলের হাতে সঁপে দি। আমার জামাইয়ের নাম সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

কিন্তু বিবাহের কিছু দিন পরেই জানা গেল, সুরেন্দ্র লম্পট, মাতাল,—আর সব-চেয়ে যা খারাপ—সে আমার সোনার প্রতিমা সরমার উপর অত্যাচার করে।

বিবাহের বছর-দুই পরেই সরমার শ্বশুর মারা যান। তাঁর শ্রাদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই

বিষয় নিয়ে সুরেন আর তার ভায়েদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও মোকদ্দমা সুরু হোল। মোকদ্দমায় অনেক টাকা নষ্ট হয়, বাকী যা থাকে, সুরেনের বদ্‌খেয়ালীতে তাও উড়ে যায়।

বিবাহের পর সরমা মোটে বছরখানেক শ্বশুরঘর করেছিল। তারপর থেকে সে আমার কাছেই আছে। সুরেন যতদিন বেঁচেছিল, স্ত্রীকে নিয়ে যাবার নাম করে-নি। বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করে বারকতক টাকা চেয়ে সে আমাকে চিঠি লিখেছিল—কিন্তু, আমি কোন জবাব দিই-নি। কেননা, তার খাঁই মেটাতে পারি, এমন সঙ্গতি আমার ছিল না।

এর পর কিছুদিন সুরেনের আর কোন খোঁজখবর পাই-নি। শ্রীরামপুরের বাস্তু-ভিটে বিক্রী করে সে কলকাতায় চলে যায়। কোথায় থাকত, কেউ জানত না। খোঁজ করেও তার সন্ধান পাই-নি। স্বামীকে চেনবার সুযোগ সরমার ভাগ্যে ঘটে-নি, স্বামীর স্মৃতিও তার পক্ষে সুখস্মৃতি ছিল না। আমি তার মনকে শান্ত রাখবার জন্যে তাকে এস্রাজ ও বেহালা বাজাতে শিখাতুম। ঘরকন্নার কাজ, রান্নাবান্না, লেখাপড়া আর বাজনা নিয়েই এ ক-বছর সে কাটিয়েছে।

বছরখানেক আগে হঠাৎ কাশীধাম থেকে এক পত্র পাই। সুরেনের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় কাশীতে থাকতেন। চিঠি লিখেছিলেন তিনিই। সেই চিঠি পড়ে জানলুম, সুরেন মাতাল অবস্থায় গঙ্গায় পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। সরলার স্বামীর নাম মাত্র ছিল—সেদিন থেকে তাও ঘুচল।

এর মধ্যে আর-এক হাঙ্গাম বাধল। আমাদের পাড়ার এক ধনী জমিদারের কুদৃষ্টি সরমার উপর পড়ল। সেই পাষণ্ডই তার এক সঙ্গীর সঙ্গে আজ এখানে এসেছিল। এই নির্দ্দয় লোকটা আমার—আমি বাপ—আমার কাছেই সরমার সম্বন্ধে কুপ্রস্তাব করে—এত বড় তার বুকের পাটা! প্রথম-প্রথম সে কাকুতিমিনতি করত, তারপর ক্রমেই আমার উপর অত্যাচার সুরু হোল। আমি গরীব, সে ধনী। কি করি, পাড়া-পড়্‌শীর আশ্রয় নিলুম। কিন্তু পাড়া-পড়্‌শীরা লোককে একঘরে করতে জানে, বিপদে ফেল্‌তে জানে—বিপদে সাহায্য করতে জানে না। ধনীর সাতখুন মাপ্! দুঃখের কথা বলব-কি,—যে গরীব, সেও দুষ্ট ধনীর পক্ষেই দাঁড়ায় আর-এক গরীবকে পায়ে থেঁৎলাতে! শেষে আমার উপরে অত্যাচার এমন বাড়ল যে, আমার পক্ষে দেশে তিষ্ঠান দায় হয়ে উঠ্‌ল। কাজেই বাধ্য হয়ে একদিন চুপি-চুপি দেশ ছেড়ে চলে এলুম। কিন্তু দেশত্যাগী হয়েও শান্তি নেই, এখানেও আমার পিছনে দেখছি, ছায়ার মত শনি লেগে আছে।

জানিনা ভগবানের কি ইচ্ছা, এ-বয়সে আমাকে তিনি আরো কত শাস্তি দিতে চান!"

ছয়

মুরারিবাবু তাঁহার কাহিনী বলিয়া চিন্তিত মুখে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিলেন। মোহন আর হরেনও কিছু বলিল না।

কিন্তু বেশীক্ষণ এমন মুখবন্ধ করিয়া বসিয়া

থাকা হরেনের ধাতে কিছুতেই বরদাস্ত হইল না। সকলের আগে সেই-ই মৌন ভঙ্গ করিল। তক্তাপোষের উপরে জোরে ঘুষি মারিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওঃ! রাস্কেলদুটোকে হাতে-পেয়েও অমনি-অমনি ছেড়ে দিলুম! একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার ছিল যে!"

মুরারিবাবু দুশ্চিন্তায় এমনি বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন যে, এতক্ষণ হরেনের প্রতি তাঁর লক্ষ্যই হয় নাই। এখন হরেন কথা কওয়াতে হঠাৎ তাঁহার হুঁস্ হইল। তিনি লজ্জিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি অযাচিত ভাবে আমাদের এতবড় উপকারটা করলেন, আর এতক্ষণেও আমি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি-নি! সুতরাং—"

—"সুতরাং, নিজের ঢাক আমি নিজেই বাজাব। আমি হচ্ছি শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু বি এ, মেডিকেল কলেজের ষ্টুডেণ্ট, শ্রীযুক্ত মোহন-লাল মজুমদার বি-এ আমার বন্ধু। আর-কিছু জানতে চান?"

—"হরেনবাবু, আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারব না।"

—"কেন পারবেন না— আলবৎ পারবেন! ঐ যে বল্লেন, রন্ধনে আপনার কন্যা দ্রৌপদীর মত, তার পরিচয় আমি যেদিন পাব, সেইদিনই কৃতজ্ঞতার ঋণ থেকে আপনাকে মুক্তি দেব!"

মুরারিবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এত সহজে যদি ধারশোধ হয়, তাহলে এখনি আমি সে বন্দোবস্ত করছি!" তিনি আস্তে-আস্তে উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

মোহন মুখভার করিয়া বলিল, "অসভ্য! পেটুক! এ-সব কথার আর যেন সময় পেলেন না!"

হরেন দুষ্টামির হাসি হাসিয়া চুপিচুপি বলিল, "তোমার মুখে শুনেছি, দ্রৌপদী স্বহস্তে পরিবেষণ করেন। আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে চাই! আমার লক্ষ্য তাঁর প্রতি—ভোজনটা উপলক্ষ্য! বুঝলে মূর্খ?"

মুরারিবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সরমা আপনার কথা ও-ঘর থেকে শুনতে পেয়েছিল হরেনবাবু! সুতরাং—"

—"সুতরাং আপনি প্রস্তাব দাখিল করবার আগেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে গেছে—কেমন, এইত? শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।"

প্রথম আলাপেই পরিচয় জমাইয়া তুলিতে হরেন একেবারে অদ্বিতীয়। সুধু তাই নয়, আসর জমকাইবার ক্ষমতাও তাহার অদ্ভুত ছিল—গভীর ও তরল যে কোন বিষয়ের আলোচনাই হউক না কেন—সমানভাবে সে সব-তাতেই যোগ দিতে পারিত। এইজন্য যে তাহার সহিত একদিন ভাল-করিয়া মিশিত, তাহারই হৃদয়ের মধ্যে হরেন একটি চিরদিনের আসন দখল করিয়া লইত।

আজও সে মুরারিবাবুর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ তুলিল। তাহার মত্‌লোব্ ছিল, মুরারি-বাবু কোন্ মতের লোক, কোনরকমে সেটা জানিয়া লওয়া। সে এমন কৌশলে নানা কথার মধ্য দিয়া আপন উদ্দেশ্যে গিয়া পৌঁছিল যে, সরলপ্রাণ মুরারিবাবু কিছুই সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

কথায়-কথায় হরেন বলিল,—"আমাদের সমাজের বিধবাদের কথা আপনি ভেবে

দেখেছেন কি? আমরা তাঁদের নাম দিয়েছি, দেবী। তাই মনে করি ঐ পাষাণ-প্রতিমা দেবীর মত তাঁরাও বুঝি পাষাণে তৈরি। তাঁরা যে মানুষ, তাঁদের যে রক্ত-মাংসের শরীর—পৃথিবীর এই আলো-বাতাস যে তাঁদের দেহ মনের উপর সাড়া জাগায়, এখানকার হর্ষ-শোকের তুফান যে তাঁদের প্রাণকেও দোলা দেয়, এ-কথা আমরা স্বীকার করতেই চাই না। দেবী বলে একটা আদর্শ আমরা মনের মধ্যে খাড়া রেখেছি। অথচ ঐ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের যে বিরোধ, তাকে ত মানতে চাই না! আদর্শের ঠাটটুকু বজায় রাখবার জন্যে যাঁকে আদর্শের আসনে বসিয়ে বলি, তাঁর পূজা করছি, তখন তাঁকে ত পূজা করা হয় না—তাঁর প্রতি যে অত্যাচার করা হয়! দেবীত্বে আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু মানবীকে দেবী বলে কপট ভক্তি প্রকাশ করতে আমি রাজি নই।"

মুরারিবাবু বাধো-বাধো স্বরে মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন, "কিন্তু—সমাজ—সমাজ—"

হরেন যথার্থ আন্তরিকতার সহিত দৃপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "সমাজ! সমাজ অমানুষকে শাসন করতে পারে, কিন্তু নির্দোষকে সে পায়ে থেঁৎলাতে পারে না, মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে সে বঞ্চিত রাখতে পারে না! বিধবারা সমাজের কাছে কি দোষে দোষী?"

—"হিন্দুরা বলে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।"

—"ভাবের ঘরে চুরি করবেন না মুরারিবাবু! যুক্তির ঝুলি যখন রিক্ত হয়ে যায়, নির্ব্বোধকে ফাঁকি দেবার জন্যে বিধি-সংহিতা তখন বলে—'এ কর্ম্মফল!' বিধবারা সমাজে কোন দোষে দোষী নয়। কিন্তু, তারা যে অবলা রমণী, তারা যে পুরুষের ক্রীতদাসী—কাজেই স্বেচ্ছাচারী পুরুষের অত্যাচার তাদের মাথা পেতে সহ্য করতে হবেই-হবে! পুরুষ হলে সেও একশোটি বিবাহ করতে পারত, শত ব্যভিচারেও তাকে পাপ স্পর্শ করতে পারত না। এ ত হিন্দুত্ব নয়,—জরাগ্রস্ত সমাজকে এখানে সুধু শিখণ্ডীর মত সুমুখে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার পিছনে লুকানো আছে—পুরুষের স্বেচ্ছাচার! এ স্বেচ্ছাচার যিনি মাথা পেতে নেবেন, এই লক্ষ লক্ষ অকাল-বিধবার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস দ্রবীভূত অগ্নির মত তাঁকে দগ্ধ করুক! মুরারিবাবু, আপনি মনকে খালি চোখ ঠেরে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তা কি পারবেন?—আপনি যে পিতা!"

মুরারিবাবু আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না; আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, আমি যে পিতা! কিন্তু যে স্নেহ আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে, সমাজের বুকে ত সে স্নেহ নেই হরেনবাবু! আমার চঞ্চলতাকে সমাজ ত ক্ষমা করবে না!"

হরেন উত্তেজিত ভাবে কহিল, "সমাজ ত ক্ষমা করবে না জানিই। সেইজন্যেই ত আমাদের—নবীনদের নূতন-করে সমাজ গড়তে হবে। প্রাচীনতার গোলামী করে আমরা চিরদিন কেবল প্রাচীন হয়েই থাকব না। আমরা যে নবীন, তার পরিচয় দিতে হবে আমাদের নবীন সমাজ তৈরি করে।

নবীনতা যদি আমাদের না থাকে, তাহলে ত বলতে হয় আমরা মরেছি। কিন্তু আমরা মরব না মুরারিবাবু, আমরা মরব না—মরব না!"

হরেন যে সুধু নিজের বন্ধুর সুবিধার জন্যই এতখানি বাক্যব্যয় করিল, তা নয়; সে যাহা বলিল, সেটা তাহার খাঁটি প্রাণের কথা। তাই তাহার সেই আবেগ ও উত্তেজনা মুরারিবাবুর হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, সেখানেও একটা সাড়া জাগাইয়া তুলিল। হরেনের প্রতি কথার মধ্যেই তিনি যেন আপন নিভৃত প্রাণেরই কাতর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন,—সে যেন কি-এক মন্ত্রশক্তিতে তাঁহারই কুণ্ঠিত মনের ভিতরকার গোপনতাকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে!

মুরারিবাবু এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি একটিও কথা কহিতে পারিলেন না—হেঁটমুখে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিলেন। ... ...

অনেকক্ষণ পরে তিনি মাথা তুলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন; তাহার পর উঠিয়া, হরেনকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই বয়সে আপনি এমন জ্ঞানীর মত চমৎকার কথা কইতে শিখলেন কি করে?"

সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, হরেন কিছুতেই অপ্রস্তুত হইবার পাত্র ছিল না; সেও অমনি হাসিয়া পাল্টা জবাব দিল, "আমি যে বাঙ্গালী, মুরারিবাবু! কাজে আমাদের অপটুতা আছে বলেই বাক্যপটু হয়ে আমরা সেটুকু পুরিয়ে নি!"

মুরারিবাবু বলিলেন, "আপনারা মাঝে মাঝে এখানে এলে আমরা সুখী হব।"

—"হ্যাঁ, আমাকে আর মোহনকে মাঝে-মাঝে আপনাদের খবরাখবর নিতে হবে বৈকি! নইলে আপনার দেশের ভদ্র-লোক-দুটি আপনাকে একলা দেখলে আবার উৎসাহী হয়ে উঠতে পারেন।"

মুরারিবাবুর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। মোহন এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া ছিল। এখন সময় বুঝিয়া সে বলিল, "মুরারিবাবু, আমার বাড়ীর পাশে আমার একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া আছে। আপনি যদি সেখানে উঠে যান, তাহলে আর কোন ভয় থাকে না।"

মুরারিবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ বলতে হয়! সে ত খুব ভাল কথা মোহনবাবু! আমার মত অসহায় লোকের পক্ষে আপনার মত প্রতিবাসী পাওয়াত ভাগ্যের কথা! বিশেষ, তারা যখন এ বাড়ী চিনে গেছে, তখন আবার কখন্ যে এসে পড়বে তার ত কিছু ঠিক নেই!"

মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া হরেন বলিল, "কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে আগে থাকতেই সাবধান করে দিচ্ছি মশাই! মাঝে-মাঝে আমরা দ্রৌপদী-ঠাকরুণের হেঁসেলে গিয়ে উৎপাত করতে পারি!"

মুরারিবাবু উচ্চহাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "তথাস্তু!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

চিরাগত প্রথা-অনুসারে ব্রাহ্মণ উপবাস-ব্রত পালন করেন, ধর্ম্মোৎসব-সমূহের অনুষ্ঠান করেন। পুরাকালের ৪০টি সংস্কারের মধ্যে, এক্ষণে কতকগুলি সংস্কারমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুত্রের নামকরণ। জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইলে পর, তাহার একটা নাম দেওয়া হয়;—প্রায়ই কোন দেবতার নামানুসারে নাম রাখা হয়। বিবাহের বাক্‌দান। উপবীত গ্রহণ। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদিগের ন্যায় আজকাল বেনিয়া ও কায়স্থেরা—এমন-কি কোন কোন অস্পৃশ্য জাতের লোকও উপবীত ধারণ করে।

সংস্কারগুলির মধ্যে বিবাহই সর্ব্বপ্রধান। কি ধনবান, কি দরিদ্র সকলকেই সন্তানের বিবাহ উপলক্ষে উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়—নচেৎ মান থাকে না।

কোন ধনশালী ব্রাহ্মণের উদ্যান—বসন্ত-কালের কোন এক উজ্জ্বল নিশা। গাছে গাছে কাগজের লণ্ঠন মালার মতো ঝুলান হইয়াছে। বাড়ীর সকল মুখ-ভাগের উপরেই রঙ্গিন গেলাসের 'ল্যাম্প'। বিচিত্র রঙের আলোক-প্রতিবিম্বের মধ্য দিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া জনতা চলিয়াছে ঃ প্যাঁচালো পাগ্‌ড়ী; শুভ্র, পীত, লাল রঙের পরিচ্ছদ; স্কন্ধ ও হস্তপদাদি নগ্ন, গায়ের রং ঘোর বা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বৃহৎ দালান, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মাদুরের উপর মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট। মধ্যস্থলে দুই-তিনটি নর্ত্তকী ঃ—উহাদের চওড়া-ভাঁজওয়ালা লম্বা পেশোয়াজ, দৃষ্টি-আকর্ষক ফ্যাট্‌ফেটে রং—বিশেষতঃ লাল। মুখে রং, চোখে সুর্ম্মা, কাণে বড় বড় কাণবালা, নাকে নথ। অতি ধীরগতিতে পদক্ষেপ করিতে করিতে, একঘেয়ে সুরে গায়িতে গায়িতে, উহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অভিনয় করিতেছে।

তাহার পর, মশালের আলোয়, জনতার রাস্তা দিয়া, ঘোড়-সওয়ার, ফীটেন গাড়ি, পাল্কী-গাড়ী, সুন্দর পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট শত সহস্র নরনারীর সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা চলিয়াছে, বহুমূল্য সাজে সজ্জিত একটি অশ্বের উপর উপবিষ্ট—বর (বয়স দশ বৎসর হয় কিনা সন্দেহ, কখন-কখন তাহারও কম) ঃ—জরির পরিচ্ছদ, রত্নখচিত মুকুট; হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরের রত্নহার। বরের বাহুর দ্বারা পরিধৃত—একটি ছোট্ট 'কনে', পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু, অবগুণ্ঠিত; হল্‌দে কিম্বা লাল রঙের একটা বড় শাল দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। উহাদের মাথার উপর একটা বেগ্‌নী রঙের ছত্র; রৌপ্যনির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা উহাদিগকে বাতাস করা হইতেছে। এই বর-যাত্রার দল, কন্যাকে লইয়া কন্যার শ্বশুরবাড়ীতে উপনীত হইল। ইহার পূর্ব্বে পিতৃগৃহে বিবাহের অনুষ্ঠানাদি হইয়া গিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ বহু-সংখ্যক ও অতীব জটিল। একজন ব্রাহ্মণ একখণ্ড কাপড় দিয়া বর-কনের পরিচ্ছদ

বাঁধিয়া দেয়; কাপড়ের নীচে, বর-কনে পরস্পরের সহিত হাতে হাত মিলায়। উহাদের মুখ লাল দাগে চিহ্নিত করা হয়। উহাদের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হয়। একজন ব্রাহ্মণ, তাহাদের গ্রীবাদেশে একটা দড়ি রাখিয়া দেয়। বর, দুধের ভিতর হাত ডুবাইয়া হাত ভিজায়। অন্য অনুষ্ঠান মন্ত্রপাঠের সহিত সম্পাদিত হয়। তথাপি উহার কোনটাতেই সাংস্কারিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। আরো বিলম্বে, বাড়ীর সম্মানার্থে বরের গৃহে একটা গুরুতর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বিবাহ হইয়া গেলে, অল্পবয়স্ক বর আবার লেখা-পড়ায় প্রবৃত্ত হয়। কন্যা শ্বশুরবাড়ীর অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হয়। যোগ্য বয়স হইলে, উহাদিগকে একত্র সম্মিলিত করা হয়। উহাদের নিত্য-নিয়মিত দৈনন্দিন কাজ সমান চলিতে থাকে—কোন পরিবর্ত্তন হয় না। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র, ছাত্রদশাতেই 'ছেলের বাপ'।

সন্তানের বিবাহে, পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত এবং সন্তানেরা পিতামাতার শ্রাদ্ধে, সর্ব্বস্বান্ত হয়। কোন কোন শ্রাদ্ধে কয়েক লক্ষ, এমন-কি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, শুনা যায়।

মৃত্যুর পরে মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে হিন্দুর বিশ্বাস এইরূপ ঃ—শরীর মৃত হয়, কিন্তু আত্মা জীবিত থাকে; অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একটি সূক্ষ্মশরীর দ্বারা আত্মা সমাচ্ছাদিত। সন্তান-প্রদত্ত পিণ্ডান্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এই সূক্ষ্মশরীর বাড়িতে থাকে, এবং ক্রমে একটি মধ্যবর্ত্তী শরীরে পরিণত হয়; পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত আত্মা এই শরীর ধারণ করে। এই মধ্যবর্ত্তী শরীরের দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া, আত্মা অনেক স্বর্গলোকে গিয়া পুণ্যের পুরস্কার লাভ করে, পাপী হইলে, তাহাকে সেই সব নরকে টানিয়া লইয়া যায়—যেখানে নির্দ্দয় যমরাজার রাজত্ব। পাপীর ভ্রমণ-পথটা বড়ই ভীষণ। কখন-বা সৌরদগ্ধ মরুভূমি, কখন-বা কণ্টকাকীর্ণ হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত সর্প-সমাকুল বন-জঙ্গল। অসিরূপ শাখা-সমন্বিত মহারণ্য। খাড়া পর্ব্বতের ধার। শূল ও ক্ষুর-সমাচ্ছন্ন যাত্রা-পথ। ঝটিকাময় আকাশ; ভীষণাকার শকুনী-গৃধিনীরা উড়িয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের কৃষ্ণ পক্ষচ্ছায়ায় আকাশ আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; আকাশের নিম্নে শতশত যোজন বিস্তৃত এক নদী গর্জ্জন করিতে করিতে, কলকল শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে। একটা রক্তের নদী। শবদেহ ও ভগ্নাবশেষ জিনিসে পরিপূর্ণ। নক্র, মকর, হাঙ্গর, কুম্ভীর-সমাকীর্ণ। উহার তটদেশে, হাজার-হাজার নারকী,—কোটরে-ঢোকা চোখ, বাঁকা মোচ্‌ড়ান বাহু। তৃষ্ণায় দগ্ধ হইয়া, অবনত হইয়া উহারা অঞ্জলি অঞ্জলি রক্ত পান করিতেছে; আবার ঐ রক্তই উহা-দিগের শরীর ক্ষয় করিতেছে, কুরিয়া কুরিয়া গ্রাস করিতেছে; তখন হতাশ হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিতেছে; সুনীল তরঙ্গরাজি,—নরক-উৎক্ষিপ্ত জিনিসের ন্যায় উহাদিগকে গুটাইয়া লইয়া যাইতেছে।

এই শাস্তিগুলি আত্মার উদ্ধারের একমাত্র উপায় ঃ—ব্রাহ্মণদিগকে জীবিত আত্মীয়দিগের

অর্থদান। এমন-কি দৈত্য-দানবেরা ব্রাহ্মণের মন্ত্রকে আদেশরূপে মানিয়া থাকে। ইহারই দরুণ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকলাপের এত জটিলতা ও মৃতদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও উৎসর্গক্রিয়া—অর্থাৎ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। (১)

কোন ব্যক্তির মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে অমনি তাহার আত্মীয়েরা গঙ্গা বা কোন পবিত্র নদীর তীরে তাহাকে স্থাপন করে। মৃত্যু হইলে, তাহার দেহকে স্নান করায়, তাহাকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেয়, পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে, চন্দন-কাষ্ঠের আগুনে দগ্ধ করে। স্বজাতের লোকেরা শবকে বহন করিয়া দাহ-স্থানে লইয়া যায়। তুলসীপত্র চন্দন ও পলাশ-কাষ্ঠে চিতা রচিত হয়। শবের বক্ষের উপর চারিটা চাউলের পিষ্টক রাখিয়া শবকে একটা মঞ্চের উপর প্রসারিত করা হয়। অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। বাহকের দল বলিয়া উঠেঃ—"পূষণ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যেন সুদীর্ঘ পথ দিয়া, তোমাকে তোমার পিতৃপুরুষদিগের নিকট লইয়া যান" (ঋগ্বেদ X, ১৭, ৩)। শব অর্দ্ধদগ্ধ হইলে পর, যাহাতে আত্মাপুরুষ সহজে বাহির হইতে পারে, মুক্তির পথে ব্যাঘাত না হয় এইজন্য মাথার খুলিটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

শবদাহের চারিদিন পরে, মৃতের আত্মীয়েরা অস্থিগুলি জড়ো করিয়া একটা ঘটের মধ্যে স্থাপন করে ও সেই ঘটকে মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখে। আবার চারি দিন পরে, সেই ঘটকে মাটির ভিতর হইতে বাহির করা হয়; ভস্ম ও দেহাবশেষগুলি কোন নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপের যথাবৎ অনুসরণ—ইহাই প্রাচীনতন্ত্রী ব্রাহ্মণের জীবন-যাত্রা-প্রণালী। কিন্তু অধুনা খুব উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও এই সকল নিয়ম কতটা মানিয়া চলে?

বিবিধ ব্যবসায়-অবলম্বী ব্রাহ্মণেরা রাজপুতেরা, বেনিয়ারা—ইহাদের মধ্যে কেহ এ-প্রথা, কেহ ও-প্রথা অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু মন্ত্রপাঠ করা, ধ্যান-ধারণা করা—তাহারা এ-সব করিবার সময় পায় না। কাজ-কর্ম্মে, আমোদ-আহ্লাদে, সংসার-চিন্তায় তাহারা নিমগ্ন। ইংরাজের দৃষ্টান্ত, স্কুল, মুদ্রাযন্ত্র, পুস্তক, ইংরাজ-শাসন—এই সমস্ত প্রাচীন দেবতাদিগের সম্বন্ধে সংশয় উৎপাদন করিবার বহুপূর্ব্বেই, এবং প্রাচীন রীতিনীতি-গুলি যে অত্যন্ত হাস্যজনক এইরূপ ধারণা জন্মাইবার বহুপূর্ব্বেই—হিন্দু-সভ্যতার অধঃ-পতন, মুসলমান-সভ্যতার প্রভাব, সমাজের পরিবর্ত্তন এই সমস্ত হিন্দুদের অনেক ধারণা ও অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১) সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দেবলোককে "স্বর্গ" বলে। বিষ্ণুর দেব-লোককে "বৈকুণ্ঠ", কৃষ্ণের দেব-লোককে "গোলোক", শিবের দেব-লোককে "কৈলাস" বলে। এই সকল স্বর্গলোক দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে অবস্থিত। মোক্ষের চারি ধাপ যথাঃ—দেবতার নিজ আবাসস্থানে বাস করাকে "সালোক্য", দেবতার অব্যবহিত নৈকট্য লাভ করাকে "সামীপ্য", দেবতার স্বরূপকে নিজ আত্মার মধ্যে আত্মসাৎ করাকে "সারূপ্য" এবং দেবতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হওয়াকে "সাযুজ্য" বলে।

২১ টা নরক। প্রত্যেক নরকে পৃথক পৃথক শাস্তি; কোন শাস্তিই অনন্ত নহে; আত্মা বিশোধিত হইলেই আবার তাহার পুনর্জন্মের পালা আরম্ভ হয়। যে শাস্ত্রীয় গ্রন্থে নরকের সম্পূর্ণ বিবরণ আছে তাহার নাম "গরুড়-পুরাণ"।

পুণ্যবানদিগের আত্মা ব্রহ্ম-রন্ধ্র দিয়া এবং পাপীদিগের আত্মা পাকস্থলীর রন্ধ্র দিয়া বাহির হয়।

ভীষণ যম-দূত-বৃন্দ। "যম-দূত"। নরকের শাস্তিঃ—"যাতন"। যমের লিপি-পুস্তকে, প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। "চিত্রগুপ্ত" (কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, নরকের লিপিকরের নাম)।

সাধুদিগের শব দাহ করা হয় না, সমাধিস্থ করা হয়। তাহাদের আত্মা ব্রহ্মেতে লীন হইয়া যায় বলিয়া, তাহাদের কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না।

কোন নগরের সহিত নগরের মরীচিকার যে পার্থক্য, একজন তাপসের দেহের সহিত অন্য দেহের সেইরূপ পার্থক্য।

মৃতের উদ্দেশে চীনজাতীয়দিগের অনুষ্ঠানের ন্যায়,—জীবিতদিগের কল্যাণ-সাধনই শ্রাদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপে, "বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ" সৌভাগ্যদান করে, "পুষ্টি-অর্থ" স্বাস্থ্য দান করে, "যাত্রার্থ" সুযাত্রা আনয়ন করে, ইত্যাদি।

রূপসী

নাটিকা

পাত্র ও পাত্রী

নিরঞ্জন	...	মান্দার দুর্গাধিপতি
রূপসী	...	নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী
আর্য্যধন	...	নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা
দেবল, কহ্লন	}	নিরঞ্জনের অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ
বরাট	...	মোগল-সেনাপতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিরঞ্জনের প্রাসাদ-কক্ষ

[নিরঞ্জন, দেবল ও কহ্লন মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে—মুক্ত বাতায়নের বাহিরে মান্দার গ্রামের অনেকখানি দেখা যাইতেছে।]

নিরঞ্জন

না, আর কোন আশা দেখছি না। চারিধারে শত্রুসৈন্য! আমাদের সাহায্য করবার জন্য বুঁদেলা থেকে যে সৈন্য এল, তারা শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে গ্রামে পৌঁছুতে পারলে না! বুঁদেলার সেনা মান্দারের ওধারে অলস হয়ে বসে আছে। উপায় নেই! নীলপাহাড়ের ধার বেয়ে যে শীর্ণ পথ পড়ে আছে, সেখানেও শত্রুরা সজাগ পাহারা দিচ্ছে; আমাদের আর কোন আশা নেই! পরিত্যক্ত উপায়-হীন আমরা—খেয়ালী শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখচি না। আর এই শত্রু এখন তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য সব-চেয়ে কঠিন ভীষণ অভিসন্ধি আঁটছে—নিশ্চয়, তাতে

কোন সন্দেহ নেই! বুঁদেলা শুধু সৈন্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত আছে—এ কথা বুঝছে না যে, আহার না পেয়ে মান্দারের এত বড় বাহিনী শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করবে! অথচ এরা কি বিপুল বিক্রমে এতদিন যুদ্ধ করে এসেছে—তিনমাসের অবিশ্রাম যুদ্ধে শত্রু তাদের একতিলও হঠাতে পারেনি! ধৈর্য্য তাদের অসীম, বীর্য্যের তুলনা নেই, স্বার্থত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আর কেউ কখনো পৃথিবীতে দেখিয়েছে কি না, জানি না! কিন্তু আজ আর অন্ন নেই—শত্রু এমন ব্যূহ রচনা করেছে যে নিরন্ন উপবাসী সৈন্য তাদের হঠিয়ে আজ আর অন্নচেষ্টায় বেরুতে পারছে না—এমন অবস্থায় ক'দিন লড়া যায়? মান্দারের কোন আশা নেই! ভিতরের এ খবর শত্রু যদি একবার জানতে পারে তাহলে মান্দারের প্রাচীর আপনা-হতে তাদের গতির সম্মুখে মাথা হেঁট করে নুয়ে দাঁড়াবে, গড়ের দ্বার তাদের উদ্যত পদাঘাতের আশঙ্কায় আপনাকে মুক্ত করে দেবে—

দেবল

আমার তূণ আজ শূন্য! একটিও তীর নেই—একটা বন্যপশু এসে আক্রমণ করলে তাকে হঠাবারও সাধ্য নেই!

কহ্লন

আমার সৈন্যেরা আহার-অভাবে ধূলার উপর লুটিয়ে পড়েছে—তার উপর একটুক্‌রো বারুদ অবধি পড়ে নেই—

দেবল

ওদিকে বরাটের কামান এখনো সঘন গর্জ্জন করছে। অস্ত্র নেই, আহার নেই—কিসের বলে শত্রুকে আর হঠিয়ে রাখা যায়?

কহ্লন

অথচ সন্ধির আশা—

দেবল

সন্ধি! ও নাম মুখে উচ্চারণ করলে বরাট উচ্চ হাস্য করে উঠবে! তার প্রতিহিংসা-বৃত্তি বাজের চেয়েও ভীষণ! তার নিষ্ঠুরতা সীমা মানে না!

নিরঞ্জন

তবু অন্নহীন মান্দারের মুখ চেয়ে, অপমান জেনেও আমি আমার বৃদ্ধ পিতাকে বরাটের কাছে পাঠিয়েছি, আমাদের অবস্থার পরিচয়ও তাঁকে প্রকাশ করে বলতে বলেছি। এখনো ত তিনি ফিরলেন না—

দেবল

এক সপ্তাহ আমাদের কামান স্তব্ধ রয়েছে—ধনু থেকে তীর ছোটেনি—দুর্গের স্থানে স্থানে রন্ধ্র হয়েছে—তবুও বরাট এসে দুর্গ অধিকার করছে না! দারুণ হত্যার আদেশ দিচ্ছে না! এতে আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছে—সে কি সাহস হারিয়েছে, না, সে এ স্তব্ধতাকে আসন্ন প্রলয়ের সূচনা মনে করে স্থির হয়ে আছে?

কহ্লন

হয়ত সম্রাটের আদেশ পায়নি বলে বরাট স্থির হয়ে বসে আছে। দিল্লীর মোগল-শক্তিকে এতখানি মেনে চলে বরাট! সম্রাটের আদেশের জন্য এতখানি সপ্রতিভ সে—অথচ শিশু বা নারীকে তোপে ওড়াতে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই! অদ্ভুত-চরিত্র এই বরাট—একটা হেঁয়ালির রূপান্তর বলেই আমার মনে হয়!

দেবল

এই বরাটের জন্ম, শুনেছি, অতি ছোট একটা বংশে। শুধু দৈহিক শক্তি আর দুঃসাহসের জোরেই সে আজ মোগল বাহিনীর অধ্যক্ষ, মোগল সম্রাটের ডান হাত। শুনেছি, তার চরিত্র অতি বদ—সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, খেয়ালী—

নিরঞ্জন

কিন্তু নিমকহারাম নয়। সে মোগলের নিমক খেয়েছে এবং সে নিমকের মর্য্যাদা রাখতে জানের তোয়াক্কা মোটেই রাখে না।

কহ্লন

হতভাগ্য মান্দার! আজ এ অবস্থায় তার হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া উপায়ও নেই—!

নিরঞ্জন

তবুও সবুর কর। সকলেই আমরা এমন কাপুরুষ নই যে, তুচ্ছ দুটি অন্নের জন্য শত্রুর কাছে মাথা নুয়ে দাঁড়াব—! সেইজন্যই বলি, একবার প্রচার কর, যারা জানের মায়া করে না, অন্নের জন্য নীচতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়—তারা একবার আমাদের সঙ্গে মিশে জলোচ্ছ্বাসের মত ঐ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক, এসে—একবার আমাদের শেষ শক্তি নিয়ে যুঝে দেখি—সমস্ত দেশের অন্ন লুঠে আনি—না পারি ত, শত্রুর তপ্ত নিশ্বাসে উবে যাই! প্রাণ একবার যাবার—সে যাবেই, তা শত্রুর ঘৃণায়-দেওয়া দু মুঠো অন্নের জোরে এ প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা না করে বরং একবার রুখে উঠে দেখি, এস—যদি মরি, শত্রুর ঈর্ষাকুল বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়ে মরব—

[আর্য্যধনের প্রবেশ]

এই যে পিতা! খবর কি? আপনি অক্ষত দেহে ফিরে এসেছেন! মোগল ভৃত্যের অস্ত্রচিহ্ন আপনার গায়ে দেখচি না যে! তারা আপনাকে বন্দী করলে না? আপনি ফিরে এলেন? তারা ছেড়ে দিলে—কোন অত্যাচার করলে না?

আর্য্যধন

না, পুত্র, কোন অত্যাচার করেনি তারা। দেখলুম, তারা বর্ব্বর নয়, তারাও মানুষ। আমায় যথেষ্ট সম্মান করেছে, তারা। বরাট নতজানু হয়ে প্রণাম করলে...জানো পুত্র, বরাটের শিবিরে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল?

নিরঞ্জন

মোগল সম্রাটের—

আর্য্যধন

না। পণ্ডিত মাধবাচার্য্য। এত-বড় দার্শনিক ভারতে এ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছেন কি না, সন্দেহ। দর্শনের সুগভীর জটিল তর্ক এমন সহজ কথায় অল্পসময়ের মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন যে শুনে সামান্য একটা প্রহরী অবধি মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি বোঝাচ্ছিলেন, আত্মার কথা—অর্থাৎ,

নিরঞ্জন

থাক্ পিতা—দর্শনের কথা শোনবার এখন অবসর নেই আমাদের। এত-বড় সৈন্যের দল একটু আহারের জন্য অধীর উন্মুখ হয়ে আছে—তাদের আহারের কোন উপায় হল কি না, তারা তাই জানতে পেলে মুগ্ধ হয়ে যাবে—আত্মার সংবাদ তারা চায় না—

আর্য্যধন

কিন্তু এই আত্মা অবিনশ্বর—

নিরঞ্জন

সে অবিনশ্বরত্ব দর্শনের পাতায় আঁটা থাকুক! এখানে ত্রিশহাজার লোক অন্নাভাবে মরতে বসেছে—অবিনশ্বর আত্মা তাদের নশ্বর দেহে এতটুকু ভরসা দিতে পারবে না—মুহূর্ত্ত বিলম্ব তাদের সহ্য হচ্ছে না! অন্নের কি সংস্থান হল, আপনি তাই বলুন। বরাট কি চায়? আমাদের শির—না, হিন্দু নারীর নারীত্ব? বলুন—ঐ শুনুন, নীচে বুভুক্ষু সৈন্যের উন্মত্ত চীৎকার—চেয়ে দেখুন, তারা ঐ কঠিন কর্কশ শিলা-লগ্ন তৃণগুচ্ছ খাবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করছে—

আর্য্যধন

আমি ভুলে গেছলুম, পুত্র—বসন্তের এই স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্য্য, পাখীর এই কলগান, ঐ নির্ম্মল-নীল আকাশ—এসবের মধ্যে আমি ভুলে গেছলুম, যে প্রকাণ্ড একটা যুদ্ধ চলেছে—মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যে বাঁধন, তা কেটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য দু'দিকে দু'দল সৈন্য শুধু হিংসায় ফুঁসছে আর অস্ত্র শানাচ্ছে! মানুষের বুকে যে অমল শুভ্র আনন্দ শতদলের মত ফুটে উঠেছে, তাকে রক্তে রাঙা করে দেবার জন্য তোমরা সকলে মিলে শুধু অবসর খুঁজছ! না, ঠিক বলেছ—ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যের ঐ আর্ত্ত চীৎকার··· শোনো তবে···আমায় যে জন্য পাঠিয়েছিলে—তার কি করে এসেছি, শোনো—ত্রিশ হাজার প্রজার জন্য আমি জীবনের আশ্বাস বয়ে এনেছি। কিন্তু—না, সে ত তুচ্ছ একজন—একজনের দুঃখ! ত্রিশহাজারের সুখের সামনে—কিছুই নয় সে! একদিকে ত্রিশহাজার আর্ত্ত নর-নারীর প্রাণ—আর একদিকে একজনের বুক-ভাঙ্গা যাতনা—শোনো পুত্র—কিন্তু সে কথা শুনলে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে—হয়ত এক-নিমেষে প্রাণহীন পাষাণ-স্তূপে পরিণত হবে—বুঝে দেখ, পুত্র—শুনতে পারবে? সে শক্তি তোমার—কিন্তু মনে রেখো, ওদিকে ত্রিশহাজার আর্ত্ত নর-নারীর অমূল্য প্রাণ—

নিরঞ্জন

(বিরক্ত চিত্তে) দেবল, কহ্লন, তোমরা অন্তরালে যাও—

আর্য্যধন

না, না, থাকো—তুমি, আমি, দেবল, কহ্লন, সকলেই ত এই ত্রিশ হাজার নর-নারীর অন্তর্গত। তবে! সমস্ত নগর এসে এখানে সমবেত হোক্—যেখানে রাজ্যের যত ক্ষুধার্ত্ত জীবন-ভিখারী হতভাগা আছে, সকলকে ডেকে এনে এখানে দাঁড় করাও—সকলের সুমুখে চীৎকার করে আমি বলি, ওরে দুর্ভাগা, জীবন-কামীর দল, আমি তোদের জীবন দান করব—প্রকাণ্ড আশ্বাস বয়ে এনেছি—

নিরঞ্জন

আমরা তিন জন এই ত্রিশ হাজারেরই প্রতিনিধি—বলুন, পিতা, কি সংবাদ, যত কঠিন হোক, আমরা অকম্পিত চিত্তে তা শুনব, ভীত হব না।

আর্য্যধন

তবে তাই হোক! বরাটকে দেখলুম—তার যে ছবি এখানে বসে তোমরা এঁকেছো, তা ঠিক নয়—তার বিপরীতই দেখলুম! তোমাদের আঁকা ছবি থেকে আমি ভেবেছিলুম, গিয়ে বরাটকে দেখব, একটা

উচ্ছৃঙ্খল, বর্ব্বর, রক্তপিপাসু দানব—যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত সে, ভদ্রতার কোন ধার ধারে না—শ্রদ্ধা, প্রীতি, মায়া, মমতাহীন এক দুর্বৃত্ত—

নিরঞ্জন

সে মোগলের দাস—

আর্য্যধন

কিন্তু ভদ্র; নিমকহারাম নয়—নিমকের সে মর্য্যাদা রাখে! শান্ত, গম্ভীর, বিনীত মূর্ত্তি! —আমার শুভ্র শির দেখে নতজানু হয়ে সে প্রণাম করলে—আতিথ্যে এতটুকু ত্রুটি রাখেনি—তবু আমি তার শত্রু—

নিরঞ্জন

বৃদ্ধ বয়সে আপনার মতিভ্রম হয়েছে—তাই এ সঙীন সময়েও শত্রুর স্তুতি করতে ইতস্তত করছেন না! ওদিকে ত্রিশ হাজার নর-নারী ক্ষুধার্ত্ত; বিপন্ন—

আর্য্যধন

তবে শোনো পুত্র—মান্দার ধ্বংস করাই মোগলের উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য-সাধনের ভার বরাটের উপর। বরাট বীর—সে চায় যুদ্ধ করে মান্দার দখল করতে—কিন্তু মোগল চায়, কৌশলে! তাই বরাটের অনুপস্থিতিতে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মুলতব খাঁর কৌশলে মান্দার অতর্কিতে অবরুদ্ধ। তিন মাস মুলতবের লোক শুধু নজর রেখে এসেছে—বাহির থেকে এতটুকু খাবার কি রসদ যেন মান্দারে না আসে! তাই তোমরা মান্দার থেকে যখন হাজার তোপ দেগেছ—মোগল তখন শুধু পাঁচটা জবাব দিয়েছে—তোমরা তখন মোগলের উদ্দেশ্য বোঝনি। তার পর তোমাদের যখন গোলাগুলি ফুরিয়ে গেছে, আহার-অভাবে তোমরা বিপন্ন নির্জ্জীব, তখনই মুলতব খাঁ তোমাদের গড় দখলের জন্য উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু বরাট এ-সব জানতে পেরে তা করতে দেয়নি! মুলতব খাঁ তাই দিল্লীশ্বরের আদেশ প্রার্থনা করেছে, বরাটও মুলতবের নামে নালিশ করেছে যে, তার অধীনস্থ মুলতব খাঁ বরাটের মর্য্যাদা রাখেনি, বীরত্বের মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ করেছে! বরাট চায়, মান্দারকে যুদ্ধে জয় করে—খাদ্যাভাবে শীর্ণ মৃত শব মাড়িয়ে সে মান্দারে প্রবেশ করতে চায় না।

নিরঞ্জন

উদার অনুগ্রহ তার! কিন্তু এতে তার উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

দেবল

থাকতে পারে কি! উদ্দেশ্য আছেই—

কহ্লন

খুব গভীর মতলব আছে—না হলে বিধর্ম্মীর দাস হবে কেন সে?

আর্য্যধন

তোমাদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। মহত্ত্বকে সন্দেহ করলে নিজের অধঃপতনেরই পরিচয় দেওয়া হয়!

নিরঞ্জন

যাক—তার পর—

আর্য্যধন

আমার মুখে মান্দারের সংবাদ শুনে বরাট বিস্মিত হল—অস্ত্র-শস্ত্র আর প্রচুর আহার এখনি সে পাঠাতে প্রস্তুত—সম্রাটের আদেশেরও অপেক্ষা করবে না সে!

নিরঞ্জন

ইস্—এত মহৎ! নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে—

দেবল

গভীর উদ্দেশ্য! বাদশার আদেশ নেবে না? তাহলে তার নিমকের মর্য্যাদা থাকে কৈ?

আর্য্যধন

উপায় নেই! বাদশার কাছ থেকে সে আদেশ আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে, এধারে এ হতভাগা ক্ষুধার্ত্তদের প্রাণ থাকবে না যে! বাদশার কাছে তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে সে প্রস্তুত! আপাততঃ তিনশ' গাড়ী ভরে আহার আর অস্ত্রশস্ত্র সে পাঠাতে চায়—

নিরঞ্জন

আশ্চর্য্য!

আর্য্যধন

কিন্তু—

নিরঞ্জন

কিন্তু কেন?

আর্য্যধন

এইবার প্রস্তুত হও পুত্র,—খুব কঠিন কথা শুনতে হবে! এই উপকার সে করবে, কিন্তু তার মূল্য চায়—

নিরঞ্জন

তাই বলুন পিতা, মূল্য চায়! এবারে তার মহত্ব আর উদারতার রহস্যটুকু বোঝা গেল! বলুন, কত মূল্য, কি মূল্য চায় সে?

আর্য্যধন

সে চায়, কিশোরী রূপসী তার শিবিরে গিয়ে আজ রাত্রি যাপন করে—

নিরঞ্জন

কিশোরী রূপসী!

আর্য্যধন

আমার পুত্রবধূ—

নিরঞ্জন

পিতা—(অস্ত্র তুলিতে উদ্যত)

আর্য্যধন

পুত্র—

নিরঞ্জন

আপনি পিতা—

আর্য্যধন

হাঁ, বৎস, আমি তোমার পিতা, পুত্রের গর্ব্বে গর্ব্বিত পিতা আমি! আর তুমি আমার পুত্র, একমাত্র পুত্র, আমার মাতৃহারা পুত্র—বড় আদরের ধন!

নিরঞ্জন

এ কি কথা! মান্দারে সহস্র রূপসী নারী আছে—

আর্য্যধন

তাদের সে চায় না! বিচিত্র খেয়াল তার! কিন্তু মনে রেখো পুত্র, মান্দারের স্বাধীনতা, মনে রেখো ত্রিশ হাজার আর্ত্ত নর-নারীর অমূল্য প্রাণ—

নিরঞ্জন

যাক, মান্দার রসাতলে যাক্! ত্রিশ হাজার নর-নারীর প্রাণও ভস্মীভূত হোক—! রূপসী, আমার স্ত্রী, আমার সহধর্ম্মিণী—

আর্য্যধন

তুমি ত প্রাণ দিয়েও মান্দারকে রক্ষা করতে চাও—

নিরঞ্জন

তাই রূপসীকেও তার মান, আর নারীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে?

আর্য্যধন

রূপসী তোমার সহধর্ম্মিণী—

নিরঞ্জন

আমি তার স্বামী! কিন্তু মান্দার আমার কে? আমি মান্দার চাই না।

আর্য্যধন

কিন্তু এই সঙিন মুহূর্ত্তে মান্দারকে তুমি ত্যাগ করবে? যখন মান্দার আজ—

নিরঞ্জন

নিজের প্রাণ দিয়েও যদি মান্দারকে রাখতে পারতুম, রাখতুম, কিন্তু ধর্ম্ম—

আর্য্যধন

মান্দার তোমার দেশ! এই মান্দারকে তুমি মোগলের পায়ে ফেলে দেবে পুত্র! যে মান্দার তোমার মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়েছে—

নিরঞ্জন

না, মান্দার আমার কেউ নয়—মান্দার জড় মাটি কিন্তু রূপসী আমার—

আর্য্যধন

তবু এই জড় মান্দার আজ তোমারই মুখ চেয়ে আছে, পুত্র—

নিরঞ্জন

তবে কি মান্দার চায়, তার জন্য আমার ধর্ম্ম, আমার পত্নীর মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, নারীত্ব সব আমি বিসর্জ্জন দেব! বলুন, মান্দার তাতে সুখী হবে? মান্দার মুখ ফুটে তবু বলবে—হাঁ, দাও, তোমার ধর্ম্ম, তোমার পত্নীর ধর্ম্ম, সব দিয়ে আমায় রক্ষা কর—

আর্য্যধন

যদি সে বলে, একদিকে একজনের ধর্ম্ম, মান, সুখ, আর-এক দিকে ত্রিশহাজার আর্ত্ত নর-নারীর প্রাণ? ভেবে দেখ পুত্র—

নিরঞ্জন

অসম্ভব! ঢের ভেবেছি! না, তা হতে পারে না, মান্দার যদি এত নীচ হয়, এমনি হেয় উপায়ে আপনাকে সে রক্ষা করতে চায় ত আমি তাকে এতটুকু সাহায্য করতে প্রস্তুত নই! তাছাড়া আমার নিজের উপরই নিজের অধিকার আছে; রূপসীকে আমি কোন্ মুখে বলব, দাও, আমার সাধের মান্দারের জন্য তুমি তোমার নারীত্বকে বলি দাও! দিয়ে পতির কীর্ত্তি উজ্জ্বল কর, সতী!

আর্য্যধন

আর যদি রূপসী বলে, আমি মান্দারকে রক্ষা করব!

নিরঞ্জন

রূপসী বলবে! ঐ পণে? পিতা, আপনি বাতুল হয়েছেন! রূপসীকে আমি জানিনা? রূপসী আমার স্ত্রী—তার মন—

আর্য্যধন

রূপসী আমার মা! আমিও তাকে জানি, পুত্র। জানি, কত উচ্চ, কত মহৎ তার প্রাণ—

নিরঞ্জন

একে মহত্ব বলে না, পিতা, এ কাপুরুষতা —দারুণ ক্লৈব্যের নামান্তর—

আর্য্যধন

আর রূপসী যদি বলে, ত্রিশহাজার নর-নারীর প্রাণের জন্য, মান্দারকে রক্ষা করবার জন্য এ মূল্য সে দিতে প্রস্তুত—

নিরঞ্জন

(উচ্চ স্বরে) পিতা, আমি যোদ্ধা হলেও মানুষ; আমারও সহ্য করবার একটা সীমা

আছে, পিতৃ-হত্যার অপরাধে অপরাধী করবেন না—

আর্য্যধন

একবার রাজা রামচন্দ্রের কথা মনে কর, পুত্র,—প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি আপনার প্রাণ-অংশ ছিন্ন করেছিলেন, লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতাদেবীকেও বর্জ্জন করেছিলেন—

নিরঞ্জন

রামচন্দ্রের মহত্ত্ব রামচন্দ্রেরই থাক্, পিতা! আমি সামান্য মানুষ, অত উচ্চ আদর্শ সহ্য করতে পারব না।

আর্য্যধন

প্রকৃতিস্থ হও, পুত্র! রূপসী এ মূল্য দিতে চায়—

নিরঞ্জন

চায়?

আর্য্যধন

হাঁ, চায়।

নিরঞ্জন

সে তবে সব শুনেছে? কে তাকে এ কথা বললে?

আর্য্যধন

আমি বলেছি।

নিরঞ্জন

আপনি!...নাঃ··· থাক্! শুনে সে কি বললে? সে বললে, সে বরাটের শিবিরে যাবে?

আর্য্যধন

না—

নিরঞ্জন

তবে—তবে?

আর্য্যধন

মুখে সে কোন কথা বলেনি। এ কথা শুনে মুখ তার পাণ্ডু হয়ে গেল— সমস্ত অবয়বে যেন মৃত্যুর ছায়া নেমে এল! সে নীরবে সে স্থান ত্যাগ করলে—

নিরঞ্জন

সরলা—বালিকা রূপসী! কিন্তু শুনুন পিতা, এ মূল্য দিয়ে মান্দারকে রক্ষা করা হবে না—মান্দার যদি তবুও তাই চায়, তবে তার সে স্পর্দ্ধার শাস্তিও আমি দিতে জানি, এ কথা মনে রাখবেন! এই নীচ মান্দারকে তাহলে নিজের হাতে আমি ধ্বংস করব! যে মান্দারকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছি, নিজের হাতে এমন করে যে মান্দারকে সাজিয়ে তুলেছি—সেই মান্দারকে গুঁড়িয়ে চূর্ণ করে দেব। দেবল, কহ্লন, আমার এই বাতুল পিতাকে বন্দী কর! সতর্ক থেকো— ক্ষিপ্ত মান্দার যেন তাঁকে না দেখে, এ প্রস্তাব মান্দারের কানে না ওঠে!

আর্য্যধন

মান্দার সব শুনেছে, পুত্র। মান্দার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বলেছে, সতীর সতীত্বের মূল্যে সে প্রাণ কিনতে চায় না—রূপসীকেও তারা সে কথা বলেছে—

নিরঞ্জন

এই ত আমার মান্দারের যোগ্য কথা! কিন্তু আমার অসাক্ষাতে এতখানি গোপন ষড়যন্ত্র, গোপন পরামর্শ চলেছে, আশ্চর্য্য! অকৃতজ্ঞ মান্দার আমার অসাক্ষাতে এ-সবের আলোচনা শেষ করে ফেলেছে—! অথচ এই মান্দারের মঙ্গলই আমি চিরদিন করে এসেছি, কখনো কোন অনিষ্ট করিনি—আমার কাছে

কি তার জন্য মান্দারের এতটুকুও ঋণ নেই? প্রাণটা কি এতই বড়—সেটা কি এতই রাখবার যোগ্য যে, এই জঘন্য—(বাহিরে কোলাহল) ও কিসের কোলাহল?

দেবল

ক্ষুধার্ত্ত মান্দারের চীৎকার—

নিরঞ্জন

সব আলোচনা শেষ করেও মান্দার আবার ও কি চায়?

আর্য্যধন

তারা আমার মার কাছে দরবার করতে এসেছে—নির্জ্জীব মান্দার আমার মার পায়ে তাদের ভক্তি জানাতে এসেছে—

নিরঞ্জন

কি স্পর্দ্ধা! নারীতে আর বৃদ্ধেতে মিলে মান্দারকে চালাচ্ছে! কেন,আমি কি মরেছি? অকৃতজ্ঞ মান্দার, এমনি হীন কৌশলে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে তুই আজ ছিনিয়ে নিতে চাস? বুঝেছি, এ ষড়যন্ত্র—চারিধারে ভীষণ ষড়যন্ত্র—বেড়াপাকে আমায় ঘিরতে চায়!...দেবল, বন্ধু, আমার পিতাকে বন্দী কর—এ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেছে এই বাতুল বৃদ্ধ—তাকে বন্দী কর! তারপর অকৃতজ্ঞ মান্দারকে আমি একবার দেখতে চাই!

[উন্মত্তভাবে বাহির হইয়া গেল]

(ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক সাহিত্যের একটা লক্ষণ

আধুনিক সাহিত্যের একটা বড় লক্ষণ এই যে, সমাজের নানা লক্ষণ মিলাইয়া তাহার কোষ্ঠী তৈরির চেষ্টা এদেশের ও বিদেশের লেখকদলের একটা পেশা ও নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হবহাউস্, বোসাংকোয়ে এচ, জি, ওয়েল্‌স্, ওয়েব, বেলক, ডিকিন্‌সন্ প্রভৃতি ইংরেজ লেখক; রবীন্দ্র, রামেন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, প্রভৃতি বাঙালী লেখক এই কাজ যথেষ্ট পরিমাণে করিতেছেন। ইহা প্রমাণের জন্য আধুনিক ইংরেজি বা বাংলা সাহিত্যের রকমারী-পরিমাণের চেষ্টা যদি করা যায়, তবে Socialistic literature অর্থাৎ সামাজিক প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, নাট্যাদি সাহিত্যের পরিমাণ আর আর সব শ্রেণীর সাহিত্যের পরিমাণকে ছাপাইয়া উঠে।

কেন? অবশ্য ইহার সোজা উত্তর সমাজ জিনিসটা মানুষকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সে উত্তরও "এহ বাহ্য আগে কহ আর"। পূর্ব্বকালেই সমাজ মানুষের মনকে এমন নাড়া দেয় নাই কেন, আর এখনই বা সমাজ জিনিসটা মানুষের কাছে সবার বাড়া হইয়া উঠিল কেন?

আমরা যাহাকে আধুনিক যুগ বলিয়া থাকি, ইউরোপে তাহা বড়জোর চারি শত বৎসরের যুগ, ; আর এদেশে তাহা একশত বৎসরের বা তারও কিছু কম সময়ের যুগ। ইউরোপে

এই চারিশত বৎসরের আগে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিগ্রহের কাঠখড়, রূপ ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র যাহা ছিল তাহা অনেক কালের বনিয়াদের উপর খাতিরজমা হইয়া ছিল। কেহই তাহার অদল বদল আশঙ্কা করে নাই। বিশেষতঃ ইউরোপীয় মধ্যযুগের সেই পুরোহিত তন্ত্র—Holy Mother Church—কোন কালেই এই সনাতন বিগ্রহের জায়গায় যে নূতন দেবতার আমদানি হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যে heretic বা পাষণ্ড সে রকমের দুঃস্বপ্ন ক্বচিৎ দেখিয়া সে কথা মুখে উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া তাহাকে শুধু গ্রামছাড়া বা দেশ-ছাড়া নয়, একেবারে ইহলোক-ছাড়া করিবার জন্য চর্চ্চের অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছু-মাত্রই ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়া এবং যন্ত্র-তন্ত্র কতকগুলা উদ্ভাবিত হইয়া প্রায় রাতারাতি সমাজ ও রাষ্ট্র, একেবারে ওলোট্‌পালোট্‌ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে ধর্ম্মেরও সনাতন ব্যবস্থার প্রাণসংশয় অবস্থা হইয়া উঠিল। ইউরোপে এই পরিবর্ত্তনটা একেবারেই আকস্মিক। মিডিভ্যাল বা মধ্যযুগীয় ইউরোপ এবং মডার্ণ বা আধুনিক ইউরোপ এক গোত্রের নয়—পরস্পরের মধ্যে কৌলিক যোগ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের খোল শুধু নয়, নলচে পর্য্যন্ত এমনি বদল হইয়াছে যে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক দুই ইউরোপীয় সমাজ—একেরই উত্তর সংস্করণ যে অন্যটা—এ কথা বলার উপায় নাই। সুতরাং এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনটা ইউরোপ সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই; কারণ ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের ঢেউ খাইতেছে বলিয়া তাহার ব্যবস্থা সব গুলাইয়া যাইতেছে। এই কারণেই বোধ হয় তাহার সাহিত্যের মধ্যেও তাহার সমাজের রূপটাই বড় হইয়া উঠিতেছে। এ শুধু ইংলণ্ডে নয়, সমগ্র ইউরোপে। নরওয়ে সুইডেনে ইব্‌সেন, ষ্ট্রাইন্‌ড্‌বার্গ; জর্ম্মাণীতে হাউপ্‌ট্‌ম্যান, সুডারম্যান; ফ্রান্সে ব্রিয়ে, মেটারলিঙ্ক; ইতালীতে ডানান্‌জিয়ো; রাশিয়াতে শেকফ, এন্‌ড্রিভ; ইংলণ্ডে বার্ণাড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, সামাজিক নাট্য রচিয়া ইউরোপে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমনি এক ধরণের নাট্য-এপিডেমিক সমস্ত ইউরোপে ছাইয়া-যাওয়ার মত দৃশ্য এ যুগের পূর্ব্বে আর কোন যুগেই হয় নাই—তা সে সব যুগে শেক্‌সপীয়র, বা গ্যয়টে জন্মান্‌ না কেন।

কিন্তু বাংলাদেশেও হঠাৎ এই সামাজিক সাহিত্যের চাষ সুরু হইল কেন? তার কারণ, আমাদেরও এই এক শতাব্দীর মধ্যে সমাজে ভাঙা-চোরা ত বড় কম হয় নাই। ইংরেজ-শাসন ও শিক্ষা আসিয়া এই সমাজকে প্রথম একচোট ভাঙিয়াছে। ইংরেজের এই নব শিক্ষায় গ্রাম্য সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতায় পরিণত করিয়া গ্রাম-গুলিকে উৎসন্ন ও সহরগুলিকে প্রসন্ন করিয়াছে। তার ফলে আমাদের ভদ্র শিক্ষিত সাধারণের দেশের সঙ্গে নাড়ীর যে যোগটুকু ছিল সেটা কাটিয়া গেছে এবং এই সংকীর্ণ শিক্ষিত দল আর বিস্তীর্ণ অশিক্ষিত জনসংঘের মধ্যে বিচ্ছেদের একটা পাকা প্রাচীর দাঁড়াইয়া গেছে।

রাষ্ট্রতন্ত্রের বদলই চাই আর সমাজতন্ত্রেরই বদলই চাই—এই গণতন্ত্রকে বাদ্‌ দিয়া কোন তন্ত্রেরই আবাদ সম্ভব হইবে না। "এমন মানব জমীন্‌ রইল পতিত আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা!" কিন্তু কেমন করিয়া যে আবাদ করা যায় তাহাইতো সমস্যা। রবীন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন—স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠিত কর, পল্লী সংস্কার করিতে সুরু কর। সে জন্য স্বেচ্ছা-সেবকদলের তলব পড়িয়াছিল—কিন্তু এমন স্বেচ্ছাসেবক ক'জন পাওয়া যায়? তারপর এই রকম বিন্দু বিন্দু জলসংগ্রহে কি আর কঠিন ভুঁই চাষ করা চলে? যাই হোক্‌ এ সমস্যা এখনও মস্ত বড় সমস্যা হইয়া আছে। ইহারি অচল পাহাড়ে ঠেকিয়া সমাজসংস্কারের সচল চেষ্টা চুরমার হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে যে সমাজ সংস্কৃত সমাজ বলিয়া গর্ব্ব করে, এই অগণ্য প্রাকৃত অসংস্কৃত সংঘের সঙ্গে তার যোগ হয় নাই বলিয়া তাহা আজ জীর্ণপ্রায়, শীর্ণগতি, মুমূর্ষুপ্রায়। যে যুগে নাড়াবুনেরা কাস্তে ভাঙিয়া করতাল তৈরি করিয়া কীর্ত্তনে হইয়াছিল, এ যুগের ভদ্র সমাজের শুদ্ধ ধর্ম্ম তাহাদিগকে ত ধরিল না। এ যুগের শিক্ষাও ধরিল না, এযুগের সাহিত্যও ধরিল না। তার কারণ, নীচ হইতে উপরের দিকে এ সমস্তের উৎপত্তি ও গতিটা নয়, গতিটা—উপর হইতে নীচের দিকে। এইবার স্বায়ত্ত শাসনের কল্পতরীও এই পাহাড়ের গায়েই চুরমার হইতে পারে, একথাও আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন।

তারপর ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের বিস্তর সংস্কারের বদল হইয়া গিয়াছে। রামমোহন রায় হইতে বিবেকানন্দের কাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারাটাকে একবার অনুধাবন করিলে এ কথা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী ধর্ম্ম ও সমাজ-সংরক্ষকদিগের আদর্শ ও প্রণালীগত প্রভেদ যেমনি থাকুক, এই হিন্দু সমাজের মধ্যে নানা রকমের পরিবর্ত্তন উপস্থিত করার ব্যাপারে ইঁহাদের মধ্যে অভেদ। সেই এক একটা পরিবর্ত্তনের অভিঘাত সমাজের চিত্তে ও চেতনায় এক এক রকমের প্রতিঘাত জাগাইয়াছে। লজ্জাবতী লতার সাড়ার লিপি আচার্য্য জগদীশের যন্ত্রে যেমন ধরা পড়ে, তেম্‌নি সমাজের সেই সব সাড়ার লিপি সাহিত্যে নিবদ্ধ হইয়া আছে। যেমন দেবেন্দ্রনাথের কালে অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের tradition-ভাঙা rationalismএর, যুক্তিবাদের সাহিত্য। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কালে বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্রের nationalismএর সাহিত্য, traditionalismএর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তার সাহিত্য। Reason এবং tradition এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ধাক্কার সাড়া সাহিত্যে দুই প্রকারে দেখা দিয়াছে। এখন আবার রবীন্দ্র বলেন tradition ভাঙিয়া বাহির হইতে; রামেন্দ্র প্রভৃতি বলেন tradition ও reason এর সমন্বয় সাধন করিতে।

অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, সেই জাতীয়তার যুগেই বঙ্কিম যে রোমাণ্টিক হাওয়াটা বাংলায় বহাইয়াছিলেন, যে সব রোমাণ্টিক চরিত্র তিনি সৃষ্টি করয়াছিলেন, তাহা 'ট্রাডিশন্'-রক্ষক অক্ষয় সরকার মহাশয় বা চন্দ্রনাথ বসুর মনঃপূত হয় নাই। কারণ, সমাজকে তাহাও ঘা দিয়াছিল এবং ঘা দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিল। সুতরাং সমাজই যে সব সময়ে সাহিত্যকে জাগায় তাহা নয়, সাহিত্যও সমাজের মধ্যে নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া দেয়। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে। একের ক্রিয়া অন্যে প্রতি-ক্রিয়া জাগায়। সাহিত্যের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সমাজে দেখি; আবার সমাজের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে দেখি। মনে করুন, বঙ্কিম যদি রোমাণ্টিক সাহিত্য সৃষ্টি না করিতেন, তবে বাংলা সাহিত্যের পরিসর কতটুকু থাকিত? তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কল্পনা-শক্তির দ্বারা যে সব নূতন আদর্শ (types) ও যে সব নূতন প্রকৃতি (temperaments) গড়িয়াছেন, সেগুলি এখন সমাজের বাস্তব জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এখন তাই রোমাণ্টিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ শেষ না হইলেও 'রিয়ালিষ্টিক' বা বাস্তব সাহিত্য-পর্ব্বের আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্কটের পর জর্জ্জ এলিয়টের মত, হুগোর পরে বাল্‌জাকের মত, বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্র-নাথপ্রমুখ প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকগণ দেখা দিয়াছেন। তবে স্কট ও হুগো যেমন চিরকাল নূতন, বঙ্কিমের নূতনত্ব ও মোহও তেমনি ঘুচিবার নয়।

তার পর রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের মত ধর্ম্মসংস্কারক নহেন বটে, কিন্তু রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের চেয়েও তাঁহারা ধর্ম্মের সংস্কারকে বেশি বই কম ঘা দেন নাই। খৃষ্টানের চর্চ্চেও তাঁহাদের ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইয়াছে, মুসলমানের মসজিদেও হইয়াছে। কোন ধর্ম্মমত, কোন ধর্ম্মসাধনাই তাঁহাদের অনাদরনীয় হয় নাই। নিরাকার ঈশ্বর যেমন তাঁদের সম্ভজনীয়, চিদাকার ঈশ্বরও তেমনিই। বিজয়কৃষ্ণ কুলগুরু ত্যাগ করাইলেন; তাঁহার মন্ত্রগ্রাহী শিষ্যদের মণ্ডলীতে পংক্তিভোজন থাকিলনা; জগন্নাথধামের মত তাঁহার আশ্রমে ছত্রিশ জাতকে তিনি এক মিলনসূত্রে বাঁধিলেন। এ গুলিও ধর্ম্মসংস্কার। বিবেকানন্দ 'ছুঁত-মার্গে'র প্রতিবাদ করিলেন; 'অস্পৃশ্য' জাতির লোককে নারায়ণ বলিলেন ও সেই নর-নারায়ণের পূজায় দেশকে উদ্বোধিত করিলেন। ইহাও ধর্ম্মসংস্কার নয় কি?

ধর্ম্মের এই উদারতা হিন্দুর চিরকালের বিশেষত্ব বলিলে চলিবে না। এ কালে ইহা বিশেষভাবে আমাদের সমাজকে নাড়া দিয়াছে ও এখনও ভিতরে ভিতরে দিতেছে। বঙ্কিমের রোমাণ্টিক সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথে গীতিকাব্যও সমাজকে আর এক দিক হইতে নাড়া দিতেছে। সুতরাং পূর্ব্ব কালের সমাজে আর এ কালের সমাজে বিস্তর প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। এক দিকে কালের পরিবর্ত্তন, অবস্থার পরিবর্ত্তন, পারি-পার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন; অন্য দিকে ভাবের পরিবর্ত্তন, আদর্শের পরিবর্ত্তন, পরিপ্রেক্ষণ-তত্ত্বের (perspective) পরিবর্ত্তন। আর

এই পরিবর্ত্তনও এমনি আকস্মিক যে সেই আকস্মিকতার জন্যই বাংলাদেশে সামাজিক সাহিত্যের পরিমাণ অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্যকে হীনমান করিয়া দিয়াছে। বাংলার চিরকেলে গার্হস্থ্য উপন্যাস এখন সামাজিক উপন্যাস হইয়া উঠিতেছে।—রবীন্দ্র-নাথের গোরা, ঘরে-বাইরে; প্রভাত-কুমারের নবীন সন্ন্যাসী; শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রহীন, বড় দিদি, প্রভৃতি; চারু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের স্রোতের ফুল—উদাহরণ। ছোট গল্পেও প্রভাত, শরৎ, চারু, মণিলাল, প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলিকেই গল্পের মধ্যে ফলাইয়া তুলিতেছেন। সামাজিক নাট্য জিনিসটা বাংলায় এখনো আসে নাই—শুধু 'অচলায়তন' ও 'দেবোত্তর' দুইটি মাত্র এই শ্রেণীর নাট্য দেখিয়াছি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

পরম ক্ষণ

আজ বেসুরা একতারাতে তার জুড়িনু বুক ছিঁড়ে',
মন-নদীতে প্রতিধ্বনির ছড় টানিনু শেষ মীড়ে।
স্বপ্ন ছিল, ধ্যান ছিল যা, রূপ ধরে তা দেয় দেখা—
একলা পথের যাত্রী তবু, আজ তো আমি নই একা!
মন্ত্র পড়ে অরুণ আলো আকাশ-ভাষার ইঙ্গিতে—
নবীন গ্রহের আঘাত পেয়ে, মন উতলা কোন্ গীতে!

নদীর বালি, বনের আলি, গিরির জটায় সূর্য্যোদয়,
সুদূর দরীর নির্জনতা গৌরবে গায় আলোর জয়।
হাওয়ার গানের চাইতে মধুর গান গেয়ে কে যায় চলে'?
বন-লতিকার ফুল-মেখলা এলিয়ে পড়ে তার কোলে।
দূর জনমের লক্ষ যুগের মিলন-ভরা আব্‌ছায়া,
আধেক-গাওয়া গানের কলি, ভুলিয়ে দিল সব মায়া।
রৈবে কে আর বন্দী হ'য়ে এই গ্রহেরি পিঞ্জরে?
ক্ষুদ্র আমার মানস-শঙ্খ সাগর-সুরে যায় ভরে'!
অদৃশ্যে আজ বিশ্বাসি নিত্য ধ্রুব সত্য সে,
মগ্ন হ'ল সন্দেহ সব আনন্দেরি প্রেম-রসে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায়।

রং-ছুট

স্বামী আমায় ভালোবাসেননা এ-কথা বল্লে আমি জানি কেউ বিশ্বাস করবেনা। সবাই বলে আমি ভাগ্যিমানী—এমন রূপবান, গুণবান স্বামী কজনের হয়! সত্যি, তিনি গুণবানও বটে, রূপবানও বটে—এ কথা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করবে,—আমি তাতে না বলিনা। আমি শুধু বলি—বলি কেন বলচি?—এ পর্য্যন্ত ত মুখ-ফুটে বলিনি—আমি মনে-মনে জানি তিনি আমায় ভালো বাসেননা। এ-কথা নিয়ে তর্ক করতে গেলে আমি হেরে যাবো। কারণ তিনি যে আমায় ভালোবাসেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পদে-পদে দিচ্চেন। সেই সব দৃষ্টান্ত ধরে দিলে আমার কিছু বলবার আর মুখ থাকবে না। সচরাচর অভাব বলতে আমরা যা বুঝি তেমন কোনো অভাব ত তিনি আমার রাখেন নি;—রাণীর ঐশ্বর্য্য আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। লোকে বলে এ-সবই ত ভালোবাসার চিহ্ন! তা হতে পারে। কিন্তু তবু আমার মন স্বীকার করেনা যে তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি। তবে কি পেলে ভালোবাসা পাওয়া হয়? তার উত্তরও আমি জানিনা—আমি শুধু জানি তাঁর ভালোবাসা আমি পাইনি!

সই সেদিন দুঃখ-করে বলছিল যে সে বড় অভাগিনী। কারণ তার স্বামী ভারি গরীব। গায়ে দু-খানা গয়না পরা, ভালো দুটি খাওয়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকার সাধ এজন্মে তার মিটলনা। শুনে আমার ইচ্ছে হতে লাগল আমার এই গয়নার লোহার সিন্দুকটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমি একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচি! সত্যি বলতে কি, ঐ গয়নাগুলো দিন-দিন যেন পাথরের মতন ভারি হয়ে আমার বুকে চেপে বসছে। ওর ত ক্ষয় নেই, বরং বেড়েই চলেছে;—উপলক্ষ্যে, বিনা-উপলক্ষ্যে স্বামীর উপহার পেয়েই চলেছি। এক-এক-সময় ভাবি তিনি এত উপহার আমায় কেন দিচ্চেন? দিয়ে যে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে এমন ত কিছু মনে হয় না—দেওয়ার ভিতর যে একটা আবেগ আছে তাও ত দেখতে পাইনা। এ যেন দেওয়ার একটা প্রথাকে শুধু মেনে চলা মাত্র। এ-বাড়ির বৌদের গয়নার তালিকা একেবারে ডাকসাইটে। শুনেছি আমার শাশুড়ি এবং তাঁর শাশুড়ির গয়না এখনো যা মালখানায় জমা আছে তাতে হীরে-জহরত ও সোনারূপোর ছোট-খাটো মনুমেণ্ট তৈরি হতে পারে। আমি কোনো-দিন স্বামীর কাছে গয়না চাইনি—আ চাইবার ফাঁকই বা কোথায়! কিন্তু আমার মনে হয় তিনি যদি ঐ চাইবার অবকাশটুকু দিতেন, আমি খুসি হতুম।

আমার সইয়ের হাতে দুগাছি বেলোয়ারি কাঁচের চুড়ি। আমি জানি এক-জোড়া সোনার বালার জন্যে সে প্রতিদিন তার স্বামীকে উত্যক্ত করে;—এক-এক-দিন তুমুল ঝগড়াও হয়। হয় ত ঐ সোনার

বালা কোনো দিনই সে পাবেনা—চির দিন তার মনে খেদ থেকে যাবে ঐ টুকুর জন্যে। কেন জানিনা আমার কিন্তু সোনা ছেড়ে ঐ খেদটুকুরই উপর ভারি লোভ হয়।

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসে সই আমার কাছে কাঁদতে থাকে। আমি তাকে কখনো প্রবোধ দিইনা। সে হয় ত মনে ভাবে আমি পাষাণী! নয় ত ঠাউরে নেয় আমার অভাব নেই বলে আমি অভাবের দুঃখ বুঝিনা। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তার ঐ চোখের জলে আমি ভারি একটি আনন্দ পাই। মনে হয় ঐ কান্নার জল পেয়ে তাদের প্রেম-লতিকাটি বাড়ন্ত হয়ে উঠছে,—নিশ্চয় এমন দিন আসবে যখন সেটি পুষ্পে-পল্লবে নিবিড় হয়ে তাদের যুগল-মূর্ত্তিকে কুঞ্জের মত ঘিরে থাকবে! বেচারা জানেনা ঐ কান্নার জল দিয়ে সে কাকে সিঞ্চন করচে। আমি অমন কাঁদতে পেলে বর্ত্তে যেতুম। অবশ্য আমিও কাঁদি—কিন্তু আমার চারিদিকে যে মরুভূমি! আমার চোখের জল গড়িয়ে তার উপরেই পড়চে!

সইয়ের দুঃখ কিসের? সে তার স্বামীকে পেয়েছে। মুখে না বলে বেড়ালেও, তার সমস্তটা তা জানান দেয়;—তার কান্নায়, তার রাগে, তার অভিমানে, তার আনন্দে আর ত কিছু নেই—আছে কেবল তার স্বামী। তবু সে বলে তার সুখ নেই। আমি ত তার সুখের অন্ত দেখতে পাইনা। আমি জানি আমার ভাগ্যকে সে হিংসা করে; কিন্তু আমি যে তার সৌভাগ্যের হিংসা করে থাকি সে তা জানেনা!

আমি একদিন সইকে বল্লুম, সই গয়নার জন্যে তুমি এত দুঃখ কর কেন? এই ত আমার এত গয়না—সুখ আমার কৈ!

সই কপালের দিকে চোখ তুলে বল্লে, ওমা বোলোনা! তোমার আবার সুখের অভাব বোন্! তুমি হলে রাজরাণী!

আমি বল্লুম, রাজরাণী হলে কি দুঃখ থাকেনা?

সে বল্লে, সে হচ্ছে সৌখীন দুঃখ। বেশি মিষ্টিতে মুখ মেরে দেয় না?—তেমনি আর কি!

আমার যে দুঃখ আছে সইকে তা বোঝাতে পারলুম না। শুধু সই কেন, এ-জগতে কাউকে বোঝাতে পারব কি-না সন্দেহ। কারণ বাইরে সুখের সকল ঠাটই যে আমার বজায় আছে। আমার মনের দুঃখ আমার অন্তর্যামীই জানেন। আমি তাঁরই পায়ে আমার সকল দুঃখ নিবেদন করে জানাই—কাউকে কিছু বলিনা।

আমার স্বামীকে লোকে বলে স্ত্রৈণ। তিনি আমায় রাশ-রাশ উপহার এনে দেন বলেই বোধ হয় এই কথাটা উঠেছে। হায়রে আমার কপাল!

আমার স্বামী স্ত্রৈণ—একথা সত্যিও নয়, মিথ্যেও নয়। সত্যি নয় এই জন্যে যে তিনি কোনো দিন আমার কথা-মতো চলেননি, কারণ আমি তাঁকে কখনো কোনো আদেশ করিনি; মিথ্যে নয় এই জন্যে যে তিনি কখনো আমার অবাধ্য হননি, কারণ তাঁকে আমি বাধ্য করবার চেষ্টাই করিনি। তিনি যদি কোনোদিন আমায় শাসন করতেন,

তাহলে শাসন কাকে বলে তাঁকে টের পাইয়ে দিতুম। তিনি যদি আমায় বাধ্য করবার চেষ্টা করতেন তাহ'লে মনের আশ-মিটিয়ে তাঁকে আমার বাধ্য করে নিতুম—ছাড়তুম না! কিন্তু তা ত হলনা। ছেলে-বেলার পুঁতুল নিয়ে যা-খুসি-তাই করেছি—মেরেছি ধরেছি আদর করেছি, কোনো বাধা পাইনি, তাইতে অপ্রতিহত খেলার সখ একেবারে মিটে গেছে, এখন বোধ হয় তাই ঘাত-প্রতিঘাতের খেলা খেলতে না পেয়ে তৃপ্তি হচ্ছেনা। মনে-মনে ভাবি চিরকালটা কি সেই পুঁতুল-খেলাই খেলতে হবে! তোমরা আমার অপরাধ নিয়োনা—সত্যি বলতে কি, এক-একসময়ে স্বামীকে আমার একটি প্রকাণ্ড পুঁতুল ছাড়া আর-কিচ্ছু মনে হয় না। এ-কথা বল্লুম বলে মনে কোরোনা স্বামীর প্রতি আমার অভক্তি আছে। স্বামীকে আমি দেবতার মতন ভক্তি করি। আমার বাপের বাড়ির ঠাকুর-ঘরে সেই প্রকাণ্ড বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মাথা আপনি যেমন নুয়ে আসত, স্বামীকে দেখেও ঠিক তেমনি হয়। স্বামী যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ান, তখন আমাদের সেই পাথরের ঠাকুরটিকে আমার মনে পড়ে। ছেলেবেলায় ঠাকুরের কাছে যেতে বুক ছম্-ছম্ করত—দূর থেকে প্রণাম করে পালাতুম; আমার স্বামী-দেবতাটিকেও তেমনি দূর থেকে মনে-মনে প্রণাম করি—তাঁর কাছটিতে যাওয়া ঘটল না। দেবতারা স্বর্গে থাকেন, মানুষের সঙ্গে তাঁদের অনেক তফাৎ। স্বামী আমার মনের মন্দিরে সেই দেবতা হয়েই রইলেন—তাঁকে নিয়ে খেলা করা আমার হলনা। স্বামীকে দেবতার আসন থেকে নামিয়ে মর্ত্যলোকের মানুষ করে ফেল্লে তাঁকে অপমান করা হয় কি-না জানিনা, কিন্তু স্বামীকে মানুষ-রূপে পাবার জন্যে প্রাণের যে একটা কান্না আছে, তার সুর ভিতর থেকে অনবরত শুনচি। ওগো আমার দেবতা, আমার অপরাধ নিয়োনা। তোমাকে ভক্তিভরে অর্চ্চনা ত করছি; তাতে হয় ত পরকালে আমার অক্ষয় স্বর্গ-লোকের ব্যবস্থা হবে; কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে আমার ইহকালের মর্ত্যলোকের দিন কাটে কেমন করে! অক্ষয় স্বর্গ আমি চাই না, তুমি আমার এই মর্ত্যটিকে ক্ষণিকের জন্যেও স্বর্গ কোরে তোলো! শুধু আমার পূজা নয়—আমাকেও হাত ধরে নাও!

সই তার স্বামীকে ভক্তি করে। কিন্তু তবু তার সঙ্গে ঝগড়া করতে, তাকে গালাগাল দিতে, অপমান করতে ছাড়ে না। তার স্বামী নিশ্চয় তাকে উস্কে দেয় নইলে সে যখন সহজ-অবস্থায় থাকে স্বামীর নিন্দা তার মুখে কখনো শুনিনি; বরং আর কেউ নিন্দা করলে সে ফোঁস-করে ওঠে—অসহ্য হলে উঠে চলে যায়। স্বামীকে অপমান-করা, গালগাল-দেওয়া যে মস্ত বাহাদুরী তা আমি বলছি না, কিন্তু স্বামী যেখানে মানুষের রূপ-ধরে খেলা করেন এবং খেলান সে হয় ত বড় দেউল নয়, নাটমন্দির মাত্র, কিন্তু তারও চূড়া স্বর্গের দিকেই ঠেলে উঠেছে।

আমার স্বামী এমন কেন? তাঁর ত

কোনো দোষ নেই, তবে কেন তিনি এমন? আমার মনে হয়, তাঁর হৃদয়-দেউলে ভালোবাসার প্রদীপটি স্থান পায়নি। সমস্তটা অন্ধকার থেকে গেছে। সেখানে দীপদান—আমি অভাগীও পারিনি—পারিনি! সে দুর্ভাগ্য আমার স্বীকার করি কিন্তু আমি ভাবি আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কেমন আছেন? আমার হাতে দীপ জ্বলেনি বলে আমার অসহ্য দুঃখ আছে মানি, কিন্তু এ পরিপূর্ণ অন্ধকার যে আরো ভয়ঙ্কর। যদি অন্য পূজারিণীর হাতের দীপ সেখানে জ্বলে, সে যে এর চেয়ে শত-গুণে ভালো।

তোমরা আমার দোষ দেবে—আমি কেন সে মণিপ্রদীপ জ্বালতে পারিনি। কিন্তু কেমন করে পারব? আমি যে সে-দেউলে প্রবেশের পথই পেলুম না। সেখানে যে গায়ের জোরে যাওয়া যায় না—দ্বার খোলবার কোনো মন্ত্রও নেই। যার দেউল সে নিজে না খুলে দিলে তার সকল আট-ঘাট একেবারে নিরেট হয়ে থাকে। নিতান্তই আমার অদৃষ্ট! তাই হতভাগী আমি কাউকে কিছু বলতে পারিনা। স্বামী যদি আমায় বঞ্চিত করতেন, সে বঞ্চনার দুঃখও ত আমি পেতুম—কিন্তু এ যে কিছুই পেলুম না।

অথচ স্বামী আমার কৃপণ, নিষ্ঠুর নন। তাঁর শরীরে দয়ামায়া আছে এবং সব-চেয়ে বেশি করে আছে তাঁর কর্ত্তব্যবোধ। এই জন্যেই লোকের কাছে তাঁর এত সুখ্যাতি। কর্ত্তব্যের খাতায় জমাখরচের হিসেবটি তিনি এমন পরিষ্কার করে রেখে চলেন যে কোথাও ভুলভ্রান্তি ঘটতে পায় না। আমার পাওনা তিনি হিসাব-মতো কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর হাতের এই দাতব্যটা আমার সব-চেয়ে বুকে বাজে। আমার মনে হয় কর্ত্তব্য যেন একটা রাক্ষস! সে আমার স্বামীকে মায়া-পাশে অচেতন করে রেখে আমার মন-ভোলাবার জন্যে নানা রকম ফাঁদ পাতছে—আমাকে তার প্রেয়সী করে নেবে। ওগো, আমি তার মোহে ভুলতে পারব না,—এই ঘৃণ্য কুলটাবৃত্তি আমার দ্বারা হবেনা—ঐ রাক্ষসের দান গ্রহণ করে আমার অন্তরের সতী-সাধ্বীকে কলঙ্কিত করতে পারব না। ওগো আমার স্বামী, তুমি কোথায়? তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসের হাত থেকে আমায় বাঁচাও—আমার সতীত্ব রক্ষা কর।

স্বামীর এই কর্ত্তব্যের দান গ্রহণ করতে আমার মন বিমুখ হয়ে ওঠে—আমি মনে-মনে প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করি—এ কি তিনি দেখতে পান না! তা যদি দেখতেন, তাতে তাঁর মনে যদি দুঃখ হত, রাগ হত, অভিমান হত—সেও যে আমার মাথার মণি হয়ে থাকত!

সই সে দিন কাঁদতে-কাঁদতে এসে বল্লে যে তার স্বামী তাকে মেরেছে। কপালে তার রক্তের দাগ। দেখে আমার মন যে কী খুসি হল বলতে পারিনা। আমি দেখলুম তার কপালের সেই দাগ তার মাথার সিঁদুর একেবারে ম্লান করে দিয়েছে। কে যেন একখানা প্রকাণ্ড চুনি-বসানো সিঁতি আদর করে তার কপাল ঝেঁপে পরিয়ে দিয়েছে। আমি বল্লুম, সই তুমি গয়নার

দুঃখ কর, আজ তুমি যে-গয়না পেয়েছ আমার রাজরাণীর ভাণ্ডার উজাড় করে ফেল্লেও অমন-একখানি পাবেনা। সই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। হয় ত ভাবলে আমি পাগল হয়েছি। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার সেই অপরূপ অলঙ্কারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম।

গয়নার উপরে লোভের জন্য মনে-মনে সইকে কত ঘৃণা করেছি—তার হয়ে লজ্জা বোধ করেছি; কিন্তু একদিন দেখি তার এই লোভ হঠাৎ এক ঘূর্ণির হাওয়ায় উড়ে গেল—তার জন্যে কিছুমাত্র ক্ষোভ করলে না। আমি আশ্চর্য্য হলুম। তার চার-গাছি মাত্র সোনার চুড়ি ছিল। সেগুলি সে অতি-যত্নে আঁকড়ে রেখেছিল। সর্ব্বদাই বাক্স-বন্ধ থাকত—কোনো বিশেষ উপলক্ষ্য না হলে তারা হাতে উঠতে পেত না। তারপর স্বামীর অসুখ হতে যখন ডাক্তার ডাকবার পয়সা নেই, তখন সই হাসিমুখে চুড়ি চারগাছা বার করে দিলে—দুঃখের কথা মনেই এল না—বরং সেগুলোকে বিসর্জ্জন দিয়ে কৃতার্থ বোধ করলে। সইয়ের চারগাছি মাত্র চুড়ি ছিল তাও গেল—আর আমার গয়নার শেষ নেই! সিন্দুক খুলে বসে আমি অবাক হয়ে ভাবি—এ ত গয়না নয়—এ যেন জগতের যত ব্যর্থতার জঞ্জাল আমার সিন্দুকে এসে ঠাসা হয়ে জমেছে। সইয়ের সামান্য চুড়ি চারগাছি বিকিয়ে গিয়েও অমূল্য হয়ে রইল—আর আমার এই অমূল্য হীরে-জহরতগুলোর কোনো দামই উঠল না।

আমি শুনেছি আমার এই গয়না দেখে অনেক মা কামনা করেন যে তাঁদের মেয়ে যেন আমার মতন সৌভাগ্যবতী হয়। শুনে আমার গা শিউরে উঠে! আমি মুখ-ফুটে কিছু বলতে পারিনা—মনে-মনে বলে উঠি, হে ভগবান আমার এই সৌভাগ্য থেকে এই অভাগিনীদের রক্ষা কর।

আমার মনে পড়ে স্বামীর সঙ্গে যেদিন আমার গাঁট-ছড়া বাঁধা হয়। সেদিন সে কত উলু-ধ্বনি—কত শঙ্খ-ধ্বনি! সেই শব্দে আমার বুকের কপাটখানা থর-থর করে কাঁপছিল। দেখলুম গায়ে লাল চেলির জোড়, গলায় সাদা ফুলের গোড়ে, মাথায় সাদা জরির টোপর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার স্বামী! এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তির দিকে ছেলেমানুষ আমি অবাক হয়ে চেয়ে ছিলুম। তাঁকে আমার তখন ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না—যেন কার হাতে-গড়া একটা প্রতিমূর্ত্তি—যেন চিত্রপটের ছবি। আমি কৌতূহলী হয়ে বার-বার সেই ছবির দিকে চেয়েছি—কেবলই বিস্ময় হয়েছে। ছবি আমরা দেখি, ছবি আমাদের দেখছে কি-না, এ প্রশ্ন যেমন মনেই ওঠে না, তেমনি তিনি আমাকে দেখছেন কিনা, কেমন-করে দেখছেন এ কথা তখন একবারও মনে হয়নি। এখন কিন্তু জানবার ভারি ইচ্ছে হয়।

স্বামী যখন প্রথম আমার ঘরে এলেন, আমার তখন বাপের বাড়ীর জন্যে মন-কেমন করছিল। তিনি এসে আমার চোখ-মুছিয়ে দিলেন, আমার সঙ্গে খেলা করতে

বসে গেলেন। তার পরেও যখন কেঁদেছি, আমার চোখ-মুছিয়ে দিয়েছেন, নানা-রকম খেল্‌না এনে আমার মন ভুলিয়েছেন। সে আমার বেশ লাগত। তারপর ক্রমে ক্রমে শ্বশুর-বাড়ী আমার কাছে যেমন সহজ হয়ে আসতে লাগল, চোখের জল যেমন দিনে-দিনে শুকিয়ে এল, আমার চোখের উপরে তাঁর হাতের সেই স্পর্শটিও ধীরে ধীরে খসে যেতে লাগল। এ যেন ঠিক পোষ-মানানো। পোষ-মানানো শেষ হয়ে গেলে পোষ-মানাবার মন্ত্রের আর দরকার রইল না—তখন শুধু যা বরাদ্দ, যা বাঁধা-খোরাক তাই রইল।

বিয়ের পর ঐ কটা দিন আমার স্বপ্নের মতো কেটেছে। তার পর কেমন-করে ধীরে ধীরে সেই স্বপ্নরাজ্য থেকে এই দিবালোকের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে এসে পৌছলুম তার সূক্ষ্ম সূত্র আমি খুঁজে পাই না;—সে স্বপ্নরাজ্য থেকে যে বাইরে ঠিকরে পড়েছি শুধু তাই জানি। হঠাৎ একদিন চম্‌কে উঠে দেখলুম এই বাড়ির আসবাব-গুলোর মতোই আমি এক-কোণে পড়ে আছি। প্রয়োজনের সামগ্রী, ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করবার একটা সজীব আসবাব—আর কিছু নয়।

কিন্তু কেন এমন হল? স্বামীকে আমার দোষ দেব কোথা থেকে আমি খুঁজে পাই না—তিনি ত অন্যায় কিছু করেন নি। নতুন জিনিষ পুরোনো হয়ে এলে তার উপর থেকে টান আপনিই কমে আসে—আমার ভাগ্যেও ঠিক তাই হয়েছে। তিনি জবরদস্তি করে ত কিছু করেন নি। আমি যে তাঁর চোখে পুরানো হয়ে গেলুম! আমার রূপ নব-নব উষায় যে আলোতে সৌন্দর্য্যের একটি-একটি দল মেলে দেবে, সে আলো আমার ভাগ্যে এসে পৌছবার আগেই আমি ঝরে পড়লুম। তবে দোষ দেব কার?

একই সময়ে আমি আর সই শ্বশুর-ঘর করতে আসি। একই হাওয়ায় আমরা তখন দুই-সখীতে হেলছিলুম, দুলছিলুম। আমরা দুজনে বসে চুপি-চুপি কেবল স্বামীর কথাই কইতুম—গানের গুঞ্জনের মতন। সেই গানের সুর ক্রমে ক্রমে আমার গলায় ক্ষীণ হয়ে হঠাৎ একদিন একেবারে ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সইয়ের দেখি সেই সুরের ভিতর দিন-দিন নব-নব বেগ ও বিচিত্র লীলা খেলে উঠছে। তার গানে এখনো ক্লান্তি আসেনি, আর আমার সুর কবে হারিয়ে গেছে! আমি মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনি, সে তন্ময় হয়ে গেয়ে যায়, আমার সুর যে বন্ধ হয়ে গেছে তা ধরবারও তার অবসর নেই।

সই তার স্বামীর ছোট্ট ঘরটি একেবারে জুড়ে বসতে পেলে, আর এত বড় বাড়ীতে আমি কোথায় হারিয়ে রইলুম। সই আমায় বলে, কি ভাগ্যি তোমার! ভারে-ভারে তোমার পায়ে পূজার উপহার আসছে,—তুমি রাজরাজেশ্বরীর আসনে বসে আছ! শুনে আমি মনে-মনে হাসি। হায় রে, এ উপহার কি আমার? এ তারই জন্যে যে এ-বাড়ির বড়-বৌ নাম পেয়েছে। এ বাড়ির বড়-বৌয়ের যে মর্য্যাদা এ সব

উপহার উপঢৌকন তারই রত্নবেদীর সামনে স্তূপীকৃত হচ্ছে। আমার সঙ্গে ঐ বড়-বৌয়ের যে প্রভেদ তা আমি বোঝাবো কেমন করে? ওগো, আমি তোমাদের বড়-বৌ হতে চাই না। তোমরা এই সিংহাসনে আর-কাউকে বসিয়ে সকাল-সন্ধ্যা তার আরতি কর, আমার তাতে ক্ষোভ নেই—আমাকে শুধু আমার স্বামীর হৃদয়-মন্দিরে দাসী করে রেখে দাও!

সইয়ের কথা শুনে-শুনে এক-এক-সময় ভাবি, সত্যি আমার মতন ভাগ্যিমানী কে? এমন রাজার মত স্বামী আমার, এমন স্নেহময়ী শাশুড়ি আমার! সত্যি, শাশুড়ি কোনোদিন আমার শাশুড়ি হননি—চিরদিন আমার মা। সেই প্রথম-দিন বরণ করে ঘরে তুলে তিনি আমার মুখে-চোখে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন—সে স্পর্শ আমি এখনো ভুলতে পারিনি। নিজের পেটের মেয়ের চেয়েও যেন তিনি আমায় বেশি-করে দেখলেন। তাঁর রাজার ঘরের বড়-বৌ আমি—আমি কি তাঁর কম আদরের! তিনি আমায় এত স্নেহ করেন যে মনে হয় একটু উঠে-নড়তে আমার কষ্ট হবে ভেবে তাঁরও কষ্ট হয়। তিনি আমাকে নিজের মেয়ের মতন দেখেন বটে কিন্তু তিনিও কি ভুলতে পেরেছেন যে আমি এ বাড়ির বড়বৌ মাত্র? তিনি নিজে এ বাড়ির বৌ হয়ে এসে যে-সব ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন, পাছে তার একটা থেকেও ভুলক্রমে আমি বঞ্চিত হয়ে যাই এর জন্যে সর্ব্বদাই সাবধান হয়ে আছেন। কড়ায়-গণ্ডায় আমি সব মিলিয়ে পাচ্ছি কি-না তা হিসেব করে দেখবার জন্যে তিনি মধ্যে-মধ্যে দপ্তরখানা থেকে পুরোনো হিসেবের খাতা তলব করে পাঠান। এ বাড়ির বৌয়ের প্রাপ্যের ফর্দ্দ একেবারে বাঁধা হয়ে গেছে। মা আমার নিশ্চিন্ত আছেন যে আমার সেই বাঁধা-বরাদ্দের কোথাও ফাঁক পড়ছে না,—কিন্তু যে-জিনিষের হিসেব হয় না—যার অঙ্ক এ পর্য্যন্ত জগতের কোনো খাতায় পড়েনি, তার কোনো গরমিল হচ্ছে কি-না সে খবর কি রাখেন?

আমাকে যখন সাধ-দেবার সময় এল, বাপের বাড়ি থেকে মা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন আমার কি কি জিনিষ চাই। স্বামীর ঘরে আমার কোনো জিনিষেরই অভাব নেই বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ ঠাসা হয়ে আছে, তবু মায়ের ঐ চিঠিখানি পেয়ে মনে হল আমার বিস্তর জিনিষের দরকার—আমি একটা প্রকাণ্ড ফর্দ্দ লিখে ফেল্লুম। এখানে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোনো দরকারই হল না। শাশুড়ি তাঁর সাধের সময় যে-সব সামগ্রী পেয়েছিলেন তার ফর্দ্দ মিলিয়ে আমার জন্যে জিনিষের ফরমাশ দিলেন। কি একটা জিনিষ তো দুষ্প্রাপ্য বলে সংগ্রহ হল না; তার জন্যে শাশুড়ি ক্ষোভ রাখবার আর জায়গা পেলেন না। তাঁর সে আপশোসের কথা তিনি এখনও ভুলতে পারেননি। আমি সেই দুষ্প্রাপ্য জিনিষ না পেয়ে কোনো খেদ করলুম না দেখে তিনি আমার সুখ্যাতি করতে লাগলেন, বল্লেন—কী লক্ষ্মী বৌ আমার! তারপর আমার স্বামীকে ডেকে বল্লেন—ঐ দামের চেয়ে বেশি

দামের কোনো জিনিষ দিয়ে আমার ক্ষতি যেন পূরণ করে দেওয়া হয়। মায়ের আজ্ঞা প্রতিপালন করে স্বামী আমার হাতে এক বহুমূল্য উপহার এনে দিলেন। আমার সাধ দেওয়া শেষ হল।—হায়রে আমার সাধ!

মাগো, তুমি আমার অপরাধ নিয়ো না। তোমার স্নেহের দানও আমি মন-খুলে নিতে পারচি না। তুমি যাকে এসব দিচ্চ সে আমি নই—আমি নই! সে তোমার ছেলের প্রেয়সী! যেদিন সে সৌভাগ্য হবে, সেদিন তোমার এই দান আমি মাথায় করে নেব—এখন ওসব তোলা থাক!

খুকী বোধ হয় আমার মনের দুঃখ বোঝে। আমি যখন একলা চুপ-করে বসে থাকি, সে কোথা-থেকে ছুটে এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে-পোড়ে আমার গলা-ধরে এমন আদর করতে থাকে যে আমার সব দুঃখ ঘুলিয়ে যায়। সে কেমন-এক-রকম-করে চায় যাতে আমার বোধ হয় আমার মনের সমস্ত গলিঘুলির ভিতর তার চোখের আলো গিয়ে পড়েছে—যেন তার ঐ কচি নরম হাত আমার বেদনার উপর ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিচ্ছে। ও কচি মেয়ে আমার মনের দুঃখ টের পেলে কেমন করে? এক-এক-সময় সে আমার বুকের উপর কান পেতে চুপটি করে শুনতে থাকে—মনে হয় যেন কি শুনছে! নিশ্চয় ও যাদুমন্ত্র শিখেছে, নইলে থেকে-থেকে আমার চোখের উপর থেকে পৃথিবীর রং কি-করে এমন বদলে দেয়!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা একা চুপটি করে বসেছিলুম, মনে হচ্ছিল আমার বুকের ভিতরকার অন্ধকারের ছায়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ে আজকের সন্ধ্যাকে ঘনীভূত করে তুলছে। সমস্ত পৃথিবীটা অল্পে অল্পে ঝাপসা হয়ে আমার চোখের উপর থেকে মুছে আসছিল—চারিদিকে কেবল অন্ধকারময় বিরাট শূন্যতা জেগে উঠছিল। আমি ক্রমে ক্রমে সেই শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ খুকী তার বাপকে এনে ঘরে হাজির করলে। তিনি বল্লেন—"তুমি আমায় ডাকছিলে?" আমি চমকে বলে ফেল্লুম—"হ্যাঁ।" কিন্তু কৈ আমি ত তাঁকে ডেকে পাঠাইনি—তবে কেন বল্লুম হ্যাঁ। আমি হতভম্ব হয়ে রইলুম। তিনি বল্লেন—"আমার বাইরে যাবার দরকার ছিল, খুকী কিছুতেই ছাড়লেনা, বল্লে আসতেই হবে। কি দরকার বলত?" দরকার? কৈ দরকার ত কিছুরই নেই! আমি কি উত্তর দেব জানিনা, খুকী আমায় রক্ষা করলে। সে আমার জবাবের সময় না দিয়েই বলে উঠল—"বাবা, তুমি সেই গল্পটা মাকে বল!" "দুষ্টু মেয়ে!"—বলে একবার চোখ-রাঙিয়ে তিনি বসলেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি কখনো ঘরে আসেন না, আজ অনেকক্ষণ রইলেন। খুকী এমনি-করে মাঝে-মাঝে তার বাপকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসে, তিনি দেখি মনের খুসিতেই আসেন—সে আমার বেশ লাগে। কিন্তু আমি ভাবি তিনি কার টানে আসেন?

খুকীর দরদে শুধু স্বামীর কাছে কেন, বাড়ীর সকলের কাছেই আমার আবার নতুন-করে আদর বেড়েছে। খুকীকে যখন কোলে পেলুম তখন স্বামীর ব্যবহার দেখে আমার

একবার মনে হয়েছিল তাঁর সেই হৃদয়-দেউলে যেন একটু আলোর আভা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে আমার ভুল—সে-অন্ধকার তেমনি কঠিন অটুট আছে। আমি খুকীর মা হয়েছি বলে আমার একটা বেশী আদর পাওনা হয়েছে মাত্র। ওগো এ সংসারে শুধু কি এমনি-করে দেনা-পাওনার হিসেবই চলবে?

খুকী এসে তার মা ও বাপকে নিয়ে নতুন এক খেলা খেলাচ্ছে। সে খেলার প্রধান হচ্ছে সে নিজে—আমরা দুজন খেলার ঘুঁটিমাত্র। খেলার ঝোঁকে দুই ঘুঁটি যেমন একএকবার এক-ঘরে এসে বসে, তেমনিধারা মধ্যে মধ্যে আমাদের দুজনের মিলন ঘটে, কিন্তু তারপর আবার যে যার নিজের কোটরে প্রবেশ করি।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আর্টে প্রেম

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'!—সুতরাং শিল্পীদের পক্ষেও এ জগৎজোড়া ফাঁদ এড়াইয়া চলা শক্ত কথা। পৃথিবীর সকল জাতির ললিত কলাই তাই প্রেমের পেলব স্পর্শে কোমল হইয়া উঠিয়াছে।

জাগতিক শিল্পে দুটি বিষয়ের প্রাধান্য দেখা যায়;—ধর্ম্ম আর প্রেমের ছবি। আগেকার শিল্পীরা ধর্ম্মকেই একান্ত ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, লিওনার্ডো ডা ভিন্সি, টিসিয়ান, দোনাতেলো, বোটিশেলী প্রভৃতি শিল্পীরা ধর্ম্মের শত শত চিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাইবেলের একই বিষয় লইয়া তখনকার ছোট-বড় অসংখ্য শিল্পী এতটা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, দেখিলে অবাক মানিতে হয়; আর্টের এতটা ধর্ম্মপ্রাণতার আসল কারণ হইতেছে এই যে, সে যুগের খৃষ্টিয় চার্চ্চগুলিই প্রধানত শিল্পীদের পালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মের নিরাপদ ছায়ায় ঠাঁই না পাইলে সেকালের আর্ট কখনো টিকিয়া থাকিতে পারিত না। রোমের পোপদের নেক-নজর পাইয়াছিলেন বলিয়াই র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতি অনেক ওস্তাদ-শিল্পী এত-বেশী নাম করিয়া গিয়াছেন। এই-সব সুবিধার জন্য শিল্পীরা প্রথম হইতেই তখন আর্টের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক পাতাইতে চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু, অনেকসময়ে এই সম্পর্কটা জোর-করিয়া পাতানো হইত, তাহার ঢের প্রমাণ আছে। শিল্পের মধ্যে নিছক ধর্ম্মের প্রকাশ ক্রমে একটা বাঁধা গৎ হইয়া দাঁড়ানোতে আর্টিষ্টের অনুভূতিও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই প্রাণের টানে আর ধর্ম্মের ছবি আঁকিতেন না; আঁকিতেন, দস্তুর বলিয়া। ফলে আর্টের স্বাধীনতা, বিচিত্রতা ও ভাবুকতা



প্রেমালাপ

(Boucherএর আঁকা ছবি হইতে)

কমিয়া আসিয়াছিল। অমন্ যে বিখ্যাত চিত্রকর টিসিয়ান, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিসে যাঁহার জোড়া মিলিত না, চল্‌তি রীতির নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া তিনিও কলালক্ষ্মীর মান রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্রের পাত্র-পাত্রীরা ধার্ম্মিক বটে; কিন্তু সমালোচকের মতে তাহারা প্রাণহীন। (He painted many "Assumptions," but although so much of his work was devoted to sacred subjects it is curiously lacking in soul, even when perfect in detail of colour and workmanship.) বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর Boucherও প্রথম জীবনে অন্যের দেখাদেখি ধর্ম্মকে চিত্রবস্তু করিতে গিয়াছিলেন। সে-সময়ে তিনি যে দু-চারখানি ধর্ম্মমূলক ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব বিশেষত্ব বা ভাবের ছাপ্ কিছুই ছিল না। তিনি নিজের প্রাণে ধর্ম্মকে অনুভব করেন নাই,—লোকে যেমনটি চায়, বাজারে যে ধরণের ধর্ম্মের ছবি বেশী বিক্রী হয়, তিনি হুবহু ঠিক সেই রকমেরই ছবি, দস্তুর বজায় রাখিয়া আঁকিয়াছিলেন। সুতরাং সে অনুকরণে কি আর্ট, আর কি ধর্ম্ম—এ-দুয়ের কোনটিই বিকাশ লাভ করে নাই। কিন্তু ভিতরে প্রতিভার প্রদীপ থাকিলে পথ চিনিতে দেরি লাগে না। প্রতিভাবান



প্রণয়ী
(মার্কাস ষ্টোনের আঁকা ছবি হইতে)

Boucher শীঘ্রই আপনার ভ্রম বুঝিয়া ধর্ম্মমূলক ছবি-আঁকা ছাড়িয়া—যেদিকে তাঁহার প্রাণের টান, সেই—প্রেমকে অবলম্বন করিলেন। ফলে অল্পদিনের ভিতরেই দেশ-বিদেশে তাঁহার নাম রটিয়া গেল।

একজন প্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক বলিয়াছেন, "A man's art is the revelation of his soul's appetites, the confession of what he has felt most intensely, set his heart upon most keenly." এই কথাগুলি না বুঝার দরুণই শিল্পজগতে আমরা আজ এত ভাব-হীন ও প্রাণহীন ম্যাডোনার মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এ-সব ছবি দেখিয়া না-হয় ভক্তি না-হয় তৃপ্তি;—এরা শুধু মৌন ভাষায় শিল্পীদের কলঙ্ক ঘোষণা করে!



ভালোবাসো ?
(সি, হেগ-উডের আঁকা ছবি হইতে)

"All the world loves a lover"—তাই প্রেমের ছবি দেখিতে আমরা এত ভালবাসি। জগতে প্রেমের মত পুরাণো ও শতবার আলোচিত এবং নিত্য-অনুভূত বিষয় আর নাই; কিন্তু পুরাণো হইলেও এই "পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে" সাহিত্য ও শিল্পের আসর যুড়িয়া আছে। যাঁহারা ভারিকে মেজাজের লোক, সাহিত্য ও শিল্পে প্রেমকে দেখিলেই তাঁহারা চটিয়া অস্থির হন; তাচ্ছীল্য করিয়া বলেন, 'এ যে ছেলেমানুষী খেলা'! কিন্তু হায়রে মানুষের চপল মন! মুখের কথায় সে ত বোঝ মানে না, মাথার চুল পাকিলেও সে ত এ খেলা ভুলিতে পারে না! বসন্তের একটু বাতাসে, নয়নের একটু ঠারে-ঠোরে, আঁচলের একটু স্পর্শে জরা-নত দেহের তলে-তলেও তাই অজর প্রাণ সকল শাসন ঠেলিয়া জাগিয়া উঠিতে চায়! প্রেমের দেবতা বেশ ভাল-রকমেই বোঝেন, মানুষের এ মানা মুখের মানা—এ হৃদয়ের বিদ্রোহ নহে; তাই

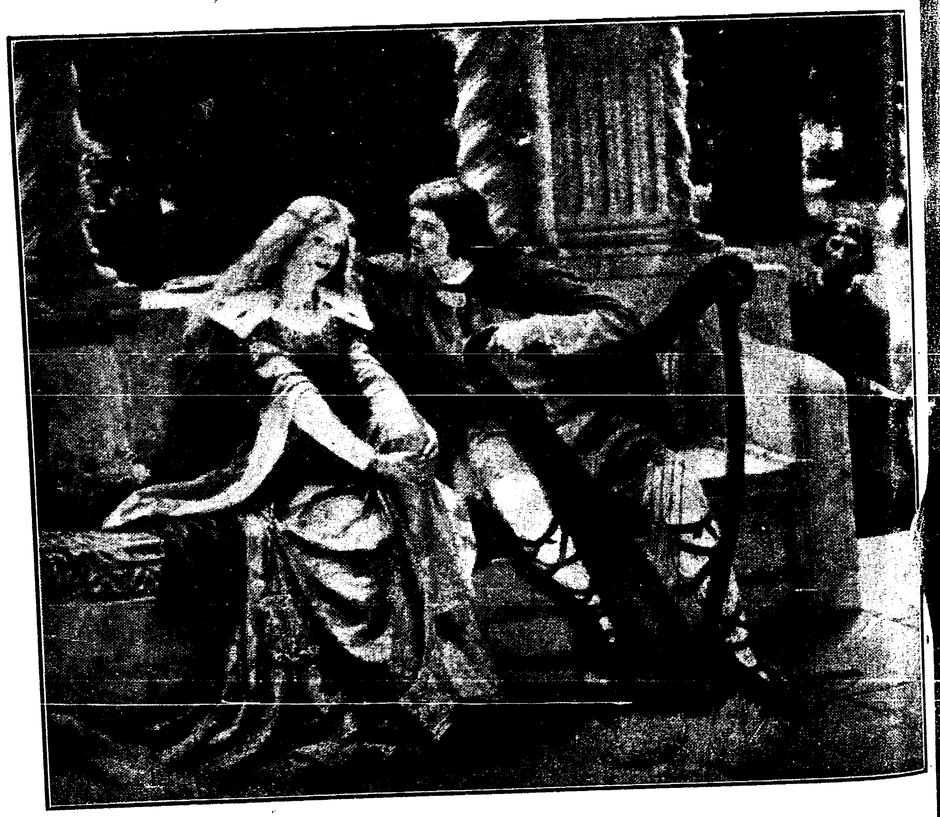

গান-শেষে

(ই, ব্লেয়ার লেটনের আঁকা ছবি হইতে)

তাঁহার লীলা আদিপ্রভাত হইতে আজ-পর্য্যন্ত সমানই চলিয়াছে। আর, যতদিন মানুষের জীবনে এই প্রেমের সাড়া পাওয়া যাইবে, ততদিন গম্ভীরের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শিল্পী গড়িবেন প্রেমের প্রতিমা এবং কবি রচিবেন প্রেমের পূজা-মন্ত্র! জীবনের সঙ্গে যাহার চিরসম্পর্ক, কবি ও শিল্পী কি তাহাকে প্রাণ থাকিতে ত্যাগ করিতে পারেন! তাই কবি চণ্ডীদাস একেবারে কবুল-জবাব দিয়া বসিয়াছেন—

"পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে!"

তাঁহার রাধাও স্পষ্টাস্পষ্টি বলিয়াছেন—

"সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা!"

প্রেম কি? দুটি আত্মার পরস্পরের সহিত মিলন-আকাঙ্ক্ষা। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে বুঝা যায়, সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা এই আকাঙ্ক্ষার উৎস। আমাদের প্রাচীন কবি বলিয়াছেন, "মন কি কারো রূপে ভোলে?" কিন্তু, মন যে রূপেই ভোলে এবং রূপই যে প্রেমের প্রথম ধাপ, এ সত্য ত আমরা নিত্যই জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি! দুনিয়ার পনেরোআনা লোকই বাহিরের রূপের মধ্যে প্রেমের প্রথম সাড়া পায়, বাকি একআনা লোকের প্রেমের সঙ্গে যদি বাহিরের রূপের সম্পর্ক নাই-বা থাকে, তবে মানস-সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সেখানে আছেই আছে। দেহের রূপ বা মনের রূপ—যেদিক দিয়াই দেখি, প্রেমের ঘুম ভাঙ্গায় রূপের সোনার কাঠি। যৌবন সুন্দর বলিয়াই প্রেমের মধুরসের ভিয়ান হয় যৌবনবয়সে।

শিল্পী রূপের পূজারী। প্রেমের সম্ভোগে রূপের সার্থকতা, শিল্পী তাই প্রেমের ছবি লইয়া এমন মাতিয়া উঠেন। তিনি যে প্রেমের মূর্ত্তি আঁকেন বা গড়েন, তাহার মধ্যে আমরা শিল্পীর সম্ভোগলিপ্সা দেখি না, তাঁহার সৌন্দর্য্যপূজার পরিচয়ই জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই। এই যে সব সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী কামিনী প্রেমালাপে বিভোর হইয়া আছে, ইহাদের যৌবনপুষ্পিত দেহে দেহে, ইহাদের মোহন সাজসজ্জায়, মধুর ভাবে-ভঙ্গীতে, ইহাদের আবেগভরা মিলনোচ্ছ্বাসে আমরা দেখি, শিল্পীর আদর্শ-সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস! সৌন্দর্য্যের বিচিত্র প্রকাশ নানা ভাবে দেখানো যায়। এমন-কি, আর্টিষ্ট যে কুৎসিতকেও ত্যাগ করেন না, তাঁহার হাতে পড়িয়া কুশ্রীও যে আর্টের গুণে সুশ্রী হইয়া উঠে, এ কথাও ত সবাই জানেন! কিন্তু সৌন্দর্য্য যখন যৌবরাজ্যের প্রেমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন তাহার যথার্থ মহিমা বুঝাইবার জন্য শিল্প-সমালোচকের টিপ্পনীর কোন দরকার করে না; অন্য-কোন ভাবের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইলে, জনসাধারণ তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া শিল্পীকে গালাগালি দেয়; কিন্তু প্রেম-ভাবে যখন সৌন্দর্য্যের আত্মপ্রকাশ, তখন কাহারও তাহা বুঝিতে দেরি হয় না এবং শিল্পীর গুণপনা তখন সহজেই সকলকে মোহিত করে। কেননা, প্রাসাদে, কুটীরে, হাটেমাঠেবাটে—সর্ব্বত্রই প্রেমের অবাধগতি। এমন অনেক ভাব আছে পণ্ডিত ও মূর্খ

সমানভাবে যাহাদের বুঝিতে পারে না। কিন্তু প্রেমে এ বালাই নাই, সে যে ছাড়পত্র পাইয়াছে, তার জোরে সে সকল প্রাণের ভিতরেই অনায়াসে ঢুকিতে পারে। কম-বেশী পরিমাণে সকল শ্রেণীর সকল মানুষই প্রেমের স্বোয়াদ পাইয়াছে, তাই চিত্রার্পিত



প্রিয়ের উদ্দেশে
(অ্যাবি অ্যল্টেসনের আঁকা ছবি হইতে)

প্রেমভাবে সকল হৃদয়েই সাড়া পড়িয়া যায়;—প্রণয়ীর ঐ চোখ-মুখ, ঐ হাসি-লজ্জা, ঐ মান-অভিমান, ঐ চুম্বন-আলিঙ্গন—এ-সবের যথার্থ অর্থবোধে কাহারও ক্ষণ-বিলম্ব হয় না! এইজন্য যে-সকল শিল্পী প্রেম লইয়া বেশী কারবার করিয়াছেন, তাঁহারা আর-সকলের চাইতে অধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

জগতে যদি প্রেম না থাকিত, তাহা-হইলে বেশীর ভাগ কবি ও শিল্পী নিশ্চয়ই মাঠে মারা যাইতেন! ভাগ্যে প্রেমের রেওয়াজ উঠিয়া যায় নাই, শিল্পী ও কবিরা তাই বাঁচিয়া আছেন। বিখ্যাত প্রেমের চিত্রকর মার্কাস্ ষ্টোন বলিয়াছেন, প্রেম আছে তাই আমি বেকারের দলে গিয়ে পড়িনি; নইলে আমাকে একটি পয়সার জন্যে

লোকের দোরে দোরে হাত পেতে ঘুরে মরতে হোত!

হেগ্-উড নামে আর-একজন নামজাদা পটুয়া বলিতেছেন, আমি ভালবাসি প্রেমমূলক ছবি; লোকে যখন দোসরহারা ও বয়সে-বুড়ো হয়, সে-সব ছবি তখন কালো জীবনে আলোর রেখাপাত করে।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রণয়-কাহিনী অবলম্বনে যে-সব ছবি আঁকা হইয়াছে, প্রেমসম্পর্কীয় সমস্ত চিত্র-ভাণ্ডারের মধ্যে গুণ্‌তিতে তাহাই সব-চেয়ে বেশী। তারপর কবি ও ঔপন্যাসিকদের কাব্য এবং কথাগ্রন্থ অবলম্বনেও অনেক পট আঁকা হইয়াছে। সেক্‌স্‌পিয়ারের অমর প্রেমিক-প্রেমিকা রোমিও এবং জুলিয়েটের মধুর প্রেম-কথা যে কত চিত্রকরকে ছবি আঁকিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা হয় না! ভারতীয় চিত্রকরেরাও কৃষ্ণ-রাধার প্রেম-লীলা লইয়া এমনি মাতিয়া আছেন।

ভারতের প্রাচীন চিত্রে প্রেমকে যে কত ভাবে ও কত রূপে দেখিয়াছি, তার আর হিসাব হয় না। বিরহের ছবি, মিলনের ছবি, মানের ছবি! প্রেম হচ্ছে সুন্দর যৌবনের সুন্দরতর স্বপ্ন,—সে-সব ছবিও তাই স্বপ্নের মতই মধুর লাবণ্যে সমুজ্জ্বল! তাহাদের মধ্যে রূপোল্লাস আছে, রসালস আছে, অনুরাগ, বিরাগ ও সম্ভোগ প্রভৃতি প্রেমবৈচিত্র্যও আছে। প্রথমবৎসরের "প্রাচ্য চিত্রকলা-প্রদর্শনী"তে অভিসারের একখানি প্রাচীন পট দেখিয়াছিলাম, তাহার অপূর্ব্বতা আজও ভুলিতে পারি নাই।

"অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কতশত কোটি শবদ, জীউ কাঁপ।"—

ইহারই মধ্যে গভীর রাত্রে আঁধার পথে একাকিনী অভিসারিকা কান্তদর্শনে চলিয়াছে। বনের গাছে গাছে অগ্নিরূপিনী সাপিনীর মত চঞ্চলা চপলার লীলা,—আর তাহারই ক্ষণিক প্রভায় ভয়ত্রস্তা কামিনী, চারিদিকে অন্ধকারের চেয়েও ভয়ানক, নানা বিভীষিকার মিথ্যা মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে! ইহাই সেই ছবিখানির বিষয়। আর-কোন চিত্রকরের পটে, অভিসারের এমন নিখুঁত ভাবের আভাস আমরা দেখি নাই—এ ছবিখানি প্রাচীন ভারতীয় কলার একটি masterpiece! সুধু ছবিতে নয়, এদেশে সেকালের ভাস্কর্য্যের নমুনা যেখানে-যেখানে বিদ্যমান, সেখানেই শিলা-পটে প্রেমের দৃশ্য উৎকীর্ণ হইয়াছে। আমাদের সেকালকার শিল্প একান্ত ভাবে ধর্ম্মের দ্বারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে; এমন-কি, দেবালয় ছাড়া শিল্পীদের আর-কোন কলা-ভবন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বরং চিত্রকরেরা স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু ভাস্করদের হাত দেবতার তুষ্টি-সাধনের জন্য একেবারে যোড়া ছিল।—হাজার হোক্ শিল্পীরা ত মানুষ বটে! তাই গম্ভীর দেবতার পাষাণ-নেত্রের কঠিন দৃষ্টিও শিল্পীদের তরল চিত্তের চপলতা নিবারণ করিতে পারিত না। জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর ও কণারক প্রভৃতি দেবমন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে ভারতীয় ভাস্করদের মানুষী চপলতার এমনি শত-শত নিদর্শন বর্ত্তমান। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের নিকেতনে চুম্বন ও আলিঙ্গনের এত ছড়াছড়ি দেখিলে বেশ বুঝা যায়,



নব-দম্পতী
(লর্ড লেটনের আঁকা ছবি হইতে)

শিল্পীরা দেবতার ডাক্ শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনাদের প্রাণের ডাকেও তাহারা সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে নাই!

য়ুরোপের আধুনিক প্রেম-শিল্পীদের চিত্র-মালায় একটি বিশেষত্ব বিশেষ-করিয়া আমাদের চোখে পড়ে। অনেক চিত্রকর তাঁহাদের চিত্রলিখিত পাত্র-পাত্রীদের দেহে প্রাচীন কালের ঢিলা পোষাক দিয়াছেন। যাঁহারা প্রাচীন পোষাকের ভক্ত নন, তাঁহারাও একেবারে একেলে কাপড়ের উপরে হাড়ে-হাড়ে চটা! বাস্তবিক, পাশ্চাত্য দেশের একালকার কাপড়-চোপড়ে এমন একটা কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা আছে যে, তাহার ভিতরে পড়িলে পেলব প্রেমের সরস কাব্য যেন একেবারে নীরস গদ্যে পরিণত হইয়া যায়; সে পোষাকের চাপে যৌবনের মাধুর্য্য ও দেহের সৌন্দর্য্যও যেন আড়ষ্ট হইয়া হাঁপাইয়া উঠে! এইজন্যই বোধহয় একালের জামা-কাপড় শিল্পীদের পটে স্থানলাভ করে নাই।

এ সংসারে প্রেম, আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব রচনা করিয়া লইয়াছে। সংসারের সাধারণ সুখ-দুঃখের বাহিরে প্রেমিকের মনোজগতে প্রেমজনিত সুখ-দুঃখ এবং আশা-নিরাশার লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের মান-অভিমান এবং বিরহ-মিলন প্রভৃতি প্রেমিকের প্রাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ঢেউ বহাইয়া দেয়; প্রেমে যেমন "ক্ষণেক হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ", এই হাসি এই কান্না, এই আলো এই ছায়া,—তেমন বিপরীত ভাবের খেলা সাধারণ জীবনে ঘটিতে দেরি হয়। এইজন্যই মানুষের একঘেয়ে জীবনে যখন প্রেমের বাঁশী বাজিয়া উঠে, তখন কিছুদিনের তরে সে সব-ভুলিয়া একেবারে মাতিয়া যায়। কিন্তু সংসারের দস্তুরমত, প্রেমের উপর হইতেও ক্রমে নবীনতার আবরণ খসিয়া পড়ে। তবে, এর মধ্যেই যৌবনের নবীন প্রেম আমাদের স্মৃতির পরতে-পরতে যে ছবি খুদিয়া রাখিয়া যায়, তাহার মধুরতা আমরা সারাজীবনের মধ্যে আর ভুলিতে পারি না। তাই নূতন প্রেমিকের আবেগ ও উপভোগ-স্পৃহা খোয়াইয়া প্রাচীন বয়সেও আমরা যখন কোন ভাল আর্টিষ্টের আঁকা প্রেমের আলেখ্য দেখি, তখন তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের প্রণয়-স্মৃতির শিখা আবার নূতন-করিয়া উস্কাইয়া দেয়,—তখন আমরা আবার প্রেমের স্বতন্ত্র বিশ্বে গিয়া পড়ি। এই দুর্লভ শক্তি আছে বলিয়াই প্রেমের কাব্য এবং প্রেমের চিত্র আমাদের সমগ্র জীবনে পুরাণো হইলেও "নিতুই নব" হইয়া থাকে!

কিন্তু অন্যদিকে, প্রেমের ভাবটা খুব সাধারণ বলিয়াই চিত্রকরদের কাজ শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা সাধারণ, সকলেই যাহা অনেকবার দেখিয়াছে, যাহার সমস্ত রস সকলেই ভোগ করিয়াছে, তাহাকে নূতন রূপে, নূতন রসে অপূর্ব্ব করিয়া নূতন ভাবে দেখানো বড় যে-সে শিল্পীর কাজ নয়! শিল্পজগতে প্রেম-চিত্রের যে বিশাল ভাণ্ডার আছে, তাহার মধ্যে গেলে দেখা যাইবে, এ ভাণ্ডারে রাবিশ আছে ঝুড়ী ঝুড়ী! কেবল যে শিল্পেই এই ব্যাপার, তাও নয়; সাহিত্যেও আমরা নিত্য যে



দোলনায়
(পি, এ, কটের আঁকা ছবি হইতে)



চুম্বন
(রোদাঁর গড়া মূর্ত্তি হইতে)

অগুন্তি প্রেমের 'কাব্যি' এবং গল্প পড়িয়া মরিতেছি, তাহাদের ভিতরেও আসলে কয়টি পড়িবার যোগ্য ?

কথা হইতেছে কি,—যাহা সাধারণ, তাহাকে আর্টের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা একপক্ষে যেমন সহজ, অন্যপক্ষে তেমনি কঠিন। আনাড়ি যাহাকে সোজা ভাবে, তাহাকে লইয়াই গুণীর ভাবনার অবধি থাকে না। হাল্‌কা প্রাণে যে প্রেমের ছবি আঁকিতে বসে, সে মনে করে, যুবক যুবতী, আলিঙ্গন আর চুম্বন দেখাইতে পারিলেই বুঝি প্রেমের ছবি আঁকা হইয়া গেল! এইজন্যই অধিকাংশ প্রেমের ছবি হয় কুৎসিত কাম-চিত্র হইয়া দাঁড়ায়, নয়

তাহা এতটা বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দিকে আর ফিরিয়া তাকাইতে সাধ যায় না। কিন্তু যাঁহারা পাকা পটুয়া, তাঁহারা এই বহু-ব্যবহৃত প্রেমকে, পাত্র-পাত্রীর চোখ মুখের ভিতর দিয়া এমন নূতন আকারে ফুটাইয়া তুলেন যে, পুরাতনকে তখন আর পুরাতন বলিয়াই মনে হইবে না।—নূতন ভাব ও নূতন ভঙ্গীর ইঙ্গিতে তাহার সাধারণত্ব তখন অসাধারণত্বে পরিণত হইয়া যাইবে। 'প্রেমের ছবি আঁকিবই' বলিয়া পণ করিয়া, বা সাধারণে প্রেমের ছবি ভালবাসে বলিয়া তাহাদের মন যোগাইবার জন্য, আঁকিতে বসিলে ত চলিবে না। আর্টিষ্টের মনের বীণায় প্রেমের যে নরম সুরটি বাজে, ছবির রঙ্গে-রঙ্গে তাঁহাকে সেই সুর সেই রাগিনীর আসল মাধুরীটুকু ফলাইয়া তুলিতে হইবে, আপনার প্রাণ-সায়রের রসমন্থন করিয়া তাঁহাকে চিত্রের রস যোগাইতে হইবে। আমরা যখন কোন ভাল ছবি দেখিয়া তারিফ্ করিয়া বলি 'বাঃ, এ ছবিখানির প্রাণ আছে!'—তখন বুঝিতে হইবে, এখানে যে প্রাণের কথা হইতেছে, তাহা ছবির প্রাণ নয়—তাহা চিত্রকরের প্রাণ! সকল চিত্রই তুচ্ছ হইয়া থাকিবে—চিত্রকরের আত্মপ্রাণের আভাসে যদি-না তাহারা জীবন্ত হইয়া উঠে! হেটো শিল্পীরা সে যাদু-মন্ত্রটি জানে না—যাহার গুণে অঙ্কিত বিষয়ের সঙ্গে অঙ্কনকারীর প্রাণের যোগসাধন হইয়া যায়; কারণ, তাহাদের মধ্যে ত সে অনুভূতি নাই! প্রেম-চিত্রে অনেকে যে অক্ষম, এই অনুভূতির অভাবও তাহার আর-একটি কারণ।

সমালোচকে বলেন, "Any momentary action is apt to be tiresome to the onlooker when passed into endless perpetuity." এখন, ছবিতে সচরাচর চুম্বন, আলিঙ্গন, হাসি ও অশ্রু প্রভৃতির দ্বারাই প্রেম-ভাব প্রকাশ করা হয়; অথচ এগুলি হচ্ছে 'momentary action' বা 'ক্ষণিক ক্রিয়া'। সুতরাং বাস্তব জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়াগুলি ললিতকলায় যদি চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়, তবে দু-চারদিন পরেই তাহারা আমাদের চক্ষুকে পীড়া দিতে সুরু করিবে। দীর্ঘ কাল দেখিতেছি, অথচ চিত্রলিখিত চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রভৃতিতে অরুচি ধরিয়া যায় নাই, এমন ছবি খুব কমই আছে; দু-চারজন ভাল শিল্পী ছাড়া বেশীরভাগ লোকই এদিকে কৃতকার্য্য হন নাই। অনেক চতুর শিল্পী এ-সব ফ্যাঁসাদ্ এড়াইয়া চলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন,—তাঁহারা পাত্র-পাত্রীর ভাব-ভঙ্গীর দ্বারাই প্রেমের আভাস দিয়াছেন। এই-সব নানান কারণের জন্যই বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ললিত কলায় প্রেমের ছবিই বেশী দেখা যায়, বটে, কিন্তু এই বাহুল্যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না; প্রেমের ভাল ছবি গুণ্‌তিতে বড়ই অল্প—কেননা, তেমন ছবি আঁকিতে হইলে যথার্থ প্রতিভা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সেকালের গৃহস্থালী

গৃহস্থালীর কথা বলিতে গেলে গৃহ ও গৃহিণী দুইয়েরই উল্লেখ প্রয়োজন। তবে গৃহের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে বলিয়া গৃহ হইতেই কথা আরম্ভ করা ভাল। ইহাতে প্রবন্ধের বনিয়াদ পাকা হউক না হউক, গৃহস্থগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভালরূপ বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে।

গৃহাদি

গরুড় পুরাণে দেখিতে পাই (বঙ্গবাসী-সংস্করণ, অধ্যায় ৪৬; শ্লোক ১৩-১৭) বাস্তুর সম্মুখে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্ব্বদিকে প্রবেশ-নির্গম-পথ, ঈশান কোণে পট্টবস্ত্র-যুক্ত গন্ধ-পুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডার, বায়ুকোণে গোশালা, পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈঋত কোণে সমিধ কুশ কাষ্ঠাদির গৃহ ও অস্ত্রশালা এবং দক্ষিণে মনোরম অতিথিশালা থাকিবে, এইরূপই ছিল গৃহের ব্যবস্থা। এই শেষোক্ত গৃহে শয্যা, আসন, পাদুকা, অগ্নি, দীপ ও যোগ্য ভৃত্য রাখা হইত। গৃহগুলির আশে পাশে যে ফাঁকা জায়গা পড়িয়া থাকিত, তাহা সজল কদলী বৃক্ষ (সজলৈঃ কদলী-গৃহৈঃ) ও পঞ্চবর্ণ কুসুম দ্বারা সুশোভিত করা হইত। বৃহৎ সংহিতা ও অগ্নিপুরাণে এই সকল গৃহের সংস্থান একই দিকে দেখানো হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে দেখিতে পাই (House Building & Sanitation in Ancient India—Journal of B & O Research Society, Vol II. Pt II. P. 145) পাকশালা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং শয়নঘর—দক্ষিণদিকে। অগ্নিপুরাণের মতে (১) অস্ত্রশালা (২) এবং বৃহৎ সংহিতার মতে তৈজসাদি রক্ষার ঘর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ভোজন-শালা পশ্চিমে, শয্যাগার—উত্তর-পশ্চিমে, ধনাগার—উত্তর দিকে, দেব-গৃহ—উত্তর-পূর্ব্বে এবং শ্রীগৃহ বা উত্তম-রূপে সজ্জিত বৈঠকখানা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত থাকিত। ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝার তালিকায় গোশালা, কাষ্ঠাদি-রক্ষার গৃহ, জলাগার প্রভৃতি কয়েকটি অতি-প্রয়োজনীয় গৃহের উল্লেখ নাই, তবে মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে একজন অবস্থাপন্ন আর্য্য গৃহস্থের আট-দশ-খানি ঘরের আবশ্যক হইত। বাস্তুভূমি কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা গোভিল গৃহ্য সূত্রে বর্ণিত আছে। ৪ প্রপাঠক; ৭ কাণ্ডিকা।

---

(১) মিলিন্দ প্রশ্নের প্রথমাংশে পুরাণাদির উল্লেখ আছে। Vincent Smith মহোদয়ের মতে এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৩০০ অব্দে রচিত। পুরাণাদি তৎপূর্ব্বে রচিত বলিয়াই বোধ হয়।

(২) অস্ত্রশালায় কি কি অস্ত্র সাধারণতঃ রক্ষিত হইত, তাহা অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়; যথা—কুঠার, কুদ্দাল, চক্র, ত্রিশূল, বর্শা, মুদ্গর, মুষল যন্ত্র প্রভৃতি ও আমাদিগের সেই সনাতন বংশ-যষ্টি! ভল্ল তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের নামও প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

বাস্তুমণ্ডল

গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত ভূমি সমতল ও তৃণাচ্ছাদিত হওয়া আবশ্যক। এরূপ উচ্চ হইবে যে বর্ষার জলপ্লাবনে কদাচ ডুবিয়া না যায়। বাস্তুর অবস্থান এরূপ হইবে যে জল পূর্ব্ব বা উত্তরদিক দিয়া বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। বাস্তুমণ্ডলের উপর কণ্টক গুল্ম, এবং শ্বেত রসস্রাবী বা কটু আস্বাদযুক্ত কোনও বৃক্ষাদি থাকিবে না। নিকটে বালুময় মরুভূমি বা জলাভূমি থাকা উচিত নয়। মৃত্তিকা একবর্ণ, ঘন-সংসক্ত (compact) এবং অনতিশুষ্ক হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা-যুক্ত স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবেন। যাহারা দেহে পবিত্রতার দীপ্তি কামনা করে, তাহারা দর্ভসংযুক্ত স্থানে বাস করিবে; যাহারা শক্তি কামনা করে তাহারা বাসের জন্য দীর্ঘ তৃণযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিবে, এবং যাহারা গৃহপালিত পশু-পক্ষীর প্রার্থনা করে, তাহারা কোমল তৃণ-সংযুক্ত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। গৃহের আকৃতি ইষ্টকের ন্যায় চতুষ্কোণ বা দ্বীপের ন্যায় বৃত্তাকার হইবে।

যাহারা যশঃ কামনা করে তাহারা পূর্ব্বদিকে গৃহদ্বার নির্ম্মাণ করিবে। যাহারা পুত্র-কন্যা ও গবাদি প্রার্থনা করে, তাহাদের গৃহ উত্তর-দ্বারী হইবে এবং যাহারা সকল প্রকার কাম্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহারা দক্ষিণদ্বারী গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। পশ্চিম দিকে গৃহদ্বার নির্ম্মাণ সেকালে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ একালেও চলিত দেখা যায়;—

"দক্ষিণমুখো ঘরের রাজা
পূর্ব্বদিক তার প্রজা।
পশ্চিম-মুখের মুখে ছাই
উত্তর-মুখের খাজনা নাই॥"

গৃহের নিকট বৃক্ষাদি থাকা যে অস্বাস্থ্য-জনক তাহা প্রাচীন কালেও অবিদিত ছিল না। গৃহের পূর্ব্বে অশ্বত্থ, দক্ষিণে প্লক্ষ, (পাকুড়), পশ্চিমে ন্যগ্রোধ এবং উত্তরে উদুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষাদি রোপণ অবিধেয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

প্রবেশ-নির্গম-পথ

গরুড় পুরাণের পূর্ব্বোল্লিখিত অংশে আরও দেখিতে পাই যে বাস্তুভিটার চতুর্দ্দিকে প্রাকার নির্ম্মিত হইত। এই প্রাকার ঊর্দ্ধে প্রায় পাঁচ হাত পরিমিত হওয়া উচিত এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। সাধারণতঃ গৃহের দুইটি করিয়া প্রবেশ-দ্বার থাকিত। সদরের গমনাগমনের পথ পূর্ব্বদিকে ও খিড়কির পথ দক্ষিণ দিকে। এই খিড়কির রাস্তা দিয়াই সকল প্রকার আবর্জ্জনা বাহিরে ফেলা হইত। যমের দক্ষিণ দ্বারের যেরূপ ভীতি কল্পনা এখনও লোক-সমাজে প্রচলিত দেখা তাহা যে সেকালের গৃহের দক্ষিণ দ্বারের অবস্থা-দৃষ্টে উদ্ভূত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

কাঠ-চেলাই ও অনাবশ্যক দ্রব্যাদি রাখার জন্য খিড়কির সন্নিহিত স্থানই ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক গৃহের সান্নিধ্যেই কূপ বা জলাশয়-খননের ব্যবস্থা

ছিল। কামসূত্রে লিখিত বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যে বাস্তু-মণ্ডলের বর্ণনা করিয়াছি, তাহা অবস্থাপন্ন দ্বিজাতিগণের বসতবাটীর আদর্শ চিত্র (model plan) বলিয়াই মনে হয়। বিভিন্ন জাতি বা পেশা অনুসারে আবাস-গৃহের আয়তনেরও তারতম্য লক্ষিত হইত। বৃহৎসংহিতায় দেখা যায় যে পাঁচখানি ঘর ও মধ্যে উঠান থাকিলেই চলিয়া যাইত।

প্রমোদ বা বিরাম-গৃহ

নাগরক (young gallants) এবং সৌখীন ও ধনী ব্যক্তিগণের আবাস-গৃহ অবশ্য বিভিন্ন-প্রথায় নির্ম্মিত হইত। এইরূপ প্রমোদ বা বিরাম-গৃহের বর্ণনাও আমরা বাৎস্যায়ন হইতে অবগত হই। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর ত থাকিতই তা ছাড়া দুইটি শয়নঘর থাকিত। শয়ন-ঘরের সজ্জাদিরও বর্ণনা আছে। (৩) পালঙ্কের উপর ধোপদোস্ত চাদর পাতা; দুইটি বালিশ, একটি পায়ের, অপরটি মাথার দিকে। মাথার নিকটে টেবিলের ন্যায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটি সামগ্রী থাকিত; তাহার উপর পুস্তক (৪), গন্ধ-দ্রব্য, পূজা-দ্রব্যাদি এবং একটি সৌগন্ধিক পুটিকায় সম্ভবতঃ লোধ্রচূর্ণাদি অঙ্গরাগের উপকরণ রক্ষিত হইত। পতদগ্রহ বা পিকদানীরও ব্যবহার ছিল; তাহা ছাড়া বসিবার টুল, চেয়ার প্রভৃতির ন্যায় কাষ্ঠাসনেরও যে ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণের যুগেও এইরূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ "পীঠ" সুবর্ণ হস্তিদন্তাদিতে খচিত হইয়া ব্যবহৃত হইত। (রাজকুমার বসুর রামায়ণ-কাহিনী; পৃ ৯০০) গৃহের দেওয়ালে বাদ্যযন্ত্রাদি (৫) টাঙ্গানো থাকিত। চিত্রফলক ও চিত্রকর্ম্মাদির উপযোগী তুলিকা রঙেরও ব্যবস্থা থাকিত। অন্তঃপুরিকাগণও যে চিত্রশিল্পের অনুশীলন করিতেন তাহা মালবিকাগ্নিমিত্র হইতে জানা যায়। জিনিষ-পত্র খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

(৩) বাহ্যে চ বাসগৃহে সুশ্লক্ষ্ণমুভয়োপধানং মধ্যে বিনতং শুক্লোত্তরচ্ছদং শয়নীয়ং স্যাৎ। প্রতি শয্যিকাচ। তস্য শিরোভাগে কুর্চ্চস্থানম্ বেদিকাচ। তত্র রাত্রিশেষমনুলেপনং মাল্যং সিক্থ করণ্ডকং (মোমের দ্বারা বিধৃত) সৌগন্ধিক-পুটিকা মাতুলুঙ্গত্বচস্তাম্বুলানি চ স্যুঃ। ভূমৌ পতদগ্রহ। নাগদন্তাব-সক্তা বীণা। চিত্রফলম্ বর্ত্তিকাসমুদ্গকঃ (চিত্রকর্ম্মোপযোগী তুলিকা রঙ প্রভৃতি) যঃ কশ্চিতপুস্তকঃ ...ভূমৌ বৃত্তাস্তরণং সমস্তকং (বসিবার চেয়ার প্রভৃতির ন্যায় কাঠাসন) ক্রীড়াশকুনিপঞ্জরাণি (ক্রীড়া পক্ষীর পিঞ্জরাদি...স্বাস্তীর্ণা পেত্থা দোলা বৃক্ষবাটিকায়াং সপ্রচ্ছায়া।

—কামসূত্র—মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ।

(৪) অগ্নিপুরাণে পুস্তক-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে বোধ হয় যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মোক্ষ কামী ব্যক্তিগণ অনেকেই পুস্তকাদি লেখাইয়া শাস্ত্রমতে তাহা প্রতিষ্ঠা করাইয়া রথে বা হস্তি-পৃষ্ঠে নগর-প্রদক্ষিণ করাইতেন। এই সকল পুস্তক দেবালয়ে বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করা হইত। মুদ্রাযন্ত্রের অবর্ত্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পুস্তকাদির অভাব এইরূপেই মোচন করার ব্যবস্থা ছিল। পুস্তকাদি লিখন-প্রসঙ্গে সুবর্ণময়ী লেখনী ও রৌপ্য মস্যাধারের উল্লেখ দেখা যায়।

(৫) সন্ধ্যার পর গীতবাদ্যাদি-প্রসঙ্গের কথা কামসূত্রেই লিখিত আছে।

রাখা হইত। বিছানার চাদর তিন দিন অন্তর বদলাইবার নিয়ম ছিল। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চিত্রশিল্পের সরঞ্জামটুকু বাদ দিলে আধুনিক কালের পল্লী-নিবাসী সৌখীন লোকের বৈঠকখানা হইতে সেকালের বৈঠকখানার বড়-বিশেষ তফাত ছিল না; কেবল বহিঃস্থিত রজ্জু-বিলম্বিত দোলনার উল্লেখে মনে পড়ে যে আধুনিক যুগের সাহসিকাগণ আর দোলনায় দোল খাওয়া অভ্যাস করেন না। তবে পল্লী-গ্রামের ইতর শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ-দিগকে এখনও মেলা প্রভৃতি উপলক্ষে নাগর-দোলায় চড়িয়া আমোদ করিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহ

সেকালের গৃহ বলিলেই যে পর্ণশালা বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। অবস্থা ও প্রয়োজন-ভেদে গৃহাদি প্রস্তর, ইষ্টক, অপক্ক ইষ্টক, কাষ্ঠ, বংশ ও বস্ত্র প্রভৃতিতে নির্ম্মিত হইত। প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ "মন্দির," ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ "বাস্তু" ও বস্ত্র-গৃহ "বিজয়" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। (J. B. O. R. S. Vol. II. Pt II. P. 140)

শৌচাদির ব্যবস্থা

খাদির গৃহ্য সূত্রে (৬) দেখা যায় যে আঁস্তাকুড় ও পাইখানাতেও "বলি" (৭) (Bali-offerings) দেওয়ার নিয়ম ছিল। (Khadira Grihya Sutra—Sacred Books of the East Series P. 38.) সুতরাং বাড়ীর নিকটে বা কিছুদূরে পাইখানাও যে থাকিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ রোগী, বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল ব্যক্তি-গণের জন্যই ইহার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে বল্মীক, শ্মশান, কর্ষিত ক্ষেত্র এবং গোচারণ মাঠে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদন-সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে মনে হয় লোকালয়ের সন্নিহিত জঙ্গল প্রভৃতিই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত।

প্রাতঃকৃত্য

গৃহস্থ ঊষাকালে শয্যাত্যাগ করিতেন;—যখন পূর্ব্বদিক সবে রাঙ্গাইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান নিষ্ঠাবান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সন্ধ্যা-আহ্নিকাদির সময় ও নিয়ম পূর্ব্ব হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং এ সম্বন্ধে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মনুসংহিতায় দেখা যায় যে শৌচাদি, স্না দন্তমার্জ্জন, চক্ষে অঞ্জন-প্রলেপ ও পূজাদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সারিয়া লইতে হইত।

(৬) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে সূত্রাদি খৃঃ পূঃ ছয় শতাব্দী হইতে দুই শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

(৭) "বলি" দেওয়ার প্রথা এখন আর বড় প্রচলিত নাই; কিন্তু নবান্নের সময় অদ্যাপি স্থানে স্থানে কাককে নবান্ন ছড়াইয়া "কাক বলি" দেওয়ার নিয়ম আছে। এ বলিও সেইরূপ ছিল। সেকালে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বলিপূজা দ্বারের চৌকাটের নিকট দেওয়া হইত। বরুণের উদ্দেশ্যে বলি জলপূর্ণ পাত্র বা কলসীর নিকট (উদধানে) দেওয়া হইত। এমন কি ছাদের উপর বিচরণকারী প্রেতাত্মারাও বাদ পড়িত না। (বিষ্ণুসংহিতা ৬৭ অধ্যায়)

বিষ্ণুসংহিতার মতে পূর্ব্বদিকে যখন ঊষার রক্তিম ছটা সূচিত হয়, সেই সময়েই স্নানাদি সারিয়া লওয়া কর্ত্তব্য (বিষ্ণু ৫৪, ৯)।

স্নানের জন্য স্রোতস্বিনী নদীর জলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার পর নির্ঝরের জল, তদভাবে পুষ্করিণী বা কূপের বদ্ধ জল। (বিষ্ণুসংহিতা ৫৪ অধ্যায় ১৪—১৭)। "গর্ত্ত" বা আট মাইলের কম লম্বা কোন স্বাভাবিক হ্রদে স্নানও অবিধেয় বলিয়া বিবেচিত হইত না।

করঞ্জ, খদির, কদম্ব, কুরব, সপ্তপর্ণী, বিল্ব, অপামার্গ উদুম্বর, মালতী প্রভৃতির কোমল শাখা দন্তকাষ্ঠের জন্য ব্যবহৃত হইত। দাঁতন এক বিঘতের অধিক লম্বা হইত না। পূর্ণিমা, প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে দাঁতন ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। (হারীত সংহিতা শ্লোক ৫,৬) পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া দাঁতন করিতে হইত। (বিষ্ণু সংহিতা chap. lxi)

প্রসাধন ও ক্ষৌরকর্ম্ম

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান, কেশাদি-মার্জ্জনা, শ্মশ্রু ও নখ সংস্কার সম্বন্ধে উপদেশ দেখিতে পাই (chap. I, 131)। হিরণ্যকেশীর গৃহ্যসূত্রে পাঠ-সমাপনান্তে ছাত্রের স্নান-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে অবগাহনের পূর্ব্বে স্নানের জন্য ব্যবহার্য্য চূর্ণ অঙ্গে মর্দ্দন করিবে এবং উদুম্বরের দন্ত কাষ্ঠের দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিবে। সুতরাং তৈলের পরিবর্ত্তে Shampooing powder শ্রেণীর কোনও চূর্ণ যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত তাহা বুঝা যায়। কামসূত্রে নিত্যস্নান, সুবাসিত তৈলমর্দ্দন, ফেনক বা তরল সাবানের ন্যায় কোনও দ্রব্যের দ্বারা প্রতি তৃতীয় দিনে অঙ্গের সন্ধিস্থল প্রভৃতি পরিষ্কার করা এবং সাত দিন অন্তর নখ ফেলা ক্ষৌরী হওয়া প্রভৃতি নিয়মের উল্লেখ আছে। হারীত সংহিতায় কিন্তু দেখিতে পাই, মাত্র মৃত্তিকায় অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া স্নানের ব্যবস্থা। বোধ হয় শেষোক্ত ব্যবস্থা নিষ্ঠাবান শাস্ত্রানু-ধ্যায়ী ব্রাহ্মণের জন্য; এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা নাগরক শ্রেণীর যুবকগণের জন্য (৮)। এইসঙ্গে এ কথা মনে রাখা উচিত যে সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামসূত্র কিছু একই সময়ে রচিত হয় নাই, সুতরাং বিভিন্ন যুগের আচার-ব্যবহার যে যথাযথ মিলিয়া যাইবে এমন ভরসা করা যায় না। হিরণ্যকেশীর গৃহ্যসূত্রে দেখা যায়, ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য উদুম্বর কাষ্ঠের ক্ষুর ব্যবহার করা হইত। এই গ্রন্থে ক্ষুর কুঠারের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম প্রশ্ন ও ৩য় পটলে মাথা মুড়াইবার ও দাড়ি কামাইবার সময় নাপিতের প্রতি যে উক্তিটি দেখা যায় তাহা বড়ই কৌতুক-প্রদ:—"হে ক্ষৌরকর্ম্মরত নরসুন্দর, তুমি আমার কেশ ও শ্মশ্রু তোমার ক্ষতজনক সুগঠিত অস্ত্রের দ্বারা কামাইয়া ফেল—দেখিও তাহাতে যেন আমার মুখের জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু প্রাণের হানি না ঘটে।" আনাড়ি ক্ষৌর-কারকে এরূপ অনুরোধ আজকালকার দিনেও যে মধ্যে মধ্যে না করিতে হয়

(৮) সংহিতাদি গ্রন্থে বর্ণিত গার্হস্থ্য চিত্র যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারে না, এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

এমন নহে। প্রথমে দাড়ি পরে বগল কামানো হইত। তাহার পর মস্তক মুণ্ডন করিয়া সর্ব্বশেষে নখ ফেলা হইত। সেকালে ক্ষৌরকর্ম্মের বোধ হয় এইরূপই বিধি ছিল। (Grihya-Sutra of Hiranyakesin' Ed. MaxM. P 164)

পরিচ্ছন্নতা

ভারতবর্ষের লোকেরা আদিকাল হইতেই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। হারীত সংহিতায় লিখিত আছে যে স্নানের পর অপরিচ্ছন্ন বা দুর্গন্ধ বস্ত্র কদাচ ধারণ করিবে না। কূর্ম্মপুরাণে দেখিতে পাই অপরিষ্কার বস্ত্র-পরিহিতা (মলদ্বাসসা) স্ত্রীলোকের হস্তে অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ইচ্ছামত অপর কেহ গ্রহণ করিলে যে নানারূপ সংক্রামক পীড়াদি জন্মিতে পারে তাহাও প্রাচীন কালে মনীষীগণের অবিদিত ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্যে রেশম ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে। (অধ্যায় ১ শ্লোক ১৮০) পশমী বা রেশমী কাপড়—কলার ক্ষার, মৃত্তিকা, গোমূত্র ও জল দিয়া কাচিয়া লওয়া হইত। অংশু পট্ট বিল্বফল-সহযোগে এবং কম্বলাদি—গোমূত্র ও জল দিয়া পরিষ্কৃত করিবার নিয়ম ছিল। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে মালিকের অনুমতি-ব্যতিরেকে বিছানা-তোষক যানাদি এমন কি পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। অপরের জুতা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। গঙ্গাজলের antithesis স্বরূপ কূপজল (কুবজল) এখনও পল্লীগ্রামে অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। (৯)

বেশভূষা

স্নানের পর পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিবার নিয়ম ছিল। স্ত্রীলোকেরা পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত একখানি উত্তরীয় বা ওড়না ব্যবহার করিতেন। তুলা (১০), রেশম, পশম প্রভৃতি ছাড়া তৃণ ও বল্কল দ্বারাও পরিধেয় রচিত হইত। আশ্রম ও সম্প্রদায়-ভেদে অজিনেরও ব্যবহার ছিল।

চিত্র-হরিণ, কৃষ্ণসার এবং ছাগ এই তিন প্রকার পশুচর্ম্ম ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। দীক্ষাগ্রহণ-কালে বর্ণানুসারে বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট ছিল। গোভিল গৃহ্য সূত্রে দেখা যায় (২ প্রপাঠক ১০ কাণ্ডিকা)

(৯) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও সেকালে বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল দেখিতে পাই। জলাশয়ে নিষ্ঠীবন-ত্যাগ এবং কূপে নামিয়া স্নানাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থে নিষেধ দেখা যায় (কূর্ম্মপুরাণ ১৭ অধ্যায়, বঙ্গবাসী-সংস্করণ)। রাজপথে, শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে ও চতুষ্পথ বা চৌমাথায় মলত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল উশনঃসংহিতা (১ম অধ্যায়)। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই পথে আবর্জ্জনাদি ফেলিলে এক পণের অষ্টমাংশ জরিমানা হইত। কাদা বা ময়লা জল জমাইয়া রাখিলে পণের চতুর্থাংশ এবং রাজপথে এইরূপ করিয়া গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মাইলে ইহার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হইত। জলাশয়ে তীর্থস্থানে বা রাজকীয় গৃহাদিতে মলত্যাগ করিলে এক পণ বা তদূর্দ্ধ জরিমানা হওয়ার নিয়ম ছিল। তবে ঔষধ-ব্যবহার নিবন্ধন বা রোগবশতঃ এরূপ ঘটিলে কোনও শাস্তি হইত না।

(১০) পরাশর সংহিতায় রেশম-বস্ত্রাদির উল্লেখ আছে। পাট, পশম, রেশম ও কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি জলে ধুইলেই শুদ্ধ হইত।

ব্রাহ্মণ-কুমারগণ কার্পাশ বস্ত্র, কৃষ্ণসার চর্ম্ম, মুঞ্জ তৃণের কটিবন্ধ এবং পর্ণ কাষ্ঠের দণ্ড বা যষ্টি ব্যবহার করিতেন; ক্ষত্রিয়-দিগকে "চিতাল" হরিণের চর্ম্ম, শণ-নির্ম্মিত বস্ত্র, কাশ-নির্ম্মিত কটিবন্ধ এবং বিল্ব কাষ্ঠের দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। বৈশ্যগণ যথাক্রমে ছাগচর্ম্ম, পশমনির্ম্মিত বস্ত্র, তাম্বলের কটিবন্ধ এবং অশ্বত্থের যষ্ঠি ব্যবহার করিতেন। ইহা ছাড়া আর্য্যদিগের মধ্যে চর্ম্ম এবং তৃণ (কুশ) নির্ম্মিত পাদুকার যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল। রামচন্দ্র ভরতকে কুশ-নির্ম্মিত পাদুকা দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু মহাশয়ের রামায়ণ-কাহিনীতে (পৃঃ ৮৯৬) কাচ-পাদুকার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বিলাতি উপকথা-বর্ণিত Cinderellaর "গ্লাস স্লিপারে"র কথাই আমাদের মনে পড়ে। (১১) নীল বা গাঢ় নীলবস্ত্র কাব্য-গ্রন্থাদিতে অভিসারিকাগণের প্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে স্নানের পর ব্যবহার করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল; তবে রাত্রি-বাসের জন্য বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এইরূপ নীল বস্ত্র ব্যবহার করা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রকারগণ নীলের উপর কেন এত বিরূপ ছিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আপস্তম্ব সংহিতায় ব্যবস্থা দেখিতে পাই (৬ অধ্যায় শ্লোক ১—১০) ব্রাহ্মণ জাতি নীল রঙের বস্ত্র ধারণ করিলে একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইবে। এমন কি অজ্ঞাতসারে নীল ক্ষেতের উপর দিয়া যাতায়াত করিলেও এইরূপ উপবাস করিবার বিধি আছে। পরাশর সংহিতায় নীল ক্ষেত্রে উৎপন্ন তণ্ডুলের অন্ন দ্বিজাতির ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১২)

বিদেশে বা গ্রামান্তরে যাইতে হইলে কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে যষ্টি বা বংশদণ্ড এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করার বিধি ছিল। (১৩) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার (১৪) এই উক্তি হইতে মনে হয় যে তখনও বোধ হয় পিত্তল

(১১) Arian (আরিয়ান) বলিয়াছেন ভারতবর্ষে শ্বেতচর্ম্মনির্ম্মিত বিনামার ব্যবহার ছিল। উড়িষ্যায় কাষ্ঠ জুতা অদ্যাপি নির্ম্মিত হয়—Sarkar's Positive Back-ground of Hindu Sociology p 26)

(১২) পুরাকালে "নীল মামদোর" অত্যাচার ছিল কি না জানি না; কিন্তু শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দেশে দেখিতে পাই যে ক্ষেত্রে নীল বপন করিলে বারো বৎসর সে ক্ষেত্র অশুদ্ধ থাকে। নীল আবাদে ভূমি বড়ই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এই কারণে কিম্বা পাছে নীলের আবাদ অধিক লাভজনক বলিয়া লোকে শস্যের আবাদে অযত্ন করে, এই উদ্দেশ্যে এই সকল বিধি গঠিত হইয়াছিল কি না তাহা বলা বড়ই কঠিন।

(১৩) পণ্ডিতবর শ্যাম শাস্ত্রী কয়েকটি প্রাচীন শব্দের অর্থের তারতম্য লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা অশোকের কালের পরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন।

(১৪) কুণ্ডল হিন্দুর কর্ণবেধ-সংস্কার-জ্ঞাপক বাহ্য চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এরূপ পদ ও অবস্থার পরিচায়ক অলঙ্কার, ভিন্ন স্থানে যাইবার সময় ব্যবহার করার প্রথাটি এক হিসাবে ভাল ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেকালে অপরিচিত স্থানে গমন করা বড় নিরাপদ ছিল না। এখন সন্দেহজনক ভাবে দ্রব্যাদি লইয়া গেলে বা লুক্কায়িত থাকিবার চেষ্টা করিলে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কলিকাতা

লোটার প্রচলন হয় নাই। অধীতযুদ্ধবিদ্যা ক্ষত্রকুমার কিরূপ বেশ-ভূষা করিত তাহা উত্তররামচরিত হইতে জানা যায়—

ভস্মস্তোম পবিত্র লাঞ্ছনমুরো
ধত্তে ত্বচং রৌরবীং
মৌর্য্যা মেখলয়া নিয়ন্ত্রিতমধোবাসশ্চ
মজ্জিষ্ঠিকম্
পাণৌ কার্ম্মুকমক্ষসূত্র বলয়ং দণ্ডং
তথা পৈপ্পলম্
(চতুর্থ অঙ্ক—শ্লোক ২০)

তূণীর দুইটি দুলিছে পৃষ্ঠে, লম্বিত শিখাগুচ্ছ।
করিছে পরশ শায়কগুলির কঙ্কপাতার পুচ্ছ॥
পূত লাঞ্ছনে চিহ্নিত হৃদি যাগের ভস্মপুঞ্জে।
রুরুর চর্ম্ম স্কন্ধে ফিরিছে আশ্রমবনকুঞ্জে॥
মৌর্ব্বী-মেখলা দৃঢ়নিবদ্ধ রাঙা অধোবাসখণ্ড।
করে শরাসন অক্ষমালিকা আর পিপ্পলদণ্ড॥
(শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়-কৃত অনুবাদ)

বিবস্ত্র হইয়া স্নান করা বা ঘুমানো (১৫) নিষিদ্ধ ছিল, এবং গৌতম সংহিতায় আরও দেখিতে পাই (chap IX) যে, দিবসে মস্তক আবৃত করিয়া বাহিরে যাওয়া উচিত নহে এবং রাত্রে অনাবৃত মস্তকে বহির্ভ্রমণ নিষিদ্ধ। দিবসে খালি মাথায় থাকিয়া "লঙ্গা শির" বাঙ্গালী যে রীতিমত শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতেছে, এ কথা মনে করিলে আমাদের আর দুঃখ-লজ্জা করিবার কারণ থাকে না।

রামায়ণে সীতার বিবাহকালীন পরিচ্ছদাদি-বর্ণনায় রেশম ও পশম-নির্ম্মিত বস্ত্রের এবং সলোম চর্ম্মাদির (Furs) উল্লেখ আছে। (Sarkar's Positive Background of Hindu Sociology. Page 260) প্রাচীনকালে পুরুষেও যথেষ্ট অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিতেন; কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার, বাহুতে কেয়ূর, মণিবন্ধে বলয়। পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের মধ্যে কুণ্ডল বীরবৌলীর এখনও চলন আছে, হারের বদলে নিষ্ক বা মুদ্রার মালার ব্যবহার এখনও চলিতেছে এবং মাড়োয়ারীগণ বাল-যুবা-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে অনেকেই হাতে সোনার "তাগা" ধারণ করিয়া থাকেন। গৃহ্যসূত্রে কণ্ঠীর ন্যায় আর একটি জিনিষের চলন দেখিতে পাই,—বদরী বা চন্দন কাষ্ঠের ক্ষুদ্র বর্ত্তুল ছিদ্র করিয়া ছিদ্রস্থলে সুবর্ণ সংবদ্ধ করিয়া গলদেশে ধারণ করা। (Grihya Sutra—Hiranyakeshi P.

পুলিশ আইনের ৫৪-ক ধারা বা কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে loitering charge-এ ধৃত করা হইয়া থাকে; সেকালেও সেইরূপ অজ্ঞাত-কুলশীল, আত্মগোপন-সচেষ্ট, সংহারক-যন্ত্রসহিত পথশ্রমে অতিশ্রান্ত বা অতি-নিদ্রালু ব্যক্তিকে শুধু নগররক্ষী নহে—যে-কেহ সন্দেহ হইলেই গ্রেপ্তার করিতে পারিত (অর্থশাস্ত্র ৩৬ অধ্যায় ১৪৪)। আরও দেখা যায় ঘা ও পুঁযস্রাবী ক্ষত-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে রাজপথে দেখিলে তাহাদিগকেও আটক করার নিয়ম ছিল। ইহাও কলিকাতা পুলিশ আইনের এপর একটি ধারার কতকটা অনুরূপ। (Sec. 70. Act IV of 1866)

(১৫) ইউরোপখণ্ডে এরূপ বিধি-নিষেধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। Charles Reade—ইউরোপের মধ্যযুগের চিত্রে Cloister and the Hearth গ্রন্থের নায়কের মুখে 'naked bed' পরম আরামের জিনিষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

166. Ed Maxmuller) শুক্রনীতিতে অপরের রত্নালঙ্কারাদি ব্যবহার "ছল" বা সামাজিক অপরাধ বলিয়া বর্ণিত আছে।

অঙ্গরাগ ও সুগন্ধি দ্রব্য

স্থগর নামক সুগন্ধি দ্রব্যের চূর্ণ (গোভিল ৪ প্রপা ২ কা), চন্দনকাষ্ঠের চূর্ণমিশ্রিত প্রলেপ এবং কুঙ্কুমাদি ব্যবহারের প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অঙ্গে কুঙ্কুম-চূর্ণ মর্দ্দন করা হইত। (মনু ৪র্থ অধ্যায় ১ ১শ্লোক) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও নিষেধ দেখা যায় না। মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায় ২৫০ শ্লোকে লিখিত আছে, অযাচিতভাবে কেহ শয্যাদ্রব্য, গৃহ, কুশ, সুগন্ধিদ্রব্য, জল ও ফুল প্রভৃতি দান করিলে কদাচ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। লোধ্রচূর্ণ বোধ হয় অনেকটা Face Powderএর কাজ করিত। "ফেনক" ও স্নানের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য চূর্ণের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চক্ষে অঞ্জনের ন্যায় ব্যবহারের জন্য গৃহ্য-সূত্রে হিমালয় হইতে আনীত ত্রিককুদ-লব্ধ প্রলেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (আপস্তম্ভ Ed. Max. M. P. 108)। ধূপ, সর্জ্জরস (ধুনা) প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। কেশবাসের জন্যও অগুরুর ধূপ ব্যবহৃত হইত।

তৈজসাদি

ধর্ম্মশাস্ত্রে অশুদ্ধি মোচন-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই (পরাশর-সংহিতা ষষ্ঠ অধ্যায় শ্লোক ২৪ ২৮) যে কাংস্য, রৌপ্য, লৌহ, সীসক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্রাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় ধাতব পাত্রের উল্লেখ নাই বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত সংহিতাদির মধ্যে ঐ গ্রন্থকেই প্রাচীনতম বলিয়া মনে করেন। অস্থি, শৃঙ্গ ও দন্ত (হস্তিদন্ত ?) নির্ম্মিত দ্রব্যাদির ব্যবহার ছিল এবং বংশ-নির্ম্মিত (চেটাই প্রভৃতি) দ্রব্য এবং মুঞ্জ বা বিঁড়েও (pitcher seats made of rush) ব্যবহৃত হইত। লৌহ-পাত্র একস্থান হইতে আর একস্থানে সরাইয়া রাখিলেই শুদ্ধ হইত। সীসক, স্বর্ণ, রৌপ্য, দন্ত, ও অস্থিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও মণিরত্ন প্রভৃতি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হইত। প্রস্তরময় পাত্রাদির সম্বন্ধেও এইরূপ বিধি ছিল। কাংস্য পাত্র কখনও বা ছাই দিয়া মাজিয়া কখনও বা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কখনও বা কিছুদিন মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইত। মোড়া চেটাই প্রভৃতি অশুদ্ধ হইলে জলে ধুইয়া লওয়া হইত। মৃৎপাত্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইত। পীঠী, বৃত্তাস্তরণ, সমস্তক প্রভৃতি কাষ্ঠাসনের ব্যবহার পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরাশর সংহিতায় খাটের উল্লেখ দেখা যায়। পশমনির্ম্মিত বালিস ব্যবহার করা হইত। (১৬) কম্বল প্রস্তুত করার জন্য গুজরাটের আভীদিগের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। সুতরাং কম্বলও শয্যাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। বিছানা রৌদ্রে দিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইত। লোহিত বা পীত বর্ণ আস্তরণাদি বোধ হয় রঙ উঠিয়া যাইবে বলিয়া "কাচা" হইত না, কেবল রৌদ্রে দেওয়া

(১৬) Vide B. Sarkar's Positive Background of Hindu Sociology p. 260.

হইত। রামায়ণে চর্ম্মাবৃত শয়নীয়েরও পরিচয় পাওয়া যায়। (১৭) অপরাপর গৃহস্থালীর দ্রব্যের মধ্যে চমস (milking vessel) কুলা, ঝুড়ি, চালন, সম্মার্জ্জনী, কুট্টক যন্ত্র, (ঢেঁকি ?) উদূখল, ঘরট্ট বা রোচনা (জাঁতা) ও অস্ত্রে শাণ দিবার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রে কোষ্ঠাগার-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাক্স প্রভৃতির এবং রামায়ণে "কাজ" বা ছাগচর্ম্মাবৃত পেটকের উল্লেখ আছে। (১৮) ধর্ম্মশাস্ত্রে যজ্ঞীয় পাত্রাদির মধ্যে শ্রুক, স্রুব, স্ফ্য, চমস, চরুস্থালী অজ্যস্থালী, মেক্ষণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। শ্রুক্=খদির বা পলাশাদি কাষ্ঠে নির্ম্মিত হাতার ন্যায় দ্রব্য; যজ্ঞাগ্নিতে হবি ঢালিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। স্রুবও একপ্রকার যজ্ঞীয় হাতা-বিশেষ। স্ফ্য একপ্রকার যজ্ঞীয় পাত্র; উহা বজ্রনামেও অভিহিত হইত। (Jajnavalkya chap. I. P. 31 Ed. M. N. Dutta), মেক্ষণ=ঘৃত রাখিবার পাত্র বিশেষ।

খাদ্যাদি ও পানীয়

মনুসংহিতা (৫ম অধ্যায়), যজ্ঞবল্ক্য ও কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিধি-নিষেধাদির উল্লেখ আছে। মৎস্যের মধ্যে পাঠীন অর্থাৎ বোয়ালি, রাজীব, সিংহাস্য (১৯ শকুল (শোল) এবং বৃহৎ শল্কযুক্ত মৎস্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের সময়ে যে শুষ্ক মৎস্যাদিও ভক্ষণ করা হইত তাহা অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়। সজারু, স্বর্ণগোধিকা, গণ্ডার, কচ্ছপ এবং খরগোশের মাংস গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল না। উষ্ট্রের মাংস মুসলমানগণের নিকট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। মনুসংহিতাতেও ইহা অখাদ্য বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। গৃহপালিত মুরগী, হংসাদির ন্যায় যুক্তপদবিশিষ্ট পক্ষী এবং কপোত পারাবত টিট্টিভ প্রভৃতি ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু ময়ূর তিত্তির কপিঞ্জল (চাতক) প্রভৃতির মাংস খাদ্য আহার বলিয়া বিবেচিত হইত না (কূর্ম্ম পুরাণ ১৭ অধ্যায়)। শাক-সব্জীর মধ্যে

(১৭) রাম উৎকৃষ্ট-চর্ম্মরূপ শয্যাস্তরণ ব্যবহার করিতেন ("অজিনোত্তর সংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে")।

অযোধ্যা—৮০—৬

রাবণের বিলাস-গৃহে রাম অবিক-চর্ম্মে আবৃত মনোহর শয্যা দর্শন করিয়াছিলেন।

(পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিন সংবৃতম্)

সুন্দরকাণ্ড—১০—৬

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ রচিত প্রবন্ধ, সাহিত্য—বৈশাখ ১৩২৩। মহাভারতের যজ্ঞপর্ব্বেও বহুবিধ চর্ম্মের উল্লেখ আছে। এই সকল চর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে উপহার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল।

(১৮) বেদান্ততীর্থ মহাশয় অযোধ্যাকাণ্ড ৫৫।১৭ শ্লোকে বর্ণিত "কঠিন কাজে"র যে অর্থ করিয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। তবে উহা আধুনিক ছোট suit-caseএর মত কিছু হওয়াই সম্ভব। কারণ Hand-bagএর পার্শ্বদেশ সাধারণতঃ নমনীয় (fhnible) দেখা যায়।

(১৯) কেহ কেহ বলেন শকুল ও সিংহাস্য একই জাতীয় মৎস্য। আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র (Patala Sec. 3 Ed, Maxm.)

বার্ত্তাকু, কদলী, লাউ (অলাবু), কুমড়া, শীম, ওল, কাঁকুর, পালং শাক, দমনক (দোনা-artemisia Indica), আলুক, মূলক, রাজমাষ (বর্ব্বট), পিণ্ডমূল (গর্জ্জর), তণ্ডুলীয় (নটেশাক), কালশাক, স্বয়ংগুপ্তা (কচু) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, কশেরুক (কেশুর), শৃঙ্গাটক (পানিফল) প্রভৃতি সুখাদ্য ফল-মূল শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে দান করা হইত। মাতুলুঙ্গ (বাতাবিলেবু), পিয়াজ, লশুন, শালগম, পাতালফোড় (mushroom or truffles) প্রভৃতির আবাদের সময় বিষ্ঠা সাররূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া এগুলি নিষিদ্ধ খাদ্যের পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল। (২০) ধর্ম্মশাস্ত্রে গলদা চিংড়ি প্রভৃতির ব্যবহারের উপযোগী বলিয়াই বিধান দেওয়া হইয়াছে। (যাজ্ঞবল্ক্য Chap. I. Ed. M. N. Dutta) মৃগ, মেষ ও ছাগ মাংস ভক্ষণ হয় কোন কালেই নিষিদ্ধ ছিল না। কৃষ্ণসার বা সাদা বুড়া খাসীর মাংসেও (২১) সেকালের লোকের বিশেষ আপত্তি ছিল না। গৃহ্য সূত্রের যুগে বিবাহাদি উৎসবে গোমাংস আহারেরও উল্লেখ দেখা যায়। (আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র Patala I, Sec. 3. Ed. Max M.) অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে লাজা (খই) শক্তু (ছাতু) শষ্কুলী (২২) কৃসর (তিল ও তণ্ডুলে প্রস্তুত অন্ন) পুরোডাশ (রুটির ন্যায় যজ্ঞীয় খাদ্য) সংযাব (গোধূম চূর্ণ, গুড়, দুগ্ধ ও ঘৃত-সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য) পায়সান্ন পূরিক, অপূপ (বড়ার ন্যায় খাদ্য) পিষ্টক এবং তিলচূর্ণ ও শর্করা মিশ্রিত মোদকাদির উল্লেখ দেখা যায়। ভর্জ্জিত যব দধির সহিত গ্রহণ করা হইত। (Gobhila Ed. MaxM. P. 78) (২৩) দধি ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধির সহিত ব্যবহার করা হইত। যবমণ্ড বা যবাগু ও তক্র (ঘোল) প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল। মৃচ্ছকটিক অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ কবি ভাস প্রণীত চারুদত্ত নাটকের প্রারম্ভে দেখিতে পাই "কি 'প্রাতরাশ' আছে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে ঘৃত দধি তণ্ডুল প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছে। (খিদং গুলং দহিং তণ্ডুলা অ অথি) সম্ভবতঃ এই সকল দ্রব্যাদির সহযোগে সে সময়ে "প্রাতরাশ" প্রস্তুত হইত। আমলক যেরূপ গায়ে মাখার নিয়ম ছিল সেইরূপ অন্নমণ্ড প্রভৃতির সহিতও গ্রহণ করা হইত, কি কি দ্রব্য ভিক্ষা স্বরূপ প্রদত্ত হইত (২৪) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহারও পরিচয় পাই।

(২০) লশুনং গৃঞ্জনং চৈব পলাণ্ডু কবকানিচ (মনু, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৫)

(২১) ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে মনুসংহিতা খৃঃ পূঃ সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত; Schlegelএর মতে খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে এবং Sir Wm. Jones এর মতে খৃঃ পূঃ ১২৮০ অব্দে রচিত। Wilson কিন্তু ইঁহাদের মত গ্রহণ না করিয়া মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রের রচনা-কাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া মনে করেন।

(২২) শষ্কুলী—ভিতরে পুর-দেওয়া কচুরী প্রভৃতির ন্যায় খাদ্যদ্রব্য।

(২৩) ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্। নাগকেশরসংযুক্তং চতুর্জাতকমুচ্যতে ॥

(২৪) মুগের সহিতও আমলক ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের "নমুদ্গৈরামলকৈর্বিনা" প্রভৃতি বচনে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

ভৈক্ষ্যং যবাগু, তক্রং পয়ঃ বা যাবকমেবচ
ফলমূলং বিপক্কং বা পিণ্যাকং (২৫)
শক্তিতোঽপি বা ॥
(শ্লোক, ১৬)

একপ্রস্থ পরিমাণ অন্ন একচতুর্থ প্রস্থ সূপ এবং সূপের একচতুর্থ পরিমাণ তৈল ও ঘৃত আর্য্য পুরুষগণের আহারের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। [এক কুড়ুম্বের চারিগুণ এক প্রস্থ, আর এক প্রস্থের চারিগুণ এক আঢ়ক। এক আঢ়ক প্রায় ২৫ পাঁইট বা আন্দাজ ৫২½ আউন্স (Avoirdupois) হইবে। J. R. A. S. April 1915 p. 227]

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদির একচতুর্থাংশ কম করিয়া লইলেই স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত আহার বলিয়া অনুমিত হইত। স্ত্রীলোকদিগের আহারের অর্দ্ধাংশ বালক বালিকাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। "অবর" বা নিম্নজাতীয় পুরুষগণের জন্য আর্য্য পুরুষগণের ন্যায় সমপরিমাণ সূপ এবং সূপের অর্দ্ধ পরিমাণ তৈলমাত্র নির্দ্ধারিত ছিল। বিশ পল পরিমাণ মাংস পাক করিতে হইলে অর্দ্ধ কুড়ুম্ব তৈল, একপল লবণ, একপল শর্করা, অর্দ্ধপ্রস্থ দধি এবং দুই ধারণ ঝাল-মশলাদি ব্যবহার করা হইত। (২৬) শাকাদি (শাকসব্জী ও শুষ্ক মৎস্য) একত্রে পাক করিতে হইলে ইহার দেড়গুণ এবং শুধু শুষ্ক মৎস্য পাক করিতে হইলে ইহার দুইগুণ তৈল-মশলা ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্য-পানাদি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ থাকিলেও কৌটিল্যের যুগে—খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে—(২৭) যে উহা প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থশাস্ত্রে (২য় অধ্যায়, ২৫, ২৬; এবং চতুর্থ অধ্যায় ১৩) ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সুরাপান ও মাংসাহারের উল্লেখ আছে। সম্বর্ত্ত সংহিতায় গৌড়ী পৈষ্টী ও মাধ্বী এই তিন প্রকার সুরার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই তিনেরই ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। (শ্লোক, ১১৫) নিষিদ্ধ সুরা পান করিলে উত্তপ্ত সুরা পান করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। রামায়ণে মৈরেয় সুরার উল্লেখ আছে। (২৮) কৌটিল্য মৈরেয় ব্যতীত, মেদক, প্রসন্ন, আসব ও মধু প্রভৃতি সুরার তালিকা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "পাষাণের কথা" গ্রন্থে পুরাকালে নাগরিকগণের 'কাদম্ব'-প্রীতির বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষ চরিতে কাদম্ব সুরার উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের ২৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে কোন বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম্ম-উপলক্ষে (কৃত্যেষু) ব্যক্তিবিশেষ বা কোনও পরিবার বা গোষ্ঠীকে শ্বেত সুরা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। ব্যায়াম-পীড়ার জন্য অরিষ্ট বা কবিরাজী আসবাদি প্রস্তুত করা সম্বন্ধে তাৎকালীন আবকারী বিভাগের কোনও নিষেধ ছিল বলিয়া দেখা যায় না। মেলা (সমাজ) ও পর্ব্বোপলক্ষে চার দিনের জন্য মদ্য প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। সুরাপান অল্পাধিক প্রচলিত থাকিলেও আমাদিগের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জলই যে সাধারণতঃ পান করা হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কলস প্রভৃতি পাত্রের মুখে বস্ত্র দিয়া তন্মধ্যে জল উঠাইয়া সেই জল পান করা হইত ("বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ch. xv sl 6)। উৎপল, পাটলি প্রভৃতি ফুলের দ্বারা পানীয় জল সুবাসিত করা হইত। আধুনিক কালেও কেতকী (কেয়া) ও কনকচাঁপা বা মুচকুন্দ ফুল (Pterospermum acerifolium) প্রভৃতির দ্বারা পানীয় জল সুগন্ধি করিয়া লওয়া হয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শ্রীগুরুদাস সরকার।

(২৫) পিণ্যাকং=তিলকল্কং

(২৬) Shama Sastry's ArthaSastra p. 116, 117.

(২৭) অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বকালে লিখিত। মনু ও পরাশর এ উভয়েরই ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২৮) মধু—দ্রাক্ষা হইতে এবং আসব কপিত্থ (কৎবেল) ও শর্করা-সহযোগে প্রস্তুত হইত। মৈরেয় সুরায় গুড়, ত্রিফলা ও মেষ-শৃঙ্গী প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহৃত হইত। (অর্থশাস্ত্র ২৫ অধ্যায়)

দাঁতের ব্যথা

(রুশ-লেখক আন্তন শেখভ হইতে)

দাঁতের ব্যথায় কর্ত্তা বেজায় কাবু এবং কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন! দাঁতের গোড়ায় তিনি চুরুটের ছাই গুঁজিয়াছেন, আফিমের তেত রস মাখাইয়াছেন, এমন-কি টার্পেনটাইন ও কেরোসিন তেল ঢালিতেও কিছুমাত্র কসুর করেন নাই; কিন্তু হা হতোঽস্মি! এ-সব চিকিৎসায় তাঁর উপকার ত হইতেছেই না—বরং অপকার হইতেছে বেশী! গিন্নী হইতে সুরু করিয়া আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে ও চাকর-বাকর যে যেখানে ছিল, সবাই একটা-না-একটা 'অব্যর্থ' টাট্‌কা টোটকার ব্যবস্থা দিয়াছে—কিন্তু দাঁতের গোড়া যে-কে সেই! কর্ত্তার মুখ ক্রমেই ফুলিয়া ঢোল হইবার গতিক আর-কি!

শেষটা কর্ত্তার পেয়ারের চাকর হরি আসিয়া যোড়হাতে বলিল, "হুজুর! আমার সন্ধানে একটি গুণী লোক আছে, দাঁতের ব্যথা সারাতে সে ওস্তাদ। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে সে খালি একটু থুথু ফেলবে আর আপনার ব্যথা বিলকুল সেরে যাবে!"

—"কোথায় থাকে সে?"

—"আমার দেশের কাছে। দাঁতের চিকিচ্ছে করেই তারা সাতপুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে-বসে খেয়ে আসচে! দূরদেশ থেকে যে-সব রোগী তাকে ডাকে, বাড়ীতে বসে-বসেই সে তাদের রোগ আরাম করে দেয়!"

—"বাড়ীতে বসে-বসেই?"

—"হ্যাঁ হুজুর, বাড়ীতে বসে-বসেই!

চিঠিতে সে অব্যর্থ ফুস্‌মন্ত্র ঝাড়ে কিনা! আপনি তাকেই চিঠি লিখুন!"

—"তোর মাথা আর মুণ্ডু! বেটা গাঁজাখোর!"

—"হুজুর, পেত্যয় না হয় একবার পরখ করেই দেখুন না কেন! এ যে-সে মন্ত্র নয়—একেবারে অব্যর্থ ফুস্‌মন্ত্র!"

'অব্যর্থ ফুস্‌মন্ত্রে'র কথা শুনিয়া গিন্নী গলিয়া গিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একবার দেখতে দোষটা কি? কিসে কী হয়,কে বলতে পারে!"

দাঁতের গোড়াটা আবার কট্‌কট্ করিয়া উঠিল। সেই কট্‌কটানি সুরু হইবামাত্র কর্ত্তার যত আপত্তি, যত অবিশ্বাস, সমস্তই কর্পূরের মত উবিয়া গেল! দায়ে-পড়িয়া বাগ্ মানিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "আচ্ছা, রাজি! নিয়ে আয় কাগজ—নিয়ে আয় কলম! উঃ! গেলুম যে—আর পারিনা! ভূত-প্রেত দানা-দৈত্য—কে তোর দেশে আছে? বল্ তার নাম! তাকেই আমি চিঠি লিখব!"

—কর্ত্তা কাগজের উপরে একেবারে কলম বাগাইয়া বসিলেন।

হরি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তার নাম কাক-পক্ষী কে না জানে? তার নাম—তার নাম—"

—"তার নাম কি?"

—"তার নাম—তার নাম—শ্রীযুক্ত বাবু—তার নাম! কি মুস্কিল! নামটা মনে আসচে না যে! একটু সবুর করুন—এখনি বলচি!" হরি শিবনেত্র হইয়া কড়ি-কাঠের দিকে তাকাইয়া নাম ভাবিতে লাগিল; কর্ত্তা আর গিন্নী হাঁ-করিয়া ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—"কি রে, মনে হোল? ভাল করে ভাব্।"

"একটু সবুর করুন! তার নাম—তার নাম, কি মুস্কিল! মনে পড়চে না যে! বনমালী? উঁহু! বনমালী নয়! কেদার? না কেদারও নয়!"

—"তবে?"

—"একটু সবুর করুন। তার নাম—ওর-নাম-কি—তার নাম—হুঁ, হয়েচে, হয়েচে!"

—"কি, কি, বলে ফ্যাল্ বাবা, বলে ফ্যাল্!"

—"কি জানেন হুজুর, তার নামের সঙ্গে ঘোড়ার মতন একটা নামও আছে!"

—"ঘোড়ার মতন নাম—অশ্বিনী বুঝি?"

—"উঁহু, গর্দ্দভ মানে কি কর্ত্তা!"

—"গর্দ্দভ মানে তুই! বেটা মুখ্যু! কোথায় ঘোড়া আর কোথায় গাধা!—সে ত, অশ্বিনীকুমার নয় ত!"

—"উঁহু!"

—"অশ্বসেন, অশ্বেন্দ্র, অশ্বভূষণ?"

—"উঁহু!"

—"তবে কি?"

—"একটু সবুর করুন! ঘোড়া—ঘোড়া—ঘোড়া, হুঁ, তার নামে যে আর মতন নাম আছে!

—"অশ্বত্থামা?"

—"উঁহু!"

—"তবে আমি চিঠি লিখব কার? ভাল করে ভাব্—ভাল করে ভাব্!"

—"একটু সবুর করুন। ঘোড়া—ঘোড়া—ওর-নাম-কি—ঘোড়া—"

গিন্নী বলিলেন, "অশ্বমেধ?"

—"উঁহু!"

গিন্নী গালে হাত দিয়া আরো-খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "অশ্বগন্ধা নয় ত!"

—"উঁহু! নামটা আমি ভুলে গেছি!"

কর্ত্তা চটিয়া লাল হইয়া বলিলেন, "নামই যখন জানিস্ না, তখন চালাকি করতে এসেচিস্ কেন? বেরো এখান থেকে!"

হরি ভাবিতে-ভাবিতে আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া গেল।

কর্ত্তা ফুলো গালে ফেট্টি বাঁধিয়া চারি দিকে ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মত দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন;—"ওঃ! ওঃ! বাপ্‌রে বাপ্! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না গিন্নী, কিছু দেখতে পাচ্ছি না!"

গিন্নী বাগানে বসিয়া আকাশ-পানে মুখ তুলিয়া নাম ভাবিতেছিল, এমনসময় কর্ত্তা তাহাকে তলব করিলেন। হরি ঘোড়ার কর্ত্তা কাত্‌রাইতে-কাত্‌রাইতে "ওরে বাবা হরিনাথ, নামটা মনে পড়ল কি রে বাবা?"

—একটু সবুর করুন কর্ত্তা!"

—তার নাম কি অশ্বতর? অশ্বত্থ? না ও কিছু? অশ্বপাল?"

—"উঁহু!"

কর্ত্তা আরো-বেশী দমিয়া গিয়া গালের উপর আর এক ফের্‌তা ফ্লানেল জড়াইলেন।

বাড়ীর সবাই মিলিয়া নাম ভাবিতে লাগিয়া গেল। গালে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কর্ত্তা, তাঁর পাশে বসিয়া গিন্নী, পান সাজিতে-সাজিতে দাসী, রাঁধিতে-রাঁধিতে বামুনঠাকুর, ফুলগাছে জল দিতে-দিতে মালী,—সকলেই ভাবিতেছে ঘোড়ার নাম! কর্ত্তা বলিয়াছিলেন, যে আসল নামটি বলিতে পারিবে সে দশ টাকা বখশীস্ পাইবে!

খোকাবাবুর বড় সাধ একটি কাঠের ঘোড়া ও ঘুড়ি-লাটাই কেনেন; এই সুযোগে যদি সেগুলি কেনা হইয়া যায়, তাই ভাবিয়া তিনিও হরির কাছে গিয়া বলিলেন, "তার নাম কি ঘোড়সওয়ার? অশ্বারোহী? ঘোড়ার গাড়ী?"... ... ...

সন্ধ্যা হইল। কিন্তু আসল নাম কাহারও মনে পড়িল না—সুতরাং চিঠিও পাঠানো হইল না। কর্ত্তা বিছানায় পড়িয়া কাটা পাঁঠার মত ছট্‌ফট্ করিতে-করিতেই সারারাত কাটাইয়া দিলেন,—ঘুম যেন সে তল্লাট ছাড়িয়া চম্পট দিয়াছে! সকাল হইতে-না-হইতে তিনি চাকরদের ঘরে গিয়া হাজির হইয়া বলিলেন, "ওরে হরে! তার নাম কি তুরগ?—নয়? তুরঙ্গ—তুরঙ্গম—হয়—টাট্টু—পক্ষীরাজ? তাও নয়?"

—"উঁহু!"—বলিয়া কাঁচুমাচু মুখে হরি ফোঁশ্-করিয়া একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

—"তবে বোধহয় ঘোড়ার নামের সঙ্গে এ নামের কোন সম্পর্ক নেই!"

—"আছে কর্ত্তা, আছে! আমার বেশ মনে পড়চে তার নামে ঘোড়ার নামের মত একটা কিছু আছেই-আছে! সেইটে মনে পড়লেই তার নামটাও মনে পড়বে!"

—"বাবা হরি, ভাব্ রে বাবা, ভাল করে ভাব্! বাপ্‌রে বাপ্—প্রাণ যে যায়!"... ... ...

পরদিন প্রভাতেও যখন নাম বাহির হইল না, কর্ত্তা তখন বে-কায়দায় পড়িয়া মরিয়া হইয়া বলিলেন, "যা থাকে কপালে, এ দাঁত আমি তুলিয়ে ফেলব। দাঁত বাঁচাতে গিয়ে শেষটা কি প্রাণটা খুইয়ে বস্‌ব? দূর হোক, কাজ নেই এমন হতচ্ছাড়া দাঁতে!"

তখনি ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি সাঁড়াশি দিয়া অম্লানবদনে পট্‌-পট্‌ করিয়া দু-দুটো দাঁত গোড়াসুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলেন। দাঁত তুলাইয়া কর্ত্তাও কিছু ঠাণ্ডা হইলেন।

ডাক্তার ভিজিট লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

সদর দরজা যুড়িয়া দাঁড়াইয়া হরি আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বলিতেছিল—"ঘোড়া—ঘোড়া—ওর-নাম-কি, ঘোড়ার মতন নাম—"

পিছন হইতে ডাক্তার হরিকে দুচারবার ডাকিলেন, কিন্তু ভাবনাবিভোর হরি সাড়া-শব্দ কিছুই দিল না।

আস্তে-আস্তে তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বিরক্ত স্বরে ডাক্তার বলিলেন, "কে হে বাপু তুমি? ঘটোৎকচের মত পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সরে দাঁড়াও!"

হরি বিদ্যুতের মত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বল্লেন—কি বল্লেন—ঘটোৎকচ? ঘট—ঘট—ঘোটক—ওর-নাম-কি ঘোটক! অ্যাঁ!—হয়েচে, হয়েচে!" বলিতে-বলিতে সে প্রাণপণে বাড়ীর ভিতরে ছুটিল।

অবাক ডাক্তার একেবারে থ!

কর্ত্তার সুমুখে গিয়া হরি হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আহ্লাদে-আটখানা হইয়া বলিল, "হয়েচে হুজুর, তার নাম মনে হয়েচে! ঘনরাম ঘটক—তার নাম ঘনরাম্‌ ঘটক!"

কর্ত্তা ঘুসি পাকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া গজ্‌রাইয়া উঠিলেন, "বেটা ঢেঁকি-অবতার! তোর ঘোড়ার মত নামের নিকুচি করেচে! সে নাম আমি জানতে চাইনা—আমার সামনে থেকে তুই দূর হ পাড়াগেঁয়ে ভূত, দূর হ!"

শ্রীমতী রেণু রায়।

"সুপ্তিতে ফিরিয়া এল জাগরণ"

আজি আকাশের চোখে পড়িল পলক,
সহসা নিভিল তাই প্রখর আলোক!
নয়ন পল্লব ছায়া ছেয়ে দিল ধীরে,
ঘন নীল নীলিমায় শ্যাম ধরণীরে!
চির জাগ্রতের এল তন্দ্রার আবেশ,
পবন নিস্পন্দ হয়, কাকলি নিঃশেষ,
অরণ্যে স্তম্ভিত তরু, নিঃশব্দে ত্বরায়
আঁধারের যবনিকা নামিল ধরায়!

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চেতনা সঞ্চার,
আকাশ চমকি আখি খুলিল আবার
উদ্দীপ্ত প্রভায় দিল দিগন্ত ঝলসি;
আঁধারের যবনিকা পড়ে গেল খসি!
ঊর্দ্ধশ্বাস পবনের নিশ্বাস-আবেগে
অরণ্য উদ্যত শাখা দ্রুত ওঠে জেগে,
ভগ্ন নীড় ফেলে পাখী চলিল উড়িয়া
দূর দুরাশার গানে ভুবন ভরিয়া।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গান

(বাউলের সুর)

এই ত ভালো লেগেছিল
আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া—
এই ত আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোট মেয়ে ধূলায় বসে
খেলার ডালি একলা সাজায়।
সাম্‌নে চেয়ে এই যা দেখি
চোখে আমার বীণা বাজায়।

দূরে যাবার খেয়াল হলে
সবাই মোরে ঘিরে থামায়।
গাঁয়ের আকাশ, সজ্‌নে ফুলের
হাত-ছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায় নি ভাই কাছের সুধা
লাগ্‌ল না তাই দূরের ক্ষুধা,
এই যে এ সব ছোটোখাটো
পাইনি এদের কূল কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা
আজো আমার হয় নি সারা।

আমার এ যে বাঁশের বাঁশি,
মাঠের সুরে আমার সাধন।
মনকে আমার বেঁধেছে রে
এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা
পান করেছে নূতন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া
নিয়েছি মোর দু চোখ পূরে।
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি
ওদের কচি গলার সুরে।

"লাগ্‌লো ভালো মন ভুলালো"
এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই,
দিনে রাতে সময় কোথা
কাজের কথা তাই ত এড়াই।
মজেছে মন, মজ্‌ল আঁখি,
মিথ্যা আমায় ডাকাডাকি,
ওদের আছে অনেক আশা
করুক্‌ ওরা অনেক জড়,
আমি যেন গেয়ে বেড়াই,
চাইনে হতে আরো বড়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসকাবারী

বৈষ্ণব কবিতা ও "রূপান্তর"-বাদ

কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বৈষ্ণব-কবিতার রসমাধুর্য্য তাঁহার 'বাংলার গীতি কবিতা' শীর্ষক অভিভাষণ প্রবন্ধে যে ভাবে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা কাব্য-রসজ্ঞমাত্রেরই উপভোগ্য হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্মগত লীলাতত্ত্ব ও তাহার রচনার বাহ্য সৌষ্ঠব সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে বহুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথই তাঁহার "আলোচনা" ও "সমালোচনা" প্রভৃতি পুস্তকে যথেষ্ট গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব কবিতার বহুল প্রচারের জন্য তিনি ও তাঁহার বন্ধু ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'পদরত্নাবলী' নাম দিয়া এক চয়ন-পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। এ কথার এইজন্য অবতারণা করিতেছি যে, রবীন্দ্রনাথের সেই সকল আলোচনার সহিত কবি চিত্তরঞ্জনের এই রসপূর্ণ আলোচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধিকা সম্বন্ধে যে সকল তুলনামূলক আলোচনা রবিবাবু করিয়াছিলেন, চিত্তবাবুও তাঁহার নিজের ভাবে ও ভাষায় তদনুরূপ আলোচনাই উপস্থিত করিয়াছেন। চিত্তবাবু সম্ভবতঃ রবিবাবুর সেই বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত আলোচনাগুলি পড়েন নাই, কারণ তাঁর লেখায় যে আবেগ, যে রস-তন্ময়তা প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারি অন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু তিনি যদি পাঠ করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারি হৃদয়ের প্রতিধ্বনি অন্যত্র দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব রসলীলাতত্ত্বের অনেক রকমের ব্যাখ্যা আছে; চিত্তবাবুর 'রূপান্তর'-বাদের ব্যাখ্যা তাঁহার স্বকীয় হইলেও তাহাকে খাঁটি বৈষ্ণব ব্যাখ্যা বলা যায় কিনা সন্দেহ। তবু এ ব্যাখ্যা নূতন বলিয়াই ইহাকে গ্রহণে কোন বাধা নাই; কারণ বৈষ্ণব কবিতা যদি রূপক হয়, তবে যিনি যেভাবে খুসী তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু ঐ রূপক বলিয়াই বৈষ্ণব কবিতাকে গীতি কবিতার শ্রেষ্ঠরূপ বলিতে আপত্তি হয়। প্রাণ এবং গানের মাঝখানে রূপকের আবরণটা একটা মস্ত ব্যবধানের মত দাঁড়ায়। অবশ্য চণ্ডীদাসের কাছে সে ব্যবধান অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিনের তিরস্করণীর মত থাকিলেও তাঁহার প্রাণে গানে অভেদ হইয়াছে। তবু বৈষ্ণবদের conventional পূর্ব্বরাগ, বিরহ, মাথুর, খণ্ডিতা, মান ইত্যাদি কোটা-গুলির কোটরে তাঁর গানগুলি পড়ায় গানের ভিতর হইতে চণ্ডীদাসের [illegible] বা কবি-মানস এবং তাঁহার কবিজীবনের evolution বা বিবর্ত্ত-বিলাস সম্পূর্ণ ভাবে সমগ্রভাবে দেখিবার উপায় নাই। শেলকে বা ব্রাউনিংকে যেমন স্তরে স্তরে অথচ সমগ্রভাবে দেখা যায়, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাস, কোন পদকর্ত্তাকেই সেভাবে দেখা যায় না।

তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের আভাস টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে পাওয়া যায় মাত্র; কিন্তু সে তটস্থ লক্ষণের মত পাওয়া; ব্যক্তিত্বের স্বরূপ লক্ষণ পাওয়া শক্ত।

রূপক কাব্য এই জন্য কোথাও ব্যক্তিত্বের কাব্য হয় নাই। মধ্যযুগের ইউরোপে খৃষ্টান-ধর্ম্মের রূপক আশ্রয় করিয়া বহু মরমী কবি গান বাঁধিয়াছিলেন; পারস্য দেশে সুফী ধর্ম্মের রূপক আশ্রয় করিয়াও বহু কবির রচনা আছে। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে সে সকল রচনা কোন কোন অংশে তুলনীয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ঐ রূপকের জন্যই গানের উৎস একাসরি ব্যক্তিত্বের প্রাণ হইতে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে নাই—একটা ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে।

যে ব্যাখ্যা করিতে হয়, ইহাই ত [illegible] প্রমাণ। যাহা প্রাণ হইতে গানে [illegible], তাহা আপনিই আপনার [illegible] কিন্তু রূপকাশ্রয়ী যে গান, রূপকের ব্যাখ্যানুসারে তাহার ব্যাখ্যা।

এইবার ব্যাখ্যার কথাই বলি। বৈষ্ণব তত্ত্ব বলে যে, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; বিশ্ব-লীলায় তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা এবং অসংখ্য গোপী প্রভৃতি তাঁহারি সেই লীলার অঙ্গ তাঁহারি সৃষ্টি-রাসমণ্ডলের অন্তর্গত। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণব এই লীলাকাণ্ডটিকে নিজের "জীবনের অনুভূতির" সঙ্গে একেবারেই মিলাইয়া দেখিতে পারেন না। রাধিকা বা গোপীর অনুভূতি যে তাঁহারি অনুভূতির রূপান্তর, এমন ভাব তাঁহার মনের ত্রিসীমায় আনাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এ সমস্তই transcendent রাজ্যের ব্যাপার; ভক্ত শুধু তাহার দর্শক মাত্র। বড়জোর তিনি গোপীর মত হইবার কামনা করিতে পারেন। সুতরাং এ ব্যাখ্যায় "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান"। রূপে রূপে বিলাসের পর প্রতি রূপেই এক অখণ্ড অনন্ত রূপের প্রতিরূপ দেখার যে তত্ত্ব চিত্তবাবু আবেগ সহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ব্যাখ্যা। এ তত্ত্বকে রবিবাবুর কাব্যের তত্ত্ব বলিলে ক্ষতি হয় না; বরং স্বচ্ছন্দে তাহা বলা যাইতে পারে। এবং রবিবাবু স্বয়ং সে কথা বহু স্থানে বলিয়াছেন তাহা যারান্তরে পরিষ্কার করিয়া দেখানো যাইতেও পারে। "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা"—রূপের সেই অসীম রূপান্তরের দিক্‌টি তাঁর কাব্যেরই মর্ম্মগত দিক্। দৃষ্টান্ত—'মানসসুন্দরী'; 'অনন্ত প্রেম'। একটিতে সৌন্দর্য্যের রূপান্তর, অন্যটিতে প্রেমের রূপান্তর পাই। চিত্তবাবু একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে আমি ইহা সাধ্যমত দেখাইয়াছি। "রূপে রূপে বিলাস করিতে করিতে" যে "আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে" সেই পরম রূপের ক্ষণিক ঝল্‌সানো (flash) রবিবাবুর অধ্যাত্ম গীতের সাধনার ধন; বৈষ্ণবের নয়। কারণ বৈষ্ণবের আসল রূপ শাশ্বত গোলোকধামের বৈকুণ্ঠবিহারী। তিনি অখিলরসামৃত মূর্ত্তি। "জীবনের রসানুভূতির ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়", এ কথা আধুনিক জীবনবাদী বলিবে বটে, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদী বলিবে কি? বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে বরং বলা

যায় যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের রূপান্তর (transfiguration) হইয়াছে অতীন্দ্রিয়তায়। বৈষ্ণব কবিতার খোসাটা erotic বা ইন্দ্রিয়লালসাপূর্ণ, শাঁসটা Spiritual বা অতীন্দ্রিয় রসপূর্ণ। এ রূপান্তরের কথা চিত্তবাবু অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য রূপান্তর-রূপের অনন্ত রূপে রূপান্তর—বৈষ্ণব কবিতায় নাই।

ফুলের মধ্যে যে "জন্মজন্মান্তরের কাহিনী" লুক্কায়িত, "ফুল ত শুধু ফুল নয়, সে যে সকল বিশ্বের যে মহাপ্রাণ তাহারি প্রাণ-কণিকা"—এ হেন রূপান্তরের কথা কি বৈষ্ণব কবির? বরং Tennysonএর Flower in the crannied wall, Blakeএর To see a world in a grain of sand, রবীন্দ্রনাথের "তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ" প্রভৃতি কবিতায় এই সান্তের মধ্যে অনন্তের বার্ত্তা প্রচারিত। 'সান্তের মধ্যে অনন্ত'—এ তত্ত্বের সঙ্গেই বৈষ্ণব কবিতার রসতত্ত্বের সম্বন্ধ বিরল। কারণ, অনন্ত সে তত্ত্বে সান্ত। তিনি গোপাল, গোপীবল্লভ। সেই সান্তের অপর্য্যাপ্ত মাধুর্য্যরস বৈষ্ণব কবির জন্য ব্রজধামে সঞ্চিত। ভগবান যেখানে আপন ঈশ্বর্য্যে ঈশ্বর বৈষ্ণব সেখানে তাঁহাকে চায় নাই, যেখানে তিনি ছোট, যেখানে তিনি সখা, পতি, বৎস, সেইখানেই তাঁহাকে কামনা করিয়াছে। সেইখানেই তাঁহার নিত্য রাস-মণ্ডল, তাঁহার নিত্য রাসলীলা। বৃন্দাবন-লীলায় তাই ভগবানকে প্রভু বলিয়া কোথাও সম্বোধন নাই; এমনকি তাঁহাকে পিতা বলিয়াও পূজা করা নাই। সেইজন্যই বাল্য ও কৈশোর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে সাঙ্গ করিতে হইয়াছে। বৃন্দাবনে তিনি কাহারও বড় নন্, তিনি সকলের ছোট। তিনি ছোট অর্থে তিনিই ধরা দিবার জন্য ব্যাকুল। মা যশোদার কাছে আদর কাড়িবার জন্য ব্যাকুল; সখা রাখালদের সঙ্গে ধেনু চরাইবার জন্য ব্যাকুল; গোপীদের সঙ্গে রঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল; রাধিকার পায়ে ধরিয়া মান ভাঙাইবার জন্য ব্যাকুল।

সৌন্দর্য্যের রূপান্তর বা প্রেমের রূপান্তর সম্বন্ধে চিত্তবাবু যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা একেবারেই রবিবাবুর কাব্যের কথা। তবে প্রেমের যে ব্যাকুলতা বলে 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল' বা 'নিমিখে শতেক যুগ মানি' তাহাতে এ রূপান্তরবাদের সমর্থন হয় না। সেই ব্যাকুলতাই প্রেমের ধর্ম্ম—তাহাতেই প্রেমের তৃপ্তির মধ্যেও চির অতৃপ্তি, অতৃপ্তিতেও চির তৃপ্তি। বিরহে মিলন, মিলনে বিরহ। 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'।

আসল কথা, বৈষ্ণব কবিতাটা আগেকার জিনিস, তাহার তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী কালের জিনিস। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি যদি কোন তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা মনে রাখিয়া কবিতা রচনা করিতেন, তবে তাহা অমন সহজ, সরল, প্রাণস্পর্শী হইতেই পারিত না। তাহা আড়ষ্ট কবিতা হইত। তবু বৃন্দাবনলীলার যে কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের প্রাণের কথা ঐ কাহিনীর

বিবৃতিতে পুরা ফুটিতে পারে নাই। এক-মাত্র চণ্ডীদাসে তবু কতকটা পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়াছে, বিদ্যাপতিতেও আংশিক ভাবে ফুটিয়াছে। তাহার পর হইতে ক্রমাগত ঐ formটাকে পদকর্ত্তারা ব্যবহার করিয়া করিয়া তাহাকে যখন প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখনই পদরচনার স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। কারণ, শেষাশেষি তাহা আর প্রাণ হইতে স্বতোচ্ছ্বসিত না হইয়া প্রথা হইতেই কেবলি পুনরাবৃত্ত হইতেছিল।

বৈষ্ণব কবিতায় ফিরিয়া যাওয়া আর সম্ভব কি?—কালের, আদর্শের, সমাজের, জীবনের, সকল দিকেই নানা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দুটি একটি বাৎসল্য বা মধুর রসের খেলায় সমস্ত জীবনের পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। বর্ত্তমান জীবনের রস আরও বিচিত্র, আরও গভীর। 'মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মায় আত্মায় যে রমণ' তাহা নিতান্ত সরল জিনিস নয়। কারণ বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যেরও অন্ত পাই না, মানব-প্রকৃতির রহস্যেরও অন্ত পাই না। দুয়ের যোগও বিচিত্র যোগ, সেই যোগের স্ফূর্ত্তিও বিচিত্র উপায়েই হইতে পারে। এ কথা চিত্তবাবুই সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং 'সমগ্র জীবনের অনুভূতি' বলিতে যতখানি বুঝায়, তাহা বৈষ্ণব কাব্যের রূপান্তর ঘটাইলেও ঐ দিক্ হইতে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে 'রূপান্তর'-তত্ত্ব চিত্ত বাবু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কবিজনোচিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও 'ধারকরা' এইজন্য বলি যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে এ রচনা তাঁহার কলম দিয়া বাহির হইত না। কোন অশিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণব তাঁহার এ সকল কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতেই পারিবেন না। তবে 'পাশ্চাত্য শিক্ষার' পরে এত কটাক্ষ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

ফাল্গুনের "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় "স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ভক্তির সহিত স্বামীজির "চরিতামৃত" পরিবেষণ করিয়াছেন; যুক্তির সহিত তাঁহার চরিত ও কার্য্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করেন নাই। অন্যান্য মহাত্মা-গণ সম্বন্ধে গিরিজাবাবু যদি এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তবে তিনি যে একজন স্বভাবভক্ত ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব ঘটিত না। কিন্তু ইংরাজীতে একটা প্রবাদ-বচন আছে যে, কোন জাতি-বিশেষকে গায়ে আঁচড় কাটিলেই তাহার ভিন্ন জাতীয়ত্ব ধরা পড়িয়া যায়। গিরিজা বাবুর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ বাদে অন্য কোন মহাপুরুষের চরিতের আঁচড় লাগিলেই তাঁহার ভক্তির মাধুর্য্য যুক্তির চাতুর্য্যে পরিণত হইয়া পড়ে। "চৈত্রে"র নারায়ণে প্রকাশিত তাঁহার "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধ তার সাক্ষী।

"স্বামী বিবেকানন্দে"র চরিতালোচনায় গিরিজাবাবু গোড়াতেই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত মানিয়া লইয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য বা রাজা রামমোহন রায় যেমন এক এক যুগ-

সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া যুগ-সমস্যাগুলির মীমাংসা করিয়াছিলেন ও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। অবশ্য সকল ভক্তই নিজ নিজ ভক্তিভাজন সম্বন্ধে এই সকল দাবী করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযোগ্য দাবীর সেরা প্রমাণ তাহারা জানে গায়ের জোর। যুক্তিপন্থী গিরিজা বাবু অবশ্য সে প্রমাণ আশ্রয় করিবেন না বলিয়া আশা করি, কারণ তাহা হইলে তাঁহার সহিত পারিয়া উঠা শক্ত হইবে।

যাহাই হৌক্ গিরিজাবাবু বিবেকানন্দের আবির্ভাব সময়ে হিন্দু জাতির ও পাশ্চাত্য জাতির অবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যে-কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত আরম্ভ করিবার মত উপযুক্ত উপক্রমণিকা হইয়াছে বটে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার ভাষায়, "যখন আমরা সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া কোন্ পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই···সমগ্র জাতির যখন প্রায় দিগ্‌ভ্রম হইবার উপক্রম" তখন বিবেকানন্দ "আবির্ভূত" হইয়া কি করিলেন? গিরিজাবাবু বলেন, তিনি "সংস্কার-যুগের প্রতিবাদ" করিয়া ও তাহার নানা দোষ দেখাইয়া "প্রতিক্রিয়ামূলক এক সমন্বয় যুগের (!) সূচনা" করিয়া গেলেন। সেই সমন্বয়-গুলি কি কি তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। "সমন্বয়" শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অবিরোধ'; অর্থাৎ অভিধানকার বলিতে চান্ যে সম্ পূর্ব্বক অন্বয় বলিতে কেহ যেন বিষম্ পূর্ব্বক অন্বয় না বুঝেন, এক কথায় খিচুড়ি না বুঝেন। গিরিজাবাবুর দাবী অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতিমা-পূজার 'সমন্বয়' করিয়াছেন; এটাকে আমরা 'বিষমন্বয়' বলি, কারণ শাস্ত্রকারদের মত-হিসাবেই সিঁড়ির সর্ব্ব নিম্ন ধাপের সঙ্গে সিঁড়ির সর্ব্ব উচ্চ ধাপের ঠিক সমন্বয় বা অবিরোধ হয়, এটা বলা যায় না। তারপর, বিবেকানন্দ স্বামী বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকারের সঙ্গে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অনুভূতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, এই তাঁর দ্বিতীয় সমন্বয়। যিনি সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর দাঁড়ান, তিনি শাস্ত্রের অভ্রান্ততা কেমন করিয়া হুবহু মানিতে পারেন তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। শাস্ত্রের সবই অভ্রান্ত বা সবই ভ্রান্ত, এই দুই মতের কোন মতই প্রশস্ত নয়। শাস্ত্রের যেখানে যেখানে 'অপরোক্ষানুভূতি'র সাক্ষ্য আছে তাহাই তাহার নিত্য অংশ; কিন্তু যে মহাত্মার নিজের 'সাক্ষাৎ অনুভূতি' হয় নাই, তিনি সেই নিত্য অংশগুলি আবিষ্কারই বা করিবেন কি উপায়ে, তাহার বিচারই বা করিবেন কি করিয়া? সুতরাং সাক্ষাৎ অনুভূতিই শাস্ত্রবিচারের কষ্টিপাথর হইলে শাস্ত্রের অভ্রান্ততা মানিবার কোন প্রয়োজন থাকে কি?

গিরিজাবাবু বলেন যে, সামাজিক ব্যাপারে স্বামীজি পতিত ও অন্ত্যজ জাতিকে উদ্ধার করিবার প্রস্তাব করিলেও জাতিভেদের সমর্থন ও অসবর্ণ বিবাহের অসমর্থন করিয়াছেন। জন্মগত যে জাতিভেদ প্রথা আমাদের দেশে দাঁড়াইয়া গেছে, তাহাতে যে যেখানে স্থান পাইয়াছে তাহার সেই স্থানই যে কায়েম। যে নীচে পড়িয়াছে, সে নীচেই থাকিবে; যে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য সে চিরকাল তাহাই থাকিবে। সুতরাং যে ভিত্তির উপর এই উচ্চ-নীচের ব্যবধান জিনিষটা প্রতিষ্ঠিত, সেই ভিত্তি সমানই থাকিবে অথচ ব্যবধানটা দূর হইবে—ইহা কেবল আরব্য উপন্যাসের রাজ্যেই সম্ভব হইতে পারে। গিরিজাবাবুর উক্তি অনুসারে জাতিভেদের সমর্থনের সঙ্গে পতিত জাতির উদ্ধারের সমন্বয় যদি বিবেকানন্দ করিয়া থাকেন, তবে তাহাও এক খিচুড়ি হইয়াছে।

আমরা ভরসা করি বিবেকানন্দের ভক্তদল এই সকল উল্টা দাবী করিতে গিয়া খাবি খাইবার ইচ্ছা মোটেই করেন না। কারণ ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ত্ব বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোন সত্য ধারণায় [illegible] অসম্ভব হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষত্ব কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে দুটো কথা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

[illegible]র ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সংস্কার-যুগের পরই প্রতিক্রিয়া-যুগ সর্ব্বত্রই স্বভাবতই দেখা দেয়। ইউরোপের ইতিহাসে Reformation যুগের সঙ্গে সঙ্গেই Counter-Reformation যুগ আসিয়াছিল। উন্নতিশীল ও রক্ষণশীল—এই দুই দিক্, মানব সমাজে হয় [illegible] একই সময়ে একই অবস্থায়, নয় এক যুগ অন্তে অন্য যুগে অন্য অবস্থায় দেখা দিবেই। বাংলা দেশের ইতিহাসেও কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সংস্কারের যুগের পর যখন হিন্দু সমাজের ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা প্রবল ভাবে দেখা দিল, তখনই বিবেকানন্দ সেই যুগের যুগসারথি হইয়া দাঁড়াইলেন।

অতএব, দেশের নিকট তাঁহার প্রধান দান—গিরিজাবাবু-কথিত তাঁহার সমন্বয় নয়; তাঁহার অপূর্ব্ব অগ্নিময় দেশপ্রীতি। তিনি কিছুরই সমন্বয় করেন নাই; তিনি সমস্তই সমর্থন করিয়াছেন। দেশের কিছুই বর্জ্জন করিতে তাঁহার মন চাহে নাই, দেশের সমস্তই স্বীকার করিবার জন্য তাঁর মন একান্ত উৎসুক ছিল। দেশকে এমন একান্ত ভাবে এমন নিবিড় ভাবে এমন সত্যভাবে তাঁহার মত এ যুগে আর কেহই ভালবাসিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশপ্রীতির তিনিই ভগীরথ—এই নূতন ভাবগঙ্গার ধারা তিনিই প্রবাহিত করিয়াছেন।

সেইজন্য তিনি তাঁহার সমন্বয় সাধনের জন্য নয়, তাঁহার "দরিদ্র নারায়ণ-সেবা"র জন্যই আজও দেশের মধ্যে একটি অজেয় শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষের ছয় কোটি অস্পৃশ্য 'নারায়ণে'র সেবার জন্য বোধনের জন্য, তিনি সমস্ত দেশের পৌরুষ ও মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। সেই তাঁহার "উদ্বোধন"—সেই ত তাঁহার "প্রবুদ্ধ ভারতের" কল্পনা।

বৃহৎ প্রতিভার মধ্যে কোথাও না কোথাও স্ববিরোধ থাকে—কারণ অনেক সময় এই বড় রকমের স্ববিরোধেই বড় প্রতিভার পরিচয় হয়। অজ্ঞ লোকে ইহা বুঝে না। এই জন্য মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন—"self-consisteney is the

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

hobgoblin of little minds"। কবি হুইট্‌ম্যানের একটি ছত্রে আছে—"I am large : therefore I carry contradictions"। এই জীবনের মধ্যে পদে পদেই স্বতোবিরোধ রহিয়াছে—কোন বিষয়ে গভীরতার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে গেলে প্রসরতার দিকে ততটা পরিমাণ দৃষ্টি পড়ে না ; আবার বৈচিত্র্যের দিকে বেশি অগ্রসর হইলে ঐক্যের দিকে সে পরিমাণে মনোযোগ যায় না। দেশবোধ ও বিশ্ববোধ এ দুয়ের মধ্যে যে এক জায়গায় একটা বিরোধ আছে, সেটার তাড়াতাড়ি রফা তাঁরাই করিতে উদ্যত হন্ যাঁদের এ দুয়ের কোন বোধই হয় নাই। বিবেকানন্দের মধ্যে এই দুই বোধই ছিল অথচ অবিরুদ্ধ ভাবে ছিল না। তাঁহার ভিতরকার বিশ্ব-মানুষটি তাঁহাকে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল ; তাঁহার ভিতরকার স্বাদেশিক মানুষটি তাঁহাকে জাতিভেদ সমর্থন করাইয়াছিল। জাতি-ভেদের দোষ কেহ দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন—মানুষের কোন্ institutionটা perfect ? জাতিভেদের বদলে আমাকে 'better substitute' দাও। তখন তাঁহার মনেও হয় নাই যে ছয় কোটি অস্পৃশ্য 'নারায়ণ' উদ্বুদ্ধ হইয়া যদি সমাজে কোন দিন উচ্চতর অধিকারের দাবী করে, তবে এ উত্তরে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। অবশ্য তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সন্ন্যাসে জাতিধর্ম্ম নাই। কিন্তু ছয় কোটি অস্পৃশ্য লোক ত সকলেই গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া দণ্ডী হইতে পারেনা ?

জন্মের হার

"জন্মের হার" সম্বন্ধে জানুয়ারীর এডিনবরা রিভিউতে ডিন অব্ সেণ্টপল্‌স্ ইন্‌জ্ সাহেব, এক বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি প্রাচীনকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের ইতিবৃত্ত ঘাঁটিয়া প্রত্যেক দেশে জন্মের হার কি কি কারণে বাড়ে কমে, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের পাঠকদের কাছে এ আলোচনার বিশেষ মূল্য আছে ; কারণ আমাদের বাংলাদেশে জন্মের হার কমিতেছে, সুতরাং আমরা dying race মরণমুখে পতিত জাতি-বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে।

ইন্‌জ্ বলেন, প্রাচীন কালের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রথমতঃ যে সব শিকারী জাতি ঘর বাঁধিয়া বসতি করে নাই তাহারা ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে। কারণ ছেলে কাঁখে করিয়া মেয়েরা স্বামীদের পিছন পিছন ঘুরিয়া বেড়াইলে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়েনা, তাদের রক্ষাও হয় না। মধ্য এশিয়ার তৃণ-ভূমিতে nomad-শ্রেণীর জাতের মধ্যে বরং জন্মের হার খুব বেশি ছিল। এইজন্য পূর্ব্বকালে বারুদ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে মাঝে মাঝে এই সব অসভ্য জাতির আক্রমণে পৃথিবীর সুসভ্য দেশগুলা অনেকবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। তারপর, বড় বড় নদীতীরে যে সব কৃষি-প্রধান সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল, যেমন ইজিপ্‌টে বা ব্যাবিলোনিয়ায়,—সেখানে জন্মের হারও যেমন বেশি, মৃত্যুর হারও তেমনি বেশি। লোকসংখ্যা সেখানে

অপরিমিত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল ; এতটা বাড়ের জন্যই অতটা ছাড় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীসে কোন কালেই লোক-সংখ্যা খুব বেশি ছিলনা ; তবে রসদের অভাবে বসতের বদলের জন্য গ্রীকরা উপনিবেশ বিস্তারে মন দিয়াছিল। সেও ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ; তারপর আর নয়। তারপরে গ্রীক্ নাগরিক ষ্টেটগুলির মধ্যে ঐ ছোটখাট আয়তনের ভিতরেই পূর্ণতা লাভ করিবার একটা আদর্শ আসে, 'self-sufficient life'-এর আদর্শ আসে। গ্রীকরা মনে করিয়াছিল যে, একটা নাগরিক ষ্টেটে বড় জোর বিশ কি ত্রিশ হাজার নাগরিক থাকিবে, তাহাদের যাহা কিছু অভাব তাহা তাহারাই মিটাইয়া লইবে। (রবিবাবুর পল্লীসমাজের আদর্শের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য নাই কি ?) অতবড় জ্ঞানী যে প্লেটো, তিনিও তাঁহার 'Laws' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রীক্ নগর সমুদ্রের খুব কাছে না হওয়াই ভাল, কারণ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেই যত রাজ্যের বিদেশী বণিক ও দোকানদার জুটিয়া নাগরিকদের বেণে-স্বভাববিশিষ্ট করিয়া তুলিবে। কেবল এথেনীয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের মধ্যে সেরা রাষ্ট্রনৈতিক ইসোক্রাটিস্ এই রকমের ছোটখাট নাগরিক ষ্টেটে সন্তুষ্ট থাকিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, রাজ্য-বিস্তার করিয়া ষ্টেটগুলা ক্রমশঃ আরও বলশালী ও সমৃদ্ধিশালী হয়। অবশ্য গ্রীক-দের মধ্যে দীর্ঘায়ু ও সুস্থ সবল মানুষ যত বেশি পরিমাণে দেখা যাইত, এমন আর প্রাচীনকালে অন্য কোন দেশে দেখা যায় নাই। প্রাচীন রোমানদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। তবু এক সময়ে গ্রীক ও রোমান জাতি যে একেবারেই পৃথিবী হইতে বিলোপ পাইল, তাহার কারণ কি ! হঠাৎ ইহাদের মধ্যে জন্মের হার কমিয়া গেল কেন ? গ্রীকদের মধ্যে শিশুহত্যা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল ; বিকলাঙ্গ শিশুপুত্রকে তাহারা মারিয়া ফেলিত, শিশুকন্যাকেও তাহারা পালন করিতে নারাজ ছিল। তারপর যুদ্ধবিগ্রহ সদাই বিদ্যমান ছিল, এও আর একটা কারণ বটে। তবে এ সকল কারণ এত প্রবল নয়, যাহার জন্য গ্রীক ও রোমান জাতির একেবারে ধ্বংস হইতে পারে। অবশ্য ধ্বংসের আর একটা বড় কারণ, দাসপ্রথা ও দাস-ব্যবসায়। দাসদের দ্বারা সকল শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করাইব এবং নিজেরা তাহার ফলভোগ করিব—এ ব্যবস্থায় একটা জাতির শক্তিকে ক্রমশঃ হীন ও দুর্ব্বল করিয়া আনে। কিন্তু ইন্‌জ্ সাহেব বলেন যে, এ সকল কারণের চেয়েও গ্রীক্ ও রোমান জাতির ধ্বংসের অন্য বড় কারণ ছিল। তিনি বলেন, একটা জাতির যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশা না থাকে, তবে বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধেও তার উদ্যম-উৎসাহ স্বভাবতই কমিয়া আসে। জীবন-সংগ্রামে সে আর কোমর বাঁধিয়া লাগেনা, সে অদৃষ্টবাদী হইয়া দাঁড়ায়—অদৃষ্টে যা আছে তাই হইবে বলিয়া সকল বিষয়েই সে একেবারে গা ছাড়িয়া দেয়। তখন সুস্থ সবল সন্তান রাখিয়া যাইবার ইচ্ছাও তাহার থাকে না ; সন্তান জিনিসটাই তাহার কাছে ভার ও দায়স্বরূপ হইয়া উঠে। রোমান্

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পূর্ব্বে রোমানদের মধ্যে এইরূপ একটা নৈরাশ্য ও অবসাদ দেখা দিয়াছিল। সেই নৈরাশ্য ও অবসাদই গ্রীক ও রোমান জাতির মৃত্যুর কারণ।

গ্রীক ও রোমান জাতির মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ইন্‌জ্‌ যাহা বলিতেছেন তাহাই যদি সত্য হয়, তবে আমাদের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবিবার কথা আছে। নৈরাশ্য, অবসাদ, অদৃষ্টবাদ, সন্ন্যাসের আদর্শ—আমাদের মধ্যেও পূরা মাত্রায় প্রবল। রোমানদের মধ্যে সন্ন্যাস, eremitism প্রভৃতি শেষ-দশায় বেজায় দেখা দিয়াছিল। বাংলাদেশেও সন্ন্যাসী-স্বামী-সম্প্রদায় বাংলাদেশের একচেটে স্বামী হইয়া বসিয়াছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে আশা ও উৎসাহ প্রবল, না নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহ প্রবল?—ভাবিয়া দেখা উচিত।

গ্রীক ও রোমানের মত পরবর্ত্তী যুগে স্পেন আর একটা উদাহরণ। স্পেনের যেমন হু হু করিয়া উন্নতি হইয়াছিল, তেমনই দ্রুতবেগে অবনতি দেখা দিল। কারণ তাহার উন্নতিটা ছিল শুধু কেবল ব্যবসা বাণিজ্যে এবং পরজাতির শাসন ও শোষণে—সুতরাং তাহার পরমায়ু বেশি দিনের মত হইল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে জন্মের হার ও লোকসংখ্যা যত বাড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় জগতের ইতিহাসের কোথাও কোন যুগেই হয় নাই। যন্ত্রতন্ত্রের আবিষ্কারে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে, দেশ বিদেশে বাণিজ্যের প্রসারে দেখিতে দেখিতে এক শতাব্দীর মধ্যে লোকসংখ্যা আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া গেল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের জনসংখ্যা ছিল ৪,৮০০,০০০—১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হইল, ৬,৫০০,০০০। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইল, ৩২,৫৩০,০০০।

কিন্তু এখন যাঁহারা ইউরোপীয় জাতিদের জন্মের হার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যান, তাঁহারা দেখিতে পান্‌ যে, খুব উন্নত জাতিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিদের মধ্যেই জন্মের হার অধিক। অবশ্য উন্নত জাতিদের মধ্যেও জন্মের হার সম্বন্ধে অনুপাতের যথেষ্ট তারতম্য আছে। তারপর জন্মের হার ও মৃত্যুর হার সম্বন্ধে তুলনা করিয়া তাঁরা দেখেন যে, যে-দেশের মৃত্যুর হার কম আর যে দেশের জন্মের হার বেশি তাহাদের মধ্যে আসলে তফাৎ খুব কম।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ব্লু বুক হইতে একটা তালিকা লেখক উদ্ধার করিয়াছেন এইরূপ—

	জন্ম	মৃত্যু	মোট বৃদ্ধি
যুক্তরাজ্য	২৩·৯	১৩·৮	১০·১
অষ্ট্রেলিয়া	২৮·৭	১১·২	১৭·৫
অষ্ট্রীয়া	৩১·৩	২০·৫	১০·৮
বেল্‌জিয়াম	২২·৯	১৬·৪	৬·৫
ফ্রান্স	১৯·০	১৭·৫	১·৫
জার্ম্মাণি	২৮·৬	১৭·৩	১১·৩
ইটালী	৩২·৪	১৮·২	১৪·২
নিউজিল্যাণ্ড	২৬·৫	৮·৯	১৭·৬
নরওয়ে	২৫·৪	১৩·৪	১২·০
রাশিয়া	৪৪·০	২৮·৯	১৫·১

রাশিয়ার জন্মের হার সব চেয়ে বেশি অথচ অনুপাতে মৃত্যুর হারও কম নয়; এবং অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের জন্মের হার কম হইলেও মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম বলিয়া

আসলে মোট বৃদ্ধির হার তাহাদেরি বেশি। ভারতবর্ষের জন্মমৃত্যুর হার লেখক দেন্‌ নাই; কিন্তু আমরা জানি যে ভারতবর্ষের মৃত্যুর হার রুশের চেয়েও বেশি। চীনেও তাই।

ইংলণ্ড সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন যে, সবচেয়ে বেশি জন্মের হার খনির মজুর ও slum-বাসীদের মধ্যে। ব্যবসায়ী স্ত্রীলোকদের মধ্যে জন্মের হার অত্যন্ত কম। ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জন্মের হার অত্যন্ত কম—কারণ তাহারা অনেকেই বিবাহ করিতে চায় না। এই সব কারণে বিখ্যাত Havelock Ellis তাঁহার "The Task of Social Hygiene" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই সব নিম্ন শ্রেণীর রুগ্ন ভগ্ন, অশিক্ষিত কুশিক্ষিত লোকদের বংশবৃদ্ধি হওয়া ও [illegible]দের বংশক্ষয় হওয়া কোন জাতির একটা দুর্লক্ষণ। জর্ম্মানীতেও এই [illegible] আমেরিকায় নিগ্রোদের সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আমেরিকানদের বিশেষ ভীতির কারণ হইয়াছে। বাংলা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি? মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষিত ও সভ্য তো নয়?

দক্ষিণ আমেরিকায় স্লাভ ও ইতালীয়ানদের মধ্যে বংশবৃদ্ধি ব্রিটিশ-আমেরিকানদের চেয়ে অধিক। অর্থাৎ সুসভ্য হইলেই যে টিঁকিয়া থাকিবে তাহার কোন মানে নাই। জীবন-সংগ্রামে জীবনযাত্রার সরলতার ও নূতনতার আদর্শকে বজায় রাখিয়া যে সব জাতি চলিতে পারে, হয় ত তাহারাই যোগ্যতম বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন কাফির সামান্য আয়ে বড়লোকের মত থাকিতে পারে, কিন্তু বিলাসী ইংরেজের পক্ষে ২০০ পাউণ্ড আয়ও অত্যন্ত অল্প বলিয়া মনে হয়। আমরা দরিদ্রজাতি বলিয়া মনে করি আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সরল, কিন্তু আমাদের হিন্দুদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আধুনিক সভ্যতা আমাদের যত পাইয়া বসিয়াছে, এমন মুসলমানদের নয়।

তার মানে, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা, স্বচ্ছন্দপ্রিয়তা, বিলাস এবং পাপ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সভ্যতার উপরের চিকণ-চাকণ যতই মনোরম হউক্‌ না কেন, ভিতরে মৃত্যুর ঘুণ ধরিয়া তাহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিতে থাকে। বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় দেশসমূহে তাহাই লক্ষ্য করা যায়। ধনের সঙ্গে দারিদ্র্যের অসামঞ্জস্য অন্য কোন দেশেই এত বেশি নয়। সুতরাং ক্যাপিট্যালের সঙ্গে শ্রমের বিবাদ সে দেশে ঘরাও বিবাদের মত নিত্য লাগিয়াই আছে। মেয়েরা পর্য্যন্ত জীবন-সংগ্রামে পুরুষের স্থান গ্রহণ করিতে গিয়াছে বলিয়া তাহাদের গৃহধর্ম্ম, তাহাদের সন্তান-পালন একবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। গর্ভপাতের তালিকা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যুক্তরাজ্য ২,০০০,০০০ শিশুজন্ম বন্ধ করা হয়। জর্ম্মানীতে সংখ্যা ৪০০,০০০।

ইন্‌জ্‌ সাহেব মনে করেন যে, দুই উপায়ে এই ক্ষয় নিবারণের চেষ্টা হইতে পারে:—(১) প্লেটোর আদর্শ অনুযায়ী নিজের মধ্যে নিজে সংহত-সংবৃত হইয়া কোন জাতি নিজের সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হইতে পারে।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

তিনি বলেন ফ্রান্স এই আদর্শের দিকে মনোযোগ দিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিপদ হইতেছে এই যে, যুদ্ধ বাধিলে তখন এইরূপ ছোটখাট আয়োজনে জয়ী হইবার সম্ভাবনা বিরল হইয়া পড়ে। সুতরাং (২) দ্বিতীয় উপায় এই যে, নানা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আত্মবিস্তারের দ্বারা সেই সেই স্থানে বরাবর একটা নূতনত্ব ও সজীবত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা। যেমন ক্যানাডা-অষ্ট্রেলিয়াতে বৎসর বৎসর যে সব অধিবেশী যায়, যদি সেই সব যাত্রীরা যোগ্য কি অযোগ্য তাহা নির্দ্ধারণ ও নিরূপণের চেষ্টা করা যায় ও সুযোগ্য লোকদিগকেই সেখানে পাঠাইয়া সেখানকার সভ্যতাকে সকল দিক্ হইতে সুস্থ সবল ও কল্যাণ-প্রদ করিয়া তোলা যায়, তবে যে পরিমাণে এই কাজে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে সেই পরিমাণে ব্রিটেনের ক্ষয় নিবারিত হইবে। সেখানে যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ যথাযথ পরিমাণে যায়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু এ উপায় যেন ইংলণ্ড-জর্ম্মানী সম্বন্ধে সম্ভব হইল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ উপায় কি খাটে? আমরা উপনিবেশ করিব কোথায়? আমাদের পক্ষে এখন প্রথমোক্ত ব্যবস্থাই বোধহয় সমীচীন। তবে দুই ব্যবস্থাই পাশাপাশি কাজ না করিলে লোকক্ষয় কোন জাতিই নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেনা।

আমাদের এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে দ্বিতীয় ব্যবস্থা চাই। হয় সংহত ভাবে পল্লীসমাজ স্থাপন করিতে হইবে, নয় ব্যাপক ভাবে উপনিবেশ গড়িতে হইবে।

কর্ম্মপ্রেরণা

"সবুজপত্র", "মানসী" ও "প্রবাসী" এই তিনটি কাগজে "লোকশিক্ষা," "কর্ম্মযোগ" ও "দেশের সেবা" এই তিনটি প্রবন্ধের আলোচনা-রীতি ভিন্ন হইলেও, আলোচ্য নীতি একই। তিনটি প্রবন্ধেরই বক্তব্য হচ্চে, কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে আমাদের দেশে জাগানো প্রয়োজন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের দেশের মন যে আর নিশ্চেতন নয়, এটা একটা সুলক্ষণ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে।

"সবুজপত্রে" বরদাবাবু "লোকশিক্ষা" সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত সুন্দর আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাক্-চাতুরী ও লিপি-কারিকুরী দেখান্ নাই; একেবারে তাঁর বিষয়ের মর্ম্মস্থানে তীরের মত সোজা গিয়া ঘা দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, "লোকমত" জিনিসটা আমাদের মধ্যে নাই, কারণ লোকসাধারণ থাকিলে তবে ত লোকমত থাকিবে? তিনি তাই লিখিয়াছেন,—

"মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভিতরে দু একটির বুদ্ধির যতই ধার থাক্ না কেন—জনসংঘের সহানুভূতির ভার তার পেছনে না থাকাতে, তাতে মোটেই কিছু কাটছে না। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনের প্রয়াস, আকাশে রাজপুরী নির্ম্মাণের চেষ্টার সামিল।"

কিন্তু এদেশে জনসাধারণ জাগে নাই কেন? তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন:—

"সমাজের বড় বড় দায়িত্বগুলো যদি বিশেষে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের স্কন্ধে ন্যস্ত না থাকৃত; আর তাঁরা যদি সুদীর্ঘকাল ধ'রে তাঁদের এই নেতৃত্বভার বহন করিবার সুযোগ না পেতেন; তাহলে আমাদের জনসাধারণের এমনধারা লুপ্তজ্ঞান এবং সুপ্তিমগ্ন হবার অবসর বোধ হয় জুটত না।"

প্রবন্ধের শেষে বরদাবাবু দেখাইয়াছেন যে, জনসাধারণের হাতে কোন শক্তি ছিল না দায় ছিল না বলিয়া কর্ম্মে তাহারা সাড়া দেয় নাই; ভক্তিতে, ধর্ম্মে সাড়া দিয়াছে। তার সাক্ষী শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাংলাদেশের ভক্তির আন্দোলন। বরদাবাবু সেই ধর্ম্মপ্রবণতার সঙ্গে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জুড়িয়া দিলে জনসাধারণকে জনসংঘ করিয়া তুলিতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্বাস করেন।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টা। যে সব ধর্ম্ম religions of law, বিধিবিধান-মূলক, তাহারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া কর্ম্মের জালে মানুষকে অহর্নিশি ঘিরিয়া রাখে। সেমেটিক্ ধর্ম্মে ইহার পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু যে সব ধর্ম্ম religions of redemption, ভক্তি-মূলক, সেখানে কর্ম্মটাই বন্ধন; সেখানে শুধু স্বেদ কম্প পুলক মূর্চ্ছাদির ব্যাপার, নানা রকম mystical experiences, নানা রসের সম্বন্ধে ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষকে কর্ম্মে লইয়া গিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম মানুষকে কর্ম্মবিমুখ করিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্ম যে অংশে ইহুদীয় সে অংশে তাহা বিধিবিধানমূলক; যে অংশে শুধুই খৃষ্টীয় ও অন্যান্য জাতির সাধনার সঙ্গে অন্বিত, সে অংশে তাহা ভক্তিমূলক। খৃষ্টানধর্ম্মে তাই ভক্তি ও কর্ম্মের যে সামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে তাহা অন্য কোন ভক্তিধর্ম্মে দেখা যায় নাই। চৈতন্যের ধর্ম্মে ভক্তি-প্রবণতার সঙ্গে কর্ম্মপ্রবৃত্তির সংযোজন কেমন করিয়া হয়, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

আমাদের দেশে আমরা বহুকাল ধরিয়া abstraction লইয়া কারবার করিয়াছি। জ্ঞানের চরম abstractionএ আমরা গিয়াছি বেদান্তে; ভক্তির চরম abstractionএ আমরা গিয়াছি বৈষ্ণব ধর্ম্মে। এখন চাই জীবনের কারবার।

অর্থাৎ আমরা এখনো মধ্যযুগে আছি; বর্ত্তমান যুগে পৌঁছিতে আমাদের অনেক দেরী। আমাদের শিক্ষিত সাধারণ এখন ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা লইয়া পড়িয়াছেন—ইহাতেই প্রমাণ যে ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে আর ধরিয়া নাই। আর অশিক্ষিত সাধারণ ধর্ম্মের চেয়ে ধর্ম্মের খোলস লইয়াই বেশি আছে; সেটা ছাড়াইতে গেলে তার বদলে তাহাদিগকে আর কোন সত্যবস্তু দেওয়া দরকার। অবশ্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুয়ের মধ্যে কোন কোন মানুষ দেখা দেন্ যাঁরা বাউল ধরণের লোক—তাঁরা গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরে মানুষ। চিরকালই সব দেশে এই শ্রেণীর মানুষ থাকিবেন। ইঁহারাই seers। তবে আমাদের দেশে তাঁরা সম্প্রদায় পাকাইয়া তোলেন, এই হয় অনিষ্ট। একদল লোক কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া-ছুড়িয়া তাঁদের তল্পী বয়; তারা রসের স্বাদ পায় না, খাদ্ লইয়াই মাতামাতি করে।

দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁর "কর্ম্মযোগ" প্রবন্ধে এই কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। "ভক্তিযোগে"র গ্রন্থকার বলিয়া তিনি খ্যাত; তাঁরই পক্ষে তাই "কর্ম্মযোগ" লিখিতে আরম্ভ করা ঠিক্ উপযুক্তই হইয়াছে। "ভারতের পতনের সূত্র" তিনি দেখাইয়াছেন এইরূপ:—

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

"এই ভারতবর্ষে যখন আর্য্যগণ কর্ম্মদ্বারা গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেন, এবং দেখিলেন যে এই 'সুজলা সুফলা' ভূমিতে এরূপ পর্য্যাপ্ত অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে যে তাঁহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তখন কর্ম্মের প্রতি সহজে তাচ্ছিল্য উপস্থিত হইল। শরীর-যাত্রা এই দেশে অনায়াসসাধ্য বলিয়া তাহা অনাদরের বিষয় হইল; এবং শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের সহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপ সংশ্লিষ্ট তাহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। জীবিকাবিধায়ী বহির্ম্মুখ কর্ম্ম নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল; কিন্তু তাহাই অন্তর্ম্মুখ করিয়া লইলে বাহিরের মঙ্গল যেরূপ সংসাধিত হয়, অন্তরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলও তেমনি সাধিত হইয়া থাকে—ইহা ধারণার বিষয় রহিল না। সুতরাং অগ্রণিগণ কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, মাত্র জ্ঞান ও ভক্তিকে জীবনের পরমসাধ্য নির্দ্ধারণ করিলেন, এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্ম্মদ্বারা নিয়মিত না হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ইহাই ভারতের পতনের সূত্র। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সাধু মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন; এবং যাঁহারা সংসারী রহিলেন, জগতের মঙ্গলের সহিত তাঁহাদিগের স্বকীয় মঙ্গল কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ, তাহা ভুলিয়া, ঘোর বিষয়ী ও স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইলেন। দুই দলই মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত "প্রবাসী"তে "দেশের সেবা" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে দেশটুকুর মধ্যে মানুষের প্রীতি বদ্ধ না হইলেও, বিশ্বমানবে তাহা ব্যাপ্ত হইলেও, সেবার ক্ষেত্র দেশেই আবদ্ধ থাকে। তবে সেবার আদর্শ ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে। এ কথাটির মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে। অশ্বিনীবাবুও তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে সেই কথাই বলিয়াছেন:—

"আজ জগতের সীমান্ত—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় যান এবং চিন্তা, ভাব ও ক্রিয়ার বিনিময় দ্বারা আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক, নানাবিধ বিষয়ে পরস্পর সম্বদ্ধ।"

নরেশবাবুও লিখিতেছেন,—

"সমুদয় মানব জাতি যে এক মহাদেশ ও মহাসমাজ হইয়া গড়িয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। দেশাত্মবোধ অতিক্রম করিয়া ভগবানের অপূর্ব্ব বিধানে আমাদের সেই মহাসমাজে আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।"

দেশাত্মবোধের দিনে, বিশ্ববোধের প্রতি-ক্রিয়ার দিনে, এ সকল কথা আমাদের মনে হঠাৎ চমক উপস্থিত করে। কথাগুলো পুরাণো হইলেও এ কালের হিসাবে নূতন। কিন্তু দেশ-প্রেমের আদর্শ যেমনি বদ্‌লাক্ না কেন, দেশের সেবার ক্ষেত্রের বদল হয়না। নরেশবাবু ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চান: দেশের সেবার সঙ্গে মানব-সমাজের একত্ববোধের প্রকৃত কোনও বিরোধ নাই।

সেবা বলিতে তিনি শুধু জনহিত-সাধন বুঝেন নাই। কারণ তিনি লিখিয়া-ছেন: "আত্মোন্নতিও দেশের সেবার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।" অর্থাৎ তাঁর মতে সমাজ-বোধে পূর্ণ হইয়া সেই বোধের প্রকাশস্বরূপ যাহা কিছু করা যায় তাহাই সমাজের সেবা হইয়া দাঁড়ায়। দেশের মধ্যে এই সমাজ-বোধ (social consciousness) জিনিসটা জাগাইতে পারিলেই "লোকশিক্ষা"র সমস্যারও সমাধান হয়, ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের বিরোধও ঘুচিয়া যায় এবং দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধেও দ্বন্দ্ব থাকেনা। কারণ সমাজবোধের পরিণতিই বিশ্ববোধে; সুতরাং তাহার গতিই সেই দিকে।

আমাদের শিক্ষা।

ফাল্গুনের সবুজপত্রে "আমাদের শিক্ষা" নাম দিয়া সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সকলেরি ঔদাসীন্য ও বিস্মৃতির একেবারে তলায় নিমজ্জিত সব চেয়ে বড় সমস্যাটির ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে পাঠকদের চেতনার কূলে তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সুতরাং শিক্ষার ফল সমাজে কেমন করিয়া ফলানো যাইতে পারে, তাহাই যে শিক্ষার সব চেয়ে বড় সমস্যা—এই সহজ কথাটা অধিকাংশ লোকেরই মনে থাকেনা। মনে না থাকিবার কারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন নাই। দুটি বড় কথা তিনি বলিয়াছেন:—(১) শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই; কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন যে, সে সম্বন্ধে কোন জাতিই সন্তুষ্ট হইতে পারেনা, কারণ শিক্ষা জিনিসটাই experiment মাত্র। তবু (২) অসন্তোষের বড় কারণটাও তিনি ধরিয়াছেন:—"আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের নব শিক্ষা আজও সম্পূর্ণ খাপ খায়নি।" এই দ্বিতীয় কথাটাই আসল কথা। অসন্তোষের মূল এইখানেই। আমাদের শিক্ষার উপর আমাদের সমাজের কোন দাবী নাই—আমাদের শিক্ষার চাবি সমাজের কোন কুলুপেই লাগেনা। ইউরোপে সকল দেশেই, ধীরেই হোক্ আর দ্রুত বেগেই হোক্, শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে গঠিত রটিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে তা মোটেই হয় নাই!

কিন্তু কেন আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার বনিবনাও হইতেছেনা, এ প্রশ্ন সম্বন্ধে সম্পাদক যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা তাঁহার শিক্ষা-সমস্যার পূর্ব্ব-মীমাংসার পর ঠিক উত্তর-মীমাংসা হয় নাই। তিনি প্রশ্নটাকে যথেষ্ট ঘাঁটান নাই, তাই তাহাকে মিটানও নাই।

একথা তিনি পরিষ্কার স্বীকার করিয়া-ছেন যে,—

"এ কালের স্কুল কালেজ দেশের মাটিতে গজায় নি, আকাশ থেকে পড়েছে।"

তবু তার পরেই তিনি বলিতেছেন,

এই শিক্ষা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়বে কিনা সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে। কেননা তা মূলত বিদেশী। এ সন্দেহ অবশ্য অকারণ। যে শিক্ষার বলে নয ইউরোপের বুদ্ধি ও চরিত্র গ'ড়ে উঠেছে তা আদিতে সম্পূর্ণ বিদেশী ছিল।..... মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত।"

এসব কথা কেহ অস্বীকার করে বলিয়া ত শুনি নাই। ইংরাজী শিক্ষা আমরা পাইতেছি বলিয়াই যে কোথাও কোথাও ঐরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, তাহা মোটেই সত্য নয়। বিশ্বসভ্যতার সকল শিক্ষাই আমাদের পক্ষে দরকার, কোন শিক্ষাই বাদ দিবার নয়—এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু কোন বিদেশী শিক্ষাকে দেশীয় আধারের ভিতর দিয়া ছাড়া আত্মসাৎ করা যায় কি? বাংলায় জন্মিয়া বাংলার—ভারতবর্ষের—সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিনা ও শিখিনা, অথচ ইংলণ্ডের

সব জ্ঞাতব্য কথা মুখস্থ করিয়া একজামিন পাস করিতেছি, এমনতর শিক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি, ও হৃদয়বৃত্তি সবই ক্রমশ ভোঁতা হইতে থাকে, কারণ মানুষটাই যে তোতা হইয়া বসে। শিক্ষার এ হেন অভিনব পদ্ধতি আর কোন সভ্যদেশে কখনো চলিয়াছিল কি? আমাদের বাঙালী তথাকথিত-শিক্ষিত-সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যে যে আজও যথেষ্ট পরিমাণে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিতেছেননা, তাঁদের বাংলা লেখার অনভ্যাসই তার প্রধান কারণ নয়; প্রধান কারণ বরং এই যে তাঁরা বাংলার নিজস্ব culture সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। বাংলার ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্মবৈচিত্র্য, সমাজ-গঠন, বাংলার নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, বাংলার জনসাধারণ ও তাহাদের সুখদুঃখ ভাব-অভাব—ইহার কোনটাই তাঁদের জানা নাই। সুতরাং তাঁরা যা কিছু লেখেন তার বারোআনাই শেখাবুলি এবং বাকী চার আনা বিদ্যের চুলোচুলি, অর্থাৎ নিরর্থক কলহ।

অন্ততঃ বাংলাভাষার ভিতর দিয়া বিদেশী শিক্ষাটা দিবার চেষ্টা হইলে ইহার চেয়ে ঢের ভাল ফল হইত। তখন বাংলার নিজস্ব কাল্‌চারটা কি, হয়ত তাহার তলব পড়িত। অন্ততপক্ষে বাঙালী ছাত্রের মন ও কল্পনা শৈশব হইতে উপবাসী থাকিত না, কিছু খোরাক পাইত। তোতাবৃত্তি এমনতর বৃদ্ধি পাইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানিরপেক্ষ হইয়া বাঙালী যেমন তাহার অপূর্ব্ব ছোট গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি রচিয়াছে, তেমনি সাহিত্যের অন্যান্য নানা-দিক—দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি তখন বাংলা ভাষায় গড়িয়া উঠিত ও তাহার দ্বারা রস-সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইত, সন্দেহ নাই। বাঙালী যে সাহিত্যটুকু রচিয়াছে তাহা আজ দেশ-বিদেশে আদর পাইতেছে, শুধু বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয়েই তাহার জন্য কোন স্থান নাই বলিলেই হয়। ছাত্ররা শেলী, কীট্‌স্, টেনিসন পড়িবে অথচ তাঁহাদের চেয়ে ঢের বড় কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িবেনা। স্কট পড়িবে, বঙ্কিম পড়িবেনা! প্রমথবাবু এ সকল কথা ভালরূপেই জানেন, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে তাঁর দরদ বড় বেশি দেখিতে পাই—কারণ তিনি এ সব কথা পষ্টাপষ্টি না বলিয়া লিখিয়াছেন—

"এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ত সেদিন হয়েছে।...সুতরাং আমরা যে এই নবশিক্ষাকে একেবারে আপনার ক'রে নিতে পারিনি তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।"

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে সত্যকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতিষ্ঠাই হয় নাই—আমেরিকার ফ্রেমে-গাঁথিয়া-তোলা বাড়ীর মত একেবারে গোটা গুম্বজ-খিলান-সমেত ঝুপ করিয়া রাতারাতি আমাদের মাটীতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বসানো হইয়াছে। তাহাকে ইচ্ছা করিলেই আবার সেই সব চলিষ্ণু বাড়ীর মত অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া যায়। শিক্ষা ভিৎ হইতে সুরু হইয়া ক্রমশ উপরে ওঠে—গোড়াকার শিক্ষা পাকা হইলে পর তবে ত উচ্চশিক্ষার পত্তন হইতে পারে। আমাদের মনের হাঁড়িতে চাল, জল সবই তৈরি আছে কিন্তু নীচে শিক্ষার আগুন না দিয়া উপর হইতে ক্রমাগত তাপ দিবার প্রবল



আলেকজান্দারের মৃত্যু

চেষ্টা সুরু হইল; সে আগুন ধরিবে কেমন করিয়া? দেশের জনসাধারণ পাইবে না প্রাথমিক শিক্ষা, শুধু উপরের শ্রেণীর শতকরা ৩।৪ জন লোক সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা পাইয়া সভ্যতার মহোচ্চ শিখরে উঠিবে—এসব দিবাস্বপ্নের কোন মূল্য আছে কি? এ অঘটন-ঘটনে মায়া বা যাদুবিদ্যাও পটীয়সী নয়। সুতরাং প্রমথ বাবু যে লিখিয়াছেন,

"আমাদের শিক্ষার উপর একদল ইংরাজ এই কারণে নারাজ যে তার ফলে আমরা এদেশের প্রচলিত রাষ্ট্রতন্ত্রের বদল চাই আর আমাদের গুরুজনদের মধ্যে একদল এই কারণে নারাজ যে, আমরা এদেশের প্রচলিত সমাজতন্ত্রের বদল চাই।"

সে সব অদল-বদলের দাবী যদিবা উপস্থিত মুলতুবী থাকে, তবে তা খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, জনকয়েকের রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসন এবং জনকয়েকের দ্বারা সমাজের ভিত্তির নাশন খুব সুবিধার ব্যাপার নয়। স্বায়ত্ত-শাসনের পরীক্ষাটা ভাগ্যক্রমে হয় নাই, অন্য পরীক্ষা হইয়া গেছে। তাহাতে সমস্ত সমাজের বন্ধদশা ত ঘুচেই নাই বরং তাহার কবন্ধ দশা হইয়াছে। তার মত বিভীষিকা আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রমথ বাবু শিক্ষা সম্বন্ধে public opinion এর সৃষ্টি করিতে চান্, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস যে শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে পাব্‌লিকের "কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই।" কোন পাবলিকেরই কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকেনা—তবে পাব্‌লিকের পাল কোন্‌দিকের বাতাসে নড়ে তাহা বেশ লক্ষ্য করা যায়। কি উচ্চ শিক্ষা, কি নিম্ন শিক্ষা কোন শিক্ষাই আমাদের পূরাদস্তর হইতেছে না—এই হাওয়াতেই এখন এদেশের পাব্‌লিকের পাল চঞ্চল। শিক্ষা সম্বন্ধে 'অভিমান' দূরে থাকুক্, শিক্ষা যে আমরা ঠিকমত পাইতেছিনা—এই বোধটাই ও তজ্জন্য ক্রোধটাই শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে দিনদিনই প্রবলতর হইতেছে। প্রমথ বাবু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে কেউ কেউ চান "বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্যবিদ্যালয়ে পরিণত করতে"। অথচ তিনিই লিখিতেছেন "সমাজ চায় যে সামাজিক মানব একাধারে জ্ঞানী ও কর্ম্মী হবে।" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ামুখস্থের শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে আছে অথচ একই সঙ্গে টেক্‌নিকেল শিক্ষার কোন আয়োজনই নাই এটা যে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা তাহা প্রমথ বাবুর দ্বিতীয় উক্তির কোটেশান হইতেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং তাঁহার ঠাট্টাটা ঠিক লাগসই রকমের হয় নাই। শুধু বৈশ্যবিদ্যালয় ত কেহ চায় না; তবে বৈশ্যবৃত্তির দরকার পনেরোআনা লোকেরই আছে, কারণ ব্রাহ্মণবৃত্তির স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষাত্রবৃত্তির স্থান সম্প্রতি বাঙালী পল্টন তৈরির ব্যাপারে যদি কিছু হয়। অবশ্য শূদ্রবৃত্তির জন্য কাহাকেও ভাবিতে হয় না—সমস্ত জাতটাই তাহাতে দীক্ষিত হইয়া আছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

সমালোচনা

মূর্চ্ছনা। শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এখানি নামে 'কবিতা-গ্রন্থ', ভিতরে ছাই ও পাঁশ। তবে ইহার বিশেষত্ব এইটুকু যে, ইহার ললাটে অপরের ভূমিকা নাই!

হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বি, এ প্রণীত। জিলা ঢাকা, রায়পুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, আলেক-জান্দ্রা ষ্টীম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কাব্য—একাদশ সর্গে রচিত। লেখক দীর্ঘ ভূমিকায় বিস্তর গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন, "হিন্দু কেন অধঃপতিত হইলেন? মুসলমান কেন এদেশে আসিলেন? আসা কি আকস্মিক হইয়াছে, অথবা কোন গভীর কারণে ঘটিয়াছে? ইত্যাদি প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। সেই সকল প্রশ্নের সমা-ধানের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি"। কাব্যখানিতে আমরা কোন বিশেষত্ব বা কবিত্ব দেখিলাম না।

খুকুর কথা। স্বর্গীয়া চারুবালা দেবী ও দিদিমা লিখিত। ময়মনসিংহ, জামালপুর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, আলেকজান্দ্রা ষ্টীম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। খুকু—লেখিকা স্বর্গীয়া চারুবালার শিশু পুত্র; প্রবাসিনী লেখিকা শিশুর সম্বন্ধে যে-সব কথা আত্মীয়-স্বজনকে চিঠিতে লিখিতেন—সেই সকল চিঠি হইতেই এই 'খুকুর কথা'র সৃষ্টি। উনিশ বৎসর বয়সে লেখিকা খুকুকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। লেখিকার আত্মীয়-স্বজনের কাছে এ গ্রন্থের মূল্য আছে, স্বীকার করি; কিন্তু সাহিত্যের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

তাপসী। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য কাগজের মলাট এক টাকা, কাপড়ের বাইণ্ডিং পাঁচ সিকা। এই গ্রন্থে—মীরাবাই, সংঘমিত্রা, রাবেয়া, সেণ্ট টেরেসা, সেণ্ট এলিজাবেথ, সেণ্ট কাথেরিণ, মাদাম গেঁয়ো, কুমারী কব, রাণী শরৎসুন্দরী ও দেবী অঘোর-কামিনী—স্বদেশের ও বিদেশের এই দশজন ধর্ম্মশীলা নারীর জীবন-চরিত সংগৃহীত হইয়াছে। ধারাবাহিকতা সর্ব্বত্র বজায় না থাকিলেও রচনা চলন-সই; এবং এ জীবন-আখ্যায়িকাগুলি বালক-বালিকাদিগকে পড়িতে দিলে তাহারা উপদেশ ও আনন্দ লাভ করিবে।

বীরভূম-বিবরণ। প্রথম খণ্ড। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। "বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি" হইতে প্রকাশিত ও কলিকাতা বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ভূমিকা লিখিয়াছেন;—ভূমিকাটি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। তবে প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন, এ গ্রন্থ ইতিহাস নহে; "বীরভূমের কয়েকটি পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনীমাত্র।" ইহাতে কেতমপুর, ভদ্রপুর, সুপুর, ভাণ্ডীরবন, বক্রেশ্বর, মঙ্গলডিহি জোফ্‌লাই, কেন্দুবিল্ব ও শ্যামারূপার গড়ের (ত্রিঘষ্টি, গড় বা ঢেকুর) কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। কাহিনীগুলি বঙ্গদেশের এক অংশের প্রাচীন কীর্ত্তি-কথা; ঐতিহাসিকের কাছে সেগুলির মূল্য যথেষ্ট আছে—গ্রন্থে বহু চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে—ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কাস্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

৪১শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ [২য় সংখ্যা

গুরুজী

আজ অবিনের গুরুর কাছে সে আমাকে নিয়ে যাবে। শুনেছি তিনি মহা সাধুপুরুষ এবং জাতিস্মর। আমি সেদিন আমার গেরুয়া মলিদার ওভার-কোটটার উপরে আজ-কালের স্বামীজীর ধরণে পাগড়িটা বেঁধে, পকেটে কবীরের পুঁথিখানা নিয়ে, জাহাজে গিয়ে চড়লেম। নাকে সোনার চশমা এবং হাতে রূপো-বাঁধা শুয়োরের দাঁতের ছড়ি আর পায়ে ফ্লানেলের পেণ্টা-লুনের নীচে ব্রাউন-লেদার বুটটায় আমাকে ফকির কি ফিকিরবাজ পুলিসের সি-আই-ডি অথবা আর-কিছু দেখাচ্ছিল তা আমি ঠিক বলতে পারিনে; তবে আমার মনের ভিতর সেদিন যে একটু গেরুয়ার আভা পড়েছিল এবং আমি গান বাজনা না করে খুব গম্ভীর হয়ে বসে থাকায় জাহাজে তাবৎ যাত্রী আমার দিকেই যে থেকে-থেকে কটাক্ষপাত করছে এটা আমি বেশ বুঝছিলেম। বুড়ো গোলোকবাবু সেদিন খবরের কাগজটা চশমার অতটা কাছে নিয়ে কেন যে অমন মনঃসংযোগ দিয়ে জুটের বাজার-দরের কলম্‌টা আগাগোড়া মুখস্থ করছিলেন সেটা জানতে আমায় অধিক কষ্ট পেতে হয়নি।

যাই হোক অন্যদিনের মতো সেদিনও নিয়মিত উত্তরপাড়ায় এসে জাহাজ ভিড়লো। অবিনে-আমাতে সেখানে নেমে পড়ে থার্ড এবং ফোর্থ এই দুই ক্লাসের মাঝামাঝি গড়নের ছক্কড় গাড়িতে ধূলো এবং ঝাঁকানি খেতে-খেতে আধক্রোশ-টাক্ গিয়ে রাজাদের একটা বাগান-বাড়ির ফটকের সাম্‌নে গাড়ি, ঘোড়া, মায় গাড়োয়ান আমরা দুজনে খানার ভিতরে উল্টে পড়লেম। একখানা মোটরগাড়ি একরাশ ধূলো আর খানিক পেট্রোলের বিকট গন্ধ আমাদের নাক-চোখের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। অবিন সেই পলায়িত মোটরের

চলন্ত ধূলোর মধ্যে আরো গোটা-কতক ইংরিজি গালাগাল মিশিয়ে দিয়ে আমাকে চাকা-ভাঙা গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলে। আমার চশমার একখানা কাঁচ গেছে ভেঙে, পাগড়িটা গেছে খুলে, এবং শুয়োরের দাঁতটা খসে গিয়ে আমার লাঠিটা হয়ে পড়েছে ফোগলা। অবিন আমার চেহারা দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। আমি গায়ের ধূলো যথাসম্ভব ঝেড়ে-ঝুড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম সে যেমন ফিট্-ফাট্ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তেমনি আছে;—তার কালো কোটের একটি ভাঁজও এদিক-ওদিক হয়নি এবং তার বুকের মাঝে ফুটন্ত গোলাপ-ফুলটি থেকে একটি পাপ্‌ড়িও ঝরে পড়েনি। অবিন লম্বায় চওড়ায় আমার চেয়ে বেশী বই কম হবে না, অথচ ঐ ছক্কড় গাড়িটার খাঁচা-কল থেকে কি-করে এমন সাফ্ বেরিয়ে গেল তা জানিনে; কিন্তু তাকে দেখে আমার হিংসে হয়েছিল সত্যি বলছি। ধূলো-মাখা গেরুয়া পাগড়ি ঝেড়ে-ঝুড়ে সাম্‌লে নিলেম বটে কিন্তু বাড়িতে আয়না দেখে যেমন চোস্ত করে সেটাকে বেঁধেছিলেম তেমনটা আর হল না;—ব্রহ্মতেলোর মাঝখান থেকে কাপড়ের ফুঁপিটা সাপের ফনার মতো আর উদ্যত হয়ে রইল না—বাঁ-কানের উপরে লট্‌কে পড়ল; এবং এই আকস্মিক দশা-বিপর্য্যয়ে দেহটা অনেকখানি ধূলো মেখে নিলেও, মন তার নিজের গেরুয়া রংটুকু আর বজায় রাখতে পারলে না। অবিনের সঙ্গে সেই রাজার বাড়িতে সাধু-দর্শনে প্রবেশ কল্লেম যখন মন আমার সম্পূর্ণ অসাধু এবং অধীর।

রং-ওঠা লোহার শিক-দেওয়া একটা ফটকের মাঝ দিয়ে ইটের খাদরী-করা চওড়া একটা রাস্তা খানিক সোজা গিয়ে বেড়ির মতো ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে টালি-বসানো একটা বারাণ্ডার চার ধাপ সিঁড়ির নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে, রাস্তাটায় এককালে লাল সুরকি ঢালা ছিল, এখন সেগুলো উড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় সবুজ শেওলার ছোপ ধরেছে। রাস্তার ধারে ধারে পুরোনো গোটাকতক পাটা-ঝাউ এবং এখানে-ওখানে মাটীর পরী রাখবার গোটা দুচার ইটের পিল্‌সে। পরীগুলোর মাটির দেহ বারো-আনা ক্ষয়ে গিয়ে ভিতরের শিক্‌গুলো বেরিয়ে পড়েছে। বাগানটা বাড়ীর পিছন পর্য্যন্ত ঘুরে গিয়ে, একটা টানা রেলিঙের ভিতর দিয়ে যেখানে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে সেইখানে একসার শুক্‌নো গাঁদা ফুলের গাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির দুধারে সিংহি বসবার দুটো বড় চাতাল। একটার উপর থেকে সিংহি অনেক কাল পালিয়েছে—সেখানে একটা ছেঁড়া মাদুর রোদে শুকচ্ছে; আর-একটা চাতালে পোড়ামাটির মুখ-থিঁচিয়ে এখনো এক পশুরাজ ভোম্বলদাস তার খসে-পড়া ল্যাজের সরু শিক্‌টা আকাশের দিকে খাড়া করে থাবাহীন এক পা শূন্যে উঁচিয়ে বসে আছে—।

আমরা সিঁড়ির ক'টা ধাপ পেরিয়ে মোটামোটা তিনটে থাম-দেওয়া বারাণ্ডা পেরিয়ে এক বড় ঘরে ঢুকলেম। ঘরটা খুব লম্বা, মাঝে বাঘ-থাবা পুরোনো মেহগ্নি কাঠের মস্ত একটা গোল টেবিল, অনেকখানি ধূলো আর খুব জম্‌কালো একটা চিনে-মাটির ফুলদান নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। ফুলদানটার একটা হাতোল আর খানিকটা কানা ভাঙা; আর তার গায়ে বড়-বড় গোলাপ-ফুল প্রজাপতি আঁকা। ঘরের ঝাড় ক'টা ময়লা গেলাপ দিয়ে মোড়া—আগে লাল, এখন কালো সালুমোড়া শিকে ঝুলছে। ঘরের সবুজ খড়খড়ি ছিল; এখন ফিকে হতে-হতে দাঁড়িয়েছে প্রায় গঙ্গামৃত্তিকার রং। ঘরের পাশের দেওয়ালগুলোতে একটা-করে আয়না, একটা-করে মেমের ছবি,—ছবির কোনটার কাপড়-পরা, কোনটা নয়। মাঝের দুই বড় দেওয়ালে একদিকে একটা বড় ঘড়ি, আর-একদিকে চওড়া গিল্টির ফ্রেমে বাঁধা জরীর তাজ-মাথায় এক সুপুরুষের চেহারা,—মনে হচ্ছে যেন সামনের দেওয়ালে সেই অনেক দিনের বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ির কাঁটা-দুটোর দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

অবিন ঘরে ঢুকেই বাঁকা-পায়া গোল-পিট পাঁচ-রঙা ফুল-কাটা ছিট্-মোড়া একখানা চৌকিতে ধপাস্ করে বসে পড়ল। দুজনে প্রায় এক কোয়াটার বসে আছি; অবিনের মুখে কথাই নেই। আমরা কেন যে এখানে এসেছি সেটা যেন অবিন ভুলেই গেছে। আমি বেগতিক দেখে—একটা উড়ে ঘরের একটেরে, যেখানে খানিক রোদ এসে পড়েছে, একটা সিগারেটের মরচে-ধরা টিনের কৌটো থেকে দোক্তার পাতা একটা একটা বার করে রোদে মেলিয়ে দিচ্ছিল সেইখানে আস্তে আস্তে গিয়ে বল্লুম—সাধু কোথায় রে? উড়েটা ঘাড় না উঠিয়েই, সাধু এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করেই আবার নিজের কাজে মন দিলে। আমি আবার বল্লুম—ওরে সাধু কোথায়? তাঁকে একবার খবর দে না!

দাসো একবার পানের দাগধরা লাল ঠোঁট দুটো কুঁচ্‌কে বল্লে—সাধু? আমিই তো সাধু!

আমার আর রাগ বরদাস্ত হলনা; আমি আমার ভাঙা ছড়িগাছটার বাকি অংশটা তার পিঠেই আজ ভেঙে যাব বলে উঁচিয়েছি আর অবিন ডাকলে—ওহে এদিকে। ফিরে দেখি যাঁকে দেখবার জন্যে আসা তিনি দাঁড়িয়ে। চোখা-চোখি হবামাত্র তিনি একটু-খানি হেসে কবীরের এই পরখটা সুর করে আউড়ে নিলেন—

মন ন রঙ্গায়ে রঙ্গায়ে যোগী কপড়া।

আমার পকেটে কবীরের পুঁথি, এটা ইনি নিশ্চয় জেনেছেন; আর কথাগুলো আমাকেই বলা হল এই ভেবে আমি একটু বিস্মিত একটু ভীত আর একটু লজ্জিত হয়েই তাঁর পায়ে প্রণাম কল্লুম। তিনি হো হো করে হেসে উঠে বল্লেন—ওহে অবিন, তোমার বন্ধু যবনের পায়ের ধূলো নিয়ে ফেল্লেন, এটাতো ভালো হল না!

ইনি যবন! বিস্ময়ে আমি যেন অভিভূত হয়ে অবিনের দিকে চাইলেম। মনে একটু যে ঘৃণার উদয় না হয়েছিল তা নয়। অবিনটা তার পাতলা ঠোঁট খুব চেপে এবং বড়-বড় চোখে প্রকাণ্ড একটা কৌতুকের নিঃশব্দ হাসি নিয়ে আমার মুখে চেয়ে রইল। আমার তার উপর ভারি রাগ হচ্ছিল; সে যদি আগে বলতো তো যবনের পদধূলি—কথাটা মনে আসবামাত্রই সাধু একেবারে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন—

কোই রহীম কোই রাম বখানৈ, কোই কহে আদেস
নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল ঢুঁর ফিরে চঁহু দেশ।

আমার বেশটার উপরে এই ঠেস্—সেটা যিনি কল্লেন তিনিও যে ভেকধারী কেউ নন এটা তাঁর সাদা সিল্কের পাঞ্জাবীর উপরে কাশ্মীরি শাল এবং তার নীচে লুঙ্গী ফ্যাসানে পরা নূতন ধোয়া থান ধুতি দেখে কিছুতেই আমি ভাবতে পারলেম না। এমন সাধু আমি অনেক দেখেছি এবং সময়ে-সময়ে তাদের পাল্লায় পড়ে অনেক ঠেকেও শিখেছি। আমি একটু চেঁচিয়েই অবিনকে বল্লেম—চল হে জাহাজ আবার না ছেড়ে দেয়। সাধু-দর্শন হল; চল এখন গঙ্গাস্নান করে বাড়ি যাই।

অবিনের যিনি গুরু, তিনি এতক্ষণে এসে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন—এই এতক্ষণে আপনি আমায় যথার্থ চিনেছেন। আসুন একটু চা আর গোটা-দুই মুরগীর ডিম না খাইয়ে আপনাদের ছাড়া হচ্ছে না।

বলা বাহুল্য যবনের পদধূলিতে ঘৃণা থাকলেও, যবনপালিত পক্ষীজাতির উপরে আমার কোন আক্রোশ ছিল না। জেলের জল শাস্ত্র-মতে অগ্রাহ্য বলে জেলের মাছও যে বাদ দেব এমন মূর্খ আমি ছিলেম না, বা জেল-খানার ছত্রিশ-জাতের গায়ের বাতাস মনুর মতে নিষিদ্ধ হলেও জেলের তেল অথবা সেই তেলে ভাজা সহরের ছত্রিশ-জাতের পদধূলি মাখানো গরম ফুলুরি যে অনাদরের সামগ্রী এটা স্বীকার করতে আমি একেবারেই নারাজ ছিলেম। তার পর সদ্য ধোপ-দেওয়া সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলে যখন অতি বিশুদ্ধ তামার কোশা কমণ্ডলু তাম্রকুণ্ডুতে টাটকা-পাড়া মুরগীর সাদা ডিম এবং তার চেয়েও পরিষ্কার এবং সাদা পাউরুটি, ঘরের গোরুর দুধ, লিপ্‌টনের চা-পানি—কলের জলের, গঙ্গা জলের নয়—এসে উপস্থিত, তখন অবিনের গুরুকে সাধুবাদ দিতে একটুও আমায় ইতস্তত করতে হল না।

ফকিরটির ভিতরে ফক্‌রেমি কোথাও ছিল না। দেখলেম তাঁর হাতের চিমটেয় তিনি তিনটে পাখীর খাঁচা ঝুলিয়েছেন এবং তাঁর গেরুয়া বসনটা টুকরো টুকরো করে কেটে তিনি বানিয়েছেন খাঁচার ঢাকা এবং পৈতের সুতোয় তিনি বানিয়েছেন ঘুড়ি ওড়াবার সরু লক্; লক্ষ্মীর ঘটটা উল্টে তিনি সরস্বতীর বীণার তুম্বি বানিয়ে নিয়েছেন। বৈরেগীদের যা-কিছু ভণ্ডামি, ও গোঁড়ামির যত-কিছু আসবাব, সবগুলোকে তিনি এমন-এক-একটা অদ্ভুত কাজে লাগিয়েছেন যে সেগুলোর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ না হয়ে হাসি পাবেই পাবে। মনুসংহিতায়, বাইবেলে, কোরাণে যেগুলো শুদ্ধ, সেগুলো বিরুদ্ধ কাজে খাটিয়ে তিনি আপনার চারিদিকে এমন-একটা হাস্যরসের এবং অদ্ভুত রসের অবতারণী করে রেখেছেন যে মন সেখানে এসে দুঃসাহসে ভরে না উঠে যায় না। আমার মনে হল যেন বাইরের একটা পরিষ্কার বাতাস জোর করে আমার বুকের কপাটদুখানা খুলে দিয়ে গেল। এর পর যখন সেই সাধু পুরুষের দিকে চাইলেম তখন তাঁকে গুরু এবং বন্ধু এই দুই ছাড়া আমি আরকিছু মনে করতে পাল্লুম না। আমি গুণগুণ

করে গাইতে লাগলুম—"আরে ইন্ দুহু রাহ না পাঈ, হিঁন্‌দুকী হিংদ বাঈ দেখী, তুর্কণকী তুর্‌কাঈ।

হঠাৎ হাতের কাছ থেকে বীণাটা তুলে নিয়ে বন্ধু আমার, গুরু আমার, তিনি গানের শেষ-চরণ দুটো পূর্ণ করে দিলেন—"কহৈঁ কবীর :সুনো ভাই সাধো কৌন রাহ হবৈ যাঈ"। তার পর তাঁর সঙ্গে কবির লড়াই চল্লো;—আমি গাই, তিনি জবাব দেন। কিন্তু আমার তেমন সুস্বরও ছিল না, আর বীণা বাজাতে তেমন দক্ষতা জন্মজন্মান্তরেও লাভ করব কি না তাও জানিনে।

সে-বেলার ষ্টীমার অনেকক্ষণ ঘাট পেরিয়ে আপনার ঠিকানায় যাত্রী নিয়ে পৌঁছে গেছে—তখন তিনি বীণা রেখে বল্লেন—চল এখন স্নান করে কিছু খাওয়া যাক্। আমি গঙ্গার দিকে চাইতেই তিনি বল্লেন—না ওখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো।

এইটে তাঁর স্নানের ঘর। সাদা পাথরে মোড়া যেন একটা চাঁদের আলোর গহ্বরে এসে ঢুকলেম। মাঝে স্ফটিকের চেয়ে পরিষ্কার গোলাপ-জলের ফোয়ারা! কি বিপুল শুভ্রতার ঘাটে এই মহাপুরুষের সঙ্গে স্নানে নামলেম! যখন আমি এই কথা ভাবছি তখন একটা দাসী—তেমন সুন্দরী আমি কখনো দেখিনি—সোনার একটা পাখীর খাঁচা এনে বন্ধুর হাতে দিয়ে গেল। পাখীর গা-টা বাউলদের শততালি কাঁথাখানার মতো নানা রঙে বিচিত্র। পাখীটা খাঁচার তলায় বসে ধুঁকছে। আর তার রোগা পালক-ওঠা গলাটা থেকে গোপীযন্ত্রের শব্দের মতো গুব্‌গুব্ একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে। বন্ধু সেই মুমূর্ষু পাখীটাকে খাঁচা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে আচ্ছাকরে গোলাপজলের ফোয়ারায় চুবিয়ে দাসীর হাতে একখানা সাদা রুমালের উপরে বসিয়ে দিলেন। পাখীর ডানা-দুখানা সেই সাদা রুমাল ঢেকে পাঁচমিশিলি বদ রং-মাখানো বিশ্রী দুটো হাতের মতো ছড়িয়ে রইল। নির্জ্জীব পাখীটার হলদে দুটো চোয়াল বেয়ে লোহার কসের মতো পাতলা গেরুয়ারক্ত সেই রুমালখানার সাদা রং মলিন করে দিচ্ছে আর মূর্ত্তিমন্ত নিষ্ঠুরতার মতো আমাদের বন্ধু দুটো জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে সেই দিকে চেয়ে আছেন—এ দৃশ্যটা আমার কল্পনারও অতীত। আমার অন্তর বাহির একটা বীভৎস বিস্ময়ে এই লোকটার সঙ্গে আরো বেশী-করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার উৎকট আকাঙ্খায় টলমল করে উঠল। এই দেখলেম এঁকে মহাপুরুষ, আবার এই দেখছি ঘোর নৃশংস, মৃত্যুর মতো নির্ম্মম। এ রহস্যের ব্যূহভেদ একমাত্র অবিনই করতে পারবে জেনে আমি তার শরণাপন্ন হলেম। কিন্তু সে আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে বল্লে—আমি পারবো না, ইচ্ছা হয় তুমি ওঁকে শুধোও!

আমার আর ভোজনে সুখ হল না, শয়নে শান্তি এল না। মহাপুরুষ উপাদেয় রকমেই আমাদের পান ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবিনটা দিব্বি সেগুলো উপ-ভোগ কল্লে এবং বেলা চারটের সময় ফিরতি ষ্টীমার ধরার জন্যে ঠিক সময়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আমার এস্থানটা থেকে কিছুতেই নড়তে ইচ্ছা ছিল না। এবার আমি অবিনের ঠিক পাল্টা জবাব দিলেম—আমি যাবো তুনা; তোমার ইচ্ছা হয় মি যাও!-কত

আশ্চর্য্য ব্যাপার চোখের উপরে ঘটে গেল, তাতে অবিনের কৌতূহল জাগেনি ; কিন্তু ওই যে বলেছি যাবো না, অমনি তার মনে একটু 'কেন' জাগল এবং দেখতে-দেখতে সেটা একটা বিরাট কৌতূহলে পরিণত হল। সে ছড়িগাছটা আর ওভারকোটটা খুলে রেখে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে শুধোলো —নিমন্ত্রণ পেয়েছ নাকি! আমি গম্ভীর হয়ে বল্লেম—'হুঁ'। অবিনের কৌতূহলের আবেগ দেখে হাসি পাচ্ছিল ; সে একেবারে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে—এই-খানে তুমি রাত কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছো ? একি সম্ভব!—অসম্ভব কেনইবা হবে ?—অবিন বোধ হয় আমার মুখ দেখে কতকটা এঁচে ছিল আমি তাকে ভোগাচ্ছি। সে এবার জোরের সঙ্গে বল্লে—অসম্ভব ; কেননা আমার পক্ষে সেটা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি!—বলেই অবিন ওভারকোট পিঠে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি সেই মহাপুরুষ ঘরে এসে বল্লেন—যা এতদিন অসম্ভব ছিল আজ তা সম্ভব হোক ; কি বলেন ?

আমাদের আর দুবার করে অনুরোধ করতে হল না। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যখন তাঁর দিকে চেয়ে দেখলেম তখন তাঁর হাতে হাতির দাঁতের রং একটা পাখী দেখলেম। সেটা পায়রা কি ঘুঘু কিছু বোঝা গেল না ; আর তাঁর পাশে যেন পাথরে গড়া একটি সুন্দর ছেলে।

আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশের নীলের উপরে সাদা আলোর একটা জাল বিস্তার করে দেখা দিয়েছেন। এমন পরিষ্কার ধব্‌ধবে রাত আমি দেখিনি। তার মাঝে একটা শ্বেত-পাথরের মন্দিরে আমরা এসে বসেছি। অবিনের পরণে তার সেই নেভিব্লু চায়নাকোট, আমার সেই গেরুয়া অলষ্টর, আর তাঁর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সাদা সাজ। তাঁর মাথার চুল যে এত সাদা তা পূর্ব্বে আমার চোখে পড়ে নি। যেন সাদা ফেণার মধ্যে তাঁর সুন্দর মুখ শ্বেত পদ্মের মত দেখা যাচ্ছে। আজ কি সাদার মধ্যেই এসে আমরা ডুব দিলুম। মেঘ যখন তার সমস্ত জল ঝরিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে উঠেছে এ তেমনি সাদা। হিমালয় পর্ব্বতের শিখরের তুষার যখন তার সমস্ত তরলতা সমাহার করে শুভ্র কঠিন হয়ে উঠেছে এ তেমনি সাদা। এরি মাঝে তিনি আস্তে আস্তে তাঁর ইতিহাস সুরু কল্লেন—পূর্ব্বজন্মে যাগ-যজ্ঞ দানসাগর শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণভোজন ও কুমারী দানে সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দেবার পুণ্যে আমি তিন ত্রিশে নব্বই লক্ষ বৎসর বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক আর শিবলোকে বাস করে শেষে অমরা-বতীতে ইন্দ্রত্ব পদ দখল করে বসলেম। সে বারো হাজার বৎসর নন্দনবনে চিরযৌবন নিয়ে কি আনন্দ, কি বিলাসের মধ্যেই যে বাস কচ্ছিলেম তা বর্ণনাতীত। তোমরা এখানে মোগল বাদসাহের বাবুগিরির যে-সব গল্প পড়ে অবাক হয়ে যাও সেখানকার তুলনায় সেগুলো কি তুচ্ছ! সেখানে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শ্রান্তি নেই, অবসাদ নেই ;—মনের বাগানে চিরবসন্তের ফুলগুলো সৌন্দর্য্যের সুখের লালসার মত্ততার অফুরন্ত পেয়ালার মতো রসে চিরদিন ভরপুর রয়েছে। অতৃপ্তির শিখা সেখানে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মতো দিনরাত জ্বলছে। স্বর্গের সেই ক'টা দিন আমার ভোগের অনলে উর্ব্বশী রম্ভা

ত্রিলোত্তমাকে আহুতি দিয়ে প্রায় স্বর্গবাস শেষ করে এনেছি সেই সময়ে ইন্দ্রানীর উপরে আমার লোলুপ দৃষ্টি পড়ল। আমার কাছে অপ্রাপ্য তখন কিছুই ছিল না। আমার শেষ পুণ্যফল একটা বিরাট অজগরের মতো উত্তপ্ত নিশ্বাসে আকর্ষণ করে শেষে একদিন ইন্দ্রের ইন্দ্রানীকে আমার দুই বাহুর মধ্যে এনে উপস্থিত কল্লে। সেই রাত্রি—সেই সুনীল আকাশের বাসর-ঘরে প্রমোদের বীণার ঝঙ্কারে নারীর ক্রন্দন, সতীর নিশ্বাসের করুণ সুর ডুবে গেল—অশ্রুত রইল! সেই আমার স্বর্গবাসের শেষ-প্রমোদ-রজনী, আমার চির যৌবনের উত্তেজনার মদিরা পূর্ণমাত্রায় আমি পান করলেম। আর সেই রাত্রিপ্রভাতে ইন্দ্র-দেবের অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে বারো হাজার বৎসরের শ্রান্তি আর অবসাদ প্রথম এসে আমাকে আক্রমণ করলে। ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র থেকে আপনাকে রক্ষা করবার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি গিয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেম। তিনি আমাকে একগাছা হরিনামের মালা দিয়ে বল্লেন,—তুমি নিজের কর্ম্মফলেই স্বর্গে এসেছিলে এবং তারি ফলে আবার পৃথিবীতে চলেছ ; হরিনাম কর আবার এখানে তোমার স্থান হবে। স্বর্গ যে কি ভয়ঙ্কর স্থান তা আমার জানতে বাকি ছিল না। অমর অতৃপ্তিতে আমার আর লোভ ছিল না। আমি বিষ্ণুকে নমস্কার করে ব্রহ্মার কাছে এলেম। তিনি তাঁর মানসপুত্রদের লেখা খান-কতক সংহিতা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, এতে যেমন বিধান লেখা হয়েছে সেই মতো যথাবিধানে পৃথিবীতে গিয়ে তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর, স্বর্গ আবার তোমার করতলে আসবে। আমি সেখান থেকেও হতাশ হয়ে দেবাদি-দেবের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত নিবেদন কল্লেম। তিনি বল্লেন তুমি কারো কথা শুনো না, স্বর্গলাভের সহজ উপায় আমার হাতে আছে। এই এক টিপ সিদ্ধি মুখে ফেলে দাও, তোমাকে আর স্বর্গের ফটক পেরিয়ে বেশী দূর যেতে হবে না ; আমার দূতেরা ঝুঁটি ধরে এখানে তোমায় ফিরিয়ে আনবে। আমি তখন জগৎ-জননীর পা জড়িয়ে ধল্লেম। মা আমাকে কৃপা করে তিন রঙের তিনটি কপোত দেখিয়ে বল্লেন—পৃথিবীতে এই তিন জন তোমার বন্ধু থাকবে এদের চিনে নিও, তবেই জীবন তোমার শান্তিতে কাটবে, না হলে আবার এই স্বর্গবাস আর এই স্বর্গবাসের লাঞ্ছনা তোমার অদৃষ্টে ঘটবে নিশ্চয়। আমি বিষ্ণুর জপমালা, ব্রহ্মার ঘেরণ্ডসংহিতা আর শিবের সিদ্ধির পুঁটুলি টেনে ফেলে সেই কপোততিনটিকে বুকে জড়িয়ে ধল্লেম। একটি নীল, একটি গেরুয়া, একটি সাদা। দেখতে দেখতে সপ্তস্বর্গ রাম-ধনুকের রঙের মতো আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমি এইখানে নেমে এলেম। সেই তিনটি কপোতী হচ্ছেন—

অবিন অমনি ফস্-করে বলে উঠলো—বস্ গুরুজী, আর না, গল্পের ভিতর মোরালিটি ও নীতি-কথা এসে মিশছে, রক্ষে করুন! এই নীলকোট আমি—আপনার যৌবনের ইয়ার—আমিই হচ্ছি সেই নীল কপোত ; মাঝে দুদণ্ডের মতো এই গেরুয়া কপোত আমার বন্ধু,—এ আপনার দাঁড়ে বসে ছোলা খেলে এবং আপনার

গোলাপজলের ফোয়ারার পিচ্‌কিরিতে এর ভিতরের ও বাইরের বৈরাগ্য গেরুয়া রক্ত বমন করে স্বর্গলাভও কল্লে; তবে এখন আপনার পাশে শিশুবেশে যে সাদা কপোত দেখা দিয়েছেন ওঁকে নিয়েই আপনি শান্তিতে থাকুন, আমাদের আর নীতিকথা বলে দগ্ধাবেন না।

শাণিত ছোরার উপরে আলো পড়লে যেমন হয় মহাপুরুষের চোখদুটো অবিনের এই ধৃষ্টতায় ঝক ঝক্ করে জ্বলে উঠল্। তিনি আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে কোমর থেকে সাপের মতো বাঁকা একখানা ছোরা বার করে অবিনের দিকে এগিয়ে চল্লেন। আমি চীৎকার করে অবিনকে সাবধান করতে যাব কিন্তু কথা সরলনা;—সেই ছেলেটা এসে আমার গলা এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, সেই সাদা পাখীটা ঝট-পট করে ডানা ঝাপ্‌টে মাথার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অবিন তার দুই ঘুসো বাগিয়ে সেই মহাপুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেবলি বলছে—গল্পে নীতিকথা অসহ্য!—তার পর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলো আর শব্দের মাঝে মহাপুরুষ অন্তর্ধান কল্লেন। আমি চম্‌কে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলেম জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি; অবিন আমার মুখে কেবলি জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে; আমি যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি। মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটা ভিজে পট্‌ লাগানো। এই সময় আমাদের এক উকিল সহযাত্রী অবিনকে প্রশ্ন করলেন—গাড়িটা যে মটোরের ধাক্কায় উল্টে গেল আপনি তার নম্বরটা নিলেন না কেন? এঁর মাথায় যে-রকম চোট লেগেছে তাতে নালিশ চলতো।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউসুফের প্রতি জুলেখা

(জামি হইতে)

বিধাতা তোমায় দেছেন, দেবতা,
গুল্-ভাতি যাহা কপোলে ফুটে।
নিখিল পাগল তব মহিমায়
ক্রীতদাস হয়ে চরণে লুটে।
তোমার ললাটে যে জ্যোতি উজলে
চন্দ্রমা তাহে হয়েছে ম্লান,
তোমার আঁখির ভ্রূযুগ হেরিয়া
মদন ত্যজেছে ধনুর্ব্বাণ।

উপাসনারত বয়ান তোমার
দেবতা তাহাতে করিছে বাস,
ভক্তে বাঁধিতে তোমার শীর্ষে
কুঞ্চিত কালো কেশের ফাঁস।
তোমার পিধানে বসন ভূষণে
তব অঙ্গের রশ্মি লাগে,
শুভ্র লোহিত কুসুমের রাশি
ফুটে তাহে যেন ত্রিদিব-বাগে।

তোমার অধরে মধুর হাসিটি
চারু কোরকের বিকাশ সম,
রাঙা গোলাপের ঝরার মতন
তব পদক্ষেপ রম্যতম।
তুমি আছ বলি সর্ব্বংসহা
সব গুরুভার বহিতে পারে,
তোমার বিরহে এ ধরণী বুঝি
অতলে ডুবিবে ভূধর-ভারে।
তুলে ধর মোরে কৃপা কর প্রিয়
হৃদয়বন্ধু করুণা কর,
সকল জড়তা সব বন্ধন
সব ব্যথাসহ নিরাশা হর,
দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় শোষণে
ব্যাকুল পোষণে—অশ্রু ধায়

অশনি-আহত বৃক্ষের মত
হৃদয় আমার বিদরি যায়।
হৃদয়-ক্ষতের স্নিগ্ধ প্রলেপে
জুড়াও আমার হৃদয় জ্বালা
দুলাও বন্ধু—দুলাও কণ্ঠে
তোমার বাঞ্ছার রতন-মালা।
যুগযুগ মোর হৃদয় দহেছে
হৃদয় হয়েছে সাহারা যেন,
খোস-বাগানের খুস্‌বু তোমার
তার মাঝে তুমি বহালে কেন?
বহাইলে যদি ঝলসিত হৃদি—
—কুটুলে ঢাল' জীবন-সুধা
চির অনশন শোষণ দূরিয়া
মিটাও বন্ধু হৃদয়-ক্ষুধা।

শ্রীকালিদাস রায়।

আলেয়ার আলো

সাত

সরমার কথা

নতুন বাড়ীতে গিয়ে নামতেই দেখি, দরজার কাছে হাসিমুখে মোহনবাবু দাঁড়িয়ে। তিনি বাবাকে নমস্কার করে আমাকে পথ ছেড়ে দিয়ে, একপাশে সরে গেলেন। ... ...বাবা আর তিনি গাড়ী থেকে জিনিষপত্তর নামাতে লাগলেন, আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম।

ছোট্টখাট্টো দিব্যি বাড়ীখানি। উপরে চারটি, নীচে চারটি ঘর। আমরা আগে যে বাড়ীখানিতে ছিলুম, সেখানি কিন্তু এর চেয়েও ছোট আর পুরাণো। অথচ, এর ভাড়া দশ টাকা আর তার ছিল কুড়ি। একটু আশ্চর্য্য হলুম। তাই ত, ভাড়ার এত তফাৎ হয় কি? আমাদের জন্যে মোহন বাবু নিশ্চয় তাঁর বাড়ীর ভাড়া কম-করে ধরেছেন! আমাদের উপর তাঁর এতটা দরদ কেন?... ...কে-জানে!

দক্ষিণমুখো ঘরদুখানি আমার ভারি পছন্দ হোল। এর একখানিতে থাকবেন বাবা, আর-একখানিতে আমি। তাড়াতাড়িতে যতটা পারলুম, ঘর-দুখানা গুছিয়ে-গাছিয়ে নিলুম।

আমার ঘরের সামনেই বারান্দা।

বারান্দায় গিয়ে দেখলুম, আমাদের বাড়ীর গা-ঘেঁসেই মোহনবাবুর বাড়ী। তার পিছনে একটি ছোট বাগান, তার মাঝখানে একটি পুকুর, সেটিও ছোট। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ফুলের ভুর্‌ভুরে গন্ধ ভেসে আসছিল;—দেশ ছেড়ে পর্য্যন্ত এমন মিঠে ফুলের গন্ধ একদিনও পাইনি, এমন তাজা সবুজ রং একদিনও চোখে পড়ে-নি—আজ যেন প্রাণে একটু শান্তি এল। ফুলের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে আপনাআপনি দেশের ছবি জেগে উঠল:—আমাদের সেই অগোছালো, কিন্তু ফলে-ফুলে পাখীর ডাকে ভরা, জামালকোটার বাতাড়ে ঘেরা, বাতাসে চঞ্চল সবুজ বাগানখানি; তার একদিকে গরু চরাবার বাথান—সেখানে রোজ দুপুরে বটতলায় বসে, তরল রোদে ধোয়া ধূ-ধূ মাঠের পানে তাকিয়ে, রাখালের ছেলে ঘুঘুর কাঁদুনীর সঙ্গে বাঁশের বাঁশীতে অলস রাগিণী ধরত; আর এক দিকে সারি সারি কচুঝোঁপ ও স্যাওড়াগাছের পরে, আইরি ক্ষেতের পরে গঙ্গার দুধের মত ধারাটি চরে চরে হাত বুলিয়ে আল্পনা এঁকে বনের আড়ালে কোথায় মিলিয়ে গেছে!... ...দেশের ভিজে মাটির সেই সোঁদা গন্ধটুকু পর্য্যন্ত আমি ভুলিনি-গো, ভুলতে পারি-নি।

মাগো, এই ধুলোভরা কাদাভরা ধোঁয়া-ভরা কলকাতায় দেশের ঘর-দোর ছেড়ে লোকে যে কি সুখে এসে থাকে, তা লোকেই জানে! কলকাতার নামে সকলকার মুখ-দিয়ে যেন লাল পড়ে! আমি কিন্তু কলকাতার পায়ে গড় করছি—এই ক-দিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে; মনে হচ্ছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি সব যা-তা নানামথানা ভাবছি, এমন সময় বাবা উপরে এলেন। বললেন, "সরো, কেমন-বাড়ী?"

—"হ্যাঁ, দিব্যি বাড়ী বাবা!"

—"অথচ, ভাড়া এত কম!"

—"ত্যাখ বাবা, আমার বোধহয় মোহনবাবু আমাদের কাছ থেকে কম ভাড়া নিচ্ছেন।"

—হ্যাঁ সরো, আমারও তাই মনে হচ্ছে। মোহন ছেলেটি বেশ—না?"

—"হ্যাঁ, তিনি খুব ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের এ-রকম পদে-পদে ঋণী হওয়াটা ত ভাল নয় বাবা!"

কিন্তু, কেবা শোনে কার কথা! হঠাৎ মোহনবাবুদের বাগানখানি দেখতে পেয়ে বাবার আনন্দ আর ধরে না! তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে গিয়ে ঘাড় নাড়তে-নাড়তে তারিফ করে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এই ইঁটের কোটরে বাগান—গোবর গোলাপফুল! আঃ, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল! ত্যাখ্ সরো, ত্যাখ্, কেমন সব ফুল ফুটেছে, কেমন চমৎকার গন্ধ আসছে! সুতরাং—"

বাবার এই "সুতরাং" কখন্, কোথায় কোন্ অর্থে বসে, আমার আর তা জানতে বাকি ছিল না। বুঝলুম, এখন তিনি এখানেই অন্তত ঘণ্টাদুয়েকের জন্যে আস্তানা গাড়বেন। কাজেকাজেই বাবাকে সেখানে একলা বসিয়ে রেখে আমি গেরস্থালীর কাজে গেলুম।

সন্ধ্যার পরে কাজকর্ম্ম চুকিয়ে আমার ঘরে ঢুকলুম।

আজ্‌কে ভারি গুমোট্, ঘরে ঢুকে দম যেন আঁটকে আসতে লাগল। তাঁড়াতাঁড়ি জানলা-দরজাগুলো খুলে দিলুম। মোহনবাবুদের বাড়ীর দিকে যে জানলাটা ছিল, সেটা খুলতেই একটা আলোর ঢেউ এসে আমার চোখ-মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জানলা দিয়ে মোহনবাবুদের বাড়ীর একটি ঘর দেখা গেল। সে ঘরে বিজলীর আলো জল্‌ছে। একদিকে চক্‌চকে বইএ-ভরা দুটি আলমারী; তার সুমুখেই একটি সবুজ বনাত-মোড়া টেবিল। মোহনবাবু সেই টেবিলের সামনে একখানা বইএর উপর একমনে ঝুঁকে রয়েছেন। বিজ্‌লীর আলো তাঁর মুখে পড়াতে তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মোহনবাবুর স্বভাবটি যেমন নম্র ও শান্ত, তাঁর মুখখানিও তেমনি সুশ্রী! ডাগর চোখ, টানা নাক, মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো।... ...

মোহনবাবু পড়তে-পড়তে একবার মুখ তুললেন। পাছে দেখে ফেলেন—সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলুম।...

মোহনবাবুকে ভাললোক বলে মনে হয়... ...কিন্তু না, পুরুষদের এত-শীঘ্র বোঝা ভার। জীবনে বেশী পুরুষের সংশ্রবে আসি-নি বটে, কিন্তু যাদের ভাল করে চিনতে পেরেছি, তাদের দানব বলতে পারি—দেবতা নয়!

আমার স্বামী,—বাইরে-থেকে দেখলে তাঁর ভিতরে কেউ কোন খুঁৎ বার করতে পারত না; তিনি সুশ্রী, বিদ্বান, ভাল ঘরে তাঁর জন্ম; কিন্তু তাঁর মনের ভিতরটা! বলতে নেই—আজ তিনি পরলোকে, কিন্তু এখনো তাঁকে ভাবলে প্রাণ আমার আঁৎকে ওঠে! রমণীর পক্ষে স্বামীনিন্দা মহাপাপ—কিন্তু অত্যাচারকে যে অভাগীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে-না, ঋষিরা তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা করে গেছেন? এই-যে আমার কপালে স্বামীর নির্দ্দয় পদচিহ্ন চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে, এ ক্ষত কি নারীর গৌরবের নিশানা? এ শুষ্ক ক্ষতে হাত দিয়ে কি আমাকে বলতে হবে, 'স্বামী, তোমার এ স্মৃতিচিহ্নকে আমি পূজা করি!'—এ স্মৃতি কি পবিত্র?

... ...রোজ রাতে তাঁর আশায় পথ-চেয়ে জেগে থাকতুম। কিন্তু তাঁর এলমেল টল্‌মলে পদশব্দ শুনলেই আমার বুকটা গুড়্‌-গুড়্ করে উঠত! হপ্তায় পাঁচ-ছ দিন তিনি ত বাইরে-বাইরেই রাত কাটাতেন; যেদিন অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরতেন, সেদিনও তাঁকে সহজ মানুষের মত আমার প্রাণের কাছটিতে পেতুম না। মদ খেয়ে বাড়ীতে এসে অকারণে কোনদিন আমায় গাল দিতেন, কোন দিন চুলের মুঠি ধরে মারতেন। কোন দিন বা এসেই বেহুঁস হয়ে পড়তেন;—সারারাত শিয়রে বসে আমি তাঁকে পাখার বাতাস করতুম, মাথায় জলের ঝাপটা দিতুম; আর নিজের মনের ভিতরে গুম্‌রে-গুম্‌রে কাঁদতুম।

এম্‌নি করে শ্বশুরবাড়ীতে আমার দিন কাটছিল।

ছেলেবেলায় 'স্বামীসুখ' বলে যে কথাটি

শুনতুম, যার জন্যে রোজ সকালে মাটির শিবের মাথায় বেলপাতা দিয়ে গঙ্গাজল ঢালতুম, এই কি সেই 'স্বামীসুখ'?—পাড়ার সমবয়সীরা যখন আমাকে স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করত, তখন মুখ ফুটে আমি তাঁর নিন্দা করতে পারতুম না; তাদের স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলেও তারা বোধ হয় প্রাণের কথা খুলে বলত না; কারণ, তাদের কারুর কারুর মুখ দেখেই বুঝতুম যে, পতিনিন্দা করে তারাও আপনাদের সতীত্ব-গৌরব খর্ব্ব করতে চায় না। বাঙ্গলা দেশের চির-সহিষ্ণু সতীরা শাস্ত্রকে পদে পদে মেনে চলে কিনা, তাই ত তারা এমন অটল মৌনব্রত গ্রহণ করেছে! আমাদের বলা হয় 'অবলা'—কিন্তু আমরা কি অবলা? পুরুষের মুখ চেয়ে যে রমণীরা হৃদয়ের বিদ্রোহকে এমন করে দমন করতে পারে, তারা কি অবলা?

কিন্তু আ আমার পোড়কপাল,এ 'মৌনব্রত' আমার ধাতে ত সইল না! শাস্ত্রের নিষেধ, ধর্ম্মের শাসন, নরকের ভয়, এ সবই আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে—আমি যে পাপিষ্ঠা, আমি যে ব্রত ভঙ্গ করেছি!... ...সে রাত আমি কখনো ভুলব না। সেদিনও অনেক রাতে তিনি মদ খেয়ে এসেছিলেন। ঘরে ঢুকেই চুলের মুঠি ধরে তিনি আমাকে বিছানা থেকে টেনে নামালেন—ঘুমুচ্ছিলুম, এই আমার অপরাধ! চুল ধরে টানাতে আমি 'উহু' বলে কেঁদে উঠলুম; আমার কান্না শুনে তাঁর আরো রাগ হোল। বললেন, "কী, আবার ছিঁচ্‌কান্না?"—বলেই তিনি আমার পেটে জোরে এক লাথি মারলেন। দু-হাতে পেট চেপে যাতনাভরে আমি ভুঁয়ে বসে পড়লুম।

তিনি বললেন, "ওঠ্! আলমারি থেকে একটা গেলাস বার করে দে!"

জানি না, সেদিন আমার মন কেন বেঁকে দাঁড়াল! একালের নভেলের আদর্শ সতীর মত স্বামীর পায়ের ধূলো আমি সেদিন মাথা পেতে নিতে পারলুম না! গোঁ-ধরে স্পষ্ট জবাব দিলুম, "উঠব না!"

তিনি গর্জ্জে বললেন, "কী! উঠবি-নে?"

—"না, কি করতে পার, কর!"—সে দিন যে মরতে অত ভরসা আমার কি-করে হয়েছিল, আজও তা ভালরকমে বুঝি-নি।

আমার কথায় রেগে তিনি পাগলের মত হয়ে উঠলেন। "তবে রে"—বলে খুব কুৎসিত ভাষায় আমায় রাতে তাই গালাগালি দিয়ে তিনি ফের আমাকে লাথি মারলেন।

সে নিষ্ঠুর পদাঘাত আমার প্রাণের মধ্যে সেই সুপ্ত নারীত্বকে জাগিয়ে তুলে, যে নারীত্ব অন্যায় অত্যাচারকে স্তব্ধ হয়ে সহ্য করতে পারে না! স্বামী আবার পা তুললেন,—কিন্তু সে পা আমাকে স্পর্শ করবার আগেই আমি বিদ্যুতের মত উঠে দাঁড়ালুম! তারপর আগু-পিছু কিছু না ভেবেই, টেবিলের উপর থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে বললুম, "ফের যদি তুমি আমার গায়ে হাত তোল, তবে এই আলো দিয়ে—"বলেই রাগে কাঁপতে-কাঁপতে আমি সেই কাঁচের বড় ল্যাম্পটা মাথার উপর তুললুম।

তিনি ভয়ে-ভয়ে আমার পানে অবাক হয়ে তাকাতে তাকাতে এক-পা এক-পা করে পিছন হটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেইভাবে সেইখানে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।... ...ক্রমেই আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে এল। ল্যাম্পটা হাত থেকে খসে মাটির উপর পড়ে ঝন্‌ঝনিয়ে চুরমার হয়ে গেল।

খাটের ধারে ছুটে গিয়ে বালিসে মুখ গুঁজড়ে কাঁদতে লাগলুম—একদিন সেই ঘরে সেই বিছানাতেই শুয়ে, ফুলশয্যার ফুলের স্বপনে আমি বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম!

সে দুঃখের রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে পুইয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ীতে সেই আমার শেষ রাত, স্বামীর বিছানায় শুয়ে সেই আমার শেষ কান্না!

পরদিন স্বামীর হুকুমে আমি বাপের বাড়ী ফিরে এলুম। বাবা আমাকে একটিও কটু কথা বললেন না, বরং আদর করে কোলে টেনে নিলেন। সমস্ত শুনে স্নেহভরে আমার মাথায় একখানি হাত রেখে বললেন, "বেশ করেছ মা! পুরুষ যদি সবল বলে দুর্ব্বল নারীর উপর অত্যাচার করে, নারী তাহলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে না কেন? যে পূজার অযোগ্য, তাকে পূজা করলে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা থাকবে না।"

স্বামীকে আর-কখনো দেখি-নি, আর-কখনো দেখবও না। স্বামী-মানুষটির কথা ভাবলে এখনো মনে ভয়ের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু আসে না বটে, কিন্তু তবু, তবু... ...স্বামী-নামটি কি মিষ্টি!... ...

এখন মনে হয়, আমার বিবাহের জীবন একটি অনেক দিন আগে-দেখা স্বপ্নের মতন আবছায়া। এই এতবড় পৃথিবীটা, এই বিচিত্র সংসার, এই আশা-আকাঙ্ক্ষার ঢেউ—এ সমস্তই আমার জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমি তা মনে করতেও পারি-না—মনে করলে বাঁচব কেমন করে? থেকে-থেকে আমি ভাবি, অতীতের দুঃস্বপ্ন নিয়ে বর্ত্তমান যেখানে ভবিষ্যতের পদশব্দে দাঁড়াবে, আমার জন্যে সেখানে নবজীবনের আনন্দ-সায়র নূতন প্রভাতের সূর্য্যোদয়ে উথলে উথলে উঠছে!

আট

মোহনের কথা

মুরারিবাবু আমার বাগান দেখে ভারি খুসী হয়েছেন।

বাড়ীর পিছনদিকে খানিকটা খোলা জমি বুনো ঘাস আর বিছুটির জঙ্গলে ভরে অমনি-অমনি পড়ে নষ্ট হচ্ছিল; মাঝখানে যে পুরাণো পান'-ভর্‌তি পুকুরটা ছিল, অব্যবহারে তারও এমনি হাল হয়েছিল যে, দুর্গন্ধে তার ত্রিসীমানায় তিষ্ঠোয়, কার সাধ্য!

জমিটা পরিষ্কার আর পুকুরটার সংস্কার করে আমি এই বাগানখানি মনের মত করে গড়েছি। ভাল ভাল দামী ফুল-গাছ, ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড়, পুরাণো গ্রীক আর্টের নকল-মূর্ত্তি প্রভৃতির জন্যে আমার খরচ হয়-নি বড় কম। কিন্তু খরচ করতে দরদ করি-নি বলেই আমার এ সাধের বাগানখানি ছোট হলেও শ্রী-ছাঁদে অনেক নামজাদা প্রকাণ্ড বাগানের তুলনায় নেহাৎ খাটো হবে না। আর, সুধু খরচ

করলেই ত হয় না—সেই সঙ্গে রুচিও চাই। এই উদ্যান-রচনা নিয়ে আমার আর হরেনের অনেক সময় কল্পনায়-জল্পনায় কেটে গেছে; কোথায় কোন্‌টি রাখলে দেখতে মানান-সৈ বা বেখাপ্পা হয়, তা-নিয়ে দুজনে অনেক মাথা খাটিয়েছি, অনেক তর্ক করেছি।

যত্নের জিনিষকে ভাল বললে মনে আনন্দ হয়। মুরারিবাবুর মুখে আমার বাগানের সুখ্যাতি শুনে আমি পুলকিত হয়ে বললুম, "আপনি ইচ্ছা করলে, যখন-খুসী আমার বাগানে আসতে পারেন। আপনার বাড়ী থেকে আমার বাগানে আসবার পথও আছে, সেটা আমি খুলিয়ে দেব অখন।"

মুরারিবাবু বালকের মত আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, "দেবেন? সত্যি?"

—"কেন দেব না? এ বাগান আপনারই মনে করবেন—ফুল তুলতে ইচ্ছে হয় ফুল তুলবেন—কোন সঙ্কোচ করবেন না।"

—"কি আশ্চর্য্য! ফুল তুললে আপনি চটে যাবেন না?"

—কেন? বাগানে এত ফুল ফোটে, আপনি দু-হাত ভরে নিলেও আমার ক্ষতি হবে না।"

আমার কথা শুনে মুরারিবাবুর ফূর্ত্তি দেখে কে! এই সদানন্দ খোলা-প্রাণ বৃদ্ধের ভাবে-ভোলা মনটি যতই দেখছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। যে বয়সে লোকে স্বার্থভরা সংসারের হাড়হদ্দ বুঝে নেয়, পদেপদে ঠকে দুঃখ-শোকে ভুগে সাবধানী ও কঠিন হয়ে ওঠে, সে বয়সেও যাঁদের প্রাণ এমন শিশুর মতন সাদা থাকে, তাঁরাই ত যথার্থ খাঁটি মানুষ!

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন বাগানের দিক থেকে কার ভৈরবীতে-বাঁধা বেহালার তরল রাগিণী, ভোরের আলোর সঙ্গে আমার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। বুঝলুম, এ আর কারুর নয়, মুরারিবাবুর বেহালা! শুয়ে-শুয়ে একমনে অনেকক্ষণ ধরে শুনলুম, সুরের লীলায় সুরের জোয়ারে প্রাণ যেন কানায়-কানায় ভরে উঠল!

শয্যাত্যাগ করে হাত-মুখ ধুয়ে যখন বাগানের ভিতরে গেলুম, মুরারিবাবুর বেহালা তখনো তালে তালে বাজছে। পুকুরের ধারে মার্ব্বেলের বেদীতে বেহালাখানা বাঁকিয়ে ধরে বৃদ্ধ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, তাঁর কর্পূরের মত সাদা, দীর্ঘ চুলগুলি বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে থর্‌থরিয়ে উঠছে, তাঁর সুরে-বিভোর মুখখানি বুকের পরে নুয়ে পড়েছে,—তিনি যেন তখন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীকে ভুলে গেছেন। যতক্ষণ না বাজনা থামল, আমি তফাতে দাঁড়িয়ে প্রভাতী রাগিণীর সেই বিচিত্র উল্লাস প্রাণ-ভরে কাণ-ভরে পান করতে লাগলুম।

একটি নিঃশ্বাস ফেলে মুরারিবাবু বাজনা থামালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করলুম।

মুরারিবাবু স্মিতমুখে বললেন, "আমার বাজনায় আপনি বিরক্ত হন-নি ত?"

—"বিরক্ত! আপনার বাজনা আমার আজকের ভোরবেলাটিকে সার্থক করে তুলেছে।"

—"হাতে কোন কাজ ছিল না, তাই

কি আর করি, বেহালাখানা কাঁধে করে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি।"—বলে, মুরারিবাবু বেহালার তন্ত্রীগুলির উপরে একবার আঙ্গুল চালিয়ে দিলেন,—তারা একসঙ্গে বিচিত্র কোমল রিঞ্জিনীতে আর্ত্তনাদ করে উঠল,—সে যেন সুরের বিদ্যুৎ!

আমি বললুম, "মুরারিবাবু, আপনার কাছে আমার একটি আর্‌জি আছে।"

মুরারিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার কাছে আপনার আরজি? বলুন, বলুন!"

—"আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলতে পারি।"

—"কি আশ্চর্য্য! বলুন, বলুন!"

—"আমি আপনার কাছে এস্রাজ শিখতে চাই, এতে আপনার কোন কষ্ট হবে-না ত?

মুরারিবাবু ত হো-হো করে হেসেই আকুল! অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, "রক্ষে পাই! এই আপনার আরজি? এতে আবার কষ্ট—অ্যাঃ!—এতে আবার কষ্ট কি, এ ত আনন্দের কথা!"

এমন সময় হরেন এসে হাজির।

মুরারিবাবু খুব খুসী হয়ে বলে উঠলেন, "আরে আসুন, আসুন হরেনবাবু!"

হরেন ধুপ্ করে হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল। তারপর পাঞ্জাবীর বোতামগুলো খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলে, "আনন্দের কথা কি হচ্ছিল মুরারিবাবু? সে আনন্দে কি আমিও ভাগ বসাতে পারব না?"

মুরারিবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "অবশ্য, অবশ্য! আনন্দের কথাটা কি জানেন, আমাদের মোহনবাবুর সাধ হয়েছে উনি এস্রাজ শিখবেন। আপনিও কি শিখতে চান?"

হরেন দুই চোখ বিস্ফারিত করে সভয়ে বলে উঠল, "ওরে বাস্ রে, সঙ্গীত-চর্চ্চা! এ জন্মে ত নয়ই, আসচে জন্মে পারি ত দ্যাখা যাবে!"

মুরারিবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন! মানুষ যে সঙ্গীত-চর্চ্চায় ভয় পেতে পারে, এটা যেন তাঁর ধারণার অতীত ছিল! তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! সঙ্গীতের মত বিদ্যা কি আর আছে? সুতরাং—"

হরেন প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "এর মধ্যে সুতরাং টুতরাং কিচ্ছু নেই মুরারিবাবু! ছেলেবেলায় একবার আমার ওস্তাদ রেখে গান শেখবার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু ঝাড়া একবৎসর ধরে সা-রে-গা-মা সেধেও যখন ষড়জ রেখাব ও গান্ধার প্রভৃতির মধ্যে তফাৎ কোথায় সেটা ধরতে পারলুম না, আমার ওস্তাদজী তখন মাইনে নিয়েও আর আমাকে গান শেখাতে রাজি হলেন না। কাজে-কাজেই সেইদিন থেকে আমি গান-বাজনা শুনতে ভালবাসি, কিন্তু গাইতে বা বাজাতে চাই না। আমি চিনি খেতে চাই, কিন্তু চিনির পুতুল হোতে চাই না।"

আমি বললুম, "আপনি হরেনকে এখনো চেনেন-নি মুরারিবাবু, ও মহা ষণ্ডামার্কো! ও চায় গায়ের জোরে বীণাপাণিকে বশীভূত করতে! ধরুন, আপনি ওকে বেহালায়

সুর বাঁধতে দিলেন। কিন্তু ও হয়ত সুর বাঁধতে বসে বেহালার সমস্ত কাণগুলো এক সঙ্গে চেপে ধরে চড়্‌চড়্‌ করে এমনি মোচড় লাগিয়ে দেবে যে, সে বেহালার মধ্যে আর-কোন পদার্থ থাকবে না!"

—"মোহন আমাকে যথার্থরূপে চিনেছে মুরারিবাবু, সুতরাং ওর কথার প্রতিবাদ করতে চাইনা। অক্ষম ঔপন্যাসিক যেমন ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়ায়, গায়ক হোতে না পেরে আমিও তেমনি পালোয়ান হয়ে পড়েছি! বুঝেছেন মুরারিবাবু, ও গান-বাজনা আমার কর্ম্ম নয়। মোহন গাইতে জানে, বাজনাটাও যদি আপনার দৌলতে শিখে নিতে পারে, শিখুক।"

—"বটে, বটে! মোহনবাবু গাইতে জানেন?—সুতরাং—" মুরারিবাবু মহা-উৎসাহে আমার দিকে ফিরে একেবারে বেহালা বাগিয়ে বসলেন।

আমি অনেক আপত্তি করলুম, কিন্তু সে সব আপত্তি বৃদ্ধের প্রবল উৎসাহের মুখে খড়-কুটোর মত উড়ে গেল! অগত্যা আমি বাধ্য হয়ে একটি গান ধরলুম; মুরারিবাবু সঙ্গে সঙ্গে দুলে দুলে বাজাতে লাগলেন।

গান শেষ হলে, মুরারিবাবু উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কি আশ্চর্য্য! এমন সুন্দর গান থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত রাখছিলেন? মা সরোকে গিয়ে বলতে হবে ত, সে যে গান শুনতে বড় ভালবাসে!"

এই সুরসিক বৃদ্ধকে নিয়ে আজ প্রভাতটি যে কোথা দিয়ে চমৎকার কেটে গেল, তা বুঝতেই পারলুম না।

সে পূর্ণিমার রাত।

ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিলুম, হাস্না-হানার গন্ধ মেখে দখিনা বাতাস এসে সারা ঘর মাৎ করে দিলে।

চেয়ারখানা জানলার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়লুম,—এমন সুন্দর চাঁদনী রাত! এ রাত্রি উপভোগ করবার—ঘুমিয়ে কাটাবার নয়! জ্যোৎস্না যখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিয়রের কাছটিতে এসে সত্য-স্বপনের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তাকে খানিকটা না দেখে যে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, সে হয় অন্ধ নয় গণ্ডমূর্খ!

আমার নিরিবিলি বাগানখানিকে দেখাচ্ছে, ঠিক যেন ছবির মত—দখিনায় টল্‌মলে গাছের পাতায় ঝল্‌মলে আলো, তলায় ঘুমন্ত ছায়া; পুকুরের থর্‌থরে জলে, মার্ব্বেলের ধব্‌ধবে ঘাটের কোলে-কোলে ঢেউয়ের আসা-যাওয়া আর ছল্‌ছলানি কাণাকাণির সঙ্গে আলো-ছায়ার ছিনিমিনি খেলা চলেছে!

ঘাসে-ভরা একটুখানি খোলা জমির মাঝখানে ভেনাসের একটি মর্ম্মর প্রতিমা বসিয়ে দিয়েছি। এ ভেনাস হচ্ছে গ্রীকদের রতিদেবী, আলো-আঁধারে আজ্‌কে রাতে তাঁর শুভ্র মর্ম্মর-শ্রীটুকুও যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে!

এ পাষাণী প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে, ও কে? ভাল করে দ্যাখবার জন্যে সামনে আরো ঝুঁকে পড়্‌লুম,—এ যে রমণী! মুরারিবাবুর মেয়ে, সরমা!

সরমার মুখের একদিকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, তার মাথার চুলগুলি খোঁপার বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে এঁকে-বেঁকে বুক-

পিঠ-কাঁধের উপর এলিয়ে পড়েছে, তার নরম দেহখানিকে জড়িয়ে কাপড়খানি ভাঁজে-ভাঁজে ছড়িয়ে পায়ের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। হাতে তার আঁচল, আঁচলে একরাশ ফুল—গুটিকত ফুল আঁচল উপ্‌ছে মাটিতে ঝরে পড়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এই জ্যোৎস্না-প্রোজ্জ্বল স্তব্ধ রাত্রে যেন কঠিন পাষাণ ভেদ করে ভেনাসের পেলব আত্মা মূর্ত্তি ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে; —আর তারই দুখানি নধর চরণের মধুর স্পর্শ পেয়ে পুলকাঞ্চিত ধরণী আজ ফুলে ফুলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে!

সরমা ভেনাসের মূর্ত্তিটিকে অবাক মুখে দেখতে লাগল; তারপর সেই মূর্ত্তিটির গায়ে হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।... ...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনমনে আঁচল থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে একবার সে নাকের কাছে ধরলে... ...তারপর, তার সেই চুম্বনাস্পদ ওষ্ঠাধর নত করে ফুলের পাপ্‌ড়ির উপর একটি আদরের চুম্বন দান করলে!...ফুলটি তার হাত থেকে খসে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল—সেই সোহাগ-মাখা এক চুম্বনেই কি তার পুষ্প-জীবনের সার্থক অবসান?... ...আরও কিছুক্ষণ সেই-খানে দাঁড়িয়ে থেকে, সরমা আস্তে আস্তে নিজের বাড়ীর পথে চলে গেল,—যেখান দিয়ে গেল সেখানটি আলো করে', যেখান থেকে গেল সেখানটি আঁধার করে'! তাকে হারিয়ে বাগানভরা জ্যোৎস্নার দীপ্তি যেন পরিম্লান হয়ে পড়ল।

সে রাতে আমার ঘরখানাকে মনে হোল যেন, বিজন বন। আমার একাকীত্ব এমন গভীর ভাবে আর কোনদিন অনুভব করি-নি!

উপন্যাসে 'প্রথম দর্শনেই প্রেম' হোতে দেখলে সমালোচকরা যৎপরোনাস্তি চমকে ওঠেন। আমার বিশ্বাস, এই সমালোচকদের প্রথম দৃষ্টি এমন একটা-কিছুর উপর পড়েছিল, যা ক্ষণকাল দেখলেই চিরকাল চক্ষু বুঁজে থাকতে ইচ্ছে করে। সমালোচকরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখতে পাবেন, তার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে নায়ক-নায়িকার প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়ে চিত্তবিপ্লবের অশ্রুস্তি কাহিনী!

প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে প্রেম না হোক, লোকে মুগ্ধ আর লুব্ধ হয়ে ওঠে বৈকি! সেই মোহ, সেই লোভই হচ্ছে প্রেমের প্রথম ধাপ এবং এই প্রথম ধাপে যে না উঠতে পারে প্রেম হচ্ছে তার কাছে, বামনের চাঁদ!

সরমা প্রথম দিন থেকেই আমাকে আকর্ষণ করছে, অথচ আমার জীবন-পথে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত অতিথি! আগে যাকে ভেবেছিলুম সুলভ, এখন তাকে দুর্লভ জেনেও আমার এ বাঁকা মনকে ত সোজা করতে পারছি না; এ মন এখন ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতন, এর বল্গাকে আল্গা করা এখন আমার সাধ্যের বাইরে।... ...সরমা একদিনেই আমার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে।

কিন্তু, জানিনা এ পরিবর্ত্তনের পরিণাম কোথায়? আগুণ ত ডাকে না, পোকা-মাকড় যে যেচে এসে পুড়ে মরে। পতঙ্গ আসে,

রঙ্গ ক'রে' সঙ্গ চায়—কিন্তু অগ্নি যে নির্ব্বিকার! তার রূপের তাপে পিয়াসীর বুক পুড়ে খাক্ হয়ে যায়—আগুণের শিখা একটু কাঁপে, কিন্তু নেবে না।

সরমা কি আগুণ, আমি কি পতঙ্গ? না, সে হবে নদী আর আমি হব, সাগর? সেইখানে বসে-বসে অনেক ভাবলুম, কিন্তু সে ভাবনা দ্রৌপদীর সাড়ীর মত—তার আরম্ভ আছে, প্রান্ত নাই; যত নাড়াচাড়া করি, তত বেড়ে যায়।

যৌবনের মত্ততা হচ্ছে বসন্তের ফুলের মতন; নিদাঘ এলেই খর রোদের ঝাঁঝে সে বেরঙা হয়ে নেতিয়ে পড়ে। আমার এই মাদকতাও কি তেমনি ক্ষণিক? একি সুধু চোখের নেশা,—প্রাণের তৃষা নয়?… …

ক্রমে মাথাটা ভারি হয়ে উঠ্‌ল, কাতরভাবে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম।… …

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্নেও দেখলুম, সরমাকে।

নয়

মুরারিবাবুর কথা

কি আশ্চর্য্য! এই মোহন-ছেলেটিকে ভাল করে যতই দেখচি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি; এর মধ্যে সত্যই পদার্থ আছে।

মোহনের ইচ্ছা, আমি তাকে এস্রাজ শিখাই, আর তার কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু গুরুদক্ষিণা নি।

আমি আপত্তি করাতে সে বললে, "মুরারিবাবু, এতে আপনার লজ্জিত হবার কিছু ত নেই! আপনি মিছিমিছি আমার জন্যে কেন সময় নষ্ট করবেন?"

আমার কোন আপত্তি টিকল না। শেষটা এই ঠিক হোল যে, আমি তার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেব-না বটে, তবে যে বাড়ীতে আছি, সে বাড়ীর ভাড়াও তাকে একপয়সা দেব না। যদিও হাতে-করে টাকা নেবার চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পেলুম, তবুও হয়ে-দরে সেই হাত জলই রয়ে গেল! যাক্, এ বন্দোবস্তটা ত মন্দের ভাল!

মোহন আর-একটা রফা করে নিলে, এখন থেকে সে যখন আমার শিষ্যই হোল, তখন আমার পক্ষে তাকে 'বাবু' ও 'আপনি' বলে ডাকাটা অশোভন হবে। সুতরাং—

আজকাল দিনগুলি কাটছে বেশ। রোজ বিকালে হরেনবাবু এসে যখন আসর জাঁকিয়ে বসেন, তখন সময় যেন কোথা আগে কোথা দিয়ে উড়ে যায়। হরেনবাবু ঠিক একটি মূর্ত্তিমন্ত আনন্দের ঝড়ের মতন; যেখান দিয়ে যান, দুঃখ-তাপ যেন তাঁর হাসির তোড়ে শুক্ন পাতার মত উড়ে যায়!

হরেনবাবুকেও আমার খুব মনে ধরেছে। এই যুবাটির ভিতরে প্রাণ আছে, মনুষ্যত্ব আছে। বাইরের চেহারার মত এঁর ভিতরের মনটাও মস্ত ডাগর। প্রথম দিনেই ইনি আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর সেদিনকার মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি আজ পর্য্যন্তও ভুলতে পারি-নি। বিধবার দুঃখ নিয়ে বাস্তবিকই তিনি অনেক ভেবেছেন।

কিন্তু বিবাহ দিলেই যে দুঃখ ঘুচবে, তাও ত নয়! সধবা হোক, বিধবা হোক, কু-বিবাহ কি ভয়ানক! তার চেয়ে চির-

কুমারী থাকা ভাল—তার চেয়ে চির-বিধবা থাকাও ভাল! সরমারও ত বিবাহ হয়েছিল, সধবা থাক্‌লে আজ হয়ত সে বেঁচেই থাক্‌ত না! তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বৈধব্য ত তার পক্ষে শাপে বর!

দেশে আজকাল বিধবা-বিবাহ নিয়ে নতুন করে আন্দোলন জেগে উঠেছে। আসল যুক্তি-তর্কের দিক থেকে মনুষ্যত্বের দিক থেকে যাচাই করে দেখলে বলতে হয় যে, প্রাচীন ও নবীনের এই বিরোধে নবীনেরাই জয়লাভ করেছেন। তবে যে বিধবা-বিবাহ দেশব্যাপী হতে পারছে না, এর আসত কারণ হচ্ছে, অনভ্যাস। শত শত বৎসর ধরে আমরা যে আদর্শ নকল করতে অভ্যস্থ হয়েছি, দু-দশ বৎসরের আন্দোলনে সে অভ্যাস ছাড়তে পারা শক্ত কথা। মানুষ যে অভ্যাসের গোলাম! শরীরের অনিষ্ট হচ্ছে জেনেও, মরণের ভয় আছে জেনেও নেশাখোর যেমন নেশা ছাড়তে পারে না, এও তেমনি। ব্যক্তি-বিশেষের এই দৃষ্টান্ত সমাজের পক্ষেও খাটে; কেননা সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি বলে ব্যক্তির সাধারণ গুণ তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে।

হরেনবাবুর সঙ্গে সেদিন এই কথাই হচ্ছিল।

হরেনবাবু বললেন, "এর মধ্যে আরো-একটা কথা আছে মুরারিবাবু! বিধবাদের যাঁরা অভিভাবক, উচ্চ আদর্শের মোহে তাঁরা অন্ধ। সংসারের লোভ, ভোগ ও পাপে অটল থেকে বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করবেন, এ-বড় উচ্চ আদর্শ। আমি বলি যাঁরা স্বেচ্ছায় জেনে-শুনে আদর্শ-জীবন লাভ করে' নারীত্বকে দেবীত্বে তুলতে পারেন, তাঁরা দেবী হোন—সে ত ভাল কথা। কিন্তু অনেক বিধবাই,—যে বয়সে তাঁদের ভোগের স্পৃহা মেটে-নি, যখন তাঁরা জীবনকে ভাল করে' চেনেন-নি—তখনই স্বামীকে হারিয়েছেন। নারীত্ব লাভ করবার আগে যে সব অজ্ঞান অভাগা বালিকা স্বামীহারা হয়, তাদের ঘাড়ে মাকালফলের ঝুড়ীর মত ফাঁকা ব্রহ্মচর্য্যের বোঝা চাপিয়ে কী লাভ? ব্রহ্মচর্য্যের গুরুত্ব তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে, না বুঝেই গ্রহণ করে। ফলে তাদের দেবীত্ব অর্জ্জন করা ত হয়ই না, উল্টে অনেক সময় নারীত্বও বর্জ্জন করতে হয়। সমাজের বাইরে ঐ যে অগণ্য পতিতা পড়ে রয়েছে, খোঁজ করলে জানবেন, ওদের পতনের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যভিচারের প্রবৃত্তি নয়—হয় স্বামীর অত্যাচার, নয় ত বৈধব্যের যন্ত্রণা!"

কথাগুলি খুব খাঁটি। তর্ক করে' এ সত্যকে মুখে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি বটে, কিন্তু মনে-মনে ত অস্বীকার করতে পারি না। আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম।

হরেনবাবু এই বলে তাঁর কথা শেষ করলেন, "জানবেন, আদর্শ জিনিষটা বড় বিষম। মানুষের অপূর্ণতার মূলাধার হচ্ছে, যত-সব কল্পিত আদর্শ। কারণ, যা সাধারণ তা-নিয়ে ত আদর্শ গড়া হয় না, আদর্শ তখনি উচ্চ হয় যখন সে অসাধারণ। উচ্চ আদর্শ হচ্ছে হিমালয়ের 'গৌরীশঙ্করে'র

মত, তফাৎ থেকে দেখতে লাগে ভাল—কিন্তু তার কাছে ঘেঁসা সামান্য মানুষের সাধ্যাতীত। আর দুনিয়ার সাড়ে তিন ভাগ মানুষই যখন 'সামান্যে'র দলে, তখন বাকি অর্দ্ধভাগ 'অসামান্য' লোকের মুখ চেয়ে ত আর-সকলকে জবাই করা চলে না!"

কি আশ্চর্য্য! এই তরুণ যুবার জ্ঞান ও কথা কইবার চমৎকার ভঙ্গী যে অনেক পক্ককেশ মহামহোপাধ্যায়কে লজ্জা দিতে পারে! এ-সব সত্য ত তাঁদের মাথায় ঢোকে না! তাঁরা শাস্ত্রের বাঁধা বুলি ছাড়া এক পাও নড়েন না, অথচ তাঁদের দেশেই প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতরা বলে গেছেন, 'যুক্তির সাহায্য না নিয়ে কেবল শাস্ত্রের বিধান-অনুসারে কখনো কর্ত্তব্য-নির্ণয় করবে না,—তাতে ধর্ম্মহানি হয়'।

হরেনবাবু যেদিক দিয়ে কথাটা তুলেছেন, সেদিক থেকে আমার কিছুই আপত্তি করবার ছিল না। কিন্তু আমার মনে খট্‌কা লেগে আছে অন্য জায়গায়। আমি বললুম, "হরেনবাবু, বিবাহ হলেই যে বিধবার জীবন সফল হয়ে উঠবে, তাও ত নয়! সরমার বিবাহের কি ফল হয়েছিল, শুনেছেন ত? সুতরাং—"

—"শুনেছি। কিন্তু আপনি গোড়াতেই একটা ভুল করছেন। অমঙ্গলই বিবাহের স্বাভাবিক পরিণাম নয়—সংসারে মঙ্গল আনাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। আপনি যদি ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে আপনার মেয়ের বিবাহ দিতেন, তাহলে হয়ত তিনি অমন কুচরিত্র স্বামীর হাতে পড়তেন না।"

—"প্রথম বারে যা পারি-নি, এবারেও হয়ত তা পারব-না। তাই ইচ্ছে থাকলেও সরমার আবার বিয়ে দিতে আমি ভয় পাই।"

—"ভয় পেলে ত চলবে-না মুরারিবাবু, আপনার কর্ত্তব্য আপনি করে যান। মানুষ ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে—ভবিষ্যৎ দেখে নয়; ভবিষ্যৎকে দেখা গেলে বিশ্বের ধারা বদ্‌লে যেত। আপনি ভবিষ্যৎ চোখে দেখতে না পেলেও ভেবে দেখতে ত পারেন।"

—"ভবিষ্যৎ ভেবে যা দেখছি [illegible] বাবু, তাতে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে। আমি যদি আজ [illegible] বুঁজি, তাহলে সরমা কাল কোথায় [illegible] সে বিধবা, সে সংসারকে চেনে [illegible] একাকী; তার বয়স অল্প—আর এই পৃথিবী প্রলোভনে ভরা! ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার!"

—"এ-ক্ষেত্রে আপনার মেয়েকে আপনি কি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-পালন করাতে চান?"

—"কি আশ্চর্য্য! সে যে অসম্ভব!"

—"তবে?"

—"মনের মত পাত্র পাওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে তার আবার বিবাহ দিতে চাই।"

—"তাহলে এইবেলা থেকে পাত্র সন্ধান করুন।"

—"কিন্তু সুপাত্র কোথায় পাব?"

—"সেইটেই ত দেখা দরকার! ধরুন, আমাদের মোহন। এইরকম একটি পাত্র দেখুন। আপনার মেয়ে সুখে থাকবেন।"—এই বলে হরেনবাবু হঠাৎ কথা বন্ধ করে, বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

মোহনের মত পাত্র! কি আশ্চর্য্য! বিদ্যায়, চরিত্রে, ধনে-মানে এমনধারা সুপাত্র

আর কোথায় আছে, যে সমাজের ভয় না রেখে, বিধবাবিবাহ করবে? হরেনবাবু যা বললেন, সেটা যে কত-বড় অসম্ভব তা পার, তা বোধহয় তিনি ভেবে-চিন্তে দেখেন-নি।

কিন্তু, আর দেরি করলেও ত চলবে । দিনে দিনে দিন চলে যাচ্ছে, দৃষ্টি ীণ হয়ে আসছে, দেহ নুয়ে পড়ছে—ৎ কবে পরকালের ডাক আসতে পারে, জানে? আজও সময় আছে, আজ বুঝলে হয়ত কাল অসময় এসে বে। ঐ নির্ম্মল ফুলের মত পবিত্র মা, আজও সে দেবপূজার উপযুক্ত, কিন্তু কাল?.....আজ যা দেবতার যোগ্য, াল হয়ত তা দানবের ভোগ্য হবে!··· াজ আলো, কাল অন্ধকার!

·····তবে, হ্যাঁ—একটা কথা! আমি নিজে ত এত ভাবছি, কিন্তু সরমার দিক থেকে কিছু ভেবেছি কি? তার মন কোনদিকে? সে কী চায়? একটা আদর্শের শূন্যতা তার সমস্ত জীবন পূর্ণ করে তুলতে পারবে ·· ···কি পারবে না?

প্রথম বিবাহের সময় তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার দরকার হয়-নি, তখন সে বালিকামাত্র—নিজের ভাল-মন্দ কিছুই বুঝত না। কিন্তু এখন সে বালিকাও নয়, নাবালিকাও নয়। এখন সে আপনাকে চিনতে পেরেছে, আপনার চরিত্র বুঝেছে, আপনার ভবিষ্যৎ বুঝেছে। এখন সকলের আগে তার মত নেওয়া দরকার। সে যদি বলে 'না'—আমিও তাহলে জোর করে ত বলতে পারব না, 'হাঁ'।

অকূল-পাথার ভাবছি, এমন সময়ে পিছন থেকে দুখানি নরম হাতে কে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। এ আর কেউ নয়—আমার প্রাণপুতলী সরো-রাণী!

সরমা আদর করে আমার মাথার উপর তার মুখখানি কাত্ করে রেখে বললে, "হ্যাঁ বাবা, এমন করে বসে-বসে কি ভাবছ বল দেখি!"

আমি দু-হাতে তার মুখখানি ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে আনলুম। বললুম, "কি ভাবছি, শুনবি মা?"

সরমা আশ্চর্য্য হয়ে তার বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল—কিছু বললে না।

হায়রে কপাল, এই ডাগর-ডাগর ঢলঢলে চোখদুটিতে এখনো যে শিশুত্বের ভাব মাখানো!... ...

এই সরল চোখে আমার সরমা কি কুটিল সংসারের অন্ধকার দেখতে পেয়েছে? তা কি সম্ভব?

সংসারের আনন্দ যে সুধার মত পান করছে, তাকে আমি পিতা হয়ে কোন্-প্রাণে বল্‌ব যে, এ সুধা নয়—এ বিষ! তার যেটুকু সুখ আছে, সেটুকুও ঘুচিয়ে দেব কেমন করে?

সরমা বল্‌লে, "চুপ করে রইলে কেন? কি ভাবছ, কৈ বললে না ত বাবা!"

ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "তোর কথাই ভাবছিলুম মা!"

সরমার মুখের ভাব অম্‌নি বদ্‌লে গেল, তার চোখের আলো নিবে গেল—তার প্রাণের ভিতরে ভবিষ্যতের যে আঁধার

দিনে দিনে জমে উঠ্‌চে, তারই আভাসে যেন তার আলো-করা মুখখানি কালো হয়ে গেল! থতমত খেয়ে থেমে-থেমে সে বললে, "আমার—আমার কথা!"

—"না—না—আমি কিছু ভাবি-নি মা, কিছু ভাবি-নি"—বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলুম! ভগবান, এ কথা কি মুখ ফুটে তাকে বলা যায়!

(ক্রমশ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সেকালের গৃহস্থালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আহারের সময় ও ভোজন-বিধি

সেকালের গৃহস্থেরা অনেকেই পর্ণশালায় বাস করিতেন বলিয়া অগ্নি-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। (১) গ্রীষ্মকালে তখন দিবাভাগকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইত। ইহার মধ্য-দুই-অংশে রন্ধনাদি নিষিদ্ধ ছিল। বেলা ৯।১০ ঘটিকার মধ্যেই রন্ধনাদি শেষ হইত বলিয়া মনে হয়। যে ব্যক্তি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিত, তাহাকে এক পণের অষ্টমাংশ জরিমানা দিতে হইত—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে গৃহস্বামী দ্বিপ্রহরে বাটীর বাহিরে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তবে কামসূত্রে দেখা যায় "মহানস (রন্ধন-শালা) সুগুপ্ত হইবে", সুতরাং বাটীর বাহিরে বিশেষ কারণ ব্যতীত রন্ধনাদির ব্যবস্থা ছিল না।

অতিথি-আগন্তুকের জন্য গো-দোহন-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। শিশু, পিতৃগৃহবাসিনী বিবাহিতা নারী (২) বৃদ্ধ, গর্ভিনী, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কুমারী (৩) অতিথি ও ভৃত্যগণকে অগ্রে ভোজন করাইয়া তাহার পর স্বামী, স্ত্রী,—গৃহের কর্ত্তা ও কর্ত্রী-

(১) সেকালে কিছু যন্ত্রচালিত দ্রুতগামী দমকলের ব্যবস্থা ছিল না; সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থকেই অগ্নিদাহ নিবারণের জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান থাকিতে হইত। পাঁচটি জলপূর্ণ পাত্র (পঞ্চ ঘটীনম্) এক একটি কুম্ভ দ্রোণ (সুবৃহৎ কাষ্ঠময় জলাধার) চিমটা ও চর্ম্মথলি (মশক) এবং একখানি করিয়া মই, সূর্প (কুলা) ও ধাতুময় আঁকড়া সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে গৃহস্থকে অর্দ্ধ পণ করিয়া জরিমানা দিতে হইত।

(২) সেকালে আর্য্যগণের সহৃদয়তার অভাব ছিল না। বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখা যায়। রাজা, স্নাতক ব্রাহ্মণ বা বর (bride-groom) প্রভৃতিকে যেমন পথ ছাড়িয়া দিতে হইত, সেইরূপ, বৃদ্ধ, ভারবাহী, স্ত্রীলোক বা রুগ্ন ব্যক্তিকেও পথ ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম ছিল। (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায় ১১৭)

(৩) অতিথি-সেবাও সেকালের গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অতিথি আসিলে জাতি-নির্ব্বিশেষে তাহাকে সাধ্যমত খাদ্যাদি দিতে হইত। কোন অনাহূত অতিথি রাত্রিকালে আসিয়া উপস্থিত

হারা ভোজন করিতেন (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম ধ্যায় শ্লোক ১০৫)। বিশ্বদেবের পূজা ইবার পূর্ব্বেও ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীগণকে ন্ন-ব্যঞ্জন দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল না। হিতায় আছে যে অতিথি, বৃদ্ধ, শিশু ং দুর্ব্বল ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে সন্তুষ্ট খিলে গৃহস্বামীর পারলৌকিক মঙ্গল হয়। মী-পরিত্যক্তা পিতৃগৃহবাসিনী নারীগণকে াগ্রে ভোজন করাইবার নিয়মটি বড় দর বলিয়া মনে হয়। ইহা অনুসৃত লে এই সকল মন্দভাগিনী আশ্রিতগণের মর্য্যাদায় আঘাত লাগে না এবং গৃহে ান্তি ঘটিবার আশঙ্কাও অল্প থাকে। ী সহিত একত্রে বা উচ্চাসনে বসিয়া বা ন্য লোকের সম্মুখে আহার নিষিদ্ধ ছিল। াজ্ঞবল্ক্যে একবস্ত্রে আহার, বা দণ্ডায়মান ইয়া আহার সম্বন্ধেও নিষেধ দেখা যায় (৪) হজন যেখানে অন্নদান করে, সেস্থানে অন্ন-হণ নিষিদ্ধ, এইরূপ একটি শ্লোক কূর্ম্ম পুরাণেও দেখিতে পাই (বিংশ অধ্যায় দ্ধবাসী সংস্করণ)। স্বামীর সহিত একত্রে তাঁহার সম্মুখে স্ত্রীলোকেরা এখনও াহার করেন না; তবে স্বামীর আহারের সময় নিকটে বসিয়া ব্যজনাদি করা এখন আর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। স্ত্রীর সম্মুখে আহার করাও যে নিষিদ্ধ, তাহা ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৩১)। প্রাচীন ইহুদি শাস্ত্রেও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বসিয়া আহার সম্বন্ধে নিষেধ দেখা যায়; (৫) কিন্তু সাধারণতঃ ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করা হয়, (que les hommes et les femmes soient séparés dans les festins á cause de la chaleur du sang et de l'animation du bon vin) তাহা আমাদের দেশে খাটে বলিয়া মনে হয় না। খাদির গৃহ্য সূত্রে বর্ণিত আছে, রন্ধনাদি সমাপ্ত হইবার পর স্ত্রী পূর্ব্বাহ্ণে ও সায়াহ্ণে আহারের জন্য স্বামীকে "ইহা প্রস্তুত" বলিয়া আহ্বান করিবেন এবং স্বামী প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর নিম্ন স্বরে "কোন অনটন না ঘটে" এই কথা বলিয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলি-পূজাদির ব্যবস্থা করিবেন। সাহেবদের মত জুতা পায়ে দিয়া বা মুসলমানের মত বিছানায় বসিয়া আহার ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। (পরাশর, ৬ অধ্যায়)। কেহ কেহ বলেন, আধুনিক জৈন মাড়োয়ারী-দিগের ন্যায় ত্রিপদিকের উপর থালা

হইলেও তাহাকে জল, ভূ, তৃণ ও মিষ্ট কথার দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইত (মনুসংহিতা)। অতিথির সন্তোষ-বিধানের জন্য গৃহীকে তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইত। অতিথি সন্তুষ্ট হইলে গৃহী ইন্দ্র লোকে গমন করে, মনুসংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এমন কি অতিথির অনুমতি-ব্যতিরেকে বেদপাঠও নিষিদ্ধ ছিল।

(৪) ইহার অর্থ "হোটেল" প্রভৃতিতে খাওয়া নিষেধ, এইরূপ হওয়াই সম্ভব।

(৫) That the men and the women be seated separate in the feast because of the heat of the blood and the animation due to good wine. Erckmann chatrian তাঁহার Le Blocus নামক গ্রন্থে বৃদ্ধ য়িহুদী ময়েজের মুখ দিয়া এইরূপ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

রাখিয়া খাওয়া আচার-বিরুদ্ধ ছিল না। আমার জনৈক শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু "হরিভক্তি-বিলাসে" এরূপ ত্রিপদিক বা low tripod standএর উল্লেখ পাইয়াছেন। উষ্ণ অন্ন ব্যতীত ঠাণ্ডা বা বাসি দ্রব্য ভোজন শাস্ত্রানুমোদিত নহে; বিশেষতঃ স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অগর্হিত ভোজ্য এবং যজ্ঞাবশেষ খাদ্য দ্রব্যাদি পর্য্যুসিত হইলেও কিঞ্চিৎ হবি সংযুক্ত করিয়া আহার করা চলিত। যব বা গোধূম চূর্ণ হইতে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যাদি এবং সকল প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বাসি হইলেও খাওয়া নিষেধ ছিল না (মনুসংহিতা ৫ম অধ্যায়—২৪, ২৫)। পূর্ব্ব দিনে প্রস্তুত বাসি মিষ্টান্ন টকিয়া গেলে আর তাহা ব্যবহার করার নিয়ম ছিল না। কাক প্রভৃতি পক্ষী চঞ্চু স্পর্শ করিলে বা কুকুরে মুখ দিলে সে ভাত আর খাওয়া হইত না; তবে বিড়ালের বা ভেকের স্পর্শে কোন দোষ ঘটিত না। স্পর্শ-দোষ-সম্বন্ধে এতখানি সতর্ক থাকিলেও সেকালের গৃহস্থেরা বৃথা অন্ন অপব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। দ্রোণ বা আঢ়ক পরিমাণ অন্নে কুকুরে বা কাকে মুখ দিলে বা গবাদিতে ঘ্রাণ লইলে তাহার সমস্তই পরিত্যক্ত হইত না, কেবল যেখানে মুখ দিয়াছে সেই স্থানের চারিটি ভাত ফেলিয়া দিলেই চলিত। অবশিষ্ট অন্নের উপর অল্পজলে সোনা ধুইয়া সেই জল ছিটাইয়া গরম করিয়া লইলেই পুনরায় তাহা গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপত্তি ছিল না। (পরাশর সংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৭, ৬৯, ৭০)। অন্নের সহিত মাছি বা কোন পতঙ্গ পাওয়া গেলে সে অন্নও বর্জ্জিত হইত না। জলে ধুই ভস্ম স্পর্শ করাইয়া পুনরায় তাহা আহার ক চলিত (ঐ, ৬২)।

ধূমপান

ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা চরক সংহি (সূত্র স্থান অধ্যায় ৫) হইতে বচন উ করিয়া দেখাইয়াছেন (J. B. O. S. Vol. II. Part, p. 147) দিবসে দুইবার ধূমপান করার নি ছিল। কুলার্ণব তন্ত্রে তাম্রকূট, অহিফে ধুস্তুর প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি দ্রব্যের অন্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। খৃঃ শতাব্দীর পরে রচিত কাদম্বরী রাজার ধূমপান-প্রসঙ্গে যে পরিপীত ধূমব উল্লেখ দেখা যায়, ডাক্তার গঙ্গানাথের ম তাহা চরক-সংহিতোক্ত উপকরণেই প্র হইত। ইহাতে বত্রিশ প্রকার সুগ দ্রব্য ব্যবহৃত হইত কিন্তু তাম্রকূট অহিফেনাদির কোনরূপ সংস্রব থাকিত না। ধূমবর্ত্তি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল হইত; আকৃতিতে অনেকটা "সিগার"-এর মত। একপ্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিয়া অপর প্রান্ত মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া ঠিক আধুনিক উপায়ে ধূমপান করা হইত। দুর্ব্বল ও ক্লান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল।

গৃহস্থালী ও গৃহিণীর কর্ত্তব্য

শুধু গৃহ অথবা তৈজসাদি এবং বেশভূষা ও আহার-পানের কথা বলিলেই গৃহস্থালীর কথা শেষ হয় না। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীর কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকিলে সেকালের সংসার-যাত্রার প্রণালী

সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা করাও কঠিন হইয়া উঠে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে (শ্লোক ৮৩—৮৪) যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা জানিতে পারা যায়। স্ত্রীলোকেরা সংসারের জিনিস-পত্র গুছাইয়া রাখিবে, গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মে নিপুণা হইবে, খরচ-পত্র সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হইবে, শ্বশুর-শাশুড়ীর চরণ বন্দনা করিবে এবং ভর্ত্তৃতৎপরা হইবে; স্বামীর অনুপস্থিতিতে ক্রীড়াদি, শরীর-সংস্কার, সমাজোৎসব-দর্শন (witnessing of social festivities) হাস্য-পরিহাস ও পরগৃহে গমন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। পতি-প্রিয়-হিতে-যুক্তা রমণী ইহ লোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে অনুপম সুখ লাভ করেন, এ কথাও পরবর্ত্তী একটি শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল উপদেশ কামসূত্রেও বিস্তারিতভাবে ভার্য্যাধিকরণ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যথাকালে তাহার আলোচনা করিব।

প্রাচীন সাহিত্যে গৃহস্থালীর চিত্র

গৃহস্থালীর ভার, বোধ হয়, জগতের আদি কাল হইতেই মহিলাগণের উপর ন্যস্ত। ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। কাহারও কাহারও মতে উহা অন্যূন ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। (৬) আজকাল পাশ্চাত্য দেশে গার্হস্থ্য নীতি বা রন্ধন-বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলে মহিলা বিদ্যালয় হইতে যেরূপ ডিপ্লোমা, পদক (medal) প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, সেকালে সেরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও গৃহস্থালী-কর্ম্মে নিপুণা রমণীর সুখ্যাতির অভাব ছিল না। ঋগ্বেদের একজন ঋষি (৭) নিজের পরিচয় দিবার সময় বলিয়াছেন, "আমি স্তোতা, আমার পুত্র চিকিৎসক এবং আমার কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভর্জ্জন করেন।" (১১২ সূ ৩ ঋক)। সাংসারিক কার্য্যে কন্যাটি বিশেষ গুণান্বিতা না হইলে চিকিৎসক ভ্রাতার সহিত একত্রে তাহার উল্লেখ হইত কি না সন্দেহ! ঋগ্বেদের তুলনায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৮) রচিত দশ-কুমার চরিত আধুনিক হইলেও নিতান্ত আজি-কালিকার গ্রন্থ নয়। এই কথা-গ্রন্থে-গোমিনী-উপাখ্যান নামক গল্পে প্রাচীন গৃহস্থালীর একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। আজ কাল এই পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধের কৃপায় আমরা সংরক্ষণ-নীতি বা অনাবশ্যক ব্যয়-সঙ্কোচ সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা করিতেছি, আর্য্য ললনাগণের দৃষ্টি সেদিকে বহু পূর্ব্বেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। উপাখ্যানটির সারাংশ এইরূপ। দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী (বর্ত্তমান কাঞ্জীভেরম) নগরবাসী শক্তিকুমার নামক এক বণিক-পুত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে বিবাহ করিবার জন্য এক গুণবতী কন্যার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। নির্ব্বাচিতা কন্যার গৃহস্থালী-কার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ

(৬) "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" গ্রন্থে গুহ মহাশয় Hermann Jacobi'র এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।
(৭) সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।
(৮) Weber Ed. 1812. p. 213 footnote. A. A. Macdonell Sanskrit Literature, p. 336.

হইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি একটি সুন্দর পরীক্ষা-বিধি স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র এক প্রস্থ বা আঢ়কের চতুর্থাংশ পরিমাণ শালি-ধান্য দিবেন, কন্যাকে তাহাতেই পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইতে হইবে। তিনি আর কিছু দিবেন না, কন্যাও আর কিছু লইতে পারিবেন না। অনেক সন্ধানের পর শক্তিকুমার "ন হ্রস্বা নাতি দীর্ঘা নাতিকৃশা" কাঞ্চন-বিরল-ভূষণা সুস্থদেহা এক কন্যার দর্শন লাভ করিলেন। এই কুমারী যে বয়সে নিতান্ত বালিকা ছিলেন না, তাহা গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কন্যা কিরূপে নালী-পৃষ্ঠে মৃদু সংঘট্টনের দ্বারা তণ্ডুল বাহির করিয়াছিলেন এবং পরে উহা সুর্প শোধিত ও প্রক্ষালিত করিয়া কিরূপে সেই ধান্যের তুষাদি-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে ইন্ধন, স্থালী (মৃৎপাত্র) ও সরাবাদি ('সরা' প্রভৃতি) ধাত্রী-সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া রন্ধনাদি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অনাবশ্যক-বোধে তুষ-কুঁড়া প্রভৃতি যে সকল (bye-products) দ্রব্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে তাহা যথাকার্য্যে নিয়োজিত হইলে যে গৃহস্থের বিশেষ "সাশ্রয়" হওয়া সম্ভব, গল্পটিতে এই নীতিই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তুষাদির পরিবর্ত্তে ইন্ধন এবং সেই ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত অঙ্গারের পরিবর্ত্তে শাক, ঘৃত তৈল, দধি, আমলক, চিঞ্চাফল (তেঁতুল) প্রভৃতি সংগ্রহ করা এই মহার্ঘ্যতার দিনে সম্ভব নয় বটে কিন্তু তের-চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বেও যে কতকাংশে সম্ভব ছিল না, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আমরা এই উপাখ্যান-পাঠে আরও জানিতে পারি যে গৃহস্থগণ নিজ-নিজ আঙিনায় দুই-এক ঝাড় কদলী বৃক্ষ রোপণ করিতেন এবং কদলী পত্রেই বোধ হয় অনেক সময় থালা বাসন প্রভৃতির কাজ সারিয়া লইতেন। সম্ভবতঃ প্রত্যূষে বা ভোর রাত্রেই পাতা কাটিয়া রাখার নিয়ম ছিল। রন্ধনের পূর্ব্বে চুল্লী পূজা করিতে হইত। পল্লীগ্রামে মোদকগণ এখনও মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈয়ার করিবার সময় প্রথম খোলায় সামান্য-কিছু ভাজিয়া লইয়া মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ভাতে ফেন বা অন্নমণ্ডও পরিত্যক্ত হইত। তা "সলবণ সম্ভার দত্তাঙ্গার ধূপবাসশ্চ সম্পাদ উৎপলগন্ধী কৃত্বা" মৃৎসরাবে বা মাটির স পরিবেষণ করা হইত। এইরূপ অন্নমণ্ডপা "মন প্রহৃষ্ট" "সকল গাত্র সংক্লিন্ন" এবং "অ ক্লম" বা পথশ্রান্তি নিবারিত হয়, এ কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। শুনিতে পাই, মান্দ্রাজ অঞ্চলে এইরূপ অন্নমণ্ড পান করার প্রথা স্থানে স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। অন্ন "দর্বী" বা হাতার সাহায্যে পরিবেষণ করা হইত। হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শিল্পীর সংরক্ষণশীলতা-গুণে এই দর্বী অন্নপূর্ণা দেবীর হস্তে এখনও বিরাজ করিতেছে। অগুরুর ধূপ যে কেবল যোষিৎগণের কেশবাসের জন্যই ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে; পানীয় প্রভৃতি সুগন্ধি করার জন্য "অভিনব পাটলা কুসুম" (Bignonia Suaveolens) বা উৎফুল্লোৎপলের ন্যায় ইহারও ব্যবহার ছিল দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বৌদ্ধ-জাতক কাহিনীতে বর্ণিত মৃত মুষিক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিয়া ধনী হওয়ার

ন্যায় এই গল্পটিও অর্থ-সঞ্চয় বা সাংসারিক ব্যয়-সঙ্কোচের এক উৎকট দৃষ্টান্ত মাত্র। এ শ্রেণীর কোন প্রাচীন কাহিনীই যে বিশেষ বাস্তব ঘটনা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিবেন না এবং প্রাচীন কথা-গ্রন্থাদিতেও অতিশয়োক্তির বিশেষ অভাব নাই, কিন্তু তাই বলিয়া বিপরীত ভ্রমে পতিত হওয়াও উচিত নয়। তখন এক টাকা মূল্যের মৃদঙ্গার বা অক্রেয় জ্বালানি কাঠের ব্যবহার ছিল না বলিয়া যে লোকে পোড়া কয়লা কুড়াইয়া রাখিত না, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ধান্য সুলভ হইলেই কি পল্লীগ্রামের লোক 'তুষ কুঁড়া' ফেলিয়া দিয়া থাকে? সেকালের গৃহলক্ষ্মীগণ এ সকল দ্রব্যাদির অপচয়-নিবারণ সম্বন্ধে যে রীতিমত উপদেশ পাইতেন, তাহা আমরা বাৎস্যায়ন হইতে জানিতে পারি।

বাৎস্যায়নের কাল

বাৎস্যায়নের কামসূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি হইতে "বাৎস্যায়ন, মল্লনাথ কুটিল-চনকাত্মজঃ" প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে কৌটিল্য,চাণক্য ও বাৎস্যায়ন এক ব্যক্তি (৯)। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী কৌটিল্যের "আন্বীক্ষিকী স্থাপনা" (2nd. chap.) এবং বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য হইতে দুইটি বিশেষ সাদৃশ্য-যুক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। (সাহিত্য, মাঘ ১৩২৩, পৃঃ ৬৭২, ৬৭৩) চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং খৃঃ পূঃ ২৯৭ অব্দে দেহত্যাগ করেন। অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩২১ হইতে ৩০০ অব্দের মধ্যে (১০) বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করিলে কামসূত্রের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। হেমচন্দ্রের অভিধান সম্ভবতঃ ১০৮৮—১১৭২ খৃঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং উহা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালের অনেক পরবর্ত্তী কেহ কেহ শ্লোকটিকে সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। শ্যামশাস্ত্রী কামসূত্র হইতে অর্থশাস্ত্রের কতকগুলি তুল্যপদ (Parallel passages) সঙ্কলন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বাৎস্যায়ন ঐ পদগুলি অর্থশাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন গ্রন্থকারেরও অভাব নাই যাঁহারা নিজের লেখা নিজেরাই উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। সুতরাং বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্য যে প্রকৃতই অভিন্ন নহেন, তাহা শুধু এই প্রমাণ হইতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু কৌটিল্য ও বাৎস্যায়নের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি আছে যাহা এখনও খণ্ডিত হয় নাই। কামসূত্রে অন্ধ্র

(৯) See his Introductory essay to Kumar N. N. Law's Studies in Ancient Hindu Polity p, XI.

(১০) Shama Shastry's Artha-sastra—Introduction p. VI

রাজ কুন্তল শাতকর্ণির উল্লেখ আছে। (১১) কুন্তল শাতকর্ণি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩৫ অব্দে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। Vincent Smith তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত না হইলে বাৎস্যায়ন, ও খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর গ্রন্থকার কৌটিল্য যে একই ব্যক্তি ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। জর্ম্মান ভাষায় কামসূত্রের ব্যাখ্যাকার R. Schmidt এ সম্বন্ধে নিজ গ্রন্থে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই, কেবল এ পুস্তক কালিদাসের ও পঞ্চতন্ত্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এই কথামাত্র বলিয়াছেন। কালিদাসের কথা ছাড়িয়া দিই; কারণ আধুনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন (vide M. M. H. P. Shastri's article, J. B. O. R. S. part I. vol. II)। দণ্ডী—অর্থশাস্ত্র বিষ্ণুগুপ্তের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্য বা চাণক্যেরই অপর নাম। পঞ্চতন্ত্রে শালিহোত্রের সহিত বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্যের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ ষষ্ঠ শতাব্দীতে খুসরু আনাসির ওয়ানের রাজত্বকালে পেলেভী (প্রাচীন পারসিক) ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ শতাব্দীতে রচিত দশকুমার চরিতের যে ইহা বহুপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কামসূত্রে গৃহস্থালীর উপদেশ

কামসূত্রের ভার্য্যাধিকরণে গৃহস্থা ও সংসার-ধর্ম্মসম্বন্ধে যে উপদেশ আ তাহা কিছুকাল পূর্ব্বেও হিন্দুকুলবধূগণ ক বর্ণে প্রতিপালন করিতেন। রাতির অ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্যাদি স করিয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ— হয় কিছু দিনের মধ্যেই বাতিল হ পড়িবে। এই একটি অধ্যায়ে গৃহিণীর ক কর্ম্মের যে ফর্দ্দ পাওয়া যায়, তাহা নি সামান্য নয়। মূলে ও যশোধরের জয় টীকায়—যাহা বিবৃত আছে, নিম্নে তা সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

পরিত্যক্ত বা উৎবৃত্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার

গৃহিণীর কর্ম্ম-তালিকার মধ্যে প্রথমেই সুতা কাটা, শিকা তৈয়ারী, পাশ বন্ধন সংগ্রহ (বৃক্ষ বা উদ্ভিদজাত তন্তু হইতে পশু বন্ধনে জন্য দড়ি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা) আ মণ্ড, তুষকণা, কুটি ও অঙ্গার প্রভৃতির উল্লে দেখিতে পাই; সুতরাং দেখা যাইতেছে ভূষকণা, কুটি, অঙ্গার কিছুই পরিত্য হইত না (১২)। ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণা প্রভৃতি

(১১) কর্ত্তব্যা কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহা দেবীং লম্বনাবতীং। ২৭। সম্প্রয়োগাধিকরণং—কামসূত্র (Ed. Mahesh Ghandra Pal.)

(১২) মনুসংহিতায় তুলার বীজ ও তুষের উপর দণ্ডায়মান হওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিত আছে (Manu IV—78) এ নিষেধউক্তি অপচয়-নিবারণ-উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আধুনিক কালে তুলার বীজ হইতে তৈল ও খইল প্রস্তুত করার ন্যায় সেকালে উহার কোনও ব্যবহারিক

কুক্কুটাদির জন্য ব্যবহার হইত। (কুক্কুটাদিষু —বস্তু কুক্কুট কি না, টীকাকার তাহা বলেন নাই)। অঙ্গার প্রভৃতি লৌহ ভাণ্ডকরণাদির জন্য ব্যবহৃত হইত সুতরাং বৃথা নষ্ট না হইয়া উহা কর্ম্মকার শালাতেই পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়। আচাম মণ্ড প্রভৃতিতে বোধ হয় কাঁজী আমানির ন্যায় কোনরূপ পানীয় প্রস্তুত করিয়া দাসীদিগের পানের জন্য রাখা হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও লিখিত আছে, অঙ্গার ও তুষাদি লৌহ গলাইবার জন্য ও "ভিত্তিলিপ্য" বা চুণের ভাটার জন্য (for iron smelting and lime-kiln) ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ভূষি ও কণিকা—দাস, মজুর ও পাচকদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। (Ed. Sham Sastry Chap XV. 97) জীর্ণ বস্ত্রও পরিত্যক্ত হইত না; শুদ্ধ ও রঞ্জিত করিয়া ভৃত্যাদিগকে প্রদত্ত হইত।

গৃহস্থালীর উপকরণাদি-সংগ্রহ

লবণ, স্নেহ (ঘৃতাদি), গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দুর্লভ বলিয়া লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। ধাতুপাত্র কাষ্ঠ ও চর্ম্ম ভাণ্ড (১৩) প্রভৃতি গৃহিণীকে যথাসময়ে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করিতে হইত। সকল সময়ে বোধ হয় সকল জাতীয় তৈজস সহজে মিলিত না, সুতরাং কখন কোনটি সুলভে পাওয়া যাইবে সেদিকে দৃষ্টি রাখা গৃহস্বামিনীর প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। এখনও পল্লীবধূগণ ভিন্ন স্থান হইতে আনীত উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এ-ছাড়া সেকালের গৃহিণীকে আরও কতকগুলি কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইত।

ফুল ও সব্‌জী বাগান

গৃহ-প্রাঙ্গণে আদ্রকাদি 'হরিত' ও পালঙ্কাদি শাক অল্প-বিস্তর আবাদ করা হইত। এ ছাড়া জীরক (জীরা), শর্ষপ (শরিষা) প্রভৃতি মসলার এবং বোধ হয় বাটীর বালক-বালিকাদিগের ব্যবহারের জন্য ইক্ষু লাগাইবারও ব্যবস্থা ছিল। মূলক (মূলা) আলুক (বোধ হয় চুপড়ি আলু) পালঙ্কী (পালং শাক) দমনক (দোনাশাক) আম্রাতক (আমরুল), বার্ত্তাকু, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, সূরণ (১৪) (ওল) স্বয়ংগুপ্তা (কচু প্রভৃতি) এবং শূকনাসা (সীম) ও পলাণ্ডু প্রভৃতি ঔষধির যথাকালে বীজগ্রহণ ও বীজ বপন করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহর ব্যতীত অনেক স্থানেই এই সকল শাক-সব্‌জী গৃহ-প্রাঙ্গণে উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। পালংশাক

প্রয়োগ ছিল কি না জানা যায় না তবে বীজগুলি পদদলিত হইলে পাছে বপনের অযোগ্য হয় ইহাও এ নিষেধের অন্যতম কারণ হইতে পারে।

(১৩) পূর্ব্বে দৈনিক ব্যবহার্য্য চর্ম্ম পাত্রাদি দৃতি (মশক) চর্ম্মপুট ও চর্ম্মকরণ্ড নামে অভিহিত হইত। রঞ্জন-ক্রিয়ার দ্বারা দৃতির শুদ্ধি-বিধান হইত। সেকালে চর্ম্মকরণ্ড বা চর্ম্মপুট-ধৃত জল শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। সাহিত্য, বৈশাখ ১৩২৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১৫৯৬

(১৪) হিন্দুস্থানীরা ওলকে এখনও "সূরণ" বলে।

আদা, ওল কুমড়া, লাউ, সীম প্রভৃতি তরকারীর আবাদ পল্লীসীমন্তিনীগণ অনেকস্থলে নিজেরাই করিয়া থাকেন। বপন-কালে বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট সব্জীর বীজ পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান হইয়া থাকে। যে দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে দেবী স্বয়ং "শাকম্ভরী" বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা ('শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি'—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১১,৪৬-৪৯) সে দেশের শক্তি-স্বরূপিণী রমণীগণ 'শাক হরিতাদি উৎপাদনে যে যত্নবতী হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি? কেবল শাক-সব্জী বলিয়া নহে, মল্লিকা, জাতি, নবমল্লিকা, টগর, জবা, উষির প্রভৃতির ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে সেকালেও শুধু বস্তুতন্ত্রের উপর ভর দিয়া সৌন্দর্য্য তন্ত্রের অমর্য্যাদা করা হইত না।

সুরাকুম্ভী

এখন যেরূপ প্রতীচ্য দেশে অনেক মধ্যবিত্ত ও ধনী গৃহস্থ নিজগৃহে cellar বা পাতাল-ঘরের ভিতর মদ্য রাখিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও সুরা বা আসব কুম্ভী বোধ হয় এইরূপ "প্রচ্ছন্ন" ভাবেই রক্ষিত হইত। প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে প্রাচীন-কালে প্রচলিত মধু, সীধু বা কাদম্বর এবং মৈরেয় প্রভৃতি সুরার উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৃষি ও গো-সেবা

গো-সেবা অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু পুরন্ধ্রীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। কামসূত্রের এই অধ্যায়ে পীতাবশেষ দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আছে। এখনও অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দুগ্ধ হইয়া থাকে। কোন কারণে সমস্ত দুগ্ধ ব্যবহারে না আসিলে অদ্যাপিও অন্তঃপুরিকাগণ দধি ও ঘৃতাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কৃষি ও পশুপালনের ভারও ভার্য্যার উপরই কতকটা ন্যস্ত থাকিত। কর্ষণ-বপনাদি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ না করিতে পারিলে অদ্যাপিও অনেক ভদ্রবংশীয় চাষী গৃহস্থের স্ত্রী-কন্যা কৃষাণ মাহিন্দারদিগের দ্বারা এ সকল বিষয়ের রীতিমত সংবাদ লইয়া থাকেন।

পশুশালা

সেকালের অনেক গৃহস্থই বোধ হয় সখ করিয়া গো-মহিষ ব্যতীত অন্যান্য বন্য ও গৃহ-পালিত পশু এবং নানা জাতীয় পক্ষী নিজ নিজ গৃহে বা পশ্বালয়ে রাখিতে ভাল বাসিতেন। এ প্রসঙ্গে কামসূত্রে মেষ, কুক্কুট, লাব শুক, শারিকা, পরভৃত (কোকিল) বানর মৃগ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এখনও অনেক ধনী-গৃহে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই সকল 'কৃষ্ণের' জীবের যথোপযুক্ত রক্ষণা-বেক্ষণ সম্বন্ধে গৃহিণীকেই তত্ত্বাবধান করিতে হইত। (১৫) দৈনিক আয়-ব্যয়ের "পিণ্ডী-করণ" বা মবলক্ করার ভার গৃহস্বামিনীর উপরই অর্পিত ছিল, সুতরাং তিনিই প্রাণ

(১৫) সংহিতোক্ত প্রায়শ্চিত্ত-বিধি দেখিয়া মনে হয়, পশুপক্ষীগুলি সযত্নেই রক্ষিত হইত। হংস, রাজহংস, ময়ুর, লাবক, কপিঞ্জল প্রভৃতি বিনষ্ট করিলে দিন-রাত্রি উপবাস দিতে হইত। শুক ও পারাবত

নিজ হাতে সব খরচ-পত্র করিতেন বলিয়া বোধ হয়। যে economic independence বা অর্থব্যয়-সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার জন্য সেদিন পর্য্যন্ত Suffragette দলভুক্ত স্ত্রীলোকেরা গোলযোগ বাধাইয়াছে তাহা পুরাকাল হইতেই ভারতীয় স্ত্রীগণের কতক পরিমাণে নিজস্ব ছিল বলিয়াই মনে হয়।

দাস-দাসী

ভৃত্যগণের সহিত প্রভু ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধটি বেশ মধুর ছিল বলিয়াই মনে হয়। আজকাল অনেক শিক্ষিত নর-নারী করুণ-রসাত্মক নভেল, গল্প প্রভৃতি লিখিয়া দীন-দুঃখীগণের প্রতি দয়া মমতা শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজেদের আহারের সুব্যবস্থা হইলে চাকর-বাকরে কি খাইল না খাইল তাহার বড় খোঁজ রাখেন না। প্রাচীন ইংলণ্ডে যেমন লেডি Hlaf-dige বা অন্নদাত্রী (giver of the bread) ছিলেন, সেইরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষে ভৃত্যদিগের ভরণ-পোষণ এবং বেতন প্রভৃতির ভার গৃহিণীগণের উপরই অর্পিত ছিল। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, দাসগণকে নিজের ছায়ার মত দেখিবে। ("ছায়াম্বো দাস বর্গশ্চ" Manu Ed. M. N. Dutta. Chap IV—185)। স্নেহের পাশে স্পর্শ-দোষাদি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধও অটুট থাকিতে পারে নাই, তাই মনু সংহিতায় দেখিতে পাই যে শূদ্রগণের মধ্যে "কুলমিত্রের",—যে তাঁহার জমি আবাদ করে—এরূপ ব্যক্তির, দাসের, গো-রক্ষকের ও নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থালী-সংক্রান্ত কার্য্যাদির পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে মন্থর চক্রনেমির ন্যায় এই সকল বিরক্তিকর কর্ত্তব্যের একঘেয়ে পরিবর্ত্তন গৃহস্থ বধূগণের পক্ষে নিশ্চয়ই ক্লেশকর ঠেকিত। তাঁহারা স্বহস্তে যে

মারিলে সারা দিন উপবাস করার নিয়ম ছিল। কোকিল মারিলে দিবসে উপবাস করিয়া রাত্রে আহারের ছিল। শারিকা মারিয়া ফেলিলে সকালে সন্ধ্যায় জলে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম করিতে হইত। বিড়াল, প্রভৃতি মারিলে ব্রাহ্মণকে "কৃশর" ভক্ষণ করাইয়া লোহ যষ্টি দান করিতে হইত এবং শশ কচ্ছপ তি মারিলে এক দিন শুধু বেগুন খাইয়া কাটাইতে হইত। রুরু মৃগহত্যা করিলে ক্ষেত্রে অনুৎপন্ন (বোধ নীবার প্রভৃতি) শস্য খাইয়া দিন-রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইত। পরাশর সংহিতা অধ্যায় ৬) শাস্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায়ে (Ed. Shma Sastry p. 117) পশুশালায় রক্ষিত বন্য ও গৃহ-পালিত পশু-পক্ষী-ক কি পরিমাণ আহার দেওয়া হইত তাহা বর্ণিত আছে। বলীবর্দ্দ প্রভৃতির জন্য এক দ্রোণ পরিমাণ কলাই অন্যান্য খাদ্যাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত ১০ আঢ়ক পরিমাণ ভুষি বা হিংস্র পল খইল দেওয়ার নিয়ম ছিল। উষ্ট্র ও মহিষাদির জন্য ইহার দুইগুণ পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইত। গর্দ্দভও ক্ষুদ্র জাতীয় হরিণের জন্য অর্দ্ধ আঢ়ক এবং বৃহদাকার হরিণাদির জন্য এক আঢ়ক খাদ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছাগ, মেষ ও বরাহ প্রভৃতির জন্য এক আঢ়ক বা অর্দ্ধ আঢ়ক পরিমাণ শস্য ও ভুষি প্রভৃতি দেওয়া হইত। কুক্কুরের জন্য এক প্রস্থ অন্ন এবং হংস, ক্রৌঞ্চ ও ময়ুর প্রভৃতির জন্য অর্দ্ধ প্রস্থ অন্নের ব্যবস্থা ছিল।

গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতেন, তাহা নহে। অবস্থা-ভেদে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী দাস-দাসী নিযুক্ত থাকিত। আধুনিক কালে ইংলণ্ডীয় সমাজে ধনী ও ভদ্র বংশীয়া মহিলাগণের মধ্যে যেরূপ Lady's maid রাখার প্রথা আছে সে কালেও সেইরূপ রূপদাসী (tire-women) প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থা ছিল। অবসর সময়ে ইহারা ধাতব বা কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, মহিষ বা মৃগশৃঙ্গ বিনির্ম্মিত প্রসাধনী (চিরুণী) এবং ধাতুনির্ম্মিত ও "রসাঢ্য" (পারদ সংযুক্ত) দর্পণ প্রভৃতির সাহায্যে ("যুক্তিকল্পতরু") কেশাদি সংস্কার এবং অঙ্গে লোধ্র, কুঙ্কুম, যষ্টিমধু যব তণ্ডুল প্রভৃতি একত্র পেষণসঞ্জাত কান্তিবর্দ্ধক প্রলেপ (Vide Garura Purana chap c c Ed. M. N. Dutta p. 63 for the recipt of this cosmetique) মর্দ্দন ও অন্যান্য অঙ্গরাগাদি প্রয়োগ করিয়া গৃহ-স্বামিনীর বেশ-ভূষা সম্পাদন করিয়া দিত।

(১৬) স্বামী গৃহে অনুপস্থিত না থাকিলে বধূগণ "বিবাহে-আবাহে" উৎসবে, সমাজে দেবালয় প্রভৃতি স্থানে গুরুজনের অনুমতি লইয়া আত্মীয়-আত্মীয়াগণের সহিত যাতায়াত করিতে পারিতেন। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, রূপজীবাগণ রাজ শুদ্ধান্তে গমন করিয়া নৃত্য-গীতাদির দ্বারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে তুষ্ট করিত। মধ্য বিত্ত সংসারে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না তাহা জানা যায় না; তবে যতদূর দেখা যায়, ইলেক্‌ট্রিক বাতি, জলের কল, গ্যাস প্রভৃতি না থাকিলেও সেকালের নর-নারীরা বাড়ী ও গৃহস্থালী লইয়া নিতান্ত অসুখে কাল কাটাইতেন না! এই সকল ঘরকন্নার খুঁটি ব্যাপারেও প্রাচীন কালের মনীষীগণের নিকট হইতে যে এখনও আমাদের শিখিবার অনেক আছে ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার "ধার-করা পালক" পরিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই!

শ্রীগুরুদাস সরকার।

(১৬) যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে প্রসাধনী ও দর্পণ নয়টি রাজোপকরণের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেশ-ভেদে ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির দশা-ভেদে বিভিন্ন দ্রব্যে নির্ম্মিত 'প্রসাধনী' ব্যবহার করা হইত। দর্পণ দৈব, মানুষ ও রাক্ষস এই তিন প্রকারের ছিল। ইহার মধ্যে মানুষ দর্পণ বিলাসোপকরণ-রূপে, দৈবী দর্পণ পর্ব্বাদি উজলক্ষে এবং রাক্ষস দর্পণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইত। এই সকল দর্পণ স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সীস অষ্টধাতু প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুতে নির্ম্মিত হইত। গত ফাল্গুন মাসের সাহিত্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। মানুষের সমান উচ্চদর্পণকে পৌরুষ দর্পণ বলা হইত। চারি অঙ্গুলি প্রমাণ লম্বা ও ঐ পরিমাণ চৌড়া 'বিজর'দর্পণ সকলের পক্ষে সুখপ্রদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সাহিত্যের গোড়ার কথা

পৃথিবীতে এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের নানাদিকে বৈষম্য আছে। কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে বৈষম্য আছে, যেমন আর্য্যের সঙ্গে সেমেটিক বা মঙ্গোলিয়ান জাতের বৈষম্য, তা নয়—একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যেও নানা বৈষম্য দেখা যায়, যেমন পশ্চিম দেশীয় আর্য্যজাতির মধ্যে অ্যাংলোস্যাক্‌সনের সঙ্গে কেল্ট বা স্লাভের পার্থক্য নানাদিকেই রহিয়াছে। ভৌগোলিক সংস্থানের বৈচিত্র্যের জন্য প্রথম বিস্তর পার্থক্য দেখা দেয় এবং সেই বৈচিত্র্যের দরুণ ও অন্যান্য নানা কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গঠন ও রীতি নীতির পার্থক্যও দাঁড়ায়; ক্রমে পার্থক্যগুলা জমিতে জমিতে এক একটা জাতের আকৃতি-প্রকৃতি এমনি দানা বাঁধিয়া বসে যে হয়ত অন্যজাতের সঙ্গে তার মূলতঃ কোন বৈষম্য না থাকিলেও স্থূলতঃ এত বৈষম্য হয় যে দুটো জাতকে এক জাত বলিয়া প্রমাণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

জাতিগত এই সকল বৈষম্য সাহিত্যের মধ্যেও ভেদ রচনা করে কিনা, সেইটেই প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু তা যে করে না তার প্রধান প্রমাণ এই যে, যে-কোন জাতের সাহিত্যের রস সকল জাতের লোকেরাই আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করে। সাহিত্যের যজ্ঞে জাতবিচার নাই, এ যজ্ঞে বিশ্বের নিমন্ত্রণ। ইংরাজ বা ফরাসী বা রুশ সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যা চীন বা জাপানের লোকের উপভোগ্য নয়, অথবা চীন বা জাপানের সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যা ফরাসী বা রুশের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। সাহিত্য এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ভেদের চেয়ে অভেদের কথাটাই বেশি করিয়া প্রকাশ পায়, যেখানে মানুষ আপনার মধ্যে বিশ্বমানুষের অনুভূতিকে অনুভব করিয়া বিশ্বমানুষের জন্যই সেই আশ্চর্য্য অনুভূতিকে কতই ছলাকলার সাহায্যে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করে।

অথচ সাহিত্যকে একটা সার্ব্বজাতিক বস্তু বলিলে জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার যেন কোন রকমের সম্বন্ধ নাই, এমন কথা মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। সব রকমের জাতীয়-বিশেষত্ব-মুছিয়া-ফেলা সার্ব্বজাতিক ভাষা বা শিল্প বা ধর্ম্ম বা সাহিত্য যে কেমন-তর অদ্ভুত বস্তু হয় তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। তার না থাকে কোন রং, না থাকে কোন রস; তাহা রক্তমাংসহীন একটা অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্ পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন সার্ব্বজাতিক 'এস্‌পেরাণ্টো' ভাষায় হয়ত ব্যবসাবাণিজ্যের কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সে ভাষায় সাহিত্যের ফুল কখনই ফুটিবে না। তেমনি সার্ব্বজাতিক ধর্ম্ম, ধর্ম্মের সাধন ও অনুষ্ঠানাদি বর্জ্জিত হইয়া,—সুতরাং ধর্ম্মের আসল রূপবর্জ্জিত হইয়া,—এমন একটা শুক্‌নো জিনিষ হইয়া দাঁড়ায় যে তাতে কোন সাধকের কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না। তেমনি সার্ব্বজাতিক শিল্প বা সঙ্গীত-

সবদেশের বিশিষ্ট মানস রূপলোকটিকে ও তার নানা স্ফুট-অস্ফুট চেতন-অর্দ্ধচেতন সঙ্গতি-বন্ধনকে মুছিয়া ফেলিয়া এমন একটা আকাশ-কুসুম-জাতীয় পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, যার না আছে রূপ, না আছে গন্ধ। সার্ব্বজাতিক সাহিত্যেরও সেই একই দশা।

এতো আমরা সকলেই দেখিয়াছি যে, হিন্দুর ছেলে ইংরাজের প্রেমের নভেল পড়িয়া রস পায়, ইংরাজের ছেলে হিন্দুর ঘরের লজ্জাশীলা অন্তঃপুরিকার কথা পড়িয়া রস পায়। কিন্তু সার্ব্বজাতিক সাহিত্য তৈরি করার ফরমাস হইলে এমন একটা সার্ব্বজাতিক সমাজের কথা ভাবিতে হয়, যেখানে এসব বৈষম্য নাই। তার মানে, কেবল মায়ের-ছেলের বা বন্ধুর-বন্ধুর নিতান্ত সাধারণ স্নেহপ্রীতির কথা ছাড়া অন্য কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধের কথা পাড়াই সে ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়; কেননা ঐ সব স্নেহপ্রীতির ধরণধারণ সব দেশেই মোটের উপর প্রায় সমান। অথচ দেশে দেশে ঐ সব সম্বন্ধেরই ভিতরে যে সকল বৈচিত্র্য আছে, সার্ব্বজাতিক সাহিত্য রচনার খাতিরে তাহা ভুলিতে হয়, এবং ঐ সকল সম্বন্ধের কেবলমাত্র অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাদহীন অবিশিষ্ট দিক্‌টিকেই প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং সে প্রকাশ করাও যা, না করাও তা। সাহিত্য চায় নব নব বিস্ময়, চির-পরিচিতেরই মধ্যে অপরিচিতের, চির-রহস্যের সন্ধান। সেই জন্য বিশেষ লইয়াই তার কারবার, নির্ব্বিশেষ লইয়া নয়। বিশেষের মধ্যেই সে বিশ্বকে দেখে। বিশেষ ছাড়িয়া বিশ্বের কোন অস্তিত্বকে সে মানে না।

এই সার্ব্বজাতিক সাহিত্যের উল্টাদিকে, এক এক জাত যে নিজের বিশেষ বিশেষ মূল আশ্রয় করিয়া বিশ্বমানবের ভাবের আকাশে সাহিত্যের ফুল ধরাইবে, তা সাহিত্য চায় না। সাহিত্য আরও বিশেষের দিকে যায়। জাত জিনিষটা অনেকগুলি ব্যক্তিকে তাল পাকাইয়া একটা সমষ্টি, নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া এই সমষ্টি গড়ার কাজ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলে, তারপর একরকম দাঁড়াইয়া যায়। জাত কেন, প্রত্যেক জাতের আধার বা অবলম্বন সমাজ জিনিষটাও এই ভাবেই গড়িয়া উঠে। তাও এক জাত বা দশ জাত লইয়া তৈরি হইতে পারে। জাত বলিতেও এমন কিছু বোঝায় না যে তাকে স্বতন্ত্র একটি জাতই হইতে হইবে। অনেক জাতের সম্মিশ্রণেও জাত তৈরি হয়। ইংরাজ, হিন্দু, আমেরিকান, চীন—এ সব জাতই নানা জাতের মিশ্রণে উৎপন্ন। কিন্তু প্রত্যেক জাতের, সমাজের কাজ বা রাষ্ট্রের কাজ ঐ সমষ্টি-বোধটাকে গড়া, ব্যক্তিকে ঐ সমষ্টির মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের কাজ ঠিক্ এর উল্টা। সাহিত্য ঐ সমষ্টির জট হইতে ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া তার অনন্ত বিশেষত্বকে খুলিয়া খুলিয়া দেখায়। তার কাছে এক একটা মানুষই যেন এক একটা বিশ্ব। সাহিত্যে সমাজের ঐ শ্রেণীবোধ বা group-consciousness কাজে লাগে না; ব্যক্তি-বোধই তার সন্ধান ও আবিষ্কারের বিষয়। কোন দুটা মানুষকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া দেখা চলে না; দুটা মানুষের মধ্যে অসীম বৈচিত্র্য। এর জগতের সঙ্গে ওর

জগতের অনন্ত পার্থক্য। সেই পার্থক্য সেই বৈচিত্র্যের আবিষ্কারেই সাহিত্যের আনন্দ। সাহিত্যে তাই যে যত বৈচিত্র্যকে আবিষ্কার করিতে পারে, সে ততই মানুষের ভাবলোক ও আনন্দলোকের পরিধিকে বিস্তীর্ণতর করিয়া দেয়।

অথচ শুধু বিশেষ লইয়া যদি সাহিত্যের কারবার হয়, তবেত এক দেশের সাহিত্য বা এক জাতের সাহিত্য অন্য দেশের অন্য জাতের লোকের কাছে দুর্ব্বোধ ও দুরধিগম্য হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহা হয় না। কেননা, সাহিত্য বিশেষকেই বিশ্ব করিয়া দেখায়, সেই কারণেই সাহিত্যযজ্ঞে বিশ্বের নিমন্ত্রণ হয়। সাহিত্যে "Truth is beauty, beauty truth"। যে-বিশেষের সৌন্দর্য্যকে সে উদ্ঘাটন করে, সে সৌন্দর্য্যকে সে একটি অমর অক্ষয় সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখে। বিজ্ঞানে নিউটন যেমন দেখিয়াছিলেন যে, যে আকর্ষণের নিয়মে আপেল ফল মাটিতে পড়ে, সেই আকর্ষণের নিয়মেই সূর্য্য গ্রহকে আকর্ষণ করে, সে নিয়ম বিশ্বনিয়ম—তেমনি সাহিত্যে সাহিত্যস্রষ্টা মাত্রেই মানুষের মধ্যে যখন কোন বিশেষ রহস্যকে আবিষ্কার করেন, তখন অনুভব করেন এবং অনুভব করান যে, সেই বিশেষ রহস্য বিশ্বমানব-প্রকৃতিরই ভিতরকার রহস্য, কোন বিশিষ্ট জাতের মানুষের প্রকৃতির রহস্য মাত্র নয়। তা যদি না হইত, তবে ত সাহিত্য পড়িয়া সকল কালের সকল দেশের লোক এমন আনন্দ পাইতেই পারিত না।

সমষ্টি-বোধ জিনিষটা তবে কি সাহিত্যে কোথাও প্রকাশ পায় নাই বা পাইতে পারে না? সমাজ বা রাষ্ট্র বা বিশ্বমানব কত কালের ইতিহাসের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার" ভিতর দিয়া কত আশ্চর্য্য অভিনব লীলায় বিচিত্র ও বিপুলায়তন হইয়া চলিয়াছে, ইহার যে একটা বিশাল অনুভূতি, সাহিত্যে কি তাহা প্রকাশ খুঁজিবে না? নিশ্চয়ই খুঁজিবে। কারণ ব্যক্তিবোধের মধ্যেই ত এই বড় বোধটি রহিয়াছে। কিন্তু এই বোধ কোন সংকীর্ণ জাতীয়তার বোধ নয়, তা যদি হয় তবেই তাহা সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে রডিয়াড্ কিপ্লিং ও ওয়াল্ট হুইটম্যান এই দুই জনের নাম করা যাইতে পারে। কিপ্লিং তাঁর কাব্যে ইংলণ্ডের স্বাজাত্যাভিমান, সাম্রাজ্যাভিমানকে ব্যক্ত করিয়া এক সময়ে শুধু ইংরেজের নয়, জার্ম্মাণ প্রভৃতি স্বাজাত্যাভিমানী জাতের মনোহরণ করিয়াছিলেন। এই যে এক ধরণের রাষ্ট্রবোধ এটা বিশ্ববোধের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। আমাদের মধ্যে যাঁরা "হিন্দু সাহিত্যের" গরিমা করেন, তাঁদেরও সেই হিন্দুত্ববোধ বিশ্ববোধের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু হুইট্‌ম্যান আমেরিকার গণতন্ত্র-বোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাবী মহামানব-সঙ্গীতির যে অমূর্ত্ত স্বপ্নকে তাঁর কাব্যে মূর্ত্তরূপ দিয়াছেন, তাতে বিশ্ববোধ ত কোন জায়গায় ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ তাঁর সেই En masse, সেই Democracyর মধ্যে প্রত্যেক বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশের স্থান আছে।

"One's self I sing, a simple
separate person
Yet utter the word Democratic,
the word En masse."

সমাজ বা স্বাজাত্য-বোধকে সজ্ঞান ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টায় যে জাতীয় সাহিত্য গড়ে, তা ছাড়া সকল দেশেই সকল জাতের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে লোকসাহিত্য বলিয়া একটা বস্তু গড়িয়া ওঠে। legends, folk-lores, chronicles, sagas, fables, প্রভৃতি বিস্তর সাহিত্য এই পর্য্যায়-ভুক্ত। এ সাহিত্য ঠিক্ বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থান পায় না, অথচ এর যে একটা রং ও রস আছে, তাও অবহেলার জিনিস নয়। ইউরোপে মধ্যযুগে troubadour সাহিত্য এই শ্রেণীর সাহিত্য ছিল। gaelic বা celtic সাহিত্যও এই শ্রেণীর সাহিত্য। আমাদের দেশেও কবিওয়ালাদের গান, পাঁচালী প্রভৃতি সাহিত্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে।

কালিদাসের কালে 'উদয়ন-কথা' সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে চল ছিল, মেঘদূত পড়িয়া তাহা জানা যায়। পৃথিবীতে এ শ্রেণীর সাহিত্য পরিমাণে বড় কম নয়। এ সাহিত্য খুবই ঘোরো রকমের। সেইজন্য যদি কোন সাহিত্যকে ঠিক্ 'জাতীয় সাহিত্য' নাম দিতে হয়, তবে এই ধরণের সাহিত্যই সেই নাম পাইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয়।

স্বাদেশিক ব্যক্তি এই সাহিত্যের উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক সময় খুবই চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেইজন্য তিনি যখন এই সব লোকসাহিত্যকে উদ্ধার করিতে চান বিশ্বলোকে, তখন অজ্ঞাতসারে সাহিত্যের লৌকিক অংশগুলি তাঁর হাতে অলৌকিকত্বে 'রূপান্তর' পায়। বৈষ্ণব সাহিত্য এক সময়ে এদেশে এমনি করিয়াই রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগে এরিয়ষ্টো প্রভৃতি যে বড় কবি হইয়াছিলেন সেও এমনিতর প্রণালীতে। বর্ত্তমান celtic revivalএর কবিরা এমনি করিয়াই পুরানো কেল্টিক কবিতার মদের বোতলে নূতন ভাবমদিরা ঢালিতেছেন—পুরানো নূতনে রূপান্তরিত করিয়া লইতেছে gaelic legendগুলিকে রূপান্তরিত করি Fiona Macleod ছদ্ম নাম দিয়া আধুনি কবি Dream Tales, Spiritual Tale প্রভৃতি যে সকল অপূর্ব্ব গদ্যকাব্য রচিয়াছে তাও তাদের গেলিকত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাংলা দেশে কবি চিত্তর দাশ বৈষ্ণব কবিতা ও কবিওয়ালাদের গান এম্‌নি করিয়া রূপান্তরিত করিতে চা এ বিষয়ে পরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ ছ

তবু যেমন করিয়াই রূপান্তরিত যাক্, এ ধরণের ঘোরো লোকসাহি কোন দিনই বড় সাহিত্যের সমপর্য্যায় হয় না। গ্যয়টের "ফাউষ্ট" মধ্যযুগীয় legend বা লৌকিক কথা আশ্রয়ে লিখিত কিন্তু তার ভিতরে মানব প্রকৃতির দিক্‌টি গ্যয়টে আবিষ্কার করিয়া উদ্ঘাটি করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা চিরন্তন মা প্রকৃতির একটা সত্য দিক্। সেই কা ফাউষ্টের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গ্যয়টে পূর্ব্বে অনেক নাট্যকার নাট্য তৈরি করিছে গ্যয়টের নাট্য তাহাদিগকে আত্মসাৎ ক লইয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাট্যাবলী সেইরূপ চিরন্তন মানবপ্রকৃতির নানা বিচিত্র দিক্‌কে অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। হ্যাম্‌লেট কোন এক কালের মানুষ নয়—তার সংশয়-দ্বিধা, তার

ভিতরকার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে ইচ্ছাবৃত্তির প্রবল বিরোধ ও বিচ্ছেদ এবং সেই বিচ্ছেদজনিত তার মানসিক অশান্তি, তার জীবনের সুগভীর ট্রাজেডি, ইহা চিরকালের সব মানুষেরই মধ্যে বিচিত্র আকারে দেখা দিয়া থাকে। আমাদেরি জীবনের কোন না কোন পর্ব্বে আমরা হ্যাম্‌লেট্ বা ফাউষ্টের অবস্থার ভিতর দিয়া যাই। আমরা যখন কোন বড় আদর্শকে বুঝি অথচ তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না, দুর্ব্বল ইচ্ছা বারম্বার যখন আমাদিগকে দিক্‌ভ্রান্ত করে, তখন জীবনের মধ্যে যে ট্রাজেডি ঘনায়, তাহা হ্যাম্‌লেটেরই ট্রাজেডি। আমাদের ভিতর-কার নানা প্রবৃত্তিকে যখন ক্ষুধিত ও অপরিতৃপ্ত রাখিয়া আমরা কেবল মাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধির সাহায্যে জীবনটাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করি, তখন সেই সব suppressed instincts, সেই সব রুদ্ধ অন্ধ প্রবৃত্তি কোথা হইতে জীবনের ভিত্তি-মূলে ছিদ্র করিয়া এতদিনকার সমস্ত নির্ম্মাণটাকে একেবারে ধূলায় শয়ান করিয়া দেয়। সেই যে পাপের মধ্যে রুদ্ধ প্রকৃতির উদ্ভাসিত দুর্ব্বার মুক্তি, সেই যে জীবনের ঘোরতর ট্রাজেডি—তাহাই ফাউষ্টের ট্রাজেডি এবং তাহাতেই ফাউষ্টের মুক্তি। এ সমস্তই চিরকালের মানুষের জিনিস, মানুষের বৃহৎ জীবনের ভিতরকার জিনিস। দান্তে, গ্যয়টে, শেক্‌স্‌পীয়র, ব্রাউনিং—এইজন্য কোন বিশেষ দেশে বা বিশেষ কালে আবদ্ধ হন্ নাই। সর্ব্বকালের সর্ব্বমানুষের তাঁরা। লোক-সাহিত্যকে রূপান্তরিত করিলেও তাহা এমনতর সর্ব্বকালের জিনিস হয় না। জীবনের কতটুকু অংশকে তাহা প্রকাশ করে? তার রূপ অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া তার রূপকও অত্যন্ত সংকীর্ণ। আর বড় সাহিত্যের রূপ বড় বলিয়া, তাহা সমগ্র জীবনের রূপ বলিয়া তার রূপক চিরকালের রূপক। প্রতি মানুষ নিজের নিজের জীবনে সেই রূপকের মোড়ক খোলে, সেই রূপকের ব্যাখ্যা করে। শেক্‌সপীয়র, দান্তে, গ্যয়টে, ব্রাউনিংএর সব বড় বড় রচনাই এহেন রূপক—জীবনে জীবনে তার তত্ত্বব্যাখ্যা, জীবনে জীবনে তার মর্ম্মোদ্ঘাটন।

তাই যদি হয়, যদি জীবনের ভিতর হইতেই বড় সাহিত্যকে পড়িতে হয়, তবে সমাজভেদে যে সাহিত্যভেদ হয়, তার কি করিবে? ইউরোপীয় প্রণয় কবিতা তবে হিন্দুর ছেলে জীবনের ভিতর হইতে কেমন করিয়া পড়িবে? কেন, প্রেম জিনিসটা কি ইউরোপীয়েরই একচেটিয়া, হিন্দু কোর্টশিপ্ করিয়া বিবাহ করে না বলিয়া তার কি প্রেম হইতে পারে না? একথা অবশ্যই মানি যে, আমাদের দেশে সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্বাধীন ভাবে প্রেমের বিনিময় হইতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের প্রেমসম্বন্ধে পরস্পরের স্বাধীন নির্ব্বাচন নাই বলিয়া প্রেমের ক্ষেত্র এ দেশে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সেইজন্য খাঁটি প্রেমের কবিতাও এদেশে বিরল। পুরাকালে গান্ধর্ব্ব বিবাহ জিনিসটা প্রচলিত না থাকিলে কালিদাসের "শকুন্তলা" লেখা সম্ভবই হইত না। তবু, সংস্কৃত সাহিত্যে মানব প্রেমের প্রকাশ কতটুকু

হইয়াছে? কামের বর্ণনার পরিমাণ প্রেমের বর্ণনার পরিমাণের চেয়ে ঢের বড়। নারীর রূপ লইয়া সংস্কৃত কবি যতটা ব্যস্ত, নারীর মন লইয়া ততটা নয়। নারী শুধু রূপের জন্য পুরুষের উপভোগ্যা, এই ভাবটাই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবল। তার পর সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে বাংলা সাহিত্যে যে সকল প্রেমের কাব্য আছে, তাতেও এই লালসার দিকই প্রবল। সুস্থভাবে যেখানেই প্রেমের মত এত বড় একটা মানব বৃত্তির চরিতার্থতা হয় না, চরিতার্থতার বাধা হয়, সেখানে তাহা অসুস্থ বিকারে প্রকাশ পাইতে বাধ্য। বাঙালীর "বিদ্যাসুন্দর" সেই অসুস্থ বিকারের কাব্য। বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যেও সেই বিকারের দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি মেলে, এবং তার কারণও ঐ একই। তবে বৈষ্ণব কাব্যকে আধ্যাত্মিক করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া তাকে লৌকিক দিক্ হইতে বড় একটা দেখি না। কিন্তু গোড়াতে তাহা যে একেবারেই হুবহু আধ্যাত্মিক ছিল এমন আমার ত মনে হয় না। বিদ্যাপতির মধ্যে যে সব লালসার দগদগে বর্ণনা পাই, তাহা তিনি আধ্যাত্মিক অর্থে মোটেই লেখেন নাই। একমাত্র চণ্ডীদাস ও কতক পরিমাণে বলরাম দাস ভিন্ন আর কোন কবিই "love's rare universe" প্রেমের অপূর্ব্ব জগতের খবর পান নাই। "পিরীতি-নগরে"র স্বপ্ন সেই মহাকবিই দেখিয়াছিলেন—যে পিরীতিতে, "কামগন্ধ নাহি"। বাংলা দেশে এখনও পর্য্যন্ত, এই আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবের যুগেও আমাদের গল্পে উপন্যাসে কাব্যে প্রেমের ছড়াছড়ি হইলেও তার বাহুল্য আনাই যে "বস্তুতন্ত্রহীন" তার একমাত্র কারণ, প্রেমবস্তুর সাক্ষাৎকারই আমাদের হয় নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যের নকল করিয়া আমরা অধিকাংশ প্রেমের কবিতা লিখি, প্রেমের নভেল লিখি। গোবিন্দলাল-রোহিণী, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী, মহেন্দ্র-বিনোদিনী, প্রভৃতি যে সকল প্রেমের চিত্র বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন তার নায়িকারা সবই বিধবা; কেননা সমাজে ঐ এক জায়গায় স্বাধীন প্রেমের একটু খানি সামান্য সুযোগ আছে বলিয়া ঐ চিত্রটাই সাহিত্যে এত বড় করিয়া এবং এত বারেবারে দেখা দিয়াছে। তার কারণ, যৌন প্রবৃত্তির ক্রমাগত নিরোধ, sex-suppression, আমাদের চিরকেলে শিক্ষা ও অভ্যাস বলিয়া অসুস্থ ইন্দ্রিয়বিকার (abnormal sexuality) আমাদের সাহিত্যে ক্রমাগতই নানা আকারে দেখা দিয়াছে ও দিবে। বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত দুর্ব্বল ভাবাতিশয্যের (sentimentality) একটা মস্ত কারণই তাই—তার প্রেমের সুস্থভাবে স্ফূর্ত্তিসাধন হইবার কোন সুযোগ নাই, সেইজন্য ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সেই ভাবাতিশয্য 'দশা' পাইতে থাকে, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা কল্পনার ভিতর হইতে নানা বিকারের সৃষ্টি করিতে থাকে।

তবে কি ইউরোপীয় সমাজের হুবহু নকল করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই? নকল করার কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই; কারণ এক দেশের সমাজের রীতি-

নীতি উৎপাটন করিয়া অন্যদেশের মাটিতে তখনই তাকে বসানো যায় না। আমাদের দেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ও ঘর্ষণা ও করিয়া ক্রমশ যে সামাজিক গঠনটি দাঁড়াইয়া গেছে, যে সব রীতি নীতি আচার ব্যবহার দাঁড়াইয়া গেছে, তাহাদেরি উপযোগী করিয়া অনুযায়ী করিয়া ধীরে ধীরে নূতন সংস্কার পরিবর্ত্তন ভিন্ন সমাজসংস্কারের অন্য কোন নিরাপদ উপায় হইতে পারে না। প্রেম নামে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের স্বাধীন নির্ব্বাচন আমাদের দেশে কোন কালে যে ছিল না, একথা তো বলা চলে না। ছিল—ইহা যদি সত্য হয় তবে বর্ত্তমান কালেই বা না থাকিবে কেন? অবরোধ-প্রথা ভারতবর্ষের চির-কালের প্রথা নয়, যে বিবাহ-রীতিপদ্ধতি এখন প্রচলিত তাও ভারতবর্ষের চিরকালের বিবাহ-রীতিপদ্ধতি নয়। অতএব, অবরোধ প্রথা যদি তিরোহিত হয়, স্বাধীন নির্ব্বাচনের প্রথা যদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই যে ইউরোপীয় সমাজের নকল ভিন্ন আমাদের পরিত্রাণ নাই এমন কথা মনে করিবার কোন হেতুই আমি দেখিতে পাইতেছি না।

একথা জানিতে ও মানিতে হইবে যে, সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্যের ক্রিয়া সমাজে দেখা দেয়, সমাজের ক্রিয়া সাহিত্যে দেখা করা যায়। যে কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ইংলণ্ডের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা individual libertyর উপর তার বর্ত্তমান সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার সমাজে কি রাষ্ট্রে বরাবর ছিল কি? যে আকারে এখন তাহা দেখা দিয়াছে তার জন্য ইংলণ্ডের সমাজ ও রাষ্ট্র কি ইংলণ্ডের সাহিত্যের কাছে কিছুমাত্র ঋণী নয়? socialism বা labour emancipation—প্রভৃতি আন্দোলনের মূলেও তার সাহিত্য রহিয়াছে। কার্লাইল্, রাস্কিন প্রভৃতির সাহিত্যই তার প্রমাণ। অত বড় যে ফরাসী বিপ্লব, তার মূলেও ছিল ভল্-টেয়ার, রুশো প্রভৃতির সাহিত্য। সেইজন্য আইরিশ কবি ওশেনেসি যে জোর করিয়া কবিদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "we are the movers and shakers of the world forever it seems" আমরা চিরকাল জগৎকে নাড়া দিয়া থাকি—তা খুবই সত্য। সাহিত্যের জন্যই সমাজে নানা আন্দোলন দেখা যায়, নানা পরিবর্ত্তন ঘটে, আবার সমাজের জন্যও সাহিত্যের প্রকাশ কখনো বা সংকীর্ণ ও বিকৃত হয়, কখনো বা ব্যাপ্ত ও প্রবল হয়।

বাংলা দেশে এই অল্প কালের মধ্যেই ত দেখিতে পাইতেছি যে, যদি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে রোমান্টিক চিত্র ও চরিত্র সৃষ্টি না করিতেন, তবে বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে সে সকল চিত্র ও চরিত্র কোন কালেই বাস্তব আকার লাভ করিত না। বঙ্কিমের পূর্ব্বে মাইকেল যদি পয়ারের বেড়ি ভাঙার মত তাঁর কাব্যে conventionএর বেড়িগুলি না খুলিয়া ফেলিতেন, তবে তাঁরই কালে বঙ্কিমের রোমান্টিক উপন্যাসগুলিই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমের ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, গোবিন্দলাল, এ সব একসময়ে-অবাস্তব রোমান্টিক চরিত্র এখন এদেশে আধুনিক সময়ে বাস্তব হইয়া গেছে।

TRACING LAMINATED.

এগুলি আর ত কাল্পনিক চরিত্র নয়। এমনি করিয়া বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নূতন types নূতন প্রকৃতি আমাদের সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ প্রাণবান্ হইয়া উঠিতেছে। এই পরিবর্ত্তন শনৈঃ শনৈঃ—অথচ গোপনে, অলক্ষিত ভাবে—ঘটিতেছে বলিয়াই সমাজ-রক্ষকের দল সময়ে সময়ে এই অভিনব সাহিত্যকে খেদাইবার জন্য নানা 'মোহমুদ্গর' উত্তোলন করেন, তবুত মোহ ছুটে না। এমন প্রস্তাবও কখনও কখনও কোন কোন মাসিক পত্রে দেখা যায় যে,এই সকল আধুনিক উপন্যাস নাট্য হিন্দু মেয়েদের অপাঠ্য। অতএব তাহাদিগকে এ সকল পড়িতে না দিয়া শুধু সীতা সাবিত্রীর কথা পড়িতে দেওয়া হৌক্। প্রস্তাবকারীদের ভয় এই যে, এই সকল আধুনিক উপন্যাস পড়িলে মেয়েদের প্রকৃতির যে বদল হইবে তাতে সমাজব্যবস্থার ওলোটপালোট্ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে মেয়েদের সাহিত্য পড়ানো বন্ধ করার প্রস্তাবই তাঁদের করা উচিত। কেননা, মহাভারত পড়িলেও মেয়েদের মন ঠিক্ হিন্দুর আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার ছাঁচে না গড়িতেও পারে। সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। তার পর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এক কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিরঙ্কুশ দুচারিখানি বই ছাড়া মেয়েদের পাঠ্য আর কিছুই থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব কাব্য পড়িলে বা ভারত-চন্দ্র পড়িলে তাদের যত অনিষ্ট হইতে পারে আধুনিক নাটক নভেল পড়িলে কি তত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যাঁরা এ সব কথা লইয়া আলোচনা করেন, তাঁরা ভাবেন না যে, জীবনের গতিকে রোধ করিবার সাধ্য কোন সমাজব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থাকারের হাতে নাই। যে জীবনের স্রোতের তোড়ে এই নূতন সাহিত্য এদেশে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সমাজের অনেক বাঁধনকে ভাঙিবেই, অনেক বাঁধ কূলকে ভাসাইবেই। সুতরাং সমাজ-সংস্কারের চেয়েও তার কাজ অনেক বেশি-দূরগামী ও গভীরগামী। তাকে রোধ করিবার প্রস্তাব যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন না যে তাঁরা অসম্ভবের বিরুদ্ধেই লড়িবার প্রস্তাব করেন।

সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের কোন্ খানে যোগ আছে আর কোন্ খানে যোগ নাই, তাহা আলোচনা করা গেল। সাহিত্য জাতীয়তাকে মুছিয়া সার্ব্বজাতিক হয় না, আবার কেবল মাত্র জাতীয়তা-বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়াও প্রকাশ পায় না। সাহিত্য কেবলি বিশেষকে আবিষ্কার করে এবং সেই বিশেষের মধ্যেই বিশ্বকে দর্শন করে। সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ-বোধ ও বিশ্ববোধ দুয়েরি সমাবেশ। সেই হিসাবেই সাহিত্য সার্ব্বজাতিক বস্তু হয়। সেই বিশেষ-বোধের জন্য সাহিত্য সমাজেও নব নব আন্দোলন উপস্থিত করে। সাহিত্যের প্রভাব সমাজের উপর পড়ে, আবার সমাজের প্রভাবও সাহিত্যের উপর পড়ে। সমাজ সংকীর্ণ হইলে বা বিকৃত হইলে সেই সংকীর্ণতা বা বিকার সাহিত্যকে আক্রমণ করে; সমাজ স্বাধীন ও সুস্থ হইলে তার সেই স্বাধীনতার স্বাস্থ্য সাহিত্যকে নব নব সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ করিয়া রাখে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

মুসলমান সমাজ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

হিন্দু পরিবারের পাশাপাশি মুসলমান-পরিবার। হিন্দু আইনের বিরুদ্ধ মুসলমান আইন। মূলসূত্রের মধ্যে মুসলমান-আইন, প্রাচীন আরব-আইনই রহিয়া গিয়াছে। সুস্পষ্টতা ও সুনির্দ্দিষ্টতা সম্বন্ধে, আরব-জাতি ব্যবস্থা প্রণয়নে যে বিশেষ-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে তাহা হিন্দুজাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহার পর, উহারা ইহুদি ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়; প্রাচীন গ্রীশ, পারস্য, রোম, বৈজানটিয়া এবং য়ুরোপীয় নবীন জাতি সমূহের প্রভাবের বশবর্ত্তী হয়। কিন্তু একটি অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহাদের আইন হিন্দুদের ন্যায়, রীতি নীতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশ লাভ করে নাই; উহাদের আইন কতকটা আরবীয় ও কতকটা য়ুরোপীয়, কাজেই ভারতীয় মুসলমানদিগের উপযোগী হয় নাই। যাহারা উৎপত্তি-সূত্রে হিন্দু—তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পরেও হিন্দু রহিয়া গেল। তুর্ক, মোগল, আফ্‌গান প্রভৃতি অন্য মুসলমানেরা শীঘ্রই অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক দেশীয় লোকের দৃষ্টান্ত ও আব্-হাওয়ার বশীভূত হইয়া পড়িল। আইন ও লোকপ্রকৃতির বিরোধ হইতে উহা হইতে দুইটি পরিণাম-ফল উৎপন্ন হইল: আইন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবহার এবং মুসলমান-সমাজের অবনতি।

মুসলমান-আইনের স্থূল রেখাগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—আরবদিগের পিতৃ-তন্ত্র-পরিবার-পদ্ধতির স্মৃতি প্রায় কিছুই রহিল না।

সাবালকত্বের বয়স ষোল বৎসর নির্দ্ধারিত হইল। নাবালকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পিতার উপর, উপরিতন পিতৃ-বংশীয়ের উপর অথবা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত হইল। কেবল পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি-দিগের অবর্ত্তমানেই, মাতা এবং উপরিতন মাতৃ-বংশের লোকেরা উক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার পায়। কিন্তু মাতা পুনর্বিবাহিতা না হইলে; স্বীয় নাবালক পুত্রের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন এবং বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বীয় কন্যার শিক্ষা-ভার গ্রহণ করেন। (১)

হিন্দু-আইনের ন্যায় মুসলমান-আইন, অবিভক্ত পারিবারিক স্বত্বাধিকার স্বীকার করে না। এইরূপে দেখা যায়, মুসল-মানেরা সভ্যতার আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে। মুসলমান-আইন দানপত্র-বর্জ্জিত ও দানপত্র-সমন্বিত উভয়প্রকার উত্তরাধিকারই স্বীকার করে। তবে কিনা, দানপত্র-

(১) বালক "সাবি" নামে এবং নাবালক যুবক "মুরাহিক" নামে অভিহিত হয়। ১৬ হইতে ৩৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মুসলমানের পদবী "শাব", ৩৪ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত "কোহল", তাহার পর মুসলমান, "শেখ" উপাধিতে ভূষিত হয়। তা ছাড়া, মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত অনেক হিন্দু-জাত এই "শেখ" পদবী গ্রহণ করে। ১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারে ২৭, ৬৪৪, ৯৯৩ "শেখ" গণনাভুক্ত হইয়াছে।

TRACING LAMINATED.

সূত্রে কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইলে, দানপত্র-বিরহিত উত্তরাধিকারী, সম্পত্তির এক তৃতীয় অংশ মাত্র প্রাপ্ত হয়। মুসলমানের আইনে জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম নাই। কন্যাদিগের অংশ, পুত্রদিগের অংশের অর্দ্ধেক। কোন মৃত পুত্রের সন্তানেরা স্বীয় পিতৃব্যদিগের অধিকার-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। মৃত পুত্রের নিকট-আত্মীয়েরা, সন্তানেরা, পত্নী—ইহাঁরা পরবর্ত্তী ভাবী উত্তরাধিকারী।

হিন্দু-আইনের বিপরীতে মুসলমান আইনে, যোগ্য বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহসম্বন্ধীয় চুক্তির সিদ্ধতার পক্ষে, পাত্র ও পাত্রীর ইচ্ছার স্বাধীনতা ও মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী কন্যা, স্বাধীনভাবে স্বীয় পতি নির্ব্বাচন করে; অপ্রাপ্ত-বয়স্কা যুবতী কন্যা স্বীয় পিতা অথবা গুরুর সম্মতি গ্রহণ করে; পিতা, অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন; কন্যা যোগ্য বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বে এই বাগ্‌দান হইলে তবেই তাহা সিদ্ধ হয়।

এই সমস্ত ব্যবস্থা, মুসলমান-আইনকে হিন্দু-আইন অপেক্ষা উচ্চতর আসনে স্থাপন করিয়াছে। এবং হিন্দু-আইনে "অন্তর্বিবাহের" যে নিয়ম আছে, মুসলমান-আইন সে সকল নিয়মও স্বীকার করে না!

কেবল মুসলমান-আইনে,—মাতার সহিত, মাতামহীর সহিত, দুহিতার সহিত, পুত্রবধূর সহিত, দৌহিত্রীর সহিত, সহোদরা ভগিনীর সহিত, খুড়ীর সহিত, স্বীয় ধাত্রীর সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। মুসলমান কোন বিধর্ম্মীকে বিবাহ করিতে পারে—যদি সেই বিধর্ম্মী ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয় (ভারতবর্ষে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগকেও বিবাহ করে)। ইসলামধর্ম্ম মুসলমানকে চারটী ধর্ম্মপত্নী ও অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উপপত্নী গ্রহণ করিতে সম্মতি দেয়। বিবাহ-ভঙ্গে কোন বাধা নাই। কিন্তু যে পত্নীকে স্বীয় পতি তিন বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহাকে সেই পতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না—যদি তৃতীয় বারের প্রত্যাখ্যানের পর সে আর কাহারও পত্নী না হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানেরা অনুষ্ঠানপ্রিয় নহে; তাহাদের মতে, বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র; সেই চুক্তির দ্বারা উত্তর-বংশীয়দের বৈধতা সম্পাদিত হয়। মৃতদিগকে বিনা-আড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হয়। একটি সাদাসিধা প্রস্তর-খণ্ডই মৃতের সমাধি-মন্দির। কিন্তু হিন্দুদের দৃষ্টান্তে অনেক মুসলমানই আজ কাল বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানে আড়ম্বরপ্রিয় ও অতিব্যয়শীল হইয়া উঠিয়াছে।

* *
*

ভারতীয় মুসলমানদিগের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা: সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণকে যেমন আমি হিন্দুর মূল-আদর্শ রূপে ধরিয়াছি, সেইরূপ বহু শতাব্দী হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত আর পরিবারের বা মোগল পরিবারের কোন সম্ভ্রান্ত সামন্ত শ্রেণীর ব্যক্তিকে মুসলমান জাতির মূল-আদর্শ রূপে গ্রহণ করিব। দৃষ্টান্ত যথা:—হৈদরাবাদের নবাব। উক্ত ধনশালী, পরাক্রান্ত নবাব প্রাসাদে বাস করেন। প্রাসাদটি

প্রাকার-পরিবেষ্টিত এবং বৃহৎ বেষ্টনীর মধ্যে বহুসংখ্যক মণ্ডপ-গৃহ অধিষ্ঠিত। বৃহত্ত্ব ও ধ্বংসদশা এই দুয়ের মিশ্রণই মুসলমান প্রাসাদের পরিচায়ক লক্ষণ। সামন্তরাজ-সুলভ অনুচরবর্গ:—অধীন জায়গীরদার, সৈন্য, ভৃত্য, বাজপাখী-রক্ষক, কুকুর ও শিকারী চিতার তত্ত্বাবধায়ক। কতকগুলি হাতী। কয়েক শত ঘোড়া। বিচিত্র প্রকারের পরিচ্ছদধারী সৈনিক ও ভৃত্য:—হিন্দু, আরব, মোগল, য়ুরোপীয়। আরবেরা আড়ম্বরময় আতিথ্যের অনুরাগী। বড় বড় দালান-ঘরে, অভিজাতবর্গ, সাধারণ জনসমূহ, ভিক্ষুকের দল, মাদুরের উপর অথবা উচ্চ গদির উপর, পা-দুমড়াইয়া বসিয়া আছে, তাহাদিগকে নানাপ্রকার খাদ্য দেওয়া হইতেছে; কাফি দেওয়া হইতেছে, হুকা দেওয়া হইতেছে। গৃহকর্ত্তা আসিলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইনি প্রায় শ্মশ্রুহীন কোন যুবক, অথবা দীর্ঘ-শুভ্র-শ্মশ্রুধারী কোন শেখ। প্রকৃত মুসলমান-সুলভ প্রশান্ত ভাব ও গাম্ভীর্য্য তাঁহাতে আছে। গোলাকার পাগ্‌ড়ী, শস্ত্রসমন্বিত শিকারের পরিচ্ছদ। ধীরে ধীরে কথা কহেন, ইহাঁর আদব-কায়দা শ্রান্তজনসুলভ। এই গর্ব্বিত ধরণের আদব-কায়দা সকল মুসলমানই আরবদের নিকট হইতে শিখিয়াছে।

ইহারা যথানিয়ম নমাজ করে;—কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মভাব উহাদের খুবই কম। উহারা শাস্ত্রবিহিত উপবাসের নিয়ম পালন করে; দিবাভাগে সুরাপান করিতে বিরত হয়, কিন্তু রাত্রিকালে স্বেচ্ছাসুখে সুরাপান করে (২)। অন্দর-মহলে বহু রমণী, কিন্তু তথায় গার্হস্থ্য জীবন আদৌ নাই:—বিবাহিত পুত্রেরা পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কাজ-কর্ম্ম:—কোন স্বাধীন রাজার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী হইলে এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন কাজ করে, অধীন জাইগীরদারদিগকে অভ্যর্থনা করে। মোটের উপর, ইহারা অলস, নৈষ্কর্ম্ম্য-ক্লান্ত, আড়ম্বরময় জীবন যাপন করে।

অল্প মুসলমানই ধনবান ও প্রভাবশালী; মুসলমানের না-আছে মনের নমনীয়তা, না-আছে নূতন-সভ্যতার সহিত আপনাকে উপযোগী করিবার ইচ্ছা। তাহার অন্তরাত্মাটা সৈনিকের অন্তরাত্মা; শান্তির দেশে সে কি করিবে ভাবিয়া পায় না; সেনানায়কের কাজে সে অভ্যস্ত; যে দেশে কোন বিধর্ম্মী সেনানায়ক, সে দেশকে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না।

মালাবারী নামক একজন পার্সী, গুজরাটস্থ মুসলমান আমীর-ওমরাও-দিগের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—মুসলমানেরা সুরাটের এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত গুজরাটের প্রভু ছিল। কিন্তু এক্ষণে, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, শ্রেণীর হিসাবে সম্ভবতঃ তাহারা যার-পর-নাই দরিদ্র। উহাদের অভিজাতবর্গ লক্ষ্যশূন্য উচ্চাভিলাষ-বিরহিত জীবন-যাপন করে। এই সব লোক স্বকীয়

(২) এই স্থলে, সুরাটের মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। বিদেশী সমালোচক মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন সাধারণ ভারতীয় মুসলমান-সমাজের সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মনে হয় না। —অনুবাদক।

TRACING LAMINATED.

কুল-গর্ব্বের চাপেই নিষ্পেষিত; এবং উহারা অনাহারে মরিবে, তবু ভিক্ষা করিবে না। উহারা "সৌভাগ্যের আঁচল ধরিবার" জন্য সততই প্রস্তুত। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাহাদের নিকট কখনই আসে না। শূন্যগর্ভ ভোগসুখ ও অলস ক্রিয়া-কর্ম্ম লইয়াই তাহাদের নৈতিক জীবন গঠিত এবং তাহাদের যাহা-কিছু ধন-সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহা "রাজা-রাজা" খেলাতেই নিঃশেষিত হয়। সেই "পুরাতন সুখের দিনের" জন্য তাহারা ক্রমাগত আক্ষেপ করে, এবং তাহারা হতাশ হইয়াও তবু আশা ছাড়িতে চাহে না, এবং সুদিনের জন্য আশা করিয়া-করিয়া আশ্চর্য্য ধৈর্য্য-সহকারে জীবন কাটাইয়া দেয়। সময় কাটে না দেখিয়া অনেকে ইন্দ্রিয়-সুখের হাতে আপনাদিগকে একেবারে সমর্পন করে। এইরূপ "নির্ব্বোধের স্বর্গে" থাকিয়া উহারা নাচে, গানে, পানাহারে সময় অতিবাহিত করে। ভাল কাজের কথায় উহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বেচারা! বন্ধুর হিসাবে দেখিয়াছি উহারা খাঁটি বন্ধু। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই হীন দারিদ্র্যপঙ্কে নিমজ্জিত; এবং বাহিরে একটা মান-সম্ভ্রমের ভড়ং রাখিবার জন্য (যাহা উহাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়) গৃহকর্ত্তার অতীব মমতাময়ী পত্নী ও ভক্তিমতী দুহিতা বাধ্য হইয়া গৃহকর্ত্তার জন্য যে আত্মত্যাগ স্বীকার করে গৃহকর্ত্তা তাহাতে অনুমোদন করেন। কোন কাজকে কর্ত্তব্য বলিয়া এইরূপ ভুল করিলে অবশ্য মার্জ্জনা করা যাইতে পারে—(এইরূপ আচরণ খুবই সীমাবদ্ধ); এইরূপ ভ্রান্ত আচরণ রমণীর পক্ষে প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু এই আচরণে পতি কিংবা পিতার যে অংশ আছে তাহা না ঘৃণা করিয়া থাকা যায় না। তাহারা হাড়পাকা বহুবিবাহ-ভক্ত, সুতরাং এ বিষয়টা তাহাদের চক্ষে আদৌ গুরুতর বলিয়াই ঠেকে না।" (৩)

এই চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদনার্থ, শ্রীযুক্ত মালাবারি, একজন হিন্দু কার্য্যাধক্ষের মুখে কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন:—একজন আদর্শ-ভৃত্য—তাহার প্রভু আমীর-ওমরাও দিগের এত ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল যে দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি তাহার নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রভু দুইজন:—এক যুবক "মীর," আর এক রূপলাবণ্যবতী বুদ্ধিমতী রমণী। পিতার সহিত মনান্তর হওয়ায়, মীর সর্ব্বদাই পিতার মৃত্যুর কামনা করিতে লাগিল। মনে করিল, উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার ধন-সম্পত্তি পাইলে, মীর স্বকীয় ঋণ পরিশোধ করিবে; কিন্তু পিতার মৃত্যু হইল না, সে মুস্কিলে পড়িল। কষ্টের সীমা চূড়ান্ত মাত্রায় উঠিল, উত্তরাধিকারী পুত্র নিজেই পীড়িত হইয়া পড়িল। মুসলমান হাকিম তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া দিবা চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল এবং মোল্লাও অষ্টপ্রহর তাহার আরোগ্যের জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার বাপ-মা ব্যতিব্যস্ত সংশয়াকুল চিত্তে তাহার চারিপার্শ্বে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। মাতা তাহার শেষ-অঙ্গুরীয়ক —তাঁহার স্বামীর বিবাহ-যৌতুকের অঙ্গুরীয়

(৩) Gujarat and Gujratis: Mahomedans.

পর্য্যন্ত আমাকে বিক্রয়ার্থ দিলেন। কিন্তু কোন পার্থিব শক্তিই পুত্রটিকে রক্ষা করিতে পারিল না—পুত্রের মৃত্যু হইল।

এই নিদারুণ সময়ে, গৃহিণী কামরা হইতে বাহির হইয়া দরজার কাছে আসিলেন (আমরা যত কর্ম্মচারী দরজার বাহিরে জড়ো হইয়াছিলাম)।

তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে আমি দেখিলাম। তিনি তখন নিদ্রার পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন; তাঁহার রূপলাবণ্য বাস্তবিকই দেখিবার। এবং সম্প্রতি তিনি যে কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন সেই-সব কষ্ট-যন্ত্রণা তাঁহার স্ত্রী-সৌন্দর্য্যকে এমন এক প্রকার পবিত্র গাম্ভীর্য্যের দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিল যে অতি-বড় উদ্ধত লোকও তাঁহার সম্মুখে মাথা হেঁট না করিয়া থাকিতে পারে না। আমি অবনত মস্তকে তাঁহাকে সেলাম করিলাম। নানাপ্রকার ভাবনা-চিন্তায় আকুলচিত্ত হইয়া আমি তখন কাঁপিতে ছিলাম। তিনি গর্ব্বভরে আমার পানে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাকে কিছু দিতে পারি কি না। আমি আমার সামর্থ্য নিবেদন করিলাম, কিন্তু চেষ্টা করিব বলিয়াও অঙ্গীকার করিলাম। তখন তিনি আমাকে মৃদুস্বরে বলিলেন;—"দেখ, খানচাঁদ, তোমাকে তোমার মনিবের মান বাঁচাতে হবে, তাই বলচি তুমি ওর বাপের বাড়ী যেও না। তুমি ভদ্র-রকমে আমার ছেলের গোর দিবার ব্যবস্থা কর, এমন কোন জিনিষ কি অবশিষ্ট নেই যা তুমি বিক্রী করতে পার? কিছুই কি নেই? কিছুই কি নেই?" আমার নিকট হইতে উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই তিনি দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি টাকা আনিবার জন্য বাহির হইলাম। আমার হাতে টাকা ছিল না, টাকা ধারও পাইলাম না। এক যদি মীরের নিকট হইতে পাওয়া যায়, সেই একমাত্র সম্ভাবনা। আমি মীরের নিকট গেলাম, তাঁহাকে পৌত্রের মৃত্যুসংবাদ দিলাম। তিনি তখন নিজেই রোগশয্যায় মুমূর্ষু। কিন্তু তিনি আমাকে কোন প্রশ্ন না করিয়াই একশো টাকা আমাকে দিবার জন্য ভৃত্যবর্গকে হুকুম করিলেন।"...তাহার পর, উত্তরাধিকার-সূত্রে বৃদ্ধদিগের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবার জন্য তাঁহার উপর কিরূপ ভার দেওয়া হইয়াছিল, সেই কথা ঐ হিন্দু কার্য্যাধ্যক্ষ আবার বলিতে লাগিলেন:—সেই ভৃত্যের এমনি সততা যে, প্রভূত ধনসম্পত্তির মধ্যে তাহার মনিবেরা ৪০০০৲ টাকা মাত্র পাইয়াছিল। এখন তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যৎসামান্য পেনসান্ পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আর ঐ ভৃত্য এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত; এখন সে ধনশালী, মান্যগণ্য ব্যক্তি; এখন পাছে মান খোয়াইতে হয় এই ভয়ে মনিবদিগকে সে একটা সেলামও করে না। শ্রীযুক্ত মালাবারি আরও এই কথা বলেন:—

"সাধারণ মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বাক্যব্যয় না করাই ভাল। উহারা বৃথা গর্ব্বে পূর্ণ, উহাদের জাঁক-জমক ও জারীজুরীর অন্ত নাই। সত্য কথা উহাদের গলায় যেন আটকাইয়া যায়। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের

TRACING LAMINATED.

ন্যায় উহারাও কাজ-করাটা হেয় বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহাদের বিপরীতে, সাধারণ মুসলমানেরা ভিক্ষা করে, টাকা ধার করে, চুরী করে—এমন-কি আনন্দের সহিত এই সব কাজ করিয়া থাকে। উহাদের জীবনের একমাত্র কাজ :—মদিরা ও প্রমদা। অনেকেই দিনে নিদ্রা যায় ও রাত্রে সুরাপানে প্রমত্ত হয়। এই সকল দুর্ব্যসন সত্তেও, অনেক মুসলমানের কতকগুলি সদ্‌গুণও আছে। এমন বন্ধু, এমন ভৃত্য আর কোথাও মেলে না। যদি উহাদের সহিত তুমি সদয় ব্যবহার কর,—তোমার জন্য উহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিবে।" (৪)

* * *

অতএব দেখা যায়, একদিকে যেমন হিন্দুসমাজ বহুশতাব্দীকালসহকারে আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে, তেমনি সভ্যতা-সোপানের এক ধাপ উচ্চে অধিষ্ঠিত হইলেও মুসলমান-সমাজ শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু কোন সমাজের উন্নতির গতিরোধ হইলেই তাহার অবনতি আরম্ভ হয়। মুসলমান-সমাজের উচ্ছেদেই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রসারে সুবিধা হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রূপসী

পাত্র ও পাত্রী

নিরঞ্জন	...	মান্দার-দুর্গাধিপতি
আর্য্যধন	...	নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা
রূপসী	...	নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী
বরাট	...	মোগল-সেনাপতি
মহম্মদ	...	বাদশাহ-পুত্র
ভানু	...	বরাটের বিশ্বস্ত অনুচর

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মান্দার দুর্গের উপরিতলস্থ চত্বর; নিম্নে মান্দারের মুক্ত প্রান্তর। ক্ষুধার্ত্ত নর-নারীর আর্ত্ত কোলাহল শুনা যাইতেছে।

নিরঞ্জন ও আর্য্যধন

নিরঞ্জন

মান্দারের মাঠ-পথ পঙ্গপালের মত মানুষে ছেয়ে গেছে।

আর্য্যধন

ক্ষুধার জ্বালায় সব মাটী আঁকড়ে প্রাণ দিচ্ছে। মা কোল থেকে ছেলে ছুঁড়ে ফেলছে, স্বামী স্ত্রীর টুঁটি টিপে ধরছে অসহ্য দৃশ্য!

নিরঞ্জন

তুচ্ছ প্রাণের জন্য মায়া-মমতা, স্নেহ-দয়া অকাতরে সব বিসর্জ্জন দিচ্ছে! একবার ভাবছে না—

(৪) Gujrat and Gujratis : Mahomedans.

আর্য্যধন

ভাববার অবসর নেই, পুত্র। মৃত্যুর বাঁশী বেজে উঠেছে—সে বাঁশীর সুরে মানুষ পাগল হয়ে যায়, তার কোন জ্ঞান থাকে না!

নিরঞ্জন

এই উন্মাদ প্রাণীর দলকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত, দেখচি—

আর্য্যধন

ঐ যে একদল লোক দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

নিরঞ্জন

চালাও তোপ! দেবল—

আর্য্যধন

স্থির হও, পুত্র। তুমিও উন্মাদ হয়ো না। কি বলে, শোনো।

নিরঞ্জন

বাতুলের প্রলাপ শুনতে হবে?

আর্য্যধন

ঐ শোনো অভাগাদের আর্ত্তনাদ।

[একদল লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—এক টুকরো রুটি দাও—" "চাই না দেশ—" ভাঙ্গো কেল্লা", "প্রাণ গেল—", "খাবার দাও , খাবার", "বাঁচাও মা"]

নিরঞ্জন

এদের স্পর্দ্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্চি! হয়ে এরা যে এই দুর্গের দিকে ছুটে ছে, এ স্পর্দ্ধা এদের প্রাণে আপনিই য়েছেন, পিতা! এর জন্য ক্ষমা করা—

আর্য্যধন

ক্ষমা করো না, পুত্র! আমায় বন্দী র, হত্যা কর! তুমি যদি আজ আমি তে পুত্র!··· পুত্রের হাতে-গড়া এই সোনার দেশ, পুত্রের প্রাণ-দিয়ে-জাগিয়ে-তোলা এই অসংখ্য নর-নারী—নিরঞ্জন, গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠছে!

[নিম্নে চীৎকার—"মার কাছে আমরা দরবার করতে এসেছি। তুমিই শুধু আমাদের বাঁচাতে পারো, মা—জননী গো, বাঁচাও, অন্ন দিয়ে বাঁচাও, আমাদের।"]

শুনছ? এক উপায়, শুধু এক উপায় আছে, পুত্র!

নিরঞ্জন

কাপুরুষ, বৃদ্ধ, তুমি আমার পিতা! শাস্ত্র বলে, পিতাকে ভক্তি কর, ভালবাস! সে এই পিতা! পুত্রের জীবনের সমস্ত আলো বিদ্রূপের ফুৎকারে যে নিবিয়ে দিতে চায়, পুত্রের পুণ্যময় শুভ্র জীবনে কলঙ্কের কালি যে লেপে দিতে চায়, সেই পিতা! ওঃ, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস! এর চেয়ে রাক্ষসকে শ্রদ্ধা করা সহজ, নির্ম্মম ঘাতককেও বোধ হয় ভালবাসতে পারি!... আশ্চর্য্য! এই পিতাকে দেবতার মত এতদিন ভক্তি করে এসেছি, এঁরই আদর্শে নিজেকে গড়বার চেষ্টা করেছি!

আর্য্যধন

ভুল করেছ, পুত্র। কিন্তু শোনো, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। মায়া, মমতা, ভালবাসা, সুখ, দুঃখ, তোমার চোখে যে মূর্ত্তিতে ধরা দিচ্ছে, আমার বহুকালের জীর্ণ ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমি আজ তাদের অন্য মূর্ত্তি দেখছি। আমার মনের মধ্যে এখন কি স্রোত যে বয়ে চলেছে—কত মিথ্যা সংস্কার, মায়ার জঞ্জাল, সে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আর তার জায়গায় কি আলো, কি সত্য জীবন্ত হয়ে জেগে উঠছে, তা যদি তুমি দেখতে, পুত্র—

TRACING LAMINATED.

নিরঞ্জন

চুপ!—রূপসী এদিকে আসছে!

আর্য্যধন

আমার মা। এসো মা—

(রূপসীর প্রবেশ)

রূপসী

পিতা, এ আর্ত্ত চীৎকার আর আমার সহ্য হয় না। আমি যাব। যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছি আমি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—বৃদ্ধ দধীচি নিজের অস্থি দান করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন, আমি সামান্য নারী,—আমার কোন শক্তি নেই—বড় দুর্ব্বল আমি—

আর্য্যধন

তুমি শক্তিময়ী সতী, অন্নপূর্ণা, এই ক্ষুধার্ত্তদের মুখে অন্ন তুলে দাও। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, মা, কীর্ত্তিমান স্বামীর কীর্ত্তি তুমি উজ্জ্বল কর! আমারও জীবন সার্থক হোক্!

নিরঞ্জন

রূপসী, এ কি বলছ তুমি? কোথায় যাবে?—কিসের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছ তুমি?...আমি তোমার চোখের পানে চেয়ে আছি—কি দেখছি, জানো? ঐ চোখে তোমার কি নির্ম্মল সরল দৃষ্টি—শান্ত, উজ্জ্বল বিভা!... নির্ব্বোধ মূঢ়ের দল—মাটীর কীট এরা, মাটীতে মিশিয়ে দেওয়াই এদের যোগ্য শাস্তি। মিথ্যা মোহে ভুলে এই মাটীর কীটগুলোকে আমি মানুষ করব ভেবেছিলুম! আমার এই তরুণ জীবনের জলন্ত উৎসাহ দিয়ে আমি আকাশে প্রাসাদ গড়তে উদ্যত হয়েছিলুম! স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্নে ভেসে বেড়িয়েছি...আর না, এবার জেগেছি—আর মিথ্যা নয়, মোহ নয়, এবার কঠিন সত্যকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরেছি! এই সব অকৃতজ্ঞ পশু...এদের সুখের জন্য নিজের আরাম বিলাস, সব ত্যাগ করেছিলুম! অন্যায় করেছিলুম! সেই অন্যায়ের আজ প্রায়শ্চিত্ত করব—এই সব অধম পশুগুলোকে পৃথিবীতে ছেড়ে রাখলে মনুষ্যত্ব এখানে লোপ পাবে—পশুত্বই প্রবল হয়ে উঠবে! তার অবসর দেওয়া হবে না! তোপের মুখে আজই এদের উড়িয়ে দেব। একটি তোপ—রূপসী, একটি তোপের ওয়াস্তা!

রূপসী

এ কি বলছ তুমি? মাটী চষে বেড়ায় এরা—মনুষ্যত্ব, বীর্য্য, মহত্ত্ব, কিছুই জানত না; আজ এদের প্রাণে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে—এই মরু-প্রান্তরে এমন সোনার দেশের প্রতিষ্ঠা করে, আজ—

নিরঞ্জন

একটি ফুৎকারেই উড়িয়ে দেব! তুল ভুল করেছিলুম! আর নয়, নীচতাকে বাড়তে দিতে পারি না!

আর্য্যধন

মা, তোমার অন্ধ স্বামীকে দৃষ্টি দা কর—আশীর্ব্বাদ করি, তার দেশের উজ্জ্বল কর!

(প্রস্থা

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

কি বলছিলে, রূপসী? এখন বল, এ-য শুনছিলুম এতক্ষণ, এই অস্পষ্ট আভাষ—এ

সত্য নয়—স্বপ্ন,—শুধু একটা দুঃস্বপ্ন এ? বল—

রূপসী

অনুমতি দাও, নাথ।

নিরঞ্জন

অনুমতি! কিসের অনুমতি চাচ্ছ, রূপসী?...তুমি বুঝতে পেরেছ? বল, স্পষ্ট করে বল, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না—আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে, যেন কিসের একটা ঝড় বয়ে চলেছে, উদ্দাম ঝড়।

রূপসী

আজ রাত্রে আমি বরাটের শিবিরে যাব।

নিরঞ্জন।

তুমি তাকে হত্যা করতে চাও? তাই ত, এ কথা আমার মনে হয় নি—রূপসী! কিন্তু...তখনি যে ভয়ঙ্কর গোল হবে!... তুমি কি করে ফিরে আসবে? ক্ষিপ্ত পশুর দল—মান্দারের সে শক্তি কৈ? সে পশুর গ্রাস থেকে তোমায় উদ্ধার করবে, তেমন নাক-বল মান্দারের দেখচি না ত! তবে—? বিষ? হাঁ, কিন্তু তেমন বিষ—পেয়েছ কি? তীব্র জ্বালাময় বিষ—নীরবে যা—

রূপসী

কিন্তু এ হত্যায় তোমার মান্দার ত রক্ষা ব না, নাথ! মান্দার অন্ন চায়, তাকে যোগাতে হবে।

নিরঞ্জন

পাপিষ্ঠা, সত্যই তবে তুমি অভিসারে যেতে চাও?

রূপসী

তিরস্কার করছ! কর,—কিন্তু অনুমতি দাও—

নিরঞ্জন

রূপসী—

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

তুমি বরাটকে ভালবাস?

রূপসী

আমি তাকে চোখেও দেখিনি কখনো—

নিরঞ্জন

তার শৌর্য্যের কাহিনী শুনে তবে মুগ্ধ হয়েছ?

রূপসী

বিশ্বাস কর, নাথ, রূপসী চিরদিন তোমারই শৌর্য্য-কাহিনী শুনে এসেছে।

নিরঞ্জন

তবে শোন, বরাট তরুণ যুবা—সুপুরুষ! শৌর্য্যও তার অসীম—বিধর্ম্মী হয়েও সে মোগলের ডান হাত!

রূপসী

ও-সব শোনবার প্রয়োজন দেখি না, নাথ—

নিরঞ্জন

রূপসী,—না, ও-সব বাতুলের মন্ত্র ভুলে যাও, তুমি। এস, আমরা পালিয়ে যাই দুজনে! যেখানে হোক, লোকালয় ছেড়ে সুদূর বনে চলে যাই, চল। মানুষ বড় নীচ, বড় হিংস্র, বড় পাষাণ—পরের সুখ সে সহ্য করতে পারে না—তার ঈর্ষ্যা হয়! কাজ নেই আমাদের এমন

TRACING LAMINATED.

লোকালয়ে থেকে। চল, গাছের ছায়ায়-ঘেরা শ্যামল কুঞ্জে বসে দুজনে প্রেমালাপ করব, দুজনে দুজনের কাণে প্রাণের গান অজস্র শুনিয়ে যাব!···এতদিন তোমার পানে ফিরে চাইনি,—রণোন্মাদনায় তোমার এই নব-বিকশিত যৌবনকে উপেক্ষা করে এসেছি। তার জন্য অভিমান করো না, প্রিয়ে। এখনও সময় আছে; বেশী বিলম্ব হয় নি! যৌবন এখনো পালিয়ে যায়নি—চল, সে সমস্ত অবহেলা-ত্রুটি প্রাণ দিয়ে শোধ করব। এখানে বাহিরের তুচ্ছ কোলাহল অনেক শুনেছি, মানুষ অনেক দেখেছি। আর নয়—বড় শ্রান্ত হয়েছি, রূপসী—চল! এখানে কি সুখ? সুখ পাইনি! সুখ নেই! শুধু নেশায় মেতেছিলুম! এখানে নিত্য দ্বন্দ্ব—নিত্য হিংসার গর্জ্জন—নিত্যই অহঙ্কারের আস্ফালন!···চলে এসো, অভিমান করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

রূপসী

অভিমান! কিসের অভিমান নাথ? কোনদিনই ত অভিমান করিনি, আমি! তুমি কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছিলে, আমি গৃহের কোণে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখ-ছিলুম! গর্ব্বে আমার ছোট্ট মনটুকু ভরে উঠছিল। তাই ত আমি আজ এমন করে বেরিয়ে আসতে পেরেছি! মনে আমার আজ কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচ নেই! তোমার সাধের মান্দার—সেই মান্দারের কোন কাজ যদি করতে পারি—

নিরঞ্জন

না, রূপসী, কিছু করতে হবে না। আর কাজ নেই কিছু করে! এস আমার সঙ্গে, চল, দুজনে চলে যাই!

রূপসী

কিন্তু এখন যে যাবার উপায় নেই—কর্ত্তব্যকে এমনভাবে তুমি বলি দেবে?

নিরঞ্জন

কর্ত্তব্য! কিসের কর্ত্তব্য, কার উপর কর্ত্তব্য, রূপসী?

রূপসী

তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না নাথ। সময় যায়। ঐ দেখ, সন্ধ্যা হয়ে আসছে —এতগুলো নর-নারীর প্রাণ তোমার একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রয়েছে, শুধু তাদের রক্ষা কর!

নিরঞ্জন

রূপসী, তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার! এ-সব কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না—?

রূপসী

বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, নাথ! আমি বড় দুর্ব্বল, তুমি আমায় শক্তি দাও। এ বড় কঠিন কাজ নাথ, জানি, কিন্তু তবু এ যে করতেই হবে। দাও, অনুমতি দাও—

নিরঞ্জন

অনুমতি! অনুমতি দেওয়া এতই সহজ ভাবো, নারী? তুমি বুঝছ না? এত আমার বুকের মধ্যে থেকে, আমার সকল সকল স্বপ্ন, সকল আশা তন্ন তন্ন করে বুঝেও আমার দিকে চেয়ে অম্লানি তুমি বলছ, অনুমতি দাও!··· আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে—তোমারও যাচ্ছে, বলছ যদি সত্য হয়, তবে কেন আর এ নি আঘাত করছ, রূপসী?

[নিম্নে কোলাহল—"মাগো, বাঁচাও—র কর মা—"]

রূপসী

ঐ, ঐ শোনো অভাগাদের করুণ কাতর আর্ত্তনাদ! না, আমার সহ্য হচ্ছে না। দাও, অনুমতি দাও, এ-ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই!

নিরঞ্জন

কোন উপায় নেই—তাই এই বর্ব্বর কুৎসিত প্রস্তাবকে মাথায় তুলে নিতে হবে? এত বড় অধর্ম্মকে আশ্রয় করে নীচ কতক-গুলো পশুর প্রাণ বাঁচাতে হবে? ওঃ, ভগবান—না, ভগবান নেই, না হলে এ কুৎসিত কথা সে দুর্বৃত্তের মুখ থেকে বেরুবার আগে তার মাথায় বাজ পড়েনি? এত বড় অধর্ম্ম বিজয়-গর্ব্বে নিজের কাজ হাসিল করে যাবে?... না, কখনো না। আমি থাকতে কখনো তা হতে দেব না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সব আজ সমূলে ধ্বংস করব! এই সব হতভাগা কাপুরুষের দল—পা দিয়ে চেপে এদের মেরে ফেলব। কহুন, বন্ধু, দাগো তোপ—

রূপসী

স্থির হও—(হাত ধরিল)

নিরঞ্জন

(সবলে হাত ছাড়াইয়া) না, ছেড়ে দাও, সী—মিথ্যা এ অভিনয়ের প্রয়োজন ই!···আর এই সব বর্ব্বরের দল—এদের রো কি ঘরে নারী নেই? স্ত্রী নেই, ভগ্নী ই, মা নেই—যে, নারীর নারীত্বের মূল্যে সব বন কিনতে অনায়াসে উদ্যত হয়েছে? এদের মি বাঁচাতে বল, রূপসী—? এদের নিশ্বাসে বাতাস কলুষিত হয়, মনুষ্যত্ব পুড়ে ছাই হয়ে যায়—···ঐ দেখ, তোমার নিজের পানে একবার চেয়ে দেখ, এদের নিশ্বাসে তুমি পাষাণ হয়ে গেছ! তোমার দৃষ্টি অকম্পিত, চোখে এক ফোঁটা জল নেই!··· উঃ, এই কি পৃথিবী? আমার চারিধারে শুধু ভীষণ মরু ধূ-ধূ করছে—মায়া নেই, মমতা নেই, কিছুই নেই, শুধু হিংসার জলন্ত ক্ষুধা—প্রচণ্ড বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধা... (সহসা দুইহাতে রূপসীর হাত চাপিয়া ধরিয়া) রূপসী, একদিন ত তুমি আমায় স্বর্গ-সুখ দিয়েছিলে—তবে, আজ—

রূপসী

নাথ (হাত ধরিল)

নিরঞ্জন

(হাত ছাড়াইয়া) না, আর নয়, ঐ কোমল হাতের স্পর্শে আর আমি ভুলছি না। পিতার কথাই ঠিক। তিনিই তোমায় ঠিক চিনেছিলেন! পাষাণী তুমি! আমি যৌবন-মদের নেশায় বিহ্বল হয়ে ছিলুম—তোমায় চিনিনি, জানিনি!... থাক্, আর কেন? তুমি যেতে পারো—তোমায়-আমায় কোন সম্পর্ক নেই। মিথ্যা আর অনুমতির দোহাই দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা কেন করছ? তুমি যাও—

রূপসী

না, মুখ ফিরিয়ো না। চেয়ে দেখ নাথ, আমার মনের মধ্যে একবার চেয়ে দেখ! ভুল বুঝো না—তোমার মান্দার—প্রাণের মান্দার—আমার সে যে কি—কতখানি সে আমার বুকে—(অশ্রু-মার্জ্জনা করিল)

নিরঞ্জন

আর মায়া নয়, রূপসী। আমি দুর্ব্বল নই, উন্মাদ হইনি—বেশ স্থির হয়ে আছি! চোখের জলে এখন আর গলব না—

TRACING LAMINATED.

তোমার কোন ভয় নেই, তুমি যাও। ভেবো না, নারী, নির্ব্বোধের মত নিজেকে আমি হত্যা করব! তেমন মতিভ্রম হয়নি আমার। কেন? একটা নারী—তার লাবণ্য-ভরা প্রলোভন-ঘেরা দেহের জন্য? হাঁ, দেহ শুধু! মন—? কোথায় মন—নারীর আবার মন? কবির কল্পনা সে!···শুধু নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে—এতদিন এই তুচ্ছ খেলনা নিয়ে খেলা করেছি। যাও, যাও রূপসী—অভিসারিকা নারী, অভিসারে যাও—

রূপসী

নাথ—

নিরঞ্জন

বৃথা চেষ্টা, রূপসী। নদীর যে স্রোত চলে যায়, তাকে আর ফেরানো যায় না। যা গেল, তা আর ফিরবে না! ভ্রূ-বিলাসে নিরঞ্জন আর ভুলচে না—

রূপসী

বড় ভুল বুঝছ তুমি! কি করব? আমায় যেতেই হবে। ফিরে এসে তোমায় বোঝাব, নাথ—[স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল]

নিরঞ্জন

ফিরে এসে!... ঐ মুখ নিয়ে আবার তুমি ফিরবে? সে সাধ আছে? বেশ, ফিরো... সে এক চমৎকার দৃশ্য হবে। আমিও যোগ্য বেশে সজ্জিত থাকব,—তখন আর এক নূতন অঙ্কের অভিনয় সুরু হবে—দেখবার কৌতূহল হয় বটে!

রূপসী

আসি নাথ। আশীর্ব্বাদ কর—না, কোন প্রার্থনা নিয়ে যাব না, শুধু ঐ পায়ের ধূলো!

(নিরঞ্জনের পদধূলি লইতে গেল; নিরঞ্জন পা সরাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল)

বড় ভুল বুঝলে নাথ! যদি আমার মনের মধ্যে একবার চেয়ে দেখতে!

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মোগল-শিবিরের সম্মুখস্থ প্রান্তর।

বরাট ও ভানু।

ভানু

দিল্লী থেকে এই পত্র এসেছে। বাদশাজাদাও এসেছেন; আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

বরাট

(পত্র-গ্রহণান্তে) বড় জরুরি খবর আছে, বল।

ভানু

বাদশাজাদা শিবিরে অপেক্ষা করছেন।

বরাট

অপেক্ষা করছেন! এ যে খোদ বাদশার পাঞ্জার ছাপ দেখচি। হাতের লেখা—বাদশাজাদা নিজের হাতে লিখেছে। মহম্মদেরই কাজ সব। (পত্র-পাঠান্তে) ওঃ বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। মোগল মুলুক মান্দার দখল করতে চেয়েছিল, হিন্দু তাকে বাধা দিছি; পরিশ্রান্ত বল-সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ দিয়ে হয়ে বসে আছি; তাই আদেশ ফৌজের ভার বাদশাজাদার হাতে দি আমায় দিল্লী ফিরে গিয়ে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।...এ গভীর ষড়

ভানু, অতি নীচ চক্রান্ত!... ভেবেছে, ভয়ে কম্পিত হয়ে নতশিরে গিয়ে আমি সেখানে দাঁড়াব,—একটা হীন অপরাধীর মত!··· ভুল বুঝেছে! এতদিনেও মোগল আমায় চেনেনি, দেখচি।

ভানু

বাদশাজাদা দেখা করতে চান—

বরাট

কি! মহম্মদ নিজে এসেছে! আর কারো হাতে চিঠি পাঠাতে ভরসা পায়নি! ভেবেছে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমায় চমকে দেবে! গর্দ্দভ! তা বেশ! এই মুখোমুখি দেখায় অনেক জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে, মোগল আমার সঠিক পরিচয় পাবে! এই কাপুরুষ মহম্মদ—

ভানু

ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—

বরাট

তাইত! আর্য্যধন এখনো ফেরেনি—না? তাহলে আমার প্রস্তাবে ওরা সম্মত! নাহলে বৃদ্ধ ফিরে আসত।··· সীমানায় আমাদের বিশ্বস্ত প্রহরী খাড়া আছে ত? তাকে বলে রেখেছ, এক নারী আমার শিবিরে আসতে চলে, কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়, সম্মানে যেন এখানে নিয়ে আসে?

ভানু

লালসিং আর গুজারি সীমানার প্রান্তে পাহারা দিচ্ছে। আপনার আদেশ তাদের জানিয়েছি।

বরাট

লালসিং আর গুজারি! তারা আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, জানি, তবু তুমিও যাও ভানু, অলক্ষ্যে থেকে এই নারীকে সঙ্গে নিয়ে এসো। আর রসদের গাড়ী তৈরী আছে—যা-যা বলেছি? সে নারী শিবিরে পা দেবামাত্র যেন ঐ সব গাড়ী মান্দারে যায়—খুব হুঁসিয়ার প্রহরী সঙ্গে দিয়ো। তারা যেন কোন রকম অভদ্রতা সেখানে না করে। অত্যাচার হলেও নীরবে সব সহ্য করবে, এমন লোক সঙ্গে দিয়ো।... ঐ যে দূরে মান্দার দুর্গের উপর নক্ষত্রের মত একটা আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে, না? সন্ধ্যার অন্ধকারে তারার মতই ঐ জ্বল্ জ্বল্ করছে? হাঁ, ঠিক। সম্মতির সঙ্কেত!... এই ক্ষণটুকুর জন্য কত দিন থেকে যে প্রতীক্ষা করে আছি! আমার কৈশোরের স্বপ্ন সফল হবে,—এ কি সম্ভব! উচ্ছৃঙ্খল জীব তার অবলম্বন পাবে?··· ভানু, তুমি যাও, মহম্মদকে আমার সেলাম দাও গে—আর বলবীরকে আমার শিবিরের বাহিরেই সতর্ক থাকতে বলে দিয়ো—

(ভানুর প্রস্থান)

মোগল ভেবেছে, চোখ রাঙিয়ে বরাটের সব সঙ্কল্প ভেস্তে দেবে! বড় বুদ্ধিমান মোগল, আর বরাটকে সে ভেবেছে, একটা নির্ব্বোধ বালক!

(মহম্মদের প্রবেশ)

আসুন শাহজাদা, সেলাম!

মহম্মদ

সেলাম!

বরাট

আসতে আপনার কোন কষ্ট হয়-নি, শাহজাদা?

TRACING LAMINATED.

মহম্মদ

না। সেনাপতি, ঐ দূরে মান্দার দুর্গের উপর একটা আলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের ফৌজ ও আলো দেখে চঞ্চল হয়েছে। আপনি জানেন, হঠাৎ ও আলো কেন দেখা যাচ্ছে?

বরাট

আপনার কি মনে হয়, ও কোন সঙ্কেত?

মহম্মদ

নিশ্চয়! আরও বিশ্বাস হচ্ছে, ও আলোর সঙ্গে মোগল সেনাপতিরও কোন সম্পর্ক আছে! সেই কথাই আমি বলতে এসেছি।

বরাট

বলুন, আমিও শোনবার জন্য প্রস্তুত।

মহম্মদ

বরাট—

বরাট

'সেনাপতি' বলবেন, শাহজাদা। এ রণ-ক্ষেত্র, শাহজাদার মজলিস নয়। এ সব আদব-কায়দা মেনে চলবেন, শাহজাদা।

মহম্মদ

সেনাপতি বরাট, আপনি বাদশার পত্র পড়েছেন? তাঁর আদেশ জানেন?

বরাট

হঠাৎ আমায় এতটা নির্ব্বোধ ঠাওরাচ্ছেন কেন, শাহজাদা! আমি লেখা-পড়া জানি এবং আমার নামের পত্র আমি নিজেই পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারি। এ পত্র আমি পড়েছি, এবং পড়ে বুঝেছি, এ একটা অত্যন্ত ঘৃণ্য চক্রান্ত চলেছে আমার বিরুদ্ধে। আরও বুঝেছি, সে চক্রান্তের মূলে আছেন, আপনি।

মহম্মদ

আমি?

বরাট

হাঁ, আপনি।

মহম্মদ

কিন্তু মুলতব খাঁ গিয়ে বাদশার দরবারে গুরুতর অভিযোগ জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, ক্ষুদ্র মান্দার যখন যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তার গোলা-বারুদ সব ফুরিয়ে গেছে, খাদ্যের অভাবে মান্দার একেবারে নির্জ্জীব, তখনই ত মান্দার-অধিকারের সুন্দর সুযোগ—আপনি সে সুযোগ উপেক্ষা করে দিব্য অলস হয়ে বসে আছেন! এই কি মোগল-সেনাপতির যোগ্য কাজ? নিমকের—

বরাট

সাবধান হয়ে কথা বলবেন, শাহজাদা। বালকের চাপল্যেরও একটা সীমা আছে! এ যুদ্ধে সেনাপতি আমি, মুলতব নয়, আপনিও নন। আর আমার উপর সে বিশ্বাস না থাকলে এত বড় মোগল-বাহিনীর ভার বাদশা আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন না! আমার জায়গায় মুলতবকেই তিনি সেনাপতি করে পাঠাতেন।

মহম্মদ

বাদশা ভুল করেছিলেন, তখন আপনাকে চিনতে পারেন নি—এখন চিনেছেন। আর যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক—

বরাট

বাসনা সংযত করো, বালক। আমার রক্ত-মাংসের শরীর। আমি বৃদ্ধ নহি, আমার সহজেই গরম হয়ে ওঠে—

মহম্মদ

চোখ-রাঙানিতে ভয় করি না, সেনাপতি মনে রাখবেন, আমি ভাবী মোগল-সম্রাট।

বরাট

আর আপনিও মনে রাখবেন যে মোগল সাম্রাজ্য আমার একটা ক্রুদ্ধ নিশ্বাসেই আমি উড়িয়ে দিতে পারি!

মহম্মদ

এ উত্তম, সেনাপতি—

বরাট

বালক, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমার লজ্জা হচ্ছে! কিন্তু শোন, তুমি অতি নির্ব্বোধ, তাই মুলতবের কথায় এতখানি নৃত্য করে উঠেছ! মুলতবের সঙ্গে তোমার যে চিঠি-পত্র চলেছে, জেনো, সে সব আমার হাতে পড়েছে। মোগল আমায় ঈর্ষ্যা করে আমার সাহস, আমার বীরত্বে সে ভয় পায়, তাই সে আমায় বাধা দিতে চায়! মোগলের ভয় হয়, কি জানি, আমার এ সাহস পাছে কোনদিন দিল্লীর বাদশাহী-তখ্‌তের দিকে আমায় চালিত করে! ... চমকে উঠবেন না, শাহজাদা—আমি মোগলকে চিনি। সে একজন বিধর্ম্মীকে বড় হতে দিতে চায় না,—এ আমি জানি! কিন্তু মনে রাখবেন, শাহজাদা, মোগল বরাটকে বড় করেনি, বরাটই মোগলকে প্রকাণ্ড বিস্তৃত করে দিয়েছে। তার তখ্‌তের দিকে কোনদিন যদি বরাটের লক্ষ্য থাকত, তাহলে বালক মহম্মদ আজ আমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পেত না, জানবেন, সে আমার পাদুকা সাফ করতে পেলেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করত!

মহম্মদ

এত স্পর্দ্ধা! (সহসা তরবারি টানিয়া বরাটকে আঘাত করিল; বরাট চকিতে সে আক্রমণ হঠাইতে গেলে তাহার চোখের নীচে একটা চোট লাগিল ও রক্ত-ধারা বহিল)

বরাট

(সবলে মহম্মদের তরবারি কাড়িয়া লইয়া) এ আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না, আমি। বীর মোগল—(মহম্মদকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া, তরবারি উঠাইল) এখন—?

মহম্মদ

আমায় মেরে ফেল বরাট, আমি এ ঘৃণ্য জীবন নিয়ে আর একদণ্ড বাঁচতে চাই না।

বরাট

বরাট বীর—কাপুরুষ নয়। সে হিন্দু, মোগল নয়। করতল-গত শত্রুকে সে হাসি-মুখে মাপ করতে পারে! (মহম্মদকে ছাড়িয়া) উঠে দাঁড়াও, মহম্মদ। যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সাধ থাকে, তাহলে সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করো। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করব। ... কিন্তু শোনো মহম্মদ,—যদি বাদশাহী করবার বাসনা থাকে, তবে মনকে বড় কর—নীচ, হীন, জঘন্য ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ো না; খল, হিংস্র পরিজনের চাটুবাদে আত্ম-বিস্মৃত হয়ো না। বাদশাহী মন নিয়ে বাদশাহীর কামনা করো। ... শোন মহম্মদ, বরাট নিমকের মর্য্যাদা রাখে—সে বিশ্বাস-ঘাতক নয়। আমি যদি আজও অবসর পেয়ে মান্দার অধিকার না করে থাকি ত জেনো, তার মধ্যে আমার গভীর উদ্দেশ্য আছে—জেনে রেখো, বরাট মুখে যে কথা দেয়, কাজেও তা করে! কোন প্রলোভনে কথার খেলাপ করে না সে। সেই সঙ্গে

TRACING LAMINATED.

আরো মনে রেখো, বরাট প্রকাণ্ড দুঃসাহসী যোদ্ধা হলেও সে মানুষ !

মহম্মদ

আবার হেঁয়ালির জাল বুনে চলেছ !

বরাট

সময়ে সব বুঝতে পারবে—একটু ধৈর্য্য রেখো শুধু।

মহম্মদ

তাহলে বাদশার কাছে যে কৈফিয়ৎ তলব হয়েছে—

বরাট

সে কৈফিয়ৎ বরাট দেবে ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—বালক। আর সেই সঙ্গে এই কাটা দাগও অনেক কথা বলবে। (মহম্মদ গমনোদ্যত)... যেয়ো না, দাঁড়াও। তোমার ঔদ্ধত্যের দণ্ড নিতে হবে, শাহজাদা। আপাততঃ যুদ্ধ-শেষ না হওয়া অবধি আপনি আমার বন্দী। কুকব—(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ) তুমি আর জহর শাহজাদার জন্য দায়ী। শাহজাদা আমার বন্দী—আমার আদেশ-ছাড়া তিনি বন্দীশালা ত্যাগ করতে পাবেন না। বুঝলে—? এই আমার আদেশ।

মহম্মদ

এতদূর !

বরাট

এ অতি লঘু দণ্ড, শাহজাদা ! আপনি বালক, তাই আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট হবে, মনে করি।

(মহম্মদ ও কুকবের প্রস্থান)

উদ্ধত বালক ! এই ঔদ্ধত্যই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে ! এই সন্দেহই মোগলকে টিঁকে থাকতে দেবে না, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই নীচতা, এই হীন চক্রান্ত—

(ভানুর প্রবেশ)

ভানু

আপনি শাহজাদাকে বন্দী করেছেন ?

বরাট

হাঁ। বালকের ঔদ্ধত্যকে একটু সিধা করতে চাই।

ভানু

কিন্তু এতে বিপদ ডেকে আনচেন যে—

বরাট

বিপদ !...ভানু, বিপদকে যদি বরাট ভয় করত, তাহলে আজ পৃথিবীতে বরাটের চিহ্নও থাকত না। যাক্—আজ এখন আর অন্য কথা নয়—ওদিককার খপর কি, ভানু ? সে আসছে ? ..সারা জীবন ধরে এই ক্ষণটুকুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি। কখনো ভাবিনি, এ ক্ষণটুকু সত্য হয়ে ফুটবে !...ভানু—(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ) ও কি—বন্দুকের আওয়াজ কেন ? যাও, যাও, কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না ত ?

ভানু

না, ও আমাদের বন্দুক ! এ কি আপনার চোখের নীচে রক্ত যে !

বরাট

মহম্মদ আঘাত করেছে !

ভানু

মহম্মদ ?

বরাট

হাঁ, অতর্কিত আঘাত ! তাকে ক্ষমা করেছি—নাহলে বাদশা এতক্ষণে পুত্রহীন

হতেন।...ঐ যে আলো দেখা যায়—কাছেই। ভানু, সে এসেছে—

ভানু

এক নারীর অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

বরাট

সে এসেছে। ভানু যাও, সসম্মানে তাকে আমার শিবিরে নিয়ে এসো। দেখো, যেন কোন রকম অমর্য্যাদা না হয় !

(ভানুর প্রস্থান ; বরাটের শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ)

ক্রমশ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভাষার কথা

পদ্মায় যখন পুল হয় নাই তখন এ-পারে ছিল চওড়া রেলপথ, ও-পারে ছিল সরু। মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ ছিল বলিয়া রেল-পথের এই দ্বিধা আমাদের সহিয়াছিল। এখন সেই বিচ্ছেদ মিটিয়া গেছে তবু ব্যবস্থার কার্পণ্যে যখন অর্দ্ধেক রাত্রে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ি বদল করিতে হয় তখন রেলের বিধাতাকে দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না।

ও ত গেল মানুষ এবং মাল চলাচলের পথ, কিন্তু ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা। কিছুকাল হইতে বাংলা দেশে এই ভাষায় দুই বহরের পথ চলিত আছে। একটা খুব বুলির পথ, আর একটা পুঁথির বুলির ... দুই-একজন সাহসিক বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, পথ এক-মাপের হইলে দল পক্ষেই সুবিধা। অথচ ইহাতে বিস্তর লোকের অমত। এমন কি তাঁরা এতই বলিত যে, সাধু-ভাষার পক্ষে তাঁহারা যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বাংলা-ভাষায় আর যাই হোক্, সাধুতার চর্চ্চা হইতেছে না।

এ তর্কে যদিও আমি যোগ দিই নাই তবু আমার নাম উঠিয়াছে। এ-সম্বন্ধে আমার যে কি মত তাঁহা আমি ছাড়া আমার দেশের পনেরো আনা লোকেই একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন, এবং যাঁর যা মনে আছে বলিতে কসুর করেন নাই। ভাবিয়া-ছিলাম চারিদিকের তাপটা কমিলে ঠাণ্ডার সময় আমার কথাটা পাড়িয়া দেখিব। কিন্তু বুঝিয়াছি সে আমার জীবিত কালের মধ্যে ঘটিবার আশা নাই। অতএব আর সময় নষ্ট করিব না।

ছোটবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। বোধ করি সেই জন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো মত ছিল না। যে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এ কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই, সাহিত্য-ভাষার পথটা যে এই সরু বহরের পথ, তাহা যে প্রকৃত বাংলা-ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

একবার যেটা অভ্যাস হইয়া যায় সেটাতে

TRACING LAMINATED.

আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কেননা স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশী। অভ্যাসের মেঠো পথ দিয়া গাড়ির গোরু আপনিই চলে, গাড়োয়ান ঘুমাইয়া পড়িলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহার চেয়ে প্রবল কারণ এই যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহঙ্কারের যোগ আছে। যেটা বরাবর করিয়া আসিয়াছি সেটার যে অন্যথা হইতে পারে এমন কথা শুনিলে রাগ হয়। মতের অনৈক্যে রাগারাগি হইবার প্রধান কারণই এই অহঙ্কার। মনে আছে বহুকাল পূর্ব্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালীর শিক্ষা বাংলা-ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালী আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয়, তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা, যাঁরা ইংরাজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তাহার অহঙ্কার।

একদিন নিজের স্বভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে কথাটা এইখানেই কবুল করি। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে-ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইলাম; এ লইয়া এ-পক্ষে বা ও পক্ষে কোনোপ্রকার মত গড়িয়া তুলিবার সময় পাই নাই। কিন্তু সবুজপত্র-সম্পাদকের বুদ্ধি না কি তেমন করিয়া অভ্যাসের পাকে জড়ায় নাই এইজন্য তিনি ফাঁকায় থাকিয়া অনেক দিন হইতেই বাংলা-সাহিত্যের ভাষাসম্বন্ধে একটা মত খাড়া করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে তাঁর এই মত যখন আমার কানে উঠিয়াছিল আমার একটুও ভালো লাগে নাই। এমন কি, রাগ করিয়াছিলাম। নূতন মতকে পুরাতন সংস্কার অহঙ্কার বলিয়া তাড়া করিয়া আসে, কিন্তু অহঙ্কারটা যে পুরাতন সংস্কারের পক্ষেই প্রবল এ কথা বুঝিতে সময় লাগে। অতএব, প্রাকৃত বাংলাকে পুঁথির পংক্তিতে তুলিয়া লইবার বিরুদ্ধে আজকের দিনে যে সব যুক্তি শোনা যাইতেছে সেগুলো আমিও একদিন আবৃত্তি করিয়াছি।

এক জায়গায় আমার মন অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত। পদ্য-রচনায় আমি প্রচলিত আইন-কানুন কোনোদিন মানি নাই। জানিতাম কবিতায় ভাষা ও ছন্দের একটা বাঁধন আছে বটে, কিন্তু সে-বাঁধন নূপুরের মত, তাহা বেড়ির মত নয়। এইজন্য কবিতার বাহিরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনোদিন ভয় পাই নাই।

"ক্ষণিকা"য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা-ভাষা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ-ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টুঘোড়ার মত কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাষা বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশী।

বলা বাহুল্য "ক্ষণিকা"য় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন,

কোনোটার উপরেই আপন দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। কিন্তু কোন্ দিকে তার অভ্যাসের টান এবং কোন্ দিকে অনুরাগের, সে বিচার পরে হইবে এবং পরে করিবে।

যাই হোক্ এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই:—বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা-ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন-একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে, কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়া যজ্ঞ-কর্ত্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।

যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়া-পেটা ভাষা দিয়া তাহার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে নিয়মে তাহার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত-বাংলা বাড়িয়া উঠিতে-উঠিতে প্রয়োজন-মত সংস্কৃত-ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।

কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে চলিল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত-ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ একরকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।

যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্যই বাংলা গদ্যের ব্যবহার হইত, তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্য্যন্ত ধরা পড়িত না। কিন্তু এই গদ্য যতই বাঙালীর ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। আজ পর্য্যন্ত বাংলা-গদ্য, সংস্কৃত-ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে।

অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনফার সঙ্গে-সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যবসা মূলধন লইয়া সুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার সুরু। সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তাহার চেষ্টা।

আমাদের পুঁথির ভাষার সঙ্গে কথার ভাষার মিলন ঘটিতে এত বাধা কেন, তাহার কারণ আছে। যে-গদ্যে বাঙালী কথাবার্ত্তা কয়, সে-গদ্য বাঙালীর মনোবিকাশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণত বাঙালী যে-বিষয় ও যে-ভাব লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াছে বাংলার চলিত গদ্য সেই মাপেরই। জলের পরিমাণ যতটা, নদীপথের গভীরতা ও বিস্তার সেই অনুসারেই হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগীরথও আগে লম্বা-চওড়া পথ কাটিয়া তাহার পরে গঙ্গাকে নামাইয়া আনেন নাই।

বাঙালী যে ইতিপূর্ব্বে কেবলি চাষবাস এবং ঘরকন্নার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তার চেয়ে বড়-কথা যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যবসা, দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এইজন্য ঠিক বাংলা-ভাষায় মনন করা বা মতপ্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গদ্য উচ্চ-চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত যে-সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলা বাংলা-ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষা ও বাংলা-ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে।

এমন সময় যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল ঘটাইতে বসিলেন বাংলার চলিত গদ্য লইয়া কাজ-চালানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইল। শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সব-চেয়ে বিপদ এই যে, নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত-বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলায় তদ্ধিতপ্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। "প্রার্থনা" সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাংলা-প্রতিশব্দ "চাওয়া"। "প্রার্থিত" ও "প্রার্থনীয়" শব্দের ভাবটা যদি ঐ খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্য্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক "চাহিত" "চাওনীয়" বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্য-পদকে বাংলার ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায় এপর্য্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গেছে, সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার তদ্ধিত-প্রত্যয় পর্য্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে। সুতরাং দুই নৌকায় পা দিবামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সাম্‌লাইতে গেলে সাহিত্য-সাধকের মল্লগিরি করিতে হয়। তার পর এই এ-তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে, নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তুভিটার মাঝখানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটি-গাড়ি আবার অপর-পক্ষের উপর যখন ভার তখন তাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিধি একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেন।

কিন্তু মুস্কিলের বিষয় এই যে, যে-ভাষা মল্লবিদ্যার সাহায্য ছাড়া এক পা চলিবার জো নেই সেখানে সাধারণের পক্ষে পদে পদে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই বেশী। পথটাই যেখানে দুর্গম সেখানে হয় মানুষের চলিবার তাগিদ থাকে না, নয় চলিতে হইলে পথ অপথ দুটোকেই সুবিধা-অনুসারে আশ্রয় করিতে হয়। ঘাটে মাল নামাইতে হইলে যে-দেশে মাশুলের দায়ে দেউলে, হাওয়ার কথা, সে-দেশে আঘাটায় মাল নামানোর অনুকূলে নিশ্চয়ই স্বয়ং বোপদেব চোখ-টিপিয়া ইসারা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়; বোপদেবের চেলারা যেখানে ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের ব্যবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল।

জাপানীদের ঠিক এই বিপদ। চীন ভাষার শাসন জাপানী ভাষার উপর অত্যন্ত প্রবল। তার প্রধান কারণ প্রাকৃত-জাপানী প্রাকৃত বাংলার মত; নূতন প্রয়োজনের ফরমাস জোগাইবার শক্তি তার নাই। সে-শক্তি প্রাচীন চীন ভাষার আছে। এই চীন ভাষাকে কাঁধে লইয়া জাপানী ভাষাকে চলিতে হয়। কাউণ্ট ওকুমা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই বিষম পালোয়ানীর দায়ে জাপানী-সাহিত্যের বড়ই ক্ষতি করিতেছে। আমি এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, যে-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটা একটা কুস্তিগিরি সেখানে ভাবটাকেই খাটো হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে মাটি কড়া, সেখানে ফসলের অযত্ন। যেখানে শক্তির মিতব্যয়িতা অসম্ভব সেখানে সদ্ব্যয়ও সেখানে অসম্ভব। যদি কোনো গুণী-মশায়দের এই রায়ই পাকা হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় না হইলে বাংলা ভাষায় কলম ধরা ধৃষ্টতা, তবে যাদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত-বাংলার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে।

ইহার পূর্ব্বেও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতির মত বই বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইয়াছিল কিন্তু তখন সময় আসে নাই। এখনি যে আসিল এ-কথা বলিবার হেতু কি? হেতু আছে। তাহা বলিবার চেষ্টা করি।

ইংরেজি হইতে আমরা যা লাভ করিয়াছি যখন আমাদের দেশে ইংরেজিতেই তার ব্যবসা চলিতেছিল তখন দেশের ভাষার সঙ্গে দেশের শিক্ষার কোনো সামঞ্জস্য ঘটে নাই। রামমোহন রায় হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আমাদের ভাষার মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এমন করিয়া আমাদের ভাষা চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা ঘরে-ঘরে মুখে-মুখে যে-সব শব্দ নিরাপদে ব্যবহার করি তাহা আর পঁচিশ বছর পূর্ব্বে করিলে দুর্ঘটনা ঘটিত। এখন আমাদের ভাষা-বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া ব্রিজ্ বাঁধা হইয়াছে। এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্ব্বে সাধুভাষায় যাদের জল-চল ছিল না। সেই জন্যই পুঁথির ভাষায় ও মুখের ভাষায় সমান বহরের রেল পাতিবার যে প্রস্তাব উঠিয়াছে, অভ্যাসের আরামে ও অহঙ্কারে ঘা লাগিলেই সেটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

আসল কথা সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে

লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বাংলাকে সংস্কৃতের পুত্র বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও মানা চাই যে তার ষোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা, চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য-সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত-বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসঙ্গতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেড়ার ভিতরকার গাছ যেখানে একটু-আধটু ফাঁক পায় সেইখান দিয়াই আলোর দিকে ডালপালা মেলে, তেমনি করিয়াই বাংলার সাহিত্য-ভাষা সংস্কৃতের গরাদের ভিতর দিয়া, চল্‌তি ভাষার দিকে মাঝে-মাঝে মুখ-বাড়াইতে সুরু করিয়াছিল। তা লইয়া তাহাকে কম লোকনিন্দা সহিতে হয় নাই। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় দিনে তাঁকে কটুকথা অনেক সহিতে হইয়াছে। তাই মনে হয় আমাদের দেশে এই কটু কথার হাওয়াটাই বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া। ইহা কুঞ্জবনকে নাড়া দিয়া তাড়া দিয়া অস্থির করিয়া দেয় কিন্তু এই শাসনটা ফুলের কীর্ত্তন পালার প্রথম খোলের চাঁটি।

পুঁথির বাংলার যে-অংশটা লইয়া বিশেষ ভাবে তর্ক প্রবল, তাহা ক্রিয়ার রূপ। "হইবে"র জায়গায় "হবে", "হইতেছে"র জায়গায় "হচ্চে" ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনেরা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্ব্বতাকে তারা মানের খর্ব্বতা বলিয়া মনে করিত। আজ যেই তাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে আপদ গেছে। এক-সময়ে ছাপার বহিতে "হয়েন" লেখা চলিত, এখন "হন" লিখিলে কেহ বিচলিত হন না। "হইবা" "করিবা"র আকার গেল, "হইবেক" "করিবেক"-এর ক খসিল, "করহ" "চলহ"র হ কোথায়? এখন "নহে"র জায়গায় "নয়" লিখিলে কেহ বড় লক্ষ্যই করে না। এখন যেমন আমরা "কেহ" লিখি, তেমনি একসময়ে ছাপার বইয়েও "তিনি"র বদলে "তেঁহ" লিখিত। একসময়ে "আমারদিগের" শব্দটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন "আমাদের" লিখিতে কারো হাত কাঁপে না! আগে যেখানে লিখিতাম "সেহ" এখন সেখানে লিখি "সেও" অথচ পণ্ডিতের ভ "কেহ"কে "কেও" অথবা "কেউ" লি পারি না। ভবিষ্যৎবাচক "করিহ" শ "করিয়ো" লিখিতে সঙ্কোচ করি না, তার বেশী আর-একটু অগ্রসর সাহস হয় না।

এই ত আমরা পণ্ডিতের ভয়ে হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত যখন পুঁথির বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খা করেন নাই। বাংলা গদ্য-পুঁথিতে যখন তঁ "যাইয়াছি" "যাইল" কথা-চালাইয়া দি

তখন তাঁরা ক্ষণকালের জন্য ও চিন্তা করেন নাই যে, এই ক্রিয়াপদটি একেবারে বাংলাই নয়। "যা" ধাতু বাংলায় কেবলমাত্র বর্ত্তমান কালেই চলে, যথা, যাই, যাও, যায়। আর, "যাইতে" শব্দের যোগে যে সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয় তাহাতেও চলে যেমন, "যাচ্চি" "যাচ্ছিল" ইত্যাদি। কিন্তু "যেল" "যেয়েছি" "যেয়েছিলুম" পণ্ডিতদের ঘরেও চলে না। এ স্থলে আমরা বলি "গেল" "গিয়েছি" "গিয়েছিলুম"। তার পরে পণ্ডিতেরা "এবং" বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায়। অথচ সংস্কৃত-বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দব্যবহারের যে মিল আছে তাও ত দেখি না। যেখানে সংস্কৃত "অপর" শব্দের আত্মজ যে "আর" শব্দ, সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসঙ্গত। বাংলায় "ও" বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত অপি শব্দের বাংলা রূপ। ইহা ইংরেজি "and" শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে—কিন্তু কখনও বলি না "আমি ও যাব।" সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া মাস ব্যবহার করি। আমরা বলি নানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো।" ভিন্ন শ্রেণীয় পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় বলি "বিছানা বালিশ মশারি আর বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো।" এর মধ্যে এবং" কিম্বা "ও" কোথাও স্থান পায় না। পণ্ডিতেরা বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা-ভাষার আইনকে আমল দেন নাই। আমি এই যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইতেছি তার মৎলব এই যে, পণ্ডিতমশায় যদি সংস্কৃতরীতির উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন বাংলা-রীতির উপর ভর দিয়া যথাস্থানে সংস্কৃত-রীতিকে লঙ্ঘন করিতে সঙ্কোচ করি? "মনোসাধে" আমাদের লজ্জা কিসের? "সাবধানী" বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন? এবং "আশ্চর্য্য হইলাম" বলিলে পণ্ডিতমশায় "আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন" কি কারণে?

আমি যে-কথাটা বলিতেছিলাম সে এই —যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম-অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলি সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি-গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেক দিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্য দশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই অসামঞ্জস্য প্রবল সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে-ভিতরে আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইনকর্ত্তার প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহার বেশী আর তাহার নড়িবার হুকুম নাই।

সবুজপত্র-সম্পাদক বলেন বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে কথার ভাষার সঙ্গে মালা-বদল করিবার জন্য। গুরুজন ইহার প্রতিবাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কৌলিন্যের নির্ম্মম শাসন ভেদ করিবেন

এবং শুভ বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন—কারণ কথা আছে শুভস্য শীঘ্রং।

যাঁরা প্রতিবাদী তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলার চলিত ভাষা নানা জিলায় নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর দল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে-যেমন খুসি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুসিরও একটা কারণ থাকা চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষায় আপন বই লিখিবে এমন খুসিটাই তার স্বভাবত হইবে না। কোনো-একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে যাহাতে "গেনু" "করনু" প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং "ভেয়ের বে" (ভাইয়ের বিয়ে) "চেলের দাম" (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়। যদি বল—তবে এই ভাষাকে কে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে? তবে তার উত্তর এই যে, যে-সকল লেখক এই ভাষা ব্যবহার করিবেন তাঁদের যদি প্রতিভা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের সহজ শক্তি হইতেই বাংলার এই সর্ব্বজনীন ভাষা বাহির করিবেন। দান্তে নিজের প্রতিভা-বলে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইটালির কোন্ প্রাদেশিক ভাষা ইটালির সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ভাষা। বাংলার কোন্ ভাষাটি সেইরূপ বাংলার বিশ্বভাষা কিছুকাল হইতে আপনিই তার প্রমাণ চলিতেছে। বঙ্কিমের কাল হইতে এ-পর্য্যন্ত বাংলার গদ্য-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাংলা প্রদেশেরও নয়। তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা। সকল ভদ্র ইংরেজের এক ভাষা যেমন ইংলণ্ডের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এও সেইরূপ। এ ভাষা এখনো তেমন সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিলেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পক্ষে কি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই? শুধু কি পুঁথির ভাষার ঐক্যই একমাত্র ঐক্যবন্ধন, আর এ-কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁ ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা ক পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না? বঙ্গবিভাগের বিভীষিকায় আমাদের কাঁটা দিয়াছিল তখন আমাদের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে এটা নৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভা ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাংলার পূর্ব্ব প একটা চিত্তের ভাগ হইবে। সমস্ত বাং

দেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলা দেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাসে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে। আমাদের পাকযন্ত্রে নানা খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাকযন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতই দেশের পাকযন্ত্র। এইখানে নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়। রাগ করিয়া এবং ঈর্ষা করিয়া যদি বলি প্রত্যেক প্রদেশ আপন স্বতন্ত্র পাকযন্ত্র বহন করুক তবে আমাদের হাত পা বুক পিঠ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বলিতে পারে আমাদের নিজের নিজের একটা করিয়া পাকযন্ত্র চাই। কিন্তু যতই রাগ করি আর তর্ক করি, সত্যের কাছে হার মানিতেই হয় এবং সেইজন্যই সংস্কৃত বাংলা আপন খোলস ভাঙিয়া যে ছাঁদে মশ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার রণ নানা প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, য় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, াজ করিতে অনেক কাল হইতে কলি-াতায় আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের কলের সম্মিলনে যে এক ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উপায়ে, অন্য দেশে যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি এখানেও একটি বিশেষ ভাষা বাংলা দেশের সমস্ত ভদ্রঘরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। অবশ্য স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষায়। এইটুকু নম্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সদ্বিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোক-ভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

এই যে বাংলা দেশের এক-ভাষা, আজকের দিনে যাহা অবাস্তব নহে, অথচ যাহাকে সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া যাহার পরিচয় আমাদের কাছে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় নাই, যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, সেটাতে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা যে-তর্ক আছে সেটা একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। আবার শক্তি যাদের অল্প অসংযম তাদেরই বেশী। অতএব আমাদের যে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া চালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব কায়দা এখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই

অতএব এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্ত্তমানে এই চল্‌তি ভাষায় লেখা, পুঁথির ভাষায় লেখার চেয়ে অনেক শক্ত। বিধাতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকিবেই এই জন্য ভদ্রতা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই অন্তত প্রথাগত ভদ্রতার বিধি যদি পাকা না হয় তবে সমাজ অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া ওঠে। সবুজপত্র-সম্পাদকের শাসনে আজকের দিনে বাংলা দেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য রচনা সুরু করিয়া দেয় তবে সর্ব্ব-প্রথমে তাঁহাকেই কানে হাত দিয়া দেশ ছাড়া হইতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি। অতএব সুখের বিষয় এই যে, এখনি এই দুর্য্যোগের সম্ভাবনা নাই। নূতনকে যাহারা বহন করিয়া আনে তাহারা যেমন বিধাতার সৈনিক, নূতনের বিরুদ্ধে যাহারা অস্ত্র ধরিয়া খাড়া হইয়া উঠে তাহারাও তেমনি বিধাতারই সৈন্য। কেননা প্রথমেই বিধানের সঙ্গে লড়াই করিয়া নূতনকে আপন রাজ্য গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু যতদিন তার আপন বিধান পাকা না হইয়া উঠে ততদিনের অরাজকতা সামলাইবে কে?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যতার ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এই জন্য স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার কথা এই, প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবনস্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূর পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চিরপ্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে একদিকে সাধারণ, আর একদিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তাহার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তাহার বিলাসিতা তাহার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে অবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে, সেখানে বি প্রাণ আপনাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্র করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা লাটিন এবং রাজ ফরাসীর একটা কৌলীন্য খিচুড়ি ছিল, পরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের আশ্রয় লইল তখনি সে ধ্রুব হইল। তাহার পরেও বারে বারে সে কৃত্রিমত দিকে ঝুঁকিয়াছে, আবার তাকে করিয়া সাধারণের জাতে উঠিতে হইয়াছে এমন কি, বর্ত্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও সাধারণের পথে সাহিত্যের এই অভিসার দেখিতে পাই। বার্ণার্ড্‌ শ, ওয়েল্‌স্‌, বেনেট, চেস্‌টরটন্‌, বেলক প্রভৃতি আধুনিক লেখক-গুলি হাল্‌কা চালের ভাষায় লিখিতেছেন।

আমাদের সাহিত্য যে ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য সবুজ পত্র সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন।

তাঁর মত এই যে সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট—এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে "পয়লা সামাল্‌না মুস্কিল হ্যায়" স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসকাবারি

চিত্তরঞ্জনের "বাঙ্গলার কথা"

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ সম্প্রতি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সেই অভিভাষণের নাম দিয়াছেন "বাঙ্গলার কথা"; কারণ অভিভাষণে তিনি বাংলার জাতিত্বের বিশিষ্ট রূপ, বিশ্বজাতির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ, বাংলার পল্লীর প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, বাংলার ষি-বাণিজ্য এবং শিক্ষাদীক্ষার সাবেক ও ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা এবং র সামাজিক জীবনকে কি ভাবে া তুলিলে তাহার উন্নতি হইতে পারে, গুলি বিষয়ের অবতারণা ও কিছু কিছু াচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁর কার নামটি বেশ সঙ্গত নামই হইয়াছে; ত বাংলার সমস্ত কথাই এই পুস্তিকাটিতে ালোচিত হইয়াছে বটে।

আমাদের দেশে কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি রাষ্ট্রসভা "রাজনৈতিক আন্দোলন" হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে এবং সেই আন্দোলনকে জাগাইয়া রাখাই তাহাদের মুখ্য কাজ। প্রজার স্বত্ব ও স্বাধীনতার দাবী রাজার কাছে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জানাইবার জন্যই প্রধানত এই সকল রাষ্ট্র-সভার আয়োজন। ইহাদের পিছনে রাজ্য-চালনার কোন দায়িত্ব নাই; এই সকল সভার সহিত দেশের অশিক্ষিত সাধারণের কোন যোগ নাই, যোগ স্থাপনের জন্য কোন উদ্যোগ বা উদ্বেগও নাই। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতী রাজনীতি অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার চাহিয়া থাকেন; তাঁদের সেই চাওয়াটাকে তারস্বরে গাওয়াই কন্‌গ্রেস্‌ কন্‌ফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব এই উদ্দেশ্যের প্রতি যে ব্যক্তির সহানুভূতি আছে, তাঁরই পক্ষে এই

* সবুজ পত্র হইতে।

সকল রাষ্ট্রসভার কাজে যোগদান করা স্বাভাবিক; যাঁর সহানুভূতি নাই এ সব সভার কাজে তাঁর যোগ দিবার কোন প্রয়োজনও নাই।

চিত্তরঞ্জনবাবু কন্‌ফারেন্সের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্যের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান্ নন্, তাঁর অভিভাষণে তাহা পরিষ্কার ভাষায় জানিতে দিয়াছেন। যথা :—

"আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে?.....আমাদের কোন্ কমিটিতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য শ্রেণীভুক্ত?"

"আজ যে আমরা Industrialism Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি,...কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া একটা বড় রকমের ধার করা Indian Nation তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—এই সব চেষ্টা যে আমাদিগকে কোন্ পথে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি।"

প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতির মুখে প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে এই ব্যঙ্গোক্তি নিতান্তই অশোভন হইয়াছে।

কন্‌গ্রেস্ কন্‌ফারেন্সের রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বাবু যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র নূতন নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এ সকল কথার যথেষ্ট আবৃত্তি হইয়া গেছে, কন্‌গ্রেসের নীতিকে তখন ভিক্ষুকের নীতি (mendicant policy) বলিয়া একদল স্বাদেশিক প্রচুর অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনেরও বিশ বছর পূর্ব্বে রবিবাবু তাঁর লেখায় ও গানে এই কথাই বলিয়াছিলেন :—

"মিছে,
কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা
চোখে নাই কারো নীর
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ
আপনি করিনে আপনার কাজ
পরের 'পরে অভিমান।"

এবং স্বদেশী আন্দোলনের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে "স্বদেশী সমাজ" প্রভৃতি বক্তৃতায় এই "ধার-করা নেশন" তৈরির বিপদ সম্বন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সমাজের সমস্ত কল্যাণভার দেশবাসীদের স্বহস্তে গ্রহণ করিবার চিরন্তন ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিতে হইবে—এই কথাই রবিবাবু পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তবু, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়া রবিবাবু তাঁর অভিভাষণে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে কোন অশোভন বা অসঙ্গত উক্তি প্রয়োগ করেন নাই। সেই বক্তৃতায় তাঁর উক্তিতে তিনি কন্‌গ্রেসের স্বভাব যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন, তার অভাব সম্বন্ধেও তেমনিই সুনিপুণভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সেই উক্তিটি এই—"কেবলমাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্য এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশঃ পরিস্ফুট আকার

ধারণ করিয়া বললাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্ম্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে, এই আমাদের লক্ষ্য।" অথচ দেশের ইচ্ছাশক্তিকে কর্ম্মশক্তিতে পরিণত করিবার লক্ষ্যটাকে এই সকল রাষ্ট্রসভা যে চোখের সাম্‌নে রাখেন নাই, তাহা রবিবাবু বেশ জানিতেন। তবু সেই লক্ষ্যের দিকেই এই সকল সভার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ঘটিতে পারে, এই ভরসাটুকুকে খোলসা করিয়া বলার জন্য তিনি এই সকল সভার দায়িত্বকে খুব বড় করিয়া ধরিবার একটা সুযোগ পাইয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বাবু প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হইয়া শুধু যে সেই সম্মিলনীর প্রতিই অবজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তা নয়, সম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোহিত ও নেতা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও অযথা নিন্দাবাদ করিয়া সভাপতির পদের অবমাননা করিয়াছেন। অথচ মজা এই যে, তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ভাব ও স্থানে স্থানে ভাষাও তিনি রবিবাবুর গ্রন্থাদি হইতে, জ্ঞাতসারে হোক্ বা কতকটা অজ্ঞাতসারে হোক্, গ্রহণ করিয়াছেন। একটা অজ্ঞাতসারে বলিলাম এইজন্য যে, আধুনিক অনেক লেখকেরই মত চিত্তরঞ্জন বাবুও রবীন্দ্রনাথের নিকট সর্ব্ববিষয়েই ঋণী, তাহা তাঁহার যে-কোন রচনা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। সুতরাং লিখিবার বেলায় তিনি যে রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন না হইতেও পারেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন না হইলেও একেবারে অচেতন হইবার কোন কারণ পাই না। কেননা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা ও কাজের প্রস্তাবগুলি কালের হিসাবে এখনও এতটা পুরাণো হইয়া দাঁড়ায় নাই যে তাহাকে সত্যসত্যই পুরাণের মত বা traditionএর মত যে খুসি সেই ব্যবহার করিতে পারে। যেমন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী যখন এ দেশে নানালোকের মুখে মুখে চলিয়া গেল, তখন কালক্রমে তাঁদেরি কথার ঊনিশ বিশ করিয়া বাংলা দেশে বিস্তর পদকর্ত্তা দেখা দিয়াছিলেন। কোন বড় জিনিষ একবার চলিয়া গেলে তখন লোকে এমনিতর অজ্ঞাতসারেই তাহার নকল করিয়া থাকে বা তাহার আবৃত্তি করিয়া থাকে—সেটা অনেক সময়ে তার অপব্যবহার হইলেও তার একরকমের ব্যবহার ত বটে এবং তাতেই তার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। আর পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর পরে চিত্তরঞ্জন বাবুর মত যদি প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের কোন ভাবী সভাপতি রবিবাবুর উক্তির পুনরুক্তি করিতেন, তবে পুনরুক্তির অভিযোগ হইতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারিত, কেননা এটা তখন বেশ বুঝা যাইত যে দেশের হাড়ে হাড়ে এই উক্তিগুলার ভাব ঢুকিয়া গেছে। সুতরাং কবির সেই কথাটা তখন সত্য হইত যে—

"বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ"।

কিন্তু এত শীঘ্র শীঘ্র এই কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা দেশের এত লোকের স্তুতিবাদ

ও অপবাদের স্রোতের মুখে রবিবাবুর স্বদেশ সম্বন্ধীয় কথাগুলা যে পুরাণ-কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং যে কেহ আজ সে গুলিকে নিজের মত ব্যবহার করিতে পারিবে —এটা কোন ক্রমেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, রবিবাবুর কোন কথাই এবং কোন আলোচনাই দেশ বিনা-প্রতিবাদে গ্রহণ করে নাই। বিশেষতঃ, দেশ সম্বন্ধে তিনি যা কিছু কাজের কথা বলিয়াছেন, কবি হওয়ার দরুণ সবটাই লোকে তাঁরই জল্পনা-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের দেশে কল্পনার সঙ্গে কাজের কোন কালে বিশেষ প্রণয় নাই বলিয়া তাদের মধ্যে পরিণয় ঘটানোর যে উদ্যোগ রবিবাবু করিয়াছিলেন, তাতে লোকের পরিহাসটাই জাগিয়াছে। সুতরাং এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরই কথাগুলা চিত্তরঞ্জনবাবু কতকটা অজ্ঞাতসারে লইলেও, খুব বড় কৌঁসিলির কৌশলের জোরেও পুনরাবৃত্তি-দোষ তথৈব "নকল পাণ্ডিত্যের" দোষ হইতে তাঁকে মুক্ত করিবার কোন উপায় দেখিনা।

রবীন্দ্রনাথের কণিকায় আছে :—

"ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।"

চিত্ত বাবুর এই অভিভাষণ সম্বন্ধে সেই কথাটাই দিব্য খাটে দেখিতেছি। কেননা, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত রবিবাবুর সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি করিয়া খামখা অপ্রয়োজনে এবং "অকারণ পুলকে" তিনি তাঁর "মহা-সভার সভাপতির আসন" হইতে এক-জায়গায় রবিবাবুর আমেরিকার এক বক্তৃ-তাকে লক্ষ্য করিয়া এমন একটা বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়িলেন যেটা লক্ষ্যের কাছ দিয়াও গেলনা, উল্টা ফিরিয়া আসিয়া তাঁর সেই আসনটাকেই কলঙ্কের মত বিদ্ধ করিয়া রহিয়া গেল। তাঁর লক্ষ্য—রবিবাবুর আমে-রিকার কোন বক্তৃতা—কোন্ বক্তৃতা তাহা বোধহয় তিনিও জানেননা। কারণ, তিনি নাম করেন নাই। আমাদের বোধ হয় তিনি, The Cult of Nationalism, বক্তৃ-তাটির কথাই বলিয়াছেন। তার পর তিনি কবুল করিয়াছেন সে বক্তৃতা তিনি পড়েন নাই এবং "হয়ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি।" তিনি পড়িয়াছেন সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে আমেরিকান কাগজের দুএকটা টুকরা যাহা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। টুক্‌রাগুলিতে সেই বক্তৃতার বিবরণ ছিল এবং এক আধটা অংশও উদ্ধৃত ছিল। সেই অংশগুলি হইতে পুরা বক্তৃতাটা সম্বন্ধে কোন লোকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে না, কষ্টকল্পিত ধারণা হইতে পারে বটে। আমেরিকান কাগজগুলিই একবাক্যে সকলে স্বীকার করিয়াছে যে, Cult of Nationalism বক্তৃতাটির সার কথা উদ্ধার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ত যে যা বুঝিয়াছে, সেই অনুসারে কা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। কোন কাগজ একেবারেই ভুল বুঝিয়া বসিয়া দেখা যায়। বক্তৃতা দিলেন একজন, বক্তৃতা শুনিয়া মন্তব্য প্রকাশ করি আর দশজন, তাঁদের বিচিত্র মন্তব্যের আব টুক্‌রাগুলা এখানকার কাগজে উদ্ধৃত দেখিয়া সেই নানা পত্রবায়ুবীজিত টুক্‌রাগুলার

আলোড়নে বঙ্গীয় প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের নূতন সভাপতির আসন হঠাৎ এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, সেই বক্তৃতার প্রতিবিম্ব এবং তস্য প্রতিবিম্বের ছায়ার বিরুদ্ধে অনেক খানি মসীলেপনের কীর্ত্তি-অর্জ্জনের জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! আমেরিকায় রবিবাবু বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা আগে ছাপাই হোক্, তার পর তার সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিলে বলা যাইতে পারিত। ইতিমধ্যে মহাসভা এবং সভাপতির আসন পূরাদস্তর বজায় থাকিত, কোনটাই ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা ছিল না। রবিবাবুর সেই বক্তৃতার সঙ্গে প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের কার্য্যতালিকার কিম্বা চিত্তবাবুর কাজের কথার এমন কিছু যোগ ছিল না যে বক্তৃতাটা না পড়িয়াই তাহার প্রতিবাদ করা অত্যন্ত জরুরি দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার ফলে হইয়াছে এই যে, সেই বক্তৃতায় রবিবাবু যাহা বলেন নাই তাহাই তাঁহার বক্তব্য বলিয়া অবাধে চালানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় nation-alism সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা "স্যর রবীন্দ্রনাথ" হইবার বহু পূর্ব্বেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ক্রমাগতই বলিয়া-ছেন, সেটা বোধহয় চিত্তরঞ্জন বাবু জানেন না। আমেরিকার বক্তৃতায় তিনি আসলে নূতন কোন কথাই বলেন নাই, তবে খুব জোরের সহিত নূতন ও বড় দিক্ হইতে সেই পুরাণো কথাই বলিয়াছেন বটে। আর চিত্তরঞ্জন বাবুও সেই পুরাণো কথাই অবিকল রবিবাবুরই ভাবে ও ভাষায় পুনরাবৃত্তি করিতে গিয়া রবিবাবুরই অস্ত্রে রবিবাবুকে আঘাত করিবার জন্য বিস্তর অনন্যতন্ত্রতার ঘটা ও আত্মগরিমার ছটা প্রকাশ করিয়াছেন।

সভাপতির অভিভাষণে তিনি লিখি-তেছেন :—

"ইউরোপে নাকি কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব ইংরেজিতে যাহাকে "Nation Idea" বলে ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোন বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন বিশিষ্ট জাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল নাই। (?) প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচার, ব্যবহার, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান প্রদান চলিয়াছে এবং আদান প্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কোন বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে। এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটা অনেকদিন-কার, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নব জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্খাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়া-ছেন; আমি ভরসা করি এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী, আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দো-লনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন—স্যার রবীন্দ্রনাথ—

এবার আমেরিকায় এই মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটী কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেই মতের এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভার সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সভ্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়?"

"এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ"—এই "এখন" কথাটার উপর ঠেস দেওয়ার ভিতরে বেশ একটা নীচতার আরোপ (insinuation) রহিয়াছে, যেটা ভদ্রোচিত নয় বলিয়া তাহার জবাব দেওয়াও ভদ্রোচিত হয় না। রবিবাবুকে সরকার নাইট করার পর হইতে তাঁহার জাতীয়তা হঠাৎ রাতারাতি বিশ্বভ্রাতৃপ্রেমে পরিণত হইল, সুতরাং তিনি জাতীয়তাকে গালমন্দ দিয়া পশ্চিমের কাছে বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন, "নকল পাণ্ডিত্য" দেখাইতেছেন, এই সব দোষারোপের যে কোন ভিত্তি নাই তার প্রমাণ ঐ বক্তৃতাটিই,—'The Cult of Nationalism'ই। চিত্তরঞ্জনবাবু কি একবার খোঁজ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে কেন ঐ বক্তৃতাটি এদেশের কোন কাগজে কোথাও প্রকাশিত হইল না? অথচ আমেরিকার সহরে সহরে ঐ বক্তৃতাটি লইয়া একটা তুমুল হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল কেন? ঐ বক্তৃতায় রবিবাবু যে অসামান্য তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে কোন দেশের লোকের পক্ষে সুদুর্লভ—বিশেষতঃ কোন পরাধীন দেশের লোকের পক্ষে। তাঁর সেই বক্তৃতাটি কোথাও সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়া দিতে পারিতেছি না, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। তবে তাহার মোট কথাটা রবিবাবু ১৩০৮ সালের বঙ্গদর্শনেই "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে অতি সুন্দর রূপে বলিয়াছিলেন; সেই প্রবন্ধের কতক অংশ এবং cult of nationalism প্রবন্ধের কতকাংশ এখানে উদ্ধার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। "কোন বিশিষ্টজাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল নাই" এ সকল কথা তিনি যে কোন কালেই বলেন নাই এবং এখনও বলিতেছেন না, তাহা দুই প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ বুঝা যাইবে:—

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (১৩০৮ সাল)

"য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

"ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল জনসাধারণের মধ্যে মত বিশ্বাসের প্রভেদ পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেই তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর। খানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্ত্তি করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের একটা গভীর সংস্কারের মত হইয়া গেছে, রা স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্ব্বসাধারণের তেমনি এ অন্তর্নিহিত সংস্কার।

* * *

"প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম্ম আছে, তেমনি জাতিধর্ম্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, তাহা মানব সাধারণের। 'আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যখন সেই উচ্চতর ধর্ম্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম্ম তাহাকে আঘাত করিল—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

* * *

"য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতি লাভ করে যে, ধর্ম্মের সীমানাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।"

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্ব্ব সূচনা দেখা যাইতেছে।"

* * *

"হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

"নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশন্যাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপ নেতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান । আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার আমরা মানি না।...এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা রাপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর বন্দুক ও দম্‌দম্ বুলেটের সাহায্যে বড় হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব।"

চিত্তরঞ্জন বাবু কি জানেন না যে, "নৈবেদ্যের"—"শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্ত মেঘমাঝে অস্ত গেল," প্রভৃতি স্বদেশ সম্বন্ধীয় কবিতায় এবং 'ব্রাহ্মণ' 'সমাজভেদ' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'চীনেম্যানের চিঠি', 'স্বদেশী সমাজ', 'সফলতার সদুপায়', 'সমস্যা', 'ততঃ কিম্', প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে রবিবাবু এই কথাই পুনঃপুনঃ নানা দিক্ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপর ইউরোপীয় জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমাদের জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা সে জায়গায় কখনই হইবে না? জাতি তুলিয়া দিতে তখনও তিনি বলেন নাই, এখনও বলিতেছেন না। জাতি মাত্রকেই যে "নেশন"-রূপ ধারণ করিতেই হইবে, ইহাতেই তাঁহার আপত্তি। কারণ, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের আর এক নাম যদি "নেশন" হয়, তবে তাহাকে এমন উগ্র ও প্রবল হইয়া উঠিতে দেওয়া উচিত নয়, যাহাতে তাহা জাতির ভিতরকার মহৎ ও কল্যাণপ্রদ সৃজনীশক্তিগুলিকে (creative impulses) চাপা দিয়া মানুষগুলাকে যন্ত্রের সামিল করিয়া তুলিতে পারে। ইউরোপীয় peopleরা nation-রূপ খুব বেশীদিন ধারণ করে নাই—এই রূপ ধারণ করার জন্য তাহাদের প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি কি অবনতি হইতেছে তাহাই বিবেচ্য।

The cult of Nationalismএর মোট কথার সঙ্গে আর রবিবাবুর বহুপূর্ব্বে লিখিত প্রবন্ধ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার" মোট কথার সঙ্গে যে বিশেষ পার্থক্য নাই তাহা দেখাইবার জন্য The cult of Nationalism হইতেও ঐ রাষ্ট্র

ও সমাজের পার্থক্য বিচার সম্বন্ধে দু'একটা অংশ উদ্ধার করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। তিনি বলিতেছেন :—

"The nation is a whole people organised for a mechanical purpose. Society has no such purpose—it is an end in itself; it is the natural human relationship which enables men to develop toward their aspirations. But the political side is narrower—it is for self-preservation only; it trades upon the greed and fear of men.

"When this selfish force becomes all powerful at the cost of the higher social life, then it is an evil day for humanity. When the father becomes a gambler and loses his regard for his family, then he becomes an automaton and not a man. When society turns into an organization for greed and power there are few crimes it cannot commit, for power is the end of a machine and a machine has no morals."

অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিত্তরঞ্জন বাবু nationalism সম্বন্ধে রবিবাবু কি বলিয়াছেন তাহা না জানিয়াই কতগুলা কাল্পনিক আপত্তি খাড়া করিয়া তাহার পোষণার্থে এবং রবিবাবুকে দূষণার্থে বিস্তর উপপত্তি রবিবাবুর লেখা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁর সমস্ত লেখার সব আইডিয়াগুলার জন্য তিনি যে রবিবাবুর কাছে কি পরিমাণে ঋণী তাহা তিনি স্বীকার না করিলেও বঙ্গীয় পাঠকবর্গের তাহা জানা উচিত। সেই জন্য তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর কথা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি। পর পর দুজনের লেখার উদ্ধৃতাংশ পড়িলে "নকল পণ্ডিত" যে কে তাহা বুঝিতে পাঠকবর্গের তিলার্দ্ধও বিলম্ব হইবে না। রবির চেয়ে "বালির তাপ" যে বেশি তাহাও মধ্যে মধ্যে বুঝা যাইবে।

চিত্তরঞ্জন—"মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব।...শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না," ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ—"মনে করি আমাদের পোলিটিক্যাল কর্ত্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুল বালকের ডিবেটিং ক্লাব—গবর্মেণ্ট যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল'... দেশের কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করি না।" "সফলতার সদুপায়"—"সমূহ"।

চিত্তরঞ্জন—"সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি-সমূহকে বিকশিত করিতে হইবে।... জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতে সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়।"

রবীন্দ্রনাথ—"ইহা নিশ্চয় জানা প্রত্যেক জাতি বিশ্বমানবের অঙ্গ। মানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদ্ দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা-লাভ করে।— "স্বদেশী সমাজ"—"সমূহ"।

চিত্তরঞ্জন—"আমরাও...নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নিজের

শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম।... তিনি (রামমোহন রায়) যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই।"

রবীন্দ্রনাথ—"আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম; আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল।...রামমোহন রায় নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন।" "পূর্ব্ব ও পশ্চিম"—"সমাজ"।

চিত্তরঞ্জন—"যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন।"

"ও আমার দেশের মাটী
তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কি বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে!"—
গান ও কাব্যগ্রন্থ।

চিত্তরঞ্জন—"প্রাণের যে বন্যা সে ত অঙ্কশাস্ত্র মানে না"—

রবীন্দ্রনাথ—"মনুষ্য সমাজ সাধারণতঃ হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক এক সময়ে সেখানে যেন ভেল্কী লাগিয়া যায় তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময় দুয়ে দুয়ে চার হয়, সহসা একদিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়।" "চিঠি পত্র"—"সমাজ।"

চিত্তরঞ্জন—"ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধন ...এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে হয়ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না।"

রবীন্দ্রনাথ—"বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ... ... এই উৎপাতে ... আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল তাহা চোখে পড়িল।" "স্বদেশী সমাজ"—"সমূহ"।

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের ও ইংরাজের মিলনের মর্ম্ম যদি এই হয় যে আমরা ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব,...তাহা হইলে আমি বলি এ মিলন একেবারে অসম্ভব।... কেহ কেহ বলেন যে এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল তাহা ইংরাজ লইবে...। খাঁটি ভালটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কি করিয়া?...কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ—"সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার

প্রয়োজন দেখি না··· ...বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি, বল পাইতে পারি না ; নিজের বল ছাড়া বল নাই—"নববর্ষ।"—"স্বদেশ"। "বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হয়, কারণ তাহার পশ্চাতে সুচির কালের ইতিহাস নাই —তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, শিকড় ছিন্ন"—"নববর্ষ"। "স্বদেশ"

"সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সার্থক হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে থাক্।..... এইটুকু বোঝা দরকার যে, এই বিপুল সমাজ একটি বৃহৎ প্রাণীর ন্যায়—আবশ্যক হইলেও, ইহার কোন এক অঙ্গে আঘাত করিবার পূর্ব্বে সমগ্র প্রাণীটির শরীর-তত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।—"সমাজ ভেদ," "স্বদেশ।"

"ব্রিটিশ রাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের কৃত-কার্য্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসনরক্ষণ বিধি ব্যবস্থা যত ভালই হোক্ না কেন, তাহা ত বস্তুত আমাদের নহে।··· ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্য্যের দ্বারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষ লাভের আশা করিতে পারিব।... অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতা নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে, একথা আমার বক্তব্য নহে—তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে। "দেশীয় রাজ্য" "স্বদেশ।"

চিত্তরঞ্জন—"জাতিত্ব মরেনা—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহাই জাগিয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথ—"বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে,—সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে, তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।"—"সমাজভেদ"—"স্বদেশ।"

চিত্তরঞ্জন—"পল্লী-সমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।.. ...স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে, এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম-সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য প্রতি গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তা সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের এ করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ—"সমস্ত দেশ যে শিকড় রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে গে ধরিয়াছে, যে মাটী হইতে বাঁচিবার পাইবে সেই মাটি পাথরের মত কা হইয়া গিয়াছে, যে গ্রাম্যসমাজ জাতির জন্ম ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন

বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।... ... গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর ; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর।"... ... "নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহদান করিতে হইবে।" পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের এখন বিলাতি আদর্শ জনিত যে বিলাসের ভোগ তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সবল করিতে হইবে।··· Industrialism যাহা আমাদের দেশে কখনও ছিলনা ও আমাদের স্বভাব ও ধর্ম্মের মধ্যে থাকিতেই পারেনা...আজ যে আমরা Industrialism Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি···কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া কতটা বড় রকমের ধারকরা Indian tion তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছি—এই সব চেষ্টা যে আমাদিগকে ন্ পথে কোন্‌দিকে লইয়া যাইতেছে হা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি ? কেহ আমায় বলিয়া দিতে পার আজ দুইশত সরের ভিতর কয়টা নূতন পুষ্করিণী খনন ইয়াছে, কয়টা নূতন দেউল রচিত হইয়াছে, কয়টা নূতন অন্নছত্র খোলা হইয়াছে...? সে কালে যখন গ্রামে গ্রামে দুর্গোৎসব হইত, পল্লিতে পল্লিতে বারমাসে তের পার্ব্বণ ছিল, তখন সকল গৃহস্থ সকল গ্রাম কেমন এক পরিবার হইয়া উঠিত, সুখদুঃখ, আনন্দ-উল্লাস, উৎসব এক সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতাম, এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই!"

রবীন্দ্রনাথ—"এই ভোগ এবং আড়ম্বরের ঢেউ (বিলাতের) আমাদের দেশেও যে উত্তাল উঠিয়াছে সে কথা কাহারো অগোচর নহে। অথচ আমাদের দেশে আয়ের পথ বিলাতের অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ।···আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্য্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনো বদ্‌লায় নাই। এ সমাজ বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট।... অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক।··· প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন... ... দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নানপানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং যে দেশ বারোমাসে তেরো পার্ব্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে।" —"বিলাসের ফাঁস", "সমাজ"।

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের শ্রমজীবীদের যে নৈতিক জীবন তাহা এই মিল ফ্যাক্টরীতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ—"সহরে ধনী মহাজনের

কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন।"—পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণ—"সমূহ"

চিত্তরঞ্জন—"সমাজের যে স্থানে অর্থশক্তি বদ্ধ হইয়া পড়ে, সেই স্থানই শক্তিসম্পন্ন হয় কিন্তু অন্যান্য স্থানে অবসাদ অন্ধকার!"

রবীন্দ্রনাথ—"যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্য্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না"—"বিলাসের ফাঁস"—"সমাজ।"

চিত্তরঞ্জন—"আমরা এখন যে উচ্চশিক্ষা পাই তাহা একটা ধার করা জিনিস, তাহার সঙ্গে সেই কারণে আমাদের দেশের স্বভাব-ধর্ম্মের যোগ দেখিতে পাই না।... এই ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের কত রকম সরল উপায় ছিল, এখন বৃহৎ প্রাসাদ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে না...আমরাই শিশুকালে বালির কাগজে অঙ্ক কসিতাম।...এখন স্কুলের নিম্নশ্রেণী হইতে রুলকরা ভাল কাগজের বাঁধান খাতা না হইলে না কি লেখা পড়া হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ—"য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে।... যাহা বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক তাহা নির্জ্জীব।...যতদিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে শ্লেট পেন্সিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুস্কিল।—"শিক্ষাসমস্যা"—"শিক্ষা।"

চিত্তরঞ্জন—"এই শিক্ষার ফলে...আমরা মানুষ হই নাই, একটু বেশী চালাক হইয়াছি মাত্র। বক্তৃতার সময় সেই মুখস্থ করা কথাগুলো তোতার মত আওড়াইয়া যাই"।

রবীন্দ্রনাথ—"যাহা কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে, সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে, যেন আমরাই কথা বলিতেছি।—"জাতীয় বিদ্যালয়"—"শিক্ষা।"

চিত্তরঞ্জন—"আমি আজ বাঙ্গালীর মহা-সভায় সাহস করিয়া বলিতেছি যে, এই শিক্ষা দীক্ষার প্রণালী সমূলে পরিবর্ত্তিত না করিলে, ইহার মুখ ফিরাইয়া দিতে না পারিলে, ইহাকে আমাদের দেশের যে স্বভাব ধর্ম্ম, আমাদের দেশের যে সভ্যতা সাধনা, তাহার সহিত যোগ করিয়া না দিতে পারিলে...আমাদের ঘোর বিপদের কথা।

রবীন্দ্রনাথ—"ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার অপূর্ব্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে।... যাহা পৃথিবীকে দিব, তাহা আমাদের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট না।...এতদিন আমরা ইস্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহা আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে...মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটা কোন মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না।

যেমন করিয়াই হউক্ শিক্ষার দ্বারা আমরা পূর্ণ পরিণত আমরাই হইব।"—"জাতীয় বিদ্যালয়" "শিক্ষা"

চিত্তরঞ্জন—"পল্লী বা গ্রাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"—(এখানে পল্লী-সমাজের সমস্ত আইডিয়াটি যাহা চিত্তরঞ্জন ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে সম্পূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন; বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধার করিলাম না—যাঁহার ইচ্ছা হয়, মিলাইয়া পড়িবেন।)

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের দেশে রাজার কর্ম্মক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র দেখা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবন যাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।""

রবীন্দ্রনাথ—"আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্য দ্বারা আবদ্ধ।... জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিয়া থাকেনা—সমাজের কাজ সমাজের লোকেরই উপরে আশ্চর্য্যরূপে বিচিত্ররূপে ন্যস্ত রহিয়াছে।"—"স্বদেশী সমাজ"—"সমূহ"

চিত্তরঞ্জন—"সমস্ত জেলাকে একটা বড় সমাজ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত পল্লীসমাজ এই কেন্দ্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তোলা আবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ—"কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে।... এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভর-শীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে।" পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

চিত্তরঞ্জন বাবু দেশের প্রতি প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশের সেবায় সকল প্রকার "অভিমান" ত্যাগ করিবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন:—"অহঙ্কারী! মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ!... আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক!" ইত্যাদি। অন্যকে মাথা নোয়াইবার উপদেশ দিবার আগে যাঁর কাছে তিনি এত বিষয়ে এত ঋণী তাঁর কাছে নিজের মাথাটা নত করিতে হয়, আততায়ীকে হাতের ছুরি জন্মের মত ফেলিয়া দিবার উপদেশ দিবার আগে নিজের হাতের ছুরিটা ফেলা আবশ্যক হয়—শুধু এই কথাটুকু চিত্তরঞ্জন বাবুকে স্মরণ করিতে বলি। তাঁর দেশভক্তি যে অকৃত্রিম তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; তাঁহার মত উদারহৃদয় দানশীল সকল-শুভকার্য্যে-উৎসাহী ব্যক্তি আজ বাংলা দেশে দুর্লভ। হিন্দুর পক্ষে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বা হিন্দু-মুসলমানের ভেদটা ভোলা যত কঠিন, তার চেয়ে ব্যক্তিগত সামান্য খিটিমিটি ও বিরুদ্ধ ভাবগুলো ভোলা ঢের সহজ। চিত্তরঞ্জন বাবুর দেশভক্তি দেশের যিনি শ্রেষ্ঠ সন্তান ও গৌরবের বস্তু, তাঁকে তাঁর যোগ্য সমাদর দিতে কুণ্ঠিত হয় কেন?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

মিশরের আর্ট

কোন দেশের আর্টকে ভাল-করিয়া বুঝিতে হইলে আগে দেখা দরকার, সে দেশের প্রকৃতি ও মতি-গতি কিরূপ। এক দেশের আর্টে যদি অন্যদেশীয় আদর্শ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর নকল দেখা যায়, তবে সেটা সুখ্যাতির না হইয়া নিন্দার কথাই হইয়া দাঁড়ায়। কেননা এক-এক দেশের আর্ট এক-একরূপ নিজস্ব সৌন্দর্য্যে ও বিশিষ্ট মাধুর্য্যে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে; ঐ নিজস্ব ও বিশিষ্টতাই নকল বা খাঁটি আর্ট চিনিবার যথার্থ নিকষ। ভারতবাসী যদি য়ুরোপীয় আর্টকে ভালরকম নকল করিতেও পারে, তবে তাহাতে ভারতের প্রাণের সাড়াও পাওয়া যাইবে না, য়ুরোপের ভাবের ছাপ্‌ও পড়িবে না; কারণ, নকলে আসলের রস ফোটানো দায়। ফলে এ-ধরণের নকলিয়ার এ-কূল ও-কূল দুকূলই মাটি হইয়া যায়। কোকিলের ডাক ক্রমাগত শুনিয়া শুনিয়া একঘেয়ে লাগিলেও কেউ ত নূতনতার খাতিরে তাহাকে বলে না, 'কোকিল, তুমি বুলবুলির মত শীষ দাও!' যার যা স্বাভাবিক রূপ, তাতেই তাকে মানায় ভাল।*

এইজন্যই এক দেশের আর্টকে যাহারা অন্য কোন দেশের তুলনায় খাটো করিতে উদ্যত হয়, আনাড়ি ভিন্ন আর-কোন নামে তাহাদের ডাকা যায় না। য়ুরোপীয় নিসর্গ-চিত্রে যেমন ভারতের তালীকুঞ্জ বেখাপ্পা দেখায়, কোন ভারতীয় পটেও তেমনি য়ুরোপের কোন-কিছু মানানসৈ হইবে না। য়ুরোপের আর্ট য়ুরোপের মতন, ভারতের আর্ট ভারতের মতন, জাপানের আর্ট জাপানের মতন। এদের একের সঙ্গে অপরের তুলনা চলে না। ঐ দেশগুলিতে আর্টের এক-একটি দিক ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং মিশরীয় আর্টের যে-সকল লক্ষণ আমরা দেখাইব, সেগুলির সঙ্গে কেউ যেন অন্য কোনদেশীয় আর্টের তুলনার কথা না তুলেন।

মিশরীয় আর্ট সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে তাহার মধ্যে দুটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইবে। প্রথম:—শিল্পনৈপুণ্য। মিশর যখন সভ্যতায় আর-সকলকার অগ্রণী ছিল, [illegible] কারিকরিতে অন্য কোন জাতি [illegible]

* The only bad art is that which is mechanical, where the impulse to gi[illegible] expression has decayed, and it is reduced to mere copying of styles and motive[illegible] which do not belong to its actual condition. An age of copying is the on[illegible] despicable age. It is but a confusion of thought, therefore, to try to pit t[illegible] art of one country against that of another. * * * To understand any art [illegible] must first begin by grasping its conditions, and feeling the contrasts, the neces[illegible] sities, the atmosphere, which underlie the whole terms of expression.—The Arts and Crafts of Ancient Egypt. By W. M. Flinders Petrie.

শিল্পীদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয়:—আর্টের মধ্যে স্বাধীনতার অভাব। মিশরীয় শিল্পীরা চল্‌তি রীতির বেড়ীতে এমনি বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাদের কারুকার্য্যের মধ্যে স্বাধীনতার লীলা একরকম ছিল না বলিলেই হয়। এই স্বাধীনতার অভাবের দরুণ মিশরীয় শিল্পীরা উচ্চতর সৌন্দর্য্যলোকে উঠিতে পারেন নাই। মিশরীয় ললিত কলায় সৌন্দর্য্যের মোহন বিকাশ আছে বটে,—কিন্তু সে বিকাশ পূর্ণবিকাশ নয়—তাহা অসম্পূর্ণ।

মিশরবাসীরা আপনাদের বাসগৃহগুলিকে একটু আলাদা চোখে দেখিতেন। জীবিত-কালে তাঁহারা যে-সব ঘর-বাড়ীতে থাকিতেন সেগুলিকে তাঁহারা ঠিক ঘর বলিয়া ধরিতেন না —অনেকটা পথ বলিয়া ভাবিতেন; তাঁহাদের ধারণা ছিল, অনন্ত আত্মার চিরকালের বাসভবন হইতেছে সমাধি-মন্দির। মিশর-বাসীদের প্রাণে প্রাণে ঐ ধারণা এতটা শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছিল যে, মিশরীয় শিল্পের যে-সকল নমুনা দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই সমাধি-গৃহ হইতে সংগৃহীত। [illegible] ভাল্লুকের মৃতদেহকে শিকারীরা যেমন [illegible] হইতে দেয় না, মানুষের মৃতদেহকেও [illegible] াসীরা তেমনি ধ্বংস হইতে দিত [illegible] কৌশলে দ্রব্যগুণে তাহারা শবদেহ [illegible] স্থায়ী করিয়া, পাথরের পুতুলের মত [illegible] নের মধ্যে সাজাইয়া রাখিত। এবং [illegible] র তৃপ্তিবিধানের জন্য সমাধিগৃহের [illegible] ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি খুদিয়া যাইত, [illegible] টুয়া আসিয়া ছবি আঁকিয়া যাইত! [illegible] মশরের সমাধি-মন্দিরের দেবতা হচ্ছেন মৃত মানব,—তাঁহার আত্মা সেখানে অনন্তকাল ধরিয়া বিরাম-পুলক উপভোগ করে।

ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্ব হইতেই (৮০০০—৫০০০ খৃঃ-পূঃ) মিশরবাসীরা মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্ত্তি গড়িয়াছেন; কিন্তু সে-সব মূর্ত্তি দেখিলে অনেক সময় চেনাই দায় যে, সেগুলি শিব কি বানর! তাছাড়া তখনকার হাতের কাজে আর্টের সম্পর্কও ছিল বড় অল্প। মিশরীয় শিল্পীর সামনে তখন কোন আদর্শ না থাকার দরুণ, শিল্পের মধ্যে উন্নতি বা অবনতির লক্ষণও বড়-একটা পাওয়া যাইত না।

মিশরীয় আর্টে জাগরণের প্রথম সাড়া পাওয়া যায় খৃঃ-পূঃ ৫৫০০ বৎসরে। আর্টের মধ্যে তখন এমন-একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিল যে, তাহার পুরাণো রূপের খোলস একেবারে খসিয়া পড়িল। দেশের রাজাদের আশ্রয়ে মিশরের আর্ট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নব-তন্ত্রের শিল্পীরা নূতন তেজে, নূতন রূপে ও নূতন জীবনে পুরাতন প্রাণহীন আর্টকে জীবন্ত ও পূরন্ত করিয়া তুলিলেন। মিশরের সর্ব্বত্র যে বিখ্যাত চিত্রাক্ষর (Hieroglyphic writing) দেখা যায়, এই নবযুগেই তাহার সূত্রপাত। চিত্রাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই মিশরে ইতিহাসের সৃষ্টি।

নবযুগের শিল্পীরা যে সত্য-সন্ধানী ছিলেন, শারীর-বিজ্ঞানে (Anatomy) অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া সেটা তাঁহারা ভালরকমেই প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রকৃতিকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতেন না, গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সরলতা ছিল তাঁহাদের

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কার্য্যের মূলমন্ত্র। বাস্তবিক, সেই প্রাচীন যুগের নবজাগ্রৎ ললিত কলার মধ্যে যতটা সত্য ও যথার্থতা ছিল, মিশরের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের শিল্পেও আর-কখনো ততটা শ্রী-ছাঁদ দেখা যায় নাই।

আর্টিষ্ট যখন প্রকৃতির অন্দরমহলে ঢুকিতে পারেন, প্রকৃতির সকল গোপন কথা যখন বুঝিতে পারেন, তখন তিনি সুধু আর্টের জন্যই আর্টের চর্চ্চা করেন, তখন তিনি সুধু রূপের রসেই বিভোর হইয়া থাকেন, সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দেখানো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন না। আর্টিষ্টের প্রাণ যখন এই অবস্থায় গিয়া উঠিতে পারে তাঁহার প্রথম শিক্ষা তখনি সম্পূর্ণ হয়। মিশরের শিল্পীরাও সৌন্দর্য্যভক্ত হইয়া শিল্প-জগতে সার সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিল। এর আগে মিশরের শিল্পীরা নানান্ উদ্দেশ্যে শিল্পচর্চ্চা করিত, সৌন্দর্য্যেই যে আর্টের চরম সার্থকতা, সেটা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত না,—মিশরের আর্টও তাই নগণ্য এবং প্রাণশূন্য হইয়া সৌন্দর্য্য-লোকের বন্ধদুয়ারের বাহিরে পড়িয়াছিল।

পিরামিড-যুগে (খৃঃ-পূঃ ৪৭০০—৪০০০) মিশর-শিল্পে নব নব আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়। মিশর আজও যেজন্য বিখ্যাত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে এই যুগেই সেই অতুল্য পিরামিড-শিল্পের সূত্রপাত। সুধু স্থাপত্য বলিয়া নয়, মিশরীয় ভাস্কর্য্যের যে-সকল চমৎকার নমুনা আজ-পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে, তাহার বেশীর ভাগই এই সময়ে তৈয়ারি হয়। তা-ছাড়া এ-যুগের চিত্রকলাও অনেকটা নিখুঁত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই পিরামিড-যুগে মিশরের ভাস্কররা রাজা-রাজড়া ও রাজকীয় পদস্থ কর্ম্মচারীদের যে মূর্ত্তিগুলি গড়িয়াছিল, তার চেয়ে ভাল প্রতিমূর্ত্তি মিশরে পরবর্ত্তী যুগেও আর গঠিত নাই। পরযুগের শিল্প হয়ত এ-যুগের চেয়ে সূক্ষ্ম, শ্রীমৎ ও প্রাণরঞ্জক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তেজে, স্ফূর্ত্তিতে ও ভাবে-ভঙ্গীতে এই পিরামিড-যুগের আর্ট অগ্রগণ্য।

এর পরে মিশর-শিল্পে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আর-কখনো আসে নাই।

মিশরের ভাস্কররা ধাতু, পাথর, কাঠ, হাতীর দাঁত ও মাটি প্রভৃতি নানা জিনিষ দিয়া বিবিধ মূর্ত্তি গঠন করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সমস্ত মূর্ত্তিই বুঝি একছাঁচে ঢালা। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই তাহাদের ভিতরকার তফাৎটা ধরা পড়িয়া



১ম চিত্র—কেরাণী

যায়। প্রাচীন সম্রাটদের আমলে যে-সকল মূর্ত্তি গড়া হইত, সেগুলি অনেকটা স্বাভাবিক, খর্ব্ব ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। ঐ সময়কার "কেরাণী"র যে মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে, মানব-দেহ গঠনে তাহার নির্ম্মাতার যে কতটা নিপুণতা তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর আদেশে কেরাণী শ্রুতিলিখন লিখিতে বসিয়াছে, মূর্ত্তির এ ভঙ্গীটি শিল্পী বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মূর্ত্তিটির মুখে শিল্পী যদি প্রাণের ছাপ আর-একটু বেশী

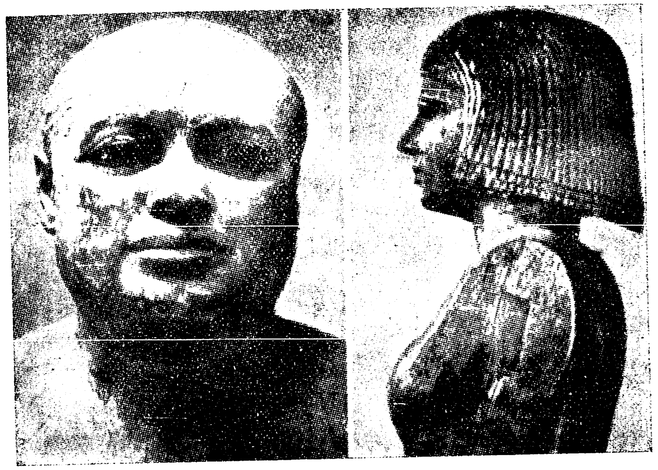

২য় চিত্র—নগরাধ্যক্ষ ৩য় চিত্র—রমণী-মূর্ত্তি

করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে এটি শিল্পের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইত।

এই প্রাচীন যুগের আরো-কয়েকটি খ্যাত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্র) "নগরাধ্যক্ষে"র মূর্ত্তিটি বেশ তৈয়ারি। ইহার ঠোঁট ও চিবুক বেশ স্বভাবসঙ্গত; চোখের আকারও ভাল, কিন্তু তামার উপরে কাঁচ ও পাথরের তারা সাইয়া চোখের স্বাভাবিকতা নষ্ট করা হইয়াছে। তৃতীয় চিত্রে যে রমণী-মূর্ত্তিটি দেখা যাইতেছে, তাহার ভগ্নদশার মধ্য হইতেও রূপের আলো ছাই-চাপা আগুনের মত স্বপ্রকাশ। ইহার সুডৌল মুখের ফের ও দেহের মধুর ভঙ্গিটি অতি চমৎকার। একালের কোন শিল্পীও যদি এ মূর্ত্তিটি গড়িতেন, তবে তাঁহার খাতির নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইত! রাজা খাফ্‌রার প্রতিমূর্ত্তি মিশরের আর্টের একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। এ মূর্ত্তিতে রাজোচিত মহিমা এতটা স্পষ্ট যে, তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্রাজ্যের মধ্যযুগে শিল্পীরা একটু বেশী লম্বাটে মূর্ত্তি গড়িত; মূর্ত্তির গড়নে আর তেমন দৃঢ়তার ভাব থাকিত না। শিল্পীরা তখন একটা তরল সৌন্দর্য্যকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।



৪র্থ চিত্র— রাজা খাফ্‌রা

নব সাম্রাজ্যে এই তরল সৌন্দর্য্যের ভাবটা আরো-বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে মিশর দেশে এক নবতন্ত্রের শিল্পী আত্ম-প্রকাশ করিলেন; তাঁহারা গতযুগের চল্‌তি রীতি ছাড়িয়া এক-পা নড়িতেন না; কারিকরিতে তাঁহাদের হাত যেমন পাকা ছিল, ভাব জাহির করিতে তাঁহারা ছিলে তেমনি কাঁচা।

Saite যুগে (Saisএর ফ্যারোয়াদে রাজত্বে), ৭২০—৫২৫ খৃঃ-পূঃ বৎসরে মিশ শিল্পে আবার প্রাচীন যুগের প্রভাব আসি পড়ে। মিশর-শিল্পে ইহা

যুগ। এ-সময়ে মিশরবাসীরা আপনাদের জাতীয় শিল্প হইতে সকলরকম বিজাতীয় প্রভাব দূর করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। Saite যুগের মিশরীয় আর্টের আদর্শ



৫ম চিত্র—একটি মূর্ত্তির মুখ

কিরূপ ছিল, পঞ্চম চিত্রের মূর্ত্তিটি দেখিলেই তাহা জানা যাইবে।

নানাযুগের নানা আদর্শের কলাবিদ মিশরের ললিত কলার ছাঁচ ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছিল। সে-সমস্ত কথা এখানে সবিস্তারে বলা চলিবে না। তবে মিশরের ভাস্করদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা এখানে কিছু-কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার সময়ে যখন নিখুঁত সত্যতার দরকার, মিশরীয় কলাবিদরা তখন আপনাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ও শিক্ষিত হস্তের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়াছেন। মিশরের সমাধিমন্দিরে একসময়ে শবাধারের উপরে মৃত ব্যক্তির প্লাষ্টারের প্রতিকৃতি রাখা হইত। ৬ষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম চিত্রে এই শ্রেণীর কয়েকটি মুখ দেওয়া হইল। ষষ্ঠ চিত্রে এক-জন সতর্ক ও গম্ভীর লোকের মুখ। সপ্তম



৬ষ্ঠ চিত্র—প্লাষ্টারের মুখ

চিত্রের মুখটি যেমন মোহনীয় ভাবে-ভরা, তাহার ওষ্ঠাধরের মৃদুমৃদু হাসির লীলা ও কপোলের রেখাগুলিও তেমনি চমৎকার; —এ মুখখানিতে মৃতের ব্যক্তিত্ব যতদূর ফুটিবার, ফুটিয়াছে। শবাধারের মধ্যে রক্ষিত মৃতদেহের মুখাকৃতির সঙ্গে এই মৃৎনির্ম্মিত মুখগুলির সাদৃশ্য যে কতটা ছিল, সপ্তম চিত্র দেখিলে তাহা স্পষ্টাস্পষ্টি বুঝা যাইবে। শিল্পী যে মানুষটিকে দেখিয়া প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া-ছিলেন, সেই বহুযুগপূর্ব্বে মৃত লোকটির মাংসহীন করোটি (Skull) শবাধার হইতে বাহির করিয়া, শিল্পীর গঠিত মুখের সামনে রাখিয়া যে ফটো তোলা হইয়াছে, অষ্টম চিত্র তাহারই প্রতিলিপি। ছবিতে বৃহত্তর যে বহিঃরেখা (Outline) দেখা যাইতেছে, সেইটিই শিল্পীর গড়া মুখ; মধ্যের গাঢ়তর রেখাটি হইতেছে মড়ার মাথার। আসল মুখ ও নকল প্রতিকৃতিতে যে কতটা সাদৃশ্য আছে, একটু ভাল করিয়া দেখিলেই



৭ম চিত্র—প্লাষ্টারের মুখ

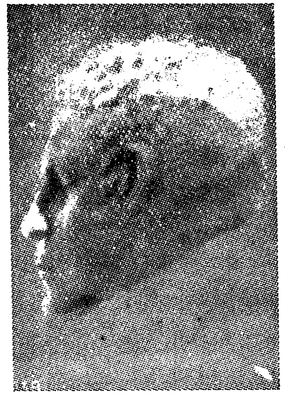

৮ম চিত্র—প্লাষ্টারের মুখ ও মড়ার মাথা

তাহা ধরা পড়িবে। হাজার হাজার বছর আগে শিল্পী যখন এই মুখটি গড়িয়াছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সুদূর ভবিষ্যতের কৌতূহলী সমালোচক আসলের সঙ্গে নকলকে এমন ভাবে মিলাইয়া তাঁহার শক্তির পরখ করিবে।

মিশরীয় ভাস্কর্য্য সময়-বিশেষে কতটা স্বভাবের অনুগমন করিত, নবম চিত্রে আমরা তাহার আর-একটি প্রমাণ দিলাম। এই ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তির মুখটি দেখিলে আমরা বুঝি যে, সেই অতীত যুগের প্রতিভাবান ভাস্করের নিপুণ হাতে পড়িয়া অমন শক্ত পাথরও ভিজে মাটির মত নরম হইয়া উঠিয়াছিল! কেমন সহজে তিনি এই মূর্ত্তিটি গড়িয়াছিলেন! বিজয়গর্ব্বিত ভাস্করের প্রাণের আনন্দই যেন এই অত্যন্ত-জীবন্ত প্রতিমার মুখের রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মিশরীয় ভাস্কর্য্যের অধিকাংশ মূর্ত্তি—মানুষের প্রতি যেন সহানুভূতি দেখাইতে নারাজ! সাধারণ মানুষের মুখে সুখ-দুঃখের, হাসি-অশ্রুর যে বিচিত্র আলোক-ছায়ার লীলা দেখা যায়, মিশরের শিল্পী আর্টে তাহার প্রকাশ খুব কমই দেখাইয়াছে।

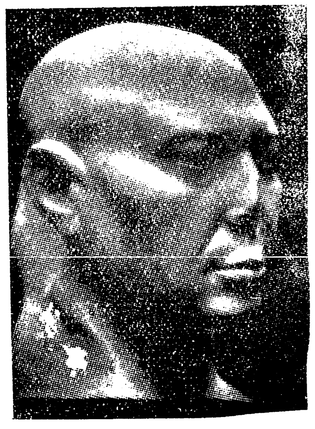

৯ম চিত্র—ভগ্নমূর্ত্তির মুখ

শিল্পীর মূর্ত্তি কখনো কথা কহে না বা কিন্তু তবু, অন্যান্য দেশের ভাস্কর্য্যে, প্রতি মুখে তাহার নীরবতার মধ্য হইতেই বাণী যে আভাস ফুটিয়া উঠে, মিশরীয় ভাস্কর্য্যে তাহা

বড়-একটা চোখে পড়ে না। মিশরীয় ভাস্কর যে-সকল মূর্ত্তি গড়িয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা যেন পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর কেহই নহে! চারিদিকে অত্যন্ত-গভীর একটা রহস্যের লুকোচুরী লইয়া, তাহারাও যেন এক-একটি মূর্ত্তিমন্ত রহস্যের মত বিরাজ করিতেছে! রহস্য-লোকের এ-সকল গম্ভীর মূর্ত্তি দেবতার মতই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বিকার! বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহাদের যেন কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই! মিশরীয় ভাস্কর্য্যের এই প্রধান ও সাধারণ লক্ষণটি, চতুর্থ চিত্রে রাজা খাফ্‌রার মূর্ত্তিতে বিশেষরূপে প্রস্ফুট হইয়াছে। ইহারা যেন অনাদি অতীতের অমর মূর্ত্তি—পৃথিবীর কত ভাবের ঢেউ ইহাদের পাষাণ পদতলে প্রহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, ইহাদের শিলা-নেত্রের স্থিরদৃষ্টির উপর দিয়াই কত মহামানব, কত মহাসাম্রাজ্য অনন্ত জীবন-সাগরে ফেনার মত বিলীন হইয়া গিয়াছে, তবু ইহারা একটুও চপল হয় নাই, একটিও কথা কহে নাই! বর্ত্তমানের তটে দাঁড়াইয়া নশ্বর মানব আমরা,—আমাদের তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

"যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে!
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার,—

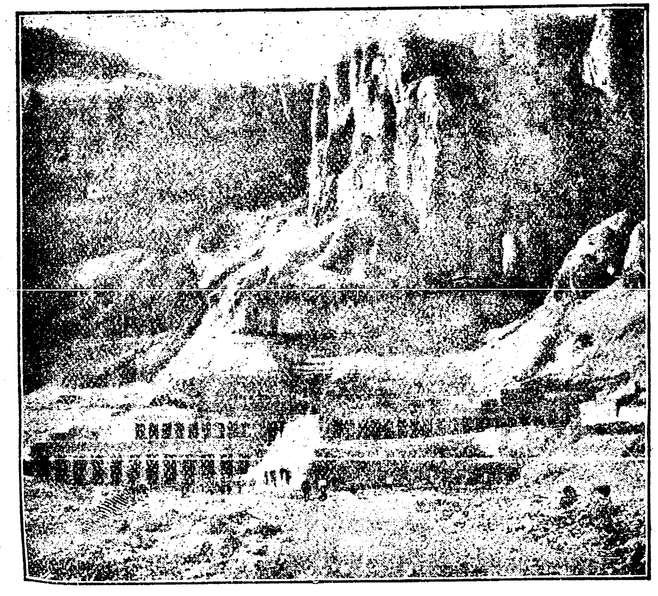

১০ম চিত্র—থিব্‌সের মন্দির

তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন !
তুমি তারে কোথা লও !
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও !"

মিশরীয় আর্টের প্রধান ধর্ম্ম হইতেছে, স্থায়ীত্ব। মিশরের প্রকৃতির মধ্যেও সর্ব্বত্র এই স্থায়ীত্বের ভাব দেখা যায়। এখানকার সুকঠিন গ্রেনাইট প্রস্তর যেমন চিরস্থায়ী, অতি-দুর্ব্বল গাছ-গাছড়াগুলিও তেমনি ঋতুর শুষ্কতার জন্য সহজে নষ্ট হয় না। এমন স্থিতিশীল প্রকৃতির কোলে মানুষ হইয়া, মিশরবাসীর অন্তঃপ্রকৃতিও ক্ষণিক কোন-কিছুর ধারণা করিতে পারিত না। তাহাদের হাতের গড়া পিরামিড ও গ্রেনাইট প্রস্তরের সমাধি-মন্দিরগুলি (দশম চিত্র দেখুন) তাই দৃঢ়তায় কালজয়ী, প্রকাণ্ড স্তম্ভবিশিষ্ট বিরাট দেবালয় যুগ-যুগ ধরিয়া সমানভাবে তাই আকাশের শূন্যতার অনেকখানি পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মানুষ মরিলে তাহার প্রাণহীন দেহকে সংসার হইতে মুছিয়া ফেলিতে আমরা শশব্যস্ত হইয়া উঠি ; কিন্তু মিশরবাসীরা সে দেহকে চিরস্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করিত। কাল-সাগরের ক্ষণভঙ্গুর বালুকা-বেলায় দাঁড়াইয়া, জগতের আর কোন জাতি নশ্বরতার বিরুদ্ধে এমন প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই—লয়কর্ত্তার তর্জ্জনী-শাসনকে এমন ভাবে উড়াইয়া দিতে পারে নাই !

মিশরের ভাস্কররা চল্‌তি রীতির মায়া এড়াইতে পারিতেন না, এ-কথা আগেই বলা হইয়াছে। এই সকল রীতির ভিতরে অনেকগুলি এত সাধারণ যে, দর্শকের উপভোগে তাহারা বাধা দেয়। প্রথম :—চলন্ত বা অচল, বসা বা দাঁড়ানো—সকল মূর্ত্তিই সামনের দিকে ফিরিয়া থাকে। তাহারা সকলেই সরল ভঙ্গীতে আছে—কেউ ডাইনে বা বাঁয়ে একটু হেলেও না দুলেও না। দ্বিতীয় :—সচল-অচল সকল মূর্ত্তি একেবারে পায়ের চেটোর উপর ভর দিয়া থাকে ; এমন মূর্ত্তি দুর্লভ, যাহার এক পা সম্পূর্ণভাবে মাটির উপরে, আর এক পা আল্‌গোছে মাটিকে ছুঁইয়া আছে। পুরুষমূর্ত্তিগুলি সচরাচর সচল এবং তাহাদের বাঁ পা-খানিই আগে আগানো ; কিন্তু স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি প্রায়ই অচল, তাহাদের পা-দুটি এ-ওর সঙ্গে যুড়িয়া মিলিয়া থাকে।

মিশরের আর্টিষ্ট এই-সব বাঁধা গতের এতটা ভক্ত ছিল যে, শেষাশেষি যখন তাহারা গ্রীক ও রোম্যান প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনো আপনাদের মুদ্রাদোষ ছাড়িতে পারে নাই। তাহাদের হাতের তৈয়ারি,—দেহের গড়ন-হিসাবে স্বভাবসঙ্গত—অনেক মূর্ত্তিও ঐ-সব উদ্ভটতার জন্য অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। মিশরের মত দেশের আর্টেও পুরাকালের কতকগুলি অসম্পূর্ণতা শেষ-বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। সভ যত উন্নত হয় মানুষের চিত্তও তত শি ও অভিজ্ঞ হইয়া উঠে। মিশর-শি ঐতিহাসিক কালেও পৌরাণিক এবং প্রাথমিক যুগের অপূর্ণতা থাকিত না—সেখানকা শিল্পীরা যদি পুরাতনের সংকীর্ণতা বর্জ্জ করিয়া নূতনের স্বাধীনতাকে গ্রহণ করিত। কিন্তু, মিশরদেশে তা হয় নাই। তাই ঐতিহাসিক কালের প্রথম মুখে সেখানে

ললিত কলার যতটা উন্নতি হইয়াছিল, শেষমুখে আর ততটা হইল না ;—বেশীর ভাগ, নব-যুগের 'সাত নকলে' প্রাচীন যুগের 'আসলও খাস্তা' হইয়া পড়িল।

ভাস্কর্য্য অপেক্ষা স্থাপত্য-কার্য্যেই মিশর-বাসীরা দক্ষতা দেখাইয়াছিল বেশী। প্রাচীন মিশরের পিরামিড, মন্দির ও স্ফিংস্ দেখিয়া পৃথিবীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সকল সভ্য জাতি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান। মিশরের স্থাপত্য-শিল্প এতটা প্রসিদ্ধ ও সকলকার এতটা পরিচিত যে, এখানে তাহার আলোচনা দরকার মনে করি না।

মিশরে চিত্র-শিল্পেরও চর্চ্চা হইয়াছিল। কিন্তু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মত চিত্র-শিল্প বেশীদিন স্থায়ী হয় না বলিয়া, মিশরীয় চিত্রের অখণ্ড সৌন্দর্য্য দেখিবার সুযোগ এখন আর নাই। তবে, মিশরের স্থাপত্য —এমন-কি ভাস্কর্য্যের আদর্শও, যতটা উন্নত হইয়াছিল, তাহার চিত্রশিল্প যে ততটা উঁচুতে উঠিতে পারে নাই, নষ্টাবশিষ্ট চিত্রমালার নমুনা দেখিয়া এটুকু অনায়াসে কল্পনা করা যায়। মিশরের ভাস্কর্য্যে তবু কতকটা স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু চিত্রের মধ্যে সেটুকুও দেখা যায় না। মিশরবাসীরা ছবিকে লেখা বলিয়া ভাবিত মাত্র ; (Egyptian paintings must in fact, be looked upon as picture-writing, and the pictures are nothing more than enlarged hieroglyphics.) লেখার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই সে-সব ছবির আর বড়-বেশী সার্থকতা থাকিত না ; হয়ত এই জন্যই মিশরের চিত্র-শিল্পের পরিণতি আশানুরূপ হয় নাই। শিল্পী ও শিল্পসমালোচক পয়েণ্টার তাঁহার Classic and Italian Painting নামক পুস্তকে তাই বলিয়াছেন :—"The art of Egypt was in many respects so primitive, and so trammelled by its peculiar formalism, that it belongs rather to the domain of archaeology than of aesthetics."

মিশরের চিত্রশিল্প যে তাহার ভাস্কর্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন, এ-কথা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বে মিশরের পটুয়ারা



১১শ চিত্র—দুটি হাঁস

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ব্যবহারের পাত্রাদির উপরে যে-সকল ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার কতক-কতক এখনো টিকিয়া আছে। সে-সব ছবি উঁচুদরের নয় বটে, তবু, সেগুলি দেখিলে পুরাকালের মিশরীয় চিত্রকলার কিছু-কিছু আন্দাজ পাওয়া যায়। পিরামিড-যুগে মিশরীয় চিত্রশিল্প যে বেশ উন্নত হইয়াছিল, একাদশ চিত্রে তাহার একখানি প্রতিলিপি দেখিলে সে-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। এই ছবিখানি Medum এর বিখ্যাত ভিত্তি-দৃশ্য হইতে



১২শ চিত্র—সমাধি-ভবনের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবি ও চিত্রাক্ষর।

সংগৃহীত। চিত্রলিখিত হাঁসদুটির সচ্ছন্দ ভঙ্গী খুব সুন্দর; ইহাদের ভিতরে গতির আভাসও আছে। মধ্যযুগে মিশরের চিত্রমালা কেমন ধারা ছিল, তাহার কোনরকম নমুনা আজ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজবংশের আমলে মিশরের চিত্র-কলার চর্চ্চা হইয়াছিল যথেষ্ট। এই সময়ে সমাধি-গৃহ ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত করিবার প্রথা উঠিয়া যায়; ভাস্কর্য্যের বদলে সমাধিগৃহের দেওয়ালে ছবি-আঁকা প্রথার চলন হইল। (দ্বাদশ চিত্র দেখুন) আধুনিক রাজবংশের সময়ে Akhenatenএর রাজত্ব-কালে মিশর-দেশে চিত্রকলার অধিকতর উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল। এতদিন মিশরীয় চিত্রকররা যে-সব মূর্ত্তি আঁকিত, তাহাদের ভাব-ভঙ্গী ধরা-বাঁধা, একছাঁদের ও এক-ঘেয়ে হইত। কিন্তু Akhenatenএর সময়ে দু-একজন চিত্রকারী প্রথার বাঁধন কাটিয়া স্বাধীনতার মন্ত্রগ্রহণ করেন; তাঁহারা ছবির মূর্ত্তিগুলিতে যে ভঙ্গিমা দিলেন, নির্দ্দোষ না হইলেও মিশরীয় চিত্রকলায় তাহা একেবারে নূতন। (ত্রয়োদশ চিত্র) আগেই বলিয়াছি, মিশরের ভাস্কর্য্যেই হোক্ আর চিত্রেই হোক্, সকল মূর্ত্তিরই দেহ ফিরানো থাকিত সুমুখ দিকে। নূতনদলের চিত্রকররা এরূপ খোসখেয়ালী উদ্ভটতা পরিহার করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিশরদেশে এই নূতন দলের প্রভাব ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল।



১৩শ চিত্র—বাজী

মিশরের চিত্রকরদের রেখা-চিত্রে দক্ষতা ছিল অপূর্ব্ব। চিত্রকলার এ-দিকটি তাহাদের হাতে যেরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা আশাতীত। (চতুর্দ্দশ চিত্র দেখুন) তুলিকার এক-একটি নিপুণ আঘাতে তাহারা মূর্ত্তির এক-একটি অংশ একেবারে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিত; সময়ে-সময়ে একটানে তাহারা একটি সমগ্র মূর্ত্তিও আঁকিয়া তুলিতে পারিত। রেখার এমন কারিকরি দেখিলে একালের অনেক আর্টিষ্টকেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে। সুধু তাই নয়, সে রেখাগুলি এতটা অবাধ, জোরালো অথচ পেলব ও ছন্দমধুর হইত যে, দেখিলেই প্রাচীন যুগের সুপটু শিল্পীর নিপুণ আঙ্গুলগুলিকে ধন্য ধন্য করিতে হয়! চতুর্দ্দশ চিত্রে চারি-জাতীয় লোকের চারিটি মুখের রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রথম মুখ লিবিয়ান জাতীয়, দ্বিতীয়টি আবিসিনিয়ান, তৃতীয় সিরিয়ান ও চতুর্থ নিগ্রো। চারিটি মুখেই চারি



১৪শ চিত্র—চারিটি মুখ

জাতির বিশেষত্ব চমৎকার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মিশরদেশে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধাতুনির্ম্মিত শিল্পকার্য্য রঞ্জিত হইত না বটে, কিন্তু পাথরে-গড়া বেশীর ভাগ মূর্ত্তির উপরেই রং লেপিয়া দেওয়া হইত। এমন-কি কেহ কেহ বলেন যে, স্ফিংস্ প্রভৃতি দৈত্যের মত মস্ত মস্ত মূর্ত্তির উপরেও পটুয়ারা তুলিতে করিয়া রং বুলাইত। প্রাচীন মিশররাসীরা রং চং ভারি পছন্দ করিত। তাহাদের বাসগৃহের, কবরের ও দেবালয়ের ভিতরে-বাহিরে যেখানে-সেখানে ছবি ও ছবির হরফ দেখা যায়। তাহাদের ব্যবহারের ঘরসাজানো জিনিষগুলি পর্য্যন্ত চিত্রিত না হইলে সম্পূর্ণ হইত না। মিশরের যেদিকেই চাওয়া যায় সেইখানেই রঙ্গের লীলা।

মিশরীয় চিত্রশিল্পের কতকগুলি বিশেষত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই বিশেষত্বগুলি অধিকাংশ স্থলেই অসম্পূর্ণতা এবং অনভিজ্ঞতার নামান্তর। ছবির প্রধান মূর্ত্তিগুলির আকার প্রায়ই ডাগর হইত, তাহাদের পাশাপাশি অন্যান্য মূর্ত্তিগুলিকে প্রধান মূর্ত্তির তুলনায় অত্যন্ত খাটো করিয়া আঁকা হইত। (১৫শ চিত্র দেখুন) ছবিতে আলোক-ছায়া বা পারিপ্রেক্ষিত,—এ'সব কিছুই থাকিত না। 'পারস্‌পেক্‌টিভ' না থাকার দরুণ মিশরীয় চিত্রপট দেখিতে হইত ঠিক মানচিত্রের মতন। পাশাপাশি দুটি লোক থাকিলে একটি লোকের উপরে আর-একটি লোককে আঁকা হইত; ম্যাপে যেমন নানাদেশের নাম চারিদিকে ছড়ানো থাকে, যুদ্ধ দৃশ্যে সৈন্যসামন্তদের মূর্ত্তিগুলিও তেমনি ছাড়া-ছাড়া ভাবে এদিকে-ওদিকে ছড়াইয়া থাকিত।

মিশরীয় চিত্রকররা যখন জীবজন্তুর ছবি আঁকিত, তখন কিন্তু তাহারা এ



১৫শ চিত্র—নিমন্ত্রণ-বাড়ী

উদ্ভট অস্বাভাবিকতার পরিচয় দিত না। আর্টের প্রথম অবস্থা হইতেই মিশরে জীবজন্তুর মূর্ত্তিগুলি হইত জীবনে, স্ফূর্ত্তিতে, তেজে ও সঙ্গতভাবে পরিপূর্ণ। জীবজন্তুর মূর্ত্তি যাহারা এমন নিপুণ হাতে আঁকিয়াছে, মানুষ আঁকিতে বসিয়া তাহারা এত ছেলে-খেলা করিয়াছে কেন? ইহার উত্তরে একজন সমালোচক বলেন, "মিশরীয় চিত্রকররা যদি নরমূর্ত্তি আঁকিবার সময়ে চলিত নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর্টকে হয়ত তাঁহারা নির্দ্দোষ এবং পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিতেন।" চিত্রকরদের পরাধীনতার বোধ হয় আর-একটা কারণও আছে। মিশরের শক্তিশালী পুরোহিত-সম্প্রদায় হয়ত চিত্রকে লিখন-কার্য্যের গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ রাখিতে চাহিতেন; ছাড়া পাইলে সৌন্দর্য্যভক্ত চিত্রকররা পাছে তুলিকে আর কলম বলিয়া মানিতে না চায়, সেই ভয়ে তাঁহারা শক্ত নিয়মের বাঁধনে পটুয়াদের হাত-পা আচ্ছা-করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ ধারণার কারণ এই যে, শিল্পীদের শক্তির অভাবই মিশরীয় চিত্রকলার সংকীর্ণতার হেতু হয়; কেননা, শিল্পীরা যে শক্তিধর ছিল তার ঢের প্রমাণ আছে। সুতরাং একটা ও প্রভাব যে শিল্পক্ষেত্রের বাহির হইতে তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মিশরের চিত্রকররা যে-সব রং ব্যবহার করিত, তাহা খুব সাদাসিধে বটে; কিন্তু দেখিতে এমন সুন্দর যে চোখ-মন মোহিত হইয়া যায়। সাদা বা হল্‌দেটে জমির উপরেই সচরাচর ছবি আঁকা হইত।

প্রাচীন মিশরে চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের যে বীজ মুকলিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হইলেও সর্ব্বাগ্রগণ্য; কেননা, উন্নত ললিত কলার জন্য আধুনিক য়ুরোপ প্রাচীন মিশর-ভূমির নিকটে সকল দিকেই ঋণী। গ্রীসের প্রাথমিক ললিত কলার উপরে মিশরের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। মিশরের আর্ট না থাকিলে গ্রীসের আর্ট, সামনে কোন-রকম আদর্শ দেখিতে পাইত না। আর্টের যে মুকুল মিশরভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, গ্রীস দেশে তাহাই বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইয়া বিশ্বের মনোহরণ করিয়াছিল। মিশরবাসীরা গৃহের ছাদ ও ভিত্তিতে যে চিত্রিত অলঙ্কারের নমুনা রাখিয়া গিয়াছে, আজ এত সহস্র বৎসর পরেও য়ুরোপের আধুনিক শিল্পীরা তাহার অবিকৃত অনুকরণ করিতেছে। কলিকাতার ধনীরা জানেন না, অথচ তাঁহাদেরও অনেকের গৃহভিত্তি বা গৃহছাদ ঈষৎবিকৃত মিশরীয় আদর্শেই অলঙ্কৃত হয়। তাই Apollo'র লেখক S. Reinach বলিয়াছেন, "After monumental architecture, of which they set the example, the greatest gift of the Egyptians to art was their system of decoration."

এমনি নানা গুণে গুণী বলিয়াই, প্রাচীন মিশরের কলাবিদরা শিল্পজগতে অমর হইয়া আছে। তাহাদের খুঁৎ আছে ঢের,—অপূর্ণতা আছে যথেষ্ট; কিন্তু এই দোষ-ত্রুটির জন্য মিশরের আর্টকে অবহেলা করিলে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

পৃথিবীর ললিতকলা আজ অনেকদিকে দরিদ্র হইয়া থাকিত। দোষে-গুণে মিশরের আর্টিষ্ট অতুল্য এবং বরেণ্য; তাহাদের সম্বন্ধে সমালোচক তাই বলেন, If they made a mistake, they at least 'sinned splendidly.'

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

তোড়া

সহর

সদাই ছোটা, মাইনে মোটা,
পাশের বাড়ী, অরুণ ওঠা;
সভায় জোটা, কথার টোটা,
মোটার-গাড়ী, আমোদ লোটা।

পল্লী

গোরুর ঘর, পাটের দর,
কুঞ্জবন, ভূতের ডর;
'মরবি মর্,' 'ছুঁস্‌নে সর্'
ক্ষুদ্র মন, বেজায় জ্বর!

বৌ

সিঁথায় সিঁদুর, হস্তে শাঁখা,
শান্ত মধুর, আস্তে ডাকা।

শাশুড়ী

বৌকে তাড়া, মেজাজ কড়া,
সবার-বাড়া, গল্প-গড়া!

মেসের ছেলে

সাজ-গোছ, কৈ কৈ!
সঙ্গীত, হৈ-চৈ!

হিন্দু

মন্দির, পেরণাম,
আশ্বিন, ধূমধাম!

বামুন-পণ্ডিত

বেলপাতা, দক্ষিণা,
থান-ধুতি, উন্-পিনা,
বকপাখী, জাত-মান,
খুঁৎখুঁৎ, নির্ব্বাণ!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

শয়তানের হাত

(গী দে মোপাসাঁ)

মাস-আষ্টেক আগেকার কথা। এক বন্ধুর বৈঠকখানায় আমরা ক-জন বসে-ছিলুম। ভর্‌সন্ধ্যা; সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন; মাঝে মাঝে মদও চলছিল। আমরা সবাই সাহিত্য আর আর্ট নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছিলুম।

হঠাৎ আমার এক প্রাণের বন্ধু [illegible] মুড়্ করে ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঢুকেই সে বলে উঠল, "বল দে আমি কোথা থেকে আসছি?"

আমাদের যার যা মনে হোল, বলে দিলুম

"ছুয়ো, তোমরা কেউ আন্দাজ করতে বলে না! আমি গিয়েছিলুম দেশে—খানে সপ্তাহ-খানেক থেকে এই মাত্র রে আসছি। আসবার সময়ে আমি সঙ্গে রে কি এনেছি জান? শয়তানের হাত!" এই বলে বন্ধু তার কাপড়ের ভিতর কে মানুষের একখানা কাটা হাত বার রলে! হাতখানায় কোন-রকম রাসায়নিক ধ মাখানো হয়েছে—তাই তাতে পচ্ ধরেনি। কিন্তু দেখতে সেটা কী ভয়ানক!—ালো, শুক্‌নো, লম্বাটে, কুঁচকে-পড়া! ীগুলো ফুলো-ফুলো, শক্ত;—তার উপরে র্চমেণ্ট কাগজের মতন একখানা পাতলা, াকাশে চামড়া; সরু-সরু হল্‌দে নখ-লা একখানা আঙুলের ডগায় লেগে য়েছে; দেখলেই মনে হয় এ হস্তের যে ধিকারী ছিল, সে একজন নররূপী তান!

বন্ধু বল্‌তে লাগল, "আমাদের দেশে ক বুড়ো যাদুকর ছিল, সম্প্রতি সে পটল লছে। এবার গিয়ে দেখি, তার জিনিষ-ত্রগুলো নিলাম হচ্ছে। সেই নিলামে এই হাতখানা কিনেছি। এ হাতটাকে খুব সাবধানে, খুব তোয়াজে রাখত। ক একটা খুনের হাত—ফাঁসীতে রেছে। উপর-উপরি দু-বার নিজের ধ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে সে য় হয়। তারপর—ফাঁসী যাবার আগে কত মানুষ মেরেছে, কত ঘর-দোর য়ে দিয়েছে, কত সতীর সর্ব্বনাশ করেছে, আর হিসাব হয় না।"

আমরা সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, "কিন্তু এই বিদ্‌কুটে জিনিষটা নিয়ে কী করতে চাও তুমি?"

—"ওহো! এটা আমি সদর-দরজার ঝুলিয়ে রাখব! পাওনাদার বেটারা টাকা-টাকা করে ভারি জ্বালায়—এটা দেখলে ভয়ে তারা আর আমার কাছে ঘেস্‌বে না!"

নেশায় চুর্‌চুরে হয়ে আমার আর-এক বন্ধু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে উঠল, "হুঁ-হুঁ, এ তামাসা নয়! পীয়ের, ভাল চাও ত মানে-মানে এ হাতখানাকে এইবেলা কবর দিয়ে এস—নইলে, কোন্‌দিন দেখবে যার এ হাত, সে নিজে এখানাকে আবার দখল করতে এসেছে। জান ত, কথায় বলে 'যে একবার খুন করেছে সে আবার খুন করবে'!"

—"আর, যে একবার মদ খেয়েছে সে আবার মদ খাবে!"—এই বলে একজন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ভর্‌তি এক গেলাস 'পাঞ্চ' সেই গম্ভীর মাতালটির হাতের কাছে এগিয়ে দিলে। সে ঢক্ করে এক চুমুকেই গেলাসটি সাবাড় করে ফেল্‌লে; তারপর মাটিতে পড়ে মার্ব্বেলের মত ঘরময় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

পীয়েরও এক গেলাস মদ ঢেলে খুনের সেই হাতখানাকে সম্বোধন করে বললে, "ওহে, আমি তোমার মনিবকে নেমন্তন্ন করলুম,—সে মহাপ্রভুকে আমার কাছে আসতে বোলো!"

তারপর, আমরা অন্য কথা তুললুম।

পরদিন বাড়ী ফেরবার মুখে একবার পীয়েরের বাড়ীটা হয়ে এলুম। মুখে একটা

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সিগারেট গুঁজে, বসে বসে সে বই পড়ছিল।

—"কি হে, কেমন?"

—"উত্তম!"

—"সে হাতখানার খবর কি?"

—"আসবার সময় দেখেছ ত, হাতখানা আমি দরজার কড়ায় ঝুলিয়ে দিয়েছি? কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, হাতটাকে আনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে!"

—"কি-রকম—কি-রকম?"

"কাল রাত যখন বারোটা, তখন কে আমার দরজার কড়া ধরে ক্রমাগত নেড়েছে! দু চারবার নাড়তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি 'কে—কে' বলে বারকতক সাড়া দিলুম, কিন্তু জবাব পেলুম না। বোধহয় পাড়ার কোন দুষ্টু ছেলে—কি বল?"

এমন সময় বাড়ীওয়ালা এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই সে মহা খাপ্পা হয়ে আমার বন্ধুকে বললে, "মশাই, দরজার কড়া থেকে হয় আপনি ঐ পচা হাতখানা সরিয়ে ফেলুন, নয় এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যান! এ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড!"

পীয়ের ভারিকে হয়ে জবাব দিলে, "মশাই, আপনি ও হাতখানাকে অনর্থক অপমান করবেন না। মনে রাখবেন, যার ও হাত, তিনি একজন খাঁটি ভদ্রলোক! অপমান করলে তিনি চটে আপনাকে দেখা দিলেও দিতে পারেন। সুতরাং—সাবধান!"

বাড়ীওয়ালা এ ঠাট্টাটা বোধহয় মোটেই পছন্দ করলে না; কারণ সে আর উচ্চ-বাচ্য না করে সেখান থেকে সিধে সরে পড়ল।

পীয়েরও তার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে গিয়ে হাতখানা সদর-দরজা থেকে খুলে নিয়ে এল। বিছানার পাশে, টেবিলের উপরে চাকরদের ডাকবার একটা ঘণ্টা ছিল। হাতখানা সেইখানে রেখে পীয়ের বললে, "গোলমালে কাজ নেই, হাতটা এখানেই থাক্। রোজ ঘুমোবার আগে এটাকে দেখলেই আমার মনে পড়বে—'জন্মিলে মরিতে হবে'!—এ একটা মস্ত উপদেশ!"

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

সে রাত্রে আমার ভাল করে ঘুম হোল না; থাকি থাকি, চমকে উঠি; একবার মনে হোল, আমার ঘরে যেন কেউ এসে ঢুকে পড়েছে! তাড়াতাড়ি উঠে আমি খাটের তলাটা দেখে নিলুম—কেউ সেখানে ঘুপটি মেরে লুকিয়ে আছে কি না! ভোরের মুখে তন্দ্রাটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে—হঠাৎ দরজাটা বাইরে থেকে দুমদুম্ করে কে ঠেলতে লাগল! এক-লাফে নেমে দরজাটা খুলতেই দেখি, বন্ধু পীয়েরের চাকর সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে; তার মুখ ফ্যাকাশে, শুক্‌নো; গা থর্‌থরিয়ে কাঁপছে!

আমাকে দেখেই কান্নার সুরে ফুঁ ফুঁপিয়ে সে বলে উঠল, "মশাই আমার মনিবকে কে খুন করে গেছে!"

খুন!... ...চট্‌পট্ জামা-কাপড় আমি উঠ্‌তে-পড়তে বন্ধুর বাড়ীতে ছুটলুম।

সেখানে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য সকলেরই মুখে ঐ এক কথা! মহা হৈ-চৈ অনেক কষ্টে, পুলিশের কাছে নিজের পরিচয়

দিয়ে তবে আমি পীয়েরের শয়নগৃহে গিয়ে ঢুকতে পারলুম।

পীয়ের মারা যায় নি বটে, কিন্তু তার অসাড় দেহটাকে দেখে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হোল।

তার চোখদুটো অত্যন্ত বিস্ফারিত;—চোখের তারাদুটো যেন ভীষণ ও অজ্ঞাত কোন-একটা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে আছে; হাতদুটো সবলে মুঠো করা! পীয়েরের পা থেকে চিবুক পর্য্যন্ত একখানা মিশ্‌-কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল;—সেখানা একটু সরিয়ে আমি দেখলুম, তার গলায় পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ মাংসের মধ্যে গভীর হয়ে চেপে বসে গেছে; জামার উপরে ক-ফোঁটা রক্তের ছোপও লেগে রয়েছে। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল। বিছানার পাশে টেবিলটার দিকে আমি ফিরে দেখলুম,—খুনের হাতখানা সেখানে নেই! সে ভয়ানক হাতটা দেখলে লোকে পাছে ভয় পায়, হয়ত সেইজন্যে কেউ সেখানাকে চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলেছে।

সকালের খবরের কাগজে এই ব্যাপারটার রিপোর্ট বেরিয়েছিল, এখানে আমি সেটুকু ল দিলুম:—

"গত কল্য রাত্রে শ্রীযুক্ত পীয়ের বি—, নামে একজন আইনশিক্ষার্থী ছাত্রকে হত্যা করিবার জন্য কে বা কাহারা চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ যুবক ছাত্রটি কল্য রাত্রি দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ তাঁহার শয়নগৃহ হইতে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি হওয়াতে বাড়ীর চাকরের নিদ্রাভঙ্গ হয়। চাকরটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভীতভাবে প্রদীপ জ্বালে; ঘণ্টাটা মাঝে একবার থামিয়া পুনর্ব্বার এত জোরে বাজিয়া উঠে যে, সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দ্বারবানকে জাগাইয়া দেয়। শ্রীযুক্ত পীয়েরের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। অনেক ঠেলাঠেলিতেও ঘরের দরজা যখন খুলিল না, তখন থানায় খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে।

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সকলে এক শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পায়। জিনিসপত্তর চারিদিকে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া আছে,—আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর ভিতরে যে প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি হইয়াছিল—ঘরের সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় জাজ্বল্যমান। মেঝের মাঝখানে হতভাগ্য যুবকটির দেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার মুখ মড়ার মত—চোখ যেন ভয়ে আড়ষ্ট। তাহার গলার উপরে কাহার হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ। ডাক্তারের মতে যুবককে যে দুরাত্মা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার শরীরের শক্তি অমানুষিক; তাহার হাতের আঙ্গুলগুলোও অস্বাভাবিকরূপে শিরাবহুল ও শীর্ণবিশীর্ণ;—কারণ, যুবকের কণ্ঠের ভিতরে আঙ্গুলের চাপে পাঁচটি গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। অপরাধীর উদ্দেশ্য কি, এবং কাহার দ্বারাই বা এমন কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

পীয়ের-বেচারা এ যাত্রা প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু একেবারে বদ্ধপাগল হয়ে গেল। উপর-উপরি সাতমাস ধরে গারদে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

তার সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম, সে কিন্তু সহজ জ্ঞান আর ফিরিয়ে পেল না। প্রলাপের সময়ে সে হরেক-রকমের উদ্ভট কথা বলত। পাগলদের যেমন হয়ে থাকে, সেও তেমনি একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকত; সর্ব্বদাই মনে করত যে, তার ঘাড়ে একটা প্রেত চেপেছে।

একদিন গিয়ে দেখি, তার গতিক বড়ই খারাপ। আমার সামনে ঘণ্টাদুয়েক সে স্তব্ধ ও স্থির হয়ে পড়ে রইল; তারপর হঠাৎ লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে পড়ল এবং ভয়ে আত্মহারা হয়ে দু-হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"এটাকে সরিয়ে ফেল! এটাকে সরিয়ে ফেল! ওঃ! ওঃ! এ যে গলা টিপে আমায় মেরে ফেললে! বাঁচাও—বাঁচাও!"

ঘরের চারিদিকে চেঁচাতে চেঁচাতে বারদুয়েক দৌড়োদৌড়ি করে মাটির উপরে মুখ-থুবড়ে সে পড়ে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু!

পীয়েরের বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না; কাজেই সৎকারের জন্যে শব নিয়ে আমিই তার দেশে গেলুম। এই দেশ থেকেই পীয়ের সেই অলক্ষুণে শয়তানের হাতখানা নিয়ে গিয়েছিল।··· ··· ···

আজ পীয়েরের কবরের দিন।··

আকাশ পরিষ্কার নীল। বাতাসে বনে বনে মর্ম্মরোৎসব জেগে উঠেছে, আলোকে চারিদিক ভরে গিয়েছে; গাছে গাছে পাখীরা মধুর স্বরে পুরাণো দিনের স্মৃতি-গান গাইছে। মনে পড়ল, ছেলে-বেলায় এইখানে পীয়ের আর আমি কত খেলাই খেলেছি, এই মাঠে দুজনে কত ছুটোছুটি করেছি, ঐ বনের তলায় গিয়ে কত ফল কুড়িয়ে খেয়েছি!

আজকেও দেখলুম, মাটির উপরে একটা পাকা ফল পড়ে রয়েছে। আনমনে সেই ফলটি কুড়িয়ে নিয়ে মুখের কাছে ধরলুম...

পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন,—জনকতক লোক পীয়েরের কবর খুঁড়ছে। হঠাৎ তাদের কোদাল শক্ত কি-একটার উপরে পড়ে সশব্দে বেজে উঠল।

খানিক পরে লোকগুলো ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাদের ডাকতে লাগল। আমি আর পুরুত ব্যাপার কি দেখতে এগিয়ে গেলুম।

গোরস্থান খুঁড়তে খুঁড়তে তারা একটা পুরাণো কবর আবিষ্কার করেছে। এক জন কুড়ুলের ঘা মারতেই কফিনের ডালাটা গেল খুলে—সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা দেখতে পেলুম, তার মধ্যে একটা অতিরিক্ত দীর্ঘাকার কঙ্কাল উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সেই মাংসশূন্য কঙ্কালটা তখনো যেন চক্ষুহীন অক্ষিকোটর মেলে, শূন্য অথচ ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে ছিল! আমার মনটা কেমন দমে গেল; কেন জানি না, কি-একটা অজানা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা যেন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

একজন বলে উঠল, "এ কি! দ্যাখ, দ্যাখ, লোকটার একখানা হাত নেই! যে, হাতখানাও যে এর সঙ্গেই রয়েছে!" —বলে, সে কঙ্কালের পাশ থেকে একখানা দীর্ঘ, শুষ্ক ও পেশীস্ফীত কাটা হাত তুলে নিয়ে আমাদের সকলকে দেখালে!

দেখেই আমার মনে হোল, শয়তানের সেই হাতখানার কথা!····· পীয়েরের ঘর থেকে সে হাতখানা হারিয়ে গিয়েছে!...

আর-একজন ঠাট্টা করে বললে, "দেখেছ! তুমি ওর হাত কেড়ে নিয়েছ বলে ও যেন লাফিয়ে উঠে তোমার টুঁটি কামড়ে ধরবার উদ্যোগ করছে!"

পুরুত বললেন, "ভাই সব, যে মরেছে তাকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও! আর-একটা জায়গা দেখে মিঃ পীয়েরের জন্যে কবর খোঁড়ো!"

পীয়েরের শেষ কাজ শেষ হোল; সহরে ফেরবার আগে পুরুতের হাতে আমি গুটি-কয় টাকা দিয়ে এলুম,—অকালে যে নিদ্রিত আত্মার সুপ্তিভঙ্গ করেছি, তার যাতে শান্তি হয়, সেইজন্যে স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করতে!

শ্রীমতী রেণু রায়

পূর্ণতা

(Rupert Brooke)

ভাল, [illegible]ই লেখা লিখিয়া ললাটে,
[illegible] ভরি অন্তর গভীরে,
বিদায় [illegible]ছ দোঁহে ধীরে অতি ধীরে!
নিঃশব্দে [illegible]য়া আজ নিরুদ্ধ কপাটে
[illegible]ঙ্কের প্রচ্ছায় তিমিরে,
বিগ্রহ-[illegible]হীন শূন্য নিভৃত মন্দিরে
আবাহন করিতেছে, উড়ে আশা চিন্তা শত শত,
বক্ষ ছিন্ন নাহি করে তীক্ষ্ণচঞ্চু বিহঙ্গের মত,
[illegible] যারা আলোকের প্রায়, নীরবে ঘুমায়
পূর্ণ করি রজনীর আঁধার কুলায়!

[illegible]য় মন, শূন্য তোরে রাখি পল ভর,
সে শকতি নাহিক আমার,
[illegible]ই ভাবি সেই প্রেম গ্রন্থে গাঁথা যার
[illegible]ক অপার, যেথা সে চির-অমর!
পুত্রবতী নারীর জীবন,
প্রবীণের শান্তি-ভরা বিরাম-ভবন,
পরিপূর্ণ প্রাণ-বান অবারিত প্রান্তর শ্যামল,
নিশ্চিত শস্যের আশে বক্ষ যার সিঞ্চনে কোমল,
শিশুর কল্যাণ মুখ, আলোকে উন্মুখ
বর্ষণবিরত স্বচ্ছ আকাশের বুক!

নীরব প্রশান্ত স্তব্ধতা যাহার
ঘরে-ফেরা বিহগের দল,
আনন্দে ভাঙিয়া দেয় করি কোলাহল!
সঙ্গীতের সদানন্দ, যে পুণ্য সম্ভার
মরণ-অতীত অবিরল,
উদার সুন্দর শান্ত উজ্জ্বল নির্ম্মল!
ধীরে ধীরে, একে একে, বার বার নিয়ত স্মরিয়া
অমৃতের অভিষেকে লব মোর অন্তর ভরিয়া!
আজ সাধ্য নাহি আর, হৃদয়ে আমার
শূন্যতারে এক তিল দিতে অধিকার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সমালোচনা

নচিকেতা। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, আদি ব্রাহ্ম সমাজ; কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন—ভূমিকায় তিনি উপনিষদের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভাল; তবে বক্তব্য কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই, আগাগোড়া ধোঁয়াটে রহিয়া গিয়াছে! এবং তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধারণ পাঠক যে 'আলো পাইবেন', এমন সম্ভাবনা ত দেখিলাম না।

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার। দ্বিতীয় খণ্ড। সুসঙ্গ রাজবংশ। কুমার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। রামগোপালপুর রাজবাটী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা চেরী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লেখা নাই। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পরগণা ময়মনসিংহের প্রাচীন জমিদার-বংশের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল—এই খণ্ডে সুসঙ্গ রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে এই বংশের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জে সোমেশ্বর পাঠক নামে এক সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন—তিনি ৬৮৭ সালে (১২৮০ খৃঃঅব্দে) কামরূপ ও চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিবার মানসে কয়েকজন অনুচরের সহিত বঙ্গদেশে আসেন ও ক্রমে গারো পাহাড়ের নিকট বাস-স্থাপন করেন; বাইশা গারোর অত্যাচারে সে প্রদেশ তখন প্রপীড়িত—বিস্তর সাধু-সন্ন্যাসী ও ধীবর অধিবাসীর সাহায্যে সোমেশ্বর বাইশা গারোকে হঠাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাধুর পরামর্শে ও সৎপ্রকৃতিক ব্যক্তিগণের সহায়তায় এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়. ইহার নাম হয় 'সুসঙ্গ'। এই সময় হইতেই সুসঙ্গের শ্রী ও সমৃদ্ধির সূত্রপাত। এ গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল অবধি রাজবংশের কথা ধারাবাহিক বিবৃত হইয়াছে; কোথাও অবান্তর কথা বা ঝাঁঝালো উচ্ছ্বাসের কোন চিহ্ন নাই—রচনায় কোনরূপ আড়ম্বর নাই; বিচিত্র ঘটনায় স্বতঃই বেশ কৌতূহল জাগিয়া উঠে।

১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা। প্রথম বৎসর, ১৩২৩, ১১ই পৌষ। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি, এ সম্পাদিত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। এখানিকে বাঙলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের 'ডিরেক্টরী' গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইহাতে বহু বাঙলা গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের পরিচয়, মাসিক ও সংবাদ পত্রাদির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ভুল বিস্তর আছে। এ ধরণের পুস্তক যতদূর-সম্ভব নির্ভুল হওয়া দরকার —নহিলে ইহার কোন মূল্য থাকে না। তবে এই প্রথম চেষ্টা বলিয়া এবার ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া চাই। বইখানি বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ বলিয়া অ অনেক উপকারে লাগিবার সম্ভাবনা। নানা বিষয় সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানি কা হইয়াছে। এই গ্রন্থ সাধারণের কাছে বঙ্গসাহিত্য সেবীদের পরিচয় দানে এবং তাঁহাদের গ্রন্থ-প্রচা সহায়তা করিবে।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)



ব্যঙ্গোক্তি (?)

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারতী

৪১শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৪ [৩য় সংখ্যা

আলেয়ার আলো

দশ

হরেন্দ্রের কথা

মুরারিবাবু একটি বয়স্ক শিশু; অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধও বটেন, শিশুও বটেন! বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা আর শিশুর সরলতা, তাঁর চরিত্রের মধ্যে এ দুয়েরি হরি-হর মিলন হয়েছে।

আর, তাঁর প্রাণটি ত দয়ামায়ায় একেবারে কানায় কানায় ভরা! সেদিন একটি সামান্য ব্যাপারে তাঁর চরিত্রের এই কোমল দিকটি দেখতে পেয়েছি। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বসে বসে কথাবার্ত্তা কইছি, হঠাৎ আমার পিছন থেকে 'কেঁউ-কেঁউ' করে কি-একটা জানোয়ার ডেকে উঠল। কিন্তু পিছন ফিরে কিছুই দেখতে পেলুম না। খানিক পরে আবার সেই 'কেঁউ-কেঁউ' আর্ত্তনাদ,—ঠিক আমার পিছনে! আবার পিছনপানে চাইলুম—কিন্তু কিছুই নেই। আমাকে আশ্চর্য্য হোতে দেখে মুরারিবাবু কৌতুকমাখা চোখে বললেন, "কি দেখছেন?"

—"ঘরের ভিতরে কি ডাকে ও?"

—"কুকুর-ছানা।"

—"কুকুর-ছানা! কৈ, দেখতে পাচ্ছি না ত!"

—"তাকে দেখতে চান ত ঐ জামার জেবের দিকে তাকান!"

তাইত! আলনায় প্রকাণ্ড একটা 'ওভার-কোট' ঝুলছিল, তারই এক পকেটের ভিতর থেকে একটা কুকুর-ছানার ছোট্ট নাকের ডগা আর পুট্‌পুটে দুটি চোখ দ্যাখা যাচ্ছে! পকেটের কারাগারে বন্দী থাকতে নারাজ হয়ে সে ক্রমাগত ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, কিন্তু কিছুতেই বেরুতে পারছিল না!

—"অ্যাঁ, জামার পকেটে কুকুর-ছানা! এ কি ব্যাপার!"

মুরারিবাবু হাসতে হাসতে উঠে জেব থেকে তাকে টেনে বার করলেন। এটি দেশী কুকুরের বাচ্ছা, বয়স মাসখানেক হবে, গা-ময় ধূলো-কাদা মাখা।

মুরারিবাবু করুণ নেত্রে সেই অস্থিসার বাচ্ছাটির দিকে তাকিয়ে, তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "কাল সন্ধ্যে-বেলায় রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছি, এমন সময় দেখি একটা কুকুর-ছানা বৃষ্টিতে

ভিজতে-ভিজতে কাদার উপর পড়ে কেঁপে মরছে। আহা, সে এমনি কাঁদছিল যে প্রাণ যেন ফেটে যায়!—সুতরাং—"

—"সুতরাং আপনি ওকে নিয়ে এসে জামার জেবের ভিতরে পুরে ওর শীত নিবারণ করেছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। মনে করছি খাইয়ে-দাইয়ে এ বেচারীকে মানুষ করব।"

—"যতই খাওয়ান-দাওয়ান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস শেষ-পর্য্যন্ত ও কুকুরই থেকে যাবে, মানুষ কখনো হবে না মুরারিবাবু!"

—"কি আশ্চর্য্য! আপনি কি জানেন না অনেক মানুষ কুকুরের চেয়েও নীচু? যত্ন করলে কোন কুকুরই নিমকের মর্য্যাদা নষ্ট করে না—বরং তারা যে অনেক মানুষের চেয়েও বড়, সেই পরিচয়ই দিয়ে থাকে।"

মুরারিবাবুর ঠিক কথা! অপকারীকে মানুষ ভয় করে, কিন্তু উপকারীকে সে দু-পায়ে থ্যাঁৎলাতে পারলে আর ছাড়ে না। এই ত দুনিয়ার ধারা!

মেয়েটিকে নিয়ে বৃদ্ধ ভারি নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছেন। আর বাস্তবিকই ভাবনার কথা ত! তাঁর এমন-কোন আত্মীয় নেই, তাঁর অবর্ত্তমানে যিনি সরমার অভিভাবক হোতে পারেন।

আমি চাই সরমার সঙ্গে মোহনের বিয়ে দিতে। মোহনের প্রাণকে বরাবর আমি মরাগঙ্গা বলে জানতুম; কিন্তু তার প্রাণে এত-হঠাৎ প্রেমের জোয়ার যে এমন জোরে বইতে পারে, এ খেয়াল আমার মোটেই ছিল না! বেচারী একেবারে ডুবেছে! দিন-রাত আন্‌মনা, পড়া-শুনোয় মন নেই, কথায় কথায় সরমার নাম করে,—প্রেমে পড়লে মানুষের এম্‌নি হাল হয় বটে! এবারে সে একজামিন দিলেও তার পক্ষে পাশ হওয়া শক্ত কথা।

মোহন কিন্তু এদিকে বেড়ে জমিয়ে তুলেছে। সরমা আমার সামনে মুখ খুলে বেরোয় না, কিন্তু মোহনের সামনে বেরোয়, দু-চারটে কথাবার্ত্তাও কয়। সরমা পরমা সুন্দরী বটে, কিন্তু মোহনও পরমসুন্দর পুরুষ। সরমাকে দেখে মোহন যখন ভুলেছে মোহনকে দেখে সরমাও তখন ভুলবে না কেন? এ ত হৃদয়ের ধর্ম্ম! দুটি তরুণ হৃদয় যখন পরস্পরের সামনাসামনি থাকে, তখন মিলন ত স্বাভাবিক! বিশেষ, কবিও বলেছেন—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে!"

এখানেও ফাঁদ পাতা হয়েছে—শিকার পড়তে বেশী দেরি লাগবে না; ফাঁদ ব্যর্থ হবে না। তা যদি হয়, মোহনের অদৃষ্ট তবে নেহাৎ মন্দ।

মোহনকেও সেদিন এই কথাটা বললুম। সে মুচকে একটু হাসলে—কিছু বললে না।

খানিক পরে সে বললে, "হরেন, তোমারও বয়স হোল, এইবার বিবাহের চেষ্টা দ্যাখ।"

—"মাপ কর ভাই! ও বিবাহ টিবাহ আমার দ্বারা হচ্ছে না!"

—"কেন হে?"

—"ও জিনিসটিকে আমি জুজুর মত ডরাই।"

—"কারণ?"

—"অনেকগুলো বই পড়া হয়ে গেলে

পর প্রায়ই আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে, এগুলো না পড়লেই ছিল ভাল! তেমনি, অনেকগুলি বিবাহিত বন্ধুর চরিত্র অধ্যয়ন করে আমার এই দিব্য জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, যাতে-করে' সহজ মানুষের বিগ্‌ড়ে যাবার সম্ভাবনা, সে হাঙ্গাম থেকে তফাতে থাকাই যথার্থ সুবোধের কার্য্য।"

—"মানুষ তবে বিয়ে বিয়ে করে পস্তায় কেন?"

—"কারণ, বিবাহ হচ্ছে দিল্লীর লাড্ডু! কাজেই, না খেলেও পস্তাতে হয়—খেলেও পস্তাবে!"

—"এ তোমার মিথ্যা বিশ্বাস!"

—"বন্ধু, আমার মিথ্যা বিশ্বাসে আমার শ্রদ্ধা আছে। সমাজে তোমরা যাকে 'সত্য' বল, সেই 'সত্য' হচ্ছে এমন কতকগুলি মিথ্যার সমষ্টি—যেগুলিকে সব-চেয়ে সহজে বিশ্বাস করা চলে। একটু তলিয়ে দেখলেই সে-সব ভুয়ো সত্যের ভাঙ্গা ঠাট বেরিয়ে পড়ে। আমি তাই জানি, পৃথিবীতে 'মিথ্যা'র চেয়ে বড় 'সত্য' আর নেই। তোমাদের কাছে যা মিথ্যা, আমার কাছে তাই সত্য।"

—"তুমি তাহলে বিবাহ করতে চাও না?"

—"না। বিবাহ করে' আমি আমার স্বাধীনতা লোপ করতে চাই না।"

—"হরেন, তুমি ভারি স্বার্থপর ত!"

—"কিসে?"

—"যারা একলা থাকতে চায়, তারা স্বার্থপর নয় ত কি?"

—"ভাই, স্বার্থপরতার একটি মস্ত গুণ আছে; কৃতঘ্নের দংশন থেকে আমাদের সে বাঁচিয়ে রাখে।"

—"দিন দিন তুমি যেন কী হয়ে উঠছ! আমার কথার উত্তরে তোমার এই দুর্ব্বোধ দার্শনিকতা সুধু যে অসহনীয়, তা নয়—অসাময়িকও বটে!"—এই বলে মোহন রাগ করে চলে গেল।

কাল যখন মুরারিবাবুর বাড়ীর কাছে যাই—তখন দূর থেকে যেন মনে হয়েছিল, দুটো লোক মুরারিবাবুর বাড়ীর সামনে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের কাছে যেতে-না-যেতে তারা ছায়ার মত সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিশিয়ে গেল। আমি খানিকক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও আর কারুকে দেখতে পেলুম না। কিন্তু মনে-মনে কেমন-একটা খটকা লেগে রইল। সহরের এদিকটা কী নির্জ্জন! যে-কোন একটা অঘটন ঘটলেও ঘটতে পারে।

পরদিন একটু সকাল-সকাল মুরারিবাবুর বাড়ীর দিকে গেলুম। তাঁর বাড়ীর পাশেই একটা ছোট গলি ছিল,—তার ভিতরে ঢুকে চুপটি করে' ঘাটি আগলে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই গলির ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, দুটো লোক একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আপনা-আপনি কি বলাবলি করছে।

মিনিট দুই-তিন পরে তারা আস্তে আস্তে চারিদিকে চাইতে-চাইতে সতর্কভাবে এগিয়ে এল। তারপর মুরারিবাবুর বাড়ীর সদর দরজাটা একটু ফাঁক করে' ভিতর-পানে উঁকিঝুঁকি দিয়ে কি দেখতে লাগল।

কে এরা? যেই হোক্—এদের মতলোব ত ভাল নয়! নিশ্চয় এরা কোন-একটা অসৎ কাজ করবার সুবিধা খুঁজছে।

গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে, পা টিপে-টিপে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর বেশ বাগিয়ে দু-হাতে দুজনের গলা ক্যাঁক্-করে' টিপে ধরলুম।

তারা চমকে উঠল,—আমার হাত ছাড়াবার জন্যে ঝটাপটি করতে লাগল। কিন্তু আমি যখন আচ্ছা করে' এর মাথায় ওর মাথায় ঠকাঠক্ ঠুকে দিলুম, তখন তারা কেমন লোকের পাল্লায় পড়েছে বুঝতে পেরে কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্যাসের আলোর দিকে ফিরিয়ে, তাদের মুখ দেখে নিয়ে বুঝলুম, গ্যালবারে যে দুই মহাপ্রভু মুরারিবাবুর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন, এঁরা তাঁরা ছাড়া আর কেউ নন!

টিট্‌কিরি দিয়ে বললুম, "এই যে! সেবার আশা দিয়ে গিয়েছিলেন আবার দর্শন দেবেন; আপনারা কথা রেখেছেন দেখে সুখী হলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের নমস্কার করতে পারলুম না—যেহেতু আমার দু-হাতই জোড়া!"

যে লোকটার চেহারা গুণ্ডার মত, সে কাতরভাবে বললে, "ছেড়ে দিন মশাই, লাগছে!"

খুব-জোরে একটা ঠ্যালা মেরে তাকে ছেড়ে দিলুম—সে তিনহাত তফাতে ছিটকে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল।

—"ব্যাটা, তালপাতার সেপাই, কল্‌কাতায় এসেছ গুণ্ডামি করতে! যাও, আবার যদি কখনো এদিকে দেখি, আর বাঁচবে না!"—

সে কোন জবাব না দিয়ে চট্ উঠেই চোঁচা দৌড় মারলে!

অন্য লোকটিকে ব্যঙ্গ করে বললুম, "ওহে, দেখেছ! তোমার স্যাঙ্ পড়ল ঠিক লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে, পালাল ঠিক টাট্টুর মত ছুটতে ছুটতে এখন তোমাকে নিয়ে কি করা যেতে পা বল দেখি? লাথি, চড়, ঘুসি, গাঁট্টা—এর মধ্যে কোন্‌টা তুমি বেশী পছন্দ কর?"

সে মিনতি করে বললে, "আর কে আমাকেও যেতে দিন!"

মুরারিবাবুর মুখে যে জমিদারের ক শুনেছিলুম, নিশ্চয় ইনি সেই মহাপুরু জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার নাম কি?"

নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বিরক্ত ম বললে, "নামে কি দরকার? ছাড়ুন না!"

গলা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল "এখনো ঝাঁঝ! নাম বল বলচি!"

সেই এক ঝাঁকুনিতেই তার সব ঝাঁ ঠাণ্ডা হয়ে গেল! শুষ্ককণ্ঠে আস্তে আ সে বললে,—"নবীনচন্দ্র পাল।"

—"নবীনবাবু, তোমার আর-এ শিক্ষার দরকার।"—বলে আমি মুরারিবাবু চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলুম।

মুরারিবাবু বাইরে এসে, ব্যাপার দে একেবারে থ! বিস্ময়ের প্রথম চমক গেলে পর তিনি বললেন, "কি আশ্চ এযে নবীনবাবু!"

—"হ্যাঁ, আপাতত কিঞ্চিৎ কাবু!"

—"ব্যাপার কি?"

—"ক্রমে শুনবেন। আগে বা ভিতরে চলুন।"

—"আহা, ওঁর লাগছে—ছেড়ে দিন হরেনবাবু!"

—"ছাড়ব বৈকি, এ রত্নকে যত্ন করে বেশীক্ষণ রেখে লাভ নেই।"—বলে, নবীনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও টেনে-হিঁচড়ে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলুম।

সরমা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল,—আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে আড়ালে সরে যেতে গেল!—আমি কিন্তু ডেকে বললুম, "দ্রৌপদী-ঠাকরুণ, যাবেন না—দয়া করে' একটু দাঁড়াতে হবে।"

সরমা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নবীনের গলা ছেড়ে দিয়ে আমি বললুম, "নবীনচন্দ্র, যাও—ওঁর পায়ের কাছে নাকে খৎ দিয়ে, ওঁকে প্রণাম করে' বল, 'মা, আমি তোমার সন্তান, এমন কাজ আর-কখনো করব না।' গেলে না যে? যাও,—যাও বলছি!"

নবীন তবু নড়ল না—মাথা হেঁট করে' কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

—"তোমার ও পাপমুখে সহজে তাহলে মা-নাম বেরুবে না? দেখবে? আমার এ হাতের একটি—একটি মাত্র চড় খেলে তুমি কি আর বাঁচবে মনে করেছ?"—বলেই আমি চড় তুললুম।

মুরারিবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললেন, "অ্যাঁ,অ্যাঁ—করেন কি—করেন কি! কি আশ্চর্য্য! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—আহা, আমার মায়া হচ্ছে!"

—"যে মা বলতে জানেনা তাকে মায়া করলে মায়ার বাজেখরচ হয় মুরারিবাবু! নবীন, এখনো যা বলছি কর!"

সে আস্তে আস্তে আড়ষ্টভাবে সামনের দিকে হেঁট হোল।

—"দাও নাকে খৎ! আচ্ছা; প্রণাম কর! আচ্ছা; বল 'মা, আমি তোমার সন্তান, এমন কাজ আর-কখনো করব না'!"

নবীন বিড়্‌বিড়্ করে আমার কথা আবৃত্তি করতে লাগল।

আমি বললুম, "ওতে হবে না—চেঁচিয়ে, ভাল করে বল!"

সে চেঁচিয়ে আবার বলতে লাগল—"মা, আমি তোমার সন্তান, এমন কাজ—"

দেখলুম, সরমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে হাসির লহর বহে যাচ্ছে; শেষটা আর থাকতে পারলে না—নবীনের কথা ফুরোবার আগেই মুখে কাপড় দিয়ে কোনরকমে হাসির বেগ থামিয়ে সে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। তারপর ঘরের ভিতর হোতে শুনতে পেলুম, তার চাপা হাসির অস্ফুট উচ্ছ্বাস!

নবীন মুখ চুণ-করে' দাঁড়িয়ে আছে দেখে মুরারিবাবু আস্তে-আস্তে তার কাছে গেলেন। তারপর দুহাতে তার একখানা হাত চেপে ধরে মমতা-মাখানো গাঢ় স্বরে বললেন, "নবীনবাবু, কিছু মনে করবেন না!"

নবীন আর সামলাতে পারলে না—অপমানে, দুঃখে বিহ্বল হয়ে সে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল, চোখের জলে তার বুক ভেসে গেল।

আমারও তার উপরে কেমন দরদ হোল; মনের ঝোঁকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি, হাজার-হোক ভদ্রলোকের ছেলে ত! আমি তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললুম, "ভাই, মাফ কর!"

আমি যে তার কাছ থেকে মাফ চাইব, এতটা বোধহয় সে আশা করে-নি। কারণ, নবীন তার সজল চোখ তুলে দুঃখিত ও বিস্মিত ভাবে একবার আমার দিকে চেয়ে দেখলে; কিন্তু, কোন কথা না বলে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে, মাথা নীচু করে'ধীরে-ধীরে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি তখন মুরারিবাবুকে একে-একে সমস্ত কথা খুলে বল্‌লুম।

মুরারিবাবু প্রশংসার চোখে আমার দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনার গায়ে এত জোর!"—তারপরেই বোধ করি নবীনের কান্না মনে করে'ই একটু বিষণ্ণ হয়ে বললেন, "কিন্তু এতটা সাজা দেওয়া আপনার ভাল হয়-নি! হাজার-হোক, জমিদারের ছেলে, অপমানের মাত্রাটা বড় বেশী হয়ে গেছে!"

—"মুরারিবাবু, আজ যদি ওকে সুধু মেরেধরে ছেড়ে দিতুম, কাল তাহলে ও তার শোধ তুলতে আবার ফিরে আসত। কিন্তু, এই-যে অপমানটা করা হোলো, ওর যদি মানের ভয় থাকে তাহলে আর এ-মুখো হবে না। সে-সব কথা যাক্। অনেক পরিশ্রম করা হয়েছে, অতএব দ্রৌপদী-ঠাকরুণকে বলুন, আমার আজকের ঋণটা হাতে-হাতে পরিশোধ করতে। ধার জমিয়ে রাখতে পারব না —আমি তেমন নির্ব্বোধ মহাজন নই!"

এগারো

সরমার কথা

মাগো, বাবা যেন কি! কোথা-থেকে একটা হাড়-জিরজিরে কুকুরের ছানা ধরে এনেছেন, সে দিন-রাত তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছে-ফিরছে। বাবা যখন খেতে বসেন, সে তাঁর পাতের পাশটিতে বসে টিক্-টিক্ করে' সরু-লিক্‌লিকে ল্যাজটি নাড়ে; বাবা যখন শুতে যান, সে তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। আদর করে' তার আবার নাম রাখা হয়েছে 'নন্নুয়া'!

আচ্ছা, বাবা আজকাল মাঝে-মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে যান কেন? মুখখানি বিমর্ষ করে' এক-একবার আমার দিকে তাকান, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আর আকাশ-পাতাল কত-কি যেন ভাবতে থাকেন। সময়ে-সময়ে আমাকে বোধহয় কিছু বল্‌ব-বল্‌ব করেন—অথচ কিছু বলতেও ত পারেন না।

এ আর কিছু নয়—আমার এই ছার কপালের কথা ভেবে-ভেবে বাবার মনের সব সুখ-সোয়াস্তি ঘুচে গেছে। কিন্তু আমাকে তিনি কি বলতে চান? কেনই-বা বলতে পারেন না? সে কথা শুনলে কি আমার মনে বিশেষ কষ্ট হবে? এমন কি কথা?

সেদিন আমি বাবাকে জোর করে' ধরে বসলুম। বললুম, "হ্যাঁ বাবা, তুমি কি ভাব, আমাকে বলতে হবে।"

বাবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল; ইতস্তত করে' বললেন, "কৈ মা, কিছু ভাবিনা ত!"

আমি বাবার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে বললুম, "না বাবা, তুমি লুকোচ্ছ। আজ কিন্তু কিছুতেই আমি ছাড়ব না, বলতেই হবে।"

বাবা আমার মুখের পানে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। খানিক পরে দেখি, তাঁর চোখ ক্রমেই জলে ভরে উঠছে!

—"বাবা, তুমি কাঁদছ!"—বলে আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁর বুকের ভিতরে মুখ লুকোলুম। মনে হোল বাবার বুকখানা থেকে-থেকে যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

অনেকক্ষণ বাবাও কথা কইলেন না—আমিও না। তারপর তিনি আমার মাথার উপর দুটি হাত রেখে আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন, "মা সরো, আজ আমি তোমায় যে-কথা বলব, সেটা হাল্‌কাভাবে নিও না। যে দুঃখী, সে তার দুঃখ যতই ভুলে থাক্‌তে পারে, তার পক্ষে সেটা ততই মঙ্গলের কথা। নারীর যার-বাড়া দুঃখ নেই, তুমি তাই সয়ে আছ। এ-অবস্থায় তোমাকে তোমার দুর্ভাগ্যের কথা নূতন করে' স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার উচিত নয়—অথচ এ না করে' আর উপায়ও নেই।"

বাবা একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "আমার বয়স বাড়ছে বৈ কমছে না—সংসার থেকে এখন আমার চিরবিদায় নেবার সময় এসেছে। আমার এমন-কোন আত্মীয় নেই, যিনি তোমার ভার নিতে পারেন। এখন আমি যদি যাই, এ পৃথিবীতে তুমি একলা হবে। তোমার এই বয়স—তাতে তুমি স্ত্রীলোক। এ অবস্থায় আমাকে এমন-কিছু করতে হবে, যাতে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

বাবা আবার থামলেন। আমার প্রাণের ভিতরটা কি-রকম হু হু করতে লাগল।

—"মা সরো, কিন্তু একটি উপায় ছাড়া আমার আর-কিছু করবারও নেই। আজ-কাল সমাজে বিধবা-বিবাহ চলছে। পণ্ডিতরা বিধানও দিয়েছেন, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তোমার আবার বিবাহ দেওয়া ছাড়া আমি ত আর দ্বিতীয় উপায় দেখতে পাচ্ছি না। এ-বিষয়ে তোমার মত কি, আমি তাই জানতে চাই। তোমার মত না নিয়ে আমি কিছু করব না—করতে পারব না। বেশ করে' সমস্ত ভেবে-চিন্তে তোমার যা মত আমাকে জানিও। আমার কাছে কিছু লজ্জা কোরো না মা, কারণ এর ওপরেই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

—এই কথা বলে বাবা ধীরে-ধীরে উঠে বাইরে চলে গেলেন।... ...

বাবার আজকের কথাগুলো যেন আচম্‌কা প্রহারের মত আমাকে মূর্চ্ছাহত করে' দিলে! নিজের শূন্য জীবনের যাতনা ভুলি-নি বটে, কিন্তু আবার বিবাহের কথা ত কোনদিন ভাবতে পারি-নি,—এ অসম্ভবের সম্ভাবনা ত কোনদিন স্বপ্নেও মনে আসে-নি! বি-ধ-বা বি-বা-হ! আমার অন্তরাত্মা যেন শিউরে উঠল! এক বিবাহের ফলভোগ করছি, আবার বিবাহ!... ...

বিধবা-বিবাহ!—আমার এ নারী-প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বলতে লাগল—'এ অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়!'

... ... স্বামীর মুখ মনে পড়্‌ল। সে মুখেতে সুখস্মৃতির কিছু ছিল না, ভক্তি-শ্রদ্ধার কিছু ছিল না... ... কিন্তু, তবু—তবু, তিনি ত আমার স্বামী—তিনি ... ...

বাবা এ কি বললেন! দেশে এখন প্রায়ই বিধবার বিবাহ হয়—কিন্তু তা কি হওয়া উচিত? একটিমাত্র ফুল কি দুই দেবতাকে উপহার দেওয়া চলে?

ওগো, তোমাদের পুরুষের পৃথিবীতে

নারী কি অসহায়! পুরুষ একলা এই ধরণীতে দিগ্বিজয় করে' আসতে পারে, আর একাকিনী নারী যদি নিজের ঘরের কোণে আপনাতে-আপনি বিলীন হয়ে থাকে, তাহলেও কি সে বাইরের হিংস্র দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না? তাকে রক্ষা করবার জন্যে পুরুষ না হলে চলবে না?

... ... কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে আবার বিবাহ! আমার স্বাধীন হৃদয়কে আবার পরাধীন করতে হবে! কিন্তু আবার যিনি আসবেন, তিনিও যদি রক্ষক না-হয়ে ভক্ষক হন? তখন তাঁর গ্রাস থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে?

ভগবান্! জগতে নারীর মত দুর্ব্বল প্রাণী কেন সৃষ্টি করেছ... ... কেন?

বিছানার উপর পড়ে, মুখ গুঁজড়ে আমি কাঁদতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চোখের জল মুছতে গিয়ে দেখি,—দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, করুণ বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে, মোহনবাবু!

এ কী লজ্জা! তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসলুম। মোহনবাবু যেমন নীরবে এসেছিলেন, তেমনি নীরবে চলে গেলেন।

মাগো, তিনি কি মনে করলেন! আরো-কিছুক্ষণ বসে বসে নানান্ কথা ভাবতে লাগলুম। ভাবতে-ভাবতে মাথাটা কেমন ধরে গেল—বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

বাগানের দিকে তাকাতেই "আবার দেখলুম, মোহনবাবুকে! তিনি আমায় দেখতে পেলেন না,—আপনমনে মাথা হেঁট করে' ঘাসের উপর পাইচারি করছিলেন।

একটা গাছে ঝাঁকে-ঝাঁকে থোকা-থোকা ফুল ফুটে আছে, মোহনবাবু তার সুমুখে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। অন্যমনস্ক ভাবে গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিলেন। ফুলটি একবার শুঁকে, বিরক্তভাবে সেটিকে আঙ্গুলে থেঁৎলে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর দু-একবার পায়চারি করে ঘাসের উপরে কেমন অবসন্নের মত বসে পড়লেন!

ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার মাথা-ধরাটা একটু কমল। আমি ঘরকন্নার কাজ সারতে, সেখান থেকে চলে এলুম।

ঘণ্টাদেড়েক পরে ঘরে আসতেই আবার বাগানের দিকে চোখ গেল। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম, মোহনবাবু ঠিক সেইখানটিতে, ঠিক তেমনি চিন্তিত ভাবে বসে রয়েছেন!... ... কেন?

সারাদিন বাবার কথা নিয়ে মনের ভিতরটা তোল্‌পাড়্ হোতে লাগল। বিবাহ—আবার বিবাহ! কেন জানি না, যতবার বিবাহের কথা ভেবেছি, ততবারই মোহনবাবুকে মনে হয়েছে!... ... এ দুয়ের মধ্যে কিসের সম্পর্ক? এ ভাবনা ক্রমে আমার কাছে দুর্ভাবনা হয়ে উঠল। মনকে আমি বারংবার জোর করে' বোঝাতে চেষ্টা করলুম যে—এ অসম্ভব, আমার বিবাহ অসম্ভব! কিন্তু মনকে যেই মানা করি, চোখের সামনে অমনি দেখি, মোহনবাবুর মুখ! কেন দেখি, কে আমাকে বলে দেবে?

সন্ধ্যের সময় দেহ আর মন, দুই-ই কেমন নেতিয়ে পড়ল—বুক যেন পুড়ে যেতে লাগল। হঠাৎ বাবা আমার কপালে হাত দিয়ে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠলেন, "সরো, একি! আমাকে তুই কিছু বলিস-নি? কি আশ্চর্য্য! জ্বরে তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে!"

বারো

মোহনের কথা

হরেনটা দেখছি, বেজায় কাঠখোট্টা হয়ে উঠল! বলে কিনা, বিয়ে করব না! সেদিন সে তাই নিয়ে এমনি আবোল-তাবোল বক্‌তে সুরু করেছিল যে, আর বরদাস্ত করতে না পেরে শেষটা আমি রেগে চলে এসেছিলুম।

তার পর দিন যখন হরেনের সঙ্গে দেখা হোল, সে নিজেই আবার সেই প্রসঙ্গ তুললে; বললে, "কাল তুমি হঠাৎ রেগে চলে এলে বড় যে!"

আমি বললুম, "কুস্তি লড়ে লড়ে তোমার দেহের সঙ্গে মনটাও পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠছে, নইলে—"

আমাকে বাধা দিয়ে সে বললে, "মোহন, আমার যা বলবার ছিল, তুমি তা না শুনেই কাল চলে এসেছিলে। আসল কথা কি জান, আমি আমার মনে মনে যথার্থ সহধর্ম্মিনীর যে মূর্ত্তি গড়েছি, হিন্দুসমাজে তা দুর্লভ বলেই আমি বিবাহ করতে চাই না।"

—"হরেন, তোমাকে বোঝা ভার! কাল তুমি কঠোর প্রত্নতাত্ত্বিকের মত কথা বলছিলে, আর আজ একেবারে ভোল ফিরিয়ে কবির মত কথা বলতে সুরু করেছ!"

—"মোহন, আরসোলা পাখী হলেও হোতে পারে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব নয়! কিন্তু যাক্ সে কথা! ভাখ ভাই, শিক্ষিত পুরুষের সঙ্গে অশিক্ষিত রমণীর বিবাহের মত বিসদৃশ ব্যাপার আমি ত আর কল্পনা করতেই পারি না; আমি তাই বিবাহের বিরোধী।"

"—কিন্তু হিন্দুসমাজে খোঁজ করলে তোমার মনের মত বিদুষী রমণী পেতে পার।"

—"বলছি ত তা দুর্লভ। আমাদের সমাজে যে দু-চারজন লোক মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাতে চান, তাঁরাও শিক্ষার আসল অর্থ বোঝেন না। কোনরকমে বর্ণপরিচয় সাঙ্গ করিয়ে মেয়েদের বই পড়াতে শেখানোর নামই লেখাপড়া নয়; এমন অল্পবিদ্যা মূর্খতার চেয়েও শোচনীয়।"

—"আমার ত মনে হয় এদেশী মেয়েদের এ-রকম অজ্ঞতার মূল কারণ হচ্ছে, স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব। দেখবে, যে-সব দেশে রমণীদের উপরে ঘেরাটোপ খাটানো হয় না, সেই-সব দেশের রমণীরাই গেরস্থালীর কাজ-কর্ম্মের সঙ্গেসঙ্গেই বিদুষী আর নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণ। ঘরে-বাইরে তাঁদের গতি অবাধ, দশজনের সঙ্গে তাঁদের হামেসাই মেলামেশা করতে হয়; তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে এই স্বাধীনতার উপযোগী জীবন গঠন করেন!"

হরেন খানিকক্ষণ নিরুত্তর হয়ে বসে দুলতে লাগলো; তারপর হঠাৎ, অকারণে টেবিলের উপরে চটাং করে' একটা চড়্ বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল,—"আমাদের দেশে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই, তার আসল কারণ এই যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্থে আমরা বুঝি, স্ত্রীলোকের পবিত্রতা নষ্ট করা! আমাদের দৃঢ় ধারণা,

ঘরের বাইরে মেয়েরা যদি ঘোমটা খোলেন, অন্য পুরুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় যোগ স্থান, তাহলেই তাঁদের নির্ম্মল চরিত্র পঙ্কিল হয়ে উঠবে! সূর্য্য যাঁর মুখ দেখতে পায় না, অন্য পুরুষের ছায়াও যিনি মাড়ান না, অত্যাচারী স্বামীর সাত চড়েও যাঁর কথা সরে না—আমাদের বিশ্বাস, তিনিই হচ্ছেন পয়লা নম্বরের সতী! অথচ, সতী বলে যাঁদের আমরা পূজা করি, সেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীরা পর্দ্দা খুলে বাইরে আসতে, পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইতে ইতস্তত করতেন না! নিন্দুকের মুখবন্ধের জন্যে আমরা যে যখন-তখন ঐ সব বিখ্যাত সতীকে আদর্শ করে' দ্যাখাতে যাই, কিন্তু আমাদের রমণীরা কি ঐ আদর্শ-মত চরিত্র গঠন করবার সুযোগ পায়? আবার, এর মধ্যে মজা এইটুকু যে, এ-সব অপ্রিয় সত্য বলতে গেলেই শাস্ত্রীর দল ঘন ঘন টিকি নেড়ে তোমাকে 'অহিন্দু, ম্লেচ্ছ, পাপিষ্ঠ' বলে পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিতে আসবে! যতদিন এই ভণ্ডের দলকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়ানো না হচ্ছে, ততদিন আমাদের মা-বোন-মেয়েরা যথার্থ রমণীত্বের অধিকার হতে বঞ্চিত থাকবেন,—পত্নীকে আমরা ভাবব, স্বামীর সেবাদাসী মাত্র!"

—"বন্ধু হে, তেঁতুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আঙ্গুরের আশা দুরাশা মাত্র! তোমার মনের মত রমণী-রত্নের খোঁজ করতে গেলে এ জন্মটাই তোমাকে আইবুড়ো হয়ে থাকতে হবে!"

হরেন কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, "আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের, সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী হচ্ছেন স্ত্রীলোক; অথচ এই স্ত্রী-জাতিতেই জন্ম নিয়ে আমাদের মেয়েরা যদি বেশী লেখাপড়া আর নাচ-গান-বাজনা শেখেন, তাহলে সুধুই যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তা নয়; সেই সঙ্গে তাঁরা গেরস্থালীর কাজকর্ম্ম ছেড়ে দেবেন, স্বামীর অবাধ্য হবেন, সতীত্বের মহিমা খর্ব্ব করে' বসবেন! ওঃ, কি অপূর্ব্ব যুক্তি! অতএব বিয়ে যদি করতে চাও, তবে চোখ থাকতেও কাণা, মুখ থাকতেও বোবা, প্রাণ থাকতেও জীবন্মৃত,—এমন-একটি অন্ধকারের জড়সড় স্ত্রী-জাতীয় জীবকে, চেলীর কাপড়ে মোড়া জীবন্ত পার্শেলের মত ঘরে তুলে আনো! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, তিনি সতী না হয়ে যাবেন না! সতীত্বে আমার শ্রদ্ধা আর কারুর চেয়ে কম না—কিন্তু এ-সব কৃত্রিম সতীর পায়ে দূর থেকেই আমি গড় করছি!"

হরেনের কথা আমারই মনের কথা। তবু, তাকে চটাবার মৎলোবে আমি বল্লুম, "সতীকে কৃত্রিম বলা! ওহে পাষণ্ড, তোমার জীভ যে এখনি খসে পড়বে!"

হরেন তার দুখানা বলিষ্ঠ ও চ্যাটালো হাতে আমার দু-কাঁধ ধরে খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "কিন্তু যতদিন জীভ না খস্‌ছে, এই কথাই বলব! মোহন, তুমি কি জাননা যে, অশিক্ষিত স্ত্রীলোকরা যা করে, তা সুধু অন্ধবিশ্বাসের জোরে? একবার কোনরকমে যদি এই অন্ধবিশ্বাস টলানো যায়, তাহলে আর তাদের বাঁচোয়া নেই। কিন্তু, যে রমণী বিদুষী—যিনি বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি বেশ সচেতন থাকে,—এ সচেতনতা

অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে নেই; তাই বিদুষী আর স্বাধীন রমণীর চেয়ে মূর্খ পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোকের পক্ষে পতনের ভয় আছে পনেরোআনা। সেইজন্যেই এদের সতীত্বকে আমি বলি কৃত্রিম। হোতে পারে আমি ভ্রান্ত;—কিন্তু আমার এই মত।"

আমি তেমনি কৌতুকভরে বললুম, "হরেন, তুমি কি গায়ের জোরে তোমার এই অদ্ভুত মত প্রতিষ্ঠা করতে চাও?"

আমার মুখের সামনে তার দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ করে,' হরেন মাথা তুলে ভুরু-কুঁচকে বললে, "আঃ, তা যদি পারতুম মোহন! তাহলে দেখিয়ে দিতুম!"

তর্কের সময় হরেনকে চটিয়ে দিলে, তার মুখের কথা ও হাতের ঘুষি এক-সঙ্গে চলবার সম্ভাবনা আছে; এইজন্যে তার বিপক্ষে তর্ক করা নিরাপদ ছিল না। তাকে আর বেশী ঘাঁটানো ঠিক নয় বুঝে আমি বললুম, "হরেন, বাতাসের সঙ্গে যুঝে লাভ নেই; নাও, একটা সিগারেট খেয়ে শান্ত হও।"

হরেন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে বসে সিগারেটের ধূমপান করতে লাগল। এবং ঘন ঘন কয়েকটা টানে দু-দণ্ডেই সমস্ত সিগারেটটা ভস্ম ও ঘরখানা ধূমপূর্ণ করে সে বললে, "মুরারিবাবুর খবর কি হে মোহন?"

—"ভাল।"

—"ছাখ মোহন, সরমাকে যাতে বিবাহ করতে পার সে-বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি কোরো না। সরমার মত রূপে-গুণে নিখুঁত স্ত্রী লাভ হওয়া ভাগ্যের কথা। বুঝেছ?"

এই বলে সে আমার উত্তরের কোন অপেক্ষা না রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

আজ সকালে মুরারিবাবুর বাড়ীতে গিয়ে কী দেখলুম!

সরমা বিছানায় পড়ে বিহ্বলভাবে কাঁদছে!

প্রথমটা সে আমাকে দেখতে পায় নি; আমিও, সে জানতে পারবার আগেই চলে আসব ভেবেছিলুম—কিন্তু তাকে কাঁদতে দেখে আমি যেন কেমন-একরকম হয়ে গেলুম—ঠিক সময়টিতে সরে আসতে পারলুম না। আমাকে সে দেখে ফেললে। দেখেই আমার দিকে সন্ত্রস্ত ভাবে পিছন ফিরে জড়সড় হয়ে বসল। আমিও আর দাঁড়ালুম না।

সরমা কাঁদছে কেন? যেদিন থেকে তাকে দেখেছি—হাস্যময়ী, লীলাময়ী মূর্ত্তিতেই দেখেছি—এমন অশ্রুসজল বিষণ্ণ প্রতিমা রূপে ত কখনো দেখি-নি! ইদানীং তাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গাঢ় হয়ে উঠেছিল, মুরারিবাবু আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন,—সেও আমার সামনে বেরোয়, আমার সঙ্গে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কথা কয়, আমার গান শোনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তার মনের মধ্যে দুঃখের আগুণ যে এমন তুষানলের মত ধিকি-ধিকি জ্বলছে, সে যে প্রাণের কান্না মুখের হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেছে, তা ত আমি বুঝতে পারি-নি।

হায়, এ বাঙ্গলাদেশের ঘরে-ঘরে বালিকা বিধবা, তাদের সকলেরই হৃদয় ত এমনি আগুনে-পোড়ানো কটাহের মত তপ্ত! পুরুষ স্বাধীন, তাই নিজের দুর্ভাগ্য সে উচ্চকণ্ঠে সমাজে ঘোষণা করতে পারে; তার এই আন্দোলনের শক্তি আছে বলেই,

আপনার ছোটখাট দুঃখও পুরুষ পুরিয়ে নিতে পারে। আমাদের সমাজে কিন্তু নারী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত; তাই বুক ফাটলেও তার মুখ ফোটে না—নিজের হতভাগ্যের চাপে সে নিজেই নুয়ে পড়ে, মনের দুঃখ সে মনেই চেপে রাখে! তাই ত আমার মনে হয়, এমন সমাজে শুধু উদার ও নবীন পুরুষ আত্মপ্রকাশ করলেই চলবে না;—সেই সঙ্গে চাই বিদ্রোহী নারীর দলকেও—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধঘোষণা করতে পারবে!

রাত্রিবেলা নীচের ঘরে বসে, এস্রাজে স্বরগ্রাম সাধছি, এমনসময়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে আলুথালু বেশে মুরারিবাবু এসে হাজির।

তাঁকে এমন অসময়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে এস্রাজটি নামিয়ে রাখলুম।

মুরারিবাবু বললেন, "বাবা, বড় বিপদ!"

—"বিপদ! কি হয়েছে?"

—"সরোর ভয়ানক জ্বর!"

তখনি উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি মুরারিবাবুর বাড়ীতে গেলুম।

পা-থেকে মাথা-পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে সরমা শুয়ে আছে। মুরারিবাবু আলো নিয়ে মেয়ের মাথার কাছে দাঁড়ালেন।

সরমার শয্যাপার্শ্বে গিয়ে আমি বললুম, "আপনি মুখটা একবার খুলুন ত!"

আমার গলা শুনেই, সেই জ্বরের ঘোরেও সরমা চমকে উঠল!

আমি আবার মুখ খুলতে বললুম।

সরমা সাড়াশব্দ কিছুই দিলে না—মুখও খুললে না। বোধ হয় লজ্জায়।

—"আচ্ছা, মুখ না খোলেন, হাতটা একবার বার করুন দেখি।"

সরমার গায়ের চাদরখানা নড়ে উঠল। মনে হোল, হাত বার করা দূরের কথা, সে যেন তার হাত-দুখানিকে বুকের আরো কাছে গুটিয়ে নিলে!

মুরারিবাবু বললেন, "সরো, মোহনকে লজ্জা কি মা? নে, হাত দ্যাখা!"

কাপড়ের ভিতর থেকে অত্যন্ত জড়সড় ভাবে আস্তে-আস্তে সরমার একখানি শুভ্র হাত বেরুল। সে হাত ছুঁতেই কেন জানিনা, আমার গা-টা যেন কেমন করতে লাগল! সরমার হাতও থর্‌থর্ করে কাঁপছিল—জ্বরে কি সঙ্কোচে, বুঝলুম না!

জ্বরের মাত্রাটা বড় বেশী বলে মনে হোল। বাড়ীতে গিয়ে তখনি আমার চেনা এক ভাল ডাক্তারকে 'টেলিফোনে' ডাকলুম।

ডাক্তার এসে সরমাকে পরীক্ষা করলেন। বললেন, "ভয় নেই। সামান্য জ্বর, শীঘ্রই সেরে যাবে।"

ডাক্তারের কাছে সরমা কোনরকম লজ্জা-সঙ্কোচ করলে না—অথচ, আমার কাছে তার মুখ খুলতে, হাত দ্যাখাতে অত আপত্তি কেন?

ডাক্তার ভুল বুঝেছিলেন,—সরমার অসুখ কমল না, বরং বেড়ে উঠল।

মুরারিবাবু ত ঠিক বালকের মত অধীর হয়ে পড়লেন—মুখখানি কাতর করে' থাকেন, কথায়-কথায় কেঁদে ফেলেন। তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া দূরের কথা—রোগীর চেয়ে তাঁকে নিয়েই বেশী বিব্রত হয়ে পড়লুম।

হরেন যখনি সময় পেত—আসত। সে মুরারিবাবুকে যত বোঝায়, তিনি ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কাঁদো-কাঁদো মুখে সেদিন তিনি বললেন, "হরেনবাবু, জানেন-না, এ যে আমার অনাথা মেয়ে! ওকে নিয়েই বেঁচে আছি—ওর এ কি হোল! সেদিন ওকে বিয়ের কথা বলেছিলুম বলেই বুঝি মা আমার ভেবে-ভেবে এমন কাল-জ্বর ডেকে আনলে! হায় হায়, অমন কাজ কেন মরতে করেছিলুম!"

হরেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমার বুকটা যেন ধড়াস্ করে' উঠল! মুরারিবাবু বিয়ের কথা তোলাতেই দুর্ভাবনায় সরমার জ্বর এসেছে? তবে কি সরমার আর বিবাহে মত নেই?

সরমা এ-ক-দিন জ্বরের ঘোরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে যা তা ভুলও বকছে। জ্বর ক্রমে বিকারে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমি আজ তিন রাত ভাল করে' ঘুমোতে পারিনি—দিন-রাত যতক্ষণ শরীর বয়েছে রোগীর বিছানার পাশে ঠায় বসে থেকেছি। মুরারিবাবু ত একরকম কাজের বাইরে বললেই হয়; রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ওষুধ-খাওয়ানো সব আমাকেই করতে হয়েছে। সামান্য যেটুকু সময় আমি থাকতে পারতুম না—হরেন এসে আমার জায়গায় বসত।

নিশুতি রাতে আমি আর মুরারিবাবু রোগীর বিছানার পাশে বসে আছি। একটা টুলের উপর 'রিডিং-ল্যাম্প'টা জ্বলছে। রোগীর গতিক আজ-একটু ভাল। ভয়ের অবস্থা কেটে গেছে।

আমি বললুম, "মুরারিবাবু, আজ আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

"কি আশ্চর্য্য, সে কি হয় বাবা? বাপ হয়ে আমি ঘুমোব—আর তুমি জেগে থাকবে? তার চেয়ে তুমি বরং ঘুমিয়ে নাও।"

—"বেশ ত, শেষ রাত্রে আমি ঘুমোব অখন, এখন আপনার পালা। আজ আর কোন ভয় নেই—মিছামিছি দুজনেরই জেগে থেকে কি হবে?"

মুরারিবাবু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার হাত ধরে বললেন, "বাবা, আর-জন্মে তুমি আমার কে ছিলে, জানি না! সরোর জন্যে তুমি যা করলে, আমার ছেলে থাকলে সেও হয়ত এমন করে' করতে পারত না! স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন দিয়ে তুমি যে আমাকে বড় শক্ত বাঁধনে বেঁধে রাখলে বাবা!"

মুরারিবাবু ত জানেন না, সরমা আমার কে! আমার এই যত্নের মধ্যে তিনি শুধু আমার পরোপকারের প্রবৃত্তি দেখছেন! কিন্তু শুধু পরোপকারের প্রবৃত্তি নিয়ে আমি কি এতটা করতে পারতুম! তা ত নয়! সরমার ভাল-মন্দের সঙ্গে এখন যে আমার অদৃষ্ট এক সুতোয় গাঁথা! আমি যা করছি, এ ত আমার স্বার্থপর প্রাণের টানেই করছি!

কিন্তু এ-সব মনের কথা ত মুখ ফুটে বলবার মত নয়! উল্টে, বাইরের বাঁধা বুলি দিয়ে মনের কথা ঢেকে রাখতে হবে। কাজেই, মুরারিবাবুর জবাবে আমি বললুম, "এসব কথা কেন মুরারিবাবু! মানুষের

আপদে-বিপদে মানুষই সাহায্য করে' থাকে! যান, আপনি এখন ঘুমোন গে যান!"

আরও খানিক ইতস্তত করে' মুরারি-বাবু শেষটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে সেই ঘরেই এককোণে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন।

আমি আলোর কাছে বসে বসে এক-খানা বই পড়তে লাগলুম।

খানিক পরে ঘড়িতে টং-করে' একটা বাজল। মুখ তুলে দেখি, সরমা বিছানার উপরে উস্‌খুস্ করছে।

তার দিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ সে ক্ষীণস্বরে বললে, "একটু জল।"

জলের গেলাস নিয়ে তার হাতে দিলুম। সে জল খেয়ে আবার চোখ মুদলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এখন কেমন আছেন?"

আলোটা আমার পিছনে ছিল বলে জল দেবার সময়ে সরমা আমাকে চিনতে পারে-নি। কিন্তু এখন আমার কণ্ঠস্বর শুনে সে সচমকে চোখ চাইলে; তার পর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে ঠিক ভীত হরিণীর মত ত্রস্ত নেত্রে তাকিয়ে রইল—তার সে দৃষ্টি থেকে আমিও আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলুম না।

অনেকক্ষণ পরে একটা ঢোঁক গিলে সে মৃদুস্বরে বলে উঠল, "আপনি!"

আমি কোন জবাব দিলুম না।

একটু চুপ করে' থেকে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা কোথায়?"

—"তিনি ঐ যে শুয়ে-শুয়ে ঘুমোচ্ছেন—এ ক-দিন দুর্ভাবনায় তাঁর চোখে ত নিদ্রা ছিল না!"

সরমা স্তব্ধ হয়ে চোখ মুদে শুয়ে রইল। দেখলুম জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়াতে তার বুকটি ফুলে-ফুলে উঠছে!

কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কেটে যাবার পর, কি ভেবে সরমা আবার বললে, "মোহনবাবু, আপনি এখনো জেগে আছেন কেন?"

কি করে বলব, কেন জেগে আছি? সরমা কি আজও তা বুঝতে পারে-নি!—আমি তার মুখের পরে চোখ রেখে বললুম, "আপনাকে দ্যাখবার জন্যে কাছে সর্ব্বদাই একজন লোক থাকা দরকার।"

সরমা ঘাড় নেড়ে বললে, "না, কোন দরকার নেই!"

—"আপনি জানেন না, এ ডাক্তারের হুকুম!"

—"তবে বাবাকে তুলে দিয়ে আপনি বাড়ী যান।"

—"আহা, আজ উনি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়েছেন, ওঁকে কি জাগানো উচিত?"

—"তবে আমার জন্যে কারুর জেগে থাকবার দরকার নেই। আপনি যান।"

সরমার নীরস স্বর শুনে মনে হোল, আমি এখানে থাকাতে সে যেন খুসী নয়! তবু, তাকে বুঝাবার জন্যে আমি বললুম, "আপনি এখনি অত কথা কইবেন না, তাহলে অসুখ বাড়বে। আপনার অসুখ হয়ে-পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি, আজকের রাতটা কাটলেই আমাকে আর দরকার হবে না।"

তিক্ত স্বরে সে বলে উঠল,—"কে আপনাকে এখানে থাকতে বলছে? আপনি যান না!"

সরমার কথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। কেন সে আমাকে তাড়াতে চায়?

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সরমা আবার বললে, "আপনি এখনো গেলেন না! যান!"

নিজের শরীরের মায়া ভুলে, দিনের বিশ্রামে রাতের নিদ্রা ভুলে, পৃথিবীর সব কথা ভুলে আমি যে তার এত সেবা করছি, এই কি তার পুরস্কার! আজ সে আমার মুখের উপরে, আমাকে ঘর থেকে দূর করে' দিতে চায়! তার কটু কথায়, অন্যায় ব্যবহারে, আমারও মন অপমানে, অভিমানে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল; কিন্তু আপনাকে সামলে নিয়ে সেখান থেকে আমি তখনি বাইরে বেরিয়ে এলুম।

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ছিটে-ফোঁটা

"ছবিটা ছবির মত হওয়া উচিত" এই সহজ কথাটি আমাদের বড়ই হেঁয়ালির মত শুনতে ঠেকে এবং এর মীমাংসা হওয়াও বড়ই শক্ত হয়ে ওঠে। আমরা এখন চাই ছবির ভিতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও বিবিধ প্রকারের গভীর গবেষণা। এককথায় আমরা চাই ছবিটি বিবিধ জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার হবে এবং তার ভাণ্ডারী হবেন শিল্পী। কিন্তু এটা জানা উচিত, সুকুমার কলা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁথি বা যন্ত্র নয়, এটি ঠিক ফুলেরই মত। ফুল যখন ফোটে তখন সে অকারণ পুলকেই ফুটে ওঠে, কিন্তু তার পিছনে অলক্ষিতে যখন ফলের সৃষ্টি হয় তখন সে কোথায় ঝরে পড়ে তার ঠিকানা নেই। আজ র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে আমরা যে বিশ্বমাতার রূপ দেখতে পাই, সেটা র‍্যাফেলের কাছে বিশ্বমাতারূপেই যে প্রকাশ পেয়েছিল তা বলা যায় না। তিনি এঁকে গেছেন একটি মায়ের সাদা-সিধে রূপ, এখন সেই মাতৃমূর্ত্তি বিশ্বমাতায় পরিণত হয়েচে। শিল্পীরা আঁকবে, গড়বে, সৃষ্টি করবে; তাতে তত্ত্বকথা খুঁজে পাওয়া যায় কি না তা তাদের জানবার কোনই আবশ্যক নেই! সে ছবিকে ছবির মত করেই আঁকবে, মূর্ত্তিকে মূর্ত্তির মত করেই গড়বে, এবং সেইটেই তার সাধনা।

* *
*

ছবিতে যে ছন্দ (Rhythm) আছে, গাছপালার ভিতর, তাদের খেয়াল-খুসির মধ্যেও সেইটি বর্ত্তমান। প্রকৃতির মধ্যে নানান বস্তুতে যে ছাঁদটা পাওয়া যায় সেইটে থেকে আমরা ছবির ছাঁদের তাৎপর্য্য যে কি, তা বেশ বুঝতে পারি। ধরণীর শোভার মধ্যে এইরকম ছাঁদ না থাকলে যেমন সেটা সুশোভন হতোনা, তেমনি চিত্রশিল্পে

এই ছন্দটি মা বজায় রাখলে ছন্দহীন কবিতার মতই তা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। শিল্পী প্রকৃতির এই লীলায়িত ছন্দ থেকে তার ছবির জমিতে (back ground) সুন্দর সুন্দর ছাঁদের আদরা (Sketch) আঁকা শিখতে পারেন। শিল্পীর পক্ষে তাই আঁকতে জানার চেয়ে দেখতে জানার প্রয়োজন অনেক বেশী।

* *
*

চিকিৎসকের অস্ত্রচালনার দ্বারা রোগীর রোগ-নিরাকরণের যে আনন্দ, যোদ্ধার অসি-আস্ফালনের দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভের যে আহ্লাদ, শিল্পীর তুলির টানের ভিতরও সেই একই খুসি বর্ত্তমান; কেবল তাতে পূর্ব্বোক্তগুলির মত কোন ফললাভের আশা থাকেনা—সেটা ছেলের মায়ের প্রতি এবং মায়ের ছেলের প্রতি প্রীতির মতই আপনা-আপনি জন্মলাভ করে। আসলে শিল্পীর কথা হওয়া উচিত "মা ফলেষু কদাচন।"

* *
*

ভারতের আদিম অধিবাসী কোলেদের মধ্যে মালার নামে একটা জাত আছে, তারা পিতল-কাঁসার কাজ করে। তাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, তারা গোড়ায় কোলেদের স্বজাতি ছিল। বহুকালপূর্ব্বে কোন-একটি কোল-পরিবারে চার ভাই বাস করত। চাষবাস করেই তাদের দিন কাটত। এখন, একদিন তারা চার ভাই ক্ষেতে হাল দিচ্চে, এমনসময় ছোট ভাইটি হঠাৎ লাঙ্গল ছেড়ে সেইখানেই মাটিতে বসে পড়ল আর তার খানিক পরেই ক্ষেতের চষা নরম মাটি দিয়ে একটা ছাঁচ তৈরি করে ফেললে। তাতে তার অন্য তিন ভাই ভারি চটে গেল। তারা তাকে "কুঁড়ে" "নিকর্ম্মা" প্রভৃতি বলে অজস্র গালিবর্ষণ করতে লাগল। সে কিন্তু কোন কথা কানে না নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। শেষে তিন ভাই পরামর্শ করলে, ছোট ভাইকে তারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। তারা লাঙ্গল দেওয়া শেষ করে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখলে, তাদের ছোট ভাই যে মাটির ছাঁচ তৈরি করেছিল, তাতে পিতল গালিয়ে ঢালাই করে একটা চমৎকার 'পয়লা' (ধান মাপবার পাত্র) তৈরি করেচে। তারা পয়লাটার চমৎকার কারুকার্য্য দেখে এত খুসি হয়ে গেল যে, তারা তখন ছোট ভাইটিকে উৎসাহ দিয়ে বল্লে, "আজ থেকে তুই বসে বসে এই নতুন কাজই করবি আর আমরা চাষবাস করে তোকে খাওয়াব।' প্রবাদ এই, সেই ছোট ভায়ের বংশধরেরাই 'মালার' অর্থাৎ কোলেদের কাঁসারী নামে খ্যাত। অসভ্য কোলেদের মধ্যে এই সুক্ষ্মশিল্পের আবির্ভাব ও সম্মানের গল্পটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মানুষের কাছে ললিতকলা খুব-একটা আদরের বস্তু; কেননা সেটা তাদের মনের খাদ্য যোগায়। মনের খাদ্যের জন্যে লালায়িত হয় মানুষেই; আর দেহের খাদ্যের জন্যে ব্যাকুল, পশুতে।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

বিচার-বিবেচনা

ভগবান সকলেরি বটে, তবে তিনি আবার প্রত্যেকেরি! প্রত্যেক সূতাটির উপর দৃষ্টি না দিলে, তাকে অখণ্ড না রাখলে—কিম্বা ছিঁড়ে গেলে গিঁট না দিলে, কাপড় যেমন সমগ্র হয় না, যে কাপড় বোনে সে যেমন প্রত্যেক সূতাটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে সমস্ত কাপড়খানি সম্পূর্ণ করে-তোলে, ঈশ্বরকেও প্রতিটি মানবজীবনের সম্বন্ধে তাই করতে হয়। তিনি আমাকেও গড়েছেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও সৃষ্টি করেছেন সত্যি, কিন্তু আমার সঙ্গে এমন কোনো বোঝাপড়া নেই যে, আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে, টুকরো-টুকরো করে, দলে পিষে তিনি শুধু ব্রহ্মাণ্ডেরি উপকার করবেন। আমার মন, আমার স্নেহবৃত্তি, আমার আত্মার একান্ত আকাঙ্খা, অতৃপ্তি যা-কিছু, তিনিই আমার মধ্যে দিয়েছেন, তার সবই ব্যর্থ করে দেবেন? মানুষের জীবনে যদি অকারণ দুঃখই দেখা যায়, অদ্ভুত ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে সে যদি কেবলি বিধ্বস্ত হতেই থাকে, অথচ সবই বাহির হতে আসে—তার চেষ্টার সুদূরে গড়ে ওঠে—তাহলে কেমন করে স্বীকার করি বিশ্ব-ব্যাপার করুণার সৃষ্টি, ন্যায়ের পরিচালনা? তাহলে যে পা রাখবার ঠাঁই কোথাও পাওয়া যায়না, ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরে মরতে হয়। যেমন দিনরাত্রি হাত-ধরাধরি করে আসে, দুঃখ সান্ত্বনা, বিপদ আর আশ্বাস, অসহ্য উত্তাপের পর বর্ষা, নিরন্তর বর্ষণের পর নিরাময় প্রসন্ন আকাশকে আসতেই হয়। দুর্দ্দিনের অবসানে আলো আসতেই হবে। এই ন্যায়ের তুলাদণ্ড দুলছে—কাঁটায়-কাঁটায় মাপ ঠিক হচ্ছে না, একে ঠিক হতেই হবে। বিশ্ববিধাতা আপন সত্যে আপনি বাঁধা। তিনিই আমাদের মনের মধ্যে মাপকাঠি রেখে দিয়েছেন, হিসাব ঠিক করে তাঁকে দিতেই হবে—তবে ত মন মেনে নেবে!

* *
*

মনে যখন কোনো ভার থাকে না, আশা ও আলোর আশ্বাস জীবনের চারিদিকে, তখন একদিন দুদিন কেন, মাস বৎসরও দীর্ঘ সময় মনে হয় না। কিন্তু জীবন যখন দুঃখভারগ্রস্ত, প্রতিমুহূর্ত্তই অনিশ্চিত, সমস্তই অন্ধকার, প্রতিপদক্ষেপে যখন হাতড়ে চলতে হয় তখন একটি দিনও কত ভয়ানক দীর্ঘ মনে হয়। মনের মধ্যে দীর্ঘতার ভার ক্রমে বিপুল হয়ে ওঠে, সম্মুখে আর কিছু থাকে না! ফাঁসীর আসামী যেমন অবশিষ্ট দিন-কয়টা কোনো রকমে কাটায়, তেম্নি আর কি! প্রভেদ এই যে, সে নিশ্চিত জানে, তার শেষ কবে!

* *
*

জীবনে সত্যের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়ানো বড় কঠিন ব্যাপার। সত্যি, সুখ দুঃখ স্নেহ

বড় তীব্র, বড়ই তীক্ষ্ণ,—একেবারে মর্ম্মন্তুদ! শেল বিঁধেই আছে, বেদনায় সমস্ত জীবন জর্জ্জর হয়ে যাচ্ছে, তবু এ শেল তুলে নেবার কেউ নেই, এ ক্ষত-স্থানে প্রলেপ দেবার মত ঔষধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে পরমধনের জন্যে দেহমনের প্রত্যেক অণু-পরমাণু ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে, তাঁকে পেতে হবে, নয় ত মরতে হবে! প্রথমটি পরমানন্দ, তা যদি ঘটে তবে জীবনে সমস্ত দুঃখের পরিপূর্ণ প্রতিকার হয়ে উপরি পাওয়া যায়; আর তা যদি না হয় তবে মৃত্যু ত পরামুক্তি—সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়, দিনের পর দিন এই দুর্ব্বহ ভার, অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে বন্ধুর পথে হাতড়ে, হুঁচট খেয়ে চল্‌তে হয় না। তবে ত বিরাম, শান্তি, সুষুপ্তি।

* *
*

কারো-কারো মনের মধ্যেকার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির কি গোল থাকে, কাছের সম্মুখের জিনিষ, বাক্য ও সঙ্গীত কেমন যেন ডিঙিয়ে চলে যায়। এ তার ইচ্ছাধীন নয়, হয়ে পড়ে! কিছুতেই মনের শান্তি অর্জ্জন করিতে পারে না, কেবলি বোধ করে কি-একটা ত্রুটি রয়েই গেল! তাই তাদের ভুলও খুব বড়, ভাল ও অত্যন্ত বেশী। ঠিক্ যত টুকু আর যেমনটি হলে সব বেশ সামঞ্জস্য করে নেওয়া যায়, তেমনটি তার কিছুতেই মনে ধরে না। একেবারে চরম চরমপন্থী! তাই কেবলি কষ্ট পায়, প্রতিকার করতে পারে না। যে প্রদীপটি জ্বাললেই সব অন্ধকার ঘোচে, সে অপূর্ব্ব দীপ জ্বালা আর হয়ই না। তেল জোটে ত বর্ত্তি নাই; বর্ত্তি জুটল, তবে যে দীপ-শলাকা দিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে, বুকের আঁচলে ঘিরে নিয়ে পথ চলবে, সেই আলো খুঁজেই পাচ্ছে না, পাওয়াই দুর্ঘট! পাওয়া যে দৈবাধীন! দেওয়া মানুষ নিজের সম্বল হ'তেই দিতে পারে।

তবে জীবনে দৈবই কি বলবত্তর? যার উপর কোনোই হাত নাই, সেইখান হতেই কি নির্ম্মম আঘাত, অসহ্য বজ্রবেদনা এসে উপস্থিত হয়? সেদিনে যে-কথাটি শুনেছিলাম সেটি খুব ঠিক্! ঈশ্বর, নির্ব্বোধ মায়ের মত, ছেলেকে শুধু সুখই যোগান্ না, কেবলি আমোদে রাখবার জন্যেই ব্যস্ত ন'ন! মঙ্গলময় বলেই তিনি অত্যন্ত কঠোর, তাঁর দয়া যেমন অপার, তাঁর শাসনও তেমনি অমোঘ! তবে ঐটুকু বোঝা কঠিন হয় যে মানুষের দুর্ব্বল শক্তির পক্ষে এমন দুরূহ প্রলোভনের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে তার পর যদি সে ভুলই করে, তখন তাকে এমনতর যন্ত্রণা কেন দেওয়া হয়? সেই প্রলোভনই বড় ভয়ানক, যখন মন ঠিক কিছুই বুঝতে পারে না, যখন সরল পথ যে কোথায় তা মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায় না। দুঃখ দেখে তা দূর করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে যা করে বসে, তা শুধু ভ্রান্তি! তার ফলে অধিকতর দুঃখই যখন হয়, তখন সে অবাক হয়ে ভাবে, এ কি হল? কেবলি অনুশোচনায় ক্লিষ্ট হতে থাকে, প্রতিকার আর তার শক্তিসামর্থ্যের মধ্যে থাকে না। যত ভাবে যায়, ততই মনে হয় দ্বিধা, দুর্ব্বলতাই মানুষের সব-চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। যে-মানুষ

প্রবল নির্ভীকভাবে ভাল হক্ মন্দ হক্, যা তার প্রাণ চায়, তাই করে, তার যেন গতিমুক্তি আছে, সে আপনার চারিদিকের জাল ছিন্ন করে, সম্মুখের পথে চল্‌তে পারে। কিন্তু যে হতভাগ্য কেবলি দ্বিধায় আন্দোলিত, শুধুই যাব-কি-যাবনা ভাবনায় এক পা অগ্রসর হতে পারে না, সে নিজের গতি করতে অক্ষম, অপরের উন্নতির বাধা। 'বেঁধে মারলে সয়' বলে একটা কথা আছে। সেটা ঠিক নয়;—সয়না। ব্যথা বরং বেশীই হয়। তবু যার বাঁধনটুকু খোলবার উদ্যম পর্য্যন্ত নেই, তার পক্ষে ব্যথার বিধানই চরম বিধান! যে পড়ে-পড়ে লাথি-গুঁতোই খাবে আর বলবে—ভগবানের ইচ্ছা, ভগবান তার সহায় হন না। যে উঠে দাঁড়াবার জন্যে, উঠে বসে; তাকেই তিনি আপন হাত বাড়িয়ে দেন। মনোবৃত্তি যার সজাগ, যে খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, শুধু গোধূলির আলো-ছায়ার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মরে না, সেই সৌভাগ্যবান। কারো-কারো মনশ্চক্ষু বোধ হয় অস্বাভাবিক,—কতক খুব ভাল দেখতে পায়, আবার কতক কিছুই দেখে না! দূরের অনেক জিনিস খুব পরিষ্কারই দেখে আর ঠিক্ যেটি হাতের কাছে আছে, তাই হাতড়ে মরে।

* *
*

ভেবে দেখলে এই কথাই ঠিক মনে হয়, এ পৃথিবী, Survival of the fittest —যোগ্যতমের স্থায়ীত্বের নিয়মেই চল্‌ছে। প্রবলের প্রাধান্যই স্বধর্ম্ম। সুস্থশরীর দীর্ঘ-জীবী, সুস্থমন কর্ম্মক্ষম,—আত্মরক্ষায় সমর্থ। উভয়েই প্রাণসার, ক্ষয়হানির সম্ভাবনা কম। যার এ-দুয়েরি অসদ্ভাব, সে যে মৃত্যুক্ষতিগ্রস্ত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি!

* *
*

অজ্ঞানই দুঃখের মূল কারণ। ছোট ছেলে জানে না, আগুনে হাত দিলে পুড়ে যায়। সে সুন্দর নির্ম্মল উজ্জ্বল বহ্নিশিখার আন্দোলিত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখে আনন্দে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়া আর-কিছুই সে তার হাতের মধ্যে পায় না! মারীচ, সোনার মায়াহরিণ, সীতার চিরদুঃখের সূচনা করেছিল—মায়া-মৃগের চাতুরীতে প্রিয়কণ্ঠস্বরের ব্যাকুল আহ্বানভ্রমে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণীও সুদীর্ঘ বিচ্ছেদদুঃখের আয়ত্বাধীন হয়েছিলেন।

* *
*

পাপ পুণ্য কি? আমার মনে হয় অপরকে দুঃখ-দেওয়াই পাপ! যা আমরা জেনে-শুনে করি, ইচ্ছে-করে ফন্দি-করে অপরের মন্দ হবে জেনেও করি, সেইটে বেশী অন্যায়! মানুষ দ্বিধায় পড়ে যেটা করে,—কতকটা না বোঝবার দরুন, কতকটা অহঙ্কারবশতঃ ভ্রান্ত হয়ে,—তার শাস্তিও হওয়া দরকার, কিন্তু সে শাস্তি যেন একেবারে প্রাণ-মারা বিধান না হ'য়ে বসে!

ভুল কি,—না অনিয়ম! তাহলেই কেমন কষ্ট পেতে হয়, গতির বাধা ঘটে, স্থিতির স্থানচ্যুতি হয়, তাই দুঃখও এসে পড়ে। এ পৃথিবীতে সবাই সবাইকে বাঁচিয়ে চলবে এই হচ্ছে আসল কথা। কেমন-করে এই

বাঁচানো ব্যাপার হতে পারে সেইটে বোঝা কঠিন। "চাচা আপন বাঁচা" করলেই কি সব কর্ত্তব্য পালন করা হয়? আঁচড়টি লাগলনা, দিব্যি আরামে গায়ে ফুঁদিয়ে চল্‌লাম, তবেই কি সব ভাল হল? ইংরাজীতে যাকে goody goody বলে তাই কি জীবনের আদর্শ? মানুষ এম্নিভাবে চারিদিক দিয়ে দশের সঙ্গে জড়িত যে একের মাথায় যে আঘাতটা পড়ে, সেটা অপরকেও বাজে। নিজেকে বাঁচাতে হলে অপরের জীবনে অনধিকার চর্চ্চা করা সঙ্গত নয়। নিজের দাবী-দাওয়া যদি গণ্ডী পেরিয়ে না যায় তবেই অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সাম্যরক্ষাই জীবনের মূলসূত্র। কিন্তু এটাও তো দেখতে পাই বিষমতাই অনেক স্থলে, মুক্তির, স্বাধীনতার সহায়। লোকে বলে golden mean—কিন্তু মধ্যপথ কতকগুলি বিষয়ের একেবারেই নেই। সত্যের সঙ্গে সর্ত্তকরা চলেনা, আর মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সত্যকে একেবারে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে হয়,—রাজপুত-রমণীরা যেমন করে জহরব্রত পালন কর্ত্তেন। আর মিথ্যাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন না করলে গতি কোথায়! খাঁটি কে খোঁজে? রংচঙে মিথ্যা বড় চমৎকার, তাকে কতরকমে পাওয়া যায়,—একেবারে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু! কিন্তু যার এ মোহ কেটে গিয়েছে, পরিষ্কার আলোতে যে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছে, জীবন কি, তার পক্ষে এমন অবাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা যে অসম্ভব! যা অসম্ভব তা সম্ভব হয় না এই মস্ত ভরসা! গতি মুক্তি হতেই হয়। মনের সম্মুখ হতে এক ছাড়া সবই মুছে যায়। সেই এককে, সত্যকে বরণ করতে হয়, তার জন্যে দুঃখকে গ্রহণ করতে হয়, তবেই জীবনের কোনো সাফল্য যদি আসে। তখন দ্বিধা, দো-মনা করার সময় থাকে না। ভগবান শুধু দুঃখই দেন, সে দুঃখও নিষ্ফল—এ কখনো হয় না। জীবনের সন্ধিক্ষণের রহস্য নিরাকরণ হয়। দৃষ্টি আসে, শ্রবণ-শক্তি প্রখর হয়, লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আদেশ পরিষ্কার শোনা যায়, জীবনের গতি আর কিছুতেই স্থগিত হয়ে থাকে না।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শেমুষী

(গল্প)

সেদিন মান্‌থলি টিকিট রিনিউ করবার দিন; তার উপর সাগরযাত্রীর ভিড়; ষ্টীমার ঘাটে বিষম গোলমাল লেগেছে। জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব দেখে ব্রীজের ধারে ফুট-পাতের উপরে যেখানে অনেকগুলো নাগা সন্ন্যাসী ধূনী জালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে সেইখানে অশথগাছের তলায় আমি একা দাঁড়িয়েছি এমন সময় রাস্তার ওপার থেকে

অবিন টিকিট কিনে হন্‌-হন্‌ করে আমার কাছে ছুটে এসে বল্লে—"ওহে শেমুষী দেখবে তো এসো।"

লোকের ভিড় ঠেলে জাহাজে উঠে দেখি ফার্ষ্ট ক্লাসে রোজ অবিন যেখানটায় বসে সেইখানে একটা লোক;—চেহারাটা বেশ গম্ভীর, পরণে লুঙ্গী, গায়ে বেরালের লোমের একটা আলখাল্লা। আর তার মাথায় একটা অদ্ভুত টুপি—তেমন টুপি আমি কখনো দেখিনি—কতকটা টোপর, কতক পাগড়ী, কতকটা যেন বিলিতী ষ্ট্রে-হ্যাট!

ষ্টীমারে উঠেই অবিন আমার হাত ছেড়ে সেই লোকটার দিকে সোজা এগিয়ে চল্লো। আমি দেখলেম অবিনের দুই চোখের মাঝখানে একটা ভ্রূ-কুটি বিদ্যুতের মতো চম্‌কে গেল। অবিন যেখানটিতে বসে লোকটা ঠিক সেইখানেই বসেছে! তিন বৎসরের মধ্যে বেঞ্চের ঐ অংশটুকু থেকে অবিনকে বেদখল করেছে এমন লোক—কি সাদা, কি কালো—আমি তো দেখিনি। লোকটার কপালে কি আছে ভেবে আমি বেশ-একটু চিন্তিত হয়েছি এমন সময় অবিন দেখি "ইয়েঃ সম্‌স্‌"—বলে লোকটাকে প্রকাণ্ড এক সেলাম বাজিয়ে অতি ভালোমানুষের মতো আমার পাশে পিছনের বেঞ্চিতে এসে বস্‌লো! লোকটা অবিনের দিকে ফিরেও চাইলে না; সে কেবল নিজের বাঁ-হাতখানা সাপের ফণার মতো বাঁকিয়ে অবিনের মুখের কাছে একবার দুলিয়ে গট্‌ হয়ে বসে রইল। খুঁটি-কাটা ময়ূরের মতো অবিনকে একেবারে মুহ্যমান দেখে আমার আজ যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমনি বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। অবিনকে এ-রকম করে দমিয়ে দিতে পারে এমন লোক আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমি তাকে চুপিচুপি বল্লুম—"ওহে এই ভাগীরথীতীরে এবং নীরে এতকাল তুমি একা সিংহাসনে বিরাজ কচ্ছিলে, আজ আবার এ কোন্‌ ভাসুরক এসে উপস্থিত হল হে?" অবিন আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে কেবল ইঙ্গিতে আমায় চুপ করতে বলে চোখ বুজে চুরুট টানতে লাগ্‌ল। নদীর মাঝ দিয়ে সারা পথটা তার মুখে আজ কথা নেই। আমিও চুপ করে চেয়ে রয়েছি। দূরে দেখা যাচ্ছে বালির চড়ার উপরে গোটা-কতক নৌকা কাত হয়ে পড়ে আছে। আরো দূরে সবুজ একটা আকের ক্ষেত; তার পিছনে একটা কলের চিম্‌নি থেকে একটু-একটু ধোঁয়া উঠ্‌ছে; একটি শঙ্খচিল নীল আকাশ থেকে আস্তে আস্তে জলের দিকে নাম্‌ছে।

নদীনীর বালুতীর দুপুরের আলোয় মিলে আমাদের চারিদিকে যখন একটা দিবাস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে আর আমাদের জাহাজখানা কুটীঘাট থেকে আস্তে আস্তে ক্রমে ওপারের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে ঠিক সেই সময় অবিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল—"ওহে সে লোকটা গেল কোথায়?"

সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখি সেই প্রথম-শ্রেণীর বেঞ্চখানা একেবারে খালি—সেই অদ্ভুত টুপির আর চিহ্নমাত্র নেই। জাহাজ তখনো জেটি ছাড়ায়নি; আমি সেদিকে চেয়ে দেখলুম জনমানব নেই, গ্রামের পথ ঘাট-পেরিয়ে সোজা দেখা যাচ্ছে—সেখানে একটা মড়াখেগো কুকুর রাস্তার

মাঝখানে ধূলোর উপরে মুখ-গুঁজড়ে শুয়ে রয়েছে—আর অন্য পথিক কাউকে দেখা গেল না। অবিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের এধার থেকে ওধার, নীচের তলার কামরা মায় ইঞ্জিন ঘরটা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসে, সারেং থেকে সুক্‌নী খালাসী এবং সকল যাত্রীদের একে একে সেই লোকটার হুবহু বর্ণনা দিয়ে জেরা করে দেখলেন সে-লোকটাকে এ-জাহাজে উঠতেও কেউ দেখেনি, বসে থাকতেও কেউ দেখেনি, এবং কোনো ঘাটে নেমে যেতেও কেউ দেখেছে কিনা তাও জানা গেল না। আমরা দুজনে গিয়ে সেই সাম্‌নের বেঞ্চি-খানা এবং তার চারিদিকটা এমন-করে সন্ধান কল্লুম যে সেই লোকটার লোমশ আলখাল্লার যদি একগাছিও লোম সেখানে থাকতো তবে সেটা আমাদের কাছে ধরা পড়তোই পড়তো। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! লোকটা এলো, বস্‌লো এবং চলে গেল অথচ পৃথিবীর কোনোখানে একটু আচড়ও পড়ল না! কোনো কোনো দিন ঘন কুয়াসার মধ্যে দিয়ে পারাপার করবার সময় দেখেছি কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ একখানা নৌকা তার দাঁড়িমাঝি মালপত্র রসারসি নিয়ে চকিতের মতো কুয়াসার গায়ে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল,—এ লোকটা ঠিক যেন তেমনি করে আমাদের দেখা দিলে! আমার মনের মধ্যে কেমন যেন শীত করতে লাগল। প্রথম-শ্রেণীতে অবিনের সঙ্গে একলা বসে থাকতে আমার ভালো লাগলো না; আমি তৃতীয়-শ্রেণীতে যেখানে ইঞ্জিনের ধারে আগুনের তাতে কতকগুলো চিনেম্যান তাদের ফ্যাকাসে মুখগুলো তাতিয়ে নিচ্ছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

"শেমুষী" বেঞ্চ খালি করে দিলেও অবি কিন্তু আজ তার নিজের সিংহাসনে বসতে বড় উৎসাহ প্রকাশ কল্লে না। সে বেঞ্চি-খানার পিঠে হাত রেখে চুপকরে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে খানিক চুরুট টেনে-টেনে দোতালায়—যেখানে সারেংসাহেব চাকা ঘুরিয়ে কম্পাসের কাঁটা দেখে জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছে—মই বেয়ে সেখানে উঠে গেল। সাধারণ যাত্রীর দোতালায় যাবার হুকুম নেই, আমি নীচেই রইলুম। কিন্তু অবিনের গতি-বিধি সর্ব্বত্র। সে দোতালার উপর থেকে দিব্যি আমাদের নাকের উপর দুই গা ঝুলিয়ে সারেংসাহেবের হুঁকোর মজলিস জম্‌কে তুল্লে। সারা পথটা তার আর কোনো খবরই পেলুম না। ফিরতি ষ্টীমার তখন আহিরীটোলার ঘাটে ভিড়ছে, এমন সময় অবিন নেমে এসে বল্লে—"ওহে কাল আবার আসছো তো?"

আমি বল্লুম—"আসছি, কিন্তু এ জাহাজ-খানার দিকেও আসছি নে!" ঘাটে নেমে জাহাজখানার নাম দেখে নিলুম 'প্রতিভা'।

তার পরদিন থেকে বড়বাজারের ঘাটে 'প্রতিভা'টি বাদ দিয়ে এ-লাইনের আর যতনামের যত জাহাজ সব কখানাতে চড়ে বেড়াই কিন্তু অবিনকে আর দেখতে পাই নে! সে যে কখন কোন্ জাহাজ ধরে যাতায়াত করে তার আর সন্ধান পাই নে। দূরবীন লাগিয়ে দেখেছি 'প্রতিভা'র ডেকে তার জায়গা শূন্য পড়ে আছে! লোকটা গেল কোথা? শেমুষীর মতো তাকেও

পা-ঢাকা হতে দেখে আমি একদিন সন্ধ্যার সময় তাদের আহিরীটোলার ঘাটে নেমে জেটি পেরিয়ে অবিনদের বাড়ির দিকে চলেছি এমন সময় রাস্তার মোড়ে দেখি অবিন হন্‌-হন্‌ করে ষ্টীমার-ঘাটের দিকে চলেছে; সঙ্গে আলবোলা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে তার চাকর গোবিন্দ। তখন সন্ধ্যা ৭টা হয়ে গেছে। বড়বাজার থেকে শেষ-ষ্টীমার রাতের অন্ধকারে ভেঁপুর শব্দ এবং সার্চ্চ লাইটের আলোর সুঁড় দোলাতে দোলাতে রক্তচক্ষু একটা বিরাট জলজন্তুর মতো আস্তে আস্তে জেটির গায়ে এসে থাম্‌লো। অবিনকে এতরাত্রে জাহাজে উঠতে দেখে আমার ভারি-একটা কৌতূহল হল। আমি তার অসাক্ষাতে ষ্টীমারে উঠে থার্ড ক্লাসের একটা খালি বেঞ্চে শালমুড়ি দিয়ে বসলুম। আমি অবিন এবং গোবিন্দ ছাড়া আর একটি মাত্র সহযাত্রী একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ির আড়ালে চুপ করে বসে রয়েছে। জাহাজ অন্ধকার জল কেটে সন্তর্পণে চলেছে। তীরের আলো-গুলো কালো জলের গায়ে সাপ-খেলানো সোনার এক-একটা রেখা টেনে দিয়েছে। আকাশের আর জলের আঁধার এক হয়ে গিয়ে নদীটা অকূল সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে। এমন সময় অবিন আমার নাম ধরে ডেকে বল্লে—"ওহে ইয়ার, শেমুষীর অত কাছে বসা নিরাপদ নয়; এদিকে চলে এস।"

অবিনের চোখ এড়াতে পারি নি দেখে আমি তার কাছে গিয়ে বল্লুম—"এখানে আবার শেমুষী কোথায় পেলে?" অবিন একবার ঝুড়ি-কোলে যে মানুষটা, তার দিকে ঘাড় হেলিয়ে সুরু কল্লে—"শেমুষী কি একরকম? তারা নানাবেশে জগৎময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।—অভিধানে শেমুষী অর্থে দেখবে বুদ্ধি।" আমি বল্লুম—"বুদ্ধিমন্ত জীবমাত্রেই যদি শেমুষী হয় তবে তুমি-আমিও তো শেমুষী!" অবিন বল্লে—"না ওই বুদ্ধির সঙ্গে অতির যোগ হলে তবে হয় শেমুষী। যেমন তোমার ঠগী তেমনি শেমুষীর একটা দল এখনো আছে। আমরা যেমন কালেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরোই, এদেরও মধ্যে তেমনি অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে হয় শেমুষী। আজন্ম-শেমুষীও দুচারজন আছে। তারা কেমন জানো? হতভাগা লক্ষ্মীমন্ত, ধার্ম্মিক ও পাজি, ভদ্র অভদ্র, মহাত্মা এবং দুরাত্মা, সুবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, পাজি ছুঁচো, মহাশয় দুরাশয়, পণ্ডিত ও গোমূর্খ, সমালোচক ও গোবদ্দি, বুজরুগ ও বেচারা একত্র মেশালে যা হয় তাই। এরা স্মরণমাত্রে যেখানে খুসি যেতে পারে, যা খুসি তাই করতে পারে;—ঘটি-চালানো, বাটি-চালানো থেকে মায় তোমার লোহার সিন্দুকের ক্যাসবাক্স পর্য্যন্ত সরানো! হোসেন খাঁর যত বুজরুকী সব এঁদের জানা আছে। এঁরা ইচ্ছে করলে অফুরন্ত তূণ, অক্ষয় কবচ, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, বিশল্যকরণীর মলম—এমন-কি ঘুমের দেশের রাজকন্যাকেও তোমার মুঠোয় এনে দিতে পারেন। স্বর্গের অপ্সরী এঁদের দাসী; দেবতাগুলো হুকুমের চাকর, তার ভূতগুলো ইয়ার। মনে কল্লে একরাত্রের জন্যে এঁরা তোমাকে ইন্দ্রের অমরাবতীতে, কালীফের বোগদাদে, এমন-কি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়ে আনতে পারেন অথচ তোমার গায়ে একটু ঘাম দেবে না। এমনি এক-

জন শেমুষীকে সেদিন দেখেছ। কিন্তু আজ যে ঐ ঝুড়ি নিয়ে ওধারে তালোমানুষটি বসে আছে দেখছো, ওঁকে চিনেছ?"

লোকটা আমার একেবারেই অচেনা। অবিন আমার কানে-কানে বল্লে—"উনিই সেই দিনের শেমুষী; ওঁরই পাল্লায় একবার পড়ে একটা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটতে ছুটতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি! আবার উনি যে কার সর্ব্বনাশ করতে কিম্বা কার-বা কি ভালো করতে এখানে এসেছেন তাই ভাবছি।"

লোকটার চেহারায় কোনো-রকম শেমুষীত্ব ছিল না। আমি অবিনকে বল্লুম—"নির্ভয়ে তোমার শেমুষীর ইতিহাস বলে যাও, ও-লোকটা এখনি নেমে যাবে।"

অবিন আমার দিকে একটু ঝুঁকে বল্লে—"দেখবে তবে?" বলেই অবিন তার বুকের পকেট থেকে একটা বনমানুষের হাড়ের বাঁশী বার করে বল্লে—"এই হল শেমুষীদের বুকের হাড়ের বাঁশী। গান এবং এই বাঁশীর সুর এই দুই হচ্ছে শেমুষী তাড়াবার এক মাত্র ওস্তাদ। তুমি গান ধর আমি বাজাই।"

হাড়ের মধ্যে থেকে যে অমন সুর বার হয় তা আমার ধারণা হয়-নি এবং অবিনও যে এমন বাঁশী বাজায় তা আমি আগে জানতেম না। সুর যেমন গিয়ে অন্ধকারকে বিদ্ধ করলে অমনি মনে হল যেন রাত্রির নীল পর্দ্দা খুলে দলে-দলে তারা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে জলের শব্দ এতক্ষণ কানে আসে নি কিন্তু এখন যেন শুনি জলও ঐ সুরে, বাতাসও সেই সুরে তাল দিচ্ছে। আর মনে হল রাত্রির রং ক্রমে যেন পাতলা হয়ে আসছে। তখন শিবতলার শ্মশানঘাটের কাছে জাহাজ এসে স্থির হল। পারে একটা চিতার আগুন ধুধূ জ্বলছে। সেই লোকটা ঝুড়ি-মাথায় জেটিতে নেমে দাঁড়াল। আমি দেখলেম সেটা ঝুড়ি নয়, সেটা তার সেই টুপিটা। অবিন বল্লে—"দেখলে?" দেখতে আমার ভুল হয়-নি কিন্তু শেমুষীর সঙ্গে তার কি লড়াই বেধেছিল যখন তাকে প্রশ্ন কল্লুম সে বল্লে—"ভুলে গেছি, মনে নেই।"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

সা সা II সা সা সা। রা রা জ্ঞা I রজ্ঞা পমা জ্ঞা। রা সা ৷ ॥ সা র্সা র্সা।
তু মি ডা ক দি য়ে ছ ০ কো ন্ স কা লে ০ কে উ তা

ণধা পা ধা I না ৷ ৷ ৷ ধা পা I মা মা জ্ঞা। রা সা রা I রজ্ঞা পমাজ্ঞা।
জ্ঞা ০ নে না ০ ০ ০ তু মি ডা ক্ দি য়ে ছ ০ কো ন্ স

রা সা। I ৷ ৷ ৷। গা গা গা I গা গা গা। গা র্গ ৷ I সা গা ৷।
কা লে ০ ০ ০ ০ আ মার ম ন্ যে কাঁ দে ০ আ পন ০

গা মা গ I গমা পমা গা। মা ৷ ৷ I রা মা জ্ঞরা। সা ন্া ন্া I
ম ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ কে উ তা মা ০ নে

মা ৷ ৷। ৷ ৷ ৷ II
না ০ ০ ০ ০ ০

II {পা পমা পা। মা জ্ঞা মা I পা না না। র্সা র্সা ৷ I না র্সা র্জ্ঞা।
ফি রি ০ আ মি ০ উ দা স্ প্রা ণে ০ তা কা ই

[৷]
র্রা র্সা র্সা I সর্রা র্সা না। না র্সা (নর্সরা)} I গর্সা ণা ণা। ধা পা
স বা র মু খে র পা নে ০ তো মা র ম ত

৷ I পা পধা। ণর্সা র্সা ণা ণা I পা ধা পা। মা গা গা I মা। ৷ ৷।
০ এ ম ০ ন্ টা নে কে উ ত টা ০ নে না ০ ০

৷ ৷ জ্ঞরা সনা II
০ ০ তু মি

II ৷ ৷ ন্া। সা রা জ্ঞা I রা মা জ্ঞা। রা সা সা I ৷ ৷ গা।
০ ০ বে জে ও ঠে প ন্ চ মে স্ব ০ ০ র কেঁ

গা গা গা I সা গা মা। গা প মা মা I রা জ্ঞা জ্ঞা। রা জ্ঞা জ্ঞা I
পে ও ঠে ব ন্ ধ এ ঘ র বা হি র হ তে ০

রা রজ্ঞা মজ্ঞা। রা সা রা I রাপা মা। রজ্ঞা রমা জ্ঞরা I
দু য়া ০ রে ক র কেউ ত হা ০ নে

সা ৷ ৷। ৷ ৷ ৷ II
না ০ ০ ০ ০ ০ ০

[নর্সা না]
II {(পা পমা) পা। মা জ্ঞা মা I পা না ৷। না র্সা ৷ I না র্সা র্জ্ঞা।
আ কা ০ শে কা র ব্যা কু ০ ল তা ০ বা তা স

র্রা র্সা ৷ I র্র্সা না না। না র্সা র্সা} I র্ন্র্স্সা না ৷। ধা পা পা I
ব হে ০ কা র বা র তা এ প ০ থে সে ই

পা পধা ণর্সা। র্সা ণা ধা I পা ধা পা। মগা রা গা I মা ঃ ঃ।
গো প ০ ন্ ক থা কে উ ত আ ০ নে না ০ ০

ঃ ত্তরা সনা II II
০ "তু মি"

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অলৌকিক

আদিম মানব যখন বিরাট বিশ্বের দিকে প্রথম চাহিয়া দেখিয়াছিল, তখন সে তাহাকে বুঝিতে না পারিয়া শিশুর মতই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই যে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎ-বজ্র, স্থাবর-জঙ্গম, জড়-চেতন,—সকলই তাহার কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্যে জড়িত হইয়া দেখা দিয়াছিল। বিশ্বের এই বিচিত্র রহস্য বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ অসম্ভব কল্পনা করিয়া সে মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছিল। বিবিধ অদ্ভুত দিব্যলোক, আশ্চর্য্য শক্তিশালী প্রাণীসমূহ, অগণ্য বহুরূপী দেব-দেবতা,—এই সকল দিয়া মানুষ তখন স্বতন্ত্র এক মানস-জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

পরে যতই মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই সে কল্পনা ছাড়িয়া সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। যুক্তি, বিচার ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে বিশ্ব-রহস্যকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাধনায় সিদ্ধিও কিয়ৎ-পরিমাণে মিলিল,—মানুষ বিশ্বের রহস্য-যবনিকা দুই-এক জায়গায় একটু-আধটু ফাঁক করিয়া ফেলিল; আশে-পাশে প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডারের দুই-একটা রত্নও কুড়াইয়া পাইল। ফলে তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্রই মানুষ তাহার বিজয়-পতাকা উড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু সে যতই চেষ্টা করুক, এই জ্ঞানের দিকে—বুদ্ধিশক্তির দিকে মানুষের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। আর বিশ্বের মধ্যে মানুষের বিজয়-যাত্রা এই সীমার গণ্ডিতে পদে পদে থামিয়া যাইতেছে। এই অনন্ত-অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কত-টুকুই বা মানুষের স্থান, আর কত সামান্য কত তুচ্ছ তাহার শক্তি, মানুষ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই সেটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে। একটা রহস্য-যবনিকা উঠিতেছে তো দ্রৌপদীর বসনের ন্যায় সহস্র সহস্র রহস্য-যবনিকা তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিতেছে; একটা সমস্যার মীমাংসা হইতেছে তো, তাহার চারিদিকে লক্ষ লক্ষ নব সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে! এইরূপে মানুষের জ্ঞান যতই প্রকৃতিকে জিতিতে চাহিতেছে, প্রকৃতি ততই দৈত্য-

লোকের মায়া-তুরঙ্গের মতো আরও দূরে সরিয়া পলাইতেছে।

জ্ঞানের দিকে—বুদ্ধিশক্তির দিকে একটা সীমা-রেখা টানা থাকিলেও মানুষের আর একটা দিক আছে, যাহার সীমা নাই। সেটা হইতেছে মানুষের প্রেমের দিক। এই প্রেমের দিক দিয়াই মানুষ অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে,—বিশ্বের মূলরহস্যের সঙ্গে একটি অখণ্ড যোগসূত্র বাঁধিতে পারিয়াছে। যে দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা মানুষের জ্ঞানকে চিরদিন ঘুলাইয়া দিতেছে, এই প্রেমের কাছেই কেবল তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠে। যিনি প্রকৃতির সহস্র আবরণের আড়ালে চিরদিন আপনাকে লুকাইয়া রাখিতেছেন, মানুষের এই প্রেমের শক্তিতেই কেবল তিনি ধরা পড়েন। আর, এই প্রেমের শক্তিতেই একদিকে যেমন মানুষ অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে, অন্যদিকে তেমনই বিশ্বের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে;—একদিকে পরম তত্ত্বের সঙ্গে যেমন তাহার যোগ সাধিত হয়, অন্য দিকে তেমনই সর্ব্বভূতের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠে।

আসল কথা, মানুষের যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব তাহার জ্ঞানের দিক দিয়া—বুদ্ধির দিক দিয়া নহে;—প্রেমের দিক দিয়াই তাহার যথার্থ মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের গৌরব। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই প্রেমের পরিণতিতে, সমাজের শ্রেষ্ঠ কার্য্য এই প্রেমবিকাশের সহায়তায়, মানুষের শ্রেষ্ঠ উদ্বর্ত্তন এই প্রেমের উৎকর্ষে। ইহাই মানুষের বিশিষ্ট সম্পত্তি, জীবজগতে তাহার স্থান-নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি।

মানুষ যে তাহা কতকটা না বুঝিতে পারিয়াছে, এমন নয়। কিন্তু বুঝিয়াও বহু পুরাতন অভ্যাস তাহার পক্ষে ত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাই সভ্যতার শৈশব-যুগের ন্যায় এখনও সে বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিজয়-যাত্রাতেই মত্ত রহিয়াছে;—বিশ্বের পরম লোভনীয় ঐশ্বর্য্য-মন্দিরের রহস্য ভেদ করিবার জন্যই বেশীর ভাগ সময় কাটাইতেছে। কিন্তু সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া সেই অনন্ত রহস্যের দরজায় মাথা কুটিয়াও তাহার বিশেষ-কিছু লাভ হইতেছে না! আপনার অক্ষমতা পদে পদে তাহাকে পীড়া দিতেছে ও বিফলতার অতৃপ্তিতে সমস্ত মন ভরিয়া উঠিতেছে।

মানুষের এই অক্ষমতা ও অতৃপ্তির ভিতরেই অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের অবসর। মানুষ জটিল বিশ্ব-রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছে না, কেবল কতকগুলি অসার কল্পনা-জাল রচনা করিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতেছে; প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইতেছে, আর কতকগুলি মনগড়া কথাকে 'অতিপ্রাকৃত' নাম দিয়া, প্রকৃতির দুর্ভেদ্য দুর্গের ফটক পার হইবার একটা কিনারা হইয়াছে ভাবিয়া তুচ্ছ আরাম লাভ করিতেছে। এইদিকেই মন্ত্রতন্ত্র, যোগযাগ, তুকতাক, বুজরুকী, ভূত-প্রেত, ডাকিনী-শাখিনী, মারণ-উচাটন, স্তম্ভন-বশীকরণ প্রভৃতি স্তূপীকৃত ভাবে সাজানো রহিয়াছে। এইদিক দিয়াই লোক-লোকান্তর হইতে নানা অদ্ভুত, অশরীরী প্রাণী আসিয়া, মানুষের এই মাটীর পৃথিবীতে, অতি

সাধারণ ভাবে আনাগোনা করিতেছে; ফলে, দেশকালের সীমাকে তুচ্ছ করিয়া মানুষের মন নানা অপরূপ খেয়ালের দৃষ্টিতে মাতিয়া উঠিতেছে। কিমিয়া-বিদ্যা এই পথেই স্বর্গলোভে যুগ-যুগান্তর বৃথা ভ্রমণ করিয়াছে; বিধাতার পুরাতন সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া এইদিক দিয়াই বিশ্বামিত্র নূতন সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন; আর রাবণ স্বর্গে যাইবার একটা পাকা সিঁড়ি এই দিক দিয়াই গড়িয়া তুলিবার ফিকির করিয়াছিলেন। ইহার এমনই মোহিনী শক্তি যে, মানুষের মন অতি সহজেই ইহার বশীভূত হইয়া পড়ে, সম্মুখের কঠোর সত্যকে ত্যাগ করিয়া লোভনীয় কাল্পনিক মায়ামৃগের পাছে পাছে ছুটিতে থাকে।

মানুষের মনের উপর অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃতের এই অসীম প্রভাব কোনদিনই প্রকৃত পক্ষে হ্রাস পায় নাই। জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা যতই বাড়িতেছে, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের সীমা-রেখা দিকচক্রবালের ন্যায় ততই সরিয়া সরিয়া যাইতেছে,—এই মাত্র তফাৎ। নব বৈজ্ঞানিক যুগে অলৌকিকের মায়া হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরই নূতনভাবে তাহার প্রতিমা গঠন করিয়া তাহার পূজা চলিতেছে, মানুষের সসীম মস্তিষ্কের ভিতরে নানা অভিনব শক্তির কল্পনা করিয়া, স্থূল জগতের বাহিরে নানা সূক্ষ্ম লোকের ও জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্থির করিয়া অলৌকিক চেষ্টার পরিচয় দিতে আমাদের কোনই ত্রুটি নাই। আমাদের জ্ঞান ও শক্তির সম্বন্ধে আমাদের এতই অবিশ্বাস ও অতৃপ্তি যে, কণামাত্র অতিপ্রাকৃতের কাছে আমাদের সমস্ত জ্ঞান-গরিমা লঘু করিয়া দেখিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না।

সেকালে মহাপুরুষ, অতি-মানুষ বা শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে যাঁহাদিগকে মনে করা হইত, তাঁহাদের শক্তি ও মহত্ত্ব এই অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের উপরই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের পৌরাণিক বীর ও মহা-পুরুষগণের প্রায় প্রত্যেকেই এই অলৌকিক শক্তির আধার। কেহ হয় ত বিশাল সাগর এক লাফে উত্তীর্ণ হইতেন, কেহ বা সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতেন, আর কেহ বা এক বাণে সাগর শুষিতেন কিংবা সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতেন। ইচ্ছামত ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নখদর্পণে জানা, অশরীরী প্রাণীর ন্যায় শূন্যে ওড়া, তপস্যার বলে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলা, ইহাই তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক ছিল। আমাদের দেশের ন্যায় প্রতীচ্যেও এই একই ভাব। গ্রীক, রোমান এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পুরাণও সেই অলৌকিক শক্তিরই রাজত্ব। সেকালের দেবতারাও মানুষের চেয়ে এই অলৌকিক শক্তির বলেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মানুষ যে প্রাকৃতিক শক্তির অধীন, তাঁহারা অনায়াসে সে-সকলকে তুচ্ছ করিতে পারিতেন; মানুষের পক্ষে যাহা অদ্ভুত ও অসম্ভব, তাঁহাদের পক্ষে তাহা ইচ্ছামাত্রই ঘটিতে পারিত বলিয়াই তাঁহারা দেবতা ছিলেন। চরিত্র বা স্বভাবগত শ্রেষ্ঠত্ব—প্রেমের মহত্ত্ব মোটেই তাঁহাদের দেবত্বের মাপকাঠি ছিল না। বরং সে হিসাবে অনেক স্থলে তাঁহারা যে মানুষের

অপেক্ষা হীন ছিলেন, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মানব-সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রেমই যে সব-চেয়ে বড় জিনিষ, যথার্থ মনুষ্যত্ব যে প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা ক্রমে জানা যাইতে লাগিল। তখন আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র অলৌকিকের উপর নির্ভর করিত না, তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব বা প্রেমের বিকাশও প্রয়োজনীয় বোধ হইতে লাগিল। মানুষ যে কত বড় তাহা বুঝিতে হইলে, কেবলমাত্র তাহার অতিপ্রাকৃত শক্তিরই হিসাব-নিকাশ পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হইল না,—তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব কতটা বিকশিত হইয়াছে, প্রেম কি পরিমাণে তাহার মধ্যে জাগ্রৎ হইয়াছে,—স্নেহ, দয়া, ভালবাসা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, ত্যাগ, প্রভৃতি কি পরিমাণে তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরেও দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাই তখনকার যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের মনুষ্যত্ব ও চরিত্র-বলও লোকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে ঐতিহাসিক যুগের মহাপুরুষেরা কেবলমাত্র অলৌকিক বাজিকর নন্, শ্রেষ্ঠ মানুষও বটেন।

কিন্তু বলিয়াছি ত, যে অলৌকিকের মোহ কোনদিনই মানুষ কাটাইতে পারে নাই। তাই ঐতিহাসিক যুগেও, মহাপুরুষদের ধারণা বিষয়ে, মানুষ যেমন তাঁহাদের ভিতরকার যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশকেও অনুভব করিয়াছে, তেমনই তাহাতে ইচ্ছামত অলৌকিকের ভাগ না মিশাইয়াও ছাড়ে নাই। বরং এই অলৌকিকের ভাগ কোন কোন স্থলে এত বেশী যে, যথার্থ মনুষ্যত্বের গৌরব তাহার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা তাঁহার সাম্য ও মৈত্রীর কথা ততটা বুঝে নাই, তাঁহার নানা অলৌকিক শক্তির কল্পনা যতটা বেশী বুঝিয়াছিল। যীশুখৃষ্টের আত্মত্যাগ ও ভগবানে নির্ভরতা খৃষ্টান-জগৎ যতটা না ভাবিয়াছে, তাঁহার জলের উপর পায়ে-হাঁটিয়া নদী পার-হওয়া, স্পর্শমাত্রে কুষ্ঠরোগীর রোগমুক্তি বা ইঙ্গিতমাত্রে ঝঞ্ঝাবাত নিবারণ প্রভৃতির হিসাব-নিকাশের গল্প লইয়া তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের মহান্ বিশ্ব-প্রেম ও অতুল ভাবতন্ময়তার কথা ভাবিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি নাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা অদ্ভুত অতিপ্রাকৃতের ভাগ মিশাইতেও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও এই অলৌকিকের পসার কিছুমাত্র কমে নাই। আজ আমরা মনুষ্যত্বকে বেশী পরিমাণে বুঝিয়াছি, প্রেমের মাহাত্ম্য মানুষের মনের উপর আজ অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজও মানুষের যথার্থ শ্রেষ্ঠত্বকে অলৌকিকের মায়া-স্পর্শ হইতে আমরা একটুও মুক্ত করিতে পারি নাই বলিলেও হয়। আজও শ্রেষ্ঠ মানুষ বা মহাপুরুষের ধারণায়,—মনুষ্যত্বের যথার্থ গৌরবে ও প্রেমের মহত্ত্বে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। তাঁহাদের মধ্যে যতক্ষণ না কিছু অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির আবিষ্কার করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের প্রাণ আইঢাই

করিতে থাকে। সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই, অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও এই মোহ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। সাধু-সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ, ভক্ত প্রেমিকদের মধ্যে চরিত্র-গৌরব ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের খোঁজ বড় বেশী লোক লয় না। তাহাদের কোনরূপ বুজরুকী বা অলৌকিক কিছু আছে কি না, সেইদিকেই সকলের ঝোঁক থাকে বেশী। আসল কথা, মানুষ যে কত বড়, তাহার প্রেমের মধ্যেই যে তাহার দেবত্ব পরিস্ফুট, এ ধারণা এখনও আমাদের ভাল-করিয়া হয় নাই। তাই অভ্যাস-বশে আসল মানুষটাকে আমরা এত ছোট করিয়া দেখি যে, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের কাছে ধার না করিলে কিছুতেই আমাদের মন উঠে না।

অবতারবাদের মূলে এই অলৌকিকের দাবী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আমরা অবতারবাদ অবিশ্বাস করিবার কথা বলিতেছি না। কিন্তু যথার্থ মনুষ্যত্ব, এবং প্রেমের মধ্য দিয়া মানবে দেবত্বের অভিব্যক্তি যতদিন না আমরা অনুভব করিতে পারিব, ততদিন অবতার-বাদের যথার্থ সার্থকতা বুঝিতে পারিব না; বরং অলৌকিকের মায়াদণ্ড ছুঁয়াইয়া যেখানে-সেখানে অবতারের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যত্বের আদর্শকে আমরা খাটো করিয়া ফেলিব। হইতেছেও তাহাই। মানুষকে যথার্থ গৌরব আমরা দিতে পারিতেছি না। মানুষ যে প্রেমবলে কত মহৎ হইতে পারে, তাহার চরিত্র-গৌরবে দেবত্বের আদর্শকেও সে যে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, এ-কথা ভাল-করিয়া না বুঝিয়া আমরা মানুষের মধ্যে মহত্ত্বের অভিব্যক্তি দেখিলেই, সেখানে ঈশ্বর গড়িয়া তুলিতেছি; মহাভক্ত বা মহাপ্রেমিকের মধ্যে মানুষকেই বৃহৎভাবে উপলব্ধি না করিয়া যেখানে-সেখানে ঈশ্বরকে স্বর্গরাজ্য হইতে নামাইয়া আনিতেছি। ইহাতে মানব-সমাজের, মানব-প্রকৃতির পূর্ণ পরিণতির —তাহার জীবনের চরম লক্ষ্যের সাধনার অপরিমেয় ক্ষতি সাধন হইতেছে। আর যাঁহারা মহাপুরুষদের চেলা ও ভক্ত সাজিয়া অতি-মাত্রায় এই অলৌকিকের পূজায় মন দিতেছেন, তাঁহারা যে এক-হিসাবে মনুষ্যজাতির ও মানব-সভ্যতার ঘোরতর শত্রু, এ-কথা বলিলে বোধহয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

পিতা-পুত্র

(শাহজাহান ও আওরংজেব) (১)

সামুগড়ের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—দারার ভাগ্যলক্ষ্মী দারাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; মুগল রাজলক্ষ্মী আওরংজেবের অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন; অতঃপর পিতা-পুত্রে যে ঘটনা ঘটে, আমরা তাহাই বলিতেছি।

সামুগড়ের যুদ্ধের তিন কি চারি দিবস

(১) এই প্রবন্ধ-রচনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার-মহাশয়ের "আওরংজেবের ইতিহাস", "আওরংজেব

পরে, আওরংজেব এবং মুরাদ দুর্গ হইতে তিনমাইল দূরবর্ত্তী আগ্রার সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ উপবনে উপনীত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা আওরংজেবের একজন বিশ্বস্ত, বাক্‌পটু এবং চতুর খোজার প্রমুখাৎ শাহজাহানকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর নামে বৃদ্ধ বাদশাহকে অভিবাদন করিয়া জানাইলেন, বাদশাহের প্রতি আওরংজেবের ভক্তি ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে; সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, যদিও তাহা একমাত্র দারার অত্যধিক দুরাকাঙ্ক্ষা ও কু-অভিপ্রায়ের জন্যই ঘটিয়াছে, তথাপি তাহার জন্য তাঁহারা দুঃখিত। তিনি বিশেষ সরলতার সহিত আওরংজেবের মহামান্য পিতৃদেবের স্বাস্থ্যোন্নতিতে অভিনন্দন-জ্ঞাপন এবং পিতার আদেশ গ্রহণ ও প্রতিপালনই যে তাঁহার আগ্রায় উপনীত হইবার একমাত্র কারণ, তাহাও নিবেদন করিলেন।

বাদশাহ পুত্রের ব্যবহারে অনুমোদনের ভাব দেখাইলেন ও বশ্যতা স্বীকারে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আওরংজেবের কপটতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তার কথা অবশ্যই তিনি অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই সকল বাক্যে তিনি আস্থা স্থাপন করিলেন না; তথাপি অটলতা প্রদর্শন, প্রজাবর্গের নিকট উপস্থিত হওয়া ও ওমরাহগণকে একত্র না করিয়া তিনি নিজের চতুরতা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আওরংজেব এই উভয় বিষয়েই সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং পিতা পুত্রের জন্য যে জাল রচনা করিতেছিলেন, চতুর পুত্রের কৌশলে পিতা স্বয়ং যে সেই জালে নিপতিত হইবেন, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই! শাহজাহান আওরংজেবকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আওরংজেব দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং যদিও তিনি পুনঃপুনঃ পিতার সহিত সাক্ষাতের দিন স্থির করিলেন, তথাপি প্রত্যহই দিন পরিবর্ত্তন করিয়া পরবর্ত্তী দিবস স্থির করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে গোপনীয় চক্রান্ত চলিতে লাগিল এবং দুর্গ-অবরোধও হইল। প্রথমতঃ দুর্গাবরোধ করিয়া আওরংজেব কোন সুবিধা পান নাই। অবশেষে আওরংজেব দুর্গের জল রুদ্ধ করিলেন। আগ্রাদুর্গ সুদৃঢ় ও গভীর পরিখাবেষ্টিত হইলেও, পানীয় জলের অভাবে সকলে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তখন শাহজাহান আওরংজেবকে এই মর্ম্মস্পর্শী চিঠিখানি পাঠাইলেন :—

"বাবা আমার! বীর আমার! এইমাত্র কাল আমি নয় লক্ষ অশ্বারোহীর অধীশ্বর ছিলাম। আর আজ আমার জল দিবার একটী চাকরের অভাব!

সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী" ও প্রবাসীতে লিখিত প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক আরভাইনের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এবং বার্নিয়ারের পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যাঁহারা বার্নিয়ারকে প্রমাণস্বরূপ (authority) গ্রহণ করিতে নারাজ, তাঁহাদিগকে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে তাঁহারা যাঁহাকে প্রমাণ (authority) বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই আরভাইনও বার্নিয়ারকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Indian Antiquary ১৯১১ দ্রষ্টব্য)। বার্নিয়ার 'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

হিন্দুদের যাহা হউক ধন্য বলি,
তাহারা মৃত (আত্মীয়)কে জলদান করে।
কিন্তু, হে পুত্র, তুমি এমন অদ্ভুত মুসলমান যে আমি জীবিত থাকিতে জল হইতে বঞ্চিত করিয়াছ।"

আওরংজেব চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! আর বেশী লেখা বেয়াদবি।"

বাদশাহ নিরুপায় হইয়া বিজয়ী নির্ম্মম পুত্রকে এই চিঠি পাঠাইলেন :—

"পিতৃভক্তি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ! আমাকে শত্রু বলিয়া মনে কর এবং আমাকে যে-সব কষ্ট দিতেছ তাহাতে তোমার ইহ-জগতে লজ্জা ও পরকালে সর্ব্বনাশ হইবে। শেষ বিচারের দিন কি বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে? যুদ্ধ জয় করিয়াছ বলিয়া উদ্ধত হইও না। আশা করিও না ভাগ্য চির-কাল তোমার পক্ষে থাকিবে, কারণ ভাগ্য বড় পরিবর্ত্তনশীল। যাহাতে নিজের ক্ষতি হইবে এরূপ কাজ করিও না। জগৎজন আমার রাজত্বের গৌরব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ ছিল, ইহার শেষাংশ তুমি বিষময় করিও না। সাধু পুত্রের মত কার্য্য কর, যেন তোমার মান ও যশ চিরস্থায়ী হয়।"

আওরংজেব উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি বাধ্য পুত্র। অধুনা যাহা করিয়াছি তাহার কারণ এই যে ভয় ও নিরাশায় আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চরণে উপস্থিত হইতাম। এখন দুর্গটা আমার লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিউন; তৎপরে আমি বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিব।"

আগ্রাদুর্গ আওরংজেবের হস্তে সমর্পিত হইল। বৃদ্ধ বাদশাহ বন্দী হইলেন।

শাহজাহান প্রজার সুখ ও রাজ্যের শান্তির জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেন। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য সমস্ত দিবা-ভাগকে ভাগ করিয়া তিনি নিয়মমত সময়ে প্রত্যেক কাজে নিযুক্ত হইতেন। ভোগ-বিলাসের ইচ্ছাকে তিনি সর্ব্বদা দমন রাখিতেন। ফলে, হিন্দুস্থান তাঁহার রাজত্বকালে অতুলনীয় সমৃদ্ধি ও শান্তি ভোগ করিয়াছিল। দস্তুর-উল-আমল্-এ আগহী শাহজাহান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"নিজ স্কন্ধে নিলে তুমি গুরু রাজ্যভার।
প্রফুল্লহৃদয় তাই তব প্রজাগণ॥
রাত্রিদিন নিদ্রা নাই নয়নে তোমার।
অত্যাচার তাই হ'ল নিদ্রায় মগন।"

আওরংজেব শাহজাহানকে বাহিরের কোন লোককে পত্র লিখিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি পত্র লিখিতে সচেষ্ট হওয়ায়, লিখনোপযোগী দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। অতঃপর আর স্বহস্তে পত্র লিখিবারও তাঁহার অধিকার রহিল না।

তাহার পর, আওরংজেব ময়ূরতক্ত, দারা শুকোর পরিত্যক্ত অলঙ্কার ও অন্যান্য রত্নাদি শাহজাহানের নিকট হইতে লইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। খাফি খাঁ লিখিয়াছেন যে, আওরংজেব শাহজাহানের একশত গোলাকার মুক্তার জপের মালা (যাহার মূল্য চারি লক্ষ টাকা ছিল) ও হস্তের অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট চাহিলে তিনি অঙ্গুরীয় প্রেরণ করেন।



পিতা-পুত্র
(শাহজাহান ও আওরংজেব)
অধ্যাপক সমাদ্দারের সংগৃহীত হস্তিদন্তোপরি চিত্র হইতে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

কিন্তু জগেন্নাথের মালা সম্বন্ধে বলেন যে, আওরংজেব পুনর্ব্বার ইহা প্রার্থনা করিলে তিনি মুক্তার প্রত্যেকটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবেন।

যতদিন আওরংজেব-পুত্র সুলতান মুহম্মদ শাহজাহানের কারা-রক্ষক ছিলেন, ততদিন শাহজাহান কথঞ্চিৎ শান্তিভোগ করিতেন। মুহম্মদের পরে, খোজা মুতমদের উপর এই কার্য্যভার ন্যস্ত হইলে, বাদশাহের উপর অত্যন্ত পীড়ন চলিতে লাগিল। এমন কি অনেক সময় খোজা তাঁহার সহিত ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিত। অধিক কি সামান্য পাদুকা বা বস্ত্রও যথাসময়ে এবং যথাযোগ্যভাবে বৃদ্ধ বাদশাহকে সরবরাহ করা হইত না।

প্রথম বৎসর পিতাপুত্রে বাদানুবাদ-সূচক পত্র ব্যবহার চলিত। আওরংজেব নিজের ব্যবহার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করিতেন; এবং কারণ দেখাইতেন যে, বাদশাহের পীড়িত অবস্থায় দারা স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, দারা জয়লাভ করিলে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান-ধর্ম্ম লোপ পাইত; দারার স্বেচ্ছাচারিতা-দমনের জন্যই তিনি আগ্রা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মের জন্যই তিনি তরবারি-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। দারার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহই ভ্রাতৃযুদ্ধের মূল কারণ, রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম, সুখেচ্ছা ও বিলাস রাজধর্ম্ম নহে, জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই সকলের উত্তরে শাহজাহান পুত্রকে চোর বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

এদিকে শাহজাহানের মনঃপীড়ার অবধি ছিল না। দারা, মুরাদ, ও সুলেমান শমন সদনে প্রেরিত হইলেন; শুজা সপরিবারে অপরিচিত মগের দেশে নিহত হইলেন। কিন্তু, এরূপ অবস্থাতেও শাহজাহান ধৈর্য্য হারান নাই। সাতবৎসর-ব্যাপী কারাবাস-কালে তাঁহার অনেক অনুরক্ত ভৃত্যের সর্ব্বনাশ ও অনেক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু তথাপি তিনি শেষজীবন পর্য্যন্ত বিচলিত হন নাই। ধর্ম্মই তাঁহার সান্ত্বনা ছিল। প্রার্থনা, ধর্ম্মচিন্তা ও কোরাণ-পাঠে তিনি সময়াতিপাত করিতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবনাতিপাত করিয়া বৃদ্ধ ও পরিত্যক্ত পিতার সেবা এবং দারা ও মুরাদের কন্যাদ্বয়কে মাতার ন্যায় লালন-পালন করিতেন।

মৃত্যুর জন্য শাহজাহান প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে আর তাঁহার কোন ভয় ছিল না। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তাঁহার জ্বর হয়। ২২শে জানুয়ারী তিনি তাঁহার বেগমদ্বয় আকবরবাদী ও ফতেপুরম-হল, জ্যেষ্ঠাকন্যা জাহানারা ও ভৃত্যগণ পরিবৃত হইয়া দেহ-ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বাদশাহ আওরংজেব পিতার নিকটে আসেন নাই। শাহ-জাহানকে তাঁহার প্রিয় বেগম মমতাজমহলের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হইল।

পিতার প্রতি আওরংজেব যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা মনুষ্যোচিত হয় নাই। জাহাঙ্গীর আকবরের বিরুদ্ধে ও শাহজাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও পিতার প্রতি কেহই এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। আওরংজেবের রাজ্যলিপ্সা

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

কিন্তু জগৎ মালা সম্বন্ধে বলেন যে, আওরংজেব পুনর্ব্বার ইহা প্রার্থনা করিলে তিনি মুক্তার প্রত্যেকটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবেন।

যতদিন আওরংজেব-পুত্র সুলতান মুহম্মদ শাহজাহানের কারা-রক্ষক ছিলেন, ততদিন শাহজাহান কথঞ্চিৎ শান্তিভোগ করিতেন। মুহম্মদের পরে, খোজা মুতমদের উপর এই কার্য্যভার ন্যস্ত হইলে, বাদশাহের উপর অত্যন্ত পীড়ন চলিতে লাগিল। এমন কি অনেক সময় খোজা তাঁহার সহিত ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিত। অধিক কি সামান্য পাদুকা বা বস্ত্রও যথাসময়ে এবং যথাযোগ্যভাবে বৃদ্ধ বাদশাহকে সরবরাহ করা হইত না।

প্রথম বৎসর পিতাপুত্রে বাদানুবাদ-সূচক পত্র ব্যবহার চলিত। আওরংজেব নিজের ব্যবহার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করিতেন; এবং কারণ দেখাইতেন যে, বাদশাহের পীড়িত অবস্থায় দারা স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, দারা জয়লাভ করিলে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান-ধর্ম্ম লোপ পাইত; দারার স্বেচ্ছাচারিতা-দমনের জন্যই তিনি আগ্রা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মের জন্যই তিনি তরবারি-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। দারার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহই ভ্রাতৃযুদ্ধের মূল কারণ, রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম, সুখেচ্ছা ও বিলাস রাজধর্ম্ম নহে, জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই সকলের উত্তরে শাহজাহান পুত্রকে চোর বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

এদিকে শাহজাহানের মনঃপীড়ার অবধি ছিল না। দারা, মুরাদ, ও সুলেমান শমন সদনে প্রেরিত হইলেন; শুজা সপরিবারে অপরিচিত মগের দেশে নিহত হইলেন। কিন্তু, এরূপ অবস্থাতেও শাহজাহান ধৈর্য্য হারান নাই। সাতবৎসর-ব্যাপী কারাবাস-কালে তাঁহার অনেক অনুরক্ত ভৃত্যের সর্ব্বনাশ ও অনেক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু তথাপি তিনি শেষজীবন পর্য্যন্ত বিচলিত হন নাই। ধর্ম্মই তাঁহার সান্ত্বনা ছিল। প্রার্থনা, ধর্ম্মচিন্তা ও কোরাণ-পাঠে তিনি সময়াতিপাত করিতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবনাতিপাত করিয়া বৃদ্ধ ও পরিত্যক্ত পিতার সেবা এবং দারা ও মুরাদের কন্যাদ্বয়কে মাতার ন্যায় লালন-পালন করিতেন।

মৃত্যুর জন্য শাহজাহান প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে আর তাঁহার কোন ভয় ছিল না। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তাঁহার জ্বর হয়। ২২শে জানুয়ারী তিনি তাঁহার বেগমদ্বয় আকবরবাদী ও ফতেপুরম-হল, জ্যেষ্ঠাকন্যা জাহানারা ও ভৃত্যগণ পরিবৃত হইয়া দেহ-ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বাদশাহ আওরংজেব পিতার নিকটে আসেন নাই। শাহ-জাহানকে তাঁহার প্রিয় বেগম মমতাজমহলের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হইল।

পিতার প্রতি আওরংজেব যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা মনুষ্যোচিত হয় নাই। জাহাঙ্গীর আকবরের বিরুদ্ধে ও শাহজাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও পিতার প্রতি কেহই এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। আওরংজেবের রাজ্যলিপ্সা

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ভদ্রতার কোনপ্রকার খাতির রাখে নাই এবং সেজন্য তিনি সাধারণের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন।

ত্রিশ বৎসর মহাসমারোহ ও সমৃদ্ধির সহিত রাজ্য করিবার পর বাদশাহ শাহ-জাহান পুত্রের হস্তে বন্দী হন। কারাগারে শেষ আট বৎসর কাটাইবার পর মৃত্যু তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক খাফি খাঁ লিখিয়াছেন—

"সোনার কলসী মত জানিও জগৎ,
কভু তাহে তিক্ত জল, কভু সরবৎ।
শমনের অশ্ব থাকে সদা সুসজ্জিত,
'আমি বড়' বলে কভু হয়োনা গর্ব্বিত।" (১)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

আমাদের সম্পদ

(ক্রপটকিন হইতে)

প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগে মানুষ যেদিন প্রস্তরফলক ও অকস্মাৎলব্ধ মৃগয়ার উপর নির্ভর করে' জীবন ধারণ করত সেদিন-থেকে আজ পর্য্যন্ত নানা অবস্থা-বিপর্য্যয় ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আমরা সভ্যতার যে স্তরে উপনীত হয়েছি, এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এতদিন ধরে মানুষ অনবরত বিচার করেছে, পর্য্যবেক্ষণ করেছে, আবিষ্কার করেছে, নির্ম্মাণ করেছে, ধূসর জমাট পৃথিবী তাদের চেষ্টায় স্বর্ণ শস্যে ভরে' গেছে, আকাশের বিদ্যুৎ বাতাসের বাষ্প তাদের পদানত হয়ে দাসবৎ সেবা করেছে, সুনির্ম্মিত সূক্ষ্ম যন্ত্র পরিশ্রমের গুরু ভার লাঘব করেছে; এবং এই বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য আমরা অনেকখানি জানতে পেরেছি। এই হাজার হাজার বছরের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে মানুষ যে-সম্পদ সঞ্চয় করেছে তা 'আরব্য-রজনী'-বর্ণিত প্রাচ্যের সকল ঐশ্বর্য্যকে ম্লান করে' দিয়েছে।

নানা কলকৌশলের দ্বারা দেশের জন-কয়েক মাত্র লোক ধনী হচ্ছে বটে তবুও মানবসাধারণ সে-সম্পদ-ভোগে একেবারে বঞ্চিত নয়।

আমরা নিজেদের যতখানি সম্পদের অধিকারী মনে করি, আমরা তার চেয়ে বেশী ধনী; আমাদের যা আছে শুধু তাই নিয়ে নয়, আমাদের উদ্ভাবিত কল-বল যন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে যথেষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা আছে। বিত্ত আহরণ ও সঞ্চয় ধনীর একমাত্র লক্ষণ নয়; আহৃত ও সঞ্চিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহারেই

(১) দারাশুকো :=দারিয়াসের ন্যায় প্রভাবশালী। শুজা=সাহসী। মুরাদ বখশ=যাহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আওরংজেব=সিংহাসনের অলঙ্কার। জাহানারা=পৃথিবীর অলঙ্কার। জাহানারার কনিষ্ঠা রৌশন-আরা অর্থাৎ আলোকমণ্ডিতা।

ধনীর পরিচয়। সাধারণত অজ্ঞাত-বংশপরম্পরা-প্রচলিত যন্ত্রবলের ও বিজ্ঞান-কৌশলের সহায়তায় যদি আমরা সার্ব্বজনীন মঙ্গলের ব্যবস্থা করি, তাহলেই আমরা যথার্থরূপে ধনী হতে পারব।

বর্ত্তমানে সভ্যসমাজ মাত্রেই উপরোক্ত প্রকারে বিপুল সম্পদের অধিকারী। তবে দেশব্যাপী দারিদ্র্যের এ হাহাকার কেন? জনসাধারণের দেহ-প্রাণনাশী এ নিদারুণ পরিশ্রম কেন? অতীতের ভাণ্ডারলব্ধ এত সম্পদের মধ্যে কর্ম্মী সাধারণের এ মৎস্থানহীনতা ও অনিশ্চয়তারই বা কারণ কি?

এর কারণ হচ্ছে, সুদূর অতীতে মিথ্যা অধিকারের দাবীতে জনকয়েক লোকে সাধারণের শ্রমলব্ধ বিত্তের বেশী অংশ হস্তগত করেছেন এবং নিতান্ত মূর্খের মত বদ খেয়ালে সেই অন্যায়লব্ধ সম্পদ নষ্ট করেছেন। এর কারণ, ছলে-বলে-কৌশলে সেই সামান্য কয়েকজন লোক জনসাধারণের একমাসের ত দূরের কথা, এক সপ্তাহেরও অন্নসংস্থান না রেখে, এমন অবস্থায় তাদের এনে ফেলেছেন যে আজ সেই জনকয়েক ধনীকে শ্রমলব্ধ জিনিসের বেশীর ভাগ দেওয়ার কড়ারে কাজ করা ছাড়া তাদের আর উপায় নেই। এর কারণ, সেই জনকত ধনী অবশিষ্ট লোকদের দিয়ে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী জিনিস তৈরি না করিয়ে যে-জিনিসে তাঁদের লাভ বেশী সেই প্রকার জিনিসই তৈরি করাচ্ছেন। Socialist সম্প্রদায় এই সব কথার আলোচনা ও আন্দোলন করেছেন অনেকবার; সাধারণের আহার, বিহার, আশ্রয় ও শিক্ষার কথা তাঁরা বারবার বলেছেন, কিন্তু কেউ তাঁদের কথায় কর্ণপাত করবার কোন আবশ্যকতাই অনুভব করেন নি, কারণ যাঁদের হাতে এই সংস্কারের ভার, তাঁরা নিজেদের ক্ষতি করেন কেমন করে'!

অধিকার-সূত্রে লব্ধ বর্ত্তমান সভ্যতা, জীবন-যাত্রার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পূর্ব্ববর্ত্তী-গণের জীবনব্যাপী প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফল। বিশ্বে যা-কিছু গরীয়ান, যা-কিছু মহীয়ান, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ লক্ষ বৎসরের একান্ত চেষ্টা নিহিত। প্রতি কাঠা জমি কত শত জাতির শ্রম-ঘর্ম্মসিক্ত, প্রতি বিঘা জমির পশ্চাতে অন্যায়রূপে বাধ্য পরিশ্রমীর, দীন-দরিদ্র মজুরের প্রতি দুর্ব্বিসহ অত্যাচারের সুদীর্ঘ নিরানন্দ ইতিহাস। প্রতি রাজপথ, প্রতি হর্ম্ম্য, সভ্যতার প্রতি অঙ্গ মানুষের শোণিত-সিক্ত। যে বিচিত্র সভ্যতার গর্ব্বে আমরা আজ স্ফীত, লক্ষ লক্ষ কর্ম্মীর চেষ্টায় সে সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীময় প্রাণপণ যত্নে তাকে রক্ষা করেছে। তাদের অভাবে এ সভ্যতা টিঁকবে কদিন?

অতীতেরই হোক আর বর্ত্তমানেরই হোক, প্রতি আবিষ্কার, প্রতি চিন্তা সাধারণ সম্পত্তি। বিখ্যাত হোন বা অখ্যাত হোন, হাজার হাজার আবিষ্কর্ত্তা ও শিল্পীর দুঃখ-দারিদ্র্য অপমানের সঙ্গে অনন্ত সংঘাতই বর্ত্তমান সুখ-সমৃদ্ধির মূল। দেশ বা জাতি মাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধির, ভ্রম-নিরসনের এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগৎ-সৃজনের মূলেও লক্ষ লক্ষ লেখক, কবি ও মনীষীর এই বিপুল

পরিশ্রম দেখা যায়। কিন্তু সমসাময়িক কর্ম্মীদলের সাহায্য পেয়েছি বলেই, অতীতের সঞ্চিত সম্পদ লাভ করেছি বলেই আজ আমাদের পরিশ্রম এতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে; তার অভাবে বর্ত্তমানে কি অবস্থা হোত তা কল্পনা করাও কঠিন। আজ যদি আচার্য্য বসুর উদ্ভাবিত যন্ত্র নির্ম্মাণ করার মত উপযুক্ত শিল্পীর অভাব হোত তবে তাঁর আবিষ্কারের মূল-নির্দ্ধারণ ততটা সহজ হোত না। শুধু তাই নয়, শিল্পীর দল প্রথম-উদ্ভাবিত যন্ত্রের সমস্ত অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা পূরিয়ে তোলবার পক্ষে কতকাল ধরে যে কত সাহায্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞান ও অধ্যবসায়, মস্তিষ্ক ও দেহের সহযোগিতায় এ সভ্যতা গড়ে উঠেছে, এ সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে; তবে কেন কয়েকজন মাত্র লোক এই সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে? আমাদের—জনসাধারণের কি এতে কোন অধিকার নেই?

মজুরের ছেলে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে' মনিবকে তার উৎপন্ন ফসলের বা আহৃত সম্পদের বেশীর ভাগ না দিয়ে কোন ক্ষেত্রে, কোন কল-কারখানায় বা কোন খনিতে কাজ করতে পায় না। সারা জীবনের পরিশ্রমের ফলে তার সম্পদ সঞ্চয় ত দূরের কথা, অতিকষ্টে দিন-গুজরাণও অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু অনিশ্চিত ও সামান্য এই মজুরীর বিনিময়ে সে বিক্রয় করছে তার দেহের শক্তি, তার জীবনের রক্ত। তারই পিতৃপিতামহ জলা সেঁচতে, কল তৈরি করতে, কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদের সমস্ত শক্তি এই কাজে ব্যয়িত হয়েছে; এবং আমরা তাদেরই রক্তরঞ্জিত এই প্রাচীন সভ্যতায় গর্ব্বিত। কিন্তু তাদের বংশধরেরা আজ দীনতম হীনতম বর্ব্বরের চেয়ে দরিদ্র। তাদের জীবন দুঃখ ও হতাশার গভীর অন্ধকার হতে গভীরতর অন্ধকারে এক মহা আত্মবিসর্জ্জন। তাদের পরিশ্রমলব্ধ ফলের এক-চতুর্থাংশ তাদের মনিব, অপর-চতুর্থাংশ দেশের শাসনকর্ত্তা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দেওয়ার কড়ারে সে কাজের অধিকার পায়। ধনী-সম্প্রদায়ের খাঁই প্রত্যহই বেড়ে চলেছে, সে-খাঁই মেটে মজুরেরই সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে। তারপর তার নিজের উন্নতি করবার শক্তিই বা কোথায় আর সুযোগই বা কোথায়? তারা দিন দিন মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সভ্যসমাজ তাদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ বিলাস-লালসায় নষ্ট করে' সভ্যতার আবরণে বর্ব্বরতার অভিনয় কচ্ছেন।

সমাজের অভাবের দিকে দৃষ্টি না রেখে যাঁরা দেশের ফসলের ব্যবস্থা করেন, তাঁরা ব্যবসাদারের লাভ-ক্ষতির বাঁধা খতিয়ানের দিকে চেয়ে আছেন। এবং ব্যবসার উঠা-নামায়, কল-কারখানার গোলমালে হাজার হাজার লোক সকল-হারা হয়ে পথের ভিখারী হচ্ছে।

দেশের সাধারণ-সম্প্রদায় নিজেদের হাতে জিনিস গড়ে, কিন্তু তা নিজের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে কিন্‌তে পারে না। দেশের কল-কারখানার স্বদেশী শিল্পীরা বিদেশের রপ্তানির দিকে চেয়ে বসে আছে, সেখানকার বাজারেই তাদের শিল্পের গতি। আর এই বাজার-দখলের আশায় লুব্ধ জাতিসমূহ পরস্পরের

মধ্যে যে ঈর্ষার আগুন জেলেছে, তার শেষ কোথায়? বিশ্ব জুড়ে কেবল কামান-গর্জ্জন, এক-একটা জাতি অস্ত্র-শস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে ধরা-বক্ষ থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সভ্যদেশে আয়ের এক-তৃতীয়াংশ অস্ত্রনির্ম্মাণে ব্যয়িত হচ্ছে, আর সেই অন্যায় ব্যয়ভার বহন করছে দেশের দারিদ্র্য পীড়িত মজুর-সম্প্রদায়!

শিক্ষার সুবিধা এখনও জনকত লোকেই ভোগ করে। মজুরের ছেলেকে যখন তের-বছর বয়সে বাপ-দাদাকে সাহায্য করতে মাঠে, কারখানায় বা খানিতে যেতে হয়, তখন দেশব্যাপী শিক্ষার কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তারা শিক্ষা-লাভ করবে কখন? এমনি করে' সুযোগে ও অসুবিধায়, সম্পদে ও দারিদ্র্যে সমাজ দুই পরস্পর-বিমুখ সম্প্রদায়ে যখন বিভক্ত, তখন মানুষের স্বাধীনতার কথা তোলা হাস্যকর নয় কি?

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নীতি-উপদেশ লম্বা-চওড়া কথার কথা মাত্র। এই বিপরীত ও অদ্ভুত ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথায় এ দেশের লোক বিশেষরূপে উদাসীন; কারণ, এই ব্যবস্থার প্রতিকারের ফলে তাঁদের স্বার্থহানি সুনিশ্চিত। নিজেদের সামান্য স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা দেশশুদ্ধ সবাই অন্যায় ও মিথ্যা আচরণ করি এবং সেই অন্যায় ঢাকবার জন্যে লোক-ভুলানো সাহিত্য ও বিজ্ঞান গড়ি। যথার্থ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বদলে পণ্ড পণ্ডিতী আমাদের একমাত্র আশ্রয়। বর্ত্তমানে ভণ্ডামি ও পণ্ড পাণ্ডিত্য, সভ্যমানবের দ্বিতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আমাদের সমাজ হয় সত্যের দিকে ফিরবে, নয় ধ্বংস হয়ে যাবে। মাঝামাঝি অবস্থা কিছু নেই। সত্যকে বাদ দিয়ে, আত্ম-সম্ভ্রমকে বাদ দিয়ে, পরস্পর সাহায্য ও সমবেদনা বাদ দিয়ে সমাজ বাঁচতে পারে না,—অতীতের বিলুপ্ত ও জিঘাংসু পশুর মত মানুষ অদূর-ভবিষ্যতে লোপ পাবে। এই মিথ্যার জাল থেকে সমাজকে, আমাদের মনকে বিমুক্ত করতে হবে। যদি বাঁচতে চাও, যদি মানুষকে ও মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা কর, তবে এতদিনের সঞ্চিত অন্যায়ের ভার লাঘব কর। দেশের ফসল সবাই ভাগ করে' নাও। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে আপনার সঞ্চয়-লালসার প্রশ্রয় দিও না। জগতে যা জন্মায় জগদ্বাসীই তার মালিক। এ সভ্যতা একজনে গড়ে' তোলেনি—যুগ-যুগান্তের পরিশ্রম এর মধ্যে নিহিত। সকলেরই সমান অধিকার; কারও কম বা বেশী নয়—হোক সে শক্তিমান বা অক্ষম, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা নির্ধন। অভাবও আছে সবারই, কম বা বেশী; সে অভাব পূরণ হবে দেশের উৎপন্ন জিনিসেই। যাদের মানুষ হবার সুবিধা নেই, তাদের সুবিধা দাও; দশকে হারিয়ে এককে বড় করবার চেষ্টা করো না। তোমার যা একলার নয় তাতে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার তোমার কোথায়?

অস্ত্রভার বা সঞ্চিত সম্পদ যথার্থ সভ্যতার পরিচায়ক নয়; জ্ঞানের গভীরতা এবং হৃদয়ের প্রসারই সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি। মানুষকে যখন তার যথার্থ অধিকার দেব, তখনই মনুষ্যত্বের যা বড় কথা তার প্রতিষ্ঠা হবে; সে কথাটি হচ্ছে—"কল্যাণের অধিকার, সার্ব্বজনীন কল্যাণ।"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় পরিবার-মণ্ডলীর উপর য়ূরোপীয় সভ্যতার প্রভাব

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

যখন ইংলণ্ড, স্বকীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মূলক মতামত ভারতে প্রচার করিতেছিলেন, তখন ভারতের জনসমাজ কিরূপ ছিল তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঐসকল মতামতের পরিসর-সীমা কতদূর বিস্তৃত তাহা দেখাইবার জন্য প্রথমে আমি Smiles-এর Self-Help হইতে তাহার গোড়ার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ক্রমোন্নতির মূলে আত্মসাহায্যের তত্ত্বটি অবস্থিত... অনেক সময়, যে সাহায্য আমরা অপরের নিকট হইতে পাই তাহা আমাদিগকে দুর্ব্বল করে; নিজের নিকটে যে সাহায্য পাই তাহাই আমাদিগের বল বিধান করে। কোন সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য অথবা বিশ্বমানবের হিতের জন্য, কোন ব্যক্তি যে কাজ করে তাহা একপ্রকার হীনতাজনক; কেননা, সেই কাজ প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে, নিজের জন্য কাজ করিবার আবশ্যকতা অপনীত করে; বেশী উপদেশের ফলে, বেশী শাসনের ফলে, মানুষ অগত্যা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহও কাজ করিবার জন্য মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। হদ্দ আমরা এইটুকু আশা করিতে পারি যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান, আত্মোন্নতি সাধনে, নিজের অবস্থার উন্নতিসাধনে, মানুষকে স্বাধীনতা দিবে।"

আবার, ঊনবিংশতি শতাব্দীতে আবির্ভূত ইংলণ্ডের দুইজন চিন্তাশীল লেখকের লেখা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

John Stuart Mill বলেন :—

"স্বেচ্ছাচার-শাসন হইতে কেবলমাত্র কিয়ৎ পরিমাণে কুফল ততক্ষণই উৎপন্ন হয়, যতক্ষণ না স্বেচ্ছাচারতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে একেবারে পিষিয়া ফেলে; কিন্তু যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহা-কিছু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে নিষ্পেষিত করে তাহাই কতকটা স্বেচ্ছাচারিতা।"

Spencer বলেন;—"প্রভুত্বের হ্রাস—যাহা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির একটা বিশেষ লক্ষণ সেই প্রভুত্ব হ্রাসের যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারা স্বাধীন-চেতা কোন বালককে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হন না। উৎপীড়নের দিকে মা-বাপের প্রবণতা যত কম হয় ছেলে-মেয়ের স্বাধীনতার দিকে প্রবণতা ততই বেশী প্রকাশ পায়। এই উভয় প্রবণতাই এমন একটা শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠার সূচনা করে যাহা আমরা নিষেধ করিয়া থাকি : আসল কথা, নিজ কার্য্যফলের অভিজ্ঞতা হইতে আপনাদিগকে যথাপথে পরিচালিত করিতে

বালকেরা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়। এই উভয় প্রবণতা হইতেই আমাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সপ্রমাণ হয়। স্বাধীনচেতা শিশু হইতেই স্বাধীন-চেতা পূর্ণবয়স্ক ইংরেজ বা মানুষ উৎপন্ন হয়। একটি না হইলে আর একটি হইতে পারে না।" (১)

* *
*

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এই যে-সব উদ্বোধন, ইহার কিছু না কিছু পরিণাম-ফল অবশ্যম্ভাবী।

একজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার বলেন :—"যেকাজে চিত্তের প্রশান্তি ও অবিচল শ্রম-শীলতা খুবই দরকার সে কাজে বাঙ্গালী সফলতা লাভ করিতে যে পারে না, তাহার কারণ, গৃহের মধ্যে বাঙ্গালীর অশান্তি ও উদ্বেগ। অনেক স্থলেই বাঙ্গালীর "মধুর গৃহ"ই অশেষ প্রকার গোলযোগ ও অশান্তির মূল-উৎস। যে গৃহে কোন গুণীজন বা প্রতিভাবান ব্যক্তি অবস্থিতি করে, সেই গৃহের প্রাচীরকে যদি প্রশ্ন করা যায়, না জানি তাহার নিকট কত কথাই শুনা যাইতে পারে! না জানি সে কত অশ্রুজল দেখিয়াছে, কত দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস তাহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে! কত ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের, কত অসাড় স্নায়ুর দৃশ্য চোখে পড়িয়াছে; সে দেখিয়াছে—কত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে,—আবার আরম্ভ হইয়াছে, আবার নিষ্ফল হইয়াছে;—গার্হস্থ্য দুঃখকষ্টে অভিভূত হইয়া কত বীর-হৃদয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করিয়াছে! এই হিন্দুগৃহ, অন্তরের কত উৎসাহ-স্ফুলিঙ্গকে নির্ব্বাপিত করিয়াছে, কত মহৎ উদ্দেশ্যকে নিষ্পেষিত করিয়াছে। এই যে সব বিনাশের শক্তি ইহার মধ্যে সব-চেয়ে খারাপ দারিদ্র্য নহে। কিন্তু যে গৃহে অনেক নরনারী একত্রে বাস করে, অথচ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নাই, অন্যের সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই

(১) এই অংশ স্পেন্সরের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে এই কথা আরও আছে :—

"রাষ্ট্র-শাসন সম্বন্ধে যে প্রচলিত মত, পরিবার-তন্ত্র সম্বন্ধেও সেই একই মত দৃষ্ট হয় : যত-কিছু গুণ সবই শাসন-কর্ত্তাদের, আর যত-কিছু দোষ সবই শাসনাধীন লোকদের। শিক্ষাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি যদি বিশ্বাস করিতে হয়—পুরুষ ও রমণী যখনই নিজ সন্তানদিগকে লইয়া ব্যাপৃত হয় তখনই তাহারা রূপান্তরিত হইয়া যায়। আমরা জানি, যে সকল পৌরজনের সহিত আমরা কারবার করি, যে সকল লোকদিগের সহিত সংসার-ক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হয়—তাহারা অপূর্ব্ব জীব। দৈনন্দিন নিন্দা গুজোব, বন্ধুদের বিবাদ-কলহ, দেউলিয়াদের প্রকাশিত গুপ্তকথা, মোকদ্দমা-মামলা, পুলিসের কার্য্য-বিবরণ এই সমস্ত আমাদিগকে ক্রমাগত স্মরণ করাইয়া দেয়—ঐ সকল লোকের নিগূঢ় স্বার্থপরতা, শঠতা, নিষ্ঠুরতা। কিন্তু যখনই শিক্ষার কথা উপস্থিত হয়, অবাধ্য বালকদিগের কথা উপস্থিত হয়—তখনই নিজের ছেলেমেয়েদের সহিত ব্যবহারে, এই সব দুশ্চরিত্র লোককেই আমরা সুনীতিসম্পন্ন আদর্শচরিত্র বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে,—গৃহের যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছেলেমেয়েদের দুষ্টবুদ্ধির প্রতি আরোপিত হয়, তাহার জন্য আসলে পিতামাতার অন্যায় ব্যবহারই যে দায়ী—এ কথা বলিতে আমাদের একটুও দ্বিধা হয় না।"

একটা না একটা অভিযোগ আছে—সে গৃহে যে-অশান্তি ও চিত্তচাঞ্চল্য স্বভাবতই উৎপন্ন হয় তাহাতে-করিয়া সকল প্রকার উত্তম উৎসাহ ও কার্য্যশক্তি অসাড় না হইয়া যায় না। স্ত্রীলোকদিগের ঝগড়া-ঝাঁটি, পুরুষদিগের বদ্ধমূল বিদ্বেষ, "সামান্য কারণ হইতে মহাসংগ্রামের উৎপত্তি"—এই সমস্ত ব্যাপারে, হিন্দু-গৃহের দুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগের মনে একটুও শান্তি থাকে না। কখন মানমর্য্যাদার বৃথা মান লইয়া, কখন ধনসম্পত্তির কথা লইয়া, কখন-বা কর্তৃত্ব ও অধীনতার কথা লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলে। অবশ্য সময়ে সময়ে যুদ্ধের বিরাম হয়, কিন্তু "সশস্ত্র নিরপেক্ষতা" ছাড়া শান্তির সীমা আর বেশীদূর অগ্রসর না।" (N. Ghosh, Kristodas Pal p.p. 146-147)।

একজন বাঙ্গালী লেখক, M. Bose তাঁহার "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে" এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন:—"পাশ্চাত্য প্রভাব, হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। যে সকল প্রতিষ্ঠান লোপ পাইতে বসিয়াছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের যে সুবিধা তাহা আমাদের বুঝা উচিত এবং সেই সকল সুবিধা যাহাতে আরও দীর্ঘকাল আমরা রক্ষা করিতে পারি তৎপ্রতি আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আজকালের শিক্ষিত লোকেরা যে সকল সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবাদি হইতে নিজে সাক্ষাৎভাবে আমোদ পায় না, সেই সকল উৎসবাদির প্রয়োজনীয়তা তাহারা বুঝিতে পারে না। পারিবারিক ব্যবস্থা-পদ্ধতির ভিত্তি নড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজি প্রভাবে পরিপুষ্ট স্বার্থবুদ্ধির সহিত উক্ত ব্যবস্থা-পদ্ধতি খাপ খায় না। নব্য হিন্দুসমাজে দরিদ্রেরা, প্রাচীন সমাজ-প্রতিষ্ঠিত স্বকীয় অধিকার হারাইয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ভিক্ষাদানের নিন্দা করিয়া থাকে।...

পাশ্চাত্য প্রভাব এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা হিন্দুসমাজে ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। হিন্দু পরিবার-মণ্ডলী, হিন্দুসমাজ, এরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি সেখানে মাথা তুলিতে না পারে,..... কিন্তু ইংরাজি-শিক্ষার ক্রমোন্নতি ও ইংরাজি শিক্ষার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটা বড় জায়গা রাখিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এখন বেশ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, নিজ পরিবারের নিকট বা সামাজিক পরিবেষ্টনের নিকট সে সম্পূর্ণরূপে ঋণী নহে। যে-জাতের লোকই হোক্ না কেন, সে সকল ধাপের শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সর্ব্বোচ্চ পদগৌরব লাভ করিতে পারে। এই ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। এই ইতিহাসে যে সকল পরিবর্ত্তন বিবৃত হইবে, এই আকাঙ্ক্ষাই সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের হেতু।" (Hindu Civilisation I. P. LXIX, LXX)।

M. Bose, ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির পরিপুষ্টির মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রভূত প্রভাব যে দেখিয়াছেন তাহা কতকটা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তিনি যে মনে করেন,

কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবেই ভারতীয় সমাজে হঠাৎ একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, একথা ঠিক নহে। এই পরিবর্ত্তন, সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশেরই ফল। য়ুরোপীয় সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজ ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইলেও হিন্দুসমাজের গতি সেই একই লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ:—তাহা, ব্যক্তির মুক্তিসাধন। জাতের খণ্ডবিভাগ, জাতের পদমর্য্যাদা-সোপানের পরিবর্ত্তন, পিতৃ-কর্তৃত্বের ও কৌলিক সত্বাধিকারের অন্তর্ধান; ভাইদিগের ও পুত্রদিগের, অবিভক্ত পরিবার-পদ্ধতি হইতে বাহির হইবার অধিকার; স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার ও অন্তিম-দানপত্র অনুযায়ী উত্তরাধিকার স্বীকার করা; বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সমূহকর্ত্তৃক প্রচারিত সাম্য ও মৈত্রী-সম্বন্ধীয় মতবাদ—এই-যে-সব উপাদান ইহা সেই ক্রমবিকাশের অন্তর্ভূত নিছক হিন্দু উপাদান। এবং য়ুরোপীয় প্রভাবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল বিদেশীয় উপাদান সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমাজকে ওলট্‌পালট্ করিয়া দিয়াছে, সেই সকল উপাদানকেও গণনার মধ্যে আনা আবশ্যক। এইরূপ, শক জাতির ও মোগল জাতির রীতিনীতি, সামন্ততন্ত্র, ক্ষত্র-বীরোচিত ব্যবহার, ইস্‌লামের সাম্যবাদ, ভাগ্য-পরীক্ষক সাহসিকদিগের অদ্ভুত বৃত্তান্ত, সর্ব্বোপরি ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-মাহাত্ম্য —এই সমস্তও ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা উচিত।

তা' ছাড়া, আরো অন্যান্য উপাদানও ইহার ভিতরে আসিয়া পড়ে:—যথা, অর্থ-নৈতিক উপাদান। M. Bose ঠিক্‌ই বলিয়াছেন যে, আয়েস্-আরামের ইচ্ছা, সুখভোগের বাসনা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধানের লঘু গর্ব্ব, আধুনিক জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কঠিনতা, মূল্যবান ধাতুসমূহের মূল্য-হ্রাস—এই সমস্ত, একান্নবর্ত্তী পরিবার-পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধনে সাহায্য করে। ইংরাজের আমলে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাবাধীনে এই সকল অর্থনৈতিক উপাদান সাক্ষাৎভাবে বেশী কাজ করিলেও দীর্ঘকাল হইতেই উহার ক্রিয়াফল কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইয়া আসিতেছে: অন্দর-মহলে রমণীদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা, মুসলমান-প্রবর্ত্তিত সেলাই-করা কাপড় ব্যবহারের প্রচলন, মোগল ও পারসীকদিগের নিকট হইতে বিলাসিতার শিক্ষা,—এই সমস্ত, এদেশের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পরিবার-মণ্ডলীর অধঃপতনে সাহায্য করিয়াছে। কি বৈষয়িক কি নৈতিক উভয় হিসাবেই, য়ুরোপীয় সভ্যতা শুধু এই কার্যের সত্বরতা বিধান করিয়াছে, সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে মাত্র—আসলে বহুকাল হইতেই এসিয়িক সভ্যতা লোকের অজ্ঞাতসারে এই পথেই চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আধুনিক নাট্যসাহিত্য

আমাদের দেশে নাট্য জিনিসটা রঙ্গ-মঞ্চের রঙ্গের সঙ্গে এমনি জড়িত হইয়া আছে যে, stage-craft যে নাটকে নাই তাহাকে আমরা নাটক বলিতেই প্রস্তুত নই। নাটক বলিতে সাধারণ লোক বুঝে, প্রবল ও প্রচণ্ড সব ঘটনার রটনা, যথা প্রণয়ের হাহাকার-হাহুতাশ, দ্বেষ-হিংসা অবিশ্বাস-অভিমানের পালা; তারপর পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, গ্রেপ্তার বা খুনখারাপি ব্যাপারে মিলনে বা বিয়োগে সে পালার শেষ। এ হেন নাটকে কোন অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা করিতে আটক নাই। খুব রুদ্র রস, বীর রস, করুণ রস, হাস্যরস বা ভাঁড়ামির ছয়লাপ ঘটিলেও তাহাতে শ্রোতা বা পাঠকদের উৎসাহের অপলাপ হয় না, বরং উত্তেজনার উত্তাপের মাত্রা বাড়িতেই থাকে।

সেই জন্য আমার মনে হয় যে, নাটক সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা যতটা অস্পষ্ট, উপন্যাস বা নবন্যাস সম্বন্ধে ততটা নয়। নাটক সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণা অস্পষ্ট বলিয়াই উচ্চাঙ্গের কোন আধুনিক নাটক পড়িলে তাঁদের কারো বা বুঝিতে কষ্ট হয়, কারো বা সময় নষ্ট হয় এবং কেহবা খামখা রুষ্ট হন! রূপক নাটক পড়িলে, সেটা তাঁদের কাছে ঠেকে ঘোর হেঁয়ালী, আর বাস্তব নাট্য পড়িলে সেটা হয় সমাজ বা ধর্ম্মের খোস্-খেয়ালী গালাগালি। একটাতে পাওয়া যায় শুধুই কুয়াশা, আর একটাতে দেখা যায় ব্যর্থ কু-আশা!

সুতরাং নাট্যের প্রকৃতি ও রূপ সম্বন্ধে বোধ হয় ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ বাংলা দেশে আধুনিক কালের রূপক নাট্যই বলি আর বাস্তব নাট্যই বলি, দুচারটে হাল ধরণের নাট্য দেখা দিয়াছে; এমন আরো দেখা দিবে আশা করা যায়।

নাট্যের উৎপত্তি আমরা কখন্ দেখি?

এক দেখি, যখন সমাজের মধ্যে জীবনটা বিচিত্র ও বেগবান্ এবং সেই বৈচিত্র্য ও বেগকে প্রকাশ করিবার আবেগ মানুষের মনকে খুব কসিয়া নাড়া দেয়। সেই আবেগের সুর নাটকে যত চড়া এবং এবং তার লয়টাও নাটকে যত বিলম্বিত হয়, সাহিত্যের অন্য কোন রূপে, যেমন খণ্ড কাব্যে বা উপন্যাসে, তেমন হইতেই পারে না। তাই জীবন যখন একটা অভূতপূর্ব্ব আবেগ-নিবিড়তা কিম্বা বিস্ময়ের উত্তেজনার উচ্চ সপ্তকে লীলা করে, তখনই দেখি নাটকে তার প্রকাশ। সেই আবেগ-উত্তেজনা কতকটা থিতাইলে ও থম্‌কাইলে তবেই উপন্যাসের অবকাশের পালা দেখা দেয়। তুলনা দিতে গেলে নাটককে বলা যায় অর্কেষ্ট্রার গান, আর উপন্যাসকে বলা যায় অর্গেনের গান।

আর দেখি নাট্যের উৎপত্তি, যখন সমাজের মধ্যে সমস্যাগুলো জটিল হইয়া ওঠে এবং তাহাদের নানারকমের সমাধানের

প্রস্তাব হয়, সুতরাং আদর্শগুলোর ঘাত-প্রতিঘাত প্রবল আকারে দেখা দেয়; যখন মানুষের সহজ অখণ্ড জীবনটা সেই সব বাহিরের বিচিত্র আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া নানাখানা হইতে থাকে এবং ভিতরেও এক ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের ঘাতপ্রতিঘাত জাগিয়া ওঠে। কাজেই তখন নাটকের আকার ছাড়া অন্য কোন আকারেই এই সব বিরুদ্ধ বিচিত্র সমস্যা ও আদর্শকে সাকার করিয়া তোলা সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু জীবনের বিচিত্রতা হইতেই নাট্যের উৎপত্তি হোক্ কিংবা জীবনের সমস্যার জটিলতা হইতেই তার উৎপত্তি হোক্, নাটকে আমরা যে সব চরিত্র দেখি তারা রাস্তা-ঘাটের মানুষের চরিত্র নয়, কিম্বা যে সব চিত্র দেখি সেগুলিও প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জীবনের চিত্র নয়। হাম্‌লেটের মত লোক যে পথে-ঘাটে দুদশটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং বলিতেছে, To be or not to be that is the question—এটা বোধ হয় কেউ বলিবেন না। লিয়রের মত সাধারণ মানুষ যে কারণে-অকারণে সর্ব্বদাই সপ্তমের উপর অষ্টমে চড়িয়া আছে তাতো বলা যায় না।

অতএব, নাটককারকে তাঁর সুপরিচিত চরিত্রগুলোর ভিতর হইতে নাট্যকল্পিত চরিত্রকে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্ করিয়া লইতে হয়—নাট্য-উপন্যাসের চরিত্রমাত্রেই সেই জন্য এক হিসাবে abstraction। অবশ্য সেজন্য যে নাটকের চরিত্রগুলো কম "বস্তুতন্ত্র" হয়, তাহা মনে করার কোনও হেতু নাই। কেননা, বাহিরের সংসারে মানুষেরা যেখানে চলাফেরা করিতেছে, সেখানে আমরা না পাই তাদের type বা বিশিষ্টরূপ, না পাই তাদের temperament বা বিশিষ্ট প্রকৃতি। সেখানে সবাই কেমন যেন ঝাপ্‌সা—ছায়াবাজীর খেলার মত। কিন্তু সেই বাহিরের ছায়ানাট্যের অন্তরালে অন্তরতর জীবনের আসল নাট্যের লীলাখেলা যেখানে চলিতেছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিলে তবেই মেলে ভিন্ন ভিন্ন types, ভিন্ন ভিন্ন temperaments। কল্পনার যোগে নাটককার তাই সেই লীলানাট্যের নাটবেদিকায় যাদের দাঁড় করান, তাদের abstraction বলিলেও আসলে তারা—

"Forms more real than living man,
Nurslings of Immortality."

মানুষের চেয়ে বাস্তবতর নাহি তাহে ভুল

তারাই হচ্চে অসীমকালের সন্ততিকুল!—

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করি। খবরের কাগজে প্রায়ই পড়া যায় যে, স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হইয়াছিল, স্বামী রাগিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। এই সব কাগজী ঘটনাই যে নাট্যের সব উপযোগী ঘটনা তা নয়। অথচ শেক্‌স্‌পীয়রের "ওথেলো"তে ত স্বামী স্ত্রীকে খুন করিয়াছে; সেই খুনের বর্ণনার সঙ্গে আর খবরের কাগজের খুনের বর্ণনার কি তফাৎ? তফাৎ অনেক খানি। ঐ খবরের কাগজের বিষয়ীভূত বাইরের খুন-খারাপিটাই বর্ণনা করা যে শেক্‌স্‌পীয়রের মতলব ছিল, এমন কথা মনে করিলে শেক্‌স্‌পীয়রকে নাট্যকার হিসাবে অত্যন্ত খাটো করা হয়। ওথেলোর প্রতি

ডেস্‌ডেমোনার অন্তরের একনিষ্ঠ প্রেম ঐ সন্দেহ এবং হত্যাকাণ্ডের দ্বারাই পরিপূর্ণ মাধুর্য্যে প্রকাশ পাইল, খুনের অবতারণার সেই জন্যেই প্রয়োজন ছিল। খুনটা কেবলমাত্র বাইরের ঘটনা—নাটকের ভিতরকার ঈর্ষা ও সন্দেহের সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের সংঘাত-বিচিত্রতাটাই আসল। সেই সংঘাতের climax দেখাইবার জন্যই খুনের অবতারণা।

তবু বোধ হয় খুন ভিন্নও সেটা দেখানো যাইতে পারিত। শেক্‌স্‌পীয়রের যুগে violent passions, উদ্দাম প্রবৃত্তির নৃত্য দেখানো নাট্যকলার মধ্যে গণ্য ছিল। প্রাচীন হিন্দু নাট্যকলায় কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর কোন প্রচণ্ড দৃশ্যের অবতারণা নিষিদ্ধ ছিল। এখন সাধারণতঃ বড় নাট্যকারেরা সেই প্রাচীন হিন্দু নাট্যকলারই পদ্ধতিরই অনুমোদন করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। মেটারলিঙ্ক বলেন, ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চ হইবে "A Theatre of peace and of beauty without tears."—অশ্রুপাতহীন শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি। তাহার কারণ তিনি বলিয়াছেন, "A truly illumined consciousness has passions and desires infinitely less exacting, infinitely more pacific, more salutary, more abstract and more generous than an unillumined consciousness"—যথার্থ উদ্ভাসিত চৈতন্যের হৃদয়াবেগ এবং বাসনাগুলি অনুদ্ভাসিত চৈতন্যের হৃদয়াবেগ এবং বাসনাগুলির চেয়ে অনেক কম প্রবল, এবং অনেক বেশি প্রশান্ত, সুস্থ, অতীন্দ্রিয় এবং উদার। সুতরাং তাঁর মতে, শেক্‌স্‌পীয়রের যুগের নাট্যের ঐ সব বাহ্যিক উদ্দাম প্রবৃত্তির দৃশ্যগুলি নাট্যহিসাবে যে খুব উৎকৃষ্ট তা নয়। সে যাই হোক্, শেক্‌স্‌পীয়র পড়িবার বেলাতেও মনে রাখিতে হইবে যে, সেখানে ঘটনাটাই নাট্যের প্রধান বিষয় নয়। ঘটনার অন্তরালে মানুষের ভিতরকার দ্বন্দ্বগুলি, বিচিত্র ভাব ও আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতগুলিই নাট্যের সত্যিকারের বিষয়। এই মোটা কথাটা ভোলার দরুণ নাট্য সম্বন্ধে লোকের পক্ষে সত্য ধারণায় উপনীত হওয়া এতই শক্ত হয়।

আধুনিক রুশ নাটককার লিওনিড এন্‌ড্রেফ্ ১৯১৩ সালে রুশ দেশের একটা রঙ্গমঞ্চ-সম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একটা চিঠি ছাপেন, তাতে প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ ও ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর আইডিয়া তিনি খোলাখুলি ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যৎ থিয়েটারের তিনি নাম দেন "Panpsyche" অর্থাৎ all-soul বা all thought, অর্থাৎ আত্মাসর্ব্বস্ব বা চিন্তাসর্ব্বস্ব। তাঁর মতে action জিনিসটার থিয়েটারে কোন স্থান থাকার দরকার নাই। কেননা, আমাদের জীবনে অত্যন্ত বিষাদ বা অত্যন্ত শোকাবহ পরিণাম যে সব দেখা দেয়, বাহিরে তার প্রকাশ কতটুকু? ভিতরের দিকেই, আত্মার ভিতরকার স্তব্ধতার মধ্যেই, তার সমস্ত লীলা নয় কি? তা যদি হয়, তবে ট্রাজেডি লিখিতে গেলেই যে তাকে actionএর ভিতর দিয়া ফলাইয়া তুলিতে হইবে তার কোন অর্থই নাই। ভিতরকার জীবন-ড্রামাকে উদ্ঘাটিত করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ এন্‌ড্রেফ্, বেন্‌ভেনুটো চেলেনি এবং ফ্রেড্‌রিক্ নীট্‌শে এই দুটি মানুষের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। চেলেনি একজন মধ্যযুগীয় আর্টিষ্ট ছিলেন এবং ইতিহাসপাঠজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, তাঁর জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য যত, এত অল্প লোকের জীবনেই দেখা যায়। কত খুনখারাপি, পলায়ন, কত ক্ষত-ক্ষতি, কত প্রণয়-অপ্রণয় শত্রুতার কাহিনী তাঁর চরিত-কথাটিকে মুড়িয়া জুড়িয়া আছে। চেলেনির এই চরিত-কথাটি এন্‌ড্রেফের মতে পুরাণো থিয়েটারের উপজীব্য। শেক্‌স্‌পীয়রের অধিকাংশ চরিত্রই এই চেলেনি-ছাঁচে গড়া।

চেলেনির পাশাপাশি নীট্‌শে-চরিত্র যদি দেখা যায়, তবে দেখা যায় যে, যৌবন বয়সে তিনি যখন সৈনিক ছিলেন, তখন বরঞ্চ তাঁর জীবনে কিছু নড়াচড়া ছিল, কিন্তু তখন তাঁর জীবনে নাট্যরস বিশেষ কিছুই জমিয়া ওঠে নাই। কিন্তু যখন হইতে তিনি তাঁর লেখকের নিস্তব্ধ আসনে আসীন হইলেন, তখন হইতে স্তরে স্তরে তাঁর ভাব-জীবনের বিকাশ ঘটিয়াছে। যে নীট্‌শেকে আমরা জানি এবং যাঁর প্রভাব আমরা সবাই মানি, তখন হইতেই বাস্তবিক তাঁর আরম্ভ।

কিন্তু এই নিস্তব্ধ অথচ নিগূঢ় নীটশে-চরিত্র ড্রামায় বিচিত্র করিয়া ফলাইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। চেলেনি আঁকা বরং সহজ। action দেখানো সহজ, thought দেখানো সহজ নয়। এন্‌ড্রেফ এইজন্য তাঁর শেষ নাটকটার নাম দিয়াছেন "Thought"। তাঁর মতে হালের নাটকের প্রধান নট বা নায়কই thought। সেই হচ্চে নটরাজ।

অবশ্য এন্‌ড্রেফের মতটা হয়ত বা একবগ্‌গা বলিয়া মনে হইতে পারে—কেননা, পুরাণো নাটকের সঙ্গে নূতন নাটকের কৌলিক আত্মীয়তার বন্ধনটুকুও তিনি ছেদন করিতে চান্। সেটা যে সবাই চায় বা চাইবে, তার কিন্তু কোন প্রমাণ নাই। হাল নাটক বলিলে সব নাটকই যে মেটারলিঙ্কের ধরণের অথবা এন্‌ড্রেফের ধরণের, তাতো নয়। ইব্‌সেন এবং তৎশিষ্য ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ, বার্ণার্ড শ প্রভৃতির নাটক ত অন্তরঙ্গ লীলানাট্য নয়, pan-psyche নয়। এন্‌ড্রেফ অবশ্য তাদেরও পুরাণো নাটকের দলভুক্ত করিয়া থাকেন। আমার বিবেচনায় ইব্‌সেন প্রভৃতি, পুরাণো-নূতনের সন্ধিস্থানেই আছেন; অর্থাৎ action-কে তাঁরা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করেন নাই, ওদিকে thoughtকেও তাঁরা সম্পূর্ণ অর্জ্জন করেন নাই। সমাজের উপরকার conventionএর ঢাকাটা তুলিয়া তার ভিতরকার ফাঁকাটাকে তাঁরা দেখাইয়াছেন—কিন্তু সে ফাঁকার নিমিত্তটা কি, তাহা দেখিবার জন্য এন্‌ড্রেফ প্রভৃতির মত খুব বেশি দূর পর্য্যন্ত তলান নাই। যাই হোক্ আধুনিক নাটক বলিতে শুধু এন্‌ড্রেফের Black Maskers বা The Life of Man জাতীয় নাটকই ত বুঝায় না। আধুনিক নাটকের এত বিচিত্রতা ও বিশিষ্টতা আছে যে কোন্‌টাকে যে প্রাচীনের কোটায় পুরিব আর কোন্‌টাকে আধুনিকের সঙ্গে জুড়িব তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া জেরবার হইয়া পড়িতে হয়। নাটকের সব

রূপই চাই, সব রূপই ভাল—একথা বলিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। D'Annunzio ত অধুনিক প্রসিদ্ধ ইতালীয়ন নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, তাঁর Honeysuckle পড়িলে মনে হয় যে শেক্‌স্‌পীয়রের হ্যামলেটের অনুবৃত্তিই পড়িতেছি। Hamletএর জায়গায় নাটকের প্রধান নায়িকা Audainকে বসান হইয়াছে মাত্র। সেটা কি আধুনিক নাট্য নয়? গ্রীক নাটককারগণ, শেক্‌সপীয়র, কালিদাস এঁরা কি আধুনিক নন্? শুধু যুগধর্ম্মের মাপকাটিটাই কি আধুনিকতার চরম মাপকাটি? সে মাপে যে খাটো হইল, তাহাকে আধুনিকতা হইতে ছাঁটো—এইটেই কি সাহিত্যের রায়? তা হইতেই পারে না। কেননা দেখা গেল যে মেটারলিঙ্ক, এন্‌ড্রেফের সঙ্গে ইব্‌সেন, শ'দের খুব তফাৎ। আবার মেটারলিঙ্ক এন্‌ড্রেফই যে মেলেন তাও নয়! এন্‌ড্রেফের বাস্তবচিত্র মেটারলিঙ্কের কোন নাটকেই পাওয়া যায় না। সেই জন্য বলিতে হয় যে, আধুনিক নাট্যকার মাত্রেই স্বয়ম্ভু। তাঁরা সাহিত্যের আকাশে দলের নীহারিকায় বাস করেন না; তাঁরা নিজেরাই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। তাঁদের কারো কারো চারিদিকে যদি সৌরমণ্ডলের মত একটা মণ্ডলী বাঁধে, তবে বাঁধুক; কিন্তু সেই মণ্ডলীটাই আসল মণ্ডলী, এমন দুঃসাহসের কথা বলিবার সাধ্য কারো নাই।

আইরিশ নাট্যকার জে, গ্রম্, সিঞ্জের নাট্য আধুনিক ত বটে; কিন্তু তিনি ইব্‌সেন্, হাপ্‌ট্‌ম্যান জুদারম্যান্‌দের দলে একেবারেই পড়েন না। তিনি বেন্ জন্‌সন্, মলেয়ার প্রভৃতি পুরাণো নাট্যকারদের পক্ষপাতী। তাঁর নিজেরও রচিত যে কোন নাটাই পড়া যাক্, যেমন The Well of the Saints, বা The Tinker's Wedding, কিম্বা The Play boy of the western world—তার মধ্যে কোন 'সমিস্যে' নাই, "চিন্তা" নাই, রূপক নাই। তার মধ্যে আছে শুধু বাস্তব জীবনের চিত্র ও প্রচুর হাস্যকৌতুক। The Tinker's Wedding নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন "The drama...does not teach or prove anything. Analysts with their problems and teachers with their systems are soon as old-fashioned as the pharmacopœia of Galen—look at Ibsen and the Germans—but the best plays of Ben Jonson and Moliere can no more go out of fashion than the blackberries on the hedges." অর্থাৎ ড্রামা কিছু শিক্ষা দিতেও চায় না, প্রমাণ করিতেও চায় না। সমস্যার সূক্ষ্ম বিশ্লেষকগণ এবং নানা "বাদের" বাদীপ্রতিবাদী মাষ্টারগণ গ্যালেনের ফার্ম্মাকোপিয়ার মত শীঘ্রই তামাদি হইয়া পড়েন—যেমন দেখ না কেন ইব্‌সেন ও জার্ম্মাণ নাট্যকারদের অবস্থা! কিন্তু ব্ল্যাকবেরির যেমন কখনও আদর কমে না, তেমনি বেনজন্‌সন, মলেয়ারের শ্রেষ্ঠ নাটক কি কোন দিন বেফ্যাসান হয়?

সেই জন্য নানাদিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি অবশেষে বুঝিতেছি এই যে, এটা পুরাণো, ওটা নূতন, এটা সেকেলে, ওটা একেলে, ওর যুগের পতন হইয়াছে আর এর যুগের পত্তন হইতেছে—এসব পাঁচিল-তোলা সাহিত্যবিচার বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত টেঁকা শক্ত। কেননা আধুনিকেরই মধ্যে কেউ বা পুরাণো নাট্যের, কেউ বা গ্রীক নাট্যের, কেউ বা প্যান্‌সাইকি নাট্যের, কেউবা সমস্যা-নাট্যের পক্ষপাতী। সেই জন্য আমার বিবেচনায় সব নাট্যই আধুনিক—'অধুনার' মধ্যে যাকে দাঁড় করানো যাইতে পারে এবং হার মানানো শক্ত হয়, তাই আধুনিক। তার মানে পুরাণোকে পুরাণ বলিয়া ঠেলাটা ঠিক্ নয়। পুরাণোর মধ্যে অনেক জিনিসই আছে যা চির-নূতন; আবার নূতন যাকে বলি তার মধ্যেও অনেক জিনিস থাকিতে পারে যা "চির"র অন্তর্ভুক্ত কোন কালেই হইবে না, অচিরেই লয় পাইবে।

তবে এটা ঠিক্ যে, পুরাণোই হোক্ আর নূতনই হোক্, নাটক বলিতে আমরা এদেশে সাধারণতঃ যাহা বুঝি, কোন নাটকই তাহা নয়। অর্থাৎ তাহা কেবলি বাহ্য কতগুলো প্রচণ্ড প্রবল ঘটনার রটনা মাত্র নয়। বাহ্য ঘটনা তখনি নাট্য-ঘটনা হয়, যখন নাট্যকারের কল্পনার মধ্যে তাহা নব রূপান্তর লাভ করে। গোড়াতেই এ কথার আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। যেমন ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে, There is nothing good or bad but thinking makes it so—ভাল বা মন্দ কিছুই নাই, চিন্তাতেই ভাল মন্দ হয়, তেমনি বলা যায় যে, নাট্যঘটনা বা বা অ-নাট্যঘটনা বলিয়া কিছুই নাই, নাট্যকারের কল্পনাতেই কোন ঘটনা নাট্য-ঘটনা হইয়া ওঠে, কোন ঘটনা বা হয় না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

রূপসী

পাত্র ও পাত্রী

বরাট	...	মোগল-সেনাপতি
রূপসী	...	মান্দার-দুর্গাধিপতি নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী
ভানু	...	বরাটের বিশ্বস্ত অনুচর
মহম্মদ	...	মোগল সম্রাটের পুত্র
মুরতব	...	মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ
প্রহরীগণ		

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোগল-শিবির। বরাটের কক্ষ।

বরাট আসীন; রূপসীর প্রবেশ

বরাট

এসো রূপসী!...এ কি তোমার হাতে রক্ত যে—

রূপসী

কাঁধে একটা গুলি লেগেছিল।

বরাট

গুলি লেগেছিল! কোথায়? কখন? আমাদের শিবিরে? এইমাত্র যে বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম, সে তবে—কিন্তু কার এ স্পর্দ্ধা হল?

রূপসী

লোকটা পালিয়ে গেল।

বরাট

তোমার খুব লেগেছে? যন্ত্রণা হচ্ছে?

রূপসী

না।

বরাট

আঘাত সামান্য নয় ত! দেখি, ওষুধ দি।

রূপসী

কোন প্রয়োজন নেই! এ সামান্য আঘাত! (ক্ষণেক স্তব্ধতা)

বরাট

তুমি তাহলে এসেছ রূপসী? কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই যে এসেছ, এ কি তোমার নিজের ইচ্ছায়?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

কেউ জোর করে পাঠায় নি?

রূপসী

না।

বরাট

জানো, কি সর্ত্তে এসেছ তুমি?

রূপসী

জানি।

বরাট

তবু এসেছ! আমি বিস্মিত হচ্ছি।... অচঞ্চল মনে এসেছ তুমি?

রূপসী

এমন সর্ত্ত ছিল না ত সেনাপতি যে আমার মনের চাঞ্চল্যটুকু সেখানে রেখে দিয়ে আসব।

বরাট

তোমার স্বামী—দুর্গাধিপতি আসবার অনুমতি দিয়েছে?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

ভেবে দেখ নারী, এখনো সময় আছে। ইচ্ছা হলে তুমি ফিরে যেতে পারো—

রূপসী

না।

বরাট

ফিরবে না! আশ্চর্য্য! জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন এ সর্ত্তে তুমি রাজী হলে?

রূপসী

কেন! না-হলে ক্ষুধার জ্বালায় একটী বিকাশমান জাতি সমূলে ধ্বংস হয়! আমার স্বামীর কীর্ত্তি অকালে লোপ পায়!

বরাট

এ-ছাড়া আর কোন কারণ নেই! এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে, আপনাকে এভাবে বলি দিতে—

রূপসী

এ-ছাড়া আর কোন কারণ নেই, সেনাপতি!...কিন্তু এত কৈফিয়ৎ দেবার সর্ত্ত বোধ হয় ছিল না!

বরাট

রাগ করো না। আমি শুধু আশ্চর্য্য হচ্ছি! এত উঁচু প্রাণ!...কিন্তু এখনো আমার সন্দেহ হচ্ছে, একজন সাধ্বী এমনভাবে—

রূপসী

বলেছি ত আমি তর্ক করতে আসিনি, সেনাপতি। তা-ছাড়া কোন কথার জবাব দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা।

বরাট

এমন পতিগত-প্রাণা! আশ্চর্য্য!

রূপসী

নারীর হৃদয় নিয়ে ব্যঙ্গ করো না, সেনাপতি! আমার অন্তরাত্মা জানে—

বরাট

অন্তরাত্মা! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!...যাক্, আসবার সময় আমাদের শিবিরের সম্মুখে দেখেছ, গাড়ী-ভরা খাদ্য, গাড়ী-ভরা অস্ত্র-শস্ত্র, সব সজ্জিত রয়েছে—?

রূপসী

দেখেচি।

বরাট

এ-সমস্ত এই মুহূর্ত্তে মান্দারে পাঠানো হবে। আমার সঙ্কেত পেলেই ওরা রওনা হবে।...কিন্তু ভেবে দেখ নারী, এখনো সময় আছে—ইচ্ছা হলে তুমি ফিরতে পারো—

রূপসী

আমি সর্ত্ত রক্ষা করতে এসেছি, সেনাপতি, চাতুরী করতে আসিনি।

বরাট

তুমি আমায় বড়ই বিস্মিত করেছ!

এ সমস্ত একটা প্রহেলিকা বলে আমার মনে হচ্ছে! কিন্তু সে সব কথা থাক্!...যখন এসেছ...বেশ, (বংশীধ্বনি করিল) এইবার ওরা রওনা হোক্! আহার আর অস্ত্র যা পাঠানো হচ্ছে, মান্দার তাতে প্রাণ পাবে, নব বলে বলী হবে, যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করবে!... তুমি চোখে দেখতে চাও—গাড়ী রওনা হল কি না?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

তবে এসো এই শিবিরের দ্বারে। (পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল) ঐ দেখ—

[অদূরে অস্পষ্ট আলো দেখা গেল,—ও সেই সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র এবং আহার্য্যে-ভরা অসংখ্য গাড়ী মান্দার-অভিমুখে চলিতে সুরু করিয়াছে, তাহাও দেখা গেল]

মান্দার আজ তার জঠর-জ্বালা ভুলবে! কাল প্রত্যূষে নব বলে বলী হয়ে মান্দার দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তিতে জেগে উঠবে!...সুগভীর জয়ের উল্লাসে সারা মান্দার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে—আর তার জন্য ধন্যবাদ দেবে সে কাকে, জানো? তাদের রাণী বিজয়িনী রূপসীকে!...দেখলে? এখন তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ?

রূপসী

হাঁ।

বরাট

এসো তবে, রূপসী। এইবার এইখানে এসে বসো। যদিও তোমার যোগ্য স্থান এখানে নেই—এ শিবির—তবু এই জানলার পাশে বেদীর উপরে এসে বসো।...বেশ শান্ত রাত্রি!

মৃদু জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে—এইখানে বসো। জ্যোৎস্না তোমার সারা অঙ্গে লুটিয়ে পড়ুক! জ্যোৎস্নার ফুটে ওঠা আজ সার্থক হোক্।…কিন্তু হাঁ,…তোমার সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই ত? বুকে ছুরি লুকিয়ে রাখনি?

রূপসী

না।

বরাট

বিষ?

রূপসী

এত ভয়! সন্দেহ হলে তল্লাস নিতে পারো।

বরাট

সন্দেহ? না। আর ভয়? মৃত্যুর ভয় বরাট কখনো করে না। তবে—তোমার জন্যই সতর্ক হতে চাই—

রূপসী

আমার জন্য ভয় করবার প্রয়োজন নেই। আমার কাছে আমার চেয়ে আমার মান্দারের মূল্য অনেক বেশী—

বরাট

এ তোমার ভুল, রূপসী! যাক্, আমি মিছে তর্ক করতে চাই না! এসো—এই জানলার পাশটিতে এসে বসো—বাহিরে জানলার ধারে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছে, পাহাড়ী ফুল—সন্ধ্যার বাতাসকে মৃদু গন্ধে আকুল করে তুলেছে! এ গন্ধ আমার বড় ভাল লাগে—এ গন্ধে মন অতীতের অনেক হারানো সুখের স্মৃতি কুড়িয়ে পায়!…(রূপসী জানালার কাছে আসিয়া বসিল)…ঐ দেখ, আকাশে একটু খানি ছোট্ট চাঁদ উঠেছে—কি শান্ত জ্যোৎস্না চারিধারে ঢেলে দিয়েছে! তোমার মুখে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে—সুন্দর দেখাচ্ছে! (রূপসী মুখ নত করিল; বরাট কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে রূপসীর পানে চাহিয়া থাকিয়া গাঢ় স্বরে ডাকিল) হাসি—(রূপসী চমকিয়া উঠিল) মনে পড়ে, হাসি? সে আজ কত—কত দিনের কথা…সেই ঝরণার ধারে ছোট্ট কুটীর—কুটীরের পাশ দিয়ে ছোট্ট রেখা বয়ে তরল রূপার মত জলের ধারা তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছিল—আশে-পাশে গাছের ছায়ায় সেই পাখীর গান—দূরে রাখালদের ছেলেরা বাঁশী বাজাচ্ছিল, খেলা করছিল!…উঃ, তারপর সারা জীবনের উপর দিয়ে আমার কি ঝড় বয়ে গেছে—নৈরাশ্যের বাজ কি সে হুঙ্কার দিয়ে ফিরেছে—সমস্ত প্রাণ আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে—কিন্তু আমার হাসিকে তারা কৈ কখনো এ বুকের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি ত!

রূপসী

ও-নাম কি করে জানলে? কে তুমি?

বরাট

আমি! তুমি অবাক হচ্ছ, হাসি, আমায় চিনতে পারছ না?…ঐ নাম শুনে কাকেও আজ তোমার মনে পড়ছে না?…কি করে চিনবে তুমি! ফুলের মত তার কোমল শুভ্র মনই তুমি দেখেছিলে, আর আজ! ফুল নেই, তার একটি দলও নেই—আছে শুধু পাষাণ, পাষাণ, কঠিন পাষাণ, হাসি।…কিন্তু বিশ্বাস করো, এ পাষাণের গায়ে যদি কোনদিন কোন অঙ্কুর ফুটে উঠে আজ-পর্য্যন্তও অটুট থাকে ত সে সেই অতীতের স্মৃতি—হাসি, তোমারই স্মৃতি

রূপসী

আমায়ি চেনো তুমি? আমার সে ছেলেবেলাকার নাম ধরে ডাকলে! কিন্তু—

বরাট

আশ্চর্য্য হয়ো না, হাসি…সারা জীবন ভরে ধ্যান করে আসছি আমি! নিজের ধ্যানের মূর্ত্তিকে মানুষ কখনো ভুলতে পারে?…এখনো তুমি চিনতে পারছ না?

রূপসী

(সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া) না। তুমি—?

বরাট

আমি কিন্তু ভুলিনি ত, মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিনি! হতভাগা আমি একটা ঢেউয়ে কূল ছেড়ে কোথায় কতদূরে সরে পড়লুম—তারপর আজ আবার আর-এক ঢেউয়ে যদি সেই কূলেরই কাছে এসে পৌঁছুলুম, ত সে কূলে আমার ঠাঁই নেই!…বারো বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে আমার, কিন্তু তুমি ঠিক তেমনি আছ, হাসি, এতটুকু তফাৎ নয়, সেই নির্ম্মল সরল দৃষ্টি, সেই জগৎ ভোলানো মূর্ত্তি—

রূপসী

কে তুমি? পরিচয় দাও।

বরাট

মনে পড়ে হাসি, সেই তোমাদের কুটীরের সামনে ছোট্ট বাগানটুকুর কথা? একদিন বিকেলে এক যুবা সেই বাগানে গাছে ফল পাড়তে উঠেছিল, আর তুমি ঝরণার ধারে বসে কাঁদছিলে, ঝরণার জলে তোমার আংটি পড়ে গেছল—তুমি খুঁজে পাচ্ছিলে না। যুবা গাছ থেকে নেমে তোমার কাছে এল, তারপর ঝরণার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার আংটি খুঁজে তুলে আনলে, তোমার হাতে সে আংটি সে পরিয়ে দিলে! তোমার জল-ভরা ডাগর চোখদুটি তুলে তুমি তার পানে চেয়ে দেখলে…তার পর—তার পর, হাসি—

রূপসী

সে মুঞ্জা—

বরাট

হাঁ, মুঞ্জা। মনে আছে? সেই মুঞ্জাই বরাট।

রূপসী

মুঞ্জা! তুমি মুঞ্জা। (বরাটের পানে চাহিয়া) হাঁ, মুঞ্জাই বটে! কপালের উপর সেই তিল! ঠিক—আমি লক্ষ্য করিনি, তাই চিনতে পারিনি—

বরাট

এখন ত চিনেছ, হাসি? (হাসিল)

রূপসী

হাঁ, এবারে চিনেছি। তুমি বীর, অনেক নরহত্যা করেছ তুমি, কিন্তু তোমার হাসিটুকু এখনো তেমনি শিশুর মতই সরল রেখেছ ত…এ কি? তোমার চোখের নীচে রক্ত! অতখানি কেটে গেছে—

বরাট

ও কিছু নয়—সামান্য একটু চোট লেগেছে মাত্র!

রূপসী

না, না, সামান্য নয়! এসো, আমি বেঁধে দি—(নিজের বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া ক্ষত-স্থানে বাঁধিয়া দিল) এ কাজ তোমারই জন্য শিখতে হয়েছে। এ যুদ্ধে এই হাতে অনেক আহতের শুশ্রূষা করতে হয়েছে।…বারো বৎসর—বললে না?…হাঁ, বা-রো—ব-ৎ-স-রই

বটে! অনেক দিন, তবু মনে হচ্ছে, যেন সে কালকের কথা! সেই বাগান, সেই ঝর্ণা,—বারা—মা—সব যেন আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! মানুষের জীবনের উপর দিয়ে শুধু ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে—ওঃ, মানুষ এত ভুলে থাকতে পারে! আশ্চর্য্য! আজ নতুন করে সমস্ত অভাব আমার মনে জেগে উঠছে।...সেই একদিনের কথা মনে পড়ছে, সেদিন ভারী গরম পড়েছিল, এতটুকু বাতাস বয়নি, গাছপালাগুলো অমনি-যেন কঠিন নিশ্চল পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তুমি একটা বরা মেরে পিঠে বয়ে সেটাকে নিয়ে এলে—

বরাট

মনে পড়েছে!...শুধু সেইটুকুই মনে পড়েছে? আমার কিন্তু আরো মনে পড়ছে, বরা দেখে তুমি কি বলেছিলে। তার পর আমার হাতের রক্ত ধুয়ে দিলে! সেদিন তুমি একটি ফুলের মালা গেঁথেছিলে, মনে আছে, হাসি? সেই মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে তুমি বললে, "বিজয়ী বীরের পুরস্কার এই!"

রূপসী

মনে আছে। তুমি কিন্তু সে মালা তখনি গলা থেকে খুলে আমার মাথায় পরিয়ে দিলে, বললে, ফুল পুরুষের জন্য নয়, তাতে ফুলের অপমান হয়! ফুলের সৃষ্টি হয়েছে, মেয়েদের রূপশ্রীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য—...কিন্তু তার পরে হঠাৎ যে তুমি কোথায় একদিন চলে গেলে—

বরাট

কাশ্মীরে। পথে বাবার মৃত্যু হল, মাও শোকে প্রাণ দিলেন। পথ হারিয়ে আমি গান্ধারের দিকে চলেছিলুম—একদল পাহাড়ী ডাকাতের হাতে বন্দী হলুম। যথাসর্ব্বস্ব তারা কেড়ে নিলে; আমার মৃত্যু-ভয় ছিল না দেখে জীবন নিলে না। তার পর সঙ্গী করলে। তাদের দলে মিশে লুঠ পাট দাঙ্গা-হাঙ্গামে রীতিমত দড় হয়ে উঠলুম। তার পর যখন বন্দী দশা ঘুচল, নজর-বন্দীর হাত এড়ালুম, তখন একদিন প্রথম সুযোগ পেয়ে তাদেরই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বরাবর আমাদের সেই গাঁয়ে ফিরলুম। সে চার বৎসর পরে। এসে দেখি, তোমাদের কুটীরের চিহ্নও নেই! শুনলুম, তোমার বিধবা মা মারা গেছেন। তোমার সন্ধান দেশের লোক কেউ দিতে পারলে না। তার পর কত দিন যে তোমার খোঁজ করে বেড়িয়েছি, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর! কেউ বললে, তোমায় কারা চুরি করে নিয়ে গেছে—কেউ বললে, তুমি বেঁচে নেই! আরো অনেকে অনেক কথা বললে, সব শুনলুম—শুনে মানুষের উপর কেমন রাগ হল। ভাবলুম, মানুষ আপনাকে নিয়ে এত ব্যস্ত, এত মত্ত! এক অসহায় বালিকার কোন সন্ধান রাখলে না! আচ্ছা, এই মানুষকে একবার দেখে নেব। মোগল তখন মানুষ মারবার কল পাতছিল। আমি এসে সেই মোগলের দাসত্ব স্বীকার করলুম! মোগল আমার দুঃসাহস, আমার কৌশল দেখে আমায় তারিফ করলে—তাই আজ আমি মোগল সেনার একজন অধ্যক্ষ!...তার পর মান্দার লুঠ করতে এসে হঠাৎ এক বৃদ্ধ কৃষকের কাছে মান্দারের রাণীর পরিচয় পেলুম।

ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মান্দারের দিকে মন আরো আকৃষ্ট হল। আর সেই জন্যই জয় করবার অবসর পেয়েও মান্দারকে আমি জয় করিনি। মান্দার জয় করতে আর আমার ইচ্ছা ছিল না—কোনমতে মান্দারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মান্দারের রাণীকে যদি একবার দেখতে পাই, এই হল আমার সাধ—

রূপসী

কিন্তু তবু আমিই যে হাসি, এ তুমি এত শীঘ্র চিনতে পারলে! বারো বৎসর পরে দেখা—

বরাট

বারো বৎসর ত সামান্য, হাসি। যুগ-যুগান্তের পরে দেখা হলেও আমি তোমায় চিনতে পারতুম। পৃথিবীর সমস্ত রূপসীর সঙ্গে মিশে থাকলেও আমি তোমায় চিনতে পারতুম। বললুম ত, হাসি, বারো বৎসর অনেক অত্যাচার করেছি আমি। পশু থেকে নিজেকে এতটুকু তফাৎ করিনি—তবু এই বারো বৎসরে এমন দিন ছিল না, যেদিন তোমার এই মূর্ত্তি না ধ্যান করেছি! আমার বারো বৎসরের ধ্যানের মূর্ত্তি—তাকে আমি চিনতে পারব না—এ কি সম্ভব, রূপসী?... বারো বৎসর তোমার সন্ধানে কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, কত বন ঢুঁড়েছি, পাহাড়ে উঠেছি, খর-স্রোতা নদী সাঁতরে পার হয়েছি। কিন্তু তোমায় পাই নি! নিজের দেশ নেই, ভুঁই নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, শুধু তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়িয়েছি। ভক্ত যেমন করে তার ভগবানের খোঁজ করে, তেমনি করে খুঁজেছি। কোথাও যখন সন্ধান পেলুম না, তখন একবার মনে হল, আর বাঁচা তবে কিসের জন্য? কিসের আশায়? নিজেকে হত্যা করতে তলোয়ার তুলেছি, উদ্যত তলোয়ার হাত থেকে পড়ে গেছে। তখন মনে হল,—না, মরবো না। মনের মধ্যেও কে যেন আশ্বাস দিয়ে বললে, "দেখা হবেরে, দেখা হবেই!"

রূপসী

তুমি উন্মাদ।

বরাট

সত্যই উন্মাদ, হাসি। তোমার রূপে উন্মাদ! তোমার প্রেমে উন্মাদ। কিন্তু তুমি—তুমি—

রূপসী

এ-সব কথা বলো না, মুঞ্জা—আমি অপরের স্ত্রী, সে কথা ভুলে যেয়ো না—

বরাট

সে কথা ভুলি নি, হাসি।...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি কি বেশ মনের সুখে আছ? বল, বল, তোমার প্রাণে কোন দুঃখ, কোন অভাব—?

রূপসী

না, কোন দুঃখ নেই, কোন অভাব আমি জানি না। স্বামীর নিবিড় স্নেহে-প্রেমে আমার চিত্ত ভরপুর। তাঁর ভালবাসা অগাধ, করুণা অসীম।

বরাট

বড় বিলম্ব করেছিলুম, হাসি, বড় বিলম্ব। ...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তোমার স্বামীকে কি যথার্থই এমনি প্রাণ-মন দিয়ে ভালবেসেছ? বল, বল—

রূপসী

বাসিনি? মুঞ্জা, তোমরা পুরুষ, বড় ভুল বিশ্বাস নিয়ে নিজের মনে তোমরা শুধু মিথ্যার রাশি জড় কর! নিজের দুঃখ তোমরা নিজেরা গড়ে তোলো!···মা মারা গেলেন,—অসহায় আমি অকূল পাথারে পড়লুম। সে বিপদ থেকে মাথা তোলবার আগেই আবার অন্য বিপদ সুরু হল। বলবান পুরুষ বলে আমায় লুণ্ঠন করতে উদ্যত হল; রূপের ভিখারী মিনতি জানালে; দুর্বৃত্তেরা হুঙ্কার দিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। শেষে এক মোগলের লোলুপ দৃষ্টি শ্যেনের মত আমায় আক্রমণ করলে। নিরাশ হয়ে বর্ব্বর একদিন আমায় নির্জ্জনে অসহায় পেয়ে আমার হাত চেপে ধরলে। চারিধার অন্ধকার দেখলুম—চোখ মুদে ভগবানকে ডাকলুম—স্বামীর মূর্ত্তি ধরে আমার ভগবান সেদিন আমায় দেখা দিলেন, সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, তারপর আমার পরিচয় নিয়ে তিনি আমায় অসীম সম্পদের অধিকারিণী করলেন, পথের ভিখারিণীকে রাণীর ঐশ্বর্য্য দিলেন। স্বামীর প্রেমে, স্বামীর স্নেহে আমি স্বর্গসুখ পেলুম। সব শোক ভুললুম। অতীতের বেদনা জীবন থেকে নিমেষে মুছে গেল। তিনিই আমায় পরিহাস করে বললেন, 'তুমি শুধু হাসি নও, রূপের হাসি'! তিনিই আমার নাম দিলেন, "রূপসী—"...সেই-অবধি শুধু সুখ, শুধু তৃপ্তির মধ্যে আমি ডুবে আছি। এ যে কি সুখ, কি তৃপ্তি, তা বোঝাবার আমার ভাষা নেই, মুঞ্জা। শুধু এইটুকু বোঝো যে এর স্পর্শে আমার সমস্ত অতীত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে!

বরাট

আর সেই-সঙ্গে সেই বাগান, কুটীর, ঝর্ণা, মুঞ্জা, সব তুমি ভুলে গেলে!

রূপসী

তাতে কি কিছু অন্যায় হয়েছে, মুঞ্জা?—আমার দেবতা স্বামী, তাঁর অমন ভালবাসা—এতেও যে নারী অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তার দুঃখের সীমা নেই! সে ত দুর্ভাগিনী!

বরাট

(স্তব্ধ রহিল; কোন কথা কহিল না)

রূপসী

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, মুঞ্জা, হঠাৎ এ সর্ত্ত তুমি কেন করলে? একজন নারীকে তার স্বামীর কাছ থেকে টেনে এনে, তার সব গৌরব ছিনিয়ে নিয়ে—

বরাট

ভুল করেছি, হাসি, অন্যায় করেছি। আমি ভেবেছিলুম, আমার মত তুমিও বুঝি সেই অতীতকে আঁকড়ে বসে আছ! তাই দুজনেই সুখী হব, এই ভেবে আমি আমারও সমস্ত ভবিষ্যৎকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলেচি।

রূপসী

বুঝেচি, এইজন্য মোগলেরও বিশ্বাস হারিয়েছ তুমি।

বরাট

মোগলের বিশ্বাস-অবিশ্বাস! সে আমি গ্রাহ্যও করি না। বে-ইমান মোগলই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে—এ আমি বুঝেছিলুম, তাই আমি হাসির স্বামীকে সাহায্য করব, স্থির করেছিলুম—ভালই করেছি, হাসি। যে

দেশের জন্য আমার সেই হাসি মাথায় কলঙ্কের বোঝা তুলে নিতে এতটুকু হঠেনি, অকম্পিত পদে মোগলের শিবিরে চলে এসেছে, সেই-হাসির সেই-দেশকে আমি প্রাণ দিয়েছি, এ কি কম সুখ আমার!

রূপসী

আমারই জন্য তুমি এতখানি ত্যাগ করেছ! নিজের একমাত্র অবলম্বনটুকুকে তুমি পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেছ!

বরাট

কিন্তু কি সুখ পেয়েছি আমি! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা তুলে ফেলতে যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি, হাসি।

রূপসী

মুঞ্জা, ভাই, তুমি মহৎ!

বরাট

না হাসি, দুর্বৃত্ত নরাধম বর্ব্বর আমি। তাই আমি বুঝে দেখিনি, তোমায় আসতে বলে কত বড় অন্যায় করেছি! তোমার সর্ব্বনাশ করেছি—

রূপসী

সর্ব্বনাশ!

বরাট

নয়? এখন তুমি ফিরে গেলে তোমার স্বামী আবার তেমনি হাসি মুখে তোমায় বুকে তুলে নেবে কি? সারা দেশ—তুমি জানো না, হাসি, এ বড় লক্ষ্মীছাড়া জায়গা, এই পৃথিবী! নারীর বিরুদ্ধে পুরুষ হেথায় দিবারাত্রি ষড়যন্ত্র করছে, কি করে তাকে পায়ের তলায় চেপে রাখবে! তুমি জানো না নারীর প্রতি এখানে পুরুষের কি দারুণ অবজ্ঞা, গভীর অবিশ্বাস! তুমি ভাবো তোমার স্বামীর বিশ্বাস হবে যে—তুমি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক—?

রূপসী

আমার স্বামীর বিশ্বাস! কেন হবে না? নিজের মুখে আমি সব কথা তাঁকে খুলে বললে—

বরাট

তাই হোক্! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

রূপসী

আর তুমি? তোমার কথা ভাবছ না?

বরাট

আমার কথা! সে আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি করব!...যাক্, একটা কথা, হাসি, তুমি যখন বরাটের শিবিরে আসতে উদ্যত হলে, তখন জানতে কি, কোথায় আসছ—কার কাছে আসছ?

রূপসী

না।...অনেক কথা শুনেছিলুম...কেউ বললে, বরাট একটা দুর্বৃত্ত বর্ব্বর—আবার কেউ বললে, সে এক তরুণ যুবা, অদ্ভুত রকমের খেয়ালী—

বরাট

কিন্তু তোমার বৃদ্ধ শ্বশুর আমায় দেখে গেছলেন—তিনি কিছু বলেন নি?

রূপসী

না।

বরাট

তুমি নিজেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করনি? জানবার কৌতূহল হয়নি?

রূপসী

বাসিনি? মুঞ্জা, তোমরা পুরুষ, বড় ভুল বিশ্বাস নিয়ে নিজের মনে তোমরা শুধু মিথ্যার রাশি জড় কর! নিজের দুঃখ তোমরা নিজেরা গড়ে তোলো!...মা মারা গেলেন,—অসহায় আমি অকূল পাথারে পড়লুম। সে বিপদ থেকে মাথা তোলবার আগেই আবার অন্য বিপদ সুরু হল। বলবান পুরুষ বলে আমায় লুণ্ঠন করতে উদ্যত হল; রূপের ভিখারী মিনতি জানালে; দুর্বৃত্তেরা হুঙ্কার দিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। শেষে এক মোগলের লোলুপ দৃষ্টি শ্যেনের মত আমায় আক্রমণ করলে। নিরাশ হয়ে বর্ব্বর একদিন আমায় নির্জ্জনে অসহায় পেয়ে আমার হাত চেপে ধরলে। চারিধার অন্ধকার দেখলুম—চোখ মুদে ভগবানকে ডাকলুম—স্বামীর মূর্ত্তি ধরে আমার ভগবান সেদিন আমায় দেখা দিলেন, সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, তারপর আমার পরিচয় নিয়ে তিনি আমায় অসীম সম্পদের অধিকারিণী করলেন, পথের ভিখারিণীকে রাণীর ঐশ্বর্য্য দিলেন। স্বামীর প্রেমে, স্বামীর স্নেহে আমি স্বর্গসুখ পেলুম। সব শোক ভুললুম। অতীতের বেদনা জীবন থেকে নিমেষে মুছে গেল। তিনিই আমায় পরিহাস করে বললেন, 'তুমি শুধু হাসি নও, রূপের হাসি'! তিনিই আমার নাম দিলেন, "রূপসী—"...সেই-অবধি শুধু সুখ, শুধু তৃপ্তির মধ্যে আমি ডুবে আছি। এ যে কি সুখ, কি তৃপ্তি, তা বোঝাবার আমার ভাষা নেই, মুঞ্জা। শুধু এইটুকু বোঝো যে এর স্পর্শে আমার সমস্ত অতীত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে!

বরাট

আর সেই-সঙ্গে সেই বাগান, কুটীর, ঝর্ণা, মুঞ্জা, সব তুমি ভুলে গেলে!

রূপসী

তাতে কি কিছু অন্যায় হয়েছে, মুঞ্জা?—আমার দেবতা স্বামী, তাঁর অমন ভালবাসা—এতেও যে নারী অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তার দুঃখের সীমা নেই! সে ত দুর্ভাগিনী!

বরাট

(স্তব্ধ রহিল; কোন কথা কহিল না)

রূপসী

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, মুঞ্জা, হঠাৎ এ সর্ত্ত তুমি কেন করলে? একজন নারীকে তার স্বামীর কাছ থেকে টেনে এনে, তার সব গৌরব ছিনিয়ে নিয়ে—

বরাট

ভুল করেছি, হাসি, অন্যায় করেছি। আমি ভেবেছিলুম, আমার মত তুমিও বুঝি সেই অতীতকে আঁকড়ে বসে আছ! তাই দুজনেই সুখী হব, এই ভেবে আমি আমারও সমস্ত ভবিষ্যৎকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলেচি।

রূপসী

বুঝেচি, এইজন্য মোগলেরও বিশ্বাস হারিয়েছ তুমি।

বরাট

মোগলের বিশ্বাস-অবিশ্বাস! সে আমি গ্রাহ্যও করি না। বে-ইমান মোগলই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে—এ আমি বুঝেছিলুম, তাই আমি হাসির স্বামীকে সাহায্য করব, স্থির করেছিলুম—ভালই করেছি, হাসি। যে

দেশের জন্য আমার সেই হাসি মাথায় কলঙ্কের বোঝা তুলে নিতে এতটুকু হঠেনি, অকম্পিত পদে মোগলের শিবিরে চলে এসেছে, সেই-হাসির সেই-দেশকে আমি প্রাণ দিয়েছি, এ কি কম সুখ আমার!

রূপসী

আমারই জন্য তুমি এতখানি ত্যাগ করেছ! নিজের একমাত্র অবলম্বনটুকুকে তুমি পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেছ!

বরাট

কিন্তু কি সুখ পেয়েছি আমি! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা তুলে ফেলতে যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি, হাসি।

রূপসী

মুঞ্জা, ভাই, তুমি মহৎ!

বরাট

না হাসি, দুর্বৃত্ত নরাধম বর্ব্বর আমি। তাই আমি বুঝে দেখিনি, তোমায় আসতে বলে কত বড় অন্যায় করেছি! তোমার সর্ব্বনাশ করেছি—

রূপসী

সর্ব্বনাশ!

বরাট

নয়? এখন তুমি ফিরে গেলে তোমার স্বামী আবার তেমনি হাসি মুখে তোমায় বুকে তুলে নেবে কি? সারা দেশ—তুমি জানো না, হাসি, এ বড় লক্ষীছাড়া জায়গা, এই পৃথিবী! নারীর বিরুদ্ধে পুরুষ হেথায় দিবারাত্রি ষড়যন্ত্র করছে, কি করে তাকে পায়ের তলায় চেপে রাখবে! তুমি জানো না নারীর প্রতি এখানে পুরুষের কি দারুণ অবজ্ঞা, গভীর অবিশ্বাস! তুমি ভাবো তোমার স্বামীর বিশ্বাস হবে যে—তুমি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক—?

রূপসী

আমার স্বামীর বিশ্বাস! কেন হবে না? নিজের মুখে আমি সব কথা তাঁকে খুলে বললে—

বরাট

তাই হোক্! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

রূপসী

আর তুমি? তোমার কথা ভাবছ না?

বরাট

আমার কথা! সে আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি করব!...যাক্, একটা কথা, হাসি, তুমি যখন বরাটের শিবিরে আসতে উদ্যত হলে, তখন জানতে কি, কোথায় আসছ—কার কাছে আসছ?

রূপসী

না।...অনেক কথা শুনেছিলুম...কেউ বললে, বরাট একটা দুর্বৃত্ত বর্ব্বর—আবার কেউ বললে, সে এক তরুণ যুবা, অদ্ভুত রকমের খেয়ালী—

বরাট

কিন্তু তোমার বৃদ্ধ শ্বশুর আমায় দেখে গেছলেন—তিনি কিছু বলেন নি?

রূপসী

না।

বরাট

তুমি নিজেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করনি? জানবার কৌতূহল হয়নি?

রূপসী

না, জানবার প্রয়োজনও মনে করিনি। সর্ত্ত-মত আমায় আসতে হবে, এইটুকু শুধু বুঝেছিলুম! না হলে দেশ-রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না।

বরাট

কিন্তু আসতে তোমার বুক কাঁপেনি? পা টলেনি? এই সন্ধ্যায় এক অপরিচিত দুর্বৃত্তের শিবিরে, শত্রুর শিবিরে—সুন্দরী কিশোরী তুমি একলা আসছ—

রূপসী

বলেছি ত—সর্ত্ত ছিল, আমায় আসতেই হবে।

বরাট

তারপর যখন আমায় দেখলে, তখন কি মনে হল?

রূপসী

কিছুই মনে হয়নি।

বরাট

এখন কি মনে হচ্ছে? যদি আমি কোন অত্যাচার করি—?

রূপসী

অত্যাচার! তুমি করবে? (হাসিয়া) আমার কোন ভয় নেই, মুঞ্জা—কাকেও ভয় নেই! মানুষ মানুষের উপর খামখা অত্যাচার করবে কেন! বিশেষ তুমি! তুমি ত কোন অত্যাচারই করতে পার না।

বরাট

পারি না!—কেন?

রূপসী

তুমিই ত বলেছ, আমায় তুমি ভালবাস!

বরাট

হায় নারী, এত সরল, এত নির্ম্মল তোমার মন!...পুরুষকে তুমি জানো না, তার প্রবৃত্তি কত কুৎসিত, তার মন কত কদর্য্য—

রূপসী

মুঞ্জা, মিথ্যা আমায় ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ—তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আমার মন্দ করতে কখনো পার না—

বরাট

ঠিক বলেছ—হাসি,—আমি তোমার মন্দ করতে পারি না। তোমায় ভালবাসি, তোমায় সুখী দেখলেই আমি সুখ পাই।...কিন্তু না, আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। চল, এই রাত্রির গোপনতার মধ্য দিয়ে তোমায় দুর্গে রেখে আসি—তোমার স্বামীকে বলো, বরাট তার বন্ধু, ভাই, আর বলো,—এ যুদ্ধে মান্দার জয়ী হবেই।

রূপসী

তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

বরাট

বিশ্বাসঘাতকতা! বরাট বিশ্বাসঘাতক নয়। তা-ছাড়া কার বিশ্বাস সে ভাঙ্গবে? মোগলের। সে ত সব শোধ-বোধ হয়ে গেছে—মোগল যেদিন আমায় অবিশ্বাস করেছে, সেই দিনই যে মোগলের নিমকের দেনাও আমি শোধ করেছি—

রূপসী

মোগল বলী।

বরাট

বরাটও মোগলের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী—

রূপসী

নিজের ভবিষ্যৎ—মোগলের রোষ-রক্ত আঁখি—

বরাট

বরাট খোড়াই তার তোয়াক্কা রাখে! ...যাক, এসো হাসি, আর দেরী নয়। তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। (নেপথ্যে কোলাহল—বন্দুকের শব্দও শুনা গেল) ও কি—

(শশব্যস্তে ভানুর প্রবেশ)

ভানু

সেনাপতি—

বরাট

খবর কি, ভানু?

ভানু

শাহজাদা পালিয়েছেন—সমস্ত সৈন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে—তারা আপনার বিরুদ্ধে উদ্যত হচ্ছে। আপনার অনুচর কুকব শাহজাদাকে ধরতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

বরাট

এত অকস্মাৎ—?

ভানু

মুলতব সাতশ' ফৌজ নিয়ে এসে পৌঁচেছে—

বরাট

দেখ হাসি, মোগলের বিশ্বাস দেখ! মোগলই আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা শেখাচ্ছে। এর প্রতিফলও তাকে পেতে হবে।...এখন এসো, শীঘ্র এসো—

রূপসী

তুমি কোথায় যাবে?

বরাট

মান্দার দুর্গে। ভানু, তুমিও আমার সঙ্গে এসো—যদি পথে মোগল আমায় আক্রমণ করে, তাহলে তুমি এই মান্দারের রাণীকে—আমার ভগ্নীকে সসম্মানে দুর্গে পৌঁছে দিয়ে আসবে। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঐ ঢাকা পড়েছে, বাঃ, চমৎকার সুযোগ মিলেছে।

রূপসী

মান্দারও যে তোমার শত্রু, মুঞ্জা। দুধারে দু'দল শত্রুর মধ্যে পড়ে তুমি—তুমি কি করবে?

বরাট

আমার জন্যে ভেবো না—এ পৃথিবীর কোলটুকু বড় ছোট যায়গা নয়—আমার ঠাঁই আমি কোনখানে করে নেবই। আর না হয়,—

ভানু

কিন্তু শিবিরের সামনেই মুলতবের আস্তানা—

বরাট

বেশ—তবে এই শিবির ফুঁড়েই আমরা পথ করে নেব। এসো হাসি।

রূপসী

না, তোমার সঙ্গে যাব না আমি। তোমাকে বিপদে ফেলে—

বরাট

হাসি, এ-সময় অবুঝ হয়ো না। তুমি আমার কৌশল জানো না—যা বলচি, শোনো, এসো—নাহলে দুজনের কেউ রক্ষা পাব না।

রূপসী

তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বরাট

যাব।

রূপসী

তবে এসো—কিন্তু একটা কথা, বল, ফিরে আসবে না? মান্দারেই থাকবে?

বরাট

তোমার স্বামীর মত হবে?

রূপসী

আমি তাঁকে সব কথা খুলে বলব।

বরাট

তিনি বিশ্বাস করবেন?

রূপসী

নিশ্চয়।

বরাট

যদি না করেন—?

রূপসী

যদি না করেন!...না, না, করবেন বৈ কি, নিশ্চয় করবেন—আমি নিজে সব কথা বলব—এসো—

বরাট

না, মান্দারের দ্বারে শুধু তোমায় পৌঁছে দেব—মান্দারে পা দেওয়া হবে না, হাসি—

রূপসী

কেন, মুঞ্জা—তোমার ভয় কি?

বরাট

ভয়! তোমারই জন্য ভয়।

রূপসী

আমার জন্য?

বরাট

হাঁ, তোমারই জন্য। আমায় তোমার সঙ্গে দেখলে—

রূপসী

সে ভয় ত সমানই আছে—আমি তোমার সঙ্গেই ফিরি কি একলাই ফিরি—নয় কি? ভয় তোমারই জন্য। কিন্তু তবু আমি সে ভয় করি না। বিপন্ন মান্দারকে তুমি তার বড়-দুর্দ্দিনে রক্ষা করেছ, নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জ্জন দিয়েও তাকে রক্ষা করেছ, মান্দার অকৃতজ্ঞ নয়, আজ তোমার দুর্দ্দিনে সেও তোমায় রক্ষা করবে।...তাকে ঋণী করে রেখো না, মুঞ্জা,—এসো, মান্দারের রাণী তোমায় নিমন্ত্রণ করছে—এসো তুমি।

বরাট

যাব?

রূপসী

হাঁ। না যাও, আমিও যাব না।...যদি আমায় ভালবাস, মুঞ্জা—এসো, আর বিলম্ব করো না—ঐ, ঐ শোনো চীৎকার—শীঘ্র এসো—

বরাট

ভানু, আমরা শিবির ছাড়লে তুমি শিবিরে আগুন লাগিয়ে দাও, তারপর অলক্ষ্যে আমাদের পিছনে এসো। যদি আমায় আক্রমণ করে, তাহলে মোগলকে আমি রুখে রাখব, তুমি ততক্ষণে রাণীকে মান্দারে পৌঁছে দিতে পারবে।

রূপসী

মুঞ্জা, ভাই, এসো—

[বরাটের হাত ধরিয়া রূপসী বাহিরে গেল; ভানু তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল]

(মহম্মদ ও মুলতবের প্রবেশ; সঙ্গে চারিজন সশস্ত্র প্রহরী)

মহম্মদ

কোথায় গেল?

ভানু

আমি এসে দেখি, শিবিরে কেউ নেই।

মুলতব

কেউ নেই! এ তোর শয়তানী বান্দা! শাহজাদা, এইই তাহলে এসে সংবাদ দিয়েছে। মূর্খ—

মহম্মদ

নিমকহারাম—

মুলতব

বল্, তোর বিশ্বাসঘাতক মনিব কোথায়? কোন্ দিকে গেছে?

ভানু

জানি না।

মহম্মদ

জানিস্ না? মুলতব, একে বন্দী কর।

সাঁড়াসি দিয়ে এর জিভ টেনে ধর। দেখি, কতক্ষণ ও না বলে চুপ করে থাকে।

ভানু

বেশ! তাই হোক্।

(প্রহরীগণ ভানুকে বন্দী করিল)

মহম্মদ

শিবিরে-শিবিরে সন্ধান কর।

ভানু

(স্বগতঃ) যাক্, অনেকখানি সময় পাওয়া গেল। বাঃ, এমন হবে, তা ত ভাবি নি কখনো। সেনাপতি যদি খবরটা পেতেন—আহা—

(ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আর্টের সেকাল-একাল

১

সেকাল ছিল আর্টের কাল; কলা-লক্ষ্মীর পাদপদ্মে সেকালের ভক্ত রসিকরা যেমন চিত্ত ঢালিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছিল, একালে তেমন তন্ময়তা বড় আর দেখা যায় না। আর্ট লইয়া এখন কথার ছটা তর্কের ঘটা বাড়িয়াছে, কিন্তু ফিডিয়াস বা মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল বা রেমব্রাণ্ডের মতন মহা শিল্পী আর ত কৈ জন্মাইল না! শিল্পীকে লোকে এখন অকেজো ঠাওরায়, আর্টের নামে মাতব্বররা এখন মুরুব্বি-আনা-চালে হাসি-ঠাট্টার ফোয়ারা খুলিয়া দেন! এখনকার চালচলন, ধরন-ধারন, কথাবার্ত্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরকন্নার জিনিষপত্তর, বাড়ী-ঘর সমস্তই কেমন-যেন শ্রী-শূন্য, ছন্দশূন্য, মোটা-রকমের,—কোন-কিছুরই ভিতরে রস-কশের ছিটেফোঁটাটি নাই, কোনগতিকে কাজ চলিয়া গেলেই আমরা এখন আঃ বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। সুদূর অতীতের কলাবিদরা জ্ঞানে ও সভ্যতায় আমাদের মত এতটা অগ্রসর ছিলেন না; আজকালকার অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রও এ-দিকে তাঁহাদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে অতীতের গুণীদের কাছে আমরা প্রায় শিশুর মত বলিলেও চলে। এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতাতেও ক্রমোন্নতির বিধানে আমরা যে গতযুগের কলা-

বিদেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিতেছি না, শিল্পজ্ঞানহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের এই রাজধানী ও প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ নগর কলিকাতায় শত শত প্রাসাদ রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের একটিও শ্রী-ছাঁদে ও গঠন-সুষমায় দিল্লী বা আগ্রার অনেক পুরাতন, ভাঙ্গাচোরা ও ছোট-খাটো বাড়ীর কাছে ছায়ার মতও দাঁড়াইতে পারে না। বাঙ্গালী ধনকুবেররা বৎসরে বৎসরে অজস্র অর্থব্যয়ে নূতন নূতন বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন; কিন্তু তাহাদের ভিতরে কেহ কি জাতীয় আদর্শ বা রুচির চিহ্নমাত্র দেখিতে পায়? উড়িষ্যায়, দক্ষিণ ভারতে, দিল্লী-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নগরে প্রাচ্য শিল্পের কত সুন্দর আদর্শ লোকের অবহেলায়, কালের মহিমায়, অজ্ঞানের অজ্ঞতায় ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ধূলায় ধূসরিত হইয়া রহিয়াছে; সে-সব অতুল আদর্শ কেন আমাদের চোখে পড়ে না? আমরা হয় ত বাড়ীর থামগুলো গড়ি গ্রীক আদর্শে, উপরটা গড়ি রোমীয় আদর্শে, ভিতরটা গড়ি প্রাচ্য আদর্শে; আমাদের হাতে পড়িয়া সৌন্দর্য্যের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে! আমাদের নিজেদেরও জাতীয়তা নাই—শিল্পেরও তাই।



প্রাচীন গ্রীশের একটি পাত্র

সেকালের লোকরা আর্টকে যে কতটা ভালবাসিত, ভাষায় তাহার সবটা খুলিয়া বলা যায় না। বড় বড় জিনিষের কথা ছাড়িয়া দি, সামান্য যে ঘটি, বাটি, গেলাস, থালা, কুঁজো ও গামলা প্রভৃতি জিনিষ, সেকালে সেগুলি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্পে এমনি চোখজুড়ানো ছিল যে, তাহাদের একটিকে হাতে পাইলে আপনাকে ধন্য মনে হয়। গ্রীশ, রোম, মিশর ও ভারতের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যত্র-তত্র এই শ্রেণীর সুন্দর আসবাব দেখা যায়। কাশীর সারনাথ অনেক বাঙ্গালীই দেখিয়াছেন; সেখানে মাটির তৈয়ারি ছোট-বড় অগুন্তি পাত্র প্রভৃতির প্রত্যেকটিই আমার কথার প্রমাণ দিবে।

আর্ট, জীবনের অভিব্যক্তি বলিয়াই সেকালের লোকরা আর্টকে জীবনের সহচর করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষের কঠোর বাস্তব জীবনকে কোমল ও সুন্দর করিয়া তোলে, আর্ট। সংসারের ঝালাফালায় আমরা যখন বড় জ্বালাতন হইয়া উঠি, পৃথিবীর গোলামী

সারিয়া আমরা যখন দু-দণ্ড ধীরে-সুস্থে জিরাইয়া লইতে চাই, অবসন্ন জীবনে নূতন উৎসাহ ও নূতন কর্ম্মপ্রেরণা আনিতে চাই, আর্ট আসিয়া তখন আমাদের চিত্তবিনোদন করে, তাহার সোণার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়া তখন আবার আমাদের এলানো প্রাণের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তখনকার ধনী-নির্ধন সকলেই তাই ললিত কলার কদর জানিতেন। শিল্পের প্রতি এই গভীর সহানুভূতি বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীশ ও রোমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পম্পি, প্রাচীন রোমের একটি তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র সহর—ভিসুভিয়াসের অগ্নিবৃষ্টিতে ৭৯ খৃষ্টাব্দে এই সহরটি ভস্মস্তূপে ডুবিয়া যায়,—সংপ্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাহাকে আবার উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও, এই সেকেলে সহরটি হইতে যত ছবি, যত মর্ম্মর-মূর্ত্তি, যত শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, একালের অধিকাংশ বিখ্যাত ও বৃহৎ নগর হইতেও তাহার অর্দ্ধেক পাওয়া যাইবে না!

রোমের স্থান শিল্পজগতে খুব উঁচু না হইলেও রোমবাসীরা আর্ট লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকিতেন। অমন যে নরবেশী দানব নীরো,—সেকালে জন্মিয়া সেও আর্টের পরম ভক্ত ছিল। নীরোর রাজত্ব যখন যায়-যায়, তাহার চারিদিকে যখন মৃত্যু-ভয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গলদের উত্তেজিত করিবার জন্য Vindex বলিয়াছিলেন, 'নীরো হচ্ছে অকবি আর গান-বাজনাতে আনাড়ি!' Vindex যে সসৈন্যে তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এখনি যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে রক্ষা নাই, সে-সব কিছুই না ভাবিয়া নীরো রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি অকবি, গান-বাজনায় আনাড়ি! Vindex জগৎ খুঁজে আমার চেয়ে আর-একটি লোককে আনুক না দেখি! সে যা বলেছে তা প্রমাণ করুক!"

নীরো যে কত বড় একজন শিল্পরসিক ছিল, তাহার মরণ-উক্তিতেও সেটুকু বেশ বোঝা যায়। রাজ্যহারা হইয়া, বিতাড়িত বন্য পশুর মত বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে পথ হারাইয়া, নীরো যখন কর্দ্দমাক্ত জলে অসহ তৃষ্ণা মিটাইয়া আত্মহত্যা করে, তখন এইকথা তাহার শেষ কথা:—"Qualis artifex peres!"—"আমার ভিতরে কত বড় একজন আর্টিষ্টের মৃত্যু হোল!"

গ্রীশের এথেন্স-নগরও শিল্পগৌরবে পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তাহার পার্থেননের নাম সকলেই জানেন। সুধু পার্থেনন নহে;—এথেন্সে প্রপিলিয়া নামে আর-একটি মন্দির ছিল, গ্রীক লেখকরা তাহার স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন পার্থেননেরও উপরে। গ্রীকরা এতটা শিল্পভক্ত ছিল যে, এথেন্সের প্রধান গৌরব বলিতে তাহারা বুঝিত, প্রপিলিয়ার শিল্পকীর্ত্তি। গ্রীশের অন্যান্য সহরের বাসিন্দারা, এথেন্সের নাগরিক-দের এই শিল্পসৌভাগ্য দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া মরিত; আর সে হিংসা এতটা প্রবল ছিল যে, ইপামিনোডাস ভিত্তিসমেত সমস্ত প্রপিলিয়া-মন্দিরটিকে নিজের দেশে তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন! নীচের গল্পটিতে গ্রীকদের শিল্পানুরক্তির চমৎকার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

২

Phryne ছিল এথেন্স নগরের রূপযৌবনশালিনী বিখ্যাত নর্ত্তকী;—তাহার চপল নয়নের সামনে অটল থাকিতে পারে, এমন লোক তখন সারা দেশ ঢুঁড়িয়া একটিও মিলিত না।

যৌবন ও লাবণ্যকে সে আপনার সেরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিত; পাছে লোকে বিনামূল্যে তাহার মোহন তনু দেখিয়া ফেলে, সেই ভয়ে সে রাজপথে বা জনতার ভিতরে বা রঙ্গালয়ে সহজে আসা-যাওয়া করিত না; যদি বা কখনো পথে বাহির হইত, তবে পা-থেকে মাথা-পর্য্যন্ত কাপড়মুড়ি না দিয়া ও মুখে ঘোমটা না টানিয়া যাইত না। তাহার রূপ দেখিবার ভাগ্য হইত খুব কম লোকেরই—কারণ, ততটা অর্থ-সামর্থ্য ছিল না অনেকেরই।

তাহার জীবনকে পবিত্র জীবন বলা যায় না। কিন্তু রূপ লইয়া বিকিকিনি করিলেও Phryneএর হৃদয় উদার ও উচ্চ ছিল। আলেকজান্দার যখন থিবস্ সহর ধ্বংস করিয়া দেন, সে তখন ঐ সহরটিকে নিজের খরচে আবার নূতন-করিয়া গড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল। করিন্থের অধিকাংশ শিল্পবিচিত্র কীর্ত্তিস্তম্ভ তাহারই সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ললিত কলা ছাড়া পৃথিবীর আর-কিছুকে সে ভালবাসিত না।

এই সময়ে ফিডিয়াসের বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে গ্রীকরা আর্টের মহান আদর্শের সন্ধান লাভ করিয়াছিল; ফিডিয়াসের প্রতিভা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যকে নানা দিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। যিয়াস, ফিবাস, আর্টেমিস ও এথীনী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি তখন শরীরী হইয়া মন্দিরে মন্দিরে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু রূপলক্ষ্মী ভেনাস —যিনি সৌন্দর্য্যের নিখুঁত আদর্শ,—কল্পনালোক ছাড়িয়া তখনও তিনি নরলোকে ভাল শিল্পীর হাতে যথাযোগ্য আকার ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করেন নাই; হয়ত কল্পনার সে অতুল সৌন্দর্য্যের কাছে বাস্তবের সমস্ত শক্তি নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল।

গ্রীশদেশে প্র্যাক্সিটিল্‌স্ তখন সর্ব্বপ্রধান ভাস্কর এবং অ্যাপেলিস সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর।

রূপপিয়াসীর কাতর পূজা ঠেলিয়া, পুষ্পিত বিরামকুঞ্জের বিলাস-শয়ন ছাড়িয়া, অর্থের সমস্ত মায়া ভুলিয়া Phryne, হঠাৎ একদিন ভাস্কর প্র্যাক্সিটিল্‌সের কলাভবনে গিয়া হাজির হইল। কথায় সুরের ঢেউ তুলিয়া বলিল, "শিল্পী, আমি তোমার কাছ থেকে আর কিছু চাই না, কেবল তোমার শিল্পের আদর্শ হোতে চাই।"

দেহের কৃত্রিম আবরণ ফেলিয়া আপন নগ্ন সৌন্দর্য্যকে সে প্রকাশ করিল।

ভাস্করের চক্ষু বিস্ময়ে-প্রশংসায় একেবারে মুগ্ধ! এ কি কল্পনাতীত দৃশ্য! এ যে রূপের বীণা,—এ তনু যন্ত্রের একটি তারও যে বেসুরো বাজিতেছে না! এ যে রূপলক্ষ্মী দেবী ভেনাসের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! প্র্যাক্সিটিল্‌স্ স্বপ্নেও এমন সৌভাগ্যের আশা করেন নাই, নরদেহে যে এত সুষমা থাকিতে পারে, এ ধারণাও তাঁহার ছিল না! তিনি সেইদিন হইতেই এই সজীব আদর্শের সামনে বসিয়া প্রতিমা গড়িতে লাগিয়া গেলেন;



প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া Aphroditeএর একটি নকল-প্রতিমূর্ত্তির মুখ

সে প্রতিমার নাম হইল Aphrodite বা Venus of Cnidos। আসল প্রতিমাটি কেমন ছিল, আজ আর তা জানিবার উপায় নাই; তবে, তাহার নকলে আরো অনেকে যে-মূর্ত্তিগুলি গড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই আসলের কিছু-কিছু আঁচ্ পাওয়া যাইতে পারে।

প্লিনি বলিয়াছেন, ভেনাসের এই মূর্ত্তিটি শুধুই প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত নয়—সমস্ত গ্রীশদেশে, সমস্ত পৃথিবীতে এর চেয়ে নিখুঁত সুন্দরীর মূর্ত্তি আর নাই!

Cnidosএর নাগরিকরা এই ভেনাস-মূর্ত্তিটিকে কিনিয়া লইল এবং একটি শৈল-শিখরে চারিদিক-খোলা মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করিল। বহুদূর হইতে নগরবাসীরা পুলকিত নেত্রে নীল গগনপটে মূর্ত্তিমন্ত ভেনাস দেবীকে চিত্রলিখিতের মত দেখিতে পাইত।

Cnidosএর লোকরা একবার অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা নিকোমেডেস নামে অন্য এক নগরপতি সেই সময়ে ভেনাসের মূর্ত্তিটিকে কিনিয়া ঋণের সমস্ত টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু সহরবাসীরা ভেনাস-মূর্ত্তিটিকে কিছুতেই বিক্রী করিতে রাজি হইল না; বলিল, "আমরা যদি সমস্ত ক্ষুইয়ে পথের ভিখারী হই, তাহলেও এ প্রতিমাকে ছাড়তে পারব না—এ যে আমাদের প্রাণের রতন!" তাহারা বাড়ী-ঘর বিক্রী করিয়া ফেলিতে, পরের গোলাম হইতে, দিন-মজুরী করিতেও প্রস্তুত হইল, —কিন্তু প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া এই অদ্বিতীয় শিল্পরত্নকে প্রাণ থাকিতে বিকাইয়া দিতে সম্মত হইল না! আর্টের প্রতি সমগ্র জাতির এই গভীর প্রেম, সেকালেই সম্ভব ছিল; একালে শিল্পের জন্য এমন স্বার্থ-ত্যাগের কথা স্বপ্নেও কারুর মনে আসিবে না।

Venus of Cnidos যেমন প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া সকল মূর্ত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি চিত্রকর আপেলিস যত ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সকলের সেরা হইয়াছিল, তাঁহার



প্র্যাক্সিটিল্‌সের গড়া মূর্ত্তির নমুনা



"বিজয়িনী ভেনাস"

Venus Anadyomene নামে পটখানি। এখানেও Phryne স্বেচ্ছায় আদর্শ হইয়া চিত্রকরকে কৃতার্থ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, আপেলিসের এই চমৎকার ছবিখানির নাম ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব নাই।

"Venus Triumphant," "Venus of the Capitol," "Venus De Medici" ও "Venus of Milo" প্রভৃতি নামে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর অনেকগুলি বিখ্যাত মূর্ত্তি আছে। সমালোচকদের মতে প্র্যাক্সিটিল্‌সের Venus of Cnidosএর অনুকরণেই এ-সকল মূর্ত্তি গড়া হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, Phryne যতদিন পুষ্পিতযৌবনা ছিল, ততদিন সে-সময়কার সকল শিল্পীরই আদর্শ হইয়াছিল। প্রচুর অর্থব্যয় না করিলে কেহই তাহার দেখা পাইত না, কিন্তু সে যখন শিল্পীর আদর্শ হইয়া আপনার মূল্যবান সময় কাটাইত, তখন কাহারও কাছ হইতে এক পয়সাও লইত না; সুতরাং আর্টের প্রতি তাহার অনুরাগ যে কতটা অকৃত্রিম ছিল, সে কথা বোধ হয় আর খুলিয়া বলা অনাবশ্যক। তাহার শিল্পানুরাগে সুধুই যে গ্রীক কলার একটা মস্ত অভাব দূর হইয়াছে, তাহা নয়; পরন্তু, রমণীর নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবী একটা স্পষ্ট



"ভেনাস অফ দি ক্যাপিটল"

ধারণা করিতে পারিয়াছে। Phryne যদি সেকালের শিল্পীর আদর্শ না হইত, তাহা হইলে একালের আর কোন শিল্পী এমন নিখুঁত গড়ন গড়িতে পারিতেন না।

এইখানে Phryneএর জীবন-কাহিনী হইতে আর-একটি গল্প বলা দরকার; কারণ, এই গল্প হইতে বেশ বোঝা যাইবে যে, প্রাচীন গ্রীক জাতি কতটা সৌন্দর্য্য-বিলাসী ছিল।

Phryneএর অপরূপ রূপের আগুনে সকলের মন পতঙ্গের মত পুড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, একদল লোক তাহার উপরে খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার Phryneএর দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ষড়যন্ত্রীরা Phryneএর বিরুদ্ধে নালিস করিল, সে নাকি এই বলিয়া জাঁক করে যে, সহরের সমস্ত লোক যদি একজনে পরিণত হয় আর সে যদি তখন এথেন্সকে কিনিতে চায়, তবে তাহার একরাত্রির প্রেমের লোভে লোকে এথেন্স সহরটি অনায়াসে বিকাইয়া দিবে! Phryneএর বিরুদ্ধে আরও অনেক অভিযোগ উঠিল। অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহাকে চরম দণ্ডভোগ করিতে হইবে।



Aphroditeএর আর-একটি মুখ

নির্দ্দিষ্ট দিনে সে বিচারালয়ে গিয়া হাজির হইল। বিচার দেখিবার জন্য সেখানে তখন হাজার হাজার লোক আসিয়া জমিয়াছে। সকলে দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠনে ও বস্ত্রে আবৃত। তাহার বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে, সে স্থিরভাবে সেগুলি শ্রবণ করিল।

তাহার পর বিখ্যাত বক্তা Hyperides, সেই নির্দ্দোষ রমণীর পক্ষ সমর্থন করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের সম্মুখে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে, Phryneএর বিরুদ্ধে যে-সব কথা রটিয়াছে, তাহা মিথ্যা।

Hyperides এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন, "হাঁ, সহরের সমস্ত পুরুষ যদি একজনে পরিণত হয়, Phryneএর

সঙ্গলাভের জন্য তবে তাহাদের পক্ষে এথেন্স নগরকে বিকাইয়া দেওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়!"

Hyperidesএর শেষ কথা শুনিয়া বিচারকরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আদালতে উপস্থিত জনতার ভিতর হইতেও অসন্তোষের খুঁৎখুঁতুনি শুনা যাইতে লাগিল।

চতুর বক্তা তখন Phryneএর কাছে গিয়া, হঠাৎ তাহার দেহের কাপড় খুলিয়া দিলেন!

সে এক বিচিত্র দৃশ্য! গ্রীক পুরাণে কথিত আছে, আজন্মযৌবনা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী ভেনাস যেদিন মুক্তবেণী বিবসন হইয়া জগতে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, সেদিন

"তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।"

আজও এই বিরাট জনতা-সাগরের মাঝখানে Pnryneএর অপূর্ব্বসুন্দর নগ্ন-তনু ও তাহার নিষ্কলঙ্ক মুখ-শ্রী যেন সেই পৌরাণিক দৃশ্যের মতই দেখাইতে লাগিল। বিচারালয়ের যে যেখানে ছিল, সকলেই মোহিত, চকিত, স্তব্ধ! "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র!"—Phryneএর নামে সকলেই জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—সে জয়ধ্বনিতে বিচারকর্ত্তারাও যোগদান করিলেন! চারিদিক হইতে শোনা গেল—'হ্যাঁ, এ মুখের একটু-খানি হাসির বদলে আমরা এথেন্সকে বিকিয়ে দিতেও রাজি!'—Hyperidesএর বলিষ্ঠ বাহু নির্ভর করিয়া সরমনত মুখে, সঙ্কোচজড়িত চরণে বিজয়িনী Phryne আপন আবাসে ফিরিয়া আসিল।

Phryneএর জয়লাভের কথায় এক-জন বিখ্যাত লেখক বলিতেছেন, "In that celebrated acquittal of Phryne, we ought to see something more than is generally seen in it. It was not only due to the erotic frenzy of the people, but also to the admiration and respect of an artistic race, bending the knee before the unexpected and sovereign apparition of Beauty. They felt that if they were to suppress that wonderful type, painters and sculptors would be deprived of a living ideal, and the feeling that inspired Hyperides with boldness, the judges with clemency and the crowd with enthusiasm, was one of those inspirations which do the greatest honour to the Athenian people."

এই বিচিত্র বিচারের পরেই বিচারালয় হইতে এক বিচিত্র আদেশ-পত্র বাহির হইল:—Phryneএর স্বর্গীয় সুষমা কেবল ধনীদের জন্যই নয়—সে রূপ সকলেরই দর্শনীয়। দেবতারা মানুষের জন্য যে অপূর্ব্ব লাবণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সে লাবণ্য তাঁহাদিগকেই নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইতে চাই। বিশেষ, নির্দ্দোষ রমণী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেখিলে জনসাধারণেরও মনের উন্নতি ও উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব বিচারা-

লয়ের সেদিনকার দৃশ্য, যাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বে বা উৎসবে, সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে আবার অভিনীত হয়, সেইজন্য আদেশ দেওয়া হইল।

এ আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য, Phryneএর ছিল না। সুতরাং বৎসরে একদিন করিয়া তাহাকে সাগর-স্নানে যাইতে হইত। বসনের আড়ালে আপন সুরবাঞ্ছিত তনুলতাটি গোপন করিয়া, সাগরের চঞ্চল-তরঙ্গে সে ধীরে ধীরে অবগাহন করিত; এবং "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" যখন সে ফেনচিত্রিত নীল জলের উপরে আবার ভাসিয়া উঠিত, তখন তাহার তুষারশুভ্র নগ্ন তনুর উপরে তপ্ত সূর্য্যকর প্রেমচুম্বনে লীলায়িত হইয়া যাইত! শিল্পীর কলাকুঞ্জে সে, যে দেবীর আদর্শ হইত, এ সেই ভেনাসের পুরাণ-কথিত জন্ম-দৃশ্যেরই সুন্দর অভিনয়!

তখন সহর খালি করিয়া সমুদ্রতীরে লোকের পর লোক ছুটিয়া আসিত! সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের নির্ম্মল নগ্নতা দেখিয়া বৃদ্ধ ও যুবা এবং ধনী ও নির্ধন—সকলেই একসঙ্গে একতানে বলিয়া উঠিত:

"ওগো স্বর্গের দেবী, তোমার মঙ্গল হোক! কেননা, মানুষের নয়ন ও হৃদয়ের সম্মুখে তুমি সৌন্দর্য্যের প্রদীপ্ত প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়াছ!"

সৌন্দর্য্যের প্রতি সমস্ত গ্রীক-জাতির এমন অনুপম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই ললিত কলায় আজও তাহারা অমর ও শ্রেষ্ঠ হইয়া আছে!



গ্রীক ভাস্কর্য্যের একটি রমণীমূর্ত্তির মুখ

৩

ললিত কলার সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক যে কমিয়া আসিয়াছে, তাহার অগুন্তি প্রমাণ আছে।

আর্ট হচ্ছে সভ্যতার ইতিহাস; শিল্পীর খেয়াল-খুসির সঙ্গে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আর্টের

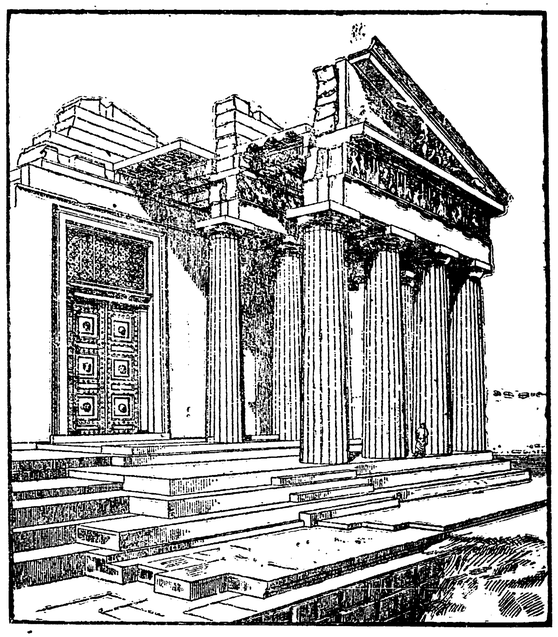

পার্থেননের একাংশ

মধ্যে সমসাময়িক যুগের ছবি আপনি ফুটিয়া ওঠে। অতীতের অনেক বিখ্যাত জাতি কেবল আর্টের মধ্যেই তাহাদের সভ্যতা ও সমাজের ইতিহাস রাখিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; যেমন প্রাচীন মিসরবাসীরা;—তাহাদের যাহা-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, সমস্তই শিল্পের দৌলতে। কলা-ও বিজ্ঞানে যদি অনভিজ্ঞ হইত, তবে প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোম্যানদের অনেক কথাই আজ আমরা জানিতে পারিতাম না। ভারতের গুহা-শিল্পে ও পুরাতন দেব-মন্দিরে এবং গ্রীশের পার্থেনন প্রভৃতিতে প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক জাতির সভ্যতা, সমাজ, আচারব্যবহার, আকার-প্রকার এবং পোষাক-পরিচ্ছদের যেমন জলন্ত নমুনা পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতে নয়। পরন্তু, শিল্পে সুধু বাহিরের চেহারাটাই ধরা পড়ে না, মানুষের মনের মতি-গতিও তাহার মধ্যে পরিস্ফুট হয়। এইজন্যই আর্টকে ছেলে-খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না;—আমরা যতবড়ই সাংসারিক, হিসেবী ও শুষ্কপ্রাণ জীব হই না কেন, একটু যদি ভাবিয়া দেখি, তবে জীবনের পদে পদে আর্টের সার্থকতা বুঝিতে পারিব।

আর্টের মধ্যে এই গভীরতা আছে বলিয়াই আমাদের উচিত, তাহার প্রতি

শ্রদ্ধাপ্রকাশ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সভ্য হইয়া আজ আমরা আর্টের উপর যে অসভ্য অত্যাচার করিতেছি সে অনাচারকে কিছুতেই শ্রদ্ধা বলিয়া মনে করা চলে না।

পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানব আজ শক্তির গর্ব্বে অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে; অতীতের প্রতি তাহার সম্মান নাই, আর্টের প্রতি তাহার ভক্তি নাই, ললিত কল্পনার প্রতি তাহার অনুরাগ নাই! কারুশিল্পে অতুল্য যে-সকল মন্দির-প্রাসাদ আজ যুগ-যুগ ধরিয়া পৃথিবীর বিস্ময়-প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়াছে, অতীত সভ্যতা-স্মৃতির স্বপনে যাহারা এতদিন সমুজ্জ্বল হইয়া ছিল, আমাদের সম্মুখে এতদিন যাহারা সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয় আদর্শ দেখাইয়া আসিয়াছে, যাহাদের প্রত্যেক পাষাণখানি কত হৃদয়ের সাধনায়, কত প্রেমের পুলকে, কত শিল্পীর বুকের রক্তে জীবন্ত হইয়া জাগিয়া ছিল, সভ্যতার নির্ম্মম বর্ব্বরতায় এখন তাহারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত, অগ্নির সর্ব্বগ্রাসী শিখায় সমর্পিত! মানুষ গেলে তাহার স্থানে আবার নূতন মানুষ আসে, কিন্তু অতীতের যে-সব শিল্প-নিদর্শন ধরাপৃষ্ঠ হইতে একবার মুছিয়া যায়, তাহার অভাব পূরণ করে বর্ত্তমান সভ্যতার এমন সাধ্য নাই! বলিয়াছি, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সকল দিকে উন্নত হইলেও, শিল্পক্ষেত্রে সে একান্ত দুর্ব্বল, অক্ষম ও পঙ্গু! প্রতীচ্যের লোকরা প্রাচ্য জাতিদের বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করে, কিন্তু কিছুদিন আগে তাহারা যখন চীনদেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখন চীনসম্রাটদের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পবিচিত্র নিদাঘ-প্রাসাদ 'ইউয়েন-মিন-ইউয়েন' ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিবার সময়ে তাহাদের কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা হয় নাই!

প্রাচীন কালে সভ্যতার শৈশব অবস্থায় এরূপ বর্ব্বরতার কাহিনী আছে অনেক। ধর্ম্মদ্বেষিতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, সাধারণের অজ্ঞানতা, ব্যক্তিগত নির্ব্বুদ্ধিতা ও যুদ্ধবিগ্রহের গোলমালে সেকালেও অনেক অমূল্য শিল্পরত্ন ক্ষোয়া গিয়াছে। গথজাতীয় অ্যালারিক গ্রীশের এলিস সহর আক্রমণ করিয়া তিন হাজার ধাতুর তৈয়ারি প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। রোমের মামিয়াস গ্রীশের পরম-সুন্দর কোরিনথ্‌কে এমনভাবে ভূমিসাৎ করিয়া দেন যে, তাহার শিল্পসুষমা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। গ্রীক শিল্পের অনেক মূর্ত্তি কনস্তানতাইন আপনার নূতন সহর সাজাইতে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; ফলে, মহা-ভাস্কর ফিডিয়াস এবং আরো-অনেক শক্তিধর শিল্পীর পরিকল্পনার চিহ্ন-পর্য্যন্ত আজ আর টিকিয়া নাই। ভারতে মুসলমান ও হিন্দু, যে যখন সুবিধা পাইয়াছে, পরস্পরের শিল্পের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে; তবে, এদিকে মুসলমানদের অপরাধই গুরুতর। এমনি ধর্ম্মদ্বেষিতা বা সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচার য়ুরোপেও অনেকবার হইয়াছে।

ধর্ম্মোন্মত্ত স্যাভোনারোলার প্ররোচনায় ফ্লোরেন্সের অনেক শিল্পীর ভাল ভাল হাতের কাজ পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মাইকেল এঞ্জিলো প্রথমশ্রেণীর যে কয়টি মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, দ্বিতীয় জুলিয়াসের প্রতিমূর্ত্তি তাহার অন্যতম। অজ্ঞান জনসাধারণের

বিষদৃষ্টিতে পড়ায় আজ সে বিখ্যাত প্রতিমূর্ত্তির একটুকরাও আর পাওয়া যায় না।

কিন্তু, প্রাচীন কালের এ-সব বিকৃত রুচি ও মূর্খতার পরিচয় এখনকার বিংশ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতার মধ্যেও যদি পাওয়া যায়, তবে এ সভ্যতার সার্থকতা কোথায়? অথচ, সেকালে বর্ব্বরতাও যেমন ছিল, উদারতাও তেমনি কম ছিল না। বরং, আর্টের প্রতি তখনকার লোকদের ভক্তি-প্রেমের যত দৃষ্টান্ত মেলে, ততটা একালেই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে! Phryneএর কাহিনীতে সে শিল্পানুরক্তির অনেক উদাহরণ আছে,—এবং ইতিহাসেও এ-সম্বন্ধে বিবিধ প্রমাণের অভাব নাই।

৩০৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে Demetrius Poliorcetes যখন রোড্‌স্ অবরোধ করেন, তখন আপন সৈন্যদের আজ্ঞা দেন যে, সহরের যেদিকটাতে চিত্রকর Protogenesএর আঁকা Ialysus নামে বিখ্যাত পটখানি আছে, সেদিকটাতে কেউ যেন অস্ত্র না চালায়! পাছে ছবিখানি নষ্ট হইয়া যায়, তাই এই হুকুম! তিনি এরূপ আজ্ঞা দেওয়ার হেতুও দেখাইয়াছেন:—"যুদ্ধ স্থধু রোডেসিয়ানদের বিরুদ্ধে—আর্টের বিরুদ্ধে নয়!" একখানি মাত্র ভাল ছবি বাঁচাইতে দু-হাজার বৎসরেরও আগেকার একজন সেনাপতি কতটা মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন! কিন্তু একালের সভ্যতাগর্ব্বী জার্ম্মানরা একখানি ছবি ত সামান্য কথা—এমন কত শত চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত বড় বড় স্থাপত্য-শিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শনকে রক্তস্রোতের মুখে একেবারে ধুইয়া-পুঁছিয়া দিতেছে! অথচ এই জার্ম্মানরা যে "Culture"এর জাঁক করে, সেই "Culture"এর মন্ত্র সর্ব্বাগ্রে প্রচার করেন এক গ্রীক চিত্রকর! তাঁহার নাম Pamphilus; তিনি ৩৯০—৩৫০ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দের লোক! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক চিত্রকর অ্যাপেলিস তাঁহারই ছাত্র। শিল্পীর কাছ হইতেই "Culture"এর মন্ত্র নিয়া জার্ম্মানরা এখন শিল্পের উপরেই মরণ-বাণ মারিতেছে! চমৎকার কৃতজ্ঞতা!

আসল কথা, আমাদের সভ্যতা হচ্ছে মুখমিষ্ট ভণ্ডের মৌখিক শিষ্টতার মত;—ইহার ভিতরটা একেবারে ফাঁপরা! এত কাল ধরিয়া আমরা স্থধু দেহের উপরটাই মাজিয়া-ঘষিয়া চকচকে করিয়া তুলিয়াছি—কিন্তু দেহের ভিতরে আমাদের যে মনটি আছে, বর্ত্তমান সভ্যতা সে অসভ্য মনের ময়লা এখনো মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই! তাই সময়ে-অসময়ে মনের ময়লা আমাদের বাহির-পরিষ্কার দেহের উপরে স্বেদজলের সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার কৃত্রিম পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করিয়া দেয়।

৪

সভ্যতার কর্ম্মকোলাহলে কবির বীণা-ঝঙ্কার ক্রমেই মৃদু হইয়া আসিতেছে, জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় মানুষের পথ হইতে আর্ট ক্রমেই সরিয়া দাঁড়াইতেছে। সত্য কথা বলিতে কি, পৃথিবীর বয়স-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাত ক্রমেই আর্টে কম-নিপুণ হইয়া উঠিতেছে। আগেই বলিয়াছি, আর্ট অকেজো বলিয়া কাজের লোকরা তাকে আর ভালবাসে না।



রিম্‌সের গির্জ্জা

আবার, যারা আরো-বেশী চালাক, তারা চায় আর্টকে দাসী-বাঁদীর মত কাজে লাগাইতে! ফলে, তাজমহল, পার্থেনন ও কণারকের মন্দিরের বদলে, জীবন-বিমা কোম্পানী ও সওদাগরী আপিসের হাড়গোড়-ভাঙ্গা দ-য়ের মত বেঢপ-বিশ্রী অট্টালিকার সারি, অ্যাপলো ও ভেনাস প্রভৃতি নগ্ন ও স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তির বদলে নখ-থেকে চুল-পর্য্যন্ত পোষাক-পরা দরজির দোকানের পুতুলের দল এবং ম্যাডোনা বা মোনা লিসার মত রমণীয় চিত্রপটের বদলে, রয়েল অ্যাকাডেমির ছাপ্-মারা আর্টিষ্টের দ্বারা আঁকা 'পিয়ার্স সোপ' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন-পটের সংখ্যা দেখিতে দেখিতে ব্যাঙ্গের ছাতার মত বাড়িয়া যাইতেছে! ভাল আর্টিষ্ট কম হইলেও এখনো দু-চারজন টিকিয়া আছেন,—কিন্তু তাঁহারা কলির এক-পেয়ে ধর্ম্মের মত একান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত! সংসারের হাজার কাজের পোড়া বালির তলায় তাঁদের অকেজো মনটি লুকানো ফল্গুর এতটুকু সরু ধারাটির মত বহিয়া যায়—কেহ জানিতে পারে না,—জানিতে চাহেও না! তাঁহাদের কল্পনার রঙ্গিন ফানুষ এখনো ভোরের কালো মেঘ-ফাঁকে সোণার রবি-কর-স্রোতে স্নান করে, অর্দ্ধচন্দ্রের আধা-আলোয় আধা-ছায়ায় তারকার মুখে মুখে সোহাগের চুম্বন দেয়,—কিন্তু সে মায়ালোকের আনন্দ-বার্ত্তা লইয়া পৃথিবীর দিকে সে আর সহজে নামিতে চায় না, পাছে এই শত শত সহরের কোটি কোটি কলের মস্ত মস্ত ধূম্রমুখ চিমনিগুলো ডাগর হা-মেলিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলে! আর্ট এখনো একেবারে মরিয়া না গেলেও, তার যে প্রায় যায়-যায় অবস্থা, তাতে আর সন্দেহ কি!

অতীত তাহার বিরাট কল্পনা, মহান আদর্শ ও গভীর আনন্দ লইয়া আমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মিশরে কর্ণ্যাকের বিশাল স্তম্ভ-গৃহ, স্ফিংস্ ও পিরামিড, চ্যাল্‌ডিয়ায় ব্যাবেলের মন্দির, এথেন্সের পার্থেনন ও প্রপেলিয়া, রোমের

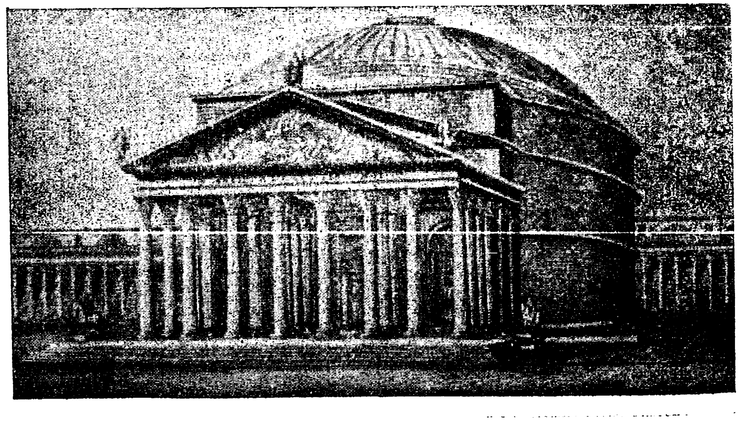

রোমের পান্থিয়ন

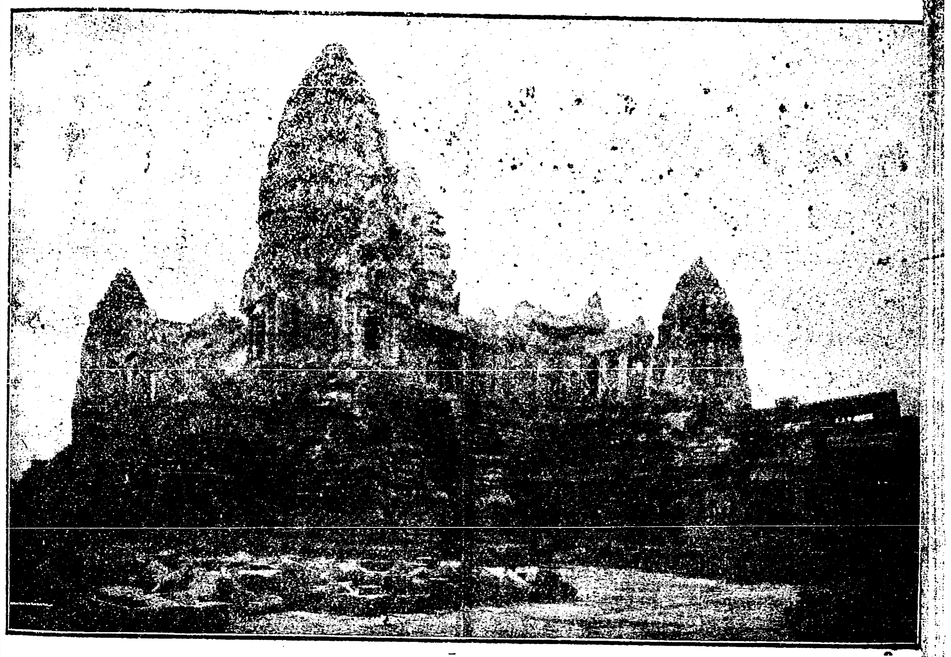

ওঙ্কারধামের মন্দির

পান্থিয়ন, ফোরাম ও কলিসিয়াম, সিরিয়ার ব্যালবেকের মন্দির, ফ্রান্সের রিম্‌সের গির্জ্জা, জাভার বড়বুদ্ধের মন্দির, শ্যামদেশের ওঙ্কারধাম এবং ভারতের ইলোরা প্রভৃতি গিরিগুহাশিল্প, ভুবনেশ্বর জগন্নাথ ও কণারকের মন্দির প্রভৃতি, অতীতের বিশ্বকর্ম্মাদের অমানুষিক ক্ষমতা ও প্রতিভার জলন্ত উদাহরণ। আর্ট তখন অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারিত—তাই সে যুগের কবি-কল্পনা শিল্পীর হস্তে স্বর্গের সোপান-নির্ম্মাণের ভারার্পণ করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই।

আবার, সুধু শিল্পে বলিয়া নয়, সাহিত্যেও সে যুগের কবি-হৃদয়ে যে বিশাল ধারণা-শক্তি ছিল, এখন তাহাও আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য এখন খণ্ড ভাবে নিখিলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্বযুগের সাহিত্যে সমগ্রতার যে মহান সৌন্দর্য্য ছিল, একালে তাহার অভাব হইয়াছে একান্ত। বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের অমর কাব্যে সমগ্র মানবতার এবং হৃদয়-বৃত্তির যে অপূর্ব্ব ঘাত-প্রতিঘাত দেখা যায়, দান্তের বিরাট কল্পনায় যে স্বপ্নাতীত অদৃশ্য জগৎ দৃশ্যমান হইয়াছে, আধুনিক কবির এমন সাধ্য নাই যে, তাহার তুল্য আর কোন-কিছু দেখাইতে পারেন। এতটা বিশালতার ভার একালের কবিরা একসঙ্গে বোধ হয় সহিতে পারেন

না; তাই তাঁহারা রহিয়া-বসিয়া একটু-একটু করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে সমগ্র ও বিশাল সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তোলেন।

এখন মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বাড়িয়াছে, কিন্তু মনের যে নির্ম্মল আনন্দ তখনকার শিল্পীদের ছোট-বড় প্রত্যেক কার্য্যকে প্রাণবন্ত ও সকলদিকে সফল করিয়া তুলিত, এ-যুগে বোধহয় তাহার অভাব হইয়াছে; নহিলে, এতদিনের বহুদর্শিতাতেও আমাদের হাত ক্রমেই অপটু হইয়া পড়িতেছে কেন? তাহার উপরে, যে ব্যস্ততা হচ্ছে আর্টের জন্মশত্রু, সেই ব্যস্ততা আমাদের আধুনিক জীবনে ঢুকিয়া সুকুমার শিল্পের মূলে কুড়ুলের ঘা মারিতেছে। যেখানে কর্ম্মজীবন প্রবল ও কল্পনার অবসর কম, আর্ট সেখানে সহজে আসিতে ভয় পায়।

আমাদের সৃষ্টি-ক্ষমতা ত গিয়াছেই; বেশীর ভাগ, যেখানে আমরা প্রাচীনকে হুবহু নকল করিতে বসি, সেখানেও আমাদের শোচনীয় অক্ষমতা পদে পদে জাহির হইয়া পড়ে। আগ্রা ও দিল্লীর মোগল শিল্পীদের পুরাণো কাজ মেরামত করিবার জন্য যেখানেই একালের নূতন কারিকর লাগানো হইয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে, নূতনের কাজ কতটা অসার, কতটা খেলো! সে মেরামতের নিস্ফলতা যেন হীরার সঙ্গে কাঁচ জোড়া দিবার চেষ্টার মত, পূর্ণিমার চাঁদিনীর ভিতরে ন্যাক্‌ড়ার পলিতা

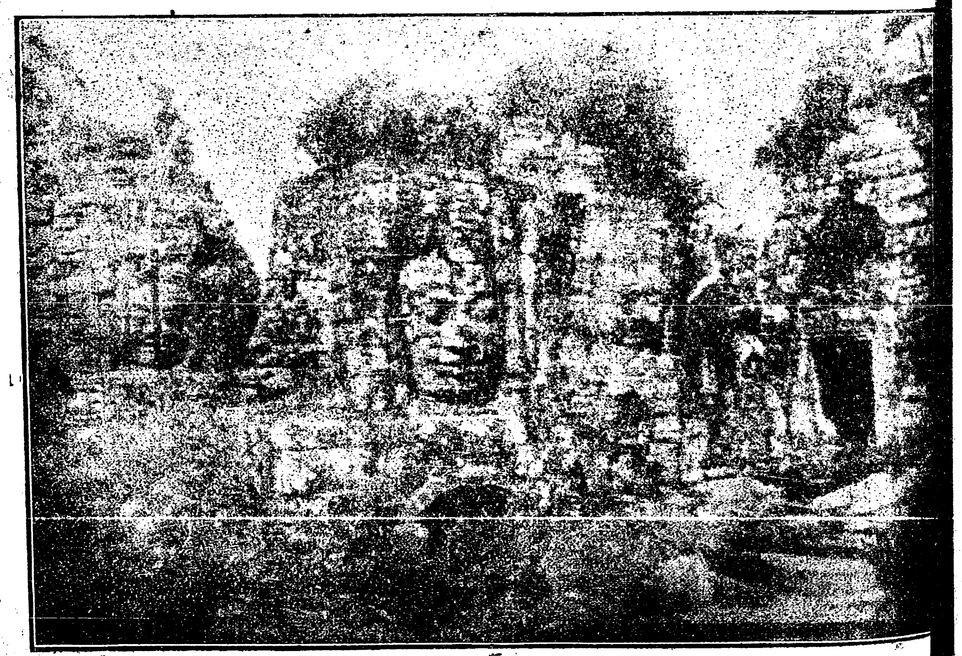

ছাদে শিবের মুখ—ওঙ্কারধাম

জ্বালার মত! মেরামত করা দূরে থাক্—উড়িষ্যার শিল্পক্ষেত্রে প্রাচীন স্থপতিরা যে-সব মস্ত মস্ত ভারি পাথর অবলীলায় মেঘচুম্বী মন্দিরের টঙে হাল্‌কা পালকের মত টানিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিয়াছেন, একালের বড় বড় পাশ-করা তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা, হরেক-রকমের জীবজন্তু ও যন্ত্রের সাহায্যে তাহার একখানি পাথরকেও সিকি মাইল সরাইয়া আনিতে পারে নাই!

আর, সংস্কারের নামে প্রাচীন শিল্পের বুকে আমরা কি নির্দ্দয় খাঁড়ার ঘা মারি! জগন্নাথের মন্দির একসময়ে ভুবনেশ্বর ও কণারকের মত সূক্ষ্মশিল্পে বিচিত্র ছিল; কিন্তু একালের অপূর্ব্ব সংস্কারের মহিমায় মন্দিরের সেই মধুচক্রের মত নিপুণ খোদাই-কাজ, চূণ-বালির প্রলেপে বেমালুম ঢাকিয়া গিয়াছে। শুনিতেছি, ভুবনেশ্বরেও তথাকথিত প্রাচীন শিল্পের সংস্কারের—অর্থাৎ সংহারের বন্দোবস্ত হইতেছে। সুধু এদেশ বলিয়া নয়—য়ূরোপেও এই ভয়ানক সংস্কারের পাল্লায় পড়িয়া প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের গণনাতীত নিদর্শন একেবারে দর্শনাতীত হইয়া গিয়াছে। লিওনার্ডো ডা ভিন্সির বিখ্যাত চিত্র Last Supperএর দুর্দ্দশার কথা ত সকলেই জানেন!

সেকালের তুলনায় একালের আর্টিষ্টদের কল্পনা, ক্ষমতা, প্রতিভা ও ভাবুকতা ত খাটো হইয়া গিয়াছে বটেই,—তাহার উপরে আমাদের রসবোধের মাত্রাও এতটা কমিয়া আসিয়াছে যে, বলিতে লজ্জা হয়। সেকালে একালে তুলনা,—মাতঙ্গের পাশে যেন পতঙ্গ! তাই একালের বামন-রূপী মানুষের সামনে বিশাল দৈত্যপুরীর বিচিত্র বিস্ময়ের মত, সেকালকার যে-সকল শিল্পের সৌন্দর্য্য আজিও অটুট আছে, নিজেদের অক্ষমতা ভাবিয়া আমরা যেন শ্রদ্ধানত শিরে তাহাদের কাছে গমন করি। দেবতার অপমান করিয়া কালাপাহাড় আজ ইতিহাসে নিন্দিত; যাহারা ললিত কলার অপমান করে, তাহাদের অপরাধও কালাপাহাড় অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প নহে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পঞ্চশরে পঞ্চত্ব

(ওনরে দে বালজাক্ হইতে)

ক

যখন নেপোলিয়ন, মস্কো হইতে সসৈন্যে হঠিয়া আসিতেছেন, তখন আমি একজন লেফ্‌টেনাণ্ট।

শীতের সন্ধ্যা; সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়াতে আমি তখন একা। সারাদিন পথ হাঁটিয়া একটি গ্রাম পাইলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক জায়গায় আশ্রয় মিলিল।

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়াই দেখি, সেখানে

আরো কয়েকজন সৈনিক আসিয়া জুটিয়াছেন। একটা টেবিলের ধারে বসিয়া তাঁহারা খাওয়া-দাওয়া করিতেছিলেন; দু-চারিটি চেনা মুখও নজরে পড়িয়া গেল। টেবিলের আর-একধারে একটি রমণীও বসিয়াছিল;—এতগুলি সৈনিক-পুরুষের সঙ্গে রমণীর দেখা পাওয়া এ-সময়ে কিছুমাত্র নূতন দৃশ্য ছিল না।

আমাকে দেখিয়াই বন্ধুরা আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমিও সকলকে উচিতমত সম্ভাষণ করিয়া ঘরের এককোণে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। শীতের চোটে আমার হাত-পা তখন অসাড় হইয়া আসিয়াছিল; চট্‌পট্ যাতে শরীরটা গরম করিয়া তুলিতে পারি, সেই চেষ্টায় আমি জড়োসড়ো হইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলাম।

এ-ঘরের ভিতর দিয়া পাশের ঘরে যাইবার জন্য দেয়ালের মাঝামাঝি একটা দরজা—সেই দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া ফৌজের এক কর্ণেল বসিয়া আছেন। একসময়ে এর তাঁবে আমি কাজ করিয়াছিলাম।

এই কর্ণেলটির চরিত্র বড় বিচিত্র,—এমন লোক সহজে নজরে পড়ে না। জাতিতে ইনি ইতালীয়। লম্বায়-চওড়ায় দৈত্যের মত—গায়েও বেজায় জোর। পুরুষোচিত বলবীর্য্যের সঙ্গে তাঁহার আকৃতিতে রমণীসুলভ সৌন্দর্য্যের মিলন হইয়াছে। নাক-চোখ যেন তুলি-দিয়া আঁকা, গড়নটি যেন ছাঁচে-ঢালা, রংটি দুধের মত ধব্‌ধবে।

কিন্তু, একবার রাগিলে তাঁহার আর হুঁস্‌দিব্য জ্ঞান থাকিত না। সে যে কি বিষম রাগ, ভাষায় তাহা খুলিয়া বলা যায় না—সে রাগের মুখে দাঁড়ায়, কার হেন সাধ্য! সকলেই তাঁর কাছে ভয়ে কেঁচোর মত এতটুকু হইয়া থাকিত। তাঁকে ডরাইতাম না কেবল আমি; তার কারণ, আমাকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। কিছুতেই তিনি আমার কোন খুঁৎ দেখিতে পাইতেন না—আমি হাজার বেঠিক কাজ করিলেও তিনি বলিতেন, ঠিক!

রাগের সময়ে তাঁর কপালের মাংসের উপরে ঘোড়ার খুরের মত একটা বাঁকা দাগ ফুটিয়া উঠিত; তখন তাঁহার অগ্নিবর্ষী চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি অপেক্ষা এই চিহ্নটিকেই দেখাইত, বেশী ভয়ানক! সে-সময়ে মত্ত হস্তীও বোধহয় তাঁহাকে এক-পা পিছু হঠাইতে পারিত না। কিন্তু যখন তাঁহার মাথা ঠাণ্ডা থাকিত, তখন তাঁহার মুখ-খানিকে মেয়েলি মুখের মত মধুর ও কোমল দেখাইত!

আমার সামনে, টেবিলের এধারে বসিয়া আছেন, একজন কাপ্তেন। ওধারে, কর্ণেলের সামনেই, কাপ্তেনের স্ত্রী। তাহার নাম রোসিনা।

বছর-কয় আগে এই কর্ণেল ও কাপ্তেনকে লইয়া একটা বিষম হৈ-চৈ লাগিয়া গিয়াছিল।

খ

সে-সময়ে আমি কর্ণেল ও কাপ্তেনের অধীনে কাজ করি।

একদিন আমরা জঙ্গলের ভিতরে একটি

সরু রাস্তার উপর দিয়া কামানের গাড়ী টানিয়া আনিতেছিলাম। মাঝপথে উল্টা-দিক হইতে হঠাৎ আর একদল পল্টনের সঙ্গে দেখা।

নূতন দলের কর্ণেল ঠোঁট বাঁকাইয়া আমাদের হুকুম দিলেন, "তফাৎ! তফাৎ! পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও!"

কিন্তু সে হুকুম তামিল করিয়া আমাদের কাপ্তেন খাটো হইতে যাইবেন কেন? তিনি দেয়ালের মত নিথর হইয়া পথের উপরেই খাড়া দাঁড়াইয়া রহিলেন!

বিরোধী পক্ষের কর্ণেল ঝাঁঝালো গলায় বলিয়া উঠিলেন, "বটে, সরবে না? দাঁড়াও, ছাখাচ্ছি মজাটা!"—তিনি ফিরিয়া তাঁহার কামানের গাড়ীর চালককে বলিলেন, "এই! চালাও গাড়ী!"

চালক, যতটা-সম্ভব পথের একধার ঘেঁষিয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল; কিন্তু তাতেও আমাদের একগুঁয়ে কাপ্তেনটি বাঁচোয়া পাইলেন না,—গাড়ীর চাকায় পা আটকাইয়া ঘোড়া হইতে তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন! সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ডান পা-খানি ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখের পলক না পড়িতে এই কাণ্ড! আমরা সবাই থতমত খাইয়া অবাকমুখে দাঁড়াইয়া আছি,—হঠাৎ দেখি, পিছন হইতে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া, মূর্ত্তিমন্ত একটা ঝড়ের মত আমাদের কর্ণেল আসিয়া হাজির!

সেই মুহূর্ত্তেই কাপ্তেন কাত্‌রাইয়া উঠিলেন, "ওঃ! গেলুম—গেলুম!"

আমাদের কর্ণেলকে তখন মানুষ মনে হইতেছিল না! মুখ দিয়া তাঁর ফেনা বাহির হইতেছিল এবং দুর্জ্জয় ক্রোধে বাক্যহারা হইয়া রুদ্ধ আক্রোশে তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিলেন। আগুনভরা চোখে বনের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া, তিনি ও-দলের কর্ণেলকে ঈসারা করিলেন!

দুই কর্ণেল তখনি বনের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। দূর হইতে নিশ্বাস চাপিয়া আমরা দেখিলাম, বনের মধ্যে প্রদীপ্ত শিখার মত ঝকিয়া উঠিল দুখানা লক্‌লকে তরবারি,—এবং পলক না-পালটিতে ও-দলের কর্ণেলের মাথাটা ধড় হইতে ছিটকাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল!

সে-দলের লোকেরা আর এক-মিনিট দাঁড়াইল না—যে পথে আসিয়াছিল, উর্দ্ধ-শ্বাসে উর্দ্ধমুখে সেই পথেই আবার দৌড় মারিল!

কাপ্তেন তখনো কাদার উপরে আধমরা হইয়া পড়িয়া পড়িয়া গ্যাঙাইতেছেন। এই কাপ্তেনটির স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কর্ণেলের কিছু মাখামাখি ছিল।… … কর্ণেলের এতটা রাগের আসল কারণ তাহাই!… …

গ

আজ সন্ধ্যেবেলায় সেই কর্ণেল ও কাপ্তেনকে অনেকদিন পরে আবার এক জায়গায় দেখিলাম।

কাপ্তেনের স্ত্রী রোসিনা পরমরূপসী; বয়সগুণে তাহার যৌবনে ভাটা পড়িতে সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার রূপের স্রোত আজও বন্ধ হইয়া যায় নাই। এখনো

তাহার ডাগর চোখের কোণে বিদ্যুৎ চম্‌কায়, কপোলে গোলাপী রং ফুটিয়া ওঠে, চলা-ফেরায় ছন্দের তাল পাওয়া যায়! এখনো তাহাকে দেখিয়া কেউ যদি প্রাণ হারাইয়া ফেলে, তবে তার পছন্দকে নিন্দা করা চলে না।

রোসিনার স্বামী কাপ্তেনকে দেখিলে লোক নেহাৎ মন্দ মনে হয় না। তিনি ভদ্র ও শিক্ষিত; কিন্তু আজ বছরতিন ধরিয়া তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে কর্ণেলের যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তিনি যেন তা দেখিয়াও দেখিতে চান না! হয়ত তাঁহার এই বিচিত্র নির্লিপ্ততার আর-কোন গুপ্ত অর্থ আছে!

তবু, এই কাপ্তেনটির মুখের দিকে যখনি চাহিয়াছি, তখনি কেন জানিনা, আমার মনে কেমন-একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে!

তাঁহার নীচের ঠোঁটটা খুব পাতলা এবং উপরদিকে না উঠিয়া তলার দিকে নুইয়া পড়িয়াছে; যাদের ঠোঁট এমনধারা, তাদের চরিত্র হয় আল্‌সে ও ম্যাদামারা এবং স্বভাবটা হয় নিষ্ঠুর।

ঘরের ভিতরে যে ক-জন লোক বসিয়াছিল, তাহারাও আমার মতই পথ-হাঁটিয়া শ্রান্ত; কাজেই এই অবসন্নতার মাঝখানে গল্পগুজবটা তেমন জমিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

কর্ণেলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তিনি হাত-মুখ পুঁছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আমাদের নমস্কার করিয়া রাতের মত বিদায় মাগিলেন। তারপর, পাশের ঘরে ঢুকিবার আগে, কাপ্তেনের স্ত্রীর দিকে একবার চাহিয়া স্পষ্ট স্বরেই ডাকিলেন, "রোসিনা!"—উত্তরের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া কর্ণেল, গড্‌-গড্‌ করিয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

কর্ণেলের এ ডাকের মানেটা যে কি, সেটা বুঝিতে কারুর দেরি হইল না। চেনা-অচেনা এতগুলো লোকের মাঝে,—বিশেষ করিয়া—স্বামীর সামনেই কর্ণেলের এমন অন্যায় ব্যবহারে, রোসিনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিল; এবং স্বামীর সম্মানে ও তাহার রমণীত্বে আঘাত লাগাতে, সে পাঙাশ-মুখে আড়ষ্ট ও গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে কর্ণেলের শয়নগৃহ হইতে আবার উচ্চস্বরে ডাক আসিল—"রোসিনা!" এই দ্বিতীয় ডাকে কর্ণেলের স্বভাবসিদ্ধ অধীরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ভাবও ফুটিয়া উঠিতেছিল।

রোসিনার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিল! ভয়ে-ভয়ে সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং একটু ইতস্তত করিয়া, অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত কর্ণেলের ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

এ ঘরে টুঁ-শব্দটি নাই,—সবাই তটস্থ! হঠাৎ আমি হাসিয়া ফেলিলাম; সঙ্গে-সঙ্গে সকলকার মুখেই আমার হাসির প্রতিধ্বনি খেলিয়া গেল!

কাপ্তেন আমার দিকে চাহিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন, "তুমি যে হাসলে বড়?"

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া বলিলাম, "আমার দোষ হয়েছে, মাফ করুন!"

কাপ্তেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারপর নীরস স্বরে বলিলেন, "না, দোষ তোমার নয়—দোষী হচ্ছি আমি!"

এই ব্যাপারটার পর সকলেই কেমন যেন মনমরা হইয়া গেল। সমস্ত কথা-বার্ত্তা বন্ধ করিয়া আমরা যে যেখানে ছিলাম, শুইয়া পড়িলাম; এবং শীঘ্রই ঘুমঘোরে আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

ঘ

সকাল বেলা; যে যার তল্পিতল্পা বাঁধিয়া আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। আমাদের কেউ কারুকে সাথী হইতে ডাকিল না—যার যেদিকে খুসি, সে সেইদিকে চলিতে সুরু করিল।

কিন্তু, খানিকদূর যাইতে-না-যাইতেই আমরা হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, পিছন হইতে উচ্চস্বরে কে যেন আর্ত্ত চীৎকার করিতেছে! কী সে চীৎকার! মানুষের স্বর কি এমন হয়? এ যেন আহত সিংহের বিকট গর্জ্জন! সেই প্রাণ-কাঁপানো, অমানুষিক, ভয়াবহ গর্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা সবাই শুনিলাম, নারীকণ্ঠের আর-এক অস্ফুট আর্ত্তনাদ!

চকিতে আমরা সবাই—যে যেখানে ছিলাম—ফিরিয়া দাঁড়াইলাম; সকলেই ভয়ে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত!

যে বাড়ীতে গেল-রাত কাটাইয়াছিলাম, দূর হইতে সেই বাড়ীর দিকে চাহিলাম। কিন্তু, এ কি! যেখানে সে বাড়ীখানা ছিল—এখন সেখানে শুধু ধূ-ধূ-ধূ-ধূ আগুনের শিখা ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে! এলমেল হাওয়ার হু-হু শ্বাসে চক্রে চক্রে ধূমের পর ধূম পাক্‌সাট্‌ মারিয়া আমাদের দিকে ধাইয়া আসিতেছে—সঙ্গে-সঙ্গে সেই তীব্র অথচ বুক-ভাঙ্গা, আর্ত্ত, ভগ্ন স্বর; এবং একটা মাংসপোড়া দুঃসহ দুর্গন্ধ!

অল্পক্ষণ পরেই কাপ্তেন আসিয়া হাজির! আমরা তাঁহার দিকে বোবার মত চাহিয়া রহিলাম,—কারুর এমন ভরসা হইল না, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করে! তিনি কিন্তু নিজেই আমাদের মনের ধাঁধা মিটাইয়া দিলেন। ডানহাতে আপনার বুকের পানে দেখাইয়া এবং বাঁ-হাতটা জলন্ত আগুনের দিকে তুলিয়া, কাপ্তেন বলিলেন, "এতদিনে প্রাণের ব্যথা গেল!"

আমরা যে যার পথে ফিরিলাম,—নীরবে, কলের পুতুলের মত!

... ...

ভ্যাড়া যদি হঠাৎ বিদ্রোহী হয় তবে তার চেয়ে ভয়ানক আর-কিছু ভাবা যায় না!

শ্রীমতী রেণু রায়

বাঙ্গালীর রসবোধ

বাঙ্গালীর অন্য যত গুণ থাক, বা নাই থাক, তাহারা যে বুদ্ধিমান জাতি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। রসবোধ বুদ্ধিরই একটি অঙ্গ। কালিদাস স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিতপটু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু আমার ত মনে হয়—বাঙ্গালী জাতি-মাত্রেই এই বিশেষণ লাভে অধিকারী। আমাদের দেশের, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ-রঙ্গ, কাব্য-কবিতা, গান-ছড়া প্রভৃতি রচনা শিক্ষিত জগতেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে;—বস্তুতঃ শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিত কবির সংখ্যাই এদেশে অধিক। কারণ, আমাদের আগম-নিগম পুরাণ-কথা-কাহিনীর সরস ভাবোচ্ছ্বাস মাঠ-ঘাট-জল-স্থল ওতঃ-প্রোতঃ করিয়া প্রবাহিত। তাই সুশিক্ষিত কবি জয়দেবকেও ভাব-সম্পদে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নিকট হার মানিতে হইয়াছে আর কবিপ্রবর রামপ্রসাদের পদাবলী ভক্তিভাবে বঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই হৃদয় জয় করিয়াছে।

বাঙ্গলার মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয়—আজকাল কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকেও অনেকে বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাধু সাধু! আমরা ইঁহাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি সহকারে এই প্রার্থনা করি, তাঁহাদের উদ্যম সফল হৌক, অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হৌক।

নিম্নে আজি যে পদাবলী উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে কবিতা-পদবাচ্য নহে, ইহা একজন বাঙ্গালী সৈনিকের ছন্দে লিখিত দৈনন্দিন বিবরণ।

বাঙ্গালী সেনা! এই নামটিতেই হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে! সকলেই জানেন, কিছুদিন হইল ষাটজন বাঙ্গালী-সেনা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক করাচী হইতে এখানে আনীত হইয়া বাঙ্গলার স্থানে স্থানে নব সৈন্য-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইবামাত্র মহিলা-সমিতি একদিন ইহাদিগকে অভ্যর্থনা-ভোজ প্রদান করেন। সেই অভ্যর্থনা-সভায় ইহাদিগকে দেখিয়া মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। চিরদিন ধরিয়া, গানে, কবিতায়, কথায়, বক্তৃতায়, গদ্যে-পদ্যে আমরা যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছি, পোষণ করিয়াছি—সেই অতৃপ্ত বাসনা আজি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদের নয়নের সম্মুখে বিরাজিত! এই বাঙ্গালী যুবকদিগের সাজ-সজ্জায়, চলনে-বলনে আকার-ইঙ্গিতে কি বীর-মাধুর্য্য! স্বদেশকে তাহারা স্বজাতিতে পরিণত করিবার ইচ্ছায় দুঃখ ক্লেশ তুচ্ছ করিয়াছে; রাজার আহ্বানে, দেশের কার্য্যে, তাহারা আজ অদম্য উৎসাহে দলে দলে মরিতে চলিয়াছে, মৃত্যুকে তাহারা আর ভয় করে না—; প্রাণ তাহাদের নিকট আজি কেবল কর্ত্তব্যের পণ। কি আনন্দ! এই দিনটি দেখিবার জন্যই যেন এতদিন এ জীবন বহন করিয়াছি! সেদিন আমাদের মনের এই আনন্দ আকাশে বাতাসে, আলোকে ছায়ায় যেন মাতামাতি করিয়া বহিয়া উঠিয়াছিল।

সেই নিমন্ত্রণ-সভায় সমবেত সকলের চিত্তবিনোদন জন্য হাবিলদার ধীরেন্দ্রনাথ সেন-রচিত নিম্নলিখিত পদাবলী একজন সৈনিক পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা ছন্দে-বন্ধে নির্দ্দোষ নহে, ভাষালালিত্যেও অপরূপ নহে, তথাপি ইহার ছত্রে ছত্রে যে একটি হাস্যকৌতুক নিহিত আছে তাহা অতি মনোরম, এবং ইহার বর্ণনাও অতি —উপাদেয়। আমি সেইজন্য এই পদাবলী পত্রস্থ করিবার জন্য লেখকের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছি। আশা করি পাঠকগণ ইহা পড়িয়া আমারই মত তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

বাঙ্গালী সেপাইয়ের রোজ-নামচা

প্রথম অধ্যায়

সরকার হয়ে তুষ্ট বাঙ্গালীর বলে,
গঠিল বাঙ্গালী সৈন্য পরীক্ষার ছলে।
সীমান্ত-প্রদেশে আছে নৌশেরা সহর
শুনিয়াছি চিরদিন দেশ মনোহর!
দৃশ্যে সেরা, খাদ্যে সেরা, জল-বায়ু ভালো;
বাদাম আঙ্গুর পেস্তা গাছ করে আলো।
নদী চলে নেচে-নেচে মাছ লয়ে বুকে
এত শুনি বঙ্গযুবা ছোটে উর্দ্ধমুখে।
কেউ এল জেনে-শুনে দিবে প্রাণ রণে,
কেউ এল পেস্তাঙ্কুর খাবে প্রাণপণে,
কেউ এল ফৎনা নিয়ে ধরিবারে মাছ,
কেউ এল ফল খাবে উপাড়িয়া গাছ!
দুরু-দুরু হিয়া লয়ে দিনপাঁচ পরে
উপনীত সবে সেই স্বপন-সহরে।
হরি হরি, একি হেরি একি মনোব্যথা,
আগাগোড়া একেবারে ডাহা মিছেকথা!
কোথায় আঙ্গুর-পেস্তা! কোথায় বাদাম!
গন্ধ তার দূরে থাক,—নাহি মেলে নাম!
নদী আছে বটে কিন্তু তেপান্তর পার
এমন ভীষণ স্রোত নামে সাধ্য কার!
মাছের কথাটা থাক্, আঁসের সন্ধান
পেতে যদি চাও খোঁজ শ্রীমৎস্যপুরাণ।
আলু মূলো প্যাঁজ ছাড়া আর নাই গতি,
দূর ছাই তাও ভাল পেলে দিন প্রতি!
জীবের জীবন জল সহজে না জোটে
প্রাণটা রাখিতে গিয়ে প্রাণ ওঠে ঠোঁটে!
ইঁদারায় আছে জল ষাট হাত নীচে,
দুই হাতে হ'ল ব্যথা লম্বা দড়ি খিঁচে।
সঙ্গে এসেছিল চার বামুন ও ভিস্তি
একে একে তাহাদের দিতেছি ফিরিস্তি।
বামুন বিক্রম সিংহ চারি দিন পরে
Deserter হয়ে চুপে পড়িলেন স'রে।
ভিস্তি সে শচীন দাস চুরি করে এসে,
বাঙ্গালায় ফিরে গেল কয়েদির বেশে।
রাজেন আরেক ভিস্তি হাসপাতালে বাস,
দুধ রুটি chiken broth খান বারমাস।
নগেন রাঁধুনী পাকা, একা করে কি—
বসে বসে ঢালে সুধু খিচুড়িতে ঘি।

রান্নাঘরে কান্না আসে,—কাঠ সব কাঁচা,
অস্থির ধোঁয়ার চোটে দায় হল বাঁচা।
নুনে-পোড়া ডাল আর কঠিন চাপাটি,
হাসিমুখে পেটে পুরে সারাদিন খাটি।

পাঠায়ে দিয়েছে সঙ্গে Ladies Committe,
অনেক জিনিষ ভরা এই পুঁটুলিটি!
ঘটি বাটি থালা আছে, আর সেফ্‌টি পিন,
চিরুণী, বুটের লেশ, চিনি একটিন।
বোতাম, ছুরী ও সুঁই, সেলায়ের সুতো,
ব্রুশ কালি তাও আছে সাফ কর্ত্তে জুতো।
বালিসের খোল, আর তেল একশিশি,
সাবান আরসী আছে হয়ে মেশামিশি।
তোয়ালে, চুরুট, লুঙ্গি, গেঞ্জি দেশলাই,
মশলা প্রভৃতি আরো যা খুঁজিবে তাই!
এখানেও লভিয়াছি জিনিষ অশেষ,
একে একে সব কথা করিতেছি পেশ।
ট্যাঁকটি ভেবনা ফোকা, আছে মুদ্রা ষাট,
তা হতে পেয়েছি এক মুর্দ্দা-ফেলা খাট্।
প্যান্ট, সার্ট, ব্রুশ আর কোমরের বেল্ট,—
টুপিরও আশা রাখি,—made of felt।
একজোড়া Puttee আর একজোড়া মোজা,
শ্রীচরণে Boot, বাপ্! শ্রীগাধার বোঝা!
পেতে শুতে সতরঞ্চি, গায়ের কম্বল—
কম-বল হচ্ছিনাকো—উল্টে বাড়ে বল!
গলা-আঁটা অপরূপ খাকীর সে কোট,
সব নিয়ে হল এই বারো দফা মোট!

(৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্যারেড)

বিস্তৃত প্যারেড-মাঠ করিতেছে ধূধূ,
ঘাস নেই, ছড়াছড়ি নোড়া-নুড়ি সুধু!
গলা-আঁটা কোট আর বুট-পাট এঁটে,
প্যারেড করিতে ছুটি চা ও রুটি সেঁটে।
ভীষণ রোদের তাতে ফাটে খোলা শির,
চোখ ছেপে ঝরে অহো! বরষার নীর!
ভদ্র বটে মিষ্টমুখ মাষ্টার-মশাই,
প্যারেড-জমিতে কিন্তু সাক্ষাৎ কসাই।
জবর চেহারাখানি, গোঁফে-ভরা মুখ,
নজরে পড়িয়া গেলে ভয়ে কাঁপে বুক।
দৈবে যদি ভুল হয়, দিবেনাকো ছাড়ি—
'কুঁইয়ামে গিরো' বলে উঠিবে ফুকারি!
দুই পায়ে দুই বুট—পাঁচসের ভারি,
তদুপরে রাইফেল—চলিতে কি পারি!
মাথা হেঁট হয়ে আসে, ভাঙ্গে বুঝি নাক,
পিছে হতে বলে উচ্চে "মুর্দ্দা উপর-তাক!"

যে-কোন অসুখ হলে Quinine mixture
গুরুতর হলে কিছু Iodine Tincture।
ডাক্তারের হাতে খালি এইমাত্র পুঁজি,
পথ্য পাবে হয় রুটি, নয় দুধ-সুজি।
রবিও বিস্ম্যৎবারে খাবে কুইনিন;
তা না হলে ম্যালেরিয়া করে দেবে ক্ষীণ!

তৃতীয় অধ্যায়

N. C. Os.

আমাদের মধ্যে আছে N. C. O গণ
একে একে তাহাদের দিব বিবরণ।
হাবিলদার মজুমদার অনাদি চাটুয্যে,
নায়ক বর্দ্ধন আর শ্রীদুর্গা বাঁড়ুয্যে।
অরুণ, ধীরেন সেন, Lance বিমল সিং,
শচীন, পটল আর তারক ফড়িং।
দাড়ী-কাটা ফণী-দাদা, বিশ্বেশ্বর ভায়া
কারিকর যিতু-ভাই প্রাণে বড় মায়া।

আঙ্গুলাজে নারায়ণ পেশোয়ারী বেশে;—
পাঠালেন ফটোগ্রাফ ভিন্ন ভিন্ন দেশে।
এর পরে আসিলেন জমাদার বোস,
বাঙ্গালীর আড্ডা পেয়ে দিল্ হল খোস।

বর্ণনা

পেটুক মজুমদার, ঘোরে-ফেরে বারবার
খাবার দেখিলে ছিনে জোঁক!
যা পাবে সে সোজাসুজি খাবে দুই চক্ষু বুঁজি
চায়ে মারে এতবড় টোঁক!
যশোর-জেলায় বাস করিয়া বি, এল পাস
কচ্ছিল উকিলী নিজ দেশে।
ছেড়ে গাউনের মায়া কাঁদায়ে মক্কেল-ভায়া
হঠাৎ হাজির রণ-বেশে।
অনাদি সে অনামুখো মেজাজ বড়ই রুখো
জলের ধারেতে নাহি যায়,
চেহারাটি ধূম্রবর্ণ ঘুমে আস্ত কুম্ভকর্ণ
তারে বুঝা দেবতার দায়;
গতরটি মোটাসোটা চুলগুলি কটা কটা
কাহারও প্রতি নহে বাম।
রাত্তিরে দেখিলে পরে বুক দুরু-দুরু করে,
মনে মনে বলি রাম রাম!
অতি-ভোজে নন কাবু নায়ক বর্দ্ধন-বাবু
খেয়ে রুগ্ন, ড্রিলে কিন্তু ভালো,
মেজাজটি খিটখিটে চেহারাটি ফিটফিটে
দোষের মধ্যে বর্ণটি কালো।
আমাদের দুর্গা-ভায়া ডাক-নাম মহামায়া
দেহখানি মার্ব্বেল-সুগোল।
তার নাম দিল John রসিক সাহেবগণ
কাজে কুড়ে, মুখে লম্বা বোল!
শ্রীঅরুণ writer, পুলিনটি fighter
শিখেরা বলে আঙ্গুর বাবু।
শুতে পেলে মুখে হাসি, দু-বেলা বিছানারাণী
ড্রিলে চটা,—জ্বরে জ্বরে কাবু।
Lance-বিমলচন্দ্র গড়নটি নহে মন্দ,—
—ম্যাগ্রিগর ফুটবল প্রায়।
প্যারেডেতে দিয়ে ফাঁকি বন্দুক রাখিতে ঢাকি
ঘড়ি-ঘড়ি ঘড়ি পানে চায়!
ঘরে বসে থাকে বেশ রোগের নাইক লেশ
কাজের সময় পায়ে ব্যথা,
Skirmish করিতে নারে, কি-করে ড্রিল সে করে,
গুপ্ত কভু থাকে সত্য কথা?
Evening Roll Callএ মিনতি করিয়া বলে
'সেন-দাদা, বাঁচাও—দোহাই!'
সরে পড়ে ছুটি নিয়ে নিজ কর্ম্ম পরে দিয়ে
হাতে তুড়ি, মুখে মস্ত হাই!
(বিমলের বিবরণ, করিলাম withdrawn
আধসের জিলিপির লাগি,
বাদ রেখে কথা তার, পড়িও সকল আর,
হে পাঠক, এই ভিক্ষা মাগি।)
উদাস শচীন রায়, উল্কী-ভরা সারা গায়
মৌনব্রতী—গম্ভীর পেচক!
বই-হাতে, বিছানাতে সদা শুয়ে, কল্পনাতে
ছোটে তাঁর মানস-ঘোটক!
পটল অটল বীর চলে উঁচু করে শির—
বুদ্ধির ভাঁড়েতে মা-ভবানী!
গোঁফদুটি খাড়া খাড়া তাতে ঘন ঘন চাড়া
বুদ্ধ-খোকা, হাসি মুখখানি!
বাঁড়ুয্যে তারকনাথ ভুঁড়ি-ভরে' মারে ভাত
এত খেয়ে, দেহটি বাঁখারি,—
চুলের বাহার ভালো, রং নয় তত কালো—
শ্যামকান্ত রোদে-পোড়া ভারি।

Rumea ফেলিছে অশ্রু তাহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রু
কে দিয়েছে ছেঁটে বিলকুল,
অতিশয় গো-বেচারা, মারো-ধরো, নাই সাড়া,
রাগে কভু হয় না বেভুল!
খেলোয়াড় বিশ্বেশ্বর বিরস গলার স্বর
জন্ম তার নিজ-বর্দ্ধমানে,
ছাড়ি নবাবের খানা, সীতাভোঁগ মিহিদানা
ধন্য ধন্য, এসেছে এখানে!
বিশ্বকর্ম্মা যিতু-ভাই, মুখে টুঁ-শব্দটি নাই
একটুতে ভ্যাঁক্ করে কান্না!
লোকটা বড়ই ভালো, তবে কিনা, রংটা কালো
অমাবস্যা নাগাল পান্‌না!

হাবিলদার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন।

মাসকাবারী

সাহিত্যে ভদ্রতার আদর্শ

গতমাসের "ভারতী"তে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে চিত্তরঞ্জন বাবু তাঁর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে রবিবাবুর আমেরিকার বক্তৃতাবিশেষ না পড়িয়াই তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া রবিবাবুকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন এবং রবিবাবুর স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্ত বক্তৃতাগুলি পড়িয়া (অথবা শুনিয়া) জ্ঞাতসারে হোক্ বা কতকটা অজ্ঞাতসারে হোক্ রবিবাবুর অনেক কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কাহারো কিছু বলিবার থাকিলে তাহার জবাব দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দু একটা কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা প্রতিবাদ নয়, অপবাদ দিবার চেষ্টা। বাংলা দেশে এই চেষ্টাটা সম্প্রতি বিশেষ সুলভ হইয়াছে, কেমনা বিদ্যা-বুদ্ধি বা গুণপনা অনেক লোকের পক্ষেই দুর্ল্লভ এবং এ চেষ্টায় তাহাদের সেরেফ কোন দরকারই নাই। সুতরাং যুক্তির মুখ বন্ধ করিবার উপযুক্ত মুখবন্ধ কতকগুলি লোকে স্থির করিয়াছেন, প্রতিপক্ষকে অভদ্র ভাষায় গালি দেওয়া। তাঁরা বেশ জানেন যে এ আর্টে কোন ভদ্রলোক তাঁদের হার মানাইতে পারিবেন না, কারণ ভদ্রলোক মাত্রেই ভদ্রতা জিনিসটার মর্য্যাদা জানেন। কিন্তু বাংলা দেশের বিস্তর 'ভদ্রলোক' এই আর্টে হাত পাকাইতে সুরু করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর তাঁদের লেখার সমজদারের ও খরিদ্‌দারের দল বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে বোধ হয় ছোঁয়াচে ব্যামোর মত গালি জিনিসটারও একটা ছোঁয়াচ আছে। কিম্বা বোধ হয় গালির বাঁধুনির মধ্যে একটা রসও বা আছে, যে রসটা ইতর রস হইলেও ক্রমশ ক্রমশ অনেক লোকেই তাতে স্বাদ পায়! ভয়ের যেমন একটা রস আছে যে-জন্য ছেলেপিলেরা যত বেশী ভয় পায় ততই ভূতের গল্প বা রাক্ষসের গল্প শুনিতে ভালবাসে, যেমন বীভৎস বলিয়া একটা রস আছে, যে জন্য বীভৎস শুক্কারজনক দৃশ্যের বর্ণনা পড়িয়া

বই বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইলেও কোন কোন লোকের সবটুকু পড়িবার জন্য মনটা উস্‌খুস্ করিতে থাকে, তেমনি বোধ হয় একটা গালি-রসও আছে এবং এ রসের রচনায় যাঁরা সিদ্ধহস্ত তাঁদের নাম না করিলেও অনেকেই জানেন যে তাঁদের গালি-রস-রচনা পড়িবার জন্য গালি-রসিকদের মনটাও কিরূপ চঞ্চল হয়।

কোন্ সময় হইতে মাসিক ও দৈনিক সাহিত্যে এ রসের উৎপত্তি তাহা নির্ণয়ের জন্য ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন করে না। স্বদেশীর সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় 'সন্ধ্যা' কাগজে এই রসটাকে popularise বা সর্ব্বজনসুলভ করেন। তার আগে তাঁর চেয়ে সূক্ষ্মতর ভাবে এ রসের সৃষ্টি করেন 'সাহিত্য'-সম্পাদক সমাজপতি মহাশয়। যিনি যাই বলুন, এক সময়ে হাতের কাছে "সাহিত্য" পাইয়া, মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা পড়িবার প্রলোভন সম্বরণ করা অতি বড় বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পক্ষেও সম্ভাবনীয় ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় যখন 'সন্ধ্যা' বাহির করিলেন, তখন সন্ধ্যার সময় ভদ্রাভদ্র সবাই মিলিয়া তাঁর স্থূল গালি-রস সাগ্রহে উপভোগ করিত, ইহা দেখিয়াছি। তবে ইতিহাসের সাল তারিখ মিলাইয়া দেখিলে এঁরাও এ আর্টে 'নভিস্'; কারণ বাস্তবিক ইন্দ্রনাথ, অমৃতলালই এ আর্টের সেরা আর্টিষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই। Satireএর সঙ্গে গালি মিশাইবার ওস্তাদি তাঁদের ছিল। শুনিয়াছি অমৃতলাল এখনকার কোন নামজাদা 'নভিস্' সম্বন্ধে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁর সযত্নরক্ষিত বহুকালের একটি 'ভাঁড়' উক্ত ব্যক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে এই ইতর রসটা কেন অনেক কাল ধরিয়া চলিতেছে, তার একটা কারণ অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী চরিত্রের মধ্যে একটা লঘুতা ও আমোদপ্রিয়তা আছে। এইজন্য পশ্চিমবঙ্গেই এ রসের উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং পশ্চিম হইতে উহা পূর্ব্ববঙ্গে ক্রমশঃ সংক্রামিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙালীর চরিত্রের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য আছে; সাহসিকতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণে তারা পশ্চিম-বঙ্গের বাঙালীকে জিতিয়া আছে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম কৌতুক-হাস্য তাদের পক্ষে অসহ্য ছিল; ব্যঙ্গ-কৌতুক আরো অসহ্য ছিল। এখনও যে সম্পূর্ণ সহিয়া গেছে তা বলা যায় না; তবে অনেকটা সহিয়া আসিয়াছে বটে।

কিন্তু বাঙালী চিত্তের লঘুতাই এই লঘু ও ইতর রসের উৎপত্তির একমাত্র কারণ নয়। বাঙালী খুব অল্প দিন হইল নাগরিক সভ্যতায় দীক্ষিত হইয়াছে, এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। আজকাল কবির গানের স্তুতির একটা ধূয়া উঠিয়াছে; যাঁরা স্তুতি করেন আশা করি তাঁরা তার সব ইতিবৃত্তান্তটা জানেন। কবির গানে দুই পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ যতবেশী অশ্লীল ভাষায় প্রতিপক্ষকে গালি দিতে পারিত, সে ততই বাহবা পাইত। আজ বিংশ শতাব্দীতে নাগরিক সভ্যতায় আমরা সভ্য হইলেও সেই কবির খেউড়ের প্রভাব সাহিত্যে যে আমরা বেশী দূর পর্য্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই, তার প্রমাণ মাসিক ও দৈনিক সাহিত্যে প্রত্যহই

এবং অজস্র পরিমাণেই পাইতেছি। তারপর সম্প্রতি বাংলার গ্রাম্য সভ্যতার মহিমা-কীর্ত্তন যে নূতন করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সেই 'গ্রাম্যসভ্যতার' মধ্যে গ্রাম্যতা বলিয়া যে বস্তুটা ছিল এবং এখনও আছে, সেটা সভ্যতা কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কেননা দেখিতে পাই যে, উচ্চ শিক্ষা সত্ত্বেও এবং এত বছরের সহুরে সভ্যতার প্রভাব সত্ত্বেও সেই গ্রাম্যতার জড় মরিতেছে না। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের জায়গায় এখন সংবাদপত্রের আসর তৈরি হইয়াছে, সেখানে গালির সোরগোল যত ইচ্ছা চড়াইলেও ভদ্রলোকের কানে তালা ধরে না, এবং গালির চালবোল কদর্য্যতার মাত্রা ছাড়াইলেও তাঁদের কান ফেরে না, বরং কর্ণদ্বয় আরো উৎকর্ণ হইয়া ওঠে।

গালির যে একটা রস আছে তাহা ত গোড়াতেই বলিয়াছি। কিন্তু ইউরোপে এক সময়ে ভদ্রলোকদের মধ্যেও Cockfightও bull-fight দেখারও ত একটা রস ছিল। ইংলণ্ডে পোপ ড্রাইডেনের আমলে এবং তারও পরে বাইরন প্রভৃতির সময়েও গালি-রসটা অথবা খেউড়-রসটাও সাহিত্যে বেশ জমিয়াছিল। তবে এখন বোধ হয় bullfightএর রস, তথৈব সাহিত্যে গালির রস, ইংরেজ বা ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভদ্রলোকেরা তেমন উপভোগ করেন না। কেননা, ভদ্রতার আদর্শটা যে সাহিত্যে ভদ্রলোকের রক্ষা করিয়া চলা উচিত, এ বিষয়ে ইউরোপীয় ভদ্র সাহিত্যে বোধ হয় একটা ষ্টাণ্ডার্ড ঠিক হইয়া গেছে।

অবশ্য প্রতিবাদীর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি চালাইবার সময়ে, হাস্য-কৌতুক বা ব্যঙ্গ-কৌতুকের যথেষ্ট অবকাশ আছে—চেষ্টরটন্, বার্ণাডশ, বা এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি হালের কোন লেখকই সে অবকাশটুকু একবার পাইলে ছাড়েন না। লালিকা বা parody এবং ব্যঙ্গচিত্র বা cartoonএর স্থান সাহিত্যে যথেষ্ট আছে। কিন্তু প্রতিবাদীর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দিয়া অথবা তাহার যুক্তিকে ব্যঙ্গ না করিয়া তাহার ব্যক্তিগত জীবন বা চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়া কিংবা তাহাকে অশিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া যে অদ্ভুত কৌতুক-হাস্যের অবতারণা করা হয়, তাহা অত্যন্ত গ্রাম্য এবং অভদ্র রসিকতার নমুনা।

বাংলা সাহিত্যে গ্রাম্যতা ও অশিষ্টতার রীতি ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই ইতর রসের স্বাদে পাঠকসাধারণ একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে, মার্জ্জিত রুচি-বিশিষ্ট রচনা আর তাহাদের মনে ধরিবে না, এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধে ভদ্র সাহিত্যিক মাত্রেরই কোমর বাঁধিয়া লাগা উচিত।

"বাঙ্গলার কথা"

চিত্ত বাবুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সুদীর্ঘ অভিভাষণ সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করি নাই, শুধু তিনি কত জায়গায় রবিবাবুর লেখার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি ও রবিবাবুর প্রতি তাঁর অযথা অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছি, ইহাতে কোন কোন খবরের কাগজ দুঃখ

প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে এই যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবিবাবু যে সব মত প্রচার করিয়াছিলেন, সবুজপত্রের আমলে তাঁর সেই সব মত কি অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে? পরিবর্ত্তনটাই যে জীবনের ধর্ম্ম এবং জীবনধর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই পরিবর্ত্তনের লীলা অথবা অভিব্যক্তির লীলা যে জীবনের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে দেখা যায়—এ কথা এমনি স্বতঃসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে ইহাকে গায়ের জোরেও অস্বীকার করা চলে না। রবিবাবুর জীবনের বিচিত্র বিকাশের ইতিহাসে নানা মত ও আদর্শ-বৈচিত্র্য দেখা যায়; বস্তুত বড় জীবন মাত্রেই এরূপ বৈচিত্র্য দেখা গিয়া থাকে। যেমন গ্যয়টের জীবনে যত বৈচিত্র্য, এমন ইউরোপীয় আর কোন মহাকবির জীবনে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশে এমন বুদ্ধিমানও কেহ কেহ আছেন, যাঁরা জীবনের এই নৈসর্গিক অভিব্যক্তির দরুণ, জীবনে মতের ও আদর্শের যে সকল বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা ক্রমশ ক্রমশ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, তাহাকে স্বতোবিরুদ্ধতা (self-contradiction) আখ্যা দিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করেন। দেশপ্রীতির দ্বারা অভিভূত হইয়া রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে দেশের অনেক প্রথা ও আচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে সকল সমর্থন করেন না—তাঁর জীবনে চিন্তার বা অভিজ্ঞতার এই যে একটা বিকাশ, এটাকে স্বত-বিরুদ্ধতা বলিলে মানুষের জীবনের লীলাই আগাগোড়া স্বত-বিরুদ্ধ একথাও বলা যাইতে পারে। বাল্যটা যৌবনের স্বতবিরুদ্ধ, যৌবন প্রৌঢ়াবস্থার স্বতবিরুদ্ধ, প্রৌঢ়ত্ব বৃদ্ধত্বের স্বতবিরুদ্ধ—এমন কথাও বলা যাইতে পারে, যদিচ 'স্বতবিরুদ্ধ' বলিতে আমরা তাহা বুঝি না। কোন মানুষের বিরুদ্ধে স্বতবিরুদ্ধতার অভিযোগ তখনি উপস্থিত করা যায়, যখন সে একই সময়ে একই অবস্থায় দুই রকমের বা নানা রকমের কথা বলে। আমরা তখন বলি এ লোকটা self-contradictory—এর মতের স্থিরতা নাই। কিন্তু অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গিয়া তারপরে যদি মানুষের মতের বদল হয়, (যেটা হওয়াই স্বাভাবিক), তবে তখন তাহাকে self-contradictory বলিবার কোন মানেই পাওয়া যায় না। যাই হোক্, চিত্তরঞ্জনবাবু রবীন্দ্রনাথের যে সকল আইডিয়ার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ যে এখনও সে সকল আইডিয়া ধরিয়াই বসিয়া আছেন, এমন কোন আভাষ আমরা কোথাও দিই নাই। শুধু বলিয়াছি যে 'Cult of Nationalism' অর্থাৎ বৈদেশিক nationalism সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেটা কিছু নূতন মত নয়; "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং অন্যান্য প্রবন্ধে সেই একই কথা তিনি বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। জীবনের বিকাশ ঘটে বলিয়া মানুষের সমস্ত ভাব ও আদর্শেরই যে বদল হইয়া যায়, তার কোন প্রমাণ নাই। nationalism সম্বন্ধে রবিবাবুর মতের বদল হয় নাই, একথা বলিলে এটা বোঝায় না যে, তাঁর কোন মতেরই বদল হয় নাই, এইটাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

রবিবাবু এক সময়ে দেশকে যথেষ্ট

idealise করিয়াছিলেন, তখন তিনি দেশকে realise করেন নাই। তিনি তখন তাঁর একটা মনগড়া ভাবুকতার আব্‌হাওয়ার মধ্যে গোটা দেশটাকে স্থাপিত করিয়া দেখিতেন, তাঁর সেই কল্পনা-প্রদীপ্ত দেশের রূপটাই তাঁর কাছে দেশের যথার্থ স্বরূপ ছিল। কখনো কখনো বাস্তব সেই কল্পনার প্রতিবাদী হইলে বরং কল্পনার উত্তাপে বাস্তবটা বাষ্প হইয়া উবিয়া যাইত, তবু কল্পনার কল্পলোক অটুট থাকিত। রবিবাবুর এই অবস্থার পরিচয় তাঁর নানা প্রবন্ধে ত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেই, অ-বিক্ষিপ্ত ভাবে সংহত ভাবে যদি এ পরিচয় কোথাও পাইতে হয়, তবে তাঁর 'গোরা' চরিত্রের গোড়ার দিকটায় তাহা পাওয়া যাইবে।

অভিভাষণে, চিত্তবাবু রবিবাবুর সেই "মোহমুগ্ধ" দেশপ্রীতির অবস্থার বিস্তর উক্তির পুনরুক্তি করিয়াছেন। তিনি সাজিয়াছেন ঠিক্, কিন্তু সে সুর কোথায়? সে জোর কোথায়, সে আগুন কোথায়, সে দিব্য দৃষ্টি কোথায়, যার গুণে তখন ভাবীকে কবি পদেপদেই আবির্ভূত করিয়াছিলেন। রবিবাবু যখন "আত্মশক্তি"র মন্ত্র ঘোষণা করেন, তখন অনেকেই হাসিয়াছিল, অথচ অনতিকালের মধ্যেই যখন স্বদেশীর সময়ে সেই আত্মশক্তির মন্ত্র আমরা গ্রহণ করিলাম, তখন রবিবাবুই যে সেই মন্ত্রের প্রথম দ্রষ্টা এবং প্রথম উদ্গাতা তাহা কি দেশের সকল লোক স্মরণ করিয়াছিল? দেশের শিক্ষার ভার দেশের "স্বভাবসঙ্গত" করিয়া দেশের লোকেই গ্রহণ করিবে, একথা যখন রবিবাবু প্রচার করিয়াছিলেন এবং বোলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া এ সম্বন্ধে একটা পরীক্ষাও সুরু করিয়া দিয়াছিলেন, তখন দেশের লোকের মন ত এ প্রস্তাবের অনুকূল ছিলনা। 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্' যখন সত্যসত্যই গঠিত হইল, তখন তার আদর্শ যে বহুপূর্ব্বে রবিবাবুর দ্বারা দেশে রটিত হইয়াছিল, সে কথা কত অল্প লোকেই মনে করিতে পারিয়াছে। এই ভবিষ্যৎদৃষ্টি রবিবাবুর মধ্যে একটা বিশেষত্ব বলিয়াই তাঁর মোহমুগ্ধ দেশপ্রীতির অবস্থায়, তিনি যে-সকল বাণী বলিয়াছেন, তার সকল অসঙ্গতি, সকল কাল্পনিকতা ও অবাস্তবতা, সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও তার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা জীবনপ্রদ। ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠনের জন্য তার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

চিত্তবাবু বাংলার সেই 'জাতীয়তা' সম্বন্ধে, বাঙালী জাতির 'জাতিত্বের দাবী' সম্বন্ধে যে ভাবে এবং যেদিক্ হইতে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও প্রবল অনুভূতির সাড়া পাই। বাঙালীর জাতীয়তা যে বাঙালীর ইতিহাসেরই ফল—এ বোধটা বোধহয় বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বড় করিয়া এবং পরিষ্কার করিয়া বাঙালীর মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেন্। সুতরাং চিত্তবাবুর সমস্ত অভিভাষণের মধ্যে গোড়ার এই অংশটুকু চমৎকার ও উপভোগ্য হইয়াছে। তার পরে বাংলার ভূতকালের অবস্থার কথা এবং এখনকার কালের জন্য নানা কাজের কথা যেখানেই তিনি পাড়িয়াছেন, সেইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক বোধের অভাব এবং বাস্তব

জ্ঞানের অভাব প্রতিপদেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে 'বাংলার কথা'টি গড়িয়াছেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেটা একটা মস্ত abstraction—সেটা কলিকাতাবাসী ভাবুকের বাংলা। আসল বাংলার অবস্থা তিনি বিশেষ কিছু জানেন অথবা আসল বাংলার ব্যবস্থারও তিনি বিশেষ কিছু খবর রাখেন তাতো তাঁর লেখা পড়িয়া আদপেই মনে হয় না।

চিত্তবাবুর ধারণা যে, সেকালে আমাদের সবই ছিল—'মুক্ত আকাশ', 'শ্যামল-পল্লীবীথি', মাঠভরা ধান, পুকুরের জল যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা সেগুলো এখনও আছে। কিন্তু মানুষের 'পরস্পরের প্রতি প্রীতি' ছিল, শান্তি, আনন্দ ও সুশৃঙ্খলা ছিল, মানুষ বলিয়া মানুষের মর্য্যাদা ছিল, "মন্দিরে মন্দিরে সাধনসঙ্গীত" ছিল, আর যাত্রা কথকতা কবির গানে বাংলা সাহিত্যের এক "অতুল প্রাণ" ছিল—মুক্ত আকাশ ও শ্যামল পল্লীবীথি প্রভৃতি নৈসর্গিক তথ্যের সঙ্গে এই বাকী ক'টাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ইতিহাসকে পরিহাস করা হইবে। গ্রামের কোন্দল, দলাদলি, গালাগালি; পুরুষানুক্রমে শত্রুতাচরণ, কুৎসারটন, জমিদারে জমিদারে লড়াইয়ে স্বচ্ছন্দে প্রজাদের মস্তক ফাটন; গুরুপুরোহিতদের দুষ্ক্রিয়া, নীচ জাতদের স্পর্শদোষ ও তজ্জনিত নানারকমের মনুষ্যোচিত ব্যবহার; তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনের বিচিত্র অবৈধ যৌনসঙ্গমের ব্যবস্থা, কবির লড়াইয়ের অশ্লীলতা এবং পাঁচালীর প্রলাপ—এ গুলো বাংলার গ্রাম্যসভ্যতার যে রিয়ালিষ্টিক ছবিটা চোখের সাম্‌নে এখনো আনে তার উপর ভাবুকতার দুচার পোঁচ দিলেও তার বিশুদ্ধ রংটা কিছুতেই মরে না। ম্যালেরিয়া কিছু কম থাক্ বা পুকুরের জল অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল থাক্, দুধ, মাছ, চাল, ডাল, শাক্‌শব্‌জী এখনকার তুলনায় অনেক শস্তা থাক্, জীবনের মাহাত্ম্য ও মূল্যটা যে এখনকার চেয়ে সেকালের লোকে বেশি বুঝিত, এ বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। বাংলা গ্রাম ও বাংলা দেশের মানুষ মোটের উপর সমানই আছে, তবে গ্রামে ভদ্র পরিবার বেশি নাই বলিয়া তার জলাশয় দূষিত ও তার শ্রী-স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে এটা সত্য কথা বটে।

চিত্তবাবু মনে করেন যে আমাদের এই সমস্ত দুর্গতির একমাত্র কারণ আমরা নিজের আদর্শকে ভুলিয়া পরের আদর্শকে ঘরে তুলিয়া লইয়াছি। বিলাতী Industrialismই যত দুর্গতি যত অনর্থের মূল।

অবশ্য চিত্তবাবু এটা মানেন যে "শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব", ব্যবসাবাণিজ্য চাই। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এই যে, ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার মত তারও নাকি একটা "বিশিষ্ট" বাঙালী পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতিটা সংক্ষেপে হইতেছে, আমাদের "কুটীর-শিল্পের" পদ্ধতি। আমাদের হাতের তাঁত ছিল, তাতে মিহি কাপড় তৈরি হইত এবং অন্যান্য অনেক সূক্ষ্মশিল্পের কাজ এদেশে ছিল। কিন্তু আজ সেই সকল কুটীরশিল্প পশ্চিমের কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবেনা,

তাহা যে চিত্তবাবু 'নিশ্চিত' জানেন তাহা কবুল করিয়াছেন তবু তাঁর পণ এই যে, সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করা যাইতে পারে। কি উপায়ে? স্বদেশীর সময়ে আমরা যে উপায়কে প্রশস্ত মনে করিয়াছিলাম, সেই উপায়ে,—অর্থাৎ বয়কটের দ্বারা Industrialism বর্জ্জন করা যাইতে পারে। চিত্তবাবু বিদেশী পণ্য বয়কট করিতে বলেন নাই; তিনি তার চেয়েও বড় "অর্ডার" দিয়াছেন, একেবারেই "বিলাস বর্জ্জন" করিতে হইবে, বলিয়াছেন। "মোটা কাপড়" আমাদের "কটিতে ব্যথা" দিলেও "তাহা সহ্য করিতে হইবে," Industrialism সমস্যার এই তাঁর সহজ সমাধান। অতএব প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আর রহিল কোথায়? দেশসুদ্ধ লোক মানব-প্রকৃতিটাকে এম্নি রাতারাতি বদ্‌লাইয়া ফেলিবে, হঠাৎ বিলাস-বাসনা দূর করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে, এতটা আশা কোনদেশের মানব-গুরুরাও করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। যাক্, এই গেল একটা তাঁর বড়গোচের practical programme, অথবা ১নং নৈতিক উপদেশ। আমাদের বিবেচনায় "বাঙ্গলার কথা" নামটার বদলে "নীতিকথা" নাম দিলে তাঁর পুস্তিকাখানি সার্থকনামা হইত। কারণ নীতিকথার চোটেই সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া তাঁর বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোধ হয় বলা দরকার। চিত্তবাবু রবিবাবুর অনেক আইডিয়ার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্র্যাক্‌টিক্যাল প্রোগ্রাম তথৈব নীতি-উপদেশগুলি প্রায় তাঁর নিজস্ব। অবশ্য স্বদেশীর সময়ে শুধু রবিবাবু কেন, সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে কুটীরশিল্প উদ্ধারের দ্বারা ও বিদেশী পণ্য বয়কটের দ্বারা আমাদের ব্যবসার উন্নতি হইবে। কিন্তু এখনও এত পরীক্ষা ও অকৃতকার্য্যতার পরেও সে বিশ্বাস একা চিত্তবাবুর ছাড়া আর বোধ হয় কাহারও নাই। তার পর, লোকশিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব সম্পূর্ণ ই তাঁর নিজস্ব তাহা একটু পরেই দেখা যাইবে।

বস্তুত চিত্তবাবুর সব "কাজের কথা"-গুলিই এম্নিতর, অর্থাৎ অকাজের কথা। তিনি একস্থানে চাষার দ্বারা নানা শিল্পপণ্য প্রস্তুত করাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় জানেন না যে, সব কৃষক নিজের হাতে লাঙল ধরিতেও চায় না, মজুরের দ্বারা সে কাজ করায়। তারপর চাষী চাষের কাজ ছাড়া আর অন্য কোন শিল্পকর্ম্ম করিবেই না, কেননা কাজ-অনুসারে আমাদের দেশে জাত তৈরি হয় এবং নিজের নিজের জাত-ব্যবসায় বজায় রাখাই জাত রক্ষার প্রশস্ত উপায়।

লোকশিক্ষা সম্বন্ধে যাত্রা কথকতা, কবি-গান, ভাগবত-পাঠ, চণ্ডীপাঠাদি শিক্ষা-বিস্তারের যে সকল সাবেক ব্যবস্থা ছিল সেইগুলিই চিত্তবাবু যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। কারণ, তাঁর আর একটি অপূর্ব্ব বিশ্বাস এই যে মনুষ্যত্বে আমাদের চাষারা কোন রকমেই আমাদের চেয়ে "কম নয়"। ইংরাজী শিক্ষাটা তাঁর মতে দেশে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, সুতরাং চাষাদের পক্ষে সে শিক্ষার আবশ্য-

কতা নাই। তার পর, তারা ত মানুষ আছেই, শুধু ক খ গ জানেনা বলিয়া "দুই একটা নৈশ বিদ্যালয়" হইলেই "আমাদের চাষাদের যে শিক্ষা আবশ্যক সেই শিক্ষার সহজেই বিস্তার হইবে"। আর যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, কবির গানের শিক্ষাপ্রণালী ত পড়িয়াই রহিয়াছে। অথচ গ্রামেগ্রামে থিয়েটার-পার্টির প্রভাবে যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি যে প্রায় উঠিয়া গেছে সে খবরটা চিত্তবাবু বোধ হয় ভাল করিয়া রাখেন না। এবং নৈশ বিদ্যালয়ের দ্বারা শিক্ষাবিস্তার যে কেমনতর হয়, তারও কোন অভিজ্ঞতা বোধ হয় তাঁর নাই। এ সব শিক্ষার ব্যবস্থা ফুটা কলসীতে জলঢালার মত, কারণ শিক্ষালাভের কিছুমাত্র আগ্রহ চাষীদের মধ্যে নাই। compulsory free education ভিন্ন চাষাদের শিক্ষা হইতেই পারে না।

স্বর্গীয় গোখ্‌লে মহোদয়ের সেই Compulsory Primary Educationএর প্রস্তাবের পর লোকশিক্ষা সম্বন্ধে এমনতর অদ্ভুত অসঙ্গত কথা সাহস করিয়া প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে কেহ বলিতে পারেন, এটা আমাদের কাছে অদ্ভুততর ঠেকে। ইংরাজী শিক্ষার যতই কুফল থাকুক, তাহা যে বাঙালীর নব জাতীয়তাকে উদ্বোধিত করিয়াছে, বাঙালীকে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় সাধন করাইয়াছে এবং তাহার মনের কৌলিক, দৈশিক ছোট বড় নানা ক্ষুদ্র সংস্কারের জাল ছেদন করিয়া বিশ্বমনের সঙ্গে ভাবের স্বাধীন আদান প্রদানে তাহাকে রত রাখিয়াছে, এ সব কথা স্বদেশিকতার মোহে পড়িয়া অস্বীকার করা যাইতে পারে তাহা ত জানিতাম না। চিত্তবাবু যে বাংলার কথা লিখিয়াছেন, একশো বছর পূর্ব্বে বাংলার 'মুক্ত আকাশের' তলায় বসিয়া পল্লীবাসী কোন সেকেলে বাঙালী কি এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন, না এ সব কথা ভাবিতে পারিতেন? অতএব সেই ইংরাজী শিক্ষার ষোল আনা ফলটুকু আমরা চিরকাল ভোগ করিতে থাকিব,—কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তুলিয়া দিতে হইবে এ কথা চিত্তবাবু বলেন নাই, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির গান পাঁচালী ইত্যাদি পড়ানো হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যে সে ফল হইতে চাষারা যেমন বঞ্চিত আছে তেমনই বঞ্চিত থাকিবে। অতএব তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির কোন বিকাশ না ঘটুক্, তাদের মূঢ় সংস্কার কোনদিন না ঘুচুক্, কালের সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে তারা সকল রকমেই অক্ষম হোক্ এবং তাদের সেই অক্ষমতা ও জড়তার প্রকাণ্ড বিপুল টানে তারা সমস্ত জাতিটাকে শুধু ক্রমাগত নীচের দিকে টানিতে থাকুক্। প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের সঙ্গে দেশের এই অশিক্ষিত সাধারণের যোগ নাই, ইহা লইয়া সভাপতি বিলাপ করিতে বাকী রাখিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,—"আমাদের কোন্ কমিটীতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্যশ্রেণীভুক্ত?" যারা সামান্য একটা ওকালতনামা পড়াইবার জন্য এর তার খোসামোদ করিয়া মরে, নিরক্ষরতার জন্য দুনিয়ার কিছুই যারা বোঝেনা, তারা প্রভিন্‌শ্যাল-কন্‌ফারেন্স-কমিটির সভ্য-শ্রেণী-ভুক্ত নয় বলিয়া এদিকে সভাপতি অশ্রুপাত

করিতেছেন, অথচ ওদিকে তাদের ইংরাজী শিক্ষার দরকার নাই এবং মোটের উপর কোন শিক্ষারই দরকার নাই এটাও তিনি প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত। আশ্চর্য্য!

উচ্চশিক্ষিত আমাদের সঙ্গে আর অশিক্ষিত চাষাদের এই অসামঞ্জস্য যে তাদের শিক্ষার অভাবের দরুণ, এ কথাটা চিত্তবাবু একবার ভাবিয়া দেখিলেন না ইহাই আশ্চর্য্য! দু একটা নৈশ বিদ্যালয়ের দ্বারাই এই প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যটা দূর হইয়া যাইবে? কোন দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন অসম্ভব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়াছে কি?

এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য চিত্তবাবুর দ্বিতীয় নম্বরের নৈতিক উপদেশ এই যে "উচ্চশিক্ষার অভিমান," "অর্থের অভিমান "বর্ণের অভিমান", এ সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। এ জায়গায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা তাঁর এই অপূর্ব্ব নীতি-উপদেশ সত্ত্বেও আর একটি চমৎকার উপভোগ্য প্রসঙ্গ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণ যখন নাই এবং "ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের মধ্যে কার্য্যগত কোন পার্থক্য" যখন তিনি দেখিতে পান না, তখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অস্তিত্বের তাৎপর্য্যটা বুঝা যায় না। কিন্তু এই কথা বলিয়াই তিনি "সামাজিক প্রশ্ন তুলিতে চান্ না" বলিয়া দিব্য পাশ কাটাইয়া গেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অর্থাৎ জাতিভেদ ভাঙিতেই হইবে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াও সেই সঙ্গে সঙ্গেই "তাহা ভাল কি মন্দ" "তার কোন কথাই এ ক্ষেত্রে উঠিতে পারে না," বলিয়া তিনি নিজের মুখের কথাটাকেই নিজে চাপা দিয়াছেন। তাঁর ধারণায় আমাদের চাষারা তো আমাদের চেয়ে মনুষ্যত্বে বেশি অগ্রসর,—কিন্তু বর্ণের সংস্কারটা তাদের মধ্যে যত প্রবল, আচার বিচারের সহস্র বাধায় তারা যতটা ব্যাহত, এতটা বোধ হয় আমরা নই। কেননা, শিক্ষার জন্য আমাদের মনের অনেকটা প্রসার হইয়াছে,নিম্ন শ্রেণীর লোকের তাহা মোটেই হয় নাই। যাত্রা কথকতা, কবির গান, পাঁচালী, হরিসংকীর্ত্তন সত্ত্বেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই অন্ধ সংস্কার, ব্রাহ্মণের এই অর্থহীন আধিপত্য, এদেশ হইতে একটুও শিথিল হইল না কেন, চিত্তবাবু চিন্তা করিয়া দেখিলে পারেন।

যাহাই হৌক্, "মনকে চোখ ঠার" না দিয়া, "ভাবের ঘরে চুরি" না করিয়া এবং ধর্ম্ম-উপদেষ্টা চিত্তবাবুর নীতি-উপদেশগুলি সুবোধ বালকের মত সম্পূর্ণ পালন করিয়াও আমরা তাঁর বাংলার কথার মধ্যে বাংলার কথাই সবচেয়ে অল্প পাইয়াছি। আসল বাংলার কথা,—বাংলার আসল ইতিহাস, সমাজ ধর্ম্ম সাহিত্য, অনুষ্ঠান-উৎসব, কৃষিবাণিজ্য, বাংলার ভাব ও অভাবের কথা বাঙালীর জন্য এখনও কেহ তৈরি করেন নাই এ কথাটা লজ্জার সহিত আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে।

নবীন সাহিত্য সম্বন্ধে অভিযোগ

"ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে"র বৈশাখ সংখ্যায় "সাহিত্যে নবীন পন্থা" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত আক্ষেপ করিয়াছেন যে নবীনপন্থী সাহিত্যিকেরা নায়ক-নায়িকার প্রেম লইয়া বড্ড বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন, তাঁরা ভুলিয়া যান যে "রমণী কেবল নায়িকা নয়, গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গিনী", এবং "নারীত্বের পরিসমাপ্তি পত্নীত্বে নয় মাতৃত্বে"।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লেখকদের একটা মহৎ দোষ দেখিতে পাই এই যে, সব সময় তাঁদের চিন্তা একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে না, সুতরাং কোন চিন্তারই একটা সুবিহিত ক্রম পাওয়া যায় না। পাঠকদের কাছে তাঁরা তাঁদের যে সব ভাবনা নিবেদন করেন, তাহা পড়িয়া অনেক সময়ে তাঁদের সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হয়। "সম্মিলনের" লেখকের বিষয় হইতেছে, সাহিত্যের নবীন পন্থা—আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, নবীন সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্যটা কেন? সুতরাং পুরুষ ও নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার, নারীর শরীর ও মনের গঠন, সেই গঠন অনুসারে সমাজে তাহার কিরূপ স্থান হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপ স্থান হওয়া উচিত, ইত্যাদি স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ-ঘটিত সামাজিক প্রশ্ন তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়। অবশ্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে সমাজের কোন প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িলেই যে রসভঙ্গ হয়, এমন কথা বলি না; কিন্তু সাহিত্যের সীমার মধ্যে সাহিত্যের আলোচনা যদি বদ্ধ না থাকে, সাহিত্যের আলোচনা যদি সামাজিক আলোচনা হইয়া দাঁড়ায়, তবে তখন লেখককে এই কথাটুকু স্মরণ করানো দরকার হয় যে, সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান কোথায়, সমাজতত্ত্বের দিক্ হইতে সেটা ভবিষ্যতে আলোচনা করিলেই চলিবে, উপস্থিত সাহিত্যের নবীন পন্থা সম্বন্ধে সাহিত্যের দিক্ হইতে তাঁর কি বলিবার আছে, তাহাই শোনা যাক্।

সমাজে রমণীর sphere বা কর্ম্মক্ষেত্র কতখানি সেটা ভিন্ন আলোচনা, রমণীর পত্নীত্বটা বড় না মাতৃত্বটা বড় তাও একটা সামাজিক প্রশ্নের বিষয়। তবু লেখক যখন সে সম্বন্ধেই মাথা ঘামাইয়াছেন তখন এইমাত্র বলা দরকার যে, সে সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা পূর্ব্বে পূর্ব্বে হইয়া গেছে এবং এখনও যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। মিল, হক্সলি, হর্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ; যাঁরা sex-psychology লিখিয়াছেন এমন জার্ম্মান ও ইংরেজ বিস্তর লেখক; Sex-Evolution সম্বন্ধে বায়লজির দিক্ হইতে ডারউইন, ওয়াইস্‌ম্যান, ক্রুপট্‌কিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক; স্ত্রীজাতির অর্থনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে যাঁরা খবরদারি করিতেছেন তাঁরা; স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে ইউরোপ আমেরিকায় শিক্ষাপ্রণালী লইয়া যাঁরা পরীক্ষা করিতেছেন—এঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে এই বড় প্রশ্নটার সদুত্তরের চেষ্টা করিতেছেন। মাসিক পত্রের একটা ছোট প্রবন্ধের মধ্যে এতদিনব্যাপী ও এত বিচিত্র আলোচনার ফলগুলিকে ব্যক্ত করিতে যাওয়া নিষ্ফল চেষ্টা হইবে। অতএব সরাসরি এ সব আলোচনার নাম-গন্ধ না করিয়া রমণীর মাতৃত্বই শ্রেষ্ঠ এবং মাতৃত্বই তাহার পূর্ণ অধিকার এমন সিদ্ধান্ত অজ্ঞ পাঠকদের মাথার উপর বিজ্ঞভাবে বর্ষণ করাটা পাঠকদের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ দুই রকমেরই বর্ষণ হইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি এই বড় বিষয়টির

আলোচনায় প্রথমে প্রবৃত্ত হন্, যেমন ওগস্ত কঁত বা লরা হ্যান্‌সন্ (স্ত্রীমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম স্ত্রীমনস্তত্ত্ববিদ্) বা রস্কো, অথবা স্পেন্‌সার, ওয়েষ্টারমার্ক প্রভৃতি—এঁদের কারো নামোল্লেখ পর্য্যন্ত লেখক করিলেন না এবং এ বিষয়ে আধুনিক যাঁরা লেখক তাঁদেরও নামোল্লেখ করিলেন না—কেবল Treitschke বলিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির স্বাধীন অধিকারের আইডিয়া "অশুভকর," তাঁকেই এ সম্বন্ধে লেখক একমাত্র "অথরিটী" খাড়া করিয়া বসিলেন। এ হেন অসম্পূর্ণ আলোচনার কোন মূল্য দাঁড়ায় কি?

স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিচার বিষয়ে এই সব আলোচনার ধাক্কা যে সাহিত্যে আসিয়া পৌঁছিতেছে না তাহা বলিনা। আধুনিক সাহিত্যে sex-problem অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধঘটিত সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে এ সকল সমস্যা যে-ভাবে দেখা দেয়, সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইহাদের যে রকমের সমাধান হয়, তাহার দ্বারাই যে সমাজ চালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন কথা মনে করিবার কোনই হেতু নাই। ইব্‌সেনের Ghosts অথবা The Pillars of Society, ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গের Father অথবা The countess Julie, হাপ্‌ট্‌ম্যানের Rose Berntd, বার্ণাডশয়ের The Devil's Disciple, ব্রিয়ের The Maternity, ইত্যাদি সামাজিক নাট্য পড়িলে ইউরোপীয় সমাজের যে বীভৎস চেহারাটা আমাদের চোখের সাম্‌নে উপস্থিত হয়, বাস্তবিকই ইউরোপীয় সমাজটা কি তাই? আর বাস্তবিকই কি ইব্‌সেন্ প্রভৃতি সমাজের এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও কদর্য্য দুর্নীতিগুলাকেই, "সম্মিলনের" লেখকের ভাষায় বলিতে গেলে "চতুর্ব্বর্গ লাভের একমাত্র উপায়" বলিয়া স্থির করিয়াছেন? আমার মনে হয়, রস-সাহিত্যের ঘাড়ের উপর কোন রকমের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের বোঝা চাপানোটাই ঠিক নয়। প্রথমতঃ, সামাজিক নাট্য সমাজের ফোটো-গ্রাফ নয়, কারণ কোন আর্টই জীবনের ফোটো-গ্রাফ নয়। আর্টের রিয়ালিজম্ বা বস্তুতন্ত্রতা সমাজের বাস্তবতার সামিল নয়। আধুনিক সমাজের কতগুলো বিশেষ সমস্যা, কতগুলো বিশেষ অবস্থা, মানব-চরিত্রের কতগুলো অদ্ভুত প্রচ্ছন্ন দিক্—যেসব দিক্ সামাজিক সংস্কারের আবরণে দিব্য আবৃত থাকে ও সচরাচর গোচর হয় না—সেই সব নূতন মালমসলা আধুনিক সাহিত্যিকদের কল্পনাকে নূতন নূতন আর্ট-রূপ সৃষ্টি করিবার দিকে উত্তেজিত করিতেছে এবং তারি ফলে এই সামাজিক নাট্যগুলি তৈরি হইতেছে। সুতরাং এ সকলও সম্পূর্ণরূপেই কল্পনার সৃষ্টি। তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, সব বিশুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির মতই এ সকল নাট্যও কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বহন করিতেছেনা। তা যদি করিত তবে ইব্‌সেন্ বা হাপ্‌ট্‌ম্যান বা ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ কিম্বা বার্নাডশ বা শেকফ্ বা ব্রিয়ে প্রত্যেকেই সম্মিলনের লেখকের মত এক একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া দিতেন। আর তাই যদি তাঁরা করিতেন, তবে নাটক নভেল না লিখিয়া sex-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিম্বা সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের গবেষণা করাই উচিত হইত। কেননা, উদ্দেশ্যমূলক আর্ট কোন কালেই

আর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদ্দেশ্যমূলক রচনা আর্ট হইলে, ধর্ম্ম ও নীতিউপদেষ্টা এবং ইস্কুলমাষ্টারেরা সবাই আর্টিষ্ট হইতেন সন্দেহ নাই। এবং রসসাহিত্য যে তাহা হইলে আর মাথা তুলিতে পারিত না সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। যাক্ সে কথা। ইব্‌সেন্ প্রভৃতির নাট্যকে যে বিশুদ্ধ আর্ট হিসাবে দেখিতে হইবে তার আরও কারণ এই যে, তাঁরা সবাই সমাজের সমস্যাকে একই রকম করিয়া দেখান্ নাই, মানব-চরিত্রের প্রচ্ছন্ন দিকগুলিও একই ভাবে উদ্ঘাটিত করেন নাই। তাঁদের প্রত্যেকের সৃষ্টিই বিচিত্র, কেননা তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বই বিশিষ্ট। যেমন ধরুন সমাজের চারিপাশের সংস্কার মানুষের স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে যে ভাবে চাপিয়া-চুপিয়া রাখে, মানুষ সেই সব বাধাগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে কি অবস্থায় কেমন করিয়া বাধ্য হয়—বোধ হয় এটা ইব্‌সেন্ যতটা দেখাইয়াছেন, মানুষের অন্তরের প্রচ্ছন্ন গ্লানি-গুলিকে তিনি ততটা ঘাঁটাইয়া তোলেন নাই। কিন্তু ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ, হাপ্‌ট্‌ম্যানের মধ্যে সেই গ্লানি, সেই পাঁকগুলিকে ঘাঁটাইয়া তুলিবার চেষ্টা বেশি দেখিতে পাই। আবার ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গের মধ্যে সন্তান-বাৎসল্য যতটা উজ্জ্বল, এমন বোধ হয় আর কারো মধ্যে নয়। তার দৃষ্টান্ত তাঁর The Connecting Link নাট্যটি। সেখানে—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দূষিত চরিত্র, তবু সন্তান উভয়ের মধ্যে বন্ধন হইয়াছে। এমনি করিয়া দেখা যাইবে যে তাঁরা সবাই নূতন নূতন দিক্ হইতে সৃজন করিয়াছেন। তাঁরা কেহই কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। তাঁরা কোন উদ্দেশ্য খাড়া করেন নাই। অবশ্য তাঁদের এই সব সৃষ্টি মানুষের মনে মনে নব নব চেতনা সঞ্চারিত করিতে করিতে সমাজকেও প্রবল ভাবে আঘাত করিবে সন্দেহ নাই। সাহিত্য মাত্রেই তাহা করিয়া থাকে। কিন্তু সমাজকে মুখ্যভাবে চিত্রিত করাও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, সমাজ-সমস্যার একটা স্থির সমাধান খাড়া করাও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের রচনা সাহিত্যই—সমাজ-বিজ্ঞানও নয় অথবা সমাজ-নীতিও নয়।

লেখক ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন কিরূপে এবং কেন আদিরসই আজ পর্য্যন্ত "সাহিত্যের সাড়ে পনেরো আনা দখল করিয়া বসিয়াছে।" তাঁর মনের ভাব এই যে, মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে পৃথিবীর কাব্য উপন্যাসের যতটা ব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল তারা ততটা ব্যস্ত হয় নাই এবং আজও পর্য্যন্ত হইতেছে না, এটা বড়ই খেদের কথা। কেননা, মাতৃস্নেহ নায়িকার প্রেমের চেয়ে ঢের বড় জিনিস। সমাজের দিক্ হইতে মাতৃস্নেহের মূল্য নায়ক-নায়িকার স্বাধীন প্রেমের মূল্যের চেয়ে বেশি হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের কাছে মাতৃস্নেহের মূল্য তত বেশি হয় নাই। তার কারণ মাতৃস্নেহের যেটা রস, তার মধ্যে নব নব উন্মেষ নাই, সুতরাং নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, যার আর এক নাম প্রতিভা, সে রস লইয়া ততটা কারবার করিতে রাজি হয় নাই। যে রসে নব নব উন্মেষ, নব নব বিস্ময়, তাহার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা থাকে—সেইজন্যই তাহা সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়। কারণ, সাহিত্যের প্রধান কাজই অনির্ব্বচনীয়কে বচন দেওয়া।

কিন্তু আদিরস বলিতে আমরা যা বুঝি, সাহিত্যে যুগলপ্রেমের যে বিচিত্র রস এ পর্য্যন্ত

সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সেই 'আদিরসের' কোটায় পড়ে না। কারণ, যুগল প্রেমের রস বলিতে শুধুই কামপ্রবৃত্তি বা ভোগলালসা বুঝায় না। কোন বড় প্রেমের কবি,কোন বড় ঔপন্যাসিক একান্ততঃ ভোগ-লালসার কবি অথবা চিত্রী নহেন। আধুনিক কালের এমন কোন "বড়" উপন্যাসের নাম করিতে পারি না, যেখানে ভোগলালসার চিত্র ভোগলালসাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রেমের শুভ্র নির্ম্মলতায় উত্তীর্ণ হয় নাই। "ঘরে বাইরে"র পরিণামটা খারাপ এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীও অসতী, ঘরে-বাইরের নায়িকা বিমলাও অসতী; কারণ তারা পতি থাকিতেও অন্য পুরুষকে মনে মনে কামনা করিয়াছে। কিন্তু মানুষের এমন কোন পাপ হইতেই পারে না, যে পাপ হইতে তাহার উদ্ধার নাই। সমাজে আমরা সে উদ্ধারের চিত্র সবসময়ে দেখিতে পাইনা বটে, কেননা সমাজের সংস্কার এবং শাসন এ সম্বন্ধে নিদারুণ। কিন্তু সাহিত্যে দেখিতে পাই। সেখানে Tolstoyএর Resurrectionএর বারাঙ্গনা মাস্লোভারও উদ্ধার হয়; সেখানে ডষ্টয়ভ্স্কির Crime and Punishmentএর দেহবিক্রয়কারিণী সোনিয়ারও সতীমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেই পরিণামটাই সাহিত্যে বিশেষ করিয়া দেখিবার বিষয়, মাঝখানের অভিব্যক্তিটা নয়। এবং বাংলাদেশের এই লেখকটির ন্যায় এই শ্রেণীর অন্যান্য লেখকেরও মনে রাখা উচিত যে ভোগের জীবন পার হইয়া ভোগ-ক্ষুব্ধ জীবনে উত্তীর্ণ না হইলে, এই পরিণামের চিত্র কোন সাহিত্য-স্রষ্টাই আঁকিতে সমর্থ হন্ না। শেক্স্পীয়র মাঝ-বয়সে তাঁর ট্রাজেডিগুলি লিখিয়াছিলেন; শেষ বয়সে লেখেন সেই ট্রাজি-কমেডিগুলি যাহাতে মাঝখানের জাঁকালো অভিব্যক্তির চেয়ে পরিণামের আভাসই বেশি, কুরুক্ষেত্র পর্ব্বের পরেই শান্তিপর্ব্বের সমাপ্তির কথা আসিয়াছে। গ্যয়টে বেশি বয়সেই ফাউষ্টের দ্বিতীয় অংশ শেষ করিয়াছিলেন, "Elective Affinities" নামক sex-problem সম্বন্ধীয় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। টল্স্টয় তাঁর উচ্ছৃঙ্খল যৌবন-বয়সে নয়—প্রবীণ বয়সেই অ্যানাক্যারেনিন্ ও রিসারেক্শন্ লিখিয়াছিলেন। সুতরাং "রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অঙ্কে 'ঘরে বাইরে' লিখিতে পারিয়াছেন; আজ যখন তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার ঋষিত্ব প্রতিপাদনের এবং তাঁহার কাব্যের সহিত মন্ত্র-ব্রাহ্মণের সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—সেই সময়েও রবীন্দ্রের লেখনী একটা অনেকেরই মতে নিন্দিত প্রেমলীলা প্রসব করিতে পারিয়াছে"—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই নাই। যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ "বৌঠাকুরাণীর হাট" লিখিয়াছিলেন সে বয়সে "চোখের বালি" বা "ঘরে বাইরে" লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। নভেল পরিণত বয়সেই পাকা হয়। পরিণত বয়স হইলেই সাহিত্য-স্রষ্টা "মোহমুদ্গর" বা "বৈরাগ্যশতক" লিখিতে থাকিবেন, ইহা যাঁরা সত্যসত্যই মনে ভাবেন, তাঁরা আর যাই করুন সাহিত্য-সমালোচনা না করিলেই ভাল হয়।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.



ব্যঙ্গ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত

আরতী

৪১শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৪ [৪র্থ সংখ্যা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমালোচক

চৈত্র এবং বৈশাখ সংখ্যার "নারায়ণে" "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক এক ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখক যেন স্বাধীনভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিত ও তৎকালীন ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পাঠক-দিগকে এরূপ বুঝিতে দিয়াছেন। অথচ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত সুবিস্তৃত গ্রন্থ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিতই যে "নারায়ণে"র লেখকের একমাত্র অবলম্বন ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না এবং উক্ত জীবন-চরিত-পাঠক মাত্রেরই নিকট ইহা ধরা পড়িতে বিলম্ব মাত্রও করে না। কিন্তু লেখক নানাস্থানেই অজিতবাবুর সেই জীবনচরিতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, অথচ অজিতবাবুর বা তাঁহার লিখিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই—"প্রতিবাদকারী" বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধহয় যে অজিতবাবু তাঁহার পূর্ব্বে লিখিত স্বাধীন গবেষণার প্রতিবাদ করিয়াছেন পরে, নহিলে তাঁহাকে "প্রতিবাদকারী" নাম দিবার সার্থকতা কি? কে প্রতিবাদকারী, কাহার রচনার প্রতি-বাদ করা হইতেছে, ইহা পাঠকবর্গকে জানিতে দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। কারণ, অধিকাংশ পাঠকই হয়ত অজিত বাবুর গ্রন্থের সহিত পরিচিত নহেন, কেহ কেহ গ্রন্থের নামমাত্র শ্রুত আছেন, কাহারও কাহারও তাহাও না জানিবার সম্ভাবনা। এরূপ ভাবে প্রতিবাদের কারণ কি? পাছে অজিতবাবুর গ্রন্থের সহিত লেখকের প্রতিবাদ কেহ মিলাইয়া পাঠ করেন এবং তাহা হইলে লেখক যে ঐ গ্রন্থ হইতে তথ্য ও তারিখ প্রভৃতি যাব-তীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ধরা পড়ে, এইজন্য কি লেখক গ্রন্থকর্ত্তার নাম করিতে বিরত হইয়াছেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি—স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে একজন অসাধারণ ঈশ্বর-নিষ্ঠ সাধক বলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়া-ছেন। হিন্দুসমাজ কি ব্রাহ্মসমাজ, সকল

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

সমাজের ব্যক্তিরাই তাঁহার মহৎ চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার, স্বদেশ-হিতৈষা ও ধর্ম্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। এরূপ বঙ্গবাসী অল্পই আছেন যিনি তদীয় "আত্মজীবনী" পাঠ করিয়া মুগ্ধ ও উপকৃত হন্ নাই। সেই মহাত্মা সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া যে সকল অভদ্র ও অসংযত ভাষা 'নারায়ণে'র লেখক প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিলাম, তাহাতে আমরা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি এবং লেখকের বিকৃত রুচির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এরূপ রচনা যে 'নারায়ণের' ন্যায় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে স্থান পাইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি এক স্থানে লিখিতেছেন—"তাঁহার শাস্ত্রের দোহাই ও যুক্তির বড়াইয়ের উত্তরে" ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথকে একস্থানে বলিয়াছেন—"অজ্ঞ অনধিকারী"—আর একস্থানে লিখিতেছেন, "তিনি সমস্ত সংস্কার যুগ ভরিয়া এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত 'অচলায়তনের' মত পড়িয়া থাকেন।" অথচ যে সকল কারণে এই সকল অভিযোগ, সে সকল কারণ সম্পূর্ণরূপেই লেখকের অনুমান-প্রসূত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষভাবপ্রসূত।

বৈশাখের "নারায়ণে" লেখক মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, রামমোহন রায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি "অবিচার" করিয়াছেন, বৈষ্ণব "তত্ত্ব বিচারের সম্পর্কেও তিনি পাণ্ডিত্যের অভাবই দেখাইয়াছেন" এবং তিনি "বৈষ্ণব সাধনায় অনধিকারী ছিলেন"। এগুলি উক্তিমাত্র, ইহাদের সমর্থনে লেখক কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। সুতরাং রামমোহন রায়ের "পাণ্ডিত্যের অভাব" দেখাইবার মত সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লেখকের নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এত বড় স্পর্দ্ধার উক্তি করিতে আধুনিক কালের অনেক বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও ইতস্ততঃ করিতেন সন্দেহ নাই। তারপর কোন্ ধর্ম্মসাধনায় রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ অধিকারী বা অনধিকারী ছিলেন তাহাও নির্দ্দেশ করিতে ইনিই সুযোগ্যতম ব্যক্তি, কারণ রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের অপেক্ষাও অধ্যাত্ম সাধনায় কোন ব্যক্তি অধিক অগ্রসর না হইলে এরূপ মত প্রকাশ করিতে কখনই সমর্থ হন্ না। এই সকল বালসুলভ অথচ জ্যাঠামিপূর্ণ রচনা প্রকাশ করিতে যে লেখকের লজ্জাবোধ হইবার কিছুমাত্র কারণই নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যাঁহারা ছাপেন বা যাঁহারা পড়েন তাঁহাদের সঙ্গতি-অসঙ্গতি-বোধ নিশ্চয়ই থাকার কথা। তাঁহারা কি না পাঠ করিয়াই প্রবন্ধ ছাপেন?

মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু আলোচনা এ দেশে হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। সুতরাং মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে বলিবার অনেক কথাই থাকিতে পারে। কিন্তু যে সকল সাধক মূর্ত্তিপূজাকে মানেন নাই তাঁহাদিগকে সে জন্য অশ্রদ্ধাপূর্ণ বা ব্যঙ্গপূর্ণ বিশেষণে বিশিষ্ট করিবার তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজার বিপক্ষে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কিংবা তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম

সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে বহুবহু সাধক-সম্প্রদায়ের প্রতিবাদোক্তি আছে। ভারতবর্ষ তাঁহাদিগকে অস্বীকার করেন নাই। নানকপন্থী কবীরপন্থী দাদূপন্থী প্রভৃতি 'পন্থা'গুলি এদেশে তাহা হইলে স্থান পাইতেই পারিত না। কবীর বলিয়াছেন—

"প্রতিমা সকল তো জড়হৈ
বোলে নহিঁ, বোলায় দেখা।
পুরাণ কোরাণ সব বাত হৈ
য়া ঘটকা পরদা খোল দেখা।"

অর্থাৎ প্রতিমাগুলি সব জড় পদার্থ, কোন কথা বলে না—আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি। এবং পুরাণ কোরাণ কেবল কথা—পর্দ্দা তুলিয়া আমি তাহা দেখিয়াছি। অথচ সেই কবীরকে সাধক বলিতে ভারতবর্ষের কিছু মাত্র দ্বিধা হয় নাই। কেহ তো নারায়ণের লেখকের মত এ প্রশ্ন করে নাই, "হিন্দুর মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করিবার কি অধিকার তাঁর ছিল, তাহা আমরা জানিনা"। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কি পরিমাণ ছিল, তাহাও ওজন করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা কেহ অনুভব করে নাই। মূর্ত্তিপূজা বা যে কোন পূজাবিধিকে অস্বীকার বা স্বীকার করিবার অধিকার অধ্যাত্ম সাধকেরই আছে, নানা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের নাই—ইহা ভারতবর্ষের লোক বিলক্ষণ অবগত আছে। কিন্তু কোন সাধকের সাধনা সম্বন্ধে বাচালের মত মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকারটা কোন্ শ্রেণীর অধিকার?

তৎপরে লেখক Vedantic Doctrines Vindicated নামক ডফের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তর্কবিতর্কের প্রসঙ্গ অজিতবাবুর গ্রন্থ হইতে কিছুমাত্র স্বীকার না করিয়া সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার পূর্ব্বক গ্রন্থকর্ত্তাকে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, অজিত বাবুর "গরজ বড় বালাই",—সেই কারণে তিনি Vedantic Doctrines Vindicated প্রবন্ধমালার আসল লেখক দেবেন্দ্রনাথকেই স্থির করিয়াছেন। অজিত বাবু বলেন যে, খৃষ্টান পাদ্রীদের সহিত তর্কবিতর্কের প্রবন্ধগুলি দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখর দেব মহাশয়ের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় লিখাইয়াছিলেন, কারণ দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজী লিখিতেন না। নারায়ণের লেখক বলেন তাহার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না, কেননা "দেবেন্দ্রনাথই রাজনারায়ণ বাবুকে দিয়া" লিওনার্ড সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের "মালমসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই ইতিহাসগ্রন্থ লেখাইবার "অদৃশ্য কারণ" হইয়াছিলেন।" সুতরাং লিওনার্ড দেবেন্দ্রনাথকে ঐ গ্রন্থের রচয়িতা বলেন নাই কেন?—দেবেন্দ্রনাথ লিওনার্ড-লিখিত ইতিহাসের "অদৃশ্য কারণ" ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার হেতুও লেখক সুস্পষ্টরূপেই জানাইতে লজ্জাবোধ করেন নাই। নিঃসন্দেহ শোভনতা, সঙ্কোচ প্রভৃতি জিনিসকে তিনি নিতান্তই বাহুল্য বোধ করেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"লিওনার্ড সাহেবের এই ইতিহাসগ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ—কুচবিহার বিবাহ প্রভৃতিতে কৈশবদিগকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছে তাহা লিওনার্ড সাহেব সম্ভবতঃ নিজের বিবেক বুদ্ধি দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া করিয়া থাকিলেও এই গ্রন্থ লেখায় যে দেবেন্দ্রনাথের কোন যোগ

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আছে,—নানাদিক্ বুজিয়া সুজিয়া হয়ত ইচ্ছা করিয়াই দেবেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে নিজের নাম জাহির করিতে চান্ নাই।" ইহার চেয়ে ইংরাজীতে যাহাকে বলে mean insinuation, আর কি হইতে পারে তাহা জানি না। লিওনার্ড সাহেবের ইতিহাসে তিনি রাজনারায়ণ বাবুর নিকট তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছিলেন ইহা ভূমিকায় লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতামতের জন্য রাজনারায়ণ বাবু বা অপর কেহই দায়ী হইতে পারেন না। তারপর দেবেন্দ্রনাথের ইহাতে কিছুমাত্রই হাত ছিলনা এবং লিওনার্ডও তাহা কোথাও বলেন নাই,—সুতরাং তাঁহাকে 'অদৃশ্য কারণ' বলিয়া স্থির করা লেখকের পক্ষে একেবারে "যুক্তির" চূড়ান্তই হইয়াছে বটে। একজন ধর্ম্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ নীচতার আরোপ করিতে লেখকের কিছু মাত্র দ্বিধা হইল না। এবং ইহাকেও তিনি ইতিহাস বলিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে জাহির করিতেছেন! কি আস্পর্দ্ধা!

তারপর লিওনার্ড সাহেব যে সময়ে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার পক্ষে Vedantic Doctrinesএর ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের নাম জানিবার সম্ভাবনামাত্র ছিল না। কারণ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই। এমনকি রাজনারায়ণের নিকট হইতেও অনেক জ্ঞাতব্য ঘটনা যথাযথরূপে আদায় করিতেও পারেন নাই। লিওনার্ডের ইতিহাসে জ্ঞাতব্য কথা অল্পই আছে। তাই মনে হয় যে মহর্ষির শেষবয়সে তাঁহার 'আত্মজীবনী' বাহির না হইলে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি সম্বন্ধেই বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞ থাকিত। তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কথা অবগত ছিলেন না। আত্মজীবনী বাহির না হইলে তিনি যে তত্ত্ব-বোধিনী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করিবার উপায় ছিল না। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতনা, তিনিই যে প্রথম ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন বা বঙ্গদেশে লুপ্ত বেদশাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যাইত না। তথাপি আত্মজীবনীতেও তিনি নিজের কৃতকীর্ত্তির কথা অল্পই বলিয়াছেন, নিজের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথাই অধিক বলিয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং লিওনার্ড সাহেব যে সময়ে ইতিহাস লেখেন সে সময়ে এ সকল কথা জানিবার সম্ভাবনা ছিলনা বলিয়াই দেবেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি ও কাল সম্বন্ধে তাঁহার ইতিহাসের তারিখ ও তথ্য প্রায় আগাগোড়াই ভুল। লিওনার্ড সাহেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইলে এরূপ ভুল হইত না। রাজনারায়ণ বাবুর নিকট হইতেও তিনি যে যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছেন তাহা মনে হয় না—কারণ রাজনারায়ণের "আত্মচরিতে" যে সকল তথ্য আছে, তাহা লিওনার্ডের গ্রন্থে নাই। এই সকল কারণে ঐ ইতিহাসকে আজ আর ইতিহাস বলিয়া কেহই স্বীকার করেনা,—অবশ্য নারায়ণের লেখক ছাড়া! পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে

দুএকটা ভুল থাকিলেও উহাই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র খাঁটি ইতিহাস। কারণ, ঐ ইতিহাসের বহুতথ্য তিনি মহর্ষি মহাশয়ের মুখাৎ শ্রবণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন, সুতরাং উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য। যথা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের তন্ত্রবিধি অনুসারে ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা-বিধি কি ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা তিনি মহর্ষির মুখে না শুনিলে ইহা কেহই জানিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি যখন Vedantic Doctrines Vindicated মহর্ষির রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন, তখন তাহাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হইবে। তবে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে এই যে, তিনি ঐ ইংরাজী রচনা রাজনারায়ণ বাবুর দ্বারা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছেন। সে ভ্রমের কারণও এই যে, রাজনারায়ণবাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিবার পরে হইতে যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনিই ইংরাজীতে লেখ্য দেবেন্দ্রনাথের সকল রচনা ও চিঠি পত্রই লিখিয়া দিতেন—অতএব Vedantic Doctrines Vindicated রচনাগুলিও শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এইরূপ দুএকটা ভুল অজিতবাবু দেখাইয়াছেন বলিয়া, নারায়ণের লেখক, তাঁহার ন্যায় 'দায়িত্ববোধহীন লেখক' আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই, এইরূপ অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যুক্তির কি অপূর্ব্ব দৌড় এবং "দায়িত্ববোধ" সম্বন্ধে লেখক আগাগোড়া কি সচেতন! সর্ব্বসাধারণের নিকট ভক্তিভাজন যাঁহারা, তাঁহাদের সম্বন্ধে এতগুলি প্রমাণহীন উক্তি ও অভিযোগ করার পশ্চাতে কি গুরুতর দায়িত্ব-বোধ রহিয়াছে!

অজিতবাবু যে সকল কারণে দেবেন্দ্রনাথকেই Vedantic Doctrines Vindicated গ্রন্থের আসল লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে সকল কারণের মধ্যে একটিমাত্র কারণ উদ্ধার করিয়া অবশিষ্ট কারণগুলিকে লেখক চাপা দিয়াছেন। অজিত বাবু বাহ্য প্রমাণ এবং আভ্যন্তরিক প্রমাণ (external and internal evidence) উভয়বিধ প্রমাণের উপরেই তাঁহার অনুমানটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু লেখক যে তাঁহার সেই প্রমাণগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত না করিয়া এবং চাপা দিয়া তাঁহার 'যুক্তির অসারতা' এবং 'নীচজনোচিত হীনপ্রয়াস' পাঠক-সমাজে উদ্ঘাটিত করিতে ব্যস্ত, ইহা তাঁহার পক্ষে উদার-জনোচিত উত্তম প্রয়াস হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বাহ্য প্রমাণ অজিতবাবু দিয়াছেন দুইটি—(ক) দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন "এত উপনিষদ বচন উদ্ধার করিয়া ও তাহাদের ভিতরকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ডাক্তার ডফের মতামত খণ্ডন করা তখন আর দ্বিতীয় কারো সাধ্যের ভিতরে ছিলনা" (খ) "বইখানি প্রকাশিত হইলে, ইহার প্রণেতা যে কে তাহার কোন উল্লেখ থাকিলনা"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩ পৃষ্ঠা দেখ। আভ্যন্তরিক প্রমাণ তিনি দিয়াছেন এই:—"বেদ যে আপ্তশাস্ত্র তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের ভিতরকার মনের ভাবটি এই সময়েই বাহির হইয়া পড়িয়াছে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

দেখা যায়। বাহিরের প্রমাণ যে প্রমাণ নয়, ভিতরের আত্মপ্রত্যয়াদির প্রমাণই যে আসল প্রমাণ এ কথা এ সময়েই তিনি বলিয়াছেন। রামমোহন রায় এ ভাবের কথা বলিতেন না।"—পৃঃ—১৩৬—ঐ গ্রন্থ।

নারায়ণের লেখক উপরের ঐ (ক) প্রমাণের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখর দেব রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত যুদ্ধে তাঁহার সহায় ছিলেন—Brahminical Magazine No III এর যখন তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তখন তিনি তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। অতএব তিনি দেবেন্দ্রনাথের অপেক্ষা উপনিষদের শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাদ্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তারপর তিনি বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের Brahminical Magazine "অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়া" তত্ত্ববোধিনী ডফের জবাব দেন, সুতরাং চন্দ্রশেখরেরই ঐ সকল লেখার একমাত্র লেখক হইতে কোন বাধা নাই। অথচ লেখকের এই সমস্ত কথাগুলিরই কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী-লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় কখনো কখনো কল্পিত নামে বা তাঁহার কোন কোন বন্ধুর নামে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। Brahminical Magazineই এক ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজা রামমোহনের বেদান্ত-যুদ্ধে চন্দ্রশেখর তাঁর ডান পার্শ্ব বা বাম পার্শ্ব কোন "পার্শ্বেই" ছিলেন না এবং রাজার মত লোকের কাহারো সাহায্যেরই অপেক্ষা ছিল না। তাঁহার বেদান্ত-যুদ্ধ বা যে কোন যুদ্ধে তিনি একাই একশো। তাঁহার সহায় আবার কে ছিল, কেই বা হইতে পারিত? সে যাহাইহোক্, চন্দ্রশেখর দেব সংস্কৃত শাস্ত্রাদি জানিতেন তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ কোথাও নাই। রাজা যখন শাস্ত্রাদি লইয়া বিচার করিতেন তখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ও তদীয় ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রাজাকে সাহায্য করিতেন, রাজার জীবনী-লেখকেরা ইহা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনায় বা তর্কবিতর্কে তাঁহার সহায় ছিলেন একথা নূতন শোনা গেল! চন্দ্রশেখরের ঐ ভূমিকা তাঁহার লিখিত হইতেও পারে না হইতেও পারে—রাজা রামমোহন কর্তৃক লিখিত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। আর যদি বা তাঁহার কর্তৃক লিখিতও হয়, তবে তাহাতেও কিছু আসে যায়না, কারণ উহা বিজ্ঞাপন ছিল মাত্র। তাহাতে Brahminical Magazine এর বাদানুবাদে চন্দ্রশেখরের সাহায্যের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। চন্দ্রশেখর যে সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন পাঠ করিয়া তাহার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা অতিশয় গাঁজাখুরী গল্প। অতএব চন্দ্রশেখর দেবের হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের এই যে অপূর্ব্ব তথ্য, ইহা "মিথ্যার ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়াছে" কিনা জানিতে চাই। চন্দ্রশেখর দেবই যদি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি জানিবেন তবে দেবেন্দ্রনাথ বহু অন্বেষণ করিয়া বিদ্যাবাগীশকে ছাড়া বেদান্তাদি বুঝিবার জন্য অন্য কাহারো সাহায্য পান্ নাই কেন, এবং বিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদ পাঠ করিয়া পরে উপনিষদ প্রচারে

...ংপর হইলেন কেন? চন্দ্রশেখরের দ্বারাই ...া সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত?

রামমোহন রায়ের পরে বেদবেদান্তাদি ...ত্র যিনি এদেশে প্রচার করিবার জন্য ...কাকী কত পরিশ্রম ও যত্ন করিলেন, তিনি ...রাজীনবীশ চন্দ্রশেখর দেবের অপেক্ষা ...াস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রজ্ঞানে অযোগ্যতর ...লিয়া প্রমাণিত হইলেন। ইহাও ইতিহাস! ...ারণ ইহা যে ঐতিহাসিক সমালোচনা!

তারপর অজিতবাবুর (খ) প্রমাণ সম্বন্ধে ...লেখক নীরব। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে ...তগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক-...তেই গ্রন্থকর্ত্তার নাম আছে শুধু Vedantic Doctrines Vindicated গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। অজিতবাবু লিখিয়াছেন যে তিনি ঐ গ্রন্থ দেখেন নাই, কিন্তু ঐ গ্রন্থ এখনও নানা লোকের কাছে আছে এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি এবং আমাদের কাছেই আছে। তাহাতে কাহারো নাম নাই অথচ অন্যান্য সকল গ্রন্থেই নাম আছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, চন্দ্রশেখর দেবের দ্বারা ইংরাজিতে লিখিত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া কাহারো নামে ঐ গ্রন্থ বাহির হয় নাই। বেনামা বাহির হইয়াছিল।

তার পর অজিতবাবু যে আভ্যন্তরিক প্রমাণ (internal evidence) দিয়াছেন, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে Vedantic Doctrines Vindicated রামমোহনের Brahminical Magazine কে "অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরে নাই"।

শাস্ত্র সম্বন্ধে রামমোহন রায় এ কথা লিখিতেই পারিতেন না যে "To prove their authority & truth by any extraneous evidence is impossible"। P. 31. V. D. V, শাস্ত্রীয় সত্য তবে কিভাবে নির্ণীত হইবে? "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের" দ্বারা। "All his (God's) revelations are effected simply by the enlightenment of the human understanding"। P. 32. V. D. V. তারপর Vedantic Doctrines Vindicated পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, মহর্ষির যে সকল উপনিষদ শ্লোক সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, যাহা পরবর্ত্তী কালে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই শ্লোকগুলিই ইহার ভিতরে স্থান পাইয়াছে। রামমোহনের Brahminlcal Magazine এর ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শনাদির বিচার ইহাতে আদৌ নাই। তবু ইহা নাকি ঐ Magazine এর "হুবহু" নকল মাত্র!

দেবেন্দ্রনাথ যে খৃষ্টান পাদ্রীদের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার আরও প্রমাণ অজিতবাবু অন্যত্র দিয়াছেন এই যে, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের এই বাদানুবাদের সংবাদ কোন গতিকে বোধ হয় ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছিল এবং তজ্জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া এক ইংরাজী পত্রে লেখেন:—"আমি ভাবিয়া অবাক্ হই যে, এখনো সমস্ত বিষয় একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই কেন! আমার বিশ্বাস তোমার সমস্ত সময় খবরের কাগজ লিখিয়া এবং মিশনারীদের সঙ্গে লড়াই করিয়াই কাটিতেছে ইত্যাদি।" ১১৫ পৃষ্ঠা মহর্ষি-চরিত। ইংরাজীপত্রে আছে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

"controversies with the missionaries"—এবং ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে এই Vedantic Doctrines এর যুদ্ধ সম্বন্ধেই দ্বারকানাথ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

পরিশেষে নারায়ণের লেখকেরই একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া আমি এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে চাই—"এইরূপ ···হীন প্রয়াসে সাহিত্যের কোন কোন অংশ যে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

প্রতারণা

(গল্প)

চিত্রকর ডি—বলিল,—জীবনে আমি একটি স্ত্রীলোককে শুধু ভালবাসিয়াছি। পাঁচটি বৎসর আমি কি সুখ যে ভোগ করিয়াছি, তাহা আমিই জানি। এই যে আজ আমার এমন খ্যাতি, কাজে এতখানি অনুরাগ, ইহার মূলে তাহার সেই ভালবাসা। সে ছিল আমার কল্পনার উৎস। জীবনে প্রথম যেদিন তাহাকে চোখে দেখিলাম আমার মনে হইল,এ যেন আমার অনেক দিনের চেনা—আমার ধ্যানের ধন, স্বপ্নের ছবি! সে কখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই—আমারই এই হাতে মাথা রাখিয়া সে চিরবিদায় লইয়াছে! কিন্তু আজ তাহার কথা মনে হইলে ক্রোধে আমার চিত্ত জলিয়া উঠে! সেই পাঁচটি বৎসরের স্মৃতি দারুণ হিংসায় আমার মনকে তাতাইয়া তুলে—সেই সুন্দর মুখখানি মনে হইলে দারুণ ঘৃণায় অন্তর ভরিয়া উঠে—আমি তাহাকে ঘৃণা করি।

তাহার নাম ছিল ক্লোতিল্। আমারই এক বন্ধুর গৃহে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়—মাদাম দেলোস্ বলিয়াই সকলে তাহাকে জানিত। তরুণী বিধবা। সে ছিল এক সদাগরের স্ত্রী। অনেক দেশ ঘুরিয়াছে সে—তাহার কথাবার্ত্তা হইতে সেটুকু বেশ বোঝা যাইত। চালচলন ছিল খাস পারির—বেশভূষাও খাঁটি পারির কেতায়—ভাবভঙ্গী দেখিলে পারির সৌখীন-সমাজের নারী বলিয়া চিনিতে কষ্ট হইত না।

যেদিন বুঝিলাম, আমি তাহাকে অসহ্য ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি সেই দিনই সমস্ত দ্বিধা ভয় ঠেলিয়া একেবারে তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব তুলিলাম। অবশ্য কথাটা অপরের মুখে পাড়িয়াছিলাম। সে শুধু বলিয়াছিল যে আর দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিবে না। শুনিয়াছিলাম, তাহার চোখের কোণে দুই ফোঁটা জলও দেখা দিয়াছিল। তাহার পর অনেক দিন তাহার সহিত আর দেখা করি নাই। ক্রমে দেখা থাকা দায় হইয়া উঠিল—কাজে মন লাগিত না, বন্ধুবান্ধব গল্প করিতে আসিলে বিরক্তি ধরিত—অর্থাৎ পুরাদস্তর হতাশ-প্রেমিক হইয়া দাঁড়াইলাম। শেষে বেড়াইতে বাহির হইবার স্থির করিলাম। বাক্স তোরঙ্গ গুছাইয়া লইতেছি—সেই দিন রাত্রেই বাহির হইয়া পড়ি—বেশ মনে পড়ে, তখন বেলা নয়টা বাজিয়াছে—হঠাৎ শুনিলাম মাদাম দেলোস্ আসিয়াছেন!

মাদাম আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথায় যাইতেছি। আমি সঠিক কথাটা বলিলাম। মাদাম বলিল, "কেন যাচ্ছ, জিজ্ঞাসা করতে পারি?" তাহার স্বর বড় কোমল, বড় করুণ। আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিলাম না। মাদাম কহিল, "বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাস? তাই, না? আসল কথা, আমিও তোমায় ভালবাসি—কিন্তু আমাদের মিলন অসম্ভব,—তার জন্য আমি দুঃখিত। কি করব? —নিরুপায়! অর্থাৎ বুঝেছেন—(এইখানে মাদামের স্বরটা একটু কাঁপিয়া উঠিল) আমার স্বামী বেঁচে আছেন, আমি বিধবা নই।"

মাদাম তাহার কাহিনী বলিতে লাগিল।

সে যেন রূপকথার মত! প্রেম আর বিরহের কাতর দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা! বিবাহের তিন বৎসর পরে স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হয়। মাদামের খুব বড় বংশে জন্ম—পারিতে সে-বংশের অত্যন্ত সম্ভ্রম! কুৎসার ভয়ে মাদাম স্বামীর বিচার মাথায় তুলিয়া লইয়াছে! সর্দ্দার রাবি তাহার খুড়া। হীনবংশে বিবাহের দরুণ পিতৃকুলের সহিত মাদামের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। মাদামের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে এক রেঞ্জারের সহিত। স্বামী ত্যাগ করিলেও মাদামকে আশ্রয়ের জন্য বড় ভাবিতে হয় নাই—লেখা-পড়া মাদাম ভাল করিয়াই শিখিয়াছে—সেলাইয়ের কাজও চমৎকার জানে। গান-বাজনাতেও বেশ দক্ষতা আছে।—বড়বড় ঘরে মেয়েদের পড়াইয়া, সেলাই ও গান শিখাইয়া মাদামের উপার্জ্জন অল্প দাঁড়ায় না।

দীর্ঘ হইলেও কাহিনীটি আগাগোড়া ভারী এক করুণ-সুরে ভরা। এত সংক্ষেপে আমি এটুকু সারিয়া লইলাম; কিন্তু মাদাম এত বিস্তারিত করিয়া জীবনের ইতিহাস ফাঁদিয়া বসিয়াছিল, যে শুনিতে আমায় দুই দিন লাগিয়াছিল। কাহিনীটি আমায় প্রাণে বাজিয়াছিল;—দুইদিন কি, দুই বৎসর ধরিয়া মাদামের মুখে এ কাহিনী শুনিলেও আমার ধৈর্য্য টুটিত না। মাদাম আমায় ভবঘুরে হইয়া বাহির হইতে নিষেধ করিল; সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কাজ কর—মিথ্যা মোহের ভুলে ভবিষ্যৎ মাটি করিয়ো না।" মাদামের সে সান্ত্বনায় আমার মন গলিয়া গেল; ভাবিলাম, কাজ করিব, মানুষ হইব। এত দুঃখে পড়িয়াও মাদাম কাজের গৌরব ভোলে নাই! নারী হইয়াও কাজে কর্ম্মে আপনাকে এমন ডুবাইয়া রাখিয়াছে; এত বড় বেদনা অনায়াসে চাপা দিয়া রাখিয়াছে! আমি মুগ্ধ হইলাম। মাদাম আশ্বাস দিল, রোজ রাত্রে সে আমার কাছে আসিবে—তাহাকে প্রতিদিনকার কাজের হিসাব দিতে হইবে। হিসাব উচিত-মত না হইলে মাদামের সঙ্গে আমার দেখা হইবে না!

সেইদিন হইতে আমার চোখে জগৎ নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিল। কাজে উৎসাহ বাড়িয়া গেল। সারাদিন কাজ করিয়া গৃহে ফিরিতাম, এইবার মাদাম আসিবে। দীপ জ্বালিয়া মাদামের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম—একটু বিলম্ব হইলে মন অস্থির হইয়া উঠিত। অভিমান করিতাম—মাদাম সাধিয়া কাঁদিয়া অভিমান ভাঙাইত। মাদাম আমার জন্য প্রত্যহ ফুলের তোড়া আনিত, —বাছা বাছা তাজা ফুলের তোড়া—

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

শোভায় গন্ধে ভরপুর। আমি উপহার দিলে মাদাম তাহা গ্রহণ করিত না—অনুযোগ করিয়া বলিত, কেন এ রাজে খরচ—মাদামের এ-সবে প্রয়োজন নাই—আমার চেয়ে মাদামের টাকা অনেক বেশী। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই!

তাহার উপর মাদাম বলিত, পড়ানো বা সেলাই প্রভৃতি শেখানো কাজে তাহার মোটেই ক্লান্তি লাগিত না। ছাত্রীরা সব বড়লোকের মেয়ে—তাহারা মাদামকে খুবই ভালবাসে; অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কখনো একটা খুব দামী ব্রেস্‌লেট বা আংটি আমাকে দেখাইয়া বলিত, অমুক ডিউকের মেয়ে তাহাকে দিয়াছে। অত্যন্ত সুখে সময় কাটিতেছিল। দিনের বেলা যে যাহার কাজে যাইতাম, আর রাত্রে আমাদের মিলন ছিল অটুট। শুধু রবিবার মাদামের দর্শন মিলিত না। রবিবার ভোরে সে সাঁৎ জার্ম্ময় যাইত—বোনের সঙ্গে দেখা করিতে; আর সোমবার ভোরে সেখান হইতে ফিরিত। আমি ষ্টেশন অবধি তাহাকে আগাইয়া দিয়া আসিতাম। আবার সোমবার ভোরে ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইতাম—মাদাম হাসি-মুখে ট্রেন হইতে নামিয়া ছাত্রীদের বাড়ী চলিয়া যাইত, আমিও নিজের কাজে লাগিতাম। সোমবার রাত্রে বোনের বাড়ীর খুঁটিনাটি কথা—ছেলেমেয়েদের দুষ্টামি, ভগিনী-পতির বিচিত্র খেয়াল প্রভৃতির গল্প বলিতে মাদাম যেন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত।

কি গভীর বিশ্বাসে, আশ্চর্য্য সুখে সময় কাটিতেছিল! মনে এতটুকু সন্দেহ জাগে নাই। মাদামের সুরে মিথ্যার সঙ্কোচ কোথাও ছিলনা;—স্বর এতটুকু কাঁপিত না, কণ্ঠ এতটুকু বাধিত না। তবে একটা কারণে রাগ ধরিত। অত্যন্ত ছোটখাট ব্যাপার বর্ণনা করিতে গিয়াও মাদাম এত খুঁটিনাটি পাড়িয়া বসিত যে গল্প অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া পড়িত। মাদাম যেন আপনার চারিদিকে রোমান্সের জাল বুনিত—নাটকীয় ঘটনার ছড়াছড়ি! মাঝে-মাঝে হিংসা হইত—এই রবিবারটুকু মাদামকে যদি নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে পারিতাম! মাদামের এই রবিবারের আত্মীয়-বন্ধুরা মাদামকে অনেকখানি ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমার মনে হইত, এই রবিবারটুকুর প্রতীক্ষাতেই বাকী কয়টা দিন যেন সে সেলাই, গানবাজনা আর আমায় লইয়া কাটাইয়া দিতে চায়! রাগ হইলেও মুখ-ফুটিয়া কিছু বলি নাই। বলিবার ইচ্ছা হইলে মনে হইত, আহা, পতিপরিত্যক্তা অভাগিনী তরুণী!

শেষে একদিন কেমন সন্দেহ হইল। সেদিন সোমবার ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিলাম। প্রথম-ট্রেন বাঁশী বাজাইয়া চলিয়া গেল, মাদাম আসিল না। মন খারাপ হইয়া গেল। মাদামের কি হইল? কোন অসুখ করিল না-কি? সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় যাইব? অত-বড় সহরে মাদামের ভগিনী-পতির বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা—সে কি সহজ ব্যাপার। নিজের উপর রাগ ধরিল। এতদিন ইহাদের গল্প শুনিতেছি, কোনদিন ভগিনীপতির নামটিও জিজ্ঞাসা করি নাই! সন্ধ্যার ট্রেনে যাওয়া সম্ভব নয়—রাত্রে অজানা দেশে কোথায়

ঘুরিব! ভাবিলাম, মঙ্গলবারে সকালের ট্রেনে বাহির হইব। সেদিনের ছুটি লইলাম। সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া দীপ জ্বালিতেছি—এমন সময় মাদাম আসিয়া উপস্থিত। মলিন মুখ, চোখে কেমন উদ্বিগ্ন ভাব! বোনের অসুখ করিয়াছিল, তাই সে আসিতে পারে নাই। তখন সে অসুখের এক দীর্ঘ বর্ণনা ফাঁদিয়া বসিল। আমার কেমন বিরক্তি ধরিল—এত বেশী কথা কে শুনিতে চায়! বিশেষ মাদামের বোন, সে আমার কে? তাহাকে চিনি না, জানি না, চোখেও কখনো দেখি নাই!

সে সপ্তাহে দুই-তিন রাত্রি মাদাম আসিল না—বোনের অসুখ সারে নাই। পর-সপ্তাহে আবার সব ঠিক-নিয়মে চলিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মাদামের অসুখ হইল। একদিন সন্ধ্যায় জ্বর-গায়ে আসিয়া কহিল, শরীর অত্যন্ত খারাপ—এখানে রোগ লইয়া আমায় জ্বালাতন করা ঠিক নয়—মাদাম তাই বোনের কাছে চলিয়াছে—সারিলেই আসিবে—একদিনও বিলম্ব হইবে না। আমি বলিলাম, না, তাহা হইবে না। এখানে আমি ডাক্তার দেখাইব, সেবা করিব। শেষে আমার কথাই রহিল। মাদাম আমার গৃহেই রোগশয্যা গ্রহণ করিল। ডাক্তার আনিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, রোগ কঠিন। আশা তিনি একটুও দিতে পারেন না।

আমার সমস্ত অন্তর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাদামের পানে চাহিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। উপায় কি—কি করিব! ভাবিলাম, আহা অভাগিনী, —যদি শেষমুহূর্ত্তে কিছু শান্তি দিতে পারি! মাদামের বোনের নামে পত্র দিলাম, ছাত্রীদের ও পত্র দিলাম। কেহ আসিল না। রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল—দুঃখে চোখ-ফাটিয়া জল বাহির হইল।

কোনমতে চোখের জল মুছিয়া প্রাণপণে মাদামের সেবা করিলাম। আমার শান্তি, আমার আনন্দ, আমার জীবন, আমার সর্ব্বস্ব! যেমন করিয়া পারি, এই শেষমুহূর্ত্তে শান্তি তোমায় আনিয়া দিবই।

নার্শকে বুঝাইয়া আমি চুপিচুপি সর্দ্দার রাবির বাটীর দিকে রওনা হইলাম। কখন্ পৌঁছিলাম, সে কথা আর খুলিয়া বলিয়া কাজ নাই। সে দিন রাবির গৃহে কিসের মজলিস ছিল—বাড়ীর সম্মুখে গাড়ার ভিড় ঠেলিয়া গৃহে ঢুকিলাম। বৃদ্ধ রাবি তখন নিমন্ত্রিত-দের লইয়া ভোজে বসিয়াছেন। আমি ঘাম মুছিয়া বলিলাম, "বড় বিপদ, কর্ত্তাকে চাই।"

আমার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়াছিল। কর্ত্তা রাবি শশব্যস্তে আসিয়া কহিলেন, "কি চাই? কোথা থেকে আসছেন?" আমি মিনতি জানাইয়া বলিলাম, "আপনার ভাইঝী মাদাম দেলোস্ মৃত্যুশয্যায়। এ সময় আর মনোমালিন্য রাখবেন না—একবার তাঁর শেষমুহূর্ত্তে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ান—সে বেচারী একটু হাসিমুখে বিদায় নিক।"

বৃদ্ধ রাবি এমন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইলেন যে আমি ভড়কাইয়া গেলাম। আমি বলিলাম, "আপনার ভাইঝী মাদাম দেলোস্ মৃত্যুশয্যায়—" তিনি যেন অবাক্ হইয়া গেলেন। বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "আমার ভাইঝী! আপনি এ কি বলছেন?

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আমার ভাইই নেই, তা ভাইঝী! আপনি বাড়ী ভুল করেছেন।"

আমি তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইলাম, কহিলাম, "এখনো সেই সব পুরানো কথা মনে রেখেছেন! বংশের মর্য্যাদাকেই বড় বলে ধরছেন! একটা প্রাগ চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে—মাদাম দেলোস্—মাদাম দেলোস্—চিনতে পারছেন না?"

"না, ও নামও কখনো শুনিনি। আমি বুড়োমানুষ, আপনার সঙ্গে পরিহাস করবারও পাত্র নই। হয় আপনি পাগল, নয় বাড়ী ভুল করেছেন, নাম ভুল করেছেন।"

বৃদ্ধ আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। রাগে আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। এই সব বংশ-দর্পিতের দল—হতভাগা, স্বার্থপর বৃদ্ধ! আবার পরক্ষণে মনে হইল, তবে কি মাদাম আমায় মিথ্যা পরিচয় দিয়াছে! কিন্তু কেন—কি তাহাতে লাভ তাহার? বাহিরে আসিয়া গাড়ি ডাকিলাম,—প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কারের কন্যা মাদামের ছাত্রী—ক্যোচম্যানকে ব্যাঙ্কারের বাড়ীর দিকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলাম।

প্রকাণ্ড বাড়ী। সম্মুখে ভৃত্যটা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিলাম, "মাদাম দেলোসের কাছ থেকে আসছি, আমি!"

"মাদাম দেলোস্!" ভৃত্যের মুখেও রাবির মত বিস্মিত ভাব!

আমি কহিলাম, "তোমার দিদিমণিদের যিনি গান-বাজনা শেখান, সেই মাদাম দেলোস্—"

ভৃত্যটা কি বিড়বিড় করিয়া বকিয়া গৃহমধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল!

বিরক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। ফিরিয়া এক পত্র পাইলাম—সাঁৎ জার্ম্মেয়ের পোষ্ট অফিসের ছাপমারা চিঠি। খামটা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলাম। মাদামের ভগিনী পক্তি রেঞ্জার সাহেব পত্র দিয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন, মাদাম দেলোস্ বলিয়া তিনি কাহাকেও জানেন না। তাছাড়া তিনি অবিবাহিত, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রই নাই, তা শ্যালিকা!

যথেষ্ট হইয়াছে! মাদামের মিথ্যা বুঝিলাম। পাঁচ বৎসর ধরিয়া মাদাম আমার সহিত চাতুরী খেলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেন—কেন? কি তাহার স্বার্থ ছিল এ মিথ্যা বলবার? কি প্রয়োজন? এতদিন সে তবে কোথায় ঘুরিত? আশ্চর্য্য হইয়াছি! রাগের মাথায় রোগশয্যাশায়িনী মাদামের প্রতি প্রশ্নের ঝড় নিক্ষেপ করিলাম, বলিলাম, "রবিবার তুমি সাঁৎ জার্ম্মেয় কার কাছে যেতে? দিনের বেলায় কোথায় থাকতে? বল, সব কথা খুলে বল।" মাদাম স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। দৃষ্টিতে সেই গভীর দর্প, অটল অবজ্ঞা!

আমি কহিলাম, "তুমি কাকেও পড়াতে যেতে না; সর্দ্দার রাবির তুমি কেউ নও। সবজায়গায় আমি সন্ধান নিয়েছি। তোমায় কেউ চেনে না, জানে না। আগাগোড়া আমাকে মিথ্যা বলে এসেছ! বল, এত গহনা-পত্র, টাকাকড়ি পোষাক-পরিচ্ছদ তোমার কোথা থেকে জুটত? কার কাছ থেকে আদায় করতে?"

মাদাম গভীর বিষাদের দৃষ্টি হাসিল—সে দৃষ্টিতে কি নৈরাশ্য, কি হতাশ! আমার দয়া হইল—আহা, কেন এ শেষমুহূর্ত্তে বেচারীকে এ আঘাত দিলাম! তখনই

কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিলাম। বড় দুঃখে বলিলাম, "এ পাঁচ বৎসর কেন তুমি আমায় শুধু মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে এসেছ? আমার এ ভালবাসার কেন এ অপমান করেছ? সত্য-পরিচয় কেন দাওনি? তুমি ত বুঝেছিলে তোমায় আমি কি অসহ্য ভালবাসতুম—তবে কেন এত-বড় চাতুরীর দেওয়াল তুলে রেখেছিলে? এই পাঁচ বৎসর তোমার প্রত্যেক স্পর্শে, প্রত্যেক চুম্বনে এতখানি গোপনতা রেখেছিলে—এত ছল! নামহীনা পরিচয়-হীনা নারী—আজ পর্য্যন্তও তোমার পরিচয়, তোমার নাম আমার কাছ থেকে গোপন রেখে চললে! শুধু খেলা—মিথ্যা খেলা খেলেছ আমার সঙ্গে! এখনো বল, কে তুমি—কি নাম তোমার,—কেন আমার জীবনে এভাবে এসে উদয় হয়েছিলে? বল, এখনও খুলে বল,—একটা অনুরক্ত হৃদয়ের এতখানি আবেগ নষ্ট করে দিয়ে যেয়ো না, তাকে কিছু দিয়ে যাও—কিছু স্মৃতি, কিছু—"

মিথ্যা প্রয়াস! মাদামের দুই চোখে শুধু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। নিঃশব্দে আমার তিরস্কার গ্রহণ করিয়া আমারই মুখের পানে চাহিয়া মাদাম শেষনিশ্বাস গ্রহণ করিল; একটা কথা কহিল না—মিথ্যাবাদিনী ছলনাময়ী নারী তাহার সকল রহস্য বুকের মধ্যে গোপন রাখিয়াই বিদায় লইল!

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

কণিকা

এক-একরকম দুঃখ আছে বৈরাগ্যের মত, সন্ধ্যার গেরুয়া আলোর মত শ্রান্ত! তার মধ্যে কোন আগ্রহ কি চেষ্টা নাই। কিরণের দীপ্তি নিবু-নিবু করতে করতে একেবারে নিবে আসে, প্রখর তাপ দূর হয়ে চারিদিক ছায়ার জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, চারিদিক নিঃশব্দ নির্জ্জন হয়, নিদ্রার গভীরতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী নিমগ্ন হয়ে যায়। চরাচর শান্তি লাভ করে, শ্রান্তির বিরাম হয়, সুষুপ্ত বিশ্ব নিশ্চেতন হয়ে পড়ে। হয়ত এ দুঃখের অবসানে, নূতন দিনের চেতনা ফিরে এসে আবার নবীন জীবনের সূচনা করতেও পারে!

কিন্তু আর-একরকম দুঃখ আছে যা, রাত্রি-শেষ প্রভাত-সূর্য্যের মত একেবারে প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ণ। তার তপ্ত স্পর্শে সব জড়তা দূর হয়ে যায়—তপনের সহস্র রশ্মির মতই অজস্র আলোকের তীর তার বুকে গিঁয়ে বেঁধে, শ্রান্তি শান্তি স্বপ্ন সুষুপ্তি সমস্তই সমাপন করে। নিষ্ঠুর জাগরণের প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তহীন শব্দের কল্লোলে, অবিরাম গতির অবারিত দীপ্ত দৃষ্টির অশান্তিতে, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। চলা, ফেরা, দেখা, অবিরাম চেতনায় সমস্ত জীবন জ্বালাময় হয়। আকাশের সূর্য্যের সহস্র রশ্মি মনের অন্ধকারে অজস্র দৃষ্টি সঞ্চার করে, তাকে আকুল করে তোলে। মুহূর্ত্তের স্বস্তি থাকে না। এর অবসানে যে রাত্রির অন্ধকার আসে, সে মৃত্যুর মত অনন্ত শান্তির নিস্তব্ধতা এনে দেয়। প্রখর জ্বালা-যন্ত্রণার অশেষ গতির

বিরাম হয়ে, চরম শান্তির পরম বৈরাগ্যের আবাহন করে। চেতনার এই একান্ত ব্যথাময় জাগরণ, এ জীবন্ত দুঃখ, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই এর নিবৃত্তি হয় না।

* *
*

দুঃখের মত নির্ব্বাক কিছু আছে কি! চোখের জলেও তার প্রকাশ হয় না, দুঃখ যখন বড়ই গভীর আর মর্ম্মন্তুদ হয়, তখন আহা-উহু, গেলাম, মলাম বল্‌তে পারা দূরে থাক, তার অসহ্য যন্ত্রণা হ্রাস করে একফোঁটা চোখের জলও যে ঝরে পড়ে না! সমস্ত জীবনের সব রং পুড়ে খাক হয়ে যায়, মাথার চুল দুদিনে শাদা হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীর একেবারে নুয়ে পড়ে, মূক মুখ আর খোলে না। যে বড় প্রিয়, যাকে অন্তরের আসনে বসিয়েছি, তার নাম কি কারো কাছে উচ্চারণ করা যায়, সে যে ইষ্টমন্ত্রের মত বড় পবিত্র, অন্তরেই জপ করতে হয়। ঐখানেও যদি আত্মবিস্মৃতি না আসে, ঐখানেও যদি জাহিরের ভাব আসে, সে তো বিলাস বৈ আর কিছু নয়! রঙ্গালয়ের দুঃখের অভিনয়, ক্ষণিকের ভ্রান্তি; তবে সেই যে অভিনয়ের দুঃখ, তাও সে সময়ের জন্য অন্তরে যথার্থরূপে অনুভব করতে হয়। নয় তো সেই যে মিথ্যার অভিনয় সে আরো মিথ্যা হয়ে পড়ে, ন্যাকামির মত দেখায়, দর্শকের মন স্পর্শ করতে পারে না! গভীর দুঃখ, সত্য দুঃখ অন্তর সমাহিত হয়ে থাকে, তার বহির্বিকাশ নাই বলে সে মনের মধ্যকার সব মালিন্য পুড়িয়ে নিঃশেষ করে, সব খাদ মিটিয়ে শুধু খাঁটিটুকু বজায় রাখে। যেখানে আত্ম-সম্মানের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সেখানে আর বাকী রইল কি? কিছুই না, ফাঁকা, ভুয়ো হাঁক-ডাক!

* *
*

চেতনা আসে বুকের মধ্যে আগুনের ছোরা, চোখের উপর বিদ্যুতের স্পর্শ! ধূ ধূ করে সব আড়াল আবর্জ্জনা পুড়ে যায়, চোখের সামনে ঝাপসা কিছুই থাকে না—তখন আর অন্ধকার গণ্ডীর মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকা চলে না, পথ চলতে হয়, সেবা করতে হয়। জীবনের এ অপূর্ব্ব সুন্দর ভাব-গ্রন্থের ভাষ্য নিজেই করে যেতে হয়। এই ধূলি, কাদা, ভূমিকম্প, দুর্দ্দিন দুর্ভিক্ষের পৃথিবী যেমন আকাশের করুণায়, ফলফুল তৃণপত্র ধনধান্যে অতুলন সুন্দর, তেমনি মানুষের এই দুঃখ-দুর্দ্দিন-সঙ্কুল, প্রলোভনে কণ্টকাকীর্ণ, খণ্ডিত জীবনও ভাবের স্পর্শে অপূর্ব্ব মহিমাময়! ত্যাগ ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু অপার শান্তি সন্ধ্যার অনুপম কান্তি নিয়ে জীবনে তখনই আসে, যখন আমরা স্বার্থের সীমা সঙ্কুচিত করে আনি!

* *
*

ভয় ভরসা দুই একত্রে মনে জাগে। পথ যখন হয়, চল্‌বার শক্তিও তখন আসে। কারো জীবনই ব্যর্থ হবার জন্য সৃষ্ট হয়-নি। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরি পরিণতি হয়ে থাকে; খানিকটা প্রাকৃতিক কারণ, কতকটা আবার অদৃশ্য দৈব শক্তির উপর নির্ভর

করে। ফুল হতে ফল হয়, তবে ফলটি স্বাদে-গন্ধে, যৌলর্ষ্যে, আকারে, সর্ব্বাঙ্গে পরিপুষ্ট হতে হলে যেমন অনুকূল রোদ বাতাস বৃষ্টির উপর নির্ভর করে রাখে, তেমনি কৃষকের যত্ন চেষ্টা, সতর্কতারও অপেক্ষা রাখে। ফলটি দেখা দেওয়া দৈবানুগ্রহ, তাকে রক্ষা করা যত্ন-চেষ্টা-সাপেক্ষ, পুরুষকার! বাহির হতে যা আসবার তা আসবেই অন্তরের অনুকূলতা যেন কিছুতে নষ্ট না হয়!

* *
*

কাজ কি? সে তো আনন্দের অভিব্যক্তি, সদানন্দের লীলা! এই যে এত বড় বিশ্বব্যাপার চলছে, জীবনের এই অবিরাম স্রোত এর মধ্যে কোন কষ্ট-চেষ্টা নাই। প্রাণে, আনন্দে আলোকে সঙ্গীতে, ছায়ায় অন্ধকারে, সুখ-দুঃখের ছন্দে উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে! এর ভাবের আর প্রকাশের, কাজের ও উদ্যমের একটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু মন যেখানে পড়েমাথা কুটছে, সেখানে বাহিরে কি উৎসবের আয়োজন ক্ষীণ হস্ত করতে পারে? বিরস মনে যে কাজই করা যাক্‌না কেন সে দেবভোগ্য হয় না—মানুষের তাতে কোন উপকার হয় কি না বলা কঠিন, তবে দেবতা যে তা গ্রাহ্য করেন না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাই হাতের কাজ আর মুখের কথার সঙ্গে মনের ভাব, অন্তরের প্রীতি যোজনা করে দিতে হয়, প্রাণের প্রেরণা আনন্দকে সঙ্গী করে যখন যাত্রী হয়, কল্যাণ তখনই সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব লাভ করে।

* *
*

আজকাল দেরদারুর পাকা ফল ঝরে পড়বার সময় কত লক্ষ লক্ষ ফল কেবলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যে কয়টারই বা অঙ্কুর হতে পায়? আর যার বা অঙ্কুর হয় তার মধ্যে কতগুলিই বা বাঁচতে পায়? যেটি বেঁচে ওঠে সেটিরও পরিণতির দিকে কত বাধা, ছাগলে মুড়িয়ে খায়, অনাবশ্যক মনে হলে মালি এসে তাকে উপড়ে ফেলে। চারিদিকেই দেখতে পাই মৃত্যু-পরীক্ষায় যে জয়ী হয়, তারি পরিণতি-লাভের আশা থাকে—কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর তাড়না চারিদিক হতে ঘিরে আসছে। আত্মরক্ষার চেয়ে আত্ম-নিবেদনই অধিক দেখা যায়। এই যে অসংখ্য মৃত্যু এ কোনো অমরতাকে আশ্রয় করে, কেননা স্থূল যা-কিছু প্রত্যক্ষ নষ্ট হয়েও মরে না, তার প্রাণ-সার অলক্ষ্যে প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে থাকে। মানব-জীবনের পক্ষেও কি এই নিয়ম সত্য? জীবনের এই বারম্বার দুঃখের মধ্যে মনে যা সঞ্চয় হয়, তা কি জন্ম-জন্মের সাথী হবে না! এই স্বকৃত-সংগ্রহ এবং অপর-দত্ত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং লাঞ্ছনা এ কোন্ ভাবে কার্য্য-কর হবে? এত কথা ঠিক্ করে ভেবে নিষ্পত্তি করা কঠিন, তবে একটি জিনিসই শুধু সম্ভব,—ভাবনার বোঝা নামিয়ে ফেলা আর মনকে একেবারে খাঁটি করে বাহিরের কাজে তারি সঙ্গে মিল রেখে চলা!

* *
*

আমার ভাবনা দিয়ে ভেবে ভেবে যখন সব রহস্য পরিষ্কার করে নিতে চাই, তখন

কিছুই দেখতে পাইনে। যে সূক্ষ্ম তন্তুগুলি দিয়ে আমার দৃশ্য বস্তু রচনা করব, তার সূত্রগুলিই আমার চোখে পড়ে না, আমার হাতের আয়ত্তের মধ্যে আসে না। কিন্তু নিজে যখন ভাবনার অসাধ্যতা বুঝে হাল ছেড়ে দি, তুমি যখন আমায় বোঝাও তখনি আমি সব পরিষ্কার করে দেখতে পাই। আমার ভাবনা যেন ঐ আকাশের মেঘ, আমার স্বর্গকেও আচ্ছন্ন করে আছে, আবার বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে আমার পৃথিবীটাকেও আবছায়ায় ঢেকে দিচ্ছে। তোমার বিচার-শক্তি যেন ঐ আকাশের আলো, স্বচ্ছ অবারিত স্বতঃপ্রকাশ! সে আপনাকেও যেমন দেখায়, আপনার চারিদিকটিকেও তেমনি উজ্জ্বল করে তোলে। সেই আলো দিয়ে যখন দেখি, তখন সবই সহজ সরল পরিষ্কার হয়ে যায়।

* *
*

তুমি যাকে পথ দেখাও তার কি আর মুখ ভার করে থাক্‌বার উপায় থাকে? চারিদিকে যে হাসির ফোয়ারা খুলে যায়, আলোর জোয়ার ভেসে আসে! আলোর তেজে জীবনের কোথাও কোন কালো ঠাঁই পায় না। বুকখানা এতখানি বেড়ে যায়, আর বুদ্ধি কেমন সহজেই সব মীমাংসা করে ফেলে! সোজা পথটি চট্ করে বেরিয়ে যায়! যাব কি যাব-না'র মিছে ভাবনা দূর হয়ে যায়। যাওয়ার পথ, আর না-যাওয়ার অপথ দুইই সুস্পষ্ট দেখা যায়। নিজের চোখ দিয়েই দেখি আর নিজের বুদ্ধি দিয়েই বিচার করি, আর দশজনে কি বল্‌বে—ভাল মনে করবে, না মন্দ বল্‌বে সে কথা মনেও আসে না। খুব নিঃস্বার্থ হতে হলে বড়ই স্বার্থপর হতে হয়, কেননা আমি কতটা ছাড়ব, আর কতটা ধরে থাক্‌ব, সে বিচার অন্যে কখনই করে দিতে পারে না, এ-বিষয়ে নিজের উপর নিতান্তই নির্ভর করে কর্ত্তব্য-বিচার করতে হয়। বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে যখন আমার ক্ষীণ শক্তির মিলন হয়, আমার ইচ্ছা যখন কল্যাণময়ী পরমা ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করে, তখন আমি স্বাধীন হই। বাধা, বিপত্তি, বিঘ্ন তিরোহিত হয়, গতি-পথে কোন প্রতিবন্ধকই স্থায়ী হয় না!

* *
*

স্বাধীনতা অবিবেকী নয়, অবিমৃশ্যকারিতার স্থান তার মধ্যে হয় না। স্বাধীন মনোবৃত্তি উদ্দাম নয়, সাবধান এবং সতর্ক! স্বাধীনতার গতি উল্কার মত কক্ষ-ভ্রষ্ট নয়, সে গতি গ্রহ-তারকার নিয়মিত সঞ্চরণ, অক্ষৌহিণী নক্ষত্র সবাই মুক্ত পথে চলেছে, উন্নতি, পরিণতি ও নিয়তির পথে যাত্রা, তার মধ্যে বিষমতা নাই বলেই তা বাধাহীন। উল্কার গতিতে ছুটে চলতে বাধা নাই সত্য, তবে তার শেষ সত্বরই হয়। অনন্তের পথে অবিরত যে চল্‌তে পারত, সে মধ্যপথে অকস্মাৎ দীপ্ত অঙ্গারের মত ভস্মীভূত হয়ে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে। তার আত্মঘাতী পরিণামে কারো কোন কল্যাণই সাধিত হয় না।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আলেয়ার আলো

তেরো

সরমার কথা

জ্বরের ঘোরে আমি যখন বেহুঁস হয়ে ছিলুম, তখন স্বপ্নের মত মনে হোত, কে যেন আমার শিয়রের কাছে ঝুঁকে বসে আছে, যে যেন কাতর-করুণ চোখে আমার মুখের পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে! তার মুখখানি মনে হোত চেনা-চেনা,—অথচ চিনতে গেলে চিন্‌তে পারতুম না, সব যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যেত!

যেদিন প্রথম জ্ঞান হোল, দেখলুম রাত্রিবেলায় আমার বিছানার পাশে মোহনবাবু!… …

আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—লজ্জায়, সঙ্কোচে মাথা যেন কাটা যেতে লাগ্‌ল! জ্বরে যখন হুঁস্ ছিল না, তখন আমার গায়ের কাপড়-চোপড় নিশ্চয়ই অসামাল হয়েছিল! ছি, ছি, মোহনবাবু কি-বলে এমনসময়ে আমার ঘরে বসে আছেন! আর, তাও বলি—বাবাই বা কি-রকম মানুষ? আমার বিছানার পাশে একজন পুরুষকে বসিয়ে রেখে, তিনি কিনা অম্লানমুখে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন! তাঁর কি বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে?

ভারি রাগ হোল; মোহনবাবুকে ঘর থেকে চলে যেতে বললুম। তিনি আমার সহজে নড়তে চান না দেখে আমার রাগ আরো বেড়ে উঠল। কড়া কথা বলে' তাঁকে ঘর থেকে একরকম তাড়িয়েই দিলুম।

ভোর হবার আগেই বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি জেগে আছি দেখে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে বললেন, "কেমন আছিস মা?"

—"ভাল আছি।"

—"আঃ, বাঁচলুম! তোর জ্ঞান হয়েছে দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ এল! এ ক-দিন যে কি-করে' কেটেছে, তা—

—"হ্যাঁ বাবা, আমার অসুখ কি খুব বেশী হয়েছিল?"

—"ওঃ—যমে-মানুষে টানাটানি! ভাগ্যে মোহন ছিল, নৈলে তুই কি আর বাঁচতিস সরো?"

—"মোহনবাবু?"

—"হ্যাঁ মা! এ ক-দিন ক-রাত তোর জন্যে সে যে মুখের রক্ত তুলে খেটেছে। হ্যাঁরে, মোহন কোথায় গেল? বাড়ী গেছে বুঝি? আহা, তার শরীর নিশ্চয়ই কাহিল হয়ে পড়েছে—এ ক-দিন সে ঠায় তোর বিছানার পাশে বসেছিল,—আমার চেয়ে তোর উপরে তার যেন দরদ বেশী! ডাক্তার তাই কাল বলছিলেন, মোহন যদি না থাকত, তাহলে তোর অসুখ আরো সংঘাতিক হয়ে উঠত। আহা, মোহনের আমার ভাল হোক্!"

ভেবেছিলুম, বাবাকে খুব বকব! কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার মুখ

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

দিয়ে আর বাকি সয়ল না! মনের ভিতরে কেমন একটা খেদ জেগে উঠতে লাগল।

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "মোহনের মত যদি একটি পাত্র পেতুম, তাহলে আজ আর তোর কপালে এ দুঃখ"—বলতে-বলতে হঠাৎ তিনি আমার মুখ দেখে থেমে পড়লেন!

আজ সারাদিন মোহনবাবু আমাদের বাড়ীতে আসেন-নি।

বিকাল-বেলায় বাবা বললেন, "কি আশ্চর্য্য! মোহন আজ একবারও এল না বড় যে?"

মোহনবাবুকে ডাকবার জন্যে তিনি ঝীকে পাঠিয়ে দিলেন। ঝী ফিরে এসে বললে, মোহনবাবু সেই দুপুরে বেরিয়ে গেছেন—এখনো ফেরেন-নি।

বাবা অস্ফুট স্বরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য!"

কিন্তু, আমি বুঝলুম।

সন্ধ্যার সময় হরেনবাবু এলেন, কেমন আছি তাই জানতে! তিনিও মোহনবাবুর কোন খবর বলতে পারলেন না।

বাবা ঘাড় নেড়ে আবার বললেন, "কি আশ্চর্য্য!"

সে রাত গেল। তার পরের দিন শুনলুম, হঠাৎ কি বিশেষ দরকারে মোহন বাবু মধুপুরে গিয়েছেন।

বুঝলুম, এ সুধু অছিলা। এ ক-দিন আমাদের বাড়ীতে তিনি সারাদিনই থাকতেন, হঠাৎ একেবারে আসা বন্ধ করে' দিলে বাবা সন্দেহ করতে পারেন—এই ভয়েই মোহনবাবু কলকাতা ত্যাগ করেছেন।

না-জানি আমার অকৃতজ্ঞতায় প্রাণে তিনি কী আঘাতই পেয়েছেন!

দিনে দিনে আমি সেরে উঠতে লাগলুম।

বাবা বড় বেশী করে'ই মোহনবাবুর অভাব বোধ করতে লাগলেন। মোহনবাবু প্রায় সারা দিনটাই আমাদের বাড়ীতে কাটাতেন। হরেনবাবু এখনো রোজ সন্ধ্যায় এক-একবার আসেন বটে, কিন্তু বাকি সময়টা বাবা যে কি-করে' কাটাবেন, তাই নিয়ে তিনি যেন মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন!

বাবা সেদিন আমাকে বললেন, "মা সরো, মোহন যে আমার মনের এতখানি দখল করেছে, এতদিন তা বুঝি-নি। তোর জন্যে সে এমন করে' খাট্‌লে-খুটলে, কিন্তু তুই সেরে ওঠবার আগেই হঠাৎ চলে গেল, চিঠি-পত্রেও আর খবরাখবর নিলে না, এর কারণ কি? বিদেশে গিয়ে সে নিজে অসুখে-বিসুখে পড়ে নি ত!"

বাবাকে সব কথা বলব-বলব করে'ও বলতে পারলুম না—মুখে কেমন বেধে গেল! যিনি আমাদের এমন আত্মীয় ছিলেন, তাঁর প্রাণে যে আমি কত-বড় দাগাটা দিয়েছি, কোন্‌মুখে তা প্রকাশ করে' বলব!

বাবা একলাটি বসে-বসে তাঁর বেহালার উপরে ছড়ি টানেন, যখন বাজনা ভাল লাগে না তখন তাঁর নন্নুয়া-কুকুরকে নিয়ে সময় কাটান, তাকে আদর করেন, তার সঙ্গে আবোল-তাবোল কত কি বকেন!

নন্নুয়ার মত আর-কোন দেশী কুকুর বোধহয় মানুষের কাছে এর আগে এতটা আদর ভোগ করে-নি!

আজ সকালে বাবা আবার রাস্তা থেকে আর-একটি জীব সংগ্রহ করে' এনেছেন!

আমার কাছে এসে বললেন, "কাপড়ের ভিতরে এটা কি নড়ছে বল্ দেখি?"

আমি কিছুই ঠাহর করতে না পেরে বললুম,—"কি বাবা?"

বাবা হাসতে-হাসতে কাপড়ের ঢাকা খুললেন—ছোট্ট একটি বেড়াল!

তার গায়ে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, "এর নাম কি রেখেছি জানিস?"

—"এর মধ্যে নামও রেখে ফেলেছ বাবা?"

—"কি আশ্চর্য্য! নাম না রাখলে কি চলে? এর নাম রেখেছি মেনুয়া!"

এদিকে বাবার সাড়া পেয়ে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে আহ্লাদে জিভ্ বার করে' নন্নুয়া এসে হাজির! কিন্তু, বাবার কোলে হঠাৎ বেড়াল-ছানা দেখে সে বেজায় চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ল্যাজ-নাড়া একেবারে থামিয়ে ফেললে। তাকে অমন হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে, মনুয়াকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, "নন্নুয়া, তোর খেলার সাথী এনেছি রে!"

কিন্তু আ কপাল, নন্নুয়া আর মেনুয়া—দুজনেই দুজনকে দেখে মোটেই খুসী হল না! কোনরকম ইতস্তত না করে'ই নন্নুয়া তেড়ে এসে দিলে মেনুয়ার ঘাড়ে ঘ্যাঁক্ করে' এক কামড়, আর মেনুয়া ল্যাজটি ফুলিয়ে কলাগাছ করে', নন্নুয়ার নাকের ডগায় দিলে ধাঁ-করে' এক থাবা বসিয়ে! থাবা খেয়ে নন্নুয়ার মেজাজ আরো বিগড়ে গেল! সে দাঁত বের করে', চার হাত-পা তুলে মেনুয়াকে তফাৎ থেকেই নানারকমে ভয় দেখাতে সুরু করলে—কিন্তু তার থাবার সীমানায় ভরসা করে' আর এগুল না।

বাবা নন্নুয়াকে এক ধমক দিয়ে মেনুয়াকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "মেনুয়া, এ-বাড়ীতে থাকা সুবিধের নয় মনে করে', তুমি যেন পালিয়ে-টালিয়ে যেও না বাছা! দুষ্টু নন্নুয়াকে আমি দুদিনেই শায়েস্তা করে' দেব—তোমার কিছু ভয় নেই!"

তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে মেনুয়া করুণ স্বরে বলে উঠল—"মিউ!"

বাবা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এরা মানুষের কথা বোঝে—দেখ্‌চিস্ সরো!"

দিন-পনেরো কেটে গেল—মোহনবাবুর কোন খবর নেই! মোহনবাবুর বাড়ীতে স্ত্রীলোক ছিলেন একজন,—তাঁর পিসীমা। ঝীকে পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকেও কোন খবর পেলুম না—মোহনবাবু চিঠি-পত্র কিছুই লেখেন-নি।

আমার সেদিনকার কথাগুলো মোহন-বাবুর প্রাণে গিয়ে যে কতটা বিঁধেছে, এতদিনে সেটা বুঝতে পারলুম। নিজের মনের ব্যথা বুকেই চেপে রেখে দিনের পর দিন কাটাচ্ছি, রোজ ভাবি আজ তিনি আসবেন,—কিন্তু কৈ, তিনি ত এলেন না—

তিনি ত এলেন না!··· সেদিন বাবার বেহালায় যে সুরটি বাজছিল, সেটি শুনে আমার সেই সুরের একটি গান মনে পড়ল—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
মধু নিশি পূর্ণিমার, আসে যায় বারবার
সেজন ফিরে-না আর যে গেছে চলে!"

আর কি তিনি ফিরবেন? আর কি তিনি আমাদের দোর মাড়াবেন?

আজ সকালে কি-একটা কাজে ঘরের ভিতরে এলুম। মোহনবাবুর বাড়ীর দিককার জানলাটা খোলা ছিল। সেদিকে তাকিয়েই দেখতে পেলুম, মোহনবাবু ঘরের যে জানলাটা এতদিন বন্ধ ছিল—আজ সেটা খোলা। একটু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলুম। মোহনবাবুর ঘরের মধ্যে একখানা বড় আরসি ছিল, তার দিকে চোখ পড়ল। আরসিতে একটি লোকের ছায়া! দেখেই চমকে উঠলুম,—একি, এ যে মোহনবাবু!

বিছানার উপরে তিনি আধ-শোয়া আধ বসা অবস্থায় ছিলেন, তাঁর মুখখানি হেঁট-করা। তিনি কখন্ এসেছেন? আমরা ত কিছুই জানতে পারি-নি! জানলার কাছে আরো এগিয়ে গেলুম—তাঁকে ডাকা উচিত কিনা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগলুম।

এমনসময় তিনি মুখ তুললেন, কিন্তু আরসির দিকে চোখ পড়বামাত্র চমকে উঠলেন। আরসির ভিতরে আমার ছায়া দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন—তারপর ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। দেখলুন, যাবার সময়ে তাঁর মুখে-চোখে বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল!

আমার উপরে তিনি এখনো রাগ করে' আছেন! মনটা কেমন হা-হা করতে লাগল।

খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

ননুয়া আর মেনুয়াকে নিয়ে বাবা বারান্দায় বসেছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, "বাবা, মোহনবাবু এসেছেন!"

—"কি আশ্চর্য্য! কোথায় সে?"

—"তাঁর বাড়ীতে।"

বাবা তখনি মোহনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ছুট্‌লেন।

খানিক পরে, আমি রান্নাঘরে বসে আছি, বাবা ফিরে এসে হতাশ ভাবে বললেন, "হ্যাঁ মা, মোহন এসেছে বটে!"

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, "কৈ, তিনি এলেন না?"

—"না মা, বললে রেলে বড় কষ্ট হয়েছে—শরীর ভারি খারাপ!"

ফস্ করে' বলে ফেললুম, "আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করলেন না?"

—"কৈ আর করলে! আমিই বললুম, সরমা এখন একেবারে সেরে উঠেছে, তোমার জন্যেই এ যাত্রা সে বেঁচে গেল। মোহন শুনে হ্যাঁ না কিছুই বললে না—খালি একটু হাসলে। মোহনকে দেখে মনে হোল, সে-যেন কেমন খাপ্‌ছাড়া হয়ে গেছে! কেন বল্ দেখি মা?"

আমার চোখে জল এল, পাছে বাবা দেখে ফেলেন সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি উনুনের কাছে গিয়ে পিছন ফিরে বসলুম।··· ···

ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলুম।

মোহনবাবু যে রাগ করেছেন, এ কথা আর বেশীদিন লুকানো থাকবে না। বাবা আর হরেনবাবু যখন জানতে পারবেন যে, মোহনবাবু কেন রাগ করেছেন, তখন কি হবে? তাঁরা আমাকে কি ভাববেন?

তাঁরা কিছু ভাবুন না ভাবুন, তাতে তত যায়-আসে না—কিন্তু মোহনবাবুর চোখে আমি কত নীচে নেমে পড়েছি! যে লোক আমাদের বাড়ীতে দিনে এক-শো বার আসতেন, যিনি আমাদের সকল দিক দিয়ে সাহায্য করেছেন, যিনি আমাকে বাঁচাবার জন্যে শরীর দিয়ে মন দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন—আজ কিনা তাঁরই মন আমাদের দিক থেকে একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, তিনি এখানে এসেও আমাদের বাড়ী মাড়ালেন না, একটিবারও আমার নাম মুখেও আনলেন না! কেন আসবেন, কেন আমার নাম করবেন,—পোড়ারমুখী আমি—আমি যে নিজেই কটু-কথায় তাঁকে বিদায় দিয়েছি!

না-বুঝে, না-ভেবে অমন কথা কেন তাঁকে বললুম? রাত্রে আমার ঘরে আছেন বলে' তাঁর উপর রাগ করে' আমি যে প্রকারান্তরে তাঁর প্রতি অন্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেছি! এ-কথা কি তিনি ভুলতে পারেন?

ওগো তুমি ভুলে যাও, ভুলে যাও! আমি মনে-প্রাণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি—তুমি এস গো, আমাকে ক্ষমা কর! তুমি ভুলে যাও!

কিন্তু, তিনি এলেন না—আমাকে ক্ষমা চাইবার সুযোগও দিলেন না। সারাদিন এই-আসেন এই-আসেন মনে করে' তাঁর পথ চেয়ে বসে রইলুম,—তিনি এলেন না!

ফুলে-ফুলে রঙ্গে-রঙ্গে বাগানখানি ছেয়ে গেছে—উদাস-চোখে সেইদিকে চেয়ে জানলার ধারে বসেছিলুম। হঠাৎ দেখলুম, বাগানের এককোণে—যেখানে ঘনসবুজ লতাকুঞ্জ ঘাসের উপরে পুষ্পিত-পল্লবের কম্পমান ছায়াপাত করেছে—সেইখানে স্থির পাথরের মূর্ত্তির মত মোহনবাবু একলাটি বসে আছেন। পুকুরের কালো জল আলো করে' গুটিকয় রাজহাঁস দীর্ঘগ্রীবা হেলিয়ে এঁকে-বেঁকে জল-খেলা খেলছে, তিনি আনমনে চুপটি করে' তাই দেখছেন।

মোহনবাবুকে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না—আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালুম। বাইরের ঘর থেকে বাবার এস্রাজের আওয়াজ কাণে এল। একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলুম, যা করতে যাচ্ছি—এ কি উচিত? তারপরেই মনে হোল, দোষ যখন করেছি, তখন ক্ষমা চাইতে লজ্জা কি? এক-একবার মনে নারীর অভিমান জেগে উঠতে লাগল কিন্তু সে অন্যায় অভিমানকে আমি প্রবল হতে দিলুম না। মনকে শক্ত করে', খিড়্‌কির

দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

দুধারে কচি ঘাসে-ভরা জমি—মাঝ-খান দিয়ে ছোট্ট একটি রাঙ্গা কাঁকরের পথ। চলতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল—কিন্তু আমি থামলুম না—কি-যেন এক মন্ত্রের টানে কে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—আচ্ছন্নের মত চলতে-চলতে আমি সেই লতাকুঞ্জের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সেখানে গিয়ে মনে হোল, আবার ফিরে যাই—একি বেহায়াপনা করছি! কিন্তু তারপরেই ভাবলুম, এতদূর যখন এগিয়েছি, তখন আর ফেরা নয়!

কুঞ্জের পাশে যেখানে তাঁকে দেখে-ছিলুম, সেইখানে এক-পা এক-পা করে' এগিয়ে গিয়ে দুরু-দুরু বুকে ডাকলুম, "মোহনবাবু!"

কেউ সাড়া দিলে না।

সামনে আর-একটু ঝুঁকে পড়ে হতাশ চোখে দেখলুম, মোহনবাবু যেখানে বসে-ছিলেন, সেখানে কেউ নেই—তিনি কখন্ উঠে চলে গেছেন!

মাথাটা ঘুরে গেল—দুই চোখ মুদে সেইখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম।

মনের মাঝ থেকে কে-যেন সকাতরে বলে উঠল—ওরে অভাগী, তোর প্রাণের কান্না প্রাণেই ফিরে এসে, তোর রমণীত্বের সকল গর্ব্ব আজ ডুবিয়ে দিলে যে!

রাত্রে শোবার আগে বাবার কাছে গিয়ে বসলুম।

বাবা বললেন, "কি মা, আজ যে বড় এখনো জেগে?"

আমি মাটীর দিকে তাকিয়ে বললুম, "হ্যাঁ বাবা, মোহনবাবুর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়-নি?"

বাবা একটু দুঃখিত ভাবে বললেন, "ওরে, মোহন আর সে মোহন নেই! তার মনে কি হয়েছে তা সে-ই জানে!"

—"তাহলে দেখা হয়-নি?"

—"না।"

—"বাবা, মোহনবাবু আমাদের উপর রাগ করেছেন।"

—"রাগ? কেন মা, আমরা ত তার রাগ হবার মত কিছুই করি-নি!"

—"তুমি কিছু কর-নি বাবা, কিন্তু আমি তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি!"

বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "কি আশ্চর্য্য! তুই?"

আমি আর কিছু লুকোলুম না—একে একে সেদিনকার সমস্ত ব্যাপার বাবার কাছে খুলে বললুম। সমস্ত শুনে বাবা অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন।

তারপর ব্যথিত স্বরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এতবড় অন্যায়টা তুই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিস্! ছিঃ ছিঃ, মোহনের পায়ে ধরে' তোর মাফ চাওয়া উচিত!"

বাবার কোলের উপরে মুখ রেখে আমি কাঠের মত বসে রইলুম।

—"তাইত বলি, মোহন ত তেমন ছেলে নয়, হঠাৎ সে এমন হোল কেন? তলে-তলে এমন কাণ্ড হয়ে গেছে, কে

জানত তা? সে হয়ত ভাবছে, আমরা কি হীন, কি অকৃতজ্ঞ! ছি ছি, লজ্জার কথা, লজ্জার কথা! সুতরাং—"

চোদ্দ

মুরারিবাবুর কথা

সরমার মুখে সমস্ত শুনে সারারাত ভালরকম ঘুম হোল না; মোহন আমাদের কি ভাবছে, তাই ভেবে আমি যেন মরমে মরে গেলুম।

ঐ ত সরোর দোষ! সামান্য কারণে হঠাৎ এমনি বেঁকে দাঁড়াবে যে কার সাধ্য তখন তাকে আর বাগ মানায়! ওর ঐ উল্টো স্বভাবের জন্যে মাঝে-মাঝে আমাকেও কি কম ভুগতে হয়? কিন্তু আমি যে তোর বাপ! আমি যা সইব, অন্যে তা সইবে কেন বাছা?

ভোরবেলায় কাক-চিল ডাকতে-না-ডাকতেই উঠে মোহনের বাড়ীতে ছুটলুম। মোহন সবে তখন মুখ-হাত ধুয়ে নীচে নামছে,—আমাকে দেখে নামতে-নামতে সে সিঁড়ির উপরেই থমকে দাঁড়াল।

আমি তার সামনে গিয়ে বললুম, "মোহন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে!"

মোহন অবাক হয়ে আমার মুখপানে তাকিয়ে রইল; তারপর নেমে এসে আমাকে তার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালে।

মোহনের কাছে কথাটা কি-ভাবে পাড়ব তাই ভাবছি, হঠাৎ "হ্যাঁ হে মোহনলাল, যাবার সময়েও খবর দিলে না, আসবার সময়ও দিলে না—ব্যাপার কি বল দেখি?—এই যে মুরারিবাবু!"—বলতে বলতে হরেনবাবু ঘরে ঢুকে আমাকে নমস্কার করলেন।

—"হরেনবাবু, আজ এত সকালে যে?"

—"এই অকৃতজ্ঞ মোহনকে ধমকাতে। ওর জন্যে যারা ভেবে মরে, কত সহজে ও তাদের ভুলে যায়, দেখছেন ত! আমাদের মেয়েলি কথায় আছে না—'বনের মোষ খায়, বনের পানে ধায়'—ও হচ্ছে সেই জাতীয় জীব! বিদেশে না বলে-কয়ে চলে গেল, একখানা চিঠিও লিখলে না!"

হরেনবাবুর কাছে লুকিয়ে লাভ নেই—তিনি মোহনের প্রাণের বন্ধু, আজ হোক কাল হোক সমস্তই শুনতে পাবেন ত! এই-সব ভেবে-চিন্তে বললুম,—"হরেনবাবু, মোহন আমাদের উপর রাগ করেছে!"

মোহন চমকে উঠে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে, মাথা হেঁট করলে।

হরেনবাবু খানিকক্ষণ হা-করে' থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর আশ্চর্য্য স্বরে বললেন, "রাগ!"

—"হ্যাঁ। সরো ছেলেমানুষ, জ্বরে তার মাথা ঠিক ছিল না—কি বলতে কি বলে ফেলেছে! তার কথায় কি রাগ করতে আছে বাবা? মোহন, এই তোমার দুটি হাত ধরে বলছি, একবার গিয়ে দেখবে চল, সরো কি-রকম অনুতপ্ত হয়েছে! তুমি এখানে যে ক-দিন ছিলে না, সে ক-দিন সে খালি তোমার কথা তুলত। কিন্তু আমি কি ছাই এ-সব জানতুম! কাল তুমি কলকাতায় এসেও যখন আমাদের

বাড়ী মাড়ালে না, সরো তখন কাঁদো-কাঁদো মুখে আমার কাছে গিয়ে সকল কথা খুলে বললে। সে যা বলেছে, না-বুঝে জ্বরের ঘোরে বলেছে! মোহন, বাবা, তোমার আশ্রয়েই আমরা কলকাতায় রয়েছি, তুমি আমাদের এত উপকার করেছ—আমরা কি তোমাকে অপমান করতে পারি? চল বাবা, দেখবে চল—সরো তোমার আশায় বসে আছে, তোমার কাছে মাফ চাইবে বলে। সুতরাং—"

হরেনবাবু চীৎকার করে' বলে উঠলেন, "বটে, বটে? কিন্তু মুরারিবাবু, এতে ত আমি দ্রৌপদী-ঠাকরুণের কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না! তিনি রুগ্ন দেহে বেঠিক মাথায় যা বলেছেন, সুস্থ দেহে মোহন তাতে যখন রাগ করতে পেরেছে, তখন সে যে একটি অতি-বড় হস্তীমূর্খ, সত্যের অনুরোধে এ আমি স্বীকার করতে বাধ্য!"

আমি বললুম, "মোহন, বল, আমাদের তুমি ক্ষমা করবে?"

হরেনবাবু তাঁর হাতের ছড়ীটা ঠক্‌ঠক্ করে' মাটীর উপরে ঠুকে বললেন, "যে নিজে দোষী, সে মত দেবে না—দণ্ড নেবে। এখন ওর প্রতি কি শাস্তি বিধান করা যাবে—আসুন, আলোচনা দ্বারা সেইটেই অবধারণ করা যাক্।"

মোহন এতক্ষণ চুপ করে' বসেছিল। এবার সে লজ্জিতভাবে বললে, "মুরারিবাবু, আমারই অপরাধ হয়েছে—আমাকে ক্ষমা করুন।"

আমি বললুম, "কি আশ্চর্য্য! বাবা আমরা—

হরেনবাবু আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, "মুরারিবাবু, চুপ! আপনি আশ্চর্য্য হবার অবকাশ পরে যথেষ্ট পাবেন। আগে শাস্তির কথা হোক—আপোষে মেটালে চলবে না। তুমি মোহন, তোমার প্রতি এই শাস্তি হোল যে, তুমি অবিলম্বে শ্রীমতী দ্রৌপদী-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে তোমার এই প্রকাণ্ড নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে বিশেষ অনুতপ্ত চিত্তে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ওঠ—দেরি নয়, ওঠ!"

মোহন বললে, "এতে আমি রাজি। কিন্তু—"

"কী! আবার কিন্তু? এ সব বাক-চাতুরী চলবে না মোহন!"—হরেনবাবু দু-হাতে শিশুর মত মোহনকে আগে শূন্যে তুলে, তারপর দাঁড়-করিয়ে দিয়ে আবার বললেন, "যাও! আগে ক্ষমা চেয়ে এস—নইলে আর তোমার মুখদর্শন করব না! অ্যাঁ,—দ্রৌপদী-ঠাকরুণের উপরে রাগ? যাঁর স্বহস্তে ভর্জ্জিত ঘৃতপক্ক লুচি এবং অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি উদরসাৎ করে' আমরা পৃথিবীতে বসেও স্বশরীরে স্বর্গলাভের পরমানন্দ উপভোগ করি, তাঁর উপরে রাগ! অকৃতজ্ঞ মোহন, শীঘ্র যাও! ততক্ষণ আমরা এখানে বসে গল্পগুজব করি! যাও—যাও, আর দাঁড়িও না বলছি!"

পনেরো

মোহনের কথা

সরমার ব্যবহারে সে দিন কী মর্ম্মাহত হয়েছিলুম!

কলকাতায় থাকলে পাছে আবার বাধ্য

হয়ে সরমাকে দেখতে যেতে হয়, সেই ভয়ে আমি দেশত্যাগী হলুম। ভাবলুম, যে আমাকে চায় না—আমিও তাকে ভুলে যাব! কিন্তু যার দিকে আমার সকল প্রাণ-মন একাগ্র হয়ে আছে, তাকে ভোলা কি সহজ! সামান্য একটা উল্কীর আঁচড় দেহের উপর থেকে তুলে ফেলা যায় না, আর দেহের ভিতরে প্রাণের মাঝখানে যে ছবি আঁকা হয়ে যায় সে ছবি পুঁছতে গেলে প্রাণকেও যে ত্যাগ করতে হয়!

পনেরো দিন বিদেশে ছিলুম—এ পনেরো দিন যে কি-করে', কোথা দিয়ে কেটেছে, তা আমি জানি আর জানেন ভগবান! সত্যি, দিন কারুর জন্যে বসে থাকে না, দিন কেটে যায়; কিন্তু আশাহীনের এক-একটি দুঃখের দিনের সঙ্গে-সঙ্গে তার বুকের এক-একটি তন্ত্রীও যে বেসুরো হয়ে ছিঁড়ে যেতে থাকে!

সরমাকে ছেড়ে থাকতে আর পারলুম কৈ! যদিও তার সেদিনকার নিষ্ঠুর কথাগুলো সূচের মত বুকের মধ্যে বারংবার বিঁধ্‌ছিল, তবু জানি না, কি মোহের টানে সেই ব্যথাকাতর প্রাণ নিয়েই আবার কলকাতায় ফিরে এলুম।

ফিরে এসে সবে ঘরে বসে বিশ্রাম করছি,—আরসির মধ্যে দেখলুম তার ছায়া! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নীরবে সে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। আমার মনে হোল, তার সেই নীরবতা, মৌন ব্যঙ্গ বৈ আর-কিছুই নয়! সে কি তাই দেখছিল নিস্তব্ধভাবে, যে, তার নিষ্ঠুর আঘাতে আমি কতটা মুহ্যমান হয়ে পড়েছি? আবার আমার মনের মধ্যে অভিমান উথলে উঠল,—আমি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে'ই সে ঘর ছেড়ে চলে এলুম।

কিন্তু আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম, তাকেও ভাল করে' বুঝি-নি! তখন যদি বুঝতুম যে, তার সে নীরবতা লজ্জা-অনুতাপের নীরবতা, দীনতার নীরবতা, তাহলে কি তেমন করে' মুখ ফিরিয়ে চলে আসতে পারতুম? না, তা' ত পারতুম না!

পরদিন প্রভাতেই যখন মুরারিবাবুর মুখে সমস্ত শুনলুম, তখনি বুঝলুম সরমার উপরে আমি কত-বড় অবিচারটা করেছি! আমার সকল রাগ, সকল অভিমান, আবেগের স্রোতে কুটোর মত এক লহমায় ভেসে গেল—একান্ত লজ্জিত হয়ে মূঢ়ের মত আমি বসে রইলুম।

তারপর দুষ্ট হরেন যখন তার বাক্য-চাতুর্য্যের দ্বারা সরমার সঙ্গে আমার নির্জ্জনে সাক্ষাৎলাভের সুযোগ ঘটিয়ে দিলে, তখন সে মাহেন্দ্রক্ষণকে আর আমি অবহেলা করতে পারলুম না!

ঘরের দরজার কাছে সরমা প্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে বসেছিল। আমার পদ-শব্দ শুনে সচকিতে সে একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েই, আবার লজ্জিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে।

দোষীর মত তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম—কিন্তু কোন কথা কইতে পারলুম না।

সরমাও মৌনমুখে মাথা নামিয়ে হাতের আঙ্গুলে আঁচলের খুঁটটা জড়াতে লাগল।

কি বলি? কি করি? কত কথাই

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

মনে হোতে লাগল, কিন্তু মুখের কাছে এসেই বুকের কথা হারিয়ে যায় কেন? অনেকক্ষণ পরে সুধু বললুম, "সরমা!"

সরমা আবার মুখ তুললে! 'সরমা' বলে তার নাম ধরে আর-কোনদিন ডাকি-নি, কিন্তু আমার মুখে এই প্রথম তার নাম শুনে সে কিছুমাত্র বিস্মিত হোল না —সে যেন আমার কাছ থেকে এমনি সম্বোধনের জন্যেই আগে-থাকতে প্রস্তুত ছিল!

সরমার চোখদুটি কি কাতর, কি করুণ, কি ছলছল! সে আয়ত নয়নে তার প্রাণের যে দুঃখ-তাপের ছায়া এসে পড়েছে, মুখের কথা এর চেয়ে আর বেশী কি প্রকাশ করবে?

মিনতি করে' বললুম, "আমি না বুঝে তোমার ওপর অত্যন্ত অবিচার করেছি, আমাকে ক্ষমা কর।"

সরমা যেন খুব চেষ্টা-করে' কথা কইলে। মৃদুস্বরে, সকাতরে সে বললে, "মোহনবাবু, অবিচার আপনি করেন-নি,—আমি করেছি। ক্ষমা করবার অধিকারও আমার নেই—আপনার আছে। আমি যা বলেছি, যে অন্যায় করেছি, সমস্ত ভুলে গিয়ে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"—বলে, সরমা ঊর্দ্ধ-মুখী ফুলের মত তার মুখখানি তুলে হাত-দুটি যোড় করে' ধরলে!

আমি আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, "সরমা, এ-সব বিচার-অবিচারের কথা ছেড়ে দাও,—আমাদের মনের অন্ধকার যখন দূর হয়ে গেল, তখন আমরা আর কেউ ভাবের ঘরে চুরি করব না!"

এমনসময় নীচে হরেনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ওহে মোহন, আশা করি এতক্ষণে তোমাদের পালা শেষ হয়েছে—অতএব, যবনিকা-পতনের হুকুম হোক!"

হরেন আর মুরারিবাবু উপরে এলেন। সরমা মাথায় ঘোমটা টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল। হরেন বললে, "দ্রৌপদী-ঠাকরুণ, আজকের এই সন্ধি-স্থাপন ব্যাপারে আমি দূতগিরি করেছি; অতএব—"

মুরারিবাবু বললেন, "অবশ্য, অবশ্য!"

সরমা মৃদুস্বরে বললে, "বাবা, ওঁকে বল যে, উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে,—আমি এখনি গিয়ে কড়া চড়িয়ে দেব!"

সেদিন দুপুরবেলায় খেতে বসেছি, পিসিমা পরিবেষণ করছেন। সংসারে এখন আমার আপন বলতে আছেন, এই পিসিমা আর একটি বোন। পিসিমার ছেলেপুলে কিছু হয়-নি, তিনি বিধবাও হয়েছেন অনেকদিন।

পিসিমা আমার পাতে মোচার ঘণ্ট দিতে-দিতে বললেন, "হ্যাঁরে, ও-বাড়ীতে তুই যে হামেসাই আসা-যাওয়া করিস, ওরা কারা?"

বুঝলুম পিসিমা মুরারিবাবুদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। আমি বললুম, "পিসিমা, ওঁরা আমাদেরই জাত!"

—"তা শুনলুম ওদের নাকি একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে?"

—"কোথা থেকে শুনলে পিসিমা?"

—"তিনুর মার মুখে।"

—"হ্যাঁ, আছে। তার নাম সরমা। সরমাকে দেখবে?"

—"তা, দেখতে দোষ কি?"

—"আচ্ছা, খেয়ে উঠেই সরমাকে এনে দেখাব।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে, সরমার কাছে গিয়ে বললুম, "আমার পিসিমা তোমাকে ডেকে-ছেন। একবার আমাদের বাড়ীতে আসবে?"

সরমা রাজি হোল। বাগানের পথ দিয়ে তাকে নিয়ে আমি পিসিমার কাছে এলুম।

পিসিমা, সরমাকে আগে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন,—তিনি সেকেলে মানুষ, একেলে আদব-কায়দার কোন ধার ধারেন না।

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "মোহন, এম্‌নি একটি রাঙ্গা বৌ যেদিন তোর জন্যে ঘরে আনতে পারব, সেদিন আমার সাধ মিটবে।"

সরমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আহা মা, এই বয়সেই তোমার কপাল পুড়েছে—ভগবানের এ কী অবিচার!"

সরমা মাথা হেঁট করে' দাঁড়িয়ে রইল।

পিসিমা আবার বললেন, "যাহোক্ মা, খুব সাবধানে থেক! তোমার এই সোমত্ত বয়েস, এ বয়েসে নানান জ্বালা! পুরুষ পরেশ-পাথর, যা করে তা শোভা পায়, কিন্তু মেয়েমানুষের সব তাতেই—"

"আঃ পিসিমা, কি যে বল তার ঠিকানা নেই। কোথায় দুটো ভাল কথা কইবে, না, যত-সব সৃষ্টিছাড়া কথা! চল সরমা, তোমাকে রেখে আসি।"

পিসিমার কথায় সরমা কেমন জড়সড় হয়ে পড়েছিল। আমি তাকে ডাকবা মাত্রই পিসিমার পায়ে সে টিপ্ করে' একটি নমস্কার দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এল।

সরমাকে রেখে আমি যখন বাড়ী ফিরে এলুম, পিসিমা আবার আমার কাছে এসে ধরা দিয়ে পড়লেন।

বললেন, "হ্যাঁরে মোহন, এ-সব কি শুনছি?""

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কি শুনছ?"

—"তোদের সরমা নাকি বাজনা বাজায়, তুই গান গাস্, ওর সঙ্গে একলা একঘরে বসে কথা কস্?"

—"কে বললে?"

—"কেন, তিনুর মা।"

—"কি-করে' জানলে সে?"

—"তাদের বাড়ী থেকে যে আমাদের ও-বাড়ীর সবটা দ্যাখা যায়।"

—"হ্যাঁ, যা বললে তার কতক সত্যি কতক মিথ্যে! কিন্তু তিনুর মার আমাদের নিয়ে এত মাথাব্যাথা কেন?"

পিসিমা গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা, অবাক! তুই আইবুড়ো সোমত্ত ছেলে আর সরমা একে সোমত্ত, তায় বিধবা! লোকের দোষ কি, বলবে না? আরো কত কথা রটেছে, তা কি তুই জানিস?"

আমি রেগে বললুম, "জানতে চাইনা! ফের্ যদি এ-সব কথা নিয়ে আমার বাড়ীতে কেউ আসে, তাহলে দরোয়ানকে বলে

দেব, কারুকে যেন বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়।"

আমাকে রাগতে দেখে পিসিমা থতমত খেয়ে বলতে-বলতে চলে গেলেন, "একালের সব উল্টোছিষ্টি—ঘোর কলি কিনা, হবে না কেন?"

এতক্ষণে বুঝলুম, পিসিমা আজ হঠাৎ কেন মুরারিবাবুদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সরমার সঙ্গে অমন অপূর্ব্ব ভণিতা করে' কথা কইলেন!

একটু চিন্তিত হলুম। বাঙ্গালী-সমাজে জনরব বড় ভয়ানক জিনিস। মুরারিবাবু যে-রকম ভীতু, সরল স্বভাবের মানুষ,—এ-সব কুৎসিত কথা যদি তাঁর কাণে গিয়ে ওঠে, তাহলে তিনি একেবারেই মুসড়ে পড়বেন। আর, একবার কুৎসা রটাবার, ঘোঁট পাকাবার সুবিধা পেলে পাড়া-পড়শীরা চরম না-করে' ত ছাড়ে না! এখন এর উপায় কি? পিসিমা যা বললেন, সেটা ত উপেক্ষা করবার ব্যাপার নয়! এইবেলা যদি সাবধান না হই, দুষ্টলোকের মুখবন্ধের চেষ্টা না করি, তবে আজ যা সামান্য বলে ভাবছি, কাল তাই অসামান্য ও অসহনীয় হয়ে উঠবেই-উঠবে!

(ক্রমশ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বিবেকানন্দ-সঙ্গমে

(Jules Bois প্রণীত Visions de L'Inde হইতে)

সহর দূরে চলিয়া গেল। এতক্ষণে বারো মাইল দীর্ঘ পোতাশ্রয় (ডক্) প্রভৃতিরও শেষ হইল। জোয়ার আসিয়াছে। আমাদিগের চারিদিকেই গঙ্গার জল বর্দ্ধিত হইতেছে। জোয়ারের অনুকূল স্রোত আমাদিগের পান্সী-খানিকে মঠের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। মঠ-বাড়ীটি শুভ্র—সর্ব্বত্র সুন্দর চূণকাম করা, উদ্যান ও তালীকুঞ্জে বেষ্টিত। ত্রিশূল-শীর্ষ মন্দির-চূড়া সকলের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। অদূরে মঠ-সংলগ্ন সৌধ-শ্রেণী যেন আমাদিগকে শিষ্টভাবে আহ্বান করিতেছে।

আমার সহযাত্রী মার্কিণ-রমণী গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন। নিউইয়র্ক সহরে বিবেকানন্দের সর্ব্বচিত্তহারী অপূর্ব্ব শক্তির কথা শুনিয়া তিনি আজ পর্য্যন্ত তাহা ভুলিতে পারেন নাই। একত্রে সাধু-সন্দর্শনে যাওয়ার প্রস্তাব করিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। এই মহিলাটির দেশ-পর্য্যটনে ক্লান্তি নাই। পারি-নগরীতে প্রদর্শনীর সময় তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে। তাহার পর, পুনরায় কায়রো-নগরীতে সাক্ষাৎ। গতকল্য গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে আবার দেখা হইল। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ খরধার দৃষ্টি, অপাপবিদ্ধ মুখচ্ছবি ও সেই দুরাকাঙ্ক্ষ্য অতৃপ্ত ভাব সহজেই তাঁহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, "দেখুন, পৃথিবীটা কত ক্ষুদ্র!" বাস্তবিক ধরিতে গেলে, আমাদের এই বিপুল পৃথিবী একটা বিরাট চতুষ্পথ মাত্র। এখানে ভ্রমণশীল পথিকবৃন্দ অনুপ্রস্থে গমনকালীন সর্ব্বদাই পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকে।

বিবেকানন্দ অলিন্দে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বিশাল-আয়ত নেত্রদ্বয় মুখ-মণ্ডলের যেন অধিকাংশই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে শ্যামাঙ্গ ব্যক্তিটি প্রাচীন আর্য্যগণের সেই ছয় সহস্র বৎসরের পুরাতন বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আমি ভূমণ্ডলের যে কোণটিতে বাস করি সেখান হইতে ইঁহার জন্মস্থান কতই না দূরে অবস্থিত! ইনি ভিন্ন-ভাষাভাষী, ভিন্ন দেবের উপাসক, তথাপি আমি ইঁহাকেই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে বরণ করিয়াছিলাম। পারি-নগরীতে অবস্থান-কালে তিনি কয়েকসপ্তাহ আমার গৃহেই বাস করিয়াছিলেন। আমরা একত্রে কনস্তান্তি-নোপ্‌ল্, গ্রীস ও মিসর দেশ ভ্রমণ করিয়া ছিলাম! তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বিপুল ভাবোন্মাদনার সাহায্যে আমার মানসচক্ষে ভারতবর্ষের যে চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সে দেশকে আমার স্বপ্নের পিতৃভূমি-বোধে স্নেহের সহিত হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম। আমার মনের মাধুরী মিশাইয়া আমি যে আদর্শটি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহা এই কল্পনার নন্দন-কাননেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমরা উভয়ে পরলোক ও অদৃষ্টবাদের কত না কথাই আলোচনা করিয়াছি! যে মহাপ্রাণ টলষ্টয় এখন মহাপথের আসন্নযাত্রী*, তাঁহার ন্যায় এই হিন্দুটিরও বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজের চিন্তা ও বিশ্বাস-অনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি ভবঘুরের মত দেশে দেশে ঘুরিয়াছেন, সংসারে মানবের যাহা গর্ব্ব ও আনন্দের বস্তু, সে সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন; স্নেহ-ভালবাসা, আত্মীয়-স্বজন,—এমন-কি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরূপে যশোলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইনি এখন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী! ইমার্সনের ভাষায় ইঁহার জীবনের ইতিহাসকেও representative বা আদর্শ-জ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। তরুণবয়সে ইঁহার একজন সাধুর সহিত পরিচয় হয়—তিনি 'পরমহংস' 'মহাত্মা'। ইনি অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ—বিজ্ঞানের বড় ধার ধারিতেন না; কিন্তু তপশ্চর্য্যা ও কঠোর সন্ন্যাসব্রতে বিশেষ শক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ হিন্দুদিগের দুইটি প্রধান দেবতা ও বীরপুরুষের নামানুসারে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিত—মনে করিত, একাধারে তিনি এই দুই দেবতারই 'অবতার'। যে সংস্কৃত ভাষা এখনও ভারতে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত তাহাতে রামকৃষ্ণের অধিকার ছিল না। তিনি কখনও বিদেশে ভ্রমণ করেন নাই। কলিকাতার উত্তরে একটি কালিকা-মন্দিরের উদ্যানে তাঁহার অদীর্ঘ জীবন-স্রোত মৃদুভাবেই প্রবাহিত হইয়াছিল। ভাবাবেশ যখন তাঁহাকে আর ধ্যানের অতল-স্পর্শ গভীরতায় রুদ্ধ রাখিতে পারিত না সেই সময়ে মুক্তিকামী জনগণের প্রতি তাঁহার

* জুল বোয়ার পুস্তকখানি ১৯০৩খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

কথামৃত অজস্রধারে বর্ষিত হইত। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহার উপদেশাবলী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। বালকের স্বদেশনিষ্ঠ হৃদয়খানি তখন দেশের দুঃখ ও নিরাশায় কত-না বেদনায় ভরিয়া উঠিত! তিনি ভাবিতেন, এই নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর উপদেশ অবলম্বন করিয়া তিনি জন্মভূমির উন্নতি-সাধনে ব্রতী হইবেন। গুরু তাঁহার বিবেকানন্দ নামকরণ করিয়াছিলেন এবং সংস্কারকের উপযোগী অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁহাকে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তরুণ শিষ্যটির মানবাত্মার পরমাত্মায় বিলীনতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি বেশ-ভূষা ছাড়িয়া, অঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখনও রাজার প্রাসাদে আহার করেন, কখনও দীনহীন কৃষকের পর্ণকুটীরে আশ্রয় লন—কখনও বা বারান্দায় কখনও বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করেন। গুরুদেবের তিরোভাবে শোকাকুল বিবেকানন্দ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে এইরূপ অধীর ভাবেই দিনপাত করিতে লাগিলেন; যাহাতে প্রত্যাদিষ্ট প্রচারকার্য্য সফল ও চিরস্মরণীয় হয়, সে-সম্বন্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ইহা বিশ্ব-মানবের ধর্ম্ম—পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। ইহার কোনও নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নাই—সকল দেবতা, সকল ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা মহাপুরুষগণের প্রতিই এ ধর্ম্মের সমান ভক্তি ও অনুরাগ। পর্য্যটনরত ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবন যাপন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বলবতী হইয়া উঠিলে বিবেকানন্দ মার্কিণ দেশে যাত্রা করেন। সেখানে সভায় পরিষদে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব যশোলাভ ঘটে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাঁহার বাঙ্গালী-সুলভ ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্যটুকুও সেইখানে নষ্ট হইয়া যায়। বংশগত যকৃতের দোষে ও বহুমূত্ররোগে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে। যাহা হউক সুখের কথা এই যে, তাঁহার বিদেশ-গমন নিষ্ফল হয় নাই। তিনি প্রত্যাগমন-কালে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, মঠ-প্রতিষ্ঠা ও গুরু-ভাইদের একত্র করিয়া সঙ্ঘ-স্থাপনার জন্য সেই অর্থই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতেই সর্ব্বপ্রথমে এই সম্বন্ধেই কথা-বার্ত্তা হইল।

বিবেকানন্দ বলিলেন, "বন্ধু, আমি মুক্তি পাইয়াছি। গুরুভার শৃঙ্খলের ন্যায় কাঞ্চনরাশি বহন করিতেছিলাম, সমস্ত উৎসর্গ করিয়া—এখন যেন নূতন করিয়া মুক্তি লাভ করিলাম। আমি এখন জগতের দরিদ্রতম দেশের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি। কিন্তু তাহাতে কি? আমার রামকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখানে আমার গুরুভাই ও শিষ্যগণের এখন মাথা গুঁজিবার স্থান হইয়াছে।" তিনি আমার সঙ্গিনী মার্কিণ-বাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া কতই নম্রতার সহিত জোড়করে—মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিলেন। আমাদের প্রতীচ্য দেশে এ ভঙ্গীটি কেবল প্রার্থনার সময়েই দেখা যায়; কিন্তু হিন্দু-শিল্পে দেবগণের সহ-ভঙ্গীতেই ধর্ম্মিণীরা তাঁহাদের ভর্ত্তৃদিগের সম্মুখে এইরূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকেন।

বিবেকানন্দ আমাদিগকে অপর সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন, ইঁহারাই আমার ভ্রাতা ও সন্তানস্থানীয়।"

মোহন উষ্ণীশধারী তরুণ তাপসগণ আমাদিগের প্রতি সহাস্যে ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহাদিগের সরল অপাঙ্গের অকপট দৃষ্টি দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল যে, জীবনের কর্ম্মশালায় তাঁহারা এখনও শিক্ষনবীস মাত্র। বৃদ্ধ মঠবাসিগণ কিয়ৎক্ষণের জন্য বেদাদি-সংক্রান্ত গবেষণা হইতে আপনা-দিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগের শৈব চিহ্নে চিহ্নিত ললাটদেশ আমাদিগের উদ্দেশ্যে অবনত করিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, এমন-কি অস্পৃশ্য চণ্ডাল পর্য্যন্ত একত্রে সম্মিলিত। এই ধর্ম্মোপদেষ্টাটির নিকট জাতি-ভেদের কোনও স্থান নাই—কারণ ঈশ্বর সকল মানবেই সমভাবে বিরাজমান। একজন শিষ্য তামাক খাইতেছিল। স্বামীজি তাঁহার হাত হইতে গড়গড়াটি তুলিয়া লইয়া—তাহাতে একবার টান দিয়া ফিরাইয়া উহা প্রত্যর্পণ দিলেন। গোলাপী গন্ধে চারিদিক ভরপুর হইয়া উঠিল। বিবেকানন্দ আমাদিগের হাতে কয়েকটি পদ্মফুল দিয়া বলিলেন, "চলুন, ছাদের উপর যাওয়া যাক্। আমার বন্ধুরা এখন "টিফিন" প্রস্তুত করিতে যাইতেছেন।" ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে দ্বিপ্রাহরিক আহার এখন "টিফিন" নামেই অভিহিত।

উপর হইতে কি-এক অপূর্ব্ব প্রাণস্পর্শী দৃশ্য আমাদের নয়ন-পথে পতিত হইল! প্রচণ্ড সৌরকরোদ্ভাসিত মুক্ত গগন-তলে একি বিমোহন চিরনবীন পল্লী-শোভা! সরসীগুলি আরসির ন্যায়ই স্বচ্ছ! যেন কোনও পলায়ন-পরা দেববালা সেগুলি ভূতলে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে কানন-শ্রেণী মখমল-সুকোমল সুদীর্ঘ রোমাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। গঙ্গার রজতধারা প্রণয়ীর বাহুর ন্যায় বসুধার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পর পারে আর-একটি উচ্চ মন্দির-চূড়া দেখিতে পাইতেছি; উহার সন্নিকটে একটি বিশাল-বিতত-শাখ বটবৃক্ষ। এই প্রাচীন বৃক্ষের শাখাদি হইতে 'শিকড়' নামিয়া—মৃত্তিকাসংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ এক-একটি বিভিন্ন বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামীজি কহিলেন, "ওই ছায়াশীতল বৃক্ষতলে আমার প্রভু রামকৃষ্ণদেব প্রথমে সমাধিমগ্ন হইয়া পরমাত্মায় বিলীন হইয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সাধনার স্থান বুদ্ধ-গয়ার বোধিদ্রুম বৌদ্ধগণের নিকট যেরূপ পবিত্র, ওই বৃক্ষটিও আমাদের চক্ষে তাহা অপেক্ষা কম পবিত্র নহে।"

আধঘণ্টা পরে—তাঁহার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিবেকানন্দ আমাদিগকে স্বহস্তে 'টিফিন' আনিয়া দিলেন। ডিম, টাটকা দুগ্ধ, সুগন্ধি অন্ন * ও কতকগুলি আম্র রহিয়াছে দেখিলাম। এই ফলগুলি আমাদিগের নিকট 'পীচ' (Peach) অপেক্ষাও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হইল। মঠে আমিষের ব্যবহার নাই; সেজন্য আমিষ-সম্পর্কীয় খাদ্যাদি আমাদিগকে দিতে পারিলেন না বলিয়া স্বামীজি ত্রুটি স্বীকার করিলেন। তাঁহার এই কক্ষটি বড় অদ্ভুত রকমের।

* ফরাসী "grain" শব্দের অর্থ 'berry' বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলও হইতে পারে।

হিন্দু সন্ন্যাসীর আড়ম্বরহীন নগ্নতার সহিত যেন পাশ্চাত্য দার্শনিকের ব্যবহারিক গৃহ-সজ্জা বিচিত্র ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। দোদুল আরাম-কেদারা—বহুবিধ গ্রন্থপূর্ণ গ্রন্থাগার সবই রহিয়াছে দেখিতেছি। ইমার্সন ও স্পেন্সার কীটদষ্ট দেশীয় পুস্তকাদির সহিত এক পংক্তিতেই ঠাসাঠাসিভাবে স্থান পাইয়াছে একটি নম্রস্বভাব শিষ্য হরিৎপত্রে মণ্ডিত কয়েকটি ('দোনা-করা') পান আমাদিগকে আনিয়া দিল। শুনিলাম, পর্ণপত্রগুলি সমস্তই মঠের উদ্যান হইতে সংগৃহীত। আমি খিলি লইয়া চিবাইতে লাগিলাম। ফুলের গন্ধে, তাম্রকূটের আস্বাদে ও খিলির রসে আমার মুখ পরিপূর্ণ হইল —দন্তপাতি আরক্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই লোকে মাদক দ্রব্যাদি ধূমপান বা চর্ব্বণ করিয়া ব্যবহার করে। আমাদিগের নিকট জীবন শুধুই স্বপ্নবৎ। আপনারা যাহাকে স্বপ্ন বলিয়া থাকেন আমরা তাহাই বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করি। দৃষ্টিগ্রাহ্য বা স্পর্শ-যোগ্য বলিয়া আপনারা যাহা সত্য, প্রকৃত ও সত্বাসংযুক্ত বলিয়া মনে করেন, আমাদিগের নিকট তাহা মায়া-প্রপঞ্চ মাত্র—মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অলীক। এ সকলই সর্ব্বক্ষণ পরিবর্ত্তন-শীল, সর্ব্বদাই ধ্বংস-প্রবণ। ইহাতে এমন কোনও গুণ নাই যাহাতে আসক্তি জন্মাইতে পারে বা যাহার জন্য এই সকল মায়িক দৃশ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন ঘটে। নগর-জনপদ, বিলাস-ব্যসন, ঐশ্বর্য্য-গৌরব-সভ্যতা, জাতীয় উন্নতি ও জড়-বিজ্ঞানের অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি আমাদের কিছুই অবিদিত নাই। কয়েক শতাব্দীর পরীক্ষার ফলে আমরা এখন ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; এ সকল শুধু বালকের ক্রীড়নক—বালকের জন্যই নির্ম্মিত। আপনারা যে কঠোর স্বপ্নমোহে এখনও আবিষ্ট রহিয়াছেন, আমরা তাহা বর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই জাগরিত হইয়াছি। আমরা শ্বাস রোধ করিয়া কোনও সুবৃহৎ বৃক্ষের তলায় বসিয়া সেই পুরাকালীন 'অগ্নি'র প্রতি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চাহিয়া থাকি। যিনি ভূমা—যিনি অনন্ত—যিনি স্বয়ং জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত, তিনিই তাঁহার অপরূপ দ্বারগুলি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া দেন—আমরা সেই পথ দিয়া অন্তর্জ্জগতের সেই একমাত্র সত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকি। আপনারা নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন, এ যাবৎ খুব অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়ই যোগসাধনার এই সকল রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

আমরা প্রকোষ্ঠের জানালার দিকে ঝুঁকিয়া দেখিলাম। কোথায় একটা ঘড়ি টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিল। নীচে—বৃক্ষবাটিকায় একটি উদুম্বর তরুতলে সন্ন্যাসীরা বৃত্তাকারে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তালে তালে, যেন ছন্দের মাত্রায় মাত্রায় তাঁহারা নিজেদের শির ও পৃষ্ঠদেশ দুলাইতে ছিলেন। যে সন্ন্যাসীটি একটু পূর্ব্বেই আমাদিগের সহচর ছিলেন, তিনিও দেখিতেছি এক অশ্রুতপূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম-স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন; শুনিলে আমাদের গির্জ্জা-ঘরের plain-chant গীতের কথা মনে পড়ে; তবে, তার চেয়েও এই স্তোত্র যেন

আরও একটু রুক্ষ—আরও আনন্দ-পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। অগ্নির একপার্শ্বে পুষ্পমাল্যভারে সজ্জিত শিবের ত্রিশূল প্রোথিত! যে অগ্নিশিখায় দেবতা স্বয়ং বিরাজমান, সকলেই নিবিষ্টচিত্তে তাহারই প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছেন। এই অগ্নিগর্ভ আত্মার সম্মোহন শক্তিপ্রভাবে কোনও অপূর্ব্ব স্বপ্নে অভিভূত এই সকল সেন্দ্রিয় দেহীগণ হইতে কি জানি কি এক বিপুল শান্তি উচ্চে উত্থিত হইতেছিল! আমাদিগের উন্মত্ত কর্ম্ম-প্রবণতার তুলনায় এ শান্তি যেন আরও ভয়াবহ! মনে হইতেছিল, এই ভীষণ স্থৈর্য্যের ভিতর দিয়া পবিত্র স্তোত্র-গীতের প্রতিধ্বনি যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া ত্রিদিবের পথে অগ্রসর হইতেছে! সুবর্ণপ্রভ মধু-মক্ষিকাগণ সূর্য্যকিরণে এই সকল যোগানন্দে মগ্ন সাধুর মস্তকের উপর নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে। এদিকে পবিত্র গোশালার ভিতর সযত্নপালিত গাভীগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া যে অপরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মানব বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিনা-মৃত্যুতে মোক্ষলাভ করে—সেই অসাধারণ আরাধনা-পদ্ধতির সহিত যেন নিজেদের সাহচর্য্য জ্ঞাপন করিতেছিল!

শ্রীগুরুদাস সরকার।

আমাদের নিজস্ব সম্পদ কোথায়

আমাদের সম্মুখে এখন বহুবিধ সমস্যা! রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতি,—যেদিকেই তাকাই সেই দিকেই আমাদের জাতীয় জীবনের গোড়ায় গলদ দেখি। সংসারটা আগাগোড়া পরিবর্ত্তনশীল; জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে বিশ্বসংসার প্রতিদিন বিচিত্র পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদের জাতীয় জীবন-ধারা যে সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবে, উহাও কতক জ্ঞাতসারে, এবং কতক-বা অজ্ঞাতসারে হইবে।

কিন্তু সম্মুখে এই এক বিষম সমস্যা উপস্থিত যে, আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব? আমাদের যদি নিজস্ব কিছু থাকিত, তবে এমন ভাবে আমাদের এ ভাবনা ভাবিতে হইত না। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা নিজস্ব সম্পদ হারাইয়া পরের সম্পদেই একরূপ প্রাণ-রক্ষা করিয়া আসিতেছি। তারপর হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্শি, সকলে মিলিয়া ভারতবর্ষে এমন বিভিন্নতার সৃজন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষের নিজস্ব বলিতে সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে কল্পনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন মাহাত্ম্য জাহির করিতেছেন। এবং ভারতীয় সভ্যতাকে ইঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে দেখিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ জাতীয়তার ক্ষেত্রে কোনও দিক দিয়া আপনার যথার্থ মহিমা প্রকাশ করিতে পারে নাই।

তাই ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন সভ্যতা জাতীয়ত্ব-রূপ বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত এবং ইহারই জন্য ভারতীয় সভ্যতা আজ নিতান্ত খর্ব্ব ও পঙ্গু।

অনেকে প্রচার করিতেছেন, হিন্দু-সভ্যতার আড়ম্বরহীন সরলতার দিকেই আমাদের ফিরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এই যে আমরা আপন ভুলিয়া বিদেশীর অনুকরণে জীবন যাপন করিতেছি ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবন ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। এমন-কি, গত প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি-মহাশয় পূর্ব্বকালের সেই প্রাচীন সহজ-সরল জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তখন লোকের প্রাণে আনন্দ ছিল, পরস্পরের সহানুভূতি ছিল, দেবতায় ভক্তি ছিল, অথিতির সেবা দান ধ্যান ছিল। লোক বিনা আড়ম্বরে তখনকার দিনে শান্তিময় জীবন যাপন করিত।'

এ খবর কতদিন আগেকার, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কবে হইতে এ দেশের এই শান্তির জীবন যে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহাও সাব্যস্ত করা সহজ নহে। আজ আমরা তাহার জন্য যে দুঃখ করিয়া থাকি, সে দুঃখ অনেকটা কাল্পনিক। রামচন্দ্র বা অন্য কোন মহাপ্রাণ রাজার শাসনে এদেশের জনসাধারণ হয়ত তেমন শান্তির জীবন যাপন করিয়াছিল। কিন্তু বিদেশী রাজা বা কোন দুর্দ্দান্ত রাজার রাজ্যশাসনে দেশের সাধারণের অবস্থা তেমন শান্তিময় ছিল কিনা, সেবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে! তারপর, আর-একটা কথা মনে জাগে, বাস্তবিকই লোকে যদি অত শান্ত জীবনযাপন করিত—তাহা হইলে তখনকার দিনের সেই নির্জ্জীবতার মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান অমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারিত কি? আপন আপন পল্লীর ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে "আপনার শ্যামল নির্জ্জন কোমল উত্তরী" বিছাইয়া, সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয়তার স্রোতে ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য না করিয়া যে জীবন-যাপনের স্বপ্ন আমরা দেখি, তাহা ইংরেজ-আমলেই সম্ভব; তাহা অলসতা ও শক্তিহীনতার পরিচয় দেয় মাত্র। তাহার ভিতরে ক্ষুদ্রত্বের আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বমানবের জীবন-স্রোতের সঙ্গে ঐ শান্তি-পূর্ণ পল্লী-জীবনের মিলন সাধন হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের জীবন ভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়াছে। অনেকেই এখন জিজ্ঞাসা করিবেন, বর্ত্তমান সভ্যতায় থাকিয়া এই যে আমরা আবার সেই অতীতের জীবনের জন্য লালায়িত হইয়াছি, তাহা কি বাস্তবিকই আমাদের প্রাণের বাসনা, এবং তাহা কি কোনরকমে সম্ভবপর?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের নিজস্ব যে কোন্‌টি তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা শক্ত ব্যাপার। এই দেড়শত বৎসরব্যাপী ইংরেজ-রাজত্বে আমাদের জাতীয় জীবনের কোনও অধ্যায় ভাল করিয়া খুলিয়া দেখা হয় নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী যে সকল শক্তির সংঘর্ষ আমরা প্রতিনিয়ত সহ্য করিতেছি, তাহাতে আমাদের আপন শক্তি কোনদিকেই বিকসিত হইয়া উঠে নাই। এবং আমরা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক সামাজিক ইত্যাদি কতকগুলি সংস্কারের

অবলম্বন করিলেও, সে সকল চেষ্টা মোটের উপর ব্যর্থতাতেই পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রভাবই সকলের উপরে জয়যুক্ত হইয়াছে, এবং আমাদের যে জাতীয় জীবন, তাহার প্রতি অঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। হইবারই কথা; কেননা, আমরা নিজস্ব হইতে বঞ্চিত, এবং দেশের শাসনভার পাশ্চাত্যের হস্তে অর্পিত।

অবশ্য, এ-কথা স্বীকার করি যে, আমরা যদি আমাদের স্বভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়া জীবনের আরম্ভ হইতেই চলিতে পারিতাম, এবং বাহিরের কোন জীবন্ত প্রতিঘাত প্রথম হইতেই যদি আমাদের সহজ বৃদ্ধির অন্তরায় না হইত, তাহা হইলে আমরা আজ স্বভাবের অঙ্কে নিশ্চয়ই একটি অভিনব জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতাম। কিন্তু আজিকার দিনে আমাদের পক্ষে আর ইহা সম্ভব নহে।

ধরুন, আমাদের সমাজের কথা। কে আজ আমাদের সমাজের প্রকৃতিকে সম্যকরূপে ভারতীয় সমাজ বা পুরাতন হিন্দুসমাজের ছাঁচে ফেলিয়া একটি নূতন ও আদর্শ হিন্দু সমাজ গঠন করিতে পারে? একসময় ছিল, যখন এ দেশে হিন্দুর প্রভাব ছিল সর্ব্বোপরি প্রবল। অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় তখন আপনার প্রভাব জাহির করিয়া হিন্দুসমাজের উপরে ছায়াপাত করিতে পারিত না। তখন হিন্দুই রাজা, এবং হিন্দুই ছিল প্রজা। যদিও পার্শ্ববর্ত্তী অনার্য্য-সমাজের প্রভাব হইতে হিন্দুসমাজ তখন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলনা, তবু এমন কথা অনায়াসে বলা যায় যে, হিন্দু তখন একপ্রকার নির্ঝঞ্ঝাটে আপনার সমাজের সীমানায় বসিয়া উহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারিত। রাজ্য, ধর্ম্ম, কৃষি ও বাণিজ্যকে আপনার প্রয়োজনানুসারে হিন্দু তখন বেশ একটা শৃঙ্খলার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। মানুষের জীবনটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ প্রভৃতি অধ্যায়ের মধ্য দিয়া হিন্দু তখন অপনাকে চালাইয়া লইয়া গিয়াছিল। যতখানি প্রয়োজন ছিল, ততখানি অর্জ্জন করিতে তাহারা কোনও ত্রুটি করে নাই। অর্থাৎ, তখন এমন কোনও শক্তির সংঘর্ষ তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই, যাহা তাহাদের স্বাতন্ত্র্যকে লুপ্ত করিতে পারিত।

এখন আমাদের বিচার্য্য বিষয়, অতীতের সেই সমাজকে আজিকার দিনে আমরা আবার নূতন করিয়া গড়িতে পারিব কিনা, এবং আজিকার দিনে তাহাই আমাদের ঈপ্সিত বস্তু কিনা?

তখনকার দিনে যে সকল অনুকূল অবস্থার মধ্যে হিন্দুসমাজের বিশেষত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে সে অবস্থা আর বিদ্যমান নাই। এখন দেশের রাজনীতি ও কর্ম্মনীতির ভার পরের হস্তে। গল্প শোনা যায়, তখনকার রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণকে এমন ভক্তি করিতেন যে, অকাতরে সকল রাজ্য-সম্পদ এককথায় বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী হইতে পারিতেন। আজ কিন্তু ব্রাহ্মণের সে মাহাত্ম্য আর নাই। রাজা আপনার

স্বার্থে রাজ্যশাসন করে এবং এ-দেশীয়দিগের জীবন-যাত্রা আপনার প্রয়োজনানুসারেই নিয়ন্ত্রিত করে। বর্ণাশ্রমে কর্ম্মের যে বিভিন্নতা ছিল, সে বিভিন্নতা বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মজীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাস্তবিকই সাগর-প্রমাণ অতীত মহিমার মালিক হইয়া আমরা আজ কোন ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহি। আমরাও এখন চাহিতেছি যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশকেও আমরা এক শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। সমগ্র পৃথিবী আজ আমাদের হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, সুতরাং সকলের সহিত দেনা-পাওনা আজ যদি আমরা বুঝিয়া না লই, তবে আমাদের একেবারেই ঠকিতে হইবে।

আজ আমাদের ভিতরে যে বৃহৎভাবের ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্রত্বের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহে না। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ত আমাদের এমন স্বভাব ছিল না। অবশ্য ধার-করা বিষয়ের অধিকারী হইয়া আমরা আপন প্রকৃতির বিকাশসাধন করিতে পারিব না, এবং কেহ কখনও তাহা পারেও না। কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রই যে ধার-করা সম্পত্তি, এমন ধারণাও ভ্রম-মূলক। কে জানে, এই যে পরিবর্ত্তনের হাওয়া আসিয়াছে, ইহাই এদেশের পক্ষে যথার্থ উপযোগী এবং স্বাভাবিক কিনা!

যতদিন একটা জাতি আপনার নিজস্ব সত্তাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে না পারে, ততদিন পৃথিবীর চক্ষে সে বরণীয় হইতে পারে না। ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মণ ও মার্কিণ প্রভৃতি জাতির প্রত্যেকেরই কতকগুলি করিয়া নিজস্ব সম্পত্তি আছে। কিন্তু আমাদের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বরূপ কেহ ঠাহর করিয়াছে কি? ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান, সকলে মিলিয়া এখানে পরস্পরবিরোধী এক Chaos জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই আপন আপন পথ করিতে একে অন্যকে তফাতে সরাইয়া দিতেছে। আবার, ইহাদের মধ্যেই শত শত অংশ ভগ্নাংশ এমন ভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে যে, ভারতবাসী বলিয়া একটি সমগ্র জাতির কল্পনা করা একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখানকার নানা জাতির সামাজিক শাখাপ্রশাখাগুলির আবার ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি অত্যধিক এবং অস্বাভাবিক টান থাকাতে, জাতীয় জীবনের একত্বের পক্ষে তাহা বিষম বাধা-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষুদ্রত্বের বিশাল মোহ, পাহাড়-প্রমাণ ধর্ম্মাভিমান, আমাদিগকে সঙ্কীর্ণতার এককোণে ঠেসিয়া লইয়া যাইতেছে। এই মোহ ও অভিমানে একটুখানি আঘাত লাগিলেই সমাজ বৃথা আস্ফালন করে, অথচ এ দেশের বুকের উপর দিয়া দানবের নর্ত্তন চলিলেও কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহাতেই বোঝা যায়, এদেশে মানুষের মনুষ্যত্বের অভাব আছে; সমাজের জন্য এ দেশের লোকের যে নিষ্ঠা-প্রবৃত্তি, তাহা শক্তির বিকৃতি মাত্র। সামাজিক উন্নতির উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। সমাজ যতদিন অসংস্কৃত থাকিবে,

ততদিন জাতির উন্নতি হইবে না। হিন্দু মুসলমান যেই হউক না কেন, যে সমাজ আত্মপীড়ন করে, সে সমাজ জাতীয় জীবনের ধ্বংসসাধন করে! পূর্ব্বে আমি দু' একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে ক্ষেত্রে এই আত্মহত্যার লীলা তত প্রবল নহে, দেশের গৌরব-পদ্মগুলি সেই খানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাঁহাদের লইয়া আজ আমরা গৌরব করি, তাঁহারা এই আত্মহত্যার লীলাক্ষেত্র হইতে বরাবর তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাতি ব্যক্তির সমষ্টি, কিন্তু সমাজ এই ব্যক্তির স্রষ্টা। আমরা যে সমাজ-সংস্কারের প্রতি এত অমনোযোগী, তাহার কারণ জাতির প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগের অভাব। অথচ যাহাদের লইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাহারা সকলেই স্বায়ত্ব-শাসন চাহিতেছে, এবং পৃথিবীতে একটি বিশেষ জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য অন্ততঃ মৌখিক অগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে সমাজের সংস্কার করিতে আমরা সকলেই আগ্রহবান। কিন্তু সংস্কারের ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাও আমাদের ভাবিতে হইবে। যাঁহারা সমাজের কর্ণধার—তাঁহাদের দৃষ্টি সমাজের দিকে পড়িলে, তাঁহারা সমস্ত খুঁটিনাটি ধরিয়া সকল বিষয় আমাদের চেয়ে ভালরূপে বিচার করিতে পারেন। তবে, যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ভারত-সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম উপাদান বলিয়া আমরা স্বীকার করি, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যে জাতি গঠন করা যাইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের হয় না। বৈদিক-যুগ বা তৎপূর্ব্ব কালের সমাজের যে চিত্র আমরা পাইয়া থাকি, আমাদের সমাজ-যাত্রা আবার সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

যখন এক পরিবারের কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের, কোনও ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের, কোনও ব্যক্তি বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত, যখন জন্মের খাতিরে পার্থক্য ছিলনা, ব্যবসায়ের খাতিরে পার্থক্য ছিল, আমাদের আবার সেই দিনে ফিরিয়া যাওয়া দরকার। এই শতধাভিন্ন বিশাল ভারত-বর্ষে এক জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে হইলে, সামাজিক ভিন্নতা ভাঙ্গিয়া না দিলে, জাতিগঠনের আশা আকাশকুসুম বই আর কিছুই নহে। পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঘরে ঘরে দলাদলি, ঘরে ঘরে বিবাদ, পরস্পরের ঈর্ষা, লাঞ্ছনা, শত প্রকার দুঃখ-কষ্ট যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা কি মনে করেন, পল্লীসমাজের লোক কোন বৃহৎ কর্ম্মে পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে? সমাজগত পার্থক্য তাহাদের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে বিকারগ্রস্ত করিয়াছে যে, তাহারা ঘৃণ্য সংকীর্ণতার পাঁকে একেবারে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া রহিয়াছে। এই যে প্রতিনিয়ত আমরা শুনিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি 'একঘরে' হইয়াছে, ইহার মানে কি? ঐ ব্যক্তিকে সমাজ ত্যাগ করিয়াছে; ধোপা, নাপিত, পুরোহিত পর্য্যন্ত তাহার বাড়ী যাইবে না। এবং যে-কেহ তাহার সংশ্রবে যাইবে, সেও দণ্ডভোগ করিবে। হয়ত তাহার অপরাধ,

সে কুলীনের ঘরে মেয়ের বিবাহ দেয় নাই, অথবা কোন বিলাতফেরতা আত্মীয়কে ঘরে বসিতে দিয়াছে! পল্লী-সমাজ সুধু এই সকল শাসন-অনুশাসন লইয়াই উদ্বাস্ত; কোথায় বা দেশ, কেই বা জাতি, এ সব ভাবনা তাহার মাথায় নাই। পল্লীকে দেশের কথা ভাবাইতে হইলে যে ব্যাধি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করা ভিন্ন আর কি গত্যন্তর থাকিতে পারে?

অবশ্য, ইহা একপ্রকার অসম্ভব যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কেহ থাকিবে না, সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। তেমন মিছা স্বপ্নের ঘোরে কাহাকেও আচ্ছন্ন হইতে বলি না। হিন্দুর নিজস্ব হিন্দুই যদি বজায় রাখে, মুসলমান এবং খৃষ্টানও যদি তাহাদের নিজস্ব আপনারাই বজায় রাখে তাহা হইলেই এদেশে জাতীয়তার স্বপ্ন সম্ভব হয়। বিভিন্নতার ভিতর দিয়াও মিলনের ক্ষেত্রে পৌঁছান যায়, যদি প্রকৃতি অবিকৃত থাকে।

সমাজের ভিতরে যে আত্মীয়-কুটুম্বিতা হয়, তাহার অর্থ কোনও সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া। য়ুরোপে এই ক্ষেত্রের পরিসর অতিবিস্তৃত। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সম্প্রদায়গত পার্থক্য ভারতের মত বিষম নহে; সেখানে ভাষা-গত যে পার্থক্য, তাহাও খর্ব্ব করিবার জন্য য়ুরোপীয়েরা সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। আমাদের দেশের এই আত্মীয়-কুটুম্বিতার পরিসর য়ুরোপের তুলনায় অত্যন্ত সংকীর্ণ। এবং এই ক্ষেত্রে সমাজ যে ক্রমশ রসাতলের পথ অবলম্বন করিয়াছে, আমরা এখন তাহাই আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে আমাদের ভিতরে বর্ণাশ্রমের কর্ম্ম-গত ব্যবধান আর লক্ষ্য করা যায় না। সকলেই এখন সকল ব্যবসায় করিতেছে, সকলেই এক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছে, এক জল-হাওয়ায় মানুষ হইতেছে। তবু আমাদের ক্ষুদ্রত্ব দূর হয় না কেন?

সমাজের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমরা কোনও আলোচনা করিতে চাহি না। যদিও, উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতা সমাজের ভিতরে প্রকৃত বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে বিশ্বজনীন মহান ধর্ম্ম সকল পার্থক্য একদিনে ঘুচাইয়াও দেয়।

যে সকল বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিলে সমাজ ব্যক্তির সৃজন ও পরোক্ষে জাতি-গঠন করিতে পারে, বাংলাদেশে কোথাও যে তাহা দেখিতে পাইনা, এমন নহে। বাংলার হিন্দুসমাজে প্রধানতঃ তিনটি শক্তিমান সম্প্রদায় আছে—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। এক জল-হাওয়ায়, এক বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক আহারীয় সামগ্রীতে, এক ভাবনা-চিন্তায়, এক কর্ম্মস্রোতে ইহারা মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম্মচিন্তা, ভাষা ও আদর্শ, সকল বিষয়ে ইহারা অভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে আত্ম-পরিচয় না দিলে অনেক সময় চেনা যায় না, কে ব্রাহ্মণ, কে বৈদ্য ও কে কায়স্থ। তবু, ইহাদের ভিতরে একএক জায়গায় এমন ঘোরতর পার্থক্য বিদ্যমান যেখানে একে অপরের অস্পৃশ্য। একটি ব্রাহ্মণ এই ভাবটি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, মুসলমান সকলেই এক, তাই

তাহাদের ভিতরে একতা আছে; আর হিন্দুগণ এক নহে, তাই তাহাদের ভিতরে একতাও নাই। হিন্দুর ও মুসলমানের মধ্যে যে পার্থক্য, ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের মধ্যেও প্রায় তেমনি পার্থক্য। অনেক ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি, কায়স্থের ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত তাঁহারা পান করেন না। আরো অনেক আচার-ব্যবহারে তাঁহারা একে অন্যকে দূরে রাখিয়াছেন।

অনেক বিদেশীয় ও দেশীয় পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, রক্তের সম্বন্ধ যত সুবিস্তৃত হয়, সমাজের ব্যক্তিগত জীবন তত উন্নত হয়। নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্রের বিশালতার উপর জাতির মনুষ্যত্ব যে অনেকাংশে নির্ভর করে, এ কথা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু, আমরা এই মিলন-ক্ষেত্রকে দিনে দিনে কত সংকীর্ণ করিয়া আনিয়াছি, আপনারা তাহা একবার বিচার করিয়া দেখুন। বাংলাদেশে সর্ব্বসমেত সাড়ে চার কোটি লোকের বাস, ইহার ভিতরে অনেকে মুসলমান। তারপরে যত হিন্দু আছে, তাহাদের মধ্যে যে কত ভেদ কত দলাদলি তাহারও ঠিক-ঠিকানা নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ হইতে ডোম, মেথর ও চণ্ডাল পর্য্যন্ত বোধ হয় একশত বর্ণ আছে। তারপর প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে কতক কুলীন, কতক বংশজ, কতক শ্রোত্রীয়। আবার বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বৈদিক ও মধ্যম শ্রেণী ইত্যাদি শত শত শ্রেণীবিভাগ। ইহারা সকলেই একপ্রকার পরস্পরবিরোধী। বিবাহের ক্ষেত্রে এবং আহার-বিহার ব্যাপারেও ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিতেছে। আমরা যে দৈহিক, মানসিক এবং চরিত্রের বলে দিন দিন খাটো হইয়া জাতীয়ত্ব হারাইয়াছি, আমাদের সমাজের সংকীর্ণতা, তাহার জন্য সকলের চেয়ে বেশী দায়ী নয় কি? আমাদের যুবকদের শতকরা ৭৫ জন দৈহিক প্রমাণে অনুপযুক্ত বলিয়া সৈনিক-বিভাগে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; ইহার জন্য দায়ী কে? তাই মনে হয়, নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্রে কণ্টক থাকাতে এবং সেই মিলনে স্বাধীনতার অভাবেই আজ আমাদের এই দুর্দ্দিন।

যদি জাতীয় উন্নতির বাসনা আমাদের দেশের লোকের মৌখিক আন্দোলন না হয়, তাহা হইলে এদেশে নর-নারীর মিলন-ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দেওয়া, আমাদের দেশ-নায়কগণের আজিকার দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ইহার জন্য অন্ততঃ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের ভিতরকার সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যতদিনে তাহা না হইবে, ততদিনে এ জাতির উন্নতি নাই—কিছুতেই নাই! কেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অহি-নকুল সম্পর্ক? ইহার সার্থকতা কোথায়? কেন সমাজের অগ্রণীরা এই মিছা সঙ্কীর্ণতাকে গৌরবের মুখোস পরাইয়া একটা মস্ত অসত্যকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন? হইতে পারে, এই খণ্ডবিখণ্ড সমাজ পুরাতনের স্মৃতিজ্ঞাপক, কিন্তু অখণ্ড-দেহী ব্যতীত মেরুদণ্ডে ভর করিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য আর কাহার আছে? সমাজের এই সকল খেলো

রীতি-নীতির গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যা করিয়া যাঁহারা আস্ফালন করেন, তাঁহাদের কথা প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ ও অসার মনে হয়। হিন্দুসমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদের গণ্ডী এড়াইয়া সমাজকে আবার প্রসারতা ও উদারতার দিকে লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ-সভা, কায়স্থ-সভা এবং বৈদ্যসভার ইহাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

এই পন্থা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণকে বৈদ্যকে এবং কায়স্থকে যে নিজস্ব সম্পদে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। জাতীয়তা অর্জ্জন করিবার জন্য হিন্দুসমাজ যদি এতটুকু ত্যাগস্বীকার না করে, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কৌলিন্য-প্রথার স্বার্থান্ধতা ও দ্রান্তিকত্ব বজায় রাখিবার জন্য এ গোঁড়ামি অনেকেই ছাড়িতে চাহিবে না, কিন্তু যাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে, যাহারা বর্ত্তমান পৃথিবীর হাল-চাল কিছু-কিছু বুঝিয়াছে, তাহাদের ভিতরেও যদি এই অন্ধ জড়ত্ব দেখি তবে আমাদের পক্ষে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

সংস্কারের নাম শুনিলেই একদল লোক সাব্যস্ত করিয়া বসেন যে, উহা খৃষ্টানী অনুকরণ। বোধ হয় তাঁহাদের প্রকৃতি কোন রকম পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এমন প্রকৃতি শুধু জড়ভরতেরই যোগ্য। যাহাতে বাস্তবিক উন্নতি হয়, তাহা গ্রহণ করিব না কেন? কে না আজ দেখিতে পাইতেছে, যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না, এবং বিশবৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহা আর নাই। এই যে বর্ণাশ্রমের গৌরব করি, প্রকৃত প্রস্তাবে আর উহার গুরুত্ব আছে কি? সেই বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগেই ভারতবর্ষ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল বলিয়া যদি আমরা স্বীকার করি, তবে সেই যুগধর্ম্মকেই আমাদের স্বকীয় সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের কি বাধা থাকিতে পারে? এই তান্ত্রিক যুগ কত দিনের? ইহাতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে? হইতে পারে, মুসলমানের প্রভাব হইতে তন্ত্র আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেই লোক-বিমুগ্ধকারী জটিল ধর্ম্ম প্রকৃত অধ্যাত্ম-ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই আজিকার দিনে তাহার প্রয়োজন আর কি আছে? উহা আমাদিগের উপনিষদের ব্রহ্মকে বামন-রূপে পরিণত করিয়াছে, আন্তর্জাতিক ঘৃণা-মূলক জাতিভেদের কঠোরতা আনয়ন করিয়াছে, এবং অবরোধ ইত্যাদি প্রথাকে দৃঢ়তর করিয়া নারী জাতিকে বিশ্বের আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণ দিনে দিনে ত্যাগের মন্ত্র ভুলিয়া পার্থিব স্বার্থের দিকে ঝুঁকিয়া এবং আপন ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্যই এই তন্ত্র দ্বারা এ দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। মানুষ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবে, স্বাধীন ভাবে ভগবানের আরাধনা করিবে, ইহাকে কি পাশ্চাত্য ভাব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত? ইহা তো সর্ব্ব জীবের, সমগ্র জগতের সার্ব্বজনীন্ মঙ্গলময় পন্থা।

তাই বলিতেছিলাম, সংস্কারের নাম

করিলেই যদি উহা পাশ্চাত্য বলিয়া কাহারও ধারণা জন্মে তবে সে ধারণা নিতান্ত ভ্রমমূলক। প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন চরিত্র থাকা সত্ত্বেও সকলেরই এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহা সকলেরই গ্রাহ্য বস্তু। যাহা বিশেষভাবে প্রাচ্য, তাহা ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে যাহা পাশ্চাত্য, তাহা গ্রহণ করিলে জাতির মৃত্যু ঘটিতে পারে। তেমন সংস্কারের কথা আমরা বলি না। কিন্তু সংস্কার চাই। সংস্কার কি এ দেশে ঘটে নাই? হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসূত হইয়া ছিল কেমন করিয়া? কেমন করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভেদাভেদ ঘুচাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? কিন্তু এইসকল পরিবর্ত্তনে কি বিজাতীয়তা ছিল? প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এখনও একটা পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব-পরিবর্ত্তন হইতে এ পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি ভিন্ন। এখন রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধননৈতিক ও কর্ম্মনৈতিক সমস্তরই বদল না হইলে আমরা কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের এখন দশ জাতির সঙ্গে মিশিতে হইবে, দশ জাতির সম্পত্তি হইতে ধন-রত্ন আনিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। অভিমানে সকলকে ঘৃণা করিয়া আপনার গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে জীবন-সংগ্রামে আমাদের মরণ নিশ্চয়।

বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করার উপর আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের পরিমাণ নির্ভর করে। মনুষ্যত্ব অর্থে আমরা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক পরিপূর্ণতাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এগুলি কি সমাজের শিক্ষা ও রীতিনীতির ফল নহে? অবশ্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজার সাহায্যের প্রয়োজন। যে ছেলে হাঁটিতে শিখে নাই প্রথমে হাত ধরিয়াই তাহাকে হাঁটিতে শিখাইতে হয়। কিন্তু যে ছেলে খোঁড়া তাহার হাত ধরিলেই বা লাভ কি? ইংরেজ আমলে আমরা দেড় শত বৎসর কাটাইলাম, কিন্তু এতদিনেও আমরা কোন অধিকার লাভ করিলাম না কেন? হইতে পারে, ইংরেজ আমাদিগকে হাত ধরিয়া হাঁটাইতে শিখায় নাই, কিন্তু আমরাও কি বারবার পড়িয়া আবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াছি? যদি করিয়াই থাকি, তবে ব্যর্থ হইয়াছি কেন?

আমরা যেখানে যতটুকু ক্ষমতা হাতে পাইয়াছি, সেটুকুও বিকৃত করিয়াছি কেন? কেন এ সমাজের লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করে না, স্বাধীনভাবে উপাসনা করে না, স্বাধীনভাবে বিবাহ করে না, স্বাধীনভাবে পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে না? সমাজের হাতে যে ক্ষমতা ছিল, সমাজ তাহা বিকৃত করিল কেন? ইহাতে তো বিদেশীর কোন হাত ছিল না। অবশ্য, রাজা সাহায্য না করিলে সকল কাজ সুসাধ্য হয় না। রাজার সাহায্যে আমরা সহমরণ-প্রথা, গঙ্গায় সন্তান-ত্যাগ-প্রথা ইত্যাদি বর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী হওয়াও নিতান্ত ঘৃণার ব্যাপার। যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকুর সদ্ব্যয় করিলেই ত আমরা অনেকখানি মঙ্গল সাধন করিতে পারি!

যাঁহারা আজকাল বঙ্গদেশে রাজনীতির আন্দোলন করেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে সমাজের যে কিছুই করিতে পারেন না, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না! কিন্তু তাঁহারা অবজ্ঞাভরে সমাজের দিকে চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লন্। অথচ, সমাজের উন্নতির উপরেই দেশের উন্নতি যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, এ সহজ সত্যটা ত তাঁহাদের চোখে পড়ে না! তারপর, আমাদের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ, তাহারাও তো বেশ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, তেজস্বী এবং দেশপ্রেমিক। অথচ পাঠ্যাবস্থায় তাহাদের যে প্রবৃত্তি থাকে, কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া সে প্রবৃত্তি কোথায় বিলীন হইয়া যায়! কিন্তু ইহারাই তো হাতে হাতে সমাজের পীড়ন সহ্য করিতে থাকে এবং তাহার জন্য কত অনুতাপ করে। কন্যার পাত্র জুটে না, পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যয়বহন করা যায় না, দোল-দুর্গোৎসবে খরচ কুলায় না!

সকল দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে পারি, যদি আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সজাগ করিতে পারিতাম, জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর বক্ষে আজ আমরা এতটা হীনতার পরিচয় দিতাম না। ভারতবাসীর যে দিন গৌরবের দিন ছিল সে দিন ভুলিয়া আমরা অন্ধের মতন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া নিজের পথ বাহির করিতে পারিতেছি না। আমাদের বিশ্বাস, বৈদিক কালের যুগধর্ম্মের মধ্যেই ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তি, এবং স্বাভাবিক নিজস্ব নিহিত রহিয়াছে। আজ কে তাহা উদ্ধার করিয়া আনিবে?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

কবি ও সমালোচক

(Tennyson হইতে)

লোকালয় মাঝে যেই পাখী গায়
উচ্চবৃক্ষে উচ্চস্বরে,
শেষে মহিমার দেউলের দ্বারে
ধরি শেষ গান কণ্ঠে, মরে।
মাংসলোলুপ গৃধ্রের শ্রেণী
তার লাগি ঐ উড়িছে নভে,
জনতার মাঝে তার দেহ লয়ে
নির্দ্দয় ভাবে ছিঁড়িতে রবে।

তার চেয়ে ভাল তাহার জীবন,
গায় যেবা গিরি গহন বনে,
বনফুল অলি লতামঞ্জরী
তাহার মর্ম্ম-কাহিনী শোনে।
নর-নিলয়ের গর্ব্বিত দয়া
বিচার-বচন কভু না সহে,
নীরবে নিভৃতে সুখ-শান্তিতে
পত্র-পুঞ্জে মরিয়া রহে।

শ্রীকালিদাস রায়।

অস্থি

হঠাৎ সে-ক'দিন জাহাজের ডেকে, ক্যাবিনে, পন্টুনে এবং টিকিট-ঘরে বাদল-পোকার ঝাঁকের মতো কেন এত 'সি আই ডি'র আবির্ভাব হল এবং কেনই বা দেখতে দেখতে একদিন তারা গা-ঢাকা হয়ে এ তল্লাট ছেড়ে গেল তা বলা শক্ত। কিন্তু তারা অদৃশ্য হবার অনেক দিন পর পর্য্যন্ত জলে-স্থলে-আকাশে, জাহাজের ডেকের তক্তাগুলোর ফাটলে-ফাটলে, বসবার বেঞ্চগুলোর তলায়-তলায়, এমন কি ষ্টীমারের চিমনির কালো ধূঁয়ার আড়ালে পর্য্যন্ত কতকগুলো যম-দূতের মতো ইংলিস্ আল্‌ফা বেটার উপ-সর্গের ছড়াছড়ি যে দেখছিলেম সেটা আমি বেশ বলতে পারি। বড়বাজার থেকে সাতটা-পঞ্চাশের ষ্টীমারের ফার্ষ্টক্লাসের সব-আগের দুটো বেঞ্চির কোণে নষ্টামি, ভাঁড়ামি, গাঁজাখুরি গল্প, যাত্রা, গান, কবীর এবং তুলসীদাসের পদাবলী দিয়ে আমরা দিব্যি একটি কুঁড়েমির নীড় বেঁধে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা আরামে কাটাচ্ছিলেম, উপসর্গের উৎপাতে যখন আমাদের সে নীড় ভাঙো-ভাঙো, —গানও জমছেনা, গল্পও প্রায় বন্ধ, ঠিক সেই সময় একটা লোক তার চক্‌চকে কালো ইরাণী টুপি, টুপির চেয়ে কালো ঝোলা দাড়ি, মোচড়ানো গোঁপ, চামড়ার পুস্তিন্ আর সোনা-বাঁধা গেঁটে বাঁশের মোটা লাঠিটা নিয়ে হাজির হল এবং ঠিক তার আসার সঙ্গেই ষ্টীমার-কোম্পানী আমাদের আগের জাহাজখানা বদ্‌লে আকাশের দিকে নাক-তোলা, ঘুপসি এবং অতিরিক্ত-রকম কম-চওড়া ও অধিক-লম্বা ষ্টীমার বড়বাজারের ঘাটে এনে হাজির কল্লে তখন আমি সে লোকটাকে শেমুষী বলে স্থির করে নিতে একটুকুও দেরী কল্লেম না,—যদিও অবিন তাকে গিরগিটির চেয়ে উচ্চপদ দিতে মোটেই রাজি হয় নি।

এই জাহাজখানায় চড়ে আনাগোনা কচ্ছি বটে কিন্তু এখানার সবই আমাদের অপরিচিত খটমটে ঠেকছে। এটার বয়লার-গুলো কেল্লার বুরুজের মতো লোহার চাদরে ঢাকা; এটার খালাসী থেকে সারেং সুগনী সবাই যেন গোরাদের চুরুটের এবং মদের একটা উৎকট গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; —আমাদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে তাদের দৃষ্টিই নেই। আর মকরের শুঁড়ের মতো আগাতোলা সেই ফার্ষ্টক্লাসের ঘুপ্‌সি ডেক্ —সেখানে বসে গঙ্গাও দেখা যায় না, আকাশের নীলও. চোখে পড়ে না, মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা হাঙরের পেটের ভিতর বসে চলেছি—সেখানে অবিনের ওই পুস্তিন্-পরা মানুষটি! আমরা ক'টি ঝোড়ো কাকের মতো নিজের নিজের ডানায় মুখ-লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় এক দিন কেল্লার একটা খুব বড় ইংরেজ, জার্নেল কি কার্ণেল হবে, ঝাপ্সা-ঝোপ্সা ইউনিফারেমের উপরে পালক-দেওয়া টুপি এবং থোপনা-বাঁধা তলোয়ার ঝুলিয়ে জাহাজে উঠেই সেই লোকটাকে দেখে বল্লে—"হেলো, তুমি যে এখানে?"

লোকটা অতি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে উত্তর

কল্লে—'আমি এখানে কেননা আমার যাবার আর কোথাও বাকি নেই। এই জাহাজ-খানা আমি পোর্ট কমিশনারদের বেচে ফেলেছি কিন্তু এর মায়াটা এখনো কাটাতে পারিনি তাই এটায় চড়ে দুই-সন্ধ্যা বেড়াই। এখানা এক বছর গার্ডেনরীচের ঐ দিকে আমার বাড়ির কাছ দিয়েই ডায়মণ্ড-হারবারে যাওয়া-আসা কচ্ছিল, এদিকের একখানা জাহাজ বেকল হওয়ায় এরা এটাকে এখানে এনেছে। জাহাজের সঙ্গে আমিও দক্ষিণ থেকে উত্তরে—ব্রীজের ওপার থেকে এপারে এসে পড়েছি; তোমার সঙ্গে দেখা হল সুখী হলেম।"

তখন কাশীপুরের গন্‌ফাউণ্ডারির ঘাটে এসে জাহাজ ভিড়ছে, সাহেব সেই লোকটাকে টাইম্ কি জিজ্ঞাসা করলে। সে জেব থেকে একটা প্রকাণ্ড ম্যেকেব ওয়াচ বার করে বল্লে—"আটটা পঞ্চাশ।" ঘড়িটা আগাগোড়া হীরেয় মোড়া এবং তার চেন্‌টা সমস্তটা পান্না আর চুনি গাঁথা। সকালের আলো সে দুটোর উপরে পড়ে বিদ্যুতের মতো ঝক্-করে উঠল। সাহেব গুড্‌মর্ণিং বলে কাশীপুরে নেমে গেল। সেই লোকটা অন্যমনস্ক ভাবে সেই ঘড়ি আর চেন দুই আঙুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে আপনার মনে বিড়-বিড় করে কি বকতে লাগল।

কারো কাছে কিছু নতুন দেখলে অবিন সেটাকে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য কেড়ে না নিয়ে থাকতে পারেনা জানতেম, কিন্তু সে আজ যে এমনটা করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সাহেব নেমে যেতেই অবিন হঠাৎ সেই লোকটার হাত থেকে ঘড়ি মায় চেন ছোঁ-মেরে টেনে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে দিয়ে গট্ হয়ে বসল;—আমার মনে হল যেন একটা আণ্ডণের সাপ অবিনের বুকের পকেটে গিয়ে লুকুলো। লোকটা কী মনে করছে এই ভেবে আমার দুই কান লাল হয়ে উঠেছে; অবিন কিন্তু দেখি চোখ-বুজে স্থির হয়ে বসে। আর সেই লোকটা একটু নড়লেনা চড়লেনা, অবিনের দিকে ফিরেও দেখলে না,—উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে যেমন ছিল তেমনই রইল; আর দেখলেম তার দুটো আঙুল ঘড়ি-চেনটা নিয়ে যেমন ঘুরছিল এখনো তেমনি আস্তে আস্তে শূন্যে ঘুরছে। কড়া-কথা মিষ্টি-কথা মিনতি এবং বিনতি সব যখন হার মেনেছে, তখন আমি অবিনকে বল্লেম—"তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।" বলেই আমি তার দিকে পিঠ-ফিরিয়ে বসলেম। কতক্ষণ এমন কাটলো মনে নেই। একটা সাদা পাখী ঢেউয়ের উপর পদ্ম থেকে ছেঁড়া পাপড়িটির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি সেই দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় অবিন আমার পিঠে একটা মস্ত থাবড়া বসিয়ে দিয়ে চুপি-চুপি বল্লে—"ওহে, পকেট থেকে চেনটা কোথায় পড়ল দেখেছো!"

সাপে ছোব্‌লালে যেমন আমি তেমনি চম্‌কে উঠলেম, দেখলেম ভয়ে অবিনের মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমার দুই চোখ চকিতের মতো ডেকটার একধার থেকে আর একধার যেন ঝেঁটিয়ে নিলে। শিরিস্ কাগজ করা সেগুন কাঠের সরু সরু তক্তাগুলো এবং পিচ্-ঢালা তাদের জোড়ের সেলাই-গুলো এমন অতিরিক্ত স্পষ্ট হয়ে কোনো

দিন আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। অবিনও তার পায়ের কাছে জমা-করা জাহাজের মোটা কাছিটা যেন আন্‌মনে পা দোলাতে একটুখানি সরিয়ে দেখলে এবং বুক থেকে হঠাৎ খসে-পড়া গোলাপ ফুলটা কুড়োবার অছিলায় বেঞ্চের তলাটাও একবার বেশ করে হাত-বুলিয়ে নিলে বটে কিন্তু কোথাও আর সেই ঘড়ি তার সাপ-খেলানো চেনের লেজুড়ের ডগাটি পর্য্যন্ত নাই! এ-দিকে দেখছি কুঠীঘাটার পণ্টুনে মৌমাছির ঝাঁকের মতো লোক জাহাজটা ধরবার অপেক্ষায়। আর-একটু পরেই লোকের পায়ের তলায় অবিনের এই মহামূল্য বিপদ গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যাবে এটা ভেবে আমার লজ্জাও যেমন হচ্ছে তেমনি আর-একটু পরেই অবিনকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিতে পারবো ভেবে খানিকটা ফুর্ত্তি এবং সাহসও হচ্ছে, এমন সময় সেই লোকটা বেশ ধীরে-সুস্থে বেঞ্চি থেকে উঠে বরাবর থার্ড ক্লাসে ইঞ্জিন-ঘরের ধারে লালপাগড়ি একজন রিভার পুলিশের জমাদারের সঙ্গে কে জানে খানিকটা কী ফুস্-ফাস্ করে আবার আস্তে আস্তে নিজের জায়গা এসে দখল করলে! কুঠী-ঘাটায় তখন লোক উঠতে সুরু হয়েছে। পাহারাওয়ালা-সাহেব ফার্ষ্টক্লাসে আসবার রাস্তাটা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে জাহাজের একজন ছোকরা টিকিট-কালেক্টারের সঙ্গে ফিস্-ফাস্ করে কি যে বলাবলি করতে লাগল তা শুনতে পেলেম না, অবিনও চোখ-বুজে কি ভাবতে লাগল তা আমি জানি না, কিন্তু আমি আমার দুই পকেটে হাত গুঁজে বুট জুতোর সুক্‌তলা থেকে মাথার উপরে টুপি-ঢাকা ব্রহ্মতেলো পর্য্যন্ত একটা শীত অনুভব করতে লাগলেম। জাহাজ পুরো দমে কলকাতার দিকে চলেছে তার সমস্তটা একটা রুদ্ধ আবেগে থর-থর করে কাঁপছে, —যেন সে আমাদের যত শীঘ্র পারে বড় বাজারের পণ্টুনে হাজির কল্লে বাঁচে!— যেখানে নিকলের বোতাম-আঁটা কালো কোর্ত্তা গায়ে সাহেব-কন্‌ষ্টেবল কটা চোখের স্থির দৃষ্টিটা নিয়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। এমন সময় অবিন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল —"দেখুন তো আপনার ঘড়িতে কটা?" সমস্ত পৃথিবী ক্ষণকালের জন্য চলা বলা বন্ধ করে আমার দুই চোখের চসমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে সেই লোকটার দিকে যেন চেয়ে দেখলে। লোকটা তার জেব থেকে সেই হীরের ঘড়ি মায় চেন হারানিধির মতো অবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বল্লে—"দশটা বিশ হল!" ঝমাঝম্ বাদলা হঠাৎ কেটে সূর্য্য উঠলে যেমন সব পাখীগুলো একসঙ্গে ডেকে ওঠে, তেমনি জাহাজের যাত্রীদের কোলাহল, কলের হুস্-হাস্, জলের কল্ কল্ সমস্ত একসঙ্গে এসে আমার মনের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে;—অবিন যে কখন উঠে সেই লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আহিরি-টোলায় নেমে গেল তা আমি দেখতেও পেলেম না।

আমাদের কুঁড়েমির বাসাটা ভেঙে গেছে। অবিন আর আসে না,—যদিও কোনোদিন আসে তো ঘড়ি-ধরে বাড়ি ফেরে! অবিনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নবীন এবং প্রবীণের দল একে-একে গা-ঢাকা হল,—পড়ে

রইলেম কেবল আমি,—নবীন ও প্রবীণ দুই দলেরই অবশেষ, উল্টে-পড়া মদের পেয়ালার তলানি একটি ফোঁটা। ইয়ারকির শেষ নাড়িছেঁদ বুড়ো গোলোকবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ করে আমি আমার সেই আগেকার জাহাজে আজকের সকালে ঠিক সেই আগেকারই মতো একলাটি এসে বসেছি। এতদিন যেন শীতে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে আগুন-তাপে বাস করছিলেম, হঠাৎ আজ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখছি বসন্তকাল জলে-স্থলে ঢেউ দিয়ে বইছে। মন-ভোলানো ফাগুনের হাওয়া বসন্তবাউরীর সবে-ওঠা কচি ডানার মতো হল্‌দে রোদ এখনো শীতে কাঁপছে। আমি তারি দিকে চেয়ে একলাটি আমার সেই আগেকার জায়গায় চুপ-করে বসে বসে দেখছি—সব নৌকার ফুটো-ফাটা নতুন-পুরাতন নির্ব্বিশেষে পালগুলোতে আজ নতুন দখিনে হাওয়া বেধেছে, নদীর বুকে যৌবনের জোয়ার তুফান তুলেছে, জলের ফেনা যেন ফুলের সাদা সাজ। বাইরের এই শোভার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আছি, এমন সময় একটা প্রাণখোলা পরিষ্কার বাতাস নদীর এক আঁজলা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে সমস্ত ডেকটা একবার জলের ছড়া দিয়ে দিয়ে ধুয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলাপফুলের খোস্‌বো চোরিদিকে ছড়িয়ে সেই সে হাঙরমুখো ষ্টীমারের লোকটি বাসন্তী রঙের একখানা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দেখা দিলেন। লোকটির চেহারা যে এত সুন্দর ইতিপূর্ব্বে তা আমার চোখেই পড়েনি। আজ গোলাপী সাটিনের সদরী বাসন্তী রঙের ফিন্‌ফিনে ঢাকাই মস্‌লিনের বুটিদার চাপকান, তার উপরে চিকনের কাজকরা হাল্কা টুপিটি পোরে মূর্ত্তিমান বসন্তের মতো তাঁকে দেখতে হয়েছে। সিংহের মতো সরু কোমর, দরাজ বুক নিয়ে লোকটি আমার পাশেই এসে বসলেন। আমি তাঁকে একটা সেলাম না-দিয়ে থাকতে পাল্লেম না। তিনি একটুখানি হেসে আমার দিকে একবার ঘাড় নীচু করে চাইলেন। সেই সময় তার চোখদুটো দেখলেম যেন একটা স্বপ্নের জাল দিয়ে ঢাকা! এমন চোখ আমি কারু দেখিনি,—এ যেন আমার দিকে চেয়ে দেখছে বটে, দেখছে-নাও বটে! তখন সেই আচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি, সেই বাসন্তী কাপড়ের আভা, আর সেই রুমালে-ঢালা গোলাপফুলের রুঃ আমাকে এমন বিহ্বল করেছে যে আমার মনে পড়েনা তাঁকে আমি কোনো প্রশ্ন করেছিলেম কি না। তিনি যেন আমার প্রশ্নেরই জবাবে বল্লেন, তবে শুনুন্—

আমার বংশে কেউ কখনো স্বপ্ন দেখতো না! এটা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হবেন না। পাঁজরের যে হাড়খানায় স্বপ্নের বাসা, সেই হাড়টা হাফেজের মতো কোনো মহাকবির অভিশাপে আমাদের আদিপুরুষের বুক থেকে খসে পড়েছিল। সেই থেকে বংশানুক্রমে আমরা ভয়ঙ্কর রকম কাজের মানুষ হয়ে জন্মাতে লাগলুম। বুকের ঐ হাড় যেটাকে স্বপ্ন এসে বাঁশীর মতো ফুঁ-দিয়ে বাজিয়ে তোলে, সেটা আর আমাদের কারু মধ্যে গজাতে পেলেনা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে দক্ষতার একটা শিলমোহর বুকে

নিয়েই যেন আমাদের বংশের সব ছেলে-গুলো ভূমিষ্ঠ হতো এবং আমাদের মধ্যে কোনো ছেলের বুকে যদি কখনো ঐ হাড়ের বাঁশির অঙ্কুর মাত্র আছে এরূপ সন্দেহ হতো, তবে হাকিম এবং বুজরুগ ডেকে সেই শিশু-বুকে একটা তপ্ত লোহার শলা চালিয়ে স্বপ্নের অঙ্কুর দগ্ধ করে দিতে আমাদের কেউ কোনোদিন ইতস্তত করেন নি, যদিও স্বপ্নের সন্দেহে অনেক সময় শিশুপ্রাণগুলি পুড়ে ছাই হতে বিলম্ব হয়নি। আমাদের যারা কেউ নয় তারা এজন্যে হাহাকার করতো, এবং এর জন্যে আমাদের বংশে অনেক মায়েরও বুক ফাটতো সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো পিতার তাতে এক-নিমিষের জন্য কাজে একটু শৈথিল্য এসেছে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। পুরুষানুক্রমে কাজ থেকে রস টেনে নিয়ে আমাদের বুকের হাড়গুলো বাজ ধরবার সিকের মতো সরু, কালো এবং নিরেট হয়ে উঠেছিল।

এই বংশের শেষসন্তান আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলেম তার ছমাস পূর্ব্বে পিতা আমার স্বর্গারোহণ করেছেন এবং আমায় প্রসব করে মা আমার কঠিন রোগ-শয্যায় শুলেন, কাজেই আমার বুকের ভিতরে স্বপ্নের বাঁশি যদি থাকে সেটা নিয়ে আমি বেড়ে উঠতে কোনো বাধাই পেলেম না। শুকনো ডালের শেষ-পল্লবের মতো আমি, আমার মধ্যে দিয়ে হয়তো এই অভিশপ্ত বংশের অসংখ্য বিফল স্বপ্নগুলো শেষফুলটির মতো একদিন ফুটে উঠতেও পারে এই ভেবে মা আমার এক-এক দিন রোগশয্যার কাছে আমাকে ডেকে তাঁর শীর্ণ হাতখানা আমার বুকের উপর আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেখতেন। সে সময় তাঁর দুই চোখ রোগের কালিমার মাঝে এমন একটা উৎকট আশঙ্কা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত যে আমি ভয়ে এক-একদিন কেঁদে ফেল্‌তুম। মা আমার চোখে জল দেখে আরামের একটা নিশ্বাস ফেলে আমায় ছেড়ে দিতেন! আমার বংশে কেউ কোনোদিন চোখের জল ফেলেনি, সেটাকে তাঁরা স্বপ্নের অঙ্কুরের মতো সম্পূর্ণ অকেজো বলেই গণ্য করতেন।

মা দুঃসাধ্য রোগে বিকল, কাজেই সেই অল্পবয়স থেকেই আমি কাজের মানুষ হয়ে উঠলুম। কাজের চাপনে আমার সমস্ত বুকটা যখন কলের চাপে পাটের গাঁটের মতো নিরেট শক্ত হয়ে ওঠবার জোগাড়, যে-সময় কাজের মধ্যে আমি এমন-একটু অবসর পাচ্ছিনে যে রোগা মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে একটুও সময় নষ্ট করি, যখন মা-আমার অসময়ে হঠাৎ মরে অসমাপ্ত কাজের কোনো ব্যাঘাত না ঘটান এই প্রার্থনাটা আমার মনে নিত্য জাগছে, সেই সময় পাটের বাজারে একটা বিষম দাঁও-প্যাঁচের মাঝখানে মায়ের আসন্ন মৃত্যুর খবরটা আমার আফিস-ঘরে এসে পৌছল। বলা বাহুল্য সেখান থেকে আমার কাজ অসমাপ্ত রেখে তখন নড়বার সাধ্য ছিল না। যে সাহেবের সঙ্গে সেদিন দেখা তিনি তখন আমাদের ডাক্তার ছিলেন। আমি এক-খান চিরকুটে আমার কাজ সেরে আসা পর্য্যন্ত তাঁকে মায়ের খবরদারি করতে লিখে পাঠিয়ে কাজে মন দিলেম। আর-কেউ হলে সব কাজ ফেলে মুমূর্ষু মায়ের

কাছে ছুটে যেতো কিন্তু আমি জানতাম আমি সেই নিরেট বাঁশের শেষ কঞ্চি—বাঁশি হয়ে বাজা যার পক্ষে অসম্ভব।

কাজ চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায় দশটা হল এবং বাড়ি এসে কাপড় ছেড়ে জলযোগ করে নিতে আরো খানিকটা সময় অতীত হল। আমি যখন মায়ের ঘরে গেলেম তখন রাত গভীর হয়েছে। মাকে যে জীবন্ত দেখতে পেলেম সেজন্য আনন্দ হল না, তিনি যে আমার কাজ-সারা হবার মাঝেই সরে গিয়ে কোনো অসুবিধা ঘটান নি সেইটেতেই আমার আনন্দ। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে বল্লেন—ওই বাক্সটা এখানে আন্। বাক্সটা তাঁর সম্মুখে ধরে দিতেই তিনি কি-একটা বার করে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লেন, তুই কখন স্বপ্ন দেখিস্?

বাক্সটার ভিতর আমি দেখলেম শূন্য। আমার মনে হল মায়ের কথার কি উত্তর দেব সেইটে শোনবার জন্যে সেই লোহার বাক্সটা যেন হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি হোঃ হোঃ করে হেসে বল্লেম—কোনো পুরুষে স্বপ্ন কাকে বলে জানিনি!—আমার মনে হল আমার কথা শুনে মায়ের বুকের ওঠা-পড়া হঠাৎ বন্ধ হল, তার পর আস্তে আস্তে তাঁর ডান হাতের মুঠো সজোরে কি যেন আঁকড়ে ধরলে।

তার পর যা ঘটল সেটার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেম না। একটা ঝড় যেন প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিয়ে আমার ভিতরে জমাট-বাঁধা কান্নাকে হঠাৎ [illegible] বার করে দিলে। আমার পাঁজরে সমস্ত হাড়গুলো তলতা বাঁশের বাঁশি মতো করুণ সুরে সহসা বেজে উঠলে আর আমার সেই মরা-মায়ের হাত আস্তে আস্তে তাঁর নিজের বুকে উপর থেকে উঠে ক্রমে ক্রমে আমার বুকের উপরে এসে আস্তে আস্তে আপনার মুটো খুল্লে। তার ভিতর রয়েছে দেখলেম আব্‌দ্ আল্লা লেখা আমার অতি অতি পুরাতন পূর্ব্বপুরুষের বুকের হাড়। তার গায়ে সাত-আটটা ছোট ছোট ফুটো। সেই দিন সব প্রথম লোকে আমাদের বাড়ি থেকে কান্নার করুণ সুর শুনতে পেয়েছিল। আর সেই দিন আমি প্রথম জানতে পাল্লেম আমার বুকের ভিতরে সব হাড়গুলো বাঁশীর মত ফাঁপা ও ফুটো, কাজ দিয়ে সেগুলো বোজানো ছিল মাত্র—

গঙ্গার একটা জলের ঝাপ্‌টা হঠাৎ ষ্টীমারের ডেক্ ডিঙিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা জলের ছিটেয় একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। আমি হঠাৎ চম্‌কে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলেম, একটা গোলাপ ফুল আমার পাশে পড়ে আছে কিন্তু সে লোকটার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তার পর দিন অবিনের সঙ্গে দেখা হতে সে বল্লে—"ওহে কাল কি তুমি স্বপ্নে ভোর ছিলে? পাশের ষ্টীমার থেকে গোলাপ ফুলটা তোমার গায়ে ছুঁড়ে মাল্লেম তাতেও তোমার চৈতন্য হল না, অবাক্!"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



"বস্তুহীন কবিতায় ভরেনাক' ভুঁড়ি;
ঝুড়িতে আসল কাব্য ছ'পন ছ'বুড়ি!"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে।

নারীর অবস্থা

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

যে পরিবার-তন্ত্র হইতে সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশ সাধিত হয়, তাহার পরিবর্ত্তন দুই প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল :—

গৃহ ছাড়িয়া পুরুষদিগের ইতস্তত অপসরণ (ভাইরা পৃথক হইয়া যায়, পুত্রেরা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে);

নারীর দাসত্ব-মোচন।

প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে,—হিন্দুসমাজ ধীরে-ধীরে চলিলেও—উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল; ইংলণ্ডের আবির্ভাবে, এই ক্রমবিকাশের কাজ আরও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এই মাত্র।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে—উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইয়া, ক্রমবিকাশ উন্নতির উল্টা পথে চলিতেছিল; তাই নূতন আইন করিয়া ইংরাজদিগকে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে চলিতে হইয়াছিল।

প্রথমে সতীদাহ নিবারণ।

তাহার পর, শিশুহত্যা নিবারণ।

উচ্চবর্ণের লোকেরা, বিবাহ-অনুষ্ঠানে যে অপরিসীম ব্যয় হয় সেই ব্যয় লাঘবের ইচ্ছা করিত; তাছাড়া, তাহারা নিজ কন্যাদের জন্য স্বজাতের মধ্য হইতে, বর সহজে খুঁজিয়া পাইত না। ১৮৫৬ অব্দে, সরকার হইতে রাজপুতানার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রবর্ত্তিত হইলে, জানা গেল যে, ৩০৮ গ্রামের মধ্যে, ২৬ গ্রামে, ৬ বৎসর বয়সের নীচে কোন বালিকা ছিল না। অন্য ৩৮ গ্রামে, একটিমাত্র বালিকাও ছিল না। তাছাড়া এই প্রথাটি কেবল রাজস্থানেরই বিশেষ প্রথা নহে। বারাণসীতে,—মেয়েগুলি জন্মান্তরে যেন ছেলে হইয়া জন্মায়,—দেবতার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, মেয়েগুলিকে নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া হইত। আজকাল আইনের দ্বারা শিশুহত্যা নিবারিত হইয়াছে—যদিও এখনও গোপনে-গোপনে শিশুহত্যা হইয়া থাকে। (১)

*
* *

যে সকল প্রথা ইংরাজ ও নব্য-হিন্দুরা রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেছি :—

উচ্চ-বর্ণসমূহের মধ্যেই বাল্যবিবাহ বা শিশুবিবাহ সমধিক প্রচলিত। ১৮৯০ অব্দে, ১১ বৎসরের কম বয়স্ক দশহাজার ভারত-বাসী পুরুষের মধ্যে ৬০৬জন বিবাহিত ও ২২ জন গতপত্নীক; এই একই বয়সের দশহাজার ভারতবাসিনীর মধ্যে ১৭৫২ বিবাহিতা ও ৫২

(১) রাজপুতানার কোন কোন প্রদেশে, ২৫ বৎসর ধরিয়া অভিজাত-বংশীয় বালিকাদিগের বিবাহ হয় নাই। বারাণসীর কোন কোন প্রদেশে, বালিকার বিবাহ দেখিয়াছে বলিয়া কাহারও মনে পড়ে না। (Wilkins, Modern Hinduism) M. Ibbetson বলেন, পঞ্জাবে, যত্নের অভাবে অনেক বালিকা মারা যায়। এবং কোন কোন শাখাজাতির মধ্যে চিন্তিতপূর্ব্ব শিশুহত্যার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

জন বিধবা। এই গণনার অন্তর্ভুক্ত—দেশের সমস্ত অধিবাসী, এমন-কি মুসলমানেরাও, যাহাদের ধর্ম্মে, যোগ্য বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, এবং সেই সকল বন্য জাতি যাহারা এই প্রথার সহিত আদৌ পরিচিত নহে। এই প্রথা বিশেষরূপে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত। ১৮৯১ অব্দের আদম সুমারে, দক্ষিণ বেহারের নিম্নলিখিত সংখ্যাঙ্কগুলি পাওয়া যায়; দশ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকার মধ্যে, ২৬৩৯ জনের বিবাহ হয়; তন্মধ্যে ১৭৭৩ জন হিন্দু ও ৮৬৬ জন মুসলমান; বেহারের অবশিষ্ট অংশে ও পশ্চিম বঙ্গে প্রায় একই অনুপাত দৃষ্ট হয়।

কতকগুলি পার্শী ও নব্য-হিন্দু সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টায় ১৮৯০ অব্দে "সম্মতি আইন" বিধিবদ্ধ হয়,—যাহার দ্বারা ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, বিবাহের পূর্ণ-পরিণতিসাধন নিষিদ্ধ; কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার না থাকায়,—এই আইনের নিষেধ একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে(২)।

(২) Justice Maihu-Swami Iyer M. Rees কর্ত্তৃক Nineteenth Century"তে উদ্ধৃত হইয়াছে —অক্টোবর ১৮৯০) এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন:—

"গর্ভাধান ও জন্ম উভয়ই অশুচি ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের পরিণাম, সুতরাং উহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক —এই যে ধারণা, ইহা অমরতার স্পৃহা হইতে এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এই বিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত। বিবাহের অনুষ্ঠান এই প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবশ্যক এবং নারীর পক্ষে বিবাহই একমাত্র অত্যাবশ্যক সংস্কার-কর্ম্ম।

১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারের পর, হিন্দুনারীর রাষ্ট্রিক (civil) অবস্থা এইরূপ ছিল। দেখ:—

বয়স		অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
৫ বৎসরের নীচে	...	১৩,৬৭২,৪৯৪	২২২,১১১	১০,১৫৫
৫ হইতে ৯	...	১০,৮০৫,২৯৮	১,৮৯৩,০৩৯	৫১,৮১৩
১০ হইতে ১৪	...	৩,৮৫৪,৮৯৩	৪,৭২৪,৩৭২	১৪০,৭৩৫
১৫ হইতে ১৯	...	৭৮২,৮৮০	৬,৩০৩,৯৯৮	২৮০,৯১৫
২০ হইতে ২৪	...	২০৩,২১৬	৭,৬৩১,৮৩৮	৫৪৫,৪০৫
২৫ হইতে ২৯	...	১২১,১৩৪	৭,৪০৩,০৯৪	৯০৩,২৩৯
৩০ হইতে ৩৪	...	৯৯,১৭১	৬,৪৩১,৪২০	১,৪৯৩,৯০৭
৩৫ হইতে ৩৯	...	৫৬,৪৩৪	৩,৭৯৩,৮৫৪	১,৩৬৪,৭৭৫
৪০ হইতে ৪৪	...	৫৪,০১২	৩,৪৮২,৪১৮	২,৪৯১,০৫৫
৪৫ হইতে ৪৯	...	২৬,০৬৭	১,৫৩১,৫৬৯	১,৪৮৮,২০৮
৫০ হইতে ৫৪	...	৩২,৫১৭	১,৪০৭,৫৪৪	১,০৫২,০৭৩
৫৫ হইতে ৫৯	...	১২,৩৭৭	৪৯২,৬৬৮	১,০৫২,০৭৩
৬০ এর নীচে	...	৩৬,২৩৮	৩৮,৮৩৩	৪৭১১
উল্লেখ-বিহীন	...			
সমষ্টি	...	২৯,৭২৮,৮০১	৪৬,০৫৩,২৬৫	১৭,৩,২৩১৩

* * *

বহুবিবাহ প্রথা মুসলমানদিগের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে, হাজার-করা ৪০ জন হিসাবে বিবাহিতা নারীর সংখ্যা, বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; বুনো জাতিদিগের মধ্যে হিসাবটা হাজার-করা ৬০ জন। সমস্ত ভারতে, প্রত্যেক হাজারের মধ্যে ৭ জন বিবাহিত পুরুষের একাধিক পত্নী। এই অনুপাতটা খুবই কম, কিন্তু উচ্চবর্ণদিগের মধ্যে এই অনুপাতের সংখ্যা আরও উর্দ্ধে উঠিয়াছে। (৩)

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী উপন্যাস "বিষবৃক্ষে" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বহুবিবাহ-প্রথার কু-ফলই বিবৃত করিয়াছেন।

নগেন্দ্র নামক এক ধনী জমিদার সূর্য্য-মুখীকে বিবাহ করে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল। ভ্রমণ-পথে

সমস্ত প্রশ্নটার অবস্থা এইরূপ:—

১৮৭২ অব্দে "দেশীয় বিবাহ-আইন" জারী হয়; ঐ আইনে, পুরুষের বিবাহের বয়স ১৮ বৎসর ও বালিকার বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু যাহারা নিম্নলিখিত ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া ঘোষণা করিবে তাহারা ব্যতীত আর কেহই এই আইনের সংস্রবে আসিবে না:—যথা;—হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও "পজিটিভিষ্ট" সম্প্রদায় ছাড়া আর কাহারও সম্বন্ধে এই আইনের প্রয়োগ হয় না।

১৮৮৪ অব্দে, আইনের দ্বারা বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবার জন্য, শ্রীযুক্ত মালাবারী একটা আন্দোলন আরম্ভ করেন; কিন্তু ১৮৮৬ অব্দে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন। ১৮৯০ অব্দে, একটি ক্ষুদ্র বালিকার বিবাহ হইয়া, বিবাহের পূর্ণ-পরিণতি-সাধন একটু বেশী শীঘ্র হওয়ায়, তাহার মৃত্যু হয়,—এই মৃত্যুর দরুণ আবার আন্দোলন সুরু হইল এবং তাহার ফলে ১৮৯২ অব্দে "সম্মতি আইন" বিধিবদ্ধ হইল। সেই অবধি, বিভিন্ন সভাসমিতি, বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সভ্য-সংখ্যা অল্প হওয়ায়, সেই সভ্যদিগের বাহিরে আর কোথাও তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

আইনের সর্ত্ত-অনুসারে, স্বামী "বৈবাহিক অধিকার পুনঃস্থাপনের" জন্য নালিশ দায়ের করিতে পারে। যে অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে তত্ত্বাবধানার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়, সেই বালিকার পতি তাহার নিকট হইতে আদালতের সাহায্য লইয়া স্বীয় পত্নীকে নিজ গৃহে আনিয়া তাহার সহিত সহবাস করিতে বাধ্য করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার দরুণ, কতকগুলি য়ুরোপীয় লেখক ভারতীয় ইংরাজ-সরকারকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের আইনেও, পত্নীকে পতিগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার পতির আছে। য়ুরোপ অপেক্ষা ভারতে এই ব্যবস্থা যদি বেশী অশান্তি-কর হইয়া থাকে,—সে দোষ হিন্দু রীতিনীতির,—ভারত-সরকারের নহে।

(৩) উচ্চবর্ণ বাঙ্গালীদের মধ্যে, বিশেষত অন্য ব্রাহ্মণেরা যাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সমুৎসুক সেই কুলীনব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা সমধিক প্রচলিত। কুলীনেরা পণ গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি পত্নী গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সব পত্নী পিতৃগৃহেই বাস করে, পিতৃগৃহেই তাহাদের মৃত্যু হয়। কলিকাতার "সঞ্জীবনী" পত্রিকা হইতে M. P. N. Bose কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় গ্রন্থে দিয়াছেন:—১৮৯৩ অব্দে, ৪জন বাঙ্গালীর ৩০, দুইজনের ৩২, একজনের ৩৪, একজনের ৩৫, একজনের ৩৬, একজনের ৫০, একজনের ৬১, ও একজনের ১০৭ পত্নী ছিল।

দৈবক্রমে কুন্দনন্দিনী নামক একটি নিঃসম্বল অনাথা যুবতীকে দেখিয়া নগেন্দ্র তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। কুন্দনন্দিনীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য। মৌন-প্রকৃতি, শান্ত, ধীর ও প্রেমাসক্তা। কিন্তু লেখাপড়া জানে না,—দ্বেষহিংসাহীন, নিরুদ্যম ও নিস্তেজ। নগেন্দ্র তাহার প্রেমে উন্মত্ত হইল। সূর্য্যমুখী যখন দেখিল, কুন্দের প্রেমে নগেন্দ্র ওষ্ঠাগতপ্রাণ তখন কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য নগেন্দ্রকে জিদ করিয়া বলিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তখন আপনার মনের বল ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই—তাহা অপেক্ষা আর একজনকে নগেন্দ্র বেশী ভালবাসে একথা তাঁর সহ্য হইল না। সূর্য্যমুখী গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন।

সূর্য্যমুখী তাহার ননদকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"যেদিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেননা, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম; কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনিই বধ করিলাম, সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। আর তোমাকে আর একবার দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমন ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না, আর আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে ফিরিব, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব, আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা-রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

তুমি আমার একটি কাজ করিও।

আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল।

কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না! যাঁহাকে মনে হইলে আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল, যতদিন না মাটীতে এ মাটী মিশে, ততদিন থাকিবে। কেননা তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক। তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যেদিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আমায় এই আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

একজন খুব উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক, মালাবারি এইরূপ বলেন :—

"হাঁ, একটা গীতে আছে,—যাহাদের হৃদয় পবিত্র, যাহাদের অন্তঃকরণ সরল, তাঁরাই যেন নারীদিগের ভাগ্যবিধাতা হয়! ভেঙ্গে ফেল নারীদের পায়ের শিকল; তাহারা গোলাম, তাহারা বলির পশু; তাহাদের সমস্ত জীবনটা, আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করে, ন্যায্য অধিকাররূপে সুখের দাবী করে। ...যখন এই ব্যাধি দূর হইবে, যখন বিধবারা দুঃখ-আঁধার হইতে মুক্ত হইয়া আবার আলোকে আসিবে তখনই ভারত প্রকৃত-রূপে বর্ব্বরতার উপর জয়লাভ করিবে, আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে,—অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক আনন্দের যুগ আরম্ভ হইবে।

বিধবার এই মুক্তিদাতা,—বিশ্বমানবের হিতকারী বন্ধু—এই উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইবে। তাহার যশোভাতি সূর্য্যকিরণের ন্যায় জগতে উদ্ভাসিত হইবে। আর আজিকার দিনে যাহারা নারী-পীড়ন অপরাধে অপরাধী, যাহারা শাস্ত্র-বচনের অর্থ মিথ্যা করিয়া ব্যাখ্যা করে, সেই অত্যাচারী পাষণ্ড-দিগের জন্য পরলোকে অশেষ দুঃখ, অনন্ত দুর্গতি সঞ্চিত রহিয়াছে। আহা না, তাহা নহে—যে সকল দয়ার্দ্রচিত্ত মহাত্মাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা দুর্ব্বলের সাহায্যার্থ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, সেই মহাত্মাদিগেরই নয়নাশ্রু-বারি এই অত্যাচারী নরাধমদিগের জন্যও মার্জ্জনা আনিয়া দিবে।

হায়, এক্ষণে কি-কষ্ট কি-দুর্দ্দশা! দেখ —কতকগুলি বাল-বিধবা, কতকগুলি স্তন্যপায়ী শিশু,—যাহাদিগের সরল অকপট

চক্ষু আলোর দিকে উন্মুক্ত; আলোক তাহাদিগকে বলিতেছে, 'ঐখানে আশা রাখ'। আরও দেখ—এমন কতকগুলি মা দেখিতে পাওয়া যায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা যাহাদিগকে মা হইতে নিবারণ করে। দুর্ব্বলতার দরুণ তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে—তাহারা পতিতা হয়। মার্জ্জনীয় তাহাদের সেই দুর্ব্বলতা! এই দুর্ব্বলতার দোষে, তাহাদের যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেই শিশুর গলায় ফাঁস লাগাইয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই শিশুকে হত্যা করে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুন্দরের বরণ

(জামী হইতে)

হে চির সুন্দর দেব পরম প্রেমিক
তব পুণ্য সুমধুর স্মৃতি,
এ বিশ্বের নরনারী হৃদয়ে হৃদয়ে
প্রেমরূপে জাগিতেছে নিতি।
তোমারি আনন্দ-উৎসে রসধারা পিয়ে
প্রেমিকের কণ্ঠে ফুটে ভাষা,
তোমারি চরণ-ছায়ে, প্রণাম করিয়া
বিনিময় করে ভালোবাসা।
তুমিই পাগল কর প্রেমিকা-প্রেমিকে
তুমি ধ্রুবসুন্দরের প্রাণ,
নাহি রূপ ছাড়া প্রেম তোমা ছাড়া রূপ,
প্রেম বিনা মানুষ পাষাণ।
কর তুমি 'মজনু'র শোণিত চঞ্চল
গণ্ডস্থলে রহি 'লয়লা'র,
শিরীনের রক্তাধরে মাধুর্য্য হইয়া
মত্ত কর প্রিয়জনে তার।

এ বিশ্ব-সৌন্দর্য্য-মায়া ঘন যবনিকা—
অন্তরালে হইয়া আসীন,
করিবে বঞ্চনা মোরে হে ধ্রুব সুন্দর,
কতদিন—আরো কত দিন?
ছিঁড়ে ফেল যবনিকা পূর্ণরূপে জাগো
দূর হতে কেন উঁকি দাও,
মম আত্মাবালিকারে পুতুল-খেলায়
মিছে আর কেন গো ভুলাও।
নববধূ সম আমি বর-প্রতীক্ষায়,
এস আজি শুভদৃষ্টি হোক্,
বিশ্বের সকল আলো ভুলাইয়া দিক্
তব দীপ্ত আঁখির আলোক!
লাজ-নম্র বধূটির রুদ্ধ কর আঁখি
আর যেন চাহে না বাহিরে,
পূর্ণইন্দুহার তুমি জাগ চিরদিন
হে সুন্দর, হৃদি-সিন্ধুতীরে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বাদ্‌লার গল্প

দিনটা ভারি মেঘলা; সকাল থেকে সেই যে ইল্‌সেগুঁড়ি সুরু হইয়াছে, থামিবার আর নামটি নাই। সমস্ত আকাশটার রং যেন বর্ষার স্তব্ধ, ঘোলা গঙ্গাজলের মত! পথ-ঘাট কাদায়-কাদায় একেবারে প্যাচ্‌-প্যাচ্‌ করিতেছে।

পরেশের বৈঠকখানায় বসিয়া সন্ধ্যা-বেলায় জনকতক যুবা সিগারেট ফুঁকিতেছিল, তামাক টানিতেছিল, গল্পগুজব করিতেছিল।

মাণিক আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ভাগ্যে আজ রবিবার,—নৈলে এই বাদ্‌লায় জুতো বগলে করে', হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, পা পিছ্‌লোতে-পিছ্‌লোতে আপিসে ছুটতে হোত। ওঃ, বড্ড বেঁচে যাওয়া গেছে হে!"

সুরেন মুখভার করিয়া বলিল, "মরে যাই! বেঁচেছ ত ভারি! এমন বেঁচে লাভ কি,—হপ্তায় একটিমাত্র রবিবার—বাদল নেমে সেটিও বাজেখরচ হোল!"

পরেশ হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে-দিতে বলিল, "বাজেখরচই বা হবে কেন,—পার-ত কাজে খাটিয়ে নাও না! শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর মত বর্ষারও ত একটা বিশেষত্ব আছে—সে বিশেষত্ব যে উপভোগ করতে পারে, তার কাছে কিছুই বাজেখরচে যায় না।"

সুরেন বলিল, "কবির মত একঝুড়ি বাক্যব্যয় ত কর্‌লে, কিন্তু তোমার মত আমরা সবাই ত আর কবি নই,—কাজেই বর্ষা নামলে আমাদের বলতে হয়—'পায়ে জুতো পথে কাদা যাই কেমন করে'! এই সন্তুরে বর্ষায় রাস্তায় কাদা-ঘেঁটে মরা কিম্বা ঘরের কোণে সেই সাক্ষাৎগন্ধরূপিণী চিরপুরাতন স্ত্রীর কাছে হাত-পা গুটিয়ে বসে গয়নার বায়না শোনা ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব আমি ত দেখতে পাই না।"

নবীন হুস্‌ করিয়া সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ভুল সুরেন, ভুল! প্রথমত, যা বল্‌লে সেগুলো তোমার বিশেষত্ব হতে পারে—বর্ষার নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের সকলকার স্ত্রী পুরাতনও নন, গন্ধরূপিণীও নন, স্বামীকে পাশে পেলে গয়নার বায়নাও ধরেন না!"

রমেশ আলবোলার নলটা পরেশের হাতে দিয়া কহিল, "নিশ্চয়, আমি তোমার বাক্য সমর্থন করি নবীন!"

সুরেন চটিয়া বলিল, "তুমি আর মুখ নেড়ো না রমেশ! তোমার ত বিয়ে হয়েচে আজ তের বছর, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে এখনো নবীনা বলতে সাহস কর?"

রমেশ বলিল, "আলবৎ! কেননা, আমি আমার স্ত্রীকে ফি-মাসে দিন-পনেরোর জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে পুরাতনে নূতনত্বের রসান দিয়ে নি।"

রমেশ কোনদিকেই আঁটিতে না পারিয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, বর্ষার বিশেষত্বটা কি, শুনি!"

মাণিক বলিল, "সেটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।"

—"কি ?"

—"প্রথম, আড্ডায় বসে পাঁচজনে মিলে-মিশে গল্পস্বল্প করা।"

—"সে ত হচ্ছেই।"

—"দ্বিতীয়, কচিশষা, নারিকেল-কুচি আর গরমাগরম ফুলুরি সহযোগে মুড়ি ভক্ষণ। তৃতীয়, সেই সঙ্গে দাবাবোড়ে, পাশা বা তাস খেলা, কিম্বা—"

—"তাশ-দাবা-পাশা—ওঃ, ভারি বিশেষত্ব!"

—"কিংবা ভূতের গল্প-শোনা।"

পরেশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "Bravo! ঠিক বলেছ! মুড়ি-টুড়ি আমি এখনি আনিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ভূতের গল্প বলবে কে ?"

চন্দ্রনাথ এতক্ষণ তাকিয়ার উপরে নিশ্চেষ্ট ভাবে আড় হইয়া চক্ষু মুদিয়া তাম্বুলরস উপভোগ করিতেছিল। এখন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিল, "মুড়ি-ফুলুরির ভার যদি পরেশ নেয়, গল্প-বলার ভার তাহলে আমি নিতে পারি।"

—"কিন্তু, ভূতের গল্প!"

—"অবশ্য, অবশ্য!"

—"আর, সত্যঘটনা!"

—"নিশ্চয়। গল্পের নায়ক হচ্ছি, আমি।"

—"আর, নায়িকা ?"

—"আমার প্রিয়তমা।"

—"সাধু! সাধু!—এতদিনে একজোড়া বাস্তব নায়ক-নায়িকার সন্ধান পাওয়া গেল! ওহে পরেশ, মুড়ি আনাও, ফুলুরি ভাজাও!"

বন্ধুরা সবাই সাগ্রহে চন্দ্রনাথের চারিদিক ঘিরিয়া বসিল।

* * *

বাহিরের মেঘলা আকাশের দিকে একবার চাহিয়া চন্দ্রনাথ আরম্ভ করিল :—

"সে-সময়ে হাওয়া খেতে আমরা মধুপুরে গিয়েছিলুম।

যে বাড়ীতে আমরা ছিলুম,—সেখানা খুব বড়সড়, সামনে বাগান, কাছেই নদী।

তোমরা সবাই জান ত, মধুপুরে গিয়ে আমরা—গারদরক্ষীরা, মেয়েদের পায়ের বেড়ী বেপরোয়া হয়ে খুলে দি। মেয়েরাও এমন দুর্লভ সুযোগের ষোলআনাই কাজে খাটিয়ে নিতে কিঞ্চিৎমাত্র গাফিলি করেন-না, রোদ পড়লেই তাঁরা আল্‌তা-পরা পদযুগলের সদ্ব্যবহার করতে দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন।

কমলাও (বলাবাহুল্য, আমার স্ত্রী—এই গল্পের নায়িকা) এ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়-নি। সেও রোজ মাথায় আধ-ঘোমটা টেনে, গ্রীষ্মেও গায়ে একখানি শীতের আলোয়ান জড়িয়ে, আল্‌তা-পরা পায়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরুত।

মেয়েদের বন্ধুসংগ্রহের ক্ষমতাও অদ্ভুত। বেড়িয়ে এসে কমলা প্রায়ই বল্‌ত, "আজ একটি বৌয়ের সঙ্গে ভাব হোল।"

—"কে ?"

"অমুক বাবুর বৌ। কল্‌কেতায় বাড়ী। গায়ে এক-গা গয়না।"

কার গায়ে কত গয়না মেয়েরা সকলের আগে সেটা ভাল করে' চোখ-বুলিয়ে দেখে

নয়। কমলাও গয়নার 'কম-বেশীত্ব' দেখে আমার কাছে সমালোচনা করত—দেখ, অমুকের গায়ে এত গয়না—নিশ্চয় খুব বড়-মানুষের বৌ। অমুকের হাতে সুধু দু-গাছা বালা আর চুড়ী—তার বর নিশ্চয় তাকে দেখতে পারে না।"

স্ত্রীর মুখে শুনে আরো বুঝতুম, কমলার এই নিতুই-নূতন বন্ধুর দল একদিনের আলাপেই বেফাঁস হয়ে এত হাঁড়ির খবর বলে ফেল্‌ত যে, আমরা—পুরুষরা, দশবছরের আলাপেও কোন বন্ধুর কাছ থেকে তত পেটের কথা আদায় করতে পারি না।

কমলা একদিন নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ সমাপ্ত করে' এসে বল্‌লে, "ওগো, আজ আমার নেমন্তন্ন।"

আমি বিস্মিতস্বরে বললুম, "নেমন্তন্ন! কোথায় ?"

—"সেই যে অমুক বাবুর পরিবার—যার কথা পরশুদিন তোমায় বলেছিলুম!"

—"কি মুস্কিল, পথে-পথে আলাপ আর পথে-পথেই নেমন্তন্ন!"

কমলা চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বললে, "অবশ্য!—

'আমি ত তেমন মেয়ে নই!
আকাশ যুড়ে আমি সখা,
পাতিয়ে নিছি সই!'

পথেই এখন আমার আস্তানা,—সুতরাং পথেই নেমন্তন্ন!"

—"কিন্তু পথেই যে পাত পাতবে না, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তাদের বাড়ীতে ত পুরুষমানুষ আছে, তুমি একলা যাবে কি করে' ?"

কমলা কৃত্রিম কোপকটাক্ষে আমার

গোঁফ টেনে দিয়ে বললে, "হে জটিল-কুটিল নিপট-কপট শঠ, হে সন্দেহের মূর্ত্তিমান অপদেবতা! আশ্বস্ত হও, তোমার এ সন্দেহ অমূলক! কেননা, পুরুষের ভেতরে একটি পনেরো-ষোল বছরের ভাই, হঠাৎ কি দরকার পড়াতে বউটির বর কল্‌কেতায় গেছেন, কাল আস্‌বেন। বাড়ীতে থাক্‌বার মধ্যে সুধু একপাল মেয়ে আর ঐ বাচ্ছা পুরুষটি। সে-সব না জেনেই কি নেমন্তন্ন নিয়েছি ? আমি কি তেমনি হাঁদা গা ?—আর, এখান থেকে এমন-কিছু দূরেও নয়—এই খানতিনেক বাড়ীর পরেই। যাবার সময় ঝী-চাকরকে সঙ্গে নিয়ে যাব,—না গেলে তারা কি মনে করবে বল দেখি ?"

আমার এই স্ত্রী-রত্নটি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত এবং অন্যায় রকমের মুখরা। সুতরাং তার মুখবন্ধের জন্য আমি বললুম, "প্রিয়ে, লেক্‌চার থামাও—আমি রাজি!"

কমলা উঁচু হয়ে আমার গলা জড়িয়ে (আমি লম্বায় ছ-ফুট তিন ইঞ্চি, প্রিয়তমা সহজে আমার নাগাল পান না) ধরে বললে, "তুমি আমার পোষমানা স্বামী—তাইত তোমার চরণে কায়মনোপ্রাণে আমার এ জীবন-যৌবন সঁপে নিশ্চিন্ত আছি। হে প্রিয়তম, তোমার উঁচু মাথা নিচু কর, নৈলে আমার চুম্বন অতদূর পৌঁছুবে না!"

চন্দ্রনাথ হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া পড়িয়া বলিল, "ওহে, মুড়ি-ফুলুরি এখনো এল না যে!"

পরেশ বলিল, "ধৈর্য্য ধর, এল বলে। তপ্ত তৈলে এখন সৎব্রাহ্মণের দ্বারা

মহাসমারোহে ফুলুরির অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, রান্নাঘর থেকে ঐযে শ্যামের বাঁশীর চেয়েও সুমধুর ছ্যাঁক্-কল্‌কল্ ধ্বনি আস্‌চে —শুনচ না ?"

রমেশ বলিল, "ওহে চন্দর, ভূত কৈ —বিনামূল্যে মুড়ি-ফুলুরি খেতে চাইলে ত চল্‌বে-না ! বল গল্প, খাও মুড়ি—ফেল কড়ি, মাথ তেল,—ভদ্দরলোকের এক কথা !"

চন্দ্রনাথ বলিল, "রও, আগে গোড়াটা ফেঁদে-নি ! নৈলে শেষটা তোমাদের জেরার মুখে টেঁকব কেমন করে' ! তারপর, শোন ।:—

সন্ধ্যার একটু আগে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কমলা জামার একটা হাতা শেলাই করছে।

আমি বল্লুম, "একি, সাজগোছ করে' অসময়ে সুঁচ নিয়ে কি হচ্ছে ?"

কমলা মুখভার করে' বল্‌লে, "দেখনা, পোড়ারমুখী 'ঝুমী'র কীর্ত্তি ! আমি কাপড় পর্‌চি, জামাটা ওখানে বার করে' রেখেছি, আর ঝুমী এসে কিনা জামার হাতাটা দাঁতে করে' ছিঁড়ে দিলে ! ভাগ্যে রেশমের সুতোর বাণ্ডিলটা সঙ্গে এনেছিলুম, তাই তাড়াতাড়ি শেলাই করে' নিচ্চি। দাও-ত হতভাগার দাঁতগুলো ভেঙ্গে !"

যার নামের গোড়ায় কমলা দু-দুটো সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করলে, সেই ঝুমী হচ্ছে আমার সখের কুকুর। কমলা যখনি তার দাঁত ভাঙ্গবার আদেশ দিলে, তখনি সে বুঝে নিলে তার বিরুদ্ধে মস্ত-একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমি যেই তার দিকে তাকালুম, সে অমনি পেটের তলায় ল্যাজ ঢুকিয়ে ফুড়ুক্ করে' ঘর থেকে সরে পড়্‌ল।

কমলা হেসে বল্‌লে, "দেখেচ, হতভাগা মানুষের চেয়েও চালাক। বোঝে সব, জামা ছিঁড়েচে দুষ্টুমি করে'।"

এমনসময় চাকর এসে খবর দিলে, কমলাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে।

কমলা বল্‌লে, "বল্-গে যাচ্ছি। তুই আর ঝী আমার সঙ্গে যাবি।"

চাকরটা একটু জড়সড় হয়ে বল্‌লে, "মা, আপনি কি সেখানে বেশী রাত পর্য্যন্ত থাকবেন ?"

—"কেন, সে খোঁজে তোর দরকার কি ?"

—"না মা, মালী বল্‌ছিল ও-বাড়ীতে ভূত আছে। রাত হলে তারা গান গায়—তবলা বাজায় !"

কমলা ত হেসেই অজ্ঞান! বল্‌লে, "আচ্ছা, আচ্ছা, ভূতকে আমি মানা করে' দেব—সে যেন তোর ঘাড় না মট্‌কায়। নে, এখন চল্ !"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে কমলার পিছু-পিছু গেল।

কমলা চলে গেলে পর, আমি জুতো খুলে বিছানার উপর গিয়ে শুয়ে পড়লুম। হাতের কাছেই রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থাবলী পড়ে ছিল, সেখানা তুলে নিয়ে একটা গল্প পড়তে লাগ্‌লুম। সেটা ভূতের গল্প।

রাত্রিতে তোমরা কেউ যদি ভূতের গল্প পড়ে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই জান যে, পড়তে-পড়তে কি-রকম একটা অকারণ,

অজ্ঞাত আতঙ্কে মনটা গুমোট হয়ে আসে। বিশেষ, গল্পটি যদি আবার ভাল লেখকের লেখা হয়! কারণ, ভাল লেখকরা আজগুবির রংটা এমন করে' ফলিয়ে তুলতে পারেন, যে মনে হয়, যা পড়চি তা সব সত্য—একেবারে বাস্তব আর স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের কবলে পড়ে আমারও সেই হাল হোল। পড়তে-পড়তে বোধ হতে লাগল, গল্পের সেই ভুতুড়ে কাণ্ড আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি !

হঠাৎ মনে পড়ল, নেমন্তন্নে যাবার সময় চাকরটা কমলাকে বলে ছিল, যে বাড়ীতে সে যাচ্ছে সেটা হানাবাড়ী। আশ্চর্য্য কি! মধুপুরের এই ভাড়াটে বাড়ীগুলোতে কত-রকমের রুগী আসে আর মরে—এখানে কোথায় কি আছে, কে বলতে পারে ?

এই, আমি যে বাড়ীতে আছি, এটাও ত ভাড়াটে বাড়ী, এখানেও লোক মরেছে নিশ্চয়, এ-বাড়ীতেও ত ভূত থাকতে পারে! ... ... কথাগুলো মনে হোতেই গা-টা কেমন ছম্‌ছম্ করতে লাগল। ভূতের ভয় রাত্রিকালে প্রবল হয় কেন ? কারণ, রাত্রির সঙ্গে এমন-একটা রহস্যের ভাব আছে, যাতে-করে' সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানকার তফাৎটা একেবারে ঘুচে যায়। দিনের আলো হচ্ছে বাস্তব, তার মধ্যে আবছায়া, আধ্‌ঢাকা বা গোপন কিছুই থাকবার যো নেই ; আর রাতের অন্ধকার হচ্ছে অবাস্তবের বাসা, তার মধ্যে নজর চলে না, তাই যত-কিছু কাল্পনিক, অদেখা, অচেনা ব্যাপার আড়ালে আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।... ... ...

একটা মেঠো হাওয়া এসে আচম্‌কা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গেসঙ্গে আলোটা গেল নিবে।

আস্তেআস্তে বিছানা থেকে নামলুম। অন্ধকারেই জুতো পরে দেশলাইটা কোথায় আছে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে লাগলুম। দেশলাইটা খুঁজে বের করে' আলোর দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ পিছনে কিসের একটা শব্দ হোল।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লুম। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না—শব্দও আর নেই। ভাবলুম, বাতাসে বোধহয় ঘরের কোন জিনিষ নড়ে উঠেছে।

কিন্তু, আবার যেই আলোর দিকে এগুব,—ফের সেই শব্দ !—না, এ ত বাতাসে জিনিষ-নড়ার শব্দ নয়! ফস্ করে' দেশলাই জ্বাললুম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। তবে কিসের শব্দ এ ?

না, এ-সময় অন্ধকারে থাকা সুবিধের নয়—আগে আলো জেলে তবে অন্য কথা। কিন্তু যতবার আমি আলোর দিকে এগুতে যাই, ততবারই ঠিক আমার পিছনে কিসের শব্দ হয়, অথচ আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দটাও থেমে যায়। ক্রমাগত দেশলাই জ্বালতে লাগলুম,—কিন্তু ঘরের ভিতরে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

এ ঘরে একখানা খাট, একটা ছোট টেবিল আর খানদুই 'বেণ্টউড্' চেয়ার ছাড়া আর-কিছু আসবাব ছিল না—সুতরাং কেউ যে কোথাও লুকিয়ে থাকবে, সে সম্ভাবনাও নেই।

ঘরে কেউ নেই—অথচ শব্দ হচ্ছে,

এর মানে কি? তবে কি যা ভাবছিলুম, তাই? এটা কি হানাবাড়ী?—আমার সমস্ত দেহ ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এতক্ষণ ঘর ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, এখন মেঘের ফাঁক থেকে আবার চাঁদ ফুটে উঠল। জানলা দিয়ে ঘরের মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্নার শিখা এসে পড়ল।

অন্ধকার যে ছিল ভাল! এই খানিক কালো, খানিক আলোতে সমস্ত ঘরখানা যেন অপার্থিব হয়ে উঠল। মনে হোতে লাগল, আমার চারিদিকে যেন অনেকগুলো ছায়াশরীরী রক্তপিপাসু প্রেতাত্মা, তাদের লিক্‌লিকে কঙ্কাল-বাহু আমার দিকে বাড়িয়ে ওঁৎ পেতে গুম্ হয়ে বসে আছে, যে-কোন মুহূর্ত্তে তারা সবাই মিলে একসঙ্গে হুড়্-মুড়্ করে' আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়তে পারে!

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু আর কোন শব্দ পেলুম না। তবে কি এতক্ষণ আমি মিথ্যাভয়ের কুস্বপ্ন দেখছিলুম? তাই হবে! ভুতের গল্প পড়ে মাথাটা আমার বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল, নিশ্চয়!

একটু আশ্বস্ত হয়ে আবার এক-পা এক-পা করে' এগুতে লাগলুম। আবার—আবার সেই শব্দ! শব্দটাও ঠিক আমার পিছনে পিছনে এক-পা এক-পা করে' এগুচ্ছে। চকিতে ফিরে দাঁড়ালুম,—কেউ কোথাও নেই! আমি খুব জোরে জোরে পা ফেলে জানলার দিকে এগিয়ে গেলুম, —সে অজ্ঞাত, অদৃশ্য, অমানুষ শত্রুর পদ-শব্দও আমার পিছনে পিছনে এগিয়ে এল—খুপ্, খুপ্, খুপ্!

ভয়ে আর পিছনপানে চাইলুম না। কে জানে—কি দেখতে কি দেখব! প্রাণপণে জানলার গরাদেগুলো দুহাতে আঁকড়ে রইলুম।

দেখলুম, রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে একটা লোক যাচ্ছে সে আমার এত কাছে,—কিন্তু আমার মনে হোল, কাছে থেকেও সে যেন বহুদূরে! তার আর আমার মাঝখানে যেন প্রেতলোকের একটা অদৃশ্য যবনিকা পড়ে গেছে। তাকে চেঁচিয়ে ডাকতে গেলুম—কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না।

আকাশের গায়ে উড়ন্ত তিমির-পিণ্ডের মত একটা প্যাঁচা, ভীষণ কর্কশ চীৎকারে মৌন নিশীথকে বিদীর্ণ করে' দিয়ে কোথায় উড়ে গেল। আমার প্রাণ যেন গলা-পর্য্যন্ত উঠে ধুক্‌ফুক্ করতে লাগল।

ঐযে—পথ দিয়ে লণ্ঠন নিয়ে কারা আসচে না?—এ কি—কমলা আসছে! হ্যাঁ, তাইত—ঐযে, ওরা আমার বাড়ীর বাগানের ভিতর ঢুকল। আঃ—বাঁচলুম!

তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে দরজার দিকে ছুটে গেলুম—সঙ্গেসঙ্গে ঘরের একখানা 'বেণ্টউড' চেয়ার হড়্‌হড়্ করে' আমার দিকে সরে এল—তারপরেই পিছন থেকে কে-যেন আমার একখানা পা টেনে ধরেই ছেড়ে দিলে!... ... ... আমার পাদুটো ঠিক পাথরের মত হয়ে গেল, বুকের মধ্যে প্রাণটা যেন ধড়্‌ফড়্ করে আছ্‌ড়ে মরে' গেল—ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে আমি সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম।"

চন্দ্রনাথ গল্প থামাইয়া শ্রোতাদের মুখের দিকে চাহিল। বাহিরে তখনো ঝুরুঝুরু করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছে—মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে জোলো হাওয়া ঢুকিয়া 'অ্যাল্‌ম্যানাকে'র ছবিগুলো দোলাইয়া দিয়া যাইতেছে। গল্পটাও রীতিমত জমিয়া উঠিয়াছে। ঘরের দেয়ালে কালো-কালো ছায়া ফেলিয়া শ্রোতারা চন্দ্রনাথের মুখের দিকে রুদ্ধনিশ্বাসে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ গল্প বন্ধ হওয়াতে সকলে মহা উদ্বেগে, সাগ্রহে, সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর! তারপর!"

চন্দ্রনাথ গদাই-লস্করি চালে থামিয়া থামিয়া বলিল, "তারপর? তারপর—বুঝেছ কিনা—যা ঘটল, সে একেবারে—ওর নাম কি—অবর্ণনীয় ব্যাপার। আচ্ছা, আমার গল্পটি ক্রমপ্রকাশ্য হলেই ভাল হয় না কি? আজ ত কাটল,—আগামী বাদলে এটি সমাপ্য!"

—"না, না! শীগ্‌গির বল বল্‌চি! নইলে মুড়ি-ফুলুরির থালা কেড়ে নেব এখনি!"

—"স্বচ্ছন্দে। তোমরা বোধহয় জান যে, খালি থালা ভক্ষণ করা আমার অভ্যাস নেই—মুড়ি, ফুলুরি ইত্যাদি সমস্তই এখন আমার উদর-সিন্দুকে আবদ্ধ। তবে সবাই যখন এতই নাছোড়বান্দা, আমার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করতে আপত্তি নেই। শোন... ... ...

যখন জ্ঞান হোল, দেখলুম, শিয়রে হেঁট হয়ে কমলা আমার মাথায় জল ঢালছে—ঝী বাতাস করছে, চাকরটা লণ্ঠন-হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার জ্ঞান হোতে দেখে কমলা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁগা, কি হয়েছে তোমার!"

আমি ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাইতে-চাইতে উঠে বস্‌লুম। তারপর বললুম, "কমলা, ঘরে কোন শব্দ-টব্দ হচ্ছে না? ভূতটা চলে গেছে ত?"

—"ভূত! ভূত কিগো?"

—"হ্যাঁ, ভয়ানক ভূত—দেখা যায় না অথচ শব্দ করে; মানুষ ধরে!"

—"ওমা, তুমি বল্‌ছ কি! স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছ নাকি?"

—"স্বপ্নই বটে! এও যদি স্বপ্ন হয়, তবে আমি স্বপ্ন—তুমি স্বপ্ন—সবই স্বপ্ন!" —এই বলে কমলাকে একে-একে সব কথা খুলে বললুম।

সব বলা হয়ে গেলে মুখ তুলে দেখি, লণ্ঠনটা ফেলে চাকর, পাখাখানা ফেলে ঝী-মাগী সে মুল্লুক ছেড়ে সরে পড়েছে।

পরদিন ভোরবেলায় হঠাৎ চটুল হাসির কলরোলে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে চোখ-কচ্‌লে চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝেতে বসে কমলা মুখে কাপড় দিয়েও কোনমতে হাসি চাপতে পারছে না। হাসতে-হাসতে তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

—"হয়েচে কি, অত হাসির ঘটা কেন?"

কমলা হাসতে-হাসতে হাত নেড়ে আমাকে সবুর করতে বল্‌লে;—অর্থাৎ, আগে সে প্রাণ ভরে হেসে নিক্, তারপর কথাবার্ত্তা। আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম।

তারপর হাসির ধূম যখন একটু কম্‌ল,

কমলা তখন উঠে, আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, "গুণমণি, কালকের সে দুরন্ত ভূতটাকে, তদন্ত করে' আমি আজ এই ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করেচি!"

—"কি ?"

—"ভূত, মশাই, ভূত! যে ভূত দেখা যায় না অথচ শব্দ করে, মানুষ ধরে! এই দেখ!"

কমলার হাতে খানিকটা রেশমের সূতো!

—"ও ত দেখচি, সূতো!"

—"হুঁ, এ-টুকু তোমার ঐ 'আলবার্ট শ্লিপারে'র ভেতর থেকে আবিষ্কার করলুম।"

—"বেশ ত, হয়েছে কি ?"

—"ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখ। তাতেও যদি মশাই বুঝতে না পারেন, তবে আপনার গোঁফজোড়া আমাকে বাধ্য হয়ে কর্ত্তন করতে হবে।"

তাইত! ঘরের যেদিকে চাই—খালি দেখি কালো কালো রেশমের সূতো! দরজার কাছে, জানলার কাছে, টেবিলের চারিদিকে, চেয়ারের পায়ায়, সূতো—খালি রেশমের সূতো!

কমলা যা বল্‌লে, তার মর্ম্ম এই: নেমন্তন্নে যাবার সময় সূতোর বাণ্ডিলটা সে বিছানাতেই তাড়াতাড়িতে ফেলে গিয়েছিল। আমার পা লেগে বা যেমন করে'ই হোক্—বাণ্ডিলটা বিছানা থেকে মাটিতে পড়ে যায়, সেই সময়ে কোনগতিকে খানিকটা খোলা সূতো গিয়ে পড়ে আমার জুতোর ভিতরে। তারপর ঘরের আলোটা যায় নিবে। ভূতের গল্প পড়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় যখন আলো জাল্‌তে নীচে নামি, তখন আমি সেই সূতো-সুদ্ধ জুতো পায়ে দি। কাজেই, যখনি আমি চল্‌তে গেছি, সেই পায়ে-আঁট্‌কানো বাণ্ডিল সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ করে' উঠেছে। এই হ'ল ভূত-দেখার প্রামাণিক ইতিহাস!

কমলার কথা অনেকক্ষণ ধরে ভেবে দেখলুম!

Circumstancial evidenceএ তার কথা সত্য বলে মেনে নিতে হয় বটে! কিন্তু কি-জান—বলা ত যায় না—

শ্রীঃ—

পুরাতন পূজার সাজ

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে, অনেকে মুখে ও মাসিকপত্রে সমালোচনকালে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, উহা বাঙ্গালার ইতিহাসই হয় নাই, কারণ উহাতে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি পাওয়া যায় না। অনেকে বলিয়াছেন যে গ্রন্থখানি ইতিহাস-মূলক হইলেও উহাকে বাঙ্গালার ইতিহাস নাম দেওয়া উচিত হয় নাই; Greenএর History of the English Peopleএর ন্যায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ যখন বাঙ্গালায় রচিত হইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে এতদিনে বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশিত

হইল। প্রাচীনযুগের বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস কখনও Greenএর ইতিহাসের ন্যায় সম্পূর্ণাবয়ব হইবে কিনা সন্দেহ। যে দেশের লিখিত ইতিহাস নাই, যে দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহা অবলম্বনে ইতিহাসের কঙ্কাল যোজনা করিতে হয়, কোনকালে সে দেশে Greenএর ইতিহাসের ন্যায় সম্পূর্ণাবয়ব ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস কোনকালে ইংরাজ অথবা ফরাসী জাতির ইতিহাসের অথবা রোমক বা গ্রীক্ জাতির ইতিহাসের ন্যায় সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। আধুনিক ইংরাজ অথবা ফরাশী জাতির ও অধুনা-বিলুপ্ত প্রাচীন রোমক ও গ্রীক্ জাতির লিখিত ইতিহাস ছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে কেবল চীন ও জাপান দেশের লিখিত প্রাচীন ইতিহাস আছে। প্রাচীন মিশর অথবা বাবিরুষের (Babylon) লিখিত ইতিহাস নাই। খোদিত লিপি, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি অবলম্বনে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডপ্রমাণ যোজনা করিয়া, এই সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কঙ্কাল একত্র হইয়াছে। প্রাচীন ভারত অথবা প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস এইরূপে রচিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। ইতিহাসের কঙ্কাল যোজিত হইলে যে দেশে যত অধিক উপাদান পাওয়া যায় সেই-দেশে প্রাচীন ইতিহাস তত সম্পূর্ণাবয়ব হয়। মিশরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বাবিরুষে কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপাদান পাওয়া গিয়াছে, এইজন্য প্রাচীন মিশরের ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণাবয়ব ও বাবিরুষের ইতিহাস কিঞ্চিৎ অবয়বসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে ও বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন ইতিহাস-রচনার উপাদান অতীব দুষ্প্রাপ্য, যাহা পাওয়া যায় তাহাও সকল সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে, এইজন্য প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস কঙ্কালসার রহিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাস-রচনার যে উপাদান পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময়ে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না এবং বিশ্বাসযোগ্য হইলেও ব্যবহার করিতে পারা যায় না; কারণ সাহিত্যের



কর্পূরদান—সম্মুখ

প্রমাণ কোন্ যুগের ইতিহাস-রচনায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা স্থির করা যায় না। ইতিহাসের কঙ্কাল সম্পূর্ণাবয়ব করিতে হইলে প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করা আবশ্যক। এখন বাঙ্গালা দেশে সামাজিক ইতিহাস বলিলে যাহা বুঝায় তাহা বলিতেছি না। কুলশাস্ত্র অবলম্বনে মেলবন্ধন, পটি-বন্ধন, সমীকরণ প্রভৃতি কৌলীন্য ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসের বিবাহ-সম্বন্ধীয় অধ্যায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস বলিলে মানুষের আচার, ব্যবহার, জাতকর্ম্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, রীতি-নীতি, ব্যবসায় ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বুঝায়। আমাদিগের দেশে প্রাচীন সাহিত্যে ইহার অনেক উপাদান আছে বটে, কিন্তু তারিখ নির্ণয় করা যায় না বলিয়া এই সমস্ত উপাদান ইতিহাস-রচনা কালে ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

প্রাচীন মিশর অথবা বাবিরুষে সমাধি-স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন যুগের তৈজস-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতে মৃতদেহ সমাহিত হয় না এবং মৃতদেহের সহিত তৈজসপত্রও রক্ষিত হইত না। সেই জন্য প্রাচীন ভারতের তৈজসপত্রের বিবরণ অদ্যাবধি কোনও ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ও নবীন যুগের তৈজস-পত্রের কি প্রভেদ তাহাও নির্ণীত হয় নাই। মৃত্তিকা-খননকালে ভারতবর্ষের নানাস্থানে পুরাতন তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে কিন্তু কাল-নির্ণয় করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে নৈহাটি গ্রামে একখানি তাম্রশাসন ও কতকগুলি প্রাচীন তৈজস-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনখানি বাঙ্গালার সেনবংশের রাজা বল্লাল-সেনের,



কর্পূরদান—পার্শ্ব

ইহার উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা"য় ও "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। যেস্থানে এই তাম্রশাসন ও তৈজসগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী নৈহাটি ও সীতাহাটি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত এবং কৃষক-সমাজে "নৈরাজার ভিটা" বলিয়া পরিচিত। এই স্থানে আবিষ্কৃত তৈজসগুলি পুরাতন পূজার সাজ। তাম্রশাসনের সহিত একটি তাম্রকুণ্ড, তিনটি পানিশঙ্খ, চারিটি পিতলের পানিশঙ্খের আধার ও একটি গন্ধাধার আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাটোয়ার তাৎকালীন হাকিম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি, এ, তাম্রশাসনখানি ও তৈজসগুলি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার চিত্রশালায় প্রেরণ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাম্রশাসনের সহিত অনেকগুলি সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংবাদ সত্য হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, "নৈরাজার ভিটা" একটি প্রাচীন দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানে যে তৈজসগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাম্রশাসনের সহিত আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান হয় যে, সেগুলি বল্লালসেনের সমসাময়িক। বল্লালসেন দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন, কারণ ১১১৮—১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, অতএব ১১১৭ বা ১১১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

"নৈরাজার ভিটা"য় আবিষ্কৃত তাম্রকুণ্ড-খানি বিকৃতাঙ্গ হইয়াছে, তথাপি ইহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন যে আকারের তাম্রকুণ্ড ব্যবহৃত হইত, এখনও সেইরূপ তাম্রকুণ্ড ব্যবহৃত হয়। পানিশঙ্খ তিনটির মধ্যে একটি কারুকার্য্যশোভিত, ঢাকায় নির্ম্মিত পানিশঙ্খে এইরূপ কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্তলনির্ম্মিত পানি-শঙ্খের আধার চারিটি পানিশঙ্খের আধার কিম্বা শালগ্রাম শিলা বসাইবার টাট্ তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। তবে



তাম্রকুণ্ড

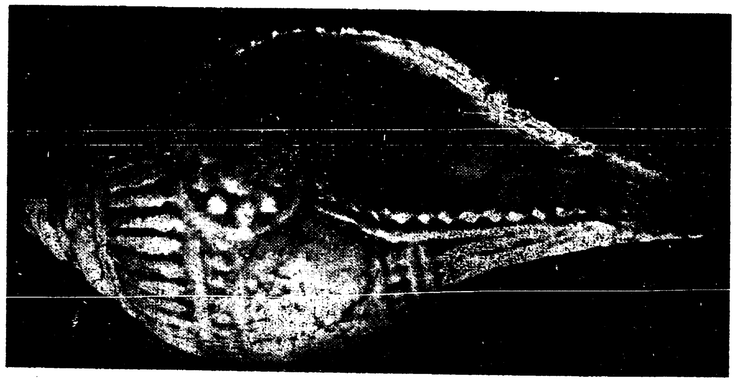

পানিশঙ্খ

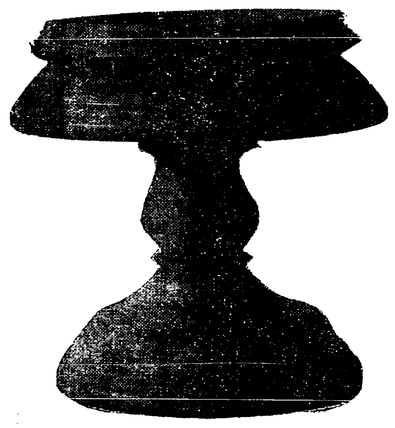

পানিশঙ্খের আধার

আবিষ্কৃত পানিশঙ্খ তিনটি, ইহার তিনটি আধারে, জলপূর্ণ করিয়া বসাইলে, স্থির থাকে। অবশিষ্ট তৈজসটি নূতন ধরণের, এই জাতীয় তৈজসের চিত্র বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত প্রস্তর-মূর্ত্তির পাদপীঠে অঙ্কিত আছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাধ্যক্ষ ডাক্তার ভোগেল (Dr. J. Ph. Vogel) মাদ্রাজে কর্ণুল জেলায় মামল্যদেবের মন্দিরে এই জাতীয় তৈজস বর্ত্তমান কালে পূজায় ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় ইহা গন্ধাধার, ইহাতে আরত্রিকের সময়ে কর্পূর দগ্ধ হইয়া থাকে এবং বাঙ্গালাদেশে কোনও কোন স্থানে এই জাতীয় তৈজস এখনও ব্যবহৃত হয়।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপসী

পাত্র ও পাত্রী

নিরঞ্জন	...	মান্দার-দুর্গাধিপতি
রূপসী	...	নিরঞ্জনের কিশোরী পত্নী
আর্য্যধন	...	নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা
দেবল, কহ্লন		নিরঞ্জনের অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ
বরাট	...	মোগল-সেনাপতি

তৃতীয় অঙ্ক

নিরঞ্জনের প্রাসাদ-কক্ষ

নিরঞ্জন, আর্য্যধন, দেবল ও কহ্লনের প্রবেশ

নিরঞ্জন

আর নয়। তোমাদের সকলের কথাই রেখেছি আমি, অক্ষরে অক্ষরে রেখেছি। কারো মনে কোন ক্ষোভ নেই। আমি স্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ সকলের তৃপ্তি সাধন করেছি! নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলুম—ডাকাতে বাড়ী লুঠছে দেখে কাপুরুষ গৃহস্বামী যেমন এককোণে লুকিয়ে থাকে—তেমনি আমি নিজেকে এককোণে জোর করে লুকিয়ে রেখে-ছিলুম! আমার ঘর লুঠ হয়ে গেল, তবু একটা নিশ্বাস অবধি পড়তে দিই নি... আমার এত বড় অসম্মানেও আমি ধৈর্য্য হারাইনি, মাথা খাড়া রেখেছিলুম। তোমরা আমার সে স্তব্ধতার চূড়ান্ত মূল্য আদায় করেছ! আমার সম্মানের মূল্যে আপনাদের তুচ্ছ উদর-পূর্ত্তির অন্ন কিনেছ...আমি কোন কথা কইনি, কোন বাধা দিইনি। এখন সর্ত্ত রক্ষা হয়েছে, তোমরা উদর পূর্ণ করেছ—চাঙ্গা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছ! ব্যস্! এধারে রাত্রি কেটে গেছে, প্রভাত হয়েছে,—আমারও পা থেকে চুক্তির শৃঙ্খল খসে গেছে! আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন,—নিজেকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি! গা থেকে সমস্ত লজ্জা, সমস্ত কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলে আবার আমি উঠে দাঁড়িয়েছি!

আর্য্যধন

তোমার এ দুঃখ সীমাহীন—এ দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই, পুত্র... সান্ত্বনার কথা তোমার গায়ে কাঁটার মত বিঁধবে—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও আমি করছি না। তবু মনে রেখো পুত্র, তোমার মান্দার বড় বিপদ থেকে আজ পরিত্রাণ পেয়েছে। এর জন্য লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে আছে, তোমার মুখের পানে আমরা চাইতে পারছি না। তবু...শোনো পুত্র, যদি কোন দিন বুঝে থাকো, আমি তোমায় ভালবেসেছি, সকলের চেয়ে সব-জিনিসের চেয়ে ভাল-বেসেছি, আমার প্রাণাধিক তুমি, গৌরব তুমি—তাহলে আমার একটা অনুরোধ রেখো—ক্রোধের বশে মন যখন তপ্ত, বিষাদে যখন সে মূর্চ্ছিত, তখন সেই মন দিয়ে আমার মার বিচার করো না তুমি। ...এই রাগ যখন শীতল হয়ে যাবে, বিষাদ কেটে যাবে, মন শান্ত হবে,—তখন তুমি এ ব্যাপারটাকে আর-এক মূর্ত্তিতে দেখবে ...মা আমার এখনই ফিরে আসবে। আজ তার বিচার করো না পুত্র—কোন

রূঢ় কথা বলো না। এ সঙ্গীন মুহূর্ত্তে তোমার একটা তপ্ত শ্বাস প্রলয় ঘটিয়ে তুলতে পারে!...শান্ত হয়ে তার বিচার করো। যদি বোঝো, সে শক্তি তোমার আজ নেই, তাহলে তার সঙ্গে দেখাও করো না।...মানুষ কতকগুলো দুর্দ্দম শক্তির খেলনা বৈ ত নয়, সে শক্তিগুলো যতক্ষণ জেগে থাকে, মানুষ ততক্ষণ বুঝতে পারে না, তার বুকের মধ্যে কতখানি মহত্ত্ব, কতখানি সুবিচার, বুদ্ধি, বিবেক, ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা পাথারের মত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে!...সেই শান্ত মুহূর্ত্তে আমার মার পানে চেয়ে দেখো পুত্র, দেখবে, মনে তোমার এতটুকু ঘৃণা হবে না; ক্রোধ মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে না। এক অপূর্ব্ব অসীম ভালবাসায় প্রাণ তোমার ভরে উঠবে!

নিরঞ্জন

বক্তব্য তোমার শেষ হয়েছে, বৃদ্ধ? আর ও-সব বাক্যচ্ছটার প্রয়োজন নেই—তোমাদের দিন কেটে গেছে—এখন আমার দিন এসেছে। তোমরা উদর ভরে আহার সংগ্রহ করেছ, কড়ায়-গণ্ডায় আমি তার মূল্য দিয়েছি। ব্যস্—দেনা-পাওনার সম্পর্ক চুকে গেছে।...তবু আমি ভাবছিলুম, এখনো তোমার কি বক্তব্য থাকতে পারে! তাই স্থির হয়ে সব শুনছিলুম। আশ্চর্য্য, এখনো সেই এক কথা,—ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর, ক্ষমা কর—! সেই সনাতন যুগ থেকে এই উপদেশ বকে বকে মানুষ এখনো তা বক্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে! যেন মানুষ একটা যন্ত্র—শুধু পরের হাতে দম খেয়েই সে চলবে—নিজের তার কিছু নেই! তার ইচ্ছা...থাক্, আমি বেশী কথার ধার ধারি না। স্পষ্ট করে সহজ ভাষায় বলি, শোনো, আমি কি করব, তা স্থির করেছি। একটা পাষণ্ড দস্যু আমার রূপসীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেছে—যতক্ষণ সে এ পৃথিবীতে আছে, ততক্ষণ রূপসীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই! হয় সে, নয় আমি, এক জনকে দুনিয়া থেকে সর্‌তেই হবে। বুঝলে? আর আমি যে মূল্য দিয়েছি, তার বিনিময়ে আমি কি চাই, জানো?...মান্দার আমার সম্মানের মূল্যে এই যে আহার পেয়েছে, সেই আহারে সে আজ বলিষ্ঠ সবল হয়ে উঠেছে। তার নির্জ্জীব হাতে আবার যে শক্তি ফিরে পেয়েছে। এখন মান্দার আমার সম্মানের মূল্য দিতে বাধ্য—আজ থেকে মান্দারের সমস্ত প্রাণী আমার ক্রীতদাস। আমি তাদের নিজের সম্মান দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছি। মান্দারের প্রতি আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি, এখন মান্দার আমার প্রতি তার কর্ত্তব্য করুক! এই সমস্ত প্রাণী আমার ইঙ্গিতে আজ চলা-ফেরা করবে। আর রূপসী? তাকে আমি ক্ষমা করব—সে বুদ্ধিহীনা দুর্ব্বল নারী! কিন্তু সে পাষণ্ড বেঁচে থাকতে এ ক্ষমা পাবে না সে!...জানি, সে প্রতারিতা হয়েছে, কতকগুলো স্বার্থপর বাক্‌পটু লোকের কথার ফাঁদে পা দিয়ে বিপন্ন হয়েছে। তবুও সে এতে আশ্চর্য্য সাহসের পরিচয় দিয়েছে।...তার এই সাধুতা, এই মহত্ত্ব এমনভাবে কাজে খাটাতে মান্দার এতটুকু লজ্জা বোধ করলে না? প্রাণটা তার কাছে বেশী দামী হল? আশ্চর্য্য! যাক্, যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরবার নয়!...

ভুলব? অসম্ভব! মানুষ এ কি ভুলতে পারে কখনো?...কিন্তু সেই পাষণ্ড—আর তুমি—আমার পিতা.. জেনো, একটা মহৎ উদার প্রাণকে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত করে দিয়েছ—তার ফলও মান্দার দেখবে! তোমায় শাস্তি নিতে হবে। আমি তোমায় ঘৃণা করি। খুব ঘৃণা—কোন পুত্র পিতাকে কখনো তেমন ঘৃণা করে নি—পিতাকে তেমন অভিশম্পাৎ কখনো দেয়নি—

আর্য্যধন

তাই কর, আমায় ঘৃণা কর পুত্র, অভিশম্পাৎ দাও—কিন্তু আমার মাকে মার্জ্জনা করো।...সমস্ত দেশকে আমার মাই আজ প্রাণ দিয়েছে—জগতে যদিও সে সুবিচার না পায়, জেনো, আর এক জগৎ আছে, সেখানে সোনার অক্ষরে মার এই কীর্ত্তি-কথা তারা লিখে রেখেছে, তারা এর সুবিচার করবে।...আমি মুখের কথায় অনুমতি দিয়েছি মাত্র। অনুমতি দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু তা পালন করা—তাতে অসাধারণ শক্তি আছে, পুত্র!...আজ তুমি যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখ, তাও আমার সহ্য হবে। সহ্য হবে এই জন্য যে আমার মা—আমার মা আমায় অতুল গৌরব দান করেছে! মার কৃপায় আমি স্বর্গ দেখেছি!... তোমার কোন দোষ নেই, পুত্র। তুমি আমায় ত্যাগ করলে, যে কদিন আমার এ দেহে প্রাণ আছে, জেনো, আমি তোমার মঙ্গলই কামনা করব। তোমার কোন অপরাধ নেই। তোমার মত বয়সে আমিও হয়ত এই রকম বিচার করতুম, পুত্র। আমি যাচ্ছি, আর তুমি আমায় দেখতে পাবে না, কিন্তু যাবার সময় আবার অনুরোধ করি, পুত্র, আমার মাকে কঠিন কথা বলো না, তিরস্কার করো না, তাকে ক্ষমা করো। তোমার ক্রোধের বহ্নি আমারই মাথায় তুমি নিঃশেষে নিক্ষেপ কর, করে শান্ত হও। এর একটি স্ফুলিঙ্গও তোমার বুকে লুকিয়ে রেখো না।...মনে রেখো পুত্র, ক্রোধ এখানে শুধু ক্ষণিক আস্ফালন করে, সে বড় ক্ষণিকের। ক্ষমা শান্ত প্রকৃতির নির্ম্মল হাসির মতই মানুষের বুক ভরে পড়ে আছে। ক্রোধের ক্ষণিক গর্জ্জনে ভীতা হয়ে প্রকৃতির সে হাসি মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু বুক ছেড়ে পালায় না। মানুষ তাই মানুষের পাশে এতকাল নিরস্ত্র হয়েও শুধু সেই গভীর বিশ্বাসেই হেসে-খেলে বেঁচে আছে!...আমি তোমার সমস্ত অকরুণা, সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত ঘৃণা নিয়ে চলে যাচ্ছি, পুত্র, কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে! পিতা হয়ে প্রার্থনা করছি, আমায় নিরাশ করো না—মনে আমার শুধু একটি সাধ আছে, যাবার পূর্ব্বে একবার আমায় দেখতে দাও,—মা আমার ফিরে আসছে, এখনই এসে পৌঁছুবে! এলে তার দুই হাত ধরে তাকে তোমার বুকে তুলে নাও। সে দৃশ্য দেখে তখনি আমি চলে যাব, হাসি-মুখে যাব। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, পুত্র, তোমার এ বিচার বেশী আর-কি দুঃখ দেবে? দুঃখের ভারে ঘাড় আমার নুয়ে পড়েছে, না হয় আর-একটু নুইবে, না হয় এ ঘাড় সে দুঃখের ভারে ভেঙ্গে যাবে! তাতে আমি কাতর হব না পুত্র কিন্তু দেখো, আমার মাকে যেন একবিন্দু দুঃখ না স্পর্শ করে...তার মুখের হাসিটুকু যেন অটুট থাকে!

[অদূরে অস্পষ্ট কোলাহল শ্রুত হইল ;

ক্রমে সে কোলাহল স্পষ্টতর হইলে শুনা গেল, অসংখ্য কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিতেছে,

"জয় মাতাজীর জয়"

"জয় রূপসী-রাণীর জয়—"]

ঐ, ঐ মা আমার আসছে। কৃতজ্ঞ মান্দার মহা-উল্লাসে ঐ জয়-ধ্বনি করছে। এ কি মূর্চ্ছা? এ কি সুপ্তি? না, না, ভগবান, ভগবান...আমায় আর-খানিক বাঁচিয়ে রাখো, চেতন-হারা করো না!

দেবল ও কহ্লন বাতায়ন-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল

দেখতে পাচ্ছ! ঐ—ঐ কাতারে-কাতারে সব দাঁড়িয়ে আছে, দলে-দলে সব লোক ছুটেছে! মান্দারের পথ-ঘাট নর-মুণ্ডে ভরে গেছে। গাছের ডালে, চারিধারে—শুধু মানুষের মাথা! কিন্তু আমার মা—আমার মা কৈ? তোমরা দেখতে পাচ্ছ? আমি বৃদ্ধ, দৃষ্টি আমার ক্ষীণ, তার উপর অশ্রু এসে সে ক্ষীণ দৃষ্টিটুকুকেও রোধ করছে! কৈ, কৈ—আমার মা কৈ? যাই, যাই, আমি নেমে যাই—

দেবল

(আর্য্যধনকে ধরিয়া) না, যাবেন না। মান্দার উন্মত্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় অধীর মান্দার—তার পায়ের তলায় পড়ে আপনি পিষে চূর্ণ হয়ে যাবেন।...ঐ, ঐ রাণী আসছেন, মান্দারের পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসিমুখে রাণী আসছেন···

আর্য্যধন

হাসিমুখে! হাঁ, ঠিক দেখেছ, তাহলে—হাসিমুখ! ঠিক! এই ত আমার মার মুখ। জয়ের হাসি-ভরা,—বড় গৌরবের হাসি এ আজ বার্দ্ধক্যে আমার ক্ষোভ হচ্ছে! যদি সে শক্তি থাকত, যদি এ বাহুতে সে ব —মাকে আমার এ পথটুকু চলবার দিতে পারতুম না, কোলে তুলে নি আসতুম! তোমরা ব , বল, মার মুখে সত্য হাসি দেখছ? বল, বল, মার মুখে দী দেখতে পাচ্ছ? বিজয়ের উজ্জ্বল দীপ্তি?

কহ্লন

অপূর্ব্ব রশ্মিতে মুখখানি উজ্জ্ব উদ্ভাসিত!···সারা পথে যেন আলো ছড়ি আসছেন—

দেবল

কিন্তু ও কে? ঠিক-পিছনে ঐ সঙ্গে ম আসছে, নত শিরে, অত্যন্ত মন্থর গতিতে

কহ্লন

জানি না। অপরিচিত মুখ! বেশ-ভূষাও—

[নেপথ্যে আবার জয়ধ্বনি উঠিল]

আর্য্যধন

ঐ আবার সকলে জয়ধ্বনি করছে কাছে এসেছে!...সমস্ত প্রাসাদ এই কেঁপে উঠল? ঠিক। ওদেরই জ ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছে! দেওয়ালগুলো প্রাসাদের এ মূক দেওয়ালগুলো যেন উত্তেজনা সাড়া দিচ্ছে! এই দেখ, আমার পায়ে তলায় মেঝেটা অবধি তালে-তালে নে উঠছে! আনন্দ, ওরে, চারিধারে মা আমা অধীর আনন্দ ছড়িয়ে আসছে। সত্য ত, পথে যেন আলোর হিল্লোল ছুটেছে...

দেবল

মান্দারের পুরনারীরাও পথে বেরিয়েছে মা ছেলে কোলে করে, তরুণী দ্বিধা-জ

রে ঠেলে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। বাতায়ন কে বধূরা ফুল ছুড়ে দিচ্ছে, মালা ড়াচ্ছে, লাজ বর্ষণ করছে ঐ যে গলা থেকে াতির মালা ফেলে দিচ্ছে! ফুলের পাপড়িতে খ ভরে গেছে··প্রাসাদের কাছে সব এসে ড়েছে। মান্দার সত্যই আজ উন্মত্ত হয়েছে। ান্দারের এ মূর্ত্তি ত কখনো চোখে দেখিনি! তজ্ঞ মান্দার। না, না—এ যে বন্যার মত নস্রোত ছুটে আসছে—প্রাসাদ-দ্বারে ক্ষীরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিপুল স্রোত রুখে রাখতে হবে। প্রাসাদে ঢুকলে াসাদ চুরমার হয়ে যাবে। যাই, আমি যাই, াসাদ-দ্বার বন্ধ করতে আদেশ দিইগে—ন্মাদের দলকে ভিতরে আসতে দেওয়া বে না!

আর্য্যধন

আহা, না,—আসুক, আসুক! ওদের াণে বড় উল্লাস মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে! কৃতজ্ঞ দয়ে আজ অজস্র ফুল ফুটেছে—ঠিন বুক সব কোমল হয়ে গেছে! ড় দুঃখ পেয়েছে...বেচারা মান্দার! তার তজ্ঞ হৃদয়ের এ উচ্ছ্বাস রোধ করো না। ক্তি এসেছে আজ, মুক্তি—প্রাচীর তুলে মুক্তিকে আর রুদ্ধ করো না। ওরে ামার সাহসী বীরের দল,—তোরা কণ্ঠ রে যে আনন্দ-সুধা আজ পান করেছিস, বড় মধুর সুধা রে, বড় মধুর! কর্, য়ধ্বনি কর্, মধুর সুরে সব জয়ধ্বনি কর্! ামার জীর্ণ কণ্ঠ! তোদের সঙ্গে সুর মেলাতে াচ্ছি না—দুঃখে আমি অভিভূত হয়ে ছি। আমার সাধ হচ্ছে, তোদের কণ্ঠে মিলিয়ে মার জয়ধ্বনি তুলি, গগন ফেটে যাক—গগনের বুক থেকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হোক!...মা, মা—আমার মা—ঐ না, ঐ না প্রাসাদ-সোপানে মার চরণ-পদ্ম ফুটে উঠেছে? আয় মা, তোর সন্তানের বুকে আয় (ছুটিয়া গমনোদ্যত ; দেবল ও কহ্লন আর্য্যধনকে ধরিয়া রাখিল) ওরে, আমায় ধরে রেখেছে এরা ধরে রেখেছে—আমার এ আনন্দে ওরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আয় মা, আয়, আয়,—স্বর্গের সুষমা তোর সারা অঙ্গে আজ কি লাবণ্য যে ফুটিয়ে তুলেছে! আমার বড়-সুন্দর মা—আমার পুণ্যচরিত মা—আয় মা—(কক্ষ-মধ্যস্থ পুষ্পাধার হইতে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া ছিঁড়িয়া পুষ্পদল ছড়াইতে ছড়াইতে) আয় মা, এই সুগন্ধি ফুলের দলে তোর পা রাখবি আয়—তোর ঐ ফুলের মত সুন্দর কোমল পা দুখানি দিয়ে···

রূপসীর প্রবেশ ; পশ্চাতে নতশিরে বরাট ও নাগরিকগণ

রূপসী

বাবা—

আর্য্যধন

এসেছিস্, মা আমার এসেছিস্! আয় (রূপসীকে বুকে ধরিয়া) ছেলের বুকে ফিরে আয় মা! দাঁড়া, স্থির হয়ে দাঁড়া, একবার তোর পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে চেয়ে দেখি। তোর মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার দৃষ্টির শেষ কিরণটুকুও যদি আজ মিলিয়ে যায় ত তাতে কোন ক্ষোভ থাকবে না! অশ্রু আমার দৃষ্টি রোধ করছে মা, তবু সেই অশ্রুর মধ্য দিয়েও আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—আমার মা—আমার মার কত রূপ, কত মাধুরী! আমার

মার মুখে কি স্বর্গীয় দীপ্তি! তারা ত এ দীপ্তি কৈ এতটুকু কেড়ে নিতে পারেনি—ঐ চোখে তোর সেই হাজার চাঁদের আলো, ঐ ঠোঁটে তোর সেই শুভ্র অমল হাসি তেমনি আছে, ঠিক তেমনি!

রূপসী

বাবা—(চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) কৈ? কৈ?···আমি যে সকলের সামনে সব কথা বলতে চাই, বাবা। প্রথমেই—

আর্য্যধন

নিরঞ্জন! ঐ যে তোমার স্বামী, ঐ সে। আমার আজ সে বিচার করেছে মা, বিচার শেষ হয়েছে, দণ্ড দিয়েছে আমাকে! কিন্তু তোর প্রতি সুবিচারই করবে! এত বড় মহত্ত্ব! বর্ব্বরেরও মাথা যে তার সামনে নত হয়ে পড়ে!···এত বড় ব্রত উদ্‌যাপন করে এলে, যাও মা, তোমার স্বামীকে প্রণাম কর—

(রূপসী নিরঞ্জনকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে নিরঞ্জন বাধা দিল)

নিরঞ্জন

রূপসী—(নাগরিকগণের প্রতি) যাও তোমরা। এ ঠিক তামাসা হচ্ছে না যে দাঁড়িয়ে দেখবে সব! যাও—

রূপসী

না, না, থাকুক, সকলে থাকুক—সকলে শুনুক—সকলকেই বলব আমি! তুমিও শোনো (নিরঞ্জনের কাছে আসিল)

নিরঞ্জন

না, সরে যাও, আমায় স্পর্শ করো না, রূপসী। (নাগরিকগণের দিকে অগ্রসর হইয়া) তোরা শুনতে পাচ্ছিস না? দূর হ কাপুরুষের দল, তোরা চলে যা নিজেদের গৃহে তোরা যা-খুসি তাই করতে পারিস, কিন্তু এখানে এ আমার ঘর এখানে আমি প্রভু—আমার আদে করবার শক্তি আছে, তোরা চলে যা দেবল, কহ্লন, প্রহরীদের ডাকো—যা না যাবে, তাদের স্পর্দ্ধার শাস্তি দাও মান্দার আহার পেয়েছে, চুকে গেছে। যা সকলে চলে যাও। (জনতা অস্পষ্ট কোল হল করিতে করিতে চলিয়া গেল) কে এখানে থাকবে না, কেউ না! (আর্য্যধনকে ধরিয়া) তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে বৃদ্ধ তুমিও যাবে—তোমাকেও যেতে হবে যাও—তুমিও ঐ বর্ব্বর মান্দারের একজন তোমার অপরাধ সব-চেয়ে বেশী, তুমি যাও তুমি আমার চোখের জল দেখে আনি করবে, ভেবেছ? না, তা হবে না—লোকে নিশ্বাস আমার সহ্য হচ্ছে না। কলুষিত নিশ্বা কেউ এখানে থাকবে না—যাও। (বরাটকে দেখিয়া) তুই—তুই কে? মাথা হ করে পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ দাঁড়ি আছিস্—কে তুই, বল্। কথা ক'। কি প্রেত না, ছায়ামূর্ত্তি—কে তুই? এ দাঁড়িয়ে আছিস কোন্ স্পর্দ্ধায়? এ নড়লি না? ভেবেছিস্, আমার হাতে নেই? (তরবারি টানিয়া) দেখেছিস্, প্রাণের মায়া থাকে, এই দণ্ডে দূর কি, হাত তুলছিস্? তরবারির আঘাত রোধ করবি? বাতুল তুই—জানিস্ তরবারি কত বীরের রক্ত পান করেছে ··· ··· না, তোর অঙ্গে এ তরবারি আ করব না!···এখনো নড়লি না?

তোল্ বর্ব্বর! এখানে ভেকি দেখাতে এসেছিস্! জবাব দে। এখনো জবাব দিলি না? কে তুই? বল্—

(বরাটের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার মুখে বাঁধা বস্ত্র-খণ্ড টানিয়া সরাইল; রূপসী ছুটিয়া আসিয়া দুইজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিরঞ্জনকে সরাইয়া দিল)

রূপসী

না, ওকে স্পর্শ করো না তুমি···

নিরঞ্জন

এ কি রূপসী! আমি বিস্মিত হচ্ছি—এত শক্তি তুমি কোথায় পেলে?

রূপসী

এ আমায় রক্ষা করেছে।

নিরঞ্জন

এ রক্ষা করেছে! কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, রূপসী! মহৎ কাজ করেছে ও, সন্দেহ নেই...কিন্তু—

রূপসী

শোনো, তোমায় মিনতি কচ্ছি, একটা কথা শোনো। এ আমায় শুধু রক্ষা করেনি, আমায় বিপুল সম্মানে সম্মানিত করেছে, বিপুল গৌরব দিয়েছে, পুরুষের প্রতি অনেকখানি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছে, প্রভু!·· এখন এখানে আমার আশ্রিত হয়ে এসেছে ও, আমি ওকে কথা দিয়েছি, কেউ ওর কেশাগ্রও এখানে স্পর্শ করবে না। তুমি অবধি না...রাগ করছ? কর, কিন্তু আমার একটা কথা শোনো—

নিরঞ্জন

কে এ—আমি জানতে চাই।

রূপসী

এ বরাট।

নিরঞ্জন

কে! কি বললে!··· এই সে—যাকে আমি খুঁজছি, এই সে বরাট?

রূপসী

হাঁ, এই সে। বরাট। তোমার অতিথি আজ, আমার আশ্রিত। তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করতে এখানে এসেছে। এই বরাটই আমায় দারুণ কলঙ্ক, দারুণ অপমান থেকে রক্ষা করেছে!

নিরঞ্জন

(মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, পরে) হাঁ, এই-বারে বুঝেছি সব।··· এই ত আমার রূপসীর যোগ্য কাজ! রূপসী, সহধর্ম্মিণী আমার—বেশ করেছ। পতির ব্রতে আজ তুমি বড় সাহায্য করেছ সতী, ঠিক কাজ করেছ!··· তোমার কৌশল এখন বুঝেছি আমি! দুরাত্মাকে ছলে ভুলিয়ে এখানে টেনে এনেছ! বাঃ, এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি, রূপসী··· দুর্ব্বল নারী আত্মহত্যা করে; সেটা দুর্ব্বলতা, পাপ! তাতে কোন লাভও নেই··· ক্ষতি—ঋণ আরো বেড়ে যায়। কিন্তু তুমি! উচিত কাজ করেছ···কি জয়ের আভাস পাচ্ছি আমি··· (হাস্য) তোমার পিছনে পিছনে পোষা কুকুরের মত চলে এল!··· মূর্খ, এত সহজে ফাঁদে পা দিলে! আশ্চর্য্য! নিরাশ্রয় একা ওকে গোপনে শিবিরে মেরে ফেললে কি হত? কিছু না। এখানে কে জানত? কেউ না। তোমারও কোন গৌরব হত না—লোকের

মনে সন্দেহের ছায়া থেকে যেত। আর এখন? চমৎকার হয়েছে! বাঃ—সবাই এখন জানবে, সবাই এখন বুঝবে, নারীর বল কত অসীম, বুদ্ধি তার কত গভীর! না, ওদের ডাকি—সকলকে ডাকি—সকলে এসে দেখুক, নিজের চোখে তোমার গৌরব দেখুক—দেখে মাটির কীট সব ধন্য হয়ে যাক—দেখে কৃতার্থ হোক্! (বাতায়নের ধারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে) এসো, সকলে এসো এখানে। বরাট—বরাট আমাদের কবলে এসে উপস্থিত। আমাদের শত্রু, মান্দারের শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু! সেই বরাটকে আমাদের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি আজ। এসো সকলে।

রূপসী

(নিরঞ্জনকে ধরিয়া) ও কি করছ তুমি? না, না—তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? শোনো, শোনো—

নিরঞ্জন

(রূপসীকে হঠাইয়া) না,—কোন কথা শুনব না, কোন কথা শুনতে চাই না আর! বরাট, বরাটকে পেয়েছি আমি। এসো, সকলে এসো, আমার বৃদ্ধ পিতাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। বড় আনন্দ—বড় সমারোহ আজ! সকলে আজ রূপসীর জয়ধ্বনি কর—আমিও তোমাদের সুরে সুর মেলাই।

(জনতার প্রবেশ; সঙ্গে আর্য্যধন প্রভৃতি)

বিচার আছে—ভগবান আছে! কে বলে, নেই? মূর্খ সে, পাগল সে!... আমি ভেবেছিলুম, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর তার প্রতীক্ষায় থাকতে হবে! তার জন্য কত নগর, কত বন ঢুঁড়তে হবে, কত পাহাড়ে চড়তে হবে, কত নদীতে ঝাঁপ দিতে হবে—কিন্তু না, কিছু না, এত সহজে বরাটকে পেলুম! ওঃ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না... কিন্তু না, কেন, অবিশ্বাস কেন? ঐ যে, ঐ বরাট—(আর্য্যধনকে ধরিয়া) দেখচ বৃদ্ধ, তোমার বন্ধু বরাটকে দেখচ?

আর্য্যধন

হাঁ। এই বরাট—

নিরঞ্জন

এই বরাট! দেখ, চিনতে পারছ ত?

আর্য্যধন

হাঁ, বরাটই।

নিরঞ্জন

হাঁ, সে-ই। চেয়ে দেখ, কোন ভুল নয়—কোন সন্দেহ নেই!...দেখ, আরও কাছে এসে দেখ, স্পর্শ করে দেখ, হয়ত নতুন কোন সংবাদ থাকতে পারে—হাঃ-হাঃ! আর সে উদ্ধত শির নেই, উজ্জ্বল বেশ নেই—তবু এতটুকু দয়া করব না আমি, করা হবে না। কদর্য্য হীন ফন্দিতে আমার অপমান করেছে, নিষ্ঠুর বর্ব্বরের মত আমার শান্তির গৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—আমার ঘর, আমার স্ত্রী—কারও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে নি,—এত বড় কাপুরুষ, এত বড় নৃশংস বরাট আজ আমার মুঠোর মধ্যে এসেছে—আজ তার শাস্তি দেব, এমন শাস্তি দেব যে সে শাস্তির কথা শুনে বড়-বদমায়েস যে, তারও সমস্ত শরীর কেঁপে শিউরে উঠবে—শুনে পঙ্গু হয়ে বসে পড়বে, তাদের সমস্ত সয়তানী শক্তি উবে যাবে!...এসো, আরো কাছে এসো...পালাবার পথ নেই আর—পালাতে পারবে না! এমন কোন দেবতা কি দানব নেই যে তোমা

আমার গ্রাস থেকে আজ ছিনিয়ে নেয়! ...শোন্ পাষণ্ড, তোমরাও শোনো, এই দুর্বৃত্ত দস্যু তোমাদের ধ্বংস করছিল, তোমাদের সুখের ঘর শ্মশান করে দিতে এসেছিল, তোমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করতে উদ্যত হয়েছিল, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাদের সম্মান হরণ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, তাকে কি শাস্তি দিতে চাও তোমরা? বল, সকলে বল। সকলের কথাই আজ আমি রক্ষা করব। সকলের মিলিত ব্যবস্থায় প্রচণ্ড শাস্তি আবিষ্কার হবে! আমার স্ত্রী তাকে আজ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে! ...রূপসী, মান্দার এ ঋণ কখনো ভুলবে না। মন্দির গড়ে তাতে তোমার মূর্ত্তি স্থাপনা করবে, মান্দার সে মূর্ত্তির পূজা করবে।...শোনো, তোমাদের রাণী কি বলতে চান, শোনো—

রূপসী

হাঁ, সকলে এসেছ—তোমরা সকলে শোনো। আমি এক আশ্চর্য্য কাহিনী বলব, শোনো—

নিরঞ্জন

হাঁ, মন দিয়ে শোনো—এমন কাহিনী, নারীর এত বড় জয়ের কাহিনী তোমাদের পুরাণে নেই, ইতিহাসে নেই, শোনো—

রূপসী

সত্যই নেই। এত বড় গৌরব, এত বড় সম্মান, পুরুষের সংযমের এত বড় কাহিনী আজ পর্য্যন্ত কেউ শোনে নি, কখনো কল্পনাও করে নি। বাবা, আপনিও শুনুন—

নিরঞ্জন

বল, রূপসী—আসল কথাটা শীঘ্র করে খুলে বল। দেখ, এরা শোনবার জন্য অধীর হয়ে রয়েছে—

রূপসী

হাঁ শোনো, সকলে শোনো, মান্দারবাসী তোমরা সকলে শোনো, জীবনে কখনো আমি মিথ্যা বলিনি—চিরদিন সত্য পথে চলে এসেছি, সত্য কথা বলে এসেছি—কোন বিষয়ে কোন গোপনতা রাখিনি কখনো—আজও কিছু গোপন করব না। এত বড় সত্যও আমি আর-কখনো বলিনি, শোনো—আমার পানে চেয়ে দেখ, সকলে, আমার প্রাণের মধ্যে দৃষ্টি রেখে শোনো—সমস্ত দেবতার নামে শপথ করে আমি বলছি—আমার কথা বিশ্বাস কর...কাল রাত্রে এই শত্রুর শিবিরে আমি গেছলুম, উপায় ছিল না। দারুণ ভয়ে কম্পিত বক্ষে গেছলুম! কিন্তু শত্রু আমায় স্পর্শ করে নি, আমায় কোন অপমান করে নি—প্রচুর সম্মানে সম্মানিত করে ভগ্নী বলে সে আমায় সম্বর্দ্ধনা করেছে—আমি যেমন নিষ্কলঙ্ক দেহ-মন নিয়ে গেছলুম, তেমনি নিষ্কলঙ্ক দেহ-মন নিয়েই ফিরে এসেছি! এতটুকু কলঙ্ক আমায় স্পর্শ করে নি! আমি ফিরে এসেছি,—মানুষের উপর সুগভীর শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস-ভরা হৃদয় নিয়ে আমার ভাইয়ের ঘর থেকে আমি ফিরে এসেছি!

নিরঞ্জন

রূপসী, এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে বল আমাদের?

রূপসী

হাঁ।

নিরঞ্জন

কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি?

রূপসী

কারণ? কারণ, বরাট আমায় ভাল বাসে, তার তরুণ বয়স থেকে প্রথম কৈশোর থেকে সে আমায় ভালবাসে।

নিরঞ্জন

এই কথাই আমি শুনব, ভাবছিলুম। ...ঠিক···তোমার চোখে তাই আমি অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখেছিলুম!...আমি তা গ্রাহ্য করিনি। কি বললে? তোমায় ও স্পর্শ করে নি···?

রূপসী

না, স্পর্শ করে নি। বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি আমায় চেনো ত, তুমি আমায় জানো ত—আমি সত্য কথা বলছি, কিছু গোপন করিনি—

নিরঞ্জন

সত্য কথা বলেছ! কিন্তু অস্বাভাবিক সত্য এ, রূপসী। একটা বর্ব্বর, যে বিশ্বাসঘাতকতায় হটে না, নিমকহারামিতে পেছপাও নয়, সারা পৃথিবীর যে শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু, শান্তির শত্রু, আনন্দের শত্রু—চট্ করে সে এতটা মহৎ হয়ে উঠবে! এ অসম্ভব, রূপসী। পৃথিবীতে সম্ভাবনারও একটা গণ্ডী আছে—সে গণ্ডীর অনেক দূরে তুমি আমাদের যেতে বলছ! কাল সন্ধ্যার কামোন্মত্ত বর্ব্বর, অমন স্নিগ্ধ চন্দ্র-করোজ্জ্বল রাত্রি, সুন্দরী কিশোরী, নির্জ্জন অবসর—তুমি এ কি বলছ, রূপসী! পুরাণেও এমন অসম্ভব গল্প কেউ কখনো পড়েনি যে...আচ্ছা, তোমরা বল, তোমরা এ কাহিনী বিশ্বাস করেছ কেউ! (সকলে নিস্তব্ধ) যারা বিশ্বাস করেছ, তারা আমার দিকে অগ্রসর হয়ে এসো—[আর্য্যধন শুধু অগ্রসর হইল] তুমি, বাতুল বৃদ্ধ, এ প্রলাপ তুমিই শুধু বিশ্বাস করেছ—কিন্তু চেয়ে দেখ, আর কেউ বিশ্বাস করেনি!

আর্য্যধন

মূঢ় হতভাগা মান্দার, অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড মান্দার, নীচ কুৎসিত মান্দার—না, তোদের কোন কথা বলতে চাই না!···কিন্তু নিরঞ্জন, এ-ভাবে তুমি সতীর অমর্য্যাদা করো না। সতী, তোমার স্ত্রী! মনে রেখো, সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষার কথা।...সতীর পরীক্ষা করছ! লজ্জা হচ্ছে না? মার মুখ দেখেও বুঝছ না! ধিক! তোমাদের আর কি বলব? মা, মা আমার, এরা বড় হীন, বড় নীচ এরা, ও মহত্ত্ব এরা ধারণাও করতে পারে না—নিজেদের পাপে-ভরা জর্জ্জরিত হৃদয় দিয়ে অপরের হৃদয়ের বিচার করে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি মা, তোর প্রতি কথা আমি বিশ্বাস করেছি।

নিরঞ্জন

তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে আছ! তোমার বিশ্বাসে মান্দারের কিছু আসে যায় না—

আর্য্যধন

কিন্তু এই মান্দারই সব নয়। মান্দারের উপর যে বড় মান্দার আছে, আমার বিশ্বাসে তার বিস্তর এসে যাবে পুত্র—

নিরঞ্জন

বাতুলের সঙ্গে বাদানুবাদ করাও বাতুলতা! যাক,···রূপসী, তুমি দেখলে ত—মান্দার তোমার এ কাহিনী বিশ্বাস করছে না—

রূপসী

মান্দারের বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমি গ্রাহ্যও করি না। এরা কি জানে—কাকে জানে? কিন্তু তুমি, তুমি বল, তোমার স্ত্রীর কথা তুমি বিশ্বাস করেছ কি না!...চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখচ—হাঁ, দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার মুখের পানে চেয়ে দেখ, দেখে বল, তোমার মনে কোন অবিশ্বাস আছে কি না—

নিরঞ্জন

অবিশ্বাস! বলা কঠিন, রূপসী···যে ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, সে ঝড় আমায় একেবারে জীর্ণ করে দিয়েছে, আমার বার্দ্ধক্য এসেছে! আমি চোখে সমস্ত ঝাপসা দেখচি—আমার চোখের সে আলো নিবে গেছে, আমার কাণে আমি সমস্তই অস্পষ্ট শুনচি—অনেক আশা করেছিলুম রূপসী, মনে বড় আশা হয়েছিল, —যাক···আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কিছু বুঝতে পারছি না। রাগ নয়, রূপসী, হিংসা নয়—আমার মন খুব শান্ত এখন, কিন্তু সে থই পাচ্ছে না—কোন্‌টাকে অবলম্বন করবে, তা সে কিছু বুঝছে না...যাক, ও আর ভাবব না—আমার এক কথা—একে শাস্তি নিতে হবে—! তারপর তোমার কথা পরে ভেবে দেখব···কিন্তু তোমার কোন অপরাধ নেই—যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরবার নয়। উপায় নেই। তুমি সত্য বলেছ? হবে! পরে মন স্থির করে আবার তোমার কথা শুনব। হয়ত এখন যা অবিশ্বাস করছি, পরে তা বিশ্বাস করতে পারি।

রূপসী

কিন্তু আমার পানে আবার তুমি চেয়ে দেখ—দেখ, এই চোখের পানে চেয়ে দেখ, আর এই স্বর—দেখ, একটুও কম্পিত দেখচ! এমন অকম্পিত স্বর দেখেও তুমি কিছু বুঝছ না!···এমন করে মাথা তুলে তোমার সামনে দাঁড়াতে পাচ্ছি, তবু তুমি বিশ্বাস করছ না! আশ্চর্য্য! কিন্তু আমি সত্য কথা বলেছি, প্রভু—বরাট আমায় স্পর্শও করেনি—বরাটের দৃষ্টিতেও আমি কোন কালিমা দেখিনি!

নিরঞ্জন

খুব ভাল কথা, রূপসী, খুব ভাল কথা। তোমরাও সব শুনেছ ত, এখন তোমরা যাও।··· কিন্তু যাবার পূর্ব্বে একটা কথা শুনে যাও—এদের দুজনকে পথ ছেড়ে দিয়ো—আমার স্ত্রী আর এই বাতুল বৃদ্ধ। এরা তোমাদের দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে—তোমাদের প্রাণ দিয়েছে। এদের পথ রোধ করো না কেউ।···রূপসী, তোমার-আমার মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ—এ ঘটনার পর আর নতুন করে গ্রন্থি দেওয়া যায় না। আমি মানুষ, যদি অবিচার করে থাকি—মানুষ বলেই মার্জ্জনা করো। কিন্তু এই পাষণ্ড—এর শাস্তি দেব আমি—অন্ধকার কারাগারে আপাতত একে নিক্ষেপ করব, তারপর অনেক ভেবে শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। এর মুক্তি নেই, মুক্তি নেই—কিছুতেই মুক্তি নেই—

রূপসী

মুক্তি নেই···? ওগো, না, না, শোনো—

নিরঞ্জন

কোন কথা নয়—কোন মিনতি শুনব না। আমার অভিপ্রায় অটল—কারো মিনতিতে এ ব্যবস্থা টলবে না— (বরাটকে সবলে ধরিয়া) বর্ব্বর দস্যু, তোর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার—রাজার অধিকার, স্বামীর অধিকার—

রূপসী

(সবলে বরাটকে মুক্ত করিয়া) না, না, ওর উপর তোমার কোন অধিকার নেই! কিসের অধিকার! শোনো, সকলে শোনো। আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আগাগোড়া মিথ্যা কথা—এখন সত্য কথা বলছি, শোনো—এই বর্ব্বর দস্যু আমায় কলুষিত করেছে—তাই শাস্তি দেবার জন্য কৌশলে ভুলিয়ে ওকে এখানে এনেছি—নিজের হাতে আমি ওর অমর্য্যাদার শাস্তি দেব—এইটুকু আমার মিনতি! আমি কত বড় মূল্য দিয়েছি, সে কথা মনে করে এ অধিকারটুকু তোমরা আমাকে দাও, ওগো, আমি এই নতজানু হয়ে তোমাদের সকলের কাছে ভিক্ষা চাইছি—

বরাট

না, না, রাণী মিথ্যা কথা বলছে—আমায় রক্ষা করবার জন্য মিথ্যা বলছে। রাণী নিষ্কলঙ্কা—স্পর্শের কালিমাও রাণীর গায়ে লাগেনি—নির্ম্মলচিত্তা সাধ্বী রাণী—

রূপসী

চুপ কর বন্দী। না হলে তোমার প্রগল্‌ভতার শাস্তি পাবে। বর্ব্বর দস্যু—না, না, তোমরা গায়ে হাত দিয়ো না! (জনৈক প্রহরীর হাত হইতে শৃঙ্খল লইল) দাও, আমাকে দাও, আমি নিজের হাতে ওকে শৃঙ্খলিত করব। আমি ওকে বন্দী করেছি—ও আমার বন্দী, বন্দীর উপর আমার অধিকার! (বরাটকে শৃঙ্খলিত করিল) তোমরা দেখ—ওর মুখে অস্ত্র-চিহ্ন দেখচ? এ আঘাত আমিই দিয়েছি—আমি। কাপুরুষ, পশু, নারীর কোন সম্মান জানে না—ওর শাস্তি, তোমরা পুরুষ, তোমরা কি আবিষ্কার করবে? ওর শাস্তি আমি দেব। নারীর প্রতিহিংসা! পদাহতা অপমানিতা নারীর স্বহস্তে দেওয়া শাস্তি, তোমরা সে শাস্তির কথা শুনলে এখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে—

নিরঞ্জন

রূপসী—কোন্ কথাটা তুমি সত্য বলছ?

রূপসী

কোন্ কথা! তুমি এত বড় যোদ্ধা হয়েও তা বুঝছ না! বুঝবে না। কেবলই দেহের শক্তি দেখে এসেছ—মানুষের মন বলে যে একটা পদার্থ আছে, তার পানে ফিরেও চাওনি কখনো! হতভাগ্য স্বামী! যাক্, আমি তর্ক করতে চাই না। বন্দী—এ আমার বন্দী—এর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার।... শোনো সকলে, সেই শিবিরেই আমি ওকে হত্যা করতে পারতুম, —পারিনি। অস্ত্র চোখের নীচে আঘাত করতেই ভীত দুর্ব্বল হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল—তাই এই কৌশল করে ওকে এখানে এনেছি।...বাবা, বন্দীর ভার আমি আপনার হাতে দিলুম। এর জন্য দায়ী আপনি। খুব সতর্ক থাকবেন। যেন না পালায়, যেন আমার বন্দীর কাছে আর কেউ না যায়—আমার অধিকারে কেউ না হস্তক্ষেপ করে! যান, একে আপনি নিয়ে যান—

(আর্য্যধন বরাটকে লইয়া প্রস্থান করিল ; জনতার প্রস্থান)

নিরঞ্জন

রূপসী—

রূপসী

কেন?

নিরঞ্জন

আমি বুঝছি, এ মিথ্যা—এর সমস্ত মিথ্যা...বল, এখন বল, এখন এখানে আর কেউ নেই, সব কথা খুলে বল, আমার সামনে বল—

রূপসী

সত্যই আমি বলেছি নাথ। বরাট আমার বাল্য-সহচর, মুঞ্জ; আমার পিতার কুটীরের কাছে থাকত। আমায় সে ভালবাসত। আমিও হয়ত আর এক মূর্ত্তিতে তাকে দেখতুম—কিন্তু তার পূর্ব্বেই সে চলে গেল! বরাট আমায় ভোলে নি, চিরদিন আমায় খুঁজে বেড়িয়েছে। সে মোহ এখনো আছে। আমায় দেখতে চেয়েছিল,কিন্তু আমার সুখের কথা শুনে 'ভগ্নী' বলে সে আমায় সম্বোধন করেছে—আমায় সে স্পর্শও করে নি ...এর জন্য মোগলের দারুণ বিদ্বেষ সে মাথায় নিয়েছে, মোগলকে শত্রু করেছে!—তাই আমি ওকে এখানে এনেছি। ও আসতে চায় নি,আমি অভয় দিয়ে এনেছি। সেই শত্রুর হাতে নিঃসঙ্গ ওকে রেখে আসতে পারিনি —চুপ করে রইলে যে—বিশ্বাস হল না?

নিরঞ্জন

বিশ্বাস করা বড় কঠিন! তুমি সুন্দরী কিশোরী, বরাট তরুণ পুরুষ, তারপর কৈশোরের সে প্রথম অনুরাগ!... বিশ্বাস করতে চেষ্টা করব রূপসী। বেশ, তোমার কথাই থাক্—বরাটের কারাগারের চাবি তুমি নিজের হাতেই রাখো—যতক্ষণ না একটা প্রচণ্ড শাস্তি স্থির করিতে পারছি, ততক্ষণ বরাট তোমারই বন্দী থাক্। কিন্তু—

রূপসী

না, আর কিন্তু নয়—বিশ্বাস করতে চেষ্টা করো নাথ। নারীকে যতটা হেয়, যতখানি দুর্ব্বল মনে কর, নারী ঠিক ততখানি হেয়, ততখানি দুর্ব্বল নয়। নারীর চিত্তটা ছোট নয়, সামান্য জিনিষ নয়—বোধ হয়, পুরুষেরও এতখানি চিত্ত নেই!...বেশ করে বুঝে দেখো নাথ। দেখবে, এ সমস্তই দুঃস্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে যাবে...প্রভাতের আলোয় প্রাণ তোমার ভরে উঠবে। তোমার চোখে আমি তার আভাস দেখতে পাচ্ছি...তা যদি না দেখতুম, তাহলে বাঁচবার কোন সাধ রাখতুম না আর। কাল-রাত্রি থাকে না, দিনের আলো ফোটেই—সেই আশায় আমি ধৈর্য্য ধরে থাকব, নাথ। আমার কোন দুঃখ নেই, কোন অভিমান নেই। ঐ আলোর আশা-পথ চেয়ে আমি ধৈর্য্য ধরে থাকব। যদি সে আলো ফুটতে দেরী হয়, অনেক অনেক দেরী হয়, তবুও ধৈর্য্য হারাব না। আমি জানি, নাথ, এ আলো তোমার বুকে তোমার চোখে ফুটবে, এ আলো ফুটবেই। *

যবনিকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

* মেটরলিঙ্ক রচিত Monna Vanna অবলম্বনে।

মাসকাবারী

"সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য"

জ্যৈষ্ঠের "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ের উপরি-উক্ত প্রবন্ধের মত সরস ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বহুকাল পর্য্যন্ত বাংলা মাসিক সাহিত্যে পড়া যায় নাই। তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা বাংলার আধুনিক লেখকবর্গের ও সমালোচকবর্গের সম্পূর্ণ প্রণিধানযোগ্য; তাই তাঁর লেখা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি:—

"জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, তাই জীবন্ত সাহিত্যেরও প্রকাশ বহুভঙ্গিম সৃষ্টির মধ্য দিয়া। কিন্তু যখনই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়, বিধি নিষেধের দ্বারা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ ধারা বিশেষ রীতির মধ্যেই তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে, তখনই আমরা সাহিত্যের মরণ সজ্জা প্রস্তুত করিয়া থাকি।...

"উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিক্তর হিউগো যখন ফরাসী সাহিত্যে ভাবের ভঙ্গিমার বিপ্লব ঘটাইতেছিলেন, পুরাতনের সঙ্কীর্ণ আভিজাত্যটি ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত জীবনের স্রোত বহাইতে চাহিতেছিলেন, তখন পুরাতনের দল তারস্বরে বলিতেছিলেন, হিউগোর ভাষা ফরাসী ভাষা নয়, তাঁহার কবিতায় ফরাসী কবিতার প্রাণধর্ম্ম নাই, তিনি ক্লাসিক নহেন। ইহাঁদের মুখপাত্র হইয়া ফরাসী কবিপ্রতিভার তথাকথিত কোটটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দাঁড়ান নিসার (Nisard)। এই নিসারকে লক্ষ্য করিয়া উদারদৃষ্টি সমালোচক সুস্তব্যভ বলিতেছেন, "প্রকৃতি বৈচিত্র্যে ভরা, সেখানে কত রকমারী ছাঁচ। প্রতিভারও অনন্তরূপ। তবে সমালোচক তুমি কেন এক মনিবেরই দাসত্ব করিতে থাকিবে।"...

"সাহিত্যে আর এক শুচি ব্যাধি আছে—ঐটি আধুনিক যুগেই দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপর "নীতিকতা", ধার্ম্মিকতা, শ্লীলতার দাবী। সাহিত্যের মুক্ত বিকাশ যদি চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবন্ত কি মৃত, কোন ভাষাতেই এ উদাহরণ পাই না যে, শ্লীলতা সাধুতা এমন কি আধ্যাত্মিকতার পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগড়িত করিয়াছে। ফরাসীর কথা ছাড়িয়া দিলাম —লাতিন সাহিত্য যাহার আদর্শে এতখানি শোভনতা বাহ্যশ্লীলতা, গুরুগম্ভীরতার স্থান, সেখানেও উন্নত হইয়াছেন কাতুল্ল (Catullus) ওভিদ।"

লেখক সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যকে কৃত্রিম বিধি নিষেধের নিগড়ে নিগড়িত করিবার বিরুদ্ধে এই যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণহীন সোচ্ছ্বাস উক্তি নয়। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে ভাল রকম পরিচয় আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যেই তার সাক্ষ্য মেলে। তাঁর উক্তির সপক্ষে তিনি লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যের তুলনা করিয়াছেন—নিম্নে তাঁর লেখার সেই অংশটি উদ্ধার করিয়া দিতেছি:—

"গ্রীকের সৌন্দর্য্যবোধ—রসবোধ ছিল উদার বিস্তৃত। তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীয়তা,—উহা চলিত সুবলয়িত তরঙ্গভঙ্গে! তাহাদের কবিত্বপ্রতিভায় দূরপ্রসারিত অবকাশ, স্বচ্ছন্দগতি, বিচিত্র ভঙ্গিমা। অন্য পক্ষে বীরকর্ম্মী বস্তুতান্ত্রিক লাতিন জাতির মধ্যে ভাবুকতার, কল্পনাপ্রিয়তার সে লীলায়িত রেখাপাতের নৈপুণ্য ছিল না। তাহারা জিনিষকে দেখিত ঋজুদৃষ্টিতে, জিনিষকে ধরিতে চাহিত জিনিষের যে স্পষ্ট স্ফুট সহজগ্রাহ্য রূপ, তাহার সহায়ে। কাটিয়া ছাঁটিয়া, ঘসিয়া মাজিয়া নানা পদার্থকে একই ছাঁচে গড়িতে তাহাদের আনন্দ। বিজয়ী জাতি তাহারা—বহুজাতি, বহুদেশ, বহুধর্ম্মকে পিষিয়া এক মহাজাতি, মহাদেশ মহাধর্ম্মে পরিণত

করিতে চাহিয়াছিল, সব অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এক নামে—রোম। সাহিত্যেও তেমনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল একটা আদর্শ—বীরের গম্ভীর আরাব, বিজয়ীর দৃপ্ত তেজস্ ওজস্, সেনানীর মুখে সে আদেশবাণীর অক্ষরকার্পণ্য, রাজানুশাসনের কঠোর স্পষ্টতা, বাগ্মিতার ধীর প্রসারিত পূর্ণতা। প্রাকৃতজনের (plebs) হাবভাবে কথায় চিন্তায় যে সহজবিগলিত গড্ডালিকা-প্রবাহ, যে সদা-চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খলগতি, তাহাকে রোম অবহেলার চক্ষেই দেখিয়াছে। সে চাহিয়াছে আভিজাত্যের (Patricii) গুরুভার গাম্ভীর্য্য।...গ্রীক কিন্তু তাহার প্রতিভাকে এইরূপ একই কেন্দ্রে সম্পুটিত করিয়া রাখে নাই। রোম নগরীর ন্যায় এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার তেমন সর্ব্বগ্রাসী কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ে নাই—যতটুকু হয়, তাহা বহু পরে। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশই একটা স্বাতন্ত্র্য—একটা জাগ্রত বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাষাকে একই প্রকরণে ঢালে নাই, ভাবকেও কোন একটি ধারায় আবদ্ধ রাখে নাই। প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রেরণা ও ভঙ্গিমার স্বতঃস্ফূরণে এমন বিচিত্র মহনীয় গ্রীক-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্বাধীনতা এই মুক্ত অঙ্গসঞ্চালনের অভাবে লাতিন সাহিত্য অল্প দিনেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিভা দেখাইয়াছে দুই একটি বিষয়ে মাত্র। গ্রীস কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত দিকে, কত বিষয়ে, সাহিত্যের কত প্রকরণে আপনাকে বিকশিত করিয়া দিয়াছে।"

এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, তবে কি সাহিত্যে আভিজাত্যের কোন স্থান নাই? মিল্টন, কর্ণেই, ভার্জ্জিল—প্রভৃতি কবির মধ্যে আভিজাত্যের অভিমান সুস্পষ্ট বিদ্যমান। এ প্রশ্ন যে লেখকের দৃষ্টিকে এড়াইয়া গেছে তা নয়। তিনি ইহারও সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। মিল্টন, ভার্জ্জিল প্রভৃতি কবির নামোল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"তাঁহারা ছিলেন প্রতিভাবান, তাই তাঁহাদের সৃষ্টি অনবদ্যাঙ্গ, জীবন্ত, মহনীয়—সকলের পূজার্হ। কিন্তু পরে যাঁহারা আসিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়াছেন; কিন্তু অন্তরে সেই একই জ্বলন্ত অনুভূতি রাখিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট সে আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে শাস্ত্রবিধান—কষ্টকল্পনামাত্র। সাহিত্যের ধারাটি—শিষ্টাচারটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া হারাইয়াছেন স্বাতন্ত্র্য, নিজের প্রাণের উপলব্ধি; হারাইয়াছেন সাহিত্য-সৃজনের মূল মন্ত্রটি। তাই দেখি, মিল্টনের পরে পোপ, কর্ণেইর পরেই রোয়ালো, ভর্জ্জিলের পরেই ওভিদ ষ্টাস, কালিদাসের পরেই ভট্টি বাণভট্ট।"

লেখক বলেন ক্লাসিক ঠাট বজায় রাখিলেই ক্লাসিক হয় না—

"Classic soul যাঁহার Classic manner তাঁহারই সহজসিদ্ধ। মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিয়া বিশেষ একটি কোন ধারা নাই। কাব্যের আত্মপরিস্ফরণ, বিশ্বকবির কবিত্বশক্তি বহুরূপী। তাহাকে দুই একজন কবির বা দুএকটি কবিসঙ্ঘের ভঙ্গিমায় আবদ্ধ রাখা চলেনা।"

প্রকৃত আভিজাত্য তাই প্রতি কবির আত্মার আভিজাত্য।

"কবি সহজেই তাঁহার সকল ভাব, সকল ভঙ্গিমাই এক নৈসর্গিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

কবিত্বের এই মূল উৎসটি, লেখক যাহাকে বলিয়াছেন কবির "আত্মার তপঃ-অভিব্যঞ্জনা", যখন শুকাইয়া যায়, কিম্বা আমরা যখন সেই মূল উৎস হইতে দূরে সরিয়া যাই, তখনই বিধিনিষেধ, অলঙ্কার, প্রকরণপদ্ধতি প্রভৃতি কাব্য-সংহিতার canons & standards খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টাতেই সাহিত্যের মৃত্যু। সেই জন্য লেখক আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন:—

"সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইরূপ একমুখী এক আদর্শানুযায়ী হয়, তবে সে সাহিত্য শুকাইয়াই উঠিবে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাই ঘটিয়াছে। যেদিন মানুষের আগে বসাইয়াছি শিল্পীকে, যেদিন কেবল অভিরূপভূয়িষ্ঠ পরিষদের জন্যই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছি, সেইদিন হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অবশেষে পাণ্ডিত্যের তর্কের শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।"

অতএব আমাদের চাই, কোন "বিশেষ আদর্শ" নয় –"সমগ্র জাতির নিগূঢ় সারস্বত প্রতিভা"র সম্যক উদ্বোধন। প্রাচীন গ্রীসে —"দেশটিই ছিল বাণীদেবীর জীবন্ত বিগ্রহ।" "সাহিত্যেও তেমনি গড়িয়া তুলিতে হইবে Peuple Intelligentsia", জাতির সারস্বত প্রতিভা।

"জাপানের কথা"

নববর্ষের "সবুজ পত্রে" রবীন্দ্রনাথের "জাপানের কথা" বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁরা কবির জাপানের পত্র আগ্রহের সঙ্গে পড়িতেছিলেন, এবার-কার জাপানের কথায় তাঁরা নূতন করিয়া ভাবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস পাইবেন।

কবি বলিতেছেন, "পৃথিবীতে মোটামুটি দু রকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর আর এক জঙ্গম"—"ইউরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা" এবং "জাপানেরও মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম।" সেই জন্য ইতিহাসে আর কোথাও যাহা হয় নাই জাপানে তাহাই হইয়াছে, জাপান "কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইউরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে"।

কিন্তু এই স্বভাবজঙ্গমতা জাপান পাইল কেমন করিয়া? কবি তাহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(১) জাপানীরা "মিশ্র জাতি"—"তারা এক ধাতুতে গড়া নয়" "জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েচে এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেচি।" (২) "স্থানসঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধে হয়েচে। ছোট জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুট-পাকের কাজ করেচে।"

কবি বাঙালী জাতির সঙ্গে জাপানী জাতির এক জায়গায় মিল অনুভব করিয়াছেন। ভারতের মধ্যে বাঙালীরই "নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মত চিত্তের নমনীয়তা আছে।" "তার আর একটি কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেচে"।

কিন্তু সম্প্রতি বাংলা দেশে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে যে একটা অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায়, কবি তার কারণ স্থির করিয়াছেন, ইংরেজের নিকট আমরা বাধা পাইয়াছি এবং সেইজন্য ইউরোপ সম্বন্ধে আমাদের মনে অভিমান জাগিয়াছে।

জাপানী মিশ্রজাতি এবং বাঙালীও মিশ্র জাতি, তবে কে কি পরিমাণে মিশ্র তাহা বলা শক্ত। বাঙালীর মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্ত আছে এটা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের একটা সিদ্ধান্ত এবং এ সিদ্ধান্তটাকে উল্টাইবার এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। এইজন্য বাঙালীকে যাঁরা কেবলই ভাবপ্রবণ মনে

করেন, তাঁরা ভুল করেন, কর্ম্মপটুতাতেও বাঙালীর শক্তির পরিচয় ক্রমশই পাওয়া যাইতেছে। মিশ্র জাতি বলিয়াই বাঙালীর মধ্যে যত রকমের type দেখা যাইতেছে, এত বোধ হয় ভারতীয় অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

তার পর জাপানীরা ইউরোপীয় সভ্যতার যে দিক্‌টা আত্মসাৎ করিয়াছে, সেটা ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য সমৃদ্ধির দিক্, বাহ্যশক্তির দিক্। ইউরোপের কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্দুক-কামান, রাষ্ট্রনীতি, জাপান আয়ত্ত করিয়াছে। ইউরোপের এই বাহ্য শক্তিটাকে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে বাঙালীর ছেলেও যে জাপানীরই মত আত্ম-সাৎ করিতে পারিত, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এই খানেই বাঙালী ক্রমাগতই প্রতিহত হইতেছে বলিয়াই বাঙালীর মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে। ইংরেজের কলকারখানায় তার সম্পূর্ণ প্রবেশ নাই, ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতকার্য্য হওয়ার তার বিশেষ সুযোগ নাই, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা তার পক্ষে কল্পনারও অতীত ছিল—অথচ এই সব ক্ষেত্রে শক্তিলাভের জন্যই তার সমস্ত মন এখন চঞ্চল ও উৎসুক। এবং এইখানেই তার প্রতিদিন হার।

বাঙালীর সঙ্গে জাপানীর এ পর্য্যন্ত বাহ্য সাদৃশ্য চলে, যেমন জাপানীর সঙ্গে ইউরোপীয়ের এ জায়গায় একটা বাহ্য সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কবি দেখাইয়াছেন যে জাপানের সঙ্গে ইউরোপের, এবং বাংলারও, "একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে"। "যে গূঢ় ভিত্তির উপরে ইউরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবল মাত্র কর্ম্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ।" তিনি তাই লিখিতেছেন :—

"মনুষ্যত্বের যে সাধনা অমৃত লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতি-ক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেচে—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়।"

তিনি তাই বলিয়াছেন যে জাপানী সভ্যতা একমহলা; তার অন্তর মহাল নাই। এ কথাও খুবই সত্য। বোধ হয় এইজন্য জাপানী চিত্রশিল্পে রেখার লীলা আছে, কিন্তু রংয়ের বিচিত্র আবেগ নাই; তার ভাল কাব্য নাই; তার ল্যাণ্ডস্কেপ আছে, মানুষের চিত্র যথেষ্ট নাই—কারণ মানুষের শরীর সম্বন্ধে তার মোহ নাই, মানুষের রহস্য সম্বন্ধে তার বোধ নাই।

কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার এই যে আসল স্বরূপ, ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সম্প্রতি আমাদের দেশে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। কারণ, আমাদের দেশে আমরা নানা কর্ম্মসূত্রে যে সকল ইংরেজের সংস্পর্শে আসি, নানা কারণে তাঁদের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাবান্ নই, তাঁরাও আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান নন্। ইংরেজ মাত্রকেই এদেশে আমরা "এংলো ইণ্ডিয়ান" রূপেই জানি। সুতরাং ইংরেজের সভ্যতা ও সাধনাকে কেতাবে আমরা যত বড় করিয়াই জানি, আসল মানুষের মধ্যে তাহাকে তত ছোট করিয়াই দেখিতে অভ্যস্ত হই। এই

কারণে, রামমোহন রায়ের আমলে, কিংবা হেয়ার, বেথুন, ডিরোজিয়ো, রিচার্ডসনদের আমলে ইংরাজি শিক্ষা এদেশের চিত্তে যে নব উদ্বোধন আনিয়াছিল, যার ফলে আমাদের দেশে সাহিত্যসৃষ্টি বলি, সমাজ-সংস্কার বলি, সমস্তই নব প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন ইংরাজী শিক্ষা আর সে ফল প্রসব করিতেছে না। ইংরাজি সাহিত্য এখন আর আমাদের প্রাণে সে রস সঞ্চার করে না, ইংরেজের ইতিহাস এখন আর কল্পনাকে সে মাতান মাতায় না। বরং ইংরেজের ইতিহাসের ছিদ্রগুলাই আমরা এখন বেশি করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইতেছি।

যেখানে উভয় পক্ষের সম্বন্ধ সহজ ও আন্তরিক সম্বন্ধ হইতেই পারিবে না, সেখানে মিলনের কথা তুলিলে তাহা হয় বিরুদ্ধতাকে বেশি করিয়া জাগায়, নয় ঔদাসীন্যকে বাড়াইয়া তোলে। এ দুটো অবস্থার একটা অবস্থাও স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত নয়। এই জন্য এখনকার কালে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ বিষয়ে সব চেয়ে-বড় সমস্যা এই যে কেমন করিয়া আমরা এত বড় হইব যে ইংরেজ আমাদিগকে আর অবজ্ঞা করিতে সাহস করিবে না। ক্রমশঃ তাদের শ্রদ্ধা আমরা জোর করিয়া অর্জ্জন করিতে পারিব।

যিনি "জাপানের কথা" লিখিতেছেন তিনি ইউরোপের কাছে সেই বড় সম্মান নিজ প্রতিভাগুণে অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রতিভা সকলের নাই, কিন্তু নিজের শক্তির সম্পূর্ণ উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটাইবার শক্তি আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেখানে বাধা কম, সেখানে যদি আমরা সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হই, দেশ-দেশান্তরে সেই শক্তির বোধন করি, তবে এমন দিন আসিতে বাধ্য, যখন ইংরেজ বা অপর ইউরোপীয় জাতি আমাদিগকে জাতে ঠেলিতে পারিবেনা।

অর্থাৎ রবিবাবু যে "অন্তরমহলের" কথা বলিয়াছেন, আমাদের এখন সেই "অন্তর-মহলের" দরজাগুলাই খুলিতে হইবে এবং বিশ্বজাতির অন্তরমহলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পথঘাটগুলিকে প্রশস্ত করিতে হইবে। কবি লিখিয়াছেন "এই মিলনের দ্বার উদ্ঘাটন করবার কাজে বাঙালীর আহ্বান আছে।" এ পর্য্যন্ত সে আহ্বান বাঙালী শুনিয়াও আসিয়াছে। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, ব্রজেন্দ্রনাথ, —ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে ইহারা প্রত্যেকেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে মিলাইয়াছেন। এ কাজ সম্প্রতি ব্যাহত হইলেও, ইহা যে বাধামুক্ত হইবে তাহা আশা করা যাইতে পারে। তখন জাপানেরও "অন্তরমহাল" রচনা করিবার ভার একসময়ে বৌদ্ধযুগে যেমন ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, তেমনি হয়ত পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে।

উত্তর-প্রত্যুত্তর

জ্যৈষ্ঠের "ভারতী"তে আমরা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-মহাশয়ের অভিভাষণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর অযথা অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছিলাম এবং তাঁর অভিভাষণে তিনি যে কত জায়গায় রবীন্দ্রনাথের ভাব

ও ভাষা ধার করিয়াছেন তাহা একে একে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। আষাঢ়ের "ভারত-বর্ষের" "সাহিত্য-প্রসঙ্গের" লেখক এজন্য বিষম "দুঃখ" এবং "লজ্জা" অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন যে, এ রকমের সমালোচনায় "সাহিত্যের চরিত্র...নষ্ট হইয়া যায়" এবং "সাহিত্য-সেবা ক্রমশঃ দোকানদারীতে পরিণত হয়।" তাঁর এই অভিনব মর্ম্ম-বেদনায় বাংলা দেশসুদ্ধ সমস্ত লোক সম-বেদনা অনুভব করিবে সন্দেহ নাই, কারণ "সাহিত্যের চরিত্র" রক্ষা করিবার জন্য "প্রবাসী"র প্রবীণ সম্পাদকের পরেই, তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রাণপণ প্রযত্ন উল্লেখ করিবার মত বটে !

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর "সভাপতির আসন" হইতে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকার বক্তৃতা-বিশেষ না পড়িয়াই তার প্রতিবাদ করা এবং ইঙ্গিতচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতগুলি অন্যায় দোষারোপ করা জরুরি বোধ করিয়া-ছিলেন বলিয়াই, তাঁর কথার প্রতিবাদ করাও "প্রবাসী" এবং "ভারতী" এবং আরও দু-একটা কাগজ জরুরি মনে করিয়াছিলেন। কেননা, দেশের সভার সভাপতির আসনের একটা মর্য্যাদা আছে এবং সেজন্য সভা-পতির উক্তিও দায়িত্বপূর্ণ হওয়া চাই। চিত্তরঞ্জনবাবু "সভাপতির আসন" হইতে যদি ঐ সব দায়িত্ববিহীন কথা না বলিতেন, তবে তার প্রতিবাদ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইত না—কারণ, ব্যক্তিবিশেষ কোন্ কাগজে কি বলে না বলে তাহাতে কি আসে যায় ?

লেখক সেই প্রতিবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ভরসা পান্ নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে "নকল পণ্ডিত" ও "বালির তাপ" বলা হয় নাই। অভি-ভাষণে চিত্তরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন যে, "আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত" ধরিয়া বসিয়াছেন যে "জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে" "সমগ্র মানব জাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে"। তারপর সেই অজ্ঞাত-নামা দুই-একজন ব্যক্তিকে নকল পণ্ডিত ও বালির তাপ বলিয়া তিনি পরিহাস করিয়া-ছিলেন এবং "এমন কি" রবীন্দ্রনাথও "ঐ মতটি" আমেরিকায় "জাহির" করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ "এমন কি" বলার দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে নকল পণ্ডিত ও বালির তাপ বলা হয় নাই এইটেই যদি সত্য হয়, তবে জানিতে চাই, ভারত-বর্ষে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি বৈদেশিক ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন ? তাঁদের নাম ও উক্তি আমরা নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারি—নহিলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিই যে ঐ সকল ইঙ্গিত প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা ভাবিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ থাকিয়া যায়।

তার পর ভারতবর্ষের লেখক প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন যে আমরা অভিভাষণের যে সকল আইডিয়াকে রবীন্দ্র-নাথের আইডিয়া বলিয়া মনে করিয়াছি "তাহার একটিও প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া নহে।...সে সমস্ত ভাবই ভূদেব বঙ্কিম ও বিবেকানন্দাদির রচনা মধ্যে পাওয়া যায়।" "প্রমাণস্বরূপ" কিছু কিছু নমুনাও

তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথমেই বলা ভাল যে, তাঁর নমুনা-উদ্ধারের একটু বিশেষ বাহাদুরী আছে। ভূদেব বা বিবেকানন্দের কোন্ গ্রন্থ হইতে তিনি যে তাঁদের উক্তি-গুলি উদ্ধার করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই; কেননা পরের উক্তিকে নিজের যুক্তিমাফিক কাটিয়া-ছাঁটিয়া সাজাইবার চাতুরী তিনি ইতিপূর্ব্বেও দুই-একবার প্রকাশ করিয়া-ছেন এবং সে চাতুরী ফাঁস হইয়াও গেছে। ১৩২৩ সালের পৌষের 'ভারতী'তেই দেখিয়া-ছিলাম যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে তাঁর একটা উক্তিকে তিনি এমনি নিজের মনের মতন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আসলে যা মত নয়, লেখকের কোটেশন-চাতুরীর দ্বারা তাঁর সেই মতই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। "সাহিত্যের চরিত্র" রক্ষা করিবার জন্য লেখক বিশেষ ব্যস্ত কিনা, সেইজন্য এমন কাণ্ডটা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াই থাকে!

যাই হোক্, তিনি রবীন্দ্রনাথের আইডিয়ার স্বকীয়তা অপ্রমাণ করিবার জন্য এবং চিত্তরঞ্জন বাবুকে রবীন্দ্রনাথের ঋণমুক্ত করিবার জন্য ভূদেব বিবেকানন্দাদির এবং রবীন্দ্রনাথের আইডিয়ার সাদৃশ্য যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভূদেব প্রভৃতির উক্তি ঠিক্ তোলা হইয়াছে কি হয় নাই তাহা তাঁদের লেখা ঘাঁটিয়া দেখিবার কিছুমাত্র দরকার করে না। কারণ, সাহিত্যে কোন আইডিয়াই কারো নিজস্ব নয়, এই যখন তাঁর স্থির ধারণা—তখন কোন আইডিয়ার বিশেষত্বটুকু তিনি ধরিবেন কেমন করিয়া? কিন্তু এটা যে শুধু তাঁরই ধারণা তা নয়, এ-সম্বন্ধে তিনি রবিবাবুরও একটা কথা তুলিয়া দিয়া ইস্কুল-মাষ্টারের মত প্রবাসী ও ভারতীর "ছেলেমানুষীর" উপর দণ্ড আস্ফালন করিয়াছেন। বলিয়াছেন—আঃ 'এটুকু'ও পড় নাই! ইত্যাদি। রবিবাবু নাকি কোথায় লিখিয়াছেন, যে সাহিত্যের বারো আনা কথাই নিতান্ত জানা কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মত নূতন করিয়া বলা। কিন্তু কথাটা যে রসসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন নাই, আমাদের নবীন মাষ্টার-মহাশয় তাহা মোটেই বুঝেন নাই। বস্তুত রসসাহিত্য যে সব ভাব লইয়া কারবার করিয়া থাকে, তাহা কারো নিজস্ব নয়; কিন্তু সেই মামুলি ভাবই প্রত্যেক রসস্রষ্টার হাতে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয়। কিন্তু সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক থিওরি সম্বন্ধে একথা মোটেই খাটে না যে, সে সকল ক্ষেত্রে কোন মত-বাদীরই নিজস্ব আইডিয়া বলিয়া কিছুই নাই। তাহা হইলে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তারা Political Theories সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিতেই পারিতেন না; Social Theories সম্বন্ধে বা Economic ideas সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদীদের মতের ইতিহাস আলোচনা করার কোন অর্থই থাকিত না।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশীয় সমাজ-সম্বন্ধে কতগুলি বিশেষ মতামত খাড়া করিয়াছেন এবং সমাজ কি ভাবে গঠিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও কতগুলি কাজের পদ্ধতিও উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁর থিওরিও

আছে এবং তার Practical application ও আছে। সেই সবটা জড়াইয়াই তাঁর আইডিয়া। এবং তাঁর সেই গোটা আইডিয়াটাই চিত্তরঞ্জন বাবু তাঁর নিকট হইতে জ্ঞাতসারে হোক্ বা অজ্ঞাতসারে হোক্,—লইয়াছেন, আমরা ইহা ক্রমে ক্রমে তাঁর লেখার নানা জায়গা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। রবিবাবুর সেই মূল আইডিয়ার সঙ্গে ভূদেব, বিবেকানন্দ বা বঙ্কিমের মূল আইডিয়ার কোন মিল নাই। তবে লেখক যে ভাবে মিল দেখাইতে ব্যস্ত সে ভাবের মিল—তাঁর কথা অনু-সারেই বলি—বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ হইতেও দেখানো যাইতে পারে বটে।

যেমন ধরুন, রবিবাবুর প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের "আত্মশক্তি"র উপর দাঁড়াইতে হইবে, দেশের কল্যাণকর্ম্ম দেশের লোকেরাই সরকারের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াই করিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ প্রস্তাব বঙ্কিম, ভূদেব বা বিবেকানন্দের লেখায় কুত্রাপি নাই। তবে বঙ্কিম যে কমলকান্তের দপ্তরে পলিটিক্স্‌কে ভিক্ষা চাওয়া বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, এবং যে বিদ্রূপ-বাক্যটা উদ্ধার করিয়া ভারতবর্ষের লেখক রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা অপ্রমাণিত হইল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে কথাটা পুরা উদ্ধার করিলেই তাহার আসল চেহারাটা ফুটিত। কিন্তু ভারতবর্ষের লেখক ঠিকমত কোটেশন দিতে বড়ই নারাজ। বঙ্কিম "স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন"—"সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহা-দের পলিটিক্স নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাওগো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্স", এবং তার স্পষ্ট মানে এই যে, যে জাতি পরাধীন, সে জাতির পলিটিক্স মানেই ভিক্ষা চাওয়া—বঙ্কিম তাহাকেই "কুক্কুর জাতীয়" পলিটিক্স নাম দিয়াছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ পরাধীন জাতির পরাধীনত্ব সম্পূর্ণ মানিয়াই কতটা আত্মশক্তির অধিকার ও চর্চ্চা সেই পরাধীনতার অবস্থার মধ্যেও পূর্ব্বকালে বজায় ছিল এবং এখনও থাকিতে পারে, তাহাই আলোচনা করিয়া-ছেন,—সুতরাং তাঁর আইডিয়া এবং বঙ্কিমের আইডিয়ার মধ্যে সাদৃশ্যটা কেমনতর সেটা পাঠকেরা বিচার করিয়া লউন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি:—"রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী।" "দেশনায়ক"—"সমূহ"। ৫০ পৃঃ।

তারপর জাতিত্বের অর্থ কি এবং তাহার বিশিষ্ট আদর্শই বা কি, সে-সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন ও রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য আমরা দেখাইয়াছিলাম বলিয়া লেখক ভূদেব, বঙ্কিম ও বিবেকা-নন্দের রচনা হইতেও (তাঁর মতে) অনুরূপ ভাবের বাক্য সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভূদেব বলিতেছেন "এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপরজাতীয় হইতে পারেনা" বঙ্কিম বলিতেছেন "বাঙ্গালী কখন

ইংরেজ হইতে পারিবে না" এবং বিবেকানন্দ বলিতেছেন "আমাদিগকে···ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অপরজাতির ন্যায় গড়িতে পারা অসম্ভব"। এই তিন উক্তির মধ্যে কতকটা ভাবসাদৃশ্য আছে বটে, কারণ তিনজনের কথার সার এই যে, জাতিমাত্রেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে—ইংরেজের যেটা স্বাতন্ত্র্য বাঙালীর সেটা স্বাতন্ত্র্য নয়। এই platitudeটা অর্থাৎ এই অত্যন্ত সাদা সর্ব্বজনবিদিত মোটা কথাটা চিত্তরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন বলিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে তড়িঘড়ি এই ধরণের গোটাকতক সর্ব্বজনবিদিত মোটা কথা উদ্ধার করিতে গিয়াছি, তাহা যে ভারতবর্ষের পাঠকদিগকে বুঝানো হইয়াছে, ইহা "সাহিত্যের চরিত্র রক্ষার" একটা প্রকৃষ্ট উপায় বটে! কিন্তু আমরা বাংলার জাতিত্ব ও তাহার বিশিষ্ট আদর্শ, বিশ্বজাতির সঙ্গে বাংলার জাতিত্বের কি সম্বন্ধ,—চিত্তবাবুর এই সমস্ত আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার মিল দেখাইয়াছি; সুতরাং টুক্‌রাভাবে আমাদের উদ্ধৃত একটি মাত্র রবিবাবুর উক্তি ও চিত্তরঞ্জন বাবুর একটি উক্তি তুলিয়া দিলে পাঠকদিগকে সেরেফ ফাঁকি দেওয়া হইবে। ভূদেব বা বঙ্কিমের লেখায় চিত্তরঞ্জনবাবুর এ-কথা কোথায় আছে যে "সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। ··· জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয় গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়।" কিম্বা "জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহাই জাগিয়া উঠে।"? ইহার parallel passage ভূদেব হইতে ভারতবর্ষের লেখক বাহির করুন।

দেখুন না কেন, এই জাতিত্বের প্রসঙ্গেই তিনি যে অংশ ভূদেবের লেখা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেখানে ভূদেব জাতি বলিতে বংশই বুঝিয়াছেন এবং স্পষ্টই বংশের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমরা জানি যে, মনুষ্যের দোষগুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত।" "সামাজিক প্রবন্ধ" ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ। এবং তার পরেই ভূদেব লিখিতেছেন:—"কিন্তু হিন্দুর এই ভাবে এবং ইংরাজের উল্লিখিত ভাবে (বৈদেশিক বিদ্বেষভাব) পার্থক্য আছে। হিন্দুর আত্মগৌরব দৈবায়ত্ত বিষয় লইয়া। ইংরাজের আত্মগৌরব প্রধানতঃ নিজায়ত্ত বিষয় লইয়া। হিন্দুর আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে না। ইংরাজের আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা জন্মাইয়া দেয়।" তারপর ইংরেজের ভিন্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষের একটি উদাহরণ দিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের মধ্যে "বর্ণভেদ প্রথা" প্রচলিত থাকায় ভিন্ন জাতীয় লোকের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ ভাব জন্মায় না।

এখানেও পাঠকেরা ভারতবর্ষের লেখকের কোটেশনের বাহাদুরী দেখিয়া লইবেন। ভূদেবের জাতিত্বের আইডিয়ার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের জাতিত্বের আইডিয়ার কেমন মিল!

যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর ভূদেবের জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

"অভিমান"টা চিত্তরঞ্জনবাবু একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে Industrialism এর উপর চিত্তরঞ্জন বাবু খড়্গহস্ত—কারণ তিনি ও তাঁর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে এদেশে কল কারখানার আমদানি হইলে গ্রামগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে এবং ধনী-দরিদ্রের অসামঞ্জস্য অত্যন্ত প্রবল রূপেই প্রতিভাত হইবে—সেই Industrialism ভূদেব সমর্থন করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন—

"এদেশে কলকারখানা হইয়া যন্ত্রপ্রসূত শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় কোন দোষই হইতে পারে না।"—সামাজিক প্রবন্ধ ১২২ পৃষ্ঠা। অথচ অর্থনীতি শাস্ত্রে যখন বলে যে অপর দেশ হইতে যদি শস্তায় তেলের আমদানি হয়, তবে তেলীর ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে, সুতরাং কারো পক্ষে জাতি-ব্যবসায় রাখাটা সঙ্গত নয়,—তখন ভূদেব বলেন:—

"আমার বিবেচনায় ইংরাজ অর্থনীতি শাস্ত্রের এই কথাটি ভাল নয়। তৈলিকেরা কি সমাজেরই একটি অঙ্গ-স্বরূপ নয়?"

—সামাজিক প্রবন্ধ।

অধিক উদাহরণ উদ্ধারের দরকার নাই। জাতিত্ব এবং বিশ্বমানবের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এটা রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন স্ফুট, চিত্তরঞ্জনের লেখাতেও তেমনি স্ফুট হইয়াছে। ভূদেব, বঙ্কিম, এমন কি বিবেকানন্দের লেখাতেও হিন্দু সভ্যতারই এতটা প্রাধান্য যে, বিশ্বমানব সভ্যতার একটা অঙ্গ যে হিন্দু সভ্যতা—একথা মোটেই আমল পায় নাই। এই মূল জায়গাটিতে ভেদ আছে বলিয়া চিত্তরঞ্জনের ভাবের সহিত ভূদেব প্রভৃতির ভাবের সাদৃশ্য দেখাইতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। ভূদেবে যাহা নাই, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কারো লেখার মধ্যে মাথা খুঁড়িলেও ভারত বর্ষের লেখক তাহা পাইবেন না। অক্ষয়-"সনাতনীর" ভাণ্ডার হইতে ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত সাম্যবাদী চিত্তরঞ্জনের কথার অনুরূপ কথা উদ্ধার করা আরও অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে একটা ছোট কথা সারিয়া লই। চিত্তরঞ্জন দেশমাতার মধ্যে বিশ্বরূপ দেখিবার কথা লিখিয়াছিলেন; তাই আমরা রবিবাবুর গানের দুটি টুক্‌রা তুলিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, সে কথাটাও রবিবাবুর, চিত্তরঞ্জন প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের অন্তের মধ্যে অনন্তের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের এমনিই প্রকৃতিগত বিশিষ্ট বস্তু যে, স্বদেশের স্তবের বেলাতেও দেশমাতাকে তিনি বিশ্ব-মাতা, দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে তিনি বিশ্ব-দেবতাকে অনুভব করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে আমরা সাধারণতঃ অনন্তকে সান্তরূপে দেখিতেই ভালবাসি, অন্তকে অনন্ত করিয়া অনুভব করিতে চাই না। সুতরাং এ জায়গাতেও ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় বর্দ্ধিত চিত্তরঞ্জনের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সহজেই পড়িয়াছে দেখা যায়। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের শিক্ষা ও সংস্কার মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি ব্যস্ত না হইলেও তাঁর সমর্থকেরা ভারী ব্যস্ত তাহাতো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে!

তারপর বিলাসের কথা। ভূদেব বলিয়াছেন 'দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ।' এ অতি সাধু কথা—বিদ্যাসাগরের আখ্যানমঞ্জরী বা কথামালাতেও বোধ হয় এ

ধরণের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে "বিলাসের ফাঁস" লিখিয়াছেন (সমাজ ২১ পৃষ্ঠা দেখ) বা চিত্তরঞ্জন যে বিলাস-জনিত সর্ব্বনাশের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতরকার কথাটা ভূদেবের নীতি-কথা মাত্র নয়। তাহার ভিতরকার কথা এই যে, "পল্লীসমাজ বাঙ্গালী সভ্যতা সাধনার কেন্দ্র-স্থল," অতএব বাঙালীকে যদি বিলাস-ব্যাধি আক্রমণ করে, তবে সেই পল্লীতে থাকিবে চির দারিদ্র্য, আর সহরগুলি—"দেশের ভোগ-বিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী" হইয়া উঠিবে। এই যে পল্লীসমাজের কথা এবং পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা, ইহাই চিত্তরঞ্জনের সমস্ত রচনার আসল কথা এবং ইহাই আবার রবীন্দ্রনাথের আসল কথা। এই পল্লীসমাজের কথার অনুরূপ বাক্য ভূদেব বিবেকানন্দাদির রচনা হইতে ভারতবর্ষের লেখক উদ্ধার করেন নাই কেন?

তারপর রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে যে রাজাই রাজত্ব করুন না কেন, "স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই···স্বায়ত্ত শাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত।" তিনি পল্লীর Local Self-Government এর কথাই বলিয়াছেন। —আমাদের পল্লী যে self-governed self-contained community ছিল, একথার সাক্ষ্য বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরাও দিয়াছেন। পল্লীবাসীরাই আশ্চর্য্যরূপে পল্লীর শিক্ষাদীক্ষা ব্যবসায় ধর্ম্ম কর্ম্ম শাসনাদির সমস্ত ভার নিজেরা লইয়াছে। চিত্তরঞ্জনবাবুও সেই কথা বলিয়াছেন এবং সেই পল্লী সংস্কারের দিকেই সমস্ত ঝোঁক দিয়াছেন। ভূদেব লিখিয়াছেন, "হিন্দু সমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ...আর্য্যেতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলেও তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না।" ইত্যাদি। ভূদেবের এই কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বা চিত্তরঞ্জনের কথার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, কেননা হিন্দুসমাজের "অন্তঃশাসন" বলিতে ভূদেব পল্লীবাসীর স্বায়ত্তশাসন আদৌ বুঝেন নাই। তিনি অন্তঃশাসন বলিতে কি বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতেই বুঝা যাইবে এবং লেখক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বাক্যের অর্থও পরিস্ফুট হইবে:—

"ব্রাহ্মণজাতিই হিন্দুসমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃশাসন করিয়া আসিতেছেন।"—সামাজিক প্রবন্ধ।

সুতরাং ভারতবর্ষের লেখক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বাক্যে, জাতি বা সম্প্রদায় বলিতে ভূদেব ব্রাহ্মণ জাতিই বুঝিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরাই "সমাজপতি" ছিলেন। এইজন্য পূর্ব্বকালের ভারতীয় শাসনকে ইংরাজীতে theocracy বলা হয়। বিধি প্রণয়ন ছিল ব্রাহ্মণের কাজ, বিধি প্রয়োগ ছিল রাজাদের কাজ। ব্রাহ্মণদের legislative function, রাজাদের executive function। এতটা তলাইয়া ভূদেবের বাক্যটি লেখক বুঝেন নাই। অথচ, চিত্তরঞ্জনবাবু পরিষ্কার বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম।"

"বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি"

জ্যৈষ্ঠের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী "বঙ্গ সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে খুব অল্প পরিসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে হিসাবে এ প্রবন্ধটি সুপাঠ্য হইয়াছে। তিনি প্রথমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের দোঁহা ও গীতিকার কথা বলিতে গিয়া লিখিতেছেন:—

"আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মূলতঃ ও মুখ্যতঃ সম্যক্‌রূপেই Democratic বা লোক-মতানুগামী।" তারপর তিনি লিখিয়াছেন যে, পাঠানেরা এদেশ জয় করিবার পর যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটিল, তখন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা ও ভাব বাংলা সাহিত্যে প্রচুররূপে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু বাংলার খাঁটি বিশেষত্বটুকুকে নষ্ট করিতে পারিল না। তখন একপক্ষে এই সংস্কৃতের প্রভাব, অন্য পক্ষে ফার্শী, আরবী—বিশেষতঃ হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব দেখা দিয়াছিল। লেখক বলেন, হিন্দী কবি সুরদাস প্রভৃতির গানই "ভাষান্তরিত" হইয়া নরোত্তম দাস ও গোবিন্দ দাসের পদাবলী সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রজভাষার সেই সময়েই উন্মেষ।

তারপর শ্রীচৈতন্যের যুগে পদাবলী-সাহিত্য যেমন রসের দিক্ হইতে একটা অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিল, তেমনি তত্ত্বের দিক্ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থও সাহিত্যের নব নব দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। সেই যুগেই বাংলা দেশ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি যদি Democratic হয়, তবে এই সময়ে তার সেই Democratic স্বরূপের চরম বিকাশ দেখা দিয়াছিল বলিতে হইবে।

তারপর বাংলা সাহিত্যের যে যুগ আসিল লেখক তাহাকে "সৌখীন যুগ" নাম দিয়াছেন। পার্শী ও সংস্কৃতের দ্বারা বাংলা ভাষাটা সংস্কৃত হইয়া একটি সুমার্জ্জিত বিলাস-শ্রী লাভ করিল। ভারতচন্দ্রের কবিতা তার নিদর্শন। লেখক বলেন সেই কলা-সৌষ্ঠব-পূর্ণ কৃত্রিম ভাষাই "আজিও আমাদের আদর্শ"। কিন্তু এই সময়েই আবার কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনেরও আবির্ভাব। তাঁদের প্রভাবে পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, নিধুবাবু, দাশুরায়, হরু ঠাকুর প্রভৃতির গানের উৎপত্তি। সুতরাং গোড়াতেও যাহা ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও তাহাই রহিয়া গেল—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য লোকসাহিত্যই রহিয়া গেল।

তারপর ইংরেজি যুগের কথায় আসিয়া লেখক দেখিতেছেন যে এযুগে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা ইংরেজির অনুকরণে। বাংলাভাষার গতি ও প্রকৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে Democratic ছিল, তার কারণ বাংলা সাহিত্য ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিয়োজিত ছিল; কিন্তু ইংরেজি যুগে সাহিত্য Secular হইয়া দাঁড়াইল। যে সাহিত্য ছিল সর্ব্ব সাধারণের, তাহা এখন হইল প্রতিভাবান কবি বা লেখকের আত্মতৃপ্তির একটা উপ-করণ। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যকে লেখক "সুখের সাহিত্য" নাম দিয়া বলিয়াছেন যে,

সমাজে একটা বড় রকমের বিপ্লব ঘটিলেই এ সাহিত্য কোথায় মিলাইয়া যাইবে। ইউরোপের Secular সাহিত্যও টিঁকিবে না, এমনতর কথা নাকি সেখানকার বহু প্রাজ্ঞ ও মনীষী বলিতেছেন। অবশ্য আমরা সে কথা শুনি নাই, এবং শুনিলেও সে সকল লোককে প্রাজ্ঞ বলিতাম কি না সন্দেহ।

কিন্তু লেখক ইংরেজি যুগে আসিয়া অনুকরণের উপর এমন খড়্গহস্ত হইলেন কেন, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। বৌদ্ধ সাহিত্যের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন, তখন তো বিস্তর বিদেশী ব্যাপার বাংলা সাহিত্যে ঢুকিয়াছে। তারপর মুসলমানযুগে তিনি দেখাইয়াছেন যে পার্শী আরবীর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেশ লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের যুগেতো আরও লক্ষ্য করা যায়। সে সব অনুকরণের বেলায় তিনি বলিবেন, বাংলাসাহিত্য নানা জায়গার ভাবকে ও ভাষাকে আরত্ত-আত্মসাৎ করিয়াছে—আর ইংরেজির প্রভাবের বেলাতেই সেই আত্মসাৎ করিবার সহজ ক্রিয়াটার অন্যথা দেখিবেন? পৃথিবীতে কোন দেশের সাহিত্য বাহির হইতে কিছুই গ্রহণ করে নাই, এটা দেখানো যাইতে পারে কি? ইংরেজি সাহিত্য বরাবর বাহির হইতেই পুষ্ট, বাহিরের খাইয়াই মানুষ—ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাঁরাই জানেন। ইংরাজী সাহিত্যে চশার আদি কবি, আর বার্ণাডশ অন্ত-সাহিত্যিক—চসারের কাব্যকে প্রথম স্তরে গড়িল ফরাশীস্ Chivalric romances-রচয়িতা কবিরা, দ্বিতীয় স্তরে গড়িল দান্তে বোকাসিয়ো পেত্রার্ক প্রভৃতি ইতালীয়ন কবিরা। এবং বার্ণাডশ ইব্‌সেনের শিষ্য—কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের পুষ্টিতে মানুষ। বাংলাসাহিত্যেও এইরূপ নানা বিদেশী ধাক্কা স্তরে স্তরে ইহাকে গড়িয়াছে এবং আজও গড়িতেছে। এজন্য আক্ষেপের কোন কারণ নাই, বরং আশা ও আনন্দের যথেষ্ট কারণ আছে।

তবে একটা কথা ঠিক্। পূর্ব্বেকার বাংলাভাষা ও সাহিত্য যেমন সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য ছিল, এখনকার বাংলা সাহিত্য তা নয়। তার প্রধান কারণ ইংরেজি শিক্ষার দরুণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান দাঁড়াইয়াছে এবং এখন সেই ব্যবধান কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে, সেইটেই হইয়াছে সমস্যা। এ সমস্যা দূর করার উপায় লোকশিক্ষার বিস্তার ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে "সখের সাহিত্য" বলিতে পারি না—ইহার সঙ্গে দেশের নাড়ীর সম্পূর্ণ যোগই আছে। দেশের সমূহ-চৈতন্যে (mass-consciousness) ইহা পরিপূর্ণ। এমন এক দিন আসিবে যখন এই সাহিত্যের ধাক্কায় নবজাগ্রত লোক-সমূহের চেতনা উদ্বোধিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে আরও অপূর্ব্বতর নিবিড়তর বিস্তৃততর করিয়া গড়িবে। তখন যা বাজে তা খসিয়া যাইবে, যা আসল তাই টিঁকিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা ২২, [illegible] ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.



—"হাউই কহিল, মোর কি সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে—তাঁর গায়ে লাগেনাক কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।"

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত)

ভারতী

৪১শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২৪ [৫ম সংখ্যা

দণ্ডনীতির প্রথম ইতিহাস

রাজনীতির চারি অঙ্গের মধ্যে "দণ্ড" অন্যতম। রাজ-শাসন ইহার উপরই বিশেষ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা দণ্ডেরই অধিক প্রশংসা দেখা যায়। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গেরই সাধক বলিয়া "ত্রিবর্গ" নামে অভিহিত হইয়াছে ; যথা :—

"দণ্ডঃ সংরক্ষতে ধর্ম্মং তথৈবার্থং বিধানতঃ।
কামং সংরক্ষতে যস্মাৎ ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত যুক্তিকল্পতরুঃ।

"দণ্ড ধর্ম্মকে সংরক্ষণ করে—তদ্রূপ যথানিয়মে অর্থেরও সংরক্ষণ করে। যেহেতু (ইহা) কামকেও সম্যক্ রক্ষা করে—অতএব দণ্ড ত্রিবর্গ বলিয়া উক্ত হয়।"

এই "দণ্ড" ত্রিবিধ বলিয়া অমরকোষের টীকায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে যথা—

"স চ ত্রিবিধঃ। বধঃ অর্থগ্রহণং বন্ধনতাড়নাদিশ্চ।"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত অমরটীকা সারসুন্দরী।

"সেই দণ্ড তিনপ্রকার—বধ, অর্থগ্রহণ বা জরিমানা ও বন্ধন-প্রহারাদি।" ইহাতে দণ্ডনীতি যে মূলে ইংরেজ-শাসনের 'Penal Code' বা 'দণ্ড-বিধি-আইনেরই' সম্পূর্ণ অনুরূপ হইতেছে—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'দণ্ডনীতি' ইংরেজী Penal Codeএর অনুরূপ হইলেও Penal Code নামে আমরা ইহার প্রথম ইতিহাসের প্রকৃত সন্ধান পাই না—বরং 'দণ্ডনীতি' নামেই ইহার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায়। "দণ্ডনীতি' নামের ব্যুৎপত্তি অভিধানে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"দণ্ডেন নীয়তে বেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতি রিতিখ্যাতা ত্রীল্লোকানতিবর্ত্ততে॥"

"দণ্ডের দ্বারা ইহা নিয়মিত হয় বা পক্ষান্তরে দণ্ডকে নিয়মিত করে বলিয়াই ইহা "দণ্ডনীতি" বলিয়া আখ্যাত। ইহা লোকত্রয়কে অতিক্রম করিয়া থাকে।"

এখানে আমরা "দণ্ডকেই" মূল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং এই 'দণ্ড' শব্দের মধ্যেই 'দণ্ডনীতির' মূল ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ 'দণ্ড' শব্দের মূলার্থের পর্য্যালোচনা

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

করিলে তাহার আলোকে অতীতের ঘনান্ধকার অপসারিত হইয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের মনে হয় 'দণ্ড' শব্দ প্রথম প্রহরণার্থক যষ্টিকেই বুঝাইত এবং এই দণ্ড বা যষ্টিদ্বারাই অপরাধীর শাস্তি বিধান হইত বলিয়া 'দণ্ড' শব্দ শাস্তির বাচক হইয়াছে। দণ্ড এই প্রকারে শাসনের প্রধান অস্ত্র ছিল বলিয়াই "রাজদণ্ড" শাসন-দণ্ডের রূপক হইয়াছে। ইংরেজী Sceptre, rod প্রভৃতি শব্দ যে রাজ-চিহ্ন—প্রভুত্ব-চিহ্নের দ্যোতক হইয়াছে—ইহার মূলেও সেই যষ্টি অর্থই বর্ত্তমান।

দণ্ডই রাজার প্রধান চিহ্ন বলিয়া 'দণ্ড-ধর' শব্দ রাজার বাচক হইয়াছে। পুরা-তত্ত্বের বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা—আমরা 'দণ্ড' অপেক্ষাও পূর্ব্বতন শাসনাস্ত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারি। সেই সন্ধান আমরা বেদেই প্রাপ্ত হই। বরুণ বেদের একটী প্রাচীন ও প্রধান দেবতা। তিনি বেদে "সম্রাট্" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এক নাম "পাশী" যথা, "প্রচেতা বরুণঃ পাশী"; তিনি "পাশাস্ত্র" ধারণ করেন বলিয়াই "পাশী" নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই পাশকেই আমরা তাঁহার প্রধান শাসনাস্ত্র বলিয়া মনে করি এবং 'দণ্ড' রাজার চিহ্ন বলিয়া যেমন রাজার 'দণ্ডধর' নাম হইয়াছে—তেমনই "পাশই" বরুণের সম্রাট্-চিহ্ন বলিয়া তাঁহার নাম "পাশী" হইয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। "পাশ" শব্দে রজ্জু বুঝাইয়া থাকে। পাশ বরুণের শাসনাস্ত্র হওয়াতে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া অপরাধীর শাস্তিবিধান করা হইত, ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

বেদের নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌টি পাঠ করিলে বরুণের পাশ-শাসনের কতকটা ধারণা আমরা করিতে পারি:—

"ধ্রুবাস্থ ত্বাস্থ ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তো ব্যম্বৎপাশং
বরুণো মুমোচৎ।
অবো বধ্নানা অদিতেরুপস্থাদ্যুয়ং পাত
স্বস্তিভিঃ সদানঃ॥"
ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল, ৮৮ সূক্ত।

"এই সকল নিত্যভূমিতে বাসকরতঃ (আমরা তোমার স্তব করি)—বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হইতে বরুণের রক্ষা ভোগ করিতে পারি।" রমেশবাবুর অনুবাদ।

বরুণের কোপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিত রেগোজিন্ লিখিয়াছেন:—

"The accepted poetical expression of this fact was "Varuna binds the sinner with his fetters". Vedic India, p. 147.

এই বিষয়ই প্রচলিত কবিতার ভাষায় এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—"বরুণ পাপীকে পাশের দ্বারা বন্ধন করেন।"

বরুণের "পাশী" নামের এই সমস্ত আলোচনা হইতে রজ্জুর দ্বারা বন্ধনই প্রথম শাসন ছিল—আমরা সেই লুপ্ত ইতিহাসেরই সন্ধান পাইতেছি।

বরুণে আমরা পাশের দ্বারা শাসনের যেমন প্রথম ইতিহাস প্রাপ্ত হই—যমে তেমনই আমরা দণ্ডের দ্বারা শাসনের প্রথম

ইতিহাস প্রাপ্ত হই। তাহাতেই দেবতাদিগের মধ্যে যমেরই অনন্যসাধারণ "দণ্ডধর" অভিধেয় হইয়াছে। যম কিরূপে দণ্ডের দ্বারা পাপী-দিগের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন—পুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা:—

"পতনোৎপতনঞ্চৈব গদাদণ্ডাদি পীড়নম্॥"
বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

"কোথায়ও পাতকী সকল একবার পড়িতেছে একবার উঠিতেছে, কোথায়ও গদাদণ্ডাদি দ্বারা তাড়িত হইতেছে।"

'দণ্ডই' কেবল যে যমের শাসনাস্ত্র তাহা নহে—'পাশ'ও যমের শাসনাস্ত্র! তাহাতেই যমের 'কাল' নামানুসারে এই পাশের নাম 'কালপাশ' হইয়াছে। যমদূতেরা পাপীকে প্রথম পাশের দ্বারা বন্ধন করিয়াই যমের নিকট লইয়া যায়—পরে যমরাজ তাহা-দিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে পাশের দ্বারা বন্ধন ও দণ্ডের দ্বারা প্রহার উভয়ই শাসনের অঙ্গীভূত হইয়া একই 'দণ্ড' নামের বাচ্য হইয়াছে। এই জন্যই পাশের নামান্তর "রজ্জু"ও 'দণ্ডিকা' নামেই পরিচিত দেখা যায়। বর্ত্তমান 'হাতকড়া' 'বেড়ী' প্রভৃতিতে আমরা পূর্ব্বের সেই পাশ বা রজ্জু বন্ধনেরই নিদর্শন দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য ভাষায় hand-cuf, Shackles, fetters প্রভৃতির প্রয়োগে সেই পূর্ব্বপ্রথারই অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দণ্ডের প্রথম অনুষ্ঠানেই যে কেবল বন্ধনের রীতি লক্ষিত হয় তাহা নহে—দণ্ডের পরিণামেও সেই বন্ধনের রীতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাতেই দণ্ডের পর যেস্থানে অপরাধী-দিগকে আবদ্ধ রাখা হয়—তাহার নাম হইয়াছে "বন্ধন-বেশ্ম", "বন্ধনালয়।" 'বন্ধন' শব্দের আদি রজ্জু অর্থও হেমচন্দ্রকর্ত্তৃক অভিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তিও এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"বধ্যতেঽনেনেতিকরণব্যুৎপত্ত্যা।" 'বন্ধ করা হয় ইহা দ্বারা' এইরূপে করণবাচ্যে ইহা সাধিত হইয়াছে। ইহাতে কারাগারেও যে অপরাধীদিগকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা হইত তাহাই বুঝিতে পারা যায়; 'কারাগারে'র কারা শব্দটী পর্য্যন্ত বন্ধনের অর্থই প্রকাশ করে। সুতরাং 'কারাদণ্ড' শব্দে কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হওয়ারূপ দণ্ড বুঝাইলেও আদিতে ইহা বন্ধন-দণ্ড পাওয়ার অর্থই যে প্রকাশ করিত আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি।

'দণ্ড' যে কেবল রাজ-শাসনেরই অস্ত্র ছিল তাহা নহে, ইহা সাধারণ শাসনেরও অস্ত্র ছিল। ইংরেজী ভাষায় ইহার অতি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। শিশুদিগের শাসন সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে "Spare the rod and spoil the child"—এস্থলে 'rod' স্পষ্টই দণ্ডের বাচক। প্রবাদটির অর্থ এই "যদি দণ্ড অর্থাৎ বেত্রাদি ব্যবহার না কর (তবে) শিশুকে বিগড়াইয়া অর্থাৎ নষ্ট করিয়া ফেলিবে।" সংস্কৃতেও তদনুরূপ বাক্য পাওয়া যায় যথা—"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।"

"পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আদর করিবে—দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাড়না করিবে॥"

"লালনে বহবো দোষা স্তাড়নে বহবে
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ন তু লালয়েৎ।"

"লালনে বহু দোষ এবং তাড়নে বহু গুণ—অতএব পুত্র ও শিষ্যকে তাড়না করিবে কিন্তু তাহাদের প্রতি আদর দেখাইবে না।"

এখানে "তাড়ন" শব্দে দণ্ডাদি দ্বারা প্রহারই যে বুঝাইতেছে—তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

সংস্কৃতে দণ্ডের শাসন সম্বন্ধে আর একটী অতি স্পষ্ট বাক্যও আছে; যথা—"মূর্খানাং লাঠ্যৌষধিঃ॥" মূর্খদিগের লাঠীই ঔষধ অর্থাৎ হিতকারক অস্ত্র।

ইংরেজীতে Birch শব্দে যেমন বৃক্ষ বিশেষকে বুঝায়—তেমনই শিশুদিগের শাসন-দণ্ডরূপে ব্যবহৃত ইহার শাখাকেও বুঝায়।

সাধারণ শাসন সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়—

"ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যোভ্রাতাচ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যা স্যুরজ্জ্বা বেণুদলেন বা॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত।

"পত্নী, পুত্র, দাস, শিষ্য, সোদর ভ্রাতা ইহারা অপরাধ করিলে রজ্জু বা বংশদণ্ড দ্বারা তাড়নীয় হইবে॥"

এ স্থলে আমরা বন্ধনাস্ত্ররূপে রজ্জুর উল্লেখ না পাইয়া তাড়নাস্ত্ররূপে উল্লেখ পাইতেছি। পাশ্চাত্যদিগের lash, scourge ও whip অর্থাৎ চাবুকে আমরা তাড়নাস্ত্র-রূপে রজ্জু ও দণ্ড উভয়েরই সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। আমাদের কশা, চর্ম্ম, যষ্টি বা চর্ম্মদণ্ডও, চাবুকেরই মত রজ্জু ও দণ্ড সংমিশ্রিত অশ্ব তাড়নাস্ত্র।

এই প্রকারে রজ্জু ও দণ্ডের সহিতই সকল শাসনের যোগ দেখা যাইতেছে। আমরা দণ্ডের ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে প্রথমেই যে বধের উল্লেখ পাইয়াছি তাহাতেও এই যোগেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। বধ-দণ্ডটী সাধারণতঃ "উদ্বন্ধন" নামে অভিহিত। এই উদ্বন্ধন যে বন্ধনের দ্বারা হয় তাহা শব্দার্থ দ্বারাই প্রকাশ পায়। উদ্বন্ধনের শব্দার্থ দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে বন্ধন বুঝায় অর্থাৎ যাহাতে ঝুলাইয়া বাঁধা হয় তাহাই উদ্বন্ধন। উদ্বন্ধনের প্রচলিত শব্দ ফাঁস বা ফাঁসি। ইহাতে আমরা যেন 'পাশ' শব্দেরই অপভ্রংশ দেখিতে পাই। 'পাশের' অপভ্রংশে 'ফাঁস' হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। ফাঁস হইতেই ফাঁসি হইয়াছে। বরুণের শাসনাস্ত্র "পাশ" এইরূপেই ফাঁসে রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রাগুক্ত আলোচনা হইতে আমরা দণ্ডের প্রথম ইতিহাস ইহাই উদ্ধার করিতে পারিতেছি যে, রজ্জু ও দণ্ডই প্রথমতঃ শাসনাস্ত্ররূপে প্রযুক্ত হইত। দণ্ড, রজ্জুর পরে উদ্ভাবিত বলিয়া উভয় শাসনাস্ত্র এক 'দণ্ড'-নামেই পরিচিত হয়। পরিশেষে দণ্ড শাসনের সাধারণ অর্থ পরিগ্রহ করিয়া বস্তু হইতে ক্রিয়ারূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাতেই দণ্ড এক্ষণে শাসনমাত্রেরই বোধক হইয়াছে। এই সাধারণ শাসনার্থ হইতেই দণ্ড শব্দ—দণ্ডের দ্বিতীয় "অর্থ-গ্রহণ" অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে দণ্ড ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইয়া শারীরিক শাসন হইতে ক্রমে নৈতিক শাসনের অর্থ লাভ করিয়াছে। "দণ্ডনীতি" দণ্ডের এই অর্থ-গৌরবেরই আভাস প্রদান করে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

টুপি

আমাদের এ লাইনের দুখানা জাহাজের ঠাৎ স্বশরীরে বসোরা-লোক প্রাপ্ত হবার কারণ যে চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে কি মুখুয্যে শায়দের পদধূলি নয় সেটা নিশ্চয়। াজন্মত্রিসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরেণু মুখে, গঙ্গাজলে নিয়ত ডুবে থেকে, ও ঙ্গার বাতাস সেবা করেও জাহাজ-দুখানা য় তাদের পুরানো তক্তার ঘুণ, বেঞ্চি-গুলোর ছারপোকা-শুদ্ধ গোলোকে না গিয়ে কেন বরাবর বসোরার গোলাপবাগে াজির হয়, এর সঙ্গে অবিনের বুকের াঝে বারোমেসে গোলাপফুলের খসে-ড়া পাপড়িগুলোর কোমল স্পর্শের কোনো াগাযোগ আছে কিনা সেটা আবিষ্কার রতে আমি যখন খুবই ব্যস্ত, সেই সময় একদিন বিকেল সাড়ে-পাঁচটার ষ্টিমারে াশের বেঞ্চে একটু জায়গা কোনোরকমে খল করে চলেছি—একটু হাওয়া খেয়ে াসবার আশায়; কিন্তু দুরদৃষ্ট—এক জাহাজ টে কিন্তু তাতে লোক উঠেছেন প্রায় তিন জাহাজ! তার উপর খালাসী আছেন, য়ং আছেন, সাহেব আছেন, সাহেবের বতে-ছাওয়া চৌকি আছেন আর আছেন মস্ত পুলিশ কোর্টটি! ন স্থানং তিল ারয়েৎ—এর উপরেও বোঝার উপর াকের আটির মতো কোনো গৃহিণীর রমাস-দেওয়া আফিসের ফেরতা মার্কেটের ফুলকপি, শনির তাগাদা-মতো সা ও লা কোম্পানির গ্রীণ্ সিল্ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সব অনবরত এসে পড়তে বিলম্ব করছিল না! এই সময় অবিনকে আহিরি-টোলার ঘাটে তার বাঁয়া-তবলা গোবিন্দ চাকর আর আলবোলা নিয়ে লাল কাপড়ে বাঁধা বিশ্বসঙ্গীতের মোটা পুঁথি-বগলে জাহাজ ধরতে দেখে মন আমার 'হা হতোস্মি' বলে মূর্চ্ছিত হয়ে যে পড়ে এমন-একটু স্থান পেলে না;—দাবা-বোড়ের আটঘাট-বাঁধা রাজার মতো বেচারা কিস্তি-মাতের অপেক্ষা করেই রইল।

বোঝাই কিস্তি আমাদের ঘাট ছেড়ে গঙ্গার মাঝ দিয়ে উত্তরমুখে আস্তে আস্তে চলেছে। আশপাশের মানুষের মাথাগুলো এত কাছে এবং এত বড় করে দেখতে পাচ্ছি যে দূরের জিনিস—তীরের ও নীরের কিছু আজ আর চোখেই পড়ছে না। এই মাথামুণ্ডুর উপরে কেবল দেখছি প্রকাণ্ড খোট্টাই টুপির মতো আধখানা সূর্য্য,—যেন লাল সাটিন কেটে দর্জ্জি সেটা এইমাত্র বানিয়ে সব মাথাগুলোতে ফিট্ করে নিতে চাচ্ছে! টুপির রহস্যে মনটা আমার যখন বেশ মগ্ন হয়েছে সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে অবিন আমায় ডাক্‌লে—"ওহে এদিকে এসো!" সঙ্গে সঙ্গে অবিনের হাত এসে ছোঁ মেরে আমাকে একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাসের প্রথম বেঞ্চি থেকে লাষ্ট ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে এনে উপস্থিত কল্লে।

চামড়ার ষ্ট্র্যাপে বাঁধা হোল্ড-অল্ থেকে চটকানো কাপড়ের সুট্‌টার মতো মানুষের

ঐ চাপন থেকে অবিন যখন আমাকে টেনে এনে বাইরে ফেল্লে তখন কি যে সোয়াস্তি পেলুম! আঃ, জাহাজের এই অংশটা ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে বরাবর গড়িয়ে এসে একেবারে গঙ্গার জল আর দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে ডুব দিয়েছে। এখানে ভদ্র-য়ানার চাপ একআনাও নেই;—খোলা বুক, খালি পা নিয়ে এখানে কাজ থেকে খালাস-পাওয়া যত খালাসী সূর্য্যাস্তের আলোর মধ্যে নিজেদের মজলিস সারি-গানের সুরে জমিয়ে তুলেছে।

সে একটি ছোকরা,—হয় তো ঠিক ছোকরা বলতে যতটা বোঝায় বয়সটা তার চেয়ে বেশী হলেও হতে পারে—কিন্তু মুখ-চোখ তার এখনো কাঁচা। জগতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শেষ করে দিয়ে বিজ্ঞ হয়ে বসবার এখনো তার দেরী আছে সেটা বুঝলুম; এবং তার মুখে এই গানটা আমায় ভারি অদ্ভুত ঠেকল—

উত্তর থিকে অ্যালো বঁধু ভাঙা লায়ের গুণ টানা,
আমার বঁধু দাঁড়িয়ে আছে পুন্নিমের ওই চাঁদখানা!
বঁধু মুখের মধুর হাঁসি, স্তেখলে নয়ানজলে ভাসি,
বঁধুর কথা রসে ভরা ঠিক যেন চিনির পানা!

কলাই-করা ডেকচির বাঁয়া-তবলার তালে তালে মাথা দোলাতে দোলাতে—ওই বঁধু, চাঁদ, চিনির পানা, নয়ান জল এবং উত্তর থেকে গুণ টেনে ভগ্ন তরীর আসার মধ্যে সারবস্তু কিছু উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় অবিনের মাথার কালো টুপিটা উড়ে ডেকের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বেঞ্চির তলা হয়ে জাহাজ টোপ্‌কে একেবারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বা জোগাড় করলে। অবিন তাকে মাথায় চড়ালে টুপিটা ছিল নিতান্ত আমারি, সুতরাং আ যখন তাকে অপমৃত্যু থেকে বাঁচাবার জ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছি সেই স পিছনে হোঃ হোঃ হাসির রব শুনে ফি দেখলেম সেই খালাসী ছোকরা তার ক'পাটি দাঁত বের করে হাস্‌ছে আর হা তালি দিচ্ছে—আমারি দিকে চেয়ে। আমা তখন রাগ করবার মোটেই অবসর ছিল না নগদ সাড়ে-সাত টাকা মূল্যের হোসেনবরে দোকানের নতুন টুপিটা জলে যাওয়া থে কোনোরকমে বাঁচিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ অবিনের পাশে এসে বসেছি সেই সময় সে ছোক্‌রা খালাসী আমাকে এসে সেলাম ক বল্লে—"হুজুর, বেয়াদবি মাপ করবেন! মা থেকে টুপি খসে পড়লে আমি বড় খুসি হই ওটা জলে গেলে আমি আরো খুসি হতুম টুপি নিয়ে আমি অনেক ভোগ ভুগেছি ছেলেবেলায় আমার বাপ আমাকে কখ টুপি পরতে দেন্‌নি। তিনি বলতেন—লণ্ঠনে উপর গেলাপ্‌ ঢাকা দিলেও যা, মানুষে মাথায় টোপি চাপালেও তা,—আলো পাও শক্ত হয়। টোপকে মাছ যেমন এড়িয়ে চ ছেলেবেলা থেকে—কি দেশী কি বিদেশী সব টোপিকে তেমনি ভয় করে কেবলম খোদার দেওয়া টুপিটা নিয়ে আমি ব হতে লাগলুম। সেই সময়ে আমার বা একদিন যে কালো টোপি মাথা পৃথিবীতে এসেছিলেন তার কালো ধোয়া কাপড়ের মতো, এই গঙ্গাজলে ফেনার মতো, পুন্নিমার ওই চাঁদের জোছনা

তা সাদা করে নিয়ে খোদাতালার দরবারে জরি দিতে চলে গেলেন।

"মা তো ছিলেননা, বাপও গেলেন—এক লে আমাকে অগাধ বিষয়ের মালিক খে! কিন্তু বেশিদিন আমাকে অনাথ কতে হল না। অনেক জুটলো, এ ীবের মা-বাপ হয়ে বসবার লোক অনেক টলো;—এত জুটলো যে তাদের ভিড়ে মার সদর ও অন্দর ভর্ত্তি হয়ে শেষ মার মালখানা তোসাখানা আস্তাবল ্যন্ত সরগরম গুলজার হতেও বাকি ল না। আমার মাথা খালি দেখে াও কোনদিন সেটাকে টুপি ঢাকা দিতে ত হন্‌নি এবং মাও কখন দুঃখ পান্‌নি; ন্তু এরা আমার মাথায় টুপি না দেখে কবারে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে আমার ল মাথার পর্দ্দা রাখবার জন্যে উঠে- ড় লেগে গেল এবং মৌলবীসাহেবরা দিন না বিচ্‌মিল্লা বলে জাঁকালো একটা উঁচু টুপি আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে লন ততদিন এরা কিছুতেই ঠাণ্ডা হল টুপিটা বাইরে খুব জম্‌কালো—জরী বতের কাজ, আর ভিতরটায় গাধার ড়ার গদী লাগানো! তারা এমন কার করে সে টুপিটা বানিয়েছিল যে -পরা কোনোদিন অভ্যেস না থাকলেও পরতে আমার কোনো কষ্টই না।

"নতুন গোঁফ উঠতে আরম্ভ হলে যেমন -অসময়ে সেটাতে তা না দিয়ে থাকা না—তেমনি এই টুপিটাকে যখন- মাথায় দিয়ে আমি বেড়াই। টুপির গুণে আমার মুখ দেখতে-দেখতে বুড়োদের মত গম্ভীর, আমার কথাবার্ত্তা চালচলন খুব পাকা আর মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটা আমার খুবই চক্‌চকে ও চওড়া হয়ে উঠলো। ঐ টুপিটা দেখলেই রাস্তার লোকেরাও আমাকে খুব বুদ্ধিমন্ত শ্রীমন্ত এবং আরো কত-কি বলে দুহাতে সেলাম ঠুকতে লাগলো আর তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটকালি নিয়ে দুবেলা মহল-ভরা আমার মা-বাপেদের পায়ে তেল দেবার জন্যে হাজির হতে লাগল।

এতগুলো মাথা একত্র হয়ে আমার বিয়েটা কি-রকম সর্ব্বগ্রাসী ধূমধামের সঙ্গে যে দিয়েছিল তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন! এতগুলো শ্বশুর-শাশুড়ির মন যুগিয়ে চলতে আমার স্ত্রীর কী সে যমযন্ত্রণা! বিয়ের হিসেবের খাতা চুকতে না চুকতে বেচারা প্রাণত্যাগ করলে আর সাতরাজার ধনে ধনী আমাকে মাথার টুপি ভিক্ষের ঝুলির মতো করে বোগদাদের রাস্তায় রাস্তায়—মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসায় উমেদারি করে ফিরতে হল। টুপিকে আমার কেউ অনাদর কল্লেনা বটে কিন্তু টুপি যার মাথায় বাসা বেঁধেছিল সেই টাকার মতো একটি গোল টাক-ওয়ালা মানুষটিকে দেখলেম কেউ খাতিরেই আনতে চাইলে না—সেই দুঃখের দিনে।

"কতকাল টুপি-পরার এই ফল—অনেক তদবিরের এই টাক—এ'কে আবার সেই টুপিতে ঢেকে বোগদাদ ছেড়ে আমি বসোরার দিকে রওনা হলুম। যদি কেউ

না জোটে তবে টুপির একটা দোকান খুলে দেশশুদ্ধকে টুপি পরিয়ে তবে ছাড়বো! অবিশ্যি এ বুদ্ধিটা বোগদাদে থাকতে-থাকতেই আমার মাথায় যোগালে হোতো ভালো, কিন্তু কে জানে, ঐ টুপির গুণে কিম্বা যে লম্বাকান জানোয়ারের চামড়া দিয়ে সেটা আস্তর করা ছিল তারি গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথায় এল তখন বোগদাদ থেকে অনেক দূরে—বসোরায় এসে পৌঁচেছি। সেখানে কেউ টুপি মাথায় দেয় না! গোলাপফুলের পাপড়ির গোড়ে-মালা গেঁথে তারা পাগড়ির মতো কিংবা আপনাদের ঐ শিবঠাকুরের সাপের মতো কেবল মাথায় জড়িয়ে রাখে। বোগদাদে আমার মতো সুপুরুষ কমই ছিল; এখানে দেখলেম আমার মতো সুপুরুষকে কেউ বিয়েই করতে রাজি হয় না, তার উপর মাথার মাঝে ছিল সেই টাকা-প্রমাণ টাকটি! যেখানে কেউ টুপি পরে-না সেখানে সর্ব্বদা টুপি দিয়ে টাক ঢেকে যে কি আতঙ্কে আর অসোয়াস্তিতে দিন কাটাতে লাগলেম তা কেমন করে জানাব। আমার কেবলি মনে হতো বসোরার এই গোলাপফুলের খোসবোতে ভরা জোর-বাতাসে যেদিন আমার এ টুপিটা উড়ে যাবে সেদিন গাধার রোঁয়ার আস্তরের আওতায় টাক্-পড়া মাথাটা আমি কোন্‌খানে গিয়ে লুকোবো! বসোরায় যেমন গোলাপফুল তেমনি গোলাপী ঠোঁটের মধুর হাসিও অনেক,—সেই হাসির তুফানের ঝাপ্‌টা থেকে টাক বাঁচাতে আমাকে কি তোগই না ভুগতে হচ্ছিল। টুপিটা আমার মাথার কুরুশী পোকা মতো;—তাকে টেনে ফেলতে পারা শক্ত তাকে রাখলেও যন্ত্রণার অন্ত নেই।

"এই সময় যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা,—আমি প্রেমে পড়লেম! আসকের আগুন যদি মগজে জ্বলতো তবে সেটাকে টুপি চাপা দিয়ে সহজেই নেবাতে পারতেম কিন্তু সে খোদার নিজের হাতে জ্বালা বাতি, টুপি দিয়ে তাকে নেবানো চলে এমন জায়গা তিনি তাকে রাখেন-নি। দুনিয়াকে রোসনাই দিতে সে রাতি তিনি জ্বালিয়েছেন—বুকে মাঝখানে প্রাণের সঙ্গে এক সামাদানে সেই বাতির আলোয় যাকে ভালোবাসলেম তাকে কি সুন্দরীই দেখলেম! যদিও সে বসোরার গোলাপবাগের ছোট ফুল বৈ বড় ফুল ছিল না। দিন আমি সবপ্রথম খোদাতালার কা হাত-পেতে ভিক্ষে চাইলুম আমার ছে বেলাকার সেই কোঁকড়াচুল খালি মা হাসবেননা বাবু, সবাই চায় খোদার ক বড় হতে, আমি বল্লেম—'আমায় ছোট ক দুনিয়া ছিষ্টি হয়ে এমন ভিক্ষে শুধু আমিই চেয়েছি, কত লোক চেয়েছে, পে এখনো চাচ্ছে দেখুন না—"

আমি সেই ছোকরার কথায় পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখলেম পৃথি মাথার উপর থেকে সেই লাল মখম বড় টুপিটা সরে গেছে, দিগন্তের কালো মেঘ এসে লেগেছে, আর পূবপারে চাঁদনী রাতে নতুন জ্যোৎস্না, তলায় গাছের আড়ালে একটি মর্দি ঘাটে বাঁশীতে সাহানার সুর বাজ

সেই নতুন রাতের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজ এসে বড়বাজারের ঘাটে লাগল। আমি অভ্যেস-মতো অবিনের কাছ থেকে আমার টুপিটা চাইতেই সে অবাক হয়ে বল্লে,—"সে কি! তোমার পাশেইতো সেটা ছিল!"

জাহাজ থেকে অনেকগুলো টুপিওয়ালা নেমে গেল, কেবল আমরা দুই বন্ধুতে নামলেম খালি মাথা। তার পর দিন সে জাহাজখানাও বসোরায় চলে গেল। গল্পের শেষটা শোনবার ইচ্ছা থাকলেও সে ছোকরার আর দেখা পেলুম না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সার্ব্বজনীন কল্যাণ

(ক্রুপটকিন হইতে)

সার্ব্বজনীন কল্যাণকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—এটি পুরোপুরি বাস্তব এবং কার্য্যত সম্ভব। সার্ব্বজনীন কল্যাণের মধ্যে মানব-সাধারণের মনুষ্যোচিত জীবন-ধারণের চেষ্টাই নিহিত। এর অর্থ, মানুষ যাতে মানুষের মত বাঁচতে এবং তাদের কাজ-চালাবার ও সমাজ-রক্ষার জন্যে উপযুক্ত সন্তানপালনের সুবিধা পায়। এতদিন কর্ম্মী-সম্প্রদায় মুখ বুজে, পশুর মত জীবনযাপন করে' পরের জন্যে খেটে মরেছে; এবার তাদের মানুষের মত বাঁচবার দিন এসেছে—মানব-সাধারণের বঞ্চিত অধিকার লাভের পক্ষে বর্ত্তমান শতাব্দী মাহেন্দ্রক্ষণ।

কর্ম্মী-সম্প্রদায় যদিও সভ্য লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, তবু তাদের উৎপাদিত ফসলে প্রত্যেকেই সুখেসচ্ছন্দে থাকতে পারে। বেশীর ভাগ, যে-সকল ধনী পরের পরিশ্রম-প্রসূত ফসলের আয়ে আলস্যে সময় ও পরিশ্রমের অপব্যবহার করেছেন এবং অপরের প্রাপ্যে হস্তক্ষেপ করেছেন, তাঁদের যদি পরিশ্রমে বাধ্য করা হয় তবে প্রচুর ফললাভের সম্ভাবনা। Malthusএর theory অনুসারে অনেকে মনে করেন যে, খাদ্যবৃদ্ধির অনুপাত জনবৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম; কিন্তু তার বিপরীত কথাটাই বেশী প্রামাণিক;—যেখানে লোকসংখ্যা বাড়ে, খাদ্য তার চেয়ে বেশী বাড়ে;—কারণ, সেখানকার ভূমির প্রসবশক্তি আবশ্যকের সঙ্গে দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। সকল দেশের ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই জনবৃদ্ধির অনুপাতে মাটীর প্রজনন-শক্তি ত বর্দ্ধিত হয়েছেই, এমন-কি, কোথাও কোথাও দশগুণ পর্য্যন্তও বেড়ে গেছে।

হয়ত ভাল অবস্থায় পড়লে আরও অনেক গুণ বাড়তে পারত, কারণ পৃথিবীর ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলস ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও বেড়ে চলেছে।

দেশের অর্থ কয়েকজন ব্যবসায়ী বা ধন-কুবেরের হাতে জমা হবার বদলে ধনী-মুখাপেক্ষী বারো ভূতের করতলগত হচ্ছে—কিন্তু তা'তে দেশের ধনবৃদ্ধির কোন সহায়তাই হচ্ছে না।

কেবল তাই নয়; মূলধনের মালিক জিনিষ-উৎপাদনের পথে বাধা দিচ্ছে—যাতে উৎপন্ন সামগ্রী সবাইয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয় সেদিকেই তার দৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ লোক শীতের দিনে কয়লার অভাবে কেঁপে মরছে। কিন্তু কয়লার খনির অধিকারী কর্ম্মোৎসুক খনককে সপ্তাহে মাত্র তিনদিন খনিতে কাজ করতে দেয়। হাজার হাজার তাঁতি তাঁত বন্ধ করে' বসে আছে—তাদের স্ত্রী-পুত্রের ন্যাকড়া মাত্র অঙ্গের আবরণ, আর লক্ষ লক্ষ লোকের অঙ্গাচ্ছাদন পোষাক নামেরও অযোগ্য। হাজার হাজার কল-কারখানা বছরের মধ্যে কতবার বন্ধ রাখা হচ্ছে, অথচ লক্ষ লক্ষ লোক কাজের অভাবে কারখানার দ্বারে দ্বারে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে, এমন-কি অনাহারে প্রাণ-পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে।

যদি এই-সমস্ত লোককে কাজের অধিকার দেওয়া হয়, যদি সমস্ত খনি-কারখানায় সপ্তাহ-ভোর কাজ চলে, তবে এই কর্ম্মীদের সানন্দ ও আন্তরিক পরিশ্রমে আমাদের ধূলার পৃথিবী সোনার হয়ে উঠবে। কিন্তু মানুষের এই সম্পদ অর্জ্জনের পথে বণিক ও কল-কারখানার মালিক তাদের সঞ্চয়-বাসনার কাঁটা পুতে রেখেছে।

এ-সব ত সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক। পরোক্ষ-ভাবেও ফসলের যথেষ্ট প্রতিবন্ধক আছে। ধনীর বদখেয়াল চরিতার্থ করতে বা অসার বিলাস-সামগ্রী তৈরী করতে যে খাটুনিটা বাজেখরচ হয় সেটাও ধর্ত্তব্যের বিষয়। আরও অনেক রকমে কর্ম্মী-সম্প্রদায় পণ্ডশ্রমে বাধ্য হয়ে ফসলের ও কারখানার প্রস্তুত সামগ্রী-উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। বাজার-দখলের চেষ্টায় জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধ চলে তার সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করতে যা ব্যয় হয় সেটাও বাজেখরচ বই আর কি? নিষ্কর্ম্মা অথচ নামজাদা চাকরেদের মাহিনায় যে মোটা টাকাটা খরচ হচ্ছে তা আমাদের লোকসানের অঙ্কই বাড়িয়ে তুলেছে। তারপর বিচার-প্রহসনে যে-সব বিচারপতি পুলিশ পাহারা শান্তিরক্ষার বিচিত্র অভিনয় এবং বাস্তবিক পক্ষে দেশের অশান্তি-বৃদ্ধিই করছেন তাঁরাও বিনা-শ্রমে দেশের ও দশের শ্রমলব্ধ অর্থশোষণ করছেন; অথচ কর্ম্মী-সম্প্রদায় বছরের পর বছর দশের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটেও কায়ক্লেশে দিন-গুজরাণ করতে অপারগ। বড়লোকের সখের কুকুর ও ঘোড়া প্রভৃতির আস্তাবলে ও বৈঠকখানায় যারা দাসত্ব করছে তারাও মস্ত-একটা বাজে খরচ। এই-সমস্ত বাজেখরচ যদি দশের উপকারে লাগান হয় তবে আমাদের সম্পদ অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়, এবং কল-কারখানায় উৎপন্ন যন্ত্রপাতিতে দোকান ভরে ও জিনিষ-পত্র সস্তা হয়ে সাধারণের অনায়াসলভ্য হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে দেশের সিকিভাগ লোক বছরে তিন-চার

মাসের মত কর্ম্মহীন হয়ে বসে' থাকতে বাধ্য; আর,—প্রায় অর্দ্ধেক না হোক—অন্তত আরও সিকিভাগ লোকের পরিশ্রম ধনীর বিলাসলালসা চরিতার্থ এবং সাধারণের অর্থশোষক সামগ্রী তৈরী করতে ব্যয়িত হয়।

এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 'যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সভ্য-সমাজে একদিকে যেমন ফসল বাড়াবার শক্তি আছে অন্য দিকে তেমনি সেই বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকও আছে যথেষ্ট—তা সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—যে-ভাবেই হোক না কেন! কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারছেন যে, দেশের আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতির উপরে আশাতীত প্রাচুর্য্য নির্ভর করছে; কারণ, কেবল মজুরদল নয়—মানব-সাধারণের একজোট চেষ্টায় কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের সকল অভাব দূর হয়ে যাবে। আমাদের আহার, পরিচ্ছদ ও সংসার-সামগ্রীর দৈন্য ত থাকবেই না, বরং আমাদের অবসর ও শক্তি কোন্ কাজে লাগাব এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।

না, প্রাচুর্য্যের কথাটা নিতান্ত স্বপ্ন নয়—একেবারে বাস্তব। যখন হাতে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্র তৈরী করতে হতো, যখন এক-কাঠা জমীতে একমুঠো শস্য উৎপাদন করাও কষ্টকর ছিল, তখনকার পক্ষে এটি অবশ্য স্বপ্নকথা! কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্বজোড়া সভ্যতার দিনে, মানুষের দৈহিক শ্রমলাঘব-কারী যন্ত্রপাতির দিনে এটি আর বাজে স্বপ্ন নয়—কার্য্যত সম্ভব!

কিন্তু, যদি এই প্রাচুর্য্য কার্য্যে পরিণত করতে হয় তবে যুগে যুগে সঞ্চিত মানুষের বিরাট মূলধন, লক্ষ লক্ষ কল-কারখানা-খনি, কৃষিভূমি, পল্লীনগর ও শিক্ষা,—সমস্তই জনসাধারণের অধিকারভুক্ত করতে হবে, একচেটে ব্যবসায়ীর বা বিত্তশালীর খেয়ালের অধীন রাখলে চলবে না; কারণ, এই প্রাচুর্য্যের উপরেই আমাদের শক্তি ও শান্তি নির্ভর করছে। বহু পরিশ্রমে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যা গড়ে গেছেন বা আবিষ্কার করেছেন সেই সঞ্চিত ও ক্রমশ-বর্দ্ধমান সম্পদ সাধারণের সম্পত্তি হবে এবং সঙ্ঘের চেষ্টায় সকলের উপকারে ব্যয়িত হবে।

ধনীদের অন্যায় অধিকার-চ্যুতিই সার্ব্বজনীন কল্যাণসাধনের একমাত্র উপায়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের উপর সভ্যসমাজে কেবল চিন্তার ও ভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু ধনীদলের চেষ্টায় সে চিন্তা বা ভাব কার্য্যে প্রকাশ পায়-নি; বর্ত্তমান শতাব্দীতে সেই চিন্তা ও ভাবই সামাজিক বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। ধনী-নির্ধন সকলেই অল্পবিস্তর বুঝতে পেরেছেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানের ইতিহাসে এই অধিকারচ্যুতিই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা; কারণ, মানব-সভ্যতার সব-চেয়ে বড় কথাটা এরই মধ্যে সফল হয়ে উঠবে। কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট কোন শক্তি এ পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারবে না—সাধারণের একজোট চেষ্টায় এ সমস্যার সমাধান হবে, এই মহান কল্যাণকর পরিবর্ত্তন সাধিত হবে।

লোকেরা কষ্ট পাচ্ছে আর বলছে, এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? এ

প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে এই যে, সভ্য-সমাজের ঘরে ঘরে আমাদের প্রচার করতে হবে—সকলেরই বাঁচবার সমান অধিকার আছে,—সমাজে সে যে স্থানই দখল করে থাকুক না কেন? হোক সে ধনী বা নির্ধন, সুস্থ বা রুগ্ন, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। আমাদের বলতে হবে, সমাজস্থ সবাই সমাজের প্রত্যেক জিনিষের সমান ভাগীদার। এ-কথা শুধু মনে স্বীকার করলে বা কাগজে লিখে প্রচার করলে চলবে না, প্রাণে প্রাণে এ সত্য বিশ্বাস করতে হবে, এই কথা-অনুসারে কাজ করতে হবে।

এই কাজের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সামাজিক বিদ্রোহ—অধিকারচ্যুতি। আমাদের এ বিদ্রোহে গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা নেই, গোলাগুলি রক্তপাত নেই; এর মধ্যে আছে উদার মনুষ্যত্ব, স্বার্থত্যাগ ও যথার্থ বীরত্ব,—যা প্রাণহননের পরিবর্ত্তে প্রাণরক্ষারই সহায়তা করে। অন্য শব্দের অভাবে আমরা এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনকেই বিদ্রোহ নামে অভিহিত করতে বাধ্য হচ্ছি।

অনেকে মনে করেন, অধিকারচ্যুতি মানে, ধনীদের সিন্দুক ভেঙ্গে তাদের সঞ্চিত সম্পদ জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করে' দেওয়া; সেটা কিন্তু নিতান্ত ভুল ধারণা;—কেননা, আমরা চাই যাতে প্রত্যেক মানুষ জীবনধারণের উপযোগী ব্যবসা শিখতে পায়, যাতে লোকে কোন মালিক বা মহাজনের অধীন না হয়ে সুবিধামত আপনার শিক্ষা ও শক্তি কাজে লাগাতে পায় এবং মানুষের মত বাঁচবার জন্যে যাতে কোন প্রভুকেই কর দিতে না হয়। অর্থাৎ কাউকে আর দিন-গুজরাণের জন্যে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বা অর্দ্ধ-অনশনে পরের কারখানায়, খনিতে বা মাঠে অনর্থক বুকের রক্ত ঢালতে হবে না। ধনীদের অর্থ যদি আমাদের কোন উপকারে আসে তবে সেটা জনসাধারণের সুবিধার জন্যে যন্ত্রপাতি বা শস্য-উৎপাদনের উপযোগী কোন কাজে ব্যয়িত হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা অনেক বিদ্রোহের কথা পড়েছি, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ দোষের জন্যে সে-সব চেষ্টা যথেষ্টরূপে সফল হয়-নি। আমরা কিন্তু রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্রসর হব—নিজের বা দলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, সুবিধা বুঝে কাজ করলে পুরাণো ভুলেরই পুনরভিনয় হবে, প্রকৃত কাজ কিছুই হবে না। এই বিদ্রোহের প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে জনসাধারণ উদর-পূর্ত্তি করে' খেতে পায়, লজ্জানিবারণের যোগ্য বসন পায়, মাথা রাখবার মত স্বাস্থ্যকর ঠাঁই পায়; তবেই-ত তারা বুঝবে যে, মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম তাদের ব্যথা বোঝবার বন্দোবস্ত হয়েছে, তাদের কাজে-খাটাবার আগে তাদের অভাব-অভিযোগ মেটানো হয়েছে—তবেই ত আমাদের প্রয়াস ও পরিশ্রম সার্থক হবে। কিন্তু, কোন বিশেষ সভা বা কোন কার্য্যকরী সমিতির দ্বারা এ-সব কাজ করতে গেলে কিছুই হবে না, প্রত্যেককেই কোমর বেঁধে ধূলা মেখে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হবে, জনসাধারণের নামে তাদের শ্রমলব্ধ সমস্ত সম্পদ ধনীদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে—পরণের কাপড়, শয়নের ঘর, স্বাস্থ্যকর খাদ্য—এককথায় মানুষের মত বাঁচতে হলে যা-কিছু দরকার, সবই তাদের অনায়াসলভ্য করতে হবে। একজনের বা একদলের সুবিধা নয়—জনসাধারণের সুবিধা-সাচ্ছন্দ্যের দিকেই আমাদের সকল চেষ্টা একাগ্র করতে হবে—যাতে মানুষ বাঁচতে পায় এবং ভবিষ্যৎ সমাজের উন্নতির জন্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জ্ঞানের মধ্যে বাড়তে পায়।

একটা তর্ক আছে। অনেকে বলছেন, 'স্বীকার করলুম, কোন দেশে এমনধারা পরিবর্ত্তন সাধিত হল এবং সঙ্ঘের সকলেই সমান অধিকার লাভ করলে। কিন্তু ধর, যদি অন্যদেশ থেকে কোন ধনী মহাজন এসে সেই দেশে বাস করে এবং কারখানা খুলে বা বাণিজ্য করে' দেশের সম্পদ-আহরণের চেষ্টা করে, তবে তাকে বাধা দেবার উপায় কি? এ-কথা কোনমতেই বলা যায় না যে, সব দেশে একই সময়ে এই বিদ্রোহ ঘটবে, তা-ছাড়া তোমাদের শান্তি-রক্ষার জন্যে ত পাহারাদার সৈন্য থাকবে না?"

এ তর্ক যাঁরা তুলছেন, তাঁরা নিতান্ত একদেশদর্শী। মূলধনী মহাজন, কারখানার মালিক বা জমিদার সবাই একই উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছে এবং সে উপায় হচ্ছে অভাবগ্রস্ত কর্ম্মী-সম্প্রদায়ের রক্ত শোষণ। কিন্তু এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের পর যদি দেশে কারও কোন অভাব বা অসচ্ছলতা না থাকে তবে তারা শ্রম বিক্রয় করবে কিসের জন্যে! যদি স্বাধীন থেকে নিজের ক্ষেতে-কারখানায় বা খনিতে তারা কাজ করতে পায় তবে অপরের দ্বারস্থ হবার তাদের দরকার কি? অন্যদেশ থেকে কোন ধনী অর্থসঞ্চয়ের মৎলোবে সে-দেশে এলে, ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাকে ফিরতে হবে—সৈন্য-সাহায্যে তাকে বিদায় দিতে হবে না।

বর্ত্তমানের মনীষী, কবি ও বৈজ্ঞানিক আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, কর্ম্মী-সম্প্রদায় যে-দিন নিজেদের কলে, খনিতে ও মাঠে কাজ করবে, যে-দিন অশন-বসন-শয়নের জন্যে কাউকে কর দেবে না, সে-দিন এল বলে! অদূর-ভবিষ্যতের সেই শক্তি, শান্তি ও প্রাচুর্য্যের উৎসব-দিনের অপেক্ষায় ধরিত্রীর অঙ্গনে আমরা উৎসুকনেত্রে পথপানে চেয়ে আছি।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দু, মুসলমান ও পার্সী রমণী

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার চির-ব্রহ্মচর্য্য—এইগুলি ভারতীয় সমাজের খাঁটি লক্ষণ-পরিচায়ক মুখশ্রী। কিন্তু, সমাজ-সংস্কারকেরা জোর করিয়া যে সকল য়ুরোপীয় রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ভারতবাসীর শিক্ষা, অভ্যাস, বিশ্বাস, সমস্ত জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহপ্রণালী, তাহার বিরুদ্ধ।

* * *

হিন্দু রমণীরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা; পরিবারের পুরুষ-পরিজনেরা পর্য্যন্ত তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্ব-হইতে সাবধান হইবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। অ-বিভক্ত স্বত্বাধিকার-নিয়মের কল্যাণে, একশো দুশো লোক প্রায়ই এক বাড়ীতে বাস করে; কি পুরুষ, কি রমণী উভয়ই স্বল্পবাসাচ্ছাদিত; এইরূপ ঘরের ভিতর বদ্ধ হইয়া না থাকিলে পারিবারিক নীতির দশাটা কি হইত বলা যায় না।

অন্তঃপুরে থাকে—গৃহস্বামীর মা, স্ত্রী, মেয়ে, বৌ, ছোট ছেলেদের বাগ্‌দত্তা বধূ; তাছাড়া বড়মানুষের বাড়ীতে কতকগুলা দাসী।

পরিচ্ছদ:—ছোট জামা, ছোট ছেলেদের জন্য কামিজ, স্ত্রীলোকদের জন্য কাঁচুলী, শাড়ী—যাহা কোমরের চারিদিকে জড়াইয়া, বাহুর নিচে দিয়া বাহির করিয়া, মাথার উপরে আনিয়া ফেলা হয়। বঙ্গদেশে কেবল একখানা শাড়ী মাত্র। বিবাহিতা রমণীর কপালে একটা লাল ফোঁটা, তাহার সুন্দর চুল তেল দিয়া আঁচ্‌ড়ানো; অলঙ্কারের সমধিক প্রাচুর্য্য।

কাজের মধ্যে—ঘরকন্নার কাজ, রাঁধা-বাড়া, তাস প্রভৃতি খেলা, গল্প-শোনা বা গল্প-পড়া, তাছাড়া শিশুদের শিক্ষা দেওয়া। গরিব স্ত্রীলোকেরা, কাজ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়; ধনী গৃহের স্ত্রীলোকেরা কদাচিৎ গৃহের বাহির হয়, তাহারা পর্দার ভিতর অবগুণ্ঠিতা; কখন কখন তাহারা ভ্রমণে বাহির হয়, এবং প্রায়ই পূজা-অর্চ্চনার জন্য মন্দিরে যায়।

"বিষবৃক্ষে" অন্তঃপুরের বর্ণনা এইরূপ আছে:—"একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবালা কুমারী হইতে পলিত-কেশা বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত সকলই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং উঁ উঁ করিয়া উকুন মারিতেছিল। কেহ পাকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধাত্রহস্তে তাহা তুলিতেছিল, কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা সিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন; কোন সুন্দরী চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাদান করিয়া তিনগ্রামে সপ্তসুরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন, কেহ কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া সিঁড়িতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদ্‌গ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাসুরায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন, কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কাণে কাণে বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। যিনি সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রাতে নিজ বুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদু ভৎর্সিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক অনেক

উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন। যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন; যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য-কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক-একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন।"

গৃহিণী, বাড়ীর সকল মেয়ের উপর কর্তৃত্ব করেন। কোন প্রবল জমিদারের পত্নী কিম্বা কোন ধনী বণিকের পত্নী, গরিব মা-বাপের কষ্টের অবস্থা হইলেও সর্ব্বজনবাঞ্ছিত য়ুরোপীয় রমণীর অবস্থা লাভ করিতে অস্বীকৃত হইবে। যে বাল-বিধবা, শ্বশুর-শাশুড়ীর দাসী হইয়া পড়িয়াছে তাহার অবস্থা অবশ্য শোচনীয়, কিন্তু যে বিধবা পুত্রবতী, সে স্বীয় শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর, স্বীয় পুত্রবধূর উপর যেরূপ প্রভুত্ব করে সেরূপ প্রভুত্ব য়ুরোপে অপরিজ্ঞাত।

*
* *

অন্তঃপুরের পর অন্দর-মহল। মুসলমানীরা সম্যক্ বাসাচ্ছাদিতা; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, চওড়া পা-জামার উপর, একটা বিপুল জামা। উৎসব-পার্ব্বণে, খুব দামী ঝক্‌ঝকে রংএর পরিচ্ছদ। মাথায় খুব ঝিক্‌মিকে দামী পাথরের সিঁথী।

তাহাদের জীবনটা এক-ঘেয়ে, কিন্তু—যদি একজন মুসলমান লেখকের কথা বিশ্বাস করা যায়—তাহাদের সান্ত্বনা আছে:—

(১) "বহু শতাব্দীর ব্যবহারে স্ত্রীর স্বভাবের মধ্যে যাহা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে সেই অভ্যাসের বলে, মুসলমান-মহিলা বাহিরের লোকের সহিত মেলামেশা করিবার সুখ যদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবন নিতান্ত একঘেয়ে বা অসহ্য নহে। মুসলমান-মহিলা স্বীয় গৃহের অধীশ্বরী; সমস্ত গার্হস্থ্য ব্যাপারের উপর তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত। সমস্ত গৃহের শাসন-ভার তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত। সেখানে তাঁহারই মতামতের প্রভাব সব-চেয়ে বেশী। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত গৃহের কোন বিভাগের কাজই করা যায় না। যদি ছেলেদের জন্য, স্বামীর জন্য বা আর কাহারও জন্য কিছু করা আবশ্যক হয়,—তাঁহারই পছন্দ সবচেয়ে সেরা বলিয়া বিবেচিত হয়। স্বামীর পরিধেয় বস্ত্রের তিনিই কাপড় পছন্দ করিয়া দেন। প্রাচ্য ভূভাগে, কোন ব্যক্তির পরিধান-বস্ত্রের পারিপাট্য ও কেতার মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর নৈপুণ্যই প্রতিভাত হয়। ভাল করিয়া মুখ-হাত না ধুয়াইয়া, ভালরকম কাপড় না পরাইয়া তিনি তাঁহার ছেলেদিগকে বাহিরে যাইতে দেন না। তিনি স্বয়ং রান্নাঘরে গিয়া সমস্ত রান্না চাখিয়া দেখেন, পাছে রান্নায় বেশী নুন বা কম নুন হয়। যদি তাঁহার স্বামীর নিকট কোন অনুগ্রহ যাচ্‌ঞা করা আবশ্যক হয়, তিনি জানেন কিরূপে তাহা আদায় করিতে হয়। যখনি

(১) Mahammad Barakatullah: Mahamedan Women in India (British Empire Series) p. 377.

দেখেন তাঁহার স্বামী ভাল মেজাজে আছেন, তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া তখনি তিনি সহজেই নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লন। স্বামীকে "মশারীর ভিতর বক্তৃতা" দিতে জগতের কোন রমণী অপেক্ষা তিনি কম পটু নহেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রমণীর যুক্তির ধারা একইপ্রকার। তাই মুসলমান স্বামী কোন একটা বিষয়ে স্ত্রীকে কিছুতেই লওয়াইতে না পারিলে শেষে শুধু এই কথাটি বলিয়াই স্ত্রীর নিকট হার মানেন ঃ—"বাঁকা পাঁজ্‌রার হাড় না ভাঙ্গিয়া কখন সোজা করা যায় না"—(স্ত্রীলোকের পাঁজ্‌রার হাড় বাঁকা এইরূপ চলিত কথা আছে)।"

*
* *

ক্ষুদ্র পার্সী সমাজ-মণ্ডলীর মধ্যে রমণীরা খুব স্বাধীন। পার্সী-রমণী সাধারণত সুগঠিতকায় ও গৌরবর্ণ; তাহাদের ব্যবহার মধুর ও প্রীতিজনক। তাহারা ধর্ম্মঘটিত একটা কুসংস্কারবশতঃ তাহাদের সুন্দর কেশ ঢাকিয়া রাখে ঃ ঢাকিয়া না রাখিলে যে-কোন দেশের সুন্দরীদের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে।

পুরুষদিগের ন্যায় তাহারাও "পবিত্র কামিজ" পরিধান করে; তাহারা রেশমের পায়জামা পরে এবং কামিজের উপর তাহাদের উপবীত বাঁধা থাকে। তাহারা পাঁচ হইতে দশ গজ আয়তনের শাড়ী পরে—বেশ মোলায়েম রেশমী শাড়ী। হাত-কাটা ফতুয়া। সবশুদ্ধ মিলিয়া পরিচ্ছদটি অতীব রমণীয় ও সুশোভন। তাহার উপর—সোনার গহনা; গলায় রত্নহার; বাহুতে রত্নখচিত বাজুবন্দ; সচরাচর একজন পার্সী-রমণীর ৫০০ হইতে ১০০০ হাজার পৌণ্ড মূল্য-পরিমাণ গহনা-পত্র। ধনী ঘরের স্ত্রীলোকদের আরও বেশী।

(২) "সবাই জানে, পার্সী-রমণীরা হিন্দু ও মুসলমান রমণী অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত। সৌভাগ্যক্রমে বাপ-মায়ের নিকট হইতে তাহারা কোন বাধা পায় না। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা ভাষা ও সঙ্গীত প্রভৃতির জ্ঞানে যে-কোন জাতির সমকক্ষ দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হন। প্রাচ্য দেশবাসীদের মধ্যে একটা জিনিস আমার খুব ভাল লাগে;—নূতন জ্ঞান লাভের জন্য তাদের চেষ্টা আছে, কিন্তু সেই নূতন জ্ঞান পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে না। কালেজের শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া কোন পার্সী-বালিকা মনে করিবে না যে, রন্ধন করা তাহার অযোগ্য; বরং সে অন্য গৃহিণীর ন্যায় ভাল রাঁধিতে পারে বলিয়া বেশ-একটা গৌরব অনুভব করিয়া থাকে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) Zulirka Sorabji Cavalier ; Parsi Women.

নীলপাখী *

তিলতিল—ভাই
মিতিল—বোন
আলো
বেরীলুন—পরী
পিতা
মাতা
সময়
টাইলা—কুকুর
টাইলেট—বিড়াল
রুটী
আগুন
জল

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—কাঠুরিয়ার গৃহ

গৃহাভ্যন্তরে তিলতিল ও মিতিল নিজ নিজ শয্যায় শুইয়া আছে। মাতা ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাদের বুকের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলেন, তাহারা ঘুমাইতেছে। তিনি ইঙ্গিতে পিতাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন এবং পা টিপিয়া ডানদিকের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় আলোটা নিবাইয়া দিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ হইবামাত্র আলোটা আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠিল। তিলতিল ও মিতিল জাগিয়া উঠিয়া বসিল।

তিলতিল। মিতিল ?

মিতিল। কি ভাই তিলতিল ?

তিলতিল। ঘুমুলে না কি ?

মিতিল। না। তুমি ঘুমুচ্ছ ?

তিলতিল। না; ঘুমুব যদি ত কথা কচ্ছি কি করে ?

মিতিল। আজ না বড়দিন ?

তিলতিল। না, এখনও বড়দিন হয়নি; সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু ক্রীশ্‌মাস্ এ-বছর আমাদের জন্য কিছুই আনবেন না...

মিতিল। কেন ?

তিলতিল। আমি শুনেছি, মা বলছিল তিনি আসছে বছরে আসবেন...

মিতিল। আসছে বছরের কি এখনও ঢের দেরী আছে ?

তিলতিল। ঢের দেরী বৈকি ! তবে আজ রাত্রে তিনি শুধু বড়লোকদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের কাছে আসবেন...

মিতিল। সত্যি ?

তিলতিল। হ্যাঁ।...বা রে কি মজা !... মা আলোটা নিবিয়ে দিতে ভুলে গেছে !... আমি একটা ফন্দী বার করছি !

মিতিল। কি ফন্দী ?

তিলতিল। আমরা উঠে পড়ি এস...

মিতিল। না, না।

তিলতিল। কেন, কেউ ত আর দেখছে না—আশে-পাশে ত আর কেউ নেই...জানলা দেখতে পাচ্ছ ?

মিতিল। হ্যাঁ, বাঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে !

তিলতিল। ওই যে চক্‌চকে আলো জানলার ভিতর দিয়ে আসছে, ও সেই তাদের।

মিতিল। কাদের ?

তিলতিল। বড়লোকদের বাড়ীর... জানলা খুলে ফেলি, কি বল ?

মিতিল। আমরা কি খুলতে পারব ?

তিলতিল। আলবৎ পারব। এখানে

* মরিস মেটরলিঙ্ক রচিত Blue Bird নাটকের অনুবাদ।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কে আছে যে বাধা দেবে...গান শুনতে পাচ্ছ ?...এস, উঠে পড়ি...

দুইজনে উঠিয়া জানালার কাছে গেল এবং একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া জানালা খুলিয়া ফেলিল। উজ্জ্বল আলোকে ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল। বালক-বালিকা দুইটী মুগ্ধ নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিলতিল। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি !

মিতিল। (টুলের উপর দাঁড়াইবার একটুখানি জায়গাও সে পায় নাই) আমি পাচ্ছি না···

তিলতিল। বরফ পড়ছে !...দুখানা গাড়ী আসছে, তাতে ছ-ছটা করে ঘোড়া জোতা !

মিতিল। গাড়ীর ভিতর থেকে বারোটি ছোট্ট ছেলে বেরুল !

তিলতিল। তুমি ভারী বোকা !. .ওরা ছেলে নয়, মেয়ে ··সবগুলিই মেয়ে ··

মিতিল। চমৎকার সব পোষাক পরেছে...

তিলতিল। তুমি কিচ্ছু জান না... আহাহা, অমন করে ধাক্কা দিয়ো না···

মিতিল। আমি তোমায় ছুঁলুম কখন যে, ধাক্কা দেব ?

তিলতিল। (সমস্ত টুলখানি সে দখল করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল) তুমি সমস্ত জায়গাটাই যে দখল করেছ।

মিতিল। কৈ, আমি একটুও জায়গা পাচ্ছি না দাঁড়াতে··

তিলতিল। থাম, থাম ! ওই গাছ দেখতে পাচ্ছি !

মিতিল। কি গাছ ?

তিলতিল। কেন, ওই যে গাছে সব খেলনা আর খাবার ঝুলোনো রয়েছে !... তুমি দেওয়ালের পানে চেয়ে ও দেখছ কি ?

মিতিল। কি করব, আমি যে দাঁড়াবার মোটেই জায়গা পাচ্ছি না...

তিলতিল। (মিতিলকে সামান্য একটু জায়গা ছাড়িয়া দিল) ওই দেখ ! এবার হয়েছে ত ?...এবার তুমি আমার চেয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়িয়েছ...দেখ, কতগুলো আলো জেলে দিয়েছে !

মিতিল। ও লোকগুলো অত গোলমাল করছে কেন ?

তিলতিল। ওরা হল বাজন্‌দার।

মিতিল। ওরা কি রেগেছে ?

তিলতিল। না, রাগবে কেন ?··· বাজানো কাজটা সহজ নয় ত ! ওতে কসরৎ দরকার।

মিতিল। ওই আর একখানা গাড়ী এল ; এর ঘোড়াগুলো সব সাদা !

তিলতিল। চুপ, কথা কয়ো না !... চোখে শুধু দেখে যাও !

মিতিল। ওই সোনার মত জিনিষ-গুলো কি, বল ত ? ওই যে গাছের ডালে ঝুলছে ?

তিলতিল। ওগুলো ? ওঃ, ওগুলো খেলনা···নিশ্চয়। দেখচ না, ঐ সব তলোয়ার, বন্দুক, সেপাই···

মিতিল। আর পুতুল ? পুতুল আছে কি না বল ?

তিলতিল। হ্যাঁ,—পুতুল কি আবার একটা জিনিষ না কি ?···পুতুলে কোন মজা নেই...

মিতিল। আর টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে, ওগুলো কি ?···

তিলতিল। ও সব পিঠে, মাখন, ফল ··

মিতিল। আমি যখন খুব ছোট ছিলুম, তখন একবার পিঠে খেয়েছিলুম...

তিলতিল। আমিও খেয়েছিলুম... রুটীর চেয়ে ঢের ভাল খেতে, না ?

মিতিল। হ্যাঁ, অনেক পিঠে ওখানে রয়েছে ; ঐ যে। সমস্ত টেবিল একেবারে জোড়া...ওরা এখনি সবগুলো খাবে না কি ?

তিলতিল। নিশ্চয় ; তা নইলে কি করবে ?

মিতিল। একেবারে সবগুলো কেন খেয়ে ফেলছে না ?

তিলতিল। ওদের এখন তেমন খিদে পায়নি···

মিতিল। (অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া) খিদে পায়নি ?···সে কি...কেন পায়নি ?

তিলতিল। কেন আবার কি ? ওরা যে কেবলই খাচ্ছে। যখনই চায়, তখনই ওরা খেতে পায় কি না !

মিতিল। (অবিশ্বাসের সহিত) রোজই ওরা খেতে পায়, যখন যা চায় ?

তিলতিল। এই রকম ত শুনি···

মিতিল। সবগুলো ওরা খাবে ?··· একটুও দেবে না ?

তিলতিল। কাদের দেবে ?

মিতিল। কেন, আমাদের ?

তিলতিল। তা কেন দেবে ? ওরা ত আর আমাদের চেনে না...

মিতিল। যদি আমরা চাই ?

তিলতিল। না, ছিঃ, চাইতে আছে ? কখ্খনো চাইব না।

মিতিল। কেন ?

তিলতিল। চাওয়া ভাল নয়।

মিতিল। (হাততালি দিয়া) হাঃ, হাঃ, ওরা কি মজাই করছে !

তিলতিল। (উচ্ছ্বসিত হইয়া) ওরা হাসছে, কেবলই হাসছে !

মিতিল। আর ঐ ছোট্ট ছেলে-মেয়েগুলি নাচছে !

তিলতিল। হাঁ, এস, আমরাও নাচি। (আনন্দে পা নাড়িতে লাগিল)

মিতিল। বাহবা, কি মজা !

তিলতিল। ওই দেখ, ওরা সব পিঠে-গুলো নিচ্ছে !...ওই তুলছে !···ওই খাচ্ছে, ওই খাচ্ছে, ওই খাচ্ছে !

মিতিল। ছোট ছোট ছেলেগুলিও খাচ্ছে ! এক-একজনে দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা করে খাচ্ছে !

তিলতিল। (আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া) কি সুন্দর !

মিতিল। (কল্পিত পিষ্টক গণনা করিতে করিতে) আমি বারোটা পিঠে পেয়েছি !

তিলতিল। আমি তোমার চার গুণ বেশী পেয়েছি···তা থেকে তোমাকেও কিছু দেব...

(দরজায় কে ঘা দিল)

তিলতিল। (ভীত চকিত হইয়া চুপ করিল) কি ও ?

মিতিল। বাবা আসছে !

তাহারা ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ

হড়কো খুলিয়া দরজাটা অর্দ্ধেক ফাঁক হইয়া গেল এবং লাল রঙের টুপি ও সবুজ রঙের পোষাক-পরা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে ক্ষীণদৃষ্টি ও খঞ্জ এবং তাহার পিঠে একটা কুঁজ। তার নাক বঁড়শীর মত। সে কোমর নোয়াইয়া লাঠির উপর ভর দিয়া চলিতেছিল। চেহারা যেমনই হোক, সে একজন পরী।

পরী। তোমাদের এখানে কি এমন ঘাস আছে যা গান করে, কি এমন পাখী যার রঙ নীল?

তিলতিল। ঘাস এখানে অনেক রকম আছে, কিন্তু তারা গান ত কৈ করে না কখনো! ঘাসে আবার গান করবে কি?

মিতিল। তিলতিলের একটী পাখী আছে।

তিলতিল। সেটা কিন্তু আমি দিতে পারব না…

মিতিল। কেন?

তিলতিল। সে যে আমার পাখী।

পরী। তোমার পাখী? তা কোথায় সে পাখীটি?

তিলতিল। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ খাঁচার মধ্যে…

পরী। (পাখীটিকে ভালরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য চসমা চোখে দিলেন) এ পাখী আমি চাই না; এটা ত তেমন নীল নয়। দেখ, তোমায় এক কাজ করতে হবে। আমি যে রকম পাখী চাই, ঠিক সেই রকমটি খুঁজে আনবার জন্য তোমায় যেতে হবে।

তিলতিল। কিন্তু সে পাখী কোথায় আছে, আমি ত তা জানি না…

পরী। আমিও জানি না। আর সেইজন্যই ত তোমায় যেতে হবে। যে ঘাস গান করে তা না হলেও আমার চলতে পারে—যদিও সে জন্য অনেক কষ্ট পেতে হবে; কিন্তু এই নীল পাখীটি আমার চাই-ই। আমার ছোট মেয়েটির জন্য দরকার। তার বড্ড অসুখ কি না!

তিলতিল। তার কি অসুখ?

পরী। আসল অসুখ যে কি, তা ঠিক জানি না। তবে সে খুসী হতে চায়…

তিলতিল। সত্যি?

পরী। আমাকে চেনো তোমরা?

তিলতিল। আমাদের পাড়ায় ঐ যে বারলিংগট আছে, তোমায় দেখতে তার মত…

পরী। (হঠাৎ ক্ষুদ্র হইয়া) কখ্খনো না!…তার চেহারার সঙ্গে আমার একটুও মিল নেই!…এমন কথা বল! এ অসহ্য!…আমি কে, জানো?…আমি হচ্ছি পরী বেরীলুন…

তিলতিল। সত্যি? তা—

পরী। শোন্, তোমাকে এখনি যেতে হবে।

তিলতিল। তুমিও সঙ্গে যাবে ত?

পরী। না, আমার যাওয়া হতে পারে না …তোমাকে একলা যেতে হবে। আমার হাতে গেরস্থালীর অনেক কাজ। দেখ, তুমি কোন্ পথে যাবে, বল দেখি—ছাদের পাশ দিয়ে, না, চিমনির ভিতর দিয়ে, না জানলা দিয়ে?

তিলতিল। (সভয়ে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) আমি ঐ দরজা খুলে যাব…

পরী। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) না, না, তা কি হয় কখনো? সে যে অসম্ভব! আবার মুখ নীচু করে দাঁড়ালে! যাবে না? তোমাদের কি বদ স্বভাব!…আচ্ছা, তবে ঐ জানলা দিয়েই যাও। কেমন…আর দেরী করছ কেন?…শীগ্‌গির্ সাজ-গোজ করে নাও…

(তিলতিল ও মিতিল তাড়াতাড়ি পোষাক পরিতে লাগিল)

তিলতিল। আমাদের জুতো নেই…

পরী। তাতে কিছু এসে যায় না। আমি তোমাকে একটি ছোট টুপি দেব। আচ্ছা, তোমাদের বাবা আর মা কোথায়?

তিলতিল। তাঁরা ওই যে ঘরে ঘুমোচ্ছেন…

পরী। আর তোমাদের ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুমা?

তিলতিল। তাঁরা মরে গেছেন…

পরী। আর সব ভাই-বোনেরা কোথায়?…কটী ভাই-বোন তোমারা?

তিলতিল। তিনটী ছোট ভাই…

মিতিল। আর চারটী ছোট বোন…

পরী। তারা সব কোথায়?

তিলতিল। তারাও সব মরে গেছে…

পরী। তাদের সবাইকে তোমাদের দেখতে ইচ্ছা হয়?

তিলতিল। তা আর হয় না? খুব ইচ্ছা হয়!…কোথায় তারা, এখনি দেখাও!

পরী। আমি কি তাদের সঙ্গে করে এনেছি যে এখনি দেখাব?…তবে দেখতে পাবে—শীগ্‌গিরই তাদের দেখবে। যখন স্মৃতির দেশের ভিতর দিয়ে ঐ নীল পাখীর সন্ধানে তোমরা যাবে, তখন তাদের সকলেরই দেখা পাবে…আচ্ছা, আমি যখন দরজায় ঘা মারি, তখন তোমরা কি কচ্ছিলে?

তিলতিল। আমরা দু'জনে পিঠে খাওয়া খেলা করছিলুম…

পরী। তোমাদের কাছে পিঠে আছে? …কৈ, দেখি?

তিলতিল। ওই যে ওখানে বড়লোকদের ছেলেদের কাছে আছে…দেখবে?…ঐ দেখ …কি চমৎকার!… (পরীকে দরজার কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া দেখাইল)

পরী। (জানালার কাছে দাঁড়াইয়া) যারা খাচ্ছে তারা ত সব অপর লোক!

তিলতিল। হ্যাঁ, ওরা খাচ্ছে, আর আমরা দেখছি…

পরী। ওদের উপর রাগ হচ্ছে না?

তিলতিল। রাগ হবে কেন?

পরী। সব পিঠেগুলোই ওরা খেয়ে ফেল্লে, তোমাদের একখানাও দিলে না! এ ওদের ভারী অন্যায়!

তিলতিল। অন্যায় মোটেই না… আমাদের কেন দেবে! বাঃ! ওরা যে খুব বড়লোক…আচ্ছা, ঐ জায়গাটা খুব চমৎকার দেখাচ্ছে না?

পরী। আমাদের এখানকার চেয়ে ওদের ওই জায়গাটা যে বেশী চমৎকার, তা নয়।

তিলতিল। ইস্! এখানটা ত অন্ধকার, একরত্তি, আর এখানে একখানাও পিঠে নেই…

পরী। ও জায়গাটা যেমন, এখানটাও

ঠিক তেমনি; কেবল তোমরা দেখতে পাচ্ছ না...

তিলতিল। কেন, আমি ত বেশ দেখতে পাচ্ছি; আমার চোখ খুব ভাল। আমি ঐ দূরের গির্জ্জার ঘড়ি দেখতে পাই... বাবা পায় না...

পরী। (হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি বলছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ না!...আমায় দেখছ ত?...বল ত আমি কি রকম দেখতে?...(তিলতিল চুপ করিয়া রহিল) বল, জবাব দাও। আমি জানতে চাই, তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ কি না? আমি দেখতে সুন্দর, না, বিশ্রী?...জবাব দিচ্ছ না যে?...বলি, আমি কি দেখতে বুড়ী?...তুমি হয়ত বলে বসবে যে, আমার পিঠে একটা মস্ত কুঁজ আছে...বল, বল—

তিলতিল। না, বেশী ত বড় নয়!

পরী। হাঁ গো হাঁ; তোমার মত সকলেই এটাকে মস্ত বড় দেখবে...আচ্ছা, আমার নাকটা কি খুব উঁচু, আর আমার একটা চোখ কি নেই?

তিলতিল। না, না, আমি তা বলছি না...কিন্তু চোখটা কি করে গেল?

পরী। (অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া) ওরে, হতভাগা ছেলে, চোখটা আমার নেই, কে বললে?...দেখছ না, এটা কত বড়; কেমন জ্বল্ জ্বল্ করছে... আকাশের রঙের চেয়েও বেশী নীল... আচ্ছা, আমার চুলগুলি কেমন সুন্দর, নয় কি, বল দেখি!...কেমন ঘন আর নরম ...এক গোছা আমার হাতে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কি?

তিলতিল। দেখতে পাচ্ছি বৈ কি! খুব পাতলা...

পরী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) কি! পাতলা? ...এমন ঘন ঘন সোনালি চুল...দেখছি, তুমি আসল জিনিষ কিছুই দেখতে পাও না!.. আমি জানি, এমন অনেক মানুষ আছে, যারা চোখ থেকেও অন্ধ, কিছু দেখতে পায় না। সুখের বিষয়, আমি সর্ব্বদা এমন সব জিনিষ সঙ্গে রাখি, যাতে নজর খোলে আর সব জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায়...আচ্ছা, আমি থলির ভিতর থেকে কি বার করছি, বল ত...

তিলতিল। বাঃ, বেশ চমৎকার সবুজ টুপি ত! আচ্ছা, ওতে ফিতে বাঁধা ওটা ও কি জ্বলছে?

পরী। ও হল এক টুকরো বড় হীরে। এইটে চোখে দিলে মানুষ ভাল দেখতে পায়...

তিলতিল। সত্যি?

পরী। হ্যাঁ, সত্যি। টুপিটী মাথায় পরে হীরেটীকে একটুখানি ঘুরিয়ে দাও; বাঁ দিক থেকে ডান দিকে—এই এমনি করে—বুঝতে পারছ? তার পরই একটা পট্‌কার মত আওয়াজ হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখ্ খুলে যাবে।

তিলতিল। আওয়াজ হবে! লাগবে না ত?

পরী। না; কেউ সে আওয়াজ শুনতেও পাবে না। আর চারিদিক অমনি বদলে যাবে, দেখবে। প্রত্যেক জিনিষের ভিতর পর্য্যন্ত দেখতে পাবে। রুটী, চিনি—এদেরও সব প্রাণ আছে, দেখবে।

তিলতিল। রুটীর প্রাণ আছে? যে রুটী আমরা খাই? আর তা চোখে দেখা যাবে?

পরী। (রুক্ষ হইয়া) নিশ্চয়! দেখ, আমি বাজে কথার লোক নই। মিথ্যাও বলি না। আমার কাছে যা ছিল, সব তোমায় দিলুম। তুমি নীল পাখীর সন্ধানে যাচ্ছ, এ সব জিনিষ তোমার খুব কাজে লাগবে। তবে উড়ন্ত আসন, আর আংটী—সে আংটি হাতে দিলে একেবারে অদৃশ্য হওয়া যায় —এ দুটি তোমাদের দিতে পারলে আরও ভাল হত, কিন্তু যে বাক্সে সেগুলি আছে, তার চাবি হারিয়ে গেছে। ওহো, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি। (হীরক খণ্ডের প্রতি দেখাইয়া) দেখ, এইটী যখন পরে থাকবে, তখন এই দিকে একবার ঘুরুলেই সমস্ত অতীত দেখতে পাবে—আরও একটু এমনি ভাবে ঘুরুলে ভবিষ্যৎ নজরে পড়বে। এটী ভারী আশ্চর্য্য জিনিস।

তিলতিল। বাবা কিন্তু এটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে।

পরী। তিনি দেখতে পাবেন না; যতক্ষণ তোমার মাথায় ঐ টুপি আছে, ততক্ষণ কেউ তোমায় দেখতে পাবে না। আচ্ছা, একবার পরখ কর ত। (ছোট সবুজ টুপিটী তিলতিলের মাথায় পরাইয়া দিলেন) এইবার হীরেটী ঘুরিয়ে দাও, আর-একটু!—ব্যস্!

তিলতিল হীরকটী ঘুরাইবামাত্র প্রত্যেক জিনিষ অদ্ভুত রকমে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বৃদ্ধা পরী তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব সুন্দরী হইয়া উঠিল। গৃহ-দেওয়ালের অপরিষ্কার প্রস্তরগুলি মণি-মাণিক্যের ন্যায় ঝলমল করিতে লাগিল। গৃহের সামান্য আসবাবপত্র সজীব হইয়া উঠিল। দেওয়ালের গায়ে ঘড়ির মুখটা চোখ্ মেলিয়া হাসিতে লাগিল, এবং দোলকের দরজা খুলিয়া 'সময়ে'র এক-একটী ঘণ্টা শরীর ধারণ করিয়া একে একে বাহিরে আসিতে লাগিল ও পরস্পরের হাত-ধরাধরি করিয়া সকলে তালে তালে নাচিতে সুরু করিল।

তিলতিল। (হতভম্ব হইয়া ঘণ্টাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ সুন্দর মেয়েগুলি কারা?

পরী। ভয় পেয়ো না; ওরা হল তোমাদের জীবনের এক-একটী ঘণ্টা। ওরা ছাড়া পেয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে তোমাদের দৃষ্টি-পথে আসতে পেরেছে, এইতে ভারী খুসী হয়েছে।

তিলতিল। দেওয়াল এমন চকচকে হল কেন? দেওয়ালটা চিনির তৈরী, না, পাথরের?

পরী। সব পাথরই সমান, আর সব পাথরেরই দাম আছে, কিন্তু মানুষ এ-সব ত আর খালি চোখে ঠিকটি দেখতে পায় না।

যে সময় ইহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময় গৃহের মধ্যে অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল। পাঁউরুটীগুলা ছোট ছোট মানুষের আকার ধারণ করিয়া, আঁটা-সাটা পোষাক পরিয়া হামাগুড়ি দিয়া কড়াই হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল এবং টেবিলের উপর নর্ত্তন-কুর্দ্দন আরম্ভ করিয়া দিল। ইতিমধ্যে 'আগুন' হলদে এবং সিঁদুরে রঙের পোষাক পরিয়া রুটীগুলার উপর আসিয়া পড়িল এবং আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাদের পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল।

তিলতিল। এই সব বিশ্রী ছোট্ট মানুষগুলি কারা?

পরী। ওরা? ওরা হল সব রুটীর আত্মা। এতদিন কড়ায়ের ভেতর খুব শক্ত ভাবে আটকে ছিল, এখন স্বাধীন হবার সুবিধে পেয়ে কড়াই থেকে বাইরে আসছে।

তিলতিল। আর ওই লাল রঙের লম্বা লোকটা? ওর গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ, মাগো!

পরী। চুপ, চুপ! অত চেঁচিয়ো না; ও হল আগুন, বড় ভয়ানক লোক।

এই সকল কথোপকথনের মধ্যেও কিন্তু ইন্দ্রজালের বিরাম ছিল না। কুকুর এবং বিড়ালটা এতক্ষণ বাসনের টেবিলের নীচে খাঁচার মধ্যে চুপ করিয়া শুইয়াছিল; হঠাৎ ইহারা চীৎকার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ইহাদের পরিবর্ত্তে দুইজন লোককে দেখা গেল। ইহাদের একজনের মুখ কুকুরের মত এবং অপরের মুখ বিড়ালের মত। কুকুরমুখো লোকটা (ইহাকে আমরা অতঃপর কেবল 'কুকুর' বলিয়াই অভিহিত করিব) আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিলতিলের কাছে ছুটিয়া আসিল ও তাহাকে চুম্বন করিয়া নানা প্রকার সোহাগ জানাইতে লাগিল। কিন্তু বিড়াল-মুখো লোকটা (ইহাকে আমরা অতঃপর 'বিড়াল' নামেই অভিহিত করিব) সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না। সে আপন মনে চুল আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে মিতিলের কাছে গেল।

কুকুর। (আনন্দে লাফালাফি করিতে করিতে) আমার প্রিয় দেবতা, তোমায় নমস্কার! আমার আরাধ্য, আমার প্রিয়তম, তোমায় নমস্কার! কি সৌভাগ্য! এতদিনে আমরা মন খুলে কথা কইতে পারব! আমার কত কথা আছে তোমায় বলবার! আমি এতদিন শুধু ল্যাজ নেড়ে চীৎকার করে আমার মনের ভাব তোমায় জানিয়েছি, কিন্তু তুমি কিছুই বোঝ নি! আর আজ! আঃ, কি আনন্দ! প্রিয়তম, তোমায় আবার নমস্কার! আমি যে তোমায় কত ভালবাসি! তুমি কি এখন আমার দু-একটা খেলা দেখতে চাও? আমি কি পেছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে নাচব, না, সামনের পায়ের উপর ভর দিয়ে ডিগ্‌বাজি খাব?

তিলতিল। (বিস্মিত হইয়া পরীর প্রতি) এই ভদ্রলোকটী কে?

পরী। দেখতে পাচ্ছ না? এ তোমার প্রিয়তম কুকুর টাইলোর আত্মা; একে তুমি মুক্ত করে দিয়েছ।

বিড়াল। (মিতিলের নিকট গিয়া তাহার হাত দুটী ধরিয়া অতিশয় আড়ম্বর ও কায়দার সহিত) নমস্কার, কুমারি! আজ তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে।

মিতিল। নমস্কার মশায়! (পরীর প্রতি) এ কে?

পরী। দেখছ না? তোমার প্রিয় বিড়াল টাইলেট তোমাকে অভ্যর্থনা করছে! যাও, ওর মুখে চুমু খাও।

কুকুর। আমায় শুদ্ধ! আমি আমার প্রিয়দেবতাকে চুম্বন করেছি। হাঃ হাঃ, আজ কি মজা! টাইলেটকে ভয় দেখাব, ওকে জব্দ করব! ভ্যৌ-ঔ, ভ্যৌ-ঔ, ভ্যৌ-ঔ!

পরী। (ছড়ি উঠাইয়া কুকুরকে শাসাইলেন) খবরদার! চুপ কর; তা নইলে তোমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্মে আর খুলবে না।

ঘরের কোণে চরকাটা বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল এবং উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি লইয়া সূতা কাটিতে লাগিল। আর এক কোণে জলের নলটা হঠাৎ উঁচু সুরে গান ধরিয়া দিল। নলের মুখ হইতে বিচিত্র ধারায় নির্ঝরিণী বাহির হইয়া চারিদিকে মণি-মুক্তা ছড়াইতে লাগিল এবং ইহার মধ্য হইতে জলের আত্মা আলুলায়িত কেশে, সিক্ত বসনে বাহির হইয়া আসিল। ইহার চক্ষু দুইটী

অশ্রুভারাক্রান্ত। সে তৎক্ষণাৎ আগুনের সহিত লড়াই বাধাইয়া দিল।

তিলতিল। কে এই মেয়েমানুষটী?

পরী। ভয় নেই। এ হল জলের আত্মা···এই মাত্র নলের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

টেবিলের উপর হইতে হঠাৎ আলোকদানটা পড়িয়া গিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই মুহূর্ত্তে গৃহমধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর আবির্ভাব হইল। তাহার বেশভূষা চাকচিক্যময়। উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ আবরণে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত; সে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া রহিল।

তিলতিল। ইনিই হলেন রাণী!

মিতিল। আহা, যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

পরী। না, ইনি আলো!

ইতিমধ্যে দরজায় কে তিনবার ঘা মারিল।

তিলতিল। (সভয়ে) ওই যা...বাবা আসছে, সব টের পেয়েছে!

পরী। হীরেটা ঘুরিয়ে ফেলো...বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে...শীগ্‌গির!

তিলতিল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হীরকখণ্ডটী ঘুরাইয়া দিল।

পরী। না, না, অমন করে নয়!... কি সর্ব্বনাশ!···সব মাটী!...তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি করে ফেল্লে। এরা সব এখন ত আর সময় পাবে না আগেকার জায়গায় ফিরে যেতে। এখন দেখছি, আমাদের বিস্তর অসুবিধা ভোগ করতে হবে···

পরী পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধা হইয়া গেল। দেওয়ালটা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি সাধারণ আকার ধারণ করিল। ঘণ্টাগুলি একে একে ঘড়ির মধ্যে ফিরিয়া গেল। চরকা বন্ধ হইয়া গেল। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ আদিম অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু 'আগুন' বেচারী ঘরের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়াও নিজের চিমনি খুঁজিয়া পাইল না। আর একখানা 'রুটী' তাড়াতাড়ি নিজস্থান অধিকার করিতে গিয়া ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গেল সে তখন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরী। কাঁদছ কেন?...কি হয়েছে তোমার?

রুটী। আমি নিজের জায়গায় যেতে পারি-নি!

কুকুর। (সোল্লাসে) প্রিয়দেবতা, আমিও এখানে আছি!···এখনও আমি কথা কইতে পারছি!

পরী। কি সর্ব্বনাশ!···তুমিও আছ?

কুকুর। নিজের জায়গায় ফিরে যেতে দেরী হয়ে গেল। আমাদের খাঁচার দরজা বড্ড তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

বিড়াল। আমারও সেই দশা! কিন্তু এখন উপায় কি?...কোন বিপদ হবে না ত?

পরী। তা হলে এবার সত্যি কথাটাই বলতে হল। দেখ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তিলতিল আর মিতিলের সঙ্গে নীল পাখীর সন্ধানে যাবে, রাস্তা ফুরিয়ে গেলেই কিন্তু তাকে প্রাণ হারাতে হবে।

বিড়াল। (কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া) চল হে, আমরা খাঁচার মধ্যে গিয়ে ঢুকি...

কুকুর। না, না; আমি ওখানে আর যাব না!···আমি আমার প্রিয়তমের সঙ্গে থাকব!...তা হলে আমি সর্ব্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পাব!

বিড়াল। আহাম্মক কোথাকার!

দরজায় পুনঃ পুনঃ ঘা পড়িতে লাগিল।

রুটী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি

মরতে পারব না!···আমি কড়াই-এর মধ্যে ফিরে যাব···সেখানে ঠাসাঠাসি করে থাকি সেও ভাল...

আগুন। (এতক্ষণ পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া রাগে গস্ গস্ করিতেছিল) আমি আমার চিমনি খুঁজে পাচ্ছি না!

জল। (নলের ভিতর প্রবেশ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল) আমি যে নলের ভেতর ঢুকতে পারছি না!

পরী। এরা সব কি মূর্খ!...যেমন মূর্খ, তেমনি ভীরু!···দেখ সকলে···তা হলে তোমরা জঘন্য খাঁচার মধ্যে, বাক্সের মধ্যে, নলের মধ্যে থাকতে চাও! অথচ এই দুটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নীল পাখীর সন্ধানে যেতে রাজী নও?

সকলে। (কুকুর এবং আলো ব্যতীত) না, না; আমরা কেউ যাব না...আমরা আমাদের সাবেক জায়গায় ফিরে যেতে চাই!

পরী। (আলোর প্রতি) আর আলো!···তুমি কি বল?

আলো। আমি এঁদের দুজনেরই সঙ্গে যাব···

কুকুর। (আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া) আমিও···আমিও যাব!

পরী। বেশ কথা...তা ছাড়া এখন খুব দেরী হয়ে গেছে...তোমাদের সাবেক জায়গায় ফিরে যাবার পথও বন্ধ; ...কাজেই তোমাদের সকলকে এদের সঙ্গে যেতে হবে...কিন্তু আগুন, তুমি সাবধান, কারো কাছে ঘেঁসে এসো না। কুকুর, তুমি বিড়ালটাকে বিরক্ত করো না। আর জল, তুমি নিজেকে একটু ঠাণ্ডা-মেজাজে রেখো।···যে-সে জায়গার উপর দিয়ে যেন দৌড় দিয়ো না···

এবার দরজায় খুব জোরে ধাক্কা পড়িতে লাগিল।

তিলতিল। বাবা আবার উঠেছে! এবার নিশ্চয় আসছে; হ্যাঁ, ঐ যে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

পরী। চল, আমরা জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তোমাদের সকলকেই আমার বাড়ীতে আগে যেতে হবে; কেন না, জানোয়ারগুলিকে আর জিনিষগুলিকে বেশ ভাল সাজ-গোজ পরাতে হবে ত। (রুটীর প্রতি) রুটী, তুমি খাঁচাটা নাও; এর ভিতরেই নীল পাখীকে রাখতে হবে। এটা তোমারই জিম্মায় রইল। নাও, শীগ্‌গির নাও; আর সময় নষ্ট করা যায় না।

হঠাৎ জানালাটা খুলিয়া গেল—তখন সকলে বাহির হইয়া পড়িল। জানালা আপনা-আপনি পূর্ব্বের ন্যায় আবার রুদ্ধ হইল। ঘর আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তিলতিল ও মিতিলের বিছানায় দুইটা ছায়া ঘনীভূত হইয়া রহিল। ডান দিকের দরজা খুলিয়া তিলতিলের মাতা ও পিতা ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইলেন।

পিতা। না, কিছু না—শুধু ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো কিচ্‌মিচ্‌ করছে।

মাতা। তিলতিল আর মিতিলকে দেখতে পাচ্ছি না ত!

পিতা। বাঃ, ওই যে ওরা অসাড়ে ঘুমুচ্ছে।

মাতা। হ্যাঁ, নিশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি!

দরজা পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

বংশানুক্রমের গোড়ার কথা

পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে * বলিয়াছি যে, পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের গুণাবলী সন্তানে সংক্রামিত হয়। কেবল যে দৈহিক গুণই সংক্রামিত হয়, তাহা নহে, মানসিক গুণও সংক্রামিত হয়। যে নিয়মে পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী এইরূপে সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাহাকেই বলে বংশানুক্রম (Heredity)। এখন আমরা একটু তলাইয়া এই বংশানুক্রমের মূলরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মোটামুটি এ কথা বলা হইয়াছে যে, দুইটি পিতৃমাতৃকোষের সহযোগে একটি মূলকোষের উৎপত্তি হয়, আর ঐ মূলকোষই গর্ভস্থ ভ্রূণের আদি। পিতৃকোষে (sperm-cell) পিতার দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী নিহিত থাকে;—আর মাতৃকোষে (Ovum) মাতার গুণাবলী নিহিত থাকে;—এবং মূলকোষে (Stem-cell) এই উভয়প্রকার গুণাবলীই একত্র সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলনের ফলে সন্তানের মধ্যে কি-ভাবে পিতা মাতার গুণ প্রকাশ পায়, তাহা বিশেষ ভাবে এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। পিতৃমাতৃকোষের মধ্যে কোথায় এই গুণাবলীর মূল-আশ্রয় ও কি উপায়ে তাহারা নূতন জীবের দেহে সংক্রামিত হয়, সেই সব কথা বলাই আজ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে cell বা জীবকোষের গঠন-প্রণালী আলোচনা করা যাক্। অধিকাংশ জীবের মধ্যে cell দুই প্রকারের। পুংকোষ (sperm-cell) ও স্ত্রী-কোষ (Ovum)। এই স্ত্রী-কোষ প্রথমাবস্থায় সাধারণত গোলাকার থাকে। ইহার প্রাণময় অংশকে (active constituents) দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১)—ক্ষুদ্রতর ও অন্তরতর অংশ,—ইহাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস্ (nucleus) বা কেন্দ্রাংশ; (২) বৃহত্তর বাহিরের অংশ, যাহা নিউক্লিয়াসকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহাকে বলা হয় বাহ্যাংশ cell-body বা cylosoma,। এই উভয় অংশই যে কোমল প্রাণময় বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার রাসায়নিক গঠন অতীব বিচিত্র। সেই প্রাণময় বস্তুকেই বলা হয় জীববস্তু (Protoplasm)। জীবকোষে এই জীববস্তু ছাড়া আর এক-প্রকারের নিষ্ক্রিয় বস্তু (passive portion) থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত পরে তৈরী হয়। কোষের নানারূপ পর্দ্দা ও ভিতরকার রস প্রভৃতি এই নিষ্ক্রিয় বস্তু দ্বারা গঠিত। বলা বাহুল্য জীববস্তুই (Protoplasm) প্রাণের মূল ও তাহাই জীবদেহকে গঠন করে ও জীবনের নানা বিচিত্র কর্ম্মকে চালাইয়া থাকে।

পুংকোষ স্ত্রীকোষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ ইহা লাঙ্গুলবিশিষ্ট লম্বা রকমের, মুণ্ডটা ঈষৎ সূঁচল। ইহার আয়তন স্ত্রী-কোষের

* বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ,—ভারতী, ১৩২৩

তুলনায় যার-পর-নাই ক্ষুদ্র। পূর্ব্বে ইহাকে cell বলা হইত না। কিন্তু অধুনা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা আসলে cell ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার সূঁচল মুণ্ডভাগেই অতি ক্ষুদ্র Nucleus বা কেন্দ্রাংশ আছে ও তাহার চারি দিকে cell-body বা বাহ্যাংশও আছে।

এখন কেন্দ্রাংশ ও বাহ্যাংশ জীব-কোষের এই দুই অংশের মধ্যে কোনটী বংশানুক্রমের মূল আশ্রয়স্থান? কেন্দ্রাংশ না বাহ্যাংশ? আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কেন্দ্রাংশই বংশানুক্রমের মূলআশ্রয়। গর্ভাধানের সময় পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রাংশ মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায়।

কিন্তু শুধু এইটুকু বলিয়াই থামিয়া থাকা যায় না। জীবকোষের এই কেন্দ্রাংশের মধ্যে আবার কি আছে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে কেন্দ্রাংশের মধ্যে আবার জালের মত তন্তুময় একপ্রকার পদার্থ আছে; তাহা কয়েকটী বিশিষ্ট বর্ণ দ্বারা বেশ রঞ্জিত হইতে পারে। এই জালের মত পদার্থকে বলে chromatin। খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ দিয়া এই chromatinকে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার পদার্থ আছে। তাহাকে বলা হইয়াছে chromosomes। 'ক্রমোসোম' সম্বন্ধে একটী প্রধান ব্যাপার এই জানা গিয়াছে যে, এক-একটী বিশিষ্ট জীববর্গের (species) অন্তর্গত সমস্ত প্রাণীর দেহস্থ জীবকোষে ইহাদের সংখ্যা সমান। হাঙ্গরের জীবকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৩৬; একজাতীয় ইঁদুরের মধ্যে ২৪; ষাঁড়, গিনিপিগ, শূকর ও মানুষের মধ্যে ১৬ ইত্যাদি। আবার আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ গর্ভাধানে একত্র মিলিত হয়, তাহাদের মধ্যে এই 'ক্রমোসোমের' সংখ্যা দেহস্থ অন্য সাধারণ কোষের (Body-cell বা somatic cell) 'ক্রোমোসোমের' সংখ্যার অর্দ্ধেক দেখা যায়। পিতৃমাতৃ-কোষ যখন পরস্পর মিলিয়া মূলকোষে পরিণত হয়, তখন তাহাদের মধ্যস্থ ক্রোমোসোমও পরস্পর মিলিয়া যায় ও দ্বিগুণ হয়; আর এইরূপে দেহস্থ অন্য সাধারণ কোষগুলির 'ক্রোমোসোমের' সংখ্যার সঙ্গে তাহাদের সংখ্যা সমান হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতামাতার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে সকল পুংকোষ বা স্ত্রীকোষ সঞ্চিত হয়, তাহাদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা নিশ্চয়ই কোন একসময়ে কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যায় ও গর্ভাধানের সময় ঐ দুইয়ে মিলিয়া দ্বিগুণিত হইয়া, আবার স্বাভাবিক সংখ্যায় দাঁড়ায়।

এই সকল আবিষ্কারের ফল আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা আজকাল বলিতেছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে ঐ 'ক্রোমোসোম'-গুলিই প্রধানতঃ বংশানুক্রমের মূল আশ্রয়স্থান। বংশানুক্রমিক গুণগুলি উহারাই বহন করে ও জীবদেহের মধ্যে বিকাশ করিয়া তোলে।

এখন অনেকটা বুঝা গেল যে, প্রধানতঃ 'ক্রোমোসোম'-গুলিই বংশানুক্রমের মূল আশ্রয়স্থান। কিন্তু কিরূপে পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের দৈহিক ও মানসিক গুণ পিতৃমাতৃকোষের মধ্যে—বিশেষ করিয়া

ক্রোমোসোমের মধ্যে—সঞ্চিত হয়, কি করিয়াই বা তাহারা ঐগুলি বহন করে এবং কি উপায়েই বা তাহারা এক জীব-দেহ হইতে অন্য নূতন জীবদেহে সেগুলি সংক্রামিত করিয়া দেয়? এই রহস্যময় ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু না জানিতে পারিলে মনের তৃপ্তি হয় না। কিন্তু জীবদেহের এই নিগূঢ় রহস্যটী প্রকৃতি এ-পর্য্যন্ত এমনই সংগোপনে রাখিয়াছেন যে, সে-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই বলিলেই হয়। তবে প্রতিভাশালী পণ্ডিতেরা এ-সম্বন্ধে নানা অনুমান করিতে ছাড়েন নাই। তাহাদের মধ্যে প্রধান দুই-একটীর পরিচয় দিলে বোধ হয় মনের ক্ষুধা কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে।

পণ্ডিতপ্রবর স্পেন্সার জীবদেহের মধ্যে একপ্রকার 'দৈহিক অণুর' (physiological units) কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন এই 'দৈহিক অণু'গুলি দেহের রাসায়নিক অণু (chemical units) ও জীবকোষের মাঝামাঝি রকমের। ইহারা শরীরের সকল অঙ্গের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে এবং নানাপ্রকার গুণের বীজ ইহারাই বহন করিতেছে। এক-একটী অঙ্গ যে বিশিষ্টভাবে গড়িয়া উঠে, এই সকল 'দৈহিক অণু'র গঠন-বৈচিত্র্য ও মিলন-বৈচিত্র্যই তাহার কারণ। ইহারাই সকলে মিলিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির আকৃতি-প্রকৃতি ঠিক করিয়া দেয়। আবার, ইহারা সকলে মিলিয়া যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপর প্রভাব বিস্তার করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও আবার ইহাদের উপর সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

জীবদেহের পরিণতির সময়ে এই সকল 'দৈহিক অণুর'ই কতকগুলি যাইয়া পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। নূতন জীবগঠনের সময়ে Stem-cell বা মূলকোষের মধ্যে ইহারা সংক্রামিত হয়। সেখানে নূতন জীবের বিকাশের পক্ষে ইহারা সাহায্য করিতে থাকে ও তাহার মধ্যে তাহার সাধারণ ও বিশিষ্ট গুণাবলী ফুটাইয়া তোলে।

স্পেন্সারের মতে কেবল যে জীবের প্রকৃতিগত গুণই ইহারা বহন করে তাহা নহে; কর্ম্মগত পরিবর্ত্তনাদিও (modifications) ইহারা এইরূপে দেহ হইতে দেহান্তরে বহন করে। কর্ম্মের ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্ত্তন হয়, আর সেই পরিবর্ত্তনের ফল 'দৈহিক অণু'গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে; দৈহিক অণুগুলি আবার নূতন জীবদেহে সেই প্রভাবের ফল সংক্রামিত করিয়া দেয়।

মনস্বী ডারুইন প্রায় ইহারই অনুরূপ এক মত প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে স্পেন্সারের physiological unitsএর স্থানে তিনি gemmules নামে আর একরকম বস্তুর কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

(১) জীবদেহের প্রত্যেক কোষ—একপ্রকার gemmules বা 'বীজ' নিক্ষেপ করে। gemmulesগুলি ঐ কোষের বিশিষ্ট গুণ বা লক্ষণগুলি বহন করিয়া থাকে।

(২) এই সকল gemmules খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু নিজেদের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হারায় না।

(৩) জীবদেহের জননেন্দ্রিয় স্থলেই এই gemmulesগুলি বিশেষরূপে সঞ্চিত হইতে থাকে ও তাহা হইতে নূতন জীব-দেহে সংক্রামিত হয়।

(৪) জীববিকাশের সময় gemmules-গুলি পরস্পর-মিলিত হইয়া তাহাদের আদি কোষের (যে কোষ হইতে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে) অনুরূপ কোষ গঠন করিয়া তোলে, কখন বা অজ্ঞাত কারণ বশতঃ লুপ্ত অবস্থায়ও থাকিয়া যায়। এই রূপে পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে গুণের সাদৃশ্য বা পার্থক্য—এককথায় বংশানুক্রমের রহস্যময় ব্যাপার—এই সকল gemmulesদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

স্পেন্সার ও ডারুইনের এই সকল অনুমান আধুনিক জীবতত্ত্ববিৎগণ মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন। কেননা,—তাঁহারা 'দৈহিক অণু' ও gemmulesদের উপর এত-বেশী ক্ষমতা চাপাইয়া দিয়াছেন, যে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিসমান (Weisman) একটী নূতন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সেই মতের নাম Theory of Germinal Continuity। তিনি বলেন, জীবদেহের যে মূলবস্তু—যাহার মধ্য দিয়া সমস্ত দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়,—তাহার নাম দেওয়া যায় —Germ-plasm বা প্রাণবস্তু। Germ-cell বা জীবকোষের মধ্যে এই প্রাণবস্তু থাকে। নূতন জীবদেহ পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মধ্যস্থ এই প্রাণবস্তু হইতেই গঠিত হয়। কিন্তু সমস্ত প্রাণবস্তুটাই সাধারণ দৈহিক গঠন-ব্যাপারে নিঃশেষে ব্যয়িত হয় না। কতকটা জননেন্দ্রিয় স্থলে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মধ্যে যাইয়া সঞ্চিত থাকে ও পুনর্ব্বার নবজীবদেহ গঠনের সময় কাজে লাগে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে এই 'আদিভূত' প্রাণবস্তু হইতে নব নব জীবের বিকাশ হইতেছে, কিন্তু আসল জিনিষটা একেবারে খরচ হইতেছে না;—কিছু পরিমাণে বরাবর সঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহার ফলে কেবল যে পিতামাতার গুণই তাহাদের অব্যবহিত সন্তানে সংক্রামিত হইতেছে তাহা নহে, বহু বহু পূর্ব্বপুরুষদের গুণ ধারাবাহিক ভাবে সৃষ্টির আদিকাল হইতে প্রাণবস্তুর সহযোগে অধস্তন পুরুষদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহারই নাম Germinal Continuity বা প্রাণবস্তুর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ('অবিচ্ছিন্ন প্রাণের ধারা')।

এই প্রাণবস্তুর মূল আশ্রয়স্থান জীবকোষের কেন্দ্রাংশ; আরও বিশেষ-ভাবে Chromatin; তাহা হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে বলিতে গেলে Chromosomes। বিসমান আরও একটু সূক্ষ্মতর কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন যে এই ক্রমোসোমের মধ্যে আবার সূক্ষ্মতর Ids বা Idants আছে। তাহারা প্রত্যেকটী স্বসম্পূর্ণ—জীবদেহের যাবতীয় গুণের কেন্দ্রস্থল তাহাদের ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজস্বরূপ। নবজীব-গঠনে, এই Ids বা Idants দ্বারাই পূর্ব্বপুরুষদের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী সন্তানে বিকশিত হইয়া উঠে।

এইরূপে বিসমানের মতে জীব-জগতে বংশানুক্রমের এই ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহিয়া চলিয়াছে। আদিকাল হইতে একই মূলবস্তু পূর্ব্বপূর্ব্ব পুরুষদের গুণাবলী বহন করিয়া উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে ও এক-এক প্রকার বিশিষ্ট জীববর্গের (Species) সাধারণ ও বিশিষ্ট লক্ষণ-গুলিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এক হিসাবে জীবকে নূতন বিশেষ কিছুই করিতে হয় না। সে এই 'জাতীয় গুণাবলীর' 'ট্রাষ্টি' স্বরূপ। পুরুষানুক্রমে এই গুলিকেই যথা-যথ বিতরণ করিয়া সে অনাদি জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, দার্শনিক কর্ম্মবাদের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রমবাদের খুব সাদৃশ্য আছে। কর্ম্মবাদের মতে পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের 'সংস্কার' নব নব জন্মে জীবের মধ্য দিয়া সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে ও সেই সকল 'সংস্কার'ই জীবের কর্ম্মফলরূপে দেখা দিতেছে,—তাহার স্বভাব ও পরিণামকে বিকাশ করিয়া তুলিতেছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রমবাদেও পূর্ব্বপূর্ব্ব পুরুষদের গুণাবলী (প্রকারান্তরে 'সংস্কার' বলিলেও বলা যায়) অধস্তন পুরুষে প্রাণবস্তুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে এবং জীবের স্বভাব ও পরিণাম নির্ণয় করিয়া দিতেছে। †

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

পূজা

যেদিন হাসি ছিল বন্ধু, ছিল যেদিন গান,
তোমার চোখে, আলোক মম করেছিলেম দান,
মৃদু হাসে মধুর ভাষে প্রাণের কল তানে
অজস্র ভরিয়া ছিনু তোমার পরাণে।

আজকে শুধু অশ্রুজল, নাইত কিছু আর
দুঃখ এ যে, চিরমৌন, কোথায় ভাষা তার?
নিশীথের স্তব্ধ স্তুতি, মেঘের তলে তারা,
তন্ত্রীহীন বীণার বুকে গীতি-বাক্য-হারা!

এ যে পূজা দিবারাতের এ চির বেদন,
মূকের বুকভরা ব্যথা, আঁখির আবেদন!
শিশির চেনে নিশার পায়ে ঊষা আলো চাওয়া,
চোখের দেখা বিরল হ'লে মনের মাঝে চাওয়া!

নত নয়ন, মৌন মুখ, রুদ্ধ হিয়া আর,
হ'ল এবার চিরদিনের পূজার উপচার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

† এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে প্রধানতঃ Thomson's "Heredity", Haeckels' "Evolution of Man" ও Karl Pearson's "Science of National Eugenics" হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।
লেখক।

আলেয়ার আলো

পনেরো

সরমার কথা

সেদিন মোহনবাবুর পিসিমা যে কথাগুলি বললেন,—কেন জানিনা, আমার মনে হোল—তার মধ্যে সমবেদনার চেয়ে বিষের ঝাঁঝটাই যেন কিছু বেশী পরিমাণে ছিল। তিনি যে সুধু আমাকে আমার ভাঙ্গা কপালের কথাটাই মনে করিয়ে দিলেন—তা-নয়; যেন তারও অতিরিক্ত কোন-একটা বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করলেন। নইলে, যে প্রসঙ্গ মোটেই আমার প্রীতিকর নয়, প্রথমদিনেই একেবারে সে কথা তোলা কেন,—অকারণে আমাকে সাবধান করে দেওয়াই-বা কেন? কী আমি করেছি, সাবধান হব কিসের জন্যে? কিছুই স্পষ্ট বুঝলুম না—অথচ মনে-মনে কেমন একটা ধোঁকা লেগে রইল।

কিন্তু, দু-চারদিন পরেই যেন একটু আঁচ পাওয়া গেল।

বামী-ঝী একদিন আমাকে চুপি চুপি ডেকে বললে, "দিদিমণি, তোমাকে নিয়ে পাড়ার দশজনে দশ কথা বলছে।"

পাড়ার দশজনের একজনকেও আমি চিনি-না, চিনতেও চাইনা; কিন্তু দশকথা কি যে বলছে সেটা জানতে আগ্রহ হোল। জিজ্ঞাসা করলুম. "কি বলছে?"

বামী রান্নাঘরের মেঝেতে ন্যাতা বুলুতে বুলুতে বললে, "যত সব ছাই কথা মা, যত সব ছাই কথা! সে আমি বলতে পারব না।"

—"যদি বলতেই পারবি-নি, তবে কথাটা তুললিই-বা কেন?"

বামী নিজের মনেই বকে যেতে লাগল, "আর এও বলি বাপু, কার ঘরে কি হচ্চে না হচ্চে, তোদের সে খোঁজে দরকার কি! কথায় আছে দিদিমণি, 'ভাত দেবার কেউ নন কিল মারবার গোঁসাই'—এরা হচ্চে তাই! উনুনমুখীদের মুখে আগুণ লাগেনা গা? ওমা, যাব কোথা! বলে কিনা, মোহনবাবুর সঙ্গে তোমার নাকি—"

সবটা শোনবার আগেই বুঝে নিলুম। ধমকে বললুম, "চুপ কর্ বামী, তোর এ-সব কথায় দরকার কি?"

বামী থতমত খেয়ে বললে, "তা মা, যা বলেছ! আমরা দাসী-বাঁদী, বড়লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ কি! তবে, কি জান দিদিমণি, তোমাদের জন্যে আমাদের শুনতে হয়, কাজেই বলতেও হয়!"

—"শুনতে হয় শুনিস্, কিন্তু আমার কাছে আর বলতে হবে না! ফের্ যদি তোকে কেউ কিছু শোনাতে আসে, তাহলে বলিস্ যে আমি বলেছি, আমরা কি কারুর আটচালায় ঘর বেঁধে বাস করি যে লোকের কথার ধার ধারব?"

—এই বলে আমি উপরে উঠে এলুম।

দশজনের দশ কথা শোনা, আমার জীবনে এই নতুন নয়। বাবা আমাকে একাদশী করতেও দেন না, খান কাপড় পরতেও দেন না। বলেন, আমাকে বিধবার বেশে দেখলে তাঁর বুকে শেল বাজবে। দেশে থাকতে এই নিয়ে কি ঘোঁটটাই না হয়েছে! সুধু কি তাই—যত সব কুৎসিত কাণাকাণি, ইতর কথা, অন্যায় ইঙ্গিত!—বিধবাকে একটু বাগে পেলে কেউ ছেড়ে কথা কয় না, যা মুখে আসে তাই বলে—ও-সব সয়ে সয়ে বুক আমার দরাজ হয়ে গেছে,—দশজনের দশ-কথার দাম যে কত,—তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে!

তবে, এ কাণাকাণি বাবা যদি শোনেন, তাহলে কাতর হয়ে পড়বেন বটে। বাবা আমার মজার মানুষ। তিনি দশজনকে চটিয়ে কাজ করতে বেজায় মজবুৎ, অথচ দশকথা সইতে হলে একেবারে কাবু! আবার আরো মজা এই যে, তিনি এ-সব শুনলে কাহিল হন বটে, কিন্তু তবু, এক-বার যে পথে চলেন, দশজনের সঙ্গে বনিবনাও করে' সে পথ ছেড়ে ফিরতেও আর রাজি হন না!

কিন্তু মোহনবাবু কোন্ দলের লোক, সেটা ত জানা নেই! এ-রকম কুৎসা শুনলে তিনি সব তুচ্ছ করবেন, না, গ্রাহ্য করবেন? আমার ত পাড়ার মন্থরাদের মুখনাড়ায় একটুও মাথাব্যথা হয় না—কিন্তু পল্লীবাসী দুর্মুখদের উচ্চভাষকে তিনিও সুবুদ্ধির মত হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন ত?

আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকার পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ে ধীরে-ধীরে প্রসন্ন হয়ে উঠছে। বাগানের এককোণে গোটা-তিনেক তাল-গাছ এ-ওর মাথা-ঠোকাঠুকি-করে' দাঁড়িয়ে আছে, তাদের বাতাসে-দোদুল বাকলে বাকলে শুভ্রস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না এসে দেদার আলোর ফিন্‌কি ফোটাচ্ছে; দেখে মনে হচ্ছে, যেন তিনটে আকাশমুখো মস্ত ফুলঝুরি থেকে-থেকে ঝিক্‌মিকে আলোর টুক্‌রো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দিচ্ছে!

চাঁদের আলো, পাপিয়ার গান আর ফুলের গন্ধ আজ আমার চোখ-কাণ-মনকে বিভোর করে' তুললে! বিধবার মানস-চোখে লোকে জোর-করে' যে ঠুলি বসিয়ে দেয়, এমন রাতে এমনসময়ে সে ঠুলি আপনি খসে পড়ে—মনের অন্ধতা আপনি ছুটে যায়,—তোমাদের ও দেশাচার, লোকাচার, বিচার-অবিচারের কোন ধার না ধেরেই!

আমরাও যে মানুষ!... ... ...

আস্তে-আস্তে এস্রাজটিকে কোলে তুলে নিলুম। বারোঁয়ার করুণ রাগিণী আমার প্রাণের মাঝ থেকে বেরিয়ে ধীরে-ধীরে এস্রাজের তারে-তারে সুরের জোয়ার বহিয়ে দিলে। সে সুরের সঙ্গে আমার উদাসী প্রাণও যেন ঐ আলোভরা তারাভরা নীলে-ভরা অনন্ত আকাশের দিকে—উপরে, উপরে,—আরো-উপরে উঠে যেতে লাগল—স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য, অসীমের জন্য!

হৃদয়ে আজ অকালে বসন্তের সাড়া পেয়েছি—এস্রাজ আমার এমন-করে' অনেক দিন কথা কয়-নি!

একই রাগিণী অনেকক্ষণ ধরে, অনেক বার আলাপ করলুম। যখন থামলুম, তখন রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে চাঁদের আলো আরো ফুটফুটে হয়ে উঠেছে, ফুলের গন্ধ আরো ঘন হয়ে উঠেছে, পাপিয়ার 'পিউ-কাহা' আরো মধুর হয়ে উঠেছে! এস্রাজের তারে-তারে রাগিণীর শেষ প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না যেতেই পিছন থেকে শুনলুম—"থামলে কেন, সরমা, ফের বাজাও!"

সচকিতে ফিরে দেখি, ছাদের উপরে দীর্ঘ ছায়া ফেলে মোহনবাবু দাঁড়িয়ে!

মাথার কাপড় খসে কাঁধের উপর এসে পড়েছিল;—তাড়াতাড়ি এস্রাজকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে, ত্রস্তভাবে মাথায় কাপড় তুলে দিলুম।—মাগো, মোহনবাবু যেন কী!

—"সরমা, তোমার নরম হাত থেকে খসে মাটির উপরে পড়ে এস্রাজের তারগুলো কী কান্নার সুরে ঝন্‌ঝন্ করে' উঠল, শোন! তুমি কি আর বাজাবে না?"

—"না।"

..."কেন?"

—"এটা হোল চুরি-করে' গান-শোনার সাজা।"

—"তোমার বাজনা কি মিষ্টি!"

—"সেটা বোধহয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে প্রকাশ্য-উক্তি। স্বগত-উক্তিতে নিশ্চয় 'থামলে বাঁচি'! কি বলেন?"

—"সরমা, দিন-কে-দিন বাজনায় তোমার হাত বেশী খুলছে, কি কথায় তোমার মুখ বেশী খুলছে—সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

—"যা বুঝতে পারছেন না, তা বেশী বোঝবার চেষ্টা করা মিছে সময়-নষ্ট মাত্র,—এটা ত অবশ্যই বুঝতে পারছেন?"

—"বাজনা বন্ধ করে' যখন কথাই সুরু করলে,—তখন অগত্যা বসে বসে তাই শোনা যাক্; কেননা, প্রবাদ বিধান দিয়েছে, মধু দুর্লভ হলে গুড় খাওয়াই প্রশস্ত!"—এই বলে মোহনবাবু ছাদের উপর বসে পড়লেন।

আমি বললুম, "মোহনবাবু, মেয়েমানুষের কথা আর কি শুনবেন বলুন! আপনারা পুরুষমানুষ, আমাদের কথা আপনাদের ভাল লাগবে কেন?"

—"সরমা, রমণীর সঙ্গে যখন পুরুষের কথা হয়,—কথার মধ্যে তখন যেমন বৈচিত্র্য আর মাধুর্য্য আসে, এমন আর কখনো নয়। আমার ত মনে হয়, একঘরে যদি দশজন পুরুষও কথা কয়, তবে সেই দশজনের কথাই যেন একটিমাত্র লোকেরই স্বগত-উক্তির মত শোনাবে!"

—"কিন্তু, তবু ত আমাদের কথাকে আপনারা মেয়েলী কথা বলে ঘৃণা করতেও ছাড়েন না!"

—"এর কারণ, আমাদের মেয়েরা কথার মত কথা কইতে জানেন না। আমরা সাধ করে' আমাদের মেয়েদের অবস্থা এমন ভয়ানক করে' রেখেছি যে, মেয়েরাও শিক্ষিত পুরুষদের কথা বুঝতে পারেন না আর শিক্ষিত পুরুষরাও অশিক্ষিত মেয়েদের কথা শোনবার যোগ্য বলে ভাবেন না। নারীদের অজ্ঞ রেখে আমরা নিজেরাই যে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, এটা এখনো

আমাদের মাথায় ঢোকে-নি—এ বড় আশ্চর্য্য! মেয়েদের কথা বলবার যে একটি বিশেষ ভঙ্গি আর স্বাভাবিক শক্তি আছে, শিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত হলে তা যে কতটা মধুর, কতটা সরস হয়ে উঠতে পারে, আমাদের সে ধারণা নেই। তা যদি থাকত, তাহলে আমাদের অন্তঃপুর আনন্দের আস্তানা হয়ে উঠত। স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাবে পুরুষদের আলাপের সঙ্গে বাঙ্গালী মহিলারাও যোগ দিতে পারেন না,—আমাদের জীবনও তাই দিন-কে-দিন একঘেয়ে, নীরস হয়ে পড়ছে। নারী-প্রকৃতি স্বভাবতই কোমল। পুরুষের কঠোরতার সঙ্গে নারীর এই কোমলতা যদি মিশতে পারে, তাহলে জীবনটা কি বিচিত্র হয়ে ওঠে!"

..."মোহনবাবু, নারীকে আপনি যে এতটা উচ্চাসন দেন, আমি ত তা জানতুম না!"

—"উচ্চাসন দেব না? এ যে নারীর প্রাপ্য! নারীকে আমরা আমাদের কর্ম্মের মন্ত্রী, অবসরের সাথী, সুখে-দুঃখে জীবনের সহচরী করতে পারছি না বলেই ত তাদের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের একটা নীচসম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। ছায়া যেমন আলো-কে কোমল করে, সুন্দর করে, মধুর করে, নারীও তেমনি দুরন্ত পুরুষ-প্রকৃতিকে শান্ত, স্নিগ্ধ, সুশ্রী করে' আনে। পুরুষ আর নারী,—এরা দুজনেই যদি দুজনকে জীবনের সকলদিক দিয়ে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে ভগবানের সৃষ্টিই যে অসার্থক হয়ে যাবে। এদের দুজনেরই স্বাভাবিক গতি দুজনের দিকে,—যা-কিছু এই গতিকে এই মিলন-স্পৃহাকে বাধা দিতে চায়, তাই-ই অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, অশোভন! সরমা, যে দেশে নারীর সাহায্য পুরুষ প্রত্যাখ্যান করে, সে দেশের অশেষ দুর্ভাগ্য!"

কিছুক্ষণ ধরে আমরা দুজনেই নীরবে বসে-বসে বাহিরের সৌন্দর্য্যকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করলুম। তারপর, আমার খোঁপায় যে গুটিকয় চাঁপাফুল গোঁজা ছিল, তারই গন্ধ বোধহয় বাতাসে মোহনবাবুর নাকে গেল; কারণ, হঠাৎ তিনি দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে উঠলেন, "আঃ! চাঁপার কি মিঠে গন্ধ আসছে!"

আমি একটু জড়সড় হয়ে চুপ-করে'ই রইলুম। গন্ধটার উৎপত্তি যে কোথায়, সেটা আর প্রকাশ করে' বললুম না।

মোহনবাবু একবার আমার দিকে তাকালেন। আমার চোখও তাঁর দিকে গেল। মুহূর্ত্ত পরে তিনি চোখ নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন—আমিও মাথা হেঁট করলুম।

হঠাৎ একখানা কালো মেঘের আড়ালে চাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে গেল। চারিদিকের তরল অন্ধকার পৃথিবীকে যেন আরো ছোট আরো নিরিবিলি করে' তুললে! আমরা দুজনেই দুজনের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। আমার মনে হোল, সে নিশ্বাস যেন লুকানো আত্মার অস্ফুট ভাষা,—যে ভাষা মুখে ফোটে না, বুকে জেগে ওঠে!

আচম্‌কা একটা দমকা বাতাসে গাছের পাতায় পাতায় কি-যেন কাণাকাণির আন্দোলন

জাগিয়ে দিয়ে গেল! আমরা এমন বিভোর হয়ে ভাবছিলুম যে, সে শব্দে দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলুম!

দেখলুম, মোহনবাবু ফিরে বসে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। সেই অল্প আঁধারের ভিতরে তাঁর দুটি চোখ দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ-শিখার মত আমার মুখের 'পরে স্থির হয়ে রইল!

আমার বুকের ভিতরটা কেমন শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল!

মোহনবাবু খুব-আস্তে—শোনা-যায়-কি-না-যায় এমনি স্বরে—ডাকলেন, "সরমা!"—তাঁর স্বর কাঁপছিল!

সে স্বর শুনে আমার ভয় হোল, তাড়াতাড়ি বললুম, "মোহনবাবু, অনেক রাত হয়েছে—চলুন, আজ যাই!"

মোহনবাবু কোমলস্বরে বললেন, "সরমা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

এমনসময় একরাশ ভাঙ্গা-ছেঁড়া মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো ফুটে উঠে, নীল-জলে পদ্মের পাপড়ির মত নীলাকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মোহনবাবুর কথার কোন জবাব না দিয়ে আমি বললুম, "আঃ, বাঁচলুম! আচ্ছা মোহনবাবু, আপনি কি ভালবাসেন—আলো, না অন্ধকার?"

—"আমার দুই-ই ভাল লাগে। কখনো আলো ভালবাসি—কখনো অন্ধকার।"

—"আমারও তাই, মোহনবাবু! কখনো আলোতে বেরিয়ে আসতে চাই, কখনো চাই অন্ধকারে বসে থাকতে!"

—"সরমা!"

—আবার সেই স্বর! তেমনি কোমল, মৃদু, কম্পিত!—আমি আর পারলুম না, জোর-করে' দাঁড়িয়ে উঠলুম। শুষ্ককণ্ঠে বললুম, "কি বলছেন মোহনবাবু?"

—"সরমা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। শুনবে?"

আমি খানিকক্ষণ চুপ-করে' রইলুম। তারপর ছাদের উপর থেকে এস্রাজটি তুলে নিয়ে দুরু-দুরু বুকে বললুম,—"কি, বলুন!"

মোহনবাবু একবার আমার মুখের পানে চেয়েই আবার মুখ নামিয়ে নিলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নাঃ, থাক্! আজ অনেক রাত হয়ে গেছে—আর-একদিন শুন তখন"—এই-বলেই ছাদের উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন।···

ঘরে গিয়ে বিছানার উপরে আমি বিবশ হয়ে লুটিয়ে পড়লুম! বুকের তুফান আর বাগ্ না মেনে চোখের কানায়-কানায় উপচে পড়তে লাগল।

খোঁপার চাঁপার গন্ধ কি বিশ্রী! দূর করে' ফুলগুলো টেনে ফেলে দিলুম··· ··· অবরুদ্ধ কণ্ঠে ডুক্‌রে বলে উঠলুম—"মা গো!"

ষোলো

হরেন্দ্রের কথা

মোহন এসে আমাকে মস্ত মুরুব্বি পাকড়াও করেছে! অর্থাৎ, তার অভিপ্রায় এই যে, আমি মুরারিবাবুর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে সরমার বিবাহের প্রস্তাব করি!

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কাল কিছু শুনলুম না, আর আজ হঠাৎ উদ্বাহ

বন্ধনে বন্দী হতে তোমার এতটা আগ্রহ কেন হে? একদিনেই প্রেমের এতটা পরিণতি—প্রেমের পাঠশালায় তুমি যে দেখছি ডবল-প্রমোশন পাচ্ছ! ধন্য সখা, ধন্য!"

—"ভাই, পাড়ার ছুঁচোগুলোকে জান ত! তাদের মুখ এইবেলা বন্ধ করতে হবে!"

—"কেন, তারা কি বলতে চায়?"

—"যত-সব অভদ্র কথা! তাদের স্বভাব ত জানই, অনুমান করে' নাও না!"

—"বেশ, তা-যেন বুঝলুম। তবু এখানে একটা কিন্তু আছে। সরমা কুমারী হোলে কোন কথাই ছিল না, সে বিধবা বলে একটা বিষয় আগেই জেনে নেওয়ার দরকার।"

—"কি?"

—"এ বিবাহে তার কি মত? সেদিকে কিছু সুবিধে-টুবিধে করতে পেরেছ?"

—"ভাই, এতদিনেও সরমার মন ত বুঝতে পারলুম না।"

—"পুরুষের কাছে রমণী দুর্ব্বোধ, আবার রমণীর কাছেও পুরুষের হৃদয় একটি মস্ত গোলকধাঁধা! কিন্তু যখন হৃদয়ে হৃদয়ে যুদ্ধ বাধে, তখন এক হৃদয়ের উচিত হচ্ছে, অন্য হৃদয়ের গুপ্তকথা যতটা-পারে সমঝে নেওয়া! যে পক্ষ অন্য পক্ষের ভিতরের কথা যত-বেশী জানতে পারে, যুদ্ধে তারই জিৎ হয়। তুমি কি কিছুই বুঝতে পার-নি মোহন?"

—"একবার মনে হচ্ছে বুঝেছি, আবার মনে হয়, বুঝি-নি। এ বড় মুস্কিল ভাই,—তাকে ধরি-ধরি করে'ও যেন ধরতে পারি না।"

—"রমণী হচ্ছে ছায়ার মত; তাকে যদি অনুসরণ কর, সে তোমার নাগালের বাইরে-বাইরে ছুটবে; তাকে ছেড়ে যদি সরে আস, সে তোমার পিছনে-পিছনে ফিরে আসবে! সুতরাং একটু মাথা-খাটানো চাই। কিন্তু মোহন, আমার বিশ্বাস, তোমার মত দুর্ব্বল জীবের পক্ষে রণক্ষেত্রে নামাটা উচিত হয়-নি!—তুমি সুধু দুর্ব্বল নও, তুমি অন্ধ! যদি কেউ প্রেমের ইতিহাস লেখেন, তাহলে তিনি প্রণয়যুদ্ধে ওস্তাদ অনেক নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ পাবেন। তাঁদের অনেকের চেহারা হয় ত কুৎসিত, চরিত্রও তেমন লোভনীয় নয়, তবু অন্যপক্ষের হাল-চালটা শীঘ্র বুঝে নেবার শক্তি ছিল বলেই তাঁরা বড় বড় যুদ্ধে সহজেই কেল্লা ফতে করেছেন। কিন্তু হে মোহন, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে তোমার উপরে আমি দোষারোপ করতেও পারি না। কেননা, মদন হচ্ছেন সেই মায়াবী,—যাঁর সঙ্গে সখ্যস্থাপন করলে রাজাই বল আর ভিখারীই বল, সকলেরই বুদ্ধিসুদ্ধি কর্পূরের মত উবে যায়! বাস্তবিক বন্ধু, তোমার এ-হেন সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্বভাব,—তার ওপরে বিদ্যা ও অর্থে তুমি এতটা ভাগ্যবান—"

—"হরেন, তুমি কি Mutual Admiration Society খুলতে চাও?"

—"উঁহু, একেবারেই না। আমি বলতে

চাই, তোমার সব আছে, কিন্তু তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ। জগতে সকলেরই পার আছে, কিন্তু নির্ব্বোধের কোন গতি নেই।"

—"তবে হেঁয়ালি ছেড়ে, তুমিই আমার খেয়ার কাণ্ডারী হও।"

—"আমি যা বললুম, তা মোটেই হেঁয়ালি নয়। কিন্তু যাদের কাণ কিঞ্চিৎ লম্বা, তাদের কাছে দুনিয়ার অনেক জিনিষই ছাঁকা-হেঁয়ালি। আর দেখ মোহনলাল, আমার কথাকে হেঁয়ালি ছাড়া আর-কিছু বলতে তুমি নিতান্তই যদি নারাজ হও, তাহলে জেনে রেখ যে, সমাজে অনেক কথা হেঁয়ালি দিয়ে প্রকাশ করাই ভাল; কেননা সরল কথা অনেক সময়ে চক্ষু-লজ্জা উপস্থিত করে, আবার প্রীতিকর না হোয়ে ভীতিকর হোতেও পারে।"

—"অতএব, হেঁয়ালিরই জয়! কিন্তু উপস্থিত তোমার দার্শনিক গবেষণা একটু স্থগিত রাখলেই ভাল হয় না কি?"

—"এমন সাদাসিধে কথাকে যে গবেষণা বলে ভ্রম করে, তার পক্ষে বাঙ্গলা মাসিক-পত্র পড়াই হচ্ছে প্রশস্ত।"

—"ভাই, তোমাকে মুরুব্বি ধরে আমি দেখছি, জ্বলন্ত আগুণ থেকে গরম কড়ায় এসে পড়েছি। অতএব, তুমি নিরাপদে তোমার গবেষণায় নিবৃত্ত থাক, আমি চললুম।"

—"কিছুতেই নিবৃত্তচিত্ত হওয়া আমার স্বভাব নয়, সুতরাং আমিও চললুম।"

—"কোথায়?"

—"মুরারিবাবুর বাড়ীতে।"

—"কেন?"

—"গর্দ্দভের জন্যে দড়ি সংগ্রহ করতে।"

—"গর্দ্দভ যেন আমি! কিন্তু দড়ি খুজতে সেখানে কেন?"

—"আমার প্রিয়তম গর্দ্দভকে সেই দড়ি দিয়ে উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধব বলে।"

মোহন কৃতজ্ঞভাবে আমার হাত চেপে ধরলে!

মুরারিবাবুর বাড়ীতে হাজির হয়ে দেখি, তাঁর বৈঠকখানাটি বেজায় সরগরম হয়ে উঠেছে। বাহির থেকেই দেখতে পেলুম, পাড়ার যত-সব মাতব্বর এসে সেখানে আসর জম্‌কে বসেছেন। ব্যাপার কি? মুরারিবাবু ত কারুর সঙ্গে মেশামেশি করেন না, তবে অকস্মাৎ এতগুলি মহাত্মা আজ এখানে পদধূলি দিয়েছেন কেন? দেখতে হোল।

একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকলুম না,—কারণ 'ষণ্ডামার্ক' ও 'গোঁয়ার' বলে পাড়ায় আমার সুনাম হয়েছে অনেকদিন। আমাকে এঁরা পছন্দও করেন না, ভালও বাসেন না,—হঠাৎ আমার আবির্ভাব হলে, এখনি এঁরা আঁৎকে উঠতে পারেন। অতএব, বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঘরের মধ্যে উকি-ঝুঁকি মারতে লাগলুম।

যিনি কথা কইছিলেন, তিনি হচ্ছেন পাড়ার বিশুখুড়ো। তিনি হুকোয়-লাগানো একটি কলাপাতার নলে টান দিতে-দিতে বলছেন, "মুরারিবাবু, বাস্তবিক আমরা আপনার জন্যে দুঃখিত!"

বিশুখুড়ো দুঃখিত? তবে ত ব্যাপার বড় সঙ্গিন! তিনি যখনি দুঃখিত হন, তখনি কারুকে জবাই করবার আয়োজন করেন, এ আমার বিলক্ষণ জানা আছে!

বিশুখুড়ো বললেন, "দেখুন, সমাজে থাকতে গেলেই আর-পাঁচজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে' থাকতে হয়।"

আর একজন খুড়োকে তারিফ করে' বলে উঠলেন, "যা বলেছ! খুড়ো, তোমার এ-কথা লাখটাকার এক কথা!"—ইনি হচ্ছেন, ঘোঁট-পাকাবার ওস্তাদ পাড়ার একচক্ষু দুর্লভ বাঁড়ুয্যে!

দুর্লভ বাঁড়ুয্যেকে সমর্থন করে' আর-সকলে তারস্বরে বলে উঠল, "অবিশ্যি, অবিশ্যি!"

বেচারী মুরারিবাবু! তিনি এই মাতব্বরদের পাল্লায় পড়ে দস্তুরমত ঘাব্‌ড়ে গেলেন! কিছুই বুঝতে না-পেরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনারা এতক্ষণ ধরে খালি আঁধারে ঢিল ছুঁড়ছেন কেন? মশাইদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, পরিস্কার করে' বললে বাধিত হব!"

বিশুখুড়ো গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, "কি-জানেন মুরারিবাবু, আপনি যখন এ পাড়ায় এসে বসবাস করছেন, তখন আমাদের কাছ থেকে—ওর-নাম-কি—দুটো ভাল-মন্দ শুনতে হবে বৈকি! তা যদি না শোনেন, তাহলে আমরা বড়ই দুঃখিত হব। কি বল হে দুর্লভ?"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে একচোখ কুঁচ্‌কে বললেন, "তা দুঃখিত হব না আর—এ যে বড় নিন্দের কথা!"

আর-সকলে বললে, "তা বৈকি—তা বৈকি!"

মুরারিবাবু বললেন, "আপনারা সকলেই যে আমার জন্যে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত, সে ত বেশ বুঝতেই পারছি। কিন্তু মুস্কিল এই, আমার দুঃখটা যে কোথায় সেইটেই খালি বুঝতে পারছি না। সুতরাং—"

বিশুখুড়ো বললেন, "মুরারিবাবু, আমরা আপনার কাছে আজ যে ক্যানো এসেছি, অতঃপর মন দিয়ে তা শুনুন। আপনার একটি—ওর-নাম-কি—বিধবা মেয়ে আছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আহা, দুঃখের কথা! কার কপালে যে কি আছে, তা কে বলতে পারে? হরি হে, তুমিই সত্য!"

—"তা কি বলতে চান, বলুন!"

—"হ্যাঁ, বলচি-কি—আপনার মেয়েটি নাকি গান গায়, বাজনা বাজায়?"

—"হ্যাঁ, সে গান-বাজনা জানে বটে।"

—"সে নাকি পরপুরুষের সামনে বেরোয়, যার তার সঙ্গে একলা বসে কথা কয়?"

—"পরপুরুষটা কে মশাই?"

—"এই ধরুন, আমাদের মোহনলাল!"

—"মোহন, সে ত আমার বাড়ীর ছেলের মত! সুতরাং—"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সুধু আপনার ক্যানো, মোহন আমাদেরও বাড়ীর ছেলের মত। তা-বলে ত আমরা আমাদের বাড়ীর বিধবা বৌ-ঝীর সঙ্গে তাকে চোখের আড়ালে মিশতে বা গান-বাজনা করতে দিতে পারি না! কি বল হে দুর্লভ?"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে শামুকের খোল থেকে খুব বড় একটিপ্ নস্য নিয়ে, একচক্ষু কুঁচকে নাকের মধ্যে গুঁজ্‌তে-গুঁজ্‌তে বললেন, "তা বটেই-ত, তা বটেই-ত !"

বিশুখুড়ো হুকোয় খুব-একটা জোর-টান লাগিয়ে বললেন, "আপনার মেয়েটিকে সাবধান করুন,—তার সম্বন্ধে আমরা আরো অনেক কাণাঘুষো শুনছি।"

মুরারিবাবু এতক্ষণে সমস্ত বুঝে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে বললেন, "ও সব মিথ্যেকথা—মিথ্যেকথা !"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে একচোখ নেড়ে মুরুব্বি-আনা চালে বললেন, "আজ্ঞে, না-জেনে আমরা কিছু বলতে আসি-নি। যেখানে মিথ্যে—জানবেন, দুর্লভ শর্ম্মা সেখানে নেই ! আর, আমাদের কথা যদি না কাণে তোলেন, আপনাকে তাহলে একঘরে হোতে হবে—এটা যেন ভুলে যাবেন না !"

মুরারিবাবু অত্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে, কাতর ভাবে সকলকার মুখের পানে তাকাতে লাগলেন,—কিন্তু সেখানে এমন মুখ একটিও দেখলেন না, যাতে একটুও মায়ামমতার ভাব মাখানো আছে !

বিশুখুড়ো চোরা কটাক্ষে দুর্লভ বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি বাঁকা হাসি হাসলেন। সে হাসিটার মানে এই যে, এতক্ষণে চারে মাছ এসেছে !

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে অত্যন্ত উৎসাহিত ভাবে আর একটিপ নস্য নাকে পূরে বললেন, "মুরারিবাবু, সেইজন্যেই আপনাকে আগে থাকতে আমরা সাবধান করে' দিতে এসেছি। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করতে হবে ত !"

মুরারিবাবু বললেন, "আমি আপনাদেরই আশ্রিত। সুতরাং—"

ফকির ভট্‌চায্যি এতক্ষণ ঘরের এক কোণে ঘাড়-নুইয়ে বসে আফিমের নেশায় ঝিমুচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর স্তিমিত চোখ-দুটি যথাসাধ্য বিস্ফারিত করে' আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে বললেন, "ও আশ্রিত-অনাশ্রিত বাছতে গেলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করা কি চলে মশয় ?"

আমি দেখলুম, আর আড়ালে থাকা চলে না, মুরারিবাবু বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন !

—"কাদের কাছে আপনি আশ্রয় চাচ্ছেন মুরারিবাবু ?"—এই বলে আমি ঘরের সেই শৃগাল-সভার মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

মুরারিবাবু আমাকে দেখে যেন হাত-বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আসুন, হরেনবাবু আসুন !"

আমি অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে মুরারিবাবুকে বললুম, "আপনি কাদের কাছ থেকে আশ্রয় চাচ্ছিলেন ?"

—"এই যে, এঁদের কাছ থেকে !"

—"এ ঘরে মানুষ আছে নাকি ? বটে, তা ত জানতুম না ! আরে কেও, বিশুখুড়ো ! এদিকে এটি কে ? দুর্লভ বাবু ! ওদিকে ভট্‌চায-মশায় বুঝি ? বেশ, বেশ, এ যে দেখছি, নরক গুলজার ! —মুরারিবাবু, আপনি এরি মধ্যে এত গুলি মহাত্মার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছেন ? সাধু, সাধু !"—আড়চোখে

একবার সকলকার মুখ দেখে নিয়ে, ঠিক মাঝখানে গিয়ে আমি বসে পড়লুম।

আমাকে দেখবামাত্র বিশুখুড়োর মুখ থেকে হুকোর কলাপাতার নল খসে পড়্‌ল, ফকির ভট্‌চায্যির নেশা বিল্‌কুল ছুটে গেল, একচক্ষু দুর্লভ বাঁড়ুয্যে হঠাৎ উদাসভাবে উর্দ্ধমুখে কড়িকাঠ গুণতে সুরু করলেন এবং মজা জম্‌তে-জম্‌তে জমল-না দেখে আর-আর সবাই অত্যন্ত হতাশ হয়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

এঁদের আকস্মিক ভাবান্তর দেখে মুরারি-বাবু একেবারে অবাক !

কোনরকমে হাসি চেপে আমি বললুম, "কি বিশুখুড়ো, হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষার কাজ আজ-কাল কেমন চল্‌ছে ? খবর সব ভাল ত ? আর কজন লোক একঘরে হোল, ক-জন পাপিষ্ঠ জাতিচ্যুত হোল ?"

খুড়ো এদিক-ওদিক চেয়ে আচম্‌কা গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "বাবা হরেন, আজ আমাদের হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী-সভার অধিবেশন আছে। আমি ত আর থাকতে পারছি-না।"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যেও শামুকের খোলটি ট্যাঁকে গুঁজে টপাস্-করে' উঠে পড়ে বললেন, "ওহো, ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে ! আমাকেও সেখানে যেতে হবে যে !"

বিশুখুড়ো আর দুর্লভ বাঁড়ুয্যে চৌকাঠ পার না-হতেই ফকির ভটচায্যিও প্রমাদ গুণে ভয়ানক চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও খুড়ো, ও দুর্লভ ! আমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে তোমরা চললে কোথায় ! দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমিও যাব !" বলতে-বলতে বৃন্দাবনী নামাবলী-খানি তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে ভট্‌চায্যিও চট্‌পট্ সরে পড়লেন। বলাবাহুল্য, ঘরের মধ্যে আর-আর যাঁরা ছিলেন, মহা-জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তাঁরাও কিছু-মাত্র বিলম্ব করলেন না !

মুরারিবাবু বললেন, "এঁরা দেখছি আপনাকে ভালচোখে দেখেন না।"

—"ভালচোখে দেখবেন কি, এঁরা আমাকে যমের মত ভয় করেন। কারণ, এঁদের প্রত্যেকের নাড়ীর খবর আমার জানা আছে ! ঐ যে বিশুখুড়ো, উনি 'হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী-সভা'র পরম বৈষ্ণব সম্পাদক—ওঁর মাথার চুল হাত্‌ড়ালে পাবেন লম্বা টিকি, আর উদর হাত্‌ড়ালে পাবেন মুরগীর কাট্‌লেট ! আমি একদিন একটা হোটেলে ওঁকে হাতে-নাতে পাক্‌ড়ে অত্যন্ত নির্দ্দয়ের মত ওঁকে টিকিহীন করে' দিয়েছিলুম। ঐ দুর্লভ বাঁড়ুয্যেটিরও যোড়া মেলা দুর্লভ। উনি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করতে চান, কিন্তু নিজে দুটি অভাগিনীকে কুলের বাহির করেছেন। আর ঐ যে ফকির ভট্‌চায্যি, জাল করে' উনি একবার জেল বেড়িয়ে এসেছেন ! এঁরাই আজকাল আমাদের সমাজপতি ! এঁরা মনুষ্য-ধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না, অথচ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করবার স্পর্দ্ধা রাখেন ! এঁদের এখানে আসবার উদ্দেশ্য আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি —সুতরাং আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। তবে একটি কথা আপনাকে বলে রাখি। এঁদের কাছে কখনো নরম

হবেন না, তাহলে দ্বীপবাসী বৃদ্ধ যেমন সিন্দবাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, এঁরাও তেমনি আর আপনার ঘাড় ছেড়ে নামতে রাজি হবেন না। এঁরা হচ্ছেন গরমের গোলাম আর নরমের যম!"

মুরারিবাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, "মানুষ কি এত নীচ হতে পারে!"

—"মানুষের ভিতরে বেশীর ভাগই নীচ, ভালর ভাগ খুব কম। আর কম বলেই, রাস্তায়-ঘাটে ভাল'র ছড়াছড়ি নেই বলেই, ভালকে আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। দুনিয়ায় যা দুর্লভ, তারই ত আদর অধিক!"

—"কিন্তু হরেনবাবু, এঁরা যে-সব ভয়ানক কথা বলে গেলেন, তাতে আমি বড় আঘাত পেয়েছি। সরমার নামে চার-দিকে নানান কথা রটেছে।"

—"রটুক। মনে যে খাঁটি, নিন্দুকের কলঙ্ক-রটনায় তার কাণ পাতবার দরকার নেই।"

—"হরেনবাবু, অমন-যে সবল-চরিত্র রামচন্দ্র, নিন্দুকের জিহ্বাকে তিনিও ত অবহেলা করতে পারেন-নি!"

—"তার ফলটা কি হয়েছিল, তাও ভেবে দেখুন! নিন্দুকের মন রাখতে গিয়ে রামচন্দ্র সীতাকে হারিয়েছিলেন, সতীর অপমান করেছিলেন।"

মুরারিবাবু চুপ-করে' বসে রইলেন। আমি একটু ইতস্তত করে' বললুম, "আপনি যদি এই কুৎসিত কাণাকাণি বন্ধ করতে চান, তাহলে একটি উপায় আছে।"

—"কি?"

—"আপনার মেয়ের বিবাহ দিন।"

—"হরেনবাবু, আপনি কল্পনায় কাজটি যত সহজ মনে করছেন, আসলে এটি তত সোজা নয়।"

—"কেন?"

—"প্রথমে ত ভালপাত্র দেখতে পাওয়া যায় না। ভালপাত্র পাওয়া গেলেও সে হয়ত বিধবা-বিবাহে রাজি হবে না। তারপর, এ-বিষয়ে সরমার মত জানতে হবে।"

—"ভালপাত্রের সন্ধান আমি এখনি দিতে পারি মুরারিবাবু, কিন্তু আপনার মত হবে কিনা, জানিনা।"

—"ভালপাত্র? কোথায়?"

—"আমার বন্ধু মোহন।"

—"কি বললেন? কে?"

—"মোহন আপনার মেয়েকে বিবাহ করতে সম্মত আছে।"

—"কি আশ্চর্য্য! আপনি কি পরিহাস করছেন? মোহন? মোহন সরমাকে বিবাহ করতে রাজি! এ কি সম্ভব?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, মোহন নিজের মুখে এ কথা বলেছে। আপনি কি তার হাতে কন্যাসম্প্রদান করবেন?"

—"বলেন-কি! মোহন আমার জামাই হতে চায়, এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না! আমার কি এত সৌভাগ্য হবে?"

—"আপনার মেয়ের মত কি, আপনি আজ সেটা জেনে রাখবেন। আমি কাল এসে সব শুনব-অখন"—এই বলে সেদিন-কার মত বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

আসতে-আসতে শুনলুম, ঘরের ভিতরে মুরারিবাবু আপনমনে বলছেন, "কি আশ্চর্য্য, মোহন? সে আমার সরমাকে চায়? এতবড় আশা আমি ত একদিনও করি-নি! সুতরাং—"

সতেরো

সরমার কথা

ওগো, আমার এ ব্যর্থ জীবনকে কোন্ মন্ত্রে তুমি সার্থক করতে চাও, আমার এ শূন্য বুককে কি-দিয়ে তুমি পূর্ণ করতে চাও! ঝরা পাপ্‌ড়ি কুড়িয়ে ফুল-ফুটানো যায়না গো যায় না,—যে ঝরতে চায়, ঝরে পড়েছে, তাকে ঝরতে দাও, সে ঝরে মরুক্···মরে সে বাঁচুক্!

আমার মনের গোপন শয়নে নারীর নারীত্বটুকু ঘুমিয়ে ছিল এতদিন, কে তুমি সোণার কাঠি হাতে করে' তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আছ? আজ সকালের অরুণ-আলোয় তরুণ ললাট তোমার অপূর্ব্ব মহিমায় জ্বল্-জ্বল্ করছে—অবাক হয়ে তোমার মুখপানে চেয়ে আছি, আমি চেয়ে আছি! তুমি কি ভাবছ, তোমার ঐ হাসির তাপ দিয়ে আমার এই কান্নার শীতলতাকে তপ্ত করে' তুলতে পারবে?

কাঁদতে-কাঁদতে চিঠিখানি আমার চোখের সামনে তুলে ধরলুম—আবার পড়তে লাগলুম।

"সরমা,

সেদিন ছাদের উপর তোমাকে যে কথা বলতে গিয়ে বলতে পারি-নি, আজ এই চিঠিতে আমি সেই কথা বলব।

বলব, কিন্তু তুমি শুনবে কি? তোমার শোনার উপরেই আমার জীবন, আমার সুখ, আমার শান্তি,—সমস্ত নির্ভর করছে। তুমি শোনো সরমা, তুমি বধির হোয়ো না—পাষাণী মূর্ত্তির মত মৌনমুখে দাঁড়িয়ে থেক না!

হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া রত্নের মত প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, সেইদিন থেকেই তুমি আমার আপনার হয়ে আছ, সেইদিন থেকেই আমি আলোক-রাজ্যে বাস করছি। আমার বিশ্ব এখন তোমাময়, আমার ভিতরে তুমি, বাহিরে তুমি,—আমার জীবন-পথ আলো-করে' আছে যে ধ্রুবতারা, সে তুমি, তুমি!

'আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃত-সরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!'

সরমা, তোমার এই আনন্দময়ী মূরতি কি আমার নিরানন্দ গৃহকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে' তুলতে পারবে না?

তুমি আমার হবে?

তোমার বাবার মত জানতে আমি আমার বন্ধুকে পাঠিয়েছি, আর তোমার মত জানবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখলুম।

আমার ভবিষ্যৎ এখন তোমার হাতে।

ইতি মোহন।"

মত? আমার মত? কি মত দেব, কি বলব?

তখনও বসে-বসে ভাবছি আর ভাবছি।...

এমনসময় এককোলে নন্নুয়া, আর এককোলে মেনুয়াকে নিয়ে বাবা এলেন।

মনের কথা মনেই চেপে বাবাকে বললুম, "হ্যাঁ বাবা, নীচে অত গোলমাল হচ্ছিল কিসের?"

বাবা বললেন, "গোলমাল বিশেষ-কিছু নয় মা, পাড়ার জনকত ভদ্রলোক এসেছিলেন।"

—"ভদ্রলোক! মাগো, আমি ভাবলুম বাড়ীতে বুঝি ডাকাত পড়েছে!"

বাবা হো-হো-করে' হেসে উঠে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! ডাকাত ভেবেছিলি বুঝি?"

—"এস বাবা, তোমার পাকাচুল তুলে দি, তোমার মাথায় পাকাচুল বড় বেড়ে উঠেছে, বাবা!"

—"বয়সও বাড়ছে মা, পাকাচুলও বাড়ছে! ফলে পাক্ ধরে গাছ থেকে খসে পড়বার জন্যে, তা জানিস্ ত?"

—"চুপ কর বাবা, ও-সব বললে তোমার সঙ্গে আমি আড়ি করে' দেব কিন্তু!"

—"তোর আড়িতে আমি ভয় পাই-না। রোজই ত তুই আমার সঙ্গে আড়ি করে' ফের সেধে ভাব করতে আসিস্!"

—"তবে যাও! আমি আর তোমার পাকাচুল তুলে দেব না!"

—"না মা, তোকে আর চুল তুলতে হবে না। তুই আমার সুমুখে এসে বোস্ দেখি! তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

বাবার গলার স্বরেই বুঝলুম, কি কথা! আমার এমনি লজ্জা করতে লাগল!

বাবা একটু চুপ-করে' থেকে বললেন, "মা, সেদিন তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, মনে আছে? তোর বিয়ের কথা?"

আমি কিছু বললুম না—নীরবে নন্নুয়ার মাথায় হাত-বুলিয়ে দিতে লাগলুম।

বাবা বললেন, "আজ আবার বাধ্য হয়ে তোর কাছে সেই কথাই তুলতে হচ্ছে। মোহন বলে পাঠিয়েছে, সে যদি তোকে বিবাহ করতে চায়, তাতে আমার মত আছে কি না।"

আমি ঘাড় হেঁট করে', যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বসে রইলুম।

বাবা বলতে লাগলেন, "মোহন যে আমার জামাই হতে চাইবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর! রূপে-গুণে এমন ছেলে হাজারে একটিও হয় না। আমি বড় সমস্যায় পড়েছি মা! এ বিবাহে তোর মত আছে কি না তা-ত আমি জানিনা! অথচ, তোর অমতে মোহনকে কিছু বলতেও পারছি না! কি করি, বল্‌ত সরো?"

আমি কি বলব? এর কি উত্তর দেওয়া যায়? আমি যেন একেবারে বোবা হয়ে গেলুম।

"কি আশ্চর্য্য! চুপ-করে' রইলি যে? লজ্জা হচ্ছে বুঝি! আ আমার বোকা মেয়ে, এখন কি লজ্জার সময়?"

কিন্তু, মুখ তবু ফোটে ফোটে ফোটে না!

"বল্, বল্, কথা ক! আমার যে আর উপায় নেই! তা-নইলে তোকে কি এমন-করে' লজ্জা দি!"

অনেক কষ্টে মুখ তুলে বললুম, "বাবা!"

—"বল্ মা, বল্! এ বিবাহে তোর মত আছে?"

প্রাণপণে বললুম, "হ্যাঁ!"—বলেই আমি বাবার কোলের ভিতরে মুখ-গুঁজে আনন্দে, লজ্জায় কেঁদে ফেললুম!

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সাহিত্যের গণ্ডগোল

সাময়িক সাহিত্যের আসরে আজকাল সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে বেশ-একটা লড়াই বেধে গেছে। সমাজ-সংস্কারকের দল বলছেন, সমাজের উপর সাহিত্য ভারি অত্যাচার সুরু করেছে অতএব—; অতএব যে কি, তা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, সনাতন সমাজের উপর এই রকম বিষম অত্যাচার চলেছে দেখে গুটিকয়েক লোক মিলে একটা Band of mercyর দল গঠন করেছেন। তাঁরা এই নিয়ে শশব্যস্ত যে, হঠাৎ কোনো ফাঁকে কেউ যেন কলমের খোঁচা মেরে সমাজকে কাবু করে না ফেলে।

সমাজবৈবর্ত্ত-পুরাণে নাকি লিখিত আছে, কলমাঘাতে সমাজ-দেহে মারাত্মক বিষ প্রবিষ্ট হয়ে সমাজকে মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে যায়। সেইজন্য এই mercyর দল বিষম ক্ষিপ্ত এবং দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। প্রথমত দুটি-একটি, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে এই দলে জুটছেন, কারণ তাঁরা নাকি সন্ধান পেয়েছেন এই দলের পিছনে বেশ হৃষ্টপুষ্ট পৃষ্ঠপোষক বর্ত্তমান। কাজেই তাঁরা সময় বুঝে যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে লজ্জিত হবেন না তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

সাহিত্যের সুড়ঙ্গ দিয়ে কে কোথায় সমাজকে ঘাল করছে তা অনুসন্ধান করতে কর্‌তে সাহিত্য-কোটালরা বিশেষ-করে রবীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্তর, তবে প্রমাণাভাবে কতক ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি তাঁকে এক অভিযোগেই বিশেষভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। অভিযোগটি এই যে "তিনি হিন্দু-সমাজের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন, অতি বর্ব্বরের ন্যায় হিন্দু-আদর্শের পর্ব্বত-বৎ গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিতেছেন।" তাঁদের মতে, এই চেষ্টা অবশ্য তাঁর রচিত উপন্যাস থেকেই প্রকাশ পাচ্চে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, তাঁর রচনায় সমাজ যে কোন্ স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হ'ল সেটি অনুমান করা সকলকার বুদ্ধির পক্ষে সমান সহজ বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। কেউ কেউ বলছেন, তিনি উপন্যাসের ভিতর দিয়ে মানুষের মনের ভাবকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, আবহাওয়া মানুষের মনের উপর কেমন-করে আধিপত্য বিস্তার করে, প্রলোভন সামনে পড়লে মানুষের মন কেমন-করে সেদিকে ছুটে যায়; তারপর কোথাও সে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে,

কোথাও-বা ভেঙে পড়ে, তারি ছবি তিনি এঁকেছেন। উপন্যাস তার নিজের তাগাদায় আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সমাজ-সমস্যার কোনো জটিলতা এসে পড়লে তার বিকাশের মুখে নিজের প্রয়োজন-অনুসারে সে তাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করে। সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা তার চলে না। সমাজ যা চায় সাহিত্যের নিজের বিকাশের জন্যে হয়ত সেটার প্রয়োজন হল না; কিম্বা তার উল্টোটা দরকার হল, কিন্তু সেখানে সে যদি সমাজকে মেনে চলে এবং নিজের স্বাভাবিক গতিকে না মানে তাহলে সমাজ হয় ত রক্ষা পেতে পারে কিন্তু উপন্যাস রক্ষা পায় না। উপন্যাস লিখতে হলে কতক-গুলো লোক, স্থান আর অবস্থার অবতারণা করা দরকার, এটা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না। এর মধ্যকার কোনো কোনো মানুষ নিতান্তই যদি সমাজের চক্ষে বেয়াড়া বোধ হয় কিম্বা তাদের অবস্থা যদি সমাজের ঠিক মনের মত না হয়, তাহলে আর কি করা যাবে? সমাজের মধ্যেও তেমন বদ্ মানুষের অসদ্ভাব নেই এবং সমাজ তাদের যেমন-করে সহ্য করে, উপন্যাসেও ঠিক তেমনি-করে তাদের সহ্য করা যেতে পারে। সমাজ থেকে যখন বেয়াড়া মানুষ তাড়াতে পার-নি তখন উপন্যাস থেকেও পারবে না। তবে কেউ-কেউ বলতে পারেন, উপন্যাসের মধ্যে অমন মানুষ রাখবার দরকার কি? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, যিনি দরকার মনে করবেন না তিনি তা রাখবেন না; যিনি দরকার বুঝবেন তাঁকে রাখতেই হবে। দরকার নেই এ-কথা যতক্ষণ না প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ দরকারকে অস্বীকার করি কি-করে? কিন্তু এ-সব তর্ক নিয়ে উপন্যাসের বিচার নয়—উপন্যাসের বিচার-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। যাঁরা উপন্যাসকে উপন্যাসের দিক দিয়ে দেখেন না সমাজের দিক দিয়ে দেখেন, তাঁরা সমাজের হিতকারী হলেও সাহিত্যের পক্ষে যে অপকারী সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

* *
*

যাঁরা এই-সব উপন্যাসের কবল থেকে সমাজকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন তাঁদের যুক্তিটা কি-রকম, একবার যাচাই-করে দেখা যাক্। "রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস" নামে একটি প্রবন্ধ সম্প্রতি একখানি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে; লেখক বলছেন, "আজকাল স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিতেছেন—তাহা ভাল কি মন্দ বলিব না—এখানে তাহা আলো-চনার বিষয়ও নহে। বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত উপন্যাসাদি তাঁহারাই পাঠ করেন। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে যে গরল আনিলেন তাহাতে নিজের কোন স্নেহ-ভাজনের নাকি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল।" বিষবৃক্ষ পড়ে যদি কোনো মহিলা বিষপান করে থাকেন, তবে তাঁর প্রতি ভগবানের কিছু অনুগ্রহ-দৃষ্টি আছে বলতে হবে; কারণ বিষবৃক্ষ পড়বার আগে কিংবা পরে অন্য কোনও পুস্তক-বর্ণিত বর্ণনা পড়ে তিনি যদি আর কোন পন্থা অবলম্বন করতেন, তাহলে সমাজকে বিষপান অপেক্ষা অধিকতর গুরু আঘাত ভোগ করতে হ'ত, সন্দেহ নেই। পূর্ব্বোক্ত

প্রবন্ধ-লেখক আবার বঙ্কিমের হয়ে সাফাই গেয়েছেন—"বোধ হয় ইহা ভাবিয়াই দেবী-চৌধুরাণীতে বঙ্কিমবাবু সপত্নী ঘরেও নিষ্কাম ভাবে কিরূপে থাকা যায় সেই চিত্র দেখাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।" তা যদি সত্য হয় তবে বঙ্কিম স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর পদসেবা, গৃহস্থ-কন্যার ডাকাতি-ব্যবসা প্রভৃতি সংখ্যাতীত ব্যাপার সংঘটিত হতে দিলেন কেমন করে, এ বোঝা শক্ত। বঙ্কিম যে অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন-নি তার অনেক প্রমাণ তাঁর সীতারাম থেকেই দেওয়া যেতে পারে। আর সত্যই যদি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করবার মতলব হ'ত তাহলে তাঁর বিষবৃক্ষের গায়ে আগুন দিয়ে তার অস্তিত্বও তিনি নিশ্চয় লোপ করে যেতেন। যাঁরা এইভাবে বঙ্কিমকে বিচার করেন, বঙ্কিমের রচনার প্রতি তাঁদের যে কতদূর শ্রদ্ধা তা তাঁদের উক্তি থেকেই ধরা পড়ে। এই ভাবে বিচার করলে শুধু বঙ্কিম বা রবীন্দ্র কেন, জগতের সমস্ত সাহিত্যকে তুষানলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। কারণ, কোনো বইই নীতি বিশারদদের মাপকাটিতে মেপে দেখলে, নিখুঁত হবে না। এঁদের যুক্তি যদি গ্রহণ করা যায় তাহলে এই কথা বলতে হয় যে, পৃথিবীতে আর মানুষ নেই, সমাজ নেই। কারণ মানুষ কিম্বা সমাজের অস্তিত্ব লোপ করবার যতগুলি অস্ত্র আছে অর্থাৎ খুন, আত্মহত্যা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি, এ-সমস্তই পুস্তকে পড়ে পড়ে, মানুষ তারই দ্বারা এতদিনে নিশ্চয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কোনো দুর্ব্বল-হৃদয় কি দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক পাঠক-পাঠিকা যদি বই পড়ে কোনো অপকর্ম্ম করে বসে, তার জন্য কি বই লেখা বন্ধ করতে হবে? দুর্ব্বল পাঠকের অপকর্ম্মের জন্য দায়ী বই নয়,—তার নিজেরই দুর্ব্বলতা। সাহিত্যিকাররা যখন চিকিৎসক নন, তখন তাঁরা পাঠকের হৃদয়-পরীক্ষা করে তাঁদের উপযোগী পুঁথি তৈরি করতে অপারগ, এ-কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

সমাজে আঘাত লাগছে বলে আজ এই যে তারস্বরে চীৎকার উঠেছে, এটা সত্য কি-না সে-বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয় ব্যক্তিগত মতে আঘাত লাগলেই জনকতক লোক হৈ-হৈ করে ওঠেন, —হায়, সমাজ একেবারে গেল! সমাজের হয়ে তাঁরা যে-সব যুক্তি খাড়া করেন সেগুলিও নিতান্ত ছেলেমানুষী। সমাজের শাসন মেনে যদি সাহিত্যকে চল্‌তে হ'ত, তাহলে শিশুশিক্ষার প্রথম নীতি "সদা সত্য কথা বলিবে" ও "চুরি করা মহাপাপে"র উপর সাহিত্য কোন কালেই এক ইঞ্চিও উঠতে পারত না; কেবল নীতি ও ধর্ম্ম ইত্যাদির আগড়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখলে সাহিত্য কখনও বড় হ'তে পারে না। সাহিত্যই সমাজকে পথ দেখায় ও উন্নতির পথে টেনে নিয়ে যায়। কোন সামাজিক রীতি যখন সাহিত্যকে বলতে থাকে, তোমার অত্যাচারে আমার তিষ্ঠানো দায় হয়েছে তখন সাহিত্য বলে যে, তোমাকে তাড়ানোই আমার উদ্দেশ্য —সুতরাং তুমি এখন মানে মানে পথ দেখতে পার। Oscar Wildeএর একটা বচন আছে, "যে রচনা সমাজের লজ্জার কথা প্রকাশ করে সমাজ সেই রচনাকে গালাগালি দেয়।"

*
* *

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্র ও বঙ্কিমের উপন্যাস, যা সাহিত্যের পরম সম্পদ বলে গণ্য হয়েছে, তাকে অশ্লীল, সমাজ-বিদ্রোহী বলে ঠেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য-হিসাবে অতি নগণ্য এবং অশ্লীলতায় ও দুর্নীতিতে একেবারে জঘন্য এমন উপন্যাস বাংলা সাহিত্য ছেয়ে ফেললেও তাদের প্রতি সমাজের এই-সমস্ত নীতিবিশারদদের দৃষ্টি পড়ছে না! সাহিত্যের দ্বারা সমাজের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে ত এই সব বইয়ের দ্বারাই তা হয়েছে। অস্ত্র আঘাত করতে হয় ত, এদের প্রতিই তা করা উচিত। কারণ, ও-সব বই শুধু সমাজ নয়, সাহিত্যেরও রীতি-মত অনিষ্ট করচে। এর উপরে আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছেন, তাঁদের অনেকেই সমাজের ধার ধারতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের কোনোই ধার ধারেন না—কারণ, তাঁদের যে সাহিত্য-রচনার ক্ষমতা আছে কিম্বা তাঁরা যে সাহিত্য-রসের রসিক, এ পরিচয় এখনো দেন-নি। বেরসিক এবং অসাহিত্যিকের গণ্ডগোলে বেচারা রস-পিপাসুদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছে।

মানুষের মন যে জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, সমাজ লক্ষ ফাঁদ পেতেও সেখানকার একটা খবরও ধরতে পারে না, অথচ সমাজকে আঘাত করবার বড় বড় অস্ত্র সেইখানকার কারখানাতেই তৈরি হয়। মানুষের কাজকর্ম্মের অবকাশ দিয়ে সেইখানকার এক-আধটা তীর এসে সমাজের গায়ে লাগলেই, খোঁচার চোটে সমাজ প্রথমটা তুড়িলাফ খেতে থাকে। ক্রমে তার এমনি হাল হয়ে ওঠে যে, সমাজ আর সে-রকম আঘাতকে আঘাত বলেই মানে না। চিন্তা-রাজ্যের স্বরূপ-মূর্ত্তিকে ধরে আনতে পারে, এক সাহিত্য। কবির চিন্তা যখন সাহিত্যে মূর্ত্তি ধরে সমাজের সামনে এসে দাঁড়ায়, সমাজ তখন মোটামুটি তাকে দু-রকমে উপভোগ করে; একদল, যারা রচনাটা পড়েই আনন্দ পায়, তার ভিতরকার অর্থ গ্রহণ করতে তারা চায় না,—এরা হচ্ছে একরকম নির্ব্বিরোধী, একটু আনন্দ পেলেই বর্ত্তে গেল। এ আনন্দের উৎপত্তি কোথায়, অত খুঁটিনাটির ভিতর তারা ঢুকতে চায় না। আর একদল আছে,—যারা কবির মনের ভাব বোঝবার চেষ্টা করে, সেই কাব্যের মধ্যে আপনার চিত্তকে অনুভব করে, এবং তাতে যে আনন্দ পায় সে আনন্দের উৎস কোথায়, সেটাও তারা খুঁজে বার করে। এ-শ্রেণীর পাঠকরাই সমালোচক হবার উপযুক্ত। আমাদের সমাজ এখন এমন-একটা তে-মাথার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, যেখানটাতে পথ দেখাবার লোক নেই অথচ কোন-একটা পথে চল্‌তে গেলে পথ রোধ কর্ব্বার লোকেরও অভাব নেই। এমন একটা সাহিত্যের এখন নিতান্ত প্রয়োজন, যে আলো হাতে করে আমাদের জাতীয় সমাজকে তার এই জীবন-সঙ্কটে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কানে যে স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছেন,

সেটাকে হেতু ও যুক্তি দিয়ে তার ভ্রম প্রতিপন্ন করে' যদি কেউ অন্য পথ দেখিয়ে দিতে পারেন ত তিনি অগ্রসর হোন, তাতে বরং একটা সমস্যার সমাধান হবে; কিন্তু যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হন তাঁরা প্রথমে নামমাত্র সমালোচনা করে' তারপর তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। সমালোচনার এমন উদ্ভট পদ্ধতি সাহিত্য-সঙ্গত ত নয়ই, উল্টে এটা সমাজ-বিরুদ্ধ অভদ্রতা। রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দেওয়াই যদি এই সব সমালোচনার উদ্দেশ্য হয় তবে সমাজ-শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে তার পিছনে প্রচ্ছন্ন থেকে এমন বাণ বর্ষণ করবার দরকার কি! গালাগালি-পূর্ণ হ্যাণ্ডবিল রাস্তায় বিলি করলে এর চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে বোধ হয়।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্বপ্ন-সুন্দরী

(ওয়াসিংটন আরভিং হইতে)

ক

ফরাসী-বিপ্লব তখন পূরাদমে চলিতেছে।

নিঝুম রাত্রি—চারিদিকে ঝোড়ো হাওয়া হাঁকিয়া-হাঁকিয়া ফিরিতেছে! আকাশের কালো বুকে অগ্নিময়ী সর্পীর মত বিদ্যুতের লীলা! এবং ঘন-ঘন বজ্রনাদে বৃষ্টিধৌত সহরের সমস্ত ঘর-বাড়ী-রাস্তা ঝন্‌ঝন্ বাজিয়া উঠিতেছে।

এমন বিষম ঝড়-জল মাথায় করিয়া একটি যুবা প্যারীর নির্জ্জন পথে বাড়ী ফিরিতেছে। এই যুবকের বিষয়ে আগে কিছু বলা দরকার।

এর নাম উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ—জাতিতে জার্মান। বিপ্লবের শেষমুখে সে প্যারী-সহরে আসিয়া একটি বাসা ভাড়া করিয়া আছে।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গের লেখাপড়ার বাতিক ছিল বড়ই বেশী। প্যারীর বড়বড় পুস্তকালয়ে, সেকেলে লেখকদের লেখা পুরানো পুঁথিরাশির মধ্যে সারাদিন সে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকে। এই পড়ার বাতিক ছাড়া সংসার-সমাজের আর কোন-কিছুর ধার সে ধারিত না। সে নির্জ্জনতা ভালবাসিত, লোকজনের সঙ্গে তেমন মেলা-মেশাও করিতে পারিত না।

আপনার চারিদিকে এই যুবক ছাত্রটি এক কাল্পনিক জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল। কেন জানিনা, কেমন-করিয়া তাহার মাথায় একটা ধারণা গাড়িয়া গিয়াছিল যে, কোন কু-আত্মার দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িয়াছে,—তাহার কবল হইতে মুক্তির কোনই -উপায় নাই! এই উদ্ভট ধারণা তাহার নিঃসঙ্গ জীবনকে ভারবহ করিয়া তুলিয়াছিল। স্থান-পরিবর্ত্তনে হয়ত কোন উপকার দর্শিতে পারে—বন্ধুদের এই পরামর্শে দেশ ছাড়িয়া সে প্যারীতে আসিয়া হাজির হইয়াছে।... ...

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ মুখচোরা ও অমিশুক হইলেও, রমণী-রূপের তারিফ করিতে জানিত। আপনার নির্জ্জন ঘরে বসিয়া সে কল্পনার রঙ্গিন নেশায় মস্‌গুল হইয়া থাকিত,—তাহার চোখের সুমুখ দিয়া চেনা-অচেনা কত সুশ্রী মুখের ছবি একে-একে ভাসিয়া যাইত! তাহার কল্পনার রূপরসে সে মুখগুলির আদর্শ এতটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাস্তব তাহার কাছে কোথায় লাগে! তাহার মনের যখন এমনি গতিক, তখন হঠাৎ একদিন সে স্বপ্নে দেখিল, এক পরমা সুন্দরী তরুণীকে! এই স্বপ্নদৃষ্ট রূপসীর রূপ ছিল এমনি অপূর্ব্ব, যে জাগরণেও সে আর তাহাকে ভুলিতে পারিল না!... ...দিনের পর দিন যায়, কিন্তু শয়নে-স্বপনে আহারে-বিহারে সেই সুন্দরীর সুশ্রী মুখের স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না—সে মুখের মোহ যেন ক্রমেই তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল!... ... ...

সেদিন ঝড়ের রাতে বিজন পথের পথিক হইয়া উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখনো তাহার মন সেই স্বপ্ন-সুন্দরীর সৌন্দর্য্যেই বিভোর হইয়া ছিল!

খ

চলিতে-চলিতে উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ সহরের যে-দিকটাতে আসিয়া পড়িল, সেদিকটাতে কয়েদীদের প্রাণদণ্ড হয়।

নিকষে সোণার কষের মত, আঁধার ফুঁড়িয়া হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝকিয়া উঠিল—সেই ক্ষণপ্রভায় উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ সভয়ে দেখিল, সামনেই বধমঞ্চের উপরে, মানুষের মাথা-কাটিবার যন্ত্র—গিলোটিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! বিপ্লব তখন চরমে উঠিয়াছে এবং এই প্রাণঘাতী ভয়ানক যন্ত্র তখন প্রতিদিন শত-শত অভাগাকে গ্রোগ্রাসে গ্রাস করিতেছে! সেইদিনেই এই বধমঞ্চের উপর দিয়া মানুষের রক্তধারা স্রোতের মত অবাধে বহিয়া গিয়াছে! দিনের আলোর সঙ্গে আবার কখন্ নূতন বলি আসিবে, যেন সেই আশাতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া, এই ঘুমন্ত সহরের মাঝখানে রক্ত-তৃষিত গিলোটিনগুলো স্তব্ধভাবে সার বাঁধিয়া হা-করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গের প্রাণ যেন হৃদয়ের ভিতরে বসিয়া গেল! শিহরিয়া, তাড়াতাড়ি সে অন্য-মুখে ফিরিতে যাইতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, বধমঞ্চের সিঁড়ির উপরে জড়োসড়ো হইয়া ছায়ার মত একটি দেহ বসিয়া রহিয়াছে!

বিদ্যুতের পর বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল! যে বসিয়া আছে, সে রমণী—পরণে কালোরঙের কাপড়। সামনে ঝুঁকিয়া দুইহাতের ভিতরে সে মুখ ঢাকিয়াছে—তাহার দীর্ঘ, এলমেলো চুলগুলো বৃষ্টির জলে ন্যাতাইয়া মাটির 'পরে লুটাইতেছে।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হয়ত এ অভাগীর কোন প্রাণের আত্মীয় আজ এখানে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইয়াছে, তাই এই ঝড়-বৃষ্টির অশান্ত রাতেও সে শোকের আবেগে এই ভয়ানক স্থানে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়াছে! এ-সময়ে অনেক রমণীর রমণীয় মুখও যে গিলোটিনের দাঁতের চাপে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সে কথাও তাহার অজানা ছিল না।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ দু-পা আগাইয়া গিয়া কোমল স্বরে আস্তে-আস্তে স্ত্রীলোকটিকে ডাকিল।

সচমকে মুখ তুলিয়া, রমণী তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল,—সে দৃষ্টি শূন্য, কিন্তু কী তীব্র!

এ কি! বিদ্যুতের আলোকে এ যে তাহার সেই স্বপ্নসুন্দরীর মুখ জাগিয়া উঠিল! হ্যাঁ,—ঠিক সেই মুখ! উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না—সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল!... ...

সেই পাণ্ডুর, বিষণ্ণ—অথচ অসীমসুন্দর মুখের দিকে স্থিরচোখে তাকাইয়া উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ আবার বলিল, "এমন ঝড়-বাদলে, এত রাতে আপনি এখানে কেন?"

তরুণী নীরবে গিলোটিনের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

—"চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করে' আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।"

—"আপন বলতে আমার কেউ নেই!"

—"কিন্তু আপনার বাড়ী আছে ত?"

—"হ্যাঁ।"

—"কোথায়?"

—"কবরে!"

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গের প্রাণ সে অভাগীর দুঃখে যেন গলিয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে বলিল, "আমি অচেনা বলে আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে বন্ধুর মত আমার বাড়ীতে আসুন। আমি এ সংসারে একলা বিদেশী।"

সেই গৃহহীনা সুন্দরী উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গের সরল মুখ দেখিয়া বোধহয় তাহাকে বিশ্বাস করিল। কারণ, সে তখনি উঠিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গ

তরুণীকে সঙ্গে-করিয়া উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ তাহার বাসাবাড়ীর ঘরের ভিতরে লইয়া আসিল। তাহার ঘরখানি সাদাসিধে—সাজগোছের জাঁকজমক তাহাতে একেবারেই ছিল না।

ঘরে আলো জ্বালা হইলে পর, উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ তাহার সঙ্গিনীকে ভাল-করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল। বাস্তবিক, তেমন রূপ সহজে চোখে পড়ে না! কাপড়ের ভিতর হইতেও তাহার সুডৌল গড়নটি ফুটিয়া উঠিতেছিল। তরুণীর চোখদুটি উজ্জ্বল ও ডাগর,—তবে দৃষ্টিতে এমন-একটা আশ্চর্য্য প্রখরতা আছে, যা দেখিলে মনটা কেমন দমিয়া যায়! তাহার সারাদেহে আর কোন গয়না ছিল না... ...গলার হীরাবসানো, চওড়া ও কালোরঙের বন্ধনীটি ছাড়া।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ এখন এই-বড় মুস্কিলে পড়িল যে, এত রাত্রে যুবতীকে সে কোথায় শুইতে দিবে! শেষটা ঠিক করিল, যুবতীর জন্য তার নিজের বিছানা ছাড়িয়া দিয়া, আজকের রাতটা সে অন্য-কোথাও গিয়া কাটাইবে। কিন্তু যাই-যাই করিয়াও যাইতে তাহার পা উঠিতেছিল না, এই আশ্রয়হীনা অপরিচিতা সুন্দরীর রূপের কুহকে সে একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিল।

যুবতীর ভাব-ভঙ্গীতেও একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। গিলোটিনের কোন প্রসঙ্গই সে আর তুলিল না—তাহার মুখের উপর হইতে শোকের ছায়াও সরিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া যুবক-ছাত্রটি যেমন মুগ্ধ,

যুবককে দেখিয়া সেও যেন তেমনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে! উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ তাহাকে যে আদর-যত্ন করিতেছিল, যুবতী যেন প্রাণমন দিয়া তাহা উপভোগ করিতেছিল!

মনের আবেগ যখন আর কোনমতে বাগ্‌ মানিল না, উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ তখন আপনার হৃদয়কে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। যুবতীকে সে তাহার বিচিত্র স্বপ্ন-দেখার কথা বলিল এবং জানাইল যে, চোখে দেখিবার আগে, স্বপ্নেই সে তাহাকে ভাল বাসিয়াছে!

যুবতী একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "কেন জানিনা, আপনাকে দেখে আমারও মন যেন কেমন হয়ে গেছে!"

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তবে আর আমাদের মিলনের বাধা কি? জীবনে-মরণে আমি তোমার!"

যুবতী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল,

"জীবনে-মরণে?"

—"জীবনে-মরণে!"

—"তবে, আমিও তোমার"—বলিতে-বলিতে যুবতী তাহার বুকে ঢলিয়া পড়িল। আবেগে তাহার দুইচোখ ঢুলিয়া আসিল।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ যুবতীকে চেয়ারের উপরে বসাইয়া তাহার মুখে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন-রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর যুবতীকে বিশ্রামের সুযোগ দিবার জন্য অধীর আনন্দে ঘর-ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

সারারাত সুখের উত্তেজনায় মাতিয়া সহরের পথে-পথে সে আনমনে ঘুরিয়া বেড়াইল; তারপর, উষার প্রথম আলোকে আকাশ যখন হাসিয়া উঠিল, তখন আবার বাড়ীর পথে ফিরিল।

এর মধ্যে তাহার একবারও মনে হইল না যে, প্রথম আলাপেই এই অপরিচিতা যুবতী যে-ভাবে তাহার কাছে প্রেমস্বীকার করিয়াছে, তাহা কতটা অস্বাভাবিক!

ঘ

ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ দেখিল, চেয়ারের উপরে একখানি হাত রাখিয়া, যুবতী উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

সে তাহাকে ডাকিল, কিন্তু সাড়া পাইল না। তাহাকে জাগাইয়া দিতে উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ আস্তে-আস্তে যুবতীর একখানি হাত ধরিল;... ...কিন্তু ধরিয়াই, বিদ্যুতাহতের মত সে হাত ছাড়িয়া দিল!

এ কি! এ যে মড়ার হাত! সে সভয়ে দেখিল, যুবতীর মুখ মলিন ও রক্ত-হীন! তাহার দেহে প্রাণ নাই!

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ আঁৎকাইয়া পিছনে হটিয়া আসিল। তারপর চীৎকার করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া তখনি সেই ঘরের ভিতরে ঢুকিল। তাড়াতাড়ি পুলিসও ডাকিয়া আনা হইল।

পুলিস-দারোগা ঘরে ঢুকিয়া লাশ দেখিয়াই কেমন-যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিস্ফারিত চোখে শবের দিকে চাহিয়া সে আশ্চর্য্য স্বরে বলিল, "এ কি ব্যাপার! এ লাশ এখানে এল কি-করে'?"

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এঁকে চেনেন?"

—"বল কি, এ স্ত্রীলোকটিকে যে কাল গিলোটিনে কেটে ফেলা হয়েছিল!"—এই-বলিয়া দারোগা সামনের দিকে দু পা আগাইয়া আসিল। তারপর, যুবতীর হীরা-বসানো গলাবন্ধটি টান-মারিয়া খুলিয়া দিল—শবদেহের মাথাটি অমনি ভাঁটার মত একদিকে গড়াইয়া গেল।

উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ পাগলের মত বিকটস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "পেত্নী! আমার ঘাড়ে পেত্নী চেপেছে! আর আমি বাঁচব না!"

সকলে মিছাই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল—কিছুতেই সে প্রবোধ মানিল না; তাহার দৃঢ় ধারণা হইল, কোনো প্রেতাত্মা ঐ যুবতীর মৃতদেহে ঢুকিয়া, তাহার কাছে আসিয়াছিল।... ... ...

কিছুদিন পরে পাগলা-গারদে তাহার মৃত্যু হইল।

শ্রীমতী রেণু রায়।

হিন্দোল-বিলাস

প্রাণে মনে হিল্লোল
বনে বনে হিন্দোল
মেঘে মৃদঙের বোল্ মৃদু-মন্থর;
শ্রাবণেরি ছন্দে
কদমেরি গন্ধে
আয় তুই চঞ্চল! চির-সুন্দর!
নিশাসে কি সৌরভ!
কালো চুলে মেঘ সব!
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধর্ গো;
কালো চোখে বিদ্যুৎ
কোনোখানে নেই খুঁৎ
অদ্ভুত! অদ্ভুত! তুই স্বর্গ!
আরো কাছে আয় তুই
কালো চোখে চোখ থুই
ভুলে থাকি দিন-দুই দুনিয়ার সব,
শুধু হাসি আর গান
শুধু সারঙের তান
ভালোবাসাময় প্রাণ—শুধু উৎসব।

কে গেছে কে যায় আর
অতশত ভাব্‌নার
ফুর্‌সুৎ নেই আজ নেই, বন্ধু!
তুমি আছ এই খুব
ধ্যানে ধ'রে ওই রূপ
ভর্‌পুর চিত্তের সব তন্ত।
এ মিলনে, অশ্রুর
মেশে যদি খাদ্ সুর
কি হবে তা'? হয় বা কি ভেবে বিস্তর?
কেয়া গুঁড়ি তবে মাখ্
তুলে নে রে লাখে লাখ্
জুঁই ফুল বিলকুল চুলে তুই পর।
আমি দেখি তন্ময়
চেয়ে চেয়ে মন্‌ময়
শত তারা যাক্ হেসে লাখ্ ইন্দু;—
যদিও এ বাদ্‌লায়
ঝিঁকি-ডাকা কাজ্‌লায়
নেই চাঁদ জ্যোস্নার নেই বিন্দু।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অম্‌নি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্য্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতই শিরোধার্য্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে সুরু করিয়াছে; তখন পরমাণু-তত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ওদিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মত মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগ-বখ্‌রা লইয়া সরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে এটর্ণি তার দিন গণিতেছেন; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন-এক বিপর্য্যয় লাফ মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পদচারিকরে
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল—আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার রাগেণ, যতিতালাভ্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নীচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নীচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও, ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল। বর্ষাও নামিয়াছে ট্রাম-লাইনের মেরামতও সুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্রামওয়ালা-দের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন-কাটার সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেক দিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন?

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই সহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাৎটা এই, আমাদের সয় ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গী রাস্তার পনেরো আনার হিস্‌সা ট্র্যামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজ-গমনে চলিত আজ তবে ট্র্যাম কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, "সে কি কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্র্যামের রাস্তা মেরামৎ হইবে না?"

"হইবে বই কি! কিন্তু এমন আশ্চর্য্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।"

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন—"সে কি সম্ভব?"

যা হইতেছে তার চেয়ে আরো ভালো হইতে পারে এই ভর্‌সা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে, এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সর্ব্বাঙ্গে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাৎরার মত সেটাকে দেশের চারদিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পূরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড় জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইলনা যে, জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ঐ মাথা-ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্ব্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুঁলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে সুরু করিয়া চলা-ফেরাটা পর্য্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্য্যন্ত, সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইসারাকে, গণ্ডীকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত, যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সাম্‌নে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতী চষমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটাই এই যে, কর্ত্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড় কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য্যের

সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন—"তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।"

আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্ব্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না-পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁৎ নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জ্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না-হয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরো কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ-কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা সুরু হইয়াছিল তখন খাল-খন্দর মধ্য দিয়া চাকা-দুটোর আর্ত্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মত শোনাইত না। পার্লামেণ্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর-এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই ষ্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জ্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদ-ওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন-এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেণ্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়ার্লণ্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ্দ দেওয়া যায়; ভারতবিভাগের ফর্দ্দটাও নেহাৎ ছোটো নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্ত্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্য্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে-অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরইত হাত দেখা যায়। এ সকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ-কথায় কারো মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্ত্তে ঘাড়-মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছ-মোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জ্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড় কথা আমাদের বলিবার আছে,—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্ম-কর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড় হয়। কেবল পল্লীসমাজে, বা ছোটোছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড় পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক

মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্ব্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড় অমঙ্গল। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। অতএব ভুল-চুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি না-ছোড়বান্দা হইয়া কোনো একগুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সেদিক হইতে সে interned হইতে পারে কিন্তু এদিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্ত্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি, "তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য্য করিবার জন্যই আমাদের নত-শিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড় অপমানের কথা আমরা মানিব না," তবে চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্ত্তা তখনি সামাজিক internment-এর হুকুম জারি করেন। যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝট্‌পট্‌ করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা, নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিৎপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গীর তফাৎ। চিৎপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিৎ হইয়া রহিল। চৌরঙ্গী বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত-দুটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গী এই কথা মানে বলিয়াই জগৎটাকে হাত করিয়াছে, আর চিৎপুর তাহা মানে না বলিয়াই জগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুর তারা উল্টাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘর-গড়া কুণো নিয়মকেই সব চেয়ে বড় মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ, সমৃদ্ধিলাভ, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিৎ। ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এতবড় মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উল্টাইয়া দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। সেই কর্ত্তাটিকে,—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা, মনসা, ওলাবিবি, দক্ষিণরায়, শনি, মঙ্গল, রাহু, কেতু,—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুক্‌রা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজী পাঠক বলিবেন—আমরা ত এসব মানিনা! আমরা ত বসন্তর টীকা লই; ওলাউঠো হইলে নুনের জলের পিচ্‌কিরি লইবার আয়োজন করি; এমন কি, মশা-বাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজো আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি;—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোন্‌টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ঐ মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জ্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অথণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলি বলে, কি জানি, কাজ কি! ভয় জিনিসটাই এই রকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনোএকটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্ম্মকেই ভুলিয়া যায়,—যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায়-রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেষ্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড় মনে করে,—এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেইত বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিম্বা ছোটো লোভ, কিম্বা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোট চাতুরী। আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্ম্মটাকে বিসর্জ্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাশ করি—"কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম"—এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলি ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্ত্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে-দশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্ত্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার

জল ফেলিতে হইবে, ক'-হাত ঘেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কি গুণ রুটিরই বা কি, ম্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কি আর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া জলেরই বা কি, কর্ত্তার ইচ্ছার উপর বরাৎ দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মত সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানি-পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বাল্‌তিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি-মিঞা ফিল্‌টার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা ত তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা ত কর্ত্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্ত্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসৎকার নয়, অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্য্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবর্দস্তিদ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া-ছোঁওয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্র-ব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গল কাব্যে। চাঁদ সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ, তাই যে-দেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদুঃখে তারই শক্তির কাছে তাকে হার মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায় ধর্ম্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র যতই যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ঙ্কর, ততই তার কাছে নতিস্তুতি। বিশ্বকর্ত্তৃত্বের এই ধারণার সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকাতেই তার খবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্ব্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেব-চরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্র-তন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতো'র্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে-বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্য কাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্য বিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্ম্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেন না, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই! এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথ রূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এত বড় একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে,

ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিঁকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্র-তন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্ব্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এত বড় সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কি পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে-মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাৎ করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপোস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মত উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে বিচারে যত সঙ্কীর্ণতা, যত স্থূলতা, যত মূঢ়তাই থাক্ উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে! গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, "যে-মানুষ আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্ব-ভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে," অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, "যে-বেটা সর্ব্বভূতকে যত-দূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা নাপিত বন্ধ,"—আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল—"বাবা বাঁচিয়া থাক!" এই জন্যই এদেশে কর্ম্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্ম্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার!

য়ুরোপে ঠিক ইহার উল্টা। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে-কোনো খুঁৎ দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এই জন্য সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল

মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়,—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে। এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্ম্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে-য়ুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর-সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি, যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন হোক্,—উপর হইতে যেমন-খুসি নিয়ম হানিবে আর আমরা বিনা খুসিতে সে-নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্ত্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া উঠে, ওটাকে এমন-একটা চাকা-ওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হোক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পরি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্ত্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনায় আমরা যে যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্ম্মে,—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্ত্তাভজা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্তত একটা ফাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে এটাও শুভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে-আত্মাভিমান আমাদের শক্তিকে সমুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে-আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মত বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক্! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্ত্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, "খবরদার, ধর্ম্মতন্ত্রে, সমাজ-তন্ত্রে, এমন কি, ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্ত্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না,"—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভি-মানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে, আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওপ্‌ড়াও ঐ বেত-বনটাকে!" ভুলিয়া গেছে বেতবনটা গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই, বাঁশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই, অপরাধটা এই যে, সত্যের জায়গায় আমরা কর্ত্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো ঝোপে-ঝাড়ে বেত-বন আমাদের জন্য অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্ম্মতন্ত্রের শাসন একসময় য়ুরোপেও প্রবল ছিল।

তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড় সুযোগ ছিল। কেননা য়ুরোপীয় ধর্ম্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্ম্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলণ্ডে আজো তার কোনো চিহ্ন নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু বড় ঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। এক সময়ে যাদের কাছে সে নথ-নাড়া দিয়াছে, ন্যায়ে অন্যায়ে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোষের জন্য সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্ব্ব-দস্তুরমত বুড়িকে হপ্তায় হপ্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্য করে না। এই গৃহিণীর দাব-রাব যদি পূর্ব্বের মত থাকিত তবে ছেলেমেয়েদের কারো আজ টুঁশব্দ করিবার জো থাকিত না।

ইংলণ্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে কিন্তু স্পেন এখনো সম্পূর্ণ কাটায় নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে আষাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বুড়ি বসিয়াছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে এতটা দৌড় দিল তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কি? তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেক দিন আগেই সেদিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা যায়, যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সেদিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্ম্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাঁধা তার নৌ-যুদ্ধ বিদ্যাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জল-হাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বাঁধি-নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি তার কৌলীন্য যেম্‌নি থাক্ সে ইংরেজ যুদ্ধজাহাজের সর্দ্দার হইতে পারিত কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারো অধিকার ছিল না।

আজ য়ুরোপের ছোটোবড় যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব আল্‌গা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণ-সমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা নাই—যেমন রাশিয়ায়—সেখানকার সমাজ বেওয়ারিশ ক্ষেত্রের মত নানা কর্ত্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালের পুঁথি পর্য্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অন্যায় খাজনা আদায় করে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্ম্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লী করিতে থাকে। তখন স্রোত

চলে না, মরুভূমি ধূধূ করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ করিয়া না মান' তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক্, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খৎ দিতে হইবে। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক্ পূজনীয়, ধর্ম্মতন্ত্র বলে যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কালেজে পাশ-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এখন সময় বাড়ি যাঁর তিনি র'জার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন—"আপনার মুখে পান!" গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথী মুসলমান। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই, "সারথী যেই হোক্ মুখের পান ফেলা যায় কেন?" ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে বা কর্ম্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না থাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে-দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত সে-দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টি সৎকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেই-ভাবেই দেখেন একজন আর্টিষ্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে,—তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক। ষ্টীমারের ঘাটে ঘাটে রেলোয়ের ষ্টেশনে ষ্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শান্তিই

দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানৎ-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে-সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অন্তরায়কে আকাশ-পরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কাণা-বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড় যে-সম্পদ দিয়াছেন —ত্যাগ স্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবী বাজে খরচ। আজ তারই নিকাস আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের ফর্দ্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই ত ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্ব্বনেশে। যে-অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্য্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা না আছে চারিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তবুত সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিম্বা নিজের জন্য করিত। সে কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে কিম্বা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধর্ম্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অনুগত দাসের মত যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এই জন্যই আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর

উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, "নিজের মজুরী দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব। তারা ভাবিল পুণ্য হইবে ঐ সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরী জোগাইব আমরা, এটা ফাঁকি!" সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।

এই যে অটল দুর্দ্দশা, এর কারণ,—গ্রামের যা-কিছু পূর্ত্তকার্য্য তা এ পর্য্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাৎ হয় বিধাতার পরে নয় কোনো আগন্তুকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনো সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্ম্মকর্ম্ম ভালোমন্দ শোওয়া-বসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারিনা, কেননা, বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কলেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারত-বর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইঁহাদের ভারি গর্ব্ব—বলেন, ওটা বড় উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না, বলেন, ঐ কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড় শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ; যমলোকের যত-গুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচার বুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, "ঐ অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সায়ান্স্ শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।" অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর ষোলআনা ঝোঁক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক্ হইলেই এত দুর্জ্জয় কানমলা; সমস্ত গুরু পুরোহিত, তাগাতাবিজ, সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হোক্, "পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হোক্" বলিয়াই যখন আশীর্ব্বাদ করা হইল

তখন দয়ালু লোক এ-কথাও বলিতে বাধ্য যে, "মানুষদের কাঁধে করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও!" যতরাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়—তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্তু দুই বিপরীত কুলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্ত্তের ঘড়া-ঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না!

অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত যে দুঃখ দারিদ্র্য তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই, রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বুকে শেল হানিয়াছে এ-কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারী বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগ্‌জামিন পাস করি। এ-কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কন্‌গ্রেস বল, লীগ্‌বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন য়ুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্ম্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশোজন ইংরেজ বলিতে পারে ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভাল কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশো ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ কর।" তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজার জন ইংরেজ রাজসভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে, যে ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্ত্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্ তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ কর!"

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল, উচ্চতর জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের

দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্ম্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই—তারপর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই,—অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্য বোধ করি মনে মনে আপ্‌সোস্ করেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের দুটো একটা জানলাদরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি,—কিন্তু তবু একথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহা, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্ব্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্য আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই;—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিম্বা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মার্ল সাহেব ভারতসচিব হইলে হয় ত আমাদের সুদিন হইবে নয় ত আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্যে, হয় আমাদের মাটির তলার সুরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে। হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না,—এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড় সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহঙ্কার সমস্তরই লীলা চলিতেছে, কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে, যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্রলোভে লুব্ধ, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তাহার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়,—সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভীতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ গবর্মেণ্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুইপক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্ব্বলতার যোগে চরম দুর্ব্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনি জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের

অধঃপতনের গর্ত্তটা তখনি গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্ব্বলের পক্ষে যতবড় শত্রু, দুর্ব্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম-বড় শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা প্রায়ই বল পুলিস তোমাদের পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না কিন্তু তোমরা ত তার প্রমাণ দাও না।" বলা বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি কর একথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াইত গায়ের জোরে নয়, সে ত তেজের লড়াই, সে তেজ কর্ত্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য এক-দল লোকের ত বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেণ্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালৎ-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারী ষ্টীমার, আর গরীব ফরিয়াদীকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর। এর পরে আর হাত পা চলে না। প্রেষ্টিজ্! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ঐ ত কর্ত্তা, ঐ ত আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঐত বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম্ম সকলের উপরে ওকেই ত পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে! অতএব

যা দেবী রাজ্যশাসনে
প্রেষ্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই ত অবিদ্যা, ইহাই ত মায়া। যেটা স্থূলচোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য আমাকে লইয়াই গবর্মেণ্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী —সেই বল আমারও বল। ইংরেজ গবর্মেণ্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেষ্টিজ্ দেবতা নর-বলি দাবী করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ কথার উত্তরে শুনিব "রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিকভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম-পন্থা—নয়ত প্রেস্ এক্টের মুখ-থাবার নীচে পরম-নিঃশব্দ নরম পন্থা!"

হাঁ, "বিপদ আছে বই কি, তবু জ্ঞানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে

কিম্বা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, বিরুদ্ধেই দিবে।"

"এ কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে!"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই প্রশংসা কিম্বা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।"

"একথাও ঠিক! তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।"

"এতটা কি আশা করা যায়?"

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়! গবর্মেণ্টের কাছ হইতেও আমরা বড় দাবীই করিব কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরো বড় দাবী করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবী টিঁকিবে না। এ কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্ব্বল; কিন্তু সকল বড় দেশেই প্রত্যেক দিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যাঁরা সকল মানুষের প্রতিনিধি—যাঁরা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যাঁরা সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্ব্ব প্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার—ভীতিকে নয়, ভীতিকে নয়! ধর্ম্ম আছে, অতএব মরা পর্য্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে কর ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জ্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড় কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মন্ত্র পড়িয়া মারিয়া-ধরিয়া ভূতের ওঝার মত বিষম ঝাড়াঝুড়ি সুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব,—"দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।" তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, "তুমি কে হে! আমি ডাক্তার যাই করিনা তাই ডাক্তারি!" ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাঁকে আমার একথা বলিবার অধিকার আছে "যে-ডাক্তারি তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড় বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য!"

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড় জোর ঐ ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে—কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়ীতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে, নিজেকে তার চেয়ে বেশী মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা

নয় কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সায় না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়শো বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলা দেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালীর নাই এতদিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেল্‌জিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্ত্তা, তখন সমুদ্রের পূর্ব্বপারে এমন নীতি কি একদিনো খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালো-মন্দ সুখ দুঃখে বাঙালীর কোনো মাথা-ব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? একথা কি নিশ্চয় জানিনা যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক্ অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড় দলিল করিয়া চলিব,—এ কথা তাকে কখনই বলিতে দিব না যে, ভারত-বর্ষকে আমরা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মাছ-কাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ, বিজ্ঞান, এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্ম-কর্ত্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজশাসনের বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্ত্তাদের স্মরণ করাই-বার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুইপক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—"জন-সাধারণের আত্মকর্ত্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।" একথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালীর ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আগুনে কাৎলি চড়ানো হইতে

সুরু করিয়া ষ্টীম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতি-হাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল জাপানে তাহা শিকড় সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্ত্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্ত্তৃত্বের চর্চ্চা। ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া-হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্ত্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর-কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে দু'পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক্ করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড় আশা টঁকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্ত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য্য তখন পূর্ব্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক্ করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জন-সাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে—সে সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না! যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে বীভৎসতা ত থাকিতই, আবার সেই পাপের স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্ত্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এককোণের বাতি জ্বালাইবার দাবী নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের যে-সল্‌তে দিয়াই হোক্ আলো জ্বালাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পূরা জ্বালাইয়া উঠিতে পারে নাই—তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছু-কাল হইতে নিবিয়া গেছে—তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমা দের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদিগকে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিষেধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী যজমানকেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়ার নামে সে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়—আর গরীবের বেলায় তার ব্যবহার উল্টা—এটা ত সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জারূপে অন্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধ রূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উঁহাদের মধ্যেও আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম্ম কখনই চিরদিন ধার-করা বার্দ্ধক্যের মুখস পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ ইতিহাস-বৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মত মানুষ চাই যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্কার সহিতে প্রস্তুত। যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি! আপনাকে জান।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন! ওরে অকাল-জরা-জর্জ্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মত কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহঙ্কার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহঙ্কার কেবল আপন গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্দ্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহাসত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু

শতাব্দীর আবর্জ্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতনযুগের প্রভাতসূর্য্যকে ম্লান করিল, নব-নব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্ম্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুজয়ী, যে চিরজাগরূক, চির সন্ধান-রত, যে বিশ্বকর্ম্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতি-রালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাঁহার জয়ধ্বনি উচ্ছসিত হইয়া দেশেদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মত আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এস প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও! আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু—ডাক আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে! দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্ব্বাসন গ্রহণ করুক!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী;
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব, তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ঐ, ভারতবু কই?

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

নিশ্চল নির্ব্বীর্য্যবাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
গত গৌরব, হৃত আসন, নতমস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নরসমাজ মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা,
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
আত্মঅবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে,
ছায়াভয়চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে—
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরূপবজ্র *

যে দু-তিনটি প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রদ্যোতে বঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পকুঞ্জ প্রোজ্জ্বল, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদেরই মধ্যে এক-জন; সুতরাং বাঙ্গলা আর্টের খবর যাঁহারা একটু-আধটুও রাখিয়া থাকেন, গগনেন্দ্রনাথের রেখাকাব্যের সঙ্গে তাঁহারা যে পরিচিত, তাহা অনায়াসে বলা যায়।

চিত্রমাত্রই হয় বর্ণকাব্য, নয় রেখাকাব্য; অনেকের ছবিতে রঙের লীলা যতটা বেশী দেখা যায়, রেখার খেলা ততটা নয়; রং সেখানে রেখাকে প্রায় পুরোপুরি গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের একটা আসল গুণ এই যে, তাঁহার নিপুণ হাতে তুলির মুখে রং আর রেখা সমান অবলীলায় খেলিতে পারে; বেশীরভাগ, ধরিতে গেলে—তাঁহার অনেক ছবিই একেবারে রেখা-প্রধান। ছবির সূত্রপাত যে রেখায়, চিত্রশিল্পের এই মূল নিয়মটি তাঁহার আলেখ্যের মধ্যে বেশ জাজ্বল্যমান।

প্রতীচ্যের আর্ট বর্ণপ্রধান, আর প্রাচ্য আর্ট রেখাসর্ব্বস্ব না হইলেও বিশেষ করিয়া রেখার ভক্ত বটে। য়ুরোপের অনেক খ্যাতনামা চিত্রকরের পট হইতে যদি রং মুছিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার 'চিত্রত্বের' অস্তিত্ব বোধ হয় কিছুমাত্র থাকে না; কিন্তু ভারতীয় চিত্র হইতে অনেকসময়ে বর্ণকে বাদ দিলেও চিত্রিত বিষয়টি পরিস্ফুট থাকে এবং ছবির মূর্ত্তিও তাহাতে মরিয়া যায় না;—কেননা, বর্ণ এখানে রেখাকে ফাঁকি দিয়া আড়ালে রাখিয়া সমস্ত বাহাদুরিটা নিজের ভাগেই টানিতে চায় না—রেখা আর বর্ণ দুইই এখানে ছবির বিষয়টি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। অবশ্য, এ নিয়ম যে সব-জায়গাতেই সমানভাবে খাটে, তা-নয়; তবে এটিকে সাধারণ নিয়ম বলা চলে।

রেখাপাতে গগনেন্দ্রনাথের কায়দা-কৌশল চমৎকার! তাঁহার ছবির প্রত্যেক রেখাটিতে জীবনের যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহাতে অবাক মানিতে হয়; পরন্তু, ছন্দে, সামঞ্জস্যে, অনায়াস গতিতে ও অনাহত ভঙ্গীতে এবং বিচিত্র কোমলতায় তাঁহার রেখাগুলি অপূর্ব্ব। তাঁহার হাতের এমন রেখা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা,—যাহা দুর্ব্বল বা আড়ষ্ট বা বেখাপ্পা। অনেকসময়ে এক-একটি তুলিকাঘাতে, সলীল রেখার এক-একটি টানে তিনি একেবারে একটি আস্ত মুখ বা দেহ আঁকিয়া তুলিয়াছেন—একালে, রেখা-পাতে এতটা দক্ষতা বড়ই দুর্লভ। যাঁহাদের সামান্য চিত্রবোধ আছে, তাঁহারা গগনেন্দ্রনাথের অনেক ছবি দেখিলে সমগ্র চিত্রের ভাবের ঐশ্বর্য্য বা বর্ণের সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া, কেবল তাহার একাংশের একটি মাত্র জীবন্ত রেখার টান লইয়াই বিভোর হইয়া থাকিবেন। তাহার উপর, তিনি কখনো অকারণ রেখা-বাহুল্যের পক্ষপাতী

* ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

নন; একটি ভাব বা ছবি ফুটাইতে তিনি যত-পারেন তত-কম রেখাপাত করেন; বাহুল্য যে আর্টের মস্ত শত্রু, এ তিনি কখনো ভুলেন নাই।

গগনেন্দ্রনাথের আর-একটি বিশেষত্ব, তাঁহার অঙ্কিত অনেক চিত্রে কবিতা যেন শরীরিণী। সে-সব ছবি যেন রেখা-বর্ণের মধুর লিরিক,—তাহাদের ভিতরকার সুরের লীলা, ছন্দের নাচ ও তালের মাত্রা প্রাণের কাণে যেন শোনা যায়! চিত্রকে এমনি কাব্যের মত বিচিত্র করিয়া গগনেন্দ্রনাথ দর্শকের চিত্তকে কল্পনার মায়াপুরীতে উধাও উড়াইয়া লইয়া যান।

সংপ্রতি গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্র-প্রতিভাকে একটি নূতন পথে লইয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে, আমরা তাঁহার অঙ্কিত "বিরূপবজ্র" নামে ব্যঙ্গচিত্রাবলীর বইখানি পাইয়াছি। প্রথমেই শিল্পীর যে গুণ ও বিশেষত্বের কথা বলিয়াছি, এই ব্যঙ্গচিত্রাবলীও ঐ-সকল গুণে ও বিশেষত্বে বিশেষরূপে বিশিষ্ট।

য়ূরোপীয় চারুশিল্পে ব্যঙ্গচিত্র একটি প্রধান অঙ্গ। 'কার্টুন' আঁকিয়া সেখানকার অনেক আর্টিষ্ট সুধু যে সুনাম কিনিয়াছেন, তা নয়; —অমর হইয়া গিয়াছেন। সাহেবদের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সকলেই এই ব্যঙ্গচিত্র দেখিতে যে কতটা লালায়িত, "পাঞ্চ" ও "পাক্" প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রেভরা কাগজের দেশযোড়া নাম-ডাক্ ও অগুন্তি কাট্‌তিই তাহার প্রমাণ। বাক্য-বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ না করিয়া ব্যঙ্গচিত্রকারীরা প্রতীচ্যের রাজনীতি ও সমাজনীতির বড় বড় গলদ এবং তরল দিকটি চোখে আঙ্গুল দিয়া সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যঙ্গচিত্রের শিল্পীরা সেখানে এত-বেশী শক্তিশালী যে, সময়ে-সময়ে এক-একখানি একরত্তি ছবি অত-বড় য়ূরোপকেও রীতিমত নাড়া দিয়া সাড়া তুলিয়াছে। যাঁহাদের নামের ডাকে গগন ফাটে, দেশে বা সমাজে যাঁহারা মোড়ল ও খয়ের-খাঁ, একটি আঙ্গুল হেলাইলে যাঁহারা অনেককে ধনে-প্রাণে মজাইতে পারেন, ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীদের বেপরোয়া তুলিকে তাঁহারাও ভয়ে-ভয়ে দস্তুরমত সমঝাইয়া চলেন; কেননা, য়ূরোপের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি এবং দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের নায়ক প্রভৃতি সকলকার মাথার উপরেই ব্যঙ্গ-চিত্রের এই অমোঘ বজ্র অষ্টপ্রহর উদ্যত হইয়া আছে;—একটু ভুল-চুক হইলেই, একবার পা ফস্কাইলেই আর মুখ রাখা দায়! সেখানে এমন নামজাদা লোক বোধহয় একজনও নাই, ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীরা যাঁহাকে মানে-মানে রেহাই দিয়াছেন। ব্যঙ্গচিত্র বড় নির্দ্দয়;—এ কথা কয় না, গৌরচন্দ্রিকা করে না, গোলে-হরিবোল দেয় না, সুধু নীরবে দশের সামনে হাটের মধ্যিখানে গাধার গা থেকে সিংহের চামড়া খুলিয়া তাহার লম্বা কাণ জাহির করিয়া দেয়! দুর্জ্জনদলনে এ হচ্ছে অব্যর্থ পাশুপত অস্ত্র!

বাঙ্গলাদেশে ব্যঙ্গচিত্র এতদিন ছিল না বলিলেই চলে। দেশী খবরের কাগজে রাশি-রাশি যে-সব ছবি পত্রস্থ হয়, সেগুলি নামেই ব্যঙ্গচিত্র, গুণে অষ্টরম্ভা! সে হচ্ছে ব্যক্তিত্বের প্রতি হিঁস্‌কুটের গরলোদ্গার, ব্যক্তি-গত ঝগড়ার ঝাল-ঝাড়া, তাহার ভিতরে না আছে সার্ব্বজনীনতা, না আছে কলাকুশলতা



শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত।

না-আছে রসিকতা বা ভাবুকতা! অবনীন্দ্র-নাথের দেশীয় চিত্রে ও কালিঘাটের পটে যতটা তফাৎ, গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রের সঙ্গে ঐ-সব কাগুজে হিজিবিজির প্রভেদ ঠিক ততটাই! এখানে তুলনার কথা তুলিলাম এইজন্য যে, গগনেন্দ্রনাথের "বিরূপবজ্রে"র স্বরূপ বুঝিতে কেউ যেন দেশী কাগজের কুরূপ "কার্টুন"গুলোকে বুঝিয়া না বসেন!—

খবরের কাগজের এই-সব 'কাকের ছানা বকের ছানা"র কথা ছাড়িয়া দিলে, বঙ্গদেশে ব্যঙ্গচিত্রের রঙ্গভঙ্গ আর-কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল ওস্তাদ-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দিনকতক আগে একবার ব্যঙ্গ-রসে তুলি ডুবাইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের মত এ-রকম বিশেষভাবে এদিকে তিনিও ঝোঁক দেন নাই।

অল্পদিনের ভিতরেই গগনেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছেন অনেক। বিষয়-বৈচিত্র্যে যেমন, অঙ্কন-নৈপুণ্যেও সেগুলি যে তেমনি উপভোগ্য, এ-কথা বলা বাহুল্য। দেশের, সমাজের, সাহিত্যের ও ধর্ম্মের কৃত্রিম ও বিকৃত নানান্ মূর্ত্তি এই সব ছবিতে সারি-সারি সাজানো। এগুলির ভিতরে কলা-কৌশলের সঙ্গে শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি, পর্য্যবেক্ষণ-পটুতা, রসগ্রাহিতা ও চিন্তাশীলতাও যথেষ্ট রূপে বিকাশপ্রাপ্ত। দেশের ও দশের জন্য গগনেন্দ্রনাথের বুকে যে ব্যথা বাজে, ভণ্ডের ভণ্ডামি যে তাঁহার চক্ষুশূল, এই চিত্রাবলীতে সে পরিচয়ও তিনি ভাল-করিয়াই দিয়াছেন।

ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"When deformities grow unchecked but are cherished by blind habit it becomes the duty of an artist to show that they are ugly and vulgar and therefore abnormal." বাস্তবিক্, ব্যঙ্গচিত্র বলিয়া এ ছবিগুলিকে যিনি হাল্‌কা ভাবে দেখিবেন, তিনি ভুল করিবেন। যাঁহারা ভাবুক, গগনেন্দ্রনাথের এই বিচিত্র তুলির লিখনে তাঁহারা ভাবিবার অনেক খোরাক পাইবেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে দু-চারিটি কথা বলিয়া লইতে চাই। গগনেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নালিশ হইয়াছে, তিনি নাকি সমাজ-বিশেষকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই ছবি আঁকিতেছেন। এ নালিশ ডাহা মিথ্যা। কারণ, কোন-একটি বিশেষ সমাজকে তিনি ছবির মডেল করেন নাই বা কোন সমাজের প্রতি বিদ্বেষ আছে বলিয়াও তুলি ধরেন নাই। ইহার প্রমাণ "বিরূপবজ্রে"র ভিতরে জলন্ত। তাঁহার আঁকা দু-একখানি মাত্র ছবি দেখিয়াই একটা বিরোধী মত খাড়া করিয়া নেওয়া বিবেচনার কাজ নয়। যিনিই গগনেন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যঙ্গচিত্র দেখিবার সুযোগ পাইবেন, তিনিই বুঝিবেন, বাঙ্গলা দেশের পুরাণো ও নূতন সমাজের এবং ছোট-বড় সকল সম্প্রদায়েরই অপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি শিল্পী স্পষ্টভাবে ও নির্ব্বিচারে জাহির করিয়া দিয়াছেন। গগনেন্দ্রনাথ গগনের মতই পরম উদার,—ভণ্ডামি ও নষ্টামির উপরেই তিনি কঠোর হইয়া ঘা মারিয়াছেন—সে-সব ভণ্ড প্রাচীন কি নব্যসমাজের লোক, ধর্ম্মে তাহারা হিন্দু কি ব্রাহ্ম—এমন বাচবিচার কোথাও রাখেন নাই। বিশেষ, কোন সমাজেরই যথার্থ গুণের উপরে খোঁচা মারিয়া তিনি অভদ্রতা ও কুরুচির প্রমাণ দেন নাই, পরন্তু, পাকা ডাক্তারের মত কেবল রোগদুষ্ট স্থানেই অস্ত্র চালাইয়া গিয়াছেন। অবশ্য, রোগী কখনো চুপ-মারিয়া বসিয়া-বসিয়া নিজের গায়ে ডাক্তারকে ছুরি খোঁচাইতে দেয় না। হয়ত, গগনেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমরা যে-সব অভিযোগ ও গোলোযোগ শুনিতেছি, সে হচ্ছে পীড়িত সমাজপতিদের ভীত আর্ত্তনাদ!

গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রগুলি ঝক্‌ঝকে আয়নার মত—এ আয়নায় অনেক বাঁদর, অনেক গাধা ও অনেক গরুই আপনাদের কুৎসিত মুখ দেখিয়া, নিজের-নিজের জাতিসুলভ স্বরে চেঁচামেচি সুরু করিবে। যে-সকল অপূর্ণতা সত্যই ব্যঙ্গযোগ্য, সেগুলিকে বাছিয়া লইয়া তিনি অনেক অবিকল Type তৈরি করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের দোষ তাঁহার লক্ষ্য নয়—এক-এক সম্প্রদায়ের অনেক লোকের ভিতরে যে-সব দোষ আকৃচার নজরে পড়ে, তাঁহার লক্ষ্য সেই দিকেই। তাঁহার অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রের মানুষ-গুলি তাই Typical হইতে পারিয়াছে; এবং এই ছবিগুলি দেখিলে তাই প্রত্যেক দোষীই ঠওরাইয়া লইবে,'আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এ ছবিখানা নিশ্চয় আঁকা হইয়াছে!' আমাদের ভরসা আছে যে, 'ঠাকুরঘরে কে?' বলিলে যাহারা চট্‌পট্ কদলী-ভক্ষণের বিরুদ্ধে যাচিয়া সাফাই দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, সেই দলের বোকা দোষীদের অনেকেই এই ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়া হাটের মাঝে নিজের হাঁড়ি নিজেই ভাঙ্গিয়া বসিবে!

গগনেন্দ্রনাথের চোখ আসল ব্যঙ্গবস্তু চিনিতে জানে। যাহা ব্যঙ্গের অযোগ্য, তাহাকে উপভোগ্য করিবার জন্য কোথাও তিনি কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেন নাই। তাহার উপরে, ব্যঙ্গচিত্রকারীর আর-একটি যে মস্ত গুণ—তীক্ষ্ণতা, সেটিও তাঁহার প্রত্যেক ছবিতে বিলক্ষণ আছে। ব্যঙ্গ যদি ভোঁতা হয়, তবে একেবারে অকেজো হইয়া যায়। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ শাণ্-দেওয়া ছোরার মত ধারালো—ভণ্ডের শক্ত চর্ম্মে ঠেকিয়া তাহা ফেরে না—মর্ম্মে গিয়া বিঁধিয়া একেবারে মর্ম্মান্তিক জ্বালায় তাহাকে জ্বলাইয়া মারে।

"বিরূপবজ্রে" গগনেন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হয় নাই; বর্ত্তমান সংগ্রহে তেরখানি নানাশ্রেণীর ছবি ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই তেরখানি ছবিতেই চিত্রকারীর সমস্ত বিশেষত্ব ও নিজস্বের পরিচয় আছে। গভীর ভাবব্যঞ্জক ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য-রসের চিত্র আঁকিয়া গগনেন্দ্রনাথ এতদিন উঁচুদরের ভাবুক শিল্পী বলিয়া রসিক-সমাজে বিখ্যাত ছিলেন; সংপ্রতি রঙ্গব্যঙ্গের এবং কৌতুক রসের যৌতুক হাতে-করিয়া তিনি অবসর-আসর জমাইতে আসিয়াছেন; এই নূতন রসবিকাশেও তিনি যে কৃত-বড় একজন ওস্তাদ, "বিরূপবজ্রে"র প্রত্যেক চিত্রই তাহা প্রমাণিত করিবে।

সর্ব্বশেষে, "বিরূপবজ্রে"র ছবিগুলির যৎসামান্য পরিচয় দিয়া আমরা বিদায় লইব।

১। ব্যঙ্গ—[অর্থাৎ বঙ্গের ইংরেজী কায়দায় (Banga) উচ্চারণ]। চিত্রকর কল্পনা করিয়াছেন, একটি টবের ভিতরে গাছের বদলে এক ভুঁইফোড় ও দ্বিজাতীয় পোষাক-পরা অদ্ভুত জীব দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বামঅঙ্গে মনোকৃল, কলার, নেকটাই, সার্ট, কোট, পেণ্টুলেন ও স্যু এবং দক্ষিণ অঙ্গে চাদর, পাঞ্জাবী, ধুতি, ছড়ি ও নাগ্‌রা। ইনি হচ্ছেন একালের অনেক দ্বিজাতীয় বাঙ্গালীর নিখুঁত আদর্শ; হরি-হরের মত ইঁহাতে আধা-সাহেবী ও আধা-দেশীয় ঢংএর মিলন হইয়াছে। রুডিয়ার্ড

কিপ্‌লিং কবিতায় বলিয়াছিলেন, প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মিলন অসম্ভব; এ নক্‌সাখানি দেখিলে অমন কথা কি তিনি ভ্রমেও মুখে আনিতেন?

২। দেশীলোকের উদ্যানে ভোজের দৃশ্য। নব্যবঙ্গের ফেরঙ্গ ধরণ-ধারণ, এ ছবিতে ঠিক্‌ঠাক্ ফুটিয়াছে। নিমন্ত্রণকারী ও নিমন্ত্রিতরা সবাই যে এদেশী,—চিত্রকর যদি নিজেই সে পরিচয়টা না দিয়া দিতেন, তবে কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। কারণ, বাবুদের সাবানকে-হার-মানানো কাককৃষ্ণ বর্ণ ছাড়া, চেহারায় দেশীয়ত্বের আর-কোন ল্যাঠা নাই। তাঁহাদের হাব-ভাব সাহেবী, পোষাক সাহেবী, খানাপিনাও সাহেবী। অনেকের হস্তধৃত পাত্রে আবার মহিমময়ী ঢলঢলায়মানা বোতলেশ্বরী সগৌরবে অবতীর্ণা। এই অবাক-ভোজ দেখিয়া, নব্যবঙ্গের নিকটে রসিক চিত্রকর একটি সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন,ইহাদের মধ্যে দেশী লোক কোন্‌টি? এই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া দেখি, সভার ঠিক মাঝখানে একটিমাত্র দেশীলোক খাড়া আছে—সে বাবু-সাহেবদের খানসামা! এই একটিমাত্র খানাসামার দেশী পোষাকের পাশে আর-সকলকার ফেরঙ্গ বেশ কী বিসদৃশ দেখাইতেছে! অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসেই বোধকরি এই কালো সাহেবদের তুচ্ছ ভৃত্যের গাত্রবর্ণও গৌর হইয়া উঠিয়াছে!

৩। বিদ্যার কারখানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার খোলা; দলে-দলে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যসুন্দর যুবক ছাত্র ভিতরে ঢুকিতেছে —তাহারাই বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা; ভিতরে বিদ্যার বিরাট কারখানা—উপরে কর্ত্তৃপক্ষরা পাহারায় নিযুক্ত। চিমনি দিয়া ধূম বাহির হইতেছে—প্রকাণ্ড গ্রন্থ-যন্ত্র পুরাদমে চলিতেছে এবং তাহারই কঠোর চাপে আষ্টেপৃষ্টে থেঁৎলাইয়া বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ শিবরাত্রির সল্‌তেরা যখন বাহির হইয়া আসিতেছে, তখন তাহাদের আর সে জোরালো গড়ন ও সুশ্রী চেহারা নাই; বিদ্যাযন্ত্রের পেষণে হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া তাহারা তালপাতার সেপাই হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কাহারও দেহে ধুতি-চাদর—বোধ হয় কেরাণী; কাহারও পরোণে চোগা-চাপকান-সামলা—নিশ্চয় উকিল; কেহ হাত-পা ছড়াইয়া পপাত ধরণীতলে—সম্ভবত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত; কেহ মাটিতে বসিয়া —হয়ত দাঁড়াইতে পারে না; কেহ লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া—বুঝি চলিতে পারে না! আর একদিকে কাতারে-কাতারে কলেজ-আউট ছোকরা একটা স্তম্ভের তলায় জমায়েৎ হইয়া বেজায় হৈ-চৈ সুরু করিয়াছে; —ব্যাপার কি? উপরপানে চাহিয়া দেখি, থামের মাথায় মস্ত-এক টোপর—তার তলায় আঁকা সোনার চাঁদ ও একটি তারার গায়ে লেখা বি-এ (বিয়ে?)! তখন বুঝিলাম, বিদ্যাযন্ত্রের চাপ্‌ ও ছাপ্‌ খাইয়া বাহির হইয়াই এতগুলো বামন ঐ সোনার চাঁদ ধরিবার ফিকিরেই ওখানে গিয়া লাফালাফি করিতেছে!

৪। স্বদেশীর সম্মান বা পরভৃতের কাকলী। রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরা। দরজা যুড়িয়া এক লম্বসার্ট-কোট-প্যাণ্ট-পরিধৃত হোঁৎকা বাবু-সাহেব;

—তাঁহার মাথায় সাড়ে-পনেরোআনা-আধআনা ফ্যাসানে ছাঁটা চুল, ডানহাত সাহেবীধরণে পকেটস্থ, বাঁ-হাঁতে বংশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মত সধূম্র চুরোট এবং এক-পা আগে-বাড়ানো—নূতন আরোহী যাহাতে গাড়ীতে উঠিতে না পারে। বেঞ্চের তলায় একটি চামড়ার কেশ—তাহার উপর এই ইঙ্গ-বঙ্গ পুরুষ-পুঙ্গবের পরিচয়, ইংরেজীতে লেখা—মিঃ এ, বি, সি:—তোতাপাখী-ক্লাবের মেম্বর!… … …ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী-পরা একজন প্রৌঢ়বয়স্ক খাঁটি বাঙ্গালী গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত; তোতা-পাখী-ক্লাবের মেম্বর এই কালা-আদমীকে দেখিয়াই হাঁ-হাঁ করিয়া ধমকাইয়া উঠিতেছেন "Not here Baboo!" স্বদেশী বাবু এই বিলাতী বাবুর উত্তরে কি বলিলেন, তাহা অজ্ঞাত; কিন্তু তাঁহার চোখের বাঁকা চাহনি ও কৌতুকমাখা ওষ্ঠাধরের ভঙ্গী চিত্রকর সুকৌশলে দেখাইতে ভুলেন নাই। দেশী বাবুর হাতে একখানি বই,—তাহার নামটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাহা Burgson প্রণীত Laughter!

৫। পুচ্ছ-পরিবর্ত্তন বা বা-রে লাইব্রেরী! ঘরের মধ্যে টেবিলের সামনে চেয়ারে আসীন এক জীব, যাহার মুখ পক্ষীজাতীয়—তীব্রচক্ষুবিশিষ্ট, পশ্চাতে যাহার ময়ূরপুচ্ছ, হাতে সেই পুচ্ছে-তৈয়ারি কলম, পরিধানে বিলাতি কোট, সার্ট, কলার এবং লম্বা সাদা টাই। তাহার সুমুখে, দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন এক তরুণ যুবক; দেশী সজ্জায়। দেয়ালে নোটিশ-বোর্ডে লেখা আছে—"Indian Dress not admitted।"

৬। দেবীদর্শন বা মহিলাদের সম্মান? যে দেশে ঘরে-বাহিরে সীতা-সাবিত্রীর নামের দোহাই শুনি, সেই দেশেরই এক রেল-ষ্টেশনে গিয়া চিত্রকর মহিলাদের প্রতি সম্মানের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন! ট্রেনের প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্য ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে হরেক-রকমের পাগড়ীওয়ালা, টেড়িওয়ালা ও গোঁফ-ওয়ালা মুখ চঞ্চল এবং উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে;—সেই অগণ্য মুখের অসংখ্য দৃষ্টির কোনটি বিস্ফারিত—কোনটি তৃষিত; কোনটি লালসায় প্রদীপ্ত—কোনটি অপাঙ্গে নিক্ষিপ্ত; কোনটি ঢুলুঢুলু, মুগ্ধ—কোনটি-বা কটমটে, লুব্ধ! সেই শত-শত ক্ষুধাভরা চোখের সামনে লজ্জাবতী-লতার মত ভাঙ্গিয়া-পড়িয়া দুটি ভদ্রমহিলা নতশিরে ত্রস্ত চরণে চলিয়াছেন —তাঁহাদের পদতলে তখন ধরণী দ্বিধা হইলেই তাঁহারা যেন বর্ত্তাইয়া যান! গাড়ীর ভিতর হইতে কোন-কোন অসভ্য আবার তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মহিলা-সম্মানের চরমে উঠিয়াছে! তাহাদের চোখ এড়াইবার জন্য মহিলাদুটি যে অন্যদিকে ফিরিয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবেন, সে পথেও কাঁটা; কেননা, অন্যদিকেও তাঁহাদের সম্মুখে রূপের নেশায় মস্‌গুল আর দুই মহাপুরুষ লোলুপ-চোখে হাঁ-করিয়া পথ-যুড়িয়া অচল ভাবে বিরাজমান!

৭। সহধর্ম্মিণীর সম্মান বা অসহ-ধর্ম্মী। স্থান—রেলষ্টেশন, বাঙ্গলা। কাল —বর্ষা, ঝুপঝুপ জল পড়িতেছে। আপাদকণ্ঠ 'বর্ষাতি' জড়াইয়া ছাতি-মাথায় বাঙ্গলার ফোতো বাবু সিগারেট ধরাইয়া পরম

আরামে দেহটা গরম করিতে-করিতে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। অদূরে তাঁহার সহধর্ম্মিনী বর্ষার অজস্র ধারা মাথায় করিয়া, কোলের শিশুকে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে বুকের মাঝে ঢাকিয়া, হেঁটমুখে স্বামীর গভীর প্রেমের কথা ভাবিতেছেন! ছাতির তলায় আশ্রয় লইবার ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই! কারণ, ছাতির তলায় স্বামীর পাশে তাঁহার ব্যাগ এবং স্ত্রীর চেয়েও মূল্যবান সখের কুকুরটি বাকি জায়গাটুকু দখল করিয়া আছে, আর তিল-ধারণের ঠাঁইটুকুও নাই—স্ত্রী ত কোন্ ছার!

৮। বাহবা বেশ! চিত্রকর এখানে নিপুণ তুলিকাপাতে বাঙ্গলার দুটি অদ্ভুত-চমৎকার এবং কিম্ভূতকিমাকার বিপরীত দৃশ্য অঙ্কন করিয়াছেন। রঙ্গভূমির একদিকে আমাদের সোনার বাঙ্গলার সহজ-সরল স্নিগ্ধশ্যাম পল্লী-শ্রী'র মধ্য দিয়া, বুড়ো-শিবের মন্দির-সোপানে আল্পনা আঁকিয়া গ্রামপ্রান্ত-বাহিনী নদীর স্রোতধারাটি খেয়াতরী বুকে-করিয়া বহিয়া যাইতেছে। এদিকে সামনেই দুটি যুবক-যুবতী—তাঁহাদের আকৃতি মধুর ও কোমল, তাঁহাদের পরোণে, ভাঁজে-ভাঁজে ফুলের-মত ছড়াইয়া-পড়া, খাঁটি বাঙ্গালীর সরল-সুন্দর কাপড়-জামা-চাদর। ... ...পিছনে আলোকপ্রাপ্ত বাঙ্গলার কল-কারখানা, চিমনির ধোঁয়া, সারি-সারি ইটের কোটর, সহুরে ও সভ্য ইঙ্গ-বঙ্গ এবং তাঁহাদের ভব্য নকলকারীর দল;—তাঁহাদের আবালবৃদ্ধবনিতার দেহে দেশী-বিলাতী পোষাকী খিচুড়ী! পোষাকী জগতের ক্রমবিকাশের অপরূপ নমুনা এবং বিচিত্র বাহার এ ছবিতে কী সুন্দর ফুটিয়াছে!

৯। দেবতার ফুল। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, গলদেশে উপবীত, বাহুতে চন্দনলেখা লইয়া এবং মালকোঁচা মারিয়া এক পুষ্পিতটিকি ব্রাহ্মণ মড়্‌মড়-শব্দে গাছের ডালকে-ডাল ভাঙ্গিয়া সাবাড় করিয়া সোৎসাহে কোমল পুষ্পচয়নে নিযুক্ত,—ঠাকুরের পূজায় লাগিবে বলিয়া। কিন্তু নম্র দেবসেবকের মত তাহার চেহারা নহে—চেহারা তাহার গুণ্ডার মত, চক্ষুদুটো লাল-করমচার মত। "দেখে সে রক্ত আঁখি ভক্তি যা তা ছুটে পালায়!"

১০। নীতিরক্ষা। একটি নবীন ছোক্‌রা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, কোথা হইতে নীতিবাগীশ 'হাঁ হাঁ, কর-কি হে, কর-কি' বলিয়া ভীষণ চীৎকারে আসিয়া প্রাণ-পণে ছোকরাটির চোখ-কাণ টিপিয়া ধরিয়াছেন! কেননা, সুমুখেই যত-সব ভয়ঙ্কর দুর্নীতির স্মৃতি! যথা, বকুল-তমাল-কদম্ব প্রভৃতি বিখ্যাত অশ্লীল বৃক্ষ এবং পেশোয়াজ, বাঁশী ও তবলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অশ্লীল পদার্থ! ঝড়ের উপর বজ্রাঘাত—গাছের ডালে বসিয়া আবার একটা দুষ্ট কোকিলও ডাকিতেছে যে! নীতিবাগীশ তাঁহার বিরাট বুটের তলায় ক্রোধভরে একটি কদম-ফুল থেৎলাইয়া আছেন!

১১। বাংলা চুলের কেতা। বাঙ্গলা-দেশে যে কতরকম ফ্যাসানে চুল আঁচড়ানো হয়, তার নমুনা। ব্যাখ্যায় এ ছবির রস বুঝানো যাইবে না।

১২। চোর। একহাতে দুটি হাড়-জিরজিরে ও ভয়ে-আধ্‌মরা অপোগণ্ড শিশু-চোরকে পাকড়াইয়া বুকে-ছাতি-বাঁধা বিরাটবপু পাঁহারাওয়ালা বিপুল গর্ব্বে দিগ্বিজয়ী বীরের মত চলিয়াছে। অবোধ বালকদুটির অপরাধ, ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া তাহারা গোটাদুয়েক কাঁচা আম চুরি করিয়াছে। আমদুটি এখন পাঁহারাওয়ালারই কবলগত—দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ।

১৩। আপনি-চলা লেকচার তৈরি-করা কল বা 'বাক্‌যন্ত্র'। বক্তৃতায় অক্ষম মহারাজা, জমিদার ও কাউন্সিলের সদস্য প্রভৃতির পক্ষে মহা সুযোগ! অনেক টাকা মাহিনা দিয়া বক্তৃতা রচনা করিবার জন্য আর কাহাকেও প্রাইভেট সেক্রেটারী পুষিতে হইবে না; যতবড় লম্বা-চওড়া এবং যে-কোন বিষয়ের বক্তৃতাই হউক না কেন, বাঙ্গলার এডিসনের উদ্ভাবিত এই আশ্চর্য্য বাক্‌যন্ত্রের দ্বারাই সে কার্য্য জলের মত সহজে সিদ্ধ হইবে। এই বাক্‌-যন্ত্রে অনেক মজার জিনিষ আছে; যাঁহারা উদ্‌গ্রীব, ছবিখানি দেখিয়া তাঁহারা চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করুন!

এ ছাড়া মলাটে আর-একখানি ছবি আছে,—পাষাণের উপর অশ্রুপাত এবং অরণ্যে রোদন দেখিয়া এক গলা-ফোলা কোলা ব্যাঙ প্রাণের মায়া ছাড়িয়া পেটফাটা হাসির গান সুরু করিয়া দিয়াছে!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মিসরবাসীর পূর্ব্বপুরুষ

প্রাচীন মিশর আধুনিক জগতে একটা মূর্ত্তিমান রহস্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সভ্যতার অজস্র নিদর্শন আমাদিগকে বিস্ময়মূক করিয়া দেয়, কিন্তু যাহাদের নিপুণ হস্ত সে অতুল সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের অনেক কথাই আজ অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রাথমিক যুগেই মিশরের সভ্যতা অধিক-সম্পূর্ণ ছিল—অন্যান্য অনেক দেশের সভ্যতার মত তাহার মধ্যে ক্রমোন্নতির নিয়মটা তেমন খাটে নাই। প্রাচীন যুগ হইতে মিশর যতই আধুনিক যুগের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, তাহার সভ্যতা ততই অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং এ সভ্যতা যে মিশরেই সর্ব্ব-প্রথমে অঙ্কুরিত হয় নাই, পরন্তু অন্য-কোন দেশ হইতে পরিপুষ্ট অবস্থাতেই তাহার আগমন হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এই-সব দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, মিশরের সভ্যতা কোথা হইতে আসিয়াছিল? যে জাতি পিরামিড গড়িয়াছে, তাহার আদিবাস কোথায়? মিশর-সভ্যতায় যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নিরুত্তর হইয়া থাকেন।

কোন্ জাতি মিশরকে এই সভ্যতার শিক্ষা দিয়াছিল আজ-পর্য্যন্ত কেহই তাহা ঠিকরূপে নির্ণয় করিতে পারে নাই। The Greater Exodus নামক পুস্তকে জে, এফ, লী, বলিতেছেন, এইসকল জাতির গায়ের রং ছিল লাল। ইহাদের মুখে দাড়ী কি গোঁফ গজাইত না, পু·াতন Peruvian-ধরণের একরকম টুপি ইহারা ব্যবহার করিত।" মিশরে দ্বিতীয় রামেসিসের যে মমি পাওয়া গিয়াছে, তার মুখের গড়ন—বিশেষ-করিয়া তাহার নাক ও গণ্ডাস্থি আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মত; এইজন্য মনে হয় যে, মিশরবাসীদিগের পূর্ব্বপুরুষ আমেরিকা হইতেই প্রথমে আগমন করিয়াছিল।

মেক্সিকোর ইউকেটানে এই রহস্যময় ব্যাপারের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। সে দেশে জঙ্গলের ভিতর কয়েকটি ধ্বংস-স্তূপে এ-সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বহুকাল পূর্ব্বে এই প্রদেশে এক জাতি বাস করিত; ইহারা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও সুকুমার শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহাদের স্থাপত্যশিল্পের আদর্শ মিশর ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন শিল্পীরা গ্রহণ করিয়াছিল।

Dr. Augustus le Plongeon এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই ইউকেটান প্রদেশে আসিয়া প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার-কার্য্যে



দ্বিতীয় রামেসিসের মমি

তাঁহাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অর্দ্ধাহার ও অনাহার প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল; এমন-কি, অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের হস্তে অনেকসময়ে তাঁহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইবারও সম্ভাবনা ছিল! Dr. Plongeon মায়া (Maya) ভাষা এবং Hieroglyphic অক্ষর পড়িতে শিখিয়াছিলেন; যাঁহারা তাঁহার Queen Mao and the Egyptian Sphinx কিম্বা Sacred Mystries among the Mayas and Quinches নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কি গভীর অধ্যবসায়ের সহিত তিনি ইহার চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু Dr. Plongeon এই জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে



ইউকেটানের ধ্বংসাবশেষের একাংশ

লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশবাসীর উপহাস এবং ঘৃণা! উক্ত অনুসন্ধানে তাঁহাকে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল; এমন-কি, মৃত্যুর পূর্ব্বে অর্থের অভাবে এবং দেশবাসীর এই নির্ম্মম ব্যবহারে তিনি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন তাঁহার কার্য্যের মর্য্যাদা সকলেই বুঝিতে পারিবে। Chichen-Itzaতে Chaacmol অথবা Prince Chor সমাধি-আবিষ্কারের পর প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক অজ্ঞাত ইতিহাস জানিতে পারা গিয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের সময় Dr. Plongeonএর সঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং কতকগুলি নিরক্ষর লোক ব্যতীত অন্য কেহই সহায় ছিল না।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-আমেরিকায় যে নানা অজ্ঞাত জাতির অস্তিত্ব ছিল, তাহার বহু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়। অধুনা-

আবিষ্কৃত কতকগুলি ধ্বংসস্তূপ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে শিল্পে ও কারুকার্য্যে এই সকল জাতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। Chichen প্রদেশের এই স্তূপ-গুলি আজিও তাহাদের গঠনকারীর অতীত জাতীয় গৌরবের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এগুলি দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বুঝিতে পারিয়াছেন, আসীরিয়া, ব্যাবিলন এবং মিশরের সাবেক বাসিন্দারা যখন নগ্নাবস্থায় বনে-বনে বিচরণ করিত, তখন Chichen-প্রদেশবাসীরা সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

এই প্রদেশে দুইটি ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। প্রথমটিতে ছোটবড় নয়টি প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এখানকার অনেক পাথরের গায়েও রকমারি মূর্ত্তি ও অক্ষর ক্ষোদা আছে। দ্বিতীয়টিতে সাতটি ক্ষোদিত প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। বলাবাহুল্য, এ-দেশের এখনকার অধিবাসীরা এগুলির কোন সন্ধান রাখে না। দ্বিতীয় স্তূপে প্রাপ্ত মূর্ত্তি ও গৃহগুলির গায়ে নানাপ্রকার Hieroglyphic লিপি আছে। Dr. Plongeonএর পূর্ব্বে এই সকল প্রাচীন ও ইঙ্গিতপ্রধান লিপির পাঠোদ্ধার করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া প্রাচীন মিশরীয় লিপিরও অক্ষর পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই শিক্ষা তাঁহাকে এ-দেশীয় লিপির পাঠোদ্ধারে অনেক সাহায্য করিয়াছে। কারণ, প্রাচীন "মায়া"-ভাষায় অনেক মিশরীয় অক্ষরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তূপটি এ-প্রদেশে "সন্ন্যাসিনীর মঠ" বলিয়া বিখ্যাত। আগেই বলিয়াছি, এই "সন্ন্যাসিনীর মঠে". অনেক ক্ষোদিত প্রস্তর ও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলিতে সৃষ্টিরহস্য-সম্বন্ধে কয়েকটি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। Mrs. Plongeon বলেন, এই সৃষ্টিরহস্য ব্যাপারটি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানকার প্রস্তরে-লিখিত অক্ষরগুলি অধিকাংশ স্থলেই পুরাতন মিশরীয় অক্ষর ব্যতীত আর-কিছুই নহে। এই "সন্ন্যাসিনীর মঠে"র দক্ষিণদিকে চল্লিশ-ধাপের একটি সুন্দর সোপান আছে; তাহা পঞ্চাশফুট চওড়া। এই সোপান বাহিয়া নামিয়া গেলে আর-একটি অট্টালিকা দেখা যায়; তাহাতে সাতটি কামরা। ঘরগুলির গায়ে হরেক-রকমের ছবি আঁকা আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একটি চিত্রও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। Chichenএর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আর-একটি রাজপ্রাসাদের মত সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাহার নাম দিয়াছে, "কুনা"। "কুনার" অর্থ, ভগবানের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের দরজা পশ্চিমমুখী, ভিতরে একটি-মাত্র বৃহৎ ঘর। দেওয়াল নানাবিধ ছবিতে ভরা, ছাদ ক্ষোদাই-করা পাথরে তৈয়ারি। স্পষ্টই বুঝা যায়, এই সকল পাথর ছাদে লাগাইবার পূর্ব্বেই ক্ষোদাই করা হইয়াছিল। ঘরের ছবিগুলিতে অনেক ভীষণাকার জীবের মূর্ত্তি আছে; এই সকল জীবের অস্তিত্ব আজিও প্রমাণিত হয় নাই; বরং সেগুলি কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। সকল দেশের মত এদেশের লোকেরাও

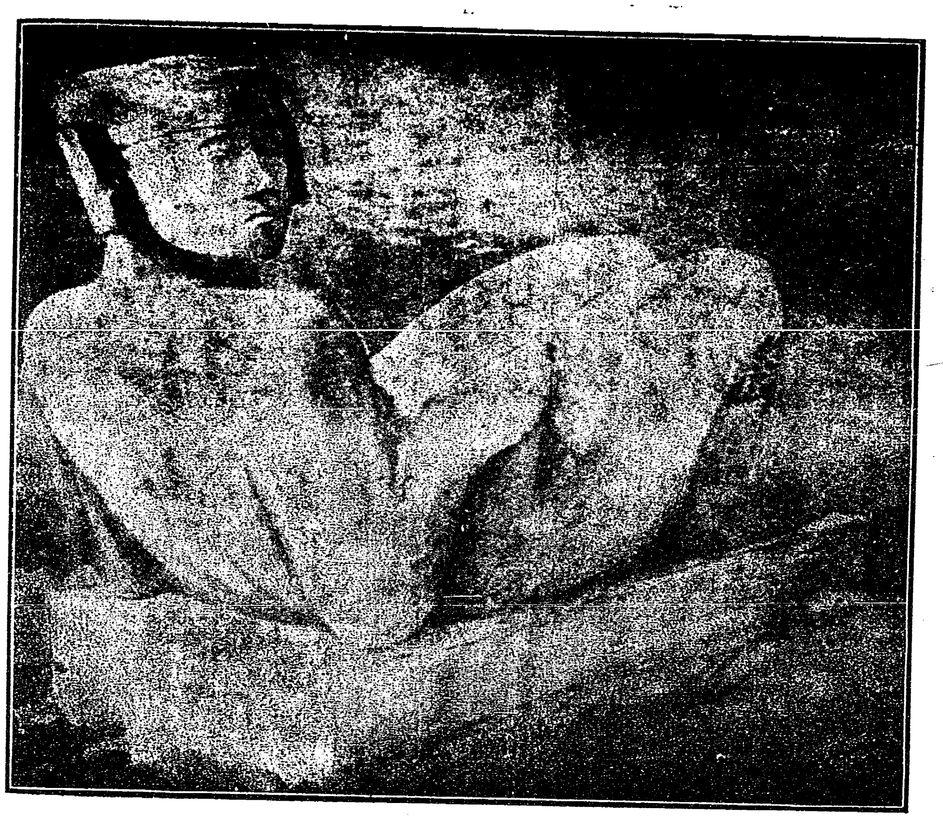

ইউকেটানে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তি

অনেক কাল্পনিক জীবকে বিশেষ ভয় ও ভক্তি করিত। জীবগুলির নামও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা 'মায়া'-ভাষায় লিখিত। এ-দেশের Prince Cohএর প্রেমের কাহিনী এবং মিশরের আইসিস ও ওসিরিসের প্রচলিত গল্প প্রায় একই ধরণের। আবার, এই গল্পটি প্রায় সকল দেশেই কোন-না কোন আকারে চলিত আছে, এমন-কি, বাইবেলে পর্য্যন্ত এইরূপ একটি গল্পের আভাস পাওয়া যায়।

Prince Cohর কবর খনন করিবার সময় একটি বৃহৎ প্রস্তর-মূর্ত্তি বাহির হয়। মূর্ত্তিটির ওজন প্রায় ৩৫০০ পাউণ্ড। এখন সেটি মেক্সিকোর যাদুঘরে রক্ষিত। এই মূর্ত্তির সঙ্গে-সঙ্গে দুইটি ভস্মাধারও পাওয়া গিয়াছে,—একটির ভিতরে কিছু ছাই আছে এবং অপরটিতে একটি অঙ্গারীভূত মনুষ্য-হৃদয় (human heart)। রাসায়নিক বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হইয়াছে, উহা মনুষ্য-হৃদয় ছাড়া অন্য-কিছুই নহে। মিশরেও এমনি মনুষ্য-হৃদয় রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। Prince Cohর সমাধি ছাড়া এখানে আরও একটি সমাধি খোঁড়া হইয়াছে। তাহা হইতেও আর-



মেক্সিকোর আর-একটি প্রাচীন মূর্ত্তি

একটি মূর্ত্তি এবং একটি ভস্মাধার পাওয়া গিয়াছে। এই পাত্রটি এত বড় যে, ইহার উপরের ঢাক্‌নীটি সরাইতে চার-পাঁচজন লোকের দরকার হয়। এই পাত্রটির ভিতর ছাই এবং কতকগুলি গহনা ছাড়া আর-কিছুই পাওয়া যায় নাই।

মিশরীয় ভাষার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দ মায়া-ভাষা হইতে গৃহীত। আরও একটি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রীক-ভাষার অনেক কথার সহিত এই মায়া-ভাষার অনেক কথার মিল আছে এবং কতকগুলির মূল যে একমাত্র মায়া-ভাষা, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। মিশরে, দেশকে অনাবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নীলনদে কুমারী-বিসর্জ্জন দিবার প্রথা ছিল, Chichen প্রদেশেও এমনি এক প্রথার

চলন ছিল। তবে এ-ক্ষেত্রে নদীতে বিসর্জ্জন না দিয়া কুমারীদের কূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত। চল্‌তি দেব-দেবীর পূজা ছাড়া, দুই দেশেরই প্রাচীনজাতি একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের স্তবগান করিত। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ইহাদের নববর্ষও একইসময়ে আরম্ভ হইত। মিসরের রামেসিসের যে মমিটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মুখের আদর্শের সঙ্গে যে আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের মুখের ছাঁচ আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়, এ-কথাও আগে বলিয়াছি। তাছাড়া এখানকার ভাস্কর্য্যকলার সঙ্গে মিসরীয় ভাস্কর্য্যের আদর্শ-সাদৃশ্যও সকলকার লক্ষ্যের বিষয়। পরন্তু, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, সাজ-সজ্জা, পশুপালন-চিকিৎসা এবং গার্হস্থ্য কর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতিতেও মিশরীয়দের এবং মায়া-ভাষা-ভাষীদের মধ্যে অত্যধিক ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাই ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এই মায়া-ভাষা-ভাষীরাই কোন কারণে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মিশরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

শ্রীঃ—

মাসকাবারি

রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

(১)

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ লেখক হেন্‌রিক ভন্ ট্রিট্‌স্কের "পলিটিক্‌স্" গ্রন্থ দুই ভল্যুমে তর্জ্জমা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং জুন মাসের "লিটারেরি ডাইজেষ্ট" পত্রে তার সমালোচনাও বাহির হইয়াছে।

নব্য জর্ম্মাণির world politik বা বিশ্বরাষ্ট্রনীতির ভিত্ পত্তন করেন নিট্‌শে। নিট্‌শের "overman" বা অতিমানবে নবীন জর্ম্মাণ আপনারই প্রতিচ্ছবি দেখে। তারপর বার্‌নহার্ডি সেই অতিমানবের অভ্যুদয় ব্যাপারটা যে অনতিদূরে, সেটা সাব্যস্ত করেন,—তিনি ইমারতের প্ল্যানটা আঁকিয়া দেখান। নয়ম্যান্ তার উপরে গড়িয়া তুলিলেন এই যে—অষ্ট্রোহাঙ্গেরির সঙ্গে জর্ম্মাণির জোট বাঁধিলে তবেই জর্ম্মাণ-অতিমানবের কাছে বিশ্বমানব পরাভব মানিতে বাধ্য। সবশেষে ট্রিট্‌স্কে রাষ্ট্রতত্ত্বের এক বিশাল গম্বুজ তৈরি করিয়া এই তিনজনের গাঁথ্‌নিটাকে সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন।

ট্রিট্‌স্কের মতে রাষ্ট্রই সর্ব্বেসর্ব্বা—রাষ্ট্রের বাড়া আর কিছু নাই। রাষ্ট্রের ইচ্ছা জনগণের ইচ্ছার অনুকূল হোক্ বা প্রতিকূল হোক্, সেই ইচ্ছাই সর্ব্বজয়ী হইবে—কেননা ব্যক্তি রাষ্ট্রের অধীন, রাষ্ট্র ব্যক্তির অধীন নয়। কোন রকম আন্তর্জাতিক বিচার-সভার দ্বারা এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের ঝগড়ার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, ইতিহাসের শেষ পর্য্যন্ত লড়াইয়ের দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তি হইবে। অতএব ট্রিট্‌স্কে বলেন যে, রাষ্ট্র যত বড় হয় ও যত স্ফীত হয় ততই তার

গৌরব—বড় রাষ্ট্র ছোট রাষ্ট্রকে আত্মসাৎ করিয়া বড় হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

* * * * *

"লিটারেরি ডাইজেষ্ট" পত্র ট্রিট্‌স্কের এই রাষ্ট্রনীতিকে নিন্দা করিয়াছেন। ইংরাজি অনেক কাগজেই ইহার কড়া জবাব বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ রাষ্ট্রনীতিকে একমাত্র নব্য জর্ম্মাণির রাষ্ট্রনীতি বলার কোন অর্থ নাই। ইউরোপের সকল দেশেই আজ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতি মানুষের আর আর সকল বড়দিক্ সকল মহৎবৃত্তিকে ছাড়াইয়া ও চাপা দিয়া একরাট্ ও স্বয়ম্ভূ হইয়া উঠিয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। একটা জাতির শিল্পজীবন, সাহিত্যজীবন, ধর্ম্মজীবন, দর্শন-জীবন, শ্রম-জীবন, বাণিজ্য-জীবন, প্রভৃতি জীবনের নানা বিচিত্র দিক্ আছে এবং জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে সে সকল বিচিত্রতার স্থান রাষ্ট্রনীতির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। অতএব, মানুষের সমূহ-চৈতন্যের (mass-consciousness) একটা বিশেষ দিকের একটা বড় রকমের প্রকাশ যদি রাষ্ট্র হয়, তবে সেই সমূহ-চৈতন্যের অন্যান্য দিক্ গুলির প্রকাশের জন্য ঐ এক ধরণের পলিটিক্স-সর্ব্বস্ব তথৈব ভেদ-নীতি-দণ্ডনীতি-কূটনীতি-সর্ব্বস্ব রাষ্ট্রে যখন কুলাইবে না, তখন নানা আধার—নানা রাষ্ট্র—নানা কেন্দ্র কেন না তৈরি হইবে? কোন মানুষ দুইটা, কোন মানুষ পাঁচটা কেন্দ্রের সহিত যোগ রাখিবে—যার যেমন শক্তি ও ইচ্ছা সে ততগুলি কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে। ঐ একটা কেন্দ্রের মধ্যেই মানুষের সব interests সব সৃষ্টিশক্তির স্থান হইতেই পারে না; সেই কারণে দেখা যায় যে, এখনকার ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্র-নীতির একচেটিয়া আধিপত্যে মানুষের অন্যান্য সৃষ্টিশক্তিগুলা ব্যষ্টিগত ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে বটে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে—জাতিগত ভাবে—স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। এ আক্ষেপ রাস্কিন্ করিয়াছেন, কার্লাইল্ করিয়াছেন, সম্প্রতি বার্ট্রেণ্ড রাসেল আরো স্ফুটতর ভাবে করিতেছেন এবং রবীন্দ্র-নাথও তাঁর "নেশন" প্রবন্ধে সেই পুরাণো আক্ষেপটাকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। অতএব ট্রিট্‌স্কেকে ঘা দিতে গেলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিটাকেই ঘা দিতে হয়, কারণ ট্রিট্‌স্কের ষ্টেট-স্বয়ম্ভূত্বের আদর্শটা শুধু নব্য জর্ম্মাণির নয়, সেটা সমস্ত ইউরোপেরই। কোথাও প্রবল কোথাও দুর্ব্বল আকারে সেই আদর্শ ইউরোপের দেশে দেশে জাগ্রত।

* * *

"নেশন" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এই যে রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া মারিতেছে, সুতরাং তিনি চান্ যে রাষ্ট্র-কুহক হইতে ব্যক্তি পূর্ণভাবে মুক্ত হয়, ব্যক্তি আপন স্বরূপে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমষ্টি-চৈতন্য যাহাতে প্রতি ব্যক্তির চৈতন্য হয়, ব্যক্তি যাহাতে সর্ব্বানুভূ হয়, এক্ষেত্রে সমূহানুভূ হয়, সেই জন্যইতো রাষ্ট্রের উদ্ভব, নেশনের উৎপত্তি। ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় এ উৎপত্তির কারণটুকুকে অস্বীকার করিবার শক্তি কাহারও নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, রাষ্ট্র বা নেশনের দ্বারা সমষ্টি-চৈতন্যের

একটা ক্ষুদ্র আংশিক দিক্ মাত্র প্রতি-ব্যক্তির চৈতন্যে অনুস্যূত হইয়াছে,—কেবল ঐ পলিটিক্সের দিক্‌টা। সেই সঙ্গে অন্যান্য দিক্‌গুলিও যদি প্রতি ব্যক্তির চৈতন্যে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিত, তবে পলিটিক্স্ তার ন্যায্য স্থান ও অধিকারকে ছাড়াইয়া এমন একান্ত ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত না। ব্যক্তি তাহা হইলে বৃহৎ হইত, ব্রহ্ম হইত। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ ভঞ্জন হইত।

আসলে মানুষের চৈতন্য বহুকেন্দ্রিক; সুতরাং চৈতন্যের প্রকাশও একটিমাত্র কেন্দ্রকে আশ্রয় করিতে পারে না। তার জন্য নানা কেন্দ্র চাই, নানা রাষ্ট্রতন্ত্র চাই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকাও চাই। অতএব, monistic state অর্থাৎ, অদ্বৈত এক ষ্টেটের আদর্শও অসম্পূর্ণ, আবার pluralistic state অর্থাৎ, অসংখ্য ষ্টেটের আদর্শও অসম্পূর্ণ। একমাত্র স্বয়ম্ভু ষ্টেট যে মানুষের আর আর সকল দিক্‌কে চাপিয়া বড় হইবে তাও ঠিক্ নয় এবং বহু বিচিত্র unions বা সমবায় যদি দাঁড়ায়, তবে তাদেরও কোথাও ঐক্য না থাকিলে তাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য হইবে না। ট্রিট্‌স্কের "পলিটিক্স্"কে এই দিক্ হইতে সমালোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু নব্য জর্ম্মাণির দানবীয় উৎপাতের সঙ্গে ট্রিট্‌স্কের রাষ্ট্রতত্ত্বের ঐকান্তিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া সে রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশেষভাবে জর্ম্মাণ —একথা বলিলে, অর্দ্ধসত্য বলা হয় মাত্র।

(২)

জর্জ্জ রাসেল (যিনি কবি এ, ই, নামে খ্যাত) ট্রিট্‌স্কের রাষ্ট্রের আইডিয়াকে অন্য একভাবে সমর্থন করিয়াছেন। ইনি আইরিশ এবং আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতাকামী, সুতরাং এ বিষয়ে ইঁহার কথাটা প্রণিধান-যোগ্য।

"Imaginations and Reveries" নামক তাঁর নবপ্রকাশিত প্রবন্ধপুস্তকে "The spiritual conflict"-প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তাঁর আলোচনার মোট কথাটা এই: তিনি বলেন, প্রত্যেক যুদ্ধের ভিতরেই একটা বড় আইডিয়া নিহিত থাকে। ফরাসী বিপ্লবের কালে গণতন্ত্রের আইডিয়াটা সকলের চেয়ে বড় আইডিয়া ছিল, তাই মানুষের মনে মনে তার রূপের অসংখ্য প্রতিরূপ দেখা দিয়া-ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মের মত একটা আইডিয়া পৃথিবীতে যেম্‌নি বড় হইয়া ওঠে, অমনি তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয় এবং তার উল্টা আইডিয়াটা ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। তাই ফরাসী বিপ্লবের গণতন্ত্রের আইডিয়ার পরিবর্ত্তে এখন উঠিয়াছে নব্য জর্ম্মাণির যন্ত্রবদ্ধ বিপুলায়তন ষ্টেট্-আইডিয়া। আগে ছিল এইকথা যে, ষ্টেট্ আছে ব্যক্তির জন্য, ষ্টেট্ ব্যক্তির অধীন। এখন কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, ব্যক্তি আছে ষ্টেটের জন্য, ব্যক্তি ষ্টেটের অধীন।

ফরাসী আইডিয়াকে যেমন বাহির হইতে সমস্ত ইউরোপ এবং ভিতর হইতে নেপোলিয়নের মত প্রবলশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি

পরাভূত করিতে পারেন নাই, তেমনি জর্ম্মাণির আইডিয়ার বিরুদ্ধে অর্দ্ধেকখানি সভ্যজগৎ দাঁড়াইলেও সে আইডিয়া সহজে পরাস্ত হইবার নয়। এখনই তার প্রভাবের লক্ষণ চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে। অন্যান্য সকল দেশের রাষ্ট্রই অজ্ঞাতসারে জর্ম্মাণ ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে—ক্রমশঃ আরো গড়িয়া উঠিবে। ভবিষ্যতে ইউরোপের সকল দেশে ষ্টেট্‌ই যে সর্ব্ববিষয়ে প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহা এখন হইতেই দিব্য বুঝা যাইতেছে।

রাসেল মনে করেন যে, তখন সাহিত্যেরও বদল হইবে। গণতন্ত্রের প্রভাবে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছে বেশিমাত্রায়—সে সাহিত্যের কাব্য ব্যক্তিত্বের কাব্য, একটি মাত্র ব্যক্তির হৃদয়ের কথা এবং সে সাহিত্যের উপন্যাস ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচিত্র সম্বন্ধকেই উদ্ঘাটিত করিয়া দেখায়। ভাবী ষ্টেট্‌তন্ত্রের প্রভাবে যে সাহিত্য জন্মলাভ করিবে, তাতে বহুব্যক্তিত্বের সমষ্টিগত রূপ ফুটিবে বলিয়া মনে হয়, সাহিত্য সেই অখণ্ড সমষ্টিকে, সেই সমষ্টি-চৈতন্যকে তার কাব্যে-উপন্যাসে প্রকাশ করিতে থাকিবে।

তার মানে দুই বিরুদ্ধ আদর্শের মধ্যে দোলকের (Pendulum) মত বিশ্বমানব যুগযুগান্তর ধরিয়া দুলিতেছে—একবার ব্যক্তি-তন্ত্র হইতে সমষ্টিতন্ত্রে, একবার সমষ্টিতন্ত্র হইতে ব্যক্তিতন্ত্রে। মধ্যযুগের ইউরোপে সমষ্টিতন্ত্র ছিল ধর্ম্মে, চর্চ্চ ছিল সমষ্টিতন্ত্রের রূপ। সেটা ভাঙিয়া হইল অসংখ্য অগণ্য ব্যক্তিতন্ত্র। আবার এখন একটা বৃহত্তর সমষ্টিতন্ত্র রচনার প্রয়াস দেখিতেছি। কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্রই বলি আর সমষ্টিতন্ত্রই বলি, এ সমস্তই কি আত্মার লীলার এক একটা রূপ মাত্র নয়? সেই লীলাই ব্যষ্টিসমষ্টির সমাধান এমনি করিয়াই তো স্থির করিতেছে। ব্যষ্টিকে সমষ্টি গ্রাস করিয়া দাঁড়ায় এও সে চায় না, আবার ব্যষ্টিই সর্ব্বগ্রাসী হইয়া ওঠে, এও সে চায়না। অতএব এই যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তিতন্ত্র ও সমষ্টিতন্ত্রের ভিতরকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ, ইহার দ্বারা আমাদের অধ্যাত্মজীবন পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে, সন্দেহ নাই।

রাসেলের কথা শেষ করিলাম। এই ধরণের লীলাতত্ত্বের একটা মুস্কিল এই যে, তাহা ভালমন্দের পার্থক্যকে অনেক সময় লুপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ আরাম পায়। যদি এটা সত্য হয় যে, জর্ম্মাণ ষ্টেটতন্ত্র ব্যক্তিকে মারিয়া, ব্যক্তির অসীম মূল্য ও অবাধ স্ফূর্ত্তি ও সম্প্রসারণকে খর্ব্ব করিয়া তবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তবে ঐখানেই যে মস্ত বড় একটা গলদ থাকিয়া গেল! রবীন্দ্রনাথ দেখাইতেছেন যে, ঐখানেই ইউরোপীয় সভ্যতার বিনাশ-বীজ নিহিত রহিয়াছে। ষ্টেট সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে পলিটিক্স কাঁটাগাছের মত মানুষের ভাবজীবনের অন্যান্য সকল পুষ্পবিকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া একান্ত হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। তার আভাস এখনই যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং তার আরো ভবিষ্যৎ বিকাশ দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই ষ্টেট্‌-স্বয়ম্ভূত্বকে আত্মার বিগ্রহ মনে করা আত্মার জীবনের পক্ষে কল্যাণকর কিনা, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। কেননা এর মধ্যে স্পষ্টই যে অন্যায় ও অকল্যাণ রহিয়াছে। এই যুদ্ধটাই সেই অন্যায় ও অকল্যাণের পুঞ্জীভূত রূপ, সেই অন্যায়ের সুনিশ্চিত পরিণাম। সুতরাং ভবিষ্যতে ষ্টেটতন্ত্র যদি সর্ব্বগ্রাসী হয়, তবে তাহা মানুষের কল্যাণের আকর হইবে না, সুতরাং মানুষ তাকে সহ্য করিতেও পারিবে না। তাকে ভাঙিয়া মানুষকে নিজের মুক্তির রাস্তাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইতেই হইবে।

ষ্টেট্‌-স্বয়ম্ভূত্বের আদর্শের মধ্যে আত্মার দর্শকের লীলা যেমনি স্ফূর্ত্তি পাক্, মানুষের বিচিত্র সৃজন-লীলাকে তাহা পীড়িত ও ব্যাহত করে বলিয়াই সে আদর্শকে পরিহার করিতে মানুষ বাধ্য। অবশ্য বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতেই আমরা সত্য আদর্শের পরিচয় পাই—এ হিসাবে বিরুদ্ধ আদর্শ আসা শ্রেয়স্কর, এ কথা মানিতে কারো আপত্তি হইতে পারে না।

আর্টের আদর্শ

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর বৈশাখের উপাসনায় "বাংলার ভাবী সাহিত্য" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তার উপ-সংহারে আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে এই ক'টি কথা আছে:—

{ "পুরাতন আর্ট }

"আর্ট শুধু আর্টের জন্য। আর্ট নিরাসক্ত। জীবনের অসুন্দর মিথ্যা ও অকল্যাণের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই।

{ "ভাবী আর্ট }

"আর্ট দায়িত্বজ্ঞানে জীবনকে সৎশোভন ও কল্যাণময় করিবে, আর্ট জীবনের শিক্ষক।"

ভবিষ্যৎ আর্ট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার অধিকার রাধাকমল বাবুর আছে কিনা তাহা জানিনা। সুতরাং ভবিষ্যৎ আর্টের কথা ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি থাক্। উপস্থিত বর্ত্তমান আর্টের সমালোচনা-ক্ষেত্রে এটা প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি যে, এক দল লোক সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের দিক হইতে আর্টের বিচার করেন এবং অন্য দল বলেন আর্টের কাজ কেবলমাত্র আনন্দ দান করা,—সামাজিক শুভাশুভের সঙ্গে তার একান্ত সম্বন্ধ নাই। ঐ "উপাসনা" কাগজে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই পড়া যায় যে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গল্প-উপন্যাসগুলি সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে, অতএব হিন্দুসমাজের সীতাসাবিত্রীরূপিণী কুলবধূদের ঐ সকল উপন্যাস পড়া একে-বারেই উচিত নয়। পরপুরুষের সঙ্গে কোন বিবাহিতা রমণীর অবৈধ প্রণয়-ব্যাপার যদি কোন উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু হয়, তবে সে কাহিনী যতই বস্তুতন্ত্র হোক্ এবং তার পরিণামটা যেমনি সুন্দর ও মহৎ হোক্ না কেন, দেখিতেছি যে, সমাজের অভিভাবকের দল শুধু সেই উপন্যাসকে গালি দিয়া ক্ষান্ত হন্ না, উপন্যাস-রচয়িতার চরিত্র সম্বন্ধেও অভদ্রভাবে কটাক্ষপাত করিতে লজ্জা বোধ করেন না। কাজেই তখন অন্যপক্ষ আর্টের দোহাই মানিয়া বলেন যে, সমাজের দিক্ হইতে কোন্ জিনিসটা ইষ্টকর বা অনিষ্টকর আর্টের সে জন্য কোন মাথাব্যথা নাই। গল্প বা উপন্যাসের বিষয় যেমনি হোক্ না কেন, রচনাটা কলাসৌষ্ঠবপূর্ণ ও

রসযুক্ত হইয়াছে কিনা সেইটেই বিচারের বিষয়।

আসলে তর্কটা আর্টের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ লইয়া দাঁড়ায় না—আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ বিচার লইয়াই এই তর্ক। অর্থাৎ ওয়াল্টার পেটার, অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্‌ প্রভৃতির সঙ্গে আর রাস্কিনের আর্টের আদর্শের যে ভেদ, বাংলা সাহিত্যে যাঁরা আর্ট সম্বন্ধে বাদানুবাদে লাগিয়াছেন তাঁদের দুই দলের মধ্যেও সেই ভেদ দেখা যাইতেছে। তর্কটা সেই পুরাণো তর্ক, বাংলা দেশের মাটীতে নূতন করিয়া গজাইতেছে মাত্র।

অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের The Picture of Dorian Gray নামক উপন্যাস যখন প্রথম বাহির হইল, তখন তাঁর সঙ্গে অনেক গুলি সংবাদপত্রের কিছুকাল ধরিয়া তুমুল মসীযুদ্ধ চলিয়াছিল। তখন ওয়াইল্‌ড্‌ বলেন, আর্টের সঙ্গে নীতির কোন সম্বন্ধ নাই। আমি কেন অমনতর উপন্যাস লিখিয়াছি, তার একমাত্র জবাব, আমার খুসী। তাই তিনি, পেটার ও সিমন্‌স্‌ প্রভৃতি এই মত ঘোষণা করিলেন যে, আর্ট আর্টের জন্য, আর্টের দিক্‌ হইতেই আর্টের বিচার করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে রাস্কিন তাঁর সমস্ত আর্ট-সমালোচনায় এই মতটাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, আর্টের সঙ্গে নীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, উচ্চ নৈতিক উদ্দেশ্য ভিন্ন উচ্চদরের আর্ট একেবারেই সম্ভব হইতে পারে না। রাস্কিনের Lectures on Art, The Two Paths, প্রভৃতি সর্ব্বজনবোধ্য রচনাগুলি পড়িলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, রাস্কিন প্রাণপণে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যখন কোন জাতির নৈতিক অবনতি ঘটে তখন কখনো কখনো তার আর্টের আপাতঃ উৎকর্ষ দেখা গেলেও সেটা আসল উৎকর্ষ নয়, বরং সেটা অপকর্ষ। কারণ আর্ট যখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সহজে যোগযুক্ত, যখন সেই বিশ্বপ্রকৃতির অনুকরণ করা নয়, ব্যাখ্যা করাই (interpret) আর্টের কাজ, তখন মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলি বলিষ্ঠ সতেজ সুস্থ ও সুন্দর থাকে। আর নানাকারণে যখন মানুষের সমাজে নৈতিক বিকার দেখা দিতে থাকে, যখন বিলাসিতার ঘুণ সমাজকে ভিতর হইতে জীর্ণ করিতে থাকে, তখন যে সৌখীন আর্ট জন্মায়, তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ থাকে না। সে আর্ট অপকৃষ্ট আর্ট।

রাস্কিন বা অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্‌ এঁদের কারো মতকেই আধুনিক রসজ্ঞেরা পাকা মত মনে করেন নাই। আর্টের মধ্যে সব ক্ষেত্রেই নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণার সন্ধান করিতে গিয়া রাস্কিন্‌ যে সব সময়ে আর্ট সম্বন্ধে সুবিচার করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। একটা অত্যন্ত স্পষ্ট উদাহরণ আমার মনে পড়িতেছে। The Two Paths গ্রন্থে "Conventional Art" সম্বন্ধে যখন রাস্কিন বক্তৃতা দেন, তখন ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল এবং সিপাহীদের নৃশংসতার অতিরঞ্জিত খবর সমুদ্রপারে ইংলণ্ডে পৌঁছিতেছিল। রাস্কিন তাঁর সেই বক্তৃতায় বলিলেন যে, ভারতবর্ষের কলাসামগ্রীর সৌষ্ঠববৈচিত্র্য ও বর্ণের বাহার অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের লোক যখন

নীতিতে এত দুর্ব্বল, এমন সব লোমহর্ষণ কাণ্ড যখন তারা অনায়াসে করিতে পারে—তখন তাদের আর্টের মধ্যেও নিশ্চয় দুর্ব্বলতা আছে। নৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে আর্টকে অতিমাত্রায় জড়াইবার চেষ্টা করিলে এম্নিতর ভুল সমালোচনার আশঙ্কা থাকে।

এইজন্য হুইস্‌লার আর্টকে পুনরায় নীতির আধিপত্য হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য একালে একথা কেহ বলেন না যে, আর্টের সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নাই, বরং এই কথাই সর্ব্বত্র শোনা যায় যে আর্টই জীবনের প্রকাশক, আর্টই জীবনের উদ্ঘাটক। তবু আর্টের বিচার যে ধর্ম্মনীতির দিক্‌ হইতে বা চারিত্রের দিক্‌ হইতে হওয়া উচিত নয়, এ সম্বন্ধে বোধ করি কারো দ্বিমত নাই।

কারণ, ঐ রকমের কোন একটা থিওরি খাড়া করার একটা প্রধান মুস্কিল এই যে, তারপর হইতে সেই থিওরির সঙ্গে আর্টের সব ছাঁদগুলাকে মানান্‌সই করিবার জন্য মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটা প্রবল তাগিদ্‌ জাগিয়া উঠে। যেটা বেমানান্‌, সেটা তখনি তখনি বাতিল হইয়া যায়। এবং অবশেষে দেখা যায় যে, কোন থিওরিই এমন সম্পূর্ণ নয় যে আর্টের সব ছাঁদগুলো তার আওতার মধ্যে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় লইতে পারে। রাস্কিনের থিওরির জন্য পোপ তাঁর কাছে ইংরাজ কবিদের মধ্যে একজন উঁচুদরের কবি বলিয়া গণ্য ছিলেন। টল্‌স্টয়ের থিওরির জন্য আধুনিক পনেরো আনা সাহিত্য তাঁর What is Art গ্রন্থে সাহিত্যের এলাকা হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড পাইয়াছে। থিওরিওয়ালারা এই কথাটাই ভুলিয়া যান যে, কলাস্রষ্টা যখন কোন শিল্পবস্তু সৃজন করেন, তখন তিনি আপনার অন্তরতর আদর্শকেই অনুসরণ করেন এবং যে পরিমাণে তিনি আপনার ভাবনিগূঢ় ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ ছাপটি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন, সেই পরিমাণেই কলাস্রষ্টা হিসাবে তাঁর সার্থকতা। বাহিরের কোন থিওরি বা মানদণ্ড বা মডেল যদি তাঁর কল্পনাকে কিছুমাত্র অভিভূত করে, তবে সেইখানেই তাঁর কাজ খারাপ হইয়া যাইতে বাধ্য। সেইজন্য কোন আর্টসৃষ্টি নৈতিক কি অনৈতিক সেটা বিচারের বিষয় নয়। কেননা এটা সত্য যে, আর্টিষ্ট যে-পরিমাণে মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তি রাখেন, সেই পরিমাণে তাঁর রচনার মধ্যে মহত্ত্ব আপনিই অজ্ঞাতসারে স্ফূর্ত্ত হইবে। এবং যদি বা কোন নৈতিক আদর্শ তাঁর রচনাতে নাও পাওয়া যায়, তবু এমন কিছু পাওয়া যাইবেই যা মলিনতাকে শ্রীহীনতাকে লজ্জা দেয়, যা মঙ্গলে সুন্দরে অবিচ্ছেদ্য যোগকে প্রকাশ করে। সুতরাং আর্ট-স্রষ্টার রসানুভূতির প্রসার ও গভীরতা কতখানি, তার উপরেই আর্টের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর করে। সেইজন্যই আর্টিষ্ট মানবের শিক্ষক হইতে পারেন না; কারণ, আর্ট হইতে আমরা যে শিক্ষা পাই সেটাকে গৌণ শিক্ষা বলিতে পারি—ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতির শিক্ষার মত সে শিক্ষা মুখ্য শিক্ষা নয়। আর্ট আমাদের রসানুভূতিকেই গভীর, প্রসারিত, সুমার্জ্জিত ও সূক্ষ্ম করিয়া দেয়, এই হিসাবে তাহা শিক্ষা দেয়

যদি বল, তবে তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু সে শিক্ষা বিশ্বের সকল সুন্দর পদার্থই দিয়া থাকে, সে শিক্ষা আকাশও দেয়, চাঁদও দেয়, গাছপালাও দেয়। সুতরাং তাকে শিক্ষা নাম দেওয়ার দরকার কি? থিওরি হইতে যেমন আর্টের জন্ম হয় না, আর্ট নিজেও তেম্নি কোন থিওরির জন্মদাতা নয়।

কিন্তু কোন থিওরি না হইলে আর্টের বিচার কেমন করিয়া হইবে? আর্টের বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ আর্টিষ্ট তাঁর ভিতরকার কোন্ vision বা কোন্ রস-ভাব তাঁর কলাসৃষ্টিতে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আর্ট-রসিকের কল্পনাপটে বা মানসপটে সেই প্রকাশ কি পরিমাণে আপনার ছাপ স্থায়ীভাবে রাখিয়া যাইতে পারিল, তারও খবর লইতে হইবে। কেননা কবির সব চেয়ে বড় কবিতা কাব্যরসিক, চিত্রকরের সব চেয়ে বড় চিত্র চিত্রের সমজ্‌দার। শিল্পীর চিত্তের সঙ্গে রসিকের চিত্তের যোগ হয়—শিল্পের ভিতর দিয়া। বিশ্বের রসকে শিল্পরসিক চাখেন শিল্পীর রসরচনায়, আবার শিল্পরসিকের রসালো ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া শিল্পীর রচনার রসকে গৌড়জনেরা চাখিয়া থাকেন। এই জন্য কবির চেয়ে কাব্যরসিক ন্যূন নন্, শিল্পীর চেয়ে শিল্পরসজ্ঞ খাটো নন্। টার্ণার বা মিলেট বা করট্ বা রসেটিকে বুঝিতে হইলে সাধারণ ব্যক্তিকে শিল্পরসিকেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। সেখান হইতে রসোদ্রেক হইলে পর হয়ত সেই ব্যক্তি ঐ সকল চিত্রকরদের চিত্রে বড় বড় শিল্প-রসজ্ঞও যাহা দেখেন নাই, এমন কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন—হয়ত সম্পূর্ণ নূতন দিক্ হইতে ঐ সকল চিত্রকরের চিত্রের রসব্যাখ্যা করিতে পারেন। শিল্পসৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির মত চিরকাল নব নব রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে বলিয়াই শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট থিওরি খাড়া করা চলে না।

বাংলা সাহিত্যে যাঁরা থিওরি লইয়া মারামারি করেন, তাঁদের রচনায় রসবোধ ও রসবিশ্লেষণের ক্ষমতার গন্ধ পর্য্যন্ত পাই না। কবি রাসেল তাঁর একটা লেখায় গল্প করিয়াছেন যে, একজন আইরিশ ক্রিটিক্ সমস্ত সন্ধ্যাবেলা Constable Monet প্রভৃতির চিত্রে সুসজ্জিত এক ঘরে বসিয়া আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গেলেন অথচ একবার ছবি-গুলির দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। আর্টের আদর্শ এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে সে সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক না করিয়া কোন একটা আর্টের সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলে আর্টের মর্য্যাদা রক্ষা হয় এবং বাংলার পাঠকবর্গেরও কাণ জুড়ায়।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ভারতী

৪১শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৪ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্যায়োগ

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে সকল শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়, ব্যায়োগ তাহার অন্যতম। 'ব্যায়োগ' শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ,—"যাহাতে বহু পুরুষ-চরিত্রের যোজনা হয় তাহাই ব্যায়োগ।" ("ব্যায়ুজ্যন্তে অস্মিন্ বহবঃ পুরুষা ইতি ব্যায়োগঃ") এই ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ব্যায়োগ-শ্রেণীর নাট্যে স্ত্রী-চরিত্র অল্প ও পুরুষ-চরিত্রই অধিক থাকে। এই প্রধান লক্ষণ ভিন্ন ব্যায়োগের অন্য লক্ষণও আছে। বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে নিম্নলিখিত রূপে সেগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ।
হীনো গর্ভবিমর্শাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ॥
একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদ্ধতঃ।
কৈশিকীবৃত্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নায়কঃ॥
রাজর্ষিরথ দিব্যো বা ভবেদ্ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।
হাস্যশৃঙ্গারশান্তেভ্য ইতরেষ্বঙ্গিনো রসাঃ॥"

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২৩১-২৩৩ শ্লোক। বোম্বাই সংস্করণ ৩৩৬ পৃষ্ঠা]

"ব্যায়োগ যে ইতিবৃত্ত লইয়া রচিত তাহা বিখ্যাত হওয়া চাই। ইহাতে স্ত্রী-চরিত্রের সংখ্যা অল্পই থাকিবে; গর্ভ ও বিমর্শ ব্যায়োগে থাকিবে না। ইহাতে বহু পুরুষ-চরিত্র থাকিবে। এক অঙ্কে ব্যায়োগ সমাপ্ত হইবে। ইহাতে যে যুদ্ধ থাকিবে, তাহা স্ত্রীনিমিত্ত হইবে না। ব্যায়োগে কৈশিকী বৃত্তি প্রযুক্ত হইবে না। দিব্য পাত্র অথবা রাজর্ষি ব্যায়োগের নায়ক হইবে। নায়কের ধীরোদ্ধত পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া চাই। হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্ত ভিন্ন অন্য যে কোন রস ব্যায়োগের অঙ্গীভূত হইতে পারিবে।"

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

সংস্কৃত নাট্যে পঞ্চসন্ধি প্রযুক্ত হয়। প্রথমে নাটকের মূলীভূত ঘটনার কারণ প্রদর্শিত হয়; ইহা মুখ-সন্ধি। পরে ঈষৎ-রূপে উক্ত বীজ-স্বরূপ কারণ প্রকাশ করা হয়; ইহার নাম প্রতিমুখ-সন্ধি। তাহার পর এই বীজ অধিক প্রকাশ পাইলে অন্য কারণাদির দ্বারা তাহা হ্রাস বা অধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাই গর্ভ-সন্ধি। গর্ভ-সন্ধি অপেক্ষা অধিক বিকাশ বা অন্তরায় প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কোচ যদি পরে প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে তাহা বিমর্শ-সন্ধি আখ্যা লাভ করে। আর যেখানে মুখ্য ঘটনা অন্যান্য বিক্ষিপ্ত ঘটনার সহিত উপসংহার প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্বহণ-সন্ধি-রূপে কথিত হইয়া থাকে। (১)

ইংরাজী নাট্য সাহিত্যে পঞ্চাঙ্ক নাটকে এক এক অঙ্কে এইরূপ সন্ধির প্রয়োগ দেখান যাইতে পারে। সংস্কৃত নাটকে কয়টি অঙ্ক থাকিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, অঙ্ক ধরিয়া এইরূপ বিভাগ দেখান অসম্ভব। কিন্তু এটা স্থির যে সকল দেশের নাটকেই এইরূপ সন্ধি দেখান যাইতে পারে। মূল ঘটনার অবতারণা (মুখ-সন্ধি), তাহার ঈষদ্বিকাশ (প্রতিমুখ-সন্ধি) অন্যান্য বিরোধী ও অনুকূল ঘটনার সহিত সংঘর্ষ (গর্ভ-সন্ধি), এই সংঘর্ষের বিস্তৃতি (বিমর্শ-সন্ধি) ও পরিশেষে সমাপ্তি (নির্বহণ-সন্ধি) ইহা প্রায় সকল নাট্যেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

ব্যায়োগ এক অঙ্কে সমাপ্ত বলিয়া ইহাতে গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি থাকে না। অর্থাৎ বৃহদবয়ব নাটকে মূল ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে অনুকূল বা প্রতিকূল অন্যান্য বিবিধ ঘটনার মধ্যে ফেলিয়া যে আলোড়ন দেখান হইয়া থাকে, ব্যায়োগে তাহা হইবার উপায় নাই। মূল ঘটনাটি অবতারিত হইয়া (মুখ-সন্ধি) তাহার ঈষদ্বিকাশের পরেই (প্রতিমুখ-সন্ধি), একেবারে উপসংহার (নির্বহণ-সন্ধি) প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যায়োগের অবয়বের অল্পতা হেতুই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, তাই বিশ্বনাথ

(১) "মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্শ উপ-সংহৃতিঃ।
ইতি পঞ্চাস্য ভেদাঃ স্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে॥
যত্র বীজ-সমুৎপত্তির্নানার্থরস-সম্ভবা।
প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তৎ॥
ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ॥
যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্শ ইতি স্মৃতঃ॥
বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্ব্বহণং হি তৎ॥"
[সাহিত্য-দর্পণম্। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। বোম্বাই সংস্করণ, ২৮৩,২৮৪ পৃঃ]

ব্যায়োগের লক্ষণে লিখিয়াছেন, ব্যায়োগে গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি নাই।

ব্যায়োগের ঘটনা কাল্পনিক হইবে না। পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ ঘটনা লইয়াই ব্যায়োগ রচিত হইবে। ব্যায়োগে যখন স্ত্রী-চরিত্র অল্প ও পুরুষ-চরিত্র অধিক তখন স্ত্রীনিমিত্ত যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ইহার অঙ্গীভূত হয় না। পুরুষ-চরিত্রগণের মধ্যে অন্যান্য কারণে যুদ্ধ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ব্যায়োগে কৈশিকীবৃত্তি থাকিবে না। শৃঙ্গার রসেই কৈশিকীবৃত্তি প্রযুক্ত হয়। উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র বেশভূষাযুক্ত, নৃত্যগীত-বহুল স্ত্রীজনসঙ্কুল, মনোহর বিলাসযুক্ত ও শৃঙ্গারের অঙ্গপূর্ণ বৃত্তিই কৈশিকী বৃত্তি। (২) ব্যায়োগ নাটকে হাস্য, শৃঙ্গার বা শান্তরস অঙ্গীভূত হইতে পারে না। বহু নারী-চরিত্রও ইহাতে থাকে না। কাজেই কৈশিকী বৃত্তিও ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

ব্যায়োগের নায়ক দেবতা, নররূপধারী দেবতা (রামচন্দ্রাদি) অথবা রাজর্ষি হইবে। এই নায়ক আবার ধীরোদ্ধত পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া চাই। প্রচণ্ড, চপল, অহংকারী, দর্পী, আত্মশ্লাঘানিরত, মায়াবী নায়ককে ধীরোদ্ধত বলা হইয়া থাকে। ভীমসেন প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। (৩)

ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এক 'ব্যায়োগ' নামের ব্যুৎপত্তি হইতে অধিকাংশ লক্ষণগুলিই একে একে আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ "বহু পুরুষ যাহাতে প্রযুক্ত হয় তাহাই ব্যায়োগ" এই ব্যুৎপত্তি হইতে ইহাতে স্ত্রীচরিত্রের অল্পতা ও পুরুষ-চরিত্রের বাহুল্য বুঝিতে পারা যাইতেছে। আবার স্ত্রী-চরিত্রের অল্পতা হেতু শৃঙ্গার-রস ব্যায়োগের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। হাস্য শৃঙ্গার-রসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং এ রসের প্রয়োগও ব্যায়োগে বিরল। শৃঙ্গার-রস না থাকাতে তদুপযোগী কৈশিকী বৃত্তিও অপ্রযুজ্য। স্ত্রীজনের অল্পতাবশতই ব্যায়োগে যুদ্ধবিগ্রহাদি স্ত্রী-নিমিত্ত হইতে পারে না। বহু পুরুষ-চরিত্র থাকাতে বীর-রস প্রয়োগ করা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দেখানই সুবিধা; এবং ধীরোদ্ধত পাত্রই ইহার উপযোগী।

সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ ব্যায়োগের উদাহরণস্বরূপ লিখিয়াছেন, যথা "সৌগন্ধিকাহরণম্।"

নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে কাব্যমালার ৭৪ সংখ্যায় বিশ্বনাথ কবি-বিরচিত সৌগন্ধিকাহরণ নামক ব্যায়োগ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি হইতে কবির পরিচয় বিশেষ-কিছু জানা যায় না। কেবল বিশ্বনাথ কবি

(২) "যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষ-চিত্রা
স্ত্রীসঙ্কুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা।
কামোপভোগা প্রভবোপচারা
সা কৈশিকী চারুবিলাসযুক্তা॥" [সা দ। ৬ প।
(৩) "মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলোঽহংকারদর্পভূয়িষ্ঠঃ।
আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্বীরোদ্ধতঃ কথিতঃ॥" যথা ভীমসেনাদিঃ। [সা দ। ৩ প]

তাঁহার মাতুল অগস্ত্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন এইটুকু মাত্র জানিতে পারা যায়। সূত্রধারের মুখে যে শ্লোক দুইটিতে কবি ও তাঁহার মাতুলের পরিচয় আছে, তাহা এই—

"বিশ্বনাথ ইতি খ্যাতঃ কবিরস্তি যদুক্তয়ঃ।
অকাঞ্চনমরঞ্চক বিদুষাং কর্ণভূষণম্॥

অথবা

যাচস্তস্য কবেরুদারমধুরা ইত্যত্র চিত্রং কিমু
প্রখ্যাতঃ সকলাসু দিক্ষু গুণিষু শ্রেয়ানগস্ত্যঃ সুধীঃ।
বেধশ্চন্দ্রমুখীকরাঙ্গুলিদলাসঙ্গকণদ্বল্লকী
বাচো যুক্তিসহোক্তিদর্শিতসুধাজন্মা স যন্মাতুলঃ॥

তেন কবিনা প্রণীতমভিনবং সৌগন্ধিকাহরণং নাম প্রেক্ষণকমস্মাভিনীতপূর্ব্বমাস্তে। তদিদানীং প্রযুঞ্জানঃ সামাজিকমনাংস্যাবর্জ্জয়ামি।"

নাট্যখানির প্রথমে রাজা প্রতাপরুদ্রের নামোল্লেখ আছে। প্রতাপরুদ্রের সভাসদ্‌গণের সমক্ষে নাট্যখানি অভিনীত হইয়াছিল। সূত্রধার বলিতেছে—

"রাজ্ঞা প্রতাপরুদ্রেণ সংভাবিতৈরশেষবিদ্যাবিশেষসারসার্ব্বজ্ঞধৌরেয়মতিভিঃ সভাসদ্‌ভিরাহূয় সবহুমানমাদিষ্টোঽস্মি।"

এই প্রতাপরুদ্র যে কে, তাহা নাট্যখানি হইতে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তাঁহার নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত "বেলাবনাবলীবিশ্রান্তনিজবলতুরঙ্গখুরমৃদঙ্গনিনদমিশ্রিতজলধিতরঙ্গনির্ঘোষণদুরবলিপ্তদমনবীরভদ্রেণ" এই বিশেষণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে উড়িষ্যার অধিপতি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রতাপরুদ্ররূপে কল্পনা করিলে বড় বেশীরকম অনুমানের সাহায্য লওয়া হয়।

সৌগন্ধিকাহরণের নায়ক ভীমসেন। ইনি ধীরোদ্ধত নায়ক। বীর ও অদ্ভুত রস নাট্যখানির অঙ্গীভূত। নাট্যকার স্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (৪) নাট্যখানির ঘটনা এই—

প্রথমে ভীমসেন প্রবেশ করিতেছেন; তাঁহার স্কন্ধে ধনু লম্বিত ও হস্তে গদা।

"সৌগন্ধিকং কিমপি গন্ধবহোপনীত-
মালোক্য কৌতুকবতা হৃদয়েন কৃষ্ণা।
অস্তানি যাচিতবতী কিল তাদৃশানি
সজ্জস্তদা ভবতিবিধে মম বাহুরেষঃ॥"

"বায়ুদ্বারা বাহিত একটি সৌগন্ধিক (কহ্লার বা শ্বেতপদ্ম) দর্শন করিয়া দ্রৌপদী কৌতূহলবশে আরও সেইপ্রকার পুষ্প প্রার্থনা করায়, আমার এই বাহু সেই পুষ্প আহরণে উদ্যত হইয়াছে।"

ভীমসেনের এই সর্ব্বপ্রথম উক্তি হইতেই নাট্যের নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইতেছে। সৌগন্ধিক বা শ্বেত-পদ্মের আহরণ অর্থে সৌগন্ধিকাহরণ নামকরণ হইয়াছে। নাম হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়ও সূচিত হইতেছে।

ভীমকে পাঠাইবার সময় দ্রৌপদীর চিত্ত আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল। ভীম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া যাত্রা করেন। পরিক্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদী-প্রার্থিত সেই

(৪) "বৃত্তিগিরামুক্তি বিশেষহৃদ্যা ধীরোদ্ধতং নেতৃবিচেষ্টিতঞ্চ।
বীরাদ্ভুতৌ যত্র রসৌ চ দীপ্তৌ প্রত্যেকমেতানি হরন্তি চেতঃ॥"
"অস্ত প্রৌঢ়পরাক্রমাদ্ভুতনিধির্ধীরোদ্ধতঃ নায়কঃ।"
[প্রস্তাবনা]

পুষ্পের সৌরভ ভীমের নাসিকায় প্রবেশ করিল। ভীম বলিলেন—

"স্বৈরং জুগুপ্সিতবনদ্রুমপুষ্পগন্ধৈ-
রগ্রে মধুব্রতকুলৈরুপভুজ্যমানঃ।
সৌগন্ধিকস্য কথয়ত্যুপযানমার্গং
কোঽপ্যেষ সৌরভময়ো বহুলঃ প্রবাহঃ॥"

সেই গন্ধের অনুসরণ করিতে করিতে ভীম বনভূমি লঙ্ঘন করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। হনুমান সর্ব্বদা সেই শৈলে বাস করিয়া থাকেন—

"তেনার্য্যেণ হনুমতা নন্থ সদা শৈলোঽয়মধ্যাস্তে॥"

হনুমান এই সময় প্রবেশ করিলেন। কিন্নরগণ কর্তৃক গীত রামচরিত শ্রবণ করিয়া বহুদিন তিনি এই শৈলে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতি সীতার স্নেহ স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইল। তিনি বলিলেন—

"সীতাবিমার্গণবিধৌ মম চক্ষুষোঽস্য
স্পন্দঃ পরীক্ষিতশুভাগম এব জাতঃ।
সম্প্রত্যপি স্ফুরতি হন্ত তদেব ভূয়—
স্তৎ কিং নু ভদ্রমনুভাবয়িতা জনোঽয়ম্?"

"পূর্ব্বে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে যখনই আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইয়াছিল, তখনই সীতাদেবীকে পাইয়াছিলাম। দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দনে যে শুভ হয় তাহা আমার পরীক্ষিত। আজ আবার এখন তাহা স্পন্দিত হইতেছে। কোনও পুরুষ কি আমার শুভ করিতে আসিল?"

ভীম এদিকে অরণ্যবাসী জন্তুদিগকে ত্রাসিত করিবার জন্য সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষ হইতে ময়ূর উড়িয়া পড়িল, হরিণ-হরিণী নিকটে থাকিয়াও উদ্বিগ্ন চিত্তে পরস্পরকে খুঁজিতে লাগিল, হস্তী দৌড়িতে দৌড়িতে মুখ ফিরাইয়া হস্তিনীকে দেখিতে লাগিল, নিদ্রাভঙ্গে সিংহ অর্দ্ধোত্থিত হইল। হনুমান তখন ভীমসেনকে দেখিলেন। ভীমসেন সদর্পে নিজ পরিচয় ঘোষণা করিয়া কুবেরের সরোবরের পথ দেখিতে চাহিলেন। হনুমান ইহার আকৃতি দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, "নিজ-রূপ গোপন করিয়া কিছুকাল ইহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য ইহার পথ রোধ করি।"

"অচিরাদপ্রকল্পিতরূপ এবাহং
কঞ্চিৎকালমমুনা সহ বিনোদ—
সম্পাদনার্থমাগমনমার্গমধিতিষ্ঠামি।"

এই বলিয়া শাখামৃগের রূপ ধরিয়া হনুমান পথ রোধ করিয়া শয়ন করিলেন। ভীম তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমায় দেখিয়া এই অরণ্যের প্রাণীগণকে ত্রস্ত ব্যাকুল দেখিয়াও নির্ভীক হৃদয়ে বানর স্বভাবজাত চপলতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া লাঙ্গুল বক্রভাবে বিস্তার করিয়া পথে শয়ন করিয়া আছে,—কি আশ্চর্য্য!"

"মদ্দর্শনাচ্চকিতবিক্রতধীরসত্ত্বং
পশ্যন্নরণ্যমিদমপ্যবিষক্তভীতিঃ।
উৎসৃজ্য জাত্যমপি চাপলমেষ ধৈর্য্যা
ত্তির্য্যক্ প্রসার্য্য পথি বালধিযষ্টিমাস্তে॥"

হনুমান্ ভীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য এই বনের সকল জন্তুকে ত্রাসিত করিতেছ?"

ভীম বলিলেন, "তাহাতে তোমার কি?"

হনুমান্ বলিলেন, "পরের উপর অত্যাচার আমি সহ্য করিব না।"

ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিবে?"

হনুমান বলিলেন, "আমি তোমার নিবারণ করিব।"

ভীমসেন উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "কি! বানর বীরকে নিবারণ করিবে?"

হনুমান হাসিয়া বলিলেন, "নীতি-উপদেশ দিয়াই নিবারণ করিব। এই নিরীহ অরণ্যচর প্রাণীদের ভীত করিয়া তোমার কি বীর্য্য প্রকাশ পাইবে?"

ভীম এ কথা শুনিয়া শান্ত হইলেন। হনুমান তখন ভীমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীম নিজ পরিচয়-প্রদানচ্ছলে বলিলেন, "অজাতশত্রুকে জান কি?" হনুমান জানিয়াও উত্তর করিলেন, "না।" ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি! যুধিষ্ঠিরকে জান না?" হনুমান তখন বলিলেন, "যে শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছে, সেই না কি?" ভীম সখেদে নিজ বীর্য্যে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "এইটুকুই কি যুধিষ্ঠিরের পরিচয়?" হনুমান বলিলেন, "পাণ্ডবদের প্রতি তোমার এত পক্ষপাত কেন?" তখন ভীম আত্মপ্রকাশ করিলেন।

"প্রমাথবিদ্যাধিগমায় রক্ষসা-
মধত্ত যস্তাক্ষরশিক্ষণং করঃ।
হিড়িম্ববক্ষঃফলকে মহাবলঃ
স এষ ভীমোঽস্মি যুধিষ্ঠিরানুজঃ॥"

তাহার পর ভীমের মনে পড়িল, কথায় কাল অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। তিনি হনুমানকে বলিলেন, "পথ হইতে লাঙ্গুল সরাইয়া লও, নহিলে হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তেমনি আমিও তোমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইব।"

"ময়াতিকালঃ কিমিবাতিপাত্যতে
বিলঙ্ঘ্যতাং বালধিরধ্বনস্ত্বয়া।
বিলঙ্ঘ্য গচ্ছাম্যুদধিং ক্ষণাদহং
পুরা হনূমানিব রাশিরম্ভসাম্।"

"হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন" এই উপমা শুনিয়া ছলক্রমে হনুমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হনুমান কে?" তখন ভীম হনুমানের পরিচয় দিলেন। কুমার-সম্ভবে যেরূপ ছদ্মবেশী শিব কর্ত্তৃক নিজ নিন্দা ও পার্ব্বতীর শিব-প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও হনুমান কর্ত্তৃক সেই-রূপ নিজ নিন্দা ও ভীম কর্ত্তৃক হনুমানের প্রশংসা বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতে লাগিল। হনুমান শেষে প্রীত হইয়া নিজরূপ ধারণ করিলে ভীম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিজকৃত চাপল্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হনুমান তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও শুনিয়া বলিলেন, "কমল-সহিত সরোবরই তোমার নিকট আনিয়া দিতেছি।" ভীম বলিলেন, "আমিই আনিব।" তখন হনুমান বলিলেন, "সেই সরোবর কুবেরের। যক্ষেরা তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। মায়াবশতঃ সে সরোবর তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না। যক্ষেরাও মায়াবী। সুতরাং সরোবর যাহাতে দেখিতে পাও সেজন্য ও যক্ষদের জয় করার জন্য একটি বিদ্যা তোমায় দিই, গ্রহণ কর।" ভীমের তাহা লইবার ইচ্ছা না থাকিলেও হনুমান অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া তিনি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। হনুমান বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর ভীমসেন হনুমান কর্ত্তৃক উপ-দিষ্ট পথে পরিক্রমণ করিতে করিতে কদলীবন অতিক্রম করিয়া তমালবনের মধ্যস্থিত পথ দিয়া চলিয়া সরোবরের নিকট

উপনীত হইলেন। নেপথ্যে শব্দ উঠিল, "ওহে যক্ষবীরগণ, না বলিয়া কে এই বনে চরিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছে?" ভীম সোৎসাহে গদা ধরিয়া কমল লইবার জন্য সরোবরে অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিলেন। নেপথ্য হইতে শুনা গেল, "ওরে দুরাত্মন্! নামিস্ না। নামিস্ না।" তখন বাক্-কলহের পর ভীমের সহিত যক্ষবীরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীম রঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

কঞ্চুকী ও কুবের ইহার অল্প পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন হইতে ভীমের সহিত যক্ষ-গণের তুমুল যুদ্ধের কথা বুঝিতে পারা গেল। যক্ষগণ শেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ভীম তখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কুবের সাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিলে ভীম বিনীতভাবে অগ্রসর হইলেন; কুবের তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে ভীম বলিলেন, "আমার বিনয়ের ব্যতিক্রম ক্ষমা করুন।" কুবের বলিলেন, "মানীদের ইহাই স্বভাব। তাঁহারা পরের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারেন না। মেঘের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সিংহ কি গুহায় লুকাইয়া থাকে?"

"নন্থ মানরুচেরয়ং গুণঃ
সহতেঽসৌ পরগর্জ্জিতং ন যৎ।
নিশমষ্য ঘনাঘনধ্বনিং
নিভৃতস্তিষ্ঠতি কিং নু কেশরী?"

এই সময় যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেব ভীমকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থলে উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির উৎকণ্ঠিত ও দ্রৌপদী ভীত হইয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব ভীমের পরাক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের আশ্বাস দিতে-ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সকলের মিলন হইল। কুবেরকে সকলে প্রণাম করিলেন। কুবেরের আজ্ঞায় কঞ্চুকী শ্বেত কমল আহরণ করিয়া আনিলে ভীমসেন তাহা দিয়া দ্রৌপদীর অঞ্জলি ভরিয়া দিলেন। কুবের দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্রুপদ-রাজনন্দিনি! ভীমসেন তোমার আর কি অভিলাষ পূরণ করিবে?"

দ্রৌপদী সলজ্জভাবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি প্রার্থনীয়? তথাপি ইহা হউক—" এই কথার পর চিরন্তন প্রথামত নিম্নলিখিত ভরতবাক্যে নাট্যখানির সমাপ্তি হইয়াছে।

"রাজানঃ পরিপালয়ন্তু সততং ন্যায্যেন গাং বর্ত্মনা
মর্য্যাদানতিলঙ্ঘিনশ্চ সুচিরং দীব্যন্তু বর্ণাশ্রমাঃ
কিঞ্চাস্তু প্রতিভাপ্রকাশসুলভা সানন্তসংবিন্ময়ী
স্বৈরং বক্ত্রসরোরুহেষু বিদুষাং বাগ্দেবতা বর্ত্ততাম্॥"

এ-যাবৎ সৌগন্ধিকাহরণের বঙ্গানুবাদ হয় নাই। এই ব্যায়োগখানি ব্যতীত আমরা আরও দুইখানি ব্যায়োগের সন্ধান পাইয়াছি। একখানি ভাস-রচিত মধ্যম-ব্যায়োগ, অপরখানি কাঞ্চনাচার্য্য রচিত ধনঞ্জয়-বিজয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক "মধ্যম-ব্যায়োগে"র বঙ্গানুবাদ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩২৪) প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর ধনঞ্জয়-বিজয়ের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের অনন্তশয়ন গ্রন্থা-

বলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া মধ্যম ব্যায়োগের মূল ও নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত কাব্যমালার ৫৪ সংখ্যায় ধনঞ্জয়-বিজয়ের মূল প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যম ব্যায়োগ নাট্যের নাম হইতেই ইহা যে ব্যায়োগ তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহার নায়কও ভীমসেন। কুরুজাঙ্গলে যূপ-গ্রামবাসী কেশবদাস নামক ব্রাহ্মণ স্বীয় মাতুল যজ্ঞবসুর পুত্রের উপনয়নে নিমন্ত্রিত হইয়া পত্নী ও তিন পুত্র সহ মাতুলালয়ে যাইতেছিলেন। যে বনে পাণ্ডবদের আশ্রম ছিল, তথায় রাক্ষসের উপদ্রব নাই শুনিয়া তাহার মধ্য দিয়াই যাইতেছিলেন। এক ভীম ব্যতীত অন্য পাণ্ডবেরা কেহ তখন আশ্রমে ছিলেন না; শতকুম্ভ নামক যজ্ঞ করিবার জন্য মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রমে গিয়াছিলেন। হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ আসিয়া কেশবদাসের পথরোধ করিল। হিড়িম্বা উপবাসের পারণের জন্য পুত্রকে একটি মনুষ্য আনয়ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ জানিয়াও ঘটোৎকচ মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে ব্রাহ্মণের পথরোধ করিল। শেষে ব্রাহ্মণের অনুনয়ে ঘটোৎকচ বলিল, "যদি তোমার এক পুত্রকে ছাড়িয়া দাও—তাহা হইলে তোমাদের রক্ষা।" কেশবদাসের পত্নী নিজ শরীর দিতে চাহিলেন—স্ত্রীলোক বলিয়া ঘটোৎকচ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেশবদাস নিজ দেহ দিতে চাহিলেন—বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহাকেও ঘটোৎকচ লইতে চাহিলেন না। তিন পুত্রের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ দেহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কেশবদাস জ্যেষ্ঠ ও কেশবদাস-পত্নী কনিষ্ঠকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। সানন্দে মধ্যম পুত্র তখন অগ্রসর হইয়া নিজ দেহ দান করিতে গেলেন। ঘটোৎকচ তাঁহার এই আত্মত্যাগে চমৎকৃত হইল। মধ্যম পুত্র ঘটোৎকচকে বলিলেন, "আমি ঐ জলাশয় হইতে পিপাসার শান্তি করিয়া আসি।" ঘটোৎকচ বলিল, "যাও।"

ব্রাহ্মণ খেদ করিতেছেন, মধ্যম পুত্রের আসিতে বিলম্ব হইতেছে, এমন সময় ঘটোৎকচ "মধ্যম" "মধ্যম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ব্যায়াম করিতেছিলেন। তিনি সেই ডাক শুনিয়া তাঁহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া দ্রুত তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কেশবদাস তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ভীম ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া নিজ শরীর বিনিময়ে তাহার পুত্রের শরীর ঘটোৎকচের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; তিনি ভীমকে নিষেধ করিলেন। ভীম বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের শরীর আমার শরীর দিয়া রক্ষা করিব।" ঘটোৎকচ ভীমকে বলিল, "এস।" ভীম বলিলেন, "সাধ্য থাকে, আমায় লইয়া চল।" ঘটোৎকচ বলিল, "জানিস্, আমি কে?" ভীম বলিলেন, "জানি। আমার পুত্র।" ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হইলে উভয়ের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধের পর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, শৈলশৃঙ্গ উন্মূলন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিল। তাহাতেও ভীমের কিছু হইল না দেখিয়া

মায়াপাশে তাহাকে বদ্ধ করিল। ভীম মায়াপাশ হইতেও নিজেকে অবলীলাক্রমে মোচন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ বলিল, "তুমি ত ব্রাহ্মণ-পুত্রের বিনিময়ে নিজ শরীর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। সেই প্রতিশ্রুতি-অনুসারে আমার অনুসরণ কর।" তখন ভীম তাহার অনুসরণ করিলেন। হিড়িম্বার নিকট উপস্থিত হইলে হিড়িম্বা পুত্রকে বলিলেন, "এ কাহাকে আনিয়াছ?" ঘটোৎকচ বলিল, "কেন! মানুষ আনিয়াছি।" হিড়িম্বা তখন বলিলেন, "এ কি মানুষ! এ যে দেবতা।" তখন ঘটোৎকচ পিতৃ-পরিচয় পাইল; পিতাকে অভিবাদন করিয়া নিজ চপলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভীম ও ঘটোৎকচ পুত্র ও পত্নীসহ কেশবদাসকে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

মধ্যম ব্যায়োগের ঘটনা এইরূপ। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র মধ্যম তপস্বী ও মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই উভয়ের নাম মধ্যম হওয়াতে নাট্যখানির সন্ধিস্থলে ঘটনার পুষ্টি হইয়াছে। ইহা সূচনার জন্যই ইহার নাম মধ্যম ব্যায়োগ প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

ধনঞ্জয়-বিজয় কাঞ্চনাচার্য্য রচিত। নাট্যারম্ভে সূত্রধারকে একজন পুরুষ এক পত্র আনিয়া দিল। জয়দেব সেই পত্রে রঙ্গমণ্ডন নামক নটকে (৫) আজ্ঞা করিতেছেন, "বীররসযুক্ত অদ্ভুত কোনও রূপক অভিনয় করিয়া গদাধর (৬) প্রভৃতি আমার পারিষদবর্গকে অভিনন্দিত কর।"

"অস্তি প্রশস্তিসহিতঃ শ্রীমাঞ্জয়দেবঃ। ... স চ প্রসাদেন রঙ্গমণ্ডনং নাম নটং সমাদিশতি।... তদিদানীং ভবতা বীররসাদ্ভুতং রূপকমভিনীয় গদাধর প্রমুখাস্মৎ—পরিষদামনন্দনীয়া ইতি।"

এই জয়দেব কে তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার কোনও উপায় নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, "দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে জয়দেব নামে কনৌজের এক রাজা ছিলেন। ইনি সেই জয়দেব কি না বলা দুষ্কর।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন, "এই ব্যায়োগ নাটকখানি ... গঙ্গাধর মিশ্র প্রভৃতির চিত্তবিনোদনার্থ শরৎকালে অভিনীত হয়। ... গঙ্গাধর মিশ্রও একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাত।" এই উক্তি ভিত্তিহীন। পূর্ব্বোদ্ধৃত সংস্কৃত পংক্তিগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে 'গদাধর' প্রমুখ পারিষদ-গণের চিত্তরঞ্জনার্থ ধনঞ্জয়-বিজয় অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু নিজেও ঐ অংশের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "আপনি বীররসাদ্ভুত কোন রূপক অভিনয় ক'রে গদাধর প্রমুখ আমাদের পরিষদ্ মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করুন।" অথচ, ভূমিকায় গদাধর স্থলে তিনি কেন যে গঙ্গাধর মিশ্র লিখিলেন, ও গঙ্গাধর মিশ্র নামক সুলেখকের সহিত তুলনা করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। সম্ভবতঃ অনবধানতার জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

(৫) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদে 'নটকে' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'নাটকে' এই মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে।

(৬) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদের ভূমিকায় "গঙ্গাধর মিশ্র" এই ভুল আছে।

ধনঞ্জয়-বিজয়ের রচয়িতা কাঞ্চনাচার্য্য। তিনি বাদীশ্বর উপাধি-ধারী নারায়ণ উপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন। নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

"তত্রাভবদুপাধ্যায়ো নারায়ণ-সমাহ্বয়ঃ,
জিতবাদিসহস্রৌঘঃ প্রাপ বাদীশ্বরাভিধাম্ ॥…
তৎসূনুঃ কাঞ্চনো নাম সমস্তগুণবল্লভঃ।
গোষ্ঠীশালেব বিদ্যানাং যস্য জিহ্বা বিরাজতে ॥"

বিরাট নৃপতির গোধন-হরণে প্রবৃত্ত দুর্য্যোধন প্রভৃতির অর্জ্জুন-হস্তে পরাজয় বৃত্তান্ত লইয়া ধনঞ্জয়-বিজয় রচিত। ধনঞ্জয়ই এ নাট্যের নায়ক। প্রথমে ধনঞ্জয় ও অমাত্য প্রবেশ করিলেন। নগরের উপকণ্ঠ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনিবার জন্য বিরাট-পুত্রকে পাঠান হইয়াছে— বিরাট-পুত্র সারথি হইতে স্বীকৃত। যুদ্ধ-সম্ভাবনায় অর্জ্জুন অতিশয় উৎসাহিত। এই সময় বিরাট-পুত্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিল, অর্জ্জুন সুসজ্জিত হইয়া রথারোহণ করিলেন। অর্জ্জুনের আদেশে অমাত্য উদ্বিগ্ন পৌরজনগণকে আশ্বস্ত করিতে গেলেন, অর্জ্জুনের রথ বেগে কৌরবদের অভিমুখে ধাবিত হইল। কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, দুর্য্যোধন সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন, দ্রোণ ও ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া উত্তরকে তাঁহাদের পরিচয় দিলেন এবং দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণকে চিনাইলেন।

এই সময় বিদ্যাধর ও প্রতীহারীর সহিত ইন্দ্রদেব প্রবেশ করিলেন। ইহাদের কথোপকথনেই অর্জ্জুনের সহিত কৌরবদের তুমুল যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। রথারোহণে দুর্য্যোধন প্রবেশ করিলে, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার বাগ্‌যুদ্ধ হইল। পরে উভয়ে যুদ্ধার্থ সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইবার জন্য রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্র, প্রতিহারী ও বিদ্যাধর তখন যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শরে কুরুসৈন্য বিচঞ্চল ও ক্ষত-বিক্ষত হইল। রাক্ষস, পিশাচ, যোগিনীরা সানন্দে রণক্ষেত্রে রক্ত পান করিতে লাগিল। ভীম অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলে অর্জ্জুন বরুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। কর্ণ ভুজঙ্গাস্ত্র প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুন গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। দ্রোণ বারণ-বাণ প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুন সিংহ-বাণে তাহাতে বাধা দিলেন। ভীমের অশ্ব ও দ্রোণের সারথি নিহত হইল— কর্ণের রথ ভগ্ন, কৃপ সংজ্ঞাহীন, অশ্বত্থামার ধনুঃ ছিন্ন। কুরুসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের রত্নমুকুট বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন; পরে প্রস্বাপন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রে কুরুদের সকলে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অর্জ্জুন তখন এক ভীষ্ম ব্যতীত অপর সকলের বসন অপহরণ করিলেন ও উত্তরকে অক্ষত শরীর দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর রথারোহণে বিরাট-রাজের রাজধানী-অভিমুখে চলিলেন। ইন্দ্র অর্জ্জুনের বিজয় দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

অর্জ্জুন ও উত্তর যাইতেছেন এমন সময় যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও সপরিবারে বিরাটরাজ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে পরস্পরকে অভিনন্দন করিলেন। বিরাটরাজ অর্জ্জুনকে

বলিলেন, "তুমি দ্রৌপদীর অবমাননার শোধ লইলে।" ভীম বলিলেন, "তার প্রতিশোধ আমি লইব।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তুমি সৌগন্ধিক বনের (৭)[কমল বনের] লক্ষ্মী অপহরণ করিয়াছ। হেলায় হিড়িম্বকে বধ করিয়াছ। তোমার বিক্রম কে রোধ করিবে?" পরস্পর সম্বর্দ্ধনার পর নাট্য শেষ হইল।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, "ব্যায়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ আর অন্য সকল রচনাই বিলুপ্ত কিম্বা দুষ্প্রাপ্য; কেবল এই ব্যায়োগখানি (ধনঞ্জয়-বিজয়) এখনও পর্য্যন্ত কালকবলে পতিত হয় নাই।" ভাসের মধ্যম ব্যায়োগ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। "সৌগন্ধিকাহরণ"ও সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর চোখে পড়ে নাই। এই তিনখানি নাট্য স্পষ্টতঃই ব্যায়োগ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই তিনখানি ছাড়া লক্ষণ দেখিয়া অন্য কোনও নাট্যকে ব্যায়োগ বলা যায় কি না তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইব।

যে তিনখানি ব্যায়োগের আমরা আলোচনা করিলাম, বীররস তাহাদের সকল গুলিরই অঙ্গীভূত। সৌগন্ধিকাহরণে বীর-রস ব্যতীত অদ্ভুত রসও আছে। হনূমানের শাখামৃগ রূপধারণ, উজ্জ্বল বিদ্যুতের আবির্ভাব প্রভৃতি অদ্ভুত রসের উদ্রেক করে। তিনখানির মধ্যে দুইখানিতে বীরোদ্ধত নায়ক ভীম ও একখানিতে ধনঞ্জয়। পুষ্পাহরণের জন্য সৌগন্ধিকাহরণে, ব্রাহ্মণের পুত্র-রক্ষার জন্য মধ্যম ব্যায়োগে ও গোধন-উদ্ধারের জন্য ধনঞ্জয়-বিজয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণিত, ইহাদের মধ্যে একটি যুদ্ধও স্ত্রী-নিমিত্ত নহে। সৌগন্ধিকাহরণে একমাত্র স্ত্রী-চরিত্র দ্রৌপদী এবং মধ্যম ব্যায়োগে কেশবদাসের পত্নী ও হিড়িম্বা। ধনঞ্জয়-বিজয়ে স্ত্রীচরিত্র আদৌ নাই। একদিকে যেমন এই স্ত্রীচরিত্রের অল্পতা, অন্যদিকে তেমনি পুরুষ-চরিত্রের বাহুল্য সবগুলিতেই লক্ষিত হয়। সৌগন্ধিকাহরণে ভীম, হনূমান, কুবের, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব; মধ্যম ব্যায়োগে কেশবদাস, কেশব দাসের তিন পুত্র, ঘটোৎকচ ও ভীম; ধনঞ্জয়-বিজয়ে অর্জ্জুন, উত্তর, ইন্দ্র, বিদ্যাধর, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাটরাজ প্রভৃতি চরিত্র বিদ্যমান। শৃঙ্গার, শান্ত বা হাস্যরস কোনটিতেই নাই। নৃত্য-গীত-বাহুল্য, নারীগণের হাবভাব-বিলাসযুক্ত কৈশিকীবৃত্তিও কোথাও প্রযুক্ত হয় নাই। একাঙ্কেই নাট্যগুলি সমাপ্ত। একটি মূল ঘটনাই ঈষদ্বিকশিত হইয়া উপসংহৃত হইয়াছে; অন্যান্য ঘটনা-পরম্পরার দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং গর্ভ ও বিমর্শ-সন্ধির প্রয়োগ কোনখানিতেই দেখা যায় না।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নাট্যগুলিতে বিশ্বনাথ নির্দ্দিষ্ট ব্যায়োগের লক্ষণ বিদ্যমান। এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র নাট্য অল্প পরিসরের মধ্যে

(৭) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদে "সৌগন্ধিকরণ শ্রী" এইরূপ আছে। ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ; 'সৌগন্ধিকবনশ্রী' হইবে। মূল শ্লোকটি এই:—

"লীলোন্মূলিতকৌবেরসৌগন্ধিকবনশ্রিয়ঃ।
লীলাহতহিড়িম্বস্য বিক্রমং তে রুণদ্ধি কঃ ॥"

এক একটি ঘটনা সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মধ্যম ব্যায়োগে ঘটনাটি বর্ণনা-বাহুল্যে বা কবিত্ব-প্রকাশের চেষ্টায় ভারাক্রান্ত হয় নাই। প্রাচীন কবি ভাসের সময়ে এরূপ বাহুল্য ও প্রয়াস ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সৌগন্ধিকাহরণ ও ধনঞ্জয়-বিজয়ে বাহুল্য-বর্ণনা ও কবিত্ব-প্রকাশের চেষ্টা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকত্ব হিসাবেও মধ্যম ব্যায়োগের স্থান অপর ব্যায়োগ দুইখানির উপরে।

ব্যায়োগের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া রচিত নাট্যের উদাহরণ অন্য দেশের নাট্য সাহিত্যে বিরল। প্রহসন প্রভৃতি ও নৃত্য-গীতপূর্ণ অপেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। আর এ-শ্রেণীর নাট্য সংস্কৃত-সাহিত্যেও আছে। কাজেই এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষুদ্র নাট্যগুলি নাট্যানুরাগীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। আজকাল ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যেরূপ অভিনয়-স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই শ্রেণীর নাট্য তাহাদের অভিনয়ের সম্যক উপযোগী বলিয়া মনে হয়। এ গুলিতে আদিরসের প্রসঙ্গ আদৌ নাই; স্ত্রী-চরিত্রের সংখ্যা অতি অল্প, কোথাও বা একেবারেই নাই। বৃহদাকার নাটক অপেক্ষা এ-গুলির অভিনয়-শিক্ষা বা সাজ-সজ্জাদি-সংগ্রহও অতি অল্প আয়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিবে। সংস্কৃত নাট্য যাঁহারা অভিনয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

নীলপাখী

দ্বিতীয় অঙ্ক

তিলতিল—ভাই	কুকুর	
মিতিল—বোন	জল	
বেরীলুন—পরী	রুটী	
আলো	ঠাকুর্দ্দা	মৃত
বিড়াল	ঠাকুমা	
চিনি	তিলতিলের	
আগুন	ভাইবোন	

প্রথম দৃশ্য

পরীর গৃহে

পরী। বেরীলুনের শ্বেতমর্ম্মর-রচিত সুদীর্ঘ সুসজ্জিত গৃহ। গৃহের উচ্চ ছাদ, থাম এবং দেওয়াল স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত এবং চাকচিক্যময়।

বিড়াল, আগুন এবং চিনি খুব জমকালো পোষাক পরিয়া একটী উজ্জ্বল কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিড়াল রঙচঙে পোষাক পরিয়া এক জোড়া বুটজুতা পায়ে দিয়াছিল। আগুন রঙিন জামা গায়ে দিয়া তাহার উপর একটা সিঁদুরে রঙের আলখাল্লা পরিয়াছিল। চিনি একটা চমৎকার রেশমি পোষাক পরিয়াছিল।

বিড়াল। এইদিকে। আমি এ বাড়ীর অন্ধি-সন্ধি সব জানি। দেড়ে-দাদা এই বাড়ীটা বেরীলুনকে দিয়ে গেছেন···সে অনেক কথা...পরীর ছোট মেয়েটীর সঙ্গে তিলতিল আলাপ কচ্ছে, আমরাও ততক্ষণ একটু কথা-বার্ত্তা কয়ে নি, এস।...দাসত্বের ফাঁসি গলায় পরতে আর বড় দেরি নেই...

দেখ, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই। কি ভয়ানক অবস্থায় আমরা পড়েছি তা বুঝতে পারছ কি?···এখানে আমরা সকলেই রয়েছি ত?

চিনি। সাবধান!... টাইলো পোষাকের ঘর থেকে বেরুচ্ছে।

আগুন। সংসারে ওর থাকবার দরকার কি?

বিড়াল। একটা পদাতিকের পোষাক পরেছে দেখ্‌ছি...ঠিকই হয়েছে···খোসামুদে চাকর ছাড়া ও আর বেশী কিছুই নয়।... আমরা থামের আড়ালে লুকোই, এস ওকে ভারি অবিশ্বাস করি আমি, ··· যে সব কথা তোমাদের বলব, তা ওর না শোনাই ভাল।

চিনি। এখন আর লুকোনো মিছে... ও আমাদের দেখতে পেয়েছে...ঐ দেখ, পোষাকের ঘর থেকে জলও বেরিয়ে আসছে। আহাহা, কি চমৎকারই মানিয়েছে!

কুকুর এবং জল আসিয়া ইহাদের সহিত মিলিত হইল।

কুকুর। (আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে) দেখ, দেখ, আমি কি সুন্দর পোষাক পরেছি!...এর ফিতেগুলির কি বাহার!··· আর সোনালি কাগজগুলিই বা কি সুন্দর! ...এ সব সোনা, খাঁটি সোনা!

বিড়াল। তা বেশ; কিন্তু এ সব বাজে কথার চেয়ে আমাদের ঢের দরকারি কথা আছে···রুটী কোথায় গেল?·· তার জন্যই অপেক্ষা করছি যে···কোথায় সে?

কুকুর। এখনও সে পোষাকের ঘরে... তার রকম যদি দেখতে!···কোন্ পোষাকটা পরবে, তা ঠিক করতে পারছে না।

আগুন। ঠিক হয়েছে; যেমন তার চেহারাখানি!···প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, দেখলেই মনে হয়, নিরেট আহাম্মক!

কুকুর। অনেকক্ষণ নাড়াচাড়ার পর একটা মুসলমানি পোষাক তার পছন্দ হল...পোষাকটী কিন্তু বেশ দামী, মণি-মুক্তো দিয়ে সাজানো। একটা পাগড়ী আর একখানা তলোয়ারও সে পছন্দ করেছে...

বিড়াল। ওই যে সে আসছে!...এ ত দেখ্‌ছি দেড়ে-দাদার ভাল পোষাকটীই সে পরেছে...

সুসজ্জিত হইয়া রুটী প্রবেশ করিল। একটা রেশমি গাউন তাহার বৃহৎ উদরের উপর ঝুলিতেছিল; মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী; এক হাতে তলোয়ার, অপর হাতে নীলপাখীর জন্য সেই খাঁচা।

রুটী। (সদম্ভে পদক্ষেপ করিতে করিতে) কেমন?...এবার আমায় কি রকম দেখাচ্ছে?

কুকুর। (রুটীর চারিদিকে লাফাইতে লাফাইতে) আহা, চমৎকার! যেন নিরেট বোকা! সুন্দর! বা রে বোকা!

বিড়াল। তিলতিল আর মিতিলের পোষাক পরা হয়েছে?

রুটী। হাঁ। তিলতিল পরেছে নীল কোট আর লাল পা-জামা। মিতিল পরেছে ভারি চমৎকার একটী ঘাগ্‌রা। কিন্তু যত মুস্কিল আমাদের এই আলো-ঠাকরুণকে নিয়ে···

বিড়াল। কেন?

রুটী। পরী-ঠাকরুণ তাকে এতই

সুন্দর দেখলেন যে কোন পোষাকই তাকে পরিয়ে তাঁর পছন্দ হয় না। আমি দেখলুম, মস্ত বিপদ। আমি তখন তাঁকে বল্লুম যে আলো যদি কিছু না পরে, তাহলে কিন্তু তাকে নিয়ে আমি একসঙ্গে দেখা দিতে পারব না···

আগুন। তাকে একটা ঢাক্‌নি পরিয়ে দিতে হয়!

বিড়াল। পরী তাতে কি বল্লেন?

রুটী। আমার কথায় ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে আমার পেটে দু-ঘা ছড়ি বসিয়ে দিলেন।

বিড়াল। তার পর?

রুটী। আমি চুপ্ করে গেলুম। কিন্তু শেষকালে আলোর মনে কি হল, সে জ্যোছ্‌নার পোষাক পরতে রাজী হল।

বিড়াল। থাক্; ও কথায় কাজ নেই ...আমাদের শীগ্‌গির একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে···কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ বড় সুবিধের নয়...তোমরা শুনেছ, পরী বলেছেন যে রাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও প্রাণ শেষ হয়ে যাবে...তা হলে এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, খুব দেরি করা, আর যে কোন উপায়ে হোক্ রাস্তাটাকে বাড়ানো।·· আমাদের নিজেদের জাতের স্বার্থ দেখতে হবে ত!...কিন্তু তাতে ছেলে-মেয়ে-দুটীর অদৃষ্টে কি ঘটবে, সেটাও ভাবা চাই।

রুটী। হাঁ, হাঁ; শোন, শোন, বেড়াল-মশাই ন্যায্য কথাই বলেছেন!

বিড়াল। থাম, ব্যস্ত হয়ো না!··· আমাদের যে আত্মা আছে অর্থাৎ আমরা জানোয়ার আর জিনিষ-পত্তর হলেও যে কথা কইতে পারি, আমাদের বোধ-শোধ আছে, মানুষ এখনও তা টের পায়-নি। আর টের পায়-নি বলেই এখনও আমাদের একটু-আধটু স্বাধীনতা তবু আছে। কিন্তু, যে দিন সে নীলপাখীর সন্ধান পাবে, সেদিন সমস্তই জানতে পারবে; আর আমাদেরও চিরকালের জন্য তাদের গোলাম হয়ে থাকতে হবে।··· এ কথা আমি এতদিন জানতুম না। আমার প্রিয় বন্ধু রাত্রি, জীবন-রহস্যের সে একজন প্রহরী কি না, সে-ই আমাকে একটু-আগে এ সব বাত্‌লে দিলে। এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, নীলপাখীর সন্ধানে সাধ্যমত বাধা দেওয়া; এতে যদি তিল-তিল আর মিতিলের প্রাণ যায়, তবে তাতেও আমাদের হঠলে চলবে না।

কুকুর। (সক্রোধে) কি!...বলছিস্ কি তুই!···আবার বল্ ত শুনি...বল্ না... চুপ করে গেলি কেন? বল্, বল্!

রুটী। চুপ্, চুপ, চুপ কর। তোমার ত কথা কইবার পালা নয়!···আমি হচ্ছি এই সভার সভাপতি, আমি বারণ করছি, চুপ কর।

আগুন। কারা তোমায় সভাপতি করেছে?

জল। (আগুনের প্রতি) চুপ কর, বলছি!...মিছে কেন বক্ বক্ করছ?

আগুন। আমার যা খুসী তাই বলব, তুমি বাধা দেবার কে?

চিনি। মাপ করবেন মশাইরা...এখন ঝগড়া করবার সময় নয়।...বিষয়টী গুরু-

তর...কি উপায় করা যাবে, সেটা এখনি ঠিক করে ফেলা দরকার।

রুটী। চিনি আর বেড়াল-মশাই যা বল্লেন, আমি তা খুব অনুমোদন করি।

কুকুর। আমি করি না...এ রকম কথাকে বাতুলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না।...মানুষ যখন আছে, তখন সবই ত আছে!···এর উপর আবার কি চাই?···আমরা তাকে মান্য করে চলব, সে যা বলবে, তাই শুনব— তা হলেই ত সব হল!...আমি ত তাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না!...মানুষই চিরকাল থাকুক। জীবনে মানুষ, মরণে মানুষ, সব রকমে—সব অবস্থায় মানুষ!··· মানুষই ভগবান!

রুটী। ঠিক বলেছ তুমি। আমারও এই মত।

বিড়াল। (কুকুরের প্রতি) কিন্তু তোমার এ সব কথার যুক্তি দেখাও।

কুকুর। যুক্তি!···যুক্তি আবার কিসের! আমি মানুষকে ভালবাসি এই-ই যথেষ্ট! ···তোমায় বলে রাখছি টাইলেট্, মানুষের বিরুদ্ধে যদি সামান্য কিছু করতে যাও, তাহলে আগে তোমার টুঁটি টিপে ধরবো, তারপর তখনই গিয়ে তাকে আমি সব বলে দেব।

চিনি। (ধীরভাবে বাধা দিয়া) আমায় মাফ করবেন। এ রকম কট্-কাটব্য করাটা আমি ঠিক মনে করি না। কোন কোন বিষয়ে আপনারা দুজনেই ঠিক বলছেন। আপনাদের দুজনের কথাই বিচার করে দেখতে হবে।

রুটী। চিনি ঠিক বলেছে। দুজনের কথাই বিচার করে দেখতে হবে।

বিড়াল। আমরা সকলেই কি অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করছি না?...আমরা সকলেই—জল, আগুন—রুটী, চিনি তোমরাও, টাইলো তুমিও—বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, সকলেই কি আমরা মানুষের ক্রীতদাস হয়ে পড়িনি?···মনে কর দেখি, সেই সময়ের কথা, যখন মানুষের এতখানি দম্ভ ছিল না, প্রভুত্ব ছিল না—তখন আমরা পৃথিবীতে কি রকম অবাধে, স্বেচ্ছামত ঘুরে বেড়াতুম!...আগুন আর জল তখন জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল, এখন তাদের দুর্দ্দশা দেখ।··আমাদের অবস্থাটাও ভাবো!... দুর্দ্দান্ত বন্য পশুর বংশধর আমরা, আমাদের ···এই চুপ, চুপ, ওরা আসছে...সাবধান হয়ে যাও···দেখাও যে আমরা কিছুই করছি না···আলো আর পরী এদিকে আসছে, আলো মানুষের সঙ্গ নিয়েছে...আলো হল আমাদের চির-শত্রু।...এই যে ওরা এসে পড়ল।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বেশে পরী এবং পশ্চাতে আলো এবং তিলতিল ও মিতিল প্রবেশ করিল।

পরী। কি হচ্ছে সব?...ওই কোণটীতে বসে তোমরা কি সব গুজ্ গুজ্ করছ?... দেখে মনে হচ্ছে, কোন ফন্দী আঁটছ।... ওঠো সব, এখনই তোমাদের বেরুতে হবে। ···আমি ঠিক করলুম যে আলো তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।···আমায় তোমরা যে-রকম মান্য কর, তাকেও সেই রকম করো। আমি আমার ছড়ি-গাছটী তাকে

দিচ্ছি। তিলতিল-মিতিল আজ সন্ধ্যাবেলায় তাদের ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।···তোমরা পিছনে থেকো!... তারা আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কাটাবে, সেই সময় তোমরা কালকের জন্য সব যোগাড়-যন্ত্র করে নিয়ো, কাল অনেক পথ হাঁটতে হবে।···এস, আর বসে থেকো না, এখন যে যার কাজে তৎপর হও।

বিড়াল। (ভণ্ডামির সহিত) মা-ঠাকরুণ, ঠিক এই কথাটাই আমি এদের এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলুম।···নিজেদের প্রত্যেক কাজটী বেশ বিবেচনা-মত নির্ভয়ে করে যাবার জন্য এদের আমি উৎসাহ দিচ্ছিলুম; কিন্তু আপশোষ এই যে কুকুর কেবল আমার কথায় বাধা দিচ্ছিল, আর...

বিড়ালের ঘাড়ে কুকুর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল; তিলতিল পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ধমক দিয়া নিবৃত্ত করিল।

কুকুর। কি? কি বলছিস্ তুই?... আচ্ছা,...

তিলতিল। খবরদার টাইলো!·· ধরলে আর রক্ষে রাখবো না!

কুকুর। তুমি জান না; ও নিজেই...

তিলতিল। (ধমক দিয়া) চুপ, কোন কথা শুনতে চাই না।

পরী। ব্যস্, হয়েছে।··· তিলতিল, আজকের মত তুমি খাঁচাটা রুটীর কাছ থেকে নাও। অতীতের মধ্যে অর্থাৎ তোমার ঠাকুর্দ্দার ওখানে হয়ত নীলপাখীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।.. সেখানে যখন যেতেই হল, তখন হুঁসিয়ার থাকা ভাল।...আচ্ছা, আমরা সব এই দিকে যাব এবার।... (তিলতিলের প্রতি) তোমরা ওই দিক দিয়ে যাও।

তিলতিল। (উদ্বিগ্নভাবে) আমরা দুটী ভাই-বোনেই শুধু যাব তাহলে?

মিতিল। আমার খিদে পেয়েছে।

তিলতিল। আমারও পেয়েছে।

রুটী তলোয়ার বাহির করিয়া নিজ পাকস্থলী হইতে দুইটা টুক্‌রা কাটিয়া তিলতিল ও মিতিলকে প্রদান করিল।

চিনি। (অগ্রসর হইয়া) আমিও এই সঙ্গে চিনির দু-এক টুকরো তোমাদের দিচ্ছি।

সে তৎক্ষণাৎ নিজ বামহস্তের পাঁচটী আঙ্গুল কাটিয়া তিলতিল ও মিতিলকে উপহার প্রদান করিল।

মিতিল। দেখ, দেখ, কি করলে! ও নিজের সব আঙ্গুলগুলো কেটে ফেল্লে!

চিনি। খেয়ে দেখ, ভারী চমৎকার।... এগুলি খাঁটি চিনির তৈরী।

মিতিল। (একটী খাইয়া) সত্যি, বড্ড চমৎকার!...এ রকম কি তোমার অনেক আছে?

চিনি। (নম্রভাবে) আছে। আমি যত ইচ্ছে পেতে পারি।

মিতিল। যখন কেটে ফেলো, তখন কি তোমার বড্ড লাগে?

চিনি। একটুও না; কেটে ফেল্লে বরং লাভ আছে; তখনি আবার নতুন আঙ্গুল গজিয়ে ওঠে; এতে আমি সর্ব্বদা পরিষ্কার নতুন আঙ্গুল পাই।

পরী। বেশী খেয়ো না।...মনে থাকে

যেন তোমাদের ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যা বেলায় খেতে হবে।

তিলতিল। তাঁরা কি এখানেই আছেন?

পরী। এখনি তাঁদের দেখবে।

তিলতিল। তাঁরা ত মরে গেছেন, তবে তাঁদের দেখব কি করে?

পরী। তোমাদের স্মৃতির মধ্যে যখন তাঁরা রয়েছেন, তখন মরতে পারেন না। মানুষের জ্ঞান এত অল্প যে এই রহস্যটুকু তারা বোঝে না। যাই হোক্, হীরেটুকুর গুণে তোমরা দেখবে যে তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন, যাঁদের কথা তোমাদের মনে আছে, তাঁরা সবাই তোমাদেরই মত সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছেন।

তিলতিল। আলো কি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

পরী। না, তোমরা কেবল দুজনেই যাবে।...অচেনা কারও সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। আমিও এখানে থাকব। তোমাদের দুজনকে ছাড়া আর কাউকে তাঁরা যেতে বলেন নি।

তিলতিল। কোন্ দিকে আমরা যাব?

পরী। এই দিকে!...তোমরা এখন স্মৃতির দেশের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছ।··· হীরেটী ঘুরিয়ে দিলেই সামনে দেখবে, একটা মস্ত গাছ, তাতে একখানা তক্তা ঝুলানো রয়েছে।···সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে তোমরা ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছ; কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে ন' টার আগে তোমাদের দুজনকেই ফিরতে হবে।...যদি ঠিক সময়ে ফিরতে না পার, যদি একটু দেরী হয়ে যায়, তাহলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে।...ন' টার আগে ফেরা চাই, বুঝলে,—এ কথা যেন ভুলো না।.. আচ্ছা, এখন তবে এসো।··· (বিড়াল, কুকুর, আলো প্রভৃতিকে ডাকিয়া লইয়া) তোমরা সব আমার সঙ্গে এস... ওরা ওদিকে যাবে।...

আলো ও জানোয়ার প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরী ডান দিকে চলিয়া গেল; তিলতিল ও মিতিল ডান দিক দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্মৃতির দেশ

ঘন কুজ্ঝটিকায় স্থানটী আচ্ছন্ন। সম্মুখে এক সুবৃহৎ গাছ, তাহাতে একখানি তক্তা ঝুলানো রহিয়াছে। ক্ষীণ, শুভ্র আলোকচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। তিলতিল ও মিতিল বৃক্ষতলে দণ্ডয়মান।

তিলতিল। এই সেই গাছ।

মিতিল। ঐ যে তক্তা ঝুলোনো রয়েছে।

তিলতিল। কি লেখা আছে—পড়া যাচ্ছে না; থাম, গাছে উঠি ..এইবার হয়েছে; লেখা আছে, "স্মৃতির দেশ"।

মিতিল। ঠাকুমা আর ঠাকুর্দ্দা কোথায়?

তিলতিল। ঐ পিছনে, যেখানে কুয়াশা নেই; এখনি দেখতে পাব।

মিতিল। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না...নিজের হাত-পা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।...উহুহু, কি শীত! আমি আর হাঁটতে পারবো না, বাড়ী ফিরে যাই।

তিলতিল। থাম। কচিখুকীর মত প্যান্ প্যান্ করে কান্না ভাল দেখায় না। ...এত বড় ধাড়ী মেয়ে, লজ্জাও করে না কাঁদতে?...ওই দেখ, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে; পিছনে কি আছে, এখনি দেখতে পাব।

কুজ্ঝটিকা নড়িতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে পাতলা ও হালকা হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। আলো ক্রমশ স্বচ্ছ তীব্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, এবং অদূরে মনোরম লতাকুঞ্জের মধ্যে একটী সুদৃশ্য কুটীর দেখা গেল। কুটীরের দরজা এবং জানালা খোলা ছিল। জানালার পার্শ্বে পুষ্পাধার সজ্জিত ছিল, দেওয়ালের গায়ে একটী মধুচক্রে মক্ষিকার দল গুন্ গুন্ করিতেছিল। খাঁচার মধ্যে একটী কালো রঙের পাখী ঘুমাইতেছিল। দরজার পাশে একখানি চৌকির উপর একটী বৃদ্ধ কৃষক ও তাহার পত্নী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। ইহারাই তিলতিলের পিতামহ ও পিতামহী।

তিলতিল। (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে চিনিতে পারিয়া) ওই যে ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমা।

মিতিল। (আনন্দে করতালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, ওই যে তাঁরা, ওই যে!

তিলতিল। (এখনও তাহার সন্দেহ দূর হয় নাই) থামো, ব্যস্ত হয়ো না। এখনও ঠিক বলা যায় না, তাঁরা নড়তে পারেন কি না! আমরা গাছের নীচে দাঁড়াই এস।

ঠাকুমা চোখ চাহিলেন, মাথা তুলিলেন, অবশেষে উঠিয়া বসিলেন; একটী নিশ্বাস ছাড়িয়া বৃক্ষের দিকে চাহিলেন। বৃদ্ধও ধীরে ধীরে জাগিয়া বসিলেন।

ঠাকুমা। আমার নাতি-নাত্‌নি যারা বেঁচে আছে,—আমার কেমন মনে হচ্ছে,—আজ তারা আমাদের দেখতে আসবে।

ঠাকুর্দ্দা। তারা আমাদের কথা ভাবছে বৈকি; কারণ আমার পায়ের তলা চুলকুচ্ছে।

ঠাকুমা। আমার মনে হয়, তারা খুব কাছেই আছে; কেননা, আনন্দে আমার চোখে জল ভরে উঠছে।

ঠাকুর্দ্দা। না, না; তারা এখনও অনেক দূরে রয়েছে।...আমি এখনও কাহিল বোধ করছি!

ঠাকুমা। কখ্খনো না।...আমি বলছি, তারা খুব কাছে আছে; আমার বেশ আমোদ হচ্ছে।

তিলতিল ও মিতিল। (বৃক্ষের পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) এই যে আমরা এসেছি, এই যে—ঠাকুর্দ্দা, অ ঠাকুমা, আমরা এসেছি গো, এসেছি!

ঠাকুর্দ্দা। দেখেছ গিন্নি, ঠিক বলেছি কি না, যে, আজ আমার নাতি-নাতনি নিশ্চয় আসবে।

ঠাকুমা। তিলতিল? মিতিল? এস ভাই, এস দিদি। (উঠিয়া তাহাদের নিকটে যাইবার চেষ্টা করিয়া) দেখ, আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না, এখনও সেই বাতে ভুগচি।

ঠাকুর্দ্দা। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যত শীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করিয়া) আমারও সেই দশা।...কাঠের পা নিয়ে আমিও তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না। সেই যে গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে কাঠের পা পরেছিলুম, সে পা এখনও তেমনি আছে।

ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুমা এবং নাতি-নাতনি পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

ঠাকুমা। তিলতিল, বা ভাই, তুমি ত বেশ বড়-সড়টী হয়েছ!

ঠাকুর্দ্দা। (মিতিলের চুল ধরিয়া টানিয়া)

আর মিতিল?...মিতিলের দিকে চেয়ে দেখ, দিদির চুলগুলি কি চমৎকার হয়েছে! চোখদুটীও ভারী সুন্দর!

ঠাকুমা। এস, কোলে এস, একটা চুমো দাও।

ঠাকুর্দ্দা। আর আমায়—

ঠাকুমা। তুমি একটু থামোনা!...আমার কাছে আগে এস।...তোমাদের বাবা আর মা ভাল আছে?

তিলতিল। বেশ ভাল আছে ঠাকুমা। আমরা যখন আসি, তখন তাঁরা ঘুমুচ্ছিলেন।

ঠাকুমা। (ভাল করিয়া দেখিয়া এবং আহ্লাদে তিলতিল-মিতিলকে জড়াইয়া ধরি।) কি সুন্দর তোরা হয়েছিস্। হ্যাঁরে, তোদের এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজ-গোজ পরিয়ে দিলে কে? মা বুঝি?...তোরা হামেশা কেন এখানে আসিস না? তোদের দেখলে যে কত খুসী হই!...মাসের পর মাস কেটে গেছে, একবারও ত কই আমাদের মনে করিস নি!...এতদিন যে আমরা কাউকে দেখতে পাইনি, ভাই!

তিলতিল। আসতে পারিনি ঠাকুমা; আর আসবই বা কি করে? আজ যে এসেছি, সে কেবল পরীর দয়ায়।

ঠাকুমা। আমরা এই জায়গাটী থেকে কোথাও নড়িনে; কিন্তু দেখা ত কই কারো সঙ্গে হয় না!...কালে-ভদ্রে কেউ হয়ত এসে পড়ে...এই তোরাই এলি কদ্দিন পরে, বল্ দেখি।...সেই এক দিন এসেছিলি, মনে পড়ে?...সেই যে দিন গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজছিল, সে আজ এক বচ্ছরের কথা না?

তিলতিল। সে দিন ত কই আমরা বাড়ীর বার হইনি, ঠাকুমা।...আমাদের দুজনেরই যে সেদিন বড্ড সর্দ্দি লেগেছিল।

ঠাকুমা। বাড়ীর বার হস্‌নি, কিন্তু সেদিন আমাদের মনে করেছিলি যে ভাই।

তিলতিল। হ্যাঁ, তা মনে করেছিলুম বটে।

ঠাকুমা। তা হলেই হল; যতবার তোরা আমাদের কথা ভাবিস্ ততবারই আমরা জেগে উঠি আর তোদের দেখতে পাই।

তিলতিল। তোমরা কি চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমিয়ে থাক?

ঠাকুর্দ্দা। হ্যাঁ, ভাই ঘুমটা আমাদের বড্ড বেশী বটে; কিন্তু যাদের প্রাণ আছে, তারা আমাদের মনে কল্লেই আমরা জেগে উঠি।.. প্রাণ শেষ হয়ে গেলে ঘুমটাই সব চেয়ে ভাল লাগে কি না! তবে মাঝে মাঝে জেগে থাকাও বেশ।

তিলতিল। তা হলে তোমরা সত্যি মরনি?

ঠাকুর্দ্দা। অ্যাঁ, কি বল্‌লি?...ও গিন্নি, এরা আবার ও সব্ কি বলছে?...এর মানে কি?...এমন একটা কথা বল্লে, যা আগে কখনও শুনিনি।

তিলতিল। সে কি? "মরণ" কথা শোন নি?

ঠাকুর্দ্দা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ কথাই বটে! তা ও কথাটার মানে কি ভাই?

তিলতিল। এর মানে যে যখন দেহে আর প্রাণ থাকে না।

ঠাকুর্দ্দা। তোমরা দেখছি, নেহাৎ

আহাম্মক। ও একটা কথাই নয়!... নাঃ, কিচ্ছুই বোঝ না...ভারী আহাম্মক!

তিলতিল। (বিস্মিতভাবে ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুমাকে দেখিতে লাগিল) ঠাকুর্দ্দা, তুমি ঠিক তেমনিটিই আছে; একটুও বদলাও নি—একটুও না; ঠাকুমা, তুমিও সেই আছ। তোমাদের চেহারায় বরং আরো জলুস্ হয়েছে।

ঠাকুর্দ্দা। হ্যাঁ, আমরা বেশ ভালই আছি...আমাদের বয়স আর বাড়বে না, আমরা আর বুড়োও হব না; কিন্তু তুমি যে মস্ত ঢেঙা হয়ে উঠেছ, ভাই।

তিলতিল। (কৌতূহলের সহিত চারিদিকে চাহিয়া) কিছুই বদলায় নি ত, বাঃ! যে যেমন ছিল, সে ঠিক তেমনিটীই আছে; কেবল আগেকার চেয়ে বেশী সুন্দর হয়েছে।

মিতিল। তিলতিল, দেখ, ওই সেই বুড়ো কালো পাখীটা!...বাহবা! ও কি এখনও গান করতে পারে?

কালো পাখীটি জাগিয়া উঠিয়া উচ্চ সুরে গান ধরিয়া দিল।

ঠাকুমা। দেখলে ত!...ওর কথা মনে করেছ কি ও অমনি জেগে বসেছে!

তিলতিল। (পাখীটিকে বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, সেটি একেবারে নীলরঙের) এ ত দেখছি একেবারে নীল। বা রে! এই পাখীটাই ত আমরা চাই, এইটীই ত পরীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এত খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর এটা এখানে রয়েছে, তোমরা আমাদের বলনি? বেশ পাখী, আগা-গোড়াই নীল, কি চমৎকার! (আদরের সুরে) ও ঠাকুমা, ঠাকুর্দ্দা, এটা আমায় দেবে?

ঠাকুর্দ্দা। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। কি বল গো গিন্নি?

ঠাকুমা। অবিশ্যি। এ আর বেশী কথা কি? ওটা রেখেই বা আর কি হবে? কেবলি ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়; গান করতে ত একদিনও শুনলুম না।

তিলতিল। আমি ওকে আমার খাঁচায় পুরে নিয়ে যাব...আচ্ছা, সে খাঁচাটা কোথায়?...ও, মনে পড়েছে, গাছতলায় রেখে এসেছি...দাঁড়াও, নিয়ে আসি। (সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া খাঁচা লইয়া আসিল এবং তাহার ভিতর পাখীটিকে বন্ধ করিল) তা হলে ঠাকুমা, সত্যি এটা আমায় দিলে ত? আলো আর পরী দুজনে দেখে কত খুসীই যে হবে এখন!

ঠাকুর্দ্দা। বেশ, নিয়ে যাও; কিন্তু এর বিষয় কিছু বলতে চাই না; তবে আমার ভয় হয়, সে দেশে গিয়ে ও বেশী দিন টিঁকতে পারবে না। বসন্তের হাওয়া এই দিক পানে বইবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ফিরে আসবে।

তিলতিল। আচ্ছা, আমার ছোট বোনগুলি কোথায়? তারাও কি এখানে আছে?

মিতিল। আর ছোট ভাইগুলি?

কুটীরের ভিতর হইতে সাতটী ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে বাহির হইয়া আসিল।

ঠাকুমা। এই যে তারা, এই যে! মনে করতে না করতেই বাছারা সব এসে হাজির হয়েছে!

তিলতিল ও মিতিল ছুটিয়া গিয়া তাহাদের জড়াইয়া ধরিল এবং হাত ধরাধরি করিয়া আহ্লাদে নাচিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দ-কলরবে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

তিলতিল। কিরে পীরোট, কেমন আছিস?...আগে যেমন আমরা লড়ালড়ি করতুম, তেমনি করি, আয়। ও রবার্ট, ও জিন, তোদের পুতুল কোথায় রে? ও পলিন, ও রিকেট্!

মিতিল। এই যে পিরীট, এই যে মাদ্‌লিন।...ও খুকী, তুই যে এখনও হামা টানছিস্?

ঠাকুমা। ও অমনিটিই থাকবে, আর ত বাড়বে না।

তিলতিল। পলিনের নাকের উপর এখনও সেই মাংসর ঢিবিটা রয়েছে!

ঠাকুমা। ওটা অমনিই থাকবে, সারবে না।

তিলতিল। এরা সব কেমন মোটা-সোটা, কেমন সুন্দর আর পরিষ্কার হয়েছে!...গালগুলি কেমন লাল টুকটুকে!... ঠাকুমা, এরা বোধ হয় ভাল খেতে-দেতে পায়, না?

ঠাকুমা। যেদিন থেকে ওরা এখানে এসেছে, সেদিন থেকে সব খুব ভালই আছে। শরীরে অসুখ নেই, কিছুরই ভয় নেই, কোন রকম ভাবনা নেই...

কুটীরের মধ্যে বড় ঘড়িটাতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল।

ঠাকুমা। (আশ্চর্য্য হইয়া) ও কিসের আওয়াজ?

ঠাকুর্দ্দা। তাইত!...ওটা ঘড়ি না?

ঠাকুমা। হতেই পারে না; এদ্দিন ত কই বাজে নি!

ঠাকুর্দ্দা। তা বাজবে কেন! আমরা কখনও সময়ের কথা যে মনেও করি নি।... আচ্ছা, তোমরা কি কেউ এখন সময়ের কথা মনে কচ্ছিলে?

তিলতিল। হ্যাঁ, আমি মনে কচ্ছিলুম। এখন সময় কত ঠাকুর্দ্দা?

ঠাকুর্দ্দা। কি জানি! আমার কোন ধারণা নেই। আটবার ওটা বাজলো; তাইতে মনে হচ্ছে এই সময়টাকে তোমরা আট-টা বল।

তিলতিল। আলো আর পরী আমার জন্যে বসে রয়েছে; ন'টার আগে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হতে হবে, বড় জরুরি কাজ আছে।...আমি তবে এখন চল্লুম!

ঠাকুমা। থাম্, থাম্, পাগলা! অমন করে কি চলে যেতে আছে!...খাবার তৈরি, খেয়ে যা। চল, সব বাইরে গিয়ে খেতে বসি। খুব চমৎকার কপির ঝোল আর কুলের চাটনি তৈরি আছে।

সকলে ধরাধরি করিয়া টেবিলটা বাহিরে আনিয়া থালা-বাসন, চামচ প্রভৃতি সাজাইতে লাগিল।

তিলতিল। সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, এর ভিতর একদিনও কপির ঝোল খেতে পাই নি। নীলপাখী ত পাওয়া গেল, এখন আমি নিশ্চিন্তি। আজ পেট ভরে কপির ঝোল খাব। কি বল ঠাকুমা?

ঠাকুমা। আচ্ছা, যত পারিস, খা, ভাই। ...বসে যা না রে সব তোরা।...তাড়াতাড়ি যদি যেতে হয় ত আর দেরি করছিস্ কেন?

আলোটা উস্‌কাইয়া দেওয়া হইল। ঝোল পরিবেশন করা হইল। ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুমা নাতি-নাতনিদের লইয়া আহারে বসিলেন। ছেলেরা উল্লাসে চেঁচাইতে লাগিল—খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি ঘুসা-ঘুসি আরম্ভ করিয়া দিল।

তিলতিল। (পেটুকের মত গিলিতে লাগিল) ভারী চমৎকার, ঠাকুমা, ভারী চমৎকার!···আরো খাব, ঠাকুমা, আর-একটু দাও।

চামচ হাতে করিয়া অস্থিরভাবে নাড়িতে লাগিল এবং থালার উপর খুব জোরে ঠুকিতে লাগিল।

ঠাকুর্দ্দা। আরে থাম্, থাম্। অত ব্যস্ত কেন?...তুই যেমন দুষ্ট ছিলি, তেমনিই আছিস, দেখছি। থালাটা ভেঙ্গে ফেলবি না কি?

তিলতিল। (টুলের উপর উঁচু হইয়া) আমায় আরো দাও, আরো, আরো। (ঝোলের থালাটা শুদ্ধ ধরিয়া নিজের দিকে টানিতে লাগিল। আর অমনি গরম ঝোল গড়াইয়া তাহার হাঁটুতে পড়িল। সে যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল)

ঠাকুমা। বেশ হয়েছে; যে-রকম ব্যস্ত-বাগীশ!

ঠাকুর্দ্দা। (তিলতিলের গালে খুব জোরে এক চড় বসাইয়া দিলেন) কেমন, এবার হয়েছে!

তিলতিল। (প্রথমটা চমকিয়া উঠিল; তারপর গালে হাত বুলাইয়া ভারি খুসী হইয়া) ঠিক এই রকম চড় তুমি মারতে, যখন তুমি বেঁচেছিলে, ঠাকুর্দ্দা। দেখ, আমার ভারি মজা লাগছে।...এর জন্যে তোমায় একটা চুমো দেব।

ঠাকুর্দ্দা। সত্যি না কি! তবে আরও এক ঘা চাস নাকি?

(ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল)

তিলতিল। ওই যাঃ, সাড়ে আটটা বেজে গেল! মিতিল, চল, চল, আর সময় নেই!

ঠাকুমা। একটু থাম্। আর দু-চার মিনিট। কদ্দিন পরে তোরা এলি, অমন তাড়াতাড়ি চলে যাবি!

তিলতিল। না, না, আর থাকতে পারি না। আলো আমাদের জন্যে বসে রয়েছে... আমি তাকে কথা দিয়েছি। মিতিল, এস।

ঠাকুর্দ্দা। হা ভগবান! এরা কাজ-কর্ম্ম নিয়ে কি কষ্টই না ভোগ করে!... একটুও কি এদের সোয়াস্তি নেই?

মিতিল। (খাঁচা হাতে লইয়া ব্যস্তভাবে প্রত্যেককে চুম্বন করিয়া) ঠাকুর্দ্দা, তবে চললুম। ঠাকুমা, আসি, ভাই সব, বোনগুলি, এখন তবে চল্লুম। কিছু মনে করো না। আমার থাকবার যো নেই। কেঁদোনা ঠাকুমা আমি আবার আসব—এমন থেকে হামেশাই আসব।

ঠাকুমা। হাঁ দিদি, রোজ আসিস্।

তিলতিল। আচ্ছা ঠাকুমা, তাই হবে। যতবার পারি, আসব।

ঠাকুমা। তোরা যে মাঝে মাঝে আমাদের মনে করিস্, এইটুকুতেই আমাদের যা-কিছু সোয়াস্তি!

ঠাকুর্দ্দা। এ ছাড়া আর কোন রকম আমোদ আমাদের নেই।

তিলতিল। শীগ্‌গির, শীগ্‌গির। আমার খাঁচা কোথায়—পাখী?

ঠাকুর্দ্দা। (খাঁচাটা তিলতিলের হাতে দিয়া) এই নাও। কিন্তু আমি বলতে পারলুম না, এর রঙটা ঠিক নীল কি না!

তিলতিল। আমরা তবে চল্লুম।

ছেলে-মেয়েগুলি সকলে। এসো, মিতিল, এসো, তিলতিল, আমাদের মনে রেখো; আবার এখানে এসো।

তিলতিল ও মিতিল চলিয়া গেল। সকলে তাহাদিগকে রুমাল নাড়িয়া বিদায় দিল। স্থানটী আবার কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল। তিলতিল ও মিতিল পুনরায় বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল।

তিলতিল। এই রাস্তা ত?

মিতিল। হ্যাঁ, আলো কোথায় গেল?

তিলতিল। কি জানি? (খাঁচার দিকে চাহিয়া) কি আশ্চর্য্যি! পাখীটা ত নীল রঙের নয়, এ যে মিশ্‌ কালো!

মিতিল। আমার হাত ধর ভাই; বড্ড শীত করছে—আমার ভারী ভয় পাচ্ছে।

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

সামাজিক পরিবর্ত্তন

(ক্রপটকিন হইতে)

আমাদের প্রার্থিত এই বিদ্রোহ যদি সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, তবে আগেকার অন্যান্য বিদ্রোহের সঙ্গে এর কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের প্রভেদ হবে না; উপায়েরও যথেষ্ট প্রভেদ থাকবে। নূতন উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে নূতন উপায় অবলম্বন করতে হবে।

গত একশ' বছরের মধ্যে ফ্রান্সে যে তিনটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে উপায় ও উদ্দেশ্যের নানা-রকম তফাৎ থাকলেও একদিকে যথেষ্ট ঐক্য ছিল। প্রতিবারেই দেশের জন-সাধারণ পুরাণো রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্যে লড়াই করে' বুকের রক্ত দিয়েছে এবং কিছুদিনের জন্যে যুদ্ধের আঘাত-চিহ্ন ধারণ করে সর্ব্বস্ব ক্ষুইয়ে বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেছে। প্রতিবারই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত কার্য্যকরী সমিতি ধর্ম্মতন্ত্র আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিতরকার বহুদিনের আবর্জ্জনা দূর করবার চেষ্টায় যে পরিমাণ সময় ও শক্তি ব্যয় করেছে, জন-সাধারণের, যুদ্ধরত কর্ম্মীর অভাব-অভিযোগের দিকে সেই পরিমাণ অমনোযোগী হয়েছে। মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ের বিজ্ঞতার ফলে রাষ্ট্রনীতির তর্ক হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু খাদ্যসংস্থানের কথাটা সেই গোলেমালে চাপা পড়ে' গেছে।

সেই বিদ্রোহে, মানবসভ্যতার সেই অরুণোদয়ে এমন-সব বড় কথা এবং মহৎ ভাব জন্মলাভ করেছে, যার জন্যে আজও জগৎময় সাড়া জেগে আছে। এক শতাব্দীর ব্যবধানকে তুচ্ছ করে' সেই-সব কথা এখনও আমাদের প্রাণে নতুন প্রেরণা

এনে দিচ্ছে, কিন্তু সে-সব বড় কথা কর্ম্মীজনের কোন উপকারেই আসে-নি। বিফলমনোরথ হয়ে তারা দুর্গন্ধ ও নোংরা কুটীরে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে অনাহারে অসহায় হয়ে মরেছে; কারণ, বড় কথায় মন ভরতে পারে, পেট ভরে না।

বিদ্রোহের সময় কল-কারখানা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন ও বিস্তার বন্ধ হয়ে গেল, ব্যবসা-বাণিজ্য স্থগিত হল, আর মূলধন ধনীর সিন্দুকের মধ্যে ডালা-চাপা হয়ে রইল। তাতে-করে' খনির মালিক বা কলের মালিকের অবশ্য কোন অভাব হলো না। গরীবের রক্ত শুষে তিনি যা সঞ্চয় করেছেন, তা শুধু উদর-পূর্ত্তি কেন,—বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করার পক্ষেও যথেষ্ট। কিন্তু অসহায়ে মরলো কর্ম্মী-সম্প্রদায়—অভাবের কষাঘাতে তাদের জীর্ণ প্রাণ ভেঙ্গে পড়ল—দুর্ভিক্ষ করাল মূর্ত্তিতে দেশের বুকে মরণ ছড়িয়ে ফিরতে লাগলো —তেমন বুঝি আর-কখনও হয়-নি।

জনসাধারণ মনে করলে, মধ্যবিত্ত দল তাদের অনাহারে মারছে; অনাহারে যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত কর্ম্মীদল তাদের ফাঁকি দিলে এবং নিজেদের মধ্যে থেকে দল গড়ে' তাদের হাতে কর্ম্মভার তুলে দিলে। কিন্তু জন-সাধারণের অভাব কমাবার কোন চেষ্টাই সফল হল না।

জনসাধারণের মধ্যে অবসাদের লক্ষণ দেখা দিলে। রাজপন্থী দল এবার সুবিধা বুঝে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো; এক-দিকে যেমন কর্ম্মীদের অভাব ও কষ্ট বাড়লো, অন্যদিকে তেমনি ধনীদের সাহসও বাড়তে লাগলো। তারা গুপ্তস্থান ছেড়ে বেরিয়ে এল; প্রজার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন ও মৃত্যুর মাঝখানে বিত্ত-বিলাসে গর্ব্বিত রাজশক্তির আনন্দকোলাহল আকাশ বিদীর্ণ করে' তুললে। ক্ষিপ্তমনে অবসন্ন দেহে বিদ্রোহীদল ব্যর্থকাম হয়ে তাদের কুটীরে ফিরে সুচির দুঃখের অপেক্ষায় বসে' রইল। রাজশক্তির পুনঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার মারামারি কাটাকাটি চল্‌লো—অজস্র রক্তপাতে স্বাধীনতার ভূমি মলিন ও কলঙ্কিত হয়ে উঠলো। কর্ম্মীজনের অভাব কিন্তু কোন-দিনই ঘুচলো না—মাঝ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে অকারণে পৃথিবী থেকে চির-নির্ব্বাসনে চলে গেল। এমনি-করে' বারে বারে বিদ্রোহীদল স্বার্থত্যাগ করে' ও যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েও যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু ইতিহাসের এই শিক্ষা আমরা কাজে লাগাব—আমরা প্রথম থেকেই যথেষ্ট সাবধান হয়ে চলবো। আমাদের বিদ্রোহ আর-কিছু চায় না—সকলের জন্যে পর্য্যাপ্ত আহার পেলেই সে সন্তুষ্ট হবে। রাজশক্তির পরিত্যক্ত গিল্টির সিংহাসন ও শিরোপার উচ্ছিষ্ট দরবারী কায়দা ও বড় কথার তর্ক যারা করতে চায় তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কাজ নেই। বিদ্রোহের আরম্ভ থেকেই আমাদের দেখতে হবে, যাতে দলভুক্ত একজনও অনাহারে না থাকে—দেশের একজন স্ত্রীলোক বা শিশুও অন্নাভাবে কাতর না হয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বড় বড় কথা নিয়ে চিরকালই মাথা ঘামায়। কিন্তু সে-সব নিতান্ত অসার কল্পনা বৈ আর

কিছু নয়। সাধারণের যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা সকলের আহার-সংস্থানে ব্যয়িত হবে। আমরা জোর-গলায় প্রচার করব যে, অন্নের অধিকার সকলেরই আছে এবং সকলের পর্য্যাপ্ত অন্নেরও কোনদিন অভাব হবে না। পর্য্যাপ্ত অন্নের স্বচ্ছলতাই আমাদের এই পরিবর্ত্তনের মূলমন্ত্র।

বিদ্রোহীর দলভুক্ত সকলকেই শয়ন, অশন ও বসনের অভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। দৈনিক অভাবের দায় থেকে ছুটি পেলে তারা খুসী মনে কাজে যোগ দিতে পারবে এবং এগুলো যদি ঠিক হয়ে যায় তবে পরিবর্ত্তনও ঠিক পথে চলবে। কাজেই অন্য তর্ক ও রাজ্য-মীমাংসা ছেড়ে সাধারণের অভাব অভিযোগের কথাই সবার আগে বিচার্য্য। এই অন্নের অধিকার বিচার করতে গেলে সাম্যকে ভিত্তি করতে হবে; সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা হাত-ধরাধরি করে'ই চলে—এদের একটিকে ছেড়ে অপরের প্রতিষ্ঠা কোনমতেই সম্ভব নয়।

দেশ-জুড়ে যদি এই বিদ্রোহ জাগে, তবে দেশের কল-কারখানা নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার ফলে হাজার হাজার লোক সপরিবারে কর্ম্মহীন হয়ে অনাহার ভোগ করবে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে, দেশের সমস্ত ফসল ও খাদ্যসামগ্রী অধিকার, তার হিসাব রাখা ও সেই সঞ্চিত খাদ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেকের অভাবানুসারে বিতরণ। কলকারখানার কর্ম্মীদের সঙ্গে চুক্তি করে' তাদের কাজ করবার অবকাশ ও সুবিধা দিতে হবে। তারপর দেশের পতিত জমিতে যাতে সুন্দর আবাদ হয় তার চেষ্টাও করতে হবে। এ-ছাড়া অন্য-কিছু উপায় ত আমরা দেখছি না; এবং দরকার পড়লে কেউ যে এ উপায়-মত কাজ করতে পশ্চাৎপদ হবেন, তাও মনে করি না।

মধ্যবিত্ত দলের ধারণা, কর্ম্মীসম্প্রদায়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত আহার যোগানোর মানে, দেশের সর্ব্বনাশ করা; কারণ, সমস্ত শক্তি তাদের হস্তগত হলে তাদের আর বাধা দেবার কোন উপায়ই থাকবে না। জনসাধারণকে যারা একপাল অসভ্য, নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর বলে' মনে করে, তারা হচ্ছে কুসংস্কারের তকমা-আঁটা ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ইতিহাসে এ-সব কথার কোন প্রমাণ আমরা পাই-না। কিন্তু উপরওয়ালাদের এ-সব কথা কোনমতেই বোঝানো যাবে না। কারণ, যারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাদের কোনদিন দেখে-নি, নিজেদের সংস্কারের মোহে কেবল অবজ্ঞাই করেছে, তারা বিশ্বাস করতে পারে না—কতখানি সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়নিষ্ঠার বিশ্বাস নিয়ে তারা কাজ করে! তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে না মিশলে, তাদের জীবনের সঙ্গে সহানুভূতি না থাকলে বোঝাই যাবে না যে, তাদের প্রাণ কত উদার, কত মহৎ! রোগীর, বৃদ্ধের, শিশুর ও নাচারের জন্যে অতখানি যত্ন ও স্বার্থত্যাগ সভ্য সমাজের আর-কোথায় পাওয়া যাবে না। এই যে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান, এ তাদেরই একটি বিশেষ কীর্ত্তি এবং বর্ত্তমানের অন্যায় অত্যাচারের ও অভাবের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই সঙ্ঘের পুনঃপ্রতিষ্ঠা,—যেখানে সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন। এ

বিপদ থেকে উদ্ধারের আর-কোন উপায় আমরা জানি না।

মধ্যবিত্তদের কথা যদি সত্য হয়, যদি পর্য্যাপ্ত আহারে জনসাধারণের সাহস বেড়ে যায়, তবে তাতে ভাবনার ত কিছু দেখিনা। খাবারের দোকান ও হাটবাজার লুট না করে'ও তারা দেশের খাদ্য একজায়গায় জড়ো করবে—আপনাদের স্বার্থ-চেষ্টায় লোকের অনিষ্ট তারা যে করবে না, এটা সুনিশ্চিত। অধিকার-চ্যুতি এই পরিবর্ত্তনের প্রধান অস্ত্র এবং জনসাধারণই এ-কাজে প্রধান কর্ম্মী। দশকে ঠকিয়ে দেশকে ভুগিয়ে ধনীরা যা সঞ্চয় করেছেন, জনসাধারণ সেই সম্পদ দেশের কাজে ব্যয় করবে। শিক্ষিত লোকেরা সেই-সব আহত খাদ্যের তালিকা করবেন এবং সেই তালিকা মুদ্রিত অবস্থায় সকলের মধ্যে বিতরিত হবে। লোকে সহজেই জানবে, দেশে খাদ্য কত, কোথায় পাওয়া যাবে এবং কি উপায়ে বিতরিত হবে।

নগরের প্রতি বিভাগে, প্রতি রাস্তায় স্বেচ্ছাসেবক-সমিতি গঠিত হবে—তারা প্রত্যেক দলের সঙ্গের যোগ রেখে কাজ করবে। জনসাধারণ যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পায়, তবে কিছুদিনের মধ্যেই অন্নসংগ্রহ ও বিতরণ কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত হবে। আমরা স্বীকার করি যে, হয়ত দিন-পনের বা মাস-খানেক একটু গোলযোগ, একটু কষ্ট হবে; কিন্তু তাতে এসে যায় কি?—অধীনতা থেকে মুক্তিই সে কষ্ট পূরণ করবে, দশের সুবিধার জন্যে নিজের কষ্টস্বীকার আনন্দ বলে' মনে হবে; বিদ্রোহের সময় বিলাসের আশা কেউ নিশ্চয়ই রাখে না।

কষ্ট হোক বা না হোক, এটা সকলেরই বোঝা উচিত, সভার পর সভায় তর্ক করে' চারটে দেয়ালের মধ্যে বদ্ধ হাওয়ায় বাস করে' 'থিওরী'-প্রেমিক যা তৈরি করেন, তার চেয়ে অভাব থেকে যা ব্যবস্থা হয় সেটা শতগুণে ভালো। মধ্যবিত্তদের ছেড়ে জনসাধারণের হাতে কাজের ভার দেবার এটাও একটা বিশেষ কারণ।

খাদ্যসংস্থান থেকে আরম্ভ করে' দৈনিক ব্যবহার্য্য সব জিনিষই সঙ্ঘের অধিকারভুক্ত করতে হবে এবং সেটা যত-শীঘ্র হয় ততই ভালো; কারণ তা হলে দুঃখও কমবে এবং সংঘাতও কমবে। সকলেই যাতে অধিকার পায় এবং সে অধিকার সবায়ের পক্ষে সমান হয় এ ব্যবস্থা করতে হলে সমাজকে কোন প্রতিষ্ঠান-ভুমির উপর দাঁড় করাতে হবে; জোড়াতাড়া দিয়ে কিছু খাড়া করলে তাতে দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না।

প্রায় সব সভ্যদেশে অতি পূর্ব্বকাল থেকে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ সঙ্ঘের ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে। সবায়ের অধিকার বজায় রেখে সমাজ-ব্যবস্থা করতে হলে সেই সঙ্ঘকে আমাদের আদর্শ বলে মেনে নিতে হবে এবং দেশ জুড়ে তারই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এককথায় ব্যবস্থাটি হচ্ছে এই, যে জিনিষ সঙ্ঘের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত, তা সকলেই বিনাবাধায় ইচ্ছা-মত ব্যবহার করতে পারবে এবং যা-কিছু কম বা কম হবার সম্ভাবনা আছে, তা সকলের মধ্যে সমান ভাগ করে' দেওয়া হবে। নগরে নগরে জল-সরবরাহের যে বন্দোবস্ত আছে, তা এই ব্যবস্থারই একটি অংশ।

আমরা বিশ্বাস করি, এ ব্যবস্থায় সকলেই দরকার-মত জিনিষ-পত্র ব্যবহার করে,—দশের অসুবিধা ঘটিয়ে অপব্যয় করে না। সাধারণ জীবনের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, পুঁথিপত্র ঘেঁটে যারা খালি 'থিওরী' তৈরি করে' জীবন কাটিয়ে দেয়, তারাই কেবল এ-সমস্তকে অবিশ্বাস করতে পারে।

বিদ্রোহের প্রারম্ভে খাদ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে, খাদ্যের অধিকার-লাভ করবে কারা? প্রতি নগরে, বিদ্রোহের প্রতি কেন্দ্রে এ প্রশ্নের সমাধান হবে। যতদিন-না কাজকর্ম্ম ঠিকভাবে চলছে, ততদিন বোঝা যাবে না, কারা যথার্থ কর্ম্মী আর কারাই বা নিষ্কর্ম্মা, সেইজন্যে আহৃত খাদ্য সকলের পক্ষে সমান ভাগ হবে। যারা নতুন দলের বিরুদ্ধে, দাসত্ব যাদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে গেছে, নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশ ছেড়ে যে-যার পথে সরে' পড়বে। কিন্তু তারা যাক্ বা থাক, জনসাধারণ তাদের অন্ন সবায়ের সাথে ভাগ করে' নেবে—জেতা-বিজিতের প্রভেদ তারা কোনদিন করে-নি, করবেও না। এই মৈত্রী ও সহানুভূতির ফলে বিদ্রোহের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না—কাজ আরম্ভ হলে, যারা বিরোধী তারাই আবার ভাই বলে' কাছে এসে কর্ম্মীদের সঙ্গে মিলে দশের কাজে আনন্দে যোগ দেবে। স্বাধীন সমাজে অলসদের কাছ থেকে ভয় পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেউ হয়ত বলবেন, সবাইকে পেট পুরে খেতে দিলে খাবার যে মাস-খানেকের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে; বেশ ত! ইতিহাসে এই প্রথম সবাই পর্য্যাপ্ত আহারের অধিকার ত আগে পাক্—নূতন খাদ্যসংস্থানের কথা পরে হবে।

কেবল যে এক দেশেই এই বিদ্রোহ জেগে উঠবে,—এ পরিবর্ত্তন সাধিত হবে, এমনও ত বিশ্বাস করা যায় না; অবশ্য, সব দেশ যে একসঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করবে, এমন কোন কথা নেই। তবে এটা বেশ বুঝতে পারি, কোন দেশের এক নগরে এ পরিবর্ত্তন হলে আর পাঁচটা নগর ক্রমে সেই ব্যবস্থায় চলতে পারে এবং ক্রমে সমস্ত দেশটা সেই নূতন ব্যবস্থাকে আদর করে' গ্রহণ করতে পারে। এটা একদিনে, না-হয় একবছরে হবে। যে-সব দেশ শিক্ষায় ও শক্তিতে এগিয়ে গেছে পিছিয়ে-পড়া দেশের সঙ্গে একত্র হওয়ার আশায় তারাও ত আর পিছিয়ে আসতে পারে না; অলসদের পশ্চাদ্বর্ত্তীদের জন্য ইতিহাস কোন দিন অপেক্ষা করে-নি। যারা এগিয়ে চলেছে, তাদের স্বাধীনতা, শান্তি ও শক্তি দেখেই অন্য দেশ তাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবে। অবশ্য সব দেশে যে একই ব্যবস্থা হবে, তাও নয়; লক্ষ্য এক হলেও দেশের অবস্থা-মত ব্যবস্থা হবে।

কোন নগরে বিদ্রোহ আরম্ভ হলে দেশের কর্ম্মীজন কৃষি ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতির উপযোগী যন্ত্র তৈরি করবে। সাধারণের কাজ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী পোষাক তৈরি করবার জন্যেও গতর খাটাতে হবে; অন্য দেশের সঙ্গে পরিবর্ত্ত বন্দোবস্ত না করে' দেশের সকল অভাব দেশের লোকের পরিশ্রমেই মিটবে। সহরে উৎপন্ন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার গ্রামে উৎপন্ন খাদ্য প্রভৃতির সঙ্গে বদলাবদলি করা হবে। চাষা

তার দরকার-মত ফসল রেখে বাকি সব সহরে পাঠিয়ে দেবে; কারণ সে বুঝবে সহরবাসী কর্ম্মী তার ভাই, তার বন্ধু,—জবরদস্ত উপর-ওয়ালা নয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থা না হলে কেবল যে অন্নাভাব হবে, তা নয়, বেশীর ভাগ, বিরোধীদল আমাদের ভুলের সুবিধা পেয়ে শক্তিলাভ করবে এবং আমাদের সকল চেষ্টা অবসাদ ও অপমানের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাবে।

বড় বড় সহরে খাদ্যসংগ্রহের জন্যে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। পরিবর্ত্তন সাধিত হলে আমরা যথাসম্ভব কম-নির্ভর করবার চেষ্টা করবো।

বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি, গরীবের পরিশ্রমের ফল জোর করে' কেড়ে-নেওয়ার উপর। আমরা এই অত্যাচার বন্ধ করব। গ্রাম উচ্ছন্ন দিয়ে বড় বড় সহরে খাদ্য-সরবরাহও বন্ধ করতে হবে। বিদ্রোহের ফলে অত্যাচার-পীড়িত দেশ এই সম্পদ লাভ করবে যে, সে আর-কারও অধীন থাকবে না। কোন্ দেশে ঠিক কি ব্যবস্থা হবে, তা বলা কঠিন। পরের দাসত্ব করে' সেলাম বাজিয়ে আর মাটি চষে' যারা পিঠের দাঁড়া নুইয়েছে, বিদ্রোহের ফলে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াবার সাহস ও শক্তি দুইই পাবে। পরের জন্যে, পরের অধীনে অর্দ্ধাহারে চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা কাজ না করে' যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করবার তার পূর্ণ-অধিকার থাকবে। এতে দেশের ফসল কমবে না। যে-দিন তারা বুঝবে, তারা ধনীর স্ফীতোদর আরও স্ফীত করবার জন্যে খেটে মরছে না—দেশের ও দশের জন্যেই পরিশ্রম করছে সে-দিন দেশের ফসল স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে উঠবে। দেশে দেশে যখন নূতন ভূমি কর্ষণোপযোগী করে' নূতন যন্ত্র-সাহায্যে চাষ হবে, তখন ফসলের অভাব ত হবেই না, বরং সকলের পক্ষে যথেষ্টই হবে।

এটা খুব সত্য কথা যে, অন্যদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হলে প্রথম প্রথম খাদ্য-সংস্থানের পক্ষে বিশেষ গোল হবে। এ গোল মেটাবার একমাত্র উপায়, সহরে যে-সমস্ত লোক আফিস-আদালত প্রভৃতিতে বাজে কাজ করে' পরের পরিশ্রম অপব্যয় করছে,—যারা অন্য দেশের বড়লোকের জন্য ফ্যাসান তৈরি করছে, তারা সবাইকে কাজে লেগে যেতে হবে; তাহলেই দেশে ভূমির অভাব হবে না। উষর ভূমি বলে' কোন স্থান নেই, মানুষের শক্তিই মাটির শক্তি; —বর্ত্তমানে কৃষি-বিজ্ঞানের এইটে সব-চেয়ে বড় কথা। অবশ্য, কেবল মুখে শক্তির আস্ফালন করলেই চলবে না—হাতেনাতে কাজ না করলে কোন জমিতেই সোনা ফলতে পারে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির কাজ আরম্ভ হলে, কৃষক-সম্প্রদায় স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পেলে, দেশের জন্যে কাজ-করা উৎসব বলে মনে হবে। এবং শারীরিক স্বাস্থ্যে ও মানসিক স্ফূর্ত্তিতে মানব-জীবন পুষ্পের মত স্বত-বিকশিত হয়ে উঠবে। কৃষি ও শিল্প,—দুয়ের সমাবেশে জীবন-যাত্রা সরল, সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাম্য পরিবর্ত্তনের সব-চেয়ে বড় কথা।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

দোশালা

শালখানা দেখতে সচরাচর যেমন হয়; —একখানা জরদ্-কালো-সবুজ-আর-লাল রঙের চারবাগ। কিন্তু সেখানি পোরে ষ্টীমারের ফার্ষ্ট-ক্লাসের বেঞ্চিতে এসে যে বসলো তার চেহারাটা মোটেই সেই কাশ্মীরী শালের উপযুক্ত ছিল না;—খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, মাথাটা কিট্‌কিটে ময়লা পাগড়িতে ঢাকা; গালের হাড়দুটো উঁচু আর তারি কোটরে শুক্‌নো আঙুরের রং দুটো বিশ্রী চোখ! অবিনের দস্তুর, নতুন লোক দেখলে সে তার দিকে খানিক কট্‌মট্ করে না-তাকিয়ে থাকতে পারে না। সেদিনও বেঞ্চিখানার সামনে দাঁড়িয়ে মিনিট-পাঁচেক সেই লোকটাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে তবে অবিন আস্তে আস্তে আমার পাশে এসে বসলো। তার পর এ-ঘাট ও-ঘাট সে-ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে জাহাজ লোকে লোকে ভর্ত্তি হতে হতে যখন আমাদের ঘাটে এসে পৌছল, সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক অবিনকে বলে উঠলেন—"আপনার শালখানা এখনি হাওয়ায় উড়ে গঙ্গায় পড়বে, ওখানাকে একটু সাবধানে রাখুন।" আমরা দুজনে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম সেই চার-রঙা চারবাগ শালের রুমালটা জাহাজের রেলিং থেকে ঝুল্‌ছে, সে মানুষটা নেই!

শালখানা যার সে নিশ্চয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্ম-হত্যা করেনি। সুতরাং আমরা দুই বন্ধুতে নিশ্চিন্ত মনে হাত-ধরাধরি করে আহিরিটোলার ঘাটে নেমে গাড়িতে উঠেছি এমন সময় এক ছোকরা খালাসি —"বাবু শাল আপনার।" বলেই তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা গলিয়ে সেই শালখানা অবিনের কোলের উপর ফেলে দিয়ে চট্ করে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। আমি গাড়ি থামিয়ে সেই খালাসিকে ডাকতে যাই, অবিন বল্লে—"থাক্‌না, কাল ফিরিয়ে দিলেই চলবে।" বন্ধু-বান্ধবের টুপি ইত্যাদির মতো টুকিটাকি জিনিষ হলে আমার আপত্তি ছিল না; কেননা সেগুলো অবিন প্রায়ই ধার নেয় এবং আজ বাদে কাল, নয়তো পরশু, সুদশুদ্ধ সেগুলো ফিরিয়ে দিতে কিছুমাত্র দেরি করে না; কিন্তু এই শাল-খানা যার সে নিশ্চয়ই অবিনকে সেখানা বখশিস কিম্বা একরাত্রের মতো ভাড়া দেবার মতলবে ষ্টিমার পর্য্যন্ত তাড়া-করে আসেনি সেটা ঠিক; এবং সে যে পুলিশে খবর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে সেটাও সম্ভব নয়; কাজেই পোর্ট-কমিশনারের হারানো মালের আফিস-ঘরের দিকেই গাড়িটা চালাতে আমি অবিনকে বিশেষ করে অনুরোধ কল্লেম; কিন্তু সব বৃথা! বাঘের থাবা শিকারের উপরে যেমন, তেমনি অবিনের মুঠো সেই শালখানার একটা কোণ সেই যে চেপে রইল আহিরিটোলার বাড়িতে পৌছন পর্য্যন্ত সে মুঠো আর কিছুতে শিথিল হল না। তারপর ঘরে

ঢুকে অবিন যখন সেই শালখানা মেঝের উপরে বিছিয়ে দিলে তখন দেখলেম, কি আশ্চর্য্য সোণা-রূপো-রেশমের তার দিয়েই সেটা বোনা! ষ্টীমারে শালখানার সবটা আমার চোখে পড়েনি, এখন বাতির আলোতে যেন একখানা নন্দন-কানন আমাদের চোখের সম্মুখে এসে উদয় হল। এরি উল্টো পিঠে দেখলেম বোনা রয়েছে—বীণা-হাতে এক কালো-কুৎসিত ঝাঁকড়া-চুল ডাইনি-বুড়ি। পরের জিনিষকে ঠিক লোষ্ট্র ভেবে নিয়ে সেটার উপরে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটা পরখ করবার কারণ কোনোদিন আমার কাছে উপস্থিত হয়নি কিন্তু কারিগরের হাতের অপূর্ব্ব সৃষ্টিগুলোর উপরে আমার যে প্রাণের টান সেটা যে অবিনের হাত থেকে এই অমূল্য শালখানা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে না-চাচ্ছিল তা নয়।

কিন্তু অবিনকে আমি চিন্‌তেম, কাজেই শালখানা তাকে খুব সাবধানে রাখতে আর পুলিশ-হাঙ্গামার পূর্ব্বেই যদি সম্ভব হয় সেটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ করে বলে আমি বাড়ী এলেম। তার পর দুদিন আমি জাহাজে যাওয়া কামাই দিলেম। না যাওয়ার কারণ নানা; তার মধ্যে প্রধান কারণ লালপাগড়ি আর ষ্টীমারের উপরে সেই শাল-হাতে অবিনের একটা অবর্ণনীয় রূপ কল্পনা।

তৃতীয় দিনের সকালে সাতটা-দশের ষ্টীমার আমাকে একলা নিয়ে বড়বাজার ছেড়ে আহিরিটোলার দিকে চলেছে। সকালের রোদে ভাটার জল আর জলের ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভিজে কাদা মাজা-কাঁসার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে, তারি উপরে অনেক-গুলো মানুষ কালো-কালো আবলুস কাঠের পুতুলের মতো দেখছি। ঘাটের ধারে পাঁচিলে-ঘেরা শ্মশানের মধ্যে দিয়ে খানিকটা সাদা ধোঁয়া আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠছে। এরি উপরে দেখতে পাচ্ছি লাল সাদা-ডোরা-টানা তেতালা একটা বাড়ীর চিলের ছাদে মাটির এক মহাদেব পিতলের ত্রিশূল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে; আর ঠিক তারি পিছনে আলোর গায়ে একটি মস্‌জিদের তিনটে গম্বুজ—অপরাজিতা ফুলের মত নীলবর্ণ।

আহিরিটোলার ঘাটের যে কোণটিতে রোজ অবিন দাঁড়িয়ে থাকে সেই কোণটায় দূর থেকে তার বিশাল বুকের মাঝে চিরবসন্তের সিগ্‌নেলের আলোর মতো বড় লাল গোলাপ-ফুলটার সন্ধানে আমার চোখ আজ দৌড়ে গিয়ে দেখছে অবিনের জায়গায় একটা রবাব কাঁধে একজন পেশোয়ারি—কালো লুঙ্গি, ঢিলে কোর্ত্তা, বড় পাগড়ি, কটা দাড়ি, কোকড়ানো চুল নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে!

একটা বয়া প্রদক্ষিণ করে ষ্টীমার উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে ঘুরে তবে আজ আহিরিটোলার ঘাটে ভিড়লো। অবিনকে না দেখে সেদিনের সেই শালখানাই যে তার এদিনের ছুটি এবং কামাই দুয়েরই কারণ এবং পুলিশ-কোর্টেই যে তাকে আটটার মধ্যে খেয়ে হাজরি দিতে হচ্ছে ওটা আমি এক্‌রকম স্থির করেই নিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে একলা কবীরের পুঁথির সঙ্গে দু-ঘণ্টা কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসলুম।

ঘাট ছেড়ে জাহাজ আর-একবার একটা গাধাবোটের রগ ঘেঁসে পাট-বোঝাই এক-খানা কিস্তিকে সজোরে ধাক্কা মেরে বাগবাজারের লোহার পোল ডাইনে রেখে সোজা কাশিপুরের দিকে চল্লো।

খড়-বোঝাই হোলাগুলো আদিম যুগের লোমশ কতকগুলো উভচর জন্তুর মতো ডাঙার খুব কাছাকাছি কাদা-জলে নিজেদের অনেকখানি ডুবিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঙার উপরে মালগাড়ির সার যেন আর-একটা শক্ত খোলায় মোড়া বিকটাকার গুটিপোকার মতো আস্তে আস্তে চলেছে। দূর থেকে কাশিপুরের জেটিটা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে অবিন দাঁড়িয়ে—জলের নীলের উপরে সোজা বিশাল স্থির নিবাত নিষ্কম্পমিব। তার কাঁধ থেকে সেই শালখানা নানারঙের ফুলের একটা মস্ত গোছার মতো ঝুলে পড়েছে সুন্দর ভঙ্গীতে। আমি গুন্‌গুন্ করে সুরু করেছি—

"হুয়া জব ইস্ক মস্তানা
কহেঁ সব লোগ দিওয়ানা।"

রবাবটায় একটা মস্ত ঝঙ্কার দিয়ে পিছন থেকে সেই পেশোয়ারীটা হঠাৎ আমার পাশে এসে বসলো—

"জিসে লাগি সোঙ্গে জানা
কহেসে দর্দ ক্যা মানা॥"

পণ্টুন থেকে অবিন চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"আগা-সাহেব, কাবুলী গীত ফরমাইয়ে, নেহিতো দোশালা ছোড়েগা নেহি।" এর পরেই জাহাজ ঘাটে ভিড়তেই অবিন ঝুপ করে সেই শালখানা আমায় ছুঁড়ে দিয়ে ষ্টীমারে উঠে এল। আগা-সাহেব তাকে একটা মস্ত সেলাম-বাজি করে রবাবের সঙ্গে একটা কাবুলী গান আরম্ভ করলে—

সুমিওসী পমঙ্গল সুমিওসী
পদম্‌কেনা পমঙ্গল সুমিওসী-ঈ-ঈ—

সুরও যেমন কথাও তেমনি বিদ্‌ঘুটে! পমঙ্গল পমঙ্গল যেন মশার ঝাঁকের মতো কানের কাছে কেবলি ভন্ ভন্ করছে আর মাঝে মাঝে সুমিওসী সে-গুলোকে ফুঁ-দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য্য এই যে অবিন বেশ মসগুল হয়ে এই ভন্‌ভনানির মাঝে সুখে বসে রয়েছে। কানে কম্ফরটার এবং তার উপর সাতপুরু চাদর জড়িয়ে একটি রোগা ছেলে—এর কম্ফরটার ছাড়াবার জন্যে আমি তাকে রোজ ধমকাতে ছাড়িনে কিন্তু আজ তাকে দিব্য হাস্যমুখে সাম্‌নের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আমার কি হিংসেই না হচ্ছিল! শ্রবণের দরজায় আগল টেনে ছোকরা আজ কি সুখেই আছে—সুর-বেসুর সবার থেকে দূরে! নিবিড় নীরবতার অন্দরে আপনাকে ডুবিয়ে রাখবার আমার প্রার্থনাটা বোধ হয় বিনা-তারের টেলিগ্রাফের মতো মা-গঙ্গার কাছে পৌঁছে থাকবে তাই রবাবের সুরটা বালির ঘাটে পৌঁছবার কিছু আগেই একটা তার-কাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল—কাবুলী গানের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে। অমনি হুস্ করে একটা হাওয়ায় চারিদিক থেকে শোনা গেল—বস্! অবিন একটা মিলিটারি রকম সেলাম দিয়ে আগা-সাহেবকে বল্লে—"তাগা তো টুটা, অব্?" "অব্ শুনিয়ে" বলেই আগা-সাহেব আরম্ভ কল্লেন পোস্ত উর্দ্দু আর হিন্দি ভাষার খিচুড়ি।

একটা আজগুবি গাঁজাখুরি গল্প—সেই শালখানার আদ্যন্ত কাহিনী। গল্পটা খুব গুরুপাক করেই আগা-সাহেব আমাদের উপহার দিলেন—ভাষায় প্যাঁজ রসুন আর হিং তিনেরই বুক্‌নি দিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অবিন গল্পটার খুব তারিফ করলেও আমি সেটা থেকে বড়-কিছু রস গ্রহণ করতে পারলেম না। মাথা তখনো আমার কাবুলীর সেই বেসুরো গান আর রবাবের ঝন্‌ঝনানিতে বিগড়ে ছিল সুতরাং গল্পের সঙ্গে গল্পকর্ত্তাকেও জাহান্নামে পাঠাতে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ কল্লেম না—কিন্তু মনে মনে! কারণ কাবুলী-মাত্রেরই যেটা চিরসহচর মোটা সেই লাঠি তার সামনে মুখ-ফুটে কিছু বলা একেবারেই আমার মতবিরুদ্ধ।

সকালের গঙ্গার পরিষ্কার পটখানির উপর হিজিবিজির মতো এই লোকটার গল্প আর গান! সেটা শেষ করে সে যখন কটা দাড়ির আড়াল থেকে বত্রিশপাটি দাঁত বের করে বল্লে—"বাবু, শাল দেও অব হাম চলে।"—তখন অবিন খুসির সঙ্গে তাকে সত্যিই সে শালখান দিয়ে দেয় দেখে আমি আর রাগ সামলাতে পারলুম না, ঝাঁ করে অবিনের হাত থেকে শালখানা টেনে নিয়ে বল্লেম—"তুমি কেমন হে! কার শাল তুমি কাকে দাও? কোথাকার একটা জোচ্চোর মিথ্যে বকরবকর করে ফাঁকি দিয়ে এই দামি শালটা নিয়ে যাবে এ হতেই পারে না।"

অবিন আমার ব্যবহার দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। কাবুলীটা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—"ক্যা বাবু, হাম জুয়াচোর হ্যায়।" আমার রাগ তখন সপ্তমে, সুতরাং গলাটাও সেই সুরে বল্লে—"যেন কাবুলের আমীর রে! যাঃ যাঃ আর শাল পরতে হবে না, এটা আমার শাল হ্যায়, জানতা এখনি তোম্‌কো পুলিশকা হাতে জিম্মে করে দেগা!" রাগের মাথায় বিদ্যেসাগরী বাংলা একেবারে হারিয়ে ফেলে গড়গড় করে চলতি বাংলাতে আমি তাকে যাচ্ছেতাই বলে গেলুম। কে জানে চলতি ভাষার একসেণ্টের জোরেই হোক বা বালির ঘাটে লালপাগড়ীর জীবন্ত একসেণ্টাকে দেখেই হোক কাবুলীটা তার গেলাপ-মোড়া রবাবটাকে কাঁধে তুলে চোঁ-চোঁ চম্পট দিলে—সোজা পণ্টুন বেয়ে লেলুয়ার মুখে। আমি তখন খুব গম্ভীর হয়ে শালটা নিজের কাঁধে ফেলে আপনার জায়গায় স্থির হয়ে বসলুম। গঙ্গার বাতাসে রাগ ঠাণ্ডা হতে আমার বেশীক্ষণ লাগলো না। অবিন দেখলেম দুইচোখ নিমীলিত করে সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ। গাল খেয়ে কাবুলীটা আমায় যদি খুনও করে যেতো তবু তার চোখ খুলতো কি না সন্দেহ। এমনি খুব চেপে দুইচোখ বন্ধ করে সে পৃথিবীর গণ্ডগোল থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে চলেছে সেটা আমি বেশ জানি এবং সে এই চোখ যখন খুলবে তখন যে ধমকের অগ্নিবাণটা আমার উপরেই প্রথম পড়বে তাও আমি জানতেম। আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করে শালখানি আস্তে আস্তে তার পাশে রেখে পাশ-কাটিয়ে একটু দূরে বসলেম—যেন প্রথম চোখ-খুলেই শালখানাকে অবিন দেখতে পায়—পোড়ে তো শালখানাই পুড়ুক, আমি কেন মরি! যা ভেবেছিলেম তাই।

শালখানা চোখে পড়তেই অবিন সেটাকে সজোরে গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বসন্তের ফুলে-ফুলে-বিছানো ফুলশয্যার চাদরখানার মতো সেই অপূর্ব্ব শালটি উড়তে উড়তে গিয়ে জলে পড়ল—দিকবিদিক যেন আলো করে। আমি বল্লেম—"ওহে কল্লে কি?" —"পরের জিনিষ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ কল্লেম। যার জিনিষ তাকে জোচ্চোর বলে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে নিজের পকেটে সেটা না পুরে।"—বলেই অবিন আমার দিকে কটমট করে চেয়ে রইল। আমি এতক্ষণে বুঝলেম শালখানা কাবুলীকে নিয়ে যেতে বাধা না দিলে জুয়াচুরির কলঙ্কটা কাবুলী পর্য্যন্তই থাকতো, আমার গায়ে গড়িয়ে লাগতো না। অবিন পুলিশ কাবুলী এবং বাটপাড়ির কলঙ্ক তিনটে থেকে বেঁচে গেল, ধরা পড়লুম আমি—জয়মিত্রের ঘাটটার ঠিক আড় পারে!

তারপর থেকে বসন্তের হাওয়ায় আমি রবাবের ছেঁড়া তারের টঙ্কার শুনতে পাচ্ছি আর সেই শালের উল্টো পিঠে লেখা ডাইনি-বুড়ির কাঁচা-পাকা চুলের ঢেউটাই গঙ্গার নির্ম্মল স্রোতকে ঘোলা করে দিয়েছে দেখছি! পাকা ধানের সোনায়, কচি ঘাসের সবুজে, দিনের উদয়-অস্তের রক্তে, রাত্রির ঘুমের অন্ধকারে ছোপানো চারবাগ শাল-খানা ফুলের ভেলাখানির মতো ভাস্‌তে ভাস্‌তে আর-কোনোদিন যদি নতুন করে আমার চোখে পড়ে তবেই আবার তার কথাটা তুলবো, না হলে এই পর্য্যন্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'আঁধারে-আলোকে'

জাহাজ ছাড়ল। আজ অনেক আরোহী। আকাশ পরিষ্কার সুন্দর, বিচিত্র বর্ণ-সমারোহে মহিমাময়; প্রতিকূল স্রোত, অনুকূল বাতাস; যাত্রা আরম্ভ হল। দুধারের দৃশ্য অধিকদূর পর্য্যন্ত আর নাছোড়-বান্দার মত সঙ্গ রাখতে পারলে না। কেননা যে নদী বেয়ে আমরা চলেছি, তার মত স্থৈর, সরীসৃপ-গতি—প্রবাহ আর-কোথাও আছে কিনা জানিনে। দণ্ডে দণ্ডে পট-পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এঁকেবেঁকে, প্রবল বলে জল কেটে দু-ভাগ করে; জোয়ারের জোরাল গতিতেও অপ্রতিহত হয়ে, আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলাম। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া, চারিদিকের নিস্তব্ধতা, জলের কল্লোল-সঙ্গীত, সমস্ত মনের মধ্যে উদাস প্রশান্তির সঞ্চার করলে।

রাখী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। মেঘ ভেদ করে পরিপূর্ণ চাঁদ দেখা দিল। আকাশে আলোকের প্লাবন; জলের উপর রজত-আলো পড়ে আকাশের নীহারিকামালার মত একটি ছায়াপথ সৃজন করেছে। জাহাজের গতি-অনুসারে সে বাষ্প-শুভ্র পথ কখনো আমাদের সম্মুখে, আবার কখনো বা পিছনে পড়ে আছে। দুধারের সঞ্চরমান দৃশ্যের উপর চাঁদের আলো পড়ে সবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জলের উপর আলোর পথ উভয়-তীরকে সংযুক্ত করছে।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

* *
*

আজ যখন চেয়ে দেখলাম তখন সূর্য্যোদয় হয়েছে। সোণার আলোর উচ্ছ্বাসে আকাশের নীলিমার গায়ে, প্রবালের অশোক-রাঙা আভা দেখা যাচ্ছে—সাদা মেঘের উপর সোণার কিরণ পড়ে, তাকে নারাঙির রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে। আমার ঘর পশ্চিম-মুখো, তাই সূর্য্যোদয়ের আলোকের অভিনয় আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে, পশ্চিমের আকাশের মুখে তারি যে প্রতিভা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তাই আমি দেখি। সবুজ গাছপালা, দুর্ব্বায় ঢাকা মাঠ, আকাশের খণ্ডিত নীলের ব্যবধান পূর্ণ করে, দীপ্ত আলোক দ্রবিত স্বর্ণের মত ঝলমল করতে থাকে। সাদা আর ধূসর মেঘের মুখে, গেরুয়া আর হাল্কা বেগুনি কিম্বা হরিতাভ নীলের ঝালর ঝুলে পড়ে, ডালপালা দোলে, অসংখ্য পত্রাবলি বিচলিত হয়ে কত জল্পনাই করতে থাকে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—নূতন দিনের আবাহন, শুনতে পাই—সচেতন-করা আলোকে ঊষাকালের উদ্বোধন-মন্ত্র।

* *
*

আজ সকালে সোণালি আলোতে চোখ মেলে জেগে ওঠা হয়-নি, ভোরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। ধোঁয়াটে নিবিড় ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ, বৃষ্টি ঝরে ঝরে ক্রমে হাল্কা হয়ে এল। মনে হচ্ছিল আকাশ আড়াল করে অনেকগুলি ভিজে কাপড় টাঙান ছিল, এক-একখানি করে কেউ যেন সরিয়ে নিলে, আর সুনীল আকাশ-খানি প্রকাশ হয়ে পড়ল! এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না, আকাশ চুপচাপ, শ্রান্ত চোখে চেয়ে আছে। নীরব বর্ষণ আমায় বড় কাতর করে, মনে হয় সে যেন বড়ই দুঃখের কান্না!

* *
*

কি সুন্দর সোণার আলোয় ঝলমল-করা এই সকালবেলা! খোলা জানালা দিয়ে দেখচি নীল আকাশের এই গলানো সোণার ধারা দূরে নিমগাছের হাল্কা-হলুদ পাতাগুলির স্তবকের উপর গড়িয়ে ঝরছে। দেখি আর ভাবি এই সোণার আলোয় হৃদয় আমার ভরে নিতে হবে। সত্যের প্রকাশে, মিথ্যার মরণে সব অন্ধকার চিরদিনের মত অন্তর্ধান হয়ে যাবে। সম্মুখের আলো-ভরা পথেই আমি চলব,—দিনের কিরণ সর্ব্বাঙ্গে বহন, আর দুটি অবারিত নেত্রপুটে ধারণ করে অচঞ্চল চিত্তেই চলব। রাত্রিও আমার কাছে অন্ধকারের বিভীষিকা আন্‌তে পারবে না,—তার আরত্রিক পাত্রে অনির্ব্বাণ অগণ্য তারকার দীপ্তি, অনন্তের পথে অভিনন্দন করে আগু বাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সম্মুখেই চল্‌ব—পিছু ফিরে আর চাইব না; তার পর যেদিন স্নিগ্ধ ছায়ায় গোধূলির শুভ মুহূর্ত্তে তুমি আমায় তোমার মন্দিরে স্থান দেবে সেদিন সমস্ত জ্বালাই নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে।

* *
*

আলো দিয়ে তুমি যা লিখে দিয়েছ অন্ধকারে বসে-বসে তাই আমি পড়ছি।

সে যে তোমার তারার আখরের লেখা অনির্ব্বাণ, অনির্ব্বাণ!

* *
*

ক-দিন ধরে কেবলি বৃষ্টি ঝরে ঝরে আকাশের মেঘ অনেক হাল্কা হয়ে এসেছে, তবু সম্পূর্ণ সরে যায়-নি! এই বাষ্পাকুল আকাশে আজ একটু রোদও দেখা দিয়েছে, তবে এ শরতের জলজলে সোণার আলো নয়, এর দীপ্তিও ম্লান, চোখের জলে ভরা দৃষ্টির উপর একটু হাসির চেষ্টার মত। তবু যে অনিবার ধারাবর্ষণের ঈষৎ বিশ্রামও হয়েছে, আর্দ্র আর্ত্ত বাতাসের দীর্ঘশ্বাস কিছুক্ষণের জন্যে শান্ত হয়ে আছে, এই সংযত অবসরটুকু,—আলোর মুখে দরজা-জানালা খুলে দিয়ে একটু ভাববার সুযোগ যে পাওয়া গেল, এও পরম লাভ মনে হচ্ছে। বাদলা দিনে অন্ধকার ঘরে স্তব্ধ হয়ে আর কত বসে থাকা যায়! মনও যে রুদ্ধ হয়ে আসে, কোনোখান হতে কোনো আলো সংগ্রহ করে আন্‌তে পারে না। মনের সেই অসাড় পাষাণ-ভার বড় দুর্ব্বহ!

ক-দিনের অবিরাম ধূসর মেঘ আর অনিবার বৃষ্টির পর আকাশে স্বচ্ছ-নীলের অবসর এক-একটি আশার আলোক-দ্বীপের মত দেখা দিয়েছে। আমারও অন্ধকার মনের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা জেগেছে,—নিকষপটে সোণার লিখন কেটে বসবে,—শুধু অবান্তর কথা নয়, প্রমাদ-গ্রস্তের উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ নয়, ছন্দোবন্ধে, যতিতে সম্পূর্ণ, শোভন সংযত শ্লোক ফুটে উঠবে—করুণায় যার জন্ম, জ্ঞানে যার স্থিতি!

উদ্দাম বর্ষার আক্রোশ দূর হয়েছে। আকাশ স্বচ্ছ-নীল, চারিদিকে নির্ম্মল সূর্য্যালোক, পর্য্যাপ্ত প্রচুর পল্লব;—তরুশ্রেণীর নিবিড় হরিত-সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গে এই সূর্য্যালোকের দীপ্তি স্নিগ্ধ-করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে! আকাশ-জোড়া আলো নিয়ে তুমি আমার সম্মুখে এসেছিলে, আমি চোখের সম্মুখে পর্দ্দা খাটিয়ে, আঁধার রচনা করে বসে-বসে ভাবছিলাম, তুমি কোথাও নাই! হাওয়ার মুখে পর্দ্দা খসে গেছে, তোমার চোখ-ধাঁধিয়ে-দেওয়া আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! কি অশোভনতার মধ্যে, কি আবর্জ্জনা-স্তূপের পাশে, জীবন যাপন করছিলাম তা সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। এখন বাঁচতে হলে উঠে-পড়ে লেগে বাস-স্থানটি সংস্কার করতে হবেই! নইলে বাঁচাই দুঃসাধ্য হবে যে! বাঁচব বলেই যে সঙ্কল্প করেছি! অবসাদের দিন অবসান হয়ে গেছে! সকাল-বেলাকার এই মন আমি রাতে কোথায় হারিয়ে ফেলি,—অন্ধকারের অস্পষ্টতায়, ছায়ার নিরুদ্দেশ পথে, আর অগণ্য নক্ষত্র-লোকের গহনের মধ্যে! তখন যে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণাই থাকে না। আমি একটা খেয়ালের মত, ক্ষীণপ্রাণ লঘু বাষ্পের মত কোথায় ভেসে চলি, দেহবোধ চলে যায়, স্বপ্নের মধ্যে অর্দ্ধতন্দ্রায় একটি চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকে! আমি যে কেবল একটি আত্মা, এই দেহসম্বন্ধে যুক্ত হয়েও বিযুক্ত, এই অনুভূতিই ক্ষণে ক্ষণে পরিপুষ্টি লাভ

করে! আমি যে মানুষ, নাম সংজ্ঞাধারিণী নারী, আমি যে সমাজ, আত্মীয়তা জাতীয়তা প্রভৃতির মধ্যেকার কেউ—এই ধারণা আমার চেতনার মধ্যে স্থান পায় না। আমি শুধু প্রাণ, এই কথাই মনে হয়, এবং এই প্রাণ যেন কোনো সংস্কারের সঙ্কীর্ণতার জালে বাঁধা পড়ে প্রতিহত নয়। মনে হয় আমি বাতাসের মত মুক্ত, আকাশের মত ব্যাপ্ত, জলের মত নির্ম্মল, আলোকের মত দীপ্তিমান আর পৃথিবীর মত সুন্দর—চিরসুন্দর! একটা অসীমতা, বাধাহীনতার অব্যাহত শক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করি, কেমন আনন্দ আবার কেমন-যেন ভয়ও হয়। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

* *
*

আজ ভোরে উঠে যেম্নি জানালা খুলে দিলাম, অমনি শুভ্র-সুন্দর নিষ্কলঙ্ক প্রভাত আমায় স্বাগত জানালে। এমন পরিপূর্ণ নির্ম্মল সকালবেলাটি আলোয়-আলোয় গানে-গানে ভরা, এ কি শুধু আমার হৃদয়-দ্বার হতে তার বারতা না জানিয়ে ফিরে যাবে? আকাশের আলো নীলিমাকে আরো সুন্দর করেছে, ধূসর মেঘকে শুভ্র করেছে; গাছের পাতায় সোণার দীপ্তি, মাঠের ঘাসে শিশিরের বুকে হীরেমাণিক ছড়িয়ে দিয়েছে—আমার চোখে আর আমার বুকে তার প্রসাদ-আনন্দ এনে দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে! আজ নয়ত কাল, নয়ত আরো দুদিন বাদে, সে তার নিখিল-মন্থন-করা অমৃতের অভিষেক, অন্ধকার-নির্ম্মূল-করা আনন্দের মন্ত্র পাঠ করে যাবেই, তার সন্দেহ নেই;—মন অবারিত, শ্রবণপথ উন্মুক্ত, নেত্র উৎসুক হয়ে থাকুক, সার্থকতা আসবেই।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আলেয়ার আলো

আঠারো

মোহনের কথা

আমার সমস্ত মন বলছে সরমা আমার! ছেলেবেলায় রূপকথার রাজকন্যাকে যেমন দুর্লভ মনে হোত, এতদিন আমার কাছে সরমা ছিল ঠিক তেমনি। রূপকথার স্বর্ণস্বপ্ন আমার জীবনে আজ সত্য হয়ে দাঁড়ালো!

আমার প্রাণে আজ আনন্দের যে ছোপ্ ধরেছে, তারই রঙ্গে-রঙ্গে সারা বিশ্ব যেন রঙ্গিন হয়ে উঠলো। আকাশের ঐ অসীম নীলিমা যেন একটি নিস্তব্ধ সঙ্গীতের মত সুন্দর, আর, এ নিখিল যেন তারই সুরে, ঝঙ্কারে, ছন্দে ও তালে পরিপূর্ণ হয়ে আত্মহারা! বিশ্ববীণার মূর্চ্ছনার মত সমীরের এই কলগুঞ্জন আজ আমার মূর্চ্ছিত হৃদয়কে সজাগ করে' তুলেছে,—যৌবনের নবীনতা যে কি, সফল প্রেমের অমৃতরসে সরস হয়ে আমার এ প্রাণ আজ তা প্রথম অনুভব করলে!

আজ সকালে সরমা যখন বাগানে ফুল তুলতে এল, আমি পা টিপে-টিপে ঠিক তার পিছনটিতে গিয়ে দাঁড়ালুম।

চুপিচুপি ডাকলুম, "সরমা!"

গলাটি মধুরভাবে হেলিয়ে, সরমা চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়াল! তার সেই বড়-বড় ঢুলে-পড়া চোখে আমার দিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখেই, লজ্জিতভাবে সে মুখ-খানি নীচু করে' রইল।

তার মাথার উপর একটি পুষ্পিত শাখা নত হয়ে রয়েছে। সেটি ধরে আমি ধীরে-ধীরে নাড়া দিলুম,—একরাশ শিউলি ফুল তার মুখে-কাঁধে-বুকে ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরে পড়্‌ল।

ভুরুদুখানি বেঁকিয়ে সরমা বললে, "যাও! অমন করলে আমি রাগ করব!"

—"তুমি রাগ কর সরমা! শুনেছি, রূপসীর রাগ বড় সুন্দর!"

সরমা হেসে ফেললে। বললে, "পথ ছাড়ুন, আমি যাই।"

আমি পথ-আগ্‌লে দাঁড়িয়ে দু-হাতে তার একখানি হাত চেপে ধরলুম! সরমা স্থির-দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইল,—ক্রমে-ক্রমে আমার মুষ্টির মধ্যে তার সেই কোমল বাহুখানি নিসাড়-নিস্পন্দ হয়ে নেতিয়ে পড়ল। সেই নিভৃত তরুতলে, সঙ্গোপনে আমরা দুটি প্রাণী পরস্পরের দিকে বিভোর হয়ে চেয়ে-চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, অনেক—অনেকক্ষণ!

কি-এক অজানা মোহে জগৎ ভুলে আমাদের দুজনের মুখ দুজনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে, ধীরে, ধীরে! সরমার ঘন-ঘন তপ্তশ্বাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল।… … …সে কি নিশ্বাস,—না, বসন্ত-বায়ুর প্রথম উচ্ছ্বাস?

সরমার থরথর ওষ্ঠাধরের উপর আমার তৃষিত ওষ্ঠ নত হোল—কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে না-করতেই আমার হাত-ছিনিয়ে চকিতে সরমা পিছনে সরে গেল; তারপর তীব্রস্বরে তিরস্কার করে' উঠল, "মোহনবাবু! আমি এখনো আপনার স্ত্রী নই!"

এ কি কঠোর সত্য! আমি যেন হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলুম। আমার নিজের প্রতি নিজের একটা ধিক্কার মনের উপর বারংবার ঘা দিতে লাগল— অনুতপ্ত হয়ে কাতর স্বরে আমি বললুম, "মাফ্ কর, আমায় মাফ্ কর!"

কোন উত্তর না দিয়ে, সরমা বাগান থেকে বেরিয়ে গেল,—স্পর্শাতীত, দহন-ভরা, তীব্র এক বিদ্যুতের মত!

এদিকে আমার বিবাহের কথা নিয়ে পাড়াময় বিষম ঘোঁটের ধূম পড়ে গেছে।

পিসিমা কেঁদে চোখ রাঙ্গা করে' আমার কাছে এসে বললেন, "বাবা মোহন, একি সর্ব্বনেশে কথা শুনছি! তুই কি তোর নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিতে চাস্?"

আমি বললুম, "কুলে কালি দিতে চাই কি-রকম?"

—"তুই নাকি বিধবা-বিয়ে করবি?"

—"তা করবই ত! বিধবাকে বিয়ে করলে কুলে কালি দেওয়া হয় নাকি?"

—"তা হয় না? সত্য ত্রেতা দ্বাপর

যুগে কেউ যা করে-নি, তুই কি তাই করতে চাস্?"

—"এটা যে কলিকাল, পিসিমা! এখন যে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে! আর তাও যদি ধর, তাহলে ত্রেতাযুগে সুগ্রীব আর বিভীষণ বিধবা বিয়ে করেছিলেন, কথক-ঠাকুরের মুখে তাও কি শোন-নি?"

—"আমি ও-সব কিছু বুঝি-নি বাবা, এ বিয়ে কিছুতেই হোতে পারে না।"

—"কেন, এযে শাস্ত্রের বিধান! পণ্ডিতরাও এতে মত দিয়েছেন!"

—"অমন শাস্ত্রের মুখে ছাই, অমন পণ্ডিতের মুখে আগুণ!"

—"অত গোল কোরো না, তোমাদের কোন কথা আমি শুনব না। এ বিয়ে আমি করবই!"

—"তবে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে; আমার এখন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এতবড় ম্লেচ্ছ ব্যাপারটা প্রাণ থাকতে আমি দেখতে পারব না!"

—"তোমার পূজো হয়েছে?"

—"না, এ-সব কথা শুনে পূজো-টুজো আমার ঘুরে গেছে!"

—"তবে এইবেলা মানে-মানে সরে পড় পিসিমা, মানে-মানে সরে পড়! এই কাপড়ে আমি চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি আর মুরগীর ডিম খেয়েছি, এখনি তোমাকে ছুঁয়ে দেব!"

—"দুর্গা, দুর্গা! সরে যা গোঁয়ার-গোবিন্দ—সরে যা!"

—"এখনো গেলে না? এই দিলুম ছুঁয়ে!"

—"অ মোহন, ছুঁস্‌নে বাবা—অ মোহন, ছুঁস্‌নে বাবা"—বলতে-বলতে পিসিমা পিছু হট্‌তে-হট্‌তে সরে পড়লেন!

পিসিমার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে নীচে নেমে দেখি, পাড়ার বিশুখুড়ো, দুর্লভ বাঁড়ুয্যে ও ফকির ভট্টচার্য্যি আমাকে আক্রমণ করবার জন্যে একেবারে রীতিমত তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছেন।

বিশুখুড়ো আমাকে দেখবামাত্র কিছুমাত্র ভূমিকা না-করে'ই বলে উঠলেন, "মোহন, এমন কার্য্য কোরো না! তাহলে আমি দুঃখিত হব!"

—"কি করব-না বিশুখুড়ো?"

ফকির ভট্টচার্য্যি বললেন, "ঐ ম্লেচ্ছ মুরারিটার বিধবা-মেয়েকে তুমি বিয়ে কোরো না বাবা!"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে তাঁর একচক্ষে যতটা দুঃখের ভাব জাহির করা যায় তা জাহির করে' বললেন, "তাহলে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যাবে।"

—"আপনারা এইজন্যেই আমাকে বুঝি সাবধান করতে এসেছেন?"

বিশুখুড়ো উৎসাহিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ বাবা, আমরা তাই এসেছি। মনে কর, আজ তোমার পিতা জীবিত থাকলে এমন অধর্ম্মের কাজ তোমাকে কিছুতেই করতে দিতেন না। আজ তিনি পরলোকে, তুমি ছেলে হয়ে তাঁর নাম ডুবিও না।"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে বললেন, "সুধু তাই নয়, তাহলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হবে।"

আমি শান্তভাবেই বললুম, "দুর্লভবাবু, আপনাদের মতন মহাপুরুষদের লীলাখেলা যখন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করছে, তখন আমার এই বিধবা-বিবাহে তার পায়ে কুশাঙ্কুর-বেঁধার ব্যথাও লাগবে না।"

বিশুখুড়ো থতমত খেয়ে বললেন, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, তোমার এ কথার অর্থ কি মোহন?"

—"অর্থ খুব স্পষ্ট। বাড়ীতে গিয়ে বুঝে দেখবেন। আসল কথা কি জানেন, দেশ আর আপনাদের চায়না—আপনাদের ধাপ্পাবাজিতে, ভুয়ো ভড়ং দেখে দেশের লোক আর ভুলবে না। আপনারা বিধবা-বিবাহ করবেন না, অথচ বিধবা অপহরণ করলে এ মিথ্যা সমাজ-বিধিতে কেউ পতিত হবে না। আপনারা যে ভেজাল-মেশানো নকল সমাজকে হিন্দুসমাজ বলে খাড়া করতে চান, সে ত জগন্নাথের মন্দিরের মত! বাইরে তার দ্বারে দ্বারে বিশ্বের আলো কেঁদে মরে, অথচ ভিতরে দরজা বন্ধ করে' সযত্নে অন্ধকার ধরা আছে; বাইরে সে প্রশস্ত, অটল, উচ্চ—কিন্তু ভিতরে সঙ্কীর্ণ, ফোপ্‌রা, নীচু! এ কি সত্য হিন্দুসমাজ? তা নয় মশাই, তা নয়! সত্য হিন্দুসমাজ আছে,—আপনারা তার খবর রাখেন না! আপনারা যাকে সমাজ সাজিয়ে প্রণামী আদায় করতে চান, সে হচ্ছে ভণ্ডামির আখ্‌ড়া, জোচ্চোরের আস্তানা, মুখ্যুমির আড্ডা।"

আমার কথা শুনে পাড়ার মুরুব্বিদের আক্কেল একেবারে গুড়ুম হয়ে গেল! তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন-নি যে, আমি তাঁদের মুখের উপর এমন-করে' অপ্রিয় সত্য বলতে পারব!

অনেকক্ষণ পরে বিশুখুড়ো মুখ খুলে বললেন, "দেখ মোহনলাল, এ ভাল হচ্ছে না কিন্তু! এর ফল হাতে-হাতে তোমাকে ভুগতে হবে!"

আমি উচ্চস্বরে তাচ্ছীল্যের হাসি হেসে বললুম, "কি হবে শুনি? আমাকে এক-ঘরে করবেন, না জাতে ঠেলবেন?"

ফকির ভটচায্যি বললেন, "সে দেখতেই পাবে তখন! আমাদের অপমান, অ্যাঁ!"

আমি বললুম, "ভটচায্, বাড়ী যাও, তোমার আফিম খাবার সময় হোল, মৌতাত চটে যাবে! তোমরা সকলকে একঘরে কর, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ কি, দেশে এখন তোমরাই সাধ করে' একঘরে হোতে বসেছ! তোমাদের ভণ্ডামিকে বাদ দিয়ে দেশে এখন এক যথার্থ হিন্দুসমাজ গড়ে উঠছে—এ নির্ম্মল, উদার, অটল; এ তোমাদেরও গ্রহণ করবে, কিন্তু তোমাদের যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেবে না!"

দুর্লভ বাঁড়ুয্যে একচোখ রাঙ্গিয়ে বললেন, "তোমার এ মুখসাবাসি কতক্ষণ ট্যাকে, দেখা যাবে!"

এদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা বৃথা। এদের তড়্‌পানি বন্ধ করতে হোলে আরো কঠিন হোতে হবে। অতএব হাঁক্ দিলুম, "গুট্টা সিং!"

"হুজুর!"—বলে আমার দ্বারবান গুট্টা সিং এসে, তার লম্বায়-চওড়ায় বিশাল শরীরে দরজা প্রায় ঢেকে, সিধে হয়ে দাঁড়াল।

তিনমূর্ত্তির দিকে ফিরে বললুম,

"আপনারা বোধহয় জানেন না যে, আমার দ্বারবান গুট্টা সিং আমার চেয়েও ঢের-বেশী পাষণ্ড! আমি যদি হুকুম দি, তাহলে ও এখনি অম্লানবদনে আপনাদের টিকিগুলি একসঙ্গে বিউনি করে' বেঁধে, তিনজনকেই রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। এমন-কি, আপত্তি করলে হয়ত চটে চড়-চাপড়টাও বসিয়ে দিতে পারে! অতএব,—"

আমার 'অতএবে'র মর্ম্ম বুঝতে তাঁদের একটুও দেরি লাগল না! কারণ, "সনাতন হিন্দুধর্ম্মে'র কথা বেবাক্ ভুলে গিয়ে সেই তিনমূর্ত্তিই এত তাড়াতাড়ি পাত্তাড়ি গুটিয়ে সরে পড়লেন যে, দেখে আমিও অবাক মানলুম। কবি ঠিক বলেছেন, "তর্কের সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো!"

আমার বিধবাবিবাহের ঘোঁট্ নিয়ে, পাড়ার মোড়লরা যখন বেজায় ধূমধাড়াক্কা বাধিয়ে তুলেছেন, তখন হঠাৎ একদিন মুরারিবাবু নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাআশ্রয় করলেন। প্রথমে আমরা ততটা গা করি-নি, কিন্তু দু-একদিন যেতে-না-যেতেই বোঝা গেল, মুরারিবাবুর অসুখ বড় যে-সে অসুখ নয়।

আমি আর হরেন পালা করে' মুরারিবাবুর সেবার ভার গ্রহণ করলুম। সহরের ভাল-ভাল ডাক্তার দিয়ে রোগীর চিকিৎসা চলতে লাগল।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সাংঘাতিক হয়ে উঠল। মুরারিবাবুর নিশ্বাসে দুর্গন্ধ পেয়ে বুঝলুম, তাঁর ফুস্‌ফুসে 'গ্যাঙ্‌রিণ' হয়েছে। আমরা তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিলুম।

সরমাকে আমরা কিছু খুলে না-বললেও তার কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। তার মুখ দেখে আমার বুক যেন ফেটে যেতে লাগল। বাপ ছাড়া এ সংসারে আপন বলতে তার আর কেউ ছিল না! শৈশবে মা-হারা হয়ে সে বাপের কোলেই মানুষ হয়েছিল; বালিকা-বয়সে বিধবা হয়ে আবার সেই স্নেহময় পিতার বুকেই আশ্রয় পেয়ে কোনরকমে সে আপনার তিক্ত জীবনকে ভুলে ছিল। আজ সেই পিতাই তাকে একলা ফেলে কোন্ অজানা দেশে জন্মের মত চলে যাচ্ছেন—তার এ দুঃখ যে বোবার স্বপ্ন-দেখার মত; সে ত কথায় প্রকাশ করা যায় না!

সরমা যেন কেমনধারা হয়ে গেল! সে কাঁদে না, কথা কয় না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, সুধু বাপের শিয়রের কাছে চুপ-করে' উদাসচোখে পাথরের মূর্ত্তির মত বসে থাকে,—কিবা রাত, কিবা দিন! রাত্রে যখন রোগীর ছট্‌ফটানি বেড়ে ওঠে, অসহ তৃষায় তিনি ক্রমাগত 'জল জল' বলে চেঁচাতে থাকেন, নিশ্বাস ফেলতে তাঁর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়—সরমা তখনো পিতাকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে না, রোগীর কষ্ট দেখে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না, তার মুখে উদ্বেগের রেখামাত্র দেখা যায় না! সেই মরণের ভরে-ভরা ঘরে অন্তিম শয্যার পাশে বসে, জীবন-মৃত্যুর অশ্রান্ত যুঝা-যুঝি দেখতে-দেখতে মন যখন ভারাক্রান্ত হয়ে ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে পড়ছে, তখন থম্‌থমে

নিশুতি রাত্রে, নিবুনিবু দীপের স্তিমিত আলোকে, সরমার সেই স্তব্ধ, স্থির, পাণ্ডু মুখ বারংবার চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছি আর বুকের কাছটা কেমন ছম্‌ছম্ করে' উঠ্‌ছে! উঃ, সরমার সেই মৌন-অচল মূর্ত্তি, নিঝুম রাতের সেই দুঃসহ নীরবতা আর তারই মাঝে মরণাহত রোগীর বিকৃত স্বরে চীৎকার,—এ কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে আলো-আঁধারে ঐ যে দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া থেকে-থেকে চুপি-চুপি নড়ে-নড়ে বেড়াচ্ছে, আমার মনের গতিক্ এমনি হোল যে, ও-গুলোকে দেখেও আমি আচ্ছন্ন প্রাণে শিউরে-শিউরে উঠ্‌তে লাগলুম!

রাত তখন পাঁচটা, পূর্ব্ব-আকাশে অল্পে-অল্পে ভোরের জলন্ত ছবি ফুটে উঠছে।

মুরারিবাবু হঠাৎ জড়িত স্বরে বললেন, "মোহন!"

আমার একটু-একটু তন্দ্রার ঘোর আসছিল, মুরারিবাবুর গলার আওয়াজে সে ঘোর ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে গিয়ে বললুম, "কি বলছেন?"

মুরারিবাবু নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের যা করবার, তা তোমরা করেছ,—আর করবার কিছু নেই। আমি বুঝতে পারছি, আমার সময় হয়ে এসেছে। সুতরাং—"

—"মুরারিবাবু, আপনি ও-সব কথা ভাববেন না।"

মুরারিবাবু অল্প হেসে বললেন, "কি আশ্চর্য্য, আর ভাবব 'কেন বাবা? আমি এখন সেই দেশে যাচ্ছি, ভাবনা যেখানে নেই। উঃ, বড় কষ্ট হচ্ছে, একটু জল দাও ত মোহন!"

জলপান করে' বললেন, "সরমার জন্যে আমার বড় ভয় ছিল, সে ভয় তুমি ঘুচিয়েছ। দেখ বাবা, সরো আমার জন্ম-দুঃখী—ও যেন সুখে থাকে। ভুলে যদি কোনদিন কিছু অপরাধ করে, ক্ষমা-ঘেণা কোরে সে দোষ নিও না। বড় সাধ ছিল তোমাদের দুটিকে পাশাপাশি দেখে যাই, কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হোল না! সরো, দেখি মা, তোর চাঁদ-মুখখানি একবার দেখেনি!"

সরমা বাপের বুকের উপর আপনার মুখখানি নিয়ে গেল। মুরারিবাবু অনেক-ক্ষণ ধরে নিষ্পলক নেত্রে মেয়ের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। অন্তিমের সে তৃষিত শেষদৃষ্টি কি মর্ম্মস্পর্শী! স্নেহব্যাকুল পিতার সমস্ত প্রাণটি যেন তখন সে অতৃপ্ত চাহনির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুরারিবাবু বললেন, "মা, তোর কোন ভয় নেই, মোহন তোকে দেখবে। আশীর্ব্বাদ করি, স্বামী-পুত্র নিয়ে চিরজীবিনী হয়ে থাক্।"

আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাবা, একটা মার নামগান কর ত!"

আমি মৃদুস্বরে গাইলুম,

"কেবল আসার আশা ভবে আসা আসামাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রহিলো।
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে' ছল,
ওমা! মিঠার লোভে তিতমুখে সারাদিনটা গেল।
মা, খেলবে বলে ফাঁকি দিয়ে নামালে ভূতল,
এখন সন্ধ্যেবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।"

মুরারিবাবু গাঢ়স্বরে বলে উঠলেন, "তোমাদের পৃথিবীতে আজ প্রভাত হচ্ছে, কিন্তু, আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এখনি সব আঁধার হয়ে যাবে—আঁধার! ঠিক কথা, আবার গাও মোহন, আবার গাও—'এখন সন্ধ্যেবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল'। নিয়ে চল্ মা, ঘরে নিয়ে চল্!"

আমি আবার গাইলুম। মুরারিবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন, "মোহন, আমার মাথাটা একটু উঁচু করে' তুলে দাও। জানলাটা খুলে দাও। চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে,—যত-ক্ষণ দেখতে পাই, পৃথিবীর নূতন সূর্য্য, নূতন আলো প্রাণভরে দেখে-নি!"

* * * *

সব শেষ! সদানন্দ মুরারিবাবুর প্রসন্ন মুখ এ পৃথিবীতে আর কেউ দেখতে পাবে না। তাঁর সেই শীতল ও অসাড় দেহ যেখানে নিয়ে গিয়ে অগ্নিশয্যায় শুইয়ে দিয়েছিলুম, এখন সেখানে সুধু কয়মুঠো তপ্ত ছাই পড়ে আছে।

দাহ শেষ করে' ফিরে দেখলুম, ঘাটের কিনারায় সরমা গালে হাত দিয়ে স্তম্ভিত-ভাবে বসে আছে,—তার শূন্যদৃষ্টি গঙ্গার চঞ্চল স্রোত পেরিয়ে, ওপারের সবুজ্‌গাছের সার ছাড়িয়ে কোথায় চলে গেছে, কে জানে!

আস্তে-আস্তে কাছে গিয়ে ডাকলুম, "সরমা!"

সরমা কোন সাড়া দিলে না, ভাব-হীন মুখে আমার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' চেয়ে রইল।

"সরমা, স্নান করবে চল।"

সরমা কলের পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল। একবার শ্মশানের দিকে ফিরে দেখলে;—মুরারিবাবুর নিবন্ত চিতা থেকে তখনো অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে এবং তারই পাশে একটা উপুড়-করা মেটে কলসীর উপরে হরেন নীরবে মাথা হেঁট করে' বসে আপনমনে কি ভাবছে।... ... ...

হরেনের সামনেই আর-একটা নূতন চিতা সাজানো,—তার উপরে একটি পরম-সুন্দর যুবকের শব—মরণ তার হিম-হাতে ছুঁয়েও যুবকের শ্রী কিছুমাত্র মলিন করতে পারে-নি! যুবার দেহ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে এক তরুণী রমণী চিতার উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে আছে—জনকত লোক অনেক টানাটানি করে'ও তাকে সরিয়ে আনতে পারছে না—সকলে তাকে যতই বোঝাচ্ছে, সে অভাগী ততই আর্ত্তনাদ করে' বলে উঠছে, "ওগো, আমাকেও ওঁর সঙ্গে পুড়িয়ে ফেল—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার এ পোড়ারমুখও পুড়িয়ে দাও গো, পুড়িয়ে দাও!"

আঃ, এ কী দৃশ্য! হরেনের দিকে চেয়ে দেখলুম, দু-হাতে সে মুখ ঢেকে ফেলেছে, আমিও আর সইতে না পেরে আবার বললুম, "সরমা, স্নান করবে চল।"

কোন কথা না বলে সরমা ধীরে-ধীরে আমার সঙ্গে গঙ্গার জলে গিয়ে নামল। তার এই নির্ব্বাক, উদাস ভাব দেখে আমার ভারি ভাবনা হোল।

ঠিক তেমনি ভাবেই আবার সে আমার সঙ্গে এসে গাড়ীর ভিতরে ঢুকল।

কিন্তু যেম্‌নি আমি গাড়ীর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে' দিলুম, সরমা অত্যন্ত চমকে উঠে বললে, "অ্যাঁ! বাবা কৈ! তিনি এলেন না যে!"—তার মুখ দেখে মনে হোল, সে যেন এইমাত্র একটা দীর্ঘ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল!

—"সরমা, এ কি বলছ? স্থির হও!"

—"কেন মোহনবাবু, আমি ত স্থির হয়েছি!" বলে সে অতিশয় শুষ্ক হাসি হাসলে,—সে হাসিতে আমার প্রাণ যেন উড়ে গেল! সরমা হাসছে? এখন,—এই অবস্থায়!... ... ...

আমি তার হাত চেপে ধরে আকুল-ভাবে বললুম, "সরমা, সরমা!"

সরমা পলকহীন নয়নে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখের ভাব বদলে যেতে লাগল, ধীরে ধীরে তার চোখদুটি ছল্-ছলে হয়ে এল। অবশেষে স্থিরতার বালির বাঁধ ভেঙ্গে হঠাৎ সে "ওগো বাবা, বাবা গো" বলে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠে, দু-হাতে আমার দু-হাঁটু জড়িয়ে ধরে, আমার কোলের ভিতরে তার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি লুকিয়ে ফেললে!

উনিশ

সরমার কথা

মনে হচ্ছে, এ পৃথিবীটা সুধু মস্তবড় একটা ফাঁক্! এ ফাঁক্ আর-কি কখনো ভরে উঠবে? ঐ আকাশ বাতাস আলো সবই আজ বাইরে পড়ে আছে, আমার ভিতরে তারা আসতে পারছে না, আমাকে অভিভূত করতে পারছে না, আমাকে আমার হতভাগ্যের কথা ভোলাতে পারছে না। আমি একলা, আমি একলা!

বাবা—বাবা!... ...

ঘরের দেওয়ালে বাবার এস্রাজ, বেহালা—যেমন-করে' তিনি শেষবার টাঙ্গিয়ে রেখে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই—টাঙ্গানো রয়েছে। কত স্নেহে কত যত্নে ওদের গায়ে হাত-বুলিয়ে, ওদের সঙ্গে তিনি সকাল-সন্ধ্যায় প্রাণের কথা কইতেন, তাঁর সুখ-দুঃখের প্রতিধ্বনি নিয়ে ওরা কত হেসেছে, ওরা কত কেঁদেছে! তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গেসঙ্গে ওদেরও আজ সকল হাসি-কান্নার অবসান। ওরাও আজ অনাথ—ওরাও আজ মরেছে!...

বাবার বড় আদরের নন্নুয়া মেন্নুয়া মুখ চুণ করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে,—ঘরে-ঘরে তাঁর খোঁজ করছে। এ দু-রাত তারা কী করুণ-স্বরে কেঁদেছিল! এক-একবার তারা আমার কাছে এসে, বিমর্ষ চোখে আমার মুখপানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আহা, অবোলা জীব! কিছু ত বলতে পারে না—কিন্তু তাদের সে কাতর চাহনি যেন বলতে চায়, 'ওগো, তিনি কোথা গেলেন—তিনি?" নন্নুয়া বাবার খাটের তলায়, বিছানার উপরে,—এমন-কি, লেপের ভিতরে পর্য্যন্ত আঁতিপাঁতি করে' খুঁজেছে,—কিন্তু কোথাও তাঁকে না-পেয়ে শেষটা কুঁই-কুঁই করে' কেঁদে মরেছে, মানুষের মতই তার দু-চোখে ধারা বয়ে গেছে! সে খেতে চায় না, খাবার দিলে মুখ ফিরিয়ে

বসে থাকে, আর ম্রিয়মান হয়ে কি-যেন ভাবে।

নির্জ্জন বাড়ীতে একলা বসে-বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছি। মোহনবাবু আর হরেনবাবু মাঝেমাঝে এসে সান্ত্বনা দিয়ে যান।

বিপদে-আপদে আমার লজ্জা-সরম দূরে গেছে; হরেনবাবু আমাকে দিদি বলে ডাকেন, আমিও তাঁকে দাদা বলি,—এতদিন তাঁর সঙ্গে কথা কইতুম না, কিন্তু এত মেশামিশির পর আর লজ্জা করা চলে না। আমার বড় সাধ, বাবার শেষ কাজটা ভাল করে'ই করব—এতে তাঁরাই আমার যা-কিছু আশা-ভরসা।

কাল সকালে এ-পাড়ায় যিনি পুরুতের কাজ করেন, তিনি এসেছিলেন। লোকটিকে দেখে আমার আদোপেই ভাল লাগল না। তিনি আমাকে মা-বলে কথা কইছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখ-মুখের ভাব এমনি বিশ্রী যে, আমি মাথার কাপড়টা আরো একটু টেনে না দিয়ে থাকতে পারলুম না। এ-সব মানুষকে দিয়ে পবিত্র কাজ করাতে আমার মন সরে না! কিন্তু কি করব, উপায় নেই,—যারা চণ্ডালের চেয়েও নীচু, সমাজে সুধু পৈতে দেখিয়েই তারা সকলের মাথার উপরে পা দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে।

পুরুতঠাকুর এসে বললেন, "মা, একটা কথা বলতে এলুম।"

—"বলুন।"

—"তোমার পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী পুরুষ কেউ ত নেই?"

—"না।"

—"তাহলে তোমাকেই চতুর্থী করতে হবে ত?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"বেশ, তাহলে এইবেলা থেকে আয়োজন করো মা! আমিই এ-পাড়ার পুরোহিত।"

—"আমি ত তা জানি না!"

—"তুমি না জানতে পার, কিন্তু ফকির ভট্‌চায্যিকে পাড়ার কে না চেনে? তোমার পিতার সঙ্গেও আমার যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় ছিল; আহা, তাঁর মত পুণ্যবান একালে আর দুটি দেখা যাবে না। এই সেদিন তিনি 'ভট্‌চায্যি মশাই, ভট্‌চায্যি-মশাই' বলে কত গল্পই বললেন, আর এর-মধ্যেই এই ব্যাপার! হরি হে, তোমার মহিমা বোঝা ভার! যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি! তুমি মা, পিতার উপযুক্ত কন্যা, কার্য্যটা কি-রকমে সম্পন্ন হবে, শুনি।"

আমি যা করতে চাই তাঁকে সব বললুম। তিনি অত্যন্ত আনন্দের ভাব দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, একেই বলি বাপের মত মেয়ে! হবে না কেন! শুনে বড় সুখী হলুম মা, পরকালে বেশ বুঝছি, তোমার ভাগ্যে অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে! তা মা, করতে হলে এখনি থেকে বন্দোবস্ত করতে হয়।"

—"ঠাকুর, বন্দোবস্ত যা করতে হবে, তা মোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা না করে' ত বলতে পারছি না!"

ভটচার্য্যি-মশায়ের মুখ যেন শুকিয়ে

এতটুকু হয়ে গেল। একটু থতমত খেয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করে' বললেন, "মোহনবাবু? কেন মা, তুমি থাকতে মোহন কেন?"

—"তিনিই এখন আমাদের একরকম অভিভাবক। তাঁর মত্ না নিয়ে ত কিছু করতে পারি না!"

ভট্‌চার্য্যি-মশাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কিছু-ক্ষণ ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তাই ভাল মা, তাই ভাল। যাই, একবার মোহনের কাছেই যাই!"

আমি একটু আশ্চর্য্য হলুম। পুরুত-ঠাকুর হঠাৎ এতটা ভেব্‌ড়ে গেলেন কেন?

কিন্তু একটু পরে মোহনবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হোল, পুরুত-ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন অনেক কথাই শুনলুম। ঠাকুরটি যে ভাল লোক নন, তা তাঁর মুখ দেখেই কতকটা ঠাওর করেছিলুম; কিন্তু তাঁর স্বভাব যে এতটা জঘন্য, তা কল্পনা করি-নি।

মোহনবাবু বললেন, "ফকির ভট্‌চায আমার কাছে কাকুতিমিনতি করতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে ওকে দিয়ে তোমার বাবার কাজ করানো হয়।"

আমি বললুম, "আহা, এতটা আশা করে' যখন এসেছে, তখন আশায় নিরাশ করা কি ভালো? হাজার হোক্ ব্রাহ্মণ ত! আর, বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন, অতি-বড় শত্রুকেও তিনি শত্রু বলে ভাবতে পারতেন না। এখন তাঁর শেষ কাজের সময় বিরোধটাকেই বড় করে' দেখতে কিছুতেই আমার মন সরছে না!"

—"তবে তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক! কিন্তু তুমি জাননা সরমা, উপকার করলে এদের শত্রুতা দ্বিগুণ বেড়ে উঠবে। মানুষ-রূপে যারা সয়তান, অপকারীকে তারা ভয় করে, কিন্তু উপকারীকে দু-পা দিয়ে থ্যাঁত্‌লায়!"

বাবার কাজ ভালোয়-ভালোয় শেষ হয়ে গেল; এ জীবনে তাঁর নামে পবিত্র এত বড় দিন আর-কখনো আসবে না—এই মনে করে' আমার প্রাণ-মন হুহু করতে লাগল।

চতুর্থীর পরদিন সকালে উঠে নন্নুয়াকে দেখতে পেলুম না। তারপর একে-একে সাত-আটদিন কেটে গেল, নন্নুয়া আর ফিরে এল না—অনেক সন্ধানেও তার কোন উদ্দেশ মিলল না। যে-রাস্তা থেকে বাবা তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, রাস্তার কুকুর আবার সেই রাস্তাতেই হারিয়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, নন্নুয়া কি বাবাকে খুঁজতে গেল? মানুষের মায়া মানুষে ভুলে যায়, কিন্তু পশু হয়েও নন্নুয়া ত তা ভুলে থাকতে পারলে না,—মায়ার ডাকে সে ঘর ছেড়ে, সুখ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ল দুঃখকে আপন করে'!

বাবা যখন-তখন একটা কথা বলতেন মনে পড়ল, 'কুকুর অনেকসময়ে মানুষের চেয়েও ঢের বড়'!

বাবার মৃত্যুর পর দেখতে-দেখতে

মাসখানেক কেটে গেল। বাবাকে হারিয়ে যে জীবনের কথা ভেবে আমাতে আর আমি ছিলুম না, সেই শূন্য জীবনই ধীরে-ধীরে আবার স্বাভাবিক ও পূর্ণ হয়ে আসছে। জীবনের সুমুখে আজ আবার নূতন ভাবে জেগে উঠছে—নূতন পথ, নূতন আশা, নূতন আলো! বিচিত্র মানুষের প্রাণ!

এর-মধ্যেই আর-এক ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন দুপুরে একলাটি বসে-বসে বই পড়ছি, হঠাৎ মোহনবাবুদের বাড়ীর ঝী এসে বললে, "মা-ঠাকরুণ আপনাকে একবার ডেকেছেন!"

বুঝলুম, আমায় ডেকেছেন মোহনবাবুর পিসিমা। একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?"

সে বললে, "জানিনে বাছা, তাঁর নাকি কি কথা আছে। আসবেন কি?"

আমার সঙ্গে কথা! কি কথা? কিছুই ঠাওরাতে না-পেরে বই মুড়ে উঠে বললুম, "চল, তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

ঝীয়ের সঙ্গে বাগানের পথ দিয়ে মোহন-বাবুদের বাড়ীতে গেলুম।

দরদালানে পাড়ার একদঙ্গল মেয়ে বসে জটলা করছে—তার মধ্যে বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা,—সকল বয়সের স্ত্রীলোকই আছে।

আমাকে দেখবামাত্র হৈচৈ বন্ধ হোল—সকলের মুখ দিয়ে কেমন-যেন একটা চাপা টিট্‌কিরির ভাব খেলে গেল। এক সঙ্গে অনেকগুলো বাঁকা চোখের খরদৃষ্টি আমার মুখের সামনে যেন ধারালো ছোরার মত জ্বল্‌তে লাগল। দুরু দুরু বুকে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে চোরের মত আমি একটি পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

চোখ দিয়ে যতটা বেঁধা যায়, ততটা বিঁধে, কে-একজন মুখ খুলে বললেন, "হ্যাঁগো মোহনের পিসি, মোহন কি একেই বিয়ে করতে চায়?"

—"হ্যাঁ বাছা, আমার অদেষ্ট! কপালে আরো কি আছে, দীনবন্ধুই জানেন!"

এককোণে বসে চুপিচুপি—অথচ আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়েই কে যেন কাকে বললে, "আ মরণ, ধিঙ্গির মত পোড়ারমুখ নিয়ে এখানে আসতে লজ্জা করল না, ভাই?"

আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে এল, কোন মতে অস্ফুট স্বরে বললুম, "আমাকে কেন ডেকেছেন?"

মোহনবাবুর পিসী বললেন, "তুমি বাছা স্বামীকে খেয়ে আবার আমার মাথা খেতে বসেছ কেন বল দেখি?"

এ কী নিদারুণ কথা! আমার মাথার উপরে এ যেন বাজ্‌ ভেঙ্গে পড়ল!

—"দেশের মেয়ে দেশে যাও,—বিধবা হয়েছ বিধবার মত থাক, তা নয়,—যত সব ম্লেচ্ছ ব্যভার! তোমাকে কেন ডেকেছি জান? আমার মোহনের যাতে সর্ব্বনাশ না হয়, তাই বলতে! এ অনাছিষ্টি অনাচারে তারও কুলে কালি পড়বে, তোমারও ধর্ম্মে সইবে না,—কি বল তিনুর মা?"

তিনুর মা বোধকরি এতক্ষণ কিছু বলতে না-পেয়ে পেটফুলে হাঁপিয়ে উঠছিলেন! কেননা, মোহনবাবুর পিসীর মুখের কথা মুখে থাকতে-থাকতেই তিনি চোখ-পাকিয়ে

বলে উঠলেন, "ওমা, তা নয় মা, তা নয়? ধর্ম্মে কি সইল? এই ত অমন জলজ্যান্ত বাপটা পট্ করে' মরে গেল!"

আর-একজন—চক্র ধরে সাপ যেমন দোলে—মাথা তুলে তেমনি দুল্‌তে-দুলতে ফোঁশ করে' উঠলেন, "মরে যাবে না! ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে!"

আর-একজন বৃদ্ধা দুই ভুরু কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে বললেন, "মা, মা, মা! বিধবার বিয়ে? একালের ছুঁড়িগুলো হোল কি! মুখে আগুন, মুখে আগুন!"

—"গলায় দড়ি! দেশ থেকে এসেছেন পুরুষ মজাতে!"

—"ও যে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে আসেনি, তাই-বা কে বলতে পারে!"

যাঁর যা মনে আসে, তিনি তাই বলতে লাগলেন, নেকড়ে দলে আমি যেন অসহায় এক হরিণ! এতগুলো মানুষের ভিতরে এমন কি কেউ নেই, যিনি এ অভাগীকে এদের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারেন? দেয়ালের গা ধরে আমি বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম,—দুঃখে কষ্টে অপমানে আমার দু-চোখ অন্ধকার হয়ে গেল, অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।

কে-একজন কাঁসরের মত খন্‌খনে গলায় বললেন, "জানো মোহনের পিসি, কর্ত্তা বলছিলেন যে, ছুঁড়ীর বাপের শ্রাদ্ধে গিয়ে তিনি ভারি অন্যায় করেছেন!"

হঠাৎ নতুন গলায় আর-একজন কে তীব্রস্বরে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, "থাম বুরুত-গিন্নি, থাম! শ্রাদ্ধে গিয়ে মোটা প্রণামী আদায় করবার সময়ে ফকির ভট্‌চায্যির ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল? 'কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলেই পাজী'! তোমার কর্ত্তাটি বেশ লোক দেখচি!"

মোহনবাবুর পিসী বিরক্ত স্বরে বললেন, "যমুনা, বামুনের মেয়েকে তুই মন্দ কথা বলছিস্ কোন্ মুখে?"

—"পিসিমা, তুমি থাম বল্‌চি—আমাকে রাগিও না! বুড়ো-বয়সে তোমার ভীমরতি হয়েছে! এ বেচারী সবে বাপকে হারিয়েছে, আর তুমি কিনা একপাড়া লোক ডাকিয়ে ওর কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিচ্ছ! তুমি এই করতেই আমাকে বুঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে আনিয়েছ? আর তোমাদেরও বলি বাছা, তোমাদের কারুর প্রাণে কি দয়া-ধর্ম্মের লেশ নেই, একটা ঘোট্ পেলেই কি এমনি ধেই-ধেই করে' নেচে উঠতে হয়?"

একজন টিপে-টিপে বিনিয়ে-বিনিয়ে বললেন, "কিলো যমুনা, বড় যে ক্যাট্‌ক্যাট্ করে' শুনিয়ে দিচ্ছিস্, তোর আবার এত মুখ ফুটলো কবে লো?"

আর-একজন বললেন, "সেদিনকার মেয়ে, উনি আবার আমাদের দয়া-ধর্ম্মের দোহাই দিচ্ছেন।"

—"ও-সব ভঙ্গিমা করে' কথা আমার সঙ্গে চলবে না, যমুনা কারুর খাতির রেখে কথা কয়-না! তোমাদের সকলকার হাঁড়ির খবরই ত জানি,—যদি মান বাঁচাতে চাও মুখটি বুজে চুপটি করে' বসে থাক; নয় ত যে যার পথ দেখ।"

কে এসে আমার হাত ধরলে; চোখের জল মুছে ভাল করে' চেয়ে দেখি, একটি

পরমসুন্দরী যুবতী! এঁরই নাম কি যমুনা?

তিনি কোমল স্বরে স্নেহভরে আমাকে বললেন, "লক্ষ্মীটি, কেঁদ না ভাই! দাদা বাড়ী নেই বলে এরা যো পেয়ে তোমাকে চেপে ধরেছে! এতটা হবে জানলে আমি তোমাকে আনতে দিতুম না। কিছু মনে কোরো না ভাই, বাড়ী যাও!"

বাড়ীতে এসে যখন নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকলুম, তখন আমার প্রাণ যেন বুকের মাঝে ছট্‌ফট্ করছে!

জীবনে দুঃখ পেয়েছি ঢের, কিন্তু এত লজ্জা এত অপমান আর-কখনো আমাকে সইতে হয়-নি। বাবার স্নেহ-আদরে এতদিন আমি পাহাড়ের আড়ালে ছিলুম, বাইরের ঝড়-ঝাপটা আমাকে স্পর্শ করতেও পারে-নি। আজ বাবা যেই সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, নির্দ্দয় সংসার অমনি তার সকল কদর্য্যতা নিয়ে বিষাক্ত নিশ্বাসে আমাকে জর্জ্জরিত্ করে' তুলতে চায়! এইজন্যই তিনি ভয় পেতেন যে, তিনি গেলে আমার কি হবে! বুঝেছি, বুঝেছি!

আজ যা শুনলুম, এ যে ভয়ানক কথা! এরা কি ভেবেছে, মোহনবাবুকে আমি প্রেতিনীর মত পেয়ে বসেছি? এমন কথাও শুনতে হোল—মাগো!

এর পরেও আর ত আমার এ-পাড়ায় থাকা চলে না! থাকা ত চলে না কিন্তু যাব কোথা? যার মা নেই, বাপ নেই, স্বামী নেই, আপন বলতে তার আছে শুধু যম। হাঁ, যম—যম .. ...একলা নারীর মরণ ভাল!

আজকের এই প্রথম লাঞ্ছনা এইখানেই থেমে যাবে না, দিনে-দিনে বাড়তে থাকবে। লোকের রসনা নিত্য-নূতন রটনা রটাবে—যে-সব বাক্যযন্ত্রণায় কানে আঙ্গুল দিতে হবে। একলা পেয়ে অবলা পেয়ে সমাজ আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে—আমার অসহায় জীবনকে ভারবহ করে' তুলবে।

আমার পক্ষ নিয়ে কে তখন এগিয়ে আসবে? মোহনবাবু?... ...হ্যাঁ, তিনি আসবেন, কিন্তু আমার জন্যে কেন তিনি আত্মীয়কে পর করবেন, সমাজকে শত্রু করবেন? আর আমাকে বাঁচাতে গিয়েই কেনই বা তিনি বিপন্ন হবেন? এতে আমিও সুখী হব না, তিনিও হবেন না—এ যে আরো ভয়ের কথা!

জীবনের সামনে যত সোনার স্বপ্ন ফুটে উঠছিল, ভবিষ্যতের অকূল পাথারে আবার তা ডুবে গেল। আজ বুঝছি আমার এ দুঃখ মরুভূমির মত অপার,—এর-মধ্যে যাবজ্জীবন জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে হা-হা করে' ছুটে মরে লাভ কি তার চেয়ে মরা ভাল, মরা ভাল!

দু-হাতে বুক চেপে ডুকরে কেঁদে উঠলুম, "বাবা-গো, আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

একতারা *

(১)

বাংলার আধুনিক কাব্যসাহিত্যে প্রেমের কবিতা অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। হালের অনেক কবি তরুণ বয়সে শঙ্করাচার্য্যের মতে "তরুণীরক্ত" না হইয়া পরমার্থ চিন্তায় মন দিতে সুরু করিয়াছেন দেখিয়া এক এক সময়ে আশঙ্কা হয় যে, বাংলাদেশে বুঝি যৌবন আর নাই। এখানে প্রকৃতি যখন শীতাপগমে নব মল্লিকার মালা কেশে পরিয়া এবং চূতমঞ্জরী কাণে কর্ণাভরণ করিয়া অভিসারিকার বেশে বাহির হন্, তখন তরুণ কবির দল 'শান্তিশতক' আওড়াইতে থাকেন—তাঁদের মনের কোন কোণায় বসন্তের আমেজ যে লাগিয়াছে, মোহের রং যে ধরিয়াছে, তার লক্ষণটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

যৌবন যে শুধুই বসিয়া বসিয়া 'ঋতু-সংহার' বা 'অমরুশতক' কিংবা 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিবে—যৌবনের ধর্ম্মই যে লালসা—যৌবনকে এত ছোট করিয়া দেখিয়া তাকে আমি অপমানিত করিতে পারি না। অবশ্য লালসার দীপ্ত অগ্নিবর্ণকে কাব্যে ফুটাইয়া তোলাও শক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। এ-দেশে বায়রন, কি হাইনে, কি থিওফিল গোতিয়ের মত কবি যদি একজনও জন্মিত, তবে বাংলাদেশটার মধ্যে একটা জীবন-বেগ আছে, ইহা বিশ্বাস করিতাম। বাংলা কাব্যে বাসনার উত্তাপ ও দীপ্তি কোথায়? যে প্রবল বাসনার অগ্নিবর্ণে গ্রীক ট্রাজেডি, শেক্‌স্‌পীয়রের অমর নাট্যগুলি রঞ্জিত, যে দুর্দ্দান্ত বাসনার ছন্দোময় রূপ বায়রণের কাব্যে বিভ্রাজমান—বাসনার সেই প্রদীপ্ত বিভাস বাংলার কাব্যে কোথাও নাই। তবু সেই দীপ্ত বাসনাবেগকেই যৌবনের সারসর্ব্বস্ব বস্তু মনে করিতে পারি না। Romanticism বলিতে যাহা বোঝায়, যৌবনই তার উদ্বোধক, তার প্রবর্ত্তক। একালের সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা (Realism) স্বভাবতন্ত্রতা (naturalism) ব্যক্তি-তন্ত্রতা (individualism) এবং বিশ্বতন্ত্রতা (humanism) যে শক্তির দ্বারা উদ্বোধিত ও প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তারই নাম যৌবন। আর রোমান্টিক সাহিত্য বলিতে ঐ সব আদর্শগুলিরই সমবায় বুঝায়; অর্থাৎ ঐ সব আদর্শের সমবায়েতেই রোমান্টিক সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এখানেও যৌবন-ধর্ম্মের ক্ষান্তি হয় না। যৌবন, সাহিত্যের মধ্যে সমস্ত জীবনের নানা জটিল সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতজনিত একটা ঝঞ্ঝা-ময় আলোড়ন আনিয়া ফেলে। সেই ঝঞ্ঝাময় ("storm and stress") সাহিত্যও যৌবনেরি সৃষ্টি।

অতএব, বাংলা সাহিত্যে যৌবন তার

---

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য একটাকা।

কাজ করিতে পারিতেছে না বলিয়া যখন আক্ষেপ করা হয়, তখন সাহিত্য এতগুলি দিক্ হইতে পূর্ণ ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে না বলিয়াই সেই আক্ষেপ। কেননা, কাব্য-সাহিত্য বলিতে যাঁরা পদাবলী সাহিত্য বা আউল বাউল সাহিত্য বুঝিয়া বসিয়া আছেন, কাব্য-সাহিত্যের সেই "রূপান্তর" ঘটাইয়া যাঁরা যুগান্তর উপস্থিত করিবার দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁদের আমরা বলি যে, ও-সব অধ্যাত্ম-রসাত্মক কাব্যসাহিত্য উঁচুদরের জিনিস হইলেও পুরোদস্তর সাহিত্য নয়। এবং ঐ-সব সাহিত্য বাদে, বাংলা সাহিত্যে, মোপাসাঁ-ফ্লোবেয়ারের গল্পের একটু আধটু ফিকে গোচের নকল চলিতেছে অথবা মধ্য-ভিক্টোরীয় Idyll-রচয়িতা টেনিসন-রোসেটি-হুগো'র অনুকরণে বাংলা পল্লীসৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কণ চলিতেছে বলিয়াই বাংলা-সাহিত্য ফরাসীস্ বা ইংরাজী সাহিত্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, এমন কথা মনে করা যায় না। একা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সব রসের আধার, সব আদর্শেরই উদ্বোধক হইয়া আছেন। তিনি নিজেই এক মহা সাহিত্য। তাঁর মধ্যে সাহিত্যের সব বিভাগেরই কিছু কিছু রূপ মেলে। কিন্তু কোনো কোনো বিষয় যাহা তিনি ছুঁইয়া গেছেন মাত্র, অন্যান্য আর্টিষ্টদের তাহাই বিচিত্র করিয়া সাহিত্যের আসরকে জমাট্ করিয়া তোলা দরকার। বাংলা সাহিত্যে সেই কাজের অপেক্ষা আছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চির "এক-তারা" কাব্যটি পড়িয়া এইজন্য অত্যন্ত আনন্দবোধ করিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' ও 'চিত্রায়' যুগল প্রেমের বিচিত্র উপলব্ধির যে একটুখানি আভাস পাওয়া যায় এবং যে-জায়গায় ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজী সাহিত্যের টেনিসন, ব্রাউনিং, রসেটি, সুইনবর্ণ এবং ফরাসী সাহিত্যের ভিক্তর হুগো, সাঁত্‌বাভ্ অগস্ত ব্রিজো, থিওফিল গোতিয়ে প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য ও সারূপ্য পাওয়া যায়—যুগল প্রেমের সেই বিচিত্র উপলব্ধির দিক্‌টা, সেই বিচিত্র মানস-রসলীলার দিক্‌টা, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের কাব্যে নূতন রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। তিনি রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য; রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার দ্বারা বহুল পরিমাণে পুষ্ট। কিন্তু তাঁর উপলব্ধির নবীনতায় ও সরসতায় তাঁর কাব্য উজ্জ্বল ও নবীন। এই জন্য আমি তাঁর এই কাব্যটিকে সাহিত্যের সভায় সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

ভিক্টোরীয় যুগের যে সকল কবির নাম করা গেল, তাঁরা সকলেই যুগলের দ্বৈতকে যুগলতত্ত্বের শেষ কথা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাঁদের প্রদর্শিত মার্গ দ্বৈত-মার্গ, যুগল প্রেমের মার্গ, ব্রাউনিংয়ের ভাষায় "love-way"। সেখানে নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের বাঞ্ছিতকে নানা পরীক্ষা ও ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়া খুঁজিতেছে। শেলির 'এপিসাইকিডিয়ন' যুগলের সেই অন্বেষণের কাব্য। কিন্তু যখন পরস্পর পরস্পরকে বাঞ্ছিত বলিয়া চিনিল, তখনও এই অন্বেষণের বিরাম নাই—এ অন্বেষণ চিরন্তন অন্বেষণ—কেননা, এক যে অন্যের মধ্যে আপনার "শত জনমের চির সফলতা"

মাগিতেছে। ব্রাউনিংয়ের "Love in a life" যুগলের সেই চিরঅন্বেষণের কাব্য —সে অন্বেষণ জীবনব্যাপী অন্বেষণ। কারণ, যুগল প্রেম দ্বৈতের প্রেম বলিয়া এ প্রেমে মিলনেও বিরহ—'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—এবং বিরহেও মিলন—যে জন্য মৃত প্রিয়তমা এভিলিন্ হোপের দিকে চাহিয়া তার প্রণয়ী বলিতেছে—"I claim you still, for my own love's sake"—"আমারি প্রেমের জন্য আমি এখনও তোমার পরে দাবী রাখি। হয়ত আরো অনেক জীবনের ভিতর দিয়া আমাদের মিলন বিলম্বিত হইবে, বিচিত্র জগতের পথে হয়ত আমাকে চলিতে হইবে —তবু একদিন তোমাকে পাইবার সময় আসিবেই।" তাই, এই যুগল প্রেম দ্বন্দ্বাত্মক বলিয়াই ভোগের জন্য যখন দেহ মন ব্যাকুল—'প্রতি অঙ্গ কাঁদে প্রতি অঙ্গ তরে'—তখন ভোগের মধ্যেও জাগে ভোগ-বিরতি, জাগে বৈরাগ্যের সুর। আবার সেই ভোগ-বিরতির অবস্থায় অপূর্ব্ব মানস সম্ভোগ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য যুগল প্রেমের কবিরা যুগলের এই দ্বৈত, যুগলের এই দ্বন্দ্বের লীলা ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন। এই সুরটার সকল পর্দ্দাই তাঁদের কাব্যে পূর্ণ-স্ফুট—এ সুরের কোন গমক বা কোন মূর্চ্ছনা তাঁরা বাদ্ দেন নাই। দ্বৈতের এই সুর কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের 'এক-তারা'তেও দিব্য বাজিয়াছে। কিন্তু সেই খানেই তাঁর নূতনত্ব নয়, তাঁর বিশেষত্বও নয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে সকল যুগল প্রেমের কবি গান গাহিতেছেন, তাঁদের সঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের একটা জায়গায় পার্থক্য দেখিতে পাই। তাঁরা যুগলের দ্বৈততত্ত্বকেই চরম বলিয়া মনে করেন না। দুয়ের মধ্যেই দুয়ের শেষ তাঁরা দেখেন না। আমি এড্‌ওয়ার্ড কার্পেণ্টার, জর্জ্জ উইলিয়াম রাসেল (এ, ই,), ল্যাসেলিস্ এবারক্‌ম্‌বি প্রভৃতি অত্যন্ত আধুনিক কবিদের কথা বলিতেছি। তাঁরা যুগল প্রেমের দ্বন্দ্বাত্মক লীলার পরিণতি ও পরিসমাপ্তি দেখিতে পান্ অদ্বৈত প্রেমে বা একের অনুভূতিতে। যুগল প্রেমের সমস্ত সীমাবদ্ধ বাসনা, কামনা, বিরহ, মিলন, তৃপ্তি, অতৃপ্তি,—সেই এক, সেই অখণ্ড, সেই অনন্তের মধ্যেই চির-পরিণাম খোঁজে।

হঠাৎ মনে হইতে পারে, যাহাকে সেই এক, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, অনন্ত বলা যাইতেছে, তিনি বুঝি ঈশ্বর। একেবারেই না। যুগল প্রেম যে এক-প্রেমের মধ্যে আপনার উপ-লব্ধির চরমতাকে খোঁজে, সে এক—যুগলেরই এক। সে এক—দুই মিলিয়া এক। দুয়ের কেন্দ্রগত এক। দুয়ের পরিণত এক। যে ভাবেই ইহার ব্যাখ্যা করিনা কেন, দুয়ের মধ্যেই সেই একের রহস্য বিরাজিত। তাকে পাইলেই দ্বৈতের দ্বৈত মেটে, নহিলে দ্বৈতের চক্রে কখনো তৃপ্তিতে কখনো অতৃপ্তিতে, কখনো সুখে কখনো দুঃখে, কখনো মিলনের মধুরতায় কখনো বিচ্ছেদের বেদনায়, ঘুরিয়া মরাই সার হয়। দ্বৈত প্রেমে ব্রাউনিংয়ের ভাষায় —"Infinite passion and the pain

of finite hearts that yearn"—সীমাবদ্ধ বাসনাশীল হৃদয়ের কেবলি অনন্ত ব্যাকুলতা এবং কেবলি অনন্ত যাতনা। কিন্তু সেই একে যখন দ্বৈত মেটে, তখন সে এক তুরীয় বা স্থিতিশীল এক থাকে না। সে একও বিচিত্র গতিশীল এক (dynamic unity)। তাহা "বিশ্বচেতন প্রেম"। তাহা দুইকে এক করিয়া, এককে আবার বহুর দিকে লইয়া যায়। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, সে একের তুরীয় অদ্বৈত স্বরূপ (statical Absolutism) থাকে না, সে একের স্বরূপ গতিশীল বহু (dynamical Pluralism) হইয়া উঠে। কবি দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণের মধ্যে আধুনিক কবিতার এই গতিশীল একের সুরও পাইয়াছি বলিয়াই তাঁর 'একতারা'কে যুগল প্রেমের এক পরমাশ্চর্য্য, পরম রহস্যময় ইতিহাস বলিয়া আদর করিতেছি। যুগল প্রেমের স্বরসপ্তকের কোন গ্রামই তাঁর কাব্যে রণিত হইতে বিরত হয় নাই। তাঁর কাব্যে ভিক্টোরীয় যুগের সুরও যেমন আছে, তাঁর কাব্যে আধুনিক যুগেরও সুর তেম্নিই আছে। তাঁর কাব্যের আরম্ভটা সে যুগে এবং সমাপ্তিটা এ যুগে।

(২)

প্রথমে তাঁর কাব্যের পুরাণো সুরটারই আলাপ শোনা যাক্,—অবশ্য তাঁর অনুভূতিতে সে সুরও নবীন হইয়া উঠিয়াছে। যুগলের পরস্পরের রহস্যের অন্বেষণের দিক্‌টা তাঁর কাব্যের আরম্ভভাগে দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কাব্যহিসাবে এ হচ্চে পূর্ব্বরাগের কথা। আমরা ইহাকে পথের কথা বলিতে পারি। পরস্পর পরস্পরকে দুইটা নবাবিষ্কৃত জগতের মত পাইয়া তার নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে লাগিয়াছে। এখানে জানিয়া যেটুকু তৃপ্তি আসে, না-জানার জন্য তার চেয়ে ঢের বেশি অতৃপ্তি জাগে। আবার জানার মধ্যে কত লুকোচুরি, কত ছদ্মবেশ, কত আত্মপ্রতারণা—সেগুলিও জানিতে হয় এবং সেগুলিকে জয় করিয়া ও অতিক্রম করিয়া তার চেয়ে সত্য-তর নিত্যতর জানাকেও জানিতে হয়। এই যে একটা মনুষ্য-হৃদয়ের অজানা জগতের গিরি-নদী-হ্রদ-অরণ্য-সমুদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে যাত্রা, এইটেই যুগল প্রেমের পথের কথা, এই হচ্চে যুগল প্রেমের পূর্ব্বরাগের কথা।

কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ যৌবন বয়স পার হইয়া তারপর প্রেমের কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছেন বলিয়া তাঁর এই পূর্ব্ব-রাগের কথা, বা পথের কথা স্মৃতির কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্মৃতিটা বেশ তাজা আছে স্বীকার করি, তবু ত সেটা স্মৃতি। তাঁর যৌবনটা তাই মানস যৌবন। তাঁর "যৌবন-চোর"-প্রেম যৌবনের সব আবেশ, সব রং, সব মাধুরীকে, সেই মানস-বনে চিরপুষ্পিত করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই নূতন করিয়া সেইখানে সেই অমর যৌবনকে অনুভব করিয়া কবি প্রেমের নূতন অন্বেষণে চলিতেছেন।

"দোঁহাকার এক প্রেম দুটি যৌবনের পাখে
উড়ে যে সুদূরে,
বাসনার স্বর্গ সেই নহে কিগো দোঁহাকারি
অন্তরের পুরে?"

তাই দেখিতেছি, কবি তাঁর "জীবন-যাত্রা"র অনেকটা পথই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর এ জীবনযাত্রার সবটাই সাম্‌নের দিকের যাত্রা নয়, এর অনেকটাই পিছনের দিকে বিলম্বিত।

"তোমার মনোবনের পথে জীবনযাত্রা মোর
ঝিল্লিমন্দ্রে ঘনায় মোহ নিবিড় নিশি ঘোর।"

এই অজানা আধার দেশের ভিতর দিয়া 'জীবনযাত্রায়' একটি মাত্র আশ্বাস এই যে :—

"আঁধার পথের পথিক আমি
যাব যেথায় হঠাৎ থামি
দেখবো বিপুল দেউল শিরে সোণার
আলো রাজে"

এবং তথায়—

"কোন্ দেবতা সিংহাসনে?
তুমিই সে যে তুমি!"

সমস্ত জীবনব্যাপী প্রেমের অন্বেষণের পর যাকে অন্বেষণ করা যাইতেছে তার সন্ধান মিলিবেই, এই ভরসা না থাকিলে কে এত খোঁজাখুঁজি করিত!

এই কবিতাটি ব্রাউনিংএর 'Love in a life' কবিতাটি স্মরণ করায়; যদিচ তার উপমা এবং ধরণ ধারণ একেবারেই স্বতন্ত্র। সেখানে উপমাটা এই যে, একজন প্রণয়ী একটা বাড়ীর ঘরের পর ঘরে প্রিয়াকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেছে না। কোন ঘরে তার চুলের সুবাস পায়, মুকুরে তার নিশ্বাস-চিহ্ন দেখা যায়—যেন মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সে সেখানে ছিল! কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসে, তবু খোঁজ মিলে না। সে ভরসাও ছাড়ে না, দরজার পর দরজা তার কাছে কেবলি খুলিয়া যাইতেছে এবং সেই প্রেমের নিভৃত গোপন ভবনের সব রহস্যই সে দেখিয়া লইতেছে।

তার চেয়েও এ কবিতাটা সাঁতবাভের 'Oh Desert of the Heart' কবিতাটি মনে আনিয়া দেয়।

সে কবিতাটির ভাব এই :—প্রেমের পথ যখন মরুভূমি হইয়া গেছে এবং হিহি করিতেছে, তার উপর শীতের বাতাস, যখন কোথাও আশ্বাসের চিহ্নমাত্র নাই—তখন মন এই কথাই বলে যে এ সব পার হইয়া এমন কোন একটি শীতল কুঞ্জে পৌছান যাইবে যেখানে নির্ঝর সতত উচ্ছ্বসিত হইতেছে, যেখানে শুধু উসর ধূসর মরুবালুকার অন্তহীন পাণ্ডুর বিস্তার আর নাই।

কিন্তু প্রেমের এই যে ব্যাকুল বিষাদ-পূর্ণ অন্বেষণ, এই যে সুদীর্ঘ অভিসার যাত্রা—ইহার ভিতরে ঐ প্রাপ্তির আশ্বাস বা ভরসা জাগিতেই পারিত না, যদি প্রেমটাই বিশুদ্ধ প্রেম না হইত। প্রেমের ছদ্মবেশ অনেক রকমের আছে, সেগুলি যখন দেখা দেয় বা ধরা পড়ে, তখন ঐ খোঁজা আরো বিলম্বিত হয়, পথ দীর্ঘতর হইয়া ওঠে। আমাদের প্রকৃতির ভিতরকার সেই ছদ্মবেশগুলো যে কি ভীষণ তারই ছবি আঁকিয়াছেন আধুনিক রুশ নাট্যকার এন্‌ড্রিফ তাঁর "Black Maskers"—"কালো মুখোসওয়ালা"-নামক নাট্যে। ভিতরকার সেই কঠিন বাধাগুলা যে কত বিরূপ আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে

পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহা ব্রাউনিংএর "Childe Roland to the Dark Tower Came" কাব্য পড়িলেই আশ্চর্য্য-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ এই পথের বাধার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছেন—তার নাম 'ছদ্মপ্রেম'।

"তোমায় ভালবাসার ছলে সেদিন আমি শুধু
কেবল ভালোবাসিনু আপনারে;
তোমার গলে পরানু মালা, আপনি হ'য়ে চোর
আড়াল হ'তে করিনু চুরি তারে।"

কিন্তু এই কবিতাটিতে ছদ্মতার ইঙ্গিত মাত্র আছে, ছদ্মতার সব রূপ এখানে ফোটে নাই। বরং তার পরের কবিতা "দেবতার আবির্ভাবে" ভিতরকার বেদনার হাহাকারময় চির-জ্বালাময় প্রাণের একটা গোপন কালো অংশ একটুখানি খুলিয়া আসিয়াছে। কবিতাটি অপূর্ব্ব। তার ভাব এই যে, প্রিয়তমার পায়ে কবি তাঁর সাত মহালা পুরীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কবিপ্রিয়ার মন ভরিল না। কারণ, এখনও কবি দেখান্ নাই একটি 'জীর্ণঘর রুদ্ধ চিরতরে,' যেখানে—'যুগান্তের ধূলিরাশি তারে ফেলিয়াছে ঢাকি'। তিনি প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'এত রত্ন এত ফুলহার' ফেলিয়া সেই আঁধারের বক্ষ জুড়িয়া যেখানে 'অনাদি দুঃখ' বিরাজিত, সেখানে তুমি যাইতে চাও কেন? সেই ঘরের দরজা তো যুগযুগান্তর ধরিয়া কেহই খোলে নাই—সেই দরজা আজ তুমি খুলিতে চাও কেন? কিন্তু সেই কালো ঘরটাই তো প্রেমের সব চেয়ে কামনার বস্তু; সেই ঘরের দরজাই যদি বন্ধ থাকে তবে প্রেম আর করিল কি?

জন্ মেইস্‌ফিল্ডের 'Death Rooms,' 'মৃত্যুর ঘর' নামক একটি কবিতা আছে। সেই কবিতাটিতে তিনি বলিতেছেন যে, 'আমার আত্মার অনেকগুলি পুরাণো জীর্ণ ঘর আছে, সেই সব ঘর মৃত্যুর দ্বারা অধিষ্ঠিত। কিন্তু আমার প্রিয়া সেগুলি কখনো দেখিবে না, তার চরণ সেখানে কখনই পড়িবে না।' দ্বিজেন্দ্রনারায়ণও সেই Death Roomsএর কথাই বলিয়াছেন; শুধু তাঁর মুখে এই জোরের কথা মিলিল যে, আমার প্রিয়া সেগুলি না দেখিয়া ছাড়িবে না, তারই চরণ সেখানে সর্ব্বাগ্রে পড়া দরকার। নহিলে আমার উদ্ধার কোথায়?

এমন একটা আশ্চর্য্য প্রেমের কবিতা আমি বাংলা কাব্যসাহিত্যে পড়ি নাই। সকল কবিতার মধ্যেই এই একটি গভীর সুরের সাড়া পাই—ইহা হইতেই বুঝিতে পারি যে কবির কাছে প্রেমের বাস্তবতা কতখানি সত্য! 'প্রেম ও যৌবন' কবিতা-টিতে তিনি যৌবনের চঞ্চল ভোগপূর্ণ প্রেমের ছবিটা বেশ ভাল করিয়াই আঁকিয়াছেন, অথচ ইহাও বুঝিয়াছেন যে, সে জিনিস চিরন্তন নয়, সে ক্ষণিক। 'ভোগবতীর চপল লীলা কোন্ মরুতে হয় যে হারা'। কিন্তু 'মন্দাকিনীর অমল ধারা' তো আর হারাইয়া যাইবার নয়।

অগস্ত ব্রিজোঁর একটা কবিতা আছে 'In praise of women'—তাতে গোড়ার দিকে তিনি তাঁর প্রিয়ার রূপ বর্ণনা দিয়া

সুরু করিয়াছেন। কিন্তু একদিন যখন বিষাদে তাঁর হৃদয় ভগ্নপ্রায়, যখন কোথাও কোন সান্ত্বনা নাই,—'Then woke thy hid beauty in the midst of my sorrow'—তখন সেই বিষাদের মধ্যে প্রিয়ার গোপন সৌন্দর্য্য বিভাসিত হইল। তাই কবিতার শেষের দিকে তিনি বলিয়া-ছেন যে নারীর দুই রকমের সৌন্দর্য্য—'a visible beauty and a beauty unseen'—এক দৃশ্য রূপ আর এক অদৃশ্য রূপ। দৃশ্য রূপ ভোগের বস্তু, অদৃশ্য রূপ পূজার বস্তু।

সেই অদৃশ্য রূপ চোখে পড়ে না বলিয়াই কবি তাঁর অন্বেষণের পালায় প্রেমকেই 'অস্বীকার' করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে 'লোকের মুখের শোনা কথার আল্‌গা জানায় জানবো না'। আমি শেষ পর্য্যন্ত জানিব, নহিলে তোমাকেই অস্বীকার। 'অল্প সুখের লোভে আমি দুয়ারে কর হান্‌বো না।'

(৩)

অন্বেষণের যে সুর, উপলব্ধিরও সেই সুর। দ্বৈত প্রেমের উপলব্ধি প্রেমের সকল দ্বৈত বা দ্বন্দ্বভাবের সমাধানের জন্য ব্যাকুল। প্রেমের একটা দিক্ দূরের, অন্যদিক নিকটের; একটা দিকে তাহা ব্যাপ্ত হইতে চায়, অন্যদিকে তাহা একটিমাত্র আধারে আপন উপভোগকে নিবিড় করিতে চায়। তার একটা দিক দেহের, অন্য দিক্ দেহাতীতের। একদিকে, তার সীমার রূপ, অন্যদিকে অসীম রূপ। তার ত্যাগে ভোগ, ভোগে ত্যাগ; মিলনে বিরহ, বিরহে মিলন; দেশকাল নহিলে তার নয় অথচ দেশকালহীনের জন্যও তার ব্যাকুলতা। উপলব্ধির এই বৈচিত্র্যের সুরগুলি কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের অনেক গুলি কবিতার মধ্যে পাই। কয়েকটি কবিতার নমুনা দিই।

"বিরহ ও মিলন" কবিতাটিতে কবি মিলনের পরম মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছেন যে, তাঁর বিরহের প্রিয়াকে দূরে ফেলিয়া আসিয়া তিনি নিকটের প্রিয়ার মিলন সম্ভোগ করিতেছেন। তাই বিরহের বেদনা মিলনের আনন্দকে ম্লান করিয়া দিতেছে।

"আকাঙ্ক্ষিত মিলনের মাঝে
প্রাণে ব্যথা বাজে,
মরমের গোপন গভীরে
কোন্ ভৈরবীর ব্যথা কেঁদে কেঁদে ফিরে
উদাস বিষাদে ভরে মিলনের গান।

* * *

"ওগো প্রিয়া—হে অন্তর-রাণী,
আপনারে ছাড়াইয়া কেমনে না জানি
মিশে গেছ নীলাভ্রের সর্ব্ব প্রান্ত-শেষে,
কোন্ আলিঙ্গন মোর যাবে সেই দেশে?"

প্রেমের দূর ও নিকটকে এক সুরে গাঁথিতে না পারিলে তার আর শান্তি নাই। সেইজন্য "মিলন" কবিতাটিতে কবি, প্রিয়ার সহিত তাঁর মিলন আর বিশ্বের সহিত তাঁর মিলন, এই দুই মিলনকেই—এক পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলিয়াছেন।

"এ মিলন কি মিলন তব শুধু আমার সনে?
ঐ যে উহার বুকের তলে
সব গগনের তারা জ্বলে,
সব কাননের ফুলের গন্ধ ভাসচে সমীরণে।"

* * *

"এ মিলন যে তীর্থ পরম নিখিল ভুবনের"

* * *

"তোমার আমার প্রেমের ডোরে
নিখিল ভুবন বাঁধা"।

তারপর প্রেমের মিলনে শুধু তো দুটি আত্মার মিলন হয় না, দেহের মিলনও সেখানে আত্মার মিলনের চেয়ে কম নয়। মিলনের পরিপূর্ণতায় দেহ বড় কি আত্মা বড়, এ প্রশ্নের কোন স্থানই থাকে না—কেননা শুধু আত্মাতেও মিলনের পূর্ণতা নাই, শুধু দেহেতেও নাই। ব্রাউনিং এ তত্ত্ব খুবই বুঝিয়াছিলেন, তাই 'র‍্যাবি বেন্ এজ্‌রা' কাব্যে তিনি লিখিয়াছেন—'nor soul helps flesh more now than flesh helps soul'—আত্মা যে দেহকে বেশি সাহায্য করে কি দেহ আত্মাকে বেশি সাহায্য করে তা বলা যায় না। 'ফেরিস্তাজ্ ফ্যান্‌সিস্' নামক তাঁর কাব্যে—'Not with thy soul, O Love' একটি গীতি-কবিতায় তিনি বলিতেছেন যে, শুধু আত্মা দিয়া ভালবাসিয়া আমার সব তৃপ্তি হয় না, আমাকে দেহ দিয়াও নিবিড় করিয়া ভালবাসিতে দাও। তখন—"Sense quenching soul"—দেহ আত্মার সব ক্ষুধার শান্তি করিয়া দিবে।

সেই দেহ ও আত্মার পরিপূর্ণ মিলনকে কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ "পরম মিলন" নাম দিয়া আর একটি পরম সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন।

"দেহের দ্বারে প্রাণের নিতি
আর্ত্ত আকুল হানাহানি,
সেদিন লাজে হান্‌ত হিয়া,
বুঝেছি আজ—কি সেই বাণী!
তোমার আমার দেহে জাগে
অনু কত লক্ষ কোটি,
উপবাসী সবাই যে তার
পরশ লভি ধন্য ক'টি।"

এমনি করিয়া যে-প্রেম সব দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে করিতে চলে, তার কাছে মৃত্যুভয়টা কিছুই নয়।

"ভয় তো শুধু আপন মাঝে—
আপন পরে অবিশ্বাস,
ভয় যে শুধু মূঢ় প্রাণের প্রেমের
প্রতি পরিহাস।
"তুমি আমায় যা পেয়েছো সে পাওয়া
কি অমনি পাওয়া
সে যে আমার তোমার মাঝে তত
খানিই হ'য়ে যাওয়া।

* * *

"নিত্য-মুখর ঊর্ম্মি-চপল কল্লোলিত
প্রাণ-সাগরে,
ঝাঁপিয়ে আমি পড়েছিলাম তিলেক তরে
ভয় না ক'রে;
তাইতো তোমায় পেয়েছিগো রবি
শশীর আলোর দেশে,
যেটুক্ তোমার প্রাণের লীলার ঢেউয়ে
ঢেউয়ে বেড়ায় ভেসে।
তেমনি আবার তোমায় পাবো,
পাবো তোমায় অচঞ্চলে,
পাবো তোমায় স্তব্ধ গভীর ওই
মরণের সিন্ধুতলে।"

এই কবিতাটি ব্রাউনিংয়ের "Never the time & the place" নামক মৃত্যুজয়ী

প্রেমের কবিতাটি মনে পড়াইয়া দেয়। ব্রাউনিং সেখানে জোরের সহিত বলিতেছেন:—

"Do I hold the past
Thus firm & fast
Yet doubt if the future
hold I can?"

আমি যদি অতীত সম্বন্ধে এমন নিশ্চিত ও সুদৃঢ়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ করিবার কারণ কি থাকিতে পারে? "This path so soft to pace shall lead Thro' the magic of May to herself indeed!"

এই কোমল সুন্দর পথ বসন্তের সকল মোহন ইন্দ্রজালের ভিতর দিয়া আমায় আমার হারানো প্রিয়ার কাছেই লইয়া যাইবে।

(৪)

এ পর্য্যন্ত গেল পুরানো সুর। বইখানির শেষের দিকে নূতন সুর ফুটিয়াছে—সেইখানেই আধুনিক যুগের কবিতার সঙ্গে ইহার নাড়ীর যোগ দেখিতে পাই। এ যুগের কবিদের কাছে সব চেয়ে বড় রহস্য যৌন সম্বন্ধের রহস্য (sex-mystery)। পতিপত্নী, নায়ক-নায়িকা, এ-সব লৌকিক সম্বন্ধের আবরণ খসাইয়া শুধু স্ত্রী এবং শুধু পুরুষকে তাদের অনাদি সম্বন্ধের চির রহস্যে নিমগ্ন করিয়া তাঁরা উপলব্ধি করিতে চান্। আবার যৌন সম্বন্ধের প্রধান আধার যে দেহ—তারও আবরণ ঘুচাইয়া কেবলমাত্র অনাদি যুগলের রহস্যকে—চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারীর সম্বন্ধ-রহস্যকে—অনুভব করিতে চান্। এ যুগল কোথা হইতে আসিল, এ যুগলের রহস্যের শেষ কোথায়? এই প্রশ্নই আধুনিক কবির সব চেয়ে বড় প্রশ্ন।

"দেশকালাতীত" কবিতায় কবি বলিতেছেন "পতি নহে পত্নী নহে, কেবল তুমি আমি"—"দুই চেতনা দোঁহে মিশে ছুট্‌ছে দিশাহারা দিশে"। "তুমি আমি" কবিতায় লিখিতেছেন যে, এক নিমেষে তোমার আমার জন্ম হইয়াছিল। তার আগে তুমি স্বপ্ন ছিলে, আমার চেতনাও অস্ফুট ছিল। দুজনের মিলনে মায়া মিলাইয়া গেল, দুজন দুজনকে দেখিলাম। আমি ভিন্ন তুমি নাই, তুমি ভিন্ন আমি নাই। "দোঁহার মাঝে দোঁহার বিকাশ রাত্রি দিনে।" কবিতার নাম যদিও তিনি দিতেছেন "আমি তুমি," কিন্তু এ আমিও আমি নয় এবং এ তুমিও তুমি নয়। কে আমি, কে তুমি, তাহা নির্ণয় করিবে কে?

ইংরেজ কবি স্যামুয়েল ওয়াডিংটনের একটা কবিতায় আছে যে, প্রেম যখন প্রেমের দ্বারে আসিয়া ঘা দিল, তখন ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, কে তুমি? বাহির হইতে প্রেম উত্তর দিল 'আমি'। কিন্তু ভিতরের প্রেম দরজা খুলিল না। আবার প্রেম আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল। এবারও ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, কে তুমি? তোমার নাম কি? বাহির হইতে প্রেম উত্তর দিল, "আমি তুমি"। তখনি দরজা খুলিয়া গেল, "and love's mystery told"—প্রেমের রহস্য বর্ণিত হইল।

"ব্যবধান" নামক আর একটি পরমাশ্চর্য্য

কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, তুমি-আমি'র মধ্যে এতটুকু ব্যবধানের ভার সহ্য হয় না; 'চিরযুগের প্রীতি'র স্মৃতির ভার সহ্য হয় না; জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতির আবরণ সহ্য হয় না; এমন কি দেহের ব্যবধানও সহ্য হয় না।

কবিতাটি পড়িয়াই মনে হইল যুগল রহস্যের এমন কবিতা আর কোথায় পড়িয়াছি? ল্যাসিলিস্ এবারক্রম্‌বি'র "Emblems of love" কবিতাটি মনে পড়িল। সেই কাব্যে অনাদি "He" পুরুষ এবং অনাদি "She" নারী নিজেদের যৌন আকর্ষণের রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত। তারা বুঝিতেছে যে এক অখণ্ড আনন্দ "আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ"—সেই অদ্বৈতেরই তারা দ্বৈত, পুনরায় সেই অদ্বৈত হইবার জন্য তাদের ভিতর হইতে তাগিদ্ জাগিতেছে। "contrived joy is sex in life"।

(৫)

কিন্তু এই রহস্যের মেঘলোকেই এ কাব্যের সমাপ্তি হয় নাই। সর্ব্বাবরণমুক্ত যুগলের অপূর্ব্ব রহস্য-উপলব্ধিতেই কবির যুগল প্রেমের গান শেষ হয় নাই। সেই মেঘলোক হইতে তাঁর প্রেমকে মর্ত্ত্যে অবতরণ করাইয়া তাকে সফল করা দরকার। দুই দিক্ হইতে 'সফল প্রেমে'র কথা তিনি বলিয়াছেন। এক সফলতা—সন্তান সন্ততির মধ্যে। প্রেম সেইখানে চির-অমর। 'মোদের ছেলে মেয়ের মাঝে মোদের জীবন ধারা বহে।' কিন্তু তার চেয়েও বড় সফলতা যখন প্রেম "বিশ্ব-চেতন প্রেম" হয়—যখন প্রেম এই কথা বুঝে যে সর্ব্বমুক্তি বিনা কারো একলার মুক্তি নাই। জগতের যত বন্ধন, যত বেদনা, যত অশান্তি, যত ক্ষুধা, যত হাহাকার—সেই সমস্তকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে তবেই যুগল, দ্বৈত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে। দ্বৈত হইতে মুক্তি পাইতে গেলে প্রথমে দুয়ের মধ্যে এককে অনুভব করিতে হয়। কিন্তু এককে অনুভব করার পর সেই একের মধ্যে বহুর অনুভূতি আসে। সেই বহুর অনুভূতির কথাই 'বিশ্বচেতন প্রেম' কবিতাটিতে জাগিয়াছে।

"তোমায় আমি বাসবো ভালো
বাস্‌বে তুমি মোরে
এইতো ছিল কথা—
কোথা হ'তে পড়লো এসে
হায়গো কেমন ক'রে
সব জগতের ব্যথা।"

* * *

"পরম অভিষেক যে প্রেমের সবার আঁখিজলে
নিখিল হৃদয়পুরে।"

এই বহুর চেতনাতেই যুগল প্রেমের কাব্য সমাপ্ত। অতএব আমিও এইখানেই এ কাব্যের পরিচয়ের কথা শেষ করিতে পারি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ভারত-রমণীর অবস্থার উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

ভারত-রমণীগণের এই প্রকার অবস্থা। পার্সী-রমণী ব্যতীত, অধিকাংশ রমণীই কুসংস্কারাপন্না, অজ্ঞ। পুরুষরা প্রায়ই তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করে, তাহারা প্রায়ই হতভাগ্য ও অ-সুখী।

নারীর অবস্থা উন্নত করিবার জন্য ইংরেজ ও ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকেরা খুব উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন।

দৈহিক অবস্থা।—এই সম্বন্ধে, লেডি ডফরীনের কাজটাই সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য। কোনও ডাক্তার, মুসলমান মহিলা অথবা হিন্দু-মহিলার নিকটে যাইতে পারে না বলিয়া, লেডি ডফরীন ভারতের বড়-বড় নগরে, নারীদিগের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন, একটি ডাক্তারণী-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই সকল ডাক্তারণী হাসপাতালে কাজ করেন, অন্তঃপুরে রোগী দেখিতে যান। (১)

মানসিক অবস্থা।—রমণীদিগকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য, কতকগুলি য়ুরোপীয় ও কতকগুলি হিন্দু মহিলা অন্তঃপুরে বা অন্দরমহলে যাতায়াত করেন। কতক-

(১) রোগগ্রস্তা ভারত-রমণীরা,—গাছ-গাছড়া বিক্রেতা ও ওঝাদিগের শরণাপন্ন হয়; ধাত্রীরা "ধাই" নামে অভিহিত হইয়া থাকে: বলা বহুল্য, উহারা চিকিৎসাশাস্ত্র ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই কারণেই, অন্তঃপুরের মধ্যে মৃত্যুর হার এত বেশী। তাই সদ্যপ্রসবা রমণীদের মধ্যে সূতিকা-জ্বর প্রায়ই হইয়া থাকে। শিশুহত্যা প্রচলিত:—একজন বৃদ্ধা ধাই শত শত নবজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া কবুল করিয়াছিল।

লেডি ডফারীণের কাজটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, লাহোর, আগ্রা, কলিকাতা, মাদ্রাজ, উদয়পুর, অল্‌ওয়ার, দ্বারভাঙ্গা, নাগপুর, রেঙ্গুন, মহীশূর, হইদ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের কার্য্য "ভারতরমণীর চিকিৎসার সাহায্যার্থ জাতীয় সভা" কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। যাহারা রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষা করে তাহারা কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত যথা:—ডাক্তারণী ("ইংলণ্ডের বা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ); সহকারিণী ডাক্তার (assistant surgeon এবং হাসপাতালের সহকারিণী (hospital assistant)।

১৮৯১ অব্দে ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৭,৬৬২; সাক্ষর রমণী ৫৪৩,৪৯৫; নিরক্ষর রমণী ১২৭,৭২৬,৭৬৮। ১৯০০-০১ অব্দে, স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা, ব্রহ্মদেশে (৩৮,৪৪৩); আসামে (৮,৭৬৯); বঙ্গদেশে (১০৩,৬৬১)· সম্মিলিত প্রদেশে (২১,৩১৪); পঞ্জাবে (২৩,৬৭০); বোম্বাইএ (৮৯,৭৪৫); মধ্যপ্রদেশে (১১,২০৮) মাদ্রাজে (১২৮,০৭৩)। স্কুলে-যাওয়া বালিকা ও বালকের অনুপাত:—য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গি-দের মধ্যে (১ হইতে ১০৭); নেটিভ খৃষ্টানদের মধ্যে (১ হইতে ১,৬৯); পার্শীদের মধ্যে (১ হইতে ১,৯৫) হিন্দুদের মধ্যে (১ হইতে ১০,৪৭), মুসলমানদিগের মধ্যে (১ হইতে ১১,১২); বঙ্গ-মুসলমানদিগের মধ্যে (১ হইতে ২০,৯৯)।

গুলি ভারতবাসী তাঁহাদের মেয়েদিগকে স্কুল কিংবা কালেজেও পাঠাইয়া থাকেন। অবশ্য শিক্ষার কাজ খুব মন্থর গতিতেই চলিতেছে। ১৮৯১ অব্দে শতকরা ১০০ জন হিসাবে ৯৯, ৫২ জন একেবারেই নিরক্ষর। ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে ৪২৫, ৭৬৯ জন বালিকা সরকারী কিংবা বে-সরকারী স্কুলে গমন করে; ১৯০০-১৯০১ অব্দে ৪২৯, ৬৪৫ জন। সেই বৎসরেই ৪৪, ৬৩৬ জন বালিকা মাধ্যমিক শিক্ষা, ১৭১জন উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। পক্ষান্তরে কতকগুলি ভারত-মহিলা ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। (২) অনেকগুলি সংবাদ-পত্র কেবল রমণীর দ্বারা পরিচালিত, তন্মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য "বাঙ্গালী" *

সামাজিক অবস্থা।—শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে, অবরোধ ততটা কড়াকড় ভাবে রক্ষিত হয় না। রমণীরা থিয়েটারে গিয়া গরাদে-ঘেরা "বাক্স"-আসনে উপবেসন করে; উহাদিগকে রাস্তায় দেখা যায়, দোকানে দেখা যায়, সরকারী উদ্যানে দেখা যায়, প্রদর্শনীতে দেখা যায়। উচ্চবর্ণের রমণীরা যে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে তাহা ততটা লম্বা নহে, ততটা মোটা নহে। পার্শী-রমণীরা বোম্বাই-নগরে একটা ক্লব্ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতায় কতকগুলি হিন্দু-মহিলা গাড়ী হাঁকান, ঘোড়ায় চড়েন, হোটেলে আহার করেন, বড়লাটের অভ্যর্থনা-সভায় গমন করেন।

* *
*

রক্ষণশীল দলের লোকেরা এই য়ুরোপীয় রীতি-নীতির অনুকরণ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি মাদ্রাজের কোন-এক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল (১৮৯৩):—

এই যুবকবৃন্দ ফ্যাশানের ভক্ত, লঘু আমোদ-প্রমোদের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা এমন ভাবে নিজ পত্নীদের শিক্ষা দেয় যাহাতে তাহারা তাহাদের যোগ্য সঙ্গী হইতে পারে। তাহারা স্ত্রীর সহিত একসঙ্গে উপন্যাস নাটকাদি পাঠ করে এবং এইরূপ ধরণের উপন্যাস ও নাটক যাহাতে অতীব হীনচরিত্র নায়কের প্রেমলীলা অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে; নির্দ্দোষ অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের রুচি কলুষিত করিবার ইহা অপেক্ষা উত্তম উপায় আর কি-হইতে পারে? ইহাই সব নহে। তাহারা আপন স্ত্রী-দিগকে য়ুরোপীয় বেশ-ভূষায় ভূষিত করে, এবং একসঙ্গে বিদেশী খাদ্য ভোজন করে—এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আমাদের এই তথাকথিত অগ্রসর যুবকেরা তাঁহাদের নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত পত্নীদিগকে অতিমাত্র প্রশ্রয় দেন: সুতরাং তাঁহাদের পত্নীরাও পরিবারের অন্তর্গত অন্য আত্মীয়দিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা রান্না এবং অন্যান্য ঘরকন্নার কাজকে মজুরের কাজ মনে করেন। তাঁহারা কতকগুলি সহচরীর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া নব্য কেতার সাজগোজে আপনাদিগকে বিভূষিত করিয়াই কালযাপন করেন। ঐখানেই কখন তাশ-পাশা খেলিয়া, কখন বা গল্পের বই পড়িয়া সময় কাটান্। কাজে-লাগিবার মত যদি কোন কাজ কখন করেন তো সে পশমী টুপি ও গলাবন্দ শেলাই করা;—তাও আমোদের হিসাবে করেন, প্রয়োজনের হিসাবে নহে। এই সকল জিনিষ পরিবার-মণ্ডলীর মধ্যে প্রায় কখনই ব্যবহার হয় না। ঐ সকল জিনিষ উপহারস্বরূপ বন্ধুবর্গকে বিতরণ করা হয়।

এই তথাকথিত "জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত" মহিলাদিগের আচরণ গিন্নিদিগের চোখে বড়ই খারাপ ঠেকে এবং এইরূপে গৃহের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। পরিবারের অন্তর্গত অন্য রমণী, যাঁহারা "আলোকপ্রাপ্ত" ধাঁচার লোক নহেন তাঁহারা কেবল ঘরকন্নার কাজেই ব্যাপৃত থাকেন। সুতরাং কেতা-দুরস্ত মহিলারা যে-সব কাজে হাত না দেন সেই-সব কাজ অগত্যা গিন্নীদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে...

যে-সব গুণের জন্য হিন্দু-রমণীরা প্রসিদ্ধ তাহা একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। যেখানে আত্মীয়দের প্রতি, পাড়া-প্রতি-বাসীদের প্রতি মমতা ছিল, সেই মমতার স্থান স্বার্থপরতা আসিয়া অধিকার করিয়াছে; গুরুজনের প্রতি যেখানে ভক্তি ছিল, সেখানে ঔদ্ধত্য আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের যে পরিচ্ছদ ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী ছিল, তাহার স্থান, বিলাতি বেশভূষা আসিয়া দখল করিয়াছে।"

প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুরা এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে প্রাচীন মতে শিক্ষিতা ও পরিবর্দ্ধিতা রমণীগণের প্রতিকূলতা যতটা প্রবল, পুরুষদিগের প্রতিকূলতা ততটা প্রবল নহে।

উন্নতির পথে অগ্রসর কোন এক সংবাদপত্র এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন:—

"নারীর অবস্থার উন্নতিসাধন করা যে কি গুরুতর ব্যাপার, তাহা শুধু য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে নহে, পরন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু নিজের অল্পস্বল্প সমাজসংস্কার-চেষ্টার অভিজ্ঞতা হইতেই দেখিতে পাইবেন। ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকের পথে যে ভীষণ প্রতিবন্ধক আছে তাহা জ্ঞানান্ধ শাস্ত্রের আদেশ কিম্বা জাতের খাম-খেয়ালী শাসন-নিয়ম ততটা নহে যতটা আমাদের রমণী-দিগের অজ্ঞতা। শিক্ষিত পুরুষেরা, কি শাস্ত্র, কি জাত দুইয়ের কোনটাতেই আবদ্ধ নহে; সমাজ-সংস্কারের জন্য তাঁহারা উভয়কেই অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু গার্হস্থ্য সুখের বিনিময়ে স্বকীয় প্রীতি-ভাজন ও ভক্তিভাজন আত্মীয়াদের শুভকামনা ও সাহচর্য্যের বিনিময়ে, নূতন-কিছু

(২) "হিন্দুযুবকদের শিক্ষাকল্পে কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট নারী-সমিতি," ১৮২১ (২০০ ছাত্র ১৮৩৪ অব্দে "চর্চ্চ-মিশনারি সোসাইটির স্কুল" এবং "লণ্ডন-মিশনারি সভা"। Drinkwater Bethune কর্ত্তৃক বেথুন-স্কুলের প্রতিষ্ঠা (১৮৪৯); ১৮৫৭ অব্দে এই স্কুল সরকারী স্কুলে পরিণত হয়। হিন্দু-সভ্যতার দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ১১৫) M. Bose কতকগুলি হিন্দুমহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যথা:—অহল্যাবাই, যিনি মধ্যভারতের এক রাজ্য শাসন করিতেন; নাটোর-রাষ্ট্রের রাণী ভবানী, ইত্যাদি Calcutta Review Vol LX. P. 56 এবং LVI, P P. 10-27 দ্রষ্টব্য)।

* এ সংবাদটা আমাদের নিকট ত খুবই নূতন—সুরেন্দ্রবাবু এ সংবাদ রাখেন কি?—অনুবাদক।

মর্ম্মভাব রক্ষা করিবার জন্য পিতৃপ্রভুত্ব, অ-বিভক্ত স্বত্বাধিকার আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আজিকার দিনে, ভায়ে-ভায়ে পৃথক্ হইতেছে, পিতা-পুত্রে পৃথক্ হইতেছে। একসঙ্গে বাস করিলেই, এই সম্মিলন তাহাদের নিকট ভারবহ বলিয়া মনে হয়। একসঙ্গে থাকা সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি করেন; উহাতে করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্যম-চেষ্টা অসাড় হইয়া পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ-গুণ বা শক্তি-সামর্থ্য বিলুপ্ত হয়। এতাবৎকাল কৌলিক রীতিনীতি, কৌলিক পূজা-পদ্ধতি বজায় রাখাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, উহার নিকট ব্যক্তি-বিশেষের গুণ ও প্রতিভা নগণ্য ছিল।

কিন্তু আজকাল নারীর কাজসম্বন্ধে সমাজসংস্কারকদের যেরূপ মতামত, তাহার মধ্যে এই সকল নূতন ভাবের চিত্র আরও স্পষ্টরূপে অঙ্কিত দেখা যায়।

অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ হয়—ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কি জন্য এই ব্যবস্থা? কারণ, বেশী বয়সে তাহারা নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে চলিবে, তাহা হইতে অযোগ্য মিলন সংঘটিত হইবে, এবং এই অযোগ্য মিলনের ফলে, বর্ণভেদ-পদ্ধতি বিনষ্ট হইবে।

শাস্ত্রে বহুবিবাহ অনুমোদিত। কেন অনুমোদিত? কারণ, কৌলিক ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত পুত্রের অধিষ্ঠান একান্তই আবশ্যক; প্রথম বিবাহে পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পরিবারের কর্ত্তা অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন।

শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। কি জন্য নিষিদ্ধ? কারণ, বিবাহ দশসংস্কারের মধ্যে একটা সংস্কার,—সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র অনুষ্ঠান। বিবাহের দ্বারা কন্যা, স্বকীয় ধর্ম্ম হইতে, গৃহদেবতা হইতে, গোত্র হইতে তফাৎ হইয়া পড়ে; সে নূতন ধর্ম্ম, নূতন গৃহ-দেবতা, নূতন গোত্র প্রাপ্ত হয়। এবং এই একই বিবাহিতা কন্যা, যে-গম্ভীর অনুষ্ঠানের দ্বারা সতিবংশের সহিত বিবাহবন্ধনে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়াছিল সে-সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আজ কিনা সে অন্য গৃহের দেবতাকে বরণ করিবে?

কিন্তু নারী এই তিন নিয়মকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, এইরূপ সমাজ-সংস্কারকেরা ঘোষণা করেন। কাহার নামে তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন?—স্বাধীনতার নামে, মানব-গৌরবের নামে তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন। মালাবারি আরও এই কথা বলেন:—নারীগণের সুখী হইবার যে-অধিকার আছে সেই অধিকারের নামে, তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করেন।

বংশের উদ্দেশে, সমস্ত সমাজ-পদ্ধতির উদ্দেশে, নারীকে যেরূপ বলিদান করা হয়, তাহা অনেক ভারতবাসী এক্ষণে ঘোরতর অপরাধ বলিয়া মনে করে। (৩)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩) কোঁতের "পজিটিভ্ ফিলজফি" হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার এই ভারতীয় সমাজ সংক্রান্ত আলোচনাটা শেষ করিব। (পঞ্চমখণ্ড-পৃষ্ঠা ১৮৩)

"এই সার্বভৌমিকতা ন্যূনাধিক পরিমাণে স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত এবং জাতের পদ্ধতিটাও দৃঢ়রূপে ও গভীররূপে বদ্ধমূল; ইহা হইতে আমাদের এইরূপ ভাবা উচিত যে, উহার অসুবিধা যতই হউক না

খ্যাতি

(গল্প)

রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও দেখা নাই! এক অনিশ্চিত মিতিয়া কুল্‌দরফ দ্রুত আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ভয়ে মার প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া প্রবেশ করিল। মা জানালার ধারে উঠিতেছিল। বাপ বিছানায় অন্য ছেলেদের বসিয়াছিল—এতখানি রাত্রি হইয়াছে, ছেলের লইয়া শুইয়াছিল; বোন্ কিটী একখানা

কেন, জাতের অভ্যুদয়কালে, মানবজাতির প্রধান প্রয়োজনগুলির সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য ছিল। ফলত ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, কি সামাজিক, কি মানসিক সকল বিষয়ের মূলগত ক্রমবিকাশের একটা সূত্রপাত আবশ্যক ছিল। প্রথমতঃ স্পষ্টই দেখা যায়, উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত; কারণ, আদিম কালে ইহাই খুব স্বাভাবিক যে, ব্যবসায়ের মৌলিকতা গার্হস্থ্য অনুকরণের দ্বারা, শিক্ষার একটা সহজ ও প্রবল উপায় হইয়া দাঁড়াইবে। তখনকার কালে এই উপায়টিই সুসাধ্য ছিল।

আবার শ্রুতির দ্বারাই তখন সমস্ত ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইত...

দ্বিতীয়তঃ এই স্বতঃস্ফূর্ত্তি ব্যতীত এই আদিম পদ্ধতির যে কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, তাহাও নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা যাইতে পারে। বিচার ও আচারের মধ্যে ঐ পদ্ধতি একটা-যে চিরস্থায়ী সর্ব্বোচ্চ বিভাগ স্থাপন করিয়াছিল, মানসিক ক্রমবিকাশ তাহার নিকট চিরঋণী। একটি চিন্তাশীল 'জাত' একটা বিশেষ প্রকারের উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেই সময় মানসিক ক্রমবিকাশের সূত্রপাত করিয়াছিল। কাজের পূর্ণতা ও ধারাবাহিকতা সম্পাদনের জন্য যে পদমর্য্যাদা ও অবসর আবশ্যক, উক্ত জাত স্বভাবতই সেই পদমর্য্যাদা ও অবসর লাভ করিয়াছিল।

সামাজিক দৃষ্টিভূমি হইতে দেখিতে গেলে, আদিমকালে এইরূপ পদ্ধতির সুবিধাও কম পরিস্ফুট নহে। প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগে, স্থায়িত্বই উহার প্রধান ধর্ম্ম স্পষ্টই দেখা যায়। কি আভ্যন্তরীণ, কি বাহ্য সকল প্রকার ভীষণ আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে বা সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যত প্রকার সতর্কতার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তৎসমস্তই যথাসম্ভব প্রভূত উদ্যম সহকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অভ্যন্তরে, বিভিন্ন খণ্ড-জাতগুলা, আসলে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন,—পুরোহিত-জাতের অধীনেই, তাহারা একটা সাধারণ ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কারণ তাহারা সকলেই নানাপ্রকার অভাব অনুভব করিত, এবং একমাত্র পুরোহিত জাত হইতেই তাহাদের দৈনন্দিন অভাব মোচন হইত; পুরোহিত জাত হইতেই তাহারা প্রতিদিন জ্ঞানের আলোক ও কর্ম্মের উদ্দীপনা লাভ করিত. সকল বিষয়েই পুরোহিত জাতের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের একদণ্ডও চলিত না। পরে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতের মধ্যে যেরূপ গভীর ভাবে ও তীব্রভাবে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এই শ্রেষ্ঠ জাতের অন্তর্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তি, অন্তত পুরোহিত-শ্রেণীর অন্তর্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তি, শুধু পুরোহিত ও নগরপালের কাজ করিত না, পরন্তু পণ্ডিত, কলাবিৎ, শিল্পী ও চিকিৎসকের কাজও করিত।

এই সকল উচ্চগুণসত্ত্বেও ইহা নিশ্চিত,—এই পৌরোহিতিক পদ্ধতি, সকল বিষয়েই মানব-ক্রমবিকাশের একটা সূত্রপাত করিয়া দিয়া,—পরে উহাই আবার চরম উন্নতির,—মানসিক বা সামাজিক উন্নতির বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। অতিমাত্র স্থায়িত্বধর্ম্ম-প্রযুক্ত এই পদ্ধতি ক্রমশ একগুঁয়ে ধরণের অ-চলিষ্ণুতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। উন্নতির নূতন নূতন বিকাশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের যে আবশ্যকতা আছে তাহা উহার ধারণায় আসিল না।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

নভেলের শেষ পৃষ্ঠাকয়খানার উপর সমস্ত মনটুকুকে ঢালিয়া দিয়াছিল।

মিতিয়া আসিয়া ডাকিল, "মা।"

মা চমকিয়া মিতিয়ার পানে চাহিল। মিতিয়ার মুখ উত্তেজনায় ভরা; চুলগুলা রুক্ষ, স্বর কম্পিত। মা বলিল, "কি রে, ব্যাপার কি? এতক্ষণ তুই ছিলি কোথায়, বল্ দেখি?"

"ছিলুম কোথায়!" মিতিয়া কহিল, "আশ্চর্য্য! কিছুই জান না? কোন খবর পাওনি! বল কি,—সারা র‍্যাশিয়াতে এ খবর রটে গেল, আর তুমি, আমার মা, তুমি সে খবর জানো না!"

বিস্ময়ে মা মিতিয়ার পানে চাহিয়া রহিল। কিটী নভেল ফেলিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া মিতিয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—বাপও মশারি তুলিয়া মুখ বাড়াইয়া ছেলের দিকে চাহিল।

কিটী বলিল, "হয়েছে কি দাদা? তোমার চেহারা যে ভূতের মত দেখাচ্ছে!"

"ভূতের মত!"

মা বলিল, "তা না ত কি! চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, মুখের সে শ্রী নেই! ব্যাপার কি, বল্ ত!"

মিতিয়া বলিল, "বংশের মুখ আজ আমি উজ্জ্বল করেছি, মা। বড় সৌভাগ্য আমার। সারা র‍্যাশিয়া আজ আমার নাম জেনেছে। কে জান্‌ত র‍্যাশিয়ার কোন্ কোণে কোথায় দিমিত্রি কুল্‌দরফ বলে ক্লেউ থাকে কি না! কিন্তু এখন রশিয়া আমার নাম জানে, ঠিকানা জানে, সব জানে। ওঃ—"

মিতিয়ার উচ্চহাস্যে ছোট ভাইগুলির ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহারা বিচিত্র কলরব জুড়িয়া দিল। বাপ বিছানা ছাড়িয়া মিতিয়ার কাছে আসিয়া কহিল, "কি হয়েছে, সব খুলে বল্ দেখি!"

"কি হয়েছে—! পৃথিবীর খবর তোমরা কোনদিন রাখলে না ত! জানবে কি, কি হয়েছে! আর এই কিটী, রাজ্যের বাজে নভেল পড়ছে শুধু, খবরের কাগজ কোনদিন ত একখানা পড়লে না! দেশ-বিদেশের যত বড়বড় খবর তাতে বেরুচ্ছে! যেখানে যে মস্ত ঘটনা ঘটছে, খবরের কাগজওলারা অমনি তা ছেপে দিচ্ছে, আর পৃথিবীময় সে খবর নিমেষে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুই আর কোথাও চাপা থাকছে না। যত বড় বড় লোকের খুঁটিনাটি খবর ছেপে বেরুচ্ছে আর দিক্-বিদিকে সে খবর রটে যাচ্ছে—"

বাপ বিরক্ত স্বরে কহিল, "নে, পাগলামি করতে হবে না আর, রাত হয়েছে, শুগে যা। সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আবার পাগলের মত বক্‌ছিস্, লজ্জা করছে না?"

"লজ্জা! এই দেখ তবে পড়ে। কি লিখেছে, পড়। সমস্ত র‍্যাশিয়া এ কথা জানে, আর তোমরা জানো না! নাও, পড় —পড়ে কাগজখানা তুলে রেখো, রোজ একবার করে সকলে পড়ব। মিতিয়া কুল্‌দরফ্ কত বড়লোক তা এ খবরের কাগজ পড়লেই বুঝতে পারবে।"

মিতিয়া একখানা খবরের কাগজ খুলিয়া বাপের সম্মুখে ধরিল—একটা জায়গা দেখাইয়া কহিল, "এই যে এইখানাটায় লিখেছে। পড়, চেঁচিয়ে পড়। আচ্ছা, কিটী, তুইই পড়্, বাবা মাকে শুনিয়ে পড়ে দে।"

কিটী পড়িতে লাগিল, "২৭এ ডিসেম্বর রাত্রি এগারটার সময় দিমিত্রি কুল্‌দরফ নামে এক তরুণ যুবা—"

বাধা দিয়া মিতিয়া কহিল, "দিমিত্রি কুল্‌দরফ—শুনছ? দেখছ ত—হাঁ, দিমিত্রি কুল্‌দরফ—তরুণ যুবা—কিরকম মিলে যাচ্ছে, দেখ—"

কিটী আবার পড়িতে লাগিল,—"দিমিত্রি কুল্‌দরফ্ নামে এক তরুণ যুবা একটা সরাই হইতে বাহির হইয়া আসে। মদ খাইয়া মত্ত অবস্থায়—"

"এখানটায় একটু রং ফলিয়েছে তবে আসলে ঠিক আছে। সরাই বটে, মদও বটে,—তবে সিমন আমার সঙ্গে ছিল, সে জানে, তেমন মত্ত অবস্থা নয়—পড়ে যা, কিটী, পড়ে যা—"

"—আসিতে আসিতে দুবরার সাঁকোর কাছে পৌঁছিলে হঠাৎ কেমন বেটক্করে তাহার পা পিছলাইয়া যায়। সাঁকোর উপর দিয়া তখন একখানা ঠিকা গাড়ী আসিতেছিল। পা পিছলাইয়া কুল্‌দরফ্ একেবারে সেই গাড়ীর ঘোড়ার পায়ের তলায় গিয়া পড়ে। গাড়ীর গাড়োয়ান অতিকষ্টে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইবার চেষ্টা করে! ঘোড়া কেমন ভড়কাইয়া কুল্‌দরফকে লাথি মারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী লইয়া ছুটিতে থাকে—পুলিশ অনেক কষ্টে সে গাড়ী থামায়। পরে কুল্‌দরফের কাছে আসিয়া পুলিশ দেখে, বেচারা ঘোড়ার চাট্ খাইয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে। তখন পুলিশ কোন মতে কুল্‌দরফের দেহটাকে টানিয়া তুলিয়া নিকটে এক ডিস্পেন্সারীতে লইয়া যায় এবং ডাক্তারকে দিয়া পরীক্ষা করায়। পরীক্ষায় দেখা যায়, ঘোড়া কুল্‌দরফের ঘাড়ের নীচে একটা চাট্ মারিয়াছে—"

কিটী সহসা থামিয়া মিতিয়ার দিকে চাহিল। মা সস্নেহে কুল্‌দরফের ঘাড়ে হাত রাখিলেন। কুল্‌দরফ সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমার ঘাড় দেখতে হবে না—ঘাড়ে কি পাবে কিছু? খবরের কাগজেই সব খবর পাবে'খন। পড়্ কিটী, পড়্—"

কিটী পড়িতে লাগিল,"—আঘাত সামান্যই। কুল্‌দরফের তেমন চোট্ লাগে নাই। বেচারা খুব রক্ষা পাইয়াছে। চাট্ যদি আর একটু সরিয়া লাগিত তবে বেচারার মাথার খুলি কিছুতেই রক্ষা পাইত না, ফাটিয়া যাইত।"

"হাঃ, হাঃ হাঃ!" উচ্চহাস্য করিয়া মিতিয়া বলিল, "বুঝলে মা, আমার ঘাড়ে ডাক্তার বরফ লাগিয়ে ছিল! শুনলে ত, দেখলে ত সব? কি ভাবছ? বংশের মুখ উজ্জ্বল করিনি? খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে গেছে। আর চাও কি? সারা র‍্যাশিয়া আমার নাম জেনে ফেলেছে! আর আমার কিসের ভাবনা! হাঃ হাঃ হাঃ, দিমিত্রি কুল্‌দরফ্ এখন সকলের জানা, সকলের চেনা লোক। দে, দে, কিটী, কাগজখানা পাকাস্ নি, নষ্ট হয়ে যাবে, —কাগজখানা দে। মাকারফদের পড়িয়ে আনিগে—তবে আইভালফকে এখনো দেখানো হয় নি। নাতালিয়া বসে আছে— তাকে বলে এসেছি, শীগগির আসছি, মস্ত খবর আছে! সে হয়ত শুতেও যায় নি—

আলাসিস শুতে যাচ্ছিল—এ কথা শুনে সেও নাতালিয়ার সঙ্গে বসে আছে।”

কোনমতে কথার ঝড় বহাইয়া কিটীর হাত হইতে খবরের কাগজখানা টানিয়া লইয়া কাহাকেও কোন কথা বলিবার অবসরমাত্র না দিয়া মিতিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। *

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

ভাস্কর্য্য

শিল্পকলার অমৃত-রসের সন্ধানে মানুষ চিরদিন সাধনা করে আসছে। কোনো শিল্পী সে-পথের বহুদূর এগিয়েছেন, কেউ-বা পিছিয়ে আছেন, আবার কেউ-বা মোটেই অগ্রসর হতে পারেন নি। আমাদের দেশেও বহু প্রাচীন কাল থেকে কলাবিদ্যার এই সাধনা চলে এসেছে। মাঝেমাঝে কোন কোন যুগের শিল্পের পূরোপূরি সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এখনো ভাঙাচোরা টুক্‌রো-টুকরো মূর্ত্তি বা চিত্র যা ভারতবর্ষের নানান স্থানে ছড়িয়ে আছে তার মধ্যেই ঐ সাধনার ইতিহাস বাঁধা পড়ে আছে। শিল্পের এই সাধনার পরিচয় বিশেষ-করে আমরা পাই ভাস্কর্য্য ও চিত্রের ভিতরে। ভারতীয় চিত্রের খবর প্রাচীন কালের মধ্যে যা-কিছু পাওয়া যায় তা অজন্তা, বাঘ ও রামগড়ের দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবিগুলি থেকে। ভাস্কর্য্যের নিদর্শনও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু-না-কিছু ছড়িয়ে আছে, এক-নিঃশ্বাসে সেগুলির নাম করা শক্ত। এই ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলি অবিকৃত অবস্থায় না থাকলেও এগুলিতে শিল্পীদের রসবোধ ও কলাকৌশলের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

মোটামুটি দেখতে গেলে দেখা যায় আমাদের দেশের ভাস্কর্য্য একটা convention বা একটা বাঁধি প্রথার দ্বারা শাসিত। আর্টকে কখনও একটা প্রথা দিয়ে বাঁধা চলে না সত্য, কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে, আর্টের বিকাশের পক্ষে এই প্রথা একটু সহায়তা করে। আর্ট সেখানে এই বাঁধা প্রথার চাকর নয়, এই বাঁধি প্রথাই তার তাঁবে। শিল্পের এই বাঁধি প্রথার মত Symbol বা রূপক-চিহ্নকে আর্টিষ্ট অনেক সময় বাদ দিতে পারেন না। কেননা এই রূপক-চিহ্ন শিল্পীর ভাব-প্রকাশের অনেক সহায় হয়। অনেকস্থলে শিল্পীরা সেটার ওজনমত ব্যবহার করে ভাবের চাবি খুলে দিয়ে থাকেন। তাই দেখা যায় কবিকেও এই রূপকচিহ্নের আশ্রয় নিতে হয়েচে। কবি যেমন বেণু, বীণা, তরী, তুফান, আলো ও আঁধার প্রভৃতি কথাগুলির ব্যবহারের দ্বারা সেগুলির প্রচলিত অর্থকে

* আন্তন্ শেকভ রচিত গল্প হইতে।



এলিফেণ্টার ত্রিমূর্ত্তি

অতিক্রম করে তাঁর ভাবেরই অভিব্যক্তি জাগিয়ে তোলেন, তেমনি শিল্পীরাও পদ্ম, শঙ্খ, বজ্র প্রভৃতি এবং বিশেষ বিশেষ মুদ্রার সংকেতে অনেক কথাই ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আমাদের দেশের মূর্ত্তিমান Conventional শিল্পের দৃষ্টান্তস্বরূপ ধ্যানী বুদ্ধের যে-কোন প্রতিমূর্ত্তি দেখলে, দেখা যাবে যে সেগুলি করি-কটি, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু মহাভুজ ইত্যাদি বাঁধা ছাঁদে বা ধাঁচায় বাঁধা পড়লেও সেগুলি বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রস্ফুটিত করবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেচে। কিন্তু বাঁধি প্রথা যখন আবার আর্টের পায়ের বেড়ির মত হয়ে পড়ে, তখন তার পরিণাম বড়ই শোচনীয় হয়। তার সাক্ষী আমাদের দেশের মৃন্ময় প্রতিমাগুলি। সেগুলি আবহমান কাল একই ছাঁদে দেখা দিচ্চে এবং পুরোহিতেরা তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেও প্রাণের কিছুমাত্র পরিচয় দিচ্চে না। আবার, আমরা প্রাচীন ভাস্কর্য্যের মধ্যেও যখন সিংহলের কপিল ও কোন তামিল সাধুর মূর্ত্তি পাথরের গায়ে খোদাই করা দেখতে পাই, তখন দেখি এই বাঁধি প্রথার মায়া-জাল কাটিয়ে শিল্পীরা কত-বড় জিনিষ দেখাতে পেরেচেন। যেখানে বাঁধা প্রথা ছন্দের মত তালেতালে চলে, সেখানে তার সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু যখন সে বিধিবদ্ধ হয়ে পায়ের বেড়ির মত হয়ে পড়ে তখন সে আর্টকে বিষম ভারাক্রান্ত করে তোলে।

নবীন সাহিত্যের উপর আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি



দাক্ষিণাত্যের নটরাজ

যেমন, প্রাচীন শিল্পকলারও তেমনি নবীন শিল্পের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। নবীন শিল্পীরা প্রাচীন শিল্পীদের সাধনা-প্রসূত ফলগুলি নিজের মত করে নিয়ে যখন আবার স্বাধীনভাবে ভারতেও নতুন ভাবে সৃষ্টি করতে থাকবেন, তখন শাস্ত্রের শাসনের কথা কারো মনেও আসবেনা, তখন শিল্পীর ব্যক্তিত্বই শিল্পে প্রকাশ পাবে। যেখানে Individuality makes an artist—সেখানে শিল্পশাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি কোনমতেই টিঁকে থাকতে পারবে না। তাই আমরা বাঁধাবাঁধি দেবমূর্ত্তি ছাড়াও কপিল প্রভৃতির মত স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত মূর্ত্তিও গড়ব। শিল্পী যখন স্বাধীন চিন্তার



সিংহলের কোন তামিল সাধু

দ্বারা ভাবপ্রকাশের জন্যে বিশেষ রেখা বা ছন্দ আবিষ্কার করেন, তখন সেটা তাঁর চলবার পথের মত হয়—তা বেড়ার মত বাধা দেয় না। কিন্তু যখন পরবর্ত্তী কোন শিল্পী পূর্ব্ব-শিল্পীর সেই বিশেষ বিশেষ রেখা বা ছন্দকে দস্তুর বলে মেনে নিয়ে তার অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর আর অগ্রসর হওয়া হয় না, ঘানির পাকে ঘুরে মরা হয়।

কবিদের মনে যেমন বর্ষার ঝর ঝর শব্দে, পাতার মরমর শব্দে অস্ফুট ভাবের উদয় করে তেমনি শিল্পীরা যা কিছু চোখে দেখেন তার ভিতর থেকে রূপ ও রস পেয়ে থাকেন। আবার কবিরা যেমন মনের সুখ-দুঃখের অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার প্রকাশ করেন, কোন কোন শিল্পী সেইরূপ নিজেদের মনের ভাব চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে ফুটিয়ে তোলেন। এই আত্ম-শক্তির প্রকাশই শ্রেষ্ঠ শিল্পের লক্ষণ।

ভাস্কর্য্য একটি জমাট জিনিষ, তাকে চোখ দিয়ে দেখা যায় আবার তাকে স্পর্শও করা চলে। সে নিজের বিশেষ একটা অংশ খালি দেখায় না, তাকে চারিদিক দিয়েই আমরা নেড়েচেড়ে দেখতে পারি। নানান কারণে ভাস্কর্য্যকে খুবই সাধাসিধে এবং স্পষ্ট হতে হয়েচে—সে শিল্পীর হাতে যখন যেখানে এসে শেষ হবে তখন তার উপর কারো—এমন কি শিল্পীর নিজের কলমও চলবেনা। তাতে কিছু যোগ করাও চলবে না বা বাদও চলবে না। এই হিসাবে ভাস্কর্য্য চিত্রের চেয়ে বড় জিনিষ। ছবিতে একটা সুবিধে এই আছে যে, তার আনুষঙ্গিক নানান জিনিষ, রং, গাছপালা ও আসবাবপত্র প্রভৃতির সামঞ্জস্যে তার মোট ভাবটিকে দানা বাঁধাতে পারে, কিন্তু ভাস্কর্য্যকে তার আশে-



কপিল

পাশের সব জিনিষকে ছাড়িয়ে নিজে নিজেই সম্পূর্ণ হতে হয়। একটি পাথরের প্রতিমূর্ত্তি তার নিজেরই কথা ব্যক্ত করবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু চিত্রে তার আশেপাশের অনেক জিনিষের সামঞ্জস্যে ভাবপ্রকাশের সুবিধে হয়। ভাস্করকে এই কারণে তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি তাঁর ভাস্কর্য্যে খুবই স্পষ্ট করে দেখাতে হয়, কিন্তু চিত্রকরেরা সেটাকে রেখার ও রঙের কৌশলের মধ্যে—কতকটা কল্পনার রাজ্যে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। পৃথিবীতে এই কারণে বোধ হয় ভাল চিত্রের চেয়ে ভাস্কর্য্যের এত অভাব।

আধুনিক যুগের ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যের খবর আমরা অবশ্য খুবই কম পাই; তার মধ্যে সেদিন কোন-একজন এমেরিকাবাসী ভাস্করের তৈরি মূর্ত্তির একখানি ছবি চোখে পড়েছিল। প্রথমে ছবিখানি দেখে নিতান্তই হতাশ হতে হয়, কিন্তু তার পরমূহূর্ত্তে—যখন একটি মূর্ত্তিমান দুঃখের গভীর বেদনার ভাব এই একটি সহজ ও সাধাসিধে ভাস্কর্য্যের ভিতর দেখতে পেলুম, তখন অবাক হতে হল। আর-কিছু নেই—একটি ঘোমটা-দেওয়া মেয়ে হেঁট হয়ে বসে আছে; তার ঘোমটার মধ্যে মুখের ও বুকের আকৃতির চিহ্নমাত্র নেই—তার বদলে কেবল পুঞ্জীভূত ঘননীল অন্ধকার; বুকের ভিতরটা যেন কেবলি শূন্য হাহাকার করচে। এই বেদনার ছবিটিতে শিল্পী বিশেষ কিছুই দেন-নি—অথচ সবই দিয়েছেন। এই ভাস্কর্য্যের যা-কিছু অসম্পূর্ণতা তা ইচ্ছাকৃত; সেটার উপর কলম চালালে কখনই এই দুঃখের প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ হতে পারতো না। এটি প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ হলেও, এটির মত সম্পূর্ণ ভাস্কর্য্য আর-কিছুই হতে পারে না।

প্রায় দেখা যায় আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্করেরা কাপড়ের texture, দেহের অস্থিচর্ম্ম প্রভৃতি আনুষঙ্গিক জিনিষগুলির উপর এত বেশী নজর দিয়েচেন যে, তার

ভিতর নানান কৌশল থাকলেও শিল্প-কলার প্রাণের বিশেষ অভাব দেখা যায়। এখন তাঁরা ভাস্কর্য্যের সম্পূর্ণতার রসের চেয়ে, খুঁটিনাটির উপর বিশেষ নজর দেন, যেমন—কোন মূর্ত্তিতে সিল্কের কাপড় পরান হলে সিল্কের মত দেখতে হচ্চে কিনা, সুতির কাপড় পরান হলে সুতোর ভাবটি পাথরের মূর্ত্তির মধ্যেও ধরা পড়চে কিনা।

আমাদের দেশের বৌদ্ধযুগের এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ে যে-সব ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাই সেগুলির মধ্যে সিংহলের বুদ্ধমূর্ত্তি,



সারনাথের বুদ্ধ

যবদ্বীপের প্রজ্ঞাপারমিতা, ইলোরার সূর্য্যমূর্ত্তি, দাক্ষিণাত্যের নটরাজ ও এলিফেণ্টার ত্রিমূর্ত্তি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কতকগুলি মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। সিংহলের নিবাতনিস্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির ধ্যানী বুদ্ধের বিরাট মূর্ত্তিটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মূর্ত্তিটির এমন একটি গভীরতা আছে যে, এটির কাছে দাঁড়ালে তার আশেপাশের সমস্তই ভুলে যেতে হয়—তার গভীর ভাব দর্শককে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। ভারতের অপরাপর বুদ্ধমূর্ত্তি-গুলিতে ভাবের অভাব না ঘটলেও সেগুলি এত-বেশী অলঙ্কারপ্রধান হয়ে পড়েছে যে, তার মোট ভাবটি ফুটতে অনেক বাধা পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা সারনাথের ধ্যানী বুদ্ধের উল্লেখ করতে পারি। সারনাথের এই মূর্ত্তিটিতে যে অলঙ্কারপ্রধান কারুকার্য্য সিংহাসন ও জ্যোতির্ম্মণ্ডলীটিতে আছে, সেইটেই ভাবপ্রকাশের বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর সারনাথের এই মূর্ত্তিটি ছাড়া অন্যান্য বুদ্ধ-মূর্ত্তিকেও অনেক স্থলে অলঙ্কার-প্রধান শিল্প এই ভাবে চাপা দেবার জোগাড় করেছে। মোটভাবটিকে সংক্ষেপে সুসংযত ভাবে ফোটাতে হলে যে অসুবিধে আছে, তা আমাদের ভাস্করেরা বেশ জানতেন এবং তাই আমরা দেখি, রূপক-চিহ্নকে আশ্রয় করে তাঁরা অনেক বড় বড় কথা প্রকাশ করেছেন। যেমন, আমাদের এলিফেণ্টার ত্রি-মূর্ত্তি। এই ত্রি-মূর্ত্তিটিকে যদিও ভাস্কর পুরোপুরি প্রকাশ করেন-নি, তার কোমর থেকে পায়ের

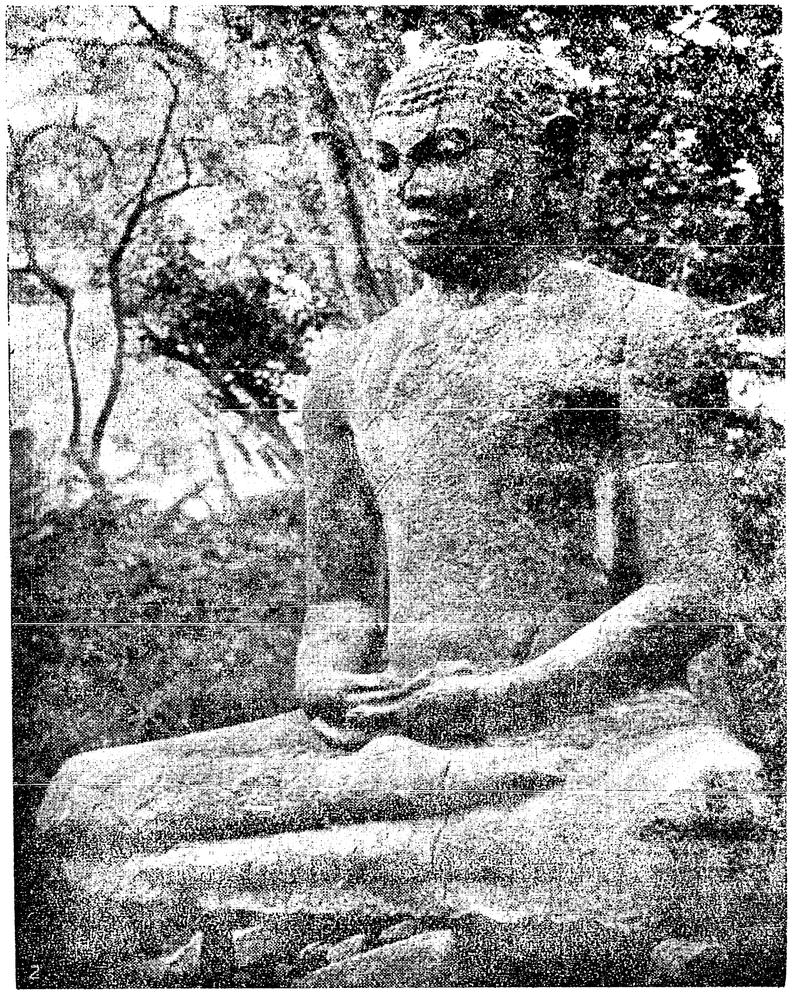

সিংহলের বুদ্ধমূর্ত্তি

দিকটা মাটির তলায় অদৃশ্যই রেখে গেছেন, তবুও তাঁর বক্তব্য মোটেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়-নি। এইখানে ত্রি-মূর্ত্তির ভাবপ্রকাশের সহায় হয়েছে তাঁর হাতের শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি চিহ্ন।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ভাস্কর্য্য যেখানে মন্দির প্রভৃতির গায়ে অলঙ্কারের মত খুব ঘন ঘন সাজানো আছে, সেখানে তার সম্পূর্ণতা এক-একটি খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না—সেখানে সে কতকটা ছবির মত, আশেপাশের সব জিনিষকে নিয়ে ফুটে উঠেছে। এখানে মন্দিরটিই এই ভাস্কর্য্যের স্থূল প্রতিরূপ। এই হিসাবে প্রাচীন কালের বরবোদর, কোনারক, ইলোরা এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

ফিলিপাইনে শিক্ষাবিস্তার

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ উনিশ বৎসর হইল মার্কিন রাজ্যের হস্তগত হয়। পূর্ব্বে দ্বীপগুলি স্পেনরাজ্যের অধীনে ছিল। এই কয় বৎসরের ভিতরে সেখানে অসভ্য দেশবাসীদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার সহিত শ্রমজীবী-শিক্ষার ব্যবস্থায় কিরূপ ফল হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে আজকাল-কার দিনে বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। ক্যাপিটাল নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে উপস্থিত প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

ফিলিপাইনের অধিকাংশ লোকই বিশেষ-রূপ বর্ব্বর ছিল। তাহাদের চালচলন মোটেই সভ্যসমাজের উপযোগী ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহে তাহারা বিশেষ পটু ছিল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা বেশ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের সভ্যতার প্রসার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষাবিস্তারই সভ্যতা-প্রসারের প্রধান সহায়; প্রথম হইতেই অল্পখরচে বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া ছাত্রেরাই নিজহাতে অনেক বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চাষবাসের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিষ তৈয়ারির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ে চাষের কাজ শিক্ষা করিয়া ছাত্রেরা ঘরে আসিয়া বাপ-দাদার অপেক্ষা অধিক ফসল উৎপন্ন করিতেছে। এই কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রের অভাব হয় না। ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের জন্য রান্না, কাপড়-বোনা, কাপড়ে কেয়ারির কাজ, লেস-তৈয়ারি ইত্যাদি ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। যে সকল জিনিষ বিদ্যালয়ে তৈয়ারি হয় তাহার বিক্রয়েরও সুবন্দোবস্ত আছে। ঝুড়ি, চুবড়ি, বেতের নানারকম আসবাব, কেয়ারির কাজ, লেস, মাদুর, পাপস ও দড়ির গালিচা ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিষ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা প্রস্তুত করে। নিয়মিতরূপে সকল বিদ্যালয়ের উৎপন্ন সকল সামগ্রীর বিক্রয়ের বন্দোবস্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ হইতে এই সুকঠিন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হইতেছে। ১৯১৬ জুন মাস হইতে ১৯১৬ জানুয়ারি মাসের মধ্যে ১৮টি প্রদেশের মধ্যে ১৩০টি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রকম জিনিষ তৈয়ারি করিয়া বিক্রয়ার্থ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই কার্য্যে ২২৬৬ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই ১৩০টি আড্ডায় যত মাল তৈয়ারি হয়, তাহা ছাড়া ৪০০০ বিদ্যালয়ে আন্দাজ ছয় লক্ষ ছাত্র যত মাল উৎপন্ন করে, সেই সমস্ত বিক্রয়ের জন্য একটি সাধারণ বিক্রয়-বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের মধ্যে শ্রমজীবী-শিক্ষার যে অনুষ্ঠান, তাহাকে একটি প্রকাণ্ড কারখানার সহিত

তুলনা করা যাইতে পারে। প্রভেদ এই মাত্র যে, কারখানা কোন-এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। শিক্ষার এই বিভাগ ১,২৭০০০ বর্গমাইল ব্যাপৃত। শিক্ষার এই বিভাগের আর-একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহার সকল উৎপন্ন দ্রব্যই হাতে তৈয়ারি, কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্যে নয়; আর, সকল জিনিষই সাদাসিধা রকমের, এবং অতি সহজ ও সরলভাবে তৈয়ারি।

এই সকল বন্দোবস্ত দাঁড় করাইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। প্রথমে শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল জিনিষের অধিক প্রয়োজন, যাহার মালমশলা দেশের মধ্যেই আছে এবং যাহা সহজে তৈয়ারি করা যায়, সেই সকল জিনিষ তৈয়ারির বন্দোবস্ত প্রথমেই করা হয়। ক্রমে ক্রমে সেই সকল জিনিষের উন্নতি করা হইয়াছে। এবং উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দড়ির গালিচার কথা বলা যাইতে পারে। পাঁচ বৎসর হইল এই কার্য্য আরম্ভ হয়; তখন দড়ি-তৈয়ারি ভাল হইত না এবং দড়ির উপাদান বা ডাঁটার আঁস,—যাহাতে দড়ি-তৈয়ারি হয় তাহা ভাল করিয়া প্রস্তুত হইত না। Panama Pacific প্রদর্শনীতে এই সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার ফলে সুতা তৈয়ারি করিবার ও বুনিবার ভালরকম প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং কয়েক প্রকার নমুনা স্থির করিয়া তাহারই অনুযায়ী মাল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয়। এই রূপ নির্দ্দিষ্ট নমুনা-মাফিক সমস্ত মাল সকল বিদ্যালয়ে ও সকল আড্ডাতেই হইতেছে। এবং যতরকম মাল তৈয়ারি হয় তাহার এক-এক জাতের জিনিষের যতপ্রকার বৈচিত্র্য আছে, তাহারও তালিকা আছে। মালঘরে ও প্রদর্শনীতে এই সকল মালের নমুনা রাখা হইয়াছে। এই সকল নমুনা দেখিয়া কোন ক্রেতা যদি কোন জিনিষ পাইতে চান, তবে ঠিক নমুনা-মতই জিনিষ সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়-সমূহে সকলরকম কাজ তদারক করিবার বন্দোবস্ত আছে। যাহাতে কোন মাল খেলো না হয় এবং নিখুত রকমে করা হয় তাহার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য থাকে। প্রত্যেক জিনিষ উৎপন্ন করিতে কি খরচা পড়িল তাহা খতান হয় এবং প্রধানত তাহার দর ধার্য্য হয়। তা-ছাড়া কোথায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের মাল পাঠান হইতেছে বা কি পাওয়া যাইতেছে তাহারও হিসাব রাখা হয় এবং হিসাবের সঙ্গে মাল মিলাইয়া দেখা হয়। সকল ব্যবস্থার মধ্যে এমনি রকম-রকম বাঁধুনি আছে। কোনস্থান হইতে বিশেষ কোন-রকম মাল যোগাইবার হুকুম আসিলে ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট কাহাকেও সেই হুকুম তামিল করিবার ভার দেওয়া হয়। তাহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সঙ্গে অন্য ছাত্রদেরও দেওয়া হয়। যে জিনিষ সরবরাহ করিবার হুকুম আসে তাহার সহিত একটা নক্সা থাকে, তাহা সর্দ্দার-ছাত্রকে দেওয়া হয়। সে তাহার অনুরূপ জিনিষ তৈয়ারি করাইবার জন্য দায়ী হয়। তাহাকে ভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত পরিমাণে

উপকরণ সব দেওয়া হয়। এইরূপ দায়িত্ব-জ্ঞানের সহিত ছেলেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়; ফলে, তাহারা পরে যে কাজেই পড়ুক তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে পারগ হয়। ছাত্রদের শিক্ষার মধ্যে এইরূপ দায়িত্ব-শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ উপকারী।

শিক্ষা-বিভাগ হইতে এই সকল ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে ছয়হাত ফিরিয়া জিনিষ বাজারে আসিত; তাহাতে যে-সকল লোক জিনিষ প্রস্তুত করিত, তাহাদের লাভের অংশ অনেক কমিয়া যাইত। বাজারে পাইকারি হিসাবে যে দরে জিনিষ বিক্রয় হইত নির্ম্মাতারা তাহার অর্দ্ধেকও পাইত কিনা সন্দেহ। শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্তে এখন কেবল দুই হাত ফিরিয়া বাজারে জিনিষ পৌছায়। প্রথম, প্রত্যেক প্রদেশের শ্রমজীবী-বিভাগ; দ্বিতীয়, বিশেষ বিশেষ আড্ডার (Centre) কর্ত্তা। ইহাদের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে সকল জিনিষ তৈয়ারি হয়। এই সকল কর্ম্মচারীর নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই; যত পরিমাণ মাল বিক্রয় হয়, তাহার উপর ইহারা একটা কমিসন পাইয়া থাকে। কতকগুলি বেতনভোগী শিক্ষক আছে, তাহারা স্থানে স্থানে কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহার তদারক করিয়া বেড়ায়।

ফিলিপাইনে এইরূপ কার্য্য-শিক্ষার সহিত বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী অনেক দিন হইতে চলিতেছে। এতদিনের পরীক্ষায় এই প্রণালীর উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রমজীবী-শিক্ষা অতি সহজ উপায়ে লোকেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থানীয় মাল-মসলা লইয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয় ছাড়ার পরও নিজের ঘরে বসিয়া কাজ চালাইতে পারে। কাজ যাহাতে না খারাপ হয়, তাহার তত্ত্বাবধান থাকার দরুণ প্রস্তুত কোন দ্রব্য খেলো হইতে পায় না। আমাদের দেশের ন্যায় ফিলিপাইনে স্বাভাবিক সুবিধা অনেক-রকম আছে। মেয়েরা বুদ্ধিমান ও সাহসী এবং জাতিভেদ ও ভাষার বৈচিত্র্য না থাকার দরুণ তাহাদের উন্নতির পথে কোন বাধা হয় না। এ দেশে শিক্ষকদের সামাজিক স্তর উন্নত। তাহারা বেশি খাতির পাইয়া থাকে।

মধ্যে মধ্যে ছুটির সময় নানা আমোদ-প্রমোদের সহিত শিক্ষকরা যাহাতে একত্র হইয়া শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা করেন, তাহারও যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়।

বিদ্যালয়ে যতরকম কার্য্য শিখান হয়, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লেখা হইলঃ—চাষ-বাস, মাছ-ধরা, গৃহপালিত জন্তু-পোষা, মাটির বাসন, ঝুড়ি, বেতের আসবাব ইত্যাদি তৈয়ারি, লোহা গালাইয়া চাষের যন্ত্র-তৈয়ারি, মদ, চামড়া, টুপি ও বুনিয়া জুতা তৈরি করা, তুলা, রেসম, আনারসের ছালের সুতায় বুনিয়া তাহাতে কাপড় তৈরি, এবং কাপড়ে কেয়ারি কাজ প্রভৃতি। ফিলিপাইন ক্রাফ্‌ট্‌সমান নামক এক মাসিকপত্রে এই সকল কার্য্যের বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই পত্রের প্রধান সম্পাদক শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। এই কাগজে বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কেহ আলোচনার অধিকারী নন বলিয়া ইহাতে যে সকল লেখা বাহির হয়, তাহাতে সাধারণের অনেক উপকার হয়।

শ্রীম—

তেলুগু গান

সন্ধ্যা-প্রদীপ

সাঁঝের প্রদীপ জেলে নত করি শির,
সন্ধ্যা-প্রদীপ প্রভু! তব মন্দির!
প্রদীপে যে আলো জ্বলে সে জ্যোতি তোমার,—
সে জ্যোতিতে পাপ-তাপ পোড়ে যে সবার;
দীপের কনক-শিখা দেউল রুচির,
দেব-দেব! সে দেউলে তুমি হাস থির!
ওরে ও সাঁঝের দীপ তোর তুলা নাই,
সন্ধ্যাদীপের আমি বন্দনা গাই।

মন্দির-দ্বারে।

জাগো জাগো মনোহর! খাবে ননী ক্ষীর সর!
জাগো, জাগো, নাড়ুয়া-গোপাল!
জাগো পুলকের ধন! গোলোকের হে রাজন্!
জাগো, জাগো, হয়েছে সকাল।
জাগো হে দুয়ার খোলো, মন্দিরে ভিড় হ'লো,
চেয়ে ত্যাখো রাতি নাই আর;
বালক, বনিতা, বুড়া, ভিড়ে দ্যাখো হ'লো গুঁড়া,
দুখ তুমি ঘুচাও সবার।
তোমার আরতি তরে ধ'রে আছি শিরোপরে
মনোহর মালতীর মাল,
জাগো হরি! জাগো হরি! খোলো দ্বার কৃপা করি'
সুন্দর! নন্দ-দুলাল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাসকাবারি

শক্তির ধর্ম্ম ও আনন্দের ধর্ম্ম

আষাঢ়ের "নারায়ণে" "ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক বলেন যে "রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন সেই জীবন—যাহা আনন্দপূর্ণ, স্বস্তিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, যেখানে দ্বন্দ্ব নাই, বৈপরীত্য নাই"। "রবীন্দ্রনাথ যে দিক্‌টি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, তাহা হইতেছে শক্তি—বীর্য্য, তেজ, যুদ্ধ, সংঘর্ষ, ধূলি, ঘনঘটা, ঝঞ্ঝা, রুদ্রের বিভূতি।" এ দিক্‌টা নিট্‌শে দেখিয়াছেন বলিয়া হঠাৎ মনে হইতে পারে, কারণ নিট্‌শের মন্ত্র—"will to power"। কিন্তু লেখক বলেন যে নিট্‌শে শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তারই অভিব্যঞ্জনায় জগতের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি শক্তির যে সকল বিকৃতি, যথা মদ মাৎসর্য্য ক্রূরতা ইত্যাদি,—তাদেরও নিত্যবস্তু করিয়া লইয়াছেন।

লেখক মনে করেন যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে যে সংঘাত বর্ত্তমান যুগে অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই

বর্ত্তমান জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ববিরোধ, মত্ততা, ত্রস্ততা "যতই কুৎসিত হউক্ না কেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে রহিয়াছে সজীবতা, জীবনকে —জগৎকে তীব্রতর ভাবে স্পষ্টতর ভাবে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস।" রবীন্দ্রনাথ যে কখনও কোন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন্ নাই একথা বলা লেখকের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বে দ্বন্দ্বের অব্যর্থতার যে স্থান নাই, ইহা বলাই তাঁর অভিপ্রায়। এমন কি তিনি বলেন যে রসভোগাত্মক কর্ম্ম ভিন্ন দ্বন্দ্বাত্মক কর্ম্মেরও কোন স্থান রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বে নাই।

এই সুচিন্তিত লেখাটি আমাদের চোখে পড়ার পূর্ব্বে বিখ্যাত সাহিত্যিক এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ লিখিত "God, The Invisible King" ঈশ্বর অদৃশ্য রাজা নামক নবপ্রকাশিত বইটি পড়িতেছিলাম। আধুনিক মানুষের ধর্ম্মটা প্রকৃত প্রস্তাবে কি হইতে পারে, তারই কতক কতক আভাস ওয়েল্‌স্ সাহেব তাঁর নূতন গ্রন্থে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন খৃষ্টধর্ম্মের ট্রিনিটি বা তিন ঈশ্বরের তত্ত্ব একালে কেউ মানেনা, এখনকার কালের মানুষের যিনি ঈশ্বর তিনি একমাত্র সসীম ঈশ্বর। ওয়েল্‌স্ তাঁকে সসীম এই অর্থে বলিয়াছেন যে, যে ঈশ্বরকে লইয়া মানুষের কারবার, যাঁকে মানুষের প্রয়োজন আছে, তাঁকে সীমাবদ্ধ একজন পুরুষ হইতেই হইবে —কেননা পুরুষের সঙ্গেই পুরুষের যোগ ঘটিতে পারে, অসীম অনন্ত একটা শক্তি বা সত্তা মাত্রের সঙ্গে মানুষের কোন সম্বন্ধই দাঁড়াইতে পারে না। অনন্ত শক্তি মানুষ ধারণা করিতেই পারে না; লোকলোকান্তরব্যাপিনী কোন শক্তি যদি কোন সত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তবে ওয়েল্‌সের ভাষায় সে একটা Veiled Being মাত্র, অবগুণ্ঠিত সত্তা মাত্র। হয়ত কোনকালে বিজ্ঞান তার ঘোমটা খসাইতেও পারে, নাও পারে—কিন্তু তাকে যখন জানিনা, তখন তাকে পূজা করিতেও পারি না।

অনন্ত দেশকাল হইতে যেমন ঈশ্বরকে ওয়েল্‌স্ তফাৎ করিলেন, তেমনি প্রকৃতির রঙ্গভূমি হইতেও তাঁকে তিনি বিদায় দিয়াছেন। যে প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে ক্রমাগতই দ্বন্দ্ববিরোধ জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে, সেই হানাহানি কাড়াকাড়ির ক্ষেত্রেও ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর আছেন শুধু আমাদের জীবনের মধ্যে। মানুষের জীবনে, মানবলোকে, মানবের অধিনায়ক রূপেই তাঁকে আমরা দেখিতে পাই। মানুষের জীবনের ভিতরে থাকিয়া তিনি সেই জীবনের ভাঙাগড়া উত্থান পতনের লীলার ভিতর দিয়া তাঁর অভিপ্রায়কে ক্রমশঃ জয়যুক্ত করিতে করিতে চলিয়াছেন। মানুষের তিনি সহযাত্রী, সহকর্ম্মী। তিনি যখন মানুষের জীবনে আবির্ভূত হন্ তখনই মানুষের জীবন পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়।

সুতরাং ওয়েল্‌সের মতে ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা বীরের স্বরূপ, শূরের স্বরূপ। তিনি বলেন যে, প্রাচীনকালে ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল বৃদ্ধ পিতা বা পিতামহের স্বরূপ; একালের ঈশ্বর তরুণ যুবা। তাঁর দৃষ্টি অতীতের দিকে নয়,

ভবিষ্যতের দিকে। তিনি তরবারি হস্তে যাত্রা করিয়াছেন তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। এইজন্য যে বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী তাঁকে সংশয় করে, সে তাঁকে সব চেয়ে বেশি মানে; যে জড়বাদী সেও না জানিয়া এই নবীন ঈশ্বরেরই অর্চ্চনার আয়োজন করিয়াছে—"The Religion of Atheists" অধ্যায়ে ওয়েল্‌স্ তাহা সুন্দর রূপেই দেখাইয়াছেন।

নারায়ণের লেখক ওয়েল্‌সের সসীম ঈশ্বরবাদ মানেন কিনা জানিনা, তবে পূর্ণ জীবনে সকল রকমের বিভূতির যে একটা স্থান আছে, "রাক্ষস পিশাচ পশু অসুর" প্রভৃতি সকলেরই স্থান আছে, একথা তিনি বলিয়াছেন। ওয়েল্‌স্ ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতির বিভূতির স্থান মানেন না; তিনি ঈশ্বরকে কেবলমাত্র মানব মনে করেন এবং মানবের সকল চিদ্বিভূতি যে ঈশ্বরের মধ্যে আছে তাহা স্বীকার করেন। শুধু এই জায়গায় ওয়েল্‌সের সঙ্গে নারায়ণের লেখকের ভাবের মিল আছে। কিন্তু আমাদের দেশের বেদান্ততত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বরকে যদি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও নিত্য স্বভাববান মনে করা যায়, এবং কোন কোন বৈষ্ণব আচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া একথাও সেই সঙ্গে বলা যায় যে, মানুষের অশুদ্ধিকে শোধন করিবার জন্যই ঈশ্বর শুদ্ধ, মানুষের ভ্রমকে নিরাকরণ করিবার জন্য, তিনি বুদ্ধ, মানুষের সকল বন্ধনকে মোচন করিয়া মানুষের মধ্যে "কৃতকৃত্য" হইবার জন্যই তাঁর মুক্তস্বরূপ এবং আমরাও যে পরিমাণে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হই, সেই পরিমাণে ঐ-দিক্ হইতেই আমাদেরও মুক্তির সার্থকতা—তবে তো ঈশ্বরকে সসীম বলার কোন দরকারই থাকে না। কেননা,তখন ঈশ্বরের স্বরূপ অসীম হইলেও তাঁর প্রকাশ সীমায়। সুতরাং যেখানে তাঁর প্রকাশ, সেখানে এক হিসাবে তাঁকে সসীম বলাও তো চলে। অথচ তাঁকে শুধু সসীম বলিলে তাঁর সৃজনের লীলার কোন অনির্ব্বচনীয় রহস্য থাকেনা। যেমন পরিপ্রেক্ষণ (Perspective) ভিন্ন ছবির রস ফোটেনা, তেম্নি অনন্তত্ব ভিন্ন সীমার সৌন্দর্য্য ও রহস্য প্রকাশ পায় না। তাছাড়া তাঁর সসীমত্বটা সত্যও নয়। কেননা, অনন্ত দেশ কাল হইতে ঈশ্বরকে পৃথক করিয়া লইয়া যদি কেবলমাত্র মানুষের জীবনের অধিপতি করিয়াই তাঁকে জানি, তবে সেই মানুষের চৈতন্যেই তিনি তাঁর সীমা ছাড়াইয়া যাইবেনই। সে চৈতন্য যে চক্র হইতে পরিবর্দ্ধিত চক্রে ক্রমশঃ অধিরোহণ করিয়া বিশ্বচৈতন্য—অনন্তচৈতন্য—হইয়া উঠিবে। অভিব্যক্তির নিয়মে চৈতন্যের পরিধির কি ক্রমশঃ বিস্তার ঘটে নাই? এবং আরও উত্তরোত্তর বিস্তার ঘটিবে না?

সেই জন্য, সীমার দিক্ হইতে যাহা সংগ্রাম সংঘর্ষ বলিয়া প্রতীত হয়, অসীমতার দিক্ হইতে তাই শান্তি ও স্বস্তি, তাই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের দেবতা "সীমার মাঝে অসীম"। তাঁর দেবতা রুদ্রও বটেন, দক্ষিণও বটেন। "তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করচে চাষা চাষ"। অন্য ক্ষেত্রে তিনিই "উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ঐযে তিনি ঐ বাহির পথে"। "দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে, অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে"। "সমর ঘাতে

অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ, সেইত তোমার স্নেহ"। "জয় তব ভীষণ সব কলুষনাশন রুদ্রতা"। এই গেল এক দিক্। অন্য দিকে "সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, অরুণবরণ পারিজাত লয়ে হাতে"। "মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে।"

জাতীয়তার আদর্শ

ভারতবর্ষের স্বাজাত্য বা জাতীয় ভাবের উপাদান উপকরণ কি ও আদর্শ কি এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় ভাবের উপাদান উপকরণ ও আদর্শের সঙ্গে তার মূলগত কোন ঐক্য অথবা অনৈক্য আছে কিনা, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আধুনিককালে যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। তার প্রধান কারণ, আমরা একটা যুগসন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতা, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, যন্ত্রতন্ত্র, বিজ্ঞান, সমস্তই আমাদের এই বহু প্রাচীনকালের সমাজের উপর হঠাৎ আসিয়া পড়াতে আমাদের সমাজে স্বভাবের নিয়মে নানা পরিবর্ত্তন দেখা দিতে সুরু করিয়াছে। অথচ সমাজ তার চিরাগত প্রকৃতি ও আদর্শকেও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া এই নবাগত আকস্মিক সভ্যতার ছাঁচে আপনাকে আমূল বদল করিতে রাজি নয়। সেইজন্য অনেক দিন হইতেই উভয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টায় কেউবা পুরাতনের পক্ষপাতী, কেউ বা নূতনের। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে এ সকল বিষয়ে সামাজিক আদর্শের তারতম্য নির্ণয়ের ভেদ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের পক্ষে বোধহয় আধুনিক সাহিত্যে, এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-প্রসূত সমাজ-গঠনের আদর্শের আলোচনা-গুলি পরখ করার মত ঔৎসুক্য-জনক ব্যাপার আর কিছুই নাই।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, ভূদেব, চন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাত, ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব এবং ভারতীয় জাতীয়তার বিশিষ্ট আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক মতবৈচিত্র্য আছে। তাঁদের প্রকৃতির ভিন্নতা ত আছেই; তাছাড়া তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থারও যথেষ্ট ভিন্নতা আছে। যেমন ধরুন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সভ্যতা সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল; সুতরাং কোন্ সভ্যতাটার কোন্ দিকে উৎকর্ষ, কোন্ সমাজের কোন্ কোন্ দিকে শক্তির স্ফূর্ত্তি, তাহা তিনি যেমন পরিষ্কার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এমন ভূদেব কি চন্দ্রনাথ পান্ নাই। আবার তখনকার কালে ওগস্ত কঁতের দর্শন পড়িয়া সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভূদেব বা বঙ্কিম যতখানি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বিশেষ ভাবে নানাদেশের ইতিহাস পড়িয়া ভূদেব যে পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সে পরিমাণ জ্ঞান চন্দ্রনাথ কিংবা রাজনারায়ণের ছিল না, যদিচ অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট অধিকার ছিল। কাল্‌চারের এই সব ভিন্নতা, কালের ভিন্নতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতা—এসমস্ত হিসাব করিয়াই তবে এক এক জনের আদর্শের বিচার

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

প্রবর্ত্তিত করা,—খুব বেশী আত্মবলিদানের কাজ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন; বস্তুত তাঁহারা মনে করেন, ঐরূপ নূতন-কিছু ফরায় কোন ফল হইবে না। শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় শিক্ষিতা রমণীরাও সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিতে কেন না পারিবেন—না বুঝিবার কোন হেতু নাই। কেবল যদি আমরা ভারত-রমণীদের শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করি, তাহা হইলে অন্য বাধা-বিঘ্ন আমাদের পথ হইতে আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইবে। হিন্দু-সমাজ—একটা প্রকাণ্ড প্রাণশূন্য জড়পিণ্ড; উহাকে নড়াইতে হইলে, অনেকটা জায়গা লইয়া খুব একটা ঠেলা দেওয়া আবশ্যক। যতই সাহসী ও উৎসাহী হউন না কেন, দুই-একজন লোকের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না; সুবিধাবোধ বা ব্যক্তিগত গর্ব্বও আমাদের সমাজকে নড়াইতে পারে না। সমাজের মধ্যে একটা নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইবে; সমাজের মধ্যে প্রাণ-শক্তি আবার ফিরিয়া আসা চাই। কিন্তু যতদিন না রমণীরা সংস্কার ও উন্নতির পথে পুরুষদিগের সহিত একত্র চলিয়া পুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিবেন, ততদিন ইহা কখনই ঘটিবে না" (Hindu 1889)।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে, নব্য হিন্দুদিগের সংস্কার-চেষ্টার মর্ম্মভাবটা আরো ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য, "পজিটিভিষ্ট"-সম্প্রদায়ের নেতা M. Ghoser গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, এই কথাটা উপেক্ষা করিলে চলিবে না যে, আমাদের অতীত ইতিহাসের বৈধ পরিণাম হইতে নিষ্কৃতি পাইব বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। এবং আমাদের চিন্তা আমাদের অবস্থার উর্দ্ধে সমুত্থিত হইলেও, যদি সেই সকল চিন্তা ও উচ্চস্পৃহা আমাদিগকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মের নিকট আমরা খাঁটি থাকিতে পারিব না। আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, সমস্ত জগতের আশীর্ব্বাদস্বরূপ যে "পজিটিভিজম্" সেই "পজিটিভিজমের" খাতিরে আমরা সেই সব ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না যাঁহাদের মধ্যে অতীতকাল, বর্ত্তমানেও সজীব ও সচল রহিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের দেশের সেই সব অধিকাংশ লোক—যাঁহাদের নিকট য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত অপরিচিতই থাকিবে। নিজেকে আমরা আপন সমাজ হইতে এইরূপ পৃথক্ হইয়া থাকিতে দিব না। শুধু তাহা নহে,—বরং চারিকোটি লোক যাহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে, আমাদের নিজের ভাষায় যাহারা কথা কহে—সেই সব লোকের উপর আমাদের সমস্ত স্নেহমমতা কেন্দ্রীভূত করিব। আমাদের বিবেচনায় আমাদের এই স্বদেশবাসীরা যতই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হউক না কেন, পজিটিভিজম আসিয়া আমাদের জমাট্ ঐক্যটাকে যে বিচলিত করিয়া তুলিবে তাহার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। পাশ্চাত্যের সহিত জমাট্ ঐক্য স্থাপনের অনিশ্চিত ও সংশয়াত্মক লাভের জন্য, আমাদের নিজের জমাট্ ঐক্যকে বিচলিত করা আমরা আবশ্যক মনে করি না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের অনেক অসুবিধা আছে। য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সহিত আমাদের সংস্পর্শটাই আমাদের সেই শক্তিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে যে শক্তির দ্বারা আমরা—কোঁৎ যাহাকে বলেন "সহজাত প্রবণতা", আমাদের স্বদেশবাসীর সেই সহজ প্রবণতা-সমূহের উচিত মূল্য ও মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। ঐ প্রবণতাগুলির মধ্যে একটা কষাকষির টান অনুভব করিয়া, আমরা তাহাদিগের হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। তাই পাশ্চাত্য প্রভাব ব্যতীত ঐ সকল প্রবণতা স্বাধীন ভাবে কিরূপে পজিটিজমে আসিয়া মিলিত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি এরূপ আমাদের অবস্থা নহে; তাহাদের দ্রুত উন্নতিসাধনকল্পে আমরা কিরূপ সাহায্য করিতে পারি, সে বিষয়ে কোন কিছু স্থির করাও আমাদের পক্ষে আরো দুঃসাধ্য…

সে যাই হোক্—যদি আমরা মনে করি, আপাতত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আচরণের মধ্যেই আমাদের কাজটাকে বদ্ধ রাখিব, তাহা হইলে দেখিব এই সমস্যায় জটিলতার অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। কারণ, আমরা যে সমাজ ও গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, সেই সমাজ ও গবর্ণমেণ্টের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া, যদি আমরা প্রত্যেকে, প্রকৃত পজিটিভিষ্টের মত জীবন যাপন করিতে পারি, তাহা হইলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোকের নিকট এই সমস্যা-প্রশ্নের একটা ভাল-রকম উত্তর দেওয়া হইবে। হিন্দুধর্ম্ম ও পজিটিভিষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় দুই অতি বিভিন্ন উপাদানকে যদি আমাদের জীবনে আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে সুদিব্য মিলন স্থাপিত হইয়া বেশ একটা কাজ হইবে।" (কটনের New India গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ-১৭০)

* *
*

এক্ষণে, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্! এই পরিবর্ত্তনের দুইটি স্পষ্ট কারণ দেখা যায়:—এই সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ; এবং ইংলণ্ডের ও য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব।

যতই জটিল হউক না কেন, এই পরিবর্ত্তনের উপর একটি তথ্যের আধিপত্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়:—প্রাচীন সমাজের ঐক্যতত্ত্ব যে "পরিবারতন্ত্র"। সেই পরিবারতন্ত্রের স্থান, অর্ব্বাচীন সমাজের ঐক্যতত্ত্ব যে "ব্যক্তিতন্ত্র" সেই ব্যক্তিতন্ত্র আসিয়া অধিকার করিয়াছে।

পরিবার বা বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদের পদমর্য্যাদাক্রম বজায় রাখিবার জন্য, বর্ণভেদ-পদ্ধতি কতক-গুলি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়ম স্থাপন করিয়াছিল। খুব প্রাচীনপন্থীদিগের নিকট এই সকল নিয়ম, আজিকার দিনে, অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, নব্য হিন্দুদের চক্ষে ঘৃণিত ও হাস্যজনক বলিয়া মনে হয়। বংশের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য, বংশের

হইবে এবং কে কতটা সম্যগ্‌দর্শী তাহারও নির্ণয় হইবে।

অতএব আমরা মাসে মাসেই জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে এই সকল মনীষীর আলোচনা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিব। তাঁদের কালের হিসাবে তাঁদের আলোচনার মূল্য এবং তারপর উত্তর কালের ক্রমবিকাশমান ধারায় তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মূল্য আমাদিগকে বেশ করিয়া যাচাই করিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। কেননা, কালের হিসাবে অনেক কথার মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বকালের হিসাবে সে মূল্য টেঁকেনা।

প্রথমে ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ" সম্বন্ধেই আলোচনাটা তোলা যাক্। কিন্তু "সামাজিক প্রবন্ধ" যে সময়ে রচিত হয়, তার পূর্ব্বে দেশে অনেকগুলি বড় বড় আন্দোলন হইয়া গেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে সেই আন্দোলনগুলির ধারা দেখিয়া গেলে তবে 'সামাজিকপ্রবন্ধ' যে কালের রচনা, তার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান কাল্‌চার ও সভ্যতার ত্রিধারার একটা প্রশস্ত মোহানায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের মনের সঙ্গে তাঁর মনের আশ্চর্য্য সাযুজ্য ও সারূপ্য ছিল—ইংরেজ ডীইষ্ট, হিউম্, গিবন প্রভৃতি সংশয়বাদী, ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট এবং ভল্‌টেয়ার, ভল্‌নি প্রভৃতি ফরাসী থিয়োফিলান্‌থ্রপিষ্টদের একেবারে সগোত্র মন ছিল রামমোহন রায়ের। সেই কারণে কোন রকমের অন্ধ সংস্কার তাঁর মনকে বাঁধিতে পারে নাই; তিনি সহজেই সকল ধর্ম্মের ও সকল সভ্যতার অন্তর্নিহিত বিশ্বভৌমিক সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের শাস্ত্রকে মানিয়া লইয়াই তার আসল সত্যগুলি কি, তার বিশ্বসত্যগুলি কি, তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর হইতেই টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহনের এই Cosmopolite এই বিশ্বভৌমিক দিক্‌টাই তাঁর একমাত্র দিক্ নয়; তাঁর আর একটি বড়দিক্ তাঁর স্বাজাতিক দিক্। সেখানে তিনি শাস্ত্রমীমাংসক, সমাজ-সংস্কারক, বিধিশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যাতারূপেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর 'বেদান্তভাষ্য,' 'বেদান্তসার', তাঁর 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকার লেখা গুলি, তাঁর 'চারি প্রশ্নের উত্তর', তিনি যে ভিত্তির উপর হিন্দুর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিতেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের অশেষ শাস্ত্রের ধর্ম্মবিধি ও কর্ম্মবিধির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ঐক্যসূত্রটিকে অর্থাৎ তার মুক্তিতত্ত্বটিকে এমন আশ্চর্য্য এমন উদারভাবে রাজা রামমোহনের মত আর কেহই ধরিতে পারেন নাই। সকল রকমের সাধন ও মার্গ, সকল রকমের সম্প্রদায় ও বিভাগের মধ্যেই যে মানুষের সর্ব্বাবরণ, সর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্তির একটা উদার পথ ভারতবর্ষ উন্মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই হিন্দু সভ্যতার সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বমার্গের বিশিষ্ট ও নিবিষ্ট আলোচনার দ্বারা রাজা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

মুক্তির আদর্শকে তিনি নিজের জাতির মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্বজাতির মধ্যেও তাকে দেখিতে তিনি বাধা পান্ নাই। সেইজন্য বেদান্তের পাশাপাশি এই ব্রাহ্মণ-তনয় সাহস করিয়া Precepts of Jesusও প্রকাশিত করিয়াছিলেন; আবার বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় humanitarianism অথবা লোকশ্রেয়ঃবাদকেও খাপ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের জাতীয়তার আদর্শ সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই ছিল যে, ভারতবর্ষকে জাতীয় ভাবে সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বজনীন ভাবেই জাতীয় হইতে হইবে।

রামমোহন যে সূত্রটি ধরাইয়া দিয়া গেলেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁর পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে দুইটি ধারা দেখা দিয়াছিল। এক, অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদের ধারা, আর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'থিজ্‌ম্' ও ভক্তিবাদের ধারা। দুটি ধারাই বিশ্বভৌমিকতার অভিমুখী ছিল। দুজনেই রামমোহনের যেন দুই অংশ পাইয়াছিলেন। অথচ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বাজাতিকতার এক হিসাবে জন্মদাতা ছিলেন বলা যায়। তিনি তাঁর উন্নত ধর্ম্মের আদর্শে দেশীয় সমাজের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানকে শোধিত সংস্কৃত করিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। Conservative Reformer—রক্ষণশীল সংস্কারকের আদর্শ অবলম্বন করিয়া তিনি যতটা পারেন দেশীয় ভাব ও রূপ রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতি-সাধনে মন দিলেন। মানুষের ধর্ম্মবোধ উন্নত হইলেই সমাজ আপনিই উন্নত হইবে, ইহাই তাঁর বিশ্বাস ছিল। দেশের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান সমস্তই তিনি দেশীয় ভাবেই উন্নত করিবার জন্য চিরজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ধর্ম্মতত্ত্বে এবং সামাজিক ব্যবহারেও তিনি অনেক জিনিস পশ্চিমের সভ্যতার ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলিকে এমনি বেমালুম দেশীয় আবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাদের বৈদেশিকতা কোথাও সহজে ধরা পড়িতে চায় না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র প্রভৃতি নব্য দল যখন সমাজ সংস্কারের তুমুল আন্দোলন তুলিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে অগ্রসর ও অনগ্রসর দুইদলের মধ্যে ভেদ হইয়া সেই ভেদ ক্রমে বিচ্ছেদ উপস্থিত করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন না; কিন্তু তিনি জাতীয়ভাবে ও ধীর ভাবে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জাতীয়তার আদর্শ লইয়াই তাঁর সঙ্গে নব্যদলের বিরোধ হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বিবাহ বিধির আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ ব্রাহ্মবিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলিয়াই ঘোষণা করিলেন, অপরপক্ষ অহিন্দু স্বীকারোক্তি আশ্রয় করিয়া তিন আইনের বিবাহকে মানিয়া লইলেন। তার পর হইতেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল।" নবগোপাল মিত্রের "হিন্দুমেলা" জমিয়া উঠিল; ঐ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেই মহর্ষির সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা'

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন; ঐ খৃষ্টাব্দেই বঙ্কিমের প্রতিভার নবরবি "বঙ্গদর্শনের" ভিতর দিয়া দেশে এক নূতন প্রভাত উপস্থিত করিল। দেবেন্দ্রনাথ ও আদি-ব্রাহ্মসমাজ বেশী পরিমাণে হিন্দুসমাজ-ঘ্যাঁষা হইয়া পড়িলেন; এবং তখন হইতেই স্বাদেশিকতার যুগ এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগ দেখা দিল। ক্রমে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, থিয়সফির আন্দোলন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এক নূতন ধর্ম্মসমন্বয়, জনসেবা ও কর্ম্মসন্ন্যাসের আন্দোলন,—এই সমস্ত পরে পরে উপস্থিত হইতে লাগিল। এ সমস্তেরই ভিতরকার কথা এই যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্ম ও সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে খর্ব্ব নয়, চাই কি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।

এই প্রতিক্রিয়ায় মুখেই ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ" লেখা হয়। "সামাজিক প্রবন্ধ" আলোচনা করিতে গেলে সকলের গোড়ায় এই কথাটা মনে রাখা দরকার।

প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলনের মধ্যে দুষ্য জিনিস যেমন অনেক থাকে, তেম্নি ভালও অনেক জিনিস থাকে। ঐকান্তিক ভাবে জাতীয়তাকে উপলব্ধি করিতে গিয়া ১৮৭২ হইতে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন পর্য্যন্ত, দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, ধর্ম্মনীতি, প্রাচীন সাহিত্য, প্রভৃতি সকল বিষয়ে যতটা ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা হইয়াছে, এমন আর কোন সময়েই হয় নাই। মনে রাখা দরকার যে, স্বদেশী আন্দোলন একটা ভুঁইফোড় আন্দোলন নয়—দেশ সম্বন্ধে এতকাল ধরিয়া এত বিচিত্র ভাবে অনুসন্ধান ও সাধনার ফলে আমাদের জাতীয় মনে যে প্রবল স্বদেশানুরাগ ও স্বাভিমান জন্মিয়াছে, সেটা অন্তঃসলিলা ঝরণার মত অগোচরেই প্রবাহিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হঠাৎ একটা জায়গায় বাধা পাইয়া তাহা প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য এক দিকে যেমন ঐকান্তিক জাতীয়তা কতগুলি গোঁড়ামি, অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তাহা জাতির অন্তর্নিগূঢ় নানা মূল্যবান সম্পদ্‌কে উদ্ঘাটিত ও আবিষ্কৃত করে—সে কথাটা ভুলিলে চলিবে না।

"সামাজিক প্রবন্ধে" ভূদেব যে জাতীয়তার আদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ঐকান্তিক জাতীয়তার আদর্শ। হিন্দুসমাজের মূল প্রকৃতি কি, তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন:—"হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আচার বিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ আছে। সেই আচারে পবিত্রতা, ধর্ম্মভীরুতা, আত্মসংযম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য, প্রভৃতি শান্তিময় ঋষিচর্য্যা শিক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু সমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার **অন্তঃশাসন** করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুসমাজের প্রকৃতি—শান্তি।". ."প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিশক্তিবাদী হিন্দু শান্তিপরায়ণ, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী, অনাসক্তচিত্ত।·· ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খৃষ্টধর্ম্মী ইউরোপীয় অশান্ত, স্বৈরাচার, উদ্যমশীল এবং ভোগসুখলিপ্স।" "আমরা

জানি যে, মনুষ্যের দোষগুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত। সুতরাং আমরা যে বংশজাত, অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই ঠিক্ তেমন হইতে পারেন না।...আমাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন থাকায়, আমরা জানি যে, লোকে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক দেশবাসী এবং এক ভাষাভাষী হইয়াও পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইয়া, পান ভোজনাদিতে একত্রিত না হইয়া, এমন কি অন্যোন্যের শরীর স্পর্শে অনুরাগী না হইয়া এক সমাজসম্বদ্ধ, এক মতানুগামী এবং এক শাসনের বশীভূত থাকিতে পারে।" ..."জাতিভেদ প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা স্থাপন করিয়া সকলেরই আত্মগৌরব রক্ষা করে।" "সকলেই মূলতঃ এক, কর্ম্মভেদে পৃথকভূত।"

এখানে তিনি তিনটি বড় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন (১) হিন্দুসমাজের অন্তঃশাসনের কথা (২) হিন্দুর প্রাক্তনে বিশ্বাস এবং সেই দিক হইতে পৃথিবীতে বৈষম্যের সমস্যার নিষ্পত্তি। (৩) বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা ও বৃত্তিভেদের ব্যবস্থার জন্য হিন্দু সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন শান্তিনিষ্ঠা। হিন্দুসমাজের মূল প্রকৃতি আলোচনা করিলে তার সামাজিক ইতিহাস ও দর্শনের দিক্ হইতে এই তিনটি মূলতত্ত্বকে চোখের সামনে রাখিতেই হইবে। কর্ম্মফলবাদী হিন্দু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলে পৃথিবীতে নানা বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে একথা বিশ্বাস করে বলিয়া তার মধ্যে ঐহিক শক্তিলাভের জন্য ঠেলাঠেলি ও কাড়াকাড়ির ব্যাপারটা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তারপর আবার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত কর্ম্মের ফল আছে, সেই ফলের চাপকেও এড়াইয়া যাইবার কোন উপায় নাই। যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মিয়াছে, যে বংশের যে বৃত্তি, সে ব্যক্তি সেই বংশের ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া সেই বংশের বৃত্তিকে অনুশীলন করিয়া চলিবে—সুতরাং অন্য বংশের লোকের প্রতি বা অন্য অন্য বৃত্তির প্রতি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিতে পায় না। তারপর আবার এই বর্ণবৃত্তিভেদমূলক শান্তিনিষ্ঠ সমাজের অন্তঃশাসনের ভার রাজার উপর নয়, ব্রাহ্মণের উপর। Legislative function—বিধি প্রণয়নের ভার ব্রাহ্মণের, কতক পরিমাণে Judicial function বিচারের ভারও ব্রাহ্মণের। রাজা শুধু executive head শাসনরক্ষণের কর্ত্তা এবং কতক পরিমাণে বিচারকর্ত্তাও বটেন। "বিবিধ প্রবন্ধে" —দ্বিতীয়ভাগে—"বঙ্গসমাজে অন্তঃশাসন" শীর্ষক অধ্যায়ে ভূদেব এই অন্তঃশাসনের ইতিহাস ও প্রণালীটি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"হিন্দুসমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। স্থূলতঃ এই শাসনের বিষয় এমন সকল পাপাচরণ যাহা রাজদণ্ডের অন্তর্ভূত নহে।...আর্য্যেতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলে তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না"। সেই কারণেই ব্রাহ্মণেরা 'সমাজপতি' হইয়া দেশের অন্তঃশাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের শাসনের কথা ঐ প্রবন্ধে গোড়ায় উল্লিখিত আছে বলিয়া কাহারও কাহারও

এমন অদ্ভুত ধারণা হয় যে ভূদেব 'অন্তঃশাসন' বলিতে সকল প্রকার হিতকর্ম্মে বাংলার জনসাধারণের আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার বুঝিয়াছেন। জনসমূহের সর্ব্ব বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্বের কোন কথাই ভূদেব কোথাও বলেন নাই—তাঁর জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে সে কথার কোথাও কোন স্থান হইতে পারেনা।

সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের প্রাচীন তন্ত্রের স্বরূপকে ভূদেব theocracy অথবা ধর্ম্মমূলক রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বরূপ বলিয়াছেন এবং সেই স্বরূপকেই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার শাসন দুই ভাগে বিভক্ত—বহিঃশাসন রাজার; অন্তঃশাসন ব্রাহ্মণের। ইহার ব্যবস্থা জাতিভেদ ও বৃত্তিভেদমূলক ব্যবস্থা। এরূপ শাসনে এবং ব্যবস্থায় অশান্তির বা বৈষম্যের অঙ্কুর পর্য্যন্ত কোথাও উদ্গত হইতে পারে না। কারণ, অশান্তি বা বৈষম্যের মূল পর্য্যন্ত উপ্‌ড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।

আর্টের তত্ত্ব

(বেনেডেটো ক্রোচের মত)

আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যে কার্দুচি (Carducci), ডানান্‌জিয়ো (D'Annunzio) এবং প্যাস্‌কোলি (Pascoli) ইউরোপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বছর কতক হইতে বেনেডেটো ক্রোচেও একজন তত্ত্ববিদ্ ও কলারসিক হিসাবে গুণীগণসমাজে আদর পাইতেছেন। তত্ত্বের সঙ্গে রসের মিলন প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় না; কিন্তু ক্রোচের রচনা যে কেউ পড়িয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন যে তাঁর মধ্যে সে মিলন ঘটিয়াছে। বিশ্লেষণ ও বিচারের শক্তিতে তিনি কোন তত্ত্ববিদের চেয়ে কম নন্, আবার অখণ্ড রসানুভূতিতে তিনি কোন কলা-রসিকের কাছেও হঠিয়া যান্‌না। সুতরাং আর্টের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মত বাঙালী পাঠকের প্রণিধানযোগ্য।

গতবারে আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা রাস্কিন্ ও অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের মত আলোচনা করিয়া দুজনেরই আর্টের আদর্শের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছিলাম এবং আমরা আর্টের কোন্ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তার আভাসও দিয়াছিলাম। ক্রোচের মতের সঙ্গে সেই আলোচনার যোগ আছে বলিয়া আমাদেরি বক্তব্য কথার পরিস্ফুটনের উদ্দেশে ক্রোচের মত উদ্ধার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'Intuition' শব্দটার বাংলা করিয়াছেন 'বোধি' শব্দের দ্বারা। তিনি বলেন, Intellectকে আমরা বলি বুদ্ধি; Intuitionকে বলা যাইতে পারে—বোধি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর Intuition এর প্রতিশব্দরূপে 'সহজ জ্ঞান' কথাটা ব্যবহার করিতেন। আমরা যুক্তির দ্বারা যাহা বুঝি তাহা বুদ্ধি; সহজ প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝি তাহা বোধি বা সহজ জ্ঞান। আমার বোধ হয় 'বোধি' কথাটার চেয়ে 'সহজ জ্ঞান' কথাটা 'Intuition'-এর ঠিক অর্থটা বেশী জ্ঞাপন করে।

ক্রোচে দেখাইয়াছেন যে, আমাদের জীবন-যাত্রায় আমাদের প্রায় বারো আনার উপর ভর ঐ সহজজ্ঞানের উপর। যে

ব্যক্তির দেশের আসল অবস্থা সম্বন্ধে একটা সহজ বোধ নাই, যে শুধু তত্ত্ব লইয়া তর্ক করে, কোন রাষ্ট্রনৈতিক তাকে আমল দেয় না। আর্টের সমালোচক কোন থিওরির দ্বারা আর্টের রসবিচারে প্রবৃত্ত হয় না, আর্ট সম্বন্ধে তার সহজ বোধের দ্বারাই সে রসকে উপলব্ধি করে এবং রসকে উদ্‌ঘাটিত করে।

অবশ্য ক্রোচে ইন্দ্রিয়বোধ, কল্পনা এবং ঐন্দ্রিয় ও কল্পনাসৃষ্ট সকল রূপ ও ভাবসঙ্গতি, এ সমস্তই সহজ জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। কেবল যে গুলি Concept বা বুদ্ধির বিষয়, সেই গুলিকে তিনি ইহার সীমানার বাহিরে ঠেলেন। সেইজন্য সহজ জ্ঞান এবং প্রকাশ ("Intuition and expression") এই দুয়ের মধ্যে কোন ভেদ তিনি দেখিতে পান্ না। কেননা, প্রকাশ ভিন্ন সহজ জ্ঞান দাঁড়াইতেই পারে না বলিয়া তাঁর ধারণা। অতএব, যে জিনিসটা প্রকাশে বাস্তব হইয়া উঠে না, তাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের বিষয় অথবা কল্পনার বিষয় হইতে পারে কিন্তু সহজ জ্ঞানের বিষয় হয় না। কারণ সহজজ্ঞান মানেই প্রকাশ। যদি বলি যে একটা চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণের সহজজ্ঞান আমার আছে, তবে তার ছবিটা নিশ্চয়ই আমার মনে এম্‌নি সুস্পষ্ট যে, আমি তাকে তখনি তখনি আঁকিতে পারি। তেমনি ভিতরকার যে কোন ভাব বা রস যখনি সহজজ্ঞানের বিষয় হয়, তখনি তার প্রকাশ হইয়া বসিয়া আছে।

সুতরাং সাধারণতঃ লোকের যে ধারণা যে, তাদের অনেক বিষয়েই বোধ আছে কিন্তু কবি বা চিত্রকরের মত প্রকাশের শক্তি নাই, ক্রোচে এই ধারণাটা একেবারেই ভুয়ো বলিয়া উড়াইয়া দেন্। তিনি বলেন, সাধারণ লোকের সব বিষয়েই যে বোধ থাকে, সেটা অত্যন্ত আব্‌ছায়া ও ভাসা-ভাসা, সেইজন্যই তাহা প্রকাশে স্পষ্ট হইয়া উঠে না। প্রত্যেকের জীবনযাত্রায় কিছু পরিমাণ প্রকাশ অবশ্যই দরকার করে—কিন্তু সে কতটুকু প্রকাশ? যেমন বই না পড়িয়া সূচী ও নির্ঘণ্ট পড়া—সাধারণ লোকে ঐ নির্ঘণ্ট পড়িয়াই কাজ চালায়, তাদের বই পড়ার আর দরকার হয় না। সেইজন্য তাদের মধ্যে কবি বা শিল্পীর প্রকাশশক্তি নিতান্ত কণা পরিমাণে আছে, কেননা তাহা যদি না থাকিত তবে কবি বা শিল্পীকে বুঝিবার শক্তি তাদের থাকিত না। সুতরাং ক্রোচের মতে সাধারণ লোক এবং প্রতিভাশালী আর্টিষ্টের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নাই, যাহা কিছু পার্থক্য তাহা পরিমাণগত ("Quantitative")। এক আধটুকু সহজ বোধের প্রকাশ সবলোকের পক্ষেই করা সম্ভব; কিন্তু নানা ভাবের সহজবোধের বিচিত্র জটিলতার প্রকাশ বড় আর্টিষ্ট ভিন্ন আর কারো দ্বারাই সম্ভাবনীয় নয়।

আর্টের তত্ত্বে একটা চিরকেলে তর্ক আছে যে, আর্টের বিষয় বড় না রূপ বড়? 'Content' বড় না 'Form' বড়? না, দুয়ের সমবায়েই আর্ট হয়? ক্রোচে বলেন যে, আর্টের রূপটাই বড়, আর্ট রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে সহজ জ্ঞান

ও প্রকাশের মধ্যে যখন কোন ভেদ নাই, তখন আর্টকে প্রকাশ বই আর কি বলা যাইতে পারে?

অতএব, সহজ জ্ঞানই আর্টের একমাত্র বিষয় এবং সহজজ্ঞান মানেই প্রকাশ—ক্রোচের এই মত মানিলে এ কথা বলার উপায় থাকে না যে, কেবলমাত্র অনুভূতি আর্টের বিষয়, কেননা অনুভূতিটা সহজ জ্ঞানেরই অন্তর্গত। এবং এই মতে, এ থিওরিও টেঁকে না যে, মানুষের কতগুলি বিশেষ বিশেষ রসবোধ বা "Æsthetic senses" আছে এবং সেইগুলিই আর্টকে সৃষ্টি করে। কারণ, ক্রোচের মতে সকল রকমের বোধেরই স্থান আর্টে আছে, শুধু সৌন্দর্য্য-বোধের ত নয়।

ক্রোচে বলেন যে আর্টের ক্রিয়া সমস্ত রকমের সহজ বোধকে বা "impressions"-কে একটা অখণ্ডরূপ দান করে; সেই জন্য আর্টের প্রত্যেক প্রকাশই আশ্চর্য্য-রূপে স্বতন্ত্র। আর্ট বহুকে এক করে, বিচিত্রকে সচিত্র করে। আর্টের রূপ বা প্রকাশ অখণ্ড রূপ বা প্রকাশ বলিয়াই আমরা যখন কবিতাকে বিশ্লেষণ করিতে যাই বা ছবির খুঁটিনাটিগুলা আলাদা করিয়া দেখিতে যাই, তখন সেই দেখিবার প্রণালীটা একেবারেই ভুল প্রণালী হইয়া পড়ে। মানুষের শরীরটাকে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, স্নায়ু, মাংসপেশী প্রভৃতিতে খণ্ডিত করিয়া দেখিতে গেলে যেমন মড়াকেই দেখা যাইতে পারে, জীবন্ত মানুষকে নয়—তেম্‌নি আর্টের প্রকাশকেও অখণ্ড ভাবেই দেখিতে হইবে, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাকে দেখা সম্ভব নয়।

অবশ্য তাই বলিয়া কি তার বৈচিত্র্য দেখিব না? সব প্রকাশই কি সাদাসিধা, জটিল প্রকাশ কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেমন কটাহের মধ্যে ধাতুর টুকরা-গুলাকে গলাইয়া লইয়া ভাস্কর তারপরে তার অখণ্ড মূর্ত্তিকে তৈরি করিয়া তোলে, তেমনই সমস্ত সহজ সহজ বোধগুলিকে গলাইয়া তবে আর্টের রূপ তৈরি হইয়া উঠে। সে রূপ অখণ্ড স্বতন্ত্র রূপ। এইজন্য আর্টে, কোন রূপের সঙ্গেই কোন রূপের সম্পূর্ণ সারূপ্য নাই।

আর্টে এই বিচিত্রতা অখণ্ডতা হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই, আর্টে মানুষ আপনার মুক্তিকে অনুভব করিতেছে। আপনার ভিতরকার সমস্ত বোধকে যখনি বাস্তব-রূপে আপনার বাহিরে আর্টের মধ্যে মানুষ অখণ্ড করিয়া দেখে, তখনি সে আপনার পাশ হইতেই আপনি মুক্ত হয়। এইজন্য আর্টিষ্টদের মধ্যে যেমন হৃদয়-রাগ বা "passion"এর প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করা যায়, তেম্‌নিই বিরতি ও শান্তি বা "serenity"র পরিপূর্ণতাও লক্ষ্য করা যায়। passion'-এর কটাহে বিচিত্র বোধ দ্রবীভূত হইতে থাকে, এবং মুক্তির শান্তির মধ্যে আর্টের অখণ্ড রূপ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

ক্রোচের মত সংক্ষেপে বলিলাম। ক্রোচের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল এইখানে যে, আর্টের প্রধান বিষয় 'Intuition' বা সহজজ্ঞান হইলেও, তাহাই আর্টের একমাত্র বিষয় নয়। আর্টের বিষয় রস, আর্ট মানেই রস। এই রস জিনিসটি জ্ঞান নয়—একটি অখণ্ড অনুভূতি আমাদের পাক

যন্ত্রের রস যেমন বাহিরের বস্তুকে শারীর বস্তু করিয়া তোলে, আমাদের হৃদয়ের রস-বোধও তেমনি বাহিরের জগৎটাকে এবং জ্ঞানের জগৎটাকেও অন্তরঙ্গ আনন্দ-লীলার জগৎ ও রসের জগতে পরিণত করে। আর্টের এই রসজগৎ একটা জগৎ, তাহা বিচ্ছিন্ন কুয়াশাপূর্ণ কতকগুলি সহজবোধের সমষ্টি মাত্র নয়। এই জন্য শুধু ইনটুই-শনের দ্বারা একটা সুছন্দিত সুবিন্যস্ত সুন্দর জগৎ গড়িয়া ওঠে না, একটা জগদাভাস পাওয়া যাইতে পারে বটে। তার দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় লোক তৈরি হয় না, মধ্যে মধ্যে আলোকের ঝলক পাওয়া যায় মাত্র। বিজ্ঞানে দর্শনে আমরা গড়ি অ-মূর্ত্ত concept'এর জগৎ, সাহিত্যে আর্টে আমরা গড়ি স-মূর্ত্ত রসের জগৎ। অবশ্য ক্রোচের এই কথাটা খুবই মানি যে প্রত্যেক আর্টিষ্টেরই এই রস-জগৎ বিশিষ্ট ও বিভিন্ন। অথচ সেই সঙ্গে এই কথাও বলিব যে, সে ভিন্নতা যেন পৃথিবী হইতে শুক্র বা বৃহস্পতি গ্রহের ভিন্নতার মত—পৃথিবী, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি যেমন এক সৌরজগতের অন্তর্গত, তেম্‌নি প্রতি আর্টিষ্টের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রসগোলক আবার এক পরিপূর্ণ বিশ্বমানব-জগতের অন্তর্গত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, অসংখ্যও যেমন সত্য, অদ্বৈতও তেমনি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

কাব্যসুধা। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি সমালোচনা-গ্রন্থ; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত। তবে এ সমালোচনার প্রণালী একটু স্বতন্ত্র ধরণের। —লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রগুলির এক-একটি গার্হস্থ্য সম্পর্ক ধরিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা এবং ইংরাজী সাহিত্যে, ঐ শ্রেণীর যে-সকল চিত্র আছে প্রাসঙ্গিকভাবে সেগুলির সহিতও উক্ত চরিত্রগুলির তিনি তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সমালোচনা-কালে সুন্দর আদর্শ সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার শ্রেষ্ঠতা ও মৌলিকতাও দেখানো হইয়াছে। এই গ্রন্থে "ননদ-ভাজ", "বোনে-বোনে", "শাশুড়ী-বৌ" ও "একান্নবর্ত্তী পরিবার" শীর্ষক চারিটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী ও সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্য হইতে এই সকল গার্হস্থ্য-সম্পর্ক কেমন মধুর উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে, তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইহারই আদর্শ কি-ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, লেখক তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা বেশ দক্ষ এবং লিপি-চাতুর্য্যের গুণে তাহা উপন্যাসের মতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের অনুশীলন-শক্তির ছাপ সর্ব্বত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। সমালোচনা-বিভাগে এই গ্রন্থখানি নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে। এ গ্রন্থ প্রত্যেক সাহিত্য-রসিক ও পারিবারিক আদর্শ-সন্ধানীর তুল্য আদরের সামগ্রী হইয়াছে। বহিখানির ছাপা-কাগজ ভাল—উপহার দিবার মত।

পাগলা ঝোরা। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা। এই গ্রন্থে "তামাকু তত্ত্ব," "মশক সঙ্কট" প্রভৃতি সতেরোটি সরস সহাস ও "কাশীবাস" নামে একটি অশ্রু-সজল সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে। কৌতুক সন্দর্ভগুলিতে বহুস্থলে লেখক সহজ সত্যের সহিত সরস শুভ্র হাস্যধারা মিশাইয়া দিয়াছেন। কোথাও অশ্লীলতার পাঁক নাই। গ্রন্থকারের ফোয়ারার ন্যায় "পাগলা ঝোরাও" বাঙ্গালী পাঠকের অবসরটুকুকে প্রমোদ-হাস্যে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল করিবে। এ বহিখানিরও ছাপা কাগজ বাঁধাই বেশ মনোরম হইয়াছে।

ধূলামাটি। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন বাণী-ভূষণ প্রণীত। কাকিনা শাহাবিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীনিখিল মোহন সেন, প্যারী-নিবাস, কাকিনা। মূল্য দুই আনা। এই ছোট পুস্তিকায় লেখক অল্প পরিসরে অনেক গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও অন্যান্য সাধকগণের বাণী সমূহ হইতে এই সকল কথার ভাব ও উপাদান সংগৃহীত। সাধারণ লোকে আসল ছাড়িয়া নকল কতখানি গ্রহণ করিবে, তাহা বিবেচ্য।

ইলিয়াড্। শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক, সিটিবুক সোসাইটি ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি ছেলেদের বহি। এ বহিখানিতে বেশ সহজ ভাষায় ইলিয়াডের কাহিনীটুকু বিবৃত হইয়াছে। রচনার ভঙ্গী সরল, বর্ণনায় কোনরূপ আড়ম্বর বা আস্ফালন নাই। লেখার গুণে কৌতূহল আপনা হইতেই উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। ছেলেরা এ বহিখানি পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইবে। গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি আছে।

পড়াশুনা। শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত। প্রকাশক; ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ ১০০ গড়পার রোড কলিকাতা। ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য—"শিশুদিগকে বর্ণ ও শব্দের ততটুকু জ্ঞান দেওয়া, যতটুকু হইলে তাহারা যুক্তাক্ষর ভিন্ন সহজ সরল ভাষায় লিখিত বাংলা পড়িতে পারে।" লেখিকার উদ্দেশ্য এ গ্রন্থে সিদ্ধ হইবে। এ গ্রন্থে নানাবিধ নক্সার সহিত শিশুকে বর্ণ পরিচয় করাইবার উপদেশ আছে। নারীই শিশুকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্রী—শিশুর চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া সহজ সরস ভাবে নারী যেমন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন, পুরুষ কখনই তেমনটি পারেন না। সেই জন্যই এ গ্রন্থে মহিলা লেখিকা শিশুকে বর্ণ পরিচয় দিবার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুধুই অভিনব নহে, তাহা সহজ হইয়াছে এবং কাজের হইয়াছে। গ্রন্থখানি বহু চিত্রে মণ্ডিত —এবং সমস্ত চিত্রগুলিই শিশুদের চিত্তে প্রচুর আনন্দ ও কৌতূহল জাগাইয়া তুলিবে। এ গ্রন্থ হাতে পাইলে পড়াশুনাকে বিভীষিকার মত না ভাবিয়া ছেলেরা খুব লোভনীয় বলিয়াই বুঝিবে।

মুরজ-মুরলী। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ।

শুভকর্ম্মে গদ্য-পদ্য। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। কলিকাতা, লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক "শুভকর্ম্মে গদ্য পদ্য লিখিবার কয়েকটি মোটামুটি নিয়ম" বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং নিজের লেখা "বিবাহের গদ্যপদ্য" সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৪ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০

১৩২৪ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
অন্ধকার (গল্প)	... শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৬৫৯
অভাব ও প্রতিকার	... শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বি-এ	...	৭২২
অরোরা (গল্প)	... শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৭২৯
অভাগী (গল্প)	... শ্রীমতী রেণু রায়	...	৯৭৫
অভিনয়ের কথা (সচিত্র)	... শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৭৭৩
অভিজ্ঞান (কবিতা)	... শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	১১৫
আঁধিয়া (গল্প)	.. শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	১০৯
আহ্বান (কবিতা)	... শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৮
আহ্বান	... শ্রীসরলা দেবী বি-এ	...	১১৬
আর্টে অধিকারী-ভেদ (সচিত্র)	... শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৬
আলেয়ার আলো (উপন্যাস)	... শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৬২৯, ৭৪৫, ৮৪৩, ৯১৫	
ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ	... শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬২৪
ইংরেজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ	... শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৮
ইন্দু (গল্প)	... শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬০
উচ্চশ্রেণী ভারতবাসীর সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ	... শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮
উদারনৈতিক ভারতবাসীদিগের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন	... শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১১
উপদেশের তাড়স্ (গল্প)	... শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০৪
এবারের আগমনী (কবিতা)	... শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৫৯
কণারকে বৌদ্ধপ্রভাব (সচিত্র)	... শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	...	১০৮
কাগজের হাতী (কবিতা)	... কলমগীর	...	৮৮
কুকী	... শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	৯৪৫
কোরিয়ার কবিতা	... শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	১০৪৫
জলৌকা ও মহীলতা	... ঐ	...	১০৪৬
ভগবানের চিড়িয়াখানা	... ঐ	...	১০৪৫
স্পষ্ট	... ঐ	...	১০৪৭
গান	... শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬৮৭
ছাইভস্ম (গল্প)	... শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯০১
ছিটে-ফোঁটা	... শ্রীঅসিতকুমার হালদার	...	৮৮৩
জাতীয় জীবনে নৈতিক অবনতি	... শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল,	...	৮২২
ঝড় (গল্প)	... শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		৭৬১
তরুণা (গল্প)	... শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১০০৬
তিপ্‌রা বা তিপারা জাতি	... শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	৮০৩
ত্রিপুরা রাজ্যের কতিপয় জাতি	... শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	১০১৫
দিনগণনার আদিতত্ত্ব	... শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ,	...	৮৫৮
দেশী ছবির মেলা (সচিত্র)	... শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১০৩৯
নব-হিন্দুদের সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ	... শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৭১
নারীর অধিকার	... শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বি-এ	...	১০০১
নিবেদন (সচিত্র)	... স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ডি-এস-সি, সি-আই-ই, সি-এস-আই,	...	৮৬২
নীলপাখী (নাটিকা)	... শ্রীযামিনীকান্ত সোম	৬০৫, ৭৩২, ৮১২	
নৈসর্গিকী (কবিতা)	... শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	...	৭৭১
পর-ঈ-তাউস (গল্প)	... শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮৮৬
পরাজয় (গল্প)	... শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ বি-এল	...	১১৪৭
পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি ও পল্লী-সংস্কার	... শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	...	৭০৫, ৮২৭
পল্লী-উৎসব (চিত্র)	... শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ		৭১১
"পাখর ফ্যাট কর্ দরিয়া ছুটে !" (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১০৭৩
পুশ্‌কিনের কবিতা	... শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৯৮৭
আমার ছবি	... ঐ	...	৯৮৮
ভগ্নহৃদয়	... ঐ	...	৯৮৮
মাতুলী	... ঐ	...	৯৮৭
স্বপ্নময়ী	... ঐ	...	৯৮৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রভাতে ও রাত্রে (কবিতা) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ,	৬৭৬
প্রেম (কবিতা) ...	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	৯৪৩
ফিরে-ফিরতি (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৮৭৫
বসন্ত-বিলাস (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায় ...	১২১
বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের নিয়ম ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল ...	৬৬৬
বদ্ধ ঘরের ঘুলঘুলিতে (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৭০০
বর্ত্তমান ভূগোলের দিগ্‌দর্শন ...	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ, ...	৭২০
বর্ত্তমান সাহিত্যে যুগ-ধর্ম্মের রূপ ...	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ...	৯০৬
বাদশাহ আকবরের নিরক্ষরতা (সচিত্র)	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, ...	৬৫৫
বিদায়ে (কবিতা) ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ, ...	৬৪২
ভারতবাসী ও ভারতীয় ইংরেজ ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৫৫
ভূতগত ব্যাপার ! (খেয়ালি নক্সা) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৬৪৬
মল্লারের সুর (গল্প) ...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ...	৩৭২
মাসকাবারি— ...	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ,	
অনুন্নত জাতিদের দুর্দ্দশা নিবারণের প্রস্তাব ...	... ...	৯৬৪
আচার ও বিচার ...	... ...	৮৯৩
কংগ্রেস ...	... ...	৯৬১
"পত্র" ...	... ...	১১৪৩
বঙ্গে আত্মহত্যা ...	... ...	৬৯১
বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি ...	... ...	৬৯৪
বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা ...	... ...	৭৯৭
বাঙ্গলার গীতি-কবিতা ...	... ...	১০৬০
বুদ্ধিমানের কর্ম্ম ...	... ...	৭৯৩, ৮৮৯
ভারতবর্ষে একভাষা প্রচলনের প্রস্তাব ...	... ...	৯৬৯
শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতা ...	... ...	৯৬৩
সাহিত্যের দায়িত্ব ...	... ...	১০৫৭
সোস্যাল কনফারেন্সে ডাক্তার রায়ের অভিভাষণ	... ...	৯৬৫
স্বামী ...	... ...	৬৯৮
স্বামী-স্ত্রী ...	... ...	৬৮৭
যুগান্ত (কাব্য নাট্য) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৯২৫
যুদ্ধ-গীতি ...	শ্রীসরলা দেবী বি-এ, ...	৯৮৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রুষিয়ার কবিতা ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৯৫৫
আপ্ত ...	ঐ ...	৯৫৮
কালোশাল ...	ঐ ...	৯৬০
তবু ...	ঐ ..	৯৫৭
তুষার-নদীর জাগরণ ...	ঐ ...	৯৫৬
নিবেদন ...	ঐ ...	৯৫৭
ভোরের বেলা ...	ঐ ...	৯৫৫
সাঁচ্চা সল্লা ...	ঐ ...	৯৫৯
লক্ষ্মীছাড়া (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৯৯২
লুকিবিদ্যে (গল্প) ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯৯৯
শাক্ত-সাহিত্য ...	শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ ...	৮৩৫
শিল্পশিক্ষা ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৫৯৮
শিল্পচর্চ্চা ...	শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বি-এ ...	৯৩৬
শীতের সকালবেলা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ, ...	৯৭৯
শেষ-গোধূলি (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায় ...	৬৭১
শ্রম-বিভাগ ...	শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বি-এ ...	১১৩৪
সমালোচনা ...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা ৭০১,৮০০,৮৯৫,৯৭৯,১০৬৮,১১৫২	
সুরের বন্ধু (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১১২৭
সেকালের গল্প (সচিত্র) ...	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ ...	৯৯১
সৌজাত্যবিদ্যা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল্, ...	১১২২
সৌভ্রাত্র (কবিতা) ...	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ ...	৬২৪
স্বরলিপি ...	শ্রীসরলা দেবী বি-এ ...	৯৮৪
স্বরলিপি ...	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৯৪
স্বীকার ...	শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী ১০২৬, ১১১২	
স্মরণ (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৬৪৪

চিত্র সূচী

চিত্র	পৃষ্ঠা
অতিবিলম্ব (বহুবর্ণ)	৯০০
অশ্বমূর্ত্তি	১০৮৫
আচার্য্য বসুর দার্জ্জিলিঙের গবেষণা-মন্দিরের ধ্যান-বিতান	৮৬৭
আচার্য্য বসুর দার্জ্জিলিঙের গবেষণা-মন্দির	৮৭১
আচার্য্য বসুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী সিজ-বাড়িয়ার গবেষণা-মন্দির	৮৭৪
কণারক—মন্দির ; উত্তরদিক	১০৮৪
কাজ্‌রি (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৫৯৬
কাঞ্চনজঙ্ঘা (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৮০২
কালীপ্রসন্ন সিংহ	৯৯৫
কাশ্মীর—মার্ত্তণ্ড-মন্দির	১০৯২
কৃষ্ণ ও রাধা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৬৭৯
চন্দ্রালোকে (প্রাচীন চিত্র)	৬৮১
জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের হস্তাক্ষর	৬৫৭
নটকৃষ্ণ (প্রাচীন চিত্র)	৬৮২
পথের সাথী (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত	৯৮২
—"পুষ্প যেমন আলোর লাগি—"(বহুবর্ণ) শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত	৭০৪
প্যারীচাঁদ মিত্র	৯৯১
'ফাল্গুনী'র ছবি—অন্ধ বাউল শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১০৪০
'ফাল্গুনী'র ছবি—দোদুল দোলা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১০৪১
'ফাল্গুনী'র ছবি—শীত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১০৪৩
বসু-বিজ্ঞান মন্দির	৮৬৩
বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চাতের বাগানের মধ্যে বট ও অশথ গাছে অবলম্বিত মঞ্চ শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত	৮৬৪
বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চাতের বাগান	৮৬৫
বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশদ্বার	৮৬৯
বাদশাহ আকবর	৬৫৬
বিষ্ণুমূর্ত্তি—কণারক	১০৮৯
ভেলাস কুয়েজের একখানি ছবি	৬৭৮
মাতৃমূর্ত্তি	৬৮
মিঃ ম্যাথিসন ল্যাং ও মিস হাটিন ব্রিটন	৭৭৮
মিঃ ফোর্বস্ রবার্টসন	৭৮০
রামনারায়ণ তর্করত্ন	৯৯৭
শিক্ষাদান	১০৮৮
সারা বার্ণাড	৭৭৫
স্যার হার্বার্টট, এলেন টেরি ও মিসেস কেণ্ডাল	৭৭৩
স্যার হেনরি আরভিং	৭৭৪
স্যার এফ, আর, বেনসন	৭৭৬
হতাশের খেদ-- শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৬৯৫
হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের হস্তলিপি	৬৫৮
হোলি-খেলা (বহুবর্ণ—প্রাচীন চিত্র)	১০৭২



পূজারিণী

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত



কাজরি

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪১শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২৪ [৭ম সংখ্যা

এবারের আগমনী

শরতের সে সোনার আলো কই গো কোথা আজ !
কোথায় বা সেই কিরণ-জ্বালা
নীলের গায়ে, বকের মালা,
কাশের ঝালর দুলিয়ে-দেওয়া নদীতীরের সাজ ?
পথের পঙ্ক ঘুচিয়ে দিয়ে,
ধানে সোণার ঢেউ দুলিয়ে
ফুরফুরে সে শীতল সমীর পিছিয়ে কেন আজ,
ভরা-নদীর জলে কোথা মৃদঙ্গ আওয়াজ ?

মহামায়ার আগমনী, সাজবে মাঠ বন,
নাইত জানা, কোথায় পড়ে সে রাঙা-চরণ !
কমল সে তাই সরোবরে
শতদলে সলিল ভরে,
তাইতে তৃণ বিছায় পথে কোমল আস্তরণ,
ব্যজন করে স্নানে শুচি ব্যাকুল সমীরণ !

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আয়োজন সে নাই গো কেন আজকে বঙ্গভূমে ?
আকাশ যেন ধূসর মেঘে মগ্ন চিতা-ধূমে !
হাহা করে' বইছে হাওয়া,
চোখের জলে কানন ছাওয়া,
কমল-মুখে নাই যে হাসি, নেতিয়ে আছে নুমে,
আলোর চোখে মিলায় আলো, পাংশু মরণ-ঘুমে !

নির্ব্বাসনে কাঁদে ছেলে শূন্য গৃহদ্বার,
শত শত মায়ের প্রাণে, শুধুই হাহাকার !
তাইতে মহামায়ার মনে,
নাইরে পুলক আগমনে,
লুটিয়ে কাঁদে পথের পরে শিউলী-ফুলের সার
আগমনী গায়না বাঁশী, কাঁদছে সুরে তার
বিসর্জ্জনের বিদায়-ব্যথা,
অশ্রুভরা শোকের কথা,
মায়েরি-কোল-হারা-ছেলের বেদনা অপার,
পর্ব্বদিনের জ্বলেনি দীপ, ভুবন অন্ধকার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শিল্পশিক্ষা *

কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আগে বা পরে কিছু বলিতে হয়। মন্ত্র পড়ার এই প্রথাটা সকল দেশেই চলিত দেখা যায়। সর্ব্বদেশের সনাতন এই নিয়মকে অগ্রাহ্য করিতে পারি—এমন সাহস আমার নাই। অতএব এ-ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে আমাকেও দু'এক কথা বলিতে হইবে।—কি বলিব ? নূতন কিছুই নয়। যুগে যুগে যাঁরা অবতার হন তাঁরাই নূতন কথা বলেন—আমরা সেই সনাতন উপদেশেরই ধূয়া ধরি মাত্র। আজও সেই পুরাতন কথাই এস্থলে একটু-ব্যাখ্যা করিব।

আমরা সকলেই জানি—এ জীবনটা দুদিনের, ক্ষণভঙ্গুর,—নশ্বর—

যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান রহে যুগ পরিমাণ
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।

কিন্তু এই সত্যেরই পাশাপাশি একই সঙ্গে আর একটি মাহাত্ম্যময় মহাসত্য যে

* নারী-শিল্পাশ্রমের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে পঠিত।

গাঁথা রহিয়াছে তাহা কি ? না এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেও বিরাজিত দেখিতে পাই একটি ধ্রুবা সার্থকতা। জীবন দুদিনে নষ্ট হয় কিন্তু এই সার্থকতা অমর ভাবে বংশানুক্রমে মানব জাতিকে অমর করিয়া তোলে। এই জন্যই ইয়োরপের যুদ্ধে আজ স্বদেশী বিদেশীর মধ্যে প্রাণদানের এত আগ্রহ এত উৎসাহের বন্যা ছুটিয়াছে।

কিন্তু সার্থকতা এই কথাটা খুব একটা বড় কথা; শুনিলেই মনে কেমন একটা হতাশা জাগে, কি করিয়া ক্ষুদ্র আমি এ জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিব! অথচ হতাশ হইবার কারণ ইহাতে নাই।—প্রকৃত পক্ষে, বড় ছোটরই সমষ্টি মাত্র, অণু-পরমাণুতেই এই প্রকাণ্ড জগৎ। আমরা যদি কেবল মাত্র ছোট্ট মুহূর্ত্তগুলিকেই ধরিতে শিখি তাহা হইলেই আমাদের জীবন অতি সহজে সার্থক হইয়া ওঠে। এই মুহূর্ত্তগুলির সদ্ব্যবহারেই কবি ভাবজগতের বিজ্ঞানবিদ বহির্জগতের রাজা হইতে সক্ষম। ইয়োরপের লোকে মুহূর্ত্তকে বাঁধিতে জানেন তাই যে কার্য্যে তাঁহারা অসিদ্ধ থাকিয়া যান তাহাতেও তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা নষ্ট হয় না। ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাদের পথ অনুসরণে সেই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষার খুবই অভাব।—সম্ভবতঃ এই কারণেই আমাদের এমন অধঃপতন হইয়াছে। অবশ্য স্বীকার করি—আমাদের দেশের জলবায়ু আলস্যসঞ্চারী, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে চেষ্টা থাকিলে আমরা কি এই প্রতিকূল আবহাওয়াকেই আমাদের অনুকূলে আনিতে পারি না ? শীত কি ইংরাজকে বাঁধিয়াছে না ইংরাজ শীতকে বশ করিয়াছেন ? শীতদেশের মানুষ যাঁহারা তাঁহারা কি এদেশে আসিয়া আলস্যের স্রোতে গা ঢালিয়া দেন ? এমন কি, গরমি কালেও তাঁহাদের টেনিস খেলাটি বাদ যায় না, আর দুপুরের রৌদ্রেও মাঠে ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিতে তাঁহারা মাতিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন, নানাকারণে,—প্রধানতঃ শরীর-রক্ষার জন্য এরকম ব্যায়ামের প্রয়োজন। জাপান ইহারও উর্দ্ধে উঠিয়াছে; জাপানীরা খাঁদা নাক—উচ্চ করিতে সচেষ্ট। জাপানীরা নাকি বলিয়াছে যে একশতাব্দির মধ্যে দেশে আর একটিও খাঁদানাক দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ইহাকেই বলি মানুষ!

আমাদেরও মানুষ হইতে হইলে অন্ততঃ আলস্যটাকেও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এখন কি আমরা কাজ করিনা বা সারাদিনই আলস্যের স্রোতে গা ঢালিয়া চলি ? না তাহা নহে। তবে যে কাজটুক না করিলে ঠিক চলেনা, প্রাণধারণের জন্য যেটুক দরকার সেই কাজই আমরা করি। যাঁহারা এ সম্বন্ধে অসাধারণ এ স্থলে অবশ্য আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগকে বর্জ্জন বিধির মধ্যেই ধরিয়া লইতে হইবে কিন্তু সাধারণত সকলেরই এবং সকল কাজের মধ্যেই কেমন একটা তৎপরতার অভাব, কেমন একটা নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হইতে পারে—ইহা গীতা কথিত নির্লিপ্ত ভাব, পরজন্মের রাস্তা ইহাতে সাফ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহজন্মে ইহাতে মঙ্গল নাই ইহা নিশ্চয়।

কৃষকগণ তাহাদের বাপ-পিতামহের চালে মাঠের কাজ করিয়া যায়—তাহা ছাড়া বেশীকিছু উন্নতির আশা রাখেনা। কুলি মজুর বোঝা উঠাইয়া পয়সাটি হাতে পাইলেই নিশ্চিন্ত, তাহার উপর আর একটি সামান্য কাজ করিতে বলিলে তাহারা মনে করে তাহার পক্ষে সেটা অকর্ম্ম। এমন কি একজন মেথরকে তাহার নিয়মিত কাজ ছাড়া যদি একখানা কোদাল ধরিতে বল বা জানালা দরজাগুলো সাফ করিতে বল—ত সে বলিবে—তাহা করিলে তাহার জাত যাইবে। একজন মেম এই বলিয়া আমার নিকট দুঃখ করিতেছিলেন;—শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝিতে পারি না। ঘরের দাসী বাঁদি হইতে গৃহিণীগণ পর্য্যন্ত সকলেই নিজের নিজের বাঁধা কাজ-টুক শেষ করিয়া—আহারান্তে দিবানিদ্রার পর কেহ বা পা ছড়াইয়া বসিয়া কেহ বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া যতক্ষণ গল্পের আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন ততক্ষণ কোন কাজের চিন্তাতে মন দিলেও কাজ হইত। এইরূপে আমরা কাজকে ফাঁকি দিতে গিয়া কিন্তু নিজেকেই ফাঁকি দিই। উক্তরূপ গল্পের বেশীটাই পরচর্চ্চা—এবং অনর্থ-উৎপাদক। ইংরাজ যে এ সম্বন্ধে দেবর্ষি মহর্ষি তা নন; কোন দেশেই কেবল নিজেকে লইয়া বা নিজের কথা লইয়া সংসার চলে না। তবে তফাৎ এই যে তাঁহারা কাজ ভুলিয়া কথা কহেন না। এখন এই যুদ্ধের সময় ইয়োরপের মেয়েরা যেরূপ কাজ করেন—শুনিলে অবাক হইতে হয়। কৃষিকার্য্য হইতে গুলিবারুদ প্রভৃতি প্রস্তুতের ভারও তাঁহাদের উপর। নহিলে এ যুদ্ধ চলিতেই পারিত না। এ দেশের ইংরাজ মেয়েরাও সারাদিন অনন্তর রকম কাজ করেন। বড় বড় ইংরাজের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা মুখে গল্প করিতেছেন কিন্তু হাতে সৈনিকদের জন্য সেলাই চলিতেছে।

ইংরাজদের কাছে আমরা বাইরের চালচলন অনেক শিখিতেছি কিন্তু যে সকল গুণে তাহারা এত বড় একটা জাতি, তাহাদের সেই গুণগুলি শিক্ষা করাই কি আমাদের সর্ব্বাগ্রে উচিত নহে? আমরা এখন চাহিতেছি রাজনৈতিক উচ্চাধিকার, আমরা চাহি স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু এ কার্য্যে যোগ্য হইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া কি আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন নহে? সে বিষয়ে আমরা কি করিতেছি? এখন গৃহিণীর কেবল রন্ধন-কার্য্যেই নিযুক্ত হইলে চলিবে না—এখনকার উপযোগী নানাকার্য্যে তাঁহাকে সুদক্ষ হইতে হইবে। সেই দক্ষতা লাভের প্রধান মন্ত্র মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার। সেই মন্ত্রেই প্রথম আমাদের উত্তমরূপে দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। লেখা-পড়া এবং শিল্পবিদ্যাদি শিক্ষা মুহূর্ত্ত ধরিবার প্রধান উপায়। এবং ইহাতে নারীমাত্রেরই অন্তর্নিহিত শক্তি উন্মেষিত হইয়া ওঠে। সুশিক্ষা পাইলে তাঁহারা নিজের এবং দেশের অনেক কাজ করিতে পারেন।

দুঃখিনী বিধবাগণ চিরদিনই আমাদের দেশে আত্মীয়ের গলগ্রহ। করুণহৃদয় বিদ্যা-সাগর তাই পুনর্ব্বিবাহ ব্যবস্থাদানে তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উদার হৃদয় মনীষি লোকের বহু চেষ্টাসত্ত্বেও বিধবা

াহ আমাদের দেশে আজও সহজ স্বাভাবিক া উঠিল না। তবে কি দুঃখভোগ ছাড়া াদের আর কোন উপায় নাই? নিশ্চয়ই ছে। শিক্ষা লাভে তাহাদের জীবন সার্থক য়া উঠিবে। যখনি কোন বিধবার মুখের ক চাইয়াছি চিরদিনই এই কথা আমার মনে গিয়া উঠিয়াছে। এই ইচ্ছার কি কোনই ন হয় নাই? সে কথা বিশদরূপে বলিবার ন ইহা নহে তবে এইটুক বলিতে ারি—যে ভগবান কোন শুভ ইচ্ছাকে ফল করেন না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিরণ্ময়ী দেবী একটি বিধবাকে লইয়া যে আশ্রম পন করিয়াছিলেন—তাঁহার ঐকান্তিক ত্ন সেই আশ্রম এখন অনেকগুলি ধবার শিক্ষা ও আশ্রয় স্থান। এ র্য্যন্ত প্রায় তিনশত বিধবা সেখান হইতে খিয়া অন্যত্র শিক্ষাদানে এবং অন্যান্য র্য্যে ব্যাপৃত আছে। আর ২৫।৩০ জন নাথা নারী নিয়মিতভাবে এখানে এখন লেখাপড়া এবং শিল্প শিক্ষা করে। কিন্তু একটি শিল্পাশ্রম বা একটি বিধবাশ্রমে দেশের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। সহরে গ্রামে যত্র তত্র যেমন বহু নারীবিদ্যালয়ের প্রয়োজন সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষারও আয়োজন হওয়া উচিত। এবং এ চেষ্টা যাঁহারাই করেন তাঁহারাই আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন।

কেবল বিধবা বা অনাথা নারী কেন সাধারণ নারী মাত্রেরই পক্ষে এই অর্থকরী শিল্প-শিক্ষা হিতকর। আজকাল আগের মত অল্প ব্যয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থনারী ঘরের দরকারী সিলাই চাপকান জ্যাকেট কামিজ নিজে প্রস্তুত করিতে পারিলে দরজির খরচ কতটা বাঁচিয়া যায়। মুসলমান কন্যাগণ গৃহের অন্তরালে থাকিয়া সূচিকার্য্য করিয়া অনেকে সংসার প্রতিপালন করে। ধনীঘরণীর শিল্পশিক্ষা ব্যয়-সঙ্কোচ জন্য তেমন নহে, কিন্তু কোনরূপ কলাবিদ্যা ভাল করিয়া শিখিতে পারিলে মনোবৃত্তি কত স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। ইহা ব্যতীত স্বহস্তপ্রস্তুত শিল্প পরোপকারে দান করিয়া আনন্দ এবং প্রশংসা উভয়ই এক সঙ্গে তিনি লাভ করিতে পারিবেন। শুনিতে পাই এক সময়ে ভারতনারী শিল্প-কলায় সাতিশয় সুনিপুণা ছিলেন। ভারতের অন্যদেশের কথা বলিতে পারি না কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়েরা বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কাঁথা প্রভৃতি নানারূপ সূক্ষ্ম শিল্প রচনায় এখনো সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এ সকল কাজে, সময় ও পরিশ্রম যত লাগে, তদনুরূপ লাভ হয়না।—তাই এখন কাটা শিল্পই প্রধানভাবে অর্থকরী। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কাটা কাপড়ের ব্যবহার ছিল না সেইজন্য বাঙ্গালা দেশে এত জাতের মধ্যেও দরজি জাত নাই। কিন্তু এখন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দরজির কাজও আমাদের শিখিতে হইবে। কাট ছাঁটের সেলাই ব্যতীত যে সকল আবশ্যকীয় সূক্ষ্ম চারু-শিল্পের বেশী ব্যবহার আছে,—তাহার বিক্রয়েও লাভ হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের প্রসাদে এরূপ শিল্প বিক্রয়েরও সুবিধা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট গৃহশিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইংরাজিতে একটি প্রবাদ

আছে নিজেকে যে সাহায্য করে ভগবান তাহারই সহায় হন। কথাটা বড় সত্য। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণেও আমাদের দক্ষতা থাকা চাই। অতএব এ-রকম নারী শিল্পাশ্রম যতই স্থাপিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল এবং যাঁহারা নারীশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করেন তাঁহারাই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। এই শিল্পাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাত্রী মজুমদার মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী এই আশ্রমের মঙ্গলকল্পে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, শুনিলে তাঁহাদের প্রতি হৃদয় শ্রদ্ধানত হইয়া উঠে। ভগবান সিদ্ধিদাতা যে তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হৃদয়ের রক্ত দিয়া যে মঙ্গল-ব্রত গ্রহণ করা যায় তাহার পরিণাম ব্যর্থ হইবার নহে ইহা আমার বহু অভিজ্ঞতার ফল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ইন্দু

প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী, সদা-হাস্যমুখই,ভায়া-আমার মূর্ত্তিমান আনন্দের মতো,—পণ্টুনের পুলিশ থেকে জাহাজের যাত্রী, সারেং, খালাসি সকলের কাছে প্রিয়; কেবল অবিন ডাকে তাঁকে প্রিয়া বলে।

কবে কোন্ সূত্রে ভায়া যে আমার ষ্টীমারের 'শুশুক-সভা' বা ডল্‌ফিন্-ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট অবিনের কাছ থেকে এই সম্মানের উপাধিটা লাভ করেছিলেন তা আমার মতো একজন নতুন শুশুকের জানা সম্ভব নয়; কেন না ষ্টীমারের ডেকে সবেমাত্র একটি শীতকাল কাটিয়ে আমি প্রথম বসন্তে পা দিয়েছি, সুতরাং শুশুক-সভার বাই-ল অনুসারে আমার এখনো দুধে-দাঁত ওঠেনি,—আসল বয়েস আমার যতই হোক না।

এখানকার নিয়ম অনুসারে ক্রমান্বয়ে চার-পাঁচটা বছর, দিন আট-প্রহর, ষড়ঋতুর সবকটাতে জল-বাতাস আলো-অন্ধকারে খেয়া দিয়ে, চল্লিশের ঘাট পেরিয়ে, উনপঞ্চাশের বাতাসে পাল তুলে পঞ্চাশের পারে—যেখানে চিরবসন্তের কুঞ্জতীরে পাপিয়া পিয়া পিয়া বলে দিন-রাত ডাকছে সেখানে আমার তরী নিরাপদে এনে ভেড়াতে হবে তবে যদি পিয়ার খবর পাই! আমার বয়েস সবে ছেচল্লিস সুতরাং উনপঞ্চাশে সুবাতাসের সঙ্গে পিয়ার খবরও আমার পেতে এখনো দেরি আছে—যদি না ইতিমধ্যে হঠাৎ ভালো-মন্দ একটা-কিছু ঘটে যায়। এমন দু-এক সময় ঘটে যে খবর না চাইতে খবরটা এসে জোর করে কানে ঢোকে, যেমন মেঘ না চাইতে জল, এবং খালি জল চাইতে যেমন জল-খাবারের থালা—যেটা বলব সে কাহিনীটা এমনি-করেই আমার কাছে পৌঁছল।

হচ্ছিল সেদিন লাঠি-ভাঙার মামলা। অবিন আজ কদিন ধরে লাঠি ভাঙবার চেষ্টায় ফিরছে—কারু পিঠে নয় বটে কিন্তু

লাঠি-বংশ তাতে করেও যে রক্ষে পাবে এমন আশা কিছুমাত্র নেই। আমরা সবাই লাঠি আনা ছেড়ে দিয়েছি। কেবল ভায়া-আমার তাঁর নিজের লাঠি আঁকড়ে রয়েছেন! তিনি অবিনকে লাঠি ভাঙতে উস্কে দেবার মূল সুতরাং তাঁর লাঠি যে চিরদিন অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান থাকবে সেটা আশা করা অন্য লোক হলে যেতোনা,কিন্তু তিনি অবিনের প্রিয়া-উপাধির পাত্র, সেইজন্যই যদি তাঁর লাঠিটাও বেঁচে যায়। সমস্ত জাহাজের মধ্যে এখন দুটিমাত্র লাঠি। এক, ভায়ার হাতের ঘোড়ার কাটা পা দেওয়া আবলুসের ছড়ি, আর অবিনের হাতের বাঁশীর উপরে মিনের কাজ-করা আধা-পাখী আধা-মানুষ একটি কিন্নরী-বসানো হিমালয়ের দেবদারু যষ্টি।

এই দুই লাঠিতে যেদিন ঠোকাঠুকি বাধ্‌লো, সেদিন জলে-বাতাসে মেঘেতে-আলোতে কোনো বিবাদ ছিল না। এমন-কি ওস্তাদী রাগরাগিনী আজ বাদী-বিবাদী সব সুরগুলো নিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিল। একটা আরাম আর শান্তির মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে উত্তরের হাওয়া কেটে। জলের ঢেউগুলোতে কিছুমাত্র চঞ্চলতা নেই; যেন ঘুমন্ত বুকের নিশ্বাসের মতো আস্তে উঠছে পড়ছে। সূর্য্যাস্তের দিকে কোনো রঙের খেলা নেই। স্বর্ণ-চাঁপার মতো একটি স্থির দীপ্তি সমস্ত পশ্চিম আলো করে রয়েছে। তারি উপরে তীরের গাছ যেন কালি দিয়ে আঁকা দেখছি। ভরা-পালের নৌকো যেমন, আজকের সন্ধ্যায় সমস্ত পৃথিবী তেমনি যেন চম্পাই রঙের প্রকাণ্ড পালখানি তুলে রাত্রির মুখে স্বচ্ছন্দ গতিতে ভেসে চলেছে নিঃসাড়ায়। প্রাতঃসন্ধ্যার অরুণোদয়ের তপ্তকাঞ্চনের সঙ্গে কতটা হীম মেশালে সায়ংসন্ধ্যার এই চাঁপাফুলি আলোর রংটি পাওয়া যায়। এটা যখন আমি বিশ্বকর্ম্মার কাছ থেকে মনের নোট্‌বুকে টুকে নিচ্ছি—থার্ড ক্লাসের একখানা বেঞ্চির কোণে বসে, সেই সময় ফার্ষ্ট ক্লাসের দিকে 'করেন-কি! করেন-কি'! রব উঠলো! কেউ জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কি-না দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি অবিন তার হাঁটুর চাড়া দিয়ে তার নিজের লাঠিখানা ধনুকের মতো বেঁকিয়েছে; তার মুখ গোলাপফুলের মতো রাঙা; আর-একটু হলেই লাঠিখানা দু-টুকরো হয়ে গঙ্গা পাবে। ভায়াই যে আজকের ধনুক-ভঙ্গের নাটের গুরু এবং তাঁর লাঠিটা বাঁচাতে তিনি অবিনকে আপনার লাঠি ভাঙতেই যে উস্কে দিয়েছেন এটা বুঝলুম। অবিনের লাঠিটা এত সুন্দর যে সেটাকে ভেঙে-ফেলা আর একটা মানুষের ঘাড়-মট্‌কে জলে ফেলে-দেওয়ায় আমার কোনো তফাৎ মনে হল না। মানুষের সৃষ্টিকে নষ্ট করাও যা ভগবানের সৃষ্টিকে আঘাত দেওয়াও তাই,—একই পাপ আমি মনে করি। অবিনের লাঠির মাথায় সেই কিন্নরীর বাঁশীর সাতটা সুর যেন একটা কান্না নিয়ে আমাকে মিনতি করতে লাগল—'বাঁচাও বাঁচাও'। আমার বুকের মাঝে কেমন করতে লাগলো কিন্তু মুখ দিয়ে আমার একটি কথাও বার হল না। দেখলেম লাঠিটা ক্রমে বেঁকছে। লাঠি এতটা যে নুইতে পারে তা আমি ধারণাই করতে

পারি-নি! পাহাড়ের রস টেনে বেড়েছিল সেই সরু দেবদারুর ডাল! অবিন সমস্ত জোর দিয়েও তাকে ভাঙতে পারলে না। লাঠিখানা বেঁকে সাপের মতো তার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তখন আমি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে অবিনের হাত ধরতেই অবিন একটা নিশ্বাস ফেলে লাঠিখানা ছেড়ে দিলে। দেখলেম সেই নিশ্বাসের সঙ্গে অবিনের মুখ কাগজের মতো পাঙাস হয়ে গেল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে অবিন আমার দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর আমাকে সেই লাঠিটা দিয়ে বল্লে—"নাও তোমাকে দিলুম।"

লাঠিটা আমার কাছে শিল্প-হিসাবে খুব মূল্যবান সুতরাং সেটাকে সহজে বখশিস্ নিতে আমার লজ্জা হল। কিন্তু দিয়ে একবার ফিরে নেওয়া অবিনের কুষ্টিতে লেখেনি সুতরাং অন্তত তখনকার মতো হাস্যমুখে লাঠিটা আমায় নিতে হল। তাছাড়া লাঠিটাকে এখন কিছুদিন অবিন এবং তার প্রিয়া—আমার ভায়াটির কাছ থেকে সরিয়ে রাখলে সবদিকেই মঙ্গল, এটাও সেই লাঠিটা খুসির সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে বখশিষ নেবার আর-একটা কারণও বটে। কাজেই লাঠিটা সেদিন আমার হাতে-হাতে আমার বাড়িতেই এল। তাড়াতাড়ি এককোণে সেটাকে রেখে আমি গায়ের কোট ছেড়ে রাখব এমন সময় বাতির আলোয় লাঠির গায়ে একটি বিদ্যুতের রেখার মতো একটা নাম ঝল্‌কে উঠলো—'ইন্দু'। তিল তিল হীরের আলো দিয়ে সেই নাম লেখা। লাঠিটা বাইরে ফেলে রাখতে আমার আর সাহস হলনা; আমি সেটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাখলুম। সঙ্গে নিয়ে খেলুম, সঙ্গে নিয়ে শুলুম। অবিন লাঠিটাকে কি-ভাবে দেখতো তা জানিনে কিন্তু তার ইন্দু বা ইন্দুমতী অথবা ইন্দুমুখীর লাঠিটা আমার যেন বৃদ্ধস্য তরুণীর মতো—চলিত কথায় অন্ধের নড়ি—হয়ে উঠলো। পাছে তাকে হারাই, পাছে সুড়ঙ্গ কেটে চোর আমার কোলের কাছ থেকে তাকে চুরি করে পালায় এই ভাবনাতে আমার খেয়ে সুখ ছিল না, শুয়ে ঘুম ছিল না।

ক-দিন পরে অবিনের সঙ্গে যখন দেখা, তখন প্রথমে আমার ভয় হল অবিন বুঝি-বা লাঠিটা ফিরিয়ে নেয়, যদিও অবিনের কোনো দিন এমন স্বভাব নয় বেশ জানতেম। সেদিন আমি লাঠিটা খুব জোর করে মুঠোর ভিতরে যে রাখলুম তা বলতেই হবে। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, গঙ্গার একটা মনোরম শোভার মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে। পশ্চিমতীরে দেখতে পাচ্ছি সাহেব-মিস্ত্রীর বানানো রাজাদের একটা পুরানো বাগান-বাড়ি; পূব পারে দেখছি—প্রকাণ্ড একটি মন্দির—ঘাটের ধারেই; পূর্ণিমার চাঁদ জলের উপর দিয়ে একটি আলোর পথ আমাদের জাহাজ থেকে এই ঘাটের কোল পর্য্যন্ত রচনা করেছে। আর এই আলোর পথের ধারটিতে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অবিন—পূর্ণিমার চাঁদের দিকটিতে চেয়ে। অবিনকে আমি কতবার এমন-করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু আকাশের পূর্ণ ইন্দু আর আমার হাতের মুঠোর হীরের বিন্দু দিয়ে লেখা নামটার

মিল দেখে মনটা আমার নড়ে উঠলো। আমার মনে হতে লাগলো অবিন হয় তো ওই আকাশের চাঁদের মধ্যে তার ইন্দুমতী বা ইন্দুমুখীকে দেখতে পাচ্ছে। হয় তো এই চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝকে তারগুলির মধ্যে দিয়ে সে তার অনেক দিনের হারানো ইন্দুর কাছে বহু দূর-পথে—বহুদিনের পথে প্রাণের আকুতি বিরহী যক্ষের মতো সারা জীবন ধরে পাঠাচ্ছে—প্রতি পূর্ণিমায়। হয় তো পূর্ব্বজন্মে অবিনের এ-জন্মের ইন্দু ছিল অলকার তন্বী শ্যামা ইন্দুরেখা কিন্নরী। হয় তো সেখানে কোনো নাগেশ্বর চাঁপার কুঞ্জবনে অবিনে তাতে প্রথম দেখা; তার পর প্রণয়-স্বপ্নের মাঝখানে দুজনের সহসা বিচ্ছেদ এবং আকাশ থেকে খসে-পড়া দুটি তারার মতো, পৃথিবীতে তাদের ঝরে পড়া! এখানে এসে স্বপ্নটা আমার যেন আট্‌কে গেল। ওই আহিরিটোলার গলিতে যে অলকার কিন্নরী ইন্দুরেখা ইন্দুবালা চক্রবর্ত্তী, ইন্দুমুখী ঝাঁ, ইন্দুমতী মুন্‌সী কিম্বা আরো-কোনো একটা নাম নিয়ে অবিনের ঘরে গৃহিণীপণা করতে করতে অথবা অবিনের সঙ্গে কোর্টসিপ্ চালাতে চালাতে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে হঠাৎ মারা পড়ল—অবিনকে তার শেষ-দান এই লাঠিটা দিয়ে—এটুকু মন আমার কিছুতে স্বীকার করতে চাইলে না। আমি ফাঁপরে পড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম সে আমার দিকে চেয়ে মিট্‌মিট্ করে হাস্‌ছে। আমি লাঠিটা সজোরে ঠুকে বলে উঠলেম—"এ হতেই পারে না।"

অবিন আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বল্লে—"কি হতে পারে না হে আর্টিষ্ট!"

আমি উত্তর কল্লেম—"আকাশের চাঁদের ভূতলে পতন! ইন্দুরেখা কিন্নরীর তোমার আহিরীটোলায় গৃহিণীপণা!"

অবিন গঙ্গার ধারে বাগান-বাড়িটা দেখিয়ে বল্লে—"ইন্দুরেখা ও-পাড়ার ইন্দু-ভূষণ হলে কি তোমার আপত্তি আছে?"

"কিছু না।"—বলে আমি লাঠিটা ইন্দুভূষণ যাকে দিয়েছিল তাকেই ফিরিয়ে দিলেম। কিন্তু সম্পূর্ণ অবস্তু ইন্দুরেখার সোনার কাঠিটা আমারি মুঠোয় রয়ে গেল;—হাতের মুঠোয় নয়—মনের মুঠোতে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীলপাখী

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাত্রির আবাস

চতুষ্কোণবিশিষ্ট এক সুবৃহৎ কক্ষ। কক্ষাভ্যন্তর কৃষ্ণবর্ণের; এবং কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত। স্থানটি অতিশয় গম্ভীর। একটী ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। এক উচ্চ আসনে

রাত্রি — কুকুর
বিড়াল — চিনি
তিলতিল — নক্ষত্রগণ
মিতিল — জানোয়ারগণ
রুটী — বৃক্ষগণ

কালোরঙের জমকালো পোষাক পরিয়া রাত্রি বসিয়া আছে। রাত্রি দেখিতে অতিশয় বৃদ্ধা। তাহার এক পাশে একটী নগ্ন ছেলে শুইয়া আছে; ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে হাসিতেছে। অপর দিকে আর-একটী ছেলে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া; তাহার আপাদমস্তক আবৃত।

বিড়াল প্রবেশ করিল।

রাত্রি। কে যায় ওখানে?

বিড়াল। (অত্যন্ত পরিশ্রান্তভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে) আমি গো, মা-জননী! বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

রাত্রি। কি হয়েছে বাছা তোর?... তোকে এমন রোগা শুক্‌নো দেখচি কেন? সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা—ব্যাপার কি?... বৃষ্টিতে আর বরফে ছুটোছুটি করছিলি বুঝি?

বিড়াল। না মা, সে সব কিছু নয়! ...এ ভারি গোপনীয় কথা—আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত!...আমি মা, কোন রকমে পালিয়ে এসেছি, তোমাকে সাবধান করে দিতে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, কিছুই হয়ত করা যাবে না।

রাত্রি। কেন? কি হয়েছে?

বিড়াল। সেই যে গো, কাঠুরের ছেলেটা, নাম তার তিলতিল; সে একটা ভূতুড়ে হীরে পেয়েছে। এখন সে তোমার কাছে আসছে নীলপাখী আদায় কর্ত্তে।

রাত্রি। এখনও ত আদায় কর্ত্তে পারেনি, তবে অত ভয় কিসের?

বিড়াল। কিন্তু শীগ্‌গিরই আদায় করবে, যদি না তাকে ভয় দেখিয়ে আটকাতে পার। সব কথা বলি, শোন। আলো আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মানুষের পক্ষ নিয়েছে। সে তার পাশে থেকে তাকে পথ দেখাচ্ছে। তারা টের পেয়েছে যে, নীলপাখী তোমার এখানেই লুকানো আছে। সেইটীই ত আসল, কারণ দিনের আলোয় সে বেঁচে থাকে; অন্য জায়গায় যা আছে, তা কেবল জ্যোৎস্নার আলোয় বেঁচে থাকে, চোখে রোদ লাগলেই মরে যায়। আলো জানে যে তোমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবার তার এক্‌তার নেই। সেইজন্য সে তিলতিল আর তার বোন মিতিলকে পাঠাচ্ছে। তুমি ত আর মানুষকে আটকাতে পার্ব্বে না। সে এসে তোমার দরজা খুলে সমস্ত গুপ্ত সন্ধি জেনে নেবে। আমি ভেবেই পাচ্ছিনে, অদৃষ্টে কি আছে! যদি সত্যি সত্যি সে নীলপাখী হাতে পায়, তবে আর আমাদের সর্ব্বনাশের বাকী থাকবে কি?

রাত্রি। তাইত বাছা, তাইত! এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পেলুম না। মানুষকে আমি এ ক'বছর ধরে বুঝতে পারলুম না। তার মতলব কি? সে কি চায়? সব সে আয়ত্ত কর্ত্তে চায় না কি? আমার গোপনীয় তত্ত্বগুলির ত বারো-আনা সে দখল করে বসেছে। আমার ভূত-প্রেতগুলো সব পালিয়েছে। ভয়-বিভীষিকা ত তার দৌরাত্ম্যে ঘর থেকে বেরুতে চায় না। আধি-ব্যাধিগুলো রোগে ভুগচে—মানুষ তাদের এমনি জব্দ করে ছেড়েছে।

বিড়াল। জানি মা, সব জানি। এখন সময় বড়ই খারাপ। আমাদের একাই মানুষের সঙ্গে লড়তে হবে। ওই যে আওয়াজ পাচ্ছি, তারা সব আসছে। এখন

কেবল একটী মাত্র উপায় আছে। ওরা হল ছেলেমানুষ। আমরা সব এমন ভয় ওদের দেখাব যে পিছন দিকের বড় দরজাটা খুলতে না ওদের সাহস হয়। কারণ সেইটেই হল নীলপাখীর আড্ডা।

রাত্রি। (বাহিরের দিকে কান পাতিয়া) আওয়াজ পাচ্ছি। ওরা কি অনেক লোক আসছে?

বিড়াল। না, বেশী লোক তেমন নেই। রুটী আর চিনি আমাদের পক্ষে। জল বেচারীর অসুখ করেছে, সে আসতে পারে নি। আগুনও এল না, কেননা আলো তার কুটুম। কেবল কুকুরটাই হল ওদের পক্ষে। তাকে কিন্তু কোনরকমে আটকে রাখা সম্ভব নয়।

ভীতচিত্তে তিলতিল, মিতিল, রুটী, চিনি এবং কুকুর প্রবেশ করিল।

বিড়াল। (ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া) এই দিকে হুজুর, এই দিকে। আমি রাত্রি ঠাকরুণকে সব বলেছি; তিনি তোমায় দেখবার জন্য ভারি উৎসুক। কিন্তু তাঁকে মাফ করবেন। তাঁর শরীর কিছু খারাপ বলে এগিয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি।

তিলতিল। (রাত্রির প্রতি) সুপ্রভাত!

রাত্রি। (ক্ষুব্ধ হইয়া) কি! অপমান করতে এসেছ তুমি! সুপ্রভাত! তোমার বলা উচিত ছিল, 'সুরাত্রি'!

তিলতিল। (লজ্জিত হইয়া) আমায় মাফ করবেন—আমি তা জানতুম না। (রাত্রির দুইটি ছেলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ও দুটী বুঝি আপনার ছেলে?

রাত্রি। হ্যাঁ। এটীর নাম নিদ্রা।

তিলতিল। ও অত মোটা কেন?

রাত্রি। ও বেশ আরামে ঘুমোয় কি না, তাই!

তিলতিল। আর ওটীর নাম কি? ও অমন করে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে কেন? কোন অসুখ করেছে নাকি?

রাত্রি। ওটী নিদ্রার বোন, ওর নাম না বলাই ভাল।

তিলতিল। কেন?

রাত্রি। ওর নামটা শুনতে ভাল লাগবে না।...তা যাক্, আমরা এখন অন্য কথা কই, এসো, কাজের কথা!... বেড়ালের মুখে শুনলুম, তুমি নাকি নীলপাখীর সন্ধানে এসেছ?

তিলতিল। হ্যাঁ; সেটা কোথায়, দয়া করে বলবেন কি?

রাত্রি। দেখ বাছা, আমি কিছুই জানি না।...আমার এখানে সে নেই...আমি তাকে চোখেও দেখিনি কখনো।

তিলতিল। আলো যে বলেছে সে এখানেই আছে...আপনি দয়া করে চাবি গুলো দেবেন কি?

রাত্রি। কিন্তু বাছা, তোমার জানা উচিত ছিল যে যারা প্রথম এখানে আসে তাদের কখনই আমি চাবি ছেড়ে দিই না।... প্রকৃতির গোপনীয় জিনিষগুলি আমার কাছে গচ্ছিত আছে; সেগুলি কারো হাতে তুলে দিতে নিষেধ। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে তা কোনমতেই দিতে পারি না।

তিলতিল। আপনার কোন অধিকার নেই অস্বীকার করবার...মানুষ চাইবামাত্রই

আপনি সব ছেড়ে দিতে বাধ্য।...আমি এ সব কথা ভাল জানি।

রাত্রি। কে তোমায় বলেছে?

তিলতিল। আলো।

রাত্রি। আলো! সব তাতেই আলো!...কি সাহসে সে এ-সব কাজে হাত দেয়?

কুকুর। হুজুর, হুকুম হয়ত আম জবরদস্তিতে বার করে নি।

তিলতিল। চুপ কর্ হতভাগা; অভদ্র কোথাকার!...(রাত্রির প্রতি) আসুন, দয়া করে আমায় চাবিগুলি দিন।

রাত্রি। চাবি ত চাইচ। তোমার কাছে এমন-কোন নিশানা আছে কি?

তিলতিল। (টুপিতে হাত দিয়া) এই দেখুন হীরে।

রাত্রি। আচ্ছা, তাহলে এই নাও চাবি। ঐ হল-ঘর খোল গিয়ে···কিছু খারাপ টারাপ হয় ত তুমি জান...আমি সেজন্য দায়ী নই।

রুটী। (উদ্বিগ্ন হইয়া) কেন, কোন বিপদ-টিপদ ঘটবে নাকি?

রাত্রি। তা আর বলতে?...অন্ধকার বড় বড় সব গর্ত্তের দরজা যখন খুলে যাবে, তখন যে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে, আমি তা বুঝতে পারছি না। হলের চারদিকে লোহার তৈরি, পিতলের তৈরি বড় বড় ঘর আছে; তার ভিতর যত রাজ্যের আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দারিদ্র্য, প্লেগ-মড়ক, আর যত সব বিভীষিকা, আপদ-বিপদ কয়েদ হয়ে রয়েছে। আমি নিয়তি দেবীর সাহায্যে কি কষ্টেই যে তাদের কয়েদ করেছি, তা আমিই জানি। এখন আমি তাদের শাসনে রেখেছি। তোমরা দেখেছ ত তাদের মধ্যে একটা যখন ছাড়া পায়, তখন পৃথিবীতে গিয়ে কি ভয়ানক কাণ্ডই বাধিয়ে দেয়!

রুটী। রাত্রি ঠাক্‌রুণ, আমি বুড়ো হয়ে গেলুম এই ছেলে দুটীর হেপাজত করে; এদের আপদ-বিপদের কথা আমাকেই আগে ভাবতে হয়। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?

রাত্রি। স্বচ্ছন্দে।

রুটী। যদি কোন হাঙ্গামই বাধে, তবে পালিয়ে যাবার পথটা কোন্ দিকে?

রাত্রি। এখান থেকে পালাবার পথ নেই।

তিলতিল। (চাবি হাতে অগ্রসর হইয়া) এই দরজাটাই আগে খোলা যাক্। ...এর ভিতর কি আছে?

রাত্রি। বোধ হয় এটা ভূতের ঘর। একবার এর দরজা আমি খুলেছিলুম, সেই সময় গোটাকতক বেরিয়ে পড়েছিল।

তিলতিল। আমি খুলে দেখি। (রুটীর প্রতি) খাঁচা ঠিক আছে ত?

রুটী। (ভয়ে তার দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল) আমি ভয় পেয়েছি ভেবো না, তবে বলছি কি যে দরজাটা না খুলে ফুটোর ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে ভাল হত না?

তিলতিল। তোমার পরামর্শ আমি শুন্‌তে চাই না।

মিতিল। (কাঁদিতে সুরু করিল) আমার বড্ড ভয় করছে...চিনি কোথায় গেল...আমায় বাড়ী নিয়ে চলুক।

চিনি। এই যে হেথায় আমি, এই যে। কেঁদো না।

তিলতিল। ব্যস্, ঢের হয়েছে।

চাবি ঘুরাইয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিল। অমনি পাঁচ ছয়টা ভূত নিমেষে বাহির হইয়া হলের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মিতিল ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। রুটী হাঁউমাঁউ করিয়া খাঁচা ফেলিয়া হলের পিছনে গিয়া লুকাইল। ভূতগুলোকে ধরিবার জন্য রাত্রি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিল।

রাত্রি। তিলতিল, শিগ্‌গির দরজা বন্ধ কর, শিগ্‌গির, নইলে সবগুলোই পালিয়ে যাবে, শেষে একটাও ধরা যাবে না।

রাত্রি অনেকক্ষণ ভূতগুলোর পশ্চাতে ছুটিয়া সাপের-মুখওয়ালা চাবুকের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া আনিতে লাগিল।

তোমরা আমায় সাহায্য কর, শিগ্‌গির এস।

তিলতিল। টাইলো, দাঁড়িয়ে দেখছ কি, শিগ্‌গির যাও, ওঁকে সাহায্য কর।

কুকুর। (লাফাইয়া চীৎকার করিয়া) হাঁ, হাঁ, এই যে!

তিলতিল। রুটী কোথায় গেল, ও রুটী!

রুটী। (হলের পিছন হইতে সভয়ে) এই যে আমি এখানে দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছি, ওরা পালাতে পারবে না।

ইত্যবসরে একটা ভূত সেইদিকে গিয়া পড়ায় রুটী ভয়ানক চীৎকার করিয়া পলাইয়া আসিল।

রাত্রি। (তিনটা ভূতের ঘাড় ধরিয়া আনিতেছিল) চল্ এইদিকে। তিলতিল, দরজাটা একটু ফাঁক কর ত। (ধাক্কা দিয়া ভূতগুলোকে ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল। কুকুর আরও তিনটাকে তাড়াইয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া ফেলিল। তিলতিল তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া দিল)

তিলতিল। (অন্য এক দরজার নিকট গিয়া) এর মধ্যে কি আছে?

রাত্রি। তা শুনে আর কি হবে? দেখলেই ত ব্যাপার! নীলপাখী এখানে নেই, আমি আগেই ত বলেছি। দরজা খুলতে চাও, সে তোমার ইচ্ছে। এর ভিতর কিন্তু জ্বর, কাশি এরা সব থাকে।

তিলতিল। (তালা খুলিতে খুলিতে) এবার আমি খুব সাবধান হব!

রাত্রি। এদের বেলায় তা দরকার হবে না। বেচারীরা অতি নিরীহ চুপচাপ পড়ে থাকে! এতটুকু মুখও ওদের নেই। মানুষ এখন ওদের ওপর কি জুলুমটাই না করছে···দরজা খুলে ফেলো, দেখতে পাবে।

তিলতিল। (দরজা একেবারে ফাঁক করিয়া খুলিয়া দিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না) এরা ত কৈ বাইরে বেরুচ্ছে না?...

রাত্রি। আমি ত বলেছি, এরা ভারি নিরীহ। ডাক্তারদের অত্যাচারে বেচারীরা একেবারে নিঝুম মেরে গেছে। একবার ভিতরে ঢুকে দেখে এসো, ওদের অবস্থাটা।

তিলতিল। (ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়া আসিল) এর ভিতর ত কৈ নীলপাখী নেই। ওরা সকলেই বড্ড

কাহিল বোধ হল; কেউ একবার মাথাও তুল্লে না।

এই সময় একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া হলের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। তার সর্ব্বাঙ্গ গরম কোটে ঢাকা, মাথায় একটী তুলার টুপি।

ঐ দেখ একটা পালাচ্ছে...কে ও?

রাত্রি। ও হল সর্দ্দি-কাশি। অন্য সকলের চেয়ে ওর দুর্দ্দশা কিছু কম। ওর স্বাস্থ্যও মন্দ নয়।...ওহে ও সর্দ্দি-কাশি, তুমি পালাচ্চ কোথায়? এদিকে এস। এখনও সময় হয় নি।...শীতের এখনও ঢের দেরি।

সর্দ্দি-কাশি হাঁচিয়া, কাশিয়া নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। তিলতিল তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তিলতিল। (অন্য একটার কাছে গিয়া) এইটে এবার দেখা যাক্। এর ভিতরে কি আছে?

রাত্রি। সাবধান! এখানে যুদ্ধুরা সব থাকে। এরা যেমন বলবান, তেমনি ভয়ানক। ভগবান জানেন, এদের একটা যখন ছাড়া পায়, তখন কি বিভ্রাটই না ঘটে। সৌভাগ্যের বিষয়, এরা যেমন মোটা তেমনি ভারি, সহজে নড়তে পারে না। তা'হলেও আমাদের খুব সাবধানে থাকা দরকার। তুমি একটুখানি ফাঁক করে চক্ষের নিমেষে ভিতরটা দেখে নিও; আমরাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে দরজা চেপে ধরব।

তিলতিল অতি সন্তর্পণে দ্বার একটুমাত্র ফাঁক করিয়া ভিতরে উঁকি মারিল, এবং তৎক্ষণাৎ দরজা চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

শিগ্‌গির এস, শিগগির। যত জোরে পার, সকলে মিলে চেপে ধর। ওরা দল বেঁধে এদিকে আসছে। এই যে ধাক্কা মারছে।

রাত্রি। এসো সকলে।...প্রাণপণে চেপে ধর...রুটী, কোথায় গেলে তুমি...ওখানে কি করছ...খুব জোরে...খুব জোরে...হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। ব্যস্‌রে, কি জোর... এখন সব সরে গেছে।...তিলতিল, ওদের দেখেছ ত?

তিলতিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি, কি ভয়ঙ্কর বদ্‌খত্ চেহারা,...ওদের কাছে নীলপাখী আছে বলে ত বোধ হয় না।

রাত্রি। ওদের কাছে থাকতেই পারে না। থাকলেও ওরা তাকে খেয়ে ফেলেছে। কেমন, এবার ত মন মেনেছে?... কোথাও ত পাওয়া গেল না...এখন কি করবে বল?

তিলতিল। আমি...আরও দেখব। আলো আমাকে প্রত্যেক জায়গা খুঁজতে বলে দিয়েছে।

রাত্রি। তা ত বলবেই...বাড়ীতে বসে বসে অমন সবাই বলতে পারে।

তিলতিল। (অন্য এক দরজায় গিয়া) আচ্ছা, আমরা এইটে খুলব...এটাও কি ভয়ানক না কি?

রাত্রি। না, এতে ভয়ের কিছু নেই। এর ভিতর আমার নিজের অনেক রকমের সুগন্ধি জিনিষ আছে—অনেকগুলি আলোর রশ্মি আর এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যারা এ পর্য্যন্ত আকাশে দেখা দেয় নি।... তা ছাড়া চমৎকার চমৎকার প্রজাপতি সব, সোণালি রঙের মৌমাছি, ঢলঢলে শিশির-

বিন্দু, নাইটিংগেল পাখীর গান, এই রকম আরও সব সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে।

তিলতিল প্রশস্তভাবে দরজা খুলিয়া দিল। নক্ষত্রগুলি সুন্দরী কুমারীর বেশে বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া ঝক্‌ঝকে ঘোমটা টানিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সুগন্ধি এবং শিশির-বিন্দু গিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল এবং নাইটিংগেলের সুললিত সঙ্গীত ভাসিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল।

মিতিল। কেমন সুন্দর মেয়েগুলি!

তিলতিল। আহা, কি সুন্দর ওরা নাচ্‌ছে!

মিতিল। সুগন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে!

তিলতিল। সুন্দর গান!

রাত্রি। (হাততালি দিয়া) ব্যস্, আর না।...ওগো নক্ষত্র-কুমারীরা, এবার তোমরা ঘরে ফিরে এস। এখন তোমাদের নাচবার সময় নয়...আকাশ পরিষ্কার নয়... ভয়ঙ্কর মেঘ করে রয়েছে।...শিগ্‌গির ঘুরে যাও, নইলে আমি রোদ্দুরকে ডাকব।

নক্ষত্র, শিশিরবিন্দু প্রভৃতি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই সঙ্গে নাইটিংগেলের গানও থামিয়া গেল।

তিলতিল। (পিছনের একটা দরজায়) এই যে একটা বড় দরজা...এইটে এবার খোলা যাক্।

রাত্রি। (সহসা গম্ভীর হইয়া) এটা খুলো না; খবরদার!

তিলতিল। কেন?

রাত্রি। এটা খোলবার যো নেই!...

তিলতিল। তা হলে এইখানেই নীল পাখী লুকোনো আছে, নিশ্চয়ই! আলো আমাকে এই রকমই বলেছিল।

রাত্রি। (বাৎসল্যের স্বরে) দেখ বাছা, আমার কথা শোন; তুমি আমার ছেলের মত। তোমার জন্যে যা করেছি, আর কারও জন্যে আমি কখনও সে-রকম করিনি। আমার নিজের লুকোনো জিনিষ সব তোমায় দেখিয়েছি।...তোমাকে ছেলের মত ভালবেসেছি বলেই এতটা করেছি। এখন আমার কথা শোন...আর এগিয়ো না...এখন বাড়ী যাও...ও দরজাটা খোলো না।

তিলতিল। (আবেগ-ভরে) কেন? কি জন্য খুলব না?

রাত্রি। কারণ, আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি মারা যাও। যারা-যারা এ দরজা খুলেছে—একটু ফাঁক করে দেখেছে, তারা কেউ আর জ্যান্ত ফেরে নি—তাদের কাকেও দিনের আর আলো দেখতে হয় নি। ...তাই বলছি, ও দরজা খুলো না। তবে যদি আমার কথা না শুনে নেহাত খুলতে চাও, তবে একটু থাম, আমাকে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যেতে দাও... তার পর তুমি যা ভাল বোঝ, কর।

মিতিল কাঁদিয়া উঠিল, ভয়ে তার মুখে কথা ফুটিতেছিল না। সে সেখান হইতে পলাইয়া যাইবার জন্য তিলতিলকে ধরিয়া টানিতে লাগিল।

রুটী। (ভয়ে তার চোখ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল) দোহাই হুজুর, খুলো না। আমি তোমার পায়ে ধরছি... আমাদের দয়া কর।...রাত্রি ঠাকুরুণ ঠিক কথাই বলেছেন।

বিড়াল। হুজুর, আমাদের সকলকে কি মেরে ফেলতে চান?

তিলতিল। দরজা আমি খুলবই।

মিতিল। আমি খুলতে দেব না... কিছুতে না।

তিলতিল। চিনি কোথায় গেল!... দেখ চিনি, তুমি আর রুটী মিতিলের হাত ধরে এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি।

রাত্রি। পালাও সব এখান থেকে... প্রাণে বাঁচতে চাও ত পালাও!

(নিজে পলাইয়া গেল)

রুটী। থাম, থাম; একটু থাম; আমাদের পালিয়ে যেতে দাও!

(হলের অপর প্রান্তে গিয়া সকলে থামের আড়ালে লুকাইল)

কুকুর। আমি থাকব, আমি থাকব; ...আমার ভয় করে নি, আমার ভয় করে নি, আমি থাকব, আমি থাকব!

তিলতিল। (কুকুরের গায়ে হাত চাপড়াইয়া) বেশ টাইলো, বেশ!...একটা চুমো দাও!...তুমি আর আমি, দুজনে!... কি বল!...এবার দরজা খুলি?

তালার গায়ে চাবি লাগাইবা মাত্র হলের অপর প্রান্ত হইতে ভয়ানক চীৎকার-ধ্বনি উঠিল। দরজা খুলিতে না খুলিতেই একটী মনোহর উদ্যান প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে বিচিত্র আলোকমালা, উজ্জ্বল গ্রহ তারকা ঝল্‌মল্ করিতেছে দেখা গেল। আর দেখা গেল, অসংখ্য নীলপাখী —সেগুলি চমৎকার নীল! উপর হইতে নীচে এবং নীচে হইতে উপরে তাহারা অবিশ্রাম উড়িয়া বেড়াইতেছিল। স্থানটী অপূর্ব্ব নীলবর্ণে উদ্ভাসিত।

তিলতিল। (বিস্মিত ও চমকিত হইয়া দেখিতে লাগিল) ওহো, কি আশ্চর্য্য! (পলাতকগণের প্রতি) শিগ্‌গির এস, শিগ্‌গির এস,...এইখানেই তারা আছে! ...এই যে নীলপাখী!...এই যে নীলপাখী! হাজার হাজার রয়েছে!...মিতিল, শিগ্‌গির এস!...টাইলো কোথায়!...এস, আমাকে সাহায্য কর।...শিগ্‌গির এস!...(পাখীগুলোর উপর গিয়া পড়িল) হাতে করে ধরা যাবে। ...এরা পালায় না! ভয় পায় না!... (রাত্রি এবং বিড়াল ব্যতীত সকলে সেখানে উপস্থিত হইল) ঐ দেখ, কত রয়েছে!... ওরা চাঁদের আলো খাচ্ছে!...ঝাঁকে ঝাঁকে এত উড়ে বেড়াচ্ছে যে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না!...মিতিল, কোথায় তুমি!... টাইলো, ওদের কামড়ো না যেন!...আস্তে আস্তে ধর!

মিতিল। আমি সাতটা ধরেছি...আঃ, ভারি ঝট্‌পট্ করছে...ধরে রাখতে পারছি না।

তিলতিল। আমিও এত বেশী ধরেছি যে সামলাতে পারছি না!...ঐ একটা পালিয়ে গেল!...টাইলো অনেকগুলো ধরেছে! এরা আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে—আকাশে নিয়ে তুলবে...শিগ্‌গির পালাই চল! আলো-বেচারী বসে রয়েছে...দেখে কত খুসী হবে...চল, পালাই চল!...এই পথে! এই পথে!

পাখীগুলোকে লইয়া তাহারা বাগান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। রুটী ও চিনি তাহাদের সহিত মিলিত হইল। সকলে হল হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবল রাত্রি এবং বিড়াল বাগানে ফিরিয়া আসিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে দেখিতে লাগিল।

রাত্রি। আমার পাখীটাকে তারা ধরতে পারেনি।

বিড়াল। হাঃ, হাঃ, কি মজা!...ওই যে সেটা চাঁদের আলোয় বসে রয়েছে... অত উঁচুতে নাগাল পায়নি।

* * *

দৃশ্যান্তর

আলো ভিতরে প্রবেশ করিল। তিলতিল, মিতিল এবং টাইলো সর্ব্বাঙ্গে পাখীগুলাকে ঝুলাইয়া ছুটিয়া আসিল; কিন্তু পাখীগুলা সব চেতনা-হীন বলিয়া মনে হইল। তাহাদের মাথা লট্‌কাইয়া পড়িয়াছে—ডানা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহারা ঝট্‌পট্ করিতেছে না; কেবল নির্জীব দেহগুলাই ঝুলিতেছে।

আলো। কেমন! পাখীটাকে ধরেছ ত?

তিলতিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে!...এই দেখ না!...হাজার হাজার ছিল!...এই দেখ না! ..(আলো-কে দিতে গেল, কিন্তু দেখিল, মরিয়া গিয়াছে) কি আশ্চর্য্য! মরে গেছে যে! ..তাই ত!...কি করে মলো! ...মিতিল, টাইলো, তোমাদের গুলোই গেছে?

(রাগ করিয়া মরা পাখীগুলাকে মাটীতে আছড়াইয়া ফেলিল)

ভারি বিশ্রী!...মলো কি করে!

(হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

আলো। (আদর করিয়া তিলতিলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কেঁদো না বাছা, কেঁদো না।...যেটা দিনের আলোয় বেঁচে থাকে, সেটাকে তুমি ধরতে পারনি। সেটা আর কোথাও গেছে। ..আমরা আবার তাকে খুঁজে বার করব।

কুকুর। (মরা পাখীগুলোকে আগ্রহের সহিত দেখিয়া) এগুলো খেতে কি বেশ লাগে?

সকলে একসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বৃহৎ অরণ্য। রাত্রিকাল। আকাশে চাঁদ; অরণ্যাভ্যন্তরে বহুবিধ প্রাচীন বৃক্ষ রাজি; যথা —ওক, বীচ, দেবদারু, ঝাউ, এল্‌ম্, সাইপ্রেস, লেবুগাছ, বাদামগাছ, ইত্যাদি।

(বিড়াল প্রবেশ করিল)

বিড়াল। ওগো গাছেরা, তোমাদের সকলকে নমস্কার!

বৃক্ষগণ। (পত্রের মর্‌মর্ শব্দ করিয়া) নমস্কার!

বিড়াল। আজ আমাদের বড় শুভ-দিন!...এমন দিন আর হবে না!... আমাদের শত্রু আসছে। তোমাদের আত্মাকে মুক্ত করে দিয়ে তোমাদের হাতেই সে আজ নিজেকে সঁপে দেবে। শত্রু কে, জান ত? সে হল ঐ কাঠুরের ছেলে তিলতিল।...কাঠুরে তোমাদের যে কি অনিষ্ট করেছে, তা বোধ হয় আর বলতে হবে না।...ছেলেটা নীলপাখী খুঁজে বেড়াচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম থেকে তোমরা এটাকে লুকিয়ে রেখেছ.. মানুষই কেবল এর সন্ধান জানে।...(বৃক্ষপত্রের মর্‌মর্ শব্দ) এ্যাঁ, কি বলছ? কে তুমি! ঝাউ-গাছ?...হ্যাঁ, তার কাছে এক টুকরো হীরে আছে, তা দিয়ে সে অল্প সময়ের জন্যে আমাদের আত্মাকে মুক্ত করে দিতে পারে,

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আর নীলপাখীটাকে জোর করে আদায় কর্ত্তে পারে; কিন্তু তা হলে কি হবে, জান? আমাদের সকলকে চিরকালের জন্যে মানুষের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে। (বৃক্ষপত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) ও কে কথা কইছে? ওক্! ভাল আছ ত? (ওক্ পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) এ্যাঁ, আজও তোমার সর্দ্দি সারে নি?...বারোমাস যে রকম ঠাণ্ডা ঘাস জড়িয়ে থাক!...আচ্ছা, নীলপাখীটা তোমার কাছেই আছে ত!..(পত্রের মর্‌-মর্‌ শব্দ)...হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে! ছোঁড়াকে মেরে ফেলতেই হবে... এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে? (পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) এ্যাঁ, কি বলছ?...ঠিক বুঝতে পারছি না,...ও, আচ্ছা...তার ছোট বোন? সেটাকেও মেরে ফেলতে হবে...(পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) হ্যাঁ, কুকুরটাও সঙ্গে আছে বটে...তাকে ত মারবার কোন উপায় দেখি না...(পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) কি বলছ?···ঘুষ দিয়ে?...অসম্ভব.. চেষ্টার ক্রুটী করি নি...(পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) আর কে কে আছে? আগুন, চিনি, জল আর রুটী।...সকলেই আমাদের দিকে, কেবল রুটীকে একটু সন্দেহ হয়।... আলো শুধু একা মানুষের পক্ষে; কিন্তু সে আসবে না।...আমি তিলতিলকে বুঝিয়েছি যে আলো যেমনি ঘুমোবে অমনি যেন তারা লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ...এমন সুযোগ কি আর হয়?...(পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, জানোয়ারদের খবর দিতে হবে বৈকি।... খরগোসের কাছে তার নাগরাটা আছে ত? আচ্ছা, তা হলে তাকে এক্ষুনি নাগরা পিটে জানোয়ারদের খবর দিতে বল...বাহবা! ঠিক হয়েছে...এদিকে যে এরাও এসে পড়ল!

খরগোসের নাগরার শব্দ শুনা গেল। তিল-তিল, মিতিল এবং কুকুর প্রবেশ করিল।

তিলতিল। এই কি সেই জায়গা?

বিড়াল। (অতিশয় নম্রতা এবং আগ্রহ ভরে অগ্রবর্ত্তী হইয়া) এই যে প্রভু এসেছ!...আজ কি সুন্দর, কি চমৎকার তোমায় দেখাচ্ছে!...তোমার আসবার খবর আগেই আমি ওদের দিতে গেলুম। ...খবর ভাল।...আজ রাত্রেই আমরা নীলপাখীটাকে হাত করতে পারব।... দেশের প্রধান প্রধান জানোয়ারদের জড় করবার জন্য আমি খরগোসকে নাগরা পিটতে বলে দিয়েছি...ওই যে জানোয়ারদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে...ওই যে গাছতলায় সব একে একে জড় হচ্ছে...কিন্তু ওরা একেবারে তোমাদের কাছে আসবে না... একটু লাজুক কি না! (নানাপ্রকার জানোয়ারের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল, গরু, শুয়ার, গাধা, ঘোড়া, ইত্যাদির। বিড়াল তিলতিলকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গেল) দেখ, কুকুরকে কিন্তু আনা ঠিক হয় নি...সকলের সঙ্গেই ওর ঝগড়া...গাছেদের সঙ্গেও ওর বনে না...আমার ভয় হয়, ও হতেই বুঝি-বা সব পণ্ড হয়ে যায়!

তিলতিল। ওকে ফেলে রেখে আসতে পারি নি।...(কুকুরের প্রতি সরোষে) দূর হ হতভাগা! সকলের সঙ্গেই ঝগড়া! দূর হয়ে যা তুই এখান থেকে!

কুকুর। কে? আমি!...কেন?... আমি কি অপরাধ কল্লুম?

তিলতিল। দূর হ বলছি...তোকে আমরা এখানে চাই না...যা, দূর হয়ে যা!

কুকুর। আমি মুখটী বুজে থাকব— একটীও কথা কব না।···তারা আমায় দেখতে পাবে না...আমায় মাফ কর... তাড়িয়ে দিও না...

বিড়াল। (তিলতিলের প্রতি চুপে চুপে) ওকে কি এই রকমে প্রশ্রয় দিতে চাও!...ভারি অবাধ্য ত!···দাও না ঘা কতক বসিয়ে...অসহ্য করে তুল্লে!

তিলতিল। (কুকুরকে প্রহার করিল) এইবার বোধ হয় আমার কথা শুনবি!

কুকুর। (যন্ত্রণায়) ঔঃ! ঔঃ! ঔঃ!··· তিলতিল। কি বলিস্ এখন!

কুকুর। তুমি আমায় মারলে; এবার আমি তোমার মুখে চুম খাব...

তিলতিলকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল।

তিলতিল। আচ্ছা, ঢের হয়েছে, এবার যাও এখান থেকে!

মিতিল। না, না; কেন ও যাবে? আমি ওকে যেতে দেব না; ও কাছে না থাকলে আমার বড্ড ভয় করে।

কুকুর। (আহ্লাদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চুম্বনে চুম্বনে মিতিলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল) এই ত কথার মত কথা!··· কি সুন্দর তুমি!...কি চমৎকার তুমি!... আর একটা চুমু দাও, আর একটা, আর একটা!

বিড়াল। আহাম্মক কোথাকার!... আচ্ছা, দেখা যাবে তখন!...আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।...হীরেটী ঘুরিয়ে ফেল।

তিলতিল। কোথায় আমি দাঁড়াব!

বিড়াল। এই চাঁদের আলোয়...তা হলে ভাল রকম দেখা যাবে; এইবার আস্তে আস্তে ঘুরোও।

তিলতিল হীরকটী ঘুরাইয়া দিল। বৃক্ষ সকলের ডালপালা হিস্ হিস্ শব্দে নড়িয়া উঠিল। পুরাতন এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি ফাঁক হইয়া গিয়া প্রত্যেকের ভিতর হইতে আত্মা বাহির হইতে লাগিল। বৃক্ষের চেহারা-অনুযায়ী তাহাদের আত্মা গুলিও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিল। কেহ বা হাত-পা ছড়াইয়া আলস্য ভাঙিয়া গুঁড়ির ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইতে লাগিল—যেন কতকাল ধরিয়া সব ঘুমাইতেছিল। কেহ কেহ বা উৎসাহভরে লাফাইয়া বাহির হইতে লাগিল। সকলে আসিয়া তিলতিল ও মিতিলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ঝাউগাছ। (সর্ব্বপ্রথম অগ্রবর্ত্তী হইয়া এবং প্রাণপণে চীৎকার করিয়া) মানুষ? ...এই ছোট্ট মানুষ!..আমরা এদের সঙ্গে কথা কইব!···আমাদের মুখ ফুটেছে; নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেছে!··· এরা কোত্থেকে এসেছে!..কে এরা!···কি করে?

(লেবু গাছের প্রতি; সে চুরুট টানিতে টানিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।)

খুড়ো, এদের চেন কি?

লেবুগাছ। এদের কখনও দেখেছি বলে ত মনে হচ্ছে না।

ঝাউগাছ। নিশ্চয় তুমি দেখেছ!··· তুমি সব মানুষকেই চেনো; তুমি তাদের ঘরের উপর সর্ব্বদা ঝুলে থাকো।

লেবুগাছ। (তিলতিল ও মিতিলকে

ভাল করিয়া দেখিয়া) না ; আমি ঠিক বলছি, এদের চিনি না।···এরা এখনও ভারি ছেলে মানুষ। আমি চিনি শুধু প্রণয়ীদের, যারা চাঁদের আলোয় আমার কাছে আসে। আর চিনি মাতালদের, যারা আমার তলায় বসে সরাব খায়।

বাদামগাছ। (চসমাখানা ভাল করিয়া চোখে লাগাইয়া) কে এরা ?···বড্ড গরিব ? ···পাড়া-গাঁ থেকে এসেছে বোধ হয় !

ঝাউগাছ। তোমার কথা যদি বলতে হয়, তুমি ত বড় বড় সহরের রাস্তা ছাড়া আর কোথাও বড় একটা দেখা দাও না !

উইলো। ও ভাই, ওরা জ্বালানি কাঠের জন্যে আবার আমার হাত পা কাটতে এসেছে !

ঝাউগাছ। চুপ্ চুপ্ ; ওক্ আসছে ; সে তার প্রাসাদের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। আজ ত ওকে বড়ই অসুস্থ দেখছি !··· ক্রমশ বুড়ো হয়ে পড়ছে কি না !··· আচ্ছা, ওর বয়স কত হতে পারে ?··· কেউ কেউ বলে, ওর বয়স নাকি চার হাজার বছর।···আমার কিন্তু মনে হয়, অত নয়··· সব কথা আজ সে নিজেই খুলে বলবে।

ওক্ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিল। সে অতিশয় বৃদ্ধ। একখানি সবুজ আঙরাখায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ; মস্তকে লতার মুকুট ; সাদা ধবধবে দাড়ি বাতাসে উড়িতেছিল। সে অন্ধ। একগাছি শক্ত লাঠির উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে সে হাঁটিতেছিল। একটী ছোট ওক্ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছিল। নীলপাখীটি তাহার কাঁধের উপর বসিয়া ছিল। সে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমুদয় বৃক্ষ সারবন্দী দাঁড়াইল এবং তাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল।

তিলতিল। এই যে, এর কাছে নীলপাখী···শিগগির, শিগ্‌গির ওটা আমায় দাও।

বৃক্ষসকল। চুপ কর !

বিড়াল। টুপি খোলো, বৃদ্ধ সম্রাট ওক্ উপস্থিত !

ওক্। কে গা তুমি ?

তিলতিল। মশাই, আমি তিলতিল।··· নীলপাখীটি কখন্ আমায় দেবেন ?

ওক্। তিলতিল ? কাঠুরের ছেলে ?

তিলতিল। হ্যাঁ মশাই।

ওক্। তোমার বাবা আমাদের কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করেছে, জান ? কেবল আমার বংশেরই কতজনকে মেরেছে, দেখ। আমার ছ'-শ' ছেলে, পাঁচশ খুড়ো-খুড়ী আর তাদের ছেলে মেয়ে বারো-শ', চার-শ' জন বউ, আর বার হাজার নাতি-নাত্‌নিকে সে মেরে ফেলেছে।

তিলতিল। মশাই, আমি তার কিছুই জানি নে। তিনি বোধ হয় ইচ্ছে করে মারেন নি।

ওক্। তুমি কি জন্যে এখানে এসেছ ? আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিজন্য আমাদের বাইরে এনেছ ?

তিলতিল। আপনাদের বিরক্ত করেছি বলে মাফ চাইছি··বেড়াল বল্লে, নীলপাখীর সন্ধান আপনারা বলে দেবেন।

ওক্। হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি নীলপাখী খুঁজে বেড়াচ্ছ, তার মানে প্রত্যেক জিনিসের গুপ্ত রহস্যটুকু।···তা হলে সব রকম সুখ হাতে আসবে, আর মানুষ আমাদের দাসত্বটাকে আরও কঠোর করে তুলবে।

তিলতিল। না মশাই, তা নয়। পরী

বেরীলুনের ছোট মেয়েটার ভারি অসুখ, তারই জন্য এটী দরকার।

ওক্। (চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল) ভাল !···জানোয়ারদের অভিপ্রায় এখনও শুনিনি···কোথায় তারা !···এতে আমাদের যেমন স্বার্থ, তাদেরও তেমনি। ···আমরা অর্থাৎ শুধু গাছেরা মিলে একটা সিদ্ধান্ত করলেই চলবে না, তাদেরও মতামত নিতে হবে।

দেবদারু। খরগোসের সঙ্গে জানোয়াররা-সব আসছে ; এই যে তারা। ঘোড়া, ষাঁড়, ভেড়া, নেকড়ে, শুয়ার, ছাগল, গাধা আর ভাল্লুক একে একে সব এইদিকে এসছে।

জানোয়ারগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবদারু প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল এবং তাহারা আসিয়া একে একে গাছতলায় বসিল। কেবল ছাগল এদিক ওদিক-ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং শুয়ার গাছের গোড়ায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া মাটি খুড়িতে লাগিল।

ওক্। সকলেই হাজির ?

খরগোস। মুরগী তার ডিম ছেড়ে আসতে পারবে না ; সজারু বাড়ীতে নেই ; হরিণের শিঙে ভয়ঙ্কর ব্যথা, সে আসতে পারে নি ; শেয়ালের জ্বর, সে ডাক্তারের চিঠি দিয়েছে—এই সে চিঠি ; হাঁস আমার কথা বুঝতেই পারলে না ; আর মোরগ ত চটেই লাল, সে গস্‌গসিয়ে চলে গেল।

ওক্। এদের অনুপস্থিতির জন্যে আমরা দুঃখিত।···যাই হোক্ এতেই আমাদের সভার কাজ চলবে।···দেখ ভাই সব, আমরা কি জন্যে আজ জড়ো হয়েছি, তা জান বোধ হয় ? এই যে ছেলেটী,—ও নীলপাখীকে নিতে এসেছে ; ইচ্ছে কল্লেই সেটী নিতে পারে। কিন্তু তা হলে যে গুপ্ত রহস্যটুকু আমরা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে লুকিয়ে এসেছি, সেটুকু হাতছাড়া হয়ে যাবে।··মানুষকে চেনো ত ? একবার এটী পেলে আমাদের দুর্দ্দশার আর আর অন্ত থাকবে না। সেজন্যে আমি বলি যে আর ইতস্তত করা উচিত নয়··· আর এক মুহূর্ত্ত দেরি না করে ছেলেটাকে থাবড়ে দি, এস।

তিলতিল। ও কি বলছে ?

কুকুর। (ওক্‌কে আক্রমণ করিবার জন্য তার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল)

এইও বুড়ো, পাজী ব্যাটা ! আমার দাঁত দেখেছিস ?

বীচ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) ওক্‌কে অপমান করছে, দেখ।

ওক্। কে ওটা, কুকুর !···দাও ওকে তাড়িয়ে···বিশ্বাসঘাতকের স্থান এখানে নেই··

বিড়াল। (একান্তে, তিলতিলের প্রতি) কুকুরকে তাড়িয়ে দাও··ওদের কথার উল্টো মানে করছে···আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি···কোন ভয় নেই··কুকুরকে কিন্তু তাড়িয়ে দাও !

তিলতিল। যা বলছি এখান থেকে !

কুকুর। হুজুর, হুকুম দিলে এই বেতো, বুড়ো ভিখিরি ব্যাটার পা দুটো খুব কসে আঁচড়ে দি ; ভারি মজাই হবে এখন !

তিলতিল। চুপ কর্ পাজী !···তুই বেরো এখান থেকে !

কুকুর। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

...তোমার যখন দরকার হবে আমি আসব।

বিড়াল। (একান্তে তিলতিলের প্রতি) একে বেঁধে রাখাই ভাল, কি জানি কি হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে...শেষে গাছেরাও সব চটে যাবে আর সব পণ্ড হবে।

তিলতিল। বাঁধব কি করে?...শেকল ত আনিনি...

বিড়াল। সেজন্যে ভাবনা নেই, এই যে আইভি রয়েছে... খুব শক্ত করে সে বেঁধে ফেলবে।

কুকুর। (গর্জ্জিয়া উঠিয়া) ও, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম; বেড়াল হল যত নষ্টের গোড়া!...ওকে আমি দেখছি। ...হ্যাঁরে, কি ফিস্ ফিস্ করে কচ্ছিস তুই!...ওরে বেইমান, ওরে নচ্ছার, ওরে পাজী!...ভৌঃ, ভৌঃ ভৌঃ!

বিড়াল। দেখ্‌ছ, আমাকে অপমান করছে।

তিলতিল। বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুল্লে!...আইভি, তুমি ওকে আচ্ছা করে বেঁধে রাখ ত!

আইভি। (ভয়ে ভয়ে কুকুরের নিকট গিয়া) কামড়াবে না ত?

কুকুর। (গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে) না, বরং তার উল্টো...একটু থাম...আচ্ছা,... তুমি আমার সঙ্গে চল।

তিলতিল। (ছড়ি উঠাইয়া) টাইলো!

কুকুর। (তিলতিলের পায়ের নিকট শুইয়া ল্যাজ নাড়িতে লাগিল) হুকুম করুন, আমায় কি করতে হবে?

তিলতিল। সটান শুয়ে পড়...আইভি তোমায় বাঁধবে...তুমি চুপটী করে থাক, নইলে—

কুকুর। (মুখ বুজিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং আইভি তাহাকে বাঁধিতে লাগিল) বাঁধ, বাঁধ, যেমন করে ইচ্ছে, বাঁধ।...দেখ হুজুর, আমার নখগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে, নিশ্বাস চেপে ধরছে!

তিলতিল। আমি কিছু জানি না... যেমন তোর নষ্টামি চুপ করে থাক্... নড়িস্ নি...বড্ড বাড় বাড়িয়েছিস্ তুই!

কুকুর। তুমি আগাগোড়া ভুল বুঝেছ ...বেড়াল নেমকহারামি করেছে...ওরা তোমায় মেরে ফেলবে...হুঁসিয়ার হও... এই দেখ, মুখ বাঁধছে...আমি কথা কইতে পারছি না!

আইভি। কোথায় একে রাখব...খুব শক্ত বাঁধন দিয়েছি...কথা কইবারও ঘোটী রাখিনি।

ওক্। আমার একটা বড় শিকড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখে দাও—একেবারে পিছন দিকে ওর বিচার পরে করা যাবে... আচ্ছা, এবার হয়েছে ত?...এখন কাজের কথা বলি...মানুষের অত্যাচার আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে রয়েছে...আমি যে কি ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করেছি, সে আমিই জানি।...এই প্রথম, আজ আমরা মানুষের বিচার করতে বসেছি; সেও আমাদের ক্ষমতা বুঝতে পারবে।...যে অনিষ্ট সে আমাদের করেছে, যে রকম নিষ্ঠুরতা সে এদ্দিন দেখিয়েছে, তাতে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে আমাদের কারও এতটুকু আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সমুদয় বৃক্ষ ও জানোয়ার। না, না, না; কিছুতেই নয়!...ফাঁসি দাও, মেরে ফেল... ভয়ানক অত্যাচার!...ঘোর অবিচার! আর সহ্য হয় না!...টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল...মেরে ফেল...আর দেরি না...এই দণ্ডে...এইখানেই—

তিলতিল। (বিড়ালের প্রতি) এরা অমন করছে কেন? চটেছে না কি?

বিড়াল। ভয় নেই...একটু বিরক্ত হয়েছে বটে, কেননা বসন্ত ঋতু আসতে এখনও দেরি...তা হোক্; ভয় নেই... আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

ওক্। তাহলে আমরা ঠিক করে ফেলি এস, কি উপায়ে হত্যা করা যাবে। কোন্‌টা সব চেয়ে সোজা, সব চেয়ে নিরাপদ এবং কি উপায় করলে বেশী দাগ-টাগ থাক্‌বে না, যাতে শেষে ধরা না পড়ি।

তিলতিল। এরা কি করছে সব?... ...কিসের এত গণ্ডগোল? আমি ত আর পারিনা!...ওর কাছেই নীলপাখী রয়েছে, দিয়ে ফেল্লেই ত চুকে যায়!

ষাঁড়। সব চেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে পেঠের নীচে আমার শিঙ্গের একটী গুঁতো দেওয়া।...বল ত আমি—

ওক্। কে ও কথা কইচে!...

বিড়াল। ষাঁড়।

বীচ। আমার সব চেয়ে উঁচু ডাল আমি দিতে পারি ওদের ফাঁসে ঝোলাবার জন্যে।

আইভি। ফাঁসি লাগাবার জন্যে খুব ভাল দড়ি আমি দিতে পারি।

দেবদারু। কফিনের জন্যে আমি চার-খানা তক্তা দিতে পারি।

উইলো। সব চেয়ে সোজা উপায় আমার মনে হয় নদীতে চুবিয়ে মারা... আমি তার ভার নিতে পারি।

লেবুগাছ। (নম্রস্বরে) থাম, থাম; একেবারে অতদূর করাটা কি সত্যি সত্যি দরকার?...ওরা এখনও বড্ড ছোট্ট। আমি বলি, ওদের কয়েদ করে রাখ, যাতে কোন অনিষ্ট না করতে পারে। আমি বরং চারদিক ঘিরে ওদের কয়েদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ওক্। কে ও? লেবুগাছের মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি না?

দেবদারু। হ্যাঁ, সেই।

ওক্। তা হলে দেখছি, জানোয়ারদের মত আমাদের মধ্যেও ধর্ম্মদ্রোহী আছে... আজ থেকে তবে ফলের গাছকেও রাজ-দ্রোহী বলে ধরা গেল। ফলের গাছ ত আর সত্যি সত্যি গাছ নয়!

শুয়ার। আমি বলি, ছোট্ট মেয়েটাকে আগে খেয়ে ফেলা যাক্। আহা! কি মোলায়েমই লাগবে!

তিলতিল। কি বলছে ওটা?

বিড়াল। কি জানি, ওরা কিসের গণ্ডগোল করছে! গতিক বড় ভাল দেখছি না।

ওক্। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে প্রথম মানুষকে আক্রমণ করবে? কে প্রথমে এগুবে?

দেবদারু। এ সম্মান আপনারই প্রাপ্য, আপনি হলেন রাজা—আমাদের মধ্যে প্রধান।

ওক্। কে ও, দেবদারু! ভায়া, এখন

আমি বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি...চোখদুটী অন্ধ ...হাতে আর সে জোর নেই...সেদিন কি আর আমার আছে!···তুমিই বরং এ সম্মান গ্রহণ কর; তুমি চির-সবুজ, উঁচু মাথা, অনেক গাছের জন্ম তুমি দেখেছ! আমার অক্ষমতায় এ সম্মান তোমারই প্রাপ্য... তুমিই অগ্রসর হও।

দেবদারু। ধন্যবাদ; কিন্তু কফিনের জন্যে তক্তা জোগাবার সম্মান যখন আমার রয়েইছে তখন এর উপর আবার একটা ভার নিতে গেলে অন্য গাছদের উপর অবিচার করা হয়; এতে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। সেইজন্যে আমি বলছি যে বীচকেই বরং এ সম্মান দেওয়া হোক! আমাদের পরে প্রাচীনত্বে এবং বংশ-মর্য্যাদায় সেই-ই এ সম্মানের অধিকারী।

বীচ। তোমরা জানই ত উইপোকায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁঝরা করে ফেলেছে; ডালগুলো সব ফোঁফরা—জোর নেই। কিন্তু এল্‌ম্ আর সাইপ্রেস্ বেশ শক্ত আর বলবান।

এল্‌ম্। এ সম্মান আমি আহ্লাদের সঙ্গে নিতে পারতুম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না—কাল রাত্রে আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল একেবারে মুচড়ে গেছে।

সাইপ্রেস্। আমায় যদি বল ত আমি প্রস্তুত! কিন্তু আমিও ভায়া দেবদারুর মত বেশী অধিকার নিতে ইচ্ছুক নই। গোরের ব্যবস্থা আমাকেই কত্তে হয়; তা ছাড়া কবরের উপর অশ্রুপাত করবার সম্মানও আমার আছে, তবে আমার ঘাড়ে আবার আর-একটা কেন?...ঝাউকে বরং জিজ্ঞাসা কর।

ঝাউগাছ। আমাকে? সত্যি বলছ নাকি?...কেন, জান না কি যে কচি ছেলের হাড়ের চেয়েও আমার কাঠ নরম? তাছাড়া আমার অবস্থা এখন বড় সাংঘাতিক। আমি জ্বরে কাঁপ্‌ছি—আমার পাতাগুলো দেখছ না!...ভোর হবার আগেই আমার ভয়ঙ্কর সর্দ্দি ধরবে।

ওক্। (সক্রোধে) দেখছি, তোমরা মানুষকে দস্তুরমত ভয় কর।...দুটো ছোট ছেলে—একরত্তি, কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই তাদের হাতে, তারাও তোমাদের বশ করলে? তাদের দেখেও ভয়ে কেউ এগুতে পারছ না?...ঢের হয়েছে...আমি একাই যাব; এ সুযোগ ত ছাড়া যায় না।.. আমি বুড়ো হয়েছি—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না—হাঁটতে আরি না—চোখে দেখতে পাই না—কিন্তু তাতে কি যায়-আসে!...আমি আমার চিরশত্রুর বিরুদ্ধে একাই যাব...কোথায় সে?

লাঠি উচাইয়া তিলতিলের দিকে অগ্রসর হইল।

তিলতিল। (পকেট হইতে ছোরা বাহির করিয়া) কি?...বুড়োটা বুঝি লাঠি নিয়ে আমাকে মারতে আসছে?

বৃক্ষসকল। (ছোরা দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বৃদ্ধ ওক্‌কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল) ছুরি বার করেছে!··· সাবধান!...ছুরি বার করেছে!

ওক্। (আস্ফালন করিয়া) যেতে দাও আমায়!...ছুরিই হোক্ বা কুড়ালিই হোক্।···কিছু যায়-আসে না!...আটকাচ্ছ

কেন আমায়?...এ্যাঁ, কি বলতে চাও তোমরা?...(লাঠি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) আচ্ছা, তাই হোক্,···ধিক্ আমাদের... জানোয়ারদেরই বলুন আমাদের রক্ষা করতে!

ষাঁড়। বেশ কথা!...দেখ, আমি কি করি? শিঙের এক গুঁতোতেই ঠিক করে দেব!

মিতিল ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তিলতিল। ভয় কিসের?..আমার পিছনে থাক...ছুরি রয়েছে, ভয় কি!

ভেড়া। ছোট ছেলেটার দেখছি ভারি সাহস!

তিলতিল। তোমরা তা হলে সকলেই আমার বিপক্ষে?

শুয়ার। ভগবানের নাম কর; তোমার মরণ উপস্থিত।···কিন্তু ছোট মেয়েটাকে অমন করে লুকিয়ে রেখো না... আমি তাকে চোখে চোখে রাখতে চাই... আগে আমি ওটাকে খাব।

তিলতিল। (ভেড়ার প্রতি) তোমার আমি কি করেছি!

ভেড়া। না, কিছুই করনি...কেবল আমার ছোট ভাইটী, বোন দুটী, কাকা-কাকী, ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমাকে তোমরা জবাই করে খেয়েছ!...থাম, দেখাচ্ছি তোমায় মজা। যখন মাটীতে চিৎপাত হয়ে পড়বে, তখন দেখবে যে আমারও দাঁত আছে!

গাধা। আর আমারও খুর আছে!

ঘোড়া। (উদ্ধতভাবে পা আছড়াইয়া) দেখ্, আমি তোর কি দশা করি! এক লাথিতে মাটীতে ফেলে দাঁত দিয়ে তোকে ফেঁড়ে ফেলব!···(তিলতিলের দিকে দৌড়িয়া গেল, তিলতিল ছোরা উঁচাইয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ ঘোড়াটা ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিল) এ কিন্তু ভারি বিশ্রী!...ও আবার ছোরা দেখায় যে!...এ রকমটা কিন্তু ঠিক নয়!

ভেড়া। ছোট্ট ছেলেটার ত ভারি সাহস!

শুয়ার। (ভল্লুক ও নেকড়ের প্রতি) দেখ ভাই, তিন জনে মিলে ওদের ঘাল করি, এস।..আমি পিছন থেকে তোমাদের সাহায্য করব। ছেলেটাকে মাটীতে ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে তিন জনে ভাগ করে খাব।

নেকড়ে। সামনে গিয়ে তোমরা ওকে ভয় দেখাও, আমি পিছন থেকে লাফ দি। (তিলতিলের গায়ে লাফাইয়া পড়িল, তিলতিল পড়িয়া গেল)

তিলতিল। পাষণ্ড!···(এক হাঁটুতে উঁচু হইয়া প্রাণপণে ছুরি চালাইতে লাগিল এবং মিতিলকে কোনও রকমে বুকের নীচে ঢাকিয়া রাখিল। জানোয়ার এবং বৃক্ষসকল একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে জখম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিলতিল প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল) টাইলো, কোথায় তুমি? শিগ্‌গির এস! সাহায্য কর!··· টাইলেট্ কোথা গেল!...টাইলেট্, টাইলেট্!

বিড়াল। (এক পা তুলিয়া ধরিয়া) আমার চলবার শক্তি নেই, পা'টা গেছে —একেবারে মুচড়ে গেছে!

তিলতিল। (ছুরি চালাইতে লাগিল এবং প্রাণপণ শক্তিতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল) টাইলো, সাহায্য কর—আমি একা পারছি না!···ওরা অনেক···ভাল্লুক, শুয়ার, নেকড়ে, গাধা, দেবদারু, ঝাউ সব একসঙ্গে জুটেছে শিগ্‌গির এস টাইলো,শিগ্‌গির এস

টাইলো বাঁধন ছিঁড়িয়া এক লাফে আসিয়া তিলতিলের সম্মুখীন হইল এবং জানোয়ারগুলাকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করিল।

কুকুর। এই যে আমি এসেছি...আর ভয় নেই!...এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার দাঁতের কত জোর!···এই যে ভাল্লুক, এই যে শুয়ার, এই যে যাঁড়,···কেমন, আর লড়বে?···এই যে গাছের দল,...এবার তোমাদেরও ঠিক করছি, দাঁড়াও!

তিলতিল। আমি আর উঠতে পারছি না...সাইপ্রেস্ আমার মাথায় খুব এক ঘা মেরেছে।

কুকুর। ঔঃ, ঔঃ! উইলো আমার পা জখম করে দিলে।

তিলতিল। ওরা আবার আসছে, ওই দেখ, নেকড়ে সকলের আগে রয়েছে!

কুকুর। থাম, ওকে এবার আচ্ছা করে দেখিয়ে দি!

নেকড়ে। (কুকুরের প্রতি) বোকা, তোমার এই কাজ!...তুমি ত আমাদের ভাই!···তোমার কি মনে নেই যে তিল-তিলের বাপ তোমার সাত-সাতটা ছেলেকে ঠেঙিয়ে মেরেছিল!

কুকুর। বেশ করেছিল!...সেগুলো তোমারই মত দেখতে হয়েছিল কিনা, তাই মেরেছিল!

জানোয়ার ও বৃক্ষগণ। অধার্ম্মিক!··· বিশ্বাসঘাতক!···আহাম্মক! ওকে ছেড়ে দে!···ওটা ত মরে গেছে!···এখনও বলছি, আমাদের দলে আয়!

কুকুর। কখ্খন না!···প্রাণ থাকতে নয়!···তোমরা সকলে এক দিকে, আমি একা অন্যদিকে!...ভগবান আছেন, ধর্ম্ম আছেন, ভয় কি!···তিলতিল সাবধান, ভাল্লুক তেড়ে আসছে।···যাঁড়টাও আসছে! ...আমি লাফিয়ে ওর টুঁটি ধরব!···উঃ-হুঃহুঃ, গাধা ব্যাটা এক ঘা লাথি মেরেছে রে!···দুটো দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে! উঃ!

তিলতিল। টাইলো, আমার দফা রফা!...উঃহুঃহুঃ এল্‌ম্ আমার মাথায় আর এক ঘা খুব মেরেছে···এই দেখ, রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে!

কুকুর। আহা, হা! এস, এস, আমি বেশ করে চেটে দি; এখনি সেরে যাবে! ...তুমি আমার পিছনে থাক, ভয় নেই! ...আবার ওরা আসছে!...এবার আমাদের প্রাণপণে রুখে দাঁড়াতে হবে!

তিলতিল। (মাটীতে শুইয়া পড়িয়া) নাঃ...আর আমি দাঁড়াতে পারছি না!

কুকুর। (কাণ পাতিয়া শুনিয়া) ওই তারা আসছে···ওই তাদের আওয়াজ পাচ্ছি ···গন্ধ পাচ্ছি!

তিলতিল। কোথায়!...কে আসছে!

কুকুর। আর ভয় নেই! আলো আসছে!...সে আমাদের খুঁজে পেয়েছে! ...ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার প্রভু বেঁচে গেলেন·· ঐ দেখ গাছগুলো, জানোয়ারগুলো সব পিছু হঠ্‌ছে···ওরা ভয় পেয়েছে!

তিলতিল। আলো, আলো! শিগ্‌গির এস, শিগগির এস!···ওরা বিদ্রোহী হয়েছে...আমাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে!

আলো প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ করিবামাত্র বনভূমি আলোকিত হইয়া উঠিল—ভোর হইল।

আলো। কি এ!...ব্যাপার কি!...

কিন্তু বাছা, তুমি করছ কি—জান না?... হীরেটা ঘুরিয়ে দাও, এখনি সব নিস্তব্ধ, অসাড় হয়ে যাবে।

তিলতিল হীরকখণ্ড ঘুরাইবামাত্র বৃক্ষ সকলের আস্থা গিয়া গুঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। জানোয়ারদের আত্মাও অদৃশ্য হইয়া গেল এবং কতকগুলি নিরীহ ষাড়, ভেড়া, গাধা, ছাগল প্রভৃতি দূরে চরিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। বনভূমি নীরব, নিস্তব্ধ হইল। তিলতিল বিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

তিলতিল। কি আশ্চর্য্য! কোথায় গেল সব!...কি হয়েছিল ওদের? ওরা···

আলো। না, ওরা সর্ব্বদাই এই রকম দুর্দ্দান্ত; কিন্তু আমরা তা জানতে পারি না, কেননা দেখতে পাই না।·· আমি প্রথমেই তোমায় বলেছিলুম যে আমি যখন না থাকব তখন ওদের জাগালেই বিপদ ঘটবে!

তিলতিল। (ছুরি মুছিতে মুছিতে) টাইলোই বাঁচিয়ে দিলে, আর এই ছুরিখানা ..আমার ধারণাই ছিল না যে ওরা এত-বড় দুর্দ্দান্ত!

আলো। এখন বোঝো সমস্ত জগতের বিপক্ষে মানুষ একাই সব।

কুকুর। প্রিয় দেবতা, তোমার ভারি লেগেছে!

তিলতিল। তেমন নয়...মিতিলকে কিন্তু তারা ছুঁতেও পারেনি!...টাইলো, তোমার কিন্তু বড্ড লেগেছে...তোমার মুখময় রক্ত, পা ভেঙ্গে গেছে! আহা!

কুকুর। ও কিছু নয়!...সকাল হলেই সেরে যাবে। লড়াইটা কিন্তু ভারি জবর চলেছিল!

বিড়াল। (পিছনের একটা ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া নেংচাইতে নেংচাইতে) কি লড়াই-ই বেধেছিল!···উঃ! যাঁড়টা আমার পেটে এমন এক গুঁতো মেরেছিল... দাগ টের পাওয়া যাচ্ছেনা বটে, কিন্তু বড্ড বেদনা।...ওক্ আমার পা ভেঙ্গে দিয়েছে।

কুকুর। সত্যি?...কোন্ পা-টা!·· হ্যাঁরে, কোন্ পা-টা!

মিতিল। আহা বেচারা!...বড্ড লেগেছে! ...কোথায় ছিলে তুমি, একবারও ত তোমায় দেখিনি!

বিড়াল। (ভণ্ডামির সহিত) আর মা, সে কথা জিজ্ঞাসা কর কেন? শুয়ারটা তোমায় খেতে আসছিল, আমি তাকে তাড়া করতে গিয়েই না বাল হয়ে পড়লুম! আর বুড়ো ওক্ অম্‌নি বাগ পেয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলে—আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

কুকুর। (সরোষে দাঁত কড়্‌মড়্ করিয়া) আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই...ওরে নেমক্‌হারাম, বুঝলি? আয় দেখি তুই আমার সঙ্গে।

বিড়াল। (মিতিলের প্রতি) দেখ না মা, আমায় অপমান করছে...মারবে বলে শাসাচ্ছে।

মিতিল। (কুকুরের প্রতি) আহা, না, না, ছেড়ে দে ওকে; ওরে এই পাজা, হতভাগা!

সকলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

সৌভ্রাত্র

(Tennyson Turner হইতে)

কন্‌কনে শীত মাঘের বিষম রাত
হয়ে গেছে মাঠে ধান-কাটা সব সারা,
নিজ নিজ ধান করেছে খামার-জাৎ
এখন কেবল বাকী আছে সুধু মাড়া।
সহসা জাগিয়া বড় ভাই সেই রাতে
ভাবিল "যে ধান পেয়েছে ভাইটি মোর,
হয়ত তাহার বছর যাবেনা তাতে"
যাইল খামারে রাত্রি না হতে ভোর।

কন্‌কনে জাড়ে চোরের মতন গিয়া
খামার হইতে লয়ে ধান বোঝা-ছয়,
গোপনে ভায়ের খামারে আসিল দিয়া
ভায়ের স্নেহটি এমনি গোপনে বয়।
ঠিক সেই রাতে জেগে উঠে ছোট ভাই
ভাবিল—"দাদার সংসার চলা ভার,
ঐ ক'টি ধান—অন্য উপায় নাই—
ছেলেপুলে লয়ে কেমনে চলিবে তার ?"

উঠে ধীরে ধীরে কম্বল গায় মুড়ে
বোঝা-ছয় ধান খামার হইতে লয়ে'
চুপেচুপে গিয়ে দাদার ধানের কুঁড়ে
দিয়ে এলো ভাই মাথায় করিয়া বয়ে।
আপন আপন খামারে যাইয়া প্রাতে
গুণে দেখে বোঝা যেমন তেমনি রয়,
ভাবে দোঁহে তবে স্বপন দেখিল রাতে!
বারবার গোণে বেড়ে যায় বিস্ময়।

বৃদ্ধ মোড়ল এ-কথা শুনিল যবে
চোখ দিয়ে তার দরদর ধারা বয়,
কহিল "বাপু হে, এমনি হয় ভবে
দুটী হৃদি প্রেমে সমান যখন রয়।"
দুইজনে ডাকি কহে বুড়া তারপর
"একই গৃহে রও আজি হতে দুই ভাই
আজি হতে হোক্ তোমাদের কুঁড়ে-ঘর
গ্রামবাসীদের দেবতা-পূজার ঠাঁই।"

শ্রীকালিদাস রায়।

ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

য়ুরোপীয় মতামতের প্রভাবে ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমি দেখাইয়াছি, এক্ষণে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, এই পরিবর্ত্তনের ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না।

এক্ষণে, এই উভয় জাতির সামাজিক সম্বন্ধ এবং তাহার পর উহাদের রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া দেখিব।

১

প্রথমে সামাজিক সম্বন্ধ।

ভারতীয় সমাজ ও ইংরেজ সমাজ—এই উভয়ের মধ্যে দুইপ্রকার প্রতিকূলতা আছে। একপ্রকার প্রতিকূলতা,—জাতি হইতে, আব্‌হাওয়া হইতে, ইতিহাস হইতে সমুৎপন্ন : উহা হইতে, একদিকে যেরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে, আইন সম্বন্ধে, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পার্থক্য, সেইরূপ আর এক দিকে, রাষ্ট্রসংক্রান্ত সমাজসংক্রান্ত, পরিবারসংক্রান্ত ধারণা ও সংস্কার সম্বন্ধেও পার্থক্য ঘটিয়াছে। অন্য প্রকার প্রতিকূলতার হেতু—সভ্যতার অসমান উন্নতি ; এমন কি য়ুরোপেও,—অতীতের প্রতি যাহারা আসক্ত, এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন-কল্পনা অনুসারে যাহারা বর্ত্তমানকে সংশোধন করিতে চাহে—এই উভয়ের মধ্যে স্বভাবতই একটু মন-কষাকষি হয় না কি ?

* *
*

নিরক্ষর সরল লোকের মনে, ইংরেজের রীতিনীতি কিরূপ বিস্ময় উৎপাদন করে, M. Kipling তাঁহার দুই নভেলে বেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

"পুরোহিত বর্জ্জিত বিবাহ" নামক নভেলে, একজন ইংরেজ সৈনিকপুরুষের সহিত এক মুসলমান-যুবতীর অবৈধ যৌন-মিলনের বর্ণনা আছে।

আমীরা মেম্-লোকদিগকে ঘৃণা করে। এই বলিষ্ঠ সাহসী মেম্-লোকদিগকে সায়াহ্নে গাড়ী করিয়া সে যাইতে দেখিয়াছে; উহাদের মাতৃভাব খুবই কম (ধাত্রী ও আয়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করে); উহারা পতিব্রতা নহে, স্বামীর উপর উহাদের ভালবাসা নাই (সর্ব্বদাই বাহিরে থাকে, আপনার সাজসজ্জা, আপনার সুখ লইয়াই ব্যাপৃত)।

—"শোন বলি, আমি মরে গেলে, তুমি কি করবে বল দেখি? তুমি আবার তোমাদের সেই সাহসী সাদামুখ মেম্-লোকদের কাছে ফিরে যাবে? সকলেই ত আপনার লোকের কাছে আবার ফিরে যায়।

—সব সময়ে না।

—স্ত্রীলোকরা যায় না বটে, কিন্তু পুরুষেরা চিরকালই যায়। শীঘ্রই হোক্, দুদিন পরেই হোক্, তুমি আপনার লোকের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। এজন্মে আমার পক্ষে সবই সমান ; কিন্তু পরজন্মে, তুমি আমা হতে ভিন্ন স্বর্গে যাবে, সে স্বর্গের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই...এ কথা কি সত্যি, সাদামুখ বড় বড় মেম্-লোক, আমরা যে পরিমাণে জীবন যাপন করি, তার তিনগুণ বেশী জীবন যাপন করে? একথা কি সত্যি, তারা বুড়ো বয়সেও বিয়ে করে?

—তারা অন্যদের মতোই করে, বিয়ের যোগ্য বয়স হলেই বিয়ে করে।

—তা আমি জানি, ওরা ২৫ বৎসর বয়সে বিয়ে করে। সে কথা সত্যি।

—হাঁ।

—ইয়া আল্লা! ২৫ বৎসর বয়সে! নিতান্ত বাধ্য না হলে তোমাদের কোন পুরুষ মানুষই ১৮ বৎসর বয়সের মেয়েকে বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু ২৫ বৎসর বয়সে আমি ত একেবারেই বুড়ী হয়ে পড়ব। কিন্তু এই

মেম-লোকেরা চির-যুবতী; আমি ওদের দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি নে!

—ওরা তোমার কি-করেছে?

—আমি জানিনে। হয় তো এই পৃথিবীর কোন জায়গায় কোন রমণী আছে যার বয়স আমা অপেক্ষা দশ বৎসর বেশী। আর আমি যখন বুড়ী থুথ্‌রে হয়ে পড়ব, তখন তুমি সেই রমণীকে ভাল বাস্‌বে। এটা কিন্তু ন্যায়সঙ্গত নয়। তাদেরও একদিন মরণ আছে (১)।"

Lispeth। একজন প্রটেস্‌টাণ্ট মিশানারী সস্ত্রীক আসিয়া পঞ্জাবে বাসস্থাপন করেন। তিনি একটি পাহাড়ী মেয়েকে কুড়াইয়া পাইয়া তাহাকে "ব্যাপ্‌টাইজ্‌" করিয়া তাহার নাম রাখেন—Lispeth। মেয়েটি ক্রমে বড় হইয়া উঠিল; অমন সুন্দরী মেয়ে প্রায় দেখা যাইত না। পাঁচফুট দশ ইঞ্চ দীর্ঘ, মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, ফ্যাঁকাশে রং, বড় বড় চোখ্‌। খুব সাদাসিধে, খুব দয়ালু, খুব গর্ব্বিত। একদিন সে দেখিতে পাইল,—এক প্রাণীতত্ত্ববিৎ ইংরেজ, একটা প্রজাপতিকে অনুধাবন করিতে করিতে, খাদে পড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, বাড়ী আসিল। তাহাদের বাড়ী সেখান হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে। বাড়ীতে পৌঁছিয়া পাদ্রিসাহেবকে বলিল:—এই দেখুন আমার "বর" এনেছি, একে আরাম করে তুলুন, তারপর আমরা বিয়ে করব। পাদ্রি ও তাঁহার গৃহিণী, সাধ্যানুসারে ঐ ইংরেজের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সারিয়া উঠিলে তাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল, লিস্‌পেথ তাহাকে ভাল বাসে ও তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে; মুখের সাম্‌নে একেবারে "না" বলিতে না পারিয়া, সে সম্মতির ভাণ করিল; এবং শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে বলিয়া, দূরদেশে চলিয়া গেল। মনে করিল, কালক্রমে লিস্‌পেথ সমস্তই ভুলিয়া যাইবে। যেমন বলা তেমনি কাজ। ইংরেজ প্রস্থান করিল। দুই মাস, তিনমাস চলিয়া গেল। প্রতিদিন প্রাতে লিস্‌পেথ পথের দিকে চাহিয়া তাহার প্রতীক্ষায় থাকে। অবশেষে সে অধীর হইয়া উঠিল। তখন পাদ্রি-গৃহিণী তাহাকে সত্য কথাটা বলিল। লিস্‌পেথ বলিয়া উঠিল "এই রকম করে তোমরা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ। সব খৃষ্টানেরাই মিথ্যাবাদী"। সে তাহার য়ুরোপীয় পোষাক খুলিয়া ফেলিল, এবং নিজের পাহাড়ী কাপড় পরিয়া তাহার নিজের গ্রামে ফিরিয়া গেল। আবার স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, এক পাহাড়ী ছোক্‌রাকে সে বিবাহ করিল। ছোঁড়াটা তাহাকে প্রহার করিত, কিন্তু লিস্‌পেথ তবু তাহাকে ভাল বাসিত: আর যাই হোক্‌ সে মিথ্যা কথা কহিতে জানিত না (২)।

* *
*

য়ুরোপীয় আচার ব্যবহার দেখিয়া শুধু যে সাধারণ লোকে বিস্মিত হয় তাহা নহে, শিক্ষিত ভারতবাসীরাও উহার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারে না। মালাবারীর "ইংরেজি জীবনযাত্রার উপর ভারতীয় দৃষ্টি" নামক গ্রন্থে, লণ্ডনের এই বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা আমরা দেখতে পাই:—

"রাস্তায় সমস্ত লোকই বে-দম্‌ ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার কারণ—গ্রন্থিবাত, অভ্যাস বা প্রয়োজন। অবশ্য, এই ব্যস্ততা ও ক্ষণিক উত্তেজনার মধ্যে, অনেকেরই পক্ষে, এই তীব্র শীতল বায়ুই সুখের বা কাজকর্ম্মের উদ্দীপনাস্বরূপ। আমার ভারি আমোদ বোধ হয়, যখন দেখি, মেয়ে পুরুষ সবাই বোচকা-বুচকি লইয়া রেল-কর্ম্মচারীদের মুখের সাম্‌নে ছাতা আস্ফালন করিয়া, ষ্টেশনে পাগলের মতো ছুটিয়া আসিতেছে। একটি "গিন্নী-বান্নি" স্ত্রীলোক, যে সময়ে ট্রেন ছাড়িবে, ছাড়িবার বাঁশী দিয়াছে, ঠিক্‌ সেই শেষ-মুহূর্ত্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে..."

প্রকৃত এসিয়াবাসীর ন্যায় মালাবারী আরও এই কথা বলেন:—"এই উন্মত্ত জীবন-চাঞ্চল্যের মধ্যে, এই সব লোকেরা কথা কহিবারও অবকাশ পায় না; অস্পষ্ট উচ্চারিত কতকগুলি সংক্ষিপ্ত শব্দমাত্র, একটা পূরাবাক্য প্রায় শুনা যায় না। রাস্তায় এমন একটি লোকও দেখা যায় না, যার চলন-ভঙ্গীতে বা ভাষায় একটু গাম্ভীর্য্য আছে। তুমি যদি সরিয়া না যাও, তোমাকে রূঢ় ভাবে এক ঠেলা দিবে, তোমার পানে একবার চাহিয়াও দেখিবে না। কেহ কেহ ক্ষমা চাহে; কিন্তু তোমার মনে হইবে—অপরাধ ত করিয়াছে, তাহার উপর আবার অপমান (৩)।" এই চিত্রের সহিত মালাবারী-প্রণীত গ্রন্থে আর কতকগুলি কঠোর পৃষ্ঠা যোগ করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে ম্যালাবারী য়ুরোপীয় সমাজের মাত্‌লামি, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত পাপাচারকে চাব্‌কাইয়াছেন।

(১) আমীরার একটি পুত্র সন্তান হইল (তার নাম "তোতা")। অতি সুন্দর ছেলে; হাত-পাগুলা কচি কচি কিন্তু বেশ সুগোল; গায়ের রং অস্তগামী সূর্য্যের মতো সোনালী। শিশুটি ক্রমে দুরন্ত আহ্লাদে ছেলে হইয়া দাঁড়াইল, সে ঘরের বেড়ালের উপর, তোতাপাখীর উপর ক্রমাগত অত্যাচার করিত; তার বৃদ্ধা ধাত্রী, তার আত্মীয়-স্বজন সর্ব্বদাই তার নিকট "কেঁচো" হইয়া থাকিত। একদিন তোতা জ্বরে আক্রান্ত হইল; ভাবনা চিন্তায় হীনবল হইয়া তাহার মাতা অবশেষে কলেরা-রোগে মারা গেল। তাহার সেই য়ুরোপীয় ছেলে বাঁচিয়া গেল। বলিষ্ঠ জাতি হইতে প্রসূত এই ছেলে রোগ হইতে, রোগের কষ্ট হইতে মুক্ত হইল। আমীরার শেষ-কথাগুলি অতি সুন্দর, কিন্তু উহা হিন্দু রমণীর মতোও নয়, মুসলমানীর মতোও নয়, উহার ভিতর অনেকটা "আর্টিষ্টের" রচনা, "আর্টিষ্টের" মনোভাব প্রকাশ পায়। "আমার কিছুই রেখো না। এক গাছি চুলও না। শেষে সে চুলগাছিও পুড়িয়ে ফেলতে তোমাকে সে বাধ্য করবে। আর সেই আগুনের জ্বালায় আমিও জ্বল্‌ব। আর একটু হেঁট্‌ হও—আরও একটু। এইটুকু শুধু মনে রেখো, আমি তোমারি ছিলাম, আমার গর্ভের একটি সন্তান তোমাকে আমি দিয়েছি; কাল তুমি একজন সাদা-মুখ রমণীকে বিবাহ করবে, কিন্তু প্রথম প্রসূত সন্তানের আনন্দ তুমি তার কাছ থেকে পাবে না। তোমার পুত্র জন্মিলে আমার কথা মনে কোরো, তোমার সেই পুত্র তোমার নামই ধারণ করবে। আমি তার বালাই নিয়ে মরি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এমন কোন ঈশ্বর নেই যিনি···তুমি, প্রাণেশ্বর...(without benifit of clergy in Lelife's Hand cap)

(২) Lispeth—Plain tales of the hills.

(৩) (Malabari, "The Indian eye on English life" P. 30)

অপক্ষপাত লেখক,—তিনি যেমন দোষ দেখাইয়াছেন, তেমনি অনেক গুণও স্বীকার করিয়াছেন।

ইংরেজের গৃহ ও শিক্ষার প্রশংসা করিয়া তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"ইংরেজদের মধ্যে, গার্হস্থ্য জীবনে সাম্য-নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। সাম্য অর্থে, মতের স্বাধীনতা ও অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন। স্বামী ও স্ত্রী,—ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে উল্টা মত পোষণ করিতে পারে; গৃহে কিন্তু উহারা এক-প্রাণ। উহারা পরস্পরের বিশ্বস্ত সঙ্গী; পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ, একান্ত অনুগত, সেবা-নিরত; উভয়েই সাধারণ ভাণ্ডারের জন্য সুখ সঞ্চয় করিয়া আনে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যেও সেই রূপ মধুর সম্বন্ধ। সন্তানদিগের মনে কোন ঢাকাঢাকি ভাব নাই, পিতামাতার মনেও কোন সন্দিগ্ধতা নাই। মা ও মেয়ে যেন দুই ভগিনী এবং বাপ ও ছেলে যেন দুই ভাই,—তাহাদের ব্যবহারে এইরূপ মনে হয়। পিতা মাতা সন্তানের উপর নিজের প্রভুত্ব জারি করে না, সন্তানেরাও স্বকীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার করে না। যখন কোলের শিশু, তখন হইতেই পুত্রকন্যারা হৃদয়ের শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা লাভ করে; তাহার কিছু কাল পরে, মানসিক শিক্ষাও আরম্ভ হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিটা কি-স্বাভাবিক! শিক্ষা দিবার প্রণালীটাও কি-প্রীতিকর! এই শিক্ষা ক্লান্তিজনক নহে, এই শিক্ষা "গিলাইয়া দেওয়া" শিক্ষা নহে".....

মালাবারী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—ভারতবাসীরা ইংরেজ-প্রভুর দোষগুলা না লইয়া শুধু গুণগুলি গ্রহণ করিতে পারেন না কি? কিন্তু তখনি আবার তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যে সকল ভারতবাসী শিক্ষালাভ করে, তাহাদের মধ্যে ইহার বিপরীত ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"আমি অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়াছি—কেন আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংলণ্ডের কালেজে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া, শেষে খিটখিটে-মেজাজ ও তিতিবিরক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসে। উহার কারণ খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না, যে ব্যক্তি সমস্ত অবস্থা জানে সে সহজেই বুঝিতে পারিবে। ভারতীয় শিক্ষার্থী, ইংরেজ সঙ্গীদের সহিত সমানভাবে মিশিতে পারে না। নিজের বাড়ীতে অল্প বয়সে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহাতে এইরূপ ভাবে মিশিবার জন্য সে প্রস্তুত হয় নাই। একটা বিষয়ে তার বড়ই অভাব আছে। যে খেলাধূলা ইংরেজি কালেজে, চরিত্রগঠনের ও বন্ধুতার প্রধান উপাদান, সেইসব খেলাধূলায় সে খুবই পশ্চাদ্-বর্ত্তী। কোন কোন সদাশয় ইংরেজ সহপাঠী, কয়েক সপ্তাহ তাহার মুরুব্বি হইতে পারে, কিন্তু তবু সে যেন তাহাকে কাঁধের বোঝা বলিয়া অনুভব করে; কেননা, ভারতীয় শিক্ষার্থী, ইংরেজ ছাত্রের অভ্যাস ও মর্ম্ম-ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কিছুদিন ইংরেজ সহপাঠীরা ভারতীয় ছাত্রের ভাবভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া শেষে উহাকে ছাড়িয়া দেয়—উহার সঙ্গে তাহারা কোন সংস্রব রাখে না। তখন সেই বিদেশী ছাত্র একলা হইয়া পড়ে। কখন কখন কালেজের কিংবা গাড়ার যে সব ছেলে খুব নিকৃষ্ট-স্বভাব তাহারাই উহার মুরুব্বি হইয়া দাঁড়ায়। সে তখন তামাক খাইতে শেখে, মদ খাইতে শেখে, জুয়া খেলিতে শেখে, বাজি রাখিতে শেখে, এবং নানা প্রকার বদখেয়ালীতে টাকা উড়াইয়া দেয়। "কামরা ভাড়া করিয়া" জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তখন সে বাধ্য হয়। কিন্তু তথাপি নীচ রকমের বিবিধ অপব্যয় হইতে সে নিস্তার পায় না। সে রোগগ্রস্ত হয়, ঋণগ্রস্ত হয়, শেষে কালেজের উপাধি লইয়া কিংবা বিনা উপাধিতেই দেশে প্রত্যাগত হয়। সে ইংরেজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কতকগুলা ভুল ধারণা সঙ্গে করিয়া আনে। তাহার প্রধান কারণ, অল্প বয়সে গৃহের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা তাহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার উর্দ্ধে সে কিছুতেই উঠিতে পারে না। যত দিন এই দুই জাতির গার্হস্থ্য জীবনে পার্থক্য থাকিবে, ততদিন অনেক স্থলে এইরূপই চলিবে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেয়ার আলো

বিশ

যমুনার কথা

পিসিমার চিঠি পড়ে ছুঁড়িটার উপরে হাড়ে-হাড়ে চটে গিয়েছিলুম। বটে, আমার দাদাটিকে ভালমানুষ পেয়ে মাথা খাবার চেষ্টা? ও ডাইনি, রও, আগে একবার বাপের বাড়ী যাই, তারপর আঁশবঁটি দিয়ে নাক কেটে নেব! আমি শ্রীমতী যমুনা,—ম্যাজিষ্ট্রেট যার স্বামী—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখনো জলজ্যান্ত বেঁচে আছি, আমি থাকতে এতবড় বুকের পাটা? উঁহু, সেটি হচ্ছে না!

আর দাদাই-বা কেমন মানুষ বাপু! মেয়ে হোলে এতদিনে নাতি-পুতি নিয়ে ঘর করতে হোত, মুখ-সাবাসি করে' 'বিয়ে করব না বিয়ে করব-না' বলে এতখানি বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো থেকে, শেষটা কিনা কোথাকার কোন্-এক বুড়ো-ধাড়ী বিধবাকে দেখে একদম্ মন-হারিয়ে ফেলা! মন কি আলগা-ট্যাঁকের সিকি-দুআনী, যে, বলা নেই কওয়া নেই—যেখানে-সেখানে বে-টপকা ফস্ করে' অমনি হারিয়ে ফেললেই হোল! বাবা, বাবা, পুরুষের পায়ে নমস্কার!

এমনসময় হাকিমী সেরে জুতো মস্-মসিয়ে স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে বললেন, "কার চিঠি পড়া হচ্ছে?"

—"তোমার চিঠি নয়।"

—"সে ত বুঝছিই—কিন্তু লিখেছে কে?"

—"সে কথা ক্রমপ্রকাশ্য। হে ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক, আগে পুচ্ছ ত্যাগ করে' ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, তারপর ধীরে-সুস্থে সব শুনবেন।"

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

—"যমুনা, তুমি না হিন্দুললনা! স্বামীকে দাঁড়কাক বলা? অ্যাঃ!"

—"হিন্দুললনার পক্ষে কি সত্যকথা বলাও নিষেধ?"

—"তাবলে স্বামীর সঙ্গে নেহাৎ দাঁড়-কাকটার তুলনা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত কোকিল বললেও বলতে পারতে ত?"

—"হুঁ, পারতুম। কিন্তু কোকিলকে কেউ-কখনো ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করতে দেখে-নি, তাই তুমি কালো হলেও কোকিল নও!"

—"বটে! তোমরা,—রমণীরা হোচ্ছ থিয়েটারের কনসার্ট-বাজনার মতন; সে বাজনা না-থাকলে মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করে, কিন্তু থাক্‌লে প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক্ ছাড়তে থাকে। জান যমুনা, তোমার কথায় আমি ক্রমেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছি!"

—"ক্রুদ্ধ যদি হও প্রিয়তম, তবে দিন বুঝে আর-একদিন হয়ো! আজ তুমি ক্রুদ্ধ হলে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে কি-করে'? সুতরাং দায়ে পড়ে তোমার কাছে আমি মাফ চাইছি। কেমন, হোলো ত? যাও, এখন ধড়া-চূড়ো ছাড়গে!"

স্বামীকে জলখাবার দিয়ে, পাখার হাওয়া করতে-করতে আমি বললুম, "কালকে আমি দিনকতকের জন্যে বাপের বাড়ীতে যাব, তোমার মত কি?"

স্বামীর হাতের রসগোল্লা হাতেই রইল —চোখ কপালে তুলে তিনি বললেন, "অ্যাঁ, বাপের বাড়ী! এই একান্ত দুরন্ত বসন্তকালে আমার প্রাণান্ত করে' তুমি বাপের বাড়ী প্রস্থান করতে চাও? অসম্ভব!"

—"মাফ করতে হোল, মহাশয়ের আপত্তিকে আমি বেদবাক্য বলে মাথা পেতে নিতে পারলুম না।"

—"যমুনা, আমার মত উদার হলেও অন্তঃপুরে আমি Suffragetteএর আন্দোলন সহ্য করব না।"

—"তা না করতে পার, কিন্তু এই চিঠিখানা দয়া করে' পড়তে পারবে ত?"—বলে আমি পিসিমার পত্রখানা তাঁর হাতে দিলুম।

পত্রে পিসিমা লিখেছিলেন, দাদা নাকি কোথাকার এক অজানা ঘরে বিধবা বিবাহ করতে চান, কারুর কথা শুনছেন না, আমি যেন পত্র পেয়েই দেরি না করে' বাপের বাড়ী চলে যাই।

চিঠিখানা পড়েই স্বামী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। টেবিলে জোরে একটা ঘুসি মেরে বলে উঠলেন, "হুর্‌রে, হুর্‌রে! সাবাস মোহন, সাবাস! তোমার এতটা সৎসাহস হয়েছে—তুমি বিধবা-বিবাহ করতে চাও! সাধু, সাধু!"

আমি মুখভার করে' বললুম, "মরে যাই আর-কি! আমার দাদা বিধবাকে বিয়ে করবেন বলে হুজুরের অতটা খুসি হবার কারণ কি?"

—"খুসি হব না—বল কি? কুসংস্কারের জন্যে দেশে বিধবাদের কষ্ট কত, জানত! এ কুসংস্কারের হাত এড়াতে পেরেছে বলে মোহন আমার শ্রদ্ধার পাত্র! আর, তুমিই-

বা কি-রকমের মানুষ যমুনা? তুমি মুখে বল, বিধবাদের বিয়ে-দেওয়া উচিত, আর আজ তোমার ভাই বিধবা-বিবাহ করতে চেয়েছে শুনেই পিছিয়ে দাঁড়াচ্ছ বড় যে?"

—"বা বুদ্ধি! পিছিয়ে দাঁড়াব না? যার ঘর জানিনা, কুল জানিনা, স্বভাব জানিনা, তাকে বুঝি ধাঁ-করে' বিয়ে করে' ফেললেই হোল?"

—"সে-সব না-জেনেই কি আর মোহন বিয়ে করতে চেয়েছে?"

—"পুরুষকে বিশ্বাস করি না। স্ত্রীলোক দেখলেই তাদের জিভ দিয়ে জল ঝরতে থাকে, তাদের মাথা ঘুরে যায়। তখন তারা না পারে এমন কাজই নেই।"

—"যমুনা, পুরুষের পক্ষ থেকে আমি প্রতিবাদ করে' বলছি, তোমার এ বিশ্বাস ভ্রান্ত।"

—"প্রমাণ?"

—"আমি। অকস্মাৎ একদল স্ত্রীলোকের মাঝখানে গিয়ে পড়লে আমি আর মাথা তুলে চাইতে পারি না। জিভে জল আসা চুলোয় যাক্, উল্টে জিভ শুকিয়ে আসে!"

—"মশায়ের মত রূপে-গুণে-সেরা স্ত্রী সকলের ভাগ্যে সুলভ নয়! তুমি যে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখ, সে খালি আমার গুণে!—বুঝলে সখা, আমার গুণে!"

—"তোমার গুণ কি আমার গুণ সেটা আমি বলব না; কারণ, তোমার মত আত্মপ্রশংসা করে' আমি পাপসঞ্চয় করতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু, আর-একটা কথা বলি, শোন। স্ত্রীলোক যখন বক্তৃতা দেয়, একসঙ্গে তখন সে দুটি পাপ করে:— প্রথম, সে পৃথিবীতে রাবিশের স্তূপ বাঁড়ায়; —দ্বিতীয়, সে তার সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য নষ্ট করে! অতএব প্রিয়তমে, সাবধান —সাবধান!"

—"তোমার স্ত্রী-চরিত্রের ব্যাখ্যা এখন থামাও গো থামাও। আমার বক্তৃতা যদি বন্ধ করতে চাও, তাহলে এখন আমার বাপের বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে—"

—"হ্যাঁ, আমি তোমাকে বাপের বাড়ী যেতে দিতে পারি বটে, কিন্তু এক সর্ত্তে।"

—"সর্ত্তটা কি, শুনি!"

—"মোহনের বিবাহে তুমি বাধা দিতে পারবে না।"

—"যদি দাদার যোগ্য ঘর হয়, দাদার যোগ্য বউ হয় তাহলে আমি কোন আপত্তি করব না।"

—"হ্যাঁ, তোমার এ-কথা সঙ্গত বটে। আচ্ছা, তোমার কলকাতায় যাবার আরজি মঞ্জুর হোল।"

* * *

কলকাতায় এসে পিসিমার মুখে সমস্ত শুনলুম। পিসিমা যেমন ভাবে বর্ণনা করলেন, তাতে বোঝা গেল, মেয়েটি পেত্নীর মত কুৎসিত ও অতিশয় বেহায়া, সে একেবারেই গৃহস্থের বউ হবার উপযুক্ত নয়, দাদাকে সে ওষুধ খাইয়ে গুণ করেছে। আরো যে-সব কথা শুনলুম, তাতে মেয়েটার উপরে আমার ঘৃণা ও রাগের মাত্রা বাড়ল বৈ, কমল না। পিসিমাকে বললুম, তাকে একবার ডাকিয়ে আনিয়ে বুঝানো যাক যে, তার মত

বিধবাকে বিয়ে করা আমার দাদার পক্ষে অসম্ভব।

সেদিন দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ীতে মেয়ে-সভা যখন বেশ জমকে উঠেছে, মেয়েটিকে তখন ডেকে আনা হোল।

ভেবেছিলুম, হাড়কুৎসিত হৃদ্দবেহায়া একটা বুড়ো-ধাড়ী মেয়েকে দেখব। ওমা, তার বদলে এ কী! এ যে লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে-পড়া, বমফুলের মত সুন্দর ছোট্টখাট্ট একটি মোমের পুতুল! মনে হোল, যেন ভাল আঁকিয়ের তুলিতে আঁকা একটি দেবীর মূর্ত্তি জীয়ন্ত হয়ে পট ছেড়ে সভার মাঝখানে এসে দাঁড়াল! এমন চমৎকার তার রং, এমন গোলগাল তার গড়ন-পিটন যে, দেখলেই তাকে ভালবাসতে সাধ যায়। আমি আর চোখ ফিরাতে পারলুম না—অবাক হয়ে তার পানে তাকিয়ে রইলুম।

ইতিমধ্যে পিসিমা আর তাঁর পাড়া-বেড়ানী সাঙ্গপাঙ্গরা মেয়েটিকে যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দিতে লাগল। মেয়েটিকে দেখে আমি এমনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে, কিছু বলবার অবকাশ পাইনি। তারপর যখন দেখলুম, এই সরল, লজ্জাশীলা, ভাল-মানুষ মেয়েটিকে খপ্পরে পেয়ে পাড়ার রঙ্গিনীরা সবাই মিলে যা-খুসি অপমান করতে মেতে উঠেছে, আর মেয়েটি একটিও কথা না-বলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাপুস চোখে কাঁদছে, তখন তার জন্যে আমারও প্রাণ কেঁদে উঠল।

আমি তার পক্ষ নিয়ে সবাইকে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিলুম। এরা সকলে জানত যে, আমি মুখ ছোটালে কারুর মান বজায় থাকবে না। কাজে-কাজেই তারা চুপচাপ হয়ে গেল। মেয়েটিকে আমি তখন আবার তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলুম।

কিন্তু মন তবু বোঝ মানল না। আহা, এই সবে-বাপ-হারা অভাগী মেয়েটিকে আজ আমার জন্যেই এত লাঞ্ছনা আর বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করতে হোল—এই ভেবে-ভেবে তার জন্যে আমার প্রাণটা ছটফট্ করতে লাগল। দাদার কাণে যদি এ-সব কথা ওঠে তাহলে তিনিই-বা কি মনে করবেন! শুনলুম, মেয়েটির বাড়ীতে এখন পুরুষ আর কেউ নেই, দাদাই তাকে দেখেন-শোনেন। আমি আর থাকতে পারলুম না—বাগান দিয়ে তার বাড়ীতে গেলুম।

গিয়ে সে কী দেখলুম!

মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে আর ভাঙ্গাগলায় মরণকে ডাকছে! উঃ, কি নির্দ্দয় আমি!

নিজেকে ধিক্কার দিতে-দিতে আমি তার পাশটিতে গিয়ে বসলুম। নিজের দুঃখে সে এমনি বিভোর হয়ে ছিল যে, মোটেই আমার সাড়া পেলে না! তার গায়ে হাত দিয়ে বললুম, "ছি ভাই, এমন করে' মরণকে কি ডাকতে আছে?"

সে চম্‌কে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল; সজল চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

তখনো তার চোখ ছাপিয়ে গাল বয়ে টস্‌টস্ করে' জল ঝরছে দেখে আমি নিজের

আঁচলে তার চোখ মুছে দিলুম। বললুম, "লক্ষ্মীটি, আর কেঁদ না!"

সে বাধো-বাধো গলায় বললে, "আপনি—আপনি কে?"

—"আমি মোহনবাবুর বোন। কেমন, এখন চিনতে পারলে ত?"

আমার পরিচয় শুনে আবার সে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ল।

আমি হেসে বললুম, "ভয় নেই বোন, ভয় নেই। আমি বাড়ী বয়ে তোমার সঙ্গে কোঁদল করতে আসি-নি। আমি এসেছি মাফ চাইতে!"

সে হেঁটমুখে খানিকটা চুপচাপ রইল। তারপর খুব আস্তে-আস্তে বললে, "কেন, আপনি কি করেছেন যে, মাফ চাইছেন? বরং আমিই আপনাদের কাছে দোষী।"

—"তুমি কিসে দোষী বোন!"

সে অভিমানে ফুলে-ফুলে বললে, "দোষী নই! আমার আপন বলতে তিন কুলে কেউ নেই, আমি গরীবের মেয়ে তায় বিধবা, আমি কি না আপনাদের নির্ম্মল বংশে কালি দিতে চাই! আমার কথায় বিশ্বাস করুন, তে-রাত্রি না পোয়াতে-পোয়াতে এ আপদ বাড়ী ছেড়ে যেদিকে দু-চোখ যায়, চলে যাবে—আপনাদের আর ভাবতে হবে না!"

মনে-মনে প্রমাদ গুণে আমি বললুম, "ভাই, আমাদের মাফ করো। পিসিমা-বুড়ী চিরকালই অমনি যা-তা বকেন, আর পাড়ার লোকেরা ত এমনি ঘোট পাকাতে পারলেই বাঁচে। ওদের কথায় তুমি কাণ দিও না, ওরা কি না বলে! তোমাকে আমি কোথাও যেতে দেব না—তুমি আমাদের বউ হবে—আমাদের সংসার আলো করে' থাকবে।"

—"ওগো না, আমি চিরদুঃখী, আমার দুঃখের জীবন সংসারে কারুর কাজে লাগবে না! আমার জন্যে সমাজে কেন আপনারা মাথা হেঁট করবেন,—আমি কোথাকার কে!"

আমি আর থাকতে পারলুম না,—দুহাতে জোর-করে' তাকে বুকে টেনে নিয়ে সুর করে বললুম,—

"তুমি আমার সোহাগ-পাখী আমি তোমার পিঞ্জর!"

ছাড়া পেলে তবে ত উড়ে পালাবে? কিন্তু আমরা তোমায় ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না, এমনি-করে' বুকে বেঁধে রাখব!"

আমার বুকে মাথা রেখে সে আবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তার মুখখানি তুলে ধরে বললুম, "তোর নামটি কি ভাই?"

—"সরমা।"

—"আর আমার নাম যমুনা। তা ছাখ্ ভাই সরম, তোর এই রাঙা ঠোঁটে আমার একটি চুমু খাবার ভারি লোভ হচ্ছে—তোর এ ঠোঁটদুখানি এখনো ত কেউ মৌরসী-পাট্টা করে' নেয়-নি? আমি চুমু খেলে সেটা বেআইনি হবে না ত? আমি ভাই হাকিমের গিন্নী—সব কাজেই আইন বাঁচিয়ে চলি!"

সেই জল-ভরা চোখেই সরমা ফিক্-করে' হেসে ফেললে; তার হাসি দেখে বুঝলুম, আমারই জিৎ! আমি আদর করে' তার মুখে একটি চুম্বন দিলুম।

—"আমাকে আর আপনি বলে ডাকিস নি! তা-বলে তুই-তোকারিটাও যেন করিস নি,—আমি একে তোর চেয়ে বয়সে বড়, তায় শীগ্‌গির তোর ননদ হব!"

—"আপনি বড়—"

—"ফের আপনি। আমার কথা অমান্য করলে এখনি থেকে ননদ-নাড়া সুরু করে' দেব কিন্তু!"

—"তুমি ভারি দুষ্টু ভাই, আমাকে খালি-খালি হাসিয়ে দিচ্ছ!"

—"হেসে-নে ভাই হেসে-নে, হাসতে পায় ক-জন? কান্না-ভরা সংসারে এক-একটি হাসির দাম লাখ টাকা রে লাখ টাকা!"

—"তুমি কে ভাই, একদিনেই যেন কত-জন্মের আপনার লোকের মত কথা কইছ!"

—"তোর রূপ দেখলে যে জগৎ ভুলে যায়—আমি কোন্ ছার! তোকে দেখেও যে তোকে আপন করতে চাইবে না, সে কি মানুষ?"

—"তোমার পায়ে পড়ি দিদি, খালি-খালি এমন-করে' আর লজ্জা দিও না।"

—"সরমা, আমার দাদাকে তারিফ করি—তাঁর নজর খুব উঁচু বটে! তাই ত আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, যে মানুষ বিয়ের নামে জ্বলে উঠত, সে হঠাৎ এমন বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠল কেন! এতক্ষণে সব বোঝা গেল; দাদা ত পুরুষমানুষ, তোকে দেখে আমারই মাথা ঘুরে গেছে!"

—"যাও, আবার!"

—"আচ্ছা ও-কথা আর বলব না। কিন্তু অন্য-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।"

—"কি?"

—"লুকোবি নে, ঠিক জবাব দিবি?"

—"কথাটাই আগে শুনি!"

—"সরমা, দাদাকে তোর মনে ধরেছে? তাঁকে তুই ভালবাসিস?"

সরমার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল।

—"কথা কচ্ছিস না যে! বল্ না—লজ্জা কি?"

—"দিদি, দিদি—"

—"থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না, তোর চোখ দেখেই সব বুঝেছি!"

একুশ

মোহনের কথা

মুরারিবাবুর স্বর্গারোহণের পর ছ-মাস কেটে গেল; সরমা পিতার অভাব এখনো ভুলতে পারে-নি বটে, কিন্তু শোকের প্রথম ধাক্কাটা সে সামলে নিয়েছে।

এর-মধ্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে যমুনা এসে দিনকতক এখানে ছিল। পিসিমার মুখে শুনেছিলুম, আমার বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে যমুনাকে তিনি চিঠি লিখে আসতে বলেছেন। আমার এই ছোট বোনটিকে আমি যেমন ভালবাসি, তার দুষ্ট জিভকে তেমনি ডরিয়ে চলি। যদিও তার ভয়ে আমি সরমাকে ত্যাগ করতুম না, তবু, সে এসে আবার কি নতুন হাঙ্গাম বাধিয়ে বসে, তাই ভেবে আমার মন একটু উদ্‌ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যে প্রথম যেদিন সে এখানে আসে, সেদিন তার কাছ থেকে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়েছিলুম।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন আমি যখন খেতে বসলুম, যমুনা এসে আমাকে গ্রেপ্তার করলে। বললে, "কি দাদা, বিয়ে করে' বৌকে বাড়ী আনতে-না-আনতেই মায়ের পেটের বোনকে পর করতে চাও নাকি?"

যমুনার ইনিয়ে-বিনিয়ে ভূমিকা শুনেই বুঝলুম, সে আমাকে নাস্তানাবুদ না-করে' ছাড়বে না। নরম হলে পাছে সে বাগে পেয়ে বসে সেই ভয়ে একেবারে চড়া মেজাজে কড়াগলায় বললুম, "কেন, হয়েছে কি?"

যমুনা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, "না, না, হবে আর-কি! তবে কি না, কাল থেকে তোমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়-নি, তাই বলছিলুম! কাল ছিলে কোথা?"

—"যেখানে থাকি না, তোর সে খোঁজে দরকার কি?"

—"ওমা, তুমি যে দেখছি গোড়া থেকেই যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি সুরু করলে! এতদিন পরে শ্বশুরবাড়া থেকে এলুম, ভুলেও একবার জিজ্ঞেস করলে না, কেমন আছি!"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, "কিছু মনে করিস্ নি, আজ আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই।"

—"ভাল নেই! কি হয়েছে দাদা?"

"না, না, এমন-কিছু নয়, মাথাটা বড্ড ধরেছে!"

—"মাথা ধরেছে? চল, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে থাকবে চল, আমি তোমার মাথা টিপে দেব-অখন!"

—"না রে না, বেশী মাথা ধরে-নি, তোকে ভাবতে হবে না, যা!"

—"এই বললে বড্ড মাথা ধরেছে, আবার বলছ বেশী ধরে-নি! দাদা তোমার হোল কি?"

আমি বুঝলুম, দুষ্টু যমুনা আমাকে কিছু বলতে চায়—তার এ মাথা-টেপবার আগ্রহ ছলমাত্র। কি আর করি, সে যখন ধরেছে তখন অমনি-অমনি ছেড়ে দেবে না—সুতরাং খাওয়া শেষ করে' বাড়ীর ভিতরেই আসতে হোল।

যমুনা আমার পিছনে-পিছনে ঘরে ঢুকে বললে, "দাদা, তোমারও মাথা ধরে-নি, আমাকেও মাথা টিপে দিতে হবে না, এ আমি খুব জানি! কিন্তু তুমি আমার কাছ থেকে এমন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন বল দেখি?"

আমি চটে বললুম, "তুই কি ভাবছিস, তোর ভয়ে?"

—"সে কি কথা! তুমি হলে পুরুষ, আমি স্ত্রীলোক; তুমি হলে দাদা, আমি বোন; তুমি হলে বড়, আমি ছোট; আমাকে ভয়! ওঃ, অসম্ভব—অসম্ভব!"

—"থাম্, থাম্, অত পাকা কথা বলে আর ঠাট্টা করতে হবে না!"

—"আচ্ছা, আর পাকা কথা বলব না। দাদা, তুমি নাকি বিয়ে করবে?"

—"হুঁ।"

—"বিধবা-বিবাহ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি হয়েছে তা?"

—"তোমার বউকে আমি দেখেছি।"

—"বেশ করেছিস্।"

—"সরমার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে।"

যমুনা কি বলতে চায়? কিছু বুঝতে না-পেরে আমি চুপ করে' রইলুম।

যমুনাও খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "দাদা, সরমাকে যত শীঘ্র পার, বিবাহ কর। পাড়ায় যে-রকম সব কথা রটেছে, তাতে যত দিন যাবে ততই গোল বাড়বে। এতে সরমার মনে কষ্ট হতে পারে। তার জন্যে তুমি এক-ঘরে হবে—এই ভাবনায় এখনি তার মন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। গোলমাল বেশী পাকিয়ে উঠলে সে হয়ত তোমাকে বিবাহ করবে না। তোমার কোন ভয় নেই দাদা, পাড়ার লোকের চোখ-রাঙ্গানিতে তুমি ভয় পেও না, ওরা তোমার কিছুই করতে পারবে না।"

যমুনা যে আমার সহায় হবে, এটা আমি কল্পনাও করি-নি। আমি ভেবেছিলুম, তার মনও সাধারণ স্ত্রীলোকের মত সঙ্কীর্ণ, অনুদার। বিলাতফেরৎ স্বামীর সংসারে গিয়ে তার চরিত্র যে এমনভাবে বদলে গিয়েছে, এ আমি জানতুম না।

আমি বললুম, "বোন, পাড়ার লোককে আমি একটুও ডরাই না!"

—"কিন্তু সমাজে তোমাকে নিয়ে গণ্ড-গোল হোলে, তোমার ভালোর জন্যে সরমা হয়ত আর বিবাহ করতে চাইবে না। আমি আজকে নানা কথাপ্রসঙ্গে সরমার মন বেশ করে' জেনে এসেছি, তাই এ কথা বলছি। এ বিয়েতে তুমি দেরি কোরো না দাদা, সরমার মত স্ত্রী তুমি আর-কোথাও পাবে না!"

যমুনা কিছুদিন আমাদের বাড়ীখানি সরল হাসির তরল স্রোত ভাসিয়ে আবার স্বামীর কাছে চলে গেল। এই ক-দিনেই সরমাকে সে একেবারে নিজের করে' নিয়েছিল। তার অজচ্ছল হাসির ফোয়ারায় সরমার শোকার্ত্ত প্রাণও সরস হয়ে, তার বিমর্ষ মুখখানিও হাসির আভাসে মধুর হয়ে উঠেছিল। রোজ দুপুরবেলায় তারা দুজনে বসে-বসে গল্পগুজব করত; যমুনার মিনতি এড়াতে না পেরে সরমাকে এস্রাজ বাজাতে হোত, কোন-কোনদিন তার বাজনার সঙ্গে যমুনাও গুন্‌গুন্ করে' গান গাইত। তার নিসঙ্গ জীবনে এমন-একজন সঙ্গী পেয়ে সরমাও যেন বর্ত্তে গিয়েছিল।

যমুনা চলে যাবার পর একদিন সরমার কাছে গেলুম। সরমাকে নীচে না দেখতে পেয়ে ছাদের উপরে উঠলুম।

সূর্য্য তখন আকাশের রঙ্গের স্রোতে ডুব দিয়ে তলিয়ে গেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত নীলপট সোনার আভায় ক্রমেই সোনালি হয়ে উঠছে; তারই উপরে নরপ্রাণের বিচিত্র-অনন্ত আশার মত গোধূলির রঙ্গিন মেঘমালা ছবির পর ছবি আঁকছে আর মুছছে, আঁকছে আর মুছছে। সেইদিকে অপলক চোখে চেয়ে সরমা চুপটি করে' দাঁড়িয়ে আছে।

আমার পায়ের শব্দ তার কাণে গেল। সে ফিরে দাঁড়াল।

আমি বললুম, "সরমা, এখানে একলাটি যে?"

সরমা ম্লানি হেসে বললে, "আপনার বোন দুদিনের জন্যে এসে আমার প্রাণটিকে

বন্দী করে' তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তাঁর জন্যে আমার মন-কেমন করছে!"

—"এমন একলা থাক্‌লে মন যে আরো খারাপ হয়ে যাবে।"

—"দোক্‌লা হই কি-করে' মোহনবাবু, আমার আর কে আছে?"—বলে সরমা মাথা হেঁট করলে। প্রথম বসন্তের একটা দম্‌কা বাতাস এসে সরমার ছোট্ট কপাল-খানির উপরে একরাশ কোঁকড়াচুল নাচিয়ে তার মাথার কাপড়খানি খসিয়ে দিয়ে গেল।

সরমা মাথার কাপড় তুলে দিতে গেল। আমি বাধা দিয়ে বললুম, "থাক্, প্রকৃতির দূতকে বাধা দিও না! আজকে এ দুরন্ত বাতাস কারুকে রূপ ঢেকে রাখতে দেবে না, যতই মাথায় কাপড় দাও—সে দুষ্টুমি করে' ফের খুলে দেবেই দেবে। সরমা, আর আমাকেই-বা তোমার লজ্জা কি!"

—"বাতাসের সঙ্গেসঙ্গে মানুষরাও যদি অধীর হয়ে ওঠে, তাহলে লজ্জাবেচারীর দোষ আর কি বলুন!"

—"রূপ যখন অধীরতা আনে, লজ্জা তখন বড় কঠোর, সরমা! রূপ যখন চায় ফুটতে, লজ্জা তখন চায় ঢাকতে; অধীরতাকে দোষ দিচ্ছ, কিন্তু এতে যে অধীরতা আরো বেড়ে ওঠে! আর, প্রকাশেই ত সৌন্দর্য্য! মাথার উপরে ঐ যে বিরাট আকাশ, আবরণকে সরিয়ে রেখেছে বলেই সে এত সুন্দর। আবার দেখ, ঝরণার নাচ তখনই মধুর হয়ে ওঠে পাহাড়ের অন্ধকার-গুহার আবরণ তার লীলাকে যখন আর আড়ালে রাখতে পারে না।"

—"মোহনবাবু, আপনি অনায়াসেই কবি হোতে পারবেন।"

—"সরমা, সময়-বিশেষে মানুষমাত্রই কবি। চাঁদের আলো, ভোরের রোদ, ফুলের হাসি, পাখীর গান, বসন্তের বাতাস আর রূপের মোহ,—এরা অবোধ শিশুকেও কবি করে' তোলে,—তুমি-আমি কোন্ ছার! তবে কেউ এদের সাড়া সুধু অনুভব করে, আর কেউ সেই অনুভূতিকে ভাষায়, ছন্দে, সুরে প্রকাশ করতে পারে, এই যা তফাৎ।"

—"থাক্, মোহনবাবু, বাক্য-নবাবদের সঙ্গে—আমি সামান্য নারী—পেরে উঠব না। আমি হার মানছি। ভবিষ্যতে আপনি অনুগ্রহ করে' পদ্য ছেড়ে গদ্যে কথাবার্ত্তা কইলে সুখী হব!"

সরমা স্তব্ধ হোল। আমিও স্তব্ধ হয়ে মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলুম, তার এলানো খোঁপার তলায় মধুর ভঙ্গিতে হেলানো শুভ্র-নধর ঘাড়খানির উপরে, গোধূলির স্বর্ণকর কেমন চুম্বন-মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে!

আমি একটু ইতস্তত করে' তারপর বললুম, "সরমা, আর কতদিন তুমি এমন একলা থাক্‌বে?"

সরমা নীরবে তার সুডৌল হাতদুখানি তুলে কপালের দু-পাশ থেকে চূর্ণকুন্তল-গুলি সরিয়ে দিতে লাগল।

—"বিশেষ, এ-ভাবে আমরা আর বেশী দিন মেশামিশি করলে লোকের কুৎসাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আর বাস্তবিক, এটা ভালও দেখায় না।"

সরমা খুব মৃদুস্বরে বললে, "কিন্তু

মোহনবাবু, আপনি বিবাহ করলেও ত লোকের কাণাকাণি বন্ধ হবে না!"

—"হ্যাঁ, কিছুদিন কাণাকাণি করবে বটে। কিন্তু নিষ্কর্ম্মার কাণাকাণি আর কুৎসিত কুৎসার মধ্যে অনেকটা তফাৎ আছে।"

সরমা কাতরভাবে বললে, "আমাকে নিয়ে আপনি সুখী হতে পারবেন না—"

—"সরমা, আজ এতদিন পরেও কি কথা বলছ! আমার ভবিষ্যতের অন্ধকারকে তুমি সূর্য্যের মত উজ্জ্বল করে' তুলেছ, তুমি—"

—"মোহনবাবু, ভেবে দেখুন আমার জন্যে আপনাকে সমাজের কি কঠোর অত্যাচার সহ্য করতে হবে। দুঃখ সয়ে-সয়ে বুক আমার পাষাণ হয়ে গেছে; আপনাকে না পেলেও সে দুঃখ আমি সহ্য করতে পারব, কিন্তু চিরসুখী আপনি, আমার জন্যে আপনি কি-করে' এত দুঃখ সইবেন বলুন!"

—"তোমাকে জীবনের সঙ্গী করতে পারলে আমার আবার দুঃখ? সরমা, আজও তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না, এই দুঃখটাই আমাকে সব-চেয়ে বেশী কাতর করে' তুলেছে।"

—"জানিনা মোহনবাবু, কেন আমার মনে হচ্ছে যে, কি-একটা মহাবিপদ যেন হাঁ-করে' আমাকে গিলতে আসছে—যেন শীঘ্রই কি-এক অমঙ্গল এসে বাজের মতন আমাদের মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়বে!"

—"তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস না, সরমা!"

—"মোহনবাবু, এ কী বলছেন!"

—"সরমা, এই আমার শেষ কথা। তুমি আমাকে বিবাহ করবে?"

সরমা দু-হাতে মুখ ঢেকে বললে, "এর জবাব ত অনেকদিনই আপনাকে দিয়েছি! আবার নতুন করে' ও-কথা কেন তুলছেন?"

—"তাহলে বিবাহের দিন স্থির করি?"

সরমা চুপ। তার বুক নিশ্বাসে-নিশ্বাসে উঠতে নামতে লাগল।"

—"কথা কও, কথা কও!"

—"মোহনবাবু!"

—"না—বল, দিনস্থির করব, কি, করব না!"

—"করুন।"

—"সরমা, তুমি বাঁচালে, আমাকে বাঁচালে! অমন করে' মুখ ঢেকে থেক না—খোলো, খোলো, মুখ খোলো!"—এই বলে আমি তার কম্পমান হাতদুখানি নিজের দুহাতের ভিতরে জোর করে' টেনে নিলুম।

সরমার সমস্ত মুখখানি রাঙ্গা হয়ে উঠেছে—যেমন রাঙ্গা গোলাপফুল। তার কপালের এলমেল চুলগুলি ঘামে একেবারে ভিজে গেছে, তার ঠোঁটের উপরে চিবুকের উপরেও ছোটছোট শিশিরের ফোঁটার মত ঘর্ম্ম-বিন্দু!

সরমা অবসন্ন হয়ে ছাদের উপরে আমার দিকে পিছন ফিরে বসে পড়ল।

আমি যেন কেমন আত্মহারা হয়ে গেলুম। সরমা আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না;—আমি ধীরে-ধীরে—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও—তার উপরে ঝুঁকে পড়লুম, তারপর তার সেই নীল-ধমনি-আঁকা মোমের মত নরম, দুধের মত সাদা গলাটির উপরে

চুম্বন করবার জন্যে আবেগভরে মুখ নামালুম,—কিন্তু, সেই মুহূর্ত্তেই সরমা আবার মুখ ফেরালে, চকিতে আমিও আপনাকে সামলে নিয়ে সরে এলুম,—মনে পড়ল, আমাদের এখনো বিবাহ হয়-নি!

* * *

বিবাহের সমস্তই ঠিক হয়ে গেছে। আর সাত দিন! তারপর, সরমা আমার!

আজ সকালে পিসিমা আমাদের সকলকার কথা ঠেলে তাঁর শ্বশুর-সম্পর্কের কোন্-এক আত্মীয়ের বাড়ী চলে গেলেন; সেখান থেকে তিনি নাকি কাশী যাবেন,—এ বাড়ী আর মাড়াবেন না, আমাদের মুখ আর দেখবেন না!

আত্মীয়-কুটুম্বদের কেউই আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না—আমিও সেজন্যে কারুকে কাকুতি-মিনতি করলুম না। যাঁরা ভেবেছিলেন আমি তাঁদের কাছে নীচু হব, আমার এই অভাবিত উপেক্ষার ভাব দেখে তাঁরা মনে-মনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট আশ্চর্য্য ও মর্ম্মাহত হয়ে গিয়েছিলেন। আপনার লোকের মধ্যে এল খালি যমুনা। সে একাই একশো, তার কলহাস্যেই আমার বাড়ীখানি আসন্ন উৎসবানন্দে ভরপূর হয়ে উঠল।

আমার ভগ্নীপতিও আমাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়ে চিঠি লিখলেন যে, আমার এই সৎসাহসে তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন এবং বিবাহের উপঢৌকন নিয়ে তিনি যে যথা-সময়ে নববধূ দর্শন করতে আসবেন, পত্রে এ-কথাও বিশেষ জোরের সহিত লিখতে ভুলেন-নি।

কিন্তু, ভবিষ্যতের সৌভাগ্য-স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে আমি যখন নিখিল বিশ্বকে একটা আনন্দের রঙ্গভূমি বলে মনে করছিলুম, অকস্মাৎ দুর্ভাগ্য এসে ঠিক সেই সময়েই আমার জীবনে যে রাবণের চিতা জ্বেলে দেবে,—এ ত আমি ঘুনাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারি-নি! ওঃ, সে কি নিষ্ঠুর আঘাত—অদৃষ্টের সে কী কঠোর পরিহাস! তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় ছিল,—মরতে পারলে ত একেবারে সমস্ত ফুরিয়ে যেত—এমন পলে-পলে, তিলে-তিলে মরণ ত আমাকে গ্রাস করতে পারত না; সেইদিন থেকে বুঝেছি, একগাছি সরু সুতায় ভারি পাথরের মত মানুষের সমস্ত আশা-ভরসা দুলছে, যে-কোন পলকে সে সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে—মুহূর্ত্তের হের-ফেরে সুখে-সরস তোমার জীবন দুঃখে-বিরস এবং নিস্ফল হয়ে যেতে পারে!

যাক্,... ... ঘটনাটা কি-করে' ঘটল,এখন তাই বলি।

বাগানের যেখানে মর্ম্মর-নির্ঝরের সহস্র-ধারা, ভোরের তরুণ রবিকর পান করবার জন্যেই যেন চপল পুলকে ঝলকে-ঝলকে উপরে উছলে উঠছে, সেইখানে সরমা আর যমুনা দুজনে হাত-ধরাধরি করে' দাঁড়িয়েছিল।

আমি দুতলার ঘরে জানলার ধারে টেবিলের সুমুখে বসে ডায়েরি লিখছিলুম, তাদের দেখতে পেয়ে লেখা বন্ধ করলুম। তারা দুজনে নিজেদের কথাতেই মেতেছিল, আমাকে দেখতে পেলে না।

হঠাৎ যমুনার কি খেয়াল হোল,—সে

সরমাকে সেইখানে বসিয়ে রেখে বাগানের অন্যদিকে চলে গেল। সরমা একলাটি ফোয়ারার জলাধারের উপরে ঝুঁকে—বোধ হয়—লালমাছের খেলা দেখতে লাগল।

খানিক পরে যমুনা হাসতে-হাসতে ফিরে এল—আঁচল-ভরা একরাশ ফুল নিয়ে।

উপর থেকে তাদের অস্পষ্ট স্বর আমি শুনতে পাচ্ছিলুম।

যমুনার আঁচলে ফুল দেখে সরমা বললে, "অত ফুল কি হবে?"

—"ফুলে ফুলে আজ তোকে ফুলরাণী সাজাব।"

সরমা ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললে, "না।"

—"কেন, না কেন শুনি?"

—"উঁহু, সে হবে না। পাগলের মত থাম্‌কা ফুলের সাজ পরতে যাব কেন?"

—"তোর যে বিয়ে লা ছুঁড়ি!"

—"তোমার দাদারও ত বিয়ে! অতই যদি সাধ, যাও না, তাঁকেই সাজিয়ে এস!"

—"দাদার ভাবনা আমাকে ভাবতে হবে না। দুদিন পরে দাদাকে তুই হাত-ভরে ফুল নিয়ে প্রাণ-ভরে সাজাস্। আজ ত আমি তোকে সাজাই।"

—"না ভাই, না!"

যমুনা, সরমার গালে আদর করে' ঠোনা মেরে বললে, "ইস্, না বললেই শুনব কিনা! নে, নে, লক্ষ্মীটির মত চুপ করে' বোস্। দুদিন বাদে যে তোর ননদ হবে, তাকে চটাস্-নে!"

অগত্যা যমুনার কথায় সরমাকে রাজি হোতে হোল। ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসে যমুনা নিপুণ হাতে সরমাকে ফুলের গয়না পরাতে লাগল। সরমার মাথায়, কুন্তলে, শ্রবণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুতে, আঙ্গুলে, কটিতে ও চরণে—যেখানে যে ফুল সাজে, সেখানে ঠিক সেই ফুলের মানান-সৈ গয়না পরিয়ে, যমুনা একটু তফাতে সরে গিয়ে ঘাড়-বেঁকিয়ে দাঁড়াল,—তাকে কেমন দেখাচ্ছে, তাই দেখতে! বাস্তবিক, টাটকা ফুলের গহনায় সরমার স্বভাব-সুন্দর রূপের শিখা যেন আরো উস্‌কে উঠল,—তার পানে তাকাতে গেলেও চোখ যেন ঝল্‌সে যায়!

এমন সময় চাকরটা এসে ঘরে ঢুকল। তাকে কতগুলো জিনিষ কিনতে বাজারে পাঠিয়েছিলুম, সেইগুলো কিনে সে একটা মোড়কে বেঁধে এনেছিল। মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্যমনস্ক ভাবে সুতো ছিঁড়ে আমি মোড়কটা খুলতে বসলুম। একখানা খবরের কাগজ দিয়ে দোকানী জিনিষগুলো মুড়ে দিয়েছিল। আচমকা কাগজখানার এক জায়গায় চোখ পড়ে গেল। সেখানে বড় বড় হরফে লেখা ছিল:—

৫০৲ টাকা পুরস্কার!

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন মজুমদার তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরমা দেবীকে সঙ্গে লইয়া কোথায়

নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। মুরারিবাবুর বয়ক্রম প্রায় চতুঃষষ্টি বর্ষ, বর্ণ গৌর, আকৃতি হ্রস্ব, মুখে শ্মশ্রুগুম্ফ আছে। তাঁহার বামগণ্ডে একটি রক্তবর্ণ গোলাকার জড়ুলের চিহ্ন আছে। তিনি এস্রাজ ও বেহালা বাজাইতে নিপুণ। যিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় মুরারিবাবুর জামাতার নিকটে তাঁহার সন্ধান প্রদান করিবেন, তাঁহাকে উপরুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী
নং—শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটি একবার, দুবার, তিনবার রুদ্ধশ্বাসে পড়লুম,—পড়তে-পড়তে চোখের সুমুখ থেকে পৃথিবীটা যেন ক্রমে-ক্রমে সরে যেতে লাগল, দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে এল, মাথাটা ঘুরে গেল—তারপর টল্‌তে-টল্‌তে মাটির উপরে আমি মূর্চ্ছিতের মত পড়ে গেলুম।... ...

সেই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলুম, জানিনা; যখন ধুঁকতে-ধুঁকতে কোনরকমে দেহটাকে টেনে তুললুম, তখন আমার প্রাণের ভিতরটা যে কেমন করছিল, তা সুধু ভগবান জানেন, ভগবান জানেন!

এ সত্য, না স্বপ্ন? আমি হঠাৎ পাগল হয়ে যাইনি ত?—কাগজখানা আবার তুলে ধরলুম, আবার তার আগাগোড়া পড়লুম। না, কোন সন্দেহ নেই—সমস্তই মিলে যাচ্ছে, মুরারিবাবুর বয়স, চেহারা, তাঁর গালের জড়ুলের দাগ, তাঁর মেয়ের নাম, জামাইয়ের নাম—সমস্ত, সমস্ত! হা ভগবান, অভাগার এ কী করলে!

কিন্তু, কিন্তু,—সরমার স্বামী ত বেঁচে নেই,—মরা মানুষ কি-করে' ফিরে এল! অনেক ভেবেও কিছু বুঝতে পারলুম না; এ দুর্ব্বোধ রহস্যের মধ্য থেকে কেবল এই ভয়ানক সত্যটা বারংবার জেগে উঠতে লাগল যে, আমার সর্ব্বস্ব আজ হারিয়ে গেল—জন্মের মত, জন্মের মত!

বাগান থেকে সরমা আর যমুনার মৃদু হাস্য-কলরব ভেসে এল—আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সে হাসি শুনে হা হা করে' উঠল। ওরে যমুনা, তুই-না সরমার দেহ-খানি ফুলের গহনায় পুষ্পদেবীর মত সাজিয়ে দিয়েছিস্! কার এ পুষ্পদেবী? এ যে পরের প্রতিমা, একে যে বিসর্জ্জন করতে হবে!

বিসর্জ্জন করতে হবে, বিসর্জ্জন? সরমা আর আমার নয়? এ কি সম্ভব? না, না,—এ হোতে পারে না, এ হোতে দেব না! এমন-করে' আমি আত্মহত্যা করতে পারব না! সমাজ, সংসার, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম,—চুলোয় যাক! এ-সব মিছে, এ-সব খালি মানুষের স্বাধীনতাকে বাধা দেবার জন্যে! এ মিথ্যাকে আমি মানব না, এ বাধা ভেঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়ব—দুর্দ্দান্ত, উন্মত্ত অশ্বের মত! দেখি, কে আমার কি করতে পারে!... ... ...

বিবাহের আর বিলম্ব নেই! সরমার স্বামী যখন এতদিন তার খোঁজ পায়-নি, তখন এর-মধ্যেও পাবে না! আমিও সরমাকে কিছু বলব না,—না, একবর্ণও না! আগে বিবাহ হয়ে যাক্—তারপর যা হবার, হবে! সরমার স্বামী জানতে

পারলেও কোন ভয় নেই, আমার কাছ থেকে তখন ত আর সে স্ত্রী বলে সরমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না!... ...

আর জানতেই-বা দেব কেন? বিবাহের পরে সরমাকে নিয়ে আমি দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব! দূর-বিদেশে, সহর ছেড়ে সবুজ বনের ভিতরে, আঁকাবাঁকা নদীর ধারে, ছায়া-করা পাহাড়ের আড়ালে, লতা-পাতার কুটির গড়ব,—কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, সুধু আমরা দুটি প্রাণী সেই বিজনে-নিভৃতে কাননের বিচিত্র মর্ম্মর-প্রলাপ, পাখীর স্বাধীন গান, ঝরণার অশ্রান্ত তান শুনতে-শুনতে কপোত-কপোতীর মত মুখোমুখি হয়ে প্রেমের গুঞ্জনে দিনের পর দিন কাটাব—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন!... ... মাথার পরে নীলপদ্মের রং-মাখানো অনন্ত আকাশ, চরণতলে কোমল দুর্ব্বাদলের শ্যামলোচ্ছ্বাস, বনে-বনে চঞ্চল আলো-আঁধারের অবিরাম লুকোচুরি, গাছে-গাছে ফুলে-ফুলে বাতাসের স্নিগ্ধমধুর শ্বাস,—ওঃ, সে কী জীবন!... ... ...

কিন্তু, এ-সব আমি কি ভাবছি?... না, না, সে কি হয়? ঐ দেবতার নির্ম্মাল্যের মত নির্ম্মল সরমাকে আমি কি আমার পাপস্পর্শে কলঙ্কিত করতে পারি? প্রেমে যেখানে কপটতা, সেখানে শান্তি কোথায়? মনে অশান্তি, মুখে প্রেম? সে যে আরো অসহ্য! না,—মিছা এ লুকোচুরি, মিছা এ আত্মবঞ্চনা,—যতই যন্ত্রণা হোক্, সত্যের আদেশ আমাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতেই হবে। ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বিদায়ে

আসিয়াছ! তবু ভাল—এও দয়া তব;
তবু ত বিদায়কালে দুটি কথা কব
হৃদয়-বন্ধুর সনে জনমের শোধ;
শুধু ক্ষমা করো যদি দৃষ্টি করে রোধ
এ বিদায়-বিহ্বলতা; রুদ্ধকণ্ঠ ক্ষীণ
বেদনার বাষ্পে যদি বিলম্বিত দীন
বাণীবিনিময়কালে হয়ে পড়ে ভুলে'—
শেষভিক্ষা অপরাধ লইওনা তুলে'।
এ নিমেষ হবে শেষ—কতক্ষণ আর—
সময় হ'ল যে বন্ধু বিদায় নেবার!

হে চপল—শেষ তবে করে' লহ খেলা;
চুকাইয়া লহ ঋণ এ অন্তিম বেলা।
এই সে প্রথম পত্র, বিজয়ার রাতে,
আশীর্ব্বাদছলে যাহা দিয়েছিলে ছাতে
ত্রস্ত কবরীতে গুঁজে'—নিশীথ-শয়নে
যে বিষ করিনু পান প্রাণান্ত গোপনে।
বিস্ময়ে রহস্যে হর্ষে স্পন্দমান হিয়া
সঙ্কোচে শঙ্কায় যারে রেখেছে পুষিয়া
গোপন বক্ষের তলে বেদনার মত—
কত দীর্ঘ দিনমান, দীর্ঘ রাত্রি কত।
কে জানে সে আশীর্ব্বাদ অভিশাপে ভরা—
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ফিরে'-ফিরে' মরা!

নিরুত্তর মূঢ় ভক্তে যে আঘাত ফিরে'
দিয়াছ দেবতা মোর—সে শায়কটিরে—

তারেও ফিরায়ে লহ—সাঙ্গ তার কাজ—
মরমের রক্তমাখা—ফিরে' লহ আজ।
সেদিন কি মনে আছে? স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
দোলপর্ব্বদিনে সেই তেতলার ঘরে
কারে খুঁজিবার ছলে কারে পেয়ে একা
কহিলে কম্পিত কণ্ঠে—'তোমারি সে দেখা
চাহিয়া এসেছি শুধু'—কররক্তফাগ
পরশিল চরণের অলক্তক রাগ।
শিহরি গেনু যে মরি —অজ্ঞাত হরষে,
লিপি সাথে ঐ তব বিদ্যুৎ পরশে!

একান্ত যাচনা সেই ঠেলিতে কি পারি?
ধরা পড়িলাম বন্ধু—সে দোষ আমারি!
সেদিনও ত বজ্র দিয়া বাঁধিয়া হৃদয়
ফিরাইতে পারিতাম! আজি মনে হয়
কেন তাহা করি নাই—কেন মিছা ভুলে'
মসীমাখা মৃত্যুবাণ হাতে নিনু তুলে'।
রাজা যে কাঙালদ্বারে সাজিল ভিখারী
হাত পাতি—রিক্ত কি তা' ফিরাইতে পারি!
বুঝিলাম মরিলাম—তবু নিরুপায়—
সে আগ্রহ আকুলতা ফিরান' কি যায়?
মরিলাম—একছত্র 'আমিও তোমারি'
নিমেষের দুর্ব্বলতা—এত দণ্ড তারি!
এ জনমে ফিরিবে না—ফিরেনা সে আর—
সেই মোর এক শাস্তি সেই পুরস্কার।
হায় বন্ধু, তারপর—আরো যাহা বাকী—
এই ফিরাইয়া লহ—করে কর রাখি'—
সেই ব্যথাভরা দৃষ্টি আজো মনে হয়,
মোর চিরজনমের চরম বিস্ময়—
'কভু ভুলিব না তোমা'—সে 'কভু' কি আছে?
অভাগীর ভাগ্য সাথে সেও মজিয়াছে!

তার পর—তার পর—দেখি তুমি আজ
ভিখারীর স্বপ্নস্বর্গ—তুমি রাজ-রাজ
কাঙালের কল্পসৃষ্টি—এই চিত্ততীরে
দাহ রাখি দীপ্তিটুকু মিলায়েছে ধীরে।
সেই ভাল—সেই সত্য—হায়রে বিশ্বাস,
ইন্দ্রধনু পরিবে সে ধরণীর ফাঁস?

তবু যে পাইনু দেখা আজি শেষবার
এই মুহূর্ত্তের লাগি—সেও সে আমার
স্বপ্নভাগ্য—দরিদ্রের পরশ-মাণিক
দাঁড়াও আঁখির আগে দাঁড়াও খানিক
মন ত যায় না দেখা—দিনু যা দিবার—
ফিরাব কেমনে যাহা নহে ফিরাবার!
এ যে দরিদ্রের স্মৃতি—এ নহে ধনীর
ক্ষণিক চিত্তের দীপ্তি খেয়াল-খনির!
মোর সেই এক ছত্র—অপরাধ ফিরে'
দাও, এই শেষ ভিক্ষা আজি দুঃখিনীরে।
সেই মোর একছত্র কলঙ্কের কালী—
শুধিব কালিমা তারি হৃদি-রক্ত ঢালি।
কোন কথা আর কিছু নাহি কহিবার—
সময় হয়েছে শেষ বিদায় নেবার।

তবু শেষ-আশা প্রিয়, যদি কোন দিন
চিত্তে মেঘ করে' আসে স্নেহার্ত্ত নবীন
আজি শ্রাবণের মত—পূর্ণ কূলে-কূলে
সমস্ত আকাশ ভরি—পূর্ব্ব স্মৃতিফুলে'
উঠে সে পালের মত মরমের তলে,
জানিও একটি চিত্ত ছায়া-অন্তরালে
রবে চির-নির্নিমেষ ঐ মুখ চাহি'—
এই সে অন্তিম সাধ—অন্য সাধ নাহি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

স্মরণ

যুধিষ্ঠির যে বলেছিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই মানুষ মৃত্যুগ্রস্ত হচ্ছে তবু আমরা মৃত্যুকে প্রত্যয় করিনে, এইটিই সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ বড় সত্যকথা। মহামারী আমরা দেখি, প্রতিবেশীর গৃহে মৃত্যুদূত এসে যখন তার সর্ব্বস্ব সম্বল আত্মসাৎ করে তখন যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে চারিদিক কাতর হয়ে ওঠে, তাও আমরা শুনতে পাই, তবুও মৃত্যুর যে কি ভীষণতা তা আমরা জানিনে। যতক্ষণ এ মৃত্যু-অভিজ্ঞতা নিজের জীবনে এসে না উপস্থিত হয়, ততক্ষণ এর যথার্থ স্বরূপবোধ আমাদের জন্মায় না। মৃত্যুর অস্তিত্ব আমরা জানি, মানুষ মরে এ-কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু মৃত্যু যতক্ষণ আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব হরণ করে', না পলায়ন করে, ততক্ষণ তার পরিচয় হয় না, তার বেদনার অনুভূতি আমরা লাভ করি-নে। সুখের সংসার বেশ চলছিল, আশা আমাদের বর্ত্তমানকে নানাবর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর করে', উজ্জ্বল করে', সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত করে' দিয়েছিল; আজ যা হচ্ছে কালও তাই হবে, কিম্বা তার চেয়ে আরো সুখকর কিছু ঘটনা ঘটবে এ প্রত্যয় মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে এমন কল্পনাও মনের কোথাও স্থানলাভ করবার সুযোগ পায়-নি। আমরা বড় নিশ্চিন্ত হয়েই ছিলাম, এমন সময় বজ্রবেদনা বহন করে' মৃত্যু যখন তার করাল মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখীন হয়, সুখের সংসার ভেঙেচুরে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, আশার নিত্যনবীন সৌন্দর্য্য অন্ধকারে বিলীন হয়, আনন্দসঙ্গীত স্তম্ভিত হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, জীবন একেবারে নিঃসম্বল হয়, তখনি বুঝি মৃত্যু কি ভয়ানক! সে বেদনার প্রথম অভিঘাত এমনি প্রচণ্ড যে অনেক সময় বোধ-শক্তিই হারিয়ে ফেলি, অভাব যে কতবড় হল তা আমরা ধারণা করতেই পারি-নে। তারপর, যখন চেতনা আসে, তখন মনে হয়, এতবড় অবিচার কেন হল? মন বিদ্রোহী হয়, স্নেহ সহানুভূতি সান্ত্বনা সবই তার কাছে বিরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, বিশ্বের উজ্জ্বল শোভা, সুনিয়মিত আহ্নিক যাত্রা তার কাছে বড়ই নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়। তার সঙ্গে যেন সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ বিছিন্ন হয়ে যায়, কিছুই আর তাকে আনন্দ দিতে পারেনা। সে বড় একা হয়ে পড়ে, সুদূরে, অন্ধকারে, নির্জ্জনতায় থাকতেই তার ভাল লাগে। বিশ্ব তখন তার কাছে যেন থেকেও থাকে না। একান্ত নিঃসঙ্গ হবার, শোকের মধ্যে এই যে প্রেরণা, বেদনাহতের এই যে স্বাতন্ত্র্য অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের কামনা, এর মধ্যে বড় একটি মঙ্গল-ইচ্ছা নিহিত থাকে। আমরা প্রথমে সে কথা বুঝতে পারি-নে। যাঁরা ফোটোগ্রাফী (Photography) করেন, তাঁরা জানেন ছবির ছায়াপাত আলোকেই হয়ে থাকে, কিন্তু আভাসে যা থাকে তাকে সম্পূর্ণ ও পরিণত করতে হলে অন্ধকারেই তাকে রাখতে হয়। শোকের দিনে নির্জ্জনতায় যখন আমরা থাকি তখনই আপনার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সুযোগ হয়। যে বাণী বারবার মনের দ্বারে এসে ফিরে গিয়েছে, যে মঙ্গল-জ্যোতিঃ বাহিরের বিক্ষিপ্ত কিরণে আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হতে অবসর পায়-নি, সেই বারতা শ্রবণের, সেই আলোক দর্শনের সুযোগ ঘটে। মন যা নিয়ে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, আমরা দেখতে পাই সে সকল ক্ষণিক ও ক্ষণভঙ্গুরে আর চলেনা। যাকে এতবড় করে' রেখে-ছিলাম, যে আমার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আড়াল করে' ছিল, যার বাড়া আমার আর কিছুই ছিলনা, সেই যখন চলে গেল, সংসারের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে পড়ল, তখন, মনের নূতন জীবনের জন্যে, এমন কিছু আবশ্যক হয়, যার অভাববোধ এতদিন তার অন্তরে ছিলনা, সদ্যজাগ্রত অন্তরের বুভুক্ষা আর তুচ্ছতা নিয়ে, ক্ষণিক দিয়ে মেটেনা, সে আপনার মধ্যেই সেই আনন্দ-উৎসের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যার সুধার ধারা দিনে দিনে তাকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করতে পারবে। নিঃসঙ্গের মধ্য হতেই সে তার চিরসঙ্গীর পরিচয়ের আভাস পায়!

নিঃসঙ্গের মধ্য হতেই সে তার চিরসঙ্গীর পরিচয়ের সুযোগলাভ করে। যে সান্ত্বনা, অপরের স্নেহ-প্রীতিতে সম্পূর্ণরূপে এতদিন সে পায়-নি, কারো কথার মধ্যে যে পরম বাণী সে শুনেও বোঝে-নি, যখন সেই অমৃতবাণী আপনার মনের কাছেই শোনে, তখনি যে চরিতার্থ হয়ে যায়। যে বিধানে তার বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিধাতার নিকট হতেই সে সান্ত্বনার দান গ্রহণ করে। মা যখন সন্তানকে শাসন করেন, ব্যথা দেন, তাঁর কোলের কাছটিতে না পেলে, তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে না কাঁদলে ত সে বেদনা দূর হয় না, চোখের জল তিনিই মুছিয়ে দেন, তবেই ত শান্তি আসে! যে দুঃখ একদিন বড় অবিচার বলে বোধ হয়েছিল, আবার জানিনা কেমন করে' তারি মধ্যে তরুণ আনন্দের জন্ম হয়, বর্ষাধৌত নীলাম্বরে সূর্য্যালোকের মত, বিশ্বের শ্রী নির্ম্মলতর বলে মনে হয়—বর্ষার অভিষিক্ত মৃদু ধরণীর মত মনের ক্ষেত্রে বীজ বপনের শুভ অবসর আসে। আমরা পরিপূর্ণ মনে বলতে সক্ষম হই, "তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"

মেটারলিঙ্কের (Materlinck) নীলপাখী (Blue Bird) বলে' নাটিকাতে পড়েছিলাম, একবার খৃষ্ট-জন্মোৎসবের পূর্ব্ব রাত্রিতে দুটি ভাই বোন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্নে তারা দেখলে, যেন কোন অপূর্ব্ব লোকে গিয়েছে, কত সুন্দর সুন্দর স্থানে বেড়াচ্ছে, দেখলে কত নবজাত আত্মা সেখানে অতিথি, আবার কতজনে আমাদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসবার জন্যে নৌকায় আরোহী। এমি সময় ঘুরতে ঘুরতে একটি জায়গায় একটি কুটীরের সম্মুখে এসে, সেখানি তাদের বড়ই পরিচিত বলে মনে হল, দুয়ারের পাশে বুড়ো কুকুর পাহারা দিচ্ছে, ঘরের দাওয়ায় তাদেরি জানা-শোনা বিড়ালটি বসে বসে ঝিমচ্ছে—গৃহসজ্জা চিরপরিচিত! তারা বলে উঠল, এই যে দেখছি ঠাকুর-মা আর দাদামশায়ের ঘর—

তারা অগ্নি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, দেখলে তাদের দাদামহাশয় আর ঠাকুরমা যেমনটি ছিলেন অবিকল তাই আছেন, তারা তাঁদের কাছে দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে বল্লে, দাদা-মশায়, ঠাকু'মা—তোমরা তো তবে মরে যাও-নি, তোমরা যে ঠিক তেম্নিই আছ!—তাঁরা বল্লেন, তোমরা যখন আমাদের মনে করে' রেখেছ, তখন তো আমরা মরি-নি, তোমরা ভুলে গেলেই আমরা আর থাকি-নে, তোমরা যদি মনে করে' রাখ তাহলে ত আমরা চিরদিন অমর হয়েই থাক্‌ব!

যাঁরা চলে গিয়েছেন—তাঁরা আমাদের এই শ্রদ্ধার স্মরণের মধ্যে চিরদিন অ-মৃত। আমরা ত তাঁদের হারাই-নি বরং অন্তরের মধ্যে আরো নিবিড় ভাবে পেয়েছি—তাঁদের ত্রুটি, ভ্রান্তি, গ্লানি, কিছুই আর আমাদের মনে নেই—যা-কিছু সুন্দর, পুণ্যময় তাই অম্লান শোভায় চিরন্তন হয়ে আমাদের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করছে। আমাদের স্নেহের স্মরণে নিরন্তর সঞ্জীবিত হয়ে চিরঞ্জীবি হলেন, শুধু কি এবারকার মত! এ-সব স্মৃতি যে আমাদের আত্মার সম্বল, তারি মত অক্ষয় ও অবিনাশী—তাঁরা আমাদের যুগ-যুগান্তের জন্ম-জন্মের সঙ্গী হয়েই রইলেন!

যে বিশ্বজননীর স্নেহক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করে', তাঁরি আদেশে জীবনের অভিনয় সাঙ্গ করে' তাঁরা বিদায় নিয়েছেন, তাঁরি চিরপ্রসারিত অনন্তের আনন্দ-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মা উন্নততর, পুণ্যতর, শ্রেষ্ঠতর সদ্গতি লাভ করুক, এই আমাদের আজিকার একাগ্র প্রার্থনা—চিরদিন তাঁহাদের জন্য যেন,—মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥ মাধ্বার্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্ত-মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌঃরস্তু নঃ পিতা। মধু মান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবোভবন্তু নঃ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভূতগত ব্যাপার!

(খেয়ালি নক্সা)

ছেলেবেলা হইতে আমার ভারি ভূতের ভয়। সায়ান্সে এম-এ পাশ করিয়াছি তবু ভূতের ভয় ছাড়ে নাই। বলিতে লজ্জা করে, এই বুড়ো-বয়সে এখনও রাত্রের অন্ধকারে একা থাকিলে গা-ছম্‌ছম্‌ বুক-ঢিপ্‌ঢিপ্‌ প্রভৃতি যতগুলো ভয়াত্মক ব্যাধি আছে সবগুলো একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করে।

হয়ত এই ভূতের ভয় বয়স এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইত, কিন্তু কাল করিয়াছে ঐ বিলাতের ভূতুড়ে-সভা—সাই-কিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটি! এখন ত দেখিতেছি বিলাতে হেন নামজাদা লোক নাই যিনি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন। যাঁহাদের জ্ঞানের একটু টুক্‌রামাত্র লইয়া

বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছি, যখন দেখি তাঁহারাও আমার দলে তখন আমার ভূতের ভয় যে আরো সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে আশ্চর্য্য কি!

আমার বিশ্বাস, কি জ্ঞানী কি মূর্খ, পৃথিবীর সকল-লোকের মনেই ভিতরে-ভিতরে সমান ভূতের ভয় আছে। কেহ মুখ-ফুটিয়া কবুল করে, কেহ লজ্জায় বলিতে না পারিয়া দম-ফাটিয়া মরে। যাহা হৌক, এখন ভূতুড়ে-সভার দৌলতে বিজ্ঞানের কাপড় পরাইয়া ভূতের ভয়টাকে সভ্যসমাজে বাহির করিবার আয়োজন হইতেছে। তাহাতে ভূত-ভয়ের লজ্জা হইতে সভ্য-মানুষ পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিবে। ভয়কে গোপনে চাপিয়া রাখা শরীর এবং মন উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক।

জয় হৌক সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটির! যদি তাঁদের সাহসের পরোয়ানা না পাইতাম তাহা হইলে আজ যে-সব কথা বলিতে বসিয়াছি তাহা কি এত লোকের সামনে এমন অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম! আমার ত এ অতি নগণ্য ব্যাপার, এর চেয়ে আরো কত আজগুবি ভূতুড়ে কাণ্ড, বিলাতের ভৌতিক সভার সভ্যেরা কাগজে-কলমে জাহির করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

ভূতের ভয় জীবনে অনেকবার পাইয়াছি কিন্তু সেবারের মতন তেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার কাহারো অদৃষ্টে কখনো ঘটিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সে-কথা মনে করিতে এখনো গা ছম্‌ছম্‌ করে। যাঁহাদের ভূতের ভয় প্রবল, গোড়া হইতে বলিয়া রাখি, তাঁহারা কানে আঙুল দিন। কারণ এই গল্প শুনিতে শুনিতে বুক-ঢিপঢিপানি প্রবল হইয়া যদি কাহারো হার্ট-ডিসিস্‌ হয় তজ্জন্য আমি দায়ী হইতে পারিব না। বুড়ো মারিয়া শেষে খুনের দায়ে পড়িবার ভয় আমার নাই। আমার ভয়, পাছে তাঁহারা ভূত হইয়া কোনো ঘোর নিশীথে আমার সহিত রসিকতা করিতে আসেন!

যাক এখন আসল কথা। সে-বৎসর পূজার ছুটিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। বাড়ি হইতে এই আমার প্রথম বিদেশ-যাত্রা। সঙ্গে ছিল আমার বাল্যবন্ধু শ্রীশ। ছেলেবেলা হইতে দেখিতেছি শ্রীশ লোকটার আশ্চর্য্য সাহস। তাহার প্রাণে ভূতের ভয় একেবারে নাই। সে বলে রাত্রের অন্ধকারে সে একলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দিব্য ছাদে বেড়াইতে পারে; ঘোর নিশীথে অশথ কিম্বা বেল-গাছের তলা দিয়া যাইতে তার এতটুকু গা ছম্‌ছম্‌ করে না; পোড়ো-বাড়ির সাম্‌নে দিয়া সে বেশ গট্‌ গট্‌ করিয়া চলিয়া যায়। এবং এমন-কি সে ভূত কখনো দেখে নাই এ-কথা দিবা-দ্বিপ্রহরে সকলের সমক্ষে চীৎকার করিয়া বলিতে এতটুকু সঙ্কোচ করেনা।

ভূত লইয়া তাহার সহিত আমায় অনেকবার তর্ক হইয়াছে। সে বলে ভূত থাকিতে পারে কিন্তু তাদের ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, যেহেতু ঘাড় মটকাইতে হইলে যে হাতের দরকার তাহা তাহাদের নাই; এবং তাহারা ঘাড়ে চাপিলে ক্ষতি কি, যখন তাহাদের দেহের কোনো ভারই নাই। আমার মত কিন্তু অন্য-রকম। আমি বলি, ভয় যদি না থাকে তবে ভূতও নাই। ভয়টাকে বাদ দিয়া শুধু ভূতটাকে

রাখা একটা জঘন্য কুসংস্কারমাত্র। মোট কথা শ্রীশের সঙ্গে তর্ক করিয়া কোনো লাভ হয় নাই। কারণ শ্রীশের যুক্তিতর্কে আমার ভূতের ভয় এক তিল কমে নাই এবং আমার ভৌতিক গবেষণার দ্বারা তার মনে এতটুকু ভূতের ভয় সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি নাই। সে আমাকে ঠাট্টা করিত। আমি রুদ্ধ আক্রোশে মনে-মনে বলিতাম, রোসো, বাছাধন একদিন টের পাইবেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত দিন গেল তবু ঐ বাছাধন এক্কা কিছুই টের পাইলেন না। ভূতের মধ্যেও কাপুরুষ আছে না কি! কোনো সাহসী ভূত শ্রীশকে এখনো সায়েস্তা করিল না দেখিয়া, চুপি-চুপি বলি, আমার মন এক-এক সময় ভূতের অস্তিত্বসম্বন্ধে বিশেষ সংশয়ী হইয়া উঠে। মনের কথা বলিয়া ফেলিলাম, আজ রাত্রে অদৃষ্টে কি আছে জানিনা!

আমি অবাক হইয়া ভাবি শ্রীশ আমার মতো সায়ান্সে নয়, সাহিত্যে এম-এ, তবু সে ভূতের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল কেমন করিয়া! সাহিত্যে ত ভূতুড়ে ব্যাপারের অন্ত নাই! সে বলে ছেলেবেলায় তার একটু-একটু ভূতের ভয় ছিল, বড় হইয়া ছুটিয়া গেছে। আমার মনে হয় বড় হইয়া তার সেই ভয় আরো সুদৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। হ্যামলেট পড়া তার একেবারে বৃথা হইয়াছে।

কলিকাতা ছাড়িয়া শ্রীশের সঙ্গে বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম। নূতন দেশের নূতন-নূতন দৃশ্যে আমরা আবিষ্ট ছিলাম বটে কিন্তু তার মধ্যে ভূতের কথা যে একবারও মনে উঠিবার অবকাশ পায় নাই তাহা নহে। কারণ শ্রীশের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে সখ আছে। তার চর্চ্চা করিতে সে ছাড়ে নাই। সেও ত একরকম ভূতেরই কথা। কারণ তারা ত কেউ জ্যান্ত নয়, তারা অতীতের কবর হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া মানুষের মনের দ্বারে সাক্ষাৎ দিতে আসে। শ্রীশ এক-এক জায়গায় যায় আর সেখানকার ইতিহাস আবৃত্তি করিতে সুরু করে। অমনি সাত-আট শত বৎসরের পূর্ব্বেকার দৃশ্যাবলী আমার মানস-নয়নে প্রতিফলিত হইয়া উঠে অর্থাৎ আমি দিন-দুপুরে ভূত দেখিতে থাকি।

কাশীর সারনাথের মাটি খুঁড়িয়া এক প্রাচীন সহর বাহির করা হইয়াছে। দেখিয়া আমার মনে হইল, একটি ছোট-খাটো সহর-ভূত কবর ঠেলিয়া উঁকি মারিতেছে। তার অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম যেন কারা সব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ-কেহ সবেমাত্র মাটি ঠেলিয়া উঠিয়াছে, আবার কাহারা যেন মাঠির ভিতর হইতে বাহির হইবার জন্য সজোরে ঠেলা মারিতেছে। সবই অপরিচিত মূর্ত্তি! দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, আবার ভয়ও করিতে থাকে। মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া-বসন-পরা মেয়ে-পুরুষ দলে-দলে চলিয়াছে—সকলকার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, সংযত দৃষ্টি, সংহত আচরণ! হাতে হাতে সব ভিক্ষাপাত্র। ছোট ছোট কুটুরীর মধ্যে বসিয়া কাহারা সব মালা ঘুরাইতেছে, শাস্ত্র পড়িতেছে, গান গাহিতেছে।

একস্থানে বুদ্ধদেব তাঁর প্রকাণ্ড দেহ লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন।

কত দিন পরে আজ তাঁহার দেহের উপর সকালবেলাকার সূর্য্যের আভা আসিয়া লাগিয়াছে তবু তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। কত যুগ চলিয়া গেল, কত লয়-বিলয় ঘটিয়া গেল, মাটি পাথর হইয়া গেল, পাথর ভাঙিয়া ধূলা গুঁড়া হইয়া গেল, তাঁহার নিজের দেহ পাথর হইয়া গেল তবু তাঁর জাগিবার সময় হয় নাই। সেই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সামনে দাঁড়াইয়া আমার কেমন ভয় হইতে লাগিল, যদি এখনি ইহা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়! আশে পাশে দেখিলাম আরো কত দেব-দেবী নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের এমন ভাবভঙ্গী যে কখন যে তাঁহাদের খেয়াল হইবে আর জাগিয়া উঠিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন তার ঠিক নাই। চতুর্দ্দিকে যা দেখিতেছি এরা সবাই যদি একসঙ্গে মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া কলরব করিতে থাকে তাহা হইলে আমরা দুটি ক্ষুদ্র দর্শক এঁদের মধ্যে যে কোথায় হারাইয়া যাইব কেহ খুঁজিয়াও পাইবে না। হয়ত এদের সঙ্গে আবার মাটি-চাপা পড়িয়া কত কাল আমাদের এইখানে থাকিতে হইবে! আমার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিতে লাগিল। আমি শ্রীশকে টানিয়া লইয়া পালাইয়া আসিলাম।

তার পর আগ্রার দুর্গ। শ্রীশ তার ইতিহাস মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিল। এক-একটা স্থান দেখায় আর তার আনুষঙ্গিক গল্প বলিতে থাকে, অমনি সহস্র সহস্র সাহাজাদা, নবাব-জাদা মাথায় তাজ, হাতে গজদন্তের ছড়ি, পায়ে নাগরা পরিয়া হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া আসে। হাজার-হাজার বেগম সাহাজাদী ও তাহাদের সখীরা ওড়না উড়াইয়া সামনে দিয়া চলিয়া যায় * * ঐ অন্ধকার গুপ্ত কক্ষে কি যেন একটা গুপ্ত মন্ত্রণা চলিয়াছে, তার ফিস্‌ফাস্ ফুস্‌ফাস্ শব্দ ভূতের নিশ্বাসের মতো গায়ে আসিয়া লাগিল * * * যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে * * হঠাৎ একটা বিকট-আকৃতি লোক একখানা ধারালো চক্‌চকে ছোরা-হাতে সামনে দিয়া চলিয়া গেল * * একটা ক্ষুদ্র ঘরের জানলার ধারে এক পরম রূপসী হতাশ মনে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া আছে * * হঠাৎ সে চ্যুতপুষ্পের মতো ঢলিয়া পড়িল, তার সর্ব্বাঙ্গের সোনালী আভা একেবারে নীল হইয়া গেল * * নর্ত্তকীদের পায়ের ঘুঙুরের ঝুম্‌ঝুম্ আওয়াজের সঙ্গে, মদের পেয়ালার ঠুন্‌ঠান্, সারেঙের ছড়ির মিঠা টানের একটা জটল্লা কানে আসিয়া লাগিল * * আতর-গোলাপের গন্ধের সঙ্গে মদের গন্ধের একটা হল্‌কা নাকের সামনে দিয়া চকিতের মধ্যে বহিয়া গেল * * হাসির একটা তুফান * * আবার একটা মর্ম্মভেদী করুণ দীর্ঘশ্বাসের ঝড় * * ঐ না কার নেশায় বিহ্বল জড়িত কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন * * ও কি, ও কার অফুরন্ত করুণ আর্ত্তনাদ * *

হঠাৎ সব নিস্তব্ধ। সারেঙের তার খুব উঁচু পর্দ্দায় উঠিয়া যেন ছিঁড়িয়া গেল। অমনি গান বন্ধ, ঘুঙুরের আওয়াজ স্তব্ধ * * গুপ্তকক্ষের কপাট সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল * * বেগম-মহলের জানলায় জানলায়

শত শত জ্বল্‌জ্বলে আঁখি ক্ষণেকের জন্য একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহল-দৃষ্টি হানিয়া একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িল * * ঘরে ঘরে জানলা-কপাট বন্ধ। বাদশাহ, বেগম, তাঁহাদের পুত্রকন্যা, কিঙ্কর-কিঙ্করী কে যে কোথায় গেল আর সন্ধান মিলিল না * * একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণি-ধোঁয়ায় সমস্ত ছাইয়া গেল। তখন চারিদিক কেবল কালো কষ্টি পাথরের মতন অন্ধকার। সেই অন্ধকার-পাথরের ধাক্কায় ধাক্কায় ময়ূরসিংহাসন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। গগনস্পর্শী প্রাসাদশিখর মাটির উপর ভাঙিয়া পড়িল, সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীরে বড়-বড় ফাট ধরিল, হীরেজহরৎ মণিমাণিক্য এবং সমস্ত আসবাবপত্র যেন একটা প্রকাণ্ড হামান-দিস্তায় পড়িয়া গুঁড়া হইতে লাগিল —তারই ধূলায় চারিদিকের অন্ধকার আরো ঘনাইয়া আসিল। * * * *

আমি চোখে অন্ধকার দেখিয়া প্রায় মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম। হঠাৎ শ্রীশের কণ্ঠ শুনিলাম। সে বলিয়া উঠিল—"তুমি অমন করে শূন্য-দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখছ?"

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলাম—"চল, চল, এখান থেকে পালাই!"

সে বলিল—"কেন!"

আমি বলিলাম—"ভূতের এই উৎপাতে মানুষ এখানে টিকতে পারে!"

শ্রীশ বলিল—"এই দিন-দুপুরে তুমি ভূত দেখলে কোথায়!"

আমি বলিলাম—"কোথায় নয়!—চারিদিকে কেবল মামদো ভূত গিস্‌গিস্ করছে। এখানকার মাটি থেকে দেয়াল কড়িকাঠ পর্য্যন্ত সব ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে! এ কি আর সেই আসল জিনিস আছে?"

শ্রীশ হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"হাসচ বটে, কিন্তু জাননা, এ সব বাদশাহী ভূত! এদের খেয়ালের কথা বলা যায় না।—আমাদের নিয়ে এমন রসিকতা করতে পারে যে—"

শ্রীশ আমার কথায় কান না দিয়া একজন গাইডের সঙ্গে কি-একটা তর্ক জুড়িয়া দিল। আমি উস্‌খুস্ করিতেছি দেখিয়া সে আমার পানে চাহিয়া বলিল —"খবরদার, এ দুর্গ থেকে একলা বেরোবার চেষ্টা কোরো না—এমন গোলকধাঁধার মধ্যে গিয়ে পড়বে যে আর পথ খুঁজে পাবে না।"

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত চন্‌চন্ করিয়া মাথায় উঠিল। আমার হাত-পা একেবারে অবশ হইয়া আসিল। * * আমি প্রাণপণশক্তিতে দৌড় দিলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ দেখি একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিক অন্ধকার। সাম্‌নের দিকে চলিলে পথ পাই, কিন্তু ফিরিতে গেলেই দেখি পিছনের পথ কালো পাথরের দেয়ালে বন্ধ। সর্ব্বনাশ! কি করি, সামনে চলিতে লাগিলাম—কিন্তু পথ ফুরায় না, চলিতে-চলিতে পা অসাড় হইয়া গেল, বসিয়া পড়িলাম, যেমন বসা অমনি সাম্‌নে একটা পাথরের দেয়াল পড়িল। হাত বাড়াইয়া দেখি সামনে দেয়াল, পিছনে দেয়াল, পাশে দেয়াল, মাথার উপর দেয়াল;—দেয়ালগুলো ক্রমেই কাছ-ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল;—ঘাড় উঁচু করিলে মাথায় ঠেকে, পাশ ফিরিলে গায়ে ঠেকে। এ কি আমার জীবন্ত সমাধি হইল নাকি! * * * * *

বাড়ি ফিরিয়া বৈকালিক জলযোগের পর শ্রীশ বলিল—"চল তাজ দেখিতে যাই!"

আমি বলিলাম—"না!"

শ্রীশ অবাক হইয়া বলিল—"সে কি!"

আমি জোর করিয়া বলিলাম—"না, আমি যাবো না!"

সে বলিল—"তবে চল ইৎমৎদৌল্লা!"

আমি বলিলাম—"না!"

—"সেকেন্দ্রা?"

—"না!"

—"তবে চল যমুনার ধারে ঠাণ্ডা বাতাসে তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসি!"

আমি এ-কথার কোনো উত্তরই দিলাম না।

অগত্যা শ্রীশ একলা বাহির হইয়া গেল। আগ্রা দেখা শেষ করিয়া আসিয়া বলিল—"এবার কোথায় যাবে?"

আমি বলিলাম—"বাড়ি!"

সে বলিল—"দুর পাগল! বাড়ি যাবে কি! চল দিল্লী যাই।"

—"সেখানে কি আছে?"

—"দিল্লী দুর্গ!"

আমি বলিলাম—"তবে আমি নাই!"

—"আচ্ছা বেশ, দুর্গ না দেখ, জুম্মা আছে, কুতুব-মিনার আছে হুমায়ুন-কবর আছে।"

আমি কবরের নামেই বলিয়া উঠিলাম —"না না, সে-সব হবেনা।"

এমনিতর তর্ক করিতে করিতে ট্রেনের সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীশ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"তবে কোথায় যেতে চাও ঠিক করে বল!"

আমি বলিলাম—"দেশ-দেখার সখ আমার মিটেছে; এখন ঘরের ছেলে ঘরে চল।"

শ্রীশ খানিকক্ষণ গোঁ হইয়া রহিল। চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল —"তবে চল জয়পুর যাই।"

—"সেখানে কি আছে?"

—"শুনেছি সহরটি দেখতে খুব ভালো।"

—"প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ সে সহর মরে ভূত হয়ে নেই ত?"

—"না হে না।"

—"নবাবদের হানা বাড়ি?"

"আরে না না, সে সব নেই। তোমার পক্ষে খুব safe place।"

আমি বলিলাম—"ঠিক বলছ?"

শ্রীশ আমার গায়ে হাত দিয়া শপথ করিল।

ট্রেন ছাড়িবার অল্পমাত্র বাকি, আর হাঁ-না করিবার বেশি সময় নাই, শ্রীশের কথার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আমি রাজি হইয়া গেলাম।

গাড়ি ছাড়িলে আমার হঠাৎ মনে পড়িল অম্বরের কথা। আমি বলিলাম —"শ্রীশ, রাস্কেল, মিথ্যেবাদী! জয়পুর তোমার safe place?"

শ্রীশ অবাক হইয়া বলিল—"কেন?"

—"কেন? অম্বরের প্রাসাদ!—সেটা কি? সেটা ত একটা আস্ত ভূতুড়ে বাড়ি!"

শ্রীশ বলিল—"তোমার ভয় নেই, সেখানে তোমায় নিয়ে যাবোনা—জয়পুর সহর থেকে সে অনেক দূর!"

জয়পুর ষ্টেসনে যখন ট্রেণ আসিয়া থামিল তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। কুলির মাথায় মোট চাপাইয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইতেছি কুলি বলিল—"কোথায় যাবেন বাবু?"

আমরা বলিলাম—"সহরে!"

সে বলিল—"সহরের ফটক বন্ধ, ঢোকবার যো নাই!"

শ্রীশ ও আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। শ্রীশ বলিল—"তবে চল ওয়েটিং রুম!"

ওয়েটিং রুমে জিনিষপত্র নামাইয়া সবে-মাত্র বসিয়াছি, ষ্টেসন মাষ্টার আসিয়া বলিল—"এখানে আপনাদের থাকতে দিতে পারি না। রাত্রে আর ট্রেণ নেই—এখনি ষ্টেসন বন্ধ করে আমরা সব চলে যাবো!"

শ্রীশ বলিল—"তা যান না। আমাদের বিরক্ত করেন কেন?"

ষ্টেসন মাষ্টার বলিল—"আপনাদের এখানে থাকতে দেব না।"

শ্রীশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"সে কি রকম কথা! আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, জানেন!"

ষ্টেসন মাষ্টার বলিল—"তা জানি। কিন্তু আপনাদের safetyর জন্যে আমি responsible হ'তে পারব না।"

শ্রীশ বলিল—"আমরা কি booked luggage যে আমরা আপনার safe custodyতে থাকবার দাবী করছি!"

সে বলিল—"ও! ব্যাপারটা আপনারা জানেন না দেখচি। সপ্তাহখানেক হল এই ওয়েটিং রুমে একটা খুন হয়ে গেছে। একটি passenger এসে রাত্রে এইখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই রাত্রেই তিনি খুন হন, তাঁর identification হয়নি—কারণ তাঁর মাথা পাওয়া যায়নি।"

শ্রীশ বলিল—"আশা করি, তাঁর মাথা আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে বলে আপনি সন্দেহ করছেন না।"

ষ্টেশন মাষ্টার একটু হাসিয়া বলিল—"সে সন্দেহ করছিনা বটে কিন্তু আপনাদের নিজের মাথা যথাস্থানে থাকে কিনা এই সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠছে।"

শ্রীশ বলিল—"তাহ'লে কি আপনার এই প্রস্তাব যে আমাদের মাথা-দুটো আপনার Iron safeএ আপাতত গচ্ছিত রাখা হোক।"

মাষ্টার বলিল—"ঠাট্টা রাখুন মশায়, ব্যাপার বড় serious।"

শ্রীশ বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যান, আমাদের মাথার জন্যে আপনার মাথাব্যাথার কোনো দরকার নেই।"

—"তা হ'ল মশায় আমার ঘাড়ে কোনো দায় রইল না!"

শ্রীশ নিজের মাথায় হাত দিয়া বলিল—"আমাদের মাথার দায় আমাদের ঘাড়েই আছে, আপনার ঘাড়ে নিশ্চয় নেই—এ ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন।"

—"যা ভালো বোঝেন করুন। মোট কথা রাত্রে খুব সাবধানে থাকবেন।"

শ্রীশ মাথা নত করিয়া বলিল—"ধন্যবাদ।"

শ্রীশ ও ষ্টেশন মাষ্টারের কথোপকথনে "মাথা" কথাটা বার বার আমার কানে আসিয়া লাগিয়া আমার মাথার ভিতর কেমন যেন একটা জটলা পাকাইয়া তুলিল। যে কথাই ভাবিতে যাই তার মধ্যে যেমন করিয়াই হোক 'মাথা' কথাটা ঢুকিয়া পড়ে।

শ্রীশ বলিল—"রাত্রি অনেক হয়েছে, নাও কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়।"

আমি ভয়ানক শীতকাতুরে। গায়ে আমার প্রকাণ্ড একটা ওভার-কোট ছিল, তবু আমার ভিতরের হাড়শুদ্ধ কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম—"জামা কাপড় আমি ছাড়ছিনা, এই সবশুদ্ধ শুয়ে পড়ব।"

শ্রীশ ওভারকোটটা খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিল—"বাবা! ঐ গাধার বোঝা পিঠে নিয়ে তুমি ঘুমবে কেমন করে?"

তারপর শ্রীশ আর দ্বিরুক্তি করিল না। যেমন বিছানায় পড়া অমনি ঘুম। আমি দুবার শ্রীশ শ্রীশ করিয়া ডাক দিলাম, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আমি তখন গায়ের কম্বলটা মাথা অবধি মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সমস্ত শরীরটা গরম হইয়া উঠিয়া বেশ-একটু আরাম করিতে লাগিল। চোখে তন্দ্রার আবেশ আসিয়া জড়াইয়া ধরিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি জানিনা, হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙিবার কারণটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইল কে যেন আসিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিয়াছে। কম্বলটা দেখি মাথা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। দূরে একটা কোণে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জলিতেছিল বটে কিন্তু তার চিমনির উপরকার ধোঁয়া ও ধূলা ছাঁকিয়া যে আলো বাহির হইতেছিল তাহা অত্যন্ত ঘোলাটে। চারিদিক হইতে ঘোর অন্ধকার ঘরের মধ্যে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো সেই জমাট অন্ধকারের গায়ে সামান্য একটু আভা ফেলিতেছিল মাত্র, তার গভীরতা ভেদ করিতে পারিতে ছিলনা,—তার কঠিন গায়ে লাগিয়া আলোর তীরগুলো প্রতিহত হইয়া যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়িতেছিল।

শ্রীশকে ঠিক দেখিতে পাইতেছিলাম না,—কোথায় সে শুইয়া আছে তারই একটা আন্দাজ পাইতেছিলাম মাত্র। আমাদের জিনিসপত্রগুলো কালো-কালো ছোটো-ছোটো ঢিবির মতন চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল। কোথায় এক-জায়গায় আমাদের একটা পুঁটুলী হইতে একটু সাদা কাপড়ের অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হইল যেন ঐ অন্ধকারটা তার সাদা দাঁতের পাটি বাহির করিয়া ভ্রূকুটি করিতেছে। আমার মাথাটা বোঁ করিয়া উঠিল। চোখে অন্ধকার দেখিলাম। তাড়াতাড়ি কম্বলটা মাথা অবধি টানিয়া চোখ বুজিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিলাম। ভয়ঙ্কর গরম বোধ হইতে লাগিল। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। মাথা অবধি কম্বলমুড়ি অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি সেটা টানিয়া ফেলিয়া দিলাম। দেখি চারিদিকে অন্ধকারের খেলা জমিয়া উঠিয়াছে। কোনোখানটা ঘোর জমাট, কোনোখানটা

পাতলা। কোথাও পাথরের মতন কঠিন ভারি, কোথাও মেঘপুঞ্জের মতো হাল্‌কা ফুরফুরে। কোনোজায়গা কালির মত মিশ-কালো, কোনো জায়গা ছাইয়ের মত ফিকে—পাণ্ডাস। চারিদিকে কেবল কালো রঙের নানা স্তর—নানা বৈচিত্র্য। ঘরের মধ্যে যে-সব জিনিস ছড়ানো আছে, সেগুলোকে আর জিনিস বলিয়া মনে হয় না, সেগুলো যেন অন্ধকারের সব কাচ্ছা-বাচ্ছা। উপরে কড়ি-কাঠের দিকে চাহিয়া দেখি যে কয়েকটা অন্ধকার-জীব বিছানা পাতিয়া ছেলেপুলে লইয়া শুইয়া আছে। দেয়ালের দিকে দেখি তার গায়ে বড়-ছোটো নানা-রকমের সব নির্জীব পোকামাকড় লাগিয়া আছে। এ যেন অন্ধকারের রাজত্ব—এখানে যেন রক্তমাংসের কোনো সম্পর্ক নাই। * * *

হঠাৎ দেখি চেয়ারের উপর একটা লোক অলসভাবে বসিয়া আছে—তার হাত-দুটো চেয়ারের দুপাশে ন্যাতার মতো ঝুলিতেছে। একবার মনে হইল বুঝি শ্রীশ চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি ডাকিলাম—শ্রীশ! কোনো উত্তর পাইলাম না। কেমন সন্দেহ হইল। খুব ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখি—এ কি লোকটার মাথা নাই যে! কাঁধ অবধি শরীরটা গিয়া—ব্যস, সেইখানেই একেবারে শেষ হইয়া গেছে। আমার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—আমি তাড়াতাড়ি কম্বলটা মাথা অবধি টানিয়া চোখ বুজিয়া রহিলাম। * * *

মনে হইল লোকটা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—যেন আমার দিকে আসিতেছে। আমার সমস্ত শরীর গুটাইয়া একেবারে কুণ্ডলী পাকাইয়া গেল। আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া কে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। সে নিশ্বাসের বাতাস কী ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা! কম্বল ফুঁড়িয়া আমার ভিতরের হাড় ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপাইতে লাগিল। লোকটা সাপের নিশ্বাসের মতো হিস্ হিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার মাথা কৈ? —আমার মাথা!" * * *

মনে হইল যেন একখানা হাত আমার মাথাটাকে পরীক্ষা করিতেছে—এদিক-ওদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। গলা হইতে কোনো স্বর বাহির হইল না। এমন অসাড় হইয়া গেলাম যে বোধ হইল যেন আমার বুকের কাঁপুনি পর্য্যন্ত থামিয়া গেছে। তখন আড়ষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিলাম দুখানা হাত কেবল চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে আর একটা অস্ফুট শব্দ উঠিতেছে—মাথা কৈ? মাথা কৈ? * * *

ঢং ঢং শব্দে সমস্ত দিক কাঁপাইয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কম্বল ফুঁড়িয়া একটা আলোর রেখা আমার চোখের পাতায় আসিয়া লাগিল। ওয়েটিং রুমের বাহিরে একটা কলরব উঠিয়াছে। শ্রীশ আমার নাম ধরিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে—"ওঠ, ওঠ, বেলা হল।"

আমি কম্বল হইতে এতটুকু মুখ বাহির করিয়া চাহিলাম। ঘরের দরজা জানলা তখনো বন্ধ, ভোরের অল্পমাত্র আলো দেখা দিয়াছে। সেই আলো-আঁধারের মধ্যে দেখিলাম শ্রীশ চেয়ারখানার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। তার দিকে চাহিতেই মনে হইল রাত্রের সেই কঙ্ককাটা লোকটা যেন শ্রীশের গায়ের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল। আমি চোখ বুজিয়া ফেলিলাম। তার পর দেখি শ্রীশ ওভারকোট আঁটিয়া আমার ঘুম ভাঙাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে। * * *

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বাদশাহ আকবরের নিরক্ষরতা

কিছুদিন হইতে, বাদশাহ আকবর নিরক্ষর ছিলেন কিনা—এই সম্বন্ধে বঙ্গীয় লেখকগণের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এ-বিষয়ে একরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আবহমান কাল হইতে আমাদের দেশেও প্রচলিত কথা এই যে আকবর নিরক্ষর ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ফার্সিভাষাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা-মহাশয় তাঁহার পুস্তকে চিরাচরিত এই অপবাদ দূরীকরণের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু, এই বিষয়ে গভীর গবেষণা-প্রসূত অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিলেও আমাদের ঠিক মনে হয় না যে, তিনি এই বিষয়টী প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি এই বিষয়ে কিছু কিছু বিরুদ্ধ প্রমাণ শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সংগ্রহ করিয়া কুমার নরেন্দ্রনাথের প্রমাণাবলী ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু, আমার মনে হয়, বিচারযোগ্য এই ঘটনা-সম্বন্ধে তাঁহারা উভয়ে বহু ফার্সী ও আরবী-গ্রন্থের প্রমাণ প্রয়োগ করিলেও গৃহসন্নিকটস্থ বিবেচনাযোগ্য ও একহিসাবে অভ্রান্ত একটী প্রমাণের সাহায্যগ্রহণ করেন নাই। আমরা কুমার নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেই প্রমাণটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

বাঁকিপুর খুদাবক্স লাইব্রেরীর ফার্সি ও আরবী পাণ্ডুলিপি সমূহের কথা বঙ্গীয় পাঠকগণ অনবগত নহেন। এই পাঠাগারের দুইখানি পুস্তকের কথা এই প্রসঙ্গে সমধিক উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিওয়ান-ই-হাফিজ্—এখানি সিরাজ শহরের সুবিখ্যাত কবি হাফিজের ভাবপ্রধান গীতিকবিতা সমষ্টির পুঁথি। এই পুঁথি-(বা হস্তলিখিত পুস্তক) খানি পাঠাগারের একটী অমূল্য রত্ন। হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর বাদশাহদ্বয়ের সাক্ষর, অর্থবোধাত্মক চিহ্ন ও কথা প্রভৃতিদ্বারা অনেক পৃষ্ঠা সুশোভিত। এই পুস্তকখানি যে হুমায়ুন ও তাঁহার পরবর্ত্তী বাদশাহগণের "সঙ্গের সঙ্গী" ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের হাতের লেখা থাকিলেও, আকবরের সাক্ষর বা হস্তলিপি দৃষ্ট হয় না। পুঁথিখানি-সম্বন্ধে একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক।

মুসলমানগণ কুরাণ ও হাফিজের কবিতা-দৃষ্টে অনেকসময় অদৃষ্টের ফলাফল বিচার করিতেন। রোমক ও আরবজাতির



বাদশাহ আকবর

মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল! যদিও অদৃষ্টের ফলাফল বিচার অনেক মুসলমান দূষণীয় মনে করেন, তথাপি এরূপ বিচারে ব্রতী লোকের সংখ্যাও কম ছিলনা। বিভিন্ন প্রকারে এই ফলাফল নির্দ্ধারিত হইত। পুস্তকখানি খুলিয়া প্রথমে যে কবিতার প্রতি চোখ পড়িত তাহার মর্ম্ম হইতেই আরব্ধ বা অভীষ্ট কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে কি বিফল-মনোরথ হইতে হইবে তাহা প্রণিধান করা হইত। হাফিজের এই পুঁথিখানি এইজন্য বাদশাহ হুমায়ুন ব্যবহার করিতেন এবং আবশ্যকমত পার্শ্বে (মার্জ্জিনে) মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেন। জাহাঙ্গীরেরও বহুমন্তব্য এই পুঁথিখানির অনেকস্থানে দৃষ্ট হয়। বাদশাহ আকবরের রাজত্বের শেষভাগে মানসিংহ যখন চক্রান্ত করিয়া সেলিমের সিংহাসনাধিরোহণের অন্তরায় হইতেছিলেন, তখন সেলিম এই পুঁথিখানি খুলিয়া নিজ অদৃষ্টের ফলাফল বিচার করিয়াছিলেন। শাহজাহান পুত্র দারাশুকোও এই পুঁথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং হুমায়ুন হইতে দারাশুকো পর্য্যন্ত সকলেই এই পুস্তকখানি যে ("Heir-loom") কুলক্রমাগত পুস্তকরূপে ব্যবহার করিতেন তাহা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পুঁথিতেও আকবরের কোন সাক্ষর বা লিপি নাই।

দ্বিতীয় আর একখানি পুঁথির অলোচনা করা যাউক। ইহা "দিওয়ান-ই-মির্জা কামরান"। এই বহুমূল্যবান ও অদ্বিতীয় পুঁথিখানির স্বত্বাধিকারী ছিলেন হুমায়ুন-ভ্রাতা কামরান। ইহাতে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সাক্ষর এবং আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের দরবারস্থ অনেক ওমরাহ ও কর্ম্মচারীদের সাক্ষর ও মোহর রহিয়াছে। কামরানের জীবদ্দশায়ই এই পুঁথিখানি যে লিখিত হইয়াছিল গ্রন্থমধ্যে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক পৃষ্ঠায় রহিয়াছে (ইহার প্রতিলিপি



জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের হস্তাক্ষর

আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম), "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। এই দিওয়ান আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের খুল্লতাত মির্জা কামরানের। ইহা আমার হস্তাক্ষর। নুরুদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর শাহ আকবর। রাজত্বের বিংশ বৎসর, হিজিরা ১০৩৪।"

ইহা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের হস্তাক্ষর।

ঐ পৃষ্ঠায়ই বাদশাহ শাহজাহান-লিখিত নিম্নোক্ত মন্তব্য ও সাক্ষর দৃষ্ট হয়—

"ভগবানকে ধন্যবাদ যিনি এই দাসের নিকট এই পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। আকবর বাদশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীর বাদশাহের পুত্র শাহজাহান।"

এস্থলে উল্লিখিত হইতে পারে যে ১০২৫ হিজিরায় (১৬১৬ খৃষ্টাব্দে) জাহাঙ্গীর প্রিয় পুত্র সুলতান খুর্‌রমকে শাহ খুর্‌রম উপাধিতে ভূষিত করিয়া, দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রেরণ করেন। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পরে রাজকুমার খুর্‌রম বুহানপুর হইতে মাণ্ডুতে অবস্থিত বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে সম্মান প্রদর্শনার্থ আগমন করেন (হিজিরা ১০২৬=খৃষ্টাব্দ ১৬১৭) এবং দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ রাজকুমারকে শাহজাহান উপাধিভূষিত করেন। খুর্‌রমই যে তখন বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা দিওয়ান্-ই-হাফিজের পূর্ব্বোল্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে জাহাঙ্গীর যে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয়:—

"বৃহস্পতিবার, আমার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে মান্দুদুর্গে সাক্ষাৎ হয়। পঞ্চদশ

মাস ও একাদশ দিবসের অধিককাল আমরা পৃথক ছিলাম। নমস্কার ও চুম্বন আচার প্রতিপালিত হইলে আমি পুত্রকে অলিন্দের উপরে আহ্বান করিলাম এবং অত্যধিক স্নেহ ও আগ্রহাতিশয্যে আমি তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিলাম। তাঁহার যতই সম্মান ও দৈন্যের জ্যোতি বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমারও অনুগ্রহ ও স্নেহ তদ্রূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং আমার সন্নিকটে উপবেশনার্থ তাঁহাকে আদেশ করিলাম।”

অপর যে চিত্রখানি আমরা হাফিজ হইতে প্রদান করিলাম তাহাতে বাদশাহ হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের স্বহস্ত-লিখিত মন্তব্য ও সাক্ষর আছে। আমরা বাদশাহদ্বয়ের চিত্রোল্লিখিত লিপির মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি। প্রথমাংশ হুমায়ুন-বাদশাহের—“হাফিজের দিওয়ান অনুসন্ধান

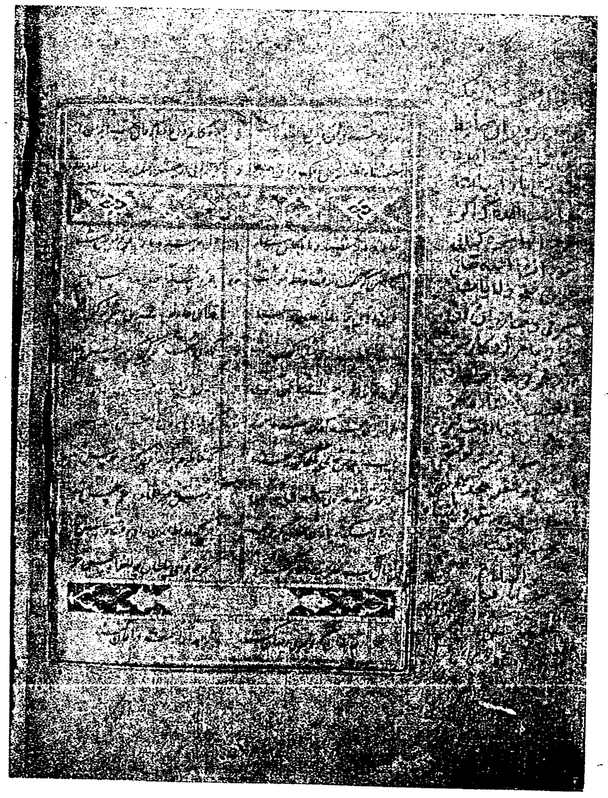

হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের হস্তলিপি

করিয়া আমি এতগুলি শুভদায়ক চিহ্ন পাইলাম যে এগুলি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিতে হইলে একখানি পুস্তক হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় পূর্ব্বাঞ্চল ও ঐ প্রদেশস্থ সৈন্যসকল বশীভূত হইলে উপহার প্রদান করা যাইবে এবং এইসকল চিহ্ন ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও আদেশে একত্রীভূত করা হইবে। ৯৬২ হিজিরা।” দ্বিতীয়াংশ জাহাঙ্গীরের লেখা—উহার মর্ম্ম এইরূপ:—“আমি রাণার সহিত যুদ্ধার্থ আজমীর গিয়াছিলাম। মৃগয়া-কালে হীরকের কবচ আমার মস্তক হইতে পতিত হয়। আমি দিওয়ান অনুসন্ধান করি এবং তৎপর দিবস কবচটী প্রাপ্ত হই—আকবর-বাদশাহের পুত্র নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর-কর্ত্তৃক ১০২৪ হিজিরায় লিখিত।”

এই চিত্রখানি কিছু অস্পষ্ট এবং জাহাঙ্গীরের লিপি অধিকতর অস্পষ্ট।

হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান—এই তিনজন বাদশাহের হস্তলিপি পাওয়া যাইতেছে। যে দুইখানি পুস্তকের কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, সে দুইখানিই যে আকবরের সময়েও ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহার কোনটীতেই আকবরের লেখা পাওয়া যাইতেছে না। খুদাবক্স লাইব্রেরীর অন্য কোন পুঁথিতেও এ-পর্য্যন্ত আকবরের লেখা বা সাক্ষর পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য প্রমাণের সহিত ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, আকবর নিরক্ষর ছিলেন। ভারত-ইতিহাসে অবশ্য এরূপ নিরক্ষরতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

অন্ধকার

ক

জমিদার ভুবন-চৌধুরীর পুত্র নগেন সেদিন একটু বেশী রাতে বাড়ী ফিরিল! তাহার মাথার চুল উস্কখুস্ক, জামার বোতাম-গুলো খোলা, পা-দুটো টলমল, কাপড়-চোপড় এলমেল—পিছনের কাছা বেপরোয়ারূপে অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাম্‌নের কোঁচাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে!

বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জাগিয়া আছে সুধু নূতন ব্রাহ্মণী। গিন্নিমার হুকুম, নগেনকে না-খাওয়াইয়া সে যেন ঘুমাইয়া না-পড়ে। তাহার নাম রাইমণি, বয়সটি কাঁচা।

নগেন এখানে-ওখানে ঠোক্কর খাইতে-খাইতে দালানে আসিয়া, দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল; কোনমতে এড়াইয়া-এড়াইয়া বলিল, “খাবার কোথা?”

খাবারের থালা হাতে-করিয়া রাইমণি আস্তে-আস্তে দালানের ভিতরে ঢুকিল। তাহার মুখে ঘোমটা, ভাব-ভঙ্গী সঙ্কুচিত।

রাইমণি আসা-পর্য্যন্ত নগেনের পিপাসী চোখ শিকারীর দৃষ্টির মত তাহার পিছনে-

পিছনে ঘুরিতেছে। কিন্তু রাইমণি এমনি সাবধানী যে, নগেন কিছুতেই তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই! তবে, তাহার সুডৌল গড়ন ও নিটোল হাত-দুখানি দেখিয়াই সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল, যে, এত সুশ্রী যার দেহ, তার মুখ কখনই বিশ্রী নহে!

নগেন দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিল, রাইমণি জলছড়া দিয়া খাবারের থালাখানি মেঝের উপরে রাখিল; তারপর আসনখানি বিছাইয়া ও জলের গেলাসটি আগাইয়া দিয়া এককোণে সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন নিঝুম রাতে রাইমণিকে এতটা কাছে নগেন আর-কখনো পায় নাই! তাহার মনে এর আগে একটু-যে ইতস্তত ছিল, আজ নেশার রঙ্গে সেটুকুও ঢাকিয়া গিয়াছে।

রাইমণির দিকে বাঁকা-চোখে একবার চাহিয়া, নগেন আসনের উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল; অত্যন্ত উত্তেজনায় তাহার নাকের ডগাটা তখন ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে!

খানদুয়েক লুচি খাইয়া নগেন বলিল, "একটু নুন দিয়ে যাও ত!"

রাইমণি কুণ্ঠিতভাবে নগেনের সামনে আসিয়া, হেঁট হইয়া থালায় নুন দিতে গেল।

নগেন দেখিল, পাতলা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর হইতে রাইমণির ডাগর চোখদুটির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে! এবং সেইসঙ্গে মাথা-ঘষা মশলার একটা মিশ্র ও মিষ্ট গন্ধ আসিয়া নগেনের মাতাল প্রাণকে পাগল করিয়া তুলিল,—সে আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—হঠাৎ সুমুখদিকে ঝুঁকিয়া এক টান্ মারিয়া রাইমণির মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিল!

"ওগো মাগো!"—বলিয়া রাইমণি বিদ্যুতাহতের মত ঘরের মেঝেতে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।

নগেন বলিল, "চুপ, চুপ—চেঁচিও না, সবাই শুন্‌তে পাবে!"

ঠিক পাশের ঘরেই থাকিতেন, গৃহিণী; সেদিন অসময়ে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। রাইমণির আর্ত্তস্বর তাঁহার কাণে ভেজিল। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন।

দেখিলেন, রাইমণি দু-হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপরে পড়িয়া আছে আর নগেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া থালার সামনে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে।

তাঁহার এই গুণধর পুত্রটির স্বভাব-চরিত্রের কথা তিনি বেশ ভালোরকমেই জানিতেন, সুতরাং ব্যাপারটা বুঝিতে গৃহিণীর বিলম্ব হইল না। অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে তিনি ডাকিলেন, "নগা!"

নগেন একেবারে কেঁচো! একটিও কথা না বলিয়া সেখান হইতে সে সুড়সুড় করিয়া উঠিয়া গেল।

গৃহিণী, রাইমণির গায়ে হাত দিয়া আস্তে-আস্তে ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "ওঠ মা, ওঠ! নগার যে এতটা সাহস হবে, আমি তা জানতুম না। জানলে, তার সামনে কি তোমাকে একলা বেরুতে দিতুম?"

খ

সপ্তাহ-খানেক পরে একদিন দুপুরবেলায় রাইমণি, গিন্নীর মাথার পাকচুল তুলিয়া দিতেছিল। এই ব্রাহ্মণ-কন্যাটিকে পাইয়া

গিন্নী যেন বর্ত্তিয়া গিয়াছেন; রাইমণি তাঁহাকে মায়ের মত ভক্তি করে, মেয়ের মত যত্ন করে; রান্নাবান্না ও গেরস্থালীর কাজে সে এতটা নিপুণা, যে তাহার হাতে সংসারের সব ভার সঁপিয়া গিন্নী যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন।

গিন্নী বলিলেন, "বামুন-মেয়ে, কাল মা তোমাকে একটু সকাল-সকাল উঠতে হবে।"

রাইমণি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

—"কাল আমাদের গুরুঠাকুর আসবেন। তাঁর জন্যে আলাদা হেঁসেল কেঁড়ে রান্নাবান্না সেরে, তবে আমাদের হাঁড়ি চড়্‌বে। সকাল সকাল উনুনে আগুণ না-দিলে ওদিকে অনেক বেলা হয়ে যাবে কি না!"

রাইমণি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

খানিক পরে গিন্নী আবার বলিলেন, "হ্যাঁ মা, রোজই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব করব ভাবি, তা পোড়া মন এমনি বেভুল যে, রোজই কেমন ভুলে যাই।"

রাইমণি বলিল, "কি কথা মা?"

—"শুনেছি, তোমার স্বামী আছেন। কিন্তু এতদিন এখানে রইলে, কৈ, একখানা চিঠি লিখেও তিনি ত তোমার খোঁজ-খবর নিলেন না!"

চুল বাছিতে-বাছিতে রাইমণি হঠাৎ থামিয়া পড়িল—তাহার সরল হাসি-হাসি মুখখানি চকিতে যেন একটা কালো ছায়ায় অন্ধকার হইয়া গেল।

গিন্নী তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না; তাই সহজভাবেই আবার বলিলেন, "চুপ করে রৈলে কেন? বল না!"

রাইমণি জোর-করিয়া কথা কহিল; বলিল, "জানি না!"

—"এখানকার ঠিকানা তোমার স্বামী জানেন ত?"

—"না। আমি যে এখানে আছি, তাও তিনি জানেন না।"

গিন্নী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি! তোমার স্বামী জানেন না?"

রাইমণি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; কোন কথা না বলিয়া চুপ-করিয়া সে বসিয়া রহিল।

গিন্নী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বামুন-মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে কি ঝগড়া করে' তুমি এখানে এসেছ?"

রাইমণি কুণ্ঠিতস্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না।"

—"তবে?"

—"তিনি আমাকে নিতে চান না!"

গিন্নী যেন আকাশ থেকে পড়িলেন। বলিলেন, "অ্যাঁ! তোমাকে নিতে চায় না! তোমার এত রূপ, এত গুণ,—তোমাকে নিতে চায় না, কেমন লোক সে?"

রাইমণি পুতুলের মত বোবা ও স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী যদি পিছন ফিরিয়া না থাকিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, রাইমণির বড়বড় চোখ ধীরে-ধীরে জলে ভরিয়া উঠিতেছে!

গিন্নী আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে ছিলেন, হঠাৎ কর্ত্তা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন; তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া, সেখান হইতে পলাইয়া, রাইমণি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল!

গ

রাইমণি কিন্তু বুঝিল, এমন লুকোচুরি আর বেশীদিন চলিবে না, তাহার সব কথা একদিন-না-একদিন বাহির হইয়া পড়িবেই!

তার স্বামী? হ্যাঁ, তিনি আছেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে থাকিয়াও তিনি আজ বহুদূরে, বহুদূরে! এ ব্যবধান তাহার নিজের পাপে ঘটে নাই—নিষ্ঠুর নিয়তি আজ তাহার জীবন-দেবতাকে জোর-করিয়া ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে,—তাহার কাকুতি, তাহার অশ্রু, তাহার বেদনা-ব্যাকুলতা এ চিরবিচ্ছেদকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই! আজ তাহার এ দেহ যেন জীবনহীন যন্ত্রচালিত শবের মত; এ শব কবে কোন্ বাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে বৈতরণীর খরস্রোতে পড়িয়া পরপারে গিয়া ঠেকিবে—ভগবান জানেন—মনে মনে সে এখন সুধু সেই কামনাই করিতেছে! সে জানে, এমন মরিয়া বাঁচিয়া কোন লাভ নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ-সীমায় গিয়াও মানুষ যে মন থেকে আশার ছবি মুছিতে পারে না! নিরাশার মরুভূমির মাঝে পথহারা হইয়াও রাইমণি আজও তাই এই মরণভরা জীবনকে কোনক্রমে কায়-ক্লেশে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

তাহার স্বামী ছিলেন স্নেহময়, প্রেমময়, সহৃদয়। সেও তাহার স্বামীকে ভালবাসিত সমস্ত জীবন-যৌবন ঢালিয়া। স্বামী বিনা আর কারুকে সে চিনিত না, জানিত না। চরিত্রে সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে সেও কিছু খাটো ছিল না; কিন্তু যে-আমাদের ধর্ম্ম সীতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে আকাশে তুলিয়াছে, সেই-আমাদেরই সমাজ তাঁহাকে আবার পাতালে পাঠাইতে যখন ইতস্তত করে নাই, তখন তুচ্ছ রাইমণির সুখের মেঘে আগুণ লাগিবে না কেন?……রাইমণির সজল নেত্রের সম্মুখে সমাজের সিংহদ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার বুকফাটা কান্নায় এখন দেবতার আসন টলিলেও, সমাজপতির হৃদয় গলিবে না!

রাইমণি কাঁদিতেছে—কাঁদুক; এমন কত রাইমণির নিস্ফল অশ্রু সমাজের পায়ে নিয়ত ঝরঝর ঝরিতেছে, কে তার খবর রাখে?

ঘ

ভুবন-চৌধুরীর বাড়ীতে আজ সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অনেকদিন পরে গুরুদেব আজ এখানে পায়ের ধূলা দিয়াছেন।

পুরু পশমের আসনে গুরুদেব তাঁহার নধর-নিটোল দেহটি লইয়া রীতিমত জাঁকিয়া বসিয়াছেন। গুরুর সে গুরুভার হৃষ্টপুষ্ট দেহখানিতে ব্রহ্মচর্য্যের কোন লক্ষণ না থাকিলেও তাঁহার বোঁটাওয়ালা বেলের মত ন্যাড়া মাথায় দিব্য আধ-হাত টিকি, তেল-চক্‌চকে কপালে ফোঁটা, খ্যাঁদা নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠীর মালা, হাতে হরিনামের ঝুলি ও পরোনে পট্টবস্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বের গুরুতর মাল-মশলার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই।

সকলের আগে বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া গুরুদেবের পা ধরিয়া মাটিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার পরে গৃহিণী, পুত্র ও অন্যঅন্য আত্মীয়-স্বজনের পালা।

তারপর, মাথায় একহাত ঘোমটা টানিয়া রাইমণি আসিয়া সলজ্জভাবে প্রণাম করিল।

গুরুদেবের চক্ষুদুটি এতক্ষণ ভাবভরে ঢুলুঢুলু করিতেছিল; পরের প্রণাম লইয়া-লইয়া তাঁহার শ্রীচরণকমল-দুটি এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিল যে, এতগুলো কৃষ্ণের জীব আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া এত যে টানাটানি করিয়া গেল, সেদিকে তাঁহার কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না; কিন্তু, ঘোমটার ভিতর হইতে রাইমণির মুখ দেখিবা-মাত্র তাঁহার ঘুমন্ত দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিল।

তাকিয়া ছাড়িয়া, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া, কর্ত্তার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ভুবন, এ মেয়েটি কে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "এ মেয়েটি আমার বাড়ীতে রাঁধে।"

—"কৈ, গ্যালবারে যখন এসেছিলুম, তখন ত মেয়েটিকে দেখি-নি!"

—"ও সবে মাসতিনেক এখানে আছে।"

—"মাস তি-নে-ক! তবে কি"—বলিতে বলিতে থামিয়া পড়িয়া, গুরুদেব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রাইমণির দিকে চাহিলেন।

রাইমণি তখন অত্যন্ত জড়োসড়ো হইয়া আস্তেআস্তে চলিয়া যাইতেছিল—গুরুদেবকে দেখিয়া সেও যেন কেমন থতমত খাইয়া গিয়াছিল।

খানিক স্তব্ধ থাকিয়া গুরুদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির নাম কি?"

—"রাইমণি!"

—"রাইমণি! ও কি তড়া-আঁটপুর গাঁ থেকে এসেছে?"

গিন্নী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকুর, আপনি জানলেন কি করে'?"

সে কথার কোন জবাব না-দিয়া, গুরু-দেব হতাশভাবে তাকিয়ার উপরে আড়্ হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভুবন, এখানে আর আমার দেবতার ভোগ হোতে পারে না—তোমার জাত্ গিয়েছে!"

গাঁয়ের সমাজপতি ভুবন-চৌধুরী,—যিনি কত লোককে একঘরে করিয়া 'পত্-পত্ রবে' হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছেন, যাঁহার ভয়ে ছেলে-ছোক্‌রার দল চোরের মত আটঘাট না বাঁধিয়া শ্রী-শ্রী রামপক্ষীর বিখ্যাত মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না, যাঁহার একটু ইঙ্গিতেই ধোপা-নাপিতের অভাবে অনেক অভাগার কাপড় হইয়াছে কয়লার মত ময়লা এবং দাড়ী-গোঁফ হইয়াছে যাত্রা-থিয়েটারের মুনি-ঋষিদের মত নাভিচুম্বনোদ্যত,—তাঁহারই এত যত্নে বাঁচানো পৈতৃক জাতিটি খাম্‌কা মারা গিয়াছে? গুরুদেব বলেন কি! 'মেঘনাদ-বধে'র রাবণ যখন ভগ্নদূতের মুখে "নিশার স্বপনসম বারতা' শুনিয়াছিলেন, তখন তিনিও বোধকরি আমাদের ভুবন-চৌধুরীর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইবার সুযোগ পান নাই! কর্ত্তা বসিয়াছিলেন, লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "প্রভু, এ কি নিদারুণ কথা! আমার জাত্ গিয়েছে? অ্যাঁ! অ্যাঁ!"

—"হ্যাঁ, তোমার জাত্ গিয়েছে! এতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

—"রাইমণি কি বামুনের মেয়ে নয়?"

—"হ্যাঁ, সে বামুনের মেয়ে।"

ভুবন-চৌধুরী ভুরু কুঁচকাইয়া খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "তবে কি ও কুলত্যাগ করেছে?"

—"না।"

তাইত! ভুবন-চৌধুরী অতিশয় ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়িয়া গেলেন! তিনি জানিলেন না শুনিলেন না—অথচ তাঁহার এত সাধের জাতিটি কোন্ ফাঁকে স্রেফ্ কর্পূরের মত উবিয়া গেল! অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষটা তিনি হাল ছাড়িয়া হতাশভাবে বলিলেন, "তবে?"

হরিনামের ঝুলির ভিতরে ঘন-ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে-করিতে গুরুদেব বলিলেন, "শোন বলি। রাইমণির স্বামী আমারই শিষ্য। ওর স্বভাব-চরিত্র খুব ভালো—কারুর দিকে উঁচুনজরে চাইতে ওকে কেউ দেখে-নি। কিন্তু গতজন্মে ও কি পাপ করেছিল জানি না, এ-জন্মে তাই বুঝি তারই শাস্তিভোগ করছে। হরি হে, তোমারি কৃপা!"

ভুবন-চৌধুরী গুরুদেবের এ গোলক-ধাঁধার ভিতরে কিছুতেই ঢুকিতে পারিলেন না; সুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে হাঁ-করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গুরুদেব আবার বলিলেন, "মাস-চারেক হোল, একদিন রাত্রে রাইমণিদের বাড়ীতে হঠাৎ ডাকাত পড়ে। ডাকাতরা যাবার সময়ে রাইমণিকেও ধরে নিয়ে যায়। গাঁয়ের লোকেরা তার চীৎকার আর কান্না শুনেও ডাকাতের ভয়ে কোন উপায়ই করতে পারলে না। পরে পুলিস এসে রাইমণিকে খুঁজে বার করলে। গ্রামের বাইরে একটা জঙ্গলের ভিতরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল।"

সকলে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল, কাহারও মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভুবন-চৌধুরীর দিকে চাহিয়া গুরুদেব আবার বলিতে লাগিলেন, "পুলিস-তদারকের পর জনকতক ডাকাত ধরা পড়ল—তাদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। কিন্তু ডাকাত ধরা পড়লে কি হবে—তাদের সংস্পর্শে রাইমণি যে অমূল্য রত্ন হারাল, সে ত আর ফিরে পাবার নয়! স্বামীর পা ধরে সে অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক কান্নাকাটি করলে; বললে সে নিষ্পাপ। ভগবান জানেন, সে কথা সত্য কি মিথ্যা! কিন্তু মানুষের মনের সন্দেহ ত চাপা দেওয়া যায় না। এর জন্যে সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ওর স্বামীও ওকে আর ঘরে ঠাঁই দিতে পারলে না।"

ভুবন-চৌধুরী বিহ্বলভাবে গুরুদেবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ও মাগী নিজের জাত-খুইয়ে কুল-মজিয়ে শেষটা কিনা আমাকে মজাতে এল! আমার কি উপায় হবে প্রভু, আমার কি উপায় হবে?"

গুরুদেব বলিলেন, "ওকে কি তুমি জানতে না?"

—"জানলে কি ওকে ঘরে ঠাঁই দিতুম—ধুলোপায়েই বিদেয় করতুম! যত নষ্টের গোড়া নাপ্তিনী-মাগী, সেইই জেনে-শুনে ওকে আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে গেছে। ছি, ছি, এ কথা প্রচার হোলে সমাজে আর মুখ দেখাব কেমন করে'?"

গুরুদেব তাঁহার গ্যাস-ভরা বেলুনের

মত ফোলা, মোটাসোটা ভুঁড়িটির উপরে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই। এ তোমার অজ্ঞানকৃত পাপ। তবে, প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আর রাইমণিকেও এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।"

৬

ঘরের মেঝেতে রাইমণি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে,—তাহার দুইগাল দিয়া ঝর ঝর অশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ কে তার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিল; চমকিয়া, মুখ তুলিয়া সে দেখিল, ঠিক তার সামনেই নগেন—সন্ধ্যার তরল আঁধারে তাহার চোখদুটো গিরগিটির চোখের মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! ভয়ে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাইমণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

নগেন চাপা-গলায় বলিল, "চেঁচিও না—চেঁচিও না! আমি যা বলতে এসেছি, শোন।"

ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া, রাইমণি থর্থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

নগেন বলিল, "দেখ, সমাজে কেউ তোমাকে ঠাঁই দেবে না—যেখানে যাবে সেখান থেকেই তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সমাজ তোমাকে না-চাইলেও আমি তোমাকে ফেলতে পারব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, আমি তোমাকে রাজরাণীর মত রাখব—তোমার কোন অভাব থাকবে না। তোমার ধর্ম্ম ত গিয়েছেই, তবে তুমিই-বা কেন ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধরে মিছে পরের লাঞ্ছনা সহ্য করবে?"

রাইমণি যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, হ্যাঁ না কিছুই বলিল না।

নগেন বুঝিল, মৌনই সম্মতির লক্ষণ। সে আস্তেআস্তে বলিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি রাইমণি! এত ভালবাসি, যে বলবার নয়। আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব। আজ শেষরাতে খিড়কীর দরজায় আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব,—তোমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে। তুমি কিছু ভেব না, তুমি যা চাইবে তাই পাবে—বাড়ী-ঘর, কাপড়-গয়না, দাসী-বাঁদী! জান ত টাকা আমার হাতের ধূলো।"

হঠাৎ বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। নগেন ব্যস্তভাবে বলিল, "ঐ কে আসছে—আমি চল্লুম। মনে রেখ—শেষরাতে খিড়কীর দরজায়।"—বলিয়াই, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রাইমণি সেখানে বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল ... ... ,... সেদিন সে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ আর জ্বলিল না।

৮

ঝিনঝুম রাত্রি। আকাশ জুড়িয়া দুধের ধারার মত জ্যোৎস্নার রূপের ঢেউ চল্‌কাইয়া উঠিয়াছে, ভাঙ্গামেঘের ধারেধারে চাঁদের হাসি আলোক-পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চৌধুরী-বাড়ীর দরজা খুলিয়া এই নীরব নিশীথে এক রমণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কোনদিকে না চাহিয়া ধীরে-ধীরে একাকিনী চলিতে লাগিল।

ঘুমের কোলে শুইয়া গ্রামখানি নিসাড় হইয়া আছে। তাহারি মাঝখান দিয়া নানা পদচিহ্ন-লেখা আঁকাবাঁকা পথের রেখাটি স্বপ্নের ছবির মত চলিয়া গিয়াছে,—কখনো আলোকে জাগিয়া, কখনো ছায়ায় মিলাইয়া।

রমণী সেই পথ ধরিয়া চলিল—চন্দ্রালোকে সেই শুভ্রবসনা রহস্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া গেঁয়ো কুকুরগুলো ভয় পাইয়া পথ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

মাঠের ধারে পথের শেষ।—রমণী কিন্তু থামিল না, সেই ধূধূ মাঠের ভিতর দিয়াই সে স্বপ্নাবিষ্ট অন্ধের মত সমান অগ্রসর হইতে লাগিল;—দূরে জলাভূমিতে ভৌতিক ব্যাপারের মত আলেয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; আরো-দূরে শ্মশানের চিতার মত কি-একটা আগুন দাউদাউ জ্বলিতেছে;—তার কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, সে যেন মরণকে একটুও ডরায় না!

চাঁদ যখন পাণ্ডুমুখে পশ্চিমে নামিতেছে, মাঠ তখন শেষ হইল। সামনেই গভীর অরণ্য, তার মধ্যে পথ নাই আলো নাই শব্দ নাই; সুধু কষ্টিপাথরের চেয়েও কালো, একটা বিরাট নিস্পন্দ জমাট অন্ধকার, এক অনন্তদেহ পিশাচের মত বিশ্বকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন হাঁ-করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে!

হঠাৎ কোন্ দূর কুঞ্জবনে পাপিয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিকের থম্‌থমে স্তব্ধতার মধ্যে পাপিয়ার আকস্মিক গান শুনিয়া রমণীও থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; এতবড় দীর্ঘপথে এই প্রথম সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, চাঁদের অস্তিমহাসি প্রান্তরের শ্যামলতার উপরে তখনো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে... ... বিদায়ের মলিন হাসি!... ... ...

রমণীর বুক ঠেলিয়া একটি চাপা নিশ্বাস উঠিল—সে যেন চুপেচুপে অস্ফুট হাহাকার!... ... ...

তারপর, সেই চাঁদের আলো, পাপিয়ার গান পিছনে রাখিয়া, রমণী সুমুখপানে অগ্রসর হইল;—চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া বিপুল অন্ধকার তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে... ... ... মৃত্যুর মত!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের নিয়ম

আমরা পূর্ব্বে (১) বংশানুক্রমের মূল অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পিতা মাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের গুণাবলী সন্তানে সংক্রামিত হয় মোটামুটি তাহা বলিয়াছি, ও কিরূপে জীব হইতে জীবান্তরে সেই সংক্রমণক্রিয়া সাধিত হয়, তাহারও কতকটা আভাস দিয়াছি। কিন্তু সৃষ্টিধারায় যে আর-একটি প্রবল শক্তি কাজ করিতেছে তাহার কথা বিশেষ কিছু বলি নাই। সে প্রবল শক্তির নাম 'পরিবর্ত্তন' (Variation)।

(১) বংশানুক্রমের গোড়ার কথা—ভারতী, শ্রাবণ, ১৩২৪।

ইহাই জীবজগতে বৈষম্যকে আনয়ন করিতেছে,—তাহার অপূর্ব্ব বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। বংশানুক্রম যেমন প্রত্যেক জীবজাতি (Genus) ও জীববর্ণের (Species) মধ্যে, সাদৃশ বা সাধর্ম্ম্যকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, পরিবর্ত্তন (Variation) তেমনই উহাদের বৈষম্যকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। বংশানুক্রম না থাকিলে যেমন জীবজাতি ও জীববর্ণসমূহের মধ্যে কোনো সাধারণ ধর্ম্ম থাকিত না, পরিবর্ত্তন না থাকিলে তেমনই এই নানা বিচিত্র জীবজাতি ও জীববর্ণাদির বিকাশ ঘটিত না। দার্শনিকের ভাষায় একটি গতিশক্তি (Dynamic), অপরটি স্থিতিশক্তি (Static); একটি সৃষ্টিকে রূপ হইতে নব-নব রূপান্তরে লইয়া যাইতেছে, অপরটি সেই সকল বিভিন্ন রূপ ও বিচিত্রতার মধ্যে মিলন-রজ্জুর বন্ধন টানিয়া রাখিতেছে।

কেবল যে বিভিন্ন জীবজাতি বা জীববর্ণের মধ্যেই এই বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, এক এক জীবজাতি ও জীববর্ণের অন্তর্গত জীবসমূহের মধ্যেও এই সাদৃশ্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, এক পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও এই বৈষম্য বেশ স্পষ্টরূপে চোখে পড়ে। একই জাতি একই বংশ একই পিতামাতার কোনো-দুই সন্তানের মধ্যেই স্বভাব, প্রকৃতি, আকৃতি, গঠন একরূপ নয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে সেই সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালেই একটা সাধর্ম্ম্যও বেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়;—সকল বৈষম্যকে ছাপাইয়া সাদৃশ্যের রূপ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। ইহাই বংশানুক্রমের ধারা। এই বংশানুক্রমিক গুণাবলী কি নিয়মে আত্ম-প্রকাশ করে, আজ সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব। পরিবর্ত্তনের কথা বারান্তরে হইবে।

এই বংশানুক্রমিক গুণাবলী নানা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায়। স্থূলভাবে বলিয়াছি যে, পিতা ও মাতা এই উভয়ের গুণ সন্তানে একত্র মিলিত হয় ও সেই সম্মিলিত গুণ হইতেই সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু এই পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তাহারা কি-ভাবে পরস্পরের উপর কার্য্য করে, একে অন্যকে ছাড়াইয়া পৃথক ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে কি না অথবা পরস্পরে মিলিয়া নূতন কোনো মূর্ত্তি গ্রহণ করে কি না,—এই সকল রহস্যের ভিতর একটু তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যেরূপে এই বংশানুক্রমিক গুণ সন্তানে প্রকাশ পায়, নানা বৈজ্ঞানিক তাহা নানা নিয়মের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক-এক জন এক-এক রকম শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ করিয়াছেন। আমরা অত সব গণ্ডগোলের মধ্যে যাইব না। সকল বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ, নামকরণ প্রভৃতি ঘাঁটিয়া মোটামুটি তিনটি স্থূল নিয়ম দাঁড় করানো যাইতে পারে। এই তিনটি স্থূল নিয়মের নাম দেওয়া যায় মিশ্রক্রম (Blended Inheritance), একান্ত ক্রম (Exclusive Inheritance) ও অমিশ্র ক্রম (Particulate Inheritance)।

১। মিশ্রক্রম (Blended Inheritance)—কখনও কখনও দেখা যায় যে পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া যায় ও সেইরূপ মিশ্রিত ভাব সন্তানে প্রকাশ পায়। মাতার নীলকেশ ও পিতার কৃষ্ণ-কেশ মিলিয়া-মিশিয়া সন্তানে উভয়ের মাঝা-মাঝি একরূপ নীলকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। সন্তানের মুখখানি স্থিরভাবে থাকিলে হয়ত তাহাতে মাতার মুখের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, আবার মুখ-খানি ঘুরাইলে পিতার সৌসাদৃশ্য জাগিয়া উঠে। কয়েকটি সঙ্করবর্ণের উদ্ভিদের মধ্যেও পিতৃমাতৃগুণের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিতৃমাতৃগুণের মিশ্রণের মধ্যেও আবার নানা তারতম্য আছে। অনেক সময়ে তাহারা প্রায় সম-পরিমাণে মিশিয়া যায়। তখন সন্তানের গুণের মধ্যে পিতা ও মাতা উভয়ের গুণই বেশ লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় আবার পিতার গুণ বা মাতার গুণ একটু অধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠে। তখন সন্তান হয়ত একটু বেশীভাবে পিতা বা মাতার অনুরূপ হয়।

২। একান্ত ক্রম (Exclusive Inheritance)—যখন পিতৃগুণ বা মাতৃগুণ এইরূপে খুব বেশী-পরিমাণে সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে বলা যায় 'একান্তক্রম'। পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া, কোনো আজ্ঞাতকারণে না মিশিয়া, একে অন্যকে ছাড়াইয়া উঠে। তখন হয় পিতৃগুণ কিম্বা মাতৃগুণ সন্তানের উপর একান্ত আধিপত্য বিস্তার করে,—অপরটির চিহ্ন পর্য্যন্ত হয়ত দেখা যায় না। পিতা বা মাতার কোনো কোনো বিশেষগুণই এরূপ-স্থলে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু কখনো কখনো সন্তানের গুণাবলীর মধ্যে পিতৃগুণ বা মাতৃগুণের আধিপত্য এত বেশী প্রকাশ পায়, যে মোটের উপর সন্তানের মধ্যে পিতা বা মাতার প্রতিকৃতিই আত্যন্তিকভাবে ফুটিয়া উঠে।

এই অবস্থায়, কোন্ গুণগুলিতে পিতার আধিপত্য দেখা যায়, আর কোন্ গুণগুলিতেই বা মাতার আধিপত্য লক্ষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোনো সূত্র আবিষ্কার করা যায় নাই। তবে কোনো কোনো গুণের সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু ইঙ্গিত করা যায় মাত্র। যথা বিলাতের অবস্থার আলোচনা করিয়া কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে সাধারণতঃ পিতার শারীরিক দৈর্ঘ্য মাতার শারীরিক দৈর্ঘ্য অপেক্ষা সন্তানের উপর বেশী কাজ করে, অর্থাৎ শারীরিক দৈর্ঘ্য হিসাবে সন্তান মাতা অপেক্ষা পিতার অনুরূপই বেশী হয়। আমাদের দেশের কোনো উৎসাহী পণ্ডিত যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন তবে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

এই একান্তক্রম সম্বন্ধে কতকগুলি লোকবিশ্বাস বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। যথা, সন্তানের বাহ্য আকৃতির উপর পিতার প্রভাব বেশী, আর স্বভাব ও প্রকৃতির উপর মাতার প্রভাব বেশী হইয়া থাকে। পশুপালকদের মধ্যেও মোটামুটি এইরূপ ধরণের বিশ্বাস দেখা যায়। কিন্তু এসকল বিষয়েই কোনো সাধারণ নিয়ম গড়িবার মত মালমসলা আবিষ্কৃত হয় নাই। লোকের বিশ্বাস যাহাই হউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে যার পর নাই সাবধান হইয়া কথা বলেন।

অনেকসময় দেখা যায় যে পুত্র অবিকল পিতার অনুরূপ আর কন্যা মাতার অনুরূপ হয়; কখনো-বা পুত্র মাতার অনুরূপ, আর কন্যা পিতার অনুরূপ হয়। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় এ-সম্বন্ধেও ঠিক করিয়া কোনো নিয়ম বাঁধা নিরাপদ নহে।

৩। অমিশ্র ক্রম:—অনেক স্থলে আবার পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পর মিশিয়া যায় না বা একে অন্যকে ছাড়াইয়াও উঠে না। পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ উভয়েই অমিশ্রভাবে সন্তানের অঙ্গবিশেষে দেখা দেয়। পিতা ও মাতা উভয়ের গুণই এত স্পষ্ট ও পৃথকভাবে দেখা দেয় যে তাহাকে মিশ্রণ বলা চলে না। কৃষ্ণবর্ণ পিতা ও ফিকে রঙের মাতার সংযোগে জাত কোনো-কোনো অশ্বশাবকের দেহে উভয়-প্রকার রংই পৃথকরূপে দেখা দেয়! কার্ল পিয়ার্সন বলেন যে চোখের রং প্রায়ই একান্তক্রমে (exclusively) প্রকাশ পায়। কিন্তু হাজার-করা দুইএকটি দৃষ্টান্ত এমনও দেখা যায় যে, সন্তানের দুই চোখের একটির রং পিতার মত আর-একটির মাতার মত; কিম্বা একই চোখে দুইরকম রঙের ছাপই থাকে। একটি বিলাতী sheep-dogএর এক চোখ পিতার মত, আর-একটি চোখ মাতার মত দেখা গিয়াছিল। এ সকলই অমিশ্র-ক্রমের দৃষ্টান্ত।

কিন্তু উপরে যে তিনটি নিয়মের কথা বলা হইল, তাহা শুধু কতক-গুলি ঘটনার বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগ মাত্র। বংশানুক্রম যে নানা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায় তাহার সবগুলি ঠিক ঠিক ইহাদের মধ্যে ধরা পড়ে না অথবা তাহার অন্তর্নিহিত রহস্য কি তাহাও বুঝা যায় না। এখন কথা হইতেছে এই যে এমন কি কোনো নিয়ম হইতে পারে না, যাহা পিতৃগুণ ও মাতৃগুণের সংযোগ-রহস্য ও তাহাদের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারে?—সমস্ত বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের প্রণালীগুলিকে একটা বড় নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে?—একটা সাধারণ সূত্রের মধ্য দিয়া সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারকে বুঝাইয়া দেয়? এইরূপ চেষ্টা যে না-হইয়াছে তাহাও নহে। মেণ্ডেলের বিখ্যাত নিয়মই (Mendel's Law) এইরূপ একটা বৃহৎ চেষ্টা।

মেণ্ডেলের নিয়ম বিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান এ নহে। আপাতত সে সম্বন্ধে কেবল কয়েকটি স্থূলকথা বলিব। মেণ্ডেলের কতকগুলি পরীক্ষার ফলে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, পিতৃমাতৃগুণগুলি মূলগুণ (unit characters); আর ইহাদের আশ্রয়স্থান তদনুরূপ 'অণু'ও (Representative Particles) আছে। এই মূলগুণ-গুলি পরস্পর স্বাধীন-স্বতন্ত্র, কাহারও সঙ্গে কেহ মিশ খায় না। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি (dominant) সক্রিয় আর কতকগুলি (recessive) নিষ্ক্রিয়। যদি এরূপ দুইটি বিভিন্ন বর্ণের (varieties) যৌন-সংযোগ করা যায়—যাহাদের একটিতে সক্রিয় গুণ ও অপরটিতে নিষ্ক্রিয় গুণ আছে, তবে তাহার ফলে যে সঙ্কর-বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহাতে শুধু সক্রিয় গুণই দেখা দিবে, নিষ্ক্রিয় গুণের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া

নিষ্ক্রিয় গুণ লোপ পায় না, শুধু চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র। কেননা সেই সঙ্করবর্ণের পরস্পরের মধ্যে যদি আবার যৌন-সংযোগ করা যায়, তবে ৩ঃ১ এই অনুপাতে সক্রিয়-গুণ ও নিষ্ক্রিয়-গুণ দেখা দিবে। অর্থাৎ একভাগ বিশুদ্ধ নিষ্ক্রিয়-গুণের পুনরাবির্ভাব হইবে, আর তিনভাগ সক্রিয়-গুণ হইবে। এই সক্রিয়-গুণযুক্ত বর্ণের মধ্যে আবার যৌনসংযোগ করিলে, ১ঃ২ এই অনুপাতে বিশুদ্ধ সক্রিয় ও সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইবে। পুনশ্চ এই সঙ্কর বর্ণের মধ্যে যৌনসংযোগ করিলে আবার ৩ঃ১ এই অনুপাতে পূর্ব্বের ন্যায় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় গুণের প্রকাশ হইবে। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে ঃ—

ড = সক্রিয়-গুণ

র = নিষ্ক্রিয়-গুণ

ড × র

ড (র)···'র' চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

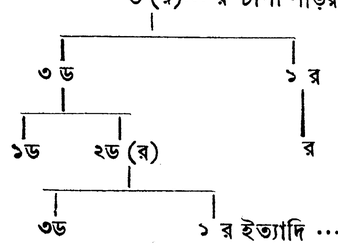

পূর্ব্বোক্ত ও আরও-কয়েকটি অনুরূপ পরীক্ষা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাইতে পারে ঃ—

(১) মূলগুণগুলি পরস্পর স্বাধীন-স্বতন্ত্র, —তাহারা কাহারও সঙ্গে কেহ মিশ খায় না।

(২) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় গুণযুক্ত দুইটি বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে প্রথমত সক্রিয় গুণ আধিপত্য বিস্তার করিলেও নিষ্ক্রিয় গুণ লোপ পায় না, চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র,—সুযোগ পাইলেই আবার দেখা দেয়।

(৩) যে দুই পিতা-মাতার সংযোগ হয়, তাহাদের মধ্যে যে গুণ না-থাকে, সন্তানে তাহার বিকাশ হইতেই পারে না। যদি পিতামাতার মধ্যে একজনের কোনো গুণ থাকে, তবে সন্তানে সেই গুণ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। আর যদি পিতামাতার দুই জনেরই কোনো গুণ থাকে, তবে সন্তানে তাহা বিশিষ্ট ও পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

মোটের উপর মেণ্ডলের মতে এই দাঁড়ায় যে, মূলগুণগুলি স্বাধীন-স্বতন্ত্র বস্তু। পিতামাতার মধ্যে যদি কোনো মূলগুণ না থাকে, সন্তানে তাহার বিকাশ হইতেই পারে না। সন্তানে যে সব গুণের বিকাশ হয় সেগুলি পিতামাতার গুণগুলিরই সাজানো-গোছানো অবস্থা—প্রকারান্তর মাত্র। পিতা-মাতার কোনো গুণ সন্তানে না বর্ত্তিলে মনে করিতে হইবে, তাহা কোন কারণ বশত কিছুকালের জন্য কেবল চাপা পড়িয়া গিয়াছে; সময় ও সুবিধামত কোনো কালে কোনো অধস্তন পুরুষে আবার তাহার বিকাশ হইতেও পারে।

একটু অভিনিবেশ করিলেই দেখা যায় যে, মেণ্ডলের এই মতবাদ প্রাকৃত-বিজ্ঞানের পরমাণুবাদেরই (Atomistic Theory) হুবহু প্রতিকৃতি। মেণ্ডলের মূলগুণগুলি (unit characters) পরমাণুরই মত।

তাহারা স্বাধীন-স্বতন্ত্র; তাহাদের বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই। উহারাই পরস্পরে মিলিয়া জীবজগতকে নব নব রূপে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

বংশানুক্রম-তত্ত্বের অন্যতম প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ গ্যাল্টনও (Galton) বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের একটি নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন। তাহাকে বলা হয় Galton's Law of Ancestral Inheritance। গ্যাল্টনের এই নিয়ম সংখ্যা-সংগ্রহের (statistics) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বহু পূর্ব্বপুরুষের নানারূপ গুণের হিসাব ধরিয়া তাহার একটা গড়পড়তা কসিবার চেষ্টা। গ্যাল্টনের নিময়টি এইরূপ ঃ—পিতামাতা গড়ে সন্তানের অর্দ্ধেকগুণ যোগাইয়া থাকে, —পিতা এক-চতুর্থাংশ, মাতা এক-চতুর্থাংশ, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহী এই চারিজনে মিলিয়া সন্তানের গুণের এক-চতুর্থাংশ যোগাইয়া থাকে;—প্রত্যেকে গড়ে $\frac{১}{৪}$; ইত্যাদি। গণিতশাস্ত্রের সূত্রের মধ্যে ফেলিলে নিয়মটা এইরূপ দাঁড়ায় ঃ—

$$\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬} \cdots \cdots = ১$$

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, গ্যাল্টনের এই নিয়মের সঙ্গে মেণ্ডলের পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মের বিরোধ আছে। কিন্তু সেটা বুঝিবার ভ্রম মাত্র। মেণ্ডলের নিয়ম, কয়েকটি বিশেষ অবস্থাকে লইয়া পরীক্ষার ফল; আর গ্যাল্টনের নিয়ম বহু বহু পূর্ব্বপুরুষের গুণাবলীর সংখ্যা-সংগ্রহ করিয়া তাহার একটা গড়পড়তা কসিবার প্রয়াস। আসল কথা, বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের ব্যাপারটাকে দুইদিক হইতে দুইজনে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। :কালে এই উভয়-নিয়মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, এরূপ আশা বোধ হয় অসম্ভব নহে। *

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

শেষ-গোধূলি

আজ গোধূলির শেষ-হাওয়াতে সকল মুকুল যায় ঝরে',
পারের পাখী গায় অ-পারের গান;
দূর বেদনার রক্তজবা ফুটেছে মোর বুক ভরে'
গুম্‌রে ওঠে পুরাণো সেই প্রাণ।
মেঘের দেশে মিলিয়ে গেল অস্ত চাঁদের আব্‌ছায়া,
আমার রাতি অতল অন্ধকার,
জোয়ার এসে মিল্‌ল যুগল অশ্রু-নদী ক্ষীণ-কায়া,
বেলায় বেলায় প্রতিধ্বনি তা'র।

* প্রধানতঃ Thomson's "Heredity" অবলম্বনে লিখিত।

কে এল আজ পান্থশালে ? বল্‌তে চাহে শেষ কথা—
স্বপ্নসম চপল দুটি চোখ।
নিবেছে হায় পথের আলো, নিশীথভরা স্তব্ধতা,
ওগো তুমি কোন্ বিদেশের লোক ?
চিনি চিনি হে অতিথি, দখিণ হাওয়ায় যাও ভেসে,
আমার ঘরে নাই তো এবে ঠাঁই ;—
এসেছ আজ অসময়ে, ফুরিয়ে-যাওয়ার সবশেষে,
হারিয়েছি যা আর কি ফিরে পাই !
সাগর-ঢেউএর চাপা আওয়াজ আস্‌ছে ঝাউএর বনচ্ছায়
একলা আমি শুন্‌ছি দিবারাত ;—
লক্ষ যুগের মৃত্যু-ফেনা যাত্রা করে শেষ-খেলায় ;
বন্ধু আমার কর্‌ছে যাতায়াত।
রাত্রি এসে বন্দী করে আমার জীবন-স্বপ্নকে,
গরল-ফুলে এলায় দেহ-মন—
শুকিয়ে গেছে তরুণ কলি আমার মানস-চম্পকে,
মৃত্যু দেছে ফাল্গুনী চুম্বন।
আজ হৃদয়ের শব্দ-শেখর টল্‌ছে গভীর রূপ-শোভায়,
দীর্ঘ যতি পড়্‌ল জীবন-গীতে ;
বিরহী ওই লুকিয়ে থেকে ছায়া-পথের বীণ্ বাজায়,
কাঁপ্‌ছে পরাণ তারার কাঁপুনিতে !

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মল্লারের সুর

(গল্প)

তার নাম লক্ষ্মীমণি। সে অন্ধ। রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়।

চিরদিন তার এ অবস্থা ছিলনা। তার রূপ-যৌবন, ধন-দৌলত সবই ছিল। আজ যারা তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ-ফিরিয়ে চলে যায়, এমন দিন ছিল যখন সে তার বিলাসিতার প্রাসাদ-শিখরে বসে তাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করত। হাসি, গান আর তার সঙ্গে শতশত পুরুষের তোষামোদ উপভোগ করেই তার সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কেটে যেত। আজ তার কণ্ঠস্বর বিকৃত, কিন্তু এই কণ্ঠই বিচিত্র সুরের লীলায়

যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন মনে হ'ত যেন রাগ-রাগিণী মূর্ত্তি ধরে শ্রোতাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝি আকাশে-বাতাসে এমন সুর নেই যা তার গলার সুরে ধরা না দিয়েছে। কিন্তু আজ ? আজ কোথায় সে সুর ? প্রাণের বীণার তার ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় ছড়িয়ে গেছে,—তাতে আর কোনো সুরই বার হয় না একটা লজ্জা-ভরা ভিক্ষার কর্কশ ভাঙা সুর ছাড়া।

কেমন করে এমন হ'ল ? ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু তাই থেকে তার ভাগ্যে এত-বড় একটা প্রলয় ঘটে গেল।

সে আজ দশ বৎসরের কথা।

সে দিন আকাশে খুব ঘটা করে বর্ষার উৎসব লেগেছিল। তারই মৃদঙ্গের বোল্, বর্ষণের সুর আর নূপুর-নিক্কনের তাল পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে এখানেও একটা ছোটখাট উৎসব জমিয়ে তুলে ছিল।

এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীমণির মজলিসে একটা জলসা চলছিল। লক্ষ্মী ধরেছিল মল্লারের করুণ সুর। শ্রোতা ছিল যারা তারা যে খুব রসিক সে কথা কথা বলা যায় না—কিন্তু সুরের সেই কান্নার মত কাঁপুনি তাদের নিসাড় হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে যে তোল-পাড় আরম্ভ করলে তাতে তাদের সমস্ত অন্তরটা কেমন-একটা অজানা ব্যথায় গলে পড়তে লাগল—যেন সেখানেও একটা বর্ষণ সুরু হয়েছে। লক্ষ্মী গাইছিল যে-করুণ সুরে তার করুণতা তাকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিল।

যখন এমনি করে আসর জমে উঠেছে—যখন ভিতর-বাহির চারিদিকে কান্নার মত একটা করুণ সুরে ভরে উঠেছে, যখন এই করুণতার সুর লক্ষ্মীমণির সেই ঘরে আর ধরেনা তখন হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে কে প্রবেশ করলে। মনে হ'ল যেন বাইরের ব্যাকুল ঝড় পাগলের মত ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছে। যে এল রুক্ষ তার কেশ, রুক্ষ তার বেশ, কে যেন তার শুষ্ক দেহ, মলিন বসনের উপর জল ও কাদার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ দেখে মনে হ'ল এ যেন কোনো আগন্তুক নয়, ঘরে-বাইরে আজ যে করুণ সুরের স্রোত চলেছে তাই থেকেই যেন এই মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে—এমনি করুণ তার দৃষ্টি। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

সে বলে উঠল—"আমার ছেলে ? আমার ছেলে কৈ ?"

শুনে মনে হ'ল এ যেন কথা নয়, কান্না !

গান থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তার করুণ রেশ সমস্ত ঘরের মধ্যে, শ্রোতাদের সমস্ত মনের মধ্যে তখনও ঘুলিয়ে উঠছিল। মনে হ'ল সেই রেশের সঙ্গে বৃদ্ধের গলা যেন একসুরে বাঁধা। শ্রোতাদের মধ্যে তারই ঝন্‌ঝনা বেজে বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ আবার বললে—"আমার ছেলে কোথায় গেল !"

কেউ কোন উত্তর করতে পারলে না—চুপ করে রইল।

লক্ষ্মীমণি বললে,—"কে তোমার ছেলে ?"

বৃদ্ধ বললে—"বিপিন।"

বলেই সে আর্ত্তনাদ করে উঠল—"সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

তার সেই আর্ত্তনাদের সুরে সকলের মনে হল যেন একটা সর্ব্বনাশ সত্যই ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে আকাশের বিদ্যুতের কাঁপুনি, মেঘের ঝন্‌ঝনা যেন সজোরে কেঁপে কেঁপে বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল—"আজ দুদিন সে বাড়ী যায় নি। কি করেছে সে জান? আফিসের টাকা ভেঙেছে। পুলিশ আজ সমস্ত দিন ধরে আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করেছে—তারা বলে আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার উপর কি অত্যাচার করেছে দেখবে?" —বলে সে চাদরখানা খুলে শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাতে লাগল। রক্ত তখনো ঝুঁজিয়ে পড়ছে।

সেইদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্মীর মুখ থেকে বেরিয়ে উঠল—"আহা।" অমনি সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা অস্ফুট প্রতিধ্বনি উঠল—"আহা!"

লক্ষ্মীমণি বললে—"কি করলে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাও? তোমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আচ্ছা, আমি রাজি আছি।"

বৃদ্ধ বললে—"না না, তাতে কোনো ফল হবে না। টাকাগুলো তুমি ফিরিয়ে দাও, আমি আফিসের লোকদের হাতে-পায়ে ধরে যেমন-করে পারি মিটিয়ে নেব।"

লক্ষ্মীমণি আশ্চর্য্য হয়ে বললে—"টাকা! কোন্ টাকা ফিরিয়ে দেব?"

বৃদ্ধ বললে, "যে টাকা সে তোমায় এনে দিয়েছে। সে ত তোমার জন্যেই চুরি করেছে, তার স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মারা গেলেও তার মাথার টনক নড়ে না।"

লক্ষ্মীমণি বললে—"আপনি ভুল করছেন, টাকা সে আমায় দেয়নি।"

বৃদ্ধ বললে—"নিশ্চয়ই দিয়েছে, নইলে সে চুরি করবে কেন? সে ত আগে এমন ছিল না, যেদিন থেকে তোমার কুহকে পড়েছে, সেদিন থেকেই তার মতিগতি বিগড়েছে।"

তার কুহকে পড়ে অনেকের মতিগতি বিগড়েছে লক্ষ্মীমণি সে কথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেনা কিন্তু এ চুরির টাকা তার তহবিলে যে আসেনি এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তাই সে মাথা-নেড়ে চীৎকার করে বলে উঠল—"না না, আমি বলছি টাকা সে আমায় দেয় নি।"

বৃদ্ধ বললে—"নিশ্চয়ই দিয়েছে। জানি তোমরা অনেক চাতুরী জান। এ বুড়োর সঙ্গে কেন চাতুরী খেলছ? নগদ টাকা না দিয়ে থাকে তোমার গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, দাও সেগুলো ফিরিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি দাও।"—বলে বৃদ্ধ তার পা জড়িয়ে ধরলে।

লক্ষ্মী পা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পিছনে সরে গেল। তার নিজের পাওয়া সেই মাল্লারের সুর তখনো তার মনের দ্বারে আঘাত দিয়ে দিয়ে ফিরছিল; মনের বাঁধকে আলগা করে দিয়ে তাকে কেমন যেন সব ভুলিয়ে দিচ্ছিল। বৃদ্ধের চোখের জল দেখে তার চোখের পাতা ভিজে এল্। সে বলে উঠল—"কত টাকা?"

বৃদ্ধ একটা আশার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—"আট হাজার টাকা।"

আট হাজার! লক্ষ্মীমণির মনে হতে লাগল একটা বুড়ো বামুন একটু চোখের জল

ফেলে এতগুলো টাকা নিয়ে যাবে? সে হবে না। সে বলে উঠল, "না না, অত টাকা হবে না—তুমি যাও।"

ঝড়ের ঝাপটে শুকনো গাছ যেমন ভেঙে পড়ে বুড়ো ঠিক তেমনি করে ভেঙে পড়ল। সেই সময় আসর থেকে একজন উঠে বৃদ্ধকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দরজা অবধি যাবার আগেই লক্ষ্মী বলে উঠল,—"না না, কেন ওকে টানাটানি করছ! দাঁড়াও।" এই বলে দেয়াজের টানাটা খুলে একখানা নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বললে—"এই নিন।"

বৃদ্ধ হাত পেতে তার কাছ থেকে নোটখানা নিয়ে করুণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"এতে কি হবে? দাও, দাও, আরো কি আছে দাও, আর দেরি কোরোনা। হতভাগা দুদিন বাড়ী যায়নি, তার বাড়ীতে যে কি কাণ্ড চলছে তা সে একবার ভাবেও না। আজ দুদিন আমরা সবাই একরকম অনাহারে কাটিয়েছি, তার ছোট ছোট মেয়ে-ছেলেগুলো ক্ষিধের জ্বালায় সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে আধমরা হয়ে পড়েছে, এ সব না হয় সহ্য হবে কিন্তু হতভাগার যদি জেল হয় তাহলে যে কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলো না খেতে পেয়ে মারা যাবে—ওর স্ত্রীকে যে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।"

রাস্তায় দাঁড়াতে হবে! এই কথা ভাবতে ভাবতে বহুকালবিস্মৃত একদিন সন্ধ্যা-বেলাকার একটি ছবি লক্ষ্মীর চোখের সামনে ফুটে উঠল। আকাশের সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে এসে সেদিনকার সন্ধ্যা তার চোখের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই হাসি, নাচ, গান-ভরা পৃথিবী সেদিন তার চোখে কী বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল! কী ভয়ঙ্কর অসহায়তা, কী নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই না তাকে লড়াই করতে হয়েছিল!—বিদ্রোহী মন যে-পথে যাবার বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল সেই মনকে কী নিষ্ঠুর শাসন করে, কি-রকম ক্ষতবিক্ষত করে তাকে ফেরাতে হয়েছিল!—সে ব্যথা সে আজও ভুলতে পারেনি। তার গোপন হৃদয়ের পরতে পরতে অদৃশ্য লিপিতে যে কাহিনী লেখা ছিল অতীত আজ বর্ত্তমানের মূর্ত্তি ধরে সেগুলোকে তার মনের সামনে আজ স্পষ্টতর করে ফুটিয়ে তুলতে লাগল—সে কি ভীষণ যন্ত্রণা!

ছুটে গিয়ে লক্ষ্মী আলমারির দরজা খুলে গয়নার বাক্সটা এনে বৃদ্ধের সামনে ফেলে দিয়ে বললে,—"যাও, নিয়ে যাও, আর একমিনিটও দেরি কোরোনা, তাহলে হয়ত তোমার পুত্র-বধূকে রাস্তায় দাঁড়াতে হতে পারে। যাও, যাও—কী ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছ!"

বৃদ্ধ বাক্সটা খুলে অবাক হয়ে একবার গয়না-গুলোর দিকে আর-একবার তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠে লক্ষ্মী দুহাত দিয়ে ঠেলে তাকে একেবারে ঘরের বার করে দিলে।

তার মাথা তখনও ঘুরছিল; মনে হতে লাগল গয়নাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সমস্ত রক্তও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, বর্ষণ তখন থেমে গেছে;—আকাশ যেন তার সমস্ত সম্পদ ঝরিয়ে দিয়ে ঠিক তারই মত নিঃস্ব হয়ে

ঝিমিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মী রিক্ততার একটা ব্যাকুলতায় আত্মহারা হয়ে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তার অবস্থা দেখে বন্ধুবান্ধবেরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

তারপর পিছনের বারান্দা থেকে একজন ছোকরার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে লক্ষ্মী বললে—"চুরির টাকা কোথায় রেখেছিস বল্। শিগ্‌গির বল্। সে টাকা আমায় এক্ষুনি এনে দে। আমার সর্ব্বস্ব আজ তোর জন্যে বিলিয়ে দিয়েছি, জানিস্!"

বিপিন বললে, "জানি। কিন্তু কেন দিলি?—টাকা আমার নেই।"

লক্ষ্মী বললে,—"কোথায় গেল টাকা?"

"কি হবে তা শুনে? সে টাকা ত আর ফিরে পাবিনি।"

"তবে তুই কাউকে দিয়েছিস্?"

"হ্যাঁ।"

"কাকে দিলি? বল্, শিগ্‌গির বল্, কে তোর পেয়ারের লোক আছে!"

"আমি বলবনা। শুন্‌লে তুই রাগ করবি।"

"না না তুই বল্!"

বিপিন জড়িতকণ্ঠে বললে,—"টাকা আমি কামিনীকে দিয়েছি—"

"—কামিনী—কামিনী! চোর কোথাকার, পাজি, মদমায়েস, বেরো এখান থেকে, বেরো!"

বিপিন লক্ষ্মীর হাত ধরে বললে, "রাগ করিসনে ভাই!"

লক্ষ্মী সজোরে তার হাত ছিট্‌কে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল; বললে—"চোরকে আমি ঘরে ঠাঁই দিইনে—বেরো তুই, চোর!"

বিপিন উত্তেজিত হয়ে বললে—"চোর চোর করিসনি বলছি!"

লক্ষ্মীমণি একটা অট্টহাস্য করে বলে উঠল,—"ওরে আমার সাধুরে! তুই চোর না ত কি!"

বিপিন আর সামলাতে পারলে না,—সামনে থেকে একটা ঘটি তুলে নিয়ে লক্ষ্মীমণির গায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। সেই ঘটি তার মুখের উপর এসে লাগল—সে ঘুরে পড়ল—তার দুটো চোখ আর মুখের খানিকটা একেবারে থেঁতলে গেলে।

বিপিন তাকে একা ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

প্রভাতে ও রাত্রে

কাল সকালে হঠাৎ আঁখি মেলি
তোমায় যদি না পাই এ মোর ঘরে;—
হিরণ তব আঁচোল বেড়ায় খেলি
উদাস উদার নীল আকাশের পরে;
নাইকো রবি তোমার ও মুখ ছবি
রোদের মতো ছড়ায় প্রেমের আলো,—
পরশে তার মধুর লাগে সবি—
সবাই যেন বাসছে সবে ভালো;
ফুটছে ফুলে তোমার প্রাণের বাস,
ছুটছে হাওয়া মধুর তোমার শ্বাস,
অবাক্ আমি হবইনাকো মোটে
সহজ সবই হতেই এযে পারে!
মুকুল যদি ফুলের মাঝে ফোটে
অবাক্ হয়ে কেইবা দেখে তারে?
জাগছে প্রেমে বিকাশ-অসীমতা
নইলে যে তার মিটবেনাকো ব্যথা।

নিশীথ রাতে হঠাৎ জেগে উঠি
দেখিই যদি পাশের পানে চেয়ে
চন্দ্র তারা তোমার মাঝেই ফুটি
সব নিশুতি তোমায় আছে ছেয়ে;
ঘুমের ঘোরে তোমার যে হাতখানি
শিথিল ভাবে ছড়িয়ে আমার দেহে
নিশীথিনীর স্তব্ধ গভীর বাণী
ঘেরা বিপুল আরাম বিরাম স্নেহে;
এলানো ওই আকুল কেশের ছায়া
জাগায় ভুবনভরা স্বপন মায়া;
তুমি যদি নিশীথ-রাণীর রূপে
জেগেই উঠ কখন চুপেচুপে
তিলেক লাগি অবাক হবনারে—
হবার কথা হোতেই এযে পারে।
নিশীথপ্রাণের স্তব্ধ বিরামখানি
তোমার মাঝে আছেই আছে জানি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

আর্টে অধিকারী-ভেদ

ললিত-কলায় যাঁহারা অনুরাগী, তাঁহারা যেন বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের এই উক্তিটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন:—I, at any rate shall never be able to join a party which has the majority on its side. Bjornson says, "The majority is always right"; and as a practical politician he is bound, I suppose, to say so. I, on the contrary, of necessity say, "The minority is always right."

কলা-জগতের সর্ব্বত্র, ইবসেনের ঐ দামী কথাগুলির সার্থকতা অক্ষরে-অক্ষরে খাটিয়া যায়। সাহিত্যে যাঁহারা প্রতিভার অবতার, তাঁহাদের অনেকেই কেবল বাছা বাছা জনকতক রসিকের প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারেন;—সকলকার মনোহরণ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত! এ-কথার জলন্ত প্রমাণ যিনি চান, তিনি যেন কোন সাধারণ পুস্তকালয়ে যান। সে-সব জায়গায় রোজ যদি ষোলজন লোক বই লইতে আসে, তবে তাহাদের মধ্যে পনেরোজন লোক লইবে বটতলার দার্শনিক ঔপন্যাসিক প্রভৃতির লেখা চমকদার বই; রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপন্যাসের দিকে তাহারা ভুলিয়াও ফিরিয়া চাহিবে না।

গানের আসরে ভাল গাইয়ের গলায় সরু কাজ বা উঁচুদরের রাগরাগিণীর আলাপ কেহ বুঝিবেও না—শুনিবেও না; কিন্তু সেইখানেই যদি অন্য-কোন লোক একটা হাল্‌কা সুরের চটুল গান ধরে, তবে ঘনঘন বাহবার চোটে প্রাণ ও কাণ একেবারে আন্‌চান্ ও যান যান করিতে থাকিবে!

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.



ভেলাসকুয়েজের একখানি ছবি

শিল্পক্ষেত্রেও ঠিক এমনি কারখানা। Millais বা Velasquezএর আঁকা ছবি দেখিতে লোকে ততটা ভালবাসে না—যতটা ভালবাসে Whistler বা Murillo'র আঁকা ছবি দেখিতে। জনসাধারণ Rodin ও Manetকে ফেলিয়া Bouguereau ও Canovaকে লইয়াই মাতামাতি করিতে চায় বেশী। প্যারীর Sainte Chapelle দেখিয়া লোকে তেমন অভিভূত হয় না, রোমের St. Peter দেখিয়া যেমন হয়।

য়ুরোপের উচ্চশিক্ষিত জনসাধারণের অবস্থাও যদি এমনি শোচনীয় হয়, তবে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের শিল্প-রসবোধের মাত্রা যে কতটা অল্প, তাহা কল্পনা করাও শক্ত! তাই শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের মোহন তুলির লিখনকে ঠোঁট বেঁকাইয়া এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া, যখন কোন সবজান্তা কষ্ট-ক্রিটিক আর্টস্কুলের দ্বিতীয়বার্ষিক ছাত্রের আঁকা রঙ্গচঙ্গে পটের তারিফ করিয়া পরম বিজ্ঞতার (এবং চরম মূর্খতার) পরিচয় দিয়া বসেন, তখন আমরা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই না; কারণ, এ-দেশী ক্রিটিকের বুদ্ধির দৌড় এমনি বিষম সুদীর্ঘ হওয়াই ত স্বাভাবিক!

* *
*



কৃষ্ণ ও রাধা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

অবশ্য, 'অধিকাংশ' (Majority) যে সব-সময়েই ভ্রান্ত, এটাও জোর-করিয়া বলিবার মত জোর আমাদের নাই। কারণ, সময়ে-সময়ে দেখা গিয়াছে যে, 'অধিকাংশ' ও 'অল্পাংশ' (Minority) এক জায়গায় আসিয়া মিলিয়া এ-ওর সঙ্গে 'সেক্-হ্যাণ্ড' করিয়াছে! তাজমহল দেখিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রসিক-অরসিক, সাধারণ-অসাধারণ সকলেই শতমুখে তারিফ সুরু করিবে। ভাস্কর্য্যে গ্রীকশিল্পীর গড়া Venus of Melos এবং চিত্রে র‍্যাফেলের আঁকা Sistine Modona দুই দলেরই প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিম্‌সের গির্জ্জার পশ্চিমদিকের কলানৈপুণ্য দেখিয়া সুধু শিল্পরসিক মুগ্ধ হন না; যাহারা শিল্পের গূঢ় রসের স্বাদ পায় নাই, এখানে আসিয়া তাহারাও মুগ্ধপ্রাণে লুব্ধদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব কারুসৃষ্টির ছায়াতলে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এখানে কঠিন পাথরের উপরে মানবপ্রাণের ভাবের কমল এমনি শত-দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, গত সাতশো বছর ধরিয়া হাজার-হাজার লুণ্ঠনপ্রিয় ধ্বংসোন্মুখ ও যুদ্ধপাগল দস্যুর দল বারেবারে ইহার সুমুখ দিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রিম্‌সের স্বর্গমাধুরী তাহাদের পাষাণ প্রাণকেও পেলব করিয়া তুলিয়াছে,—তাহাদের উদ্যত নিষ্ঠুর হস্ত হইতেও রক্তাক্ত অস্ত্র খসাইয়া দিয়াছে! হায়, সেই সাতশত বৎসরের পৈশাচিকতার চাপা আগুণ যে আজ বিংশশতাব্দীর পরিপূর্ণ সভ্যতার যুগে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া রিম্‌সের জন্য চিতারচনা করিবে, প্রতীচ্যের বর্ত্তমান রক্তপাথার দেখিবার আগে কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল? রিম্‌সের সে অপূর্ব্ব সুষমা আর নাই; বিংশশতাব্দীর নর-কুরুক্ষেত্রে সভ্যতার মহাঝড়ে তাহা বোঁটা-ছেঁড়া ফুলের মত পথের ধূলায় ঝরিয়া পড়িয়াছে!

এ সকল ক্ষেত্রে 'অধিকাংশ' ও 'অল্পাংশ' একত্রে মিলিত হইলেও, এই দু-দলের মিলনের হেতু কিন্তু এক নয়। 'অধিকাংশ' এখানে যে কারণে শিল্পসৃষ্টিকে প্রশংসা করে, 'অল্পাংশ' সে কারণকে স্বীকার করে না। সাধারণ লোকেরা শিল্পের নিন্দা-প্রশংসা করে ভাবপ্রবণতার দিক হইতে; কিন্তু, যাঁহারা সমঝদার, তাঁহারা সত্যের নিকষে কষিয়া শিল্পকে পরখ করিয়া দেখেন। যে-সব কলাবিদের কার্য্য একসঙ্গে ভাবপ্রবণ 'অধিকাংশ' এবং সত্যসন্ধানী 'অল্পাংশ'কে আকর্ষণ করিতে পারে, সেই সকল শিল্পী



চন্দ্রালোকে (প্রাচীন চিত্র)

সাধারণ-অসাধারণ সব সমাজেই কল্‌কে পাইয়া থাকেন। যেমন, র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তি। স্নেহময়ী জননীর কোলে তাঁহার প্রাণপুতলী সন্তানের খেলা—ছবির এই বিষয়টি সর্ব্ব-সাধারণকে যে খুব সহজেই অভিভূত করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু এ ছবিতে র‍্যাফেলের যে হাতের কায়দা, তুলির টান, রেখা-রঙের লীলা আছে এবং সর্ব্বোপরি ইহার মধ্যে শিল্পীর যে সূক্ষ্মদৃষ্টি, সত্যানুভূতি ও ভাবের প্রেরণা আছে, তাহা সাধারণের চোখ এড়াইয়া কেবল সমঝদারের চোখেই ধরা পড়ে—এবং সমঝদারের কাছে মাতৃমূর্ত্তির যে এত আদর তাহার আসল কারণ হইতেছে র‍্যাফেলের ঐ কলাকুশলতা এবং ধ্রুবদর্শন। "চন্দ্রালোকে" ও "কৃষ্ণ" নামে আমরা দুখানি ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি এখানে দিলাম, এ-দুখানিও দু-দলের দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে—কেননা, এ



নট কৃষ্ণ (প্রাচীন চিত্র)

ছবি-দুখানির বিষয়ও যেমন জনপ্রিয়, অঙ্কন-পটুতাও তেমনি চমৎকার।

* *
*

বিষয় ধরিয়া শিল্প-বিচার করে বলিয়াই জনসাধারণ আসল-নকল চিনিতে পারে না। শিল্পজগতে এমন কয়েকখানি ছবি আছে, সমঝদারেরা যে-গুলিকে র‍্যাফেলের "মাতৃ-মূর্ত্তি"র চেয়েও ভালো বলিয়া জানেন। কিন্তু সে-সব ছবির বিষয় সাধারণের চোখে চমক লাগাইতে পারে না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে সকলের পরিচয়লাভের সুযোগও ঘটে না। Giorgioneএর Castelfranco Madonna নামে ছবিখানি শিল্পীসমাজে অত্যন্ত বিখ্যাত। কলাজগতে এমন ছবি দুর্লভ, সমালোচকরা যাহাকে নিখুঁত বলিয়া মানিয়া নেন, Giorgioneএর অঙ্কিত এই ম্যাডোনা-মূর্ত্তিটি উক্ত দুর্লভ গুণের অধিকারী। এই ছবিখানির অঙ্কনকাল পাঁচ শতাব্দীরও আগে —কিন্তু এতকালের মধ্যে খুব কম লোকের কাছেই ইহার আদর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব কম লোকের মুখেই ইহার



মাতৃমূর্ত্তি
(Castelfranco Madonna.)

নাম শোনা যাইবে। সমঝদার ইহার গুণ যদি না-বুঝিতেন, এ ছবিখানি তাহাহইলে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যাইত।

সমঝদারেরা সকলদিক ভাবিয়া-বুঝিয়া দোষগুণ বিচার করিয়া একবার যাহাকে ভালো বলিয়া গ্রহণ করেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গেলেও আর তাহাকে ত্যাগ করেন না। কিন্তু জনসাধারণকে এমন-ধারা বিশ্বাস করা চলে না; তাহাদের নিন্দা প্রশংসা বিচারবুদ্ধি-সাপেক্ষ নয় বলিয়া, তাহারা আজ যাহাকে মাথায় চড়ায়, কাল তাহাকে পথে বসায়! ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। একসময়ে Bernini, Canova ও Tharwaldsen সর্ব্ব-সাধারণের প্রিয় ছিলেন; আর-একসময়ে Carlo Dolci, Guido Reni ও Domenichino প্রভৃতি শিল্পীকে সকলেই খুব পছন্দ করিত; কিন্তু জনসাধারণের মন লক্ষ্মীর মত চঞ্চল বলিয়া ঐ-সকল শিল্পীর জনপ্রিয়তা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এইজন্য, যতই আপাতমধুর হউক, জনসাধারণের প্রশংসাকে কোন শিল্পীই যেন সত্য বলিয়া গ্রহণ না করেন। সাধারণের মন রাখিতে গিয়া, এদেশে অত বই লিখিয়াও রাজকৃষ্ণ রায় সাহিত্য-সমাজে নিজের জন্য একটুখানি জায়গা করিয়া লইতেও পারিলেন না!

সাধারণের শিল্পবিচারে আর-একটি মস্ত খুঁৎ আছে। তাহারা আসল সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে না। তাহারা ভাবে, দেখিতে যাহা সুন্দর, তাহার মধ্যেই বুঝি সৌন্দর্য্য পাওয়া যায়! কিন্তু তা ত নয়! Beauty হচ্ছে এক জিনিষ আর Prettiness হচ্ছে আর এক জিনিষ—রূপা ও কাঁসা যেমন আলাদা জিনিষ,—এ দুটিও তেমনি!

সৌন্দর্য্য আছে কেবল সত্যের মধ্যে; তাইত কবি বলিয়াছেন 'সৌন্দর্য্য হচ্ছে সত্য, সত্য হচ্ছে সৌন্দর্য্য'! যে কলাবিদ সত্যকে পাইয়াছেন, কেবল তাঁহার সৃষ্টির মধ্যেই সৌন্দর্য্য তাহার সিংহাসন পাতিয়াছে।

ফ্লোরেন্সের প্রথম যে চিত্রকর অমরতার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার নাম Giotto, —১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কি রেখাপাতে আর কি বর্ণপাতে,—Giottoর চেয়ে বড় অনেক শিল্পী জগতে নাম কিনিয়াছেন। কিন্তু অনেকদিকে অসম্পূর্ণ হইলেও, Giotto সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; তাই তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীতে সৌন্দর্য্যের যে স্বরূপ-দর্শন হয়, রেখা ও রঙ্গে ওস্তাদ অনেক নামজাদা আঁকিয়ের ছবিতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। Bouguereau একজন একেলে পটুয়া; দেখিতে সুন্দর এবং রেখারঙ্গে নিখুঁত হয় বলিয়া বাজারে তাঁহার আঁকা ছবিগুলির নাম-ডাক যথেষ্ট। তাঁহার সুনামের আর-একটি কারণ, জনসাধারণের ভাবপ্রবণতাকে জাগাইয়া তুলিতে তিনি একজন মস্ত-ওস্তাদ। তাঁহার অঙ্কিত নানা চিত্রের মধ্যে The Virgin as Consoler নামে শোকের ছবিখানি অনেকের কাছেই পরিচিত এবং কিছুদিন আগে "সাহিত্য" পত্রে এই পটের একখানি প্রতিলিপিও বাহির হইয়া গিয়াছে। সুন্দর-সুন্দর মূর্ত্তি আঁকিয়া রঙ্গের বাহার দেখাইয়া তিনি বোকা লোকের চোখে চটক লাগাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু এত-করিয়াও সত্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার

হয় নাই; তাই তাঁহার চিত্রাবলীতে চোখভুলানো রূপ থাকিলেও মনভুলানো সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রেখাবর্ণ-পাত-কৌশলে Giotto তাঁহার চেয়ে ঢের খাটো; তথাপি সমালোচকরা Bouguereau-এর উপরে Giottoর আসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? কেননা, Bouguereau যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান নাই, Giottoর ছবিতে সেই সৌন্দর্য্যের শিখা জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

* *
*

অনুশীলন না করিলে শিল্পবোধ হওয়া অসম্ভব। সাধারণের মধ্যে সাধারণত এই অনুশীলনের একান্ত অভাব দেখা যায়; তাই তাহাদের রুচির উপর নির্ভর করা চলে না। কেন চলেনা, একটি দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ধূ-ধূ মাঠ—নির্জ্জন, স্তব্ধ, উদাস। তার মাঝখানে কোন্‌কালের একটি পুরানো বাড়ী ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার ছাদ গিয়াছে, দরজা-জানলা খসিয়াছে, শ্রী-ছাঁদ সমস্ত ঘুচিয়াছে, থাকিবার মধ্যে আছে সুধু এখানে-ওখানে দু-একটা বুনো-গাছে-ভরা শেওলা-মাখা নড়্‌বোড়ে ফাট-ধরা প্রাচীর!

খানিক-কালো খানিক-আলো লইয়া প্রথম-সন্ধ্যা যখন দিবস-রজনীর মিলন-রেখায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখন এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে একটা রহস্যপূর্ণ ভাব জাগিয়া উঠে।

এমনসময় যদি কোন সাধারণ লোক এ-পথে আসিয়া পড়ে, তবে সে এ ভাঙ্গা বাড়ীটা দেখিয়াও একটিবার থমকিয়া দাঁড়াইবে না—বরং আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে আরো তাড়াতাড়ি সুদূরের লোকালয়ের উদ্দেশে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁহার চোখের মত চোখ আছে, যিনি কলাবিদ বা কলারসজ্ঞ, এখানে আসিয়া পড়িলে ঐ লোকটির মত তিনিও এমন একটি দৃশ্য দেখার সুযোগ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন না; এখানে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ চোখে, বিভোর প্রাণে তিনি দেখিবেন, এই স্তম্ভিত, গম্ভীর সন্ধ্যাআকাশের তলায়, এই বিজন, নিভৃত ও প্রান্তহীন প্রান্তরে, এই পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ ও নিস্তব্ধ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কেমন-একটা অদৃশ্য জীবনের আভাস ও বিষণ্ণ ভাবের ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছে! ঐ লতাগুল্মশৈবালে চিত্রিত, নতোন্নত ভগ্ন প্রাচীরগুলিও কি-এক মোহন সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব-সুন্দর, হাসি ও অশ্রুর মত আলো-ছায়ার চঞ্চল লীলায় বিচিত্র! সময় বিশেষে জড়ের মধ্যেও প্রাণের যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, রসজ্ঞের হৃদয় এখানে আসিয়া তাহা একান্তভাবে অনুভব করিবে।

'অধিকাংশ' ও 'অল্পাংশে'র মধ্যে এই জায়গাতেই তফাৎ; প্রতিদিন আমরা যে-সকল দৃশ্য দেখি, যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে আসি, জনসাধারণ সেগুলিকে তলাইয়া দেখিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করে না; কিন্তু রসিকরা সেই সকল নিত্যদৃষ্ট দৃশ্য ও বস্তুর মধ্য হইতেই নূতন ভাব, নূতন রূপ ও নূতন রসের সন্ধান পাইয়া থাকেন।

রসিকের এই-যে গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রসগ্রাহিতা, সাধারণের তাহা নাই। তাই দলে ভারি হইলেও 'অধিকাংশ' কখনো 'অল্পাংশ'কে ঠেলিয়া যথার্থ উন্নত সমাজে ঢুকিতে পারে না; 'অধিকাংশ'র মত্‌ই চিরকাল সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে। এবং এইজন্যই আর্টের মধ্যে জনপ্রিয়তার (Popularity) কোন মূল্য নাই। এমন-কি, যে আর্টিষ্টের সৃষ্টি বেশী-লোকের পছন্দ-সৈ, তিনি যে খুব উঁচুদরের আর্টিষ্ট নন, কিছুমাত্র চিন্তা না-করিয়া অনেকসময়ে সে কথাটাও ফস্‌-করিয়া বলিয়া দেওয়া যায়।

শিল্পরসজ্ঞগণ তাই মনে করেন, আর্টিষ্টের পক্ষে জনপ্রিয়তার মত মারাত্মক শত্রু আর-কিছু নাই। আর্টিষ্টের হৃদয়ে যখন সর্ব্বজনপ্রিয় হইবার বাসনা জাগে, তাঁহার আর্ট তখন দেখিতে 'আহামরি' সুন্দর হইলেও হইতে পারে—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য মাকাল ফলের মত ব্যর্থ!

এমনি সকলদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আর্ট হইতে যাঁহারা আভিজাত্য উঠাইয়া দিতে চান, তাঁহাদের বুদ্ধির গোড়ায় কিঞ্চিৎ গলদ আছে! কারণ, আর্টে এখনো সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হয় নাই। য়ুরোপে জনসাধারণের রুচি, শিক্ষা ও রসবোধ এখানকার চেয়ে ঢের বেশী ধারাল, উন্নত ও প্রশস্ত; তবুও সেখানকার কবি, শিল্পী আর সমালোচকরা জনসাধারণের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অরসিকতার জন্য প্রকাশ্যে 'হা-হতোস্মি' করিয়া থাকেন; সুতরাং আমাদের দেশে—যেখানে শিক্ষা এখনো শৈশবে, পাঠকের মন এখনো কাঁচা—সেখানে আর্টে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা তুলিতে যাওয়াই মস্ত-একটা হাসির ব্যাপার। এদেশে আর্টকে যদি সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হয়, তবে বাঙ্গলা মাসিকের গল্পের ও ডিটেকটিভ উপন্যাসের অপরূপ ছবি ছাড়া আর কোন-রকম চিত্র আঁকা চলিতেই পারে না; সাহিত্যেও তাহাহইলে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিবর্ত্তে চলিবে বটতলার জনপ্রিয় সাহিত্য (যার ধুয়া হইতেছে—"একটি পয়সা খরচ করে, অবাক কাণ্ড দেখুন পড়ে") এবং সঙ্গীতে শুনিব বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর উচ্চাঙ্গের আলাপের পরিবর্ত্তে থিয়েটারের নাকী-সুরের অপূর্ব্ব বিলাপ! সাধারণ-তন্ত্রের হাঁড়িকাঠে আর্টকে পূরিয়া ফেলিলে বেচারীর মাথাটি বাঁচানো দায় হইয়া উঠিবে—আর্টকে যাঁহারা রক্ষা করিতে চান, তাঁহারা যেন সাধারণ-তন্ত্রের কথা ভুলিয়াও মুখে না-আনেন; কেননা, সুধু বাঙ্গলাদেশে কেন—পৃথিবীতেও এখনো সে শুভদিন আসিতে অনেক—অনেক দেরি আছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

গান

একদা তুমি, প্রিয়ে,
আমারি এ
তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে
সে কথা যে
গেছ ভুলে!
সেথা যে বহে নদী
নিরবধি
সে ভোলে নি,
তারি যে স্রোতে আঁকা
বাঁকা বাঁকা
তব বেণী;
তোমারি পদরেখা
আছে লেখা
তাঁরি কূলে
আজি কি সবি ফাঁকি?
সে কথা কি
গেছ ভুলে?

গেঁথেচ যে রাগিণী
একাকিনী
দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে
কেঁপে কেঁপে
তৃণে তৃণে।
গাঁথিতে যে আঁচলে
ছায়াতলে
ফুল মালা
তাহারি পরশন-
হরষণ
সুধা ঢালা;
ফাগুন আজো ঘেরে
খুঁজে ফেরে
চাঁপাফুলে
আজি কি সবি ফাঁকি?
সে কথা কি
গেছ ভুলে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসকাবারি

স্বামী-স্ত্রী

ভাদ্রের "সবুজপত্রে" শ্রীযুক্ত বরদাচরণ গুপ্তের "স্বামী-স্ত্রী" প্রবন্ধে গোটাকতক স্পষ্ট কথা কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলা হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। যে-সব কথা আমরা অনেকেই মনে মনে আলোচনা করি কিম্বা দু-পাঁচজন সঙ্গীর সঙ্গতে প্রকাশ করিয়া ফেলি, অথচ সমাজের কাছে মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস পাই না, বরদাবাবু আমাদের মনের সঙ্কোচের যবনিকার আড়াল হইতে সেই কথাগুলিকেই টানিয়া আনিয়া, বাংলার পাঠক-সভায় হাজির করিয়াছেন।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

লেখক বলেন যে, মেয়েদের শৈশব হইতে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তাদের "গোটা মনুষ্যত্বই বিকৃত এবং সংহত হয়ে স্ত্রীত্বে পরিণত" হয়। তাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার একটিমাত্র লক্ষ্য এই যে, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে পতিব্রতা গৃহধর্ম্মচারিণী স্ত্রী হইতে হইবে—তাদের উপর এর চেয়ে সমাজের কোন বড় দাবী নাই। তার পর দাম্পত্য সম্বন্ধে "নৈতিক দায়িত্ব" নিঃশেষে স্ত্রীর উপর চাপানো হয় বলিয়া একপক্ষে যেমন ফরমাসী সীতাসাবিত্রীর মত স্ত্রী তৈরি করার চেষ্টা দেখা যায়, অন্যপক্ষে তেম্নি সত্যবান বা নলরাজার মত স্বামী তৈরি করার চেষ্টা মোটেই দেখা যায় না। অথচ স্বামীর মনুষ্যত্ব না থাকিলে স্ত্রীর পাতিব্রত্য জিনিসটা যে স্বাভাবিক হয় না, এ-কথাটা আমাদের সমাজ ভুলিয়া বসিয়া আছে।

বঙ্কিম বাবুর "বিষবৃক্ষের" নায়ক নগেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী সূর্য্যমুখী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে সূর্য্যমুখী তাঁর "কেবল স্ত্রী"মাত্র ছিলেননা, তিনি "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী"—এ সবই ছিলেন। কিন্তু লেখক বলেন যে, সূর্য্যমুখীর মধ্যে "কেবল স্ত্রী"র প্রাধান্য যদি না থাকিত, তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ যদি অমন বিচিত্র হইবার সুযোগ পাইত, "তাহলে নগেন্দ্রনাথের সংসার-প্রাঙ্গনের বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হবার অবসর পেতোনা।" তিনি মনে করেন যে, নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলালের গৃহিণীরা যদি "উগ্রচণ্ডা ক্ষেমঙ্করী" গোচের হইতেন, তবে গোলমাল কিছুই হইত না। অর্থাৎ আমাদের দেশের স্ত্রীদের স্বামী হইতে "স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে নাই" বলিয়াই "স্বামীকে ভালো করবার স্পর্দ্ধা তাঁরা মনেও আনেন না"। তিনি লিখিয়াছেন, "গিরীশ বাবুর সামাজিক নাটক "গৃহলক্ষ্মীতে" এমনও দেখেছি পতি-প্রাণা সতী স্বামীর জন্যে নিজগৃহে বারবণিতা আনবার অনুরোধ কর্চ্ছেন—স্বামীর কাছে! আবার ধর্ম্মমূলক বিল্বমঙ্গলে অতিথিপরায়ণ "বণিক" নিজস্ত্রীকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অতিথির তুষ্টিসাধনে অনুরোধ করেছেন—স্বাধ্বী স্বামীর কথা ঠেল্‌তে না পেরে তাতেও সম্মত!"

সুতরাং লেখকের প্রধান অভিযোগ এই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীর মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না এবং তার আত্ম-বোধ জাগ্রত হয় না বলিয়াই "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি, একটা নিবিড় মিলন এবং পরিপূর্ণ সমবেদনা প্রায়ই ঘটে ওঠেনা। আমাদের চোখে যে মিলন খুব প্রগাঢ় ব'লে বোধ হয়, সেখানেও বুদ্ধিবৈষম্যের একটা চোরাফাঁক লুকানো থাকে!...বঙ্কিমবাবু... নগেন্দ্রনাথ আর গোবিন্দলালের মনের এই সব গোঁজাগুঁজি জোড়াতালি বাইরে এনে সমাজের সাম্‌নে ধরেছেন। রবিবাবুও "ঘরে-বাইরে"তে ঠিক্ তাই করেছেন বিমলা সম্বন্ধে।"

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ার দরুণ এবং অন্যান্য নানা কারণে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বোধটা সুপ্ত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কতগুলো অভ্যস্ত সংস্কারের দ্বারাই এদেশের মেয়েরা সকল বিষয়েই চালিত ও

নিয়ন্ত্রিত হয়—এটা যে প্রায় বারোআনা মেয়েদের জীবন সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ সত্য, তাহা বোধহয় নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের আসল সমস্যাটা এইখানে যে,—যদি উভয়ের ব্যক্তিত্বটাই বেশ পরিস্ফুট না হয়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রেমের স্বাধীন আদান প্রদান হইতেই পারে না। স্বামীর মধ্যে ব্যক্তিত্বটা স্ফুট আর স্ত্রীর মধ্যে সে পদার্থটা একবারেই সুপ্ত হইলে, সে স্ত্রীকে কোন স্বামীই সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করিতে পারে না এবং শ্রদ্ধা না থাকিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খাঁটি প্রেমও জন্মে না। কাজেই স্ত্রী তখন স্বামীর ভয়ে এবং শাসনে চলে—সংসারের ব্যাপারে তার বিশেষ কোন কর্ত্তৃত্বই থাকে না। যত দিন পর্য্যন্ত তার রূপযৌবন থাকে, ততদিন সে স্বামীর অনুগ্রহভাগিনী হয়, রূপ না থাকিলে বা যৌবন গত হইলে স্বামীর সংসারে, স্বামীর চোখে, কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন স্ত্রীরই যথেষ্ট মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম থাকে বলিয়া মনে করিনা।

তবে ছেলে মেয়ের "মা" হিসাবে একটা বড় পদ স্ত্রীলোকের থাকে সত্য—সেই একটা দিক্ হইতে স্বামীর উপর তার জোরও থাকে, দখলও থাকে। স্ত্রী হিসাবে স্বামীর সঙ্গে যে সব স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ হয় না, মা হিসাবে তাদের স্বামীর সঙ্গে একরকমের একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। প্রধানতঃ এই কারণেই আমাদের পরিবারতন্ত্রে স্ত্রীর চেয়ে মায়ের আসন বড়। এই জন্যই যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী সন্তানবতী ও বয়স্কা না হয়, ততদিন স্বামীর সঙ্গে তার সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে দেখাশোনায় পর্য্যন্ত লজ্জার কথা—অন্যলোকের সামনে স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হইলে দুজনেই এমনিভাব ধারণ করে যেন কেউই কাউকে চেনেনা! স্ত্রী যে গৃহের দীপ্তি, সে মনুর হিসাবে কেবল "প্রজনার্থং" কিনা। সেইজন্য রাত্রির নির্জ্জনতা ভিন্ন, দিনের আলোয় অন্য নানা বিষয়ে, নানা ভাবে, নানা রসে, নানা সামাজিক সূত্রে, স্ত্রীর পক্ষে পতিসঙ্গটা সনাতন দেশাচারের ব্যবস্থা সযত্নে খেদাইয়া রাখিয়াছিল। এ কালের হাওয়ায় সেই সনাতন ব্যবস্থার সবই ওলোটপালোট্ হইয়া যাইতেছে বটে কিন্তু তার সংস্কারের জড় এখনো মরে নাই।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে মনের সম্বন্ধ, আত্মার সম্বন্ধ এবং দুজনের স্বাধীন আদান-প্রদানের যোগেই যে তাদের সংসার-রচনা সুন্দর ও সফল হইয়া উঠিতে পারে, এ বোধ যেমন খুব অল্প স্বামীরই আছে, তেম্নি খুব অল্প স্ত্রীরও আছে। এ বোধ স্বামীদের মধ্যে জাগ্রত করিবার একমাত্র উপায় স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটানো। এবং স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর উপায় ছেলেবেলা হইতে তাদের মনকে প্রশস্ত শিক্ষা ও সামাজিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে মানুষ করিয়া তোলা এবং পরিণত বয়সে বিবাহ দিবার সময়ে কিছু পরিমাণে তাদের স্বাধীন নির্ব্বাচনের সুযোগ দেওয়া। ইহা না করিলে, স্ত্রীলোকের status সমাজে চিরদিনই নগণ্য থাকিবে এবং যে সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা হীন, সে সমাজ কোন দিনই উন্নতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারিবেনা, এটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মতই বলা যাইতে পারে।

সুতরাং লেখক যে বলিয়াছেন আমাদের সামাজিক অনুশাসন "একচোখো" বলিয়া তাহা নৈতিক অপরাধের জন্য স্ত্রীকে দণ্ড দেয় আর পুরুষকে রেহাই দেয়—সেদিক্ হইতে অভিযোগের কোন জোর নাই। যে স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব নাই, সে স্ত্রী অন্যায় শাসনের দণ্ডটাকে যে আপনিই মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। যে জাতটার মধ্যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ফোটে নাই, যে জাত কোনো দিক্ হইতেই বিশ্বমানবকে দান করিবার মত কোনো সম্পদ্ অর্জ্জন করিল না, সে যে দাসত্বের শৃঙ্খল আপনিই আপনার গলায় পরিল! পৃথিবীতে যে স্বভাবতই দাস, তাকে প্রবলের শাসন ও শোষণ হইতে রক্ষা করিবে কে?

অথচ এ কথাও একেবারেই বলা চলে না যে, স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব জিনিসটা পুরো-পুরি ফুটিলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা "সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি বা নিবিড় মিলন" দেখা দিবেই! স্বামী যতক্ষণ প্রভু এবং স্ত্রী অধীনা, ততক্ষণ সংসারে যে একটা তামসিক শান্তির চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মধ্যে ব্যক্তিত্ব যেখানে স্ফুট, সেখানে সব ক্ষেত্রে তেমন-তর শান্তির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত নাও হইতে পারে। ইউরোপে স্বামী-স্ত্রী যেখানে পরস্পরকে স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন করিয়া লয়, সেখানে হয়ত বারোআনা ক্ষেত্রেই তাদের সম্বন্ধ "নিবিড় মিলনের" সম্বন্ধ হয় না। যে অনুরাগে পরস্পরকে এক সময়ে বাঁধিয়াছিল, কিছুকাল পরে হয়ত দেখা যায় যে, সে অনুরাগের ভিত্তিটা যথেষ্ট দৃঢ় নয়, যথেষ্ট গভীরও নয়। পরস্পরের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল ঢের বেশি।

সুতরাং বরদা বাবুর অভিপ্রায় যদি এই হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সকল দিক্ হইতেই স্বাধীন আদান প্রদানের সম্বন্ধ হইলে এবং স্ত্রী কেবল "স্ত্রী" না হইয়া বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্র-নাথের ভাষায়, বিচিত্র সম্বন্ধের রসে স্বামীর সহিত তার সম্বন্ধটি রসাইয়া লইলেই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনটা নিবিড় হইতে পারে—তবে আমি বলিব যে, এ সব সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর মিলন স্থায়ী না হইতেও পারে। সূর্য্যমুখী বা ভ্রমর "কেবল স্ত্রী" ছিল বলিয়াই যে তাদের স্বামীর সঙ্গে তাদের মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই, তারা "উগ্রচণ্ডা ক্ষেমঙ্করী" হইলেই যে কোন 'গোলমাল' উঠিত না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কোন উগ্রচণ্ডা বা ক্ষেমঙ্করীর সাধ্য নাই যে, স্বামীর মন বিগড়াইলে তাকে ভালো পথে টানিয়া আনে।

মানুষের sex-affinity বা মিথুন-সম্বন্ধের রহস্য এত বিচিত্র যে, পরস্পরকে ভালবাসিয়া নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিবার সুদীর্ঘ কাল পরেও হঠাৎ এক সময়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আবিষ্কার করে যে, তারা পরস্পরের যথার্থ মিথুন নয়—নিয়ত কাছে বাস করিয়াও তারা পরস্পর হইতে অত্যন্ত দূরে। গ্যয়টে তাঁর "Elective Affinities" উপন্যাসে মিথুন-সম্বন্ধের এই রহস্যকেই উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। এমন কি যে প্রেম যথার্থ প্রেম, তাকেও একবার ভাঙচুরের ভিতর দিয়া হারাইয়া পাইলেই তবেই তাকে নিত্য

করিয়া পাওয়া যায়—বঙ্কিমবাবু তাঁর 'বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে' পুরুষের পক্ষে ত ইহাই দেখাইয়াছেন—কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে দেখান্ নাই। রবিবাবু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে পুরুষ ও স্ত্রী দুজনের পক্ষেই তাহা দেখাইয়া-ছেন। স্ত্রীর দিক্ হইতে এটা দেখানো এ দেশে নূতন বলিয়াই আমাদের সমাজে ঐ উপন্যাসের বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গ্যয়টে 'এফিনিটির' ইতি-হাসকে যতদূর পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততদূর পর্য্যন্ত ইঁহারা কেহই যান্ নাই। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে পর-স্পরের "এফিনিটি"কে পাইল না এবং অবশেষে স্বামী অন্য নারীতে এবং স্ত্রী অন্য পুরুষে সেই "এফিনিটি" আবিষ্কার করিল,—গ্যয়টে এফিনিটির ইতিহাসকে এতদূর পর্য্যন্ত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক এ সকল বিষয়ে সংস্কারমুক্ত হইয়া আলোচনা করিতে গেলে, এই সমস্ত সমস্যাই সমাজে ও সাহিত্যে ক্রমশ দেখা দিতে পারে, এ কথাটা বলিয়া রাখা ভাল।

সুতরাং স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হইলে সমাজে মোটের উপর শান্তির চেয়ে অশান্তির সম্ভাবনা বেশি। বস্তুত সেই অশান্তির সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াই ত মানুষ স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লয়। কেননা, অশান্তিকে ঘুচাইবার একমাত্র প্রশস্ত রাস্তা, মানুষকে অন্ধ তামসিক সংস্কারের গারদে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে যে নানা গোলমেলে সমস্যা আছে, আমাদের বাংলা সাহিত্যে যে ক্রমশ ক্রমশ সে সকল গোলমালের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাতেই প্রমাণ যে আমাদের দেশে মেয়েদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা অল্পে অল্পে ধোঁয়াইয়া উঠিতেছে। যাঁরা ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্মৃতির ও আচারের কুলোর বাতাস দিয়া এ ধোঁয়াটাকে নিবাইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁরা ধোঁয়াটাকে ক্রমশ আগুনে পরিণত করিয়া তুলিতেই সাহায্য করিবেন। 'গৃহস্থ', 'উপাসনা' প্রভৃতি কতগুলি কাগজে সেই চেষ্টা সুরু হইয়াছে। ইহাতে আমরা ত খুসিই আছি, কারণ জানি যে ব্যক্তিত্ব একবার জ্বলিবার উপক্রম করিলে তাকে কেউই নিবাইতে পারে না। নহিলে পোপেদের শাসনে ইউ-রোপের স্বাধীন চিন্তাকে আগুনের মুখে ধরিয়া পোড়াইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সেই পাবক হইতেই পূত হইয়া নূতন বিক্রমে জ্বলিয়া উঠিল কেন? অতএব, মাভৈঃ।

বঙ্গে আত্মহত্যা

আশ্বিনের "প্রবাসীতে" সম্পাদক মহাশয় তাঁর "বিবিধ প্রসঙ্গে" বঙ্গে আত্মহত্যা সম্বন্ধে বাংলার পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"বাংলা দেশের ১৯১৬ সালের যে স্বাস্থ্য-রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, ঐ বৎসর ১৩০৩ জন পুরুষ এবং ২০০৭ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাংলা দেশে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কম; প্রতি এক হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন করিয়া স্ত্রীলোক বঙ্গে আছে।

আত্মঘাতিনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিন্তু আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যার দেড় গুণেরও অধিক।" তিনি দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতা সহরেও স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার হার পুরুষদের চারি গুণেরও বেশি। বাংলার আত্মহত্যার অনুপাতের সঙ্গে বিহার-উড়িষ্যা ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের আত্মহত্যার অনুপাতের তুলনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলা দেশেই "আত্মহত্যার প্রবৃত্তি প্রবলতম", যদিচ অন্যান্য প্রদেশেও পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোক বেশি আত্মহত্যা করিয়া থাকে। তার পর ঐ তিন প্রদেশের মধ্যেই বাঙালীর মেয়েদের ভিতরেই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি সব চেয়ে বেশি দেখা যায়।

অথচ পাশ্চাত্য দেশের একজন বিশেষজ্ঞ-ব্যক্তির উক্তি উদ্ধার করিয়া সম্পাদক দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্যদেশে পুরুষেরা স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙালী মেয়েদের দুঃখ সব চেয়ে বেশি এবং তাদের শরীর ও মনের বল কম বলিয়া বাংলাদেশে আত্মহত্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাঙালীর মেয়েরা বেশি গল্প পড়ে বলিয়া বেশি আত্মহত্যা করে, এ সম্ভাবনা-টাকে সম্পাদক একেবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি গল্প পড়ে, কৈ তারা তো বেশি আত্মহত্যা করে না? তার পর লেখাপড়াজানা মেয়েরাই যে আত্মহত্যা করে তারও কোন প্রমাণ নাই। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় উপন্যাস পড়ে কিন্তু তারা যে এত আত্মহত্যা করে তা দেখা যায় না। সুতরাং বেশি গল্প পড়াটা আত্মহত্যার কারণ নয়।

গল্প পড়াটা আত্মহত্যার আসল কারণ এবং মুখ্য কারণ না হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাহা যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে একথা অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের যে স্বাধীন সংস্কারমুক্ত, উদার ও উচ্চ আদর্শটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সমাজের মধ্যে ত তার স্থান হয় নাই। সেই কারণে এই নূতন সাহিত্যের অরুণোদয়ে স্ত্রীলোকের মনের চারিদিক্ হইতে যখন সংস্কারের কুয়াসাটা কাটিয়া যায়, তার মন যখন জাগে, তখন তার বাইরের সংসারের সমস্ত কৃত্রিম বিধি-নিষেধের তর্জ্জনী তাকে এক পাও অগ্রসর হইতে দেয় না। তার জীবনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রের চারিদিকে চিরাগত সংস্কারের কালো পর্দ্দাগুলি নীরন্ধ্রভাবে টানিয়া দেওয়া হয়। এমনি করিয়া সে সাহিত্যে যে-জীবনটার কল্পরূপ দেখিয়া মনে মনে তাকে বরণ করিয়া লয়, সমাজের জীবনের বাস্তবরূপের সঙ্গে তার বৈষম্যটা এতই ভয়ঙ্কর যে, তার ভিতরের সঙ্গে বাহিরের, তার আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, তার অনুভূতির সঙ্গে সংস্কারের একটা প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়া যায়। অথচ সে বিরোধের কোন কূলকিনারা পাওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেননা, পুরুষের সমস্যার সমাধান তার নিজের হাতে, কিন্তু মেয়েদের তো তা নয়। এই আত্মবিরোধের দোটানার মধ্যে পড়িয়া অনেক

য়ে নিপীড়িত হইয়া যে আত্মহত্যা করে, ার অনেকগুলি নিদর্শন আমি প্রত্যক্ষ াবেই পাইয়াছি।

আমাদের সমাজে মেয়েদের যত দুঃখ ত অপমান এমন আর কোন সভ্য দেশের কান সমাজে নাই। যে দেশের বারো ানা লোকের বিশ্বাস যে স্ত্রীলোক বাহিরে াসিলে বা পর পুরুষের সঙ্গে মিশিলেই তার সতীত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে বাধ্য, সমস্ত ত্রীজাতিকে সে দেশের লোক অপমানিত করিয়াছে, কেননা স্ত্রীজাতির প্রতি এত বড় অশ্রদ্ধার কথা কোন সভ্য সমাজের লোকের কল্পনায় উদয় হওয়াও অসম্ভব।

আমরা পুরুষ, আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চাই, সমাজে প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র চাই, রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকার চাই—কত বিচিত্র আরোজন এবং কত প্রতি-যোগিতার নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাতে তবে আমাদের ব্যক্তিত্বের একটু আধটু জীবন-স্পন্দন দেখা দিলেও দিতে পারে! কিন্তু আমাদের বিবেচনায় মেয়েদের ব্যক্তিত্ব পদার্থটা সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কেননা, বিধাতা তাকে মন ও আত্মা বিবর্জ্জিত করিয়াই গড়িয়াছেন।

প্রথমতঃ তার জন্মটাই পিতামাতার পক্ষে একটা "দায়"। তারপর তার দশ এগার বছর পার হইতে না হইতেই সে "অরক্ষণীয়া" হইয়া পড়ে; তখন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া বিবাহের বাজারে তার ভাগ্য পরীক্ষা হয়। তারপর একদিন মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত বেশ করিয়া পরখ করিয়া বা করাইয়া লইয়া রণবাদ্য বাজাইয়া যে বীর ব্যক্তিটি তাকে ঘরে লইয়া যান্ তিনিই তখন হইতে তার ভাগ্যবিধাতা। দৈবাৎ তাঁর সুনজরে যদি সে পড়িল ত ভাল, নহিলে—কপালে করাঘাত এবং ক্রন্দন! কিন্তু কুনজরেই পড়ুক আর সুনজরেই পড়ুক, সে অন্যের যে ক্রীড়নক সেই ক্রীড়নকই থাকিয়া যায়। তার চিত্তের ক্ষেত্র ঐ অন্তঃপুর—তার স্বামী পুত্র কন্যা, তার পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়, ইষ্টিকুটুম্ব প্রভৃতির মধ্যেই তার সমস্ত কর্ত্তব্য বিভক্ত।

পুরুষের পক্ষে চাই সমস্ত জগৎটা, আর মেয়েদের পক্ষে ঐ পারিবারিক ক্ষেত্রটুকুই পর্য্যাপ্ত। অথচ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নাকি বলে যে, পুরুষের সহধর্ম্মিণী স্ত্রী, সেই তার বড় পদ। পুরুষ আর স্ত্রীর মনের মধ্যে এতবড় একটা অসামঞ্জস্য যে সমাজ পাকা করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, সে সমাজে স্ত্রীলোকের নানাদিকেই দুঃখ ও অপমান অনিবার্য্য। মুক্তির অভাবই সব চেয়ে বড় দুঃখ, বন্ধনের বেদনাই সব চেয়ে বড় বেদনা।

আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহে যে সকল পুরুষকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইতেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অকর্ম্মণ্য জীবনের দুঃসহ বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশে স্ত্রীলোকেরা যে তাদের চেয়ে সহস্রগুণে বেশি নজরবন্দী, তারা যে চিরকালের মত interned, এবং তাদের বন্ধনের বেদনা যে কত নিবিড়, তাহা আমরা অনুভবমাত্র করিনা বলিয়াই

যখন তারা কেউ কেউ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আত্মহত্যা করে, তখন আমরা উপহাস করিয়া বলি,

"পাঁচকোটী লোকের মধ্যে পাঁচটী নারী যদি আত্মহত্যা করিল, অমনই চীৎকার আর চীৎকার কিন্তু প্রতিবৎসর শতশত নরনারী ধর্ম্ম ও নীতির পথ ছাড়িয়া জীবন্মৃত হইতেছে, সে দিকে কয় জনের লক্ষ্য আছে?"—(গৃহস্থ)

হাঁ, যে কারণে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়িতেছে, সেই কারণেই তাদের মধ্যে ভ্রষ্টা নারীর সংখ্যাও বাড়িবেই। দুই রোগের ভিন্ন লক্ষণ হইলেও তাদের মূল কারণ এক। মূল কারণ—ব্যক্তিত্ববিহীন, সংস্কারশৃঙ্খলিত, অবরুদ্ধ জীবনের গ্লানি ও দুঃখ এবং সেই হেতু শরীর ও মনের অবসাদ ও দুর্ব্বলতা। মেয়েদের শরীরের স্বাস্থ্য যেমন নানা রোগের দ্বারা জীর্ণ হইতেছে, তাদের মনের স্বাস্থ্যও না থাকায় সেখানে নৈতিক দুর্ব্বলতা সহজেই দেখা দিতে পারে। সে সম্বন্ধে statistics সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি-মাত্রকেই অনুরোধ করি। দমন নীতির দ্বারা কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, কোনদিনই ভাল ফল হয় নাই, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিবে।

বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি

আশ্বিনের "ভারতবর্ষে" 'শ্রী'স্বাক্ষরিত কোন লেখক, বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধঘটিত যে সকল সমস্যা বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে দেখা দিতেছে, তাহা "নূতন ধরণের", কিন্তু "অস্বাভাবিক নয়" বরং "শ্লাঘনীয়," 'ইহাই দেখাইবার চে করিয়াছেন। লেখক নিজে রবীন্দ্রনাথে "চোখের বালি"র ভক্ত হইলেও ঐ উপ ন্যাসটি সম্বন্ধে তাঁর পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজ একজন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ম উদ্ধার করিয়াছেন। সেই পণ্ডিত মহাশ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের চোখে বালির মনস্তত্ত্বে কিছুমাত্র ভুল নাই, কি "যা সম্ভব নয় সেটাকে রবিবাবু সত্য স্বাভাবিক করে তুলেছেন।" পণ্ডি মহাশয়ের বিশ্বাস যে চোখের বালি "দর্শন" ভারতবর্ষে চলিবে না, কেন "যৌবনের উষ্ণ শোণিতের আধিক্যে এ সব দর্শনের জন্ম হয়।" পণ্ডিত মহাশয়ে মতে "নৌকাডুবির মধ্যে হিন্দু দর্শনই এ পবিত্র কবিত্বের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে —"কোন ইউরোপিয়ান্ বা আমেরিকানে সাধ্য নয় অমন পবিত্র উপন্যাস লেখে" যে কমলা রমেশকে তার স্বামী বলি জানিত, যে মুহূর্ত্তে সে টের পাইল রমেশ তার স্বামী নয়, সে মুহূর্ত্তে তা প্রতি তার মনের কিছুমাত্র অনুরাগ রহি না, ইহাই পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্চর্য লাগিয়াছে এবং ইহাকেই তিনি 'হিন্দুদর্শন' নাম দিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

লেখক বলেন কবি তাঁর সৃজনের "im-pulse" হইতে উপন্যাস সৃষ্টি করিয়া থাকেন সুতরাং —

"সেখানে সমালোচনার মাপকাঠি বা দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিকতা আনিয়া বুঝাপড়ার কি প্রয়োজন?" সাহিত্যের আদর্শ হচ্চে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও প্রকাশ করা সেই হিসাবে চোখের বালি উপন্যাসকে মন্দ বলিবার ত কোন কারণ দেখিনা।...একজন হিন্দু ঘরে



হতাশের খেদ

"ও মিস্-এডুকেশন! তোমার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করলুম
তবু তুমি আমার হলেনা!"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

ধবা বাল্যেই স্বামী সম্পর্ক রহিত হইয়া যৌবনে াহার আচার-বিচার পূজা-পদ্ধতি দূরে রাখিয়া হজে একজন গুণবান্ পরপুরুষের প্রতি আসক্তা ইতে পারে, তাহাকে সত্যই প্রেম দিতে পারে, াহা যে একটা মস্ত পাপও নয়, এই হচ্চে বীন্দ্রনাথের symbol...যে ঘটনা, যে দৃশ্য খানে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা পশ্চিম দেশে ymbol হইতে পারিত না।...খাঁটি মনস্তত্ত্বের উপ-্যাস বাংলায় তিনিই প্রথমে লিখেছেন। বিশ্ব-াহিত্যের সহিত তাঁহার লেখার তুলনা করিলে বশ বুঝা যাইবে, এই ধরণের উপস্যাস লেখার হসাবে তাঁহার স্থান কত উচ্চে। ঘটনাচক্রে পড়িয়া াহার নায়ক নায়িকা প্রভৃতির মনোভাব কিরূপ রিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া তনি হটিয়া যান্না, অস্বাভাবিক একটা কিছু করিয়া বসেন না—পাঠকেরই মাঝে মাঝে হিসাব রাখিতে য়! এমনি সূক্ষ্ম পরিচয় তাঁর স্বভাবের সঙ্গে। চোখের বালি'কে প্রশংসা হয় না দেখে আমার াশ্চর্য্য বোধ হয়, অযথা নিন্দা করা দেখে আমার ঃখ হয়।"

অবশ্য লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন যে, গল্পউপন্যাসকে সামাজিক আদর্শের মাপ-কাঠির দ্বারা বিচার করা উচিত নয়—মানব-প্রকৃতির সত্য ও স্বাভাবিক সৃষ্টি হইলেই গল্পউপন্যাসকে আমরা আদর করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁর পণ্ডিত মহাশয় যখন উপন্যাসের পবিত্রতা ও হিন্দুদর্শনের দোহাই পাড়িয়াছেন, তখন তাঁকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিত যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে এই তথাকথিত পবিত্রতার আদর্শ ও হিন্দুদর্শনের ছড়াছড়িটা দেখিতে পাওয়া যায় কি? মহাভারতের মধ্যে যতগুলি বৈধ ও অবৈধ প্রণয়-কাহিনী আছে, সেগুলি তাঁর হিন্দুদর্শনের কোটায় নিশ্চয়ই পড়ে না, অথচ হিন্দুর পঞ্চম বেদ মহাভারতকে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য না বলিয়া কোন উপায় নাই। কালিদাসের "শকুন্তলা" গোপন প্রণয়েরই কাহিনী—তাতে পবিত্রতার ভড়ং নাই। এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহের ব্যবস্থাটা সেকালের "বোহিমিয়ান্" অথচ বৈধ ব্যবস্থাই ছিল। তারপর কৃষ্ণ-লীলার ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া যে সব রসসাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা না করিলে, তাদের মধ্যে হিন্দুদর্শন ও পবিত্রতা যে কি পরিমাণে বজায় থাকে, তাহা খোলসা করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় না।

সাহিত্য সর্ব্বত্রই সাহিত্য। হিন্দু সাহিত্যে বা হিন্দুত্বের সাহিত্যে যদি এমন কোন অদ্ভুত পদার্থ থাকে যার উদ্ভব হিন্দুর দেশ ছাড়া আর কোথাও ঘটিতে পারে না, তবে সেইখানেই সে পদার্থটা সত্য কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেননা, যাহা সত্য তাহা বিশ্বব্যাপী, তার সর্ব্বত্র প্রকাশ। মানুষের মন সাহিত্য-কলায় দর্শনে ও বিজ্ঞানে আপন জ্ঞানের আপন অনুভূতির পরম সত্যকে, কৌলিক, দৈশিক প্রভৃতি সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছে বলিয়াই সব দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কলা, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ও সারূপ্যই আমরা দেখিতে পাই। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার আভাস যদি পাওয়া যায়, তবে এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর কল্পনা করার আবশ্যকতা থাকে কি যে,

পুনর্জ্জন্ম মানিলে, ইহা বলা যায় যে, "আমাদেরি কোন পূর্ব্বপুরুষ মৃত্যুর পর ইউরোপে গিয়া ওয়ার্ডসোয়ার্থরূপে জন্ম গ্রহণ করেন"? * কিম্বা এই কথা বলিয়া আস্ফালন করার কোন মানে আছে কি যে, "ওয়ার্ডসোয়ার্থও হিন্দু"। হিন্দুত্বের আদর্শ বিশ্ব আদর্শ নয়, ইহা মনে করিলেই এই সকল হাস্যকর কথা বলা সম্ভব হয়। পৃথিবীতে সব জাতিই বিশ্বমানবের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ মাত্র, মূলে সবাই এক—এইটেই সত্য এবং এই সত্য আছে বলিয়াই এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভাবের আদান প্রদান চিরকাল চলিতেছে এবং চিরকালই চলিবে।

স্বামী

নারায়ণের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "স্বামী" গল্পটা বাংলার মাসিক সাহিত্যের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য গল্প।

গল্পের প্লট্‌টা এই ঃ—

সৌদামিনীর একবছর বয়সে তার বাপের মৃত্যু হইলে তার মা তাকে লইয়া নিজের ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লন্। তার মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক—বেশি বয়স পর্য্যন্ত ভাগ্নীকে বিবাহ না দিয়া তিনি তাকে লেখাপড়া শিখাইলেন। গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদারের ছেলে নরেন কলিকাতায় বি,এ, পড়িত; সে সৌদামিনীর মামার সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করিতে আসিত—মামা নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে নরেনের তর্কবিতর্ক বাধাইয়া দিতেন। ক্রমে পড়াশুনা খেলা ধূলা হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়া দুজনেরি মন পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু সামাজিক বাধা থাকায় তাদের মধ্যে বিবাহ যে হইতে পারিবে না তাহা দুজনেই জানিত। ইতিমধ্যে অন্য এক জায়গা হইতে সৌদামিনীর সম্বন্ধ আসিল। তার মামা প্রথমটাতে আপত্তি করিলেও পাত্র নিজে দেখিয়া আসিয়া হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া গেলেন। বিবাহ হইয়া গেল। সৌদামিনীর মন রহিল নরেনে আসক্ত—স্বামীর ঘরে গিয়া স্বামীর সহিত এক শয্যায় শুইতে তার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তার স্বামীও কোন বিষয়ে তাকে কোন দিন কিছুমাত্র বাধা দিলেন না। সৌদামিনীর সৎ শ্বাশুড়ী তার স্বামীর প্রতি কিছু যত্ন করিতেন না; তার মেজ দেওর এক পয়সাও সংসারে সাহায্য করিতেন না, অথচ বাড়ীশুদ্ধ লোকের সমস্ত যত্ন ও আদর তিনি একলাই পাইতেন। স্বামীর প্রতি সৌদামিনীর ভালবাসা না থাকিলেও তাঁর প্রতি বাড়ীর এই অবহেলায় তার গা জ্বলিত এবং ক্রমে তার শ্বাশুড়ির সঙ্গে ইহা লইয়া তার খিটিমিটি চলিতে লাগিল।

সৌদামিনীর স্বামী খাঁটি বৈষ্ণব। তিনি স্ত্রীর প্রতি যত্ন করিতেন, স্ত্রীর সেবাও করিতেন—অথচ তার কাছে কোন দাবী করিতেন না। কাহারো কাছে তাঁর কোন দাবী ছিলনা।

শ্বাশুড়ীর সঙ্গে বৌয়ের হাঙ্গামার খবর ক্রমে সৌদামিনার স্বামীর কাণেও উঠিল এবং সৌদামিনীর সঙ্গে সে সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিলে, সে তাহা মান মানে না হঠাৎ এইকথা তার মুখে শুনিয়া তাঁর স্বামী অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছুই বলিলেন না, শুধু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিতে তাকে নিষেধ করিলেন। তাঁর সেই প্রথম নিষেধ বাক্যে আহত হইয়া সৌদামিনী বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে চাহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন।

এমন সময় তাদের বাড়ীতে হঠাৎ নরেন আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেনের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সৌদামিনী

* গৃহস্থ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩২৪।

দেখা না করিলেও নরেন কোন সুযোগে তার সঙ্গে দেখা করিল। নরেন তার দাসী মুক্তকে হাত করিয়া লইয়াছিল। সে শুনিয়াছিল যে, সৌদামিনী এখনো তাকে ভোলে নাই, তাই সে তাকে পাইবার আশায় তার স্বামীর গৃহেই আসিয়াছিল।

তার শ্বাশুড়ী আড়ি পাতিয়া তাদের রহস্যালাপ কতকটা শুনিয়াছিলেন। তারপর বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ অন্ধকার হইল। শুধু তার স্বামীর মুখ পূর্ব্বে যেমন প্রসন্ন ছিল, পরেও তেমনিই প্রসন্ন রহিল।

নরেন মুক্ত'র হাত দিয়া পলায়নের প্রস্তাব করিয়া তাকে চিঠি পাঠাইল। সে চিঠি পড়িয়া সৌদামিনী সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে স্বামীর কাপড় ধোবাকে দিতে গিয়া তার নিজের নামের একটা চিঠি পড়িয়া সে জানিতে পারিল যে তার বাপের বাড়ী পুড়িয়া গেছে। স্বামী তাকে সেই চিঠি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা সে বিশ্বাস করিল না। তার মনে হইল পাছে অর্থ সাহায্য করিতে হয়, সেই ভয়ে তার স্বামী তার নিকট হইতে চিঠিখানি গোপন করিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হইয়া গেল।

সেই রাত্রে নরেনের সঙ্গে সৌদামিনী স্বামীর ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কলিকাতায় বৌবাজারের একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া নরেন তাকে সেইখানে রাখিল।

কিন্তু নরেনের সঙ্গে বাহির হইবার পর মুহূর্ত্তেই সে বুঝিল তার সমস্ত মন কখন্ তার অলক্ষিতে তার স্বামীর অনুরাগে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেন তার মুখে স্বামীপ্রীতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত মুষড়াইয়া গেল, সে তাকে বারবার বুঝাইল যে এখন সে ফিরিতে চাহিলেও তার স্বামী তাকে গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু সৌদামিনীর মনে অটল বিশ্বাস ছিল যে, তার স্বামী তাকে মার্জ্জনা করিবেনই।

মুক্ত'র কাছে সৌদামিনী শুনিল যে, তার স্বামী তার সমস্ত বৃত্তান্ত জানেন। তিনি সেই বাড়ীতেই দেখা দিলেন। তিনি শুধু বলিলেন, "তোমাকে কিছুই বল্‌তে হবে না। আমি জানি তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।"

গল্পটা এইজন্য ভাল লাগিল যে, এ গল্পে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনের কোথাও কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শেষ-কালটাতে মিলনটা যে সত্যসত্যই ঘটিয়া উঠিল, তাহা কোন সামাজিক সংস্কারের তাড়নায় ঘটে নাই। সমস্ত গল্পটার ভিতর-কার অভিব্যক্তি হইতেই গল্পের পরিণামটা অগ্নি সহজভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখক গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সৌদামিনীকে কোথাও কৃত্রিম সতী বানাইবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। সে নরেনকে ভালবাসিয়াছে, বিবাহের পরেও তাকে ভোলে নাই এবং স্বামীর ঘর ছাড়িয়া তার সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু তার স্বামী যে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও তাকে একদিনের জন্য শাসন করেন নাই কিম্বা তার উপর কোন প্রভুত্ব খাটাইবার চেষ্টা করেন নাই, তিনি যে ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে ভালবাসিয়া ও সেবা করিয়া তার ভালবাসা পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াই রহিয়াছেন, ইহাতেই তিনি ভিতরে ভিতরে তাঁর স্ত্রীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রী সে খবর টের পায় নাই। যেদিন সে ঝগড়া করিয়া স্বামীর ঘর ছাড়িয়া গেল, সেদিন নরেনের সঙ্গে তার জীবন কাটাইবার অভিপ্রায়ে সে ঘর ছাড়ে নাই—সে ঘর ত্যাগ করিয়া-ছিল অভিমানে। কিন্তু বাহির হইয়া পড়িতেই তার সমস্ত লজ্জা একেবারে অনাবৃত মূর্ত্তিতে তার সাম্‌নে আসিয়া দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে তার স্বামীর ধৈর্য্য-শীল প্রতীক্ষাপরায়ণ প্রেমে সে যে কতটা অভিভূত হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিল।

অবশ্য তার স্বামী তাকে গ্রহণ করিলেন; অথচ এমনটি যে এদেশে ঘটে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। সাহিত্যের মস্ত ভরসা এই যে, 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে'। সুতরাং ঔপন্যাসিকের কল্পনায় যাহা সত্য, তাহা বাস্তব সত্যের চেয়ে সত্যতর।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বন্ধ ঘরের ঘুল্‌ঘুলিতে

বন্ধ ঘরে দ্বন্দ্ব বুকে
আঁক্‌ড়ে শিলা একটি টেরে
শিক্‌লি পায়ে শিক্‌লি গলে
অন্ধকারে তলিয়ে কে রে!
হাতকড়ি সে মাংস কেটে
কাম্‌ড়ে এঁটে বস্‌ছে হাড়ে,
গুম্‌-ঘরেরি ঘুল্‌ঘুলিতে
চাম্‌চিকেতে পাখ্‌না নাড়ে।
ঘুল্‌ঘুলিতে এক্‌টু আলো
তাও যে ঢাকে কাল্‌-পেঁচাতে,
প্রাণ্‌-পরতে এক্‌টু আশা
ফুঁপিয়ে মরে—নেই চেঁচাতে।
ফুঁপিয়ে মরে গুম্‌রে একা
স্বপ্নে কভু ডুক্‌রে ওঠে
চট্‌কা-ভাঙা ঝাপ্‌সা চোখে
স্বপ্ন-ভীতি-চিহ্ন ফোটে।
মন্‌-মরা জীয়ন্তে-মরা
তুই মরিয়া কষ্টে যে রে,
আফ্‌শোষে কি শুষ্‌ছে হিয়া?—
চক্ষু জলে আস্‌ছে ভেরে?
মর্দ্দ ওরে! হ'স্‌নে ঢিলে
কান্না গিলে ফেল্‌তে শেখো,
পাঁজরা যদি পুড়্‌তে থাকে
পুড়িয়ে তাকে আঙ্‌রা রেখো।
আঙ্‌রা রেখো আঙ্‌রা রেখো
তপ্ত রাঙা দীপ্তি-ভরা,
নেই আশা?—কে বল্‌তে পারে?—
জাগ্‌বে শিখা হাস্‌বে ধরা।
ভর্সা রাখো চাঙ্গা থাকো
শক্ত সাজা তুচ্ছ করে'
জন্মেছ মানুষ হ'য়ে যে
চল্‌বে না তা' ভুল্‌লে পরে।
দণ্ড সে মান্‌দণ্ড কভু
নয় মানুষের,—ভুল কোরো না,
নয় কোতোয়াল সেই জহুরী
কষ্‌বে যে জন তপ্ত সোনা।
কু-গ্রহ কু-দৃষ্টি হানে,—
দুঃখ দেহে,—দুঃখ মনে,
তাই বলে' কে হস্ত জুড়ে
বস্‌বে গ্রহ-স্বস্ত্যয়নে!
নির্য্যাতনে নেই যাতনা
শাস্তি যবে নির্ব্বিচারে;
ভাগ্য ভগবান চেয়ে ভাই
হয় না বলী,—শঙ্কা কারে?
কাইমী না! রে দুঃখ-দশা;
কাইমী কিবা নয়কো পাকা—
বর্ত্তমানে গর্ত্ত খুঁজে
ব্যর্থ হ'য়ে বর্ত্তে' থাকা।
আজ্‌কে ওরে মৌন! তোরে
অন্ধকারে অন্ধ করে
চৌচাপটে চাপ্‌তে থাকে
বুকটাকে জগ্‌দল্‌ পাথরে।
আজ্‌কে যেন দুনিয়া ফাঁকা
নেইক কিছু নেইক কেহ
তৃষ্ণা-খরা শুষ্ক ধরা
নেইক প্রীতি নেইক স্নেহ।
আজ্‌কে যেন লুপ্ত হাসি
দৃষ্টি ঘোলা ক্লান্ত চোখে,
হয় তো সবি বদ্‌লে যাবে,—
রাত পোহালে,—দিব্যালোকে।
ইচ্ছা-মহাশক্তি সাথে
যুক্ত হবি একনিমেষে,
আত্মঘাতী জল্পনা সে
মূর্চ্ছা যাবে অট্ট হেসে।
প্রাণ দিয়ে যে চাইতে পারে
দৃপ্ত দৃঢ় চিত্তবেগে
প্রাণ পূরে নিশ্চয় পাবে সে,
ঝর্‌বে সুধা বজ্র-মেঘে।
অন্ধকারে আস্‌বে রবি—
তার কপালে—আস্‌বে ত্বরা;—
ঘুল্‌ঘুলিতে গলিয়ে দেবে
খাম্‌খানি খোশ্‌-খবর-ভরা।
জাগ্‌ছে হিয়া,...জাগ্‌বে আলো,...
জাগ্‌ছে ভাষা,...জাগ্‌ছে আশা,...
গুম্‌-ঘরেরি ঘুল্‌ঘুলিতে
বুল্‌বুলিতে বাঁধ্‌ছে বাসা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

খাদ্য। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু আই, এস, ও, এম, বি, এফ, সি এস প্রণীত: কলিকাতা, কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা পাড়িয়া বিচক্ষণ গ্রন্থকার খাদ্য সম্বন্ধে সমস্ত কথা অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 'খাদ্য কাহাকে বলে'? তাহার উত্তরে লেখক বুঝাইয়াছেন, যাহা আমরা খাই এবং যাহা দ্বারা আমাদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন ও শক্তি সঞ্চয় হয় তাহাই যথার্থ খাদ্য; "আমরা যাহা কিছু খাই", তাহাই খাদ্য নহে। তার পর তিনি বলিয়াছেন, "এরূপ কতকগুলি খাদ্য আছে যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই শরীর-পোষণের উপযোগী হইয়া থাকে, যেমন, দুগ্ধ, চিনি, সুপক্ক ফল ইত্যাদি। অপরগুলি রন্ধনাদি কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তিত না হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, যথা,—ডাল, চাল, ময়দা, মৎস্য, মাংস তরকারী ইত্যাদি।" "খাদ্যের প্রয়োজন—শরীরের পুষ্টি-সাধন ও বল-বিধানের জন্য। আমরা যে কোন কাজই করি না কেন, শরীর তাহাতেই ক্ষয় পায়। চলাফেরা, উঠা-বসা, দৌড়ান ব্যায়াম প্রভৃতিতে দেহস্থিত মাংসপেশী আকুঞ্চন-প্রসারণের জন্য ক্ষয় পায়—এবং পাঠাভ্যাস, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্যে মস্তিষ্কাদি শারীরিক যন্ত্রের ক্ষয় হয়। শরীর রক্ষা করিতে হইলে শরীরের সেই ক্ষয় পূরণ করা যেমন প্রয়োজন, শারীরিক শক্তি সঞ্চয় ও সে শক্তির বৃদ্ধিরও তেমনি প্রয়োজন আছে। এজন্য এমন খাদ্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা ক্ষয় পূরণে ও শক্তি-বর্দ্ধনে সাহায্য করে। গ্রন্থকার অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিশদভাবে পরিপাক-যন্ত্র, পরিপাক-

ক্রিয়া, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের গুণাগুণের আলোচনা করিয়াছেন; এমন কি খাদ্যের পরিমাণ অবধি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন! অল্প-ভোজন, অতিভোজন এবং কু-ভোজনে কত দোষ, তাহাও তিনি বুঝাইয়াছেন; বয়স এবং অবস্থাভেদে খাদ্যের পরিমাণ ও সময়-নির্দ্ধারণেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহারও তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কি ভাবে চলা উচিত, বলিয়া দিয়াছেন। উপবাস সম্বন্ধে এখন নানা মুনির নানা মত। গ্রন্থকার বলেন, উপবাসের উপকারিতা বিলক্ষণ। তাঁহার মতে, "মানুষ যদি আজীবন পরিমিত-ভোজী হয়, শরীর পোষণের জন্য যে পরিমাণ যে জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন তাহা যদি নিক্তির ওজনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার উপবাস করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য-গ্রহণই আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল কারণ। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ দেহপুষ্টির জন্য গৃহীত হয় না, উহা অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ (toxins) উৎপাদন করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্ত-স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং শারীরিক সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির অপচয়, দৌর্ব্বল্য এবং ক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। শিরঃপীড়া, যকৃতের রোগ, অজীর্ণ, উদরাময়, পেট-বেদনা, বমন, জ্বর, উদরাধ্মান প্রভৃতি নানা রোগের একটি কারণ—অন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের বিকার। এরূপ অবস্থায় পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করিলে উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থ সমূহ শরীরের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং পূর্ব্বকথিত রোগগুলির লক্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে অন্ত্রশূল, মূত্রশূল, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ ও তদুৎপন্ন বিষাক্ত দ্রব্য নাশ করিবার একমাত্র উপায় উপবাস। "আমিষ ও নিরামিষ ভোজন" সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, "কোনটিই অতিরিক্ত মাত্রায় হওয়া উচিত নহে। যেমন মাংস অধিক পরিমাণে খাইলে নানাবিধ বাতরোগ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভাত, ডাল, রুটী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পদার্থ অধিক খাইলে নানাবিধ অজীর্ণ রোগ ও বহুমূত্র রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।" এ-সমস্ত আলোচনার পর গ্রন্থকার খাদ্যে ভেজাল ও তন্নিবারণের যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন প্রত্যেক স্বাস্থ্যকাম ব্যক্তিরই তাহা পাঠ করা উচিত। গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে কতিপয় সাধারণ রোগে পথ্যের ব্যবস্থা এবং সে পথ্যাদির প্রস্তুত প্রকরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নানা দিক দিয়া এ গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। অভিজ্ঞ গ্রন্থকারের মতগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত; একটিও বাজে কথা ইহাতে নাই। বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আমরা এই অতি-প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম; স্বাস্থ্যহীন বাঙ্গালা দেশে এ গ্রন্থের আরো বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৩৫০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের মূল্য দেড়টাকা মাত্র। কিন্তু এই দেড় টাকা মাত্র ব্যয়ে যে ডাক্তার ও ঔষধ-খরচ বাবদ অন্ততঃ দেড়শত টাকার অপব্যয় কমিবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুষ্প। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ রায় অর্জ্জুন প্রণীত। প্রকাশক, ম্যানেজার পরিদর্শক শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট পরিদর্শক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। ভাষা-ভাব নিতান্তই এলো-মেলো; রচনাও অক্ষম, বিশেষত্বহীন।

Rambling Thoughts. By Munindra. P. Sarvadhikari, Printed and Published by Manikchandra Ghose at the Lila Printing Works. Calcutta. 1916. এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪১শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ [৮ম সংখ্যা

পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি ও পল্লী-সংস্কার

আজকাল পল্লীগ্রামের কথা লইয়া বেশ একটু নাড়াচাড়া চলিতেছে। সহরের মাসিক পত্রিকাগুলিতেও পল্লীবার্ত্তা সাদরে স্থান পাইতেছে। যাঁহারা কদাচিৎ স্বগ্রামে গমন করিতেন, তাঁহারাও এখন মধ্যে মধ্যে দেশে আসিয়া পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের আলোচনায় যোগদান করিতে আর সেরূপ উদাসীন নহেন। কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতিরও অভাব নাই। স্বয়ং বঙ্গেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন দেশীয় কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই পল্লীবাসীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অভাব-অভিযোগের কথা অবগত হইতেছেন। কিছুদিন হইল কেবল পল্লীগ্রামের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে সার্কেল্ অফিসার নামক এক শ্রেণীর নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা নামে চৌকিদারী কার্য্য-পরিদর্শনের জন্য নিয়োজিত হইলেও পঞ্চায়েত ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণের সাহায্যে রাস্তাঘাটের উন্নতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, জঙ্গল ও আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ, নূতন পাঠশালা স্থাপন ও পুরাতন পাঠশালাগুলির উন্নতি-বিধান, দুঃস্থ কৃষকগণের সাহায্যার্থ যৌথ-ঋণদান-সমিতির প্রতিষ্ঠা, কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে কীটাদি হইতে ফসল-রক্ষা প্রভৃতি নানা জন-হিতকর কার্য্যে অবহিত হইতেছেন। ম্যালেরিয়ার প্রতিকার-কল্পে সরকার ও জেলা বোর্ড হইতে বহুবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। গ্রাম বিশেষের অবস্থা-অনুসারে জঙ্গল ও ড্রেন প্রভৃতি কাটাইয়া যাহাতে ম্যালেরিয়া এবং মশকের হাত হইতে গ্রামবাসীগণ উদ্ধার পায়, সে বিষয়ে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। কোথাও বা ডাক্তার বেণ্টলি (Dr. Bentley)

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কর্ত্তৃক অনুমোদিত Beneficazione প্রথায় বন্যার জলে পল্লীর বিষাক্ত আবর্জ্জনাদি ধুইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে; কোথাও বা চতুষ্পার্শ্বস্থিত জঙ্গলাদি সাফ করিয়া গৃহস্থের প্রাঙ্গনে নির্ম্মল বায়ু-চলাচলের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। অবশ্য সর্ব্বত্র সমানভাবে কাজ হইতেছে না এবং এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে সরকারী বেসরকারী সকল অনুষ্ঠানেই কিঞ্চিৎ ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে, কিন্তু গ্রামগুলি যাহাতে আধুনিক স্বাস্থ্যনীতির-অনুমোদিত প্রথায় শিক্ষিত সমাজের বাসোপযোগী হইয়া উঠে, বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা চারিদিকেই সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে।

যাঁহারা পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন জেলায় ম্যালেরিয়ার সংহার মূর্ত্তি স্বচক্ষে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের চরে অবস্থিত অটুট স্বাস্থ্য ও নবীন সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামগুলি দেখিয়া তাঁহারা হয়ত এই সকল পল্লীর প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। একবার নদীয়ার বড়-জাগুলি, সুবর্ণপুর প্রভৃতি স্থান স্বচক্ষে দেখিলে পল্লীর বৈষয়িক পরিবর্ত্তনের কথা বুঝিতে পারা যায়—স্বতঃই মনে হয়, পল্লীর বৈষয়িক উন্নতিই পল্লী-সংস্কারের মূল ভিত্তি।

ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক যাহাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, প্রকৃত বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীর সহিত পরিচয়-লাভের সুযোগ তাহাদের যথেষ্টই ঘটিয়া থাকে। এই সকল বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা ও আশা-ভরসার সহিত সহরবাসী শিক্ষিত সমাজের কিঞ্চিৎ যোগ বা সামঞ্জস্য না থাকিলে কেন যে সম্পূর্ণ জাতীয়ত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী স্যর মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায়া, মানব সমাজের ক্ষুদ্রতম সমষ্টি গ্রাম হইতেই উন্নতির চেষ্টা আরব্ধ হওয়া উচিত, ইহা অনুভব করিয়া মহীশূরে এক নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। সহরে আমরা উন্নতি-মার্গে খুব দ্রুত চলিয়াছি বটে কিন্তু মফঃস্বলে আমাদের গতি একেবারেই শম্বুকের মত। দেশের ভদ্রশ্রেণী গ্রামত্যাগী হইয়া প্রায়ই এখন সহরে আশ্রয় লইতেছেন। একে জীবন-সংগ্রামের দারুণ চাপ, তাহাতে আবার ম্যালেরিয়ার উপদ্রব। গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক মিলে না, ছেলেদের ভালরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না, জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের সহিতও অনেক সময় সামান্য বৈষয়িক বা সামাজিক ব্যাপার লইয়া ঘোরতর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তাই এখন অনেক শিক্ষিত বাঙালীই গড়ে প্রায় ৫০।৬০৲ টাকা মাসিক আয়ের উপর নির্ভর করিয়া স্থায়ীভাবেই সহরে আশ্রয় লইতেছেন; ইহাতে পল্লী ও শিক্ষিত সমাজ এ উভয়েরই যে কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। এ মাহিনায় আর গ্রামে গিয়া দোল-দুর্গোৎসব করা চলে না, বিপুল যৌথ পরিবারেরও প্রতিপালন হয় না; কোনরূপে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদি লইয়াই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র। পৈতৃক গৃহাদি সংস্কারও অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া দেশের অশিক্ষিত লোকেরা নানা হিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে

বা সাহায্য করিতে শিখিবে, তাঁহারাই যদি দেশত্যাগী হইয়া গ্রামের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখেন, কিম্বা দেশে থাকিয়াও উপকার করা দূরে থাকুক নানারূপ মামলা-মকর্দ্দমা ও কলহ-বিবাদে পল্লী-জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে শুধু দুইচারিজন পরহিতব্রত ব্যক্তি ও গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম কিছুতেই নন্দন কাননে পরিণত হইতে পারে না। এই ত গেল ভদ্রলোকদিগের কথা। এখনও বঙ্গদেশে কৃষক ও শ্রমজীবিগণ আপনাদের বাসস্থান ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া সহরে আসিতে সুরু করে নাই। রেল-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় সময় সময় বাঙ্গালী 'মুনিষ' মজুরেরা ধান-কাটা, মাটি কাটা প্রভৃতি কাজের চেষ্টায় এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাতায়াত করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানী কুলিগণের ন্যায় তাহারা দীর্ঘকাল বাড়ী ছাড়িয়া বা সপরিবারে স্থায়ীভাবে কর্ম্মস্থানে আসিয়া বাস করিতে প্রস্তুত নহে। কলিকাতার অনতিদূরে ভাগীরথী-তীরে ও পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথের পার্শ্বভাগে যে-সকল পাট-কল দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির সন্নিকটস্থ জঘন্য কুলি-নিবাস সমূহের অবস্থা দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয় বুঝি বা কল-কারখানা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য Slumএর ন্যায় অস্বাস্থ্যকর ও দুর্নীতি-সঙ্কুল কুপল্লীসমূহের সৃষ্টি হইয়া পড়ে! বিলাতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক, তাই শ্রমজীবীগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা অনেক মহানুভব ইংরাজের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া থাকে। কুলিদিগের বাসস্থানের অবস্থা দেখিয়া অধ্যাপক গেডিজ (Prof. Geddes) ঘুর্ণীর কুম্ভকারগণের দ্বারা কুলি-লাইন ও কৃষক কুটীরের ক্ষুদ্র আদর্শ বা "মডেল" (model) তৈয়ারির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সভ্যতার আলোক-সংস্পর্শে আসিয়া কুলি লাইনে বাস করা অপেক্ষা তাহাদিগের পল্লীকুটীরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণগৃহে বাস যে কত গুণে ভাল, তাহা এই 'মডেল'গুলি দেখিলেই শিক্ষিত সমাজ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বেও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীগণের দৃষ্টি সহরের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। ভারতীয় অর্থ-নীতির জন্মদাতা ৺মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "The progress of ruralization in modern India means its *rustication*." অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতার ফলে যদি দেশের শিল্পী ও কারিকরেরা সহর ছাড়িয়া পল্লীতে গিয়া আশ্রয় লয় তাহা হইলে সে গতি অবনতির পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে—তাহা হইলে লোকের কর্ম্ম-কুশলতা, বুদ্ধিবৃত্তি, স্বাবলম্বন-শক্তি সমস্তই লোপ পাইতে থাকিবে। প্রতিযোগিতায় অপারগ হইয়া শিল্পীগণ কৃষি-কার্য্য অবলম্বন করিলে তাহা দোষের কথা, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতার স্রোত স্বতঃই পল্লীমুখী হইলে তাহাতে আনন্দ বৈ দুঃখের কারণ দেখি না। (১)

(১) এ সম্বন্ধে মতভেদ কিন্তু এখনও মিটিয়া যায় নাই। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পল্লী-অধিবাসিগণের গ্রাম ছাড়িয়া সহর-অভিমুখে গতি স্বাভাবিক বৈ অস্বাভাবিক নহে। তিনি রানাডের

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আমরা এখন দায়ে ঠেকিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে পল্লীর উন্নতি না হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন বৈষয়িক উন্নতি একবারেই অসম্ভব। ধরিতে গেলে পল্লীর ধনোৎপাদন-সামর্থ্যই আমাদের দেশে অর্থনীতির প্রধান কথা। পল্লীগ্রামগুলির ধনোৎপাদন-শক্তি যদি উপযুক্তরূপে বর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে প্রায়শঃ পল্লীসমষ্টি-গঠিত এই বিশাল ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতি সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িবে।

পল্লীতে বাস করিতে হইলেই যে কৃষি-কার্য্য লইয়া থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ এখনও বঙ্গদেশের অনেক গণ্ডগ্রামে শিল্পী ও কারুজীবীর সংখ্যা বড় কম নয়। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী থাকা আবশ্যক এ কথা এখন প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। মহীশূরের স্যর্ মোক্ষগুণ্ডমও ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়াছেন, গ্রামের প্রতি ৫০-জন লোক-পিছু তাঁত চালান, বাসন তৈয়ারি, বা চামড়া কষ করার ন্যায় একটি করিয়া শিল্প বা কারবার প্রচলিত থাকা একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদেশের কয়েকটি গ্রাম্য শিল্পের কথা ধরা যাক। মুর্শিদাবাদে ও মৃজাপুরে রেশমীবস্ত্র ও শঙ্খবলয় যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। নদীয়ার ডাঁইহাট মাটিয়ারি কাঁসার বাসনের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সকল কারবারে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কেহ কেহ বেশ দুইপয়সা সঞ্চয়ও করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত 'লাহা' বা গালা প্রস্তুত (lac industry) এবং তাহা হইতে খেলনা চুড়ি প্রভৃতি নির্ম্মাণ, চিনি ও গুড়ের ব্যবসায়, তসর ও এণ্ডি উৎপাদন, শোলা ও ডাকের সাজের কাজ (tinsel industry), পাটি ও চাটাই তৈয়ার প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায় পল্লীগ্রামে চলিতে পারে এবং চলিতেছেও। মধুমক্ষিকা পালন আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু আধুনিক প্রথায় মক্ষিকা-বাস নির্ম্মাণ করিয়া কিরূপে মধু সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা কীটতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সেদিন রামমোহন লাইব্রেরিতে বক্তৃতা-কালে ভালরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন পল্লী-শিল্প ও কারবারের কথা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নব-প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থে (২) বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার পুস্তকের প্রথমাংশ হস্ত-শিল্পের কোষ-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি কি আধুনিক উপায় অবলম্বনে এই সকল গৃহশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা

মত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "... there was a tendency for a larger and larger proportion of the people to become rural. Of recent years however there has become discernible a tendency working in the opposite direction and towns are once more beginning to take their proper place as centres of thought, culture and industry in the life of the nation. (Indian Economics. p. 28)

(২) Foundations of Indian Economics. Longman's 1916—9 shillings (Rs. 9) PP. XXVI 515.

াইতে পারে, তাহা পল্লীর হিত-কামী চিন্তা-াল ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ হইতে পাঠ রিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কল-কারখানার জন্মস্থান ইউরোপেও হ-শিল্প একবারে লোপ পায় নাই। বস্তুতঃ দেখা যায় যে কল-কারখানার উন্নতির ঙ্গে সঙ্গে কয়েক শ্রেণীর উটজ শিল্পেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এ সম্বন্ধে রাধাকমল বাবুর গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে ইউরোপে একক কারিকরের সংখ্যা কমিয়াছে বটে কিন্তু ১ হইতে ৫ বা ৬ হইতে ৫০ জন শ্রমজীবী লইয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা চালানো হয়, তাহার সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। শুধু জর্ম্মনিতে এইরূপ একক শ্রমজীবী ও ছোট কারখানার কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলি হইতেই সহজে উপলব্ধি হইবে।

	১৮৮১ খৃঃঅঃ	১৮৯৫ খৃঃঅঃ	১৯০৭ খৃঃঅঃ
একক শ্রমজীবী— ...	১,৪৩০,০০০	১,২৩৭,০০০	৯৯৫০০০
২ হইতে ৫ জন লইয়া ছোট কারখানায়— ...	৭৪৬,০০০	৭৫৩,০০০	৮৭৫,০০০
৬ হইতে ৫০ জন লইয়া ছোট কারখানায়— ...	৮৫০০০	১৩৯০০০	১৮৭,০০০

নিছক হস্তশিল্প ত আছেই, তাহার উপর অল্পব্যয়সাধ্য গ্যাস ও অয়েল এঞ্জিনের আবিষ্কারের সহিত, এই সকল ছোট কারখানা ইউরোপের পল্লীতে সহজেই স্থান পাইয়াছে। শুধু জর্ম্মনি বলিয়া নহে, ফরাসী দেশে ও সুইজারলণ্ডে খেলনা নির্ম্মাণ, লেস্ তৈয়ারী, কাটা কাপড় প্রস্তুত প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর গৃহ-শিল্পের 'উত্তরোত্তর' শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ফরাসী দেশে কাটা কাপড় ত পল্লীগ্রামেই অধিকাংশ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কলিকাতার উপকণ্ঠবাসী মেটিয়াবুরুজের দরজীরাও নিজগৃহে পোষাক প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার ব্যবসায়ীগণকে সরবরাহ করে। পল্লীগ্রামে তুন্নবায় শিল্প (Tailoring) শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর কাটা কাপড় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রস্তুত হইয়া সহরের বিপণীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন যদি ভালরূপে করা হয় তাহা হইলে বেলডাঙ্গার ব্লাউস বা কান্ত নগরের ফ্রক্ ফরাসডাঙ্গার ধুতির ন্যায় কেন যে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে না, তাহা ত বুঝিতে পারি না। সুতরাং পল্লীতে বাস করিতে গেলে ক্রমহ্রাসমান্ উৎপাদিকা শক্তির (law of diminishing returns) নিয়মান্তর্গত কেবল যে কৃষিকার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে, এমন নয়।

কলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে গৃহ-শিল্প একেবারে বিনাশ পাইতে পারে না, তাহা দেশী কলের বস্ত্রের তুলনায় তাঁতের বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ বিবেচনা করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। ১৯০৫-৬ সালে ১৫০ ½ লক্ষ পৌণ্ড (পৌণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের পরিমিত ওজন) দেশীয় কলে নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯০৬-৭, ১৯০৭-৮ ও

১৯০৮-৯ সালে উহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া যথাক্রমে ১৮৪০½ লক্ষ, ১৮৭০½ লক্ষ ও ২১৭০½ লক্ষ পৌণ্ডে পরিণত হয়। এই কয় বৎসরে তাঁত নির্ম্মিত বস্ত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি নিম্নলিখিত পাদটীকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে:—
(Vide p. 152-3 R. K. Mukherji's Foundations of Indian Economics)

১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯
২৫২০	২৬৮০½	২৫৬০½	২৫৭০½

লক্ষ পৌণ্ড লক্ষ পৌণ্ড লক্ষ পৌণ্ড লক্ষ পৌণ্ড।

১৯০৯-১০ সালে তাঁতের বস্ত্রের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধের বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দর বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁতের কাপড় যে পুনরায় অধিক পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে ও তাহার কাট্‌তিও যে বাড়িয়াছে এরূপ অনুমান বোধ হয় অন্যায় হইবে না। অবশ্য ইহা হইতে এ কথা বলা চলে না যে, ক্রমে তাঁতের কাপড় পুনরায় কলের কাপড়ের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে কাপড়ের কল, পাটের কল, লৌহ ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি কালে বাড়িবে বৈ কমিবে না; তবে অল্প মূলধন-সাধ্য এঞ্জিন প্রভৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমবায়-পৃষ্ঠপোষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা পল্লীগ্রাম-সমূহেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া ক্রমশ সমধিক সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়।(৩) কারখানা যতই বাড়িতে থাকে supplementary demand বা ন্যূনতা-পূরক প্রয়োজনের জন্য ছোট শিল্পেরও ততই প্রয়োজন হয়, এ কথা ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝা যায়। ইউরোপে কল প্রতিষ্ঠার সহিত অনেক সরকারী হস্ত-শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে সুতরাং কল বসিলে সকল হস্ত-শিল্পই যে লোপ পাইবে, এমন নহে। জাপান এখনও "ছোট কারখানার" দেশই রহিয়াছে। সূক্ষ্ম ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট বস্ত্র এখনও হস্তে নির্ম্মিত হইতেছে। বাঙলায় মটকার বয়নও এইরূপ একটি কল-ভয়-বিহীন শিল্প বলিয়া মনে হয়। যে সকল রেশম কোয়া রেশম-কীট কর্ত্তৃক বিদীর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, মুর্শিদাবাদ চক্ ইশলামপুর প্রভৃতি স্থানে তাহা হইতেই সূত্র বাহির করিয়া মট্‌কা কাপড় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এরূপ কাটা Cocoon (কোয়া) কারখানায় ব্যবহারে আসে না, কিন্তু গৃহ-শিল্পের কল্যাণে সেগুলিও কাজে লাগিয়া যায়। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বহু স্থলে কাগজ প্রস্তুত হইত। মুর্শিদাবাদ জেলার পুরাতন সরকারী কাগজ-পত্রে দেখিয়াছি, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের কালেক্‌টারগণ লালবাগের নিকটস্থিত চুনাখালির কাগজের জন্য মুর্শিদাবাদের কালেক্‌টার সাহেবকে মধ্যে মধ্যে তাগিদ দিতেন।

(৩) সমবায়-প্রথার উপর ছোট গ্রাম্য শিল্পশালাগুলির স্থায়িত্ব যে অনেকাংশেই নির্ভর করিতেছে সে কথা ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও নিজগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে জাপানী শিল্পের উন্নতির আরও দুইটি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা (১) কর্ম্মীগণের দক্ষতা ও (২) বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক বসাইয়া সংরক্ষণ-প্রয়াস (the protection given to them by the state through the system of high tariffs)

খন চুনাখালি আম্রবাগিচার জন্যই প্রসিদ্ধ। জিয়া একজনও "কাগজী" পাওয়া যায় না সন্দেহ! অবশ্য খবরের কাগজ ছাপাখানার সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে াগজের প্রয়োজনও এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে য শুধু হাতে-তৈয়ারী কাগজে সমগ্র ঙ্গদেশের টান (demand) পূরণ করা কানক্রমেই সম্ভব নয় কিন্তু তাই বলিয়া াতে-তৈয়ারী কাগজের যে কাট্‌তি হইবে া, এ কথা বলা চলে না। মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছি, প্রাচীন শ্রেণীর দোকানদারগণ এখনও দেশী কাগজ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে হিসাবের খাতা বাঁধিয়া হিসাব লেখেন। তাঁহারা বলেন, এ কাগজ কলের কাগজ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখিয়াছিলাম এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণের দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত চিঠির কাগজ ও খাম অনেকেই ব্যবহার করিতেন; এমন কি পুরাতন "ভারতী"র কভারও সেই হরিদ্রাবর্ণের তুলোট কাগজের দিব্যশ্রীতে-ভূষিত হইত। বিলাতি হাতে-তৈয়ারী চিঠির কাগজ (hand-made stationary) আমাদের সৌখীন সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। বিলাতী প্রথার অনুকরণে জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহেরও hand-made paper edition (হস্ত-নির্ম্মিত কাগজের সংস্করণ) হয়ত অল্পদিন মধ্যেই আমাদের পুস্তক-প্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট আদর পাইবে। মোটকথা, আধুনিক প্রথায় আধুনিক রুচি-অনুযায়ী এরূপ কাগজ তৈয়ার করার ব্যবস্থা হইলে তাহার বাজার পাইতে বিলম্ব ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ প্রকার হস্তশিল্প-সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য ব্যবসায় লাভজনক করিতে হইলে co-operative production বা সমবায় উৎপাদনের সহিত co-operative distribution সমবায় কাট্‌তি বা বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করা আবশ্যক, নতুবা পাইকার শ্রেণীর (middle man) মধ্যতন্ত্রের লোকই লাভের অধিকাংশ হস্তগত করিয়া ফেলিবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীগুরুদাস সরকার।

পল্লী-উৎসব

(চিত্র)

সহুরে ছেলে সন্তোষ তার বোনের শ্বশুরবাড়ী বেলডাঙ্গা গ্রামে বারোয়ারী উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। আজ বেলডাঙ্গা-বাসী সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা;—একপ্রকার জ্ঞানশূন্য বলিলেই হয়। আজ গ্রামের জমিদার-পুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চৌকিদার-পুত্র পর্য্যন্ত সকলেই এই উৎসবে যোগ দিয়াছে। সকলেই বেশ শক্ত করিয়া "মালকোঁচা" আঁটিয়া কাপড় পরিয়াছে। কাহারও কাঁধে "তোয়ালে", কাহারও কাঁধে "গামছা," সকলে সেই ঢাকের বাজনার সঙ্গে উন্মাদের মত লাফাইতে লাফাইতে, ঠাকুর-বাড়ী হইতে

ঠাকুর আনিতে চলিয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধ-সম্প্রদায়, কোন বিষয়ে চোখ-কাণ দিবেন না। পিতার সাক্ষাতে পুত্র মদ খাইলেও পিতা সেখান হইতে সরিয়া যাইবেন। আজ কেহই রিক্তহস্তে নাই; কাহারও হস্তে সদ্য-আহরিত বৃক্ষশাখা, কাহারও হস্তে তৈলপক্ক যষ্টি, কাহারও হস্তে-বা তিন-চারিটা পরিপূর্ণ মদের বোতল।

চারিজনের স্কন্ধে একখানি "চতুর্দ্দোলা"; তাহাতে ঠাকুর যাইবে। সকলেই আনন্দে চীৎকার করিতেছে। নেশার ঝোঁকে কেহই স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, সকলেরই পা টলিতেছে। সকলের চীৎকারে ও ঢাকের গর্জ্জনে এক তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন বলিষ্ঠ পল্লীবাসীর এই উন্মত্ততা দেখিয়া সন্তোষের মুখ শুকাইয়া আসিল। সন্তোষ নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" পড়িয়া মনে মনে তাহার যে ছবি আঁকিয়াছিল, আজ এই পল্লী-উৎসবের নিকট তাহার সে চিত্র ম্লান বলিয়া বোধ হইল।

ঠাকুর-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কিছু-ক্ষণের জন্য "বাজনা" থামিল।

পুরোহিত-মহাশয় ঠাকুর লইয়া আসিয়া "চতুর্দ্দোলায়" চাপাইয়া দিলেন। ঠাকুর আসিবামাত্র সকলে একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

"বাবু আসছে," "বাবু আস্‌ছে" বলিয়া একটা মস্ত সাড়া পড়িয়া গেল। সন্তোষ প্রথমে ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না। তারপর দেখিতে পাইল, অদূরে একজন অতি সুন্দরকায় যুবক টলিতে টলিতে আসিতেছে। যুবকের সৌন্দর্য্যে কোথাও খুঁৎ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধব্‌ধবে ফরসা রং; আকৃতি কিঞ্চিৎ কৃশ। ললাটের উপর কুঞ্চিত কেশদাম আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে যুবককে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। যুবকের স্কন্ধে একখানি "তোয়ালে" আলুথালু পড়িয়া আছে। পশ্চাতে একজন দ্বারবান প্রকাণ্ড একগাছি যষ্টিস্কন্ধে ধীরে ধীরে আসিতেছে। "অমৃত" অত্যন্ত মাতাল হইয়াছে দেখিয়া, অমৃতর মা একজন দ্বারবানকে তাহার পশ্চাতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অমৃত এই বেলডাঙ্গা গ্রামের জমীদার নসীরাম দত্তের একমাত্র পুত্র।

অদূরে অমৃতবাবুকে আসিতে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের মধ্য হইতে একজন ছুটিয়া গিয়া, অমৃতকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিল। তখন আবার একটা বিষম কোলাহল উঠিল।

অমৃতবাবু আসিয়া চীৎকার করিয়া হুকুম দিলেন, "এই, সব চুপ!" শব্দ অর্দ্ধ-উচ্চারিত হইবামাত্র সেই বিরাট কোলাহল—এমন-কি, শিশুদিগের ক্রন্দন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল! সেই উত্তাল তরঙ্গ-কল্লোলবৎ জন-কলরব অমৃতবাবুর এক কথাতেই শান্তভাব ধারণ করিল।

অমৃতবাবু পুনরায় কহিলেন, "এই, সবাই শোনো,"—মত্ততাহেতু তাঁহার কথাগুলি জড়াইয়া বাহির হইল।

সন্তোষ ভাবিতে লাগিল, অমৃতবাবু

আসিয়া এ গোল বন্ধ করিয়া দিলেন, হয়ত আজ একত্রে এত লোক জড়ো হইয়াছে, এই সুযোগে একটা-কোনো সাধারণ লোক-হিতকর সৎকর্ম্মের প্রস্তাবনা হইবে। সন্তোষ খুব উৎসাহিত চিত্তে "লেক্‌চারে"র অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অমৃতবাবু কহিলেন, "দেখ, এখন সব চুপ, আমি যেই বল্‌বো অম্‌নি সবাই মিলে বাজাবি আর হৈহৈ করে নাচবি।" মুখের কথা খসাও যা, কাজেও তাই। সন্তোষ বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

ঠাকুরবাড়ী হইতে যে স্থানে গ্রাম্য দেবীকে আনিয়া পূজা করা হয়, সে স্থানটির নাম "পূজাতলা"। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে;—আর তাহার কিয়দ্দূরে বাঁধা ঘাটওয়ালা এক প্রকাণ্ড পুকুর। সেই বটগাছের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানটুকু খুবই বিস্তৃত ও পরিষ্কার। বর্ণিত "পূজা-তলায়" আজ বিস্তর লোক জমায়েৎ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে একটি করিয়া নিরীহ অজ-শিশু রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ। অসহায় ও বধ্য অজশিশু-গুলি লোকের চীৎকারে, প্রচণ্ড জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে, আর কামানের ন্যায় শব্দায়মান "বোমে"র আওয়াজে প্রায় মর'মর' হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছুদূরে পৃথক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া জনকতক লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই গায়ে এক-একটা বোতাম-ছেঁড়া পকেট-ঝোলা গরম কাপড়ের ময়লা কোট; কাঁধে একখানি করিয়া ময়লা শত-ছিদ্র সুতার চাদর ও হাতে গাঁটতোলা পাকা বাঁশের লাঠি। তাহাদের লম্বা জুল্‌পি দিয়া তৈল ঝরিতেছে। ইহাদের নিকটে একটি বিপুল-শৃঙ্গ বিরাটকায় মহিষ বাঁধা রহিয়াছে। মহিষটির পৃষ্ঠদেশে সিন্দুর ও অন্যান্য কি-সব মাখানো হইয়াছে।

ইহারও কিছু-পূর্ব্বদিকে একটি চারা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কপালে সিন্দুর, হাতে দীর্ঘ বাঁশের লাঠি। ইহাদের নিকটে একটি ক্ষুদ্রকায় শূকর-ছানা কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে।

ইহা ব্যতীত ছাগল ও ভেড়া যে কত আসিয়াছে ও আসিতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

পূজা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় গ্রামের শূদ্রসম্প্রদায়ের দা'ঠাকুর কেদার ভট্‌চাজ আপত্তি তুলিলেন, "রাইচরণ মণ্ডলের পাঁঠা আমি কিছুতেই উৎসর্গ করব না, কারণ সে আমার জমির জল কেটে নিয়েছে। ওকে জাতিচ্যুত করব তবে আমার নাম কেদার ঠাকুর।"

এই কথা শুনিবামাত্র রাইচরণ মণ্ডল কাঁদকাঁদ স্বরে অমৃতবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবু, আমার পাঁঠা তো বোধ হয় বলি হন্ না, তুমি যা হয় করুন আজ্ঞে।"

অমৃতবাবু বলিলেন, "ওহে রাইচরণ, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। তুমি পাঁচটা টাকা জরিমানা দাও, আমি তোমার পাঁঠার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

এই কথা বলিবামাত্র রাইচরণ অমৃত-

বাবুর পদতলে পড়িয়া টাকা দিতে স্বীকার করিল এবং তাহার মানসিকের পাঁঠাটির ব্যবস্থা করিবার জন্য বারবার অনুনয় করিতে লাগিল। অমৃতবাবু তখনই কেদার ভট্টাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া রাইচরণের পাঁঠা উৎসর্গ করিবার জন্য হুকুম দিলেন। কেদার ঠাকুর অগত্যা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রাইচরণের পাঁঠার কাণ ধরিয়া জলের ছিটাইয়া দিয়া তাহাকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

ইহার পরই এক নূতন বিপদ বাধিল। গ্রামের দুইপাড়ার ছোটলোকের মধ্যে কাহার পূজা আগে হইবে, তাহা লইয়া মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে সেই বচসা দাঙ্গায় পরিণত হইল। দুই পাড়াতেই ছোট লোক বিস্তর, প্রত্যেকেই বেতর মাতাল হইয়াছে। সকলেরই হাতে লাঠি। সুতরাং দাঙ্গার অঙ্গহানি হইবার পক্ষে কোনই সম্ভাবনা নাই। খুব জাঁকালো রকমেই দাঙ্গা আরম্ভ হইল।

সন্তোষ আর স্থির থাকিতে পারিল না;—ছুটিয়া গিয়া অমৃতবাবুকে বলিল, "অমৃতবাবু, আপনি বললে এক কথায় মিটে যাবে, দাঙ্গা মিটিয়ে দিন্, নয়ত এখনি একটা খুন হয়ে যাবে।"

অমৃতবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "মশাই, আপনারা সহরের লোক, আপনারা তো জানেন না, মেটালে চলবে কেন? একটু পাকাপাকি রকম হোক,নইলে—"কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দাঙ্গার মধ্য হইতে, বলিষ্ঠকায় যম-মূর্ত্তি এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া অমৃতবাবুর পদতলে পড়িয়া বলিল, "বাবু, হুকুম দিন্।"

এই ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা ছুটিতেছে;—পরিহিত বস্ত্রখানির প্রায় বারোআনা রকম রক্তে লাল-টকটকে হইয়া গিয়াছে;—মাথার একজায়গা কাটিয়া গিয়া, রক্তের ধারা কপাল বহিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

সন্তোষ ইহার পূর্ব্বে, এমন দৃশ্য কখনও চক্ষে দেখে নাই। "ডি, এল, রায়ের" নাটক দেখিবার সময় এক একবার "রক্ত" "রক্ত" বলিয়া চীৎকার শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু ভীষণ রক্তারক্তি যে কি, সে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। আজ চোখের সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার বুক কেমন ধড়ফড় করিতে লাগিল।

আজ রাত্রে বারুদ পোড়ান হইবে। সন্ধ্যার পর হইতে "তুবড়ি", "বোম", "হাউই" "আকাশতারা" প্রভৃতি বাজিগুলিকে যথা-স্থানে রাখা হইতে ছিল। প্রতি বৎসরই এই বেলডাঙ্গায় বারোয়ারি পূজায় বারুদ পোড়ানো উপলক্ষে পুলিশ মোতায়েন থাকে। পুলিশ আর কেহ নয়,—গ্রামেরই নিতাই হাড়ি চৌকিদার, পলাশপুরের শ্যাম সামন্ত দফাদার, আর ঐ গ্রামেরই হরি মান্না কনষ্টেবল।

তাহারা পোষাক পরিয়া যন্ত্রতন্ত্র লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর অমৃতবাবু যখন বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তোরা কি অম্‌নি করে সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে থাক্‌বি? খোলসগুলো ছেড়ে তুবড়ি-টুবড়ি

বয়ে দিগে যা না।" অমনি অবিলম্বে চৌকিদার, দফাদার ও কনষ্টেবল স্ব স্ব পোষাক ছাড়িয়া সকলের সঙ্গে বারুদ বহিতে সুরু করিল।

সন্তোষ এই সব দেখিতেছে এমন সময় একজন লোক সন্তোষের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বাবু, লাচ দেখবে?" বলিয়াই সে বিকট তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিল। সন্তোষ ত দেখিয়া অবাক! এই ব্যক্তিকেই যে কাল সে এক মজলিসে বেশ ভদ্রভাবে কথা কহিতে দেখিয়াছে; আর আজ মাতাল হইয়া সে "লাচ" দেখাইতে আসিয়াছে!

ক্ষণপরেই গ্রামের ধারে মাঠে, এক প্রশস্ত জায়গায় বাজি-পোড়ানো আরম্ভ হইল। বোমগুলি ব্যোম বিদীর্ণ করিতে করিতে যেন ভীষণ প্রাণের জ্বালায় ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। এক-একটা তুবড়ি অগ্ন্যুদ্গারী পর্ব্বতের ন্যায় অজস্র অগ্নিকণা তীব্র ফুৎকারে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একটা "আসমান-তারা" দিগন্তের কোলে প্রধাবিত হইয়া নিজের অন্তর-পোষিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গগুলিকে ছড়াইয়া দিয়া একটা ম্লান হাস্যের ক্ষীণ জ্যোতিতে গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিতে লাগিল।

এই সমস্ত দৃশ্যে সন্তোষ তন্ময় হইয়া ছিল; এমন সময় একটা চীৎকারে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল;—সে দেখিল, গ্রামের মাঠের দিকের একখানি কুঁড়েঘর ধূ-ধূ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সন্তোষের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইবামাত্র এক বিকট চীৎকারধ্বনিতে সারা গ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিল। সকলেই "আন্ জল্" "ঢাল্ জল্" শব্দে চীৎকার করিয়া দৌড়িল। জনতার মধ্য হইতে জহর ডোম এক লম্ফে, সেই উত্তালতরঙ্গসমাকুল সমুদ্রবৎ লেলিহান-জিহ্ব অগ্নি-মধ্যে পতিত হইল এবং বিপুল বিক্রমে অগ্নিরাশিতে জল ঢালিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল অগ্নির বিক্রম অপেক্ষা জহরের বিক্রম অনেক বেশী। নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে কলসী ভরিয়া সকলে জহরকে জল যোগাইতে লাগিল, জহর "মটকা" হইতে হুড়হুড় শব্দে জল ঢালিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, তখন সকলে একসঙ্গে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

পরদিন সন্তোষ বাড়ী ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় তার বোন নীহার বলিল, "দাদা, তুমি আজ যাবে বলছো বটে, কিন্তু আর একদিন থাকলে ভাল হত। কাল অমৃতবাবুর সখের দলের যাত্রা হবে।"

সন্তোষ কহিল, "সখের দল কেমন অভিনয় করে?"

নীহার বলিল, "অভিনয় করে মন্দ নয়, তবে বড় বেশী গোল করে। এমন-কি সময়ে সময়ে হাঁক-ডাঁকের চোটে পালা ভেঙ্গে যায়।"

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, "বটে, তাহলে অভিনয় যত হোক আর না হোক মজা দেখবার জন্যে আমায় থাকতে হবে!"

অমৃতবাবুর বৈঠকখানাটি বেশ সুন্দর

সাজানো। ঘরের বাহিরে চারিধারে জাফরির বেড়া দেওয়া ফুলবাগান। বাগানটি বেশ মনোরম। ঘরের ভিতর একধারে তিনটি আলমারি পুস্তক-ভারে প্রপীড়িত। অন্যধারে সাত-আটটি কাঠের সিন্দুকে যাত্রার দলের সাজ-পোষাক। বাদ্যযন্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

সন্তোষ ধীরে ধীরে গিয়া বৈঠকখানায় উঠিল। ঘরের ভিতর অনেকগুলি লোক বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সন্তোষকে আসিতে দেখিয়া সকলেই চুপ করিল। অমৃতবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সন্তোষের হাত ধরিয়া বলিলেন, "আসুন মশাই, আপনি যে আবার এই "ন চ্যাংড়ার" আড্ডায় পদার্পণ করবেন, এটা ভাবিনি।" সন্তোষ অমৃতবাবুর এই নিরহঙ্কার আলাপে বিশেষ তুষ্ট হইল। উভয়ে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে, সন্তোষ কহিল, "মশাই, আজ আমি যাচ্ছিলুম, তবে শুনলুম যে আপনাদের সখের যাত্রার দলের অভিনয় হবে, শুধু তাই শোনবার আগ্রহে আজকের দিনটা থেকে গেলুম। আর আমার ভগ্নীও তাই আজ যেতে দিলে না।"

অমৃতবাবু সহাস্য বদনে কহিলেন, "মশাই, আপনার ভগ্নী যে আমার দিদি হন্। দিদি আমার ভাইয়ের মনের কথা বুঝেই আপনাকে যেতে দেন্‌নি। আপনি তো কলকাতায় কত বড় বড় অভিনয় দেখেছেন, আর আজ এখানে আপনাকে এক নূতন অভিনয় দেখাব—"

সন্তোষ কহিল "আপনাদের এ সমিতি কি রকম?"

অমৃতবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "মশাই! এ সমিতি-টমিতি কিছুই নয়, এর নাম হচ্ছে 'ন বিভ্রাটের সখের দল'।"

সন্তোষ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "সে আবার কি?"

অমৃতবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তবে শুনুন, সখের দলে স্বভাবত ন'টি করে বিভ্রাট ঘটে থাকে। প্রথমতঃ—গোঁপ-বিভ্রাট—অর্থাৎ কেউ স্ত্রী-লোকের ভূমিকা গ্রহণ করতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ—"পার্ট-বিভ্রাট"—অর্থাৎ কেউই হনুমান কি রুগ্ন ব্যক্তির ভূমিকায় নামতে চায় না। তৃতীয়তঃ—"পোষাক বিভ্রাট"—অর্থাৎ সখের দল, কেউ কারও মাইনে খায় না, সকলেরই ইচ্ছা, নতুন পোষাক পরে অভিনয় করে;—বিশেষতঃ "টেল্' বা পৃষ্ঠ-আচ্ছাদনীর উপর অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি। চতুর্থতঃ—"সম্বন্ধ-বিভ্রাট" অর্থাৎ কারও হয়ত সহোদর ভাই, তারা স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় "নাথ" "প্রিয়তম" ইত্যাদি সম্বোধনে রাজি নয়। পঞ্চমতঃ—"ভূমিকা-বিভ্রাট" অর্থাৎ যারা নাটকোক্ত যুদ্ধাদিতে জয়ী হবে, যেমন অর্জ্জুন, ভীম, রাম ইত্যাদি, সকলেরই সেই ভূমিকা নেবার ইচ্ছা। ষষ্ঠতঃ—"শ্রোতা-বিভ্রাট"।" গ্রামের দল শুনে কেউ শুনতে যাবে না, অনেককে খোসামোদ করে', সম্ভব হলে ধমক-ধামাক দিয়েও আসরে বসাতে হবে। সপ্তমতঃ —"মদ্য-বিভ্রাট"। কেউ বলবে আমি পেলুম না, আবার কেউ বা বমি করতে থাকবে। অষ্টমতঃ—"উচ্চপদ-বিভ্রাট"—দলের বাঁকী দার হইতে প্রধান অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত সকলেরই

ইচ্ছা প্রোগ্রামে "অমুক মাষ্টার" বলে যেন তার নাম ছাপানো হয়। নবমতঃ "হুঁকা-বিভ্রাট"—এর মধ্যে আবার দলাদলি আছে, কেউ তামাক খেতে পেলে না, আবার কেউ-বা চব্বিশ ঘণ্টাই হুঁকোয় মুখ যুবড়ে রইল। ফলে "হুঁকো" "হুঁকো" বলে এক তুমুল কোলাহল হয়ে যাত্রা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।" এই কথা বলিয়া অমৃতবাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বারোয়ারিতলার আটচালাখানিকে যতদূর-সম্ভব সাজানো হইয়াছে। দুই-একটা গ্যাসের ঝাড় শ্বেত-বর্ণের আলো বিকীর্ণ করিতেছে। আর কিছুক্ষণপরেই যাত্রা আরম্ভ হইবে। গৃহস্থেরা সকলে যে-যাহার গৃহকর্ম্ম তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতেছে। সন্তোষ সন্ধ্যার পর চা পান করিয়া নীহারকে বলিল, "আমরা সকলেই যাত্রা শুনতে যাবো, তাহলে ঘরে কে থাকবে?"

নীহার কহিল, "কে আবার থাকবে? এখানে সহরের মত চোরের ভয় নেই, তিনদিন বাড়ীতে না থাকলেও কেউ এক-গাছি কুটো নাড়বে না।"

সন্তোষ প্রথমে বারোয়ারি-তলায় গমন করিল। সন্তোষ যাইবামাত্র দলস্থ সকলে অতি সমাদর করিয়া তাহাকে আসরের মাঝে বসাইল। অনতিবিলম্বে একটি সুগন্ধ ধূমোদ্গারী বিরাটোদর হুঁকা আসিয়া সন্তোষের নিকটে খানিকটা জায়গা দখল করিল। সে মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল।

একধারে খানিকটা প্রশস্ত জায়গা চিক দিয়া ঘেরা। স্ত্রীলোকেরা একে একে আসিয়া তাহার মধ্যে জায়গা করিয়া লইল। অনতিবিলম্বে চিকের মধ্য হইতে শিশু-ক্রন্দন স্বকীয় মাতৃ-আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। দুই-একজন লোক "ওগো, ছেলে থামাও না গো!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে "আখড়াই" বাজনা আরম্ভ হইল।

অমৃতবাবু সন্তোষের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মশাই, অভিনয় যে কেমন হবে তা বোধ হয় বুঝতে পারছেন? শিশুর রোদনে যার প্রস্তাবনা, তার উপসংহারে বুঝি বুড়ো পর্য্যন্ত কাঁদবে!"

সন্তোষ উচ্চহাস্যে বলিল, "না, না, আমার বোধ হয় অভিনয় খুব ভালই হবে!"

অমৃতবাবু বলিলেন, "তবে আপনি বসুন, আমি ততক্ষণ বেশকারীর কার্য্য করিগে।"

গতকল্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিয়া, আজ সারাদিন ঘুমাইয়া, বৈকাল বেলা কতকগুলি লোক এক জায়গায় আসিয়া জড় হইল। অমৃতবাবু পূর্ব্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলে নানারূপ খোসগল্প করিতেছে, এমন সময় ধীরে ধীরে সন্তোষ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমৃতবাবু সাদরে সন্তোষকে বসাইয়া বলিলেন, "মশাই, কাল কেমন কেলেঙ্কারি দেখলেন?"

সন্তোষ কহিল, "কেন, কেলেঙ্কারি কেন? অভিনয় তো মন্দ হয় নি। যে লোকটি "বয়স্য" সেজে ছিল, আর যে স্বর্গের

"দেববালা" সেজে নেচেছিল তারা ত দুজন বেশ পাকা লোক।"

অমৃতবাবু বলিলেন "সন্তোষবাবু, আপনি এখনও দু'-একদিন থাকবেন তো?"

সন্তোষ শশব্যস্তে বলিল, "দু'-একদিন কি মশাই! অনেক পূর্ব্বেই যেতুম, কেবল আপনার যাত্রার অভিনয় দেখবার জন্যেই রইলুম, আর দেরি করব না।"

অমৃতবাবু সন্তোষের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "না, মশাই! আমার অনুরোধ, আর একদিন থাকুন, আমি নীহার-দিদিকে বলে দিচ্ছি, তিনি যেন কিছুতেই না ছাড়েন!"

সন্তোষ তাড়াতাড়ি অমৃতবাবুর হাত ছাড়াইয়া কহিলেন, "করেন কি মশাই!"

অমৃতবাবু বলিলেন, "কাল আমাদের বাড়ী ব্রাহ্মণ-ভোজন হবে, আপনাকে থাকতেই হবে। আপনার মত একজন বিচক্ষণ লোক থাকা চাই-ই চাই।"

বেলা তখন প্রায় তিনটা, চারিধারে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মাটি তাতিয়া লাল হইয়াছে, নগ্নপদে মৃত্তিকা স্পর্শ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা হয়। এমন সময় ব্রাহ্মণদের ডাক পড়িল। ক্ষণপরে শ্যাম ভটচায, রাখাল মুখুয্যে, প্রসন্ন সামন্ত, ভূতনাথ হালদার, কালিদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মাতব্বর-মাতব্বর ব্রাহ্মণবর্গ, যুবক-সম্প্রদায়, বালকমণ্ডলী, এবং অন্যূন চৌদ্দবৎসরবয়স্কা বালিকা, প্রত্যেকেই এক একটি ঘটি হস্তে আসিতে আরম্ভ করিল।

সংখ্যায় প্রায় একশত আন্দাজ ব্রাহ্মণ সমবেত হইলে, দুইশত আন্দাজ পাতা বাহির হইল, তথাপি কুলান হয় না। সন্তোষ অমৃতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, ব্যাপার কি?"

অমৃতবাবু মুখে একখানা রুমাল জড়াইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছিলেন; সন্তোষের কথায় ক্ষণেক থামিয়া বলিলেন, "আপনি একবার গিয়ে দেখে আসুন।"

ইত্যবসরে তিন-চারিজন গোয়ালা দধি ও ক্ষীরের বাঁকস্কন্ধে প্রবেশ করিল।

অমৃতবাবু আসিয়া বলিলেন, "সামন্ত-খুড়ো, রাখাল দা, আপনারা দই-ক্ষীরগুলো "কুৎ" করে নিন।"

সন্তোষ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "কুৎ কাকে বলে?"

অমৃতবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওটা আন্দাজেরই নামান্তর।"

সন্তোষ বলিল, "কেন, আন্দাজ করবার দরকার কি? ওজন করে নিন না! এর পর জিনিষ ফুরোলে পাত্রগুলি ওজন করে "কড়তা" বাদ দিলেই চলবে।"

"নাহে ছোকরা! তুমি থামো, এখুনি সব হবে।"

সন্তোষ পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিল, বিরাট হুঁকাহস্তে সামন্ত খুড়া ও মুখুয্যে ঠাকুরের দল আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রাখাল মুখুয্যে একটি ক্ষীরের হাঁড়ি হাতে করিয়া বলিলেন, "কত হে?"

সুধাময় গোয়ালা কহিল, "আজ্ঞে এক মোন চার সের।"

রাখাল মুখুয্যে একটু হাসিয়া উচ্চ আওয়াজে কহিলেন, "ওরে, তুই তো সেই

বেহারের বেটা, তোর আবার দাম-দস্তুর কি? ব্যাটা পেসাদ পেয়ে যা।" তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "লেখ হে! বত্রিশ সের।"

সুধাময় হাত জোড় করিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "মশাই, মারা যাব, দোহাই মশায়, গলায় পা দেবেন না।"

সুধার ব্যাকুলতা দেখিয়া সন্তোষ কহিল, "রাখালবাবু, ওতে যদি না দেয়, তবে না হয়——"

প্রসন্ন সামন্ত গর্ব্বস্ফীত মুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "বাবু, সামন্তর কলম একপাই নড়-চড় হবে না।"

পরক্ষণেই আর একটি হাঁড়ি পূর্ব্বোক্ত প্রকার কান্নাকাটিতে "কুৎ" হইয়া গেল। এই প্রকারে অনেকগুলি হাঁড়ি ওজন হইল। সব-শেষে একটি হাঁড়ি কুতের সময় রাখাল মুখুয্যে বলিলেন, "সাড়ে বাইশ সের।"

সামন্ত বলিলেন, "না, স' একুশ সের।" ইহা লইয়া উভয়ে ভীষণ বচসা আরম্ভ হইল। ক্রমেই মাত্রা বাড়িতে লাগিল। শেষে উভয়েরই কল্পিত কথঞ্চিৎ-সভ্য মূর্ত্তির ভিতর হইতে নৈসর্গিক পল্লী-সুলভ স্বভাবমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল! বেছুট গালাগালি! তার পর সামন্ত খুড়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে কহিলেন, "তোকে যদি সমাজ থেকে রহিত কর্ত্তে না পারি, তবে আমার নাম প্রসন্ন সামন্ত নয়! তাহলে আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি * * * * ।" এই বলিয়া রাগে গর-গর করিতে করিতে লাঠি ঠক-ঠক করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সন্তোষ তো একেবারে অবাক!

অমৃতবাবু বলিলেন, "যাক্, যা হবার হয়ে গেল, এখন উপস্থিত যে ক'জন ব্রাহ্মণ আছে, তাদের খাইয়ে দেওয়া হোক।"

সন্তোষ দেখিল, এক ব্যক্তির পাশে একখানি পাতা অনর্থক পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানি যেমন কুড়াইয়া লইতে যাইবে, অমনি তৎপার্শ্বস্থ ব্যক্তি বলিল, "মশাই, ওখানি "ক্রোড়পত্র", ওখানি আর নিয়ে কাজ নেই।" ওদিকে লুচি আসিতে আরম্ভ হইল। প্রথমত একবার তীব্রবেগে বন্ধন-কার্য্য চলিতে লাগিল। অনেকেই বলিল, "আমি লুচি খাব না, অসুখ করেছে। কেবল ক্ষীর আর সন্দেশ খাব।" কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, প্রত্যেকেরই অসুখ বেশ আশ্চর্য্যরকম সারিয়া গিয়াছে! এক একটি ছোট ছোট ছেলে আসিয়াছে, তাহাদের "কড়তা" বাদ যায় না, প্রত্যেকেই এক একটি প্রকাণ্ড "খাইয়ে"!

সন্তোষদের কলেজে সুরেন নামে একটি ছাত্র পড়িত, সে প্রায় বার-তেরখানি লুচি খাইতে পারিত বলিয়া বন্ধু-মহলে খাইয়ে বলিয়া তাহার বেশ একটু পশার-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু এখন সন্তোষ দেখিল, এই সমাজের এক একটি বালকই সুরেনের পূজ্যপাদ পিতামহ!

ভোক্তা-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে রাম ভট্টাচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হে শশী ভায়া! এই সন্দেশটা তোমার কেমন লাগলো? বলতে পার এর দর কত?"

শশী বাঁড়ুয্যে বলিল, "আন্দাজ, সাড়ে সাতাশ টাকা।"

রাম ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞতার চালে বলিল, "নাহে, ছাব্বিশ টাকা সাত আনা।"

সন্তোষ তাড়াতাড়ি বলিল, "থাক্, আর আন্দাজে কাজ নেই, এখনি তো ফৌজদারী বাধবে? আপনারা একটা গল্প শুনুন,—'একজন লোহার মিস্ত্রীর কাছে এক ছাত্র কাজ শিখতে আসে। ছাত্রটি অতিরিক্ত মেধার গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কৃতবিদ্য হল, এমন-কি গুরুকেও ছাড়িয়ে উঠল। মিস্ত্রীর কিন্তু তা নিতান্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। একদিন ছাত্রটি এক নতুন ধরণের কল তৈরি করে সেটা নিয়ে বাজারের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল;—সামনে গুরুজিকে দেখে প্রণাম করে বললে, "আমি, কেমন একটা নতুন কল তৈরি করেছি, দেখুন।"—কল দেখে মিস্ত্রির মুখ শুকোল; তখনি সে এক বুদ্ধি খাটিয়ে বললে, "দেখ ঐখানটা একটু বাঁকা হয়েছে, আচ্ছা, আমি সেরে দিচ্ছি।" এই বলে বাজার-করা গামছার ভিতর থেকে একটি "মূলা" বার করে লোহার গায়ে দুটো ঘা দিয়ে বললে, "এইবার নাও।" ছাত্রটি হেসে বললে, "মুলোটার পান আচ্ছা শক্ত ত?" গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। তার পর যথাসময়ে ভোজন শেষ হইল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান ভূগোলের দিগ্‌দর্শন

ভূগোল এখন আর উপেক্ষণীয় ইস্কুলের পাঠ্য বিষয়মাত্র নহে, আধুনিক জীবন-সমস্যার অনেক কথাই এখন ভূগোলের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সভ্যতার বিকাশ ও পরিপুষ্টির অনেক তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত আছে। ইহার গবেষণার জন্য এখন বহু সমিতি ও বিভাগ সভ্যদেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুধীগণ এ বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। জীবনযাত্রার সহিত যে বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহার আলোচনার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এ প্রবন্ধে ভূগোলের সহিত সভ্যতা-বিকাশের সম্বন্ধের কিঞ্চিৎ আভাস দিব মাত্র।

বাণিজ্য-সর্ব্বস্ব ইয়ুরোপীয় জাতির উন্নতির মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে ভৌগোলিক সংস্থানই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই সুদূর অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভৌগোলিক আবেষ্টনই (Environment) ইয়ুরোপীয় জাতির উন্নতির পথনির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে। ইয়ুরোপীয় উন্নতির প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতে পাই, ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্ব হইতেই প্রধানতঃ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার কারণ ক্ষণকাল

চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। যে সকল দেশ সাগরের উপকূলে বিস্তৃত ও সহজে সমুদ্রপথে অন্যান্য দেশ-সকলের সহিত মিলিতে পারিত, সেই সকল দেশই সকল জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থা কি দেখিতে পাই! গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিবেষ্টিত, সমুদ্র আসিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে উহার স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীসের ন্যায় শতধা-বিভক্ত উপকূল ভূমধ্য-সাগরবর্ত্তী আর কোন ভূখণ্ডেরই নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে যে অনুকূল, তাহা একটী সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। এই অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়াই গ্রীকৃগণ একদিন ইয়ুরোপীয় সভ্যতায় আদি প্রস্রবণ ছুটাইতে পারিয়াছিলেন। এবং সেই কারণেই গ্রীস ভূমণ্ডলমধ্যে কিছুদিনের জন্য স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাণী, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কেন্দ্রভূমি হইতে পারিয়াছিল। গ্রীসের পর ইয়ুরোপে ইটালীর অভ্যুদয়। দেখিতে পাওয়া যায়, ইটালী ভূমধ্যসাগরের অপেক্ষাকৃত মধ্যবর্ত্তীস্থানে অবস্থিত, এবং সেই কারণে পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশসমূহের গমনাগমন-স্থল হওয়ায় ভূমধ্যসাগরের অন্তঃপাতী জাতি সকলের মধ্যে সে একাধিপত্য করিতে পারিয়াছিল। ফিলিসিয়ায় বণিক্‌গণের একান্ত অধ্যবসায় সত্ত্বেও, উক্ত দেশের বাণিজ্য কিছুকালের জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেও, পরিশেষে রোমের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে নাই। কার্থেজও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা লইয়া লাটিন জাতির সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালের রোমকগণের শক্তির প্রাধান্য তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক তেজেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নাই, দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপরও যথেষ্ট নির্ভর করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্যের মূলেও প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্সও আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। স্পেন দেশও দুই সাগরের উপকূলবর্ত্তী হওয়ায় স্পেনিয়ার্ডগণ দুই সাগরে সহজে কার্য্যক্ষেত্রে বিস্তৃত করিতে পারিয়াছিল এবং বণিগ্‌জাতিগণের মধ্যে কিছুদিনের জন্য আধিপত্যলাভ করিয়াছিল। কিন্তু সাগরের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় স্পেনকে ইউরোপের অন্যান্য অংশের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে হইয়াছিল, সুতরাং স্পেনের ভাগ্যে ফ্রান্সের মত অপেক্ষাকৃত মধ্যদেশবর্ত্তিতার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই।

এইবার জার্ম্মাণীর কথা ধরা যাউক। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতির সুবিধাবশতঃ জার্ম্মাণীর পক্ষে ইয়ুরোপীয় ভূখণ্ডের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পক্ষে সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনৈতিক অন্তর্বিরোধ উহার ভৌগোলিক সংস্থিতির সুবিধাগুলি বহুকাল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। পরে যখন জার্ম্মাণী ধীরে ধীরে সুগঠিত একটী মিলিত জাতিতে পরিণত হইল, তখন এই প্রাকৃতিক সুবিধাগুলি তাহার বিবিধ উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। বর্ত্তমান

জগতে তাই জার্ম্মাণী একটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য।

এই সকল উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃতিক অবস্থা জাতিসমূহের উন্নতির প্রধান সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে। উল্লিখিত সাধারণ তথ্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া অবশ্য বিশেষ অনুসন্ধান-কার্য্যও চালিত হইতে পারে। বহু শতাব্দী ধরিয়া কোন কোন জাতি কি কারণে উপনিবেশ রক্ষা করিয়াছিল এবং কি কারণেই বা অপর জাতিসমূহ উপনিবেশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা ভৌগোলিক জ্ঞান ব্যতীত কোন মতেই হইতে পারে না। গ্রীক্‌গণ যে কারণে উপনিবেশ স্থাপনায় অতিমাত্র ব্যাপৃত হইতেন, তাহা ভূমধ্যসাগরের মানচিত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। যখন ইউরোপীয় জাতিসমূহের উপনিবেশ স্থাপনকার্য্য ভূমধ্যসাগর ছাড়াইয়া বহির্দ্দেশে বিস্তৃত হইল, তখন ভূমধ্যসাগরের তীরবাসী কোন শক্তিই মহাসাগরের উপনিবেশকার্য্যতৎপর জাতিসমূহের সহিত তুল্যসামর্থ্যে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। ইটালী অবশ্য কখনও উপনিবেশ রচনা-কার্য্যে যোগদান করে নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ,—যথা, পোর্টুগাল, হলাণ্ড ও দেনমার্ক নৌবিষয়ক সমৃদ্ধিতে বলশালী থাকায় বহু ঔপনিবেশিক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিল। ঔপনিবেশিক রাজ্যবিস্তারে চরম দৃষ্টান্তস্থল অবশ্য ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি অবশ্য উপনিবেশে। চারিদিকে সাগর ও তীরে তীরে বড় বড় বাণিজ্যবন্দর থাকায় অথচ ইয়ুরোপের মূল ভূখণ্ডের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ইংলণ্ডের সম্মুখে যাবতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থায় লালিতপালিত হইয়া ইংরাজগণ আজ নৌবিদ্যা ও বাণিজ্যের সাহায্যে জগৎ জুড়িয়া আত্মপ্রাধান্য বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অভাব ও প্রতিকার

(ক্রপটকিন হইতে)

অনেকে মনে করেন যে, প্রত্যেক সঙ্ঘের একটি করে' সাধারণ পাকশালা স্থাপন করা উচিত; প্রতি বাড়ীতে পৃথক রন্ধনের ব্যবস্থার চেয়ে তাতে খাদ্য, জ্বালানি সামগ্রী ও পরিশ্রম কিছু কম হবে এবং সময়ও কিছু বাঁচবে। এ ব্যবস্থা অনেক দেশে অনেকবার হয়েছে এবং সুফলও যে ফলে নি তা নয়; কিন্তু এটা আমরা জনসাধারণের উপর চাপাতে চাই না, তাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপরই এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে;

এ-সম্বন্ধে ভাল ব্যবস্থা যাই হোক, সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করে' নেবে,—কারণ কোন-রকমে তাদের স্বাধীনতার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না। পরণের কাপড়, শয়নের ঘর ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ সম্বন্ধে তারা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করবে; অবশ্য, এটা যেন কেউ মনে না করেন যে, প্রত্যেকে নিজের জন্যে ভালটি বেছে নেবে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় না, এবং এবার তাদের বেলাই যে ইতিহাস ভিন্ন পথে যাবে তাও আমরা বিশ্বাস করি না। বলাবাহুল্য, এটা মনে রাখা উচিত যে, অনভ্যস্ত পথে যাবার দরুণ যদি কারুর কিছু ভুলচুক হয় তবে সেজন্য সেই-ই দায়ী—যদিও সে ভুল শুধরাতে সে দেরি করবে না।

জনসাধারণের চিন্তার ধারা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন যে, বাসগৃহসম্বন্ধে তাদের ধারণা একটা নির্দ্দিষ্ট মতে এসে পৌঁছেছে। এতদিন বাড়ীর মালিকই বাড়ীর স্বত্বাধিকারী বলে' রাজশক্তির কাছে সম্মান পেয়ে এসেছে, কিন্তু জনসাধারণ এখন সে-কথা আর মানতে চায় না। এ মতটা কেউ তাদের উপর জোর করে' চাপায়-নি—তাদের মন থেকেই এটা উঠেছে। কেউ তাদের বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব গৃহ-অধিকারকে বোঝায়। মালিক বাড়ী তৈরি করে-নি—ছুতারের দোকানে, ইটের ক্ষেতে, কারখানায় সামান্য মজুরীতে পরিশ্রম করে' অসংখ্য লোক বাড়ী গেঁথেছে, সাজিয়েছে, বাসযোগ্য করেছে। এর পিছনে যে মোটা টাকা খরচ হয়েছে সেটাও মালিকের শ্রমসঞ্জাত নয়—কর্ম্মী-সাধারণকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বঞ্চিত করে' এই টাকা সঞ্চিত হয়েছে; কাজেই মালিকের অধিকার যে কতটুকু তা সকলেই বুঝতে পেরেছে সে বাস করে বলেই বাড়ী তার, এ কথা গায়ের জোরে বলা যেতে পারে, কিন্তু সভ্য মানুষ গায়ের জোরে সব কাজ করে না, কারণ তাহলে তাকে আবার বর্ব্বরতায় ফিরে যেতে হবে।

গ্রাম ও সহরের পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি করতে কত লোকের দৈহিক পরিশ্রম ও মানসিক উদ্বেগ খরচ হয়েছে, কিন্তু একজন বা একদল মাত্র লোক যে তার ফলভাগী হবে, এ কথাটা সভ্য মানুষের মুখে ভারি অদ্ভুত বলে মনে হয়; নিতান্ত অবিচার না করে' কেউ এর ছোট স্থানটুকু আত্মসাৎ করতে পারবে না। সহরের বড় বড় অট্টালিকা থাকতে কর্ম্মী-সম্প্রদায় এতদিন দুর্গন্ধ আবর্জ্জনাময় কুটীরে বাস করেছে এবং তাদের সামান্য আয় থেকে অশনবসনহীনতার কষ্ট স্বীকার করে ও মালিককে কর যুগিয়েছে; আমাদের ঈপ্সিত পরিবর্ত্তনের ফলে এ অবিচারের মূলোচ্ছেদন হবে, নিশ্চয়। কার্য্যকরী-সমিতি বা থিওরীবাজ মাঝারি দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না-রেখে জন-সাধারণের কাছে এ-কথা প্রচার করতে হবে এবং যখন সকলের মনে ধারণাটা বেশ বদ্ধমূল হয়ে উঠবে, তখন আমাদের কাজ বিনা-বাধায় সম্পূর্ণ হবে। যারা মালিকদের ক্ষতিপূরণের বা তৎসম্পর্কীয় কথা নিয়ে চীৎকার করবে তাদের কথায় কর্ণপাত করবার কোন দরকার দেখি না—

ক্ষতি যা করবার তারা তা করেছে, এবার তার শেষ হবে।

এখন প্রশ্ন এই, কেমন করে' এই চিন্তাকে কাজে প্রকাশ করা যায়? আমরা বিশ্বাস করি জন-সাধারণের মানসিক ও দৈহিক শক্তির সাহায্যে এটিকে সম্পূর্ণ বাস্তব করে' তোলা যায়, তাছাড়া অন্য কোন শক্তির উপর নির্ভর করলে ফল ত হবেই না বরং অপকারের সম্ভাবনাই যথেষ্ট। এ বিষয়ে আমরা কোন বিশেষ বিধি নির্দ্দেশ করব না বা কোন খুঁটিনাটির তর্ক তুলব না, কারণ কার্য্যক্ষেত্রে এর-চেয়ে সুন্দর ও সহজ নিয়মে অনেক বড় কাজ সাধিত হবে; আমরা কেবল একটা আভাস দিতে চাই।

খাদ্যসংগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক দল যা করবেন, গৃহ-অধিকারসম্বন্ধে সেই একই কথা। তাঁদের তালিকায় সহরের সমস্ত বাড়ী ও প্রত্যেক বাড়ীর ঘরের সংখ্যা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের সংখ্যাও সংগৃহীত হবে। প্রতি পল্লীতে একটি করে' দল গঠিত হবে এবং প্রত্যেক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ থাকবে, তাহলে কাজটা সত্বর সম্পূর্ণ হবার যথেষ্ট সুবিধা হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেলে দেশের লোক নিজেদের দরকারমত ঘর দখল করবে—মারামারি না করে'ও শান্তি ও সদ্ভাবে কাজটি চলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, তাহলে ত সবাই ভাল ঘর বা বেশী জায়গা চাইবে!—না, জনসাধারণের মনের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন, ন্যায্য অধিকার ছাড়া তারা আর কিছু চায় না—বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার স্পর্দ্ধা তারা কোনদিন করে-নি—অসম্ভবের মোহে তারা কোনদিনই অন্ধ হয়-নি। তর্কবাগীশরা যাই বলুন, হঠাৎ যে ইতিহাসের ধারা বদলাবে, এমন অসম্ভব কল্পনা আমাদের মাথায় ত আসে না। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার বা আত্মসর্ব্বস্বতা যে নেই, এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু সে সবগুলো ফুটে উঠে—যখন সাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের কথা সভা-সমিতির বৈঠকে গিয়ে পড়ে। যখন একটা দল জনসাধারণের কাজের ভার নেয়—দলের মধ্যে কে বড়, কার সম্মান বা ক্ষমতা বেশী এই নিয়ে তখন মারামারি চলে এবং এমন লোক কেউই নেই যে তখন আপনাকে ছোট করে' সবার পিছনে রাখতে চায়। এইরকমে ছোট-বড়র প্রভেদ; এই অসাম্যের জন্যেই রেষারেষি ও পরস্পরের প্রতি দোষারোপ চলে—দশের মধ্যে এককে বড় করলে সাধারণের মধ্যেও বিষম গোলযোগ উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি জনসাধারণের হাতে সমান অধিকার থাকে তবে হাজার দলে ভাগ করলেও তাদের কাজ সুসম্পন্ন হয়ে উঠবে অথচ তর্ক ও মারামারির মধ্যে পড়ে কোন কাজই পণ্ড হবে না। জনসাধারণকে খুব কমই দেশের কাজে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে তারা এ-সব বিষয়ে বিশেষভাবে অভ্যস্ত—ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে; এবং সেই প্রমাণে আস্থা রেখে বর্ত্তমান বিদ্রোহে তাদের স্বার্থত্যাগ ও বীরত্বের উপর আমরা নির্ভর করছি।

এ কথা কেউ জোর করে' বলতে পারেন না যে, আমাদের মধ্যে সামান্য অসাম্য, অবশ্যম্ভাবী অবিচার ও ব্যবস্থার ত্রুটী থাকবে না—কারণ, সমাজে এমন লোক বিরল নয় যারা দেশের সব চেয়ে মহৎ মুহূর্ত্তে স্বার্থপরতার বিষ ছড়িয়ে বেড়ায়—অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। আমাদের উচিত হচ্ছে, ত্রুটী-পতন হবে কিনা ভাবার এবং সেই ভয়ে জবুথবু হয়ে বসে' থাকার চেয়ে কোমর বেঁধে যাতে সেইগুলো দূর করা যায় তার চেষ্টা করা। মানুষ নিজেই সম্পূর্ণ হবার অধিকার পায়-নি,—তবে চেষ্টা করবার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত নয়।

মানব-জাতির অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের শিক্ষা ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের উপদেশে আমরা বুঝেছি যে, যাদের জন্যে কিছু করতে হবে, বিশ্বাস করে' তাদের হাতে কাজের ভার দেওয়াটাই সব-চেয়ে নিরাপদ পথ। পুঁথি-পত্রে হিসাব যারা করে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হবারই কথা; কিন্তু জনসাধারণ নিজেরাই জানে, তাদের অভাব কোথায় এবং সেই অভাব মেটাবার উপায় কি? খাতার হিসাবে অনেক ত্রুটী আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা খুবই কম; বেশীর ভাগ নিজের কাজ পরে, করে'-দেওয়া ও নিজে-করার মধ্যে যা প্রভেদ, সেটা ত সকলেরই জানা আছে।

সহরের সব বাড়ী যে সকলের মধ্যে সমান ভাগ করে' দিতে হবে এমন কোন কথা নেই—তার কোন দরকারও দেখি না! প্রথম প্রথম নানারকম অসুবিধা

ঘটবে কিন্তু অধিকারচ্যুতি যারা প্রার্থনা করে এবং শান্তি ও স্বাধীনতা যাদের লক্ষ্য, সেই জনসাধারণের পক্ষে সেগুলো মোটেই গুরুতর হবে না। এতদিন ছুতার রাজমিস্ত্রী পরের দাসত্ব করেছে, এখন তারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আমাদের সাহায্য করবে। এবং শিক্ষিত লোকের সাহায্যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পুরাণো সহরের জায়গায় আমরা নূতন নূতন সহর গড়ে তুলব—আগেকার বাসগৃহের সমস্ত অসম্পূর্ণতা দূর করে' তাকে স্বাস্থ্যের ও সুখের মন্দিরে পরিণত করব।

এই গৃহ-অধিকার এবং বিনা-করে বসবাস, সঙ্ঘ-স্থাপনের পথে আমাদের আর-একটু অগ্রসর করে' দেবে—এর ফলে একক বা স্বতন্ত্র সম্পত্তির মূলে যে কুঠারাঘাত হবে, তাতে সেটা আর টিঁকবে না। ধনী বিলাসীর গৃহের অধিকারচ্যুতির মধ্যে সামাজিক বিদ্রোহের সমস্ত বীজ নিহিত—এর ফলের উপরে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—হয় আমরা সঙ্ঘস্থাপনের পথে সোজাসুজি এগিয়ে যাব, নয়ত শক্তিশালী অবিচারী একের বা দলের পায়ের তলায় পড়ে' দুঃসহ জীবনভার আরও দুঃসহ আরও অপমানজনক করে' তুলব।

এই বাসগৃহ-অধিকারের দিনেই জনসাধারণ বুঝবে যে, ঈপ্সিত নবযুগ এসেছে, শক্তিশালী, মহাজন বা মালিকের জোয়ালের তলায় মাথা গলিয়ে তাদের আর পরিশ্রম করতে হবে না, সাম্যের মন্ত্র সত্য এবং আমাদের এই বিদ্রোহ অভিনয় মাত্র নয়।

আমাদের অধিকার-লাভের পথে বাধা

হচ্ছে মাঝারির দল, কারণ তারাই সমিতি গড়ে' এর বিপদ ও বাধার দীর্ঘ আলোচনা করবে এবং নানারকমে বিজ্ঞতা প্রকাশ করে' সকলের কাছে এই অধিকারচ্যুতিকে ঘৃণার জিনিষ করে' তুলবে। এই চোরা বালির চরই আমাদের স্বাধীনতা-জাহাজের পক্ষে ভয়ানক ও মারাত্মক, কিন্তু জন-সাধারণ যদি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে, নিজেদের হাতে কাজের ভার নেয়, তবে হাজার বিপদ আসুক—আমাদের ভাবনার কোন কারণই থাকবে না। অভাব-অসুবিধাকে আমরা ভয় করি না, যথার্থ বিপদের সম্ভাবনা সেদিকে নেই; আমরা ভয় করি কাপুরুষতাকে, সঙ্কীর্ণতাকে ও অন্ধসংস্কারপ্রিয়তাকে এবং এ-সবের পুরোহিত মাঝারি-দলকে;—কারণ, তারা অর্দ্ধেক মন নিয়ে কাজে যোগ দেয় এবং শেষে কাজ পণ্ড না করে' ছাড়ে না। আমরা চাই সাহস—অন্যায় দমন করবার, জড়ত্ব ভাঙ্গবার, যুগসঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর করবার সাহসই আমাদের প্রধান অস্ত্র। জনসাধারণের চিন্তায় যখন সাহসের পরিচয় পেয়েছি, তখন কাজেও সাহসের অভাব হবে না, এই আমাদের বিশ্বাস।

তর্ক করা যাদের ব্যবসা, তারা গোড়া থেকেই বলবে, সহরের জন্যে তোমরা সুবন্দোবস্ত করছ কিন্তু পল্লীর দুঃখদারিদ্র্য নিয়ে ত কিছু আলোচনা করছ না—সহরের লোকেরা যত প্রাসাদ-অট্টালিকা দখল করে' সুখে থাকবে আর কৃষক ও মজুর তাদের অন্ধকার কুঁড়ের মধ্যে দুঃখভোগ করবে—একি একটা কথা!

তার্কিকরা ভুলে যায় যে, পল্লীর চেয়ে সহরের ঘর-বাড়ীর অবস্থা বেশী শোচনীয়। এরা ভুলে যায় যে, সহরের লোকেরা এতদিন এই-সব অপরিষ্কার, দুর্গন্ধ এবং বদ্ধ ঘরের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরায় সপরিবারে বাস করেছে এবং তাদেরই রক্তশোষক ধনীর সুখসাচ্ছন্দ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছে; এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচার দূর করাই আমাদের বিদ্রোহের প্রধান কর্ত্তব্য। বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় সহর ও পল্লীর মধ্যে যা-কিছু প্রভেদ থাকবে, শীঘ্রই তা দূর হয়ে যাবে—যেদিন গ্রামের লোক বুঝবে তারা আর জমিদার, বণিক বা মূলধনী মহাজনের বা শাসন-তন্ত্রের ক্রীতদাস বা ভারবাহী পশুমাত্র নয়—তারা স্বাধীন, তারা মানুষ, সেদিন নিজেদের ঘর-বাড়ীর উন্নতি করতে তারা বিরত হবে না; এমন-কি, তর্কওয়ালাদের পরামর্শেও কোন আশঙ্কা না-করে' তারা কাজে লেগে যাবে।

আর-একটা তর্কও খুব মস্ত হয়ে উঠেছে। একজন হয়ত অনেক বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে' অর্থসঞ্চয় এবং সেই অর্থে মনের মত বাড়ী তৈরি করেছে—আমরা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব কোন্ মুখে? এ-কথা শুনে অবশ্য আমাদেরই লজ্জা হয়, আমরা যারা সবায়ের সুখস্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করছি! আমরা বলি, যদি তার বাড়ী কেবল তার পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে সে সেখানেই থাকবে, কিন্তু যদি ঘর বেশী থাকে এবং যদি সে ভাড়া দেয় তবে আমরা ভাড়াটেকে

কর দিতে বারণ করব। যে যেখানেই থাক্, বিনা-করে, বিনা-বাধ্য-বাধকতায় থাকবে, তাগিদদার, মহাজন বা করসংগ্রাহকের মুখ-চেয়ে থাকবার দিন গেছে। সামাজিক পরিবর্ত্তন ও সঙ্ঘস্থাপনের ফলে অনেক অন্যায় ও অত্যাচার জগতের বুক থেকে চিরতরে নির্ব্বাসিত হবে।

আমাদের এই পরিবর্ত্তন ও নূতন বন্দোবস্তের কথায় অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তাই তারা তাড়াতাড়ি একটা বন্দোবস্ত করতে চায়; তারা,—যারা এই নূতন ব্যবস্থার চাঞ্চল্যে আলস্যের তথা দাসত্বের আস্তানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তারা ভুলে গেছে যে, আগেকার কালে যখন অর্থলোভী, অত্যাচারী গৃহস্বামী নিজের ইচ্ছামত সকলকে ঘর-ছাড়া করত, তখন ত কেউ কোন প্রতিবাদ করে-নি—সে উদ্ধত অবিচার সে অপমানকে তারা কোন-দিন মনের কোণেও ঠাঁই দেয়-নি, অথচ আজ ভাইয়ের মিলনের দিনে বিবাদের অনৈক্যের মন্ত্রপাঠ করে'—তারাই আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে' তুলছে। কোন-কিছুর পরিবর্ত্তন হলেই প্রথম-প্রথম একটু গোলযোগ, সামান্য অসুবিধা হয়, কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে না। অবশ্য শাসন-তন্ত্রের অধিকারে যখন গরীবের উপর অত্যাচার চলে তখন ধনীদলের মাথার চুলটি পর্য্যন্ত নড়ে না, কিন্তু যাদের উপর এতদিন শ্রাবণের ধারার মত অত্যাচার বর্ষিত হয়েছে, সভ্যতার পুরোহিত সেই কর্ম্মী-সাধারণের উন্নতির দিনে আমরা কারও মুখ চেয়ে তাদের সামান্য মাত্রও ক্ষতি করতে পারব না। একেকে বড় করে' দশের উপর অত্যাচার করানো, আমাদের বিধি নয়—আমরা চাই সার্ব্বজনীন কল্যাণ; এবং সে কল্যাণ-সাধনের ভার সাধারণের হাতে।

আমাদের বিশ্বাস, ধনীজনের সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব না—দরকার-মত ঘর রেখে বাহুল্য-স্থানটুকু ছেড়ে দিতে তারা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করবে না; কারণ, এখন থেকে নিজের হাতে সকলকে সব কাজ করতে হবে, সে হাজারজন দাসদাসী আর ত হুকুম তামিল করবার জন্যে জোড়হাতে অপেক্ষা করবে না! বড় বড় অট্টালিকায় তারা একলা থাকবে কি করে'? স্বাবলম্বী ও নিঃসঙ্গ জীবনে প্রতিবেশীর সঙ্গ নিশ্চয় তাদের কাছে মধুর লাগবে। দলের বা নিজের স্বার্থসাধন করতে মানুষ কিছু অন্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের বিদ্রোহ সফল হলে এবং নূতন বন্দোবস্তের ফলে সকলের মধ্যেই শান্তি ও মৈত্রী বিরাজ করবে।

ঘর-বাড়ী সহরবাসী সাধারণের অধিকার-ভুক্ত হলে, খাদ্য-বিতরণের সুবন্দোবস্তের পর বসনসংগ্রহের দিকে আমরা মন দেব। জনসাধারণের নামে সহরের সমস্ত কাপড়ের দোকান ও গুদামঘর অধিকার করাই এর একমাত্র উপায় এবং সঙ্ঘের সকলেই আবশ্যকমত সেখান থেকে বসন সংগ্রহ করবে। স্বেচ্ছাসেবকদল পূর্ব্বের মত তালিকা তৈরি করবেন, বিতরণের ভার নেবেন এবং যাতে কারুর কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। খাদ্য বিতরণে আমরা যে নিয়মে অগ্রসর হয়ে

ছিলুম বসন-বিতরণেও আমরা সেই এক নিয়মে চলব অর্থাৎ যা বেশী থাকবে তা সবাইকে বিনাবাধায় ভোগ করতে দেওয়া হবে; কিন্তু যা-কিছু কম বা কম হবার সম্ভাবনা, তাই শুধু ভাগ করে' দেওয়া হবে। যতক্ষণ তৈরি জামা-কাপড় দোকানে পাওয়া যাবে ততক্ষণ সবাই তা নেবে, যদি অভাব হয় তবে দেশের স্বাধীন দরজি-দল শীঘ্রই সে অভাব পূরণ করবে—উন্নত যন্ত্র-পাঁতির সাহায্যে কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে সেটা বাস্তবিকই সম্ভব। আমরা কারও গা থেকে জামা-কাপড় কেড়ে নেবার বন্দোবস্ত করছি না; কিম্বা সহরের সমস্ত বস্ত্র এক জায়গায় জমিয়ে লটারী করে বিতরণ করতেও চাই না,—এ কথা মনে আসে শুধু তর্কওয়ালাদের। যার যা আছে তার তাই থাকবে, একটা কেন দশটা থাকলেও কেউ তা নিয়ে ঝগড়া করবে না—তা ছাড়া পরের অঙ্গশোভা নিয়ে নিজের অঙ্গ আবরণ করতে কেহই চাইবে না। দেশে জামা-কাপড়ের অভাব নেই; নতুন ছেড়ে পুরাণো নিয়ে টানা-টানি করবে কিসের জন্যে!

যারা আমাদের কাজে গোড়া থেকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে তারা বলবে—তাহলে ত সবাই কল্কাদার ভেলভেটের জামা আর রেশমী কাপড় চাইবে! আমরা এ-কথা বিশ্বাস করিনা—সকলেই কিছু রেশমী কাপড় আর মখমলের জামার ভক্ত নয়—বাবুয়ানি করবার সখও সকলের নেই। কাজের সুবিধামত সহজ অথচ সুন্দর পোষাকই অনেকের মনের মত। এখন যে পোষাক সমাজে চলছে তখনও যে সেই পোষাক চলবে, এমন কোন কথা নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিও বদলায়। রাষ্ট্রে ও সমাজে আমরা সহজ ও সরল বন্দোবস্তের জন্যে লড়ছি, অন্য বিষয়েও তেমনি সেইদিকে চেষ্টা করব এবং আশা করি, পরিবর্ত্তনের ফলে জীবনকে সরল, সহজ ও সুন্দর করবার জন্যে সকলেই চেষ্টা করবে।

বর্ত্তমানে সবাইকে মখমলের জামা বা রেশমী কাপড় না দিতে পারলেও সাধারণের মধ্যেও সেগুলি বাহুল্য বলেই বিবেচিত হবে। একদিন যা বিলাস-সামগ্রী বলে' বিবেচিত হয়েছে জন-সাধারণের চেষ্টায় আর একদিন হয়ত তাইই সাধারণের ভোগের জিনিষ হয়ে উঠবে! প্রভেদ যখন কোথাও থাকবে না তখন একজন যা করবে, তা সাধারণের ভোগে লাগবে; কাজেই গোড়ায় যা ত্রুটী থাক্, ভবিষ্যতে তা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

আমাদের কথায় দু-একজন শিল্পপ্রিয় লোক কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন; তাঁরা বলছেন—আমরা এই রকম করে' অগ্রসর হলে সব জিনিসই একরকম ও একরঙ্গা হয়ে উঠবে এবং জীবনে ও শিল্পে যা-কিছু সুন্দর তা বাদ পড়বে এবং ক্রমেই লোপ পাবে। কিন্তু আমরা তার প্রতিবাদ করছি। কারণ, এ-রকম হবার কোন সম্ভাবনাই নেই, আমরা পরে দেখাতে চেষ্টা করব, লক্ষপতি না-হয়েও কেমন করে' শিল্পরুচির পরিতৃপ্তি সাধন করা যায়। অধিকন্তু, এতদিন যা দু-দশজনের অধিকারে ছিল তাকে আমরা

সর্ব্বসাধারণের কাছে হাজির করব—শিল্প-কলার তাতে উন্নতি বৈ অবনতি হবেনা।

রোগী বা দুর্ব্বল লোকদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ করে' আলোচনা করি-নি; তার কারণ সঙ্ঘকে তাই নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না—স্বতন্ত্র লোকের চেষ্টায় তাদের ব্যবস্থা হবে। যে-সব দেশে আগে এই সঙ্ঘের ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে, সেখানে এইরকমেই তাদের তত্ত্বাবধান করা হয়। অন্যলোকের পক্ষে যা বিলাসিতার উপকরণ, রোগীর পক্ষে তা বিশেষ আবশ্যক হলে তাকে সেইটি সংগ্রহ করে' দিতে কেউ সঙ্কোচ বোধ করবে না এবং দুর্ব্বলকে সাহায্য করতে কেউ যে পিছপাও হবেন, এমনও মনে করি না। ব্যক্তিগত কাপুরুষতা ও বীরত্বের মত সামাজিক কাপুরুষতা ও বীরত্বও দেখা যায়। আজ আমাদের সমাজে ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের পর এ-সব লোপ পাবে। তকমা-আঁটা আফিসের লোকের হাতে যে শক্তি কেবলমাত্র অত্যাচার ও অবিচারের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে, বিদ্রোহের সময় মহানুভব লোকের হাতে সে শক্তি মহত্বের ও কল্যাণসাধনের পথে আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিনের বীরত্বে ও স্বার্থত্যাগে আত্মসর্ব্বস্ব মনে-কৃপণ যে, সেও লজ্জিত হবে এবং এই মহত্বের প্রশংসা করবে। আমাদের দলের মধ্যে এই ত্যাগের ও মহত্বের আদর্শ চিরজাগরুক থাকবে, এমন আশা করি না; কিন্তু কাজের আরম্ভে এগুলি থাকলে ভিত্তিটা শক্ত হবে এবং কাজটাও সুন্দর হবে। ধ্বংসের অস্ত্র নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করি-নি,—প্রতিশোধও আমরা নিতে চাই না; আমরা শুধু অন্যায়কে, কুৎসিতকে নষ্ট করতে চাই; অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে মৈত্রী ও সহানুভূতিকে আমাদের দরকার। দৈনিক অভাব সহজে মিটলে কারুর কোথাও বাধবে না এবং ত্যাগ না করেও পরস্পরে মৈত্রী রাখা কঠিন হবে না—বরং তাতে আমাদের উন্নতির সুবিধাই হবে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

অরোরা

অরোরার সঙ্গেও যে অবিনের পরিচয় ছিল সেটা আমি জানতেম না। সে কবিতা করে সুতরাং চাঁদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রামধনুকের সঙ্গেও তার আলাপ থাকা সম্ভব, কিন্তু অরোরার বাসা—সেখানেও যে তার গতি-বিধি এটা একেবারেই আমি ভাবি-নি!

কমলালেবুর মতো পৃথিবীর সব গোল ঠিক যেখানটিতে চাপা এবং যে রাজ্যটা বেশ-একটু গভীর সেইখানেই চিরশীতল

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

মণিমন্দিরে না-দিন না-রাত্রির দেশে একাকিনী অরোরা আলো বিতরণ করেন। লক্ষকোটী রামধনুকের শোভা এককোরে ঝালর বানিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে যে বাহার, বিনা-বরের বাসরে অরোরার রূপ কতকটা সেই ধরণের। নব-নব সৌন্দর্য্যের, রঙের এবং আলোর সে যেন একটা ভরা জোয়ার বা চীনেভাষায় যাকে বলে 'টাইফুঁং'।

অরোরা সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা আমার দূরে থেকে। জলজীয়ন্ত অরোরার বাসায় গিয়ে তার নির্ভূল পরিচয় এ-পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে-নি; কেননা সেদিন পর্য্যন্ত আমি সেই দলভুক্ত ছিলেম যে-দলের কাছে রামের ধনুক, অরোরার রঙ্গ-মঞ্চের রং এমনি আরো অনেকগুলো জিনিষ হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ তিথিতে পটোল ঝিঙে ইত্যাদির মতো একবারে বর্জ্জনীয় ছিল। আমি তখন কি জানি যে তলে তলে আমার দলেও সব চলে? সেটা জানলে ও-দল থেকে নামকাটা সেফয়ের তো অবিনের বদলে এসে ভর্ত্তি হবার দরকার ছিল না।

যাই হোক, সেই অমাবস্যার রাত্রে তারার জুঁইফুলে সাজানো নীল আকাশের নীচে কলকাতার অন্ধকার গলিতে আমরা দুই বন্ধু যে অরোরার বন্ধ খিড়কি খোলা না পেয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান ও হতাশ হয়ে রাত সাড়ে-চারটেয় আহিরিটোলার ঘাটের রানায় বসে পয়লা এপ্রেলের সকালবেলার প্রতীক্ষা করে রইলেম সেটা স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা নেই বা সে লজ্জার কথাটা গোপন করতে দুটো মিথ্যে কথাও এখন আর আমার বলবার আবশ্যক হয় না,—অবিনের দলে মিশে এটা একটা সুবিধে আমি দেখছি।

অরোরার অভিসারে বেরিয়ে আর-কখনো অবিন এমন নিরাশ হয়েছিল কিনা বলতে পারিনে, তবে আমার সঙ্গ-দোষেই যে এরূপটা ঘটলো পয়লা এপ্রেলের ঠিক পূর্ব্বরাত্রে আমাকে সেটা জানাতে অবিন কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না এবং আমিও সেটা মেনে নিলেম, কেননা দল ছাড়বার পূর্ব্বে আমার আগের দলের যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা বিশেষ করে আমারি উপরে দীর্ঘনিশ্বাস ও হুঙ্কার-গুলো নিক্ষেপ করে, পিতৃপুরুষের সঞ্চয়টার সঙ্গে নিজের উপার্জ্জিত পয়সা রূপ গুণ ও যৌবন নিয়ে তাঁদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনায়। ইংরেজীতে এপ্রেলের ওই সম্ভাষণটাই আমাকে দিয়েছিলেন—যদিও মাসটা ছিল অন্য।

খানিক বসে থেকে অবিন মরীচিকামুগ্ধ হরিণের মতো অন্ধকারে আর-একবার তার অরোরার সন্ধানে ঘুরে মরতে গেল অলিতে-গলিতে। আমি একা ঘাটে যেখানটিতে সকালের একটি তারার আলো অনেকদূর থেকে এসে অন্ধকার তীরের কাছে জলের উপরে নেমে দাঁড়িয়েছে সেইখানটিতে চুপ করে বসে রইলেম। ভোরের হাওয়ায় তখনো হিম মাখানো, নদীর মাঝে ময়লা কুয়াসা গতশীতের ছেঁড়া-কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে। ঘাটের দুধারে বাঁধা সারি-সারি বোঝাই নৌকো জলের ধাক্কায় ঘুম-ভেঙে এক-একবার একটু নড়ে উঠে আবার ঝিমিয়ে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা চিতা কিছুদূরে শ্মশানঘাটের

সমস্তটা এবং অন্ধকারের অনেকখানি আলোতে ভরে দিয়ে জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলছে। চলে যাবার সময়—জ্বলে ছাই হয়ে যাবার বেলায় মানুষ কতটা আলোই না দিয়ে যাচ্ছে! কি আলোর রথই না তাকে নিতে এসেছে—যে হয়তো জীবনের অন্ধকারেই কাটিয়ে গেল রাত্রিদিন!

অন্ধকারের মধ্যে এতখানি আগুনের একটা টান আছে। শিখাগুলো যেন হাত-নেড়ে আমায় ডাকতে লাগলো। মন আমার প্রদীপের চারিদিকে পতঙ্গের মতো কতক্ষণ ধরে ঐ আগুনটার দিকে ঘুরছিল, হঠাৎ একসময় অন্ধকারে একখানা হাত যেন বোধ হল আমার দুই চোখের উপর আস্তে আস্তে চেপে পড়ল। ঠাণ্ডা হাত,—চাঁপাফুল আর হেনার-গন্ধ-মাখানো আঙুলগুলি; পাত্‌লা একখানি আঁচল, হাল্কা বাতাসের মতো উড়ে উড়ে আমার গালে পড়ছে, ঠোঁটের খুব কাছে চন্দনের গন্ধ-ভরা গরম একটা নিশ্বাস অনুভব করছি। আশ্চর্য্য এই যে, সে আমার চোখ টিপে থাকলেও আমি তার মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একেবারে রাত্রির মতো কালো আর তারি মতো স্নিগ্ধ, সুন্দর! আমি একবার তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির উপরে হাত বুলিয়ে চুপি চুপি বল্লেম—'অরোরা'! পিছন থেকে অবিন গলা ছেড়ে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠে বল্লেম—"কিহে তুমি? অরোরা কোথা!" অবিন তার আঙুলটা দিয়ে শ্মশানের চিতা দেখিয়ে বল্লে—"শোনো বলি—"

সকালের হাওয়ায় কুয়াশার সাদা চাদর নাট্যশালার যবনিকার মতো আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। নদীর পশ্চিম পারে চিতার আগুন নিভে গেল। তারি শেষ-আভার মতো একটি সোনার রেখা নদীর পূব-পারের আকাশে ফুটে উঠল! অবিন তার কথা সুরু করে এমন সময় রামা বেহারা এসে খবর দিলে—"ডাক্তারবাবু আয়া।"

এত রাত্রে এখানে ডাক্তারবাবু কেন বুঝতে আমার সময় লাগলো। ঘুম ভাঙলে যেমন আমি ডাক্তারকে বল্লেম—"তুমি যে অসময়ে?" ডাক্তার হেসে বল্লেন—"আপনি আবার গল্পের খাতা নিয়ে বসেছেন? এ-রকম কল্লে আপনার অসুখ কিছুতে সারবে না। লেখা রাখুন, যান্ জাহাজে একটু বেড়িয়ে আসুন।"

লেখবার টেবিল এবং তার উপরে দেয়ালে ঝোলানো পাঁজির প্রকাণ্ড একটা এক এবং তার শিয়রে বড় বড় অক্ষরে এপ্রেল-টার দিকে আমার তখন দৃষ্টি পড়লো। আমি একবার ডাক্তারের দিকে, একবার নিজের দিকে চেয়ে সুবোধ ছেলের মতো গল্পের খাতা বন্ধ কল্লেম। ঘড়িতে তখন বেলা দুটো উনপঞ্চাশ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীলপাখী

তিলতিল
মিতিল
আলো
কুকুর
বিড়াল
রুটী
চিনি
জল
আগুন
নীলশিশুগণ
সময়

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যবনিকার সম্মুখ

তিলতিল, মিতিল, আলো, কুকুর, বিড়াল, রুটী, আগুন, চিনি এবং জল প্রবেশ করিল।

আলো। পরী বেরীলুনের কাছে খবর পেলুম, নীলপাখী খুব-সম্ভব এইখানেই আছে।

তিলতিল। কোথায়?

আলো। এখানে, এই গোরস্থানে, ঐ পাঁচিলের মধ্যে।...যে সব লোক মরে গেছে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাকে গোরের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে।···কোন্-টার মধ্যে আছে, খুঁজে বার করতে হবে।

তিলতিল। কি করে খুঁজবে?

আলো। সে খুব সহজ কাজ। গোর-স্থানে গিয়ে তুমি হীরেটা ঘুরিয়ে দেবে। তাহলেই যারা বেরিয়ে আসবার, হুড় হুড় করে তারা বেরিয়ে পড়বে; আর যারা আসবে না, তাদেরও আমরা মাটীর নীচে দেখতে পাব।

তিলতিল। তারা ক্ষেপে উঠবে না ত?

আলো। না, সে ভয় নেই; তারা টেরই পাবে না, কি হচ্ছে।...তা ছাড়া দুপুর রাত্রে তাদের অনেকেরই বেরুনে অভ্যাস কি না! কাজেই এতে তাদের তত্দ কোন অসুবিধা হবে না।

তিলতিল। এ কি! রুটী আর চিনি অমন ফ্যাকাসে মেরে গেল কেন? মুখে কথা নেই—

রুটী। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি মনে করছি এবার বাড়ী ফিরে যাই।

আলো। (একান্তে তিলতিলের প্রতি) ওদিকে মন দিয়ো না, ওরা মরা লোকের নাম শুনে ভয় পেয়েছে।

আগুন। আমি কিন্তু ভয় করি না!...মানুষ ম'লে আমি ত তাদের পুড়িয়ে থাকি।···এমন এক সময় ছিল যখন আমি ওদের সকলকেই পোড়াতুম।...তখন কত বেশী আমোদই না ছিল!

তিলতিল। টাইলো অমন কাঁপছে কেন! সেও ভয় পেয়েছে নাকি!

কুকুর। আমি! কই না! আমার একটুও ভয় নেই; তুমি যদি নিয়ে যাও তাহলে আমিও সঙ্গে যেতে রাজী।

তিলতিল। টাইলেটের কি কিছু বলবার নেই?

বিড়াল। (উদাসভাবে) আমি জানি, শেষে একটা কাণ্ড ঘটবে!

তিলতিল। (আলোর প্রতি) তুমিও আমাদের সঙ্গে আসবে ত?

আলো। না, আমি জিনিস আর জানোয়ারদের সঙ্গে গোরস্থানের বাইরে থাকব।···কারণ, মরাদের দেখে এদের কেউ-কেউ ভয়ে আধ-মরা হয়ে যাবে, আবার কেউ বা ভারি অস্থির হয় উঠবে।... মিতিলকে সঙ্গে নিয়ে তুমি একাই যাও।

তিলতিল। টাইলো কি আমাদের সঙ্গে থাকবে না!

কুকুর। হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি থাকব বৈকি! আমার ক্ষুদে দেবতাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকব!

আলো। তা হতে পারে না।...পরীর হুকুম।...তা ছাড়া ভয় করবার কিছু নেই সেখানে।

কুকুর। আচ্ছা, আচ্ছা, না যেতে দাও ক্ষতি নেই।...তবে তারা যদি কোনরকম নষ্টামি করে, তাহলে কি করতে হবে শুনে রাখো! এই এমনি করে একবার শিস্ দিও।...আমিও অমনি সেই দণ্ডে হাজির হব।...জঙ্গলের কথা মনে আছে ত?

আলো। আচ্ছা, তবে এসো; আমি খুব কাছেই থাকব।···আমায় যে ভালবাসে, আমি তার খুব কাছে-কাছেই থাকি কিনা!

পরী ও অন্যান্য সকলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, তিলতিল ও মিতিল দাঁড়াইয়া রহিল। যবনিকা সরিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোরস্থান

কাল—রাত্রি। গ্রাম্য গোরস্থানের উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। ছোট-বড় অসংখ্য কবর—ঘাসের ঢিপি, পাথরের চাপ, কাঠের ক্রুশ্ ইত্যাদি। তিলতিল ও মিতিল একটী প্রস্তর-স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান।

মিতিল। আমার ভয় করছে!

তিলতিল। (তার গাটাও ছম্-ছম্ করিতেছিল) আমার কিন্তু কখ্খনো ভয় করে না।

মিতিল। আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে কি খুব পাজী হয়?

তিলতিল। না, পাজী কি করে হবে? তারা ত বেঁচে নেই!

মিতিল। তুমি কখনো মরা লোক দেখেছ!

তিলতিল। হাঁ, একবার দেখেছি, সে অনেকদিন আগে; তখন আমি খুব ছোট্ট ছিলুম।

মিতিল। কি রকম তারা দেখতে?

তিলতিল। একেবারে শাদা, একেবারে নিশ্চল আর ঠাণ্ডা, কোনরকম কথাবার্ত্তা কয় না। চোখের পলক অবধি কারো পড়ে না!

মিতিল। আচ্ছা, আমরা কি তাদের এখনি দেখতে পাব?

তিলতিল। পাব বৈকি! আলো ত তাই বল্লে।

মিতিল। কোথায় তারা!

তিলতিল। হয় ঐ ঘাসের নীচে, না-হয় ঐ সব বড় বড় পাথরের নীচে।

মিতিল। সারা বছর কি ওরা ওরই নীচে থাকে? দিন-রাত?

তিলতিল। হ্যাঁ।

মিতিল। (পাথরের চাপ দেখাইয়া)

ওগুলো কি তাদের ঘরে ঢোক্‌বার দরজা ?

তিলতিল। হাঁ।

মিতিল। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কি ওরা বাইরে বেরোয় ?

তিলতিল। ওরা কেবল রাত্রে বেরোয়।

মিতিল। কেন ?

তিলতিল। বাঃ, ওরা যে ঘেরাটোপের মধ্যে থাকে।

মিতিল। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন বাইরে আসে ?

তিলতিল। না, বৃষ্টির সময় ঘরে থাকে।

মিতিল। তাহলে, ওদের ঘরগুলো বেশ আরামের ?

তিলতিল। হ্যাঁ, শুনেছি ভারি আঁটা-সাঁটা।

মিতিল। ওদের ছেলে-মেয়ে আছে ?

তিলতিল। আছে বৈকি, যারা সব মরে যায়—

মিতিল। আচ্ছা, ওরা কি খায় ?

তিলতিল। গাছের শেকড় খায়।

মিতিল। আমরা ওদের দেখতে পাব ত ?

তিলতিল। নিশ্চয়; হীরেটী ঘুরিয়ে দিলেই পাব।

মিতিল। আচ্ছা, ওরা কি বলবে !

তিলতিল। কিছুই বলবে না, ওরা কথা কয় না।

মিতিল। কেন কথা কয় না ?

তিলতিল। ওদের কাকেও কিছু বলবার নেই কিনা।

মিতিল। কেন, কিছু বলবার নেই ?

তিলতিল। যাঃ, তুই ভারি বোকা। তোর সঙ্গে আর বক্‌তে পারি না।

উভয়ে চুপ করিল

মিতিল। হীরেটী কখন ঘুরোবে ?

তিলতিল। আগে দুপুর রাত হোক্, না-হলে তাদের কষ্ট হবে যে।

মিতিল। কেন কষ্ট হবে ?

তিলতিল। কারণ দুপুর রাতই হল ওদের হাওয়া খেতে বেরুবার সময় কি না ?

মিতিল। দুপুর হতে আর কত দেরী ?

তিলতিল। গির্জ্জার ঘড়ি দেখতে পাচ্ছ ?

মিতিল। হ্যাঁ, ওই যে ছোট কাঁটাটা—

তিলতিল। দুপুর বাজে-বাজে; ওই যে ঐ বাজছে, শুনছ ?

ঘড়িতে বারোটা বাজিল

মিতিল। আমি পালাই।

তিলতিল। এখন না। এবার হীরেটী ঘুরোই।

মিতিল। না, না; ঘুরিয়ো না। আমি আগে পালিয়ে যাই। আমার ভয় করছে ...বড্ড ভয় করছে।

তিলতিল। কোন ভয় নেই।

মিতিল। না, না, আমি মরা-লোক দেখতে পারব না। বড্ড ভয় করে, আমি দেখতে পারব না।

তিলতিল। আচ্ছা, ওদের দেখতে হবে না; চোখ বোজো।

মিতিল। (তিলতিলকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া) তিলতিল, ভাইটী আমার ! আমার বড্ড ভয় করছে।

...আমি থাকতে পারব না—কিছুতেই না। ওই বোধ হয় ওরা সব বাইরে বেরুচ্ছে।

তিলতিল। অমন করে কেঁদো না। ভয় কি ? এক মিনিটের বেশী ওরা বাইরে থাকবে না।

মিতিল। তুমিও ত কাঁপছ !...ওরে বাবারে !...না জানি, কি ভয়ঙ্কর ওদের চেহারা !

তিলতিল। সময় হয়ে গেছে, এইবার ঘুরুই।

তিলতিল হীরা ঘুরাইয়া দিল। ক্ষণেকের জন্য চতুর্দ্দিক নিশ্চল নিস্তব্ধ হইল। তৎপরে ধীরে ধীরে কাঠের ক্রশ্‌গুলি নড়িয়া উঠিল। মাটীর ঢিপি ফাঁক হইয়া গেল, পাথরের চাপগুলা উঠিয়া পড়িল।

মিতিল। (তিলতিলের আড়ালে দাঁড়াইয়া) এবার সব বেরুচ্ছে, ওই দেখ, বেরুচ্ছে !

তৎপরে কবরগুলির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং অভ্যন্তর হইতে বাষ্পের ন্যায় তরল, শীর্ণ শুভ্র স্পন্দন বিকশিত হইয়া উঠিল। পুষ্পগুলি ক্রমশ স্তবকে স্তবকে জমাট বাঁধিয়া অপূর্ব্ব সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। গোরস্থানটী পরীস্থানের ন্যায় মনোরম এবং উদ্যান-শোভিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ আকাশে উষার উদয় হইল। শিশির-বিন্দু ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল, ফুল ফুটিল। মৃদু-মন্দ বাতাসে বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত হইতে লাগিল। পাখীর দল জাগিয়া গান ধরিয়া দিল। মধুমক্ষিকার গুঞ্জন করিতে লাগিল। তিলতিল ও মিতিল স্মিত চমকিত হইয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া সব দেখিতে লাগিল।

মিতিল। (ঘাসের দিকে চাহিয়া) মরা-মানুষ সব কোথায় ?

তিলতিল। মরা-মানুষ ত এখানে নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

ভবিষ্যতের দেশ

নীলবর্ণ প্রাসাদের সুবৃহৎ দালানে অনেকগুলি শিশু অপেক্ষা করিতেছিল। ইহারা সকলেই জন্ম-গ্রহণ করিবে। হলের আসবাব ও সাজ-সজ্জা সমস্ত নীলরঙের। হলের সর্ব্বত্রই অসংখ্য শিশু জমায়েত হইয়াছিল। তাহাদের বর্ণ নীল এবং পরণের পোষাকও নীল। শিশুদের মধ্যে কেহ খেলা করিতেছিল, কেহ ছুটাছুটি করিতেছিল, কেহ-বা বসিয়া গল্প করিতেছিল। অনেকে ঘুমাইতেছিল এবং স্বপ্নও দেখিতেছিল। কেহ বা যন্ত্র-তন্ত্র লইয়া কাজে ব্যস্ত, কেহ ভবিষ্যতে কোন্ বিষয় আবিষ্কার করিবে তাহা লইয়া তন্ময় ছিল। কেহ ফল লইয়া, কেহ ফুল লইয়া তাহাদের ক্রমোন্নতির উপায়-উদ্ভাবনে ব্যগ্র ছিল।

তিলতিল, মিতিল এবং আলো পিছনের দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে চোরের মত প্রবেশ করিল। তাহাদের আগমনে নীলছেলেদের দলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া অপ্রত্যাশিত, নবাগত এই অতিথিদের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত তাহাদের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

মিতিল। চিনি, বেরাল আর রুটী কোথায় ?

আলো। তাদের এখানে ঢোকবার যো নেই; কারণ তাহলেই তারা ভবিষ্যত জানতে পারবে তখন আর কাউকে মানবেও না।

তিলতিল। আর কুকুরটা ?

আলো। তাকেও জানতে দেওয়া ঠিক নয়, ভবিষ্যতে কি আছে।.. আমি তাদের সকলকে গির্জ্জার এক খিলেনের মধ্যে পুরে তালা বন্ধ করে রেখে এসেছি।

তিলতিল। আমরা তাহলে এখন এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি !

আলো। ভবিষ্যতের রাজ্যে।...ঐ যে ছোট ছেলেগুলি দেখছ, ওরা এখনও পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি।...যে সব তথ্য মানুষের অজানা আছে, এই হীরের দৌলতে সে সব আমরা আজ দেখব।...খুব সম্ভব নীলপাখী এইখানেই আছে।

তিলতিল। এখানে যে পাখী আছে নিশ্চয়ই তা নীল, কারণ এখানকার সব জিনিষই ত দেখচি নীল রঙের।...(চারিদিকে চাহিয়া) আহা, কি চমৎকার! কি সুন্দর জায়গাটী!

আলো। ছেলেগুলি কেমন ছুটোছুটি করছে, দেখ!

তিলতিল। ওরা চটেছে নাকি!

আলো। না, চটবে কেন! দেখছ না, ওরা হাসছে।...ওরা কিন্তু ভারি অবাক হয়ে গেছে।

নীল শিশুগণ। (তাহাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছিল) দেখ দেখ, জ্যান্ত ছেলেরা এখানে এসেছে; ওই দেখ কেমন সব জ্যান্ত ছেলে!

তিলতিল। আমাদের ওরা জ্যান্ত ছেলে বলছে কেন!

আলো। তার মানে, ওরা নিজেরা এখন বেঁচে নেই কি না।

তিলতিল। ওরা তাহলে কি করছে!

আলো। ওদের জন্ম-সময়ের অপেক্ষা করছে।

তিলতিল। জন্ম-সময়ের?

আলো। হ্যাঁ; আমাদের পৃথিবীতে যে সব ছেলে জন্ম নেয়, তারা এই জায়গা থেকেই যায়।...প্রত্যেককে তার নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।...বাপ মা যখন ছেলে চান, তখন এই যে ডানদিকের দরজা দেখছ, এটা খুলে যায়, আর ওখান দিয়ে ছোট্ট ছেলেরা অমনি পৃথিবীতে নেমে পড়ে।

তিলতিল। ওরে বাস্‌রে! কত ছেলে, দেখ!

আলো। আরও অনেক আছে, আমরা সকলকে ত দেখতে পাচ্ছি না। এই হলটার মত এমন ত্রিশহাজার হল আছে, তার প্রত্যেকটীতে এই রকম ছেলে ভর্ত্তি।...সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত কত দরকার, একবার বুঝে দেখ! ...কেউ তাদের গুণে শেষ করতে পারে না।

তিলতিল। আর ওই যে নীল লোক গুলো, ওরা কারা?

আলো। তা ঠিক বলতে পারি না।...বোধ হয় ওরা রক্ষী।...শুনেছি মানুষের পর ওরাই পৃথিবীতে জন্ম নেবে। ...কিন্তু ওদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে বারণ আছে।

তিলতিল। কেন?

আলো। কারণ এটা হল পৃথিবীর গোপনীয় জিনিষ কি না!

তিলতিল। এই ছোট ছেলেদের সঙ্গে কথা কইতে পারি ত?

আলো। নিশ্চয়; তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ কর।...ওই দেখ ওখানে একটি ছেলে রয়েছে, সব চেয়ে ওটি চমৎকার, তুমি ওরই সঙ্গে গিয়ে কথা কও।

তিলতিল। কি বলব?

আলো। যা তোমার খুসী; খেলার সাথীর সঙ্গে যেমন কথা কও।

তিলতিল। আচ্ছা; চুমু খাব, কোলাকুলি করব?

আলো। নিশ্চয়; ও ভারী খুসী হবে তাহলে।...কিন্তু এ রকম মুষড়ে থেকো না...আমি তোমায় একলা ছেড়ে দিচ্ছি, তাহলে বেশ মন খুলে কথাবার্ত্তা কইতে পারবে।...আমি ওই লম্বা লোকটীর সঙ্গে আলাপ করি গে।

তিলতিল। (শিশুটীর কাছে গিয়া তার হাত ধরিয়া) কি ভাই, কেমন আছ! ...(তাহার নীল পোষাক ধরিয়া) এটী কি?

শিশু। (গম্ভীরভাবে তিলতিলের টুপিতে হাত দিয়া) আর এটী?

তিলতিল। এটী? এটী আমার টুপী... তোমার টুপী নেই?

শিশু। না, ওতে কি হয়?

তিলতিল। মাথায় পরে...বৃষ্টির সময়, ঠাণ্ডার সময় খুব কাজে লাগে!

শিশু। 'ঠাণ্ডার সময়,'—এ কথার মানে কি?

তিলতিল। তা জান না? এই যখন কাঁপতে থাক আর দাঁতে দাঁত লেগে হি হি হি হি কর, আর যখন হাত দুটো বুকের উপর রেখে এমনি করে চলতে থাক।

সে তার দুইটা হাত সজোরে বুকের উপর কোণাকুণি ভাবে রাখিল।

শিশু। পৃথিবীটা তাহলে ভারী ঠাণ্ডা জায়গা?

তিলতিল। তা ঠিক নয়। তবে ঠাণ্ডা হয় মাঝে মাঝে; এই যখন শীতকাল আসে, সে সময় আগুন পাওয়া যায় না।

শিশু। আগুন পাওয়া যায় না কেন?

তিলতিল। পাওয়া যায়। তবে বড্ড তাতে খরচ হয় তখন; কাঠ কিনতে পয়সার দরকার যে।

শিশু। পয়সা কি?

তিলতিল। যা দিলে জিনিষ পাওয়া যায়।

শিশু। ওঃ!

তিলতিল। পৃথিবীতে কারো অনেক পয়সা, কারো বা মোটেই নেই।

শিশু। কেন নেই!

তিলতিল। যাদের নেই তারা বড়লোক নয়।...আচ্ছা, তুমি কি খুব বড় লোক? তোমার কত বয়স?

শিশু। আমি শীগ্‌গির জন্মাব।... আর ঠিক বার বচ্ছর পরে।...জন্ম নেওয়া কি খুব ভাল?

তিলতিল। নিশ্চয়ই; সে ভারী মজার!

শিশু। কি করে তুমি জন্মেছিলে?

তিলতিল। সে আমার এখন মনে নেই; সে অনেকদিন আগে জন্মেছিলুম কি না!

শিশু। শুনেছি, পৃথিবী আর জ্যান্ত-মানুষ, এসব ভারী সুন্দর, ভারী চমৎকার!

তিলতিল। হাঁ, মন্দ নয়।...তার উপর সেখানে পাখী আছে, মেঠাই আছে, নানা-রকম খেলনা আছে।...কারো কারো এর সবগুলিই আছে, যাদের নেই তারা কিন্তু এ সব দেখতে পায়!

শিশু। মায়েরা নাকি ছেলেদের অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে?...মাগুলি খুব ভাল; না?

তিলতিল। নিশ্চয়ই; পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের চেয়ে তারা ভাল! টাকাকড়ি, খাবার-দাবার সকলের চেয়ে ভাল! ঠাকুমারা শুদ্ধু...কিন্তু তারা বড্ড শীগ্‌গির মরে যায়!

শিশু। মরে যায়?...সে আবার কি?

তিলতিল। একদিন সন্ধ্যেবেলা কোথায় যে চলে যায়—আর ফেরে না।

শিশু। কেন?

তিলতিল। কে জানে!...বোধ হয় তারা দুঃখু পায়।

শিশু। তোমার মরে গেছে?

তিলতিল। কে? ঠাকুমা?

শিশু। ঠাকুমা কি মা, আমি জানি না।

তিলতিল। এ দুজন কিন্তু এক লোক নয়!...ঠাকুমারাই আগে মরে...বড্ড দুঃখু হয় তাতে...আমার ঠাকুমা আমায় বড্ড ভাল বাসত।

শিশু। তোমার চোখে কি হল! ও কি? মুক্তো?

তিলতিল। না, মুক্তো কেন হবে!

শিশু। তবে?

তিলতিল। আবার!...খুব নীল আর চক্‌চকে, না?

শিশু। হাঁ, ওকে কি বলে?

তিলতিল। কাকে!

শিশু। ওই যে টস্ টস্ করে পড়ছে।

তিলতিল। ও কিছু নয়, একটু জল।

শিশু। চোখ্ থেকে পড়ে বুঝি?

তিলতিল। হাঁ, কখনো কখনো; যখন কান্না পায়।

শিশু। কান্না কি?

তিলতিল। আমি কিন্তু কাঁদছি না; কাঁদলে কিন্তু এই রকম জল পড়ে।

শিশু। সর্ব্বদাই সকলে কাঁদে নাকি?

তিলতিল। না, ছোট ছেলেরা কাঁদে না, ছোট মেয়েরা কিন্তু কাঁদে।...এখানে তোমরা কাঁদ না?

শিশু। না, কান্না কি তা জানি না।

তিলতিল। শীগ্‌গিরই শিখবে।... আচ্ছা, ঐ নীলরঙের বড় বড় দানা নিয়ে ও কি সব খেলছ?

শিশু। এগুলো!...আমি পৃথিবীতে গিয়ে যা আবিষ্কার করব তা তারই জন্য।

তিলতিল। কি আবিষ্কার?...তুমি কি কিছু আবিষ্কার করেছ নাকি?

শিশু। করেছি বৈ কি!...শোননি? ...পৃথিবীতে যখন জন্মাব, তখন এমন কিছু আমায় আবিষ্কার করতে হবে, যা পেলে মানুষ সুখী হয়।

তিলতিল। ও গুলো খেতে কি খুব ভাল?

শিশু। না; তুমি দেখছি, কিছুই জান না!

তিলতিল। না।

শিশু। রোজ এর জন্য আমায় মেহনত করতে হয়...শেষ হয়ে এল আর কি!... তুমি দেখতে চাও?

তিলতিল। হাঁ।...কৈ, দেখাও!

শিশু। ওই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে...দুটো থামের মাঝখানে।

অন্য একটী শিশু। (তিলতিলের কাছে আসিয়া) আমারটা দেখবে?

তিলতিল। হাঁ দেখি।

২য় শিশু। জীবনকে বাড়াবার তেত্রিশ রকমের ওষুধ...ওই যে নীল শিশিতে রয়েছে।

৩য় শিশু। (ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া) আমি তোমায় এমন একটা আলো দেখাব, যার খবর আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না!... (সে নিজেকে আলোকিত করিয়া এক বিচিত্র আলোক-রশ্মির সৃষ্টি করিল) কেমন, খুব চমৎকার নয়?—কি বল?

৪র্থ শিশু। (তিলতিলের হাত ধরিয়া টানিয়া) আমি একটা যন্ত্র তৈরী করেছি, দেখবে এস—সেটা পাখীর মত আকাশে ওড়ে, অথচ তার ডানা নেই।

৫ম শিশু। না, না, আমারটা আগে দেখবে চল, আমি চন্দ্রলোকে গুপ্তধনের আবিষ্কার করেছি।

নীল শিশুগণ। (তিলতিল ও মিতিলের চারিদিকে জড় হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল) না, না। আমার আগে!...আমার সব চেয়ে ভাল!...আমি যা আবিষ্কার করেছি, সে ভারী চমৎকার!...আমারটা চিনির তৈরী! ...ওরটা কিছুই নয়...ও আমার কাছ থেকে ভাব চুরি করেছে!

এই রকম গোলমালের মধ্যে নীল শিশুগণ তিলতিল ও মিতিলকে কারখানার দিকে টানিয়া লইয়া গেল। কারখানাটীও নীলবর্ণের। সেখানে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার জন্য নূতন নূতন যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল। নীল ছেলেরা যে যাহার কাজে লাগিয়া গেল। সেই নক্সা এবং বই খুলিয়া তিলতিলকে দেখাইতে বসিল। কেহ বৃহদাকারের ফুল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফল আনিয়া হাজির করিল।

একটী শিশু। (প্রকাণ্ড আকারের ফুলের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল) আমার ফুলগুলি দেখছ?

তিলতিল। কি ওগুলো?

শিশু। দেখচ না? এগুলো সব ফুল!

তিলতিল। অসম্ভব! এ যে এক একটা টেবিলের মত বড়!

শিশু। কি চমৎকার গন্ধ!

তিলতিল। আশ্চর্য্য!

শিশু। আমি যখন পৃথিবীতে থাকব, তখন এগুলো এত বড়ই হবে।

তিলতিল। কতদিন লাগবে?

শিশু। তিপ্পান্ন বছর চার মাস ন দিন।

আর একটী শিশু এক গোছা আঙুর হাতে লইয়া উপস্থিত হইল। আঙুরগুলা নাশপাতির মত বড়।

শিশু। আমার হাতে এ কি ফল বল দেখি?

তিলতিল। এক থোবা নাশপাতি!

শিশু। নাশপাতি নয়, আঙুর!...আমি যখন তিরিশ বছরে পড়ব, এগুলো তখন এমনি ধারা হবে। আঙুরকে বড় করবার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।...

আর একটী শিশু তরমুজের মত বড় এক ঝুড়ি আপেল লইয়া হাজির করিল।

শিশু। আবার এগুলি কি রকম বল ত!

তিলতিল। ও ত তরমুজ...

শিশু। না, না; এগুলো আপেল। আমি যখন পৃথিবীতে থাকব এগুলো তখন তখন এত বড়ই হবে। আমি তার উপায় বার করেছি।...তিনটী গ্রহের যিনি রাজা, আমি তার বাগানের মালী হব।

তিলতিল। তিনটী গ্রহের রাজা আবার কে ?

শিশু। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি পৃথিবী, মঙ্গল আর চন্দ্রগ্রহে সুখশান্তি দেবেন...এখান থেকে তুমি তাঁকে দেখতে পার।

তিলতিল। কোথায় তিনি ?

শিশু। থামের গোড়ায় ওই যে ঘুমুচ্ছে, ওই ছোট ছেলেটী।

তিলতিল। বাঁ দিকে ?

শিশু। না, ডাইনে।...বাঁ দিকের ছেলেটী পৃথিবীতে কেবলই আনন্দ নিয়ে যাবে।

তিলতিল। কি করে ?

শিশু। এমন সব নতুন ভাব নিয়ে যাবে, যা পেয়ে মানুষ আনন্দে ভোর হয়ে থাকবে।

তিলতিল। ওই যে মোটা-সোটা ছেলেটী নাকে আঙুল দিয়ে রয়েছে, ওটী কে ?

শিশু। সূর্য্যের তেজ যখন কমে আসবে তখন ও এক রকম আগুন আবিষ্কার করবে, যাতে পৃথিবী গরম থাকবে।

তিলতিল। আর ওই যে দুটী ছেলে হাত-ধরাধরি করে রয়েছে, ঘন ঘন এ ওর চুমু খাচ্ছে, ওরা কারা ?...ওরা কি ভাই বোন ?

শিশু। না, ওরা ভারী মজার মানুষ !... ওরা হল প্রণয়ী আর প্রণয়িনী।

তিলতিল। সে আবার কি ?

শিশু। আমিও ঠিক জানি না।...বুড়ো 'কাল' তামাসা করে ওদের ওই নামে ডাকেন। ওরা দুটীতে দিনরাত চোখোচোখি করে রয়েছে, ঘনঘন চুমু খাচ্ছে আর বলছে, বিদায় ! বিদায় !

তিলতিল। কেন ?

শিশু। বোধ হয় ওরা এক সঙ্গে বেশী দিন থাকতে পাবে না।

থামের গোড়ায়, বেঞ্চের উপর, সিঁড়ির পাশে বিস্তর ছেলে গাদাগাদি হইয়া ঘুমাইতেছিল।

তিলতিল। ওই যে ওখানে ঘুমুচ্ছে, ওরা কারা ?...ওরা কি কিছুই করে না ?

শিশু। ওরা কিছু-না-কিছু ভাবছে।

তিললিল। কি ভাবছে ?

শিশু। তা এখন ওরা জানে না...কিন্তু পৃথিবীতে যাবার সময় কিছু না কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। খালি হাতে সেখানে যাবার যো নেই।

তিলতিল। কে বল্লে ?

শিশু। "কাল"। সে ঠিক দরজার উপরটীতে দাঁড়িয়ে থাকে।...সে যখন দরজা খুলবে তুমি তাকে দেখতে পাবে...ভারী ফ্যাসাদের লোক সে।

একটী ছেলে ভিড় ঠেলিয়া দৌড়িয়া আসিল।

শিশু। কেমন আছ তিলতিল ?

তিলতিল। বা রে ! এ আমার নাম জানলে কি করে ?

ছেলেটী আসিয়া তিলতিল ও মিতিলকে আনন্দ ভরে চুম্বন করিল।

শিশু। কেমন আছ ?...বেশ ভাল ত ?...আর একটা চুমু দাও...মিতিল, তুমিও দাও।...তোমাদের নাম জানি, সে আর আশ্চয্যি কি ? আমি শীগ্‌গিরই তোমাদের ভাই হয়ে জন্মাব।...এইমাত্র শুনলুম, তোমরা এসেছ। আমায় জন্মাতে হবে কি না, তাই নতুন নতুন ভাব সংগ্রহ করছিলুম।...মাকে বলো, আমি প্রস্তুত।

তিলতিল। কি ? তুমি আমাদেরই বাড়ীতে আসবে না কি ?

শিশু। নিশ্চয়, ঠিক এক বছর পরে।...আমি যখন ছোট্ট থাকব, তখন যেন আমায় ত্যক্ত করো না।...আগে থেকে তোমাদের চুমু খেতে পেলুম, এতে আমি ভারী খুসী।...মাকে বলো, আমার জন্য দোলনা ঠিক করে রাখতে।...আমাদের বাড়ীটী বেশ আরামের, কি বল ?

তিলতিল। মন্দ নয় !...আর মা আমাদের বড্ড ভাল।

শিশু। আচ্ছা, খাবার আছে ?

তিলতিল। খাবারও আছে।...আমরা মাঝে মাঝে মেঠাই খেতে পাই। কি বল মিতিল ?

মিতিল। হ্যাঁ, তা ঢের পাই ; মা তৈরী করে দেন।

তিলতিল। তোমার এ থলির মধ্যে কি ?...আমাদের জন্য কিছু নিয়ে যাচ্ছ বুঝি ?

শিশু। আমি তিন রকম রোগ নিয়ে যাচ্ছি—হাম, কাশি আর জ্বর।

তিলতিল। ও ! এই কেবল ! তার পর কি করবে ?

শিশু। তারপর ?...তারপর তোমাদের ছেড়ে চলে আসব।

তিলতিল। ও রকম করে চলে আসাটা কিন্তু বড্ড খারাপ হবে।

শিশু। কি করব, বল !...নিজের ইচ্ছামত ত কিছু হতে পারে না।

এই সময় মণিময় স্তম্ভ ও দরজার মধ্য হইতে এক গম্ভীর স্বর শুনিতে পাওয়া গেল এবং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোকে স্থানটী আলোকিত হইয়া উঠিল।

তিলতিল। ও কি ?

শিশু। "কাল"। "কাল" আসছে...সে এই বার দরজা খুলবে।

নীল শিশুদের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন দেখা গেল ; অনেকে যন্ত্রতন্ত্র ফেলিয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। যাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহাদের অনেকে জাগিয়া বসিয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

আলো। (সে আসিয়া তিলতিলের সঙ্গে যোগ দিল) আমরা থামের আড়ালে লুকুই, এস...তাহলে "কাল" আমাদের দেখতে পাবে না !

তিলতিল। ও আওয়াজ কোত্থেকে আসচে ?

শিশু। ভোর হচ্ছে...যে সব ছেলে পৃথিবীতে জন্ম নেবে, তারা এইবার পৃথিবীতে নেমে যাবে।

তিলতিল। কি করে নেমে যাবে ? সিঁড়ি আছে না কি ?

শিশু। দেখতে পাবে।..."কাল" এবার দোরের হুড়কো খুলচে।

তিলতিল। "কাল" কে ?

শিশু। সে একজন বুড়ো...যে সব ছেলে যাবে, তাদের সে ডাকতে আসে।

তিলতিল। ভারী দুষ্টু, বুঝি ?

শিশু। না ; তবে সে কারো কোন ওজর-আপত্তি শোনে না। যাদের যাবার পালা আসেনি, তারা যদি যেতে চায়, তবে সে তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

তিলতিল। পৃথিবীতে যেতে কি খুব আনন্দ হয়?

শিশু। যেতে না পেলে খুব দুঃখ হয়, কিন্তু যাবার সময় হলেও আবার কষ্ট হয়। ...ঐ দেখ, ঐ দেখ, সে দরজা খুলচে।

মণিময় দ্বার আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। দূরবর্ত্তী সঙ্গীতের ন্যায় পৃথিবীর কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল। লাল এবং সবুজ আলোকে স্থানটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "কাল" আসিয়া চৌকাঠের উপর দণ্ডায়মান হইল। সে শীর্ণ, দীর্ঘকায় এবং বৃদ্ধ। তাহার শ্বেত শ্মশ্রু বাতাসে উড়িতেছিল। এক হাতে সুবৃহৎ কাঁচি, অপর হস্তে প্রহর-নিরূপণ যন্ত্র। দরজার ভিতর দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ দেখা যাইতেছিল। জাহাজগুলি সাদা এবং সোনালি পাল তুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কাল। যাদের যাবার পালা তারা সব প্রস্তুত?

শিশুগণ। (ধাক্কাধাক্কি করিয়া অগ্রসর হইল) এই যে আমরা, এই যে আমরা!

কাল। থাম, এক একজন করে। আবার ভিড় করছ?...যাদের দরকার নেই তারাও এসে হাজির হয়েছ?...আমার চোখে ধুলো দিতে পারছ না।...(একজনকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া) তোমার পালা হয়নি...এখন যাও!...তুমিও এখন না... দশ বছর পরে এস।...উপস্থিত কেবল বারো জনের পালা...তার বেশী দরকার নেই। ...অ্যাঁ, কি বলছ?...ডাক্তার আরও বেশী যেতে চাও?...না, দরকার নেই...পৃথিবীতে বিস্তর জমা হয়েছে।...শিল্পীর দল কোথায়? ...কেবল একজনকে তারা চায়, সে খুব সাধু হবে।...তোমাদের মধ্যে সাধু কে?...তুমি? ...তোমাকে কিন্তু বোকা-বোকা ঠেকছে। এই তুমি এখানে অমন তাড়াহুড়ো করছ কেন?...আর তুমি সঙ্গে কি এনেছ! কিছুই না! তবে কি করে যাবে?...খালি হাতে যেতে পাবে না।...কিছু-না-কিছু নিয়ে এস।...ভয়ানক পাপ কিম্বা ভয়ানক অসুখ, যা হোক্ একটা...যা তোমার ইচ্ছা। ...আমার তাতে আপত্তি নেই!...কেবল একটা-কিছু চাই। ওকে অমন করে ধাক্কা দিচ্ছ কেন?...ও যাবে না বলছে? ওর ত পালা এসেছে।...অবিচারের সঙ্গে ওকে লড়াই করতে হবে যে! ওকে যেতেই হবে।

শিশু। না, না, আমি যাব না।... আমার জন্মাবার ইচ্ছা নেই।...আমি... আমি এখানেই থাকব।

কাল। তা কি করে হতে পারে! যাবার পালা যখন এসেছে, তখন যেতেই হবে।...নাও, শীগ্‌গির এস...দেরী করতে পারি না।

অপর-একটী শিশু। মশাই আমায় যেতে দিন।...ও যেতে না চায়, আমি ওর বদলে যাব।..শুনলুম, আমার বাপ মা বুড়ো হয়েছেন...আমার জন্য তাঁরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছেন।

কাল। না, বদলাবদলি চলবে না।... যার পালা, সে যাবে।...যাও, তোমরা সব ভিতরে যাও।...যারা যাবে না, তাদের বাইরে থাকবার কোন দরকার নেই।... এখন সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখছি, কিন্তু আবার যখন পালা আসবে, তখন ভয় পেয়ে নানা রকম ওজর দেখাবে।...ওই দেখ, চারজন কেমন থর-থর করে কাঁপছে।

একজন হঠাৎ পিছনে হটিয়া পড়িল।

ওকি!...তুমি অমন করে পালাচ্ছ কেন? ..কি হয়েছে?

শিশু। আমি বাক্সটা নিতে ভুলে গেছি, তার ভিতর দুটো পাপ আছে, পৃথিবীতে গিয়ে দুটোই আমায় গড়তে হবে।

অপর একজন। আমার ছোট পুঁটুলিটী ফেলে এসেছি...তার ভিতর যে সব ভাব আছে, তা দিয়ে মানুষকে সভ্য করে তুলতে হবে।

অন্য-একজন। আমি আমার নাশপাতির ঝুড়ি ফেলে এসেছি।

কাল। যাও, যাও; দৌড়ে নিয়ে এস। ..জাহাজ ছাড়-ছাড়।...ওই দেখ, মাস্তুলের ওপর পাল-ঝটপট কচ্ছে।...আর কেবল ৬১২ সেকেণ্ড বাকী।

একটী শিশু তার পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল,সে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

খবরদার, বলছি!...তুমি এখন নয়!... এই তিনবার তুমি পালাবার চেষ্টা করলে। ...এবার যদি তোমায় ধরি, আমার দিদি অনন্তর হাতে তোমায় সঁপে দেব। তা হলে কস্মিন্‌কালে আর তোমার জন্ম হবে না...তখন জব্দ হবে।... তোমরা সব গেলে কোথায়? সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও— সকলে হাজির হয়েছ ত?—আর এক জনকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় গেল সে? ওই যে দেখছি ..ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।...কে?—প্রণয়ী বুঝি?... আর লুকোনো মিছে, এখন তোমার প্রণয়িনীর কাছে বিদায় নিয়ে শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়।

দুটী ছেলে—যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে প্রণয়ী ও ও প্রণয়িনী বলা হইয়াছে—ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কালের পদতলে জানু পাতিয়া বসিল। নিরাশায় তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

প্রণয়ী। সময় মশাই, দয়া করুন; আমাকে থাকতে দিন।

প্রণয়িনী। আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে দিন।

কাল। অসম্ভব!...এখন কথা কবার সময় নেই।...কেবল ৩৯৪ সেকেণ্ড বাকী।

প্রণয়ী। আমার জন্মাবার ইচ্ছা নেই।

কাল। তোমার ইচ্ছাতে ত হবে না।

প্রণয়িনী। (সানুনয়ে) কাল মশাই, কি হবে? আমার যেতে যে এখনও অনেক দেরী!

প্রণয়ী। আমাকে তোমার আগেই যেতে হচ্ছে।

প্রণয়িনী। হায়, হায়; আর কখনও যে তোমায় দেখতে পাব না!

কাল। দেখ, এ সবের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। 'জীবনের' কাছে এ সব কথা পেশ কর। আমার উপর যেমন হুকুম আছে আমি সেই ভাবেই মানুষের মিলন বিচ্ছেদ ঘটাই।...(প্রণয়ীকে ধরিয়া) এস তুমি।

প্রণয়ী। (ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে) না, না; ছেড়ে দাও...না হয় ওকেও সঙ্গে দাও।

প্রণয়িনী। (প্রণয়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া) একে ছেড়ে দাও,...আমার সঙ্গে থাকতে দাও।

কাল। থাম; অত চেঁচামেচি করো

না। এ ত আর মরতে যাচ্ছে না—জন্মাতে যাচ্ছে। (প্রণয়ীকে লইয়া গেল) চল, আর দেরী করতে পারি না।

প্রণয়িনী। (প্রণয়ীর দিকে হাত বাড়াইয়া) চিহ্ন, একটা চিহ্ন দিয়ে যাও! ...বলে দাও কি করে তোমায় খুঁজে পাব।

প্রণয়ী। আমি সর্ব্বদা তোমাকে ভালবাসব!

প্রণয়িনী। আমি পৃথিবীতে গিয়ে চিরবিষাদিনী হয়ে থাকব, তাই দেখে তুমি আমায় খুঁজে নেবে।

সে মাটীতে আছাড় খাইয়া পড়িল।

কাল। ব্যস্, এইবার হয়েছে।... এখন আর কেবল ৬৩ সেকেণ্ড বাকী।

গমনোদ্যত শিশুগুলি অন্যান্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

শিশুগণ। বিদায় পিয়ারী, বিদায় জিন্, সব জিনিস নিয়েছ ত?...আমার কল্পনাগুলি পৃথিবীতে প্রচার করো...আমার তরমুজের কথা মনে আছে ত?...কিছু ভুলে যাওনি? আমায় মাঝে মাঝে মনে করো।...তোমার নিজের কল্পনাগুলি যেন ভুলে যেও না; একটা জিনিষ নিয়ে বেশীদিন পড়ে থেকো না। আমায় তোমার খবর পাঠিয়ো। খবর পাঠাতে পারা যায় না শুনেছি...তবু চেষ্টা করো।...ভাল খবর থাকলে আমাদের বলো।...আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।—আমি সম্রাট হয়ে জন্মাব।

কাল। (চাবি উঠাইয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল) ব্যস্; আর না;...জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।

জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। জাহাজস্থ শিশুগণের কণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

ওই পৃথিবী! ওই পৃথিবী! ওই দেখা যাচ্ছে!...আহা, কি সুন্দর! কত বড়! কি চমৎকার!

তারপর দূরবর্ত্তী অতি ক্ষীণ আনন্দ-কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল!

তিলতিল। (আলোর প্রতি) ও কিসের গোলমাল? ও ত ছেলেদের গলা নয়।

আলো। যাদের ঘরে এই শিশুরা গিয়ে জন্ম নিলে মায়েরা সব গান করছে।

ইত্যবসরে কাল শেষবার হলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার মণিময় দ্বার বন্ধ করিতে গেল। এইবার হঠাৎ তিলতিল, মিতিল এবং আলো তাহার নজরে পড়িল।

কাল। এ কি?...তোমরা কারা? কি করছ এখানে?...তোমরা ত নীল নও! এখানে তোমরা ঢুকলে কি করে!

সে দা উঠাইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া গেল।

আলো। (তিলতিলের প্রতি) কথা কয়ো না!...আমি নীলপাখী পেয়েছি...আমার বুকের মধ্যে লুকোনো আছে! পালাই চল! হীরেটা ঘুরিয়ে দাও, তাহলে ও আর আমাদের ধরতে পারবে না।

পিছন দিকের দরজা দিয়া তিলতিল, মিতিল এবং আলো পলাইয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

আলেয়ার আলো

বাইশ

সরমার কথা

যমুনা-দিদিকে নিয়ে আর ত পারিনা! বাবারে বাবা, এমন দুষ্টু ত ভূভারতে আর-কখনো দেখি-নি!

আজ সারা সকালটা বসে-বসে ফুলের গয়না দিয়ে আমাকে তিনি সাজিয়েছেন। সুধু কি সাজানো? সেই সঙ্গে তাঁর ফষ্টি-নষ্টির জ্বালায় প্রাণ আমার পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে লাগল!

শেষটা তিনি বলেন কিনা, "চল্ ছুঁড়ি, তোকে তোর বরের কাছে ধরে নিয়ে যাই, তোর রূপ দেখিয়ে কিছু বখ্‌শীষ আদায় করব।"

আমার ত চক্ষু স্থির! তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, "ওমা, ওকি কথা দিদি! তাহলে আমি কি আর বাঁচব!"

ভঙ্গিভরে আমার গাল টিপে দিয়ে যমুনা-দিদি বললেন, "ঈশ্, ছুঁড়ির ঢং দেখে আর বাঁচিনা! বর বর করে যার মুখ দিয়ে লাল পড়ছে, তিনি বলেন কিনা বরের কাছে গেলে মরে যাব! ওলো, জানি লো জানি, আমাকে বোকা পুরুষ পাসনে যে, আমার চোখে ধূলো দিবি!"

—"দিদি, তোমার ও ডাগর চোখে আমি প্রাণ থাকতে ধূলো দিতে পারব না!"

—"উঁ, আমার কুটুস্ করে কামড়ে—"

—"গর্ত্তের মধ্যে সেঁধুতেও জানি, দিদি!"

—"হুঁ, তুমি একটি মিট্‌মিটে ডাইনি, তা আবার জাননা! দাদাকে ক্ষেপিয়েও তোমার আশ মেটে-নি, আবার আমাকেও মজাবার ফিকির!"

—"জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামী যাঁর দোরে দিন-রাত ভ্যা-ভ্যা করেও মন পান না, তাঁকে আমি মজাব, আমার এমন কী সাধ্যি!"

—"সত্যি ভাই সরমা, তুই যদি পুরুষ হতিস্!—"

—"তাহলে তোমার দাদা আমাকে বিয়ে করতে অত্যন্ত আপত্তি করতেন!"

—"আর আমার যদি বিয়ে না হোত—"

—"আমি যদি পুরুষ হতুম আর যমুনা-দিদির যদি বিয়ে না হোত, তাহলে—"

—"তাহলে, যমুনাদিদি তোর প্রেম-সাগরে পড়ে দস্তুরমত হাবুডুবু খেতেন।"

—"এযে অসমাপ্ত উপন্যাস! তাহলে তোমার দাদার অবস্থাটা কি হোত, কৈ, উপসংহারে সে কথাটা ত বললে না!"

—"উপন্যাস যখন শেষই হোলই না, তখন দাদার জন্যে আমার ভেবে মরবার দরকার কিলা ছুঁড়ি! তবে, পুরুষ হোতে পারি-নি বলে আমি যে আলিঙ্গন আর চুম্বন করতেও পারি-নি, এ ভুল তোর এখনি ভেঙ্গে দিচ্ছি!"—এই বলে যমুনাদিদি আমাকে

জড়িয়ে ধরে আমার মুখে একটি চুমু দিলেন। মাকে আর মনে পড়ে না, মায়ের পেটের কোন বোনও আমার নেই, পৃথিবীতে নারীর প্রতি নারীর স্নেহ-ভালবাসার স্বোয়াদ আমি কখনো পেয়েছি বলেও স্মরণ হয় না; কিন্তু এই কোমলপ্রাণা করুণারূপিণী মহিলাটির অগাধ হৃদয় যেন মায়ের স্নেহে, বোনের ভালবাসায় একেবারে পরিপূর্ণ; এঁর কাছে এলে আমি যেন সেই স্নেহ-প্রেমে বিভোর হয়ে গলে যাই! তাই আজ তিনি যখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আমারও প্রাণটি যেন জুড়িয়ে গেল—সে অকপট আদরে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠল, তাঁর কাঁধের উপরে মাথাটি এলিয়ে আমি চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলুম।

যমুনাদিদি বললেন, "সরো, বেলা হোল, বাড়ী যা! তোর কচি মুখখানি রোদে রাঙ্গা হয়ে উঠেচে, তোকে কষ্ট দিচ্ছি দেখলে বোন, দাদা আবার মুখভার করতে পারেন!" এই বলে তিনি হাসতে-হাসতে চলে গেলেন।

আমিও আস্তে-আস্তে বাড়ীতে ফিরে এলুম।...

ঘরে ঢুকেই শুনলুম, সামনের বিয়ে-বাড়ীতে গায়ে-হলুদের শাঁখ বেজে উঠল।

আমারও জীবনে আবার অমনি দিন আসছে! সে কথা স্মরণ হবামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল! বিবাহ, বিবাহ ... ... দুটি প্রাণের চির-মিলন!

আমার যে আগে কখনো বিবাহ হয়েছিল, সে কথা মনে পড়ে কি, পড়ে না—সে যেন স্বপ্নের মত, সে যেন গতজন্মের কথা! সেবার প্রেমের কোন সাড়া পাই নি, এবার প্রেম এসে আগে আগে জীবন-বন্ধুকে পথ-দেখিয়ে আমার ঘরে ডেকে আনছে! অতীতের স্মৃতি, অতীতের ব্যথা, অতীতের আঁধারকে বর্ত্তমানের শান্তি, গান, আলো ধীরে-ধীরে হৃদয় থেকে মুছে দিচ্ছে! আমার প্রাণ এতদিন বুকের মাঝে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল, আজ আবার সে জেগে উঠছে! হে বন্ধু, হে সখা, কাছে এস, তোমার ব্যথাহারী হাত-দুখানির সুখ-স্পর্শে আমার নিরালা জীবনের তন্দ্রামোহ টুটে যাক্; হে আমার নবপ্রভাতের প্রথম সূর্য্য, তোমার আকাশব্যাপী কিরণের একটি কণা পেলেও আমার অন্তর পদ্মের মত আবার বিকসিত হয়ে উঠবে!

হঠাৎ সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দ শুনে আমি চমকে উঠলুম। কি করি, কোথা যাই—এখনো আমার গা-ময় যে ফুলের গয়না!

তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে' দিতে ছুটে গেলুম,—কিন্তু তার আগেই তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। দারুণ লজ্জায় মরমে মরে আমি পিছন ফিরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

মোহনবাবু খানিকক্ষণ একটিও কথা কইলেন না,—বোধহয় আমার বেহায়াপনায় তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু তিনি-ই বা কি-রকমের মানুষ গা! দেখছেন, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু নাছোড়বান্দা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! ধন্যি লোক যাহোক!

মোহনবাবু ডাকলেন, "সরমা!"

কী অস্বাভাবিক, ভয়ানক স্বর! সে তিক্ত—তীব্র স্বর আকস্মিক অভিশাপ-বাণীর মত আমার সর্ব্বাঙ্গকে যেন পাথরে পরিণত করে' দিলে। এমন স্বর আমি জীবনে কখনো শুনি-নি!

মোহনবাবু আধার তেমনি স্বরে বললেন, "সরমা! তোমার স্বামী জীবিত!"

তড়িতের মত তাঁর দিকে আমি ফিরে দাঁড়ালুম। আমার কোথায় গেল লজ্জা, কোথায় গেল নীরবতা,—তীব্রস্বরে বলে উঠলুম, "কী, কি বললেন!"

—"তোমার স্বামী জীবিত!"

—"অ্যাঁ!"

—"হ্যাঁ। সরমা, আমি মরলুম!"

—"মোহনবাবু, মোহনবাবু!"

—"বিশ্বাস হচ্ছেনা তোমার? তুমি কি ভাবছ, নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে নিজের মৃত্যু নিয়ে, নিজের সর্ব্বনাশ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কৌতুক করছি? তা নয় সরমা, তা নয়,—তোমার স্বামী জীবিত, কিন্তু আজ থেকে আমি মৃত। এই দেখ!"—বলেই তিনি থর্‌থর্ করে' কাঁপতে-কাঁপতে আমার হাতে একখানা খবরের কাগজ দিলেন।

কাগজখানা পড়্‌তে-পড়্‌তে আমার বুকের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল! মুখ তুলে দেখলুম, ঘরের মধ্যে মোহনবাবু নেই!

আরসিতে চোখ পড়ল। তার ভিতরে আমার ফুলের গহনাপরা মূর্ত্তির ছায়া জেগে উঠেছে! কিন্তু আমার মুখ—আমার মুখ! নিজের মুখ যে আমি নিজেই চিনতে পারছি না! আরসিতে আমার ও মুখ যে মড়ার মত সাদা! আমি কি মরেছি?

পাগলের মত আমার গায়ের ফুল-গুলোকে দু-হাতে দলে, পিষে, ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে' ঘরময় ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিতে লাগলুম।

তেইশ

হরেন্দ্রের কথা

পাড়াগাঁয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিঁয়েছিলুম।

কলকাতায় ফিরে দেখি, মোহন আমার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

চিঠিখানা এই।

"ভাই হরেন,

চিঠি পেয়ে যত-শীঘ্র পার, আমার কাছে আসবে। ভয়ানক বিপদে পড়েছি, তোমার সঙ্গে অনেক পরামর্শের দরকার। লিখে সে কথা জানাবার নয়। ইতি

. হতভাগ্য মোহন।"

ব্যাপার কি? সপ্তাহখানেক মোটে কলকাতায় ছিলুম না, এরি-মধ্যে এমন কি বিপদ হোল যে, মোহন একেবারে আপনার নামের আগে হতভাগ্য বিশেষণ বসিয়ে দিয়েছে? এ আর কিছু নয়, নিশ্চয় প্রেমের ঝগড়া! আমি ভাবতুম, জগতে যে প্রেমের খেলা চলেছে, সে খেলায় রমণী চায় পুরস্কার, আর পুরুষ চায় সুধু একটু মজা! কিন্তু এই মজাতে মাতলে প্রেম যে এমন লোক-মজাতে পারে, এতটা ত জানতুম না!

যা-হোক, খাওয়া-দাওয়ার পর মোহনের বাড়ীতে গেলুম। মোহন তাহার ঘরের কোণে, শয্যার উপরে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল।

আমি বললুম, "কিহে মোহন, মদন-দেবতার সঙ্গে নারদ-ঠাকুরও তোমার উপরে কৃপাকটাক্ষ দান করেছেন নাকি?"

মোহন আস্তে-আস্তে মুখ তুলে আমার দিকে নিরুত্তর হয়ে করুণ নয়নে চেয়ে রইল।

একি! তার চোখে জল—কেঁদে কেঁদে তার মুখ যে ফুলে উঠেছে! আর তার চেহারা,—এই ক-দিনেই এ কী পরিবর্ত্তন! মোহনের কেঁদে-রাঙ্গা চোখদুটো ভিতরে বসে গেছে, তার দৃষ্টি কি-রকম উদ্‌ভ্রান্ত, তার চুলগুলো রুক্ষ ও উস্কখুস্ক, তার দেহটাও শীর্ণবিশীর্ণ। দেখলে মনে হয়, তার যেন সাংঘাতিক একটা-কিছু অসুখ হয়েছে!

আমিও তাই ভেবে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁ মোহন, তোমার কি অসুখ হয়েছে?"

মোহন একটা বিশ্রী হাসি হেসে বললে, "অসুখ? হুঁ, অসুখই বটে!... ...অসুখ!"

"মোহন, কি হয়েছে, বল ভাই!"

সে মুখে কিছু না-বলে আমার দিকে একখণ্ড কাগজ এগিয়ে দিলে। দেখে মনে হোল, কোন খবরের কাগজ থেকে এটি কেটে নেওয়া। আমি কিছুই না বুঝে, ছাপার হরফে তাতে যেটুকু লেখা ছিল, সেটুকু পড়তে লাগলুম। পড়তে-পড়তে বুঝতে পারলুম, কেন মোহনের এমন দশা হয়েছে!

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এও কি সম্ভব? মরা মানুষ আবার ফিরে এসেছে! অনেক ভেবেও কিছু ঠিক না করতে পেরে বললুম, "এটা পড়েও ত আমার সন্দেহ যাচ্ছে না ভাই!"

মোহন মুখ বিকৃত করে' বললে, "সন্দেহ! কিসের সন্দেহ? এই চিঠিখানা পড়, তাহলেই বুঝবে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। চিঠিখানা কাল মুরারিবাবুর নামে এসেছে। আমি পেয়েছি সরমার কাছ থেকে।"

পত্রখানা পড়লুম,

"শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনি শুনলে নিশ্চয় সুখী হবেন যে, আমি জীবিত আছি। ভগবানের দয়ায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে আমি প্রাণে বেঁচে আছি। আপনার শান্তিপুরের প্রতিবেশী নবীনবাবুর কাছ থেকে আপনার ঠিকানা পেয়ে এই পত্র লিখছি।

কাশীধামে গঙ্গায় ডুবে আমি মরেছি,—এ সংবাদ মিথ্যা। একখানা নৌকায় আমি আর আমার এক বন্ধু ছিলুম; নৌকাডুবি হয়ে আমার বন্ধু মারা যান বটে, কিন্তু আমি বেঁচে গিয়েছিলুম।

আপনারা আমার সমস্তই জানেন, আপনাদের কাছে আর কিছু লুকোতে চাই না। তখন চারদিক থেকে পাওনাদারদের তাগাদায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। খুচরো খুচরো দেনা ত ছিলই—তার জন্যে আমি তত ভাবতুম না, কিন্তু আমার দুজন বড় পাওনাদারের হাত এড়াবার জন্যেই আমি নিজেই নিজের মৃত্যুসংবাদ রটনা

করেছিলুম। নৌকাডুবিতে এমন মৃত্যু ত হামেসাই হয়; সুতরাং আমার মৃত্যুতে কারুর অবিশ্বাস করবার কোন কারণ ছিল না।

এ ক-বছর আমি পশ্চিমে নানা জায়গায় চাকরি করে' বেড়িয়েছি। কিছু অর্থসঞ্চয়ও করেছি। যে পাওনাদারদের ভয়ে আমি দেশছাড়া হয়েছিলুম, এখন তারা বেঁচে নেই বলেই আবার দেশে ফিরেছি, নৈলে আরো-কতদিন যে আমাকে বিদেশে নাম-ধাম লুকিয়ে ঘুরে মরতে হোত, কে তা বলতে পারে?

কলকাতায় যখন আছি, তখন আমি আমার স্ত্রীকে কাছে এনে রাখা উচিত মনে করি। আশা করি এতে আপনার অমত হবে না। আমি আসছে পরশুদিন আপনাদের বাড়ীতে যাব। আপনার কন্যাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলবেন।

আপনারা ভাল আছেন ত? আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

আপনার জামাতা
সুরেন্দ্র।"

আমার পত্রপাঠ শেষ হোলে মোহন বললে, "তোমার আর কোন সন্দেহ আছে?"

মোহনের দুঃখে আমার প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছিল। একি অভাবিত ব্যাপার! একটা মানুষের জীবন যে পলকের পরিবর্ত্তনে এমন ভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, এ যে কল্পনার অতীত! এ দুর্ভাগ্যের কি সান্ত্বনা আছে? এ ধাক্কা মোহন কি সামলাতে পারবে?

কোনরকমে আত্মসংবরণ করে' বললুম, "এখন উপায়!"

মোহন হতাশভাবে বললে, "উপায় আর কি! সাঁতার না-জেনে যে গভীর জলে সাধ করে' তলিয়ে গেছে, ডুবে মরা ছাড়া তার অন্য গতি নেই!"

—"মোহন, সুরেন কি সরমাকে চিঠি-পত্র কিছু দিয়েছে?"

—"না।"

—"হুঁ, বেশ বোঝা যাচ্ছে সরমাকে সে এখনও ভালবাসে না।"

—"কি-করে' বুঝলে?"

—"সুরেন যখন ছদ্মনাম নিয়ে বিদেশে অজ্ঞাতবাস করছিল, তখনও সে সরমাকে কোন পত্রাদি দেয়-নি। সরমার প্রতি তার বিশ্বাস থাকলে সে এতবড় একটা কর্ত্তব্য পালন করতে ভুলত না। তারপর দেখ, এতদিন পরে সে দেশে ফিরেছে, সরমার ঠিকানাও পেয়েছে। এ অবস্থায় অন্য কেউ হোলে কি করত? নিশ্চয়ই একেবারে স্ত্রীর সঙ্গে এসে দেখা করত! কিন্তু সুরেন তাও করে-নি, উল্টে স্ত্রীকে একখানা চিঠিও লেখে-নি,—এমন-কি, তার পিতাকে যে পত্র লিখেছে তাতে-পর্য্যন্ত সরমার নামগন্ধ নেই। মোহন, সরমাকে সুরেন ভালবাসে না, তার আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।"

—"উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য আবার কি?"

—"আমার যতদূর বিশ্বাস, তাতে মনে হয়, সুরেন জানতে পেরেছে যে, মুরারি-বাবুর মৃত্যু হয়েছে আর তাঁর যা-কিছু সম্পত্তি ছিল সরমাই তা পেয়েছে। সে এই টাকা হস্তগত করতে চায়।"

—"কিন্তু দেখছ ত, সে মুরারিবাবুর নামেই চিঠি লিখেছে!"

—"এটা ছল মাত্র। মুরারিবাবু বেঁচে থাকলে সুরেন কখনই তাঁকে চিঠি লিখতে সাহস করত না। কেননা সে ভালরকমেই জানত যে, সে তাঁর মেয়ের উপরে অসৎ ব্যবহার করাতে তিনি তার প্রতি চটে আছেন। তার উপর এ পত্রে সে যে কত-বড় জুয়াচোর, সুরেন নিজমুখেই তা প্রকাশ করেছে। এ-অবস্থায় মুরারিবাবুর মত প্রকৃতির লোক যে তার হাতে নিজের মেয়েকে আবার ছেড়ে দেবেন, এ-রকম আশা করাটাই অন্যায়। আর-একটা কথা ভেবে দেখ। সুরেন যে তার স্ত্রীকে এখনো ভালবাসে না, এটা আমরা বুঝেছি। এমন ক্ষেত্রে সরমার ভার সে কেন সেধে নিতে চায়? নিশ্চয়ই কিছু প্রাপ্তির আশায়।"

—"সে যদি জানতই যে মুরারিবাবু বেঁচে নেই, তবে মুরারিবাবুর নামে মিছা-মিছি চিঠি লেখবার দরকার কি?"

—"পাছে সরমা সন্দেহ করে যে, তার টাকার লোভেই সুরেন তাকে নিয়ে যেতে চায়। মুরারিবাবুর নামে চিঠি লেখাতে সরমা ভাববে, 'স্বামী তাকে নিস্বার্থভাবেই গ্রহণ করছে—পিতা জীবিত থাকতে সে ত আর তাঁর সম্পত্তি পাবে না! স্বামী যখন জানেন না যে তার পিতা মৃত, তখন সরমার হাতে অর্থ আছে এটাও তিনি জানেন না।'—সরমার পক্ষে কি এমনি-ধারা চিন্তাই স্বাভাবিক নয়?"

—"হরেন, তাহলে সরমার কি উপায়?"

—"নিরুপায়। আমরা কিছুতেই তার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারব না। কিসে কি হয়, বলা যায় না—সরমা হয়ত ভেবে বসবে, আমরা বুঝি কোন খারাপ মতলোবে তার স্বামীর নামে নিন্দা রটাচ্ছি। স্বামীকে ভাল না বাস্‌লেও, আমাদের সে নীচ ভাবতে পারে। সুতরাং আমাদের চুপ করে থাকাই ভাল। আর, আমি যা বললুম, সেটা আন্দাজ মাত্র—হয়ত মিথ্যা!"

—"হরেন, হরেন, আমিও গেলুম ভাই, সরমাও গেল। ভগবান এ কী করলেন!"

—"শান্ত হও ভাই, শান্ত হও! ভগবানের দোষ দিচ্ছ, কিন্তু কতবড় বিপদ থেকে তুমি পরিত্রাণ পেলে সেটা একবারও ভেবে দেখেছ কি? তুমি খালি দুঃখের তাপ পেয়েছ, দুঃখের আগুন তোমাকে ছুঁতে-না-ছুঁতে নিবে গেল,—এ কি কম মুক্তি? সরমার সঙ্গে তোমার বিবাহের পর যদি এই সুরেন আত্মপ্রকাশ করত, তাহলে কি হোত বল দেখি!"

—"হয়ত সেটা খুব ভয়ানকই হোত, হ্যাঁ,—হয়ত কেন—নিশ্চয়ই! কিন্তু, কিন্তু ... ..." থেমে, দু-হাতে মুখ ঢেকে মোহন অবরুদ্ধ কণ্ঠে আবার বললে, "কিন্তু, আমার এ কি হোল ভাই! হরেন, বন্ধু,—তুমি তখনকার কথা ভাবছ, কিন্তু আমার এখনকার কথাটা তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি? এর চেয়ে ভয়ানক অবস্থা আমি যে কল্পনা করতেও পারছি না! সে অন্ধ, তার কাছে কিবা রাত কিবা দিন! আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সমস্ত জীবন, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, বাসনা যে অদৃষ্টের একটি ফুৎকারে তাসের বাড়ীর মত ভেঙে পড়ে গেল! এ প্রাণ নিয়ে আর কি

আমি সংসারে নূতন জীবন দেখতে পাব—আর কি আমি—আর কি আমি—না, না, এ অসহ্য, এ আঘাত আমাকে পাগল করে দেবে, আমার জীবনকে পশুর জীবন করে দেবে—আমাকে—দূর হোক্, যা হয় তা হবে, কেন আমি এত ভেবে মরছি! —দূর হোক্, দূর হোক্"—বলতে-বলতে মোহন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তারপর বুকে দু-হাত বেঁধে হেঁটমুখে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগল। খানিক পরে আমার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর আমার চোখের উপরে স্থিরদৃষ্টি রেখে গম্ভীরভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে, "বলতে পার হরেন, আমার আত্ম-হত্যা করা উচিত কিনা?"

এতক্ষণ আমি দুঃখে নির্ব্বাক হয়ে তার ভাব-ভঙ্গী নিরীক্ষণ করছিলুম। মোহনের চরিত্র আমি জানি; তার মত ভাবপ্রবণ লোক অতি অল্পেই ভেঙ্গে পড়ে, মনের ঝোঁকে এমন-সব কার্য্য করে—যা তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সংসারের হেরফেরে এরাই কষ্ট ভোগ করে, জীবন-যুদ্ধে এরাই পদে-পদে পরাজিত হয়,—এরা কল্পনায় সাম্রাজ্য গঠন করতে পারে, কিন্তু বাস্তবজগতে যথার্থ সংসারী হোতে পারে না। মোহনের অবস্থা দেখে বাস্তবিকই আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হোল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফের বিছানার উপরে জোর করে' শুইয়ে দিলুম। ভৎর্সনার স্বরে বললুম, "মোহন, তুমি না পুরুষ!"

মোহন ম্লানহাসি হেসে বললে, "পুরুষ হোলে প্রাণ কি পাথর দিয়ে গড়্‌তে হয় ভাই?"

—"পুরুষ যখন সংসারে প্রভু হোতে চায়, তখন তাকে সবল হোতে হবে, সহ্য করতে হবে।"

—"আমি যে সহ্য করতে পারছি না ভাই! যার সর্ব্বস্ব গেল, তার সহ্য করবার অবলম্বন কোথায়?"—বলতে-বলতে সে আমার গলা-জড়িয়ে ধরে বালকের মত কাঁদতে লাগল!...

প্রেমের যখন মৃত্যু হয়—তখন আর শবের সৎকার হয় না—শব তখন বাড়ীর ভিতরেই মরে পড়ে থাকে! হতভাগ্য মোহনের এখন সেই অবস্থা হয়েছে,—তার জীবন এখন মরণেরই নামান্তর।

মোহনের অবস্থা দেখে আমার বারংবার মনে হোতে লাগল, না-জানি সরমা এখন কি করছে! কে তাকে সান্ত্বনা দেবে, সে অভাগী যে একাকী!

মোহন আর আমি বাইরের ঘরে বসে সুরেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। মোহন ত কিছুতেই বাড়ীতে থাকতে রাজি নয়, —বলে, তাকে ছেড়ে সরমা চলে যাবে, এটা সে কিছুতেই সইতে পারবে না। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে তাকে স্থির করেছি।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বামীর কাছে যাওয়া সম্বন্ধে সরমার কি মত্ তা জানো?"

মোহন উদাসভাবে বললে, "সরমার সঙ্গে এ ক-দিন আমার দেখা হয়-নি, আমি

দেখা করতে পারি-নি! তবে যমুনার মুখে শুনলুম, স্বামীর কাছে সে যেতে চায়।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, এ ছাড়া আর উপায়ও নেই। এ ব্যাপারের পর এখানে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।"

কিন্তু কি ভয়ানক অবস্থা তার! স্বামীকে সে ভালবাসে না, তার স্বামীও তাকে ভালবাসে না। সে তার স্বামীর কাছে যাচ্ছে কর্ত্তব্যের জন্য; আর তার স্বামী তাকে গ্রহণ করছে—খুব সম্ভব—অর্থের জন্য! এ মিলন ত সুখের হবে না! মোহনের চেয়ে সরমার অবস্থা ঢের-বেশী শোচনীয়, এযে জীবন্তে সমাধি! নিয়তির এ কঠোর বিধান কি-করে' সে সহ্য করবে!

এমনসময় একখানা গাড়ী সরমার বাড়ীর সুমুখে এসে দাঁড়াল। আমি তাড়া-তাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মোহন কিন্তু নড়ল না, যেমন বসেছিল, তেমনি অটল হয়ে বসে রইল।

গাড়ীর ভিতর থেকে যে লোকটি বাইরে এল, তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। মাথায় বাবরি-কাটা চুলের বাহার, চোখে নীল রঙের চশমা, হাতে ছড়ী, কাপড়-চোপড়ে বেশ বাবুয়ানা আছে—চেহারাটি কালো হলেও কুশ্রী নয়।

আমাকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, "মশাই, এইটেই কি মুরারিবাবুর বাড়ী?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কাকে খুঁজছেন?"

—"মুরারিবাবুকে।"

—"তিনি ত মারা গেছেন!"

মুরারিবাবু মারা গেছেন শুনে লোকটি কিছুমাত্র বিস্মিত বা দুঃখিত হোল না, যেন সে এ-কথাটা শুনবে বলে আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল। সে সুধু বললে "মারা গেছেন বুঝি?"

—"আপনার নান সুরেনবাবু?"

সে আশ্চর্য্য হয়ে একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, "বাঃ! আমার নাম কি-করে জানলেন আপনি?"

—"আন্দাজে।"

—"এ ত ভারি সঠিক আন্দাজ! আপনার নাম কি?"

আমি নাম বললুম।

—"হরেনবাবু, মুরারিবাবুর বাড়ীতে এখন কে আছেন?"

—"তাঁর মেয়ে।"

—"একলা?"

"হ্যাঁ, একলা বটে, কিন্তু আমরাই এখন তাঁকে দেখি-শুনি।"

—"আপনারা!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা—অর্থাৎ আমি আর আমার বন্ধু মোহন।"

"মোহন? যাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর বিবাহের—"বলতে-বলতে সুরেন হঠাৎ থেমে পড়ল।

—"সুরেনবাবু, আপনি ত দেখছি সমস্ত খবরই রাখেন!"

সুরেন বাধো-বাধো গলায় বললে, "আপনি নবীনবাবুকে চেনেন বোধ হয়? তাঁর মুখেই আমি এ-কথাটা শুনেছি।"

"নবীন? সে কি শান্তিপুরের সেই জমিদার নবীন, যার সঙ্গে আমার—"

—"হ্যাঁ, যাঁর সঙ্গে আপনার কিছু গোলমাল হয়েছিল।"

—"আপনি তাকে চিনলেন কি-করে?"

—"আমার বিজ্ঞাপন দেখে তিনি দয়া করে আমাকে মুরারিবাবুর খোঁজ দিতে এসেছিলেন।"

—"বটে! এ বিবাহের কথা-পর্য্যন্ত যখন সে জানে, তখন নবীনচন্দ্র অনুগ্রহ করে এখনো আমাদের খবরাখবর নেন দেখছি! আর সুরেনবাবু, এটাও বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, আপনি ত এত খবর রাখেন, অথচ মুরারিবাবুর মৃত্যুসংবাদ জানেন না!"

সুরেনের পাপী মন,—তাই ধরা পড়ে গেছে বুঝে সে চটেই লাল! চড়া গলায় বিরক্ত হয়ে সে বললে, "মশাই, আপনার কাছে জবাবদিহি করতে আমি আসি-নি, আমি এসেছি আমার স্ত্রীকে নিতে!"

—"চলুন, আপনাকে আমি বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।"

—"মাফ করবেন মশাই, আপনার কোন সাহায্যে আপাতত আমার দরকার নেই"—এই বলে সুরেন নিজেই সরমার বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে গেল।

—"মাফ করবেন মশাই, আপনিই যে যথার্থ সুরেনবাবু, সেটার প্রমাণ না পেলে আপনাকে আমি বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছি না"—এই বলে আমি তার পথ জুড়ে দাঁড়ালুম।

—"কী, আপনি আমায় বাধা দিতে সাহস করেন!"

—"আপনি অকারণে রাগ করবেন না। মুরারিবাবু যখন তাঁর কন্যার ভার আমাদের উপরে দিয়ে গেছেন, তখন বুঝে দেখুন, এটা আমার কর্ত্তব্য কি না!"

—"সরুন, সরুন বলছি!"

আমি অবহেলার হাসি হেসে অটল ভাবে বললুম, "মাফ করুন।"

সুরেন সবলে আমাকে ধাক্কা মেরে বললে, "আমাকে বাধা দেবার কোন অধিকার তোমার নেই।"

আমি শান্ত স্বরেই বললুম, "আমাকে ধাক্কা দেবার কোন অধিকার আপনার নেই।"

সুরেন মহা চটে আমাকে ঘুষি মারবার জন্যে হাত তুললে—কিন্তু আমাকে স্পর্শ করবার আগেই আমি চট্ করে' তার হাত-খানা ধরে ফেললুম।

সুরেন হাত-ছাড়িয়ে নেবার জন্যে বারকতক চেষ্টা করলে; কিন্তু অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তিতেও না-পেরে শেষটা রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে-ফুলতে চেঁচিয়ে উঠল, "ছাড়ো হাত —নইলে—"

—"নইলে কি সুরেনবাবু? কাঁদবেন, না লোক ডাকবেন? দেখছেন ত, মুরারি-বাবু তাঁর কন্যার ভার দুর্ব্বল হস্তে সমর্পণ করে যান-নি! সুতরাং এখানে বলপ্রকাশ বৃথা,"—এই বলে আমি তার হাত ছেড়ে দিলুম।

—"তাহলে, আপনি আমাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না, কেমন?"

—"সুরেনবাবু, আপনি অবোধের মত কথা বলছেন কেন? আপনার স্ত্রীর কাছে আপনি যাবেন এতে আমার আপত্তি করবার

কি শক্তি আছে? আমি কেবল কর্ত্তব্য-বোধেই আমার সন্দেহভঞ্জন করতে চাই।"

—"কিন্তু আমি থাকতে পরপুরুষের সামনে আমার স্ত্রীকে—"

—"চুপ, চুপ, অমন কথা মুখে আনবেন না! আপনার স্ত্রী আমার সহোদরা ভগ্নীর মত!"

এমনসময় সরমার ঝী বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "দিদিমণি বললেন, জামাইবাবুকে ভিতরে যেতে!"

হঠাৎ উপরদিকে আমার দৃষ্টি গেল। দেখি, বারান্দার এককোণে অত্যন্ত বিবর্ণ ভাবহীন মুখে মলিনবসনা সরমা কাতর চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

আমি তখনি মাথা হেঁট করে' পথ ছেড়ে সরে এলুম;—সুরেন গর্ব্বিত হাসি হাসতে-হাসতে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে, আমার মুখের উপরে সশব্দে সদর দরজাটা বন্ধ করে' দিলে।

সুরেন বুঝতে পেরেছে যে, আমি তার কপটতা ও মিথ্যাকথা ধরে ফেলেছি। পাছে সরমার কাছে গিয়ে সমস্ত প্রকাশ করে' দি, সেই ভয়েই তার আগে আমাকে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে দিতে তার অত আপত্তি! সরমা যদি জানতে পারে, তার অর্থের উপরেই সুরেনের দৃষ্টি, তাহলে স্বামীর সঙ্গে যেতে সে নারাজ হোতে পারে, সুরেনের এও একটা মস্ত ভয়!

কিন্তু সরমার ভবিষ্যৎ ভেবে আমার মনে আশঙ্কা হচ্ছে! সরমার সঙ্গে মোহনের বিবাহের কথাটাও সুরেন টের পেয়েছে! একে সে সরমাকে প্রীতির চোখে দেখে না, তার উপরে এই ব্যাপার! সরমা কি অবস্থায় পড়ে' যে এই বিবাহে রাজি হয়েছিল সুরেন ত তা ভেবে দেখবে না। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করে' সরমাকে বাক্য-যন্ত্রণা ত সহ্য করতে হবেই,—তাছাড়া আরো কত লাঞ্ছনাই যে তাকে সইতে হবে, তা সুধু ভগবানই জানেন! তার কপালে অনেক দুঃখ আছে, এ দুঃখ আর কেউ ঘুচাতে পারবে না। ঘটনা-চক্রের এ কী পরিবর্ত্তন,—দুটি তরুণ প্রাণের সকল পুলক-হাসির উপরে অশ্রু-সমাধি গড়ে ভবিতব্যতা আজ যে মূর্ত্তিতে তার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তা কি ভীষণ কি নির্ম্মম কি কঠোর!...সরমা এ জীবনে আর কি কখনো সুখের মুখ দেখবে?

ভারাক্রান্ত মনে ঘরের এককোণে বসে-বসে এই-সব কথা ভাবছি আর ভাবছি। মোহন জানলার কাছে টেবিলের সামনে মূক মূর্ত্তির মত যেমন বসেছিল এখনো ঠিক তেমনিই বসে আছে। কী যে ভাবছে সেই জানে!

হঠাৎ রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হোল। মোহনও চমকে উঠে মুখ তুলে রাস্তার দিকে চাইলে, আমিও দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এগিয়ে গেলুম।

সরমার গাড়ী! মোহনদের বাড়ী ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে—বুঝি জন্মের মত! মোহনের তখনকার চোখের ভাব যে দেখেছে জীবনে আর-কখনো তা ভুলতে পারবে না!

সরমা, গাড়ীর একটা খোলা জানলার কাছে বসে আছে।

মোহনও তাকে দেখতে পেলে, সরমার করুণ নয়নও মোহনকে দেখে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর, দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল,—নিষ্পলক নেত্রে, নিস্পন্দভাবে, নিস্তব্ধ হয়ে! তাদের ভিতরকার প্রাণ তখন যেন নয়ন দিয়ে জোর করে' বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

গাড়ী ক্রমেই দূরে, দূরে—আরো দূরে চলে যাচ্ছে।

মোহন আবেগভরে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর, সামনের দিকে যতটা পারে ঝুঁকে পড়ল!

গাড়ীখানা রাস্তার মোড়ের কাছে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোহন শূন্যপথের দিকে উদাসচোখে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হঠাৎ টেবিলের উপর ঘুরে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দেখলুম, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে! ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভারতবাসী ও ভারতীয় ইংরেজ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

যে সকল সাধারণ কারণে ভারতবাসী ও ইংরেজ—এই দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনে বাধা হয় সেই সকল সাধারণ কারণ ছাড়া আর কতক-গুলি বিশেষ-কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার। ভারত-বাসীর নিকট বিদেশী মাত্রই ম্লেচ্ছ। যে সকল জিনিস বিদেশীরা স্পর্শ করে, তাহা কলুষিত হয়। উচ্চবর্ণের সিপাহীরা, ইংরেজ সেনানায়কের ছায়া-স্পৃষ্ট খাদ্য দূরে নিক্ষেপ করে। যে সকল য়ুরোপীয়, ভারত-বাসীর অধিকার-সমর্থনে, ভারতবাসীর সাহায্যার্থে, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিতও ভারতবাসীরা কখনই খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করে না। মাদ্রাজের হিন্দুরা ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা Hume সাহেবের সহিত একত্র আহার করিতে সম্মত হইবে,—ইহা একটা অশ্রুতপূর্ব্ব সাহসের দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে;—যদিও Hume একজন নিরামিষাশী, প্রায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিলেও চলে। ইংরেজ মহিলাদিগকে তেমন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং "আমীরা"র ন্যায় উচ্চবর্ণের ভারতবাসিনীরা, তাহাদিগের সহিত "মেম-লোকের" মতো ব্যবহার করে।

* *
*

পক্ষান্তরে ইংরেজের স্বভাব। প্রাচ্যেরা যেমন বাচাল, ইংরেজরা তেমনি নীরব; প্রাচ্যেরা যেমন সুনম্য ও ভদ্র, ইংরেজরা তেমনি রূঢ়; প্রাচ্যদিগের কল্পনাবৃত্তি ও অলস বাগ্মিতা যেরূপ প্রবল, ইংরেজের তেমনি খট্‌খটে তথ্যপ্রবণ প্রকৃতি। Cotton সাহেব তাঁর "জাত-ভাই"দিগের চরিত্র-সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন:—

"প্রগাঢ় আত্মসন্তোষ—ইহাই অ্যাংলো-সেক্‌সন চরিত্রের একটা বিশেষত্ব: ইংরেজ-চরিত্রের এই লক্ষণটা ইংলণ্ডে স্পষ্ট লক্ষিত হয়; কুশিক্ষাপ্রাপ্ত যে সকল ইংরেজ য়ুরোপ-মহাদেশে ভ্রমণ করে তাহারা ইহারই নিমিত্ত সেখানে অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়ে, এবং এই আত্মাভিমান ভারতে গিয়া শীঘ্রই বিকট আকার ধারণ করে। যে সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ভারতে কাজ করে, তাহারাও এই মানবীয় দুর্ব্বলতা হইতে অব্যাহতি পায় না, তাহাদের এই দুর্ব্বলতা অধীনলোকের তোষামোদ ও দাসত্বে আরও বৃদ্ধি পায়। আমাদের প্রাচ্য প্রজাগণ তাহাদের এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া প্রাচ্য প্রথা-অনুসারে, উপর-ওয়ালা প্রভুর প্রতি অতীব নীচ ধরণের স্তুতিবাদ করে! ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এইরূপ আচরণের প্রতি বাহ্যত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও, ভিতরে ভিতরে তুষ্ট হন, এবং ঐরূপ আচরণের একটু ব্যত্যয় দেখিলেই তাঁহাদের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

কোন সিপাই যুক্তিসঙ্গত কারণে কথায় অবাধ্য হইলে, কোন ইংরেজ রাজপুরুষ তাহাকে হয়তো চাবকাইয়া দিবেন; কোন রাজপুরুষ পুলিশের লোককে প্রহার করিবেন; আবার, রাস্তায় কোন দেশীয় সম্মানার্হ অশ্বারূঢ় জমিদার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিলে সেই রাজপুরুষ তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই অসৎ ব্যবহার করিবেন (১)।

ভারতবাসীর শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াও ইংরেজ স্বীয় ঔদ্ধত্য বজায় রাখেন, এবং ভারতবাসীকে পোষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করেন।

মালাবারী বলেন:—

"কি ইংলণ্ডে, কি ভারতবর্ষে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, সেই বিষয়ের আমি উল্লেখ করিতেছি। এই সম্বন্ধ যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমরা সকলেই এক-মত। এই অবস্থাটা যাহাতে ঘটিয়া উঠে তজ্জন্য ভারতবাসীর সহিত রেষারেষি করিয়া ইংরেজরা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া থাকেন। কি সরকারী কি বে-সরকারী অধিকাংশ ইংরেজই দেশীয় লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত যে সহানুভূতি করেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সদাশয় বন্ধুদের মধ্যে কতকগুলি লোক যে বন্ধুত্বের একটু বেশী বাড়াবাড়ি করেন (আমরা এসিয়াবাসী যে-বন্ধুত্ব অনুভব করি সেই প্রকৃত বন্ধুত্ব তাঁহাদের নিকট আশা করাটা দুরাশা) সে বিষয়েও আমি সুনিশ্চিত। কেননা, আমার মনে হয়—যে-ইংরেজ সর্ব্বদাই আমাদের নিন্দা করেন, দোষানুসন্ধান করেন, তিনি যেমন অনিষ্ট করেন; যে-ইংরেজ আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করেন, তিনিও তেমনি অনিষ্ট করেন। কথাটা শুনিতে একটু অদ্ভুত হইলেও আমার মনে হয়, আমাদের হিত-চিন্তা কম করাও যেমন খারাপ, বেশী করাও আমাদের পক্ষে তেমনি খারাপ। আমরা যদি বাস্তবিকই যোগ্য হই, আমাদের সহিত ঠিক্ সমকক্ষভাবে ব্যবহার করা উচিত। আমাদের যাহা প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা তোমরা আমাদিগকে বেশী কিছুই দিও না;—তা, সে কথাতেই হোক্ বা অন্য প্রকারেই হোক্। স্কুলে, কলেজে, সরকারি কার্য্যক্ষেত্রে, তোমাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, যুঝাযুঝি করিয়া, আমাদের অধিকার আমরা অর্জ্জন করিব। আমরা চাই সমান বিচার—তা-ছাড়া বেশী কিছু নয়।"

(১) H. J. S. Cotton, New India (1885) P. 42.

এক্ষণে, ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

হাজার হাজার বৎসর হইতে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ, দরিদ্র, নিরীহ, উদাসীন ভারতের চাষা, যেমন অন্য সমস্ত বৈদেশিকদিগের শাসন সহ্য করিয়া আসিয়াছে, ইংরেজের শাসন তেমনি সহ্য করিতেছে; বরং আরো সহজে সহ্য করিতেছে। চাষার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খলা, শান্তি, ন্যায়বিচার; কোন ধর্ম্মঘটিত উৎপীড়ন নাই। আইনের বলে তাহারা ভূমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছে এবং খাজনার হার পূর্ব্বাপেক্ষা কম। তা ছাড়া, অধিকাংশ রায়ৎ ইংরেজ-দিগকে কদাচিৎ দেখিতে পায়। ভারতের প্রায় ত্রিশকোটি লোকের মধ্যে, কেবল ১৬৮,০০০ য়ুরোপীয়; তন্মধ্যে ৬৪০০০ সৈনিক। একলক্ষ ও কয়েক সহস্র অ-সৈনিক য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তিন-চতুর্থ ভাগ সহরে বাস করে। অন্য য়ুরোপীয়গণ সরকারী কর্ম্মচারী বা ভূম্যধিকারী। ইংরেজ কর্ম্মচারী-গণ, বড় বড় পদ অধিকার করেন; অথবা তাঁহারা কতকগুলি বিশেষ কাজের ভার প্রাপ্ত হন,—যথা টেলিগ্রাফ, পূর্ত্তকর্ম্ম, ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ ইত্যাদি। য়ুরোপীয়দের মধ্যে ভূম্যধিকারী খুবই কম; কাহারও কাহারও চা-র ক্ষেত আছে; তাঁহাদের কুলিরা হিমালয়ের অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের অন্তর্ভুক্ত; কেহ কেহ নীলের, কেহ কেহ পাটের, কেহ কেহ আফিমের চাষ করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্গদেশে বাস করেন। এই একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজ ও রায়তের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়া থাকে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও গুজরাটে ইংরেজ ভূম্যধিকারীর সংখ্যা খুবই কম, ভারতের অবশিষ্ট স্থানে ইংরেজ ভূম্যধিকারী একেবারেই নাই। ইংরেজ ভূম্যধিকারী, অধিক লাভের আশায় দেশীয় লোকের প্রতি কঠোর, এমন-কি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ভারতীয় জমিদার আরো-বেশী লুব্ধ, এবং তাঁহার বাহ্য ব্যবহার মিঠা হইলেও, নীচ জাতের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা অত্যন্ত বেশী, উৎপীড়নও খুব কঠোর।

খুব সাধারণভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজের শাসন-সম্বন্ধে রায়ৎরা উদাসীন। এই শাসনের ফলে, ব্রিটিশ-রাজ্য ছাড়িয়া রায়তেরা দলে-দলে দেশীয় রাজার রাজ্যে গমন করে না; দেশীয় রাজার রাজ্য হইতেও ব্রিটিশরাজ্যে আসে না।

* *
*

ইহার বিপরীতে, বড় বড় সহরে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অনিশ্চিত ও পরিবর্ত্তনশীল।

ভারতের সাধারণ লেখক ইংরেজকে যেরূপ ভয় ও সম্মানের চক্ষে দেখে, বিস্ময় ও ভক্তির চক্ষে দেখে, Kipling তাহার বেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃদ্ধ 'ইমান্-দিন্' তাহার ছোট ছেলে মহম্মদ-দিনের জন্য একটা পোলো-খেলিবার গোলা ইংরেজ-মনিবের নিকট চাহিতেছে (২):—

"ধর্ম্মাবতারের কি এই গোলায় আর কোন দরকার আছে? হজুরের হুকুম হয় তো এই গোলাটা আমার ছোট ছেলেকে দিই, গোলাটা দেখে তার বড় খেল্‌তে ইচ্ছে হয়েছে।"

Kipling বলেন,—"তার পর দিন, নিত্যনিয়মিত আমি যে সময়ে আফিস হইতে ফিরি, তাহার আধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি আফিস হইতে ফিরিয়া, খানা-কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখি, একটি ছোট শিশু—বেশ গোলগাল, একটা খাটো কামিজ পরিয়া আছে, তাহাতে তাহার মোটা পেটের অর্দ্ধেকটি মাত্র ঢাকিয়াছে···আমি প্রবেশ করিবামাত্র, সে চোখ্ মেলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া পড়িল। আমি বুঝিলাম সে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি সেখান হইতে পলাইলাম,—একটা কান্নার চীৎকার আমার অনুসরণ করিতে লাগিল দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ইমান্-দিন, খানার কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্না। আমি ফিরিয়া আসিলাম। ছেলেটা কামিজটাকে রুমালের মত ব্যববার করিতেছে দেখিয়া ইমান্-দিন ছেলেকে ধম্‌কাইতে লাগিল:—"ছেলেটা বড় বদ্‌মাশ ও শেয়ে দেখ্‌ছি জেলে যাবে।"

"তোমার ছেলেকে বল, সাহেবের রাগ হয়-নি,—তাকে নিয়ে এসো!"

ইমান বলিল:—"ওর নাম মহম্মদ্-দিন, ও বড় বদ্‌মাশ।"

আপনার বেকার অবস্থা অনুভব করিয়া ছেলেটা বাপের কোলে আবার ফিরিয়া আসিল এবং নির্ভীকভাবে বলিল: "সত্যি সাহেব, আমার নাম মহম্মদ দিন। কিন্তু আমি বদমাশ নই; আমি একজন মানুষ।"

'গুজ্‌রাট ও গুজরাটী' নামক গ্রন্থে একটা মজার দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন সায়াহ্নে, আয়ারলণ্ডদেশীয় এক সৈনিক, মাতাল হইয়া বোম্বায়ের এক নাপিতকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে!

হিন্দু নাপিত মনে মনে ভাবিল,—নালিস করব? নালিস্ করে' কি হবে!

(২) "The Story of Muhammad Din",—Plain Tales from the Hills.

নাপিতকে মারবার অধিকার গোরা-সেপায়ের নিশ্চয়ই আছে।

সে তাহার শ্বাশুড়ীর কাছে গিয়া সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল, আর তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিল:—"গোরা-সেপাই তোমার উপর মারপীঠ করেছে, এই বলে তার নামে তুমি নালিস কর।" বৃদ্ধা সম্মত হইল: আমূলসংস্কারপন্থী জ্বলন্ত উৎসাহী একজন উকীল, বিদেশী উৎপীড়কদিগের রীতি-নীতি সম্বন্ধে খুব একচোট শুনাইয়া দিবার সুযোগ পাইল। আর যিনি বিচারক, তিনিও হিন্দু—তিনি তো ভয়েই সারা; তিনি যদি একটুও ভুলচুক্ করেন তাহা হইলে সমস্ত ইংরেজ সংবাদপত্র তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করিবে।

আদালতে এইরূপ বিচার চলিতেছে:—

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (নাপিতের শ্বাশুড়ীর প্রতি) ঐখানে দাঁড়া, মাগি। সাহেব কি তোর উপর মারপীঠ করেছিল?

রমণী। (আম্‌তা আম্‌তা করিয়া) আপনি আমার মা-বাপ।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। বেত্ খাবি যদি আমার কথায় সোজা জবাব না দিস্। সাহেব তোকে মেরেছিল?

রমণী। আমি গরীব বিধবা; আমার স্বামী আপনার ক্ষৌরী করিত, মা-বাপ!

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (রাগিয়া) পাহারাওয়ালা, ইধার আও। এখন আমার কথার জবাব দিবি কি না বল্। এই গোরা কি তোকে মেরেছিল?

রমণী। মা-বাপ, আমার জামাইকে মারাও যা, আমাকে মারাও তা। একই কথা। (উকীল মাথা হেঁট করিয়া রহিয়াছে; নাপিত শ্বাশুড়ীর দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইতেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ হাসিতেছে, গোরা-সৈনিকের মুখেও ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে) সমস্ত সহর এ-কথা জানে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কোন্ কথা জানে?

রমণী। আমি ভালো স্ত্রীলোক এই কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কিন্তু ও কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

রমণী। আমার লক্ষ্মীর বাবা হুজুরের ক্ষৌরী করত—এই কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (তিতি-বিরক্ত হইয়া উকীলের দিকে ফিরিয়া) দেখুন মিষ্টার রামরাশ, প্রতিবাদী আর কাউকে প্রহার করে থাক্‌বে।

উকীল। (এই কথার সূত্র ধরিয়া গোরার প্রতি) এই নাপিত ভদ্রলোকটির উপর তুমি কি মার্‌পিঠ্ করেছিলে?

গোরা। তুমিই বলো-না যাদু!

উকীল। কথাগুলো একটু ওজন করে বোলো।

গোরা। আমি কথা ওজন করব কি-করে?

উকীল। তুমি আমার সঙ্গে কথা-কাটা-কাটি করবার জন্য এখানে এসেছ?

গোরা। তাই কি আপনি মনে করেন?

উকীল। (খুব রাগিয়া) Hold out your tongue, sir—("hold your tongue" না বলিয়া)।

এই সুযোগ পাইয়া, গোরা সৈনিক খুব গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া, তাহার জিব্ বাহির করিল—(একটা বড় লাল লড্‌বড়ে

জিনিস্ মুখ হইতে ঝুলিয়া পড়িল)। দর্শকেরা খুব হাসিতে লাগিল। উকীল হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। নাপিত, কৃপা ও অবজ্ঞার ভাবে উকীলের দিকে তাকাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ হাসিয়া খুন। আপন মুখের ভিতর রেশমী রুমাল গুঁজিয়া দেওয়ায় দম্ আটকাইবার যোগাড় হইল।

মোকদ্দামা ডিস্‌মিস্ হইল। (Malabari, "Gujarat and the Gujaratis"—Scenes in a Mofussil Magistrate's Court).

"Indian Mirror" নামক এক হিন্দু সংবাদপত্রে, ইংরেজের সম্বন্ধে লোকের মনোভাব বেশ বিবৃত হইয়াছে :—

"সাধারণতঃ শাসয়িতৃজাতির উপর দেশীয় লোকের একটা বিদ্বেষ আছে বলিয়া দেশীয় লোকের প্রতি যে দোষারোপ করা হয়, তাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হইলেও, ইংরেজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দেশীয় ব্যক্তিবিশেষের আসক্তি ও অনুরাগ দেশীয় চরিত্রের একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ। ভারতের যে-কোন অংশেই ভ্রমণ কর না কেন, এমন একটি স্থানও দেখিতে পাইবে না যেখানে, ভালোই হোক মন্দই হোক, ইংরেজের হাতের ছাপ স্পষ্ট না দেখা যায়। যেমন একদিকে খারাপ ও প্রজাপীড়ক ইংরেজের নাম লোকেরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে, তেমনি আর এক দিকে ভালো ও উদারস্বভাব ইংরেজের নাম বংশপরম্পরাক্রমে লোকের স্মৃতিপটে তাজাভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে;—ইহা দেশীয় লোকের চরিত্রগত ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। কাহারো প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করা দেশীয় লোকের স্বভাবই নহে। দেশীয় লোকের হৃদয় স্বভাবত দয়ালু; শাসয়িতৃজাতিভুক্ত কোন লোক এই দয়ার পাত্র হইলে, এই দয়ার মাত্রাটা বরং আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের নিকট সব সময়ে যে আমরা প্রতিদানের প্রত্যাশা করি তাহা নহে, আমরা পতিত প্রজার জাতি, আমরা কত বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকট ঋণী,—এই মনোভাব হইতেই আমরা তাঁহাদের উপকার করিবার জন্য সমুৎসুক হই। তাঁরা যদি আমাদের অমিশ্র ভাল করিতেন, অর্থাৎ ভালোর সহিত কিছু কিছু মন্দ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে বসিতাম;—যাঁহারা আমাদের উপকার করিয়াছেন কিংবা উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের এমনই জ্বলন্ত অনুরাগ।

ইংরেজ বলিয়াই আমরা ইংরেজের বিদ্বেষী, একথা নিতান্ত অমূলক। একথা খুবই সত্য, যেসকল য়ুরোপীয়, দেশীয় লোকদিগকে অবজ্ঞা করিবার, গালি দিবার, অবনত করিবার কোন সুযোগই ছাড়ে না, তাহাদিগকে দেশীয় লোকেরা বিদ্বেষ করে। কিন্তু এ কথাও খুব ঠিক্ যে, পাশ্চাত্য জাতির অন্তর্ভূত যেসকল লোক দেশীয় লোকের ভাল করে কিম্বা ভাল করিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাদের প্রতি দেশীয় লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অপরিসীম।" (New India" গ্রন্থে উদ্ধৃত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝড়

(গল্প)

আমার বেশ মনে পড়ে, সে-ও এমনি ঝড়ের রাত—চারিধারে বাতাসের এমনি গর্জ্জন, আকাশে মেঘের এমনি ছুটোছুটি! পনেরো বছরের কথা,—তবু মনে হয়, যেন সে কালকের ঘটনা! সেই রাতটিকে যদি আজ আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও ফেরাতে পারতুম!

বাবা আমার মস্ত জমিদার। মানসম্ভ্রম, আদব-কায়দার দিকে পুরোদস্তুর তাঁর টান ছিল—আমি তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। সকলে বলত, হাঁ, বাপ্‌কা বেটী! মা বলতেন, বাবার অহঙ্কারটুকুও কি পূর্ণমাত্রায় পেতে হয়! মেয়েমানুষের পক্ষে ও জিনিষটা যে ভারী সর্ব্বনেশে!

তখন বুঝিনি, আজ বুঝছি, আমার স্নেহময়ী মার সে কথাটুকু কত খাঁটি! মাগো, চিরদিন নিজেকে সবার আড়ালে সবার পিছনে রেখে সকলকে তৃপ্তি দিয়ে কেন অত তাড়াতাড়ি তুমি চলে গেলে! কেন মা, তোমার এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটিকে তার সব অহঙ্কার সব গর্ব্ব চূর্ণ করবার মন্ত্রটুকু যাবার বেলায় শিখিয়ে দিয়ে গেলে না? তাহলে তাকে যে আজ বুকের মধ্যে এমন বেদনা নিয়ে—

সেই কথাই বলতে বসেছি। কোনখানে এতটুকু গোপনতা রাখব না! মানুষের কাছে আমি ত বিচার চাইতে আসিনি—এ যে আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া! রাখা-ঢাকার ফাঁকি ত আর নিজের মনের সঙ্গে চলে না।

আমার বয়স তখন দশ বৎসর—আমার লক্ষ্মী মা হঠাৎ একদিন বাড়ীটায় কান্নার রোল তুলে বিদায় নিলেন। বাবা ছিলেন পুরুষ—তিনি সংসারী জীবের এই মৃত্যুকে চিরন্তন সত্য জেনে মিথ্যা শোকের ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন না। তিনি তাঁর জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম—পথ-ঘাট তৈরী, খাজনা-আদায়, বাকী বকেয়া উসুলের দরুণ বেয়াদব প্রজাকে শায়েস্তা-করণ প্রভৃতি—বেশ যথানিয়মেই করতে লাগলেন।

দেখে সকলে বললে, মার মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন, পরেও তেমনি তাঁর কাজ-কর্ম্মের ধারাটি বেশ অবিচ্ছিন্নভাবেই বয়ে চলেছে। আচার-ব্যবহার বা ভাব-ভঙ্গীতে কোথাও এমন একটু ফাঁক দেখা গেল না, যা থেকে বাহিরের লোকে কোনরকম বিচ্ছেদ বা অমঙ্গলের আভাষ পেতে পারে! বাড়ীর গুরু-পুরোহিত শাস্ত্র আওড়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এই ত স্থিরধী মুনির লক্ষণ! আর একদল লোক আড়ালে বলাবলি করেছিল, মানুষটাকে কি ভগবান এক কোঁটা প্রাণও দেন-নি! এ কথাটা খুব অস্ফুটে অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও আমার কাণে পৌঁছুতে কিছুমাত্র বাধা পায় নি।

এমন বাপের মেয়ে আমি—মা-মরা মেয়ে! বোধ হয়, নিজের সম্বন্ধে এর বেশী আর কোন কথা না বললেও চলে!

লেখাপড়া গান-বাজনা—এই সব নিয়ে বেশ একটা স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলছিলুম। বাহিরে বিশ্বের পানে চেয়ে দেখবার অবসর ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পাঁচজনে এই স্বপ্নের রাজ্যে একটা খবর নিয়ে এল যে বয়স আমার পনেরো পার হতে চলেছে! বাড়ীতে এক বিধবা পিসি ছিলেন; তিনি বাবাকে শুনিয়ে বললেন, এ বয়সে হিন্দুর ঘরের মেয়েকে আইবুড়ো রাখা কিছুতেই চলে না! ইহলোকে লোকলজ্জা ত আছেই তা ছাড়া পরলোকেও নাকি বিস্তর লাঞ্ছনা জমা হচ্ছে!

বাবা হেসে বললেন, নীরু এখনও ছেলেমানুষ। ওর যখন জমিদারী চালাবার মত বুদ্ধি হবে, তখন ওর বিয়ে দেব!

পিসি বললেন, শোনো কথা! মেয়ে মানুষ আবার জমিদারী চালাবে কি রকম? তার চেয়ে নয় তোমাদের ঐ লেখা-পড়া জানা শান্ত শিষ্ট সুন্দর একটি ছেলে দেখেই বিয়ে দাও; সেও তোমার বশে তোমারই ঘরে থাকবে—জমিদারীও বজায় রাখবে!

বাবা বললেন, বেশী নিরীহ লোক নীরুর সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে পারবে না।

পিসি বললেন, তা ঠিক! যে ধিঙ্গি মেয়ে!

পিসির মুখ গম্ভীর হল—বাবা চুপ করলেন, আমিও পাশের ঘরে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম!

বিয়ে!

এক-গা গহনা পরে আধ হাত ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে মাটীর পুতুলের মত জড়ভরতটি হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা ত! পরের ইসারায় নড়া-চড়া খাওয়া-বসা শোয়া-দাঁড়ানো—সুখে হাসতে পাব না, দুঃখে বুক ভেঙ্গে গেলেও একফোঁটা চোখের জল ফেলবার অধিকার নেই—এই ত বাঙালীর বৌয়ের সুখের ছবি! কাজ নেই আমার অমন সোনার চাঁদ বরের আদরে ডুবে সংসার করা! যেমন আছি, আমি যেন এমনিই থাকি—এই গান-গল্প, খেলা-ধূলো, হাসিখুসি নিয়ে! কোন নতুন লোকের নতুন সঙ্গ-সুখের স্বাদ আমি চাই না!

মনের যখন এমনি অবস্থা, তখন এক দিন বাবা বললেন, চ' নীরু একবার পশ্চিম ঘুরে আসি।

আমি বললুম, চল।

দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, নানান্ দেশ ঘুরে আমরা একদিন এসে কাশীতে আস্তানা পাতলুম। তীর্থ বলে যে কাশীর উপর টান পড়ল, সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। জানিনা, বাবা কোনদিন বিশ্বনাথ-দর্শনে গেছলেন কি না—তবে আমি গেছলুম—কিন্তু সে একদিন। দেব-তাকে প্রণাম করতে যাব বলে যাইনি—এ কথা স্পষ্টই স্বীকার করি। এতে যদি কেউ নাস্তিক বলে ঘৃণায় নাক সিঁটকে মুখ ফেরান, তাহলে নিরুপায়। আমি কিন্তু সত্য কথা বলছি। আর বলেছি ত, কারো বিচারের প্রত্যাশী হয়ে আমি নিজের এ

কাহিনী আজ বলতে বসিনি। আমি গেছলুম, মন্দির দেখতে—শুধু সেই প্রাচীনতার কথা শুনে, তা দেখবার কৌতূহল নিয়ে।

এবং এই যে কাশীতে আটকে পড়লুম—সে পরকালে স্বর্গ বা শিবত্ব-প্রাপ্তির লোভে নয়। বাবার এক বন্ধু জুটে গেলেন; ছেলে-বেলায় কবে নাকি দু'জনে একসঙ্গে কল্-কাতার কোন্ স্কুলে পড়েছিলেন—ভাব ছিল—আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে দু'জনে এই কাশীতে দেখা। তাঁরই বন্ধুত্বের খাতিরে পড়ে বাবা বললেন, নীরু মা, এখানে আয়, কিছুদিন থেকে যাই।

ঘুরে ঘুরে আমিও একটু শ্রান্ত হয়েছিলুম, বললুম, বেশ!

বাবার সে বন্ধুটির নাম বিশুবাবু। বিশুবাবু লোকটি ভারী অদ্ভুত ধরণের। আর্য্যামির গর্ব্বে এমনই তিনি আত্মহারা যে পৃথিবীর অপর সমস্ত জাতকে কুকুর-বিড়ালের সামিল বলেই তিনি মনে কর-তেন। বাবার সঙ্গে তাঁর তর্ক চলত। বাবা যখন সাংসারিক স্বচ্ছলতা বা নানাবিধ আধিভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা পাড়তেন, তখন বিশুবাবুর তর্কে আধ্যাত্মিক আগুন এমনি তীব্র তেজে জ্বলে উঠত যে তার দিকে বেশী এগিয়ে যাওয়া যে-কোন বুদ্ধি-মান লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল না। কারণ বিশুবাবুর তর্কে আগুন যতখানি জ্বলত, গালাগালের ধোঁয়া তার চেয়ে ঢের বেশী উঠত। সে ধোঁয়ায় তাঁর প্রতিপক্ষের চোখে জল বার করে তবে তিনি স্থির হতেন। আমি এক আধদিন আড়াল থেকে তাঁর তর্ক-যুক্তি শুনতুম—কিন্তু কোনদিন সে তর্কে আঘাত দিতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। বিশুবাবুর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে মন আমার অশ্রদ্ধায় ভরে উঠত!

এই তর্কে এক-আধদিন আবার বিশু-বাবুর ভাগ্নে তিনকড়ি খুব মৃদু-মন্দ ছন্দে সুর মেলাত। তবে তিনকড়ির বয়স ছিল কাঁচা, কাজেই আর্য্যবংশাবতংস এমন মাতুলের যুক্তি-ধারা সে বেচারা তেমন পরমানন্দে পান করতে পারত না। ফলে অনেক সময়েই ঘটত এই যে তর্কের গোড়ায় মাতুলকে অনুসরণ করতে গিয়ে শেষ-বরাবর তিনকড়ি বাবার যুক্তির স্রোতে ভেসে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এসেই থই নিত! তার সে আচরণ দেখে মাতুলের অবস্থা বাতুলের মত হয়ে উঠত! আমি নেপথ্যে বসে এদের কাণ্ড দেখে হেসে সারা হতুম!

একদিন এই তর্কের মুখে ভাগ্নের উপর চটে মাতুল বিশ্বনাথ বলে উঠলেন, তোমার মাথায় যদি এমন সব ম্লেচ্ছ ভাব তাল পাকাতে থাকে তাহলে তোমায় আমার কাছে বাস করতে দেওয়া ত নিরাপদ নয়।

এই আকস্মিক রসভঙ্গে তিনকড়ি একে-বারে অবাক হয়ে গেল। বাবা কোনমতে গোল থামিয়ে সেদিন মাতুল-ভাগিনেয়ের সম্পর্কের বাঁধনটুকু অটুট রাখলেন।

এর পর কথায় কথায় বাবা একদিন বললেন, বুঝলি নীরু, এই বিশুটা পাগল। এদিকে ত আমাদের চাল-চলন তার পছন্দ হয় না—তবু বলে কি, জানিস,—বলে, ঐ তিন-

কড়ির সঙ্গে যদি তোমার মেয়েটির বিয়ে দাও তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই! তিনকড়িরও একটা হিল্লে হয়—তাছাড়া—

আমার কাণ দুটো গরম হয়ে উঠল। কি আশ্চর্য্য আজগুবি সাধ! স্পর্দ্ধাও কম নয়! চোখে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে বাবার পানে চাইলুম।

বাবা আমার ভাব বুঝতে পেরে ঘাড়টা নেড়ে বললেন, তা হয় না। তবে এটুকু বুঝছি, তিনকড়িকে বাড়ীতে রাখতে বিশুর আর তেমন ইচ্ছে নেই। ছেলেটির লেখাপড়ার দিকে চাড় আছে—বিশু বলে, যা-হোক কোন উপায়ে রোজগার করতে লেগে যা!

বাবা যেন বাতাসকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে গেলেন; আমিও তাই তাতে কোন রকম সায় বা সাড়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করলুম না।

তিনকড়ির দোষ এমন-কিছু দেখি না। লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়! বাহিরের চেহারা প্রভৃতি ভদ্রসমাজে চলবার মত—কিন্তু বড় গরিব সে! যাক্, কাজ কি আমার মিছে তিনকড়ির কথা ভেবে!

এর পর একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল।

চৈত্র মাস। আকাশে সেদিন দুপুর থেকেই মেঘের একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। আমি তা গ্রাহ্য না করে চিরপ্রথামত বিকেলে বেড়াতে বেরুলুম।

কাশীতে স্ত্রীজাতির মস্ত একটা স্বাধীনতা আছে—এজন্য হে তীর্থ, তোমায় নমো নমো! তোমার কল্যাণে বাঙালীর মেয়ে এখানে তবু গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে তাদের নারী-জন্ম কতকটা সার্থক করতে পায়!

সেদিন বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে চলে অনেকগুলো গলিঘুঁজি পার হয়ে বেণীমাধবের ধ্বজায় এসে উঠলুম। তখন জোর বাতাস বইতে সুরু হয়েছে। ধ্বজার উপর থেকে ওপারে রামনগরের পানে চেয়ে দেখলুম। রামনগর থেকে অসি অবধি গঙ্গার উপর দিয়ে এপার-ওপার জুড়ে কে যেন মস্ত একটা স্বচ্ছ বালির দেওয়াল তুলে দিয়েছে! আমার হাতে একখানা রুমাল ছিল—দমকা বাতাসে সেখানা উড়ে চকিতে যে কোথায় চলে গেল, বুঝতেও পারলুম না। হু-হু করে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। তখন ভাবলুম, না, বাড়ী যাই। বেণীমাধব থেকে নেমে আবার গলি ভেঙ্গে একেবারে দশাশ্বমেধের কাছে এসে পৌঁছুলুম। মাথার উপর আকাশ তখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে। দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে কি-রকম একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠছে। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় ওপার থেকে অদ্ভুত রকমের একটা বুনো গন্ধ ভেসে আসছে। আমি বাড়ীর দিকে চলতে লাগলুম। পথে না আছে একখানা একা, না গাড়ী! খানিক আসতে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা ঝরতে সুরু হল! গায়ে যেন হাজার তীর ফুটছিল! আমি আরো জোরে চলতে লাগলুম। বৃষ্টির বেগও এদিকে আরো বেড়ে উঠল। আমার গা ছম-ছম

করতে লাগল। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, এই বৃষ্টিতে আপনি পথে বেরিয়েছেন?

পা কেমন থম্‌কে থেমে পড়ল। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকে গেল। পিছনে চেয়ে দেখি, তিনকড়ি; মাথায় তার ছাতা।

কোন জবাব দিলুম না; দরকার ছিল না। তিনকড়ি বললে, এই বৃষ্টি-ঝড়ে আর এগুবেন না। ঐ টিনের ছাদটার নীচে দাঁড়াবেন, চলুন। জলের বেগ কমলে আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেব।

তবুও কোন কথা বললুম না। তিনকড়ি ছাতাটা এগিয়ে এনে আমার মাথায় ধরলে। অমন ভীষণ মুহূর্ত্তেও আমার হাসি পেলে। কি নির্লজ্জ রূপ-যৌবন-লোলুপ পুরুষের এই সেধে সেবা দেবার প্রয়াস! অভদ্র দাসত্ব-পনা! কেউ ত তার এ সেবা চায় না! হায়রে এই পুরুষই আবার শাস্ত্র লিখে স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্ব খাটাতে চায়! জেনো, তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বল দয়ার পাত্র বলেই স্ত্রীজাতি তোমাদের এই সব পুঁথির বুলির বিরুদ্ধে কোন দিন কোন কথাটি কয় না—ঘাড় পেতে সমস্ত সহ্য করে যায়! একবার যদি তারা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের চোখের একটা বক্র ইঙ্গিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তোমাদের ঐ বহুমূল্য শাস্ত্র আর স্বার্থ-পঙ্কিল প্রাণ!

হঠাৎ একটা খেয়াল হল। সামনেই দেখি, এক বড় গাছের নীচে খুঁটির উপর টিনের ছাদ-দেওয়া একটুখানি ছোট্ট আস্তানা। বোধ হয়, কোন্ সন্ন্যাসী কোন যোগের সুযোগে ছাউনি ফেলেছিলেন—এখন তাঁর সেই পরিত্যক্ত আস্তানাটুকু ভক্তের স্বর্গে যাবার সোপান হয়ে পড়ে আছে। আমি সেই টিনের ছাদ-দেওয়া ছাউনিতে এসে দাঁড়ালুম। যতখানি পারে তিনকড়ি আমায় বৃষ্টির জল আর ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা করবার চেষ্টায় ছাতা ঘিরে আড়াল তুলে দাঁড়াল। ঝড়ের তখন কি সে প্রচণ্ড বেগ—বৃষ্টিরও কি জোর! মাথার উপর টিনের ছাদ হঠাৎ এক সময় তার খুঁটির মায়া ত্যাগ করে ভূমিসাৎ হল। আমায় রক্ষা করতে গিয়ে তিনকড়ি তার দুই হাত তুলে টিনখানা ধরে ফেল্‌লে। তার জামা ছিঁড়ে হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল—তিনকড়ি শেষ টিনের ভার রাখতে না পেরে পিছলে পড়ে গেল।

ভাল গ্রহ! তাড়াতাড়ি আমি টিনখানা সরিয়ে তিনকড়ির হাত ধরে তাকে ওঠালুম। হাতে তার বেশ জখম! রক্ত পড়ছে! আমি তাড়াতাড়ি আমার বৃষ্টিতে-ভেজা আঁচল ছিঁড়ে তার হাতে বেশ করে পটি জড়িয়ে দিলুম। তিনকড়ি ধুঁকছিল।

আমি বললুম, আর এখানে নয়। চলুন, আমাদের বাড়ী চলুন। পথে আরো ঢের বিপদ ঘটতে পারে! দেখুন দেখি, আমার জন্য নিজেকে একেবারে এতখানি ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললেন!

তিনকড়ি আমার পানে চাইলে—বড় করুণ সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টির অর্থ যে না বুঝলুম তা নয়। সে দৃষ্টি আমার মনের মধ্যে এক দুর্দ্দমনীয় বিজয়-স্পৃহা জাগিয়ে তুললে। একটু কৌতুক করবার ইচ্ছা হল।

দৃষ্টিতে করুণা মাখিয়ে তিনকড়ির পানে চেয়ে দেখলুম। একে মেঘের এই চপল লীলা তার উপর এ কৌতুক! সে যে মারাত্মক ব্যাপার!

তিনকড়ি বোধ হয় আমার চোখে সে সময় এমন-কিছু দেখেছিল, যাতে তার সমস্ত সঙ্কোচ চট্ করে কেটে গেল। সে একেবারে বলে উঠল, আপনার যে গায়ে এতটুকু আঁচ লাগেনি, এতেই আমি কৃতার্থ! এর জন্য আমার প্রাণটা গেলেও—তিনকড়ির কথাটা আর শেষ হল না। আদরের প্রত্যাশায় পোষা কুকুর যেমন আকুল চোখে প্রভুর পানে চায় তেমনি দৃষ্টিতে তিনকড়ি আমার মুখের পানে চেয়ে রইল!

আমি খুব উচ্চ হাস্য করে বললুম, বটে—কেন, বলুন দেখি!

তিনকড়ির হাতের পটিটা তখন আমি চেপে-চেপে আর-একবার ভাল করে জড়িয়ে দিচ্ছিলুম। হঠাৎ সে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, আমি আপনাকে ভালবাসি, বড় ভালবাসি। জানি, পাবার নয়, তবু আমার মনকে কিছুতে আমি ফেরাতে পারি না।

তাড়াতাড়ি আমি হাত টেনে নিয়ে সরে এসে বললুম, বৃষ্টি একটু নরম পড়েছে। চলুন, বাড়ী যাই।

বলেই তাকে আর আর দ্বিতীয় কথাটি কবার অবকাশমাত্র না দিয়ে রাস্তায় নেমে চলতে সুরু করলুম। তিনকড়িও আমার পাছু পাছু আসতে লাগল।

বাড়ী ফিরে চা খেয়ে গরম কাপড়-চোপড় পরে বিছানায় এসে বসলুম। ধব্‌ধব্ করছে নরম বিছানা! সামনের টেবিলে বাতি জ্বলছিল; সেই বাতির আলোয় হঠাৎ আমার কেমন মনে হল, আজ আমার মত সুখী কে! আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন! এমন ঐশ্বর্য্য আমার, এই বয়স, এমন রূপ! মানুষ এর বেশী কিছুই আর কামনা করতে পারে না। ইহলোকে মানুষের কামনা করবার মত বস্তুই বা আর কি থাকতে পারে? কিছু না। তিনকড়ির কথা মনে পড়ল। মাতুলের ভিক্ষা-অন্নে লালিত, নিতান্তই সে কৃপার পাত্র! নিজের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই! আজ ঐ মামা বিশ্বনাথ যদি তাকে পথে বার করে দেয় —আজ—এই রাত্রে—এই ঝড়-বৃষ্টির পরে বাহিরের পথ-ঘাট যখন অত্যন্ত কদর্য্য বিশ্রী হয়ে আছে—তাহলে এই কদর্য্য পথে-ঘাটেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে!

সামনে প্রকাণ্ড আয়না ছিল—তার পানে চেয়ে দেখলুম। হেসে চেঁচিয়ে আপনাকে আপনি বলে উঠলুম, এ মূর্ত্তি দেখে কে চুপ করে থাকতে পারে! বেচারা, বেচারা তিনকড়ি!

মন যখন এমনি গর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে বলে উঠল,—এই ত রূপ আর তরুণ বয়স নিয়ে বসে আছিস —কে এলরে তোর কুঞ্জ-দ্বারে, কে তার স্তুতিগান শোনাতে এল! আর এই তিনকড়ি—এ মানুষ।

মন আবার চোখ রাঙিয়ে উঠল, বললে, কি! আমি রাজার মেয়ে, আর ঐ তিনকড়ি

পথের ভিখিরী! সে আমায় পুজো করতে পারে, কিন্তু—

ভাবনার আর অন্ত রইল না। হু-হু করে যা-তা ভাবনা এসে মনটাকে তোলপাড় করে দিলে!

কিসেরই যে ছাই-পাঁশ ভাবনা! হাসি পেলে! আমি শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুমের ঘোরে কিন্তু সেই এক সুর কানের কাছে বাজতে লাগল, ভালবাসি, ভালবাসি, ওগো বড় ভালবাসি!

সকালে উঠে মনটা প্রথম কেমন আচ্ছন্ন বোধ হল! জোর করে চাবুক মেরে তাকে সিধে করলুম। তারপর কারা দু'দলে মিলে মনের মধ্যে এক বিষম লড়াই বাধিয়ে দিলে! অস্থির হয়ে বললুম, না, না, না।

বাবাকে বললুম, কলকাতা যাই চল, বাবা, এখানে আর ভাল লাগছে না।

বাবা বললেন, কিন্তু একটা কথা আছে মা—

আমি বাবার মুখের পানে চাইলুম।

বাবা বললেন, এই তিনকড়ি বেচারা! ও আমায় বড্ড ধরেছে। লেখাপড়া শিখে ও মানুষ হতে চায়, কিন্তু অর্থপিশাচ মামা তার জন্য আর একটা কাণাকড়িও খরচ করতে রাজী নয়। সে বলে, কাশী-হেন- স্থান, যাত্রী ধরে পেট চালা। তিনকড়ি তাতে রাজী নয়। সে বলে, তার মার যা গহনা-পত্র ছিল, সেগুলো দাও, তা বিক্রী করে সে লেখাপড়া শিখবে। মামা হাঁকিয়ে দিচ্ছে, বলে, গহনা আবার কি! তাই বেচারা আমায় এসে ধরেছে। কি বলিস্ মা?

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল! আবার সেই তিনকড়ি! যার জন্য মনের সঙ্গে অহরহ এই যুদ্ধ চলেছে—যার কাছ থেকে দূরে যেতে চাই, এমনি করে ভূতের মত সে সঙ্গ নেবে! না, কখনো না। কে তিনকড়ি—সে আমার কে যে তার জন্য এত মাথাব্যথা! না, সে কেউ নয়, কেউ নয়! হতভাগা, বেচারা, পথের এক সামান্য পথিক সে!

বাবা আবার বললেন, তাহলে কি বলিস্ মা?

আমি বললুম, তাকে তুমি সঙ্গে রাখতে চাও না কি?

বাবা বললেন, তুই যা বলিস, তাই করি—

ইচ্ছা হল, বাবাকে বলি, আর ফ্যাসাদ জড়িয়ো না, বাবা! কিন্তু গলাটা কে যেন চেপে ধরলে। একটা ঢোঁক গিলে বললুম, বেশ, কিন্তু আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা হবে না, তা বলে রাখছি। কোথাকার কে, কেমন লোক—

বাবা বললেন, লোক বোধ হয় মন্দ হবে না। ছেলে ভাল, তার মামার মত নয়। তবে হ্যাঁ, এক বাড়ীতে থাকা হয় না—কেন না, আমি আজ কোথায় থাকি, কাল কোথায় যাই, ঠিক নেই—তার চেয়ে ওকে মাসে মাসে বরং কিছু করে দেব, ও কলকাতায় গিয়ে মেসে থেকে পড়ুক। কেমন?

আমি বললুম, বেশ—তাহলে ওকে কালই কলকাতায় পাঠাও, আমরা এদিকে আরো ক'দিন মুঙ্গের-টুঙ্গের ঘুরে তারপর কলকাতায় যাব'খন।

কোথায় যেন আমার বাধছিল। গা ছমছম করছিল। তিনকড়ির সঙ্গে আর না দেখা হয়! একটু ভয়ও হচ্ছিল। কিন্তু না, কিসের ভয়! আমি রাজার মেয়ে—তার উপর এই রূপ, এই বয়স! কোথাকার কে তিনকড়ি এসে কানের কাছে এক আবদারের সুর তুলবে, আর অমনি আমি—না, না, কখনো না!

তার পর সেই বছর মাঘ মাসেই আমার প্রাণে বসন্ত জেগে উঠল। আমরা তখন কলকাতার বাড়ীতে। অজস্র ফুলের গন্ধে পাখীর গানে আমার প্রাণটাকে ভরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সমারোহ করে আমার হৃদয়-রাজ্যেশ্বর একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। মাগন্দীর রায় বাবুদের বংশ-তিলক এক তরুণ যুবার হাতে বাবা আনন্দাশ্রু-চোখে আমায় সমর্পণ করলেন। সে রাত্রির সেই আলো গান বাজনা আর ফুলের গন্ধে আমার প্রাণ-মন অসহ্য সুখের সম্ভাবনায় বিভোর হয়ে উঠল। সেই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত হাতের উপর হাত রেখে আমার মনে হল, মস্ত একজন সহায় পেলুম, বন্ধু পেলুম, স্বামী, স্বামী, স্বামী! মনে মনে আমার চিরজীবনের সুখদুঃখ এই হাতেই অসীম নির্ভরে সমর্পণ করে প্রাণ আমার কৃতার্থ হল। বিচিত্র আবেশ এক অপূর্ব্ব মায়া-কুঞ্জ আমার চোখের সামনে ধরে দিলে, প্রাণের মাঝে বহুদিনকার সাধ-আশা ফুলের মত অজস্রভাবে অপরূপ শোভায় ফুটে উঠল।

কিন্তু হায়রে সে কতক্ষণের জন্য!

ফুলশয্যার রাত্রে ফুলের গহনা পরে মনে মধ্যে প্রেমের মণিদীপ জ্বেলে ফুলের বাসর সাজিয়ে বসেছিলুম—এইবার আমার প্রিয়তমকে প্রাণ ভরে একান্তে দেখবার সুযোগ পাব! অস্থির পুলকে ক্ষণে ক্ষণে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল—এমন সময় আমার স্বামিদেবতা দেখা দিলেন। হায়, ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে নয়, শান্তি, আরাম, আশ্বাস-ভরা প্রেমের ডালি হাতে নিয়ে নয়—চোখ তাঁর জবাফুলের মত লাল, পা টলমল করছে, মুখে বিশ্রী গন্ধ, মদ খেয়ে মাতাল! নিমেষে যেন কোথা থেকে এক ভীষণ ঝড় উঠল—তার দাপটে আমার প্রাণের মধ্যে সে দীপের আলো নিবে গেল—অত সাধের ফুলের রাশ ছিঁড়ে কোথায় ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল! সুন্দর মায়া-কুঞ্জ চোখের পলকে শ্মশানের মত বীভৎস হয়ে উঠল। অসহ্য জ্বালা সারা দেহ-মনটাকে একেবারে তাতিয়ে তুললে। ঘৃণায় আমি সে ফুলের গহনা ছিঁড়ে ফেললুম, মাথাটা দপ্-দপ্ করে উঠল। একেবারে খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম। খড়খড়ি বন্ধ ছিল, জোরে খুলে ফেললুম। বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া কে যেন অনেকখানি জ্বালা জুড়িয়ে দিলে! দূর হতে কার বাঁশীর সাহানার সুর ভেসে আসছিল, আকাশে একরাশ নক্ষত্র—মনে হল, সবাই হাসছে, সবার মুখে তীব্র বিদ্রূপ! ভাবলুম, আজ যদি আমার এই তপ্ত প্রাণের তীক্ষ্ণ জ্বালায় সমস্ত আকাশ-বাতাস জ্বালিয়ে দিতে পারতুম, পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হত!

দেবতা এসে হঠাৎ আমার আঁচলটা টেনে জড়ানো গলায় ডাকলেন, প্রাণেশ্বরী—

এক ঝট্‌কায় আঁচল টেনে নিয়ে সরে

দাঁড়ালুম। মাতাল অবাক হয়ে চেয়ে রইল—খানিক পরে বললে, বেশ বাবা!

আমার স্বামী-সম্ভাষণ—এই প্রথম, এই শেষ!

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছিল। বাড়ী এসে বাবাকে বললুম, আমি আর কোথাও যাব না বাবা। যদি আর আমায় সেখানে পাঠাও, আমি আত্মহত্যা করব।

বাবা আমার মুখের পানে চাইলেন। আমার মনের মধ্যে তখন এমনি আগুন জ্বলছিল যে তার ঝাঁজ অবধি আমার চোখ-মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল। আমি বললুম, এক পাষণ্ড মাতাল—

কেঁদে ফেললুম। বাবারও চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি আমাকে বুকের মধ্যে তিনি টেনে নিলেন। বাবার মুখে একটিও কথা ফুটল না।

তার পর আবার সেই পুরোনো জীবন-ধারায় গা ঢেলে দিলুম। বাপে-মেয়েতে নানান্ দেশে লক্ষ্যহীন গতিতে আবার সেই ভেসে বেড়ানো!

দেবতার কাছ থেকে এতেলা এল, পাঠাও।

বাবা জবাব দিলেন, না।

তাঁরা চোখ রাঙালেন, ছেলের আবার বিয়ে দেব।

বাবা লিখলেন, তোমাদের মর্জ্জি হয়, দাওগে।

তাঁরা আবার শাসালেন, আদালত আছে।

বাবা লিখলেন, কেউ পায়ে দড়ি বেঁধে রাখেনি, স্বচ্ছন্দে সেখানে যেতে পারো!

তারপর সব চুপচাপ।

কিন্তু এই নানান্ দেশে ঘুরে বেড়িয়ে, নর-নারীর এই বিপুল মেলায়—তাদের সুখের ঢেউ মাঝে মাঝে আমার মনটাকে ছুঁয়ে এক বিষম দোল দিয়ে যেত! পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, এ সব তেমনি আছে—তবে আমার প্রাণে তারা আর কোন সাড়া জাগায় না! বসন্ত তেমনি আসে, চাঁদ তেমনি আলোর ঢেউ তুলে নেচে চলে যায়, কিন্তু সব নির্জ্জীব, সব জড়! কুয়াশায় আগাগোড়া কে যেন তাদের সে প্রাণটুকু ঢেকে দিয়েছে। এক-একবার সেই কবেকার ঝড়ের রাত্রির কথা মনে পড়ত! সেই বেচারা তিনকড়ি, আর তার সেই ব্যাকুল বেদনা-ভরা আবেদন! সে যেন একটা স্বপ্ন! মনকে চাবকে বললুম, খবরদার! তোর আপন তেজে তোকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে—মাথা হেঁট করা কিছুতেই চলবে না তোর! ভেঙে যাস্ যদি, যা—কিন্তু মচকে পড়িস্ নে!

এমনি বিপুল দ্বন্দ্বে মনকে নিয়ে যখন অস্থির, তখন কোথা থেকে বুকে বাজ পড়ল। বাবা হঠাৎ একদিন কোন্ অদৃশ্য লোকে চলে গেলেন। এ বিপুল জগতে আমি আজ একা!

জোর করে বললুম, না, কিসের ভয়! আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য—রাজার ঐশ্বর্য্য!

দুদিন পরে আবার এক খবর এল; আমার স্বামী-দেবতা এক গণিকার গৃহে মজলিশ করছিলেন—শেষে এক সময়ে মদের

নেশায় ভালবাসার সীমা দেখাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন! মস্ত একখানা ভারী পাথর বুক থেকে সরে গেল। বাঃ! আমার সব বন্ধন আজ কেটে গেছে—আমি আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত! চমৎকার!

শ্রান্ত মন নিয়ে বারো বৎসর নানা দেশ ঘুরে আবার একদিন বাড়ী ফিরলুম। রাজ্যেশ্বরী রাজ্য-পালনে মন দিলুম। খাতা-পত্র থেকে মহাল পর্য্যন্ত নিজে দেখে তদ্বির করতে লাগলুম। এক-এক সময় চোখের সামনে পড়ত, গরিবের সংসার, চাষার সংসার। স্বামী ক্ষেতে খেটে সারা হচ্ছে, মাথায় প্রচণ্ড সূর্য্য আগুন ছড়াচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, শুধু খাটছে, খাটছে, খাটছে! তার স্ত্রী ছোট ছেলে-কাঁকালে করে থালায় ভাত বেড়ে স্বামীকে খাওয়াতে এল। দুজনে গাছের ছায়ায় বসে ছোট্ট ছেলেটিকে একটু নাড়া-চাড়া করলে—তারপর স্ত্রী হেসে ছেলে-কোলে বাড়ী চলে গেল, স্বামী ক্ষেতে খাটতে লাগল! কোথাও-বা স্বামী কাজে বেরুচ্ছে, আর তার তরুণী স্ত্রী লোক-চক্ষু বাঁচিয়ে ছাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্লান হাসি হেসে তাকে বিদায় দিচ্ছে! অনাদি কালের সংসার তার সরল ধারাতেই বয়ে চলেছে।

দেখে মন আমার হু-হু করে উঠত!

আবার এক চৈত্র মাস। আকাশে বৃষ্টি-বাতাসের ভীষণ যুদ্ধ! ঘরের জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ছিলুম—মনের মধ্যে আলো-আঁধারের খেলা চলেছিল।

বৃদ্ধ নায়েব মশায় এসে বললেন, উকিল বাবু এসেছেন।

আমি বললুম, কেন?

তিনি বললেন, বাহারগাঁয়ের প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছিল—কাল তাদের নামে নালিশ রুজু না করলে সব তামাদি হয়ে যাবে। তাই আর্জী তৈরি করে আপনাকে তা বুঝিয়ে আপনার সই নিতে নিজেই তিনি এসেছেন!

আমি বললুম, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

নায়েব দ্বিরুক্তি না করে চলে গেলেন।

উকিল আমাদের সেই তিনকড়ি। বাবার কৃপার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করেছিল—আজ পাঁচ বৎসর উকিল হয়ে আমাদের এষ্টেটের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সেই দেখছে।

উঠে একটা ইজি চেয়ারে আমি বসলুম। উকিল তিনকড়ি ঘরে এসে দাঁড়াল। নিষ্ফলতার তীব্র রোষে মন আমার মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলে উঠল। তার পর হাসিমুখে সহজ সুরেই বললুম, কি চাই?

অত্যন্ত বিনীত স্বরে তিনকড়ি বললে, এই আর্জীগুলো এনেছি—পড়ে সই করতে হবে।

আমি বললুম, পড়—

তিনকড়ি পড়তে লাগল। আমার কাণে তার কিছু গেল না। শুধু জাগছিল এক বিষম ঝড়ের হু-হু গর্জ্জন! আর তারি ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছিল অত্যন্ত কোমল সুরে এক করুণ আবেদন, ভালবাসি—আমি ভালবাসি, ওগো, বড় ভালবাসি!

কলের মতই কতকগুলো সই করলুম।

নায়েব মশায় আর্জীগুলো হাতে নিয়ে বললেন, আমি তাহলে তপসীলগুলো ঠিক করে রাখিগে।

নায়েব মশায় চলে গেলেন।

তিনকড়িও চলে যাচ্ছিল; আমি বললুম, দাঁড়াও।

তিনকড়ি দাঁড়াল। ঘরে আর কেউ নেই, শুধু তিনকড়ি আর আমি। বুক আমার দুর-দুর করে উঠল। আমি বললুম, আর কোন কথা নেই তোমার?

—না।

—নিজের—কোন কথা নয়?

তিনকড়ি চুপ করে রইল।

আমি বললুম, এই রাত্রে নিজে তুমি কষ্ট করে এসেছ! এই জল-ঝড়—কোন কথা নেই? একটা নিশ্বাস কিছুতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

তিনকড়ি তখনও দাঁড়িয়ে, নির্ব্বাক,—মুখ তার মাটীর পানে!

খুব সাবধানে ছোট একটা নিশ্বাস চেপে আমি বললুম, বাড়ীর সব খবর ভাল? বৌ ভাল আছে?

—হ্যাঁ।

—যাও।

তিনকড়ি চলে গেল। এই সেই তিনকড়ি! একটা কদর্য্য মাংসপিণ্ড—বিয়ে করে পরম সুখে নিশ্চিন্ত মনে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করছে!

আর আমিই শুধু সেই কবেকার এক ঝড়কে বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি!

হারে হতভাগিনী, আজ কোথায় তোর সে তেজ, সে গর্ব্ব! বাতিটা নিবিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। চোখের জল আর কোনমতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

বাড়ীর দোর-জানলাগুলোকে কাঁপিয়ে বাহিরে উদ্দাম ঝড় হা-হা করে গর্জ্জে ফিরতে লাগল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নৈসর্গিকী

তোমারে হেরিনু যবে, বিহগের গানে
যে ভূষাশিঞ্জনধ্বনি শুনিতাম কানে,
যে আঁখিনীলিমা আমি গগনে-গগনে
হেরিতাম সাঁঝে-ভোরে মদির স্বপনে,
যে ঘন কুন্তল-জাল হেরিতাম আমি
বরিষার গিরি-শৃঙ্গে-শৃঙ্গে দিবা যামি,
বসন্ত কাননে আর সায়াহ্ন-আকাশে
যে অধর রক্তিমার চুম্বন পিয়াসে
ঘুরিতাম অন্যমনা। ঢালিত শ্রবণে
যে ভাষা-মাধুরী আহা বীণা-বেণুস্বনে,
তোমা আজি গৃহে আনি তোমা পানে চাই
তার একে একে সবি কেবল মিলাই,
অবাক হইয়া শুধু ভাবি বসে ঘরে,
কেমনে মিলিছে সব অক্ষরে অক্ষরে।

শ্রীকালিদাস রায়।

অভিনয়ের কথা

জাতীয় জীবন হইতে অভিনয়-কলাকে কিছুতেই ছাঁটিয়া ফেলা চলে না;—সভ্যতার সঙ্গে অভিনয়-কলার সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ।

প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের যে কতটা-বেশী চর্চ্চা হইত, সংস্কৃত নাট্য ও কাব্য প্রভৃতিতে তাহার অগুন্তি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে নটের নাম শুনিলেই অনেকে এখন নাক বাঁকাইয়া মুখ ফেরান, সেই নট তখন সমাজের এমন প্রিয়পাত্র ছিলেন, যে দেব-দেব মহাদেবকেও হিন্দুরা নটেশ্বর নাম দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। সেকালে ভদ্রমহিলারাও যে অভিনয়ে যোগ দিতেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। পরযুগে সামাজিক প্রথার অদল-বদল ঘটাতে ভদ্রমহিলারা নাট্যশালা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন; ফলে, গৃহলক্ষ্মীদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রঙ্গালয় হইতেও লক্ষ্মী-শ্রী অন্তর্হিত হইল।

কিন্তু মহিলারা রঙ্গালয় ছাড়িলেও, দেশের লোকেরা অভিনয়ের নির্ম্মল আনন্দ ছাড়িয়া থাকিতে পারিল না। যাত্রা, কথকতা যতই ভাল হউক, তাহাদের ভিতরে অভিনয়ের সমস্ত মাধুর্য্যটুকু ফুটিতে পারে না। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট ও শিক্ষিত পুরুষ অভিনয়-কলাকে উন্নত ও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু তখনকার অভিনয় যতই নির্দ্দোষ হউক, রমণীর ভূমিকা পুরুষে নেওয়াতে তাহাও ঠিক স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিল না। এইজন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃত-লাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী ভদ্রলোকের যত্নে ও পরিশ্রমে বাঙ্গলাদেশে নূতন যে রঙ্গালয় স্থাপিত হইল, তাহাতে স্ত্রীলোকের অভাব আর রহিল না। কিন্তু এই নূতন রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া, ইহার সহিত অনেকেই সংশ্রব রাখিতে চাহিতেন না।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল প্রভৃতি যে-সকল ভদ্রলোক, নব-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক অভিনয়-অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সুধু শিক্ষিত ও শক্তিধর ছিলেন, তাহা নহে;—অভিনয়কে তাঁহারা মনে-প্রাণে আর্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন। সেইজন্য বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রথম অবস্থাতেই আমরা অনেকগুলি ক্ষমতাবান অভিনেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। এখন রঙ্গালয়ে দর্শকের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ভাল অভিনেতার সংখ্যা সেই তুলনায় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরী ছাড়া এমন আর কাহাকেও দেখি না, আগেকার

অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে যাঁহার নাম করিতে পারি। অবশ্য, এখনকার রঙ্গালয়ে জনকতক চলন-সৈ নট ও নটী আছেন,—তাঁহাদের অভিনয় তবু বসিয়া দেখা চলে; কিন্তু তা-ছাড়া অভিনেতার পোষাকে আর যে লোকগুলিকে তর্জ্জনগর্জ্জন এবং বিনাইয়া-বিনাইয়া ক্রন্দন করিতে শুনি, সারারাত চেয়ারের উপরে হাড়-গোড়-ভাঙ্গা দ'য়ের মত খাড়া বসিয়া-বসিয়া তাহাদের অভিনয় দেখার চেয়ে শ্মশানে-মশানে গিয়া হঠযোগ সাধন করা ঢের—ঢের বেশী সহজ। এতদিনে আমাদের রঙ্গালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইবারই কথা। কিন্তু উন্নতি চুলায় যাক্, বাঙ্গলা রঙ্গালয় ক্রমেই অবনতির দিকে নামিতেছে। আমাদের মতে ইহার একমাত্র কারণ,—অভিনয় যে একটা আর্ট, রঙ্গালয়ের আধুনিক অভিনেতারা হয় তাহা জানেন না, নয়ত সে শক্ত আর্টকে দখল করিবার শক্তি তাঁহারা রাখেন না! কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে বয়াটে, নিষ্কর্ম্মা ও অপদার্থ লোকগুলি আছে, রঙ্গমঞ্চের উপরে এখন তাহাদিগকে প্রায়ই ভূতের নাচ নাচিতে দেখা যায়। যাহাদের অনাচার-শুষ্ক চেহারা



"দি মেরি ওয়াইভ্‌স্ অফ্ উইণ্ডসরে"
স্যর হার্বার্ট টি, এলেন টেরি ও মিসেস কেণ্ডাল



হ্যামলেটের ভূমিকায় স্যর হেনার আরভিং

দেখিলেই আগা-পাশ-তলা জ্বলিয়া উঠে, নাটকের কথাগুলিকেই যাহারা শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাদের অভিনয় সহ্য করার মত বড় শাস্তি নরকেও আছে কিনা, জানিনা।

* *
*

এ-দেশে, যাহাদের কোনদিকে কিছু হয় না, তাহারাই অভিনেতার কাজ গ্রহণ করে। বাঙ্গলায় সখের থিয়েটার যে কত আছে, গুনিয়া উঠা ভার;—কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের সঙ্গে শিক্ষিত সচ্চরিত্র লোকের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া, সে-সব জায়গায় সাধারণত নির্দ্দোষ অভিনয়-কলার উপযুক্ত চর্চ্চা হয় না।

অভিনেতা হইতে হইলে কতটা অন্তর্দৃষ্টি, নরচরিত্রে কতটা অভিজ্ঞতা, কলাশাস্ত্রে কতটা জ্ঞান থাকা চাই! রঙ্গালয় ত

ছেলেখেলার আখ্‌ড়া নয়—সাহিত্যে, শিল্পে ও সঙ্গীতে যাহার ভাল-করিয়া রসবোধ হয় নাই, তাহার যদি অভিনেতা হইবার সাধ হয়, তবে সে সাধের সঙ্গে অনায়াসে 'কাঙ্গালের ঘোড়া-রোগে'র তুলনা চলিতে পারে। বিলাতের আরভিংএর সমকালিক বিখ্যাত হাস্যরসের অভিনেতা পরলোকগত জে, এল, টুল বলিতেছেন: "I think an actor who loves his profession, sees more of the truly human side of the life than any other man, except in the case of painters like Wilkie, or a novelist such as Dickens; because it is our business to go

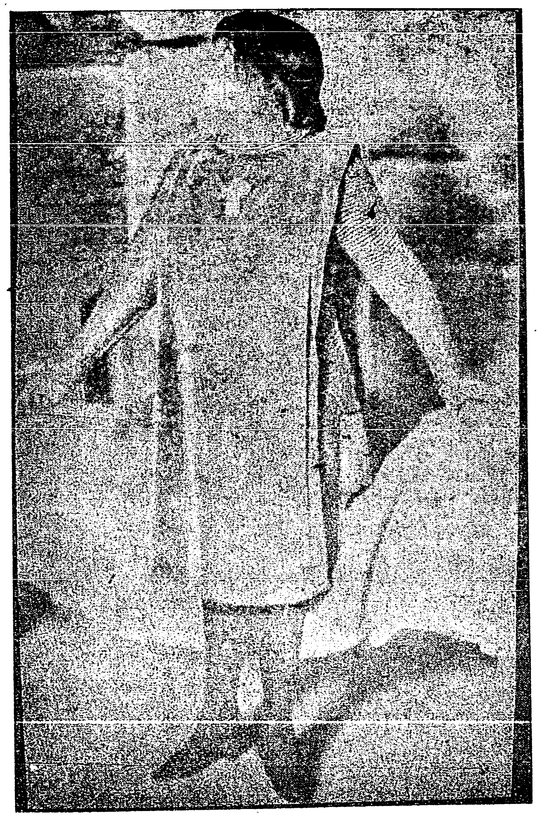

"জোয়ান অফ্ আর্কে"র ভূমিকায়
সারা বার্ণাড



"পঞ্চম হেনরি"র ভূমিকায়
স্যর এফ, আর, বেনসন

into the streets, into the slums, into markets and taverns, into society for our models."—ট্যুল আরও বলেন, রঙ্গমঞ্চের উপরে তিনি মানুষের যে-সব বিশিষ্টতা, জীবনের যে-সব ছবি দেখাইয়াছেন, তাহার কোনটিই কল্পিত নহে; পরন্তু, নিত্যদৃষ্ট সংসার হইতে তিনি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, রঙ্গমঞ্চের উপরে হুবহু তাহারই প্রতিচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অভিনেতার কাজ যে কত শক্ত, ট্যুল তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে তাহার একটি গল্প বলিয়াছেন। রঙ্গালয়ে একদিন 'মহলা'র সময়ে একটি যুবক অভিনেতা তেমন ভাল ভাবে অভিনয় করিতে পারিল না। এই জন্য ম্যানেজার তাহার উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ট্যুল কিন্তু তাহাকে যথাসাধ্য উৎসাহদান করিলেন। ফলে, সে রাত্রে যুবকের অভিনয় মন্দ হইল না।

পরদিন ট্যুল বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সেই যুবকটি তাঁহার কাছে আসিয়া খুব মৃদুস্বরে বলিল, "মশাই, আমার কালকের অভিনয় বড় খারাপ হয়েছিল। আশা করি, সেজন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না।"

ট্যুল মুখ তুলিয়া দেখিলেন, যুবকের দেহে শোকের পরিচ্ছদ!

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি তোমার যথাসাধ্য করেছ, তার বেশী আর কি করবে বল?"

যুবকটি তাঁহার পাশে খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া, কেমন-যেন ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার পর ক্ষুণ্ণস্বরে চুপিচুপি তাঁহাকে বলিল, "আমার কি হয়েছে জানেন? গেল-পরশু আমার মা মারা গেছেন।"

—"শুনে বড় দুঃখিত হলুম।"

—"তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন!"

—এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে, গভীর সাধনা ভিন্ন কেহ-কখনো ভাল অভিনেতা হইতে পারে না। অভিনেতাকে আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়,—নিজের সুখের সময়ে তাঁহাকে পরের জন্য কাঁদিতে হয়, নিজের দুঃখের সময়ে তাঁহাকে পরের জন্য হাসিতে হয়।

বিখ্যাত অভিনেতা আরভিংএর জীবনে সাধনার যে দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা অপূর্ব্ব। তিনি যখন যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইতেন, তখন একেবারে সেই ভূমিকার মধ্যে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া যাইতেন। আরভিং কখনো ধরা-বাঁধা রীতির কোন ধার ধারিতেন না; যে-সব ভূমিকায় অন্যান্য অনেক অভিনেতা নাম কিনিয়াছেন, সেই-সব ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আরভিং যতদিন-না তাহাতে নূতন আলোকপাত করিতে পারিতেন, ততদিন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন না। একজন একটি ভূমিকা কোন বিশেষ ভাবে অভিনয় করিয়াছে বলিয়া, আর-একজনকেও যে তাহারই নকল করিতে হইবে—এ নিয়মের কোন মূল্য নাই; কারণ, একের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, অপরের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। বাঙ্গলা রঙ্গালয়ে পুরাতন ভূমিকায় যখনি কোন নূতন অভিনেতাকে দেখা যায়, তখনি বোঝা যায় অভিনেতার পক্ষে অনুকরণ কি সাংঘাতিক! আরভিংএর অভিনয়ে এই দোষ ছিল না বলিয়া, তাঁহার দ্বারা অভিনীত ছোটবড় সকল ভূমিকাই পুরাতন হইলেও নূতন সৌন্দর্য্যে এবং অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে সুন্দর ও চমকদার হইয়া উঠিত। কোন নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইলে, আপনাকে তাহার উপযুক্ত করিবার জন্য আরভিং এডিনবার্গের 'ক্যাল্টন হিলে' চলিয়া



'দি টেনিং অফ দি শ্রু' নাটকে মিঃ ম্যাথিসন ল্যাং ও
মিস হাটিন ব্রিটন।

যাইতেন। সে-সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া লোকে পাগল বলিয়া ভাবিত। অনেকদিন নির্জ্জন সাধনার পর তিনি যখন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হইতেন, তখন তাঁহার ভাবভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তার ধরন-ধারন অবিকল ভূমিকার উপযোগী হইয়া উঠিত। নট-জীবনের প্রথমেই আরব্ধি Uncle Dick's Darling নামক নাটো Chevenixএর ভূমিকায় ডিকেন্সকে এমনি অভিভূত করিয়াছিলেন যে, ডিকেন্স বলিয়া ছিলেন, "এই যুবক একদিন মস্ত অভিনেতা হবে।"

কেবল আরভিং নন,—গ্যারিক, ম্যাক্রেডি, রবার্টসন, ট্রি, বেনসন, আলেকজান্দার, ম্যাথিসন ল্যাং, এলেন টেরি, মিসেস কেণ্ডাল ও সারা বার্নাড প্রভৃতি সমস্ত বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী আপনাদের কঠোর সাধনার জোরেই পৃথিবীব্যাপী যশগৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

* *
*

বাঙ্গালী যে সাহেবের মতন ভাল অভিনেতা হইতে পারে, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু-শেখর এবং কতক-পরিমাণে মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। তাহার উপর, যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারা বঙ্গ-রঙ্গালয়ে অভিনয় করানো হয়, সেই শ্রেণীর ভিতর হইতে যে তারাসুন্দরীর মত প্রতিভাশালিনী নটী আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, এটাও সকলের কল্পনার অতীত ছিল; বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের পক্ষে ইহাও একটা গৌরবের কথা। কিন্তু, কেবল এইটুকুতেই তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গলাদেশের প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এমন নাটকের অভিনয় আমরা দেখি নাই বলিলেও চলে, যাহার ভৃত্য হইতে রাজা পর্য্যন্ত ছোট-বড় সমস্ত চরিত্রের ভূমিকাই ঠিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে! তাহার উপরে, এ-দেশে দৃশ্যপট, নাচ-গান ও সাজ-গোছের অসংখ্য ত্রুটীও দর্শকের রসবোধকে অতি-মাত্রায় আহত করে; তাহাও অবহেলার বিষয় নয়। কারণ, এ-সব বিষয়ের দ্বারা অভিনেতারা পরোক্ষভাবে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন।

ইংরেজী থিয়েটারের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু বাঙ্গলাদেশেও আর্ট বজায় রাখিয়া কতটা সুন্দর অভিনয় হইতে পারে, যাঁহারা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে "বৈরাগ্যসাধন", "ফাল্গুনী", "বৈকুণ্ঠের খাতা", —এবং বিশেষ-করিয়া "ডাকঘরে"র অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। দেশীয় রঙ্গমঞ্চ বলিতে যে বৈচিত্রহীন ব্যাপারের স্মৃতি মনে পড়ে, ঠাকুরবাড়ীর এই সকল অভিনয়ে তাহার লেশমাত্র ছিল না। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের অভিনেতাদের সেই ভাবহীন মোমের পুতুলের মত মুখ, বিকটস্বরে চীৎকার বা সানুনাসিক স্বরে ক্রন্দন, 'থিয়েটারী' ঢঙ্গে চলা-ফেরা, দর্শকদের দিকে চাহিয়া অভিনয়-করা, বেখাপ্পা পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বেমানান বিষয়ও এই বিচিত্র অভিনয়ে ছিল না বলিয়া এখানে আসিয়া রসিকের মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক, ঠাকুরবাড়ীর কয়েকটি অভিনয়ে গভীর ভাব-প্রধান রসে রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এবং হাস্যরসে অবনীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব্বতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা ভুলিবার নয়। 'ডাকঘরে' তরুণ বালক শ্রীমান আশামুকুল যে অভিনয়-কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের অনেক কথাকথিত প্রসিদ্ধ অভিনেতাও তেমন অভিনয় করিতে পারিলে ধন্য হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়ীর এই-সব অভিনয়ে যে রঙ্গমঞ্চগুলি তৈয়ারি হইয়াছিল, তাহা অস্থায়ী বটে; কিন্তু এত সুন্দর, ভাবোপযোগী, রুচিসঙ্গত ও শিল্পরীতিসম্মত যে, তাহারা অনেক তথাকথিত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চেরও আদর্শ



হ্যামলেটের ভূমিকায় মিঃ ফোর্বস্ রবার্টসন

হইতে পারে। বিশেষ, 'ডাকঘরে'র অভিনয়ে একটি ঘরের ভিতরে এতটুকু জায়গায় যে স্বপ্নের মত মনোরম ও রূপকথার রাজ্যের মত সুন্দর রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, আমাদের প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা যদি তাহা দেখিতেন, তবে তাঁহাদের চোখও ফুটিত আর শিক্ষালাভও হইত। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা, ক্ষমতা এবং কলাকুশলতা এখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ের পেশাদার অভিনেতাদের নিকট হইতে আশা করা যায় না; তথাপি, অভিনয় যে কত উচুদরের আর্ট, তাহাতে যে কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টির ও রসানুভূতির প্রয়োজন এবং অভিনেতারা যে মানুষের প্রাণের ভিতরকার সূক্ষ্ম ভাবের তন্ত্রীগুলিকে কেমন-করিয়া জাগাইয়া তুলিতে পারেন, অন্তত এটুকু অনুভব করিলেও সাধারণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষরা অনেকটা উপকৃত হইতেন।

* *
*

আমাদের রঙ্গালয়ের একটা মস্ত খুঁৎ এই, তাহাতে একেবারেই কালোপযোগী নূতনতার বৈচিত্র নাই। য়ুরোপে আজকাল অভিনয় এতটা সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করিতে পারে যে, মেটারলিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড', ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক্' ও আন্দ্রীভের 'দি ব্ল্যাক মাস্কার্স্' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ও

সেখানে সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অভিনয়ে এ-সব নাটকের রস ঠিকমত ফুটাইয়া তোলা ভারি কঠিন; এমন-কি, ঐ-সকল নাটকের কোন-একখানি যদি অভিনয় করিতে হয়, তবে বাঙ্গালী অভিনেতারা চোখে সর্ষেফুল দেখিয়া, একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবেন। টিনের মরচে-ধরা তরবারি ঘুরাইয়া লম্ফঝম্প ও আকাশভেদী চীৎকারের দ্বারা রুদ্ররস প্রকাশ করা, মুখ-ভ্যাংচাইয়া অট্টস্বরে হাসিয়া হাস্যরস প্রকাশ করা এবং মৃতদেহের পাশে বসিয়া নাকী সুরে কাঁদিয়া করুণরস প্রকাশ করা, বর্ত্তমান যুগে আর চলিবে না। বিংশ-শতাব্দীর যুগধর্ম্মে মানুষের জীবন ক্রমেই ঘটনাশূন্য ও বৈচিত্রহীন হইয়া উঠিতেছে; এখন আত্মার ভিতরে যে নানাভাবের অবিরাম ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে, বাহিরের জীবনে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আন্দ্রীভ তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "Is action, in the accepted sense of movements and visible achievements on the stage, necessary to the theatre?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলিতেছেন, "না, ইহার কোন দরকার নাই।" যেহেতু, "Modern life itself in its most tragic aspects tends to withdraw farther and farther from external activities and deeper and deeper into the recesses of the soul, into the silence and outward calm that characterises mental life."

অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য যখন মানব-জীবনের প্রতিরূপ-দেখানো, তখন বর্ত্তমানের যুগধর্ম্মে মানব-জীবনে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, অভিনেতাও তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারে না। য়ুরোপের রঙ্গালয়ে তাই এখন মানুষের বাহিরের খোলস ছাড়িয়া ভিতরকার প্রাণের গতি ও লীলা দেখানো হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী', 'রাজা' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতি, বর্ত্তমান কালের উপযোগী নাটক। এ-শ্রেণীর নাটক লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা-ভাষায় এক নূতন ধারা আনয়ন করিয়াছেন; কিন্তু এই নূতন ধারাকে দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিবার সাধ্য বা সাহস বাঙ্গলার সাধারণ রঙ্গালয়ের নাই!

রঙ্গালয় জাতীয় জীবন-গঠনে সাহায্য করে। বেশীদিনের কথা নয়,—এই 'স্বদেশী'র যুগেও 'প্রতাপাদিত্য', 'সিরাজ-উদ্দৌলা', 'মীরকাশীম', 'ছত্রপতি' ও 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের দ্বারা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের অভিনেতারা দেশময় যে প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আমরা তাহা ভুলি নাই। আমোদের সঙ্গে শিক্ষাদানের কাজ রঙ্গালয়ে যতটা সহজে সারা যায়, ততটা আর কোথাও নহে। রঙ্গালয়ে গেলে সাধারণ লোকের হৃদয় আপনা-আপনি উন্নত, ভাবুক ও রসগ্রাহী হইয়া উঠে। কবির কাব্য যাহারা পড়িয়া বুঝিতে পারে না, অনেক সময় অভিনয় দেখিয়া তাহারা সেটির ভিতরের কথাটি তলাইয়া বুঝিতে পারে,—এ-হিসাবে সাহিত্য-প্রচারের পক্ষেও রঙ্গালয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের

অধিকাংশ সঙ্গীতের সঙ্গেই সর্ব্বসাধারণের পরিচয় নাই; কিন্তু তাঁহার যে গানগুলি রঙ্গালয়ে গীত হইয়াছে, সেগুলি হাটে-ঘাটে-মাঠে, সব জায়গাতে, সব সমাজে চলিয়া গিয়াছে। কোন জাতিকে ভাল করিয়া জানিতে-বুঝিতে হইলে রঙ্গালয়ে যাওয়ার মত সহজ উপায় আর নাই। যে জাতির যেমন মতিগতি, যেমন আচার-ব্যবহার, যেমন সমাজ ও ধর্ম্ম, যেমন ভাষা ও সাহিত্য, এক রঙ্গালয়ের মধ্যে তাহার সমস্তটুকু মস্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। রঙ্গালয়ের এমনি যে কত গুণ আছে, বলিয়া তাহা ফুরানো যায় না। কিন্তু এতবড় প্রশস্ত একটা ক্ষেত্র,—আবাদ করিলে যাহাতে সোনা ফলিত, তাহা যে অবহেলায়-অনাদরে পতিত জমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা।

যতদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল প্রভৃতি প্রতিভাবান ও ক্ষমতাবান পুরুষের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গলার রঙ্গালয় চলিত, ততদিন অভিনয়ে তবু অনেকটা শ্রী-ছাঁদ ও পদার্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু, এখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র মৃত; অমৃতলালও রঙ্গালয় হইতে অপসৃত; ফলে, রঙ্গমঞ্চে যে সঙের নাচ চলিতেছে, তাহার সহিত কোন সমঝদারের সহানুভূতি থাকিতে পারে না। বাঙ্গলায় এখন কি এমন শক্তিমান্ কেহ নাই, আমূল সংস্কার দ্বারা যিনি রঙ্গালয়কে বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

লক্ষ্মীছাড়া

(গল্প)

বসন্তকাল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সমিকিনদের বাড়ীর কাছে নদীর ধারে এক গাছের তলায় বলদেইয়া বসিয়াছিল। বলদেইয়ার বয়স সতেরো বৎসর, মুখে গোঁফের রেখাটি দেখা দেয় নাই—সুন্দর মুখ। বলদেইয়ার মন আজ অত্যন্ত অপ্রসন্ন। তিনটি ধারা বহিয়া এই অপ্রসন্নতার স্রোত ছুটিয়াছিল।

প্রথম ধারা,—কাল তাহার স্কুলের পরীক্ষা। দুইবার সে প্রোমোশন পায় নাই, এবার পাশ না হইলে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবে।

দ্বিতীয় ধারা,—সমিকিনদের বাড়ী এই ছুটি কাটাইতে আসিয়া তাহার মাথাটা যেন কাটা গিয়াছে। সমিকিনরা বড় লোক —সে গরীব বিধবার ছেলে। তাহার মনে হইত, সমিকিনরা তাহার মাকে ও তাহাকে নিতান্ত কৃপার চোখে দেখিয়া থাকে—আহা, গরীব অনাথ, আশ্রিত! তাহার উপর মার আজগুবি রকমের বড়মানুষির গল্প

শুনিয়া রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিত। একবার সে সমিকিনদের বড় মেয়েকে মার এই গল্পে মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিতেও দেখিয়াছিল। সেই দিনই রাত্রে বিছানায় শুইয়া মাকে সে কত করিয়া সাধিয়াছিল, চল মা—আমরা চলে যাই, এখানে আমার এগ্‌জামিনের পড়া হচ্ছে না। মা সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলে, দু'দিন আপনারজনের কাছে একটু জিরুতে এসেছি, তাও তোমার প্রাণে সইছে না। অভিমানে বলদেইয়া সে রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়াছিল —চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসে নাই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, একবার বাড়ী ফিরিলে হয়—জীবনে কখনো আর সে এই বড় লোক আত্মীয়দের চৌকাঠ মাড়াইবে না।

তৃতীয় ধারা,—এইটার কথা মনে হইলেই বলদেইয়ার মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিত। বড় লজ্জার কথা এ! তাহার মনে হইত, সমিকিনের ভাইঝী আনাকে সে ভালবাসে। আনার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর—তবুও কেমন হাসি-হাসি তার মুখখানি, কেমন ডাগর চোখ, নিটোল গড়ন, আর রংটুকুও—যেন পাকা আপেলের মত। নিখুঁত সুন্দরী! একসঙ্গে সব ভোজনে বসিলে যখন গল্পে পরিহাসে আনা মৃদু হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিত, তখন বলদেইয়ার আর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনেও থাকিত না। সমস্ত নয়ন-মন দিয়া সে আনার রূপ-মাধুরী পান করিত। আনা যদি সহসা সে-সময় তাহার পানে চাহিত ত, বলদেইয়া লজ্জায় ঘাড় নামাইত। আনা গা-ফেরা করিত, চারিধারের বাতাস এসেন্সের গন্ধে ভরিয়া উঠিত—সে বাতাস সে গন্ধের স্পর্শে বলদেইয়ার শরীরে রোমাঞ্চ হইত। একান্তে বই খুলিয়া বসিলে বইয়ের হরফ কোথায় উবিয়া যাইত—চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ফিরিত, শুধু আনার অপরূপ লাবণ্যভরা সুন্দর মূর্ত্তি!

আনার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, বিদেশে কি-একটা সহরে কাজ করে—শনিবার রাত্রে এখানে আসে —রবিবার থাকিয়া আবার সোমবার চলিয়া যায়! আনাকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে এই ইঞ্জিনিয়ারের উপর দারুণ ঘৃণায় বলদেইয়ার মন ভরিয়া উঠিত। ইঞ্জিনিয়ারটি কিন্তু কোনদিন বলদেইয়ার সঙ্গে কোন বিবাদ করে নাই; একটি রূঢ় কথাও কোনদিন বলে নাই; বরং সে মাঝে পিঙ্‌-পঙ্‌, ছিপ প্রভৃতি আনিয়া তাহাকে উপহার দিয়াছিল। বেচারা ইঞ্জিনিয়ার!

আজ এই নিভৃতে গাছের তলায় বসিয়া পরীক্ষার কথা ভাবিতে ভাবিতে আনাকে দেখিবার অদম্য স্পৃহা বলদেইয়াকে মাতাইয়া তুলিল। বলদেইয়া নভেল পড়িয়াছে বিস্তর। প্রেম জিনিষটা কি, তাহার মর্ম্মও যে সে একেবারে না বুঝিত, এমন নয়। এই যে আনাকে দেখিবার এত সাধ, আনাকে দেখিতে এত ভালো লাগে, না দেখিতে পাইলে মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, অথচ দৈবাৎ আনা তাহার দিকে চাহিলে লজ্জায় সে মাথা তুলিতে পারে না—এক আনাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যে নানা ভাব মনের মধ্যে তাল পাকাইতে থাকে—এ কেন? কেন হয়? এ কি প্রেম? কে জানে! কিন্তু আনার

বয়স যে তাহার চেয়ে অনেক বেশী—তা-ছাড়া তার স্বামী আছে!

আজ এখন বসিয়া সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, না, এ ত প্রেম নয়। সতেরো বৎসর বয়সের ছেলে ত্রিশ বৎসরের মেয়ের প্রেমে পড়ে—এমন কথা ত কোন দিন কোন উপন্যাসেও কেহ লেখে নাই! বিশেষ সে মেয়ের আবার বহুদিন বিবাহ হইয়া গেছে। এ তবে—এ—

হঠাৎ এমন সময় পাতার মধ্যে একটা খস্-খস্ শব্দ তাহার কানে গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হইল, কে?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

বলদেইয়া সে স্বরে শিহরিয়া উঠিল! এ স্বর কাহার, সে জানে। এ স্বর যে তাহার হৃদয়-কুঞ্জে বুলবুলের গানের মত অহর্নিশি বিরাজ করিতেছে! কোন মতে সঙ্কোচ কাটাইয়া বলদেইয়া মাথা তুলিয়া চাহিল।

সে আনা।

আনা কহিল, এখানে বসে কি হচ্ছে বলদেইয়া? কি ভাবছ! কল্পনা-রাজ্যে উধাও হয়েছ না কি? কবিতা লেখা ধরেছ! তবু জবাব নেই! আচ্ছা, দিন-রাত কি তুমি ভাবো, বল দেখি আমায়।

বলদেইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সব তাহার গোলমাল হইয়া গেল। কোনমতে সে আনার মুখের দিকে চাহিল। আনা সদ্য এই নদীতে স্নান সারিয়া আসিয়াছে। তাহার কাঁধে তোয়ালে—পিঠের উপর কোঁকড়া ঢেউ-তোলা চুলের রাশি থলো থলো ঝরিয়া পড়িয়াছে, ব্লাউসের উপরকার বোতামটা খোলা—কাঁধ ও গলা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, রঙ অমনি ধব্‌ধব্ করিতেছে—খোস্‌বু সাবানের গন্ধে চারিধার মাতোয়ারা। আনা যেন মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে!

বলদেইয়ার মুখে কথা ফুটিল না—সে নির্ব্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে শুধু আনার পানে চাহিয়া রহিল।

আনা কহিল, মুখে কোন কথাই নেই যে! না হয় কবিতাই লিখছ, তবু একজন স্ত্রীলোক সেধে কথা কচ্ছে, তা জবাব নেই! এটুকু ভব্যতারও ধার ধারো না? বলি, কি হচ্ছে বসে-বসে! কবিতা, না, দর্শন? এই ত তোমার দোষ! কথা নেই, কিছু না—খালি মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছ। কি—কারো প্রেমে পড়েছ নাকি?

বলদেইয়া আনার কাঁধে-ঝোলানো তোয়ালেটার পানেই চাহিয়া রহিল।

আনা কহিল, তবে দাঁড়িয়েই থাকো তুমি, কথা কয়ো না। এ কিন্তু প্রেমিকের লক্ষণ আগাগোড়াই দেখছি। বলি, কার প্রেমে পড়েছ, বল না বলদেইয়া—!

আনা একটু কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া বলদেইয়ার হাত ধরিল; বলিল, চুপি চুপি বল না আমায়। কাউকে বলব না আমি।

বলদেইয়ার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলদেইয়া কহিল, তোমায় ভালবাসি!

আমায়? আনা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, তা বেশ! আমার খুব সৌভাগ্য বলতে হবে, এখন—

বলদেইয়া হঠাৎ আনার হাতটা নিজের

দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সত্যি আমি তোমায় ভালবাসি! বলদেইয়ার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত জগৎ এক নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—তাহার মনে হইল, সমস্ত পৃথিবীকে কে যেন ঐ রঙিন তোয়ালেটায় ঢাকিয়া দিয়াছে! সে বিহ্বল হইয়া পড়িল, তাহার চেতনাও লোপ পাইল।

যখন জ্ঞান হইল, তখনও সেই সাবানের গন্ধে বাতাস মাতাল হইয়া আছে। আনা নাই, শুধু একটা নিষ্ঠুর উচ্চ হাস্যরব ছুরির ফলার মত তাহার স্মৃতিকে বিঁধিয়া আছে!

সমস্ত ব্যাপারটাও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ছি, ছি, এ সে কি করিয়াছে! এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় মনের অত্যন্ত নিভৃত গোপন বেদনাটুকুকে নিষ্ঠুর জগতের চোখের সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে!

সে ভাবিল, এ মুখ এখন বাড়ীতে সকলকে দেখাইব কি বলিয়া? আনা কি মনে করিল? নিশ্চয় সে ভাবিয়াছে, কি বর্ব্বর পশু এই বলদেইয়া! আনা হাসি-ভরা চোখে তাহার পানে দুই-একবার না-ও একটু চাহিয়া দেখিত—এখন হইতে সে দৃষ্টির হাসিটুকু ত আর তাহার ভাগ্যে মিলিবে না! এই অপমানের পর আনা যে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিবে—বিষ-দৃষ্টিতে দেখিবে!

সে ভাবিল, আর নয়—রাত্রি আটটায় একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেণেই চুপি চুপি সে বাড়ী পলাইবে।

১১

২

সন্ধ্যার পর চোরের মত নিঃশব্দে বলদেইয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। আসিয়া ঘরে অন্ধকারে হাতড়াইয়া জামা, বই প্রভৃতি নিজের দ্রব্যগুলা সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া লইয়া যেমন সে বাহির হইবে—আনার স্বর কাণে গেল। শেষবার শুনিয়া লই—ভাবিয়া সে দ্বারে কাণ পাতিল। পাশের ঘরে আনা, সমিকিন-গৃহিণী, তাহার মা—প্রভৃতি সকলে গল্প করিতেছিল। আনা বলিতেছিল, ওর পাশের আশা তুমি ছেড়ে দাও, মাসিমা। ও বেশ প্রেমিক হয়ে উঠেছে। এই আজ আমারি হাত ধরে দিব্যি বললে কি না, আমায় ভালবাসে! শুনে আমি ত আর হেসে বাঁচি না!

ঘরে অমনি হাসির ঝড় বহিয়া গেল।

বলদেইয়ার কপাল ঘামিয়া উঠিল। কি এ বর্ব্বরতা! না হয় এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মনটাকে সে বশে রাখিতে পারে নাই—দৈবাৎ তাহার গোপন বেদনাটুকু প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছে—তাহার জন্য সহানুভূতি দূরে থাক, শুধু এই পরিহাস, —নিতান্তই ক্রূর মর্ম্মান্তিক পরিহাস! তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। আর এ বাড়ীতে এক মুহূর্ত্তও নয়! অত্যন্ত সাবধানে সে বাহির হইতে গেল। কিন্তু পাটা কেমন করিয়া চৌকাঠে বাধিল; সশব্দে সে আছাড় খাইয়া পড়িল। মেয়েরা বলিয়া উঠিল, কি? তখনই শশব্যস্তে সব আসিয়া আলো জ্বালিয়া দেখে—বলদেইয়া।

আনা কহিল, এই অন্ধকারে এমন

বয়স যে তাহার চেয়ে অনেক বেশী—তা-ছাড়া তার স্বামী আছে!

আজ এখন বসিয়া সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, না, এ ত প্রেম নয়। সতেরো বৎসর বয়সের ছেলে ত্রিশ বৎসরের মেয়ের প্রেমে পড়ে—এমন কথা ত কোন দিন কোন উপন্যাসেও কেহ লেখে নাই! বিশেষ সে মেয়ের আবার বহুদিন বিবাহ হইয়া গেছে। এ তবে—এ—

হঠাৎ এমন সময় পাতার মধ্যে একটা খস্-খস্ শব্দ তাহার কানে গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হইল, কে?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

বলদেইয়া সে স্বরে শিহরিয়া উঠিল! এ স্বর কাহার, সে জানে। এ স্বর যে তাহার হৃদয়-কুঞ্জে বুলবুলের গানের মত অহর্নিশি বিরাজ করিতেছে! কোন মতে সঙ্কোচ কাটাইয়া বলদেইয়া মাথা তুলিয়া চাহিল।

সে আনা।

আনা কহিল, এখানে বসে কি হচ্ছে বলদেইয়া? কি ভাবছ! কল্পনা-রাজ্যে উধাও হয়েছ না কি? কবিতা লেখা ধরেছ! তবু জবাব নেই! আচ্ছা, দিন-রাত কি তুমি ভাবো, বল দেখি আমায়।

বলদেইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সব তাহার গোলমাল হইয়া গেল। কোনমতে সে আনার মুখের দিকে চাহিল। আনা সদ্য এই নদীতে স্নান সারিয়া আসিয়াছে। তাহার কাঁধে তোয়ালে—পিঠের উপর কোঁকড়া ঢেউ-তোলা চুলের রাশি থলো থলো ঝরিয়া পড়িয়াছে, ব্লাউসের উপরকার বোতামটা খোলা—কাঁধ ও গলা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, রঙ অমনি ধব্‌ধব্ করিতেছে—খোস্‌বু সাবানের গন্ধে চারিধার মাতোয়ারা। আনা যেন মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে!

বলদেইয়ার মুখে কথা ফুটিল না—সে নির্ব্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে শুধু আনার পানে চাহিয়া রহিল।

আনা কহিল, মুখে কোন কথাই নেই যে! না হয় কবিতাই লিখছ, তবু একজন স্ত্রীলোক সেধে কথা কচ্ছে, তা জবাব নেই! এটুকু ভব্যতারও ধার ধারো না? বলি, কি হচ্ছে বসে-বসে! কবিতা, না, দর্শন? এই ত তোমার দোষ! কথা নেই, কিছু না—খালি মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছ। কি—কারো প্রেমে পড়েছ নাকি?

বলদেইয়া আনার কাঁধে-ঝোলানো তোয়ালেটার পানেই চাহিয়া রহিল।

আনা কহিল, তবে দাঁড়িয়েই থাকো তুমি, কথা কয়ো না। এ কিন্তু প্রেমিকের লক্ষণ আগাগোড়াই দেখছি। বলি, কার প্রেমে পড়েছ, বল না বলদেইয়া—!

আনা একটু কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া বলদেইয়ার হাত ধরিল; বলিল, চুপি চুপি বল না আমায়। কাউকে বলব না আমি।

বলদেইয়ার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলদেইয়া কহিল, তোমায় ভালবাসি!

আমায়? আনা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, তা বেশ! আমার খুব সৌভাগ্য বলতে হবে, এখন—

বলদেইয়া হঠাৎ আনার হাতটা নিজের

দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সত্যি আমি তোমায় ভালবাসি! বলদেইয়ার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত জগৎ এক-নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—তাহার মনে হইল, সমস্ত পৃথিবীকে কে যেন ঐ রঙিন তোয়ালেটায় ঢাকিয়া দিয়াছে! সে বিহ্বল হইয়া পড়িল, তাহার চেতনাও লোপ পাইল।

যখন জ্ঞান হইল, তখনও সেই সাবানের গন্ধে বাতাস মাতাল হইয়া আছে। আনা নাই, শুধু একটা নিষ্ঠুর উচ্চ হাস্যরব ছুরির ফলার মত তাহার স্মৃতিকে বিঁধিয়া আছে!

সমস্ত ব্যাপারটাও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ছি, ছি, এ সে কি করিয়াছে! এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় মনের অত্যন্ত নিভৃত গোপন বেদনাটুকুকে নিষ্ঠুর জগতের চোখের সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে!

সে ভাবিল, এ মুখ এখন বাড়ীতে সকলকে দেখাইব কি বলিয়া? আনা কি মনে করিল? নিশ্চয় সে ভাবিয়াছে, কি বর্ব্বর পশু এই বলদেইয়া! আনা হাসি-ভরা চোখে তাহার পানে দুই-একবার না-ও একটু চাহিয়া দেখিত—এখন হইতে সে দৃষ্টির হাসিটুকু ত আর তাহার ভাগ্যে মিলিবে না! এই অপমানের পর আনা যে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিবে—বিষ-দৃষ্টিতে দেখিবে!

সে ভাবিল, আর নয়—রাত্রি আটটায় একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেণেই চুপি চুপি সে বাড়ী পলাইবে।

২

সন্ধ্যার পর চোরের মত নিঃশব্দে বলদেইয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। আসিয়া ঘরে অন্ধকারে হাতড়াইয়া জামা, বই প্রভৃতি নিজের দ্রব্যগুলা সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া লইয়া যেমন সে বাহির হইবে—আনার স্বর কাণে গেল। শেষবার শুনিয়া লই—ভাবিয়া সে দ্বারে কাণ পাতিল। পাশের ঘরে আনা, সমিকিন-গৃহিণী, তাহার মা—প্রভৃতি সকলে গল্প করিতেছিল। আনা বলিতেছিল, ওর পাশের আশা তুমি ছেড়ে দাও, মাসিমা। ও বেশ প্রেমিক হয়ে উঠেছে। এই আজ আমারি হাত ধরে দিব্যি বললে কি না, আমায় ভালবাসে! শুনে আমি ত আর হেসে বাঁচি না!

ঘরে অমনি হাসির ঝড় বহিয়া গেল।

বলদেইয়ার কপাল ঘামিয়া উঠিল। কি এ বর্ব্বরতা! না হয় এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মনটাকে সে বশে রাখিতে পারে নাই—দৈবাৎ তাহার গোপন বেদনাটুকু প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছে—তাহার জন্য সহানুভূতি দূরে থাক, শুধু এই পরিহাস,—নিতান্তই ক্রূর মর্ম্মান্তিক পরিহাস! তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। আর এ বাড়ীতে এক মুহূর্ত্তও নয়! অত্যন্ত সাবধানে সে বাহির হইতে গেল। কিন্তু পাটা কেমন করিয়া চৌকাঠে বাধিল; সশব্দে সে আছাড় খাইয়া পড়িল। মেয়েরা বলিয়া উঠিল, কি? তখনই শশব্যস্তে সব আসিয়া আলো জ্বালিয়া দেখে—বলদেইয়া।

আনা কহিল, এই অন্ধকারে এমন

করে ভূতের মত চলতে হয়! খুব লেগেছে? আহা, দেখ দেখি!

মা বলিল, সাধে বলি, ও ভূত!

সমিকিন-গৃহিণী বলিল, ও পুঁটুলি কিসের রে?

আনা স্বহস্তে পুঁটুলি খুলিয়া দেখিয়া কহিল, এ কি! নিজের বইটই গুছিয়ে বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল, এই অন্ধকারে? কবিতা লিখতে সেই নদীর ধারে না কি?

আনার এ বিদ্রূপে বলদেইয়ার মনে হইল, এই দণ্ডে যদি তাহার মৃত্যু হইত! হায় নারী, তোমাকে ভালবাসিয়া সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহার এ গভীর দুঃখে খোঁচা দিয়া এমন রূঢ় পরিহাস কর!

মা বলিল, কোথায় যাচ্ছিলি শুনি, এই রাত্রে?

বলদেইয়া কহিল, বাড়ী যাচ্ছিলুম। কাল আমার এগ্‌জামিন।

মা বলিল, সে ত কাল ভোরের গাড়ীতে গেলেও ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারবে—তাই ত ঠিক আছে। হঠাৎ এই রাত্রেই কি এমন তাড়া পড়ে গেল যে—

বলদেইয়া বলিল, না, এই রাত্রের গাড়ীতেই আমার যাওয়া চাই।

আনা কহিল, মাসিমাকে তাহলে কাল সঙ্গে নিয়ে যাবে কে?

বলদেইয়ার রাগ হইল। আনা আবার হুল ফুটাইতে আসিয়াছে! একটু দুঃখও হইল,—আর-কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বেশ কড়া জবাব দিত। কিন্তু আনার প্রশ্নে কড়া জবাব মুখে আসিল না—একটু কোমল স্বরে সে কহিল, তা আমি জানি না।

মা কি ভাবিতেছিল—আনা তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, বেশ ত মাসিমা, তুমি তাহলে এখানেই থেকে যাও। পরে বলদেইয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, তোমার এগ্‌জামিন হয়ে গেলে তুমিই এসে মাসিমাকে নিয়ে যেয়ো, বলদেইয়া। এসো মাসিমা, আমরা খেলিগে।

বলদেইয়া নিমেষ দৃষ্টিপাতে দেখিয়া লইল, আনার হাতে তাস। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক মারিল। মিথ্যা সে পলাইতে চায়—ইহাদের প্রাণে একটুও তাহাতে আঁচ লাগিবে না! ইহারা বেশ নিশ্চিন্ত চিত্তে আমোদ-আহ্লাদ লইয়াই মত্ত থাকিবে, আর সে—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর জগৎ, তার চেয়েও নিষ্ঠুর, হায়রে, এ জগতে নারীর প্রাণ!

বলদেইয়া আর তিলমাত্র সেখানে দাঁড়াইল না—সটান্ বাহির হইয়া পড়িল।

মা কহিল, ওরে কিছু খেয়ে যা—

না, তাহলে ট্রেন পাব না। ষ্টেশনেই আমি কিছু খাব'খন। পয়সা সঙ্গে আছে।

বলদেইয়া চলিয়া গেল।

৩

গ্রামের পথ। সন্ধ্যার পর এখানে সহরের মত নর-নারীর ভিড় জমিয়া উঠে না। লোকালয় ছাড়িয়া বল্‌দেইয়া ক্রমে মাঠের ধারে রাস্তায় আসিল। ষ্টেশনে হাঁটিয়া যাইতে হইলে এইটাই ছিল সোজা রাস্তা। মাঠের মাঝে-মাঝে বড় গাছ—কোথাও-বা গরিবের কুটীর—তথা হইতে

আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছে। দূরে থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ডাকিতেছে। বল্‌দেইয়ার প্রাণটা কেমন ছাৎ করিয়া উঠিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব ক্ষণে পলাইবার পক্ষে তাহার যতখানি উৎসাহ ছিল, পথে পা দিয়া সে উৎসাহ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। খানিকটা পথ হাঁটিয়া আসিবার পর ফিরিবার দিকেই মনটা বিষম ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার উপর সকালে এগ্‌জামিন দিতে হইবে—এ কথাটা মনে পড়িতেই তাহার গায়ের রক্ত হিম হইয়া গেল। আর আনা! আহা, সেখানে থাকিলে আনাকে সে তবু চোখে দেখিতে পাইত। আবার কবে আনার সঙ্গে দেখা হইবে? দেখা হইবে কি না, তাই বা কে বলিতে পারে! আনা নাই ভালবাসুক, তবু সে ত তাহাকে চোখে দেখিয়াই সুখী!

হায়রে, সে যদি আরো বিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মাইত! তাহা হইলে আনাকে বিবাহ করিয়া জীবনটাকে ধন্য করিবার সম্ভাবনা মিলিত। কোথায় থাকিত তখন ঐ হতভাগা ইঞ্জিনিয়ার? আনাকে ফেলিয়া কখনও সে বিদেশে চাকরি করিতে যাইত না। প্রতি সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া আনার হাত ধরিয়া এই আলো-আঁধার-ভরা স্বপ্ন-ঘেরা গ্রামের পথে বেড়িয়া বেড়াইত, দুইজনে সুখ-দুঃখের কত কথা কহিত—আর ঐ বেচারা ইঞ্জিনিয়ারটা হয়ত দূর হইতে তাহাদের এ মিলন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া যাইত! বেচারা ইঞ্জিনিয়ারের দুর্দ্দশা কল্পনা করিয়া বলদেইয়া সত্যই হাসিয়া ফেলিল।

স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেল। হায়রে, সবই শুধু জল্পনা এ। বেচারা সে এই রাত্রে পথ হাঁটিয়া ষ্টেশনে চলিয়াছে, কাল এগজামিন; আর ইঞ্জিনিয়ার ওদিকে সুখ-নিদ্রায় বিভোর—আনাও হয়ত স্বপ্নে ঐ ইঞ্জিনিয়ারটারই হাত ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে!

সহসা সম্মুখে আলোর সারি তাহার চোখে পড়িল। এই ত ষ্টেশন! সহসা ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, বলদেইয়া তেমনি চমকাইয়া উঠিল। সে ভাবিল, ঐ ষ্টেশনে টিকিট কিনিয়া একবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেই—ব্যস্, কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে! না, না, সে যাইবে না, আনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না! আবার সেই সমিকিনদের বাড়ীতেই ফিরিবে! সে-বাড়ী ছাড়িয়া আর-কোথাও যাওয়া তাহার হইতেই পারে না।

ষ্টেশনের বাহিরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলদেইয়া বসিয়া পড়িল; ষ্টেশনে ঢুকিল না। তারপর ওধারে কখন্ যে ঘণ্টা পড়িল এবং সশব্দে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল, আবার যাত্রী উঠাইয়া-নামাইয়া বাঁশী বাজাইয়া হুস্ হুস্ শব্দে চলিয়া গেল, এ সব তাহার খেয়ালই হইল না! ট্রেন চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে হঠাৎ যখন ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল, তখন হুঁস হইল। একটা কুলিকে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ট্রেন চলে গেছে?

কুলি কহিল, অনেকক্ষণ।

বলদেইয়ার মনে হইল, আঃ, খুব সে বাঁচিয়া গিয়াছে। বুকের উপর হইতে

একখানা ভারী পাথর সরিয়া গেল; বুকটা হাল্কা বোধ হইল। সে মহা-উল্লাসে উঠিয়া আবার সমিকিনদের গৃহে ফিরিল।

আনা, মা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া তখনও তাস খেলিতেছে। হঠাৎ বলদেইয়াকে ফিরিতে দেখিয়া মা কহিল, কি রে, ফিরে এলি যে?

—ট্রেন ফেল হয়ে গেল।

আনা কহিল, যাক্ বাপু আপদ গেছে। এই রাত্রে ছেলেটা বেরিয়ে গেল, মনটা কেমন ভয়-ভয় কচ্ছিল। আর এই রাত্রেই যাবার অত কি তাড়া পড়েছিল! নাও, এখন কিছু খাও—খেয়ে শুয়ে পড়গে। কাল আবার ভোরে যাবার হাঙ্গাম আছে ত! মাসিমা, ওঠো বাপু, আর খেলে না! ছেলেটা হাঁটাহাঁটি করে সারা হয়েছে, ওকে কিছু খেতে দাওগে।

বলদেইয়ার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। এই পথ হাঁটার অত কষ্ট আনার মুখের মিষ্ট কথায় ঘুচিয়া গেল। কোন মতে মুখে কিছু খাবার গুঁজিয়া একেবারে বিছানায় ঢুকিয়া সে মনের রাশ ছাড়িয়া দিল।

ভাবনার কি আর সীমা ছিল! আনার নানা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আনাকে নানা-ভাবে দেখিয়া তৃপ্তি যেন আর হয় না!

৪

রাত্রি তখন প্রায় তিনটা। বাহির হইতে মা ডাকিল, বলদেইয়া—বলদেইয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, নদীর ধারে গাছতলায় সে শুইয়া আছে—আর নদীতে আনা স্নান করিতে নামিয়াছে। বল্‌দেইয়া অর্দ্ধমুদিত নেত্রে আনার পানে চাহিয়া—আনা হঠাৎ ডাকিল, বলদেইয়া। বল্‌দেইয়া চাহিয়া দেখিল। আনা কহিল, তুমি যদি আমায় ভাল না বাসো বল্‌দেইয়া, তাহলে আমি এই জলে ডুবিয়া মরিব। বল্‌দেইয়া মুখে কৌতুকের হাসি হাসিয়া চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। আনা কহিল, ভালবাসিবে না? বল্‌দেইয়া তবু কোন কথা বলিল না। আনা কহিল, তবে এই দেখ, আমি ডুবিয়া মরি। বলিয়াই সে অগাধ জলে ভাসিয়া গেল। বল্‌দেইয়া সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, জলে ঝাঁপ দিতে যাইবে—ঠিক এমনি সময়ে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আবার কে ডাকিল, বল্‌দেইয়া, ও বল্‌দেইয়া শুনতে পাচ্ছিস্?

মা ডাকিতেছিল।

বলদেইয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

মা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, লিলির বড্ড অসুখ করেছে। এ ঘরে একটা ওষুধ আছে, তাই নিতে এসেছি আমি।

লিলি সমিকিনের ছোট মেয়ে।

বল্‌দেইয়া কহিল, কি অসুখ?

ও সেই পুরোনো ব্যাপার। নে, তুই ঘুমো—তোকে আবার কাল এগ্‌জামিন দিতে যেতে হবে।

মা শেল্‌ফ্ হইতে একটা শিশি পাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই আনার গলা শুনা গেলে বলদেইয়া শুইয়া পড়িল। বল্‌দেইয়ার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—ঐ যে আনা। সে তবে নদীতে স্নান করিতে যায় নাই। আঃ! আনা তখনই

বলদেইয়ার ঘরে আসিয়া ডাকিল, বলদেইয়া ঘুমুচ্ছ নাকি?

বলদেইয়ার মনে হইল, সে কি এখনো স্বপ্ন দেখিতেছে? সে চোখ খুলিল না।

আনা আবার ডাকিল, বলদেইয়া—

না, এ ত স্বপ্ন নয়। বলদেইয়া ধড়মড়িয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আনা কহিল, মাসিমা অন্ধকারে একটা এসেন্সের শিশিই নিয়ে গেছে। তুমি উঠে দেখত, ঐ সেল্‌ফে মরফিন্ আছে। সেইটে চাই—লিলির সেই পায়ের যন্ত্রণাটা আবার বেড়েছে—কিছুতে ঘুমুতে পাচ্ছে না, বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির করে তুলেছে।

আনা বাতি লইয়া সেল্‌ফের কাছে আসিল। বলদেইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া শিশি পাড়িল; আনা আরো কাছে আসিয়া শিশির গায়ে আঁটা লেবেল লাগিল। বলিল, এইটেই ত? দেখ দেখি।

আনার নিশ্বাস বল্‌দেইয়ার গায়ে লাগিল। তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ থামিয়া গেল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

তারপর আনা কহিল, আমি কাচের গ্লাস আনছি, তুমি তাতে দু ফোঁটা ঢেলে দাও দেখি।

আনা গ্লাস লইয়া আসিল। বল্‌দেইয়া ঔষধ ঢালিল, অনেকগুলা ফোঁটা পড়িল। আনা হাসিয়া কহিল, আচ্ছা এ যাহোক! দাও, আমায় দাও।

আনা শিশি কাড়িয়া ঔষধ ঢালিতে বসিল বল্‌দেইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে আনার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌মন্ করিয়া উঠিল। সে ডাকিল, আনা

চমকিয়া আনা বল্‌দেইয়ার পানে চাহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আনা কহিল, ও কি? অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় বল্‌দেইয়া আবার ডাকিল, আনা—চোখ তাহার আচ্ছন্নের মত বুজিয়া আসিল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আনা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল—ঔষধের শিশি রাখিয়া নিজের বুকে বলদেইয়ার মাথা রাখিয়া মুখে ধীরে ধীরে আনা হাত বুলাইয়া দিল; সম্মুখে গ্লাসে জল ছিল, চোখে-মুখে জলের ছিটা দিতে বলদেইয়া চোখ মেলিল! চোখ মেলিয়া আবার ডাকিল, আনা—

কি বলদেইয়া?

—তুমি বড় সুন্দর, আনা। তোমায় আমি ভালবাসি। আনা তীব্র দৃষ্টিতে বলদেইয়ার পানে চাহিল। বল্‌দেইয়া আর কোন কথা কহিল না—পাগলের মত ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া শুধু আনার পানে চাহিয়া রহিল। আনা তীব্রকণ্ঠে ডাকিল, মাসিমা—

মা আসিয়া কহিল, কেন? কি হয়েছে? ...এ কি?

আনা কহিল, ছেলের গোঁয়ার্ত্তুমির ফল। ঐ রাত্রে অত পথ না খেয়ে একলা হেঁটে যাওয়ার ফল! ওষুধটা পাড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে গেছল—যাক্, ভয় নেই, সামলেছে। তুমি ওকে একটু বাতাস কর দেখি। আমি লিলিকে ওষুধটা দিয়ে এখনই আসছি।

৫

সে রাত্রে বিছানায় পড়িয়া বল্‌দেইয়া অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। নানা চিন্তার ভারে সে জর্জ্জরিত আকুল হইয়া উঠিল। নিজের উপর ধিক্কারে মন ভরিয়া গেল। আনা—একজনের স্ত্রী সে, তাহাকে ভালবাসার কথা বলিয়া কতখানি তাহাকে সে অপমান করিয়াছে! এই সব ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রে এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সূর্য্যের অমল রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, লতায়-পাতায় সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে; পাখীর দল নানা ছন্দে গান ধরিয়াছে, চারিধারে জীবনের বিচিত্র কলরব ছুটিয়াছে। বল্‌দেইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নূতন আলোয় জগৎ আজ ভরিয়া গিয়াছে! কোন খানে এতটুকু কালিমা নাই, গ্লানি নাই, সমস্তই সুন্দর! সে আলোর স্পর্শে তাহার মনের ভিতরকার ঘন অন্ধকার মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। সূর্য্যের এই স্নিগ্ধ আলোয় দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল, পৃথিবীতে এত আলো, কি এ নির্ম্মল উজ্জ্বল, মহিমাময়! এমন সজীব, সুদৃঢ় জীবন চারিধারে! গত রাত্রির কথা মনে পড়িলে অসহ্য অনুতাপে মন ভরিয়া গেল। এই নির্ম্মল সূর্য্য-কিরণে কি বিচিত্র মাধুরী, কি অপূর্ব্ব মহিমা!

মা আসিয়া বলিল, এত দেরী করে ওঠে! শীগগির খেয়ে নে। গাড়ী তৈরী। এখনি না বেরুলে ট্রেন ধরতে পারবি না।

খাওয়া শেষ করিয়া মা ও ছেলে আসিয়া গাড়ীতে বসিল। আনা ও তাহার স্বামী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইঞ্জিনিয়ার কাল রাত্রে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে কহিল, এগজামিন দিয়ে আবার এসো, বল্‌দেইয়া। আমি কিছুদিন ছুটি নিচ্ছি এবার, আনাকে নিয়ে এবার এক জায়গায় বেড়াতে যাব। ওর সাধ, তোমাকেও আমরা সঙ্গে নিই। সে বেশ হবে—ক'জনে খুব বেড়াব; আমরা দুজনে শীকার করতেও যাব'-খন।

আনা কহিল, বেশ মন স্থির করে এগজামিনটা দিয়ো বল্‌দেইয়া। এখন শরীর বেশ সুস্থ বোধ কচ্ছ ত?

বল্‌দেইয়া অবাক হইয়া গেল। কি সহজ সুর, আশ্চর্য্য ভঙ্গিমা, এই আনার! কাল সে তাহাকে অমনভাবে অপমান করিয়াছে—সে কথা আনা একটুও আর মনে রাখে নাই! অমন হাসিমুখে সুরে এতখানি স্নেহ ঢালিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেছে! আনা, আনা, তুমি——? তাহার চোখে জল আসিল।

গাড়ীতে উঠিয়া মার পানে দৃষ্টি পড়িতেই কিন্তু রাগে সে একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল। মার দিব্য সুসজ্জিত বেশ—বড়লোক আত্মীয়দের বাড়ী হইতে চাহিয়া-লওয়া একটা শাল সগর্ব্বে মা গায়ে জড়াইয়াছে।

বলদেইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, মা—

মা কহিল, কি?

—তোমার লজ্জা হচ্ছে না? এই রকম সাজ-সজ্জা করে পথে বেরুতে? তুমি এই যে আগাগোড়া পোষাক পরেছ, এ তোমার নিজের নয়, ধার-করা ভিক্ষে-মেগে নেওয়া—ছি!

মা রাগিয়া কহিল, তোর যে বড় মুখ হয়েছে, দেখছি!

—চোখ রাঙাচ্ছ কি মা? ঘৃণায় আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে যাচ্ছে। ফেলে দাও, ফেলে দাও তোমার ঐ ভিক্ষে-মাগা পচা শাল। ওর চেয়ে তুমি গরীব, তোমার সে ছেঁড়া কাপড়ে তোমায় রাণীর মত দেখায় যে!

মা বলিল, সকল-তাতে তুই কথা কস্‌নে, বলছি। থাম্। মাকে অপমান!

—অপমান! মান তোমার কিছু আছে, কিছু কি আর রেখেছ মা? এই বড়লোক আত্মীয়দের কাছে মিথ্যে বড়মানুষির গল্প করে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মনের অগোচর পাপ নেই। তুমি ভাব, তোমার ঐ গল্প তারা বিশ্বাস করত! না। ঘৃণায় তারা মুখ টিপে হাস্‌ত।

মা বলিল, আবার!

—তুমি শাল খুলবে না? বেশ, তোমার শাল মুড়ি দিয়ে তুমিই থাকো। কিন্তু আমার এ সহ্য হচ্ছে না। আমি তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে তাহলে যেতে পারব না। আমি কোচবাক্সে উঠে বসিগে।

মা বলিল, দেখ্, পাগলামি করিস্ নে। কোচম্যানটা কি মনে করবে?

—কি আবার মনে করবে! সে কি কিছু বোঝে না, ভাবো? সে ও শাল খুব চেনে—সে মুখ টিপে মুচকে হাসচে, বুঝছে, কাঙ্গালী কুটুম এসেছিল, আজ ঐ পচা পা-মোচা শালখানা বিদেয় পেয়ে বাড়ী ফিরছে!

বলদেইয়া সজোরে চলন্ত গাড়ীর দ্বার খুলিয়া পথে লাফাইয়া পড়িল। মা ইজ্জৎ যাইবার ভয়ে শিহরিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোনরূপ চীৎকার করিল না। ব্যাপার দেখিয়া কোচম্যান গাড়ী থামাইল—বলদেইয়া কোচ বাক্সে উঠিয়া বসিল। বাহিরে কি চমৎকার হাওয়া! মার প্রাণও একটু আশ্বস্ত হইল—কোচম্যানটা কিছু বুঝিতে পারে নাই।

৬

সহরে এক বড় বাড়ীর দুইটা ঘর ভাড়া লইয়া মা-ও ছেলে থাকিত। আয় অল্প। সে আয়ে কোনমতে ঘরের ভাড়া ও ছেলের স্কুলের মাহিনা দিয়া যাহা থাকিত তাহাতে এই দুইটী প্রাণীর কোন রকমে চলিয়া যাইত। মার মনে সুখ ছিল না—কারণ, মা ছিল সৌখীন—বড়লোক আত্মীয়-কুটম্বদের দেখিয়া চালটাও তাহার বড়মানুষি রকমের দাঁড়াইয়াছিল। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে কোনদিন আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিতে পারে নাই, প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীতে খুঁটিনাটি লইয়া বিবাদ বাধিত। স্বামী বেচারা মনের সুখে চিরদিনই বঞ্চিত ছিল—মরিবার সময় তাই সে বেশ হাসিমুখেই মরিয়া ছিল।

বলদেইয়া বাড়ী ফিরিয়া ঘরে বসিয়া সেই সব কথা ভাবিতেছিল। ভবিষ্যৎ ত তাহার অন্ধকার! জীবনে এতটুকু স্ফূর্ত্তি নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই। এ-সব যাহাদের থাকে না, তাহারা তবু ভবিষ্যতের একটা আশা লইয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার এমন একটু ক্ষীণ আশাও নাই

যার মুখ চাহিয়া এই নীরস লক্ষ্মীছাড়া দিনগুলা সে কাটাইয়া দিতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে মাথাটা দপ্-দপ্ করিয়া উঠিল। বলদেইয়া এগজামিন দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু স্কুলে গেল না। মাঠের ধারে ঘুরিয়া সে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর ধারে আসিয়া বসিল। সামনে নানা বনফুলের গাছে নানা রঙের ফুল ফুটিয়া আছে, নানাবর্ণের প্রজাপতির দল উড়িয়া বেড়াইতেছে! কি স্বচ্ছন্দ, লঘু গতিটুকু! দূরে পাঁচ-ছয়জন ছেলে-মেয়ে খেলা করিতেছিল। ওধারে এক বেঞ্চে বসিয়া তরুণ প্রণয়ী-প্রণয়িনী প্রাণের কথা কহিতেছে! সকলেরই মনে কত সুখ, কত আনন্দ! বলদেইয়ার মনের-মধ্যকার অন্ধকারটুকু আরো নিবিড় হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর সে বাড়ী ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, মা বন্ধুদের লইয়া গল্পগুজবে মত্ত; ছেলের পানে চাহিয়াও দেখিল না। মা বলিতেছিল, সমিকিনরা—ওঃ কত বড় মানুষ! অগাধ টাকা! মাদাম সমিকিন হল আমার মামাতো বোন—সে ব্যারণের মেয়ে—আমায় কি ছাড়তে চায়? বলে, এত ঘর-দোর—এইখানে থাকো। তোমার কি সে দারিদ্র্যি পোষায়! রঙ একেবারে কালি মেড়ে গেছে। এত দুঃখে-কষ্টে বাঁচবে কেন? তা ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটার জন্যই না শুধু—

বলদেইয়া হাঁকিল, মা—সে স্বরে মা চমকিয়া উঠিল।

মা বলিল, কি বলছিস্ রে?

—কেন ওসব আজগুবি রূপকথা নিয়ে তুমি আসর জমাচ্ছ! তুমি ত জানো, যা বলছ ও সব মিথ্যে—

মা জ্বলিয়া উঠিল। এত-বড় অপমান—এমন করিয়া অপ্রতিভ করা, তাও নিজের ছেলে হইয়া—! মা বলিল, কি মিথ্যে বলেছি—?

—ঐ সব ব্যারণ ফ্যারণ। তুমি যেমন অবস্থার লোক, তোমার তেমনি থাকাই ভাল। সেখানকার আদর-যত্ন! লজ্জা করে না সে কথা বলতে! বাঁদীর মত মোসাহেবের মত তাদের মন জুগিয়ে থাকতে এত ভাল লাগে তোমার? তাহলে সেখানেই যাও। এখানে কেন! আমি তোমায় আমার সঙ্গে আসতে বলিনি ত এখানে!

মা রাগে কাঁপিতে লাগিল। বন্ধুর দল অবাক—কেহ-বা মুখের কষ্টে হাসি চাপিল।

বলদেইয়া আর মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না। বিষ! বিষ! চারিধারে শুধু বিষ! ধনের বিষ, গর্ব্বের বিষ! পৃথিবীটা বিষম বিষে বিষাইয়া উঠিয়াছে! কোথায় রে কোথায় সে ঠাঁই—যেখানকার নির্ম্মল নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জীবনের অমন প্রকাণ্ড সূচনা আজিকার প্রভাত-সূর্য্য, পাখীর গান, কর্ম্ম-কলরব বিচিত্র বর্ণে জাগাইয়া তুলিয়াছিল?

পাশের একটা ঘরে আসিয়া টেবিলের সম্মুখে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলদেইয়া বসিয়া পড়িল। কি বিশ্রী কদর্য্য এ জীবন—শুধুই এখানে গ্লানি ও পঙ্কিলতার দূষিত বাষ্প উঠিতেছে! অসহ্য!

মাথা তুলিয়া সে দেখে, অদূরে দেরাজের

মাথায় কি একটা পদার্থ মুখ বাড়াইয়া পড়িয়া আছে। কি ওটা? বলদেইয়া উঠিয়া সেটা হাতে লইল, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল—একটা পিস্তল। মুখে তাহার হাসি আসিল। সে পিস্তলের একটা ঘোড়া টানিল—আর একটা টানিল। শুধু আওয়াজ হইল, টিক্-টিক্! কি নিরীহ মিষ্ট সুর! তারপর একদৃষ্টে সেটার পানে সে চাহিয়া রহিল। জীবনে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সে রিভলভার হাতে করে নাই।

বাহিরে কে শিষ দিতেছিল—সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন মৃদুকণ্ঠে গান ধরিয়াছিল। প্রেমের গান! বাঃ, ইহারা ত বেশ মনের সুখে আছে এখানে!

অলক্ষ্যে বলদেইয়া রিভলভারের আর একটা ট্রিগার টানিল—রিভলভারের মুখটা তাহার দিকেই ফেরানো ছিল। হঠাৎ সেটা চোখ রাঙাইয়া চাহিল, বলদেইয়ার মাথার পিছনে প্রকাণ্ড একটা ধাক্কা লাগিল—চক্ষু মুদিয়া টেবিলের নীচে সে সজোরে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তে সে দেখিল, তাহার চোখের সম্মুখে তাহার পিতা—মাথায় সাদা টুপি, দুই হাত বাড়াইয়া তিনি বলদেইয়াকে কোলে ডাকিলেন। বলদেইয়া ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে পড়িল—তারপর দুইজনেই এক গভীর অন্ধকারময় গহ্বরে কোথায় তলাইয়া গেল। চারিধার সব ঝাপ্সা আঁধার .....!*

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রবন্ধে যে আত্মকর্তৃত্ব-বাদ প্রচার করিয়াছেন, তার প্রতিবাদ হিসাবেই হোক বা অনুবাদ হিসাবেই হোক্ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ভাদ্রের "নারায়ণে" "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" লিখিয়াছেন। তিনি যত বড় মনীষীই হোন্ সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর মতকে চূড়ান্ত মত মনে করাটা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়, কেননা সকলেই জানেন যে এ সকল বিষয়ে নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। অতএব রবীন্দ্রনাথ যদি ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার তরফে এক তরফা বিচার করিয়া থাকেন, তবে শাস্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রতার তরফে সে বিচারের বিরুদ্ধে আপিল দাখিলি করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেইজন্য বিপিনবাবু "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই মেজাজ এত ঠাণ্ডা যে তাঁরা বাদ-প্রতি-

* আন্তন্ শেকভের গল্পের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে।

বাদকে ডরান্। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম করার সংস্কার যে আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গেছে, এটাও তার একটা উদাহরণ। তাঁরা বলেন, তর্কের দ্বারা কি কোন কিছুর মীমাংসা হয়? "তর্কে বহুদূর"। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তর্ক-ভীরুতার এই যে সংস্কার, এর কারণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের দেশে "তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল" ইত্যাকার নৈয়ায়িক ঢেঁকির কচ্‌কচি হইয়া গেছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা না থাকিলে বস্তুজ্ঞান একেবারে লোপ পায়, তখন অন্বীক্ষার (inference) জন্য উপযুক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন থাকে না। সে অবস্থায় তর্ক জিনিসটা কুটতর্ক হইয়া বিষম উৎপাত উপস্থিত করে। কিন্তু যে তর্ক-প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত, তাকে আশ্রয় না করিলে তত্ত্ব-বিচার হইবে কি উপায়ে? সেই প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-বিজ্ঞান রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক মানব-বিজ্ঞানগুলির উৎপত্তি হইয়াছে।

বিপিনবাবুর প্রবন্ধকে ঠিক্ প্রতিবাদ বলা যায় না, কারণ "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মের" আসল বক্তব্য সম্বন্ধে বিপিন বাবুর মতদ্বৈধ নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের ও আচার বদ্ধ সমাজের যে সকল ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তার অনেক কথাই সত্য। গতানুগতিক ধর্ম্ম যেভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলে, তাহাতে ধর্ম্মাচরণ সম্ভব হইলেও, ধর্ম্মসাধন সম্ভব নয়; এ কথা শতমুখে স্বীকার করি।" সুতরাং বিপিন বাবুর লেখাটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ না বলিয়া অনুবাদ বা অনুবৃত্তি বলিলেই ঠিক্ হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মোট কথাটা ছিল এই যে, 'কর্ত্তার-ইচ্ছায়-কর্ম্ম' এই নীতি যে সমাজের চরম নীতি, সে সমাজে প্রতি ব্যক্তির আত্মকর্ত্তৃত্বের কোন স্থান থাকে না। সামাজিক ব্যাপারে যারা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব চালনা করিবার অধিকার পায় নাই, সহসা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আত্মকর্ত্তৃত্বের চর্চ্চায় সফল হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যদি আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার আমরা সত্যসত্যই চাই, তবে সামাজিক ব্যাপারে সে অধিকারকে সঙ্কুচিত করিলে চলিবে না।

এই শেষ কথাটুকু মানিতে বোধ হয় বিপিন বাবুর আপত্তি আছে। শুধু বিপিন বাবু কেন, অনেকেরই আপত্তি আছে। ইউরোপে, যে-সকল জাতি রাষ্ট্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তারা যে ধর্ম্মে ও সমাজে সকল রকম অর্থহীন আনুগত্য ও আচার-বশ্যতাকে অস্বীকার করিয়া তবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইয়াছিল, ইতিহাসে এমন নজির মেলেনা। ধর্ম্মে শাস্ত্র ও চর্চ্চানুগত্য ইউরোপে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সমাজেও আচারবশ্য জাতি ইউরোপে এখনো বিরল নয়। বস্তুত রাষ্ট্র-ব্যাপারে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করার দরুণই ইউরোপে ধীরে ধীরে সামাজিক ব্যাপারেও অধীনতার নাগপাশবন্ধনগুলি খুলিয়া গিয়াছে—মানুষের অধিকারকে যে কোথাও সঙ্কুচিত করা চলিবে না, এ বোধ ইউরোপীয় জাতিদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গেছে। প্রটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ডে,

এমন কি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বাদিগের নানা বিষয়ে অধিকার ছিল না—অবশেষে Catholic Emancipation Bill যে পার্লামেণ্টে পাস্ করা হয়, তাহা ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন উদার ভাবের প্ররোচনায় হয় নাই। অধিকারকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করা দরকার, সেই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই ইংরেজেরা বিল্ পাস করেন। স্পেনের আরমাডা যে ইংরেজের কাছে হার মানিয়াছিল, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করিয়াছেন এই যে, স্পেনের হালে বুড়ী বসিয়াছিল। কিন্তু তারও আবার কারণ এই যে, স্পেনে তখনও প্রজাতন্ত্র কোন আকারেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যে জাতি রাষ্ট্র-ব্যাপারে একবার আত্মকর্ত্তৃত্ব-চালনার সুযোগ পাইয়াছে, সে ক্রমশ তার সমাজেও সে অধিকারের পথকে প্রশস্ত করিয়া তোলে, ইউরোপের ইতিহাস হইতে এই শিক্ষাই আমরা পাই।

কিন্তু এও যে একতরফা কথা। ইউরোপে রেনেসাঁসের নবযৌবনের দক্ষিণে বাতসটা যদি এক সময়ে না বহিত, তবে তার মধ্যযুগীয় চর্চ্চ এবং সমাজের জরা-জীর্ণ নানাবন্ধন-জর্জ্জর শাখায় শাখায় প্রাণের প্রবাহ আর কোন কালেই দেখা দিত না। ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে অধীনতাই ছিল মধ্যযুগের আদর্শ; অর্থাৎ পূরাদস্তুর 'কর্ত্তার-ইচ্ছায়-কর্ম্ম'। সেই আদর্শের জায়গায় ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব-লাভের সুযোগকে প্রশস্ত করিবার আদর্শকে খাড়া করাইবার জন্য শুধু রেনেসাঁসের মত অতবড় একটা আন্দোলনেই কুলায় নাই —রেফর্মেশন Reformation ও ফ্রেঞ্চ রেভোলুশনের (French Revolution) মত প্রচণ্ড আন্দোলন ও বিপ্লবেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। রেনেসাঁসে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্মেষ; রেফরমেশনে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ; ফ্রেঞ্চ রেভোলুশনে গণতন্ত্রতার প্রতিষ্ঠা। এই তিন আন্দোলনের কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়—তিনের যোগেই ইউরোপ তার মধ্যযুগীয় বন্ধন-কারার শেষ প্রাচীর-টাকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মের" মূল কথাটা এই যে, ইউরোপ তার মধ্য-যুগের বন্ধন-দশার গণ্ডী কাটাইয়া বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতার উন্মুক্ত রাজপথে বাহির হইয়াছে; কিন্তু আমরা এখনো, এই বিংশ শতাব্দীতেও, সেই মধ্যযুগীয় গণ্ডীর আবরণের মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া আছি। অর্থাৎ আমরা এখনো দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীরই লোক।

বিপিনবাবু লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের দেশের জনসাধারণে যে ভাবেই শাস্ত্রানুগত হইয়া চলুক না কেন, সাধকেরা কোনও দিন, তিনি যে শাস্ত্রানুগত্যের অনিষ্টকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন, সেভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলেন নাই। যাঁরা এদেশে ধর্ম্মসাধন করেন, কেবল ধর্ম্মাচরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, তাঁরা সর্ব্বদাই সত্য বস্তুকে ও তত্ত্ববস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন কেবল শাস্ত্র বা গুরুমুখে তার কথা শুনিয়া কোনও দিন তৃপ্ত রহেন নাই। * *

"সতের আঠার শত বৎসর ধরিয়া

খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে সেই একই বাইবেল একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র হইয়া আছে। এই বাইবেলের অনেক টীকা-টিপ্পনি রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তার এক পংক্তিও প্রামাণ্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই। আর আমাদের দেশে যুগে যুগে সাধক ও সিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদের অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ও সেই আত্ম-প্রত্যক্ষের অভিধানের সাহায্যে শাস্ত্রবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় মধ্যে পূর্ব্বতন শাস্ত্রের সমান মর্য্যাদা ও অধিকার পাইয়াছে।

* * *

"ফলত রবীন্দ্রনাথ আমাদের শাস্ত্রকে যেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী রাজার বেশে সাজাইয়া সেদিন আসরে নামাইয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে ভারতের শাস্ত্র কোন দিন সেরূপ ছিল না, কখনও সেরূপ নাই।

সাধকেরা কি ভাবে শাস্ত্র মানেন কিম্বা শাস্ত্র কি ভাবে মানা উচিত, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে" কোন আলোচনাই করেন নাই। মুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, বুদ্ধি বিচারকে বিসর্জ্জন দিয়া যে শাস্ত্রানুগত্য বা আচারবশ্যতা ভারতের অগণিত জনগণের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেবল তাহারি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বিপিনবাবু যেভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্যকে মানিবার কথা বলিয়াছেন, আধুনিক যুগগুরু রাজা রামমোহন রায় সেই ভাবেই সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। "তুহফাতুল মোহায়েদীন" —প্রণেতা রামমোহন এবং "বেদান্ত গ্রন্থ" প্রকাশক রামমোহন একই রামমোহন নন্। ফরাসী বিপ্লবের মুখে রামমোহনের জন্ম; ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা; শাস্ত্র গুরু পুরোহিত প্রভৃতি সকল শাসনকে অস্বীকার করিবার ভিতর দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় অসাধারণ মনীষীকেও এক সময়ে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তিনি অনুভব করিলেন যে, শুধু যুক্তিতেই (Reason) মানুষের মুক্তি নাই; যুগ যুগের মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রাশির সঙ্গে প্রতি সাধকের স্বাধীন বুদ্ধির সামঞ্জস্য না ঘটিলে মানুষের মুক্তি যথার্থ মুক্তি হইবে না। "মানুষের ধর্ম্ম ও সমাজের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সর্ব্বতোভাবেই যে মানুষের বন্ধনের কারণ একথা সত্য নয়; কারণ তাদের মধ্যেও কোথাও না কোথাও মুক্তির ইঙ্গিত আছেই; সেই ইঙ্গিতগুলিকে বুদ্ধির সাহায্যে উদ্ধার করিলে তবেই আবার তাদের নূতন যুগধর্ম্মোপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা যায়। "বেদান্ত গ্রন্থে"র "অনুষ্ঠানে" রামমোহন তাই লিখিয়াছিলেন, "আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি।"

রামমোহন রায় যে শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানিয়াও শাস্ত্রকে বুদ্ধির কষ্টি পাথরেই কষিয়া দেখিতেন তার প্রমাণ ঐ ভূমিকাতেই পাই। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে লোকের আপত্তি এই যে, "পিতা পিতামহ এবং স্বর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথাকরণ অতি অযোগ্য হয়"। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে লেখে

"ইহার সাধারণ উত্তর এই যে, কেবল স্বর্গের মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশু-জাতীয়ের ধর্ম্ম হয় যে সর্ব্বদা স্বর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করে। মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে সে কিরূপে ক্রিয়ার দোষ-গুণ বিবেচনা না করিয়া স্বর্গে কারন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে।"

রামমোহন রায় আচারকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়াছিলেন; তিনি আচারকে লোকস্থিতির একটা উপায় বলিয়া মনে করিতেন মাত্র। "ধর্ম্মাধর্ম্ম এ সকল অন্তঃকরণ-বৃত্তি হয়েন—সুতরাং আচারাদির পরমার্থ-সাধনের সহিত সম্বন্ধ নাই"। বস্তুতঃ প্রত্যেক ধর্ম্মকে তার আচার হইতে মুক্ত করিয়া তবে তার বিশ্বভৌমিক স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করা যাইতে পারে, ইহাই রামমোহন রায় মনে করিতেন।

রামমোহন রায়ের ভাবে শাস্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ interpret করেন নাই; তিনি কেবলমাত্র বিচারহীন শাস্ত্রানুগত্য বা আচার পালনকে নিন্দা করিয়াছেন। রামমোহন রায় তাঁর চেয়েও তীব্রতর ভাষায় এ সকলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত তাঁর বাক্যই তার প্রমাণ।

অতএব বিপিনবাবু রবীন্দ্রনাথ যে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই, তাহাদিগকে আসরে নামাইয়া আনিয়া যে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিশেষ কোন যোগ নাই।

বিপিনবাবুর বহুদিনকার মন-গড়া কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে; সেগুলি বস্তুতন্ত্র "বস্তুতন্ত্র" কিনা তার খোঁজ তিনি লইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রগুরু সব বাদ দিয়া নিজের "স্বাভিমত"কেই ধর্ম্মের প্রামাণ্য মনে করিয়াছিলেন—এ একটা তাঁর মন-গড়া সিদ্ধান্ত। তাঁর আর একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "মহর্ষির প্রভুতার প্রতিকূলে আপনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেন" বলিয়াই মহর্ষি ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর দলের "স্বাধীনতার মর্য্যাদা" রক্ষা করিতে পারিলেন না। মৎপ্রণীত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিতে বিপিন বাবুর এই সকল সিদ্ধান্তের খণ্ডন আছে। মহর্ষি "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের" প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে যে সকল সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, উপনিষদে তাহাদের অনুরূপ বাক্য যেখানে যেখানে যাহা যাহা পাইয়াছেন তাহাদিগকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শাস্ত্রকে অস্বীকার করা হয় না। কেশব চন্দ্র প্রভৃতি নবীন দল প্রাচীনদলের "স্বাধীনতার মর্য্যাদা" রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত পড়িলে এ কথাটা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ রূপেই অবান্তর প্রসঙ্গে—অতএব এইখানেই এটাকে বন্ধ করা দরকার।

বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা

"নারায়ণে" শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভাবিবার অনেক কথা আছে।

তিনি লিখিয়াছেন, "চলিত ভাষা বলিয়া আমরা যে সুর বাঁধিয়া দিতেছি, তাহার মধ্যেই কি বাংলার সব ভবিষ্যৎ? আমরা ত মনে করি, এইরূপে বাংলার ভবিৎষ্যকে আমরা খর্ব্ব করিয়া আনিতেছি, তাহার কতকগুলি possibilitiesকে বহিষ্কার করিয়া দিতেছি। * *

"এই নব যুগের পূর্ব্বে বাংলা কি ছিল, তার যথাযথ প্রতিকৃতি পাই চণ্ডীদাসে, আর কি হইতে পারে তারও চরম অভিব্যক্তি ঐ চণ্ডীদাস। তার ভাব তার ভাষা অতিমাত্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালীর প্রাণের যা বিশেষত্ব, যে নিছক স্বাতন্ত্র্যটুকু তাহারই পরিস্ফুরণ। কিন্তু সেই সঙ্গেই মিশিয়া রহিয়াছে কেমন এক প্রাদেশিকতা, একটা সঙ্কীর্ণতা, একটা "ঘুরমুখো" প্রকৃতির ছায়া, বিশ্বজীবনের উদার বহুতরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যের সহিত একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব।

"কিন্তু ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী যেদিন বাঙ্গলার প্রাণ ছাড়িয়া বিশ্বপ্রাণের বার্ত্তা পাইল, শুধু নিজের ঘরের যে অনুভূতি, যে অভিজ্ঞতা, তাহা ছাড়াইয়া যে দিন সমস্ত জগতের বিপুল বিচিত্র রসের সন্ধান পাইল, সেদিন তাহার সে পুর্ব্বতন চিরপরিচিত ভাষা ও ভঙ্গিমা ও নূতন জীবনের স্পন্দন আর ধারণ করিতে পারিল না। সে চাহিল নূতন আধার, জীবনসঙ্গীতের নূতন মূর্চ্ছনার অনুরূপ তাহার ভাষার নূতন সুর—নূতন ছন্দ। আর তারই ফল বিদ্যাসাগর—মধুসূদন।... হইতে পারে, এই প্রথম আচার্য্যগণ, ভাষায় যে সব নূতনত্ব আনিয়াছিলেন, তাহা সব টিঁকিবার নয়, টিঁকা উচিতও নয়। কিন্তু তাঁহারা বাংলা ভাষায় যে গুরুত্ব, যে একটা লাতিল প্রতিভা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বাংলার চিরসম্পদ্, তাহা শুধু অতীতের এক ক্ষণিক বিকৃতি নহে; পরন্তু মহোজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই পূর্ব্বাভাস।

"ইংরাজী ভাষাতেও চসার ছিলেন খাঁটি ইংরাজ—"The wells of English undefiled"—তাঁহার ভঙ্গিমা ছিল ইংরাজের অতি আপনার, গৃহস্থালী ভাবেরই প্রতিমা। কিন্তু এলিজাবেথের যুগে ইংরাজ জাতির দৃষ্টি যখন ইংলণ্ডের সীমাটি অতিক্রম করিল, আপন গণ্ডীটি ছাড়িয়া নূতন জ্ঞানে নূতন প্রেরণায় তাহার অন্তরাত্মা ভরপূর হইয়া উঠিল, তাহার কর্ম্মবীরগণ যখন অসীম সাগরের পারে ছুটিয়া চলিলেন, তখন সে জাতির সাহিত্য-ভাষাও ধরিল এক নূতন আকার। আদর্শ কর্ম্মবীর রোমকের ভাষা সে সহজেই আপন করিয়া লইল। আর তারই ফল সেক্সপীয়র মিল্‌টন। ... শুধু লাতিন কেন, বৈদেশিক সব ভাষা হইতেই—ইংরাজ যেমন সহজে ও অকুণ্ঠিত. চিত্তে উপকরণরাজি সংগ্রহ করিয়াছে, বৈদেশিক ভঙ্গিমায় আপনাকে যথেচ্ছা ঢালিয়া দিয়াছে, এমন কোন জাতি তাহা পারে নাই।"

সুতরাং লেখকের মতে 'বঙ্গভাষার'ও যেমন স্থান আছে, 'বাংলা ভাষার'ও তেমনি স্থান আছে। লেখকের শেষ কথা এই যে, "বাংলার হৃদয়ে এতখানি

উদারতা বোধ হয় আছে—যাহাতে দুইটিই সেখানে স্থান পায়।"

আমার মনে হয় লেখক চলিত ভাষা ও সাধুভাষার মধ্যে যে ভেদ-রেখা টানিতেছেন, সে ভেদ-রেখা বস্তুত বর্ত্তমান নাই। প্রাচীন বাংলার ঠাট্ আছে বটে, কিন্তু চলিত ভাষা এবং তখনকার বাংলার চলিত ভাষায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মাঝে বিদ্যাসাগর—মধুসূদনের যুগে সংস্কৃত সাধুভাষার যে পালাটা চলিয়াছিল, তার দরুণ, এখনকার চল্‌তি ভাষাতেও সংস্কৃতের একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেছে। লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন, "থিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিত-পন্থীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক্ না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামগুলি ও আর দুই চারিটি কথা লইয়া।" কিন্তু সে প্রভেদটাকে তিনি যতখানি তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তাকে ততটা তুচ্ছ করিবার হেতু নাই। যে ভাষাকে চলিতে হইবে, তাকে অনাবশ্যক ভারমুক্ত হইতেই হইবে। বাংলার ক্রিয়াপদের মত এমন জবরজঙ্গ জিনিস বাংলা ভাষায় আর কিছুই নাই। কথিত ভাষায় সেইজন্য স্বভাবের নিয়মে তার ভারগুলি আপনিই লাঘব হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক কবিতাতেও কথিত ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদেরই ব্যবহার দেখিতে পাই। শুধু গদ্যে তার প্রচলন নাই—প্রচলন যদি হয়, তবে তাহাতে ভাষাটা হাল্কা ঝর্‌ঝরে হয় ইহাতে আর সন্দেহ কি?

চল্‌তি ভাষার ক্রিয়াপদের আরও সুবিধা আছে। বাংলা ভাষায় accent নাই—এজন্য বাংলা গদ্যই পড়ি বা পদ্যই পড়ি, সমস্তই কেমন sing song গানের সুরের মত করিয়া পড়িতে হয়। চল্‌তি ভাষায় ক্রিয়াপদ হসন্তবহুল বলিয়া তবু ভাষাটাকে একটু ধ্বন্যাত্মক করিয়া তোলে। ভাষার মধ্যে ছন্দোরক্ষার জন্য ঐ রকম ক্রিয়াপদের প্রচলন আধুনিক কবি ও লেখকগণ বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়া থাকেন।

তারপর লেখক ভাষা ও ভঙ্গিমা এই দুইটা জিনিসকে যেন কতকটা এক করিয়া মিশাইয়া দেখিতেছেন। ভঙ্গিমা বা style কোন ভাষার ঠাটের অপেক্ষা রাখে না বলিয়াই বোধ হয়। Style এর নির্ভর প্রতিভার উপর; প্রতিভাই ষ্টাইল সৃষ্টি করে। নূতন ষ্টাইল যখন কোন ভাষায় দেখা দেয় তখন সে ভাষাও অপূর্ব্বতর হইয়া উঠে। তখন সে যে কোথা হইতে তার উপকরণ সংগ্রহ করে সে হিসাব রাখা শক্ত হয়। কিন্তু এই সকল বিচিত্র ভঙ্গিমার দ্বারাই ভাষার স্বরূপের নির্ণয় হয় না। শেক্‌স্‌পীয়র মিল্‌টন্ যেমন চশারী ভাষাকে ছাড়াইয়া গেছেন, আধুনিক ইংরেজি তেম্‌নি শেক্‌স্‌পীয়ারী ইংরাজীকে ছাড়াইয়া গেছে। অথচ তা বলিয়া শেক্‌স্‌পীয়রের ষ্টাইলের বিশেষত্ব ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। তাহা আপনার প্রয়োজনে আপনি কালে কালে পরিণত হইতে থাকে—তার প্রয়োজন মানে সমস্ত জাতীয় মনের বিচিত্র প্রকাশের প্রয়োজন। শেক্‌স্‌পীয়ারী ভাষায় এখনকার কালের ইংরেজ-মন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে

না বলিয়াই সে ভাষায় এখন কোন লেখকই রচনা করিতে প্রস্তুত নন্।

বাংলা ভাষাও তেমনি বাঙালীর মনের বিচিত্র প্রকাশের অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। সেজন্য এ ভাষাকেও racy হইতে হইবে, ইহার বাহুল্যগুলি ক্রমশঃ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ইহাকে বেগশালী করিতে হইবে। যাঁরা চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী, তাঁরা ভাষাকে কোন একটি বিশেষ ভঙ্গিমা বা style এ আবদ্ধ রাখিতে চান্ না। তাঁরা সংস্কৃত কেন, ইংরাজীও বাদ দিতে চান্ না। তাঁরা চান্ ভাষাটাকে ভারমুক্ত করিতে, ছন্দোময় করিতে, শক্তিশালী করিতে। বীরবলের style ও ঘরে-বাইরের style এক নয়। খেয়ার style ও ক্ষণিকার style এক নয়; তেম্‌নি খেয়ার style ও বলাকার style ও এক নয়। Style যত ইচ্ছা বিচিত্র হোক্, তাতে চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতীদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

হিতবাণী। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। 'দৈনিক চন্দ্রিকা' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। 'নানা পুস্তক' ও 'নানা মুখ' হইতে লেখক যে সকল হিতবাণী 'আহরণ করিতে' পারিয়াছেন—তাহাই "হিতবাণী রূপে প্রকাশিত হইল।"

মধুপর্ক। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এ খানি ছোট গল্পের বই; গুরুদাস লাইব্রেরীর আট আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার একবিংশ গ্রন্থ। প্রকাশক মহাশয় সুলভে সৎগ্রন্থ-প্রকাশের এই যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসীমাত্রেরই তিনি ধন্যবাদভাজন। এ গ্রন্থে পাঁচটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে—সবগুলিই সুন্দর। তবে "উন্মাদ" "কুসুম" ও "অশ্রু" এ তিনটি গল্প বঙ্গসাহিত্যে সম্পদ স্বরূপ—ছোট গল্পে আর্ট এগুলিতে পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়াছে। "ডাকাত" হাস্যরসে পরিপূর্ণ। "নিয়তিতে" লেখক মানবজীবনের করুণ বেদনাটুকু সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লেখকের ভাষায় ছন্দ আছে, সুর আছে; রচনা-ভঙ্গীতে প্রাণ আছে এবং তাহা সংযত। ব্যঙ্গেও লেখকের শক্তি বেশ। রোমান্সটুকুও তাঁহার হাতে খোলে ভাল। ছোট-গল্প-রচনায় হেমেন্দ্র বাবু যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, 'মধুপর্ক' সে খ্যাতি সমধিক বর্দ্ধিত করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



ভারতী

৪১শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২৪ [৯ম সংখ্যা

তিপ্‌রা বা তিপারা জাতি

নেপালের কিরান্তি জাতি কিরাতশ্রেণী-ভুক্ত, তিপারাগণও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। য়ুরোপীয় কোন কোন পণ্ডিতের মতে, আরাকানের মুরুং জাতি যে শ্রেণীর অন্তর্গত ইহারাও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। ত্রিপুরারাজ্যে ও ত্রিপুরাজেলার বাহিরে কেবল চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই জাতিকে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরারাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ৯৪,০৭৫। ইহাদের ৬/৭ অংশ ত্রিপুরারাজ্যে বাস করে; অবশিষ্ট ১/৭ ভাগ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও ত্রিপুরাজেলায় আছে। তিপারাগণ ত্রিপুরারাজ্যের আদিম অধিবাসী। ইহারা 'পুরাণ তিপারা', 'দেশী তিপারা' ও 'জমাতিয়া' এই তিনভাগে বিভক্ত। 'নওয়াতিয়া' ও 'রিয়াং' নামে ইহাদের আরও দুইটী বিভাগ আছে, কিন্তু তাহারা আসল তিপারা নয়। নওয়াতিয়াগণ চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। রিয়াংগণ কুকিবংশ-সম্ভূত, ইহারা পূর্ব্বে তিপারারাজগণের পালকী-বেহারার কাজ করিত। ত্রিপুরারাজ্যে তিপারাজাতির মধ্যে ৪৮,৭১৭ জন পুরুষ এবং ৪৫,২৬৩ গুলি স্ত্রীলোক তিপারা বা মুরুং ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। বিগত পনর বৎসরের মধ্যে তিপ্‌রা ভাষাভাষী জনসংখ্যা শতকরা ২৪ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুরাণ তিপারাগণ তিপারাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের নিম্নে দেশী তিপারার স্থান। তারপর জমাতিয়ার স্থান। অতঃপর নওয়াতিয়া ও রিয়াংএর স্থান।

পুরাণ তিপারাগণ নিম্নলিখিত এগারটী 'হদা' বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

১। বাছাল—প্রবাদ আছে যে, ইহারা পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজ্যের অধিপতি ছিল। ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুরারাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। বাছালগণ পূর্ব্বে সুবার অধীনে 'হস্তী-খেদার' কার্য্য করিত। এক্ষণে ইহাদের উপর নিম্নোক্ত কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে :—

(ক) রাজদরবারে ইহাদিগকে রৌপ্য-নির্ম্মিত 'পান' ও 'পাঞ্জা' বহন করিতে হয়। ত্রিপুরেশ্বর যখন মিছিল লইয়া কোথাও গমন করেন, তখনও বাছালদিগকে ঐ কার্য্য করিতে হয়। 'পান' ও 'পাঞ্জা' রাজকীয় সুলতানতের অঙ্গ।

(খ) রাজপরিবারের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইহারা মৃতদেহ শ্মশানে বহন করিয়া সৎকার করিয়া থাকে।

(গ) রাজবাড়ীতে পার্ব্বত্যপদ্ধতি-ক্রমে কোন পূজার অনুষ্ঠান হইলে, বংশ-গুচ্ছ দিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং পূজার মণ্ডপ প্রস্তুত-করণ ইহাদের কার্য্য। পূজায় ইহারা জলও যোগাইয়া থাকে।

(ঘ) ত্রিপুরারাজ্যে বিবাহকালে বিবাহ-বেদির চারিপাশে পত্রশাখাসংযুক্ত বংশ পুতিয়া দিবার প্রথা আছে। রাজপরিবারস্থ কাহারও বিবাহে এই কার্য্যে বাছালদিগেরই অধিকার।

(ঙ) প্রতি বর্ষে বিজয়ার পরদিবস অসম * ভোজন নামক অপর্য্যাপ্ত মদ্যপানাদি-ক্রিয়ার একটী অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঐ অনুষ্ঠানের জন্য বাছালদিগকে বংশনির্ম্মিত দীপাধার প্রস্তুত করিতে হয়। এই উপলক্ষে যে সকল নওয়াতিয়া তিপারা † নিমন্ত্রিত হয়, তাহাদিগের আহারের জন্য বাঁশের বেড়া দিয়া স্থানটীকে ঘিরিতে হয়। ‡ এ কার্য্যও বাছালদিগকে করিতে হয়।

২। সিউক—'সিউক' শব্দের অর্থ শিকারী। ইহারা রাজপরিবারের আহারের জন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা রাজদরবারের উপাধি বিতরণকালে চন্দনের পাত্র ধারণ করিয়া থাকে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিবাহ উপলক্ষে মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য ইহারা পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সধবা (এয়ো) আনয়ন করে, পাত্রীর 'পাট' ধরে এবং পাত্রীর পক্ষের "জলভরা"র কার্য্য করিয়া থাকে। কুয়াই-তুইয়াদিগের সহিত ইহাদিগকে চন্দ্রাতপ দিয়া বিবাহ-বেদি সাজাইতে হয়।

৩। কুয়াই-তুইয়া—পানসুপারি-বাহক কুয়াইতুইয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ছয়টী প্রধান কার্য্য।

(ক) দরবারে উপাধি-বিতরণকালে ফুলের মালা গাঁথা।

(খ) সিংহাসন-ঘরে প্রত্যহ ধূপধুনা দেওয়া এবং বিশেষ বিশেষ পূজোপলক্ষে রাজসিংহাসন ধৌত করা।

(গ) পূজার প্রসাদ বাঁটিয়া দেওয়া।

(ঘ) পূজার সময় মহারাজের এবং ঠাকুর-লোকদিগের বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থানাদির বন্দোবস্ত করা।

(ঙ) বিবাহের সময় পাত্রের এবং পাত্রপক্ষের 'জলভরা'র কার্য্য করা।

(চ) সিউকদিগের সহিত বিবাহ-বেদি সজ্জিত করা।

৪। দৈত্যসিং বা দুইসিং—ইহারা রাজকীয় ধ্বজা বা নিশান বহন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যুদ্ধকালে ইহারা শ্বেত-বর্ণের নিশান বহন করিত। এক্ষণে কেবল দরবারে, মিছিলে এবং পূজার সময় শ্বেত নিশান বহন করিয়া থাকে। এ ছাড়া ইহারা পূজার কাঠাম তৈয়ারি করিয়া থাকে এবং অসমভোজনের সময় মাংসও কুটিয়া থাকে।

৫। হুজুরিয়া }
৬। ছিলটিয়া } —ইহারা মূলতঃ একই হদার দুইটী বাজু বা শাখা। হুজুরে অর্থাৎ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হয় বলিয়া 'হুজুরিয়া' এই আখ্যায় ইহারা আখ্যাত হয়। ইহাদিগকে উপস্থিতমত বহুবিধ কার্য্য করিতে হয়। রাজপ্রাসাদ হইতে বিভিন্ন দেবালয়ে বা পূজার স্থানে বলির এবং ভোগের দ্রব্যাদি ইহাদিগকে বহন করিতে হয়।

৭। আপাইয়া—এই শব্দের অর্থ 'মৎস্যক্রেতা'। ইহারা পূর্ব্বে রাজপরিবারের ব্যবহারার্থ মৎস্যাদি ক্রয় করিত। এখন ইহাদিগকে রাজবাড়ীর জ্বালানি কাঠ যোগাইতে হয়।

৮। ছত্রতুইয়া বা ছককৃতুইয়া—এই শব্দের অর্থ ছত্রবাহক। ইহারা রাজদরবারের সময় চন্দ্রবাণ, সূর্য্যবাণ, মাহী-মুরত, ছত্র, আরেঙ্গী প্রভৃতি সুলতানত বহন করিয়া থাকে।

৯। গালিম—ইহারা পূজক। কের, খার্চী প্রভৃতি পূজায় ইহারা পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

১০। সুবে নারাণ—পূজা এবং অসমভোজন উপলক্ষে মাছ কোটা ইহাদের কার্য্য।

১১। সেনা—পূর্ব্বোক্ত দশটী সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ অগম্যাগমন করে (অর্থাৎ মাসতুতো ভগিনী, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার কন্যা, পিতৃব্যকন্যা প্রভৃতিকে বিবাহ করে) তাহা হইলে তাহাকে ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ লইয়া কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ অপরাধী 'সেনা' নামে অভিহিত হয়। তবে তাহার পুত্রাদি স্বজাতিকে ভোজ দিয়া পুনরায় আপনাদের 'দফা'-ভুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা অসমভোজনের সময় চুল্লি প্রস্তুত করে, রন্ধনের বাসনাদি ধৌত করে, এবং ঠাকুর-লোকদিগের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে। অসম-ভোজনের আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, ইহারা দামামা বাজাইয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। সেনাগণ খার্চী-পূজার সময় ঢোল বাজাইয়া থাকে।

উল্লিখিত একাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ হইত না; কিন্তু অধুনা দৈত্যসিং, কুয়াইতুইয়া, ছত্রতিয়া ও হুজুরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ হইয়া থাকে। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল আন্তর্গণিক বিবাহ হইতে

* অসম=অপর্য্যাপ্ত। তিপারাগণ এই শব্দ বহুপ্রকারে উচ্চারণ করিয়া থাকে। অছম, হসম, হছম, হসন, হছন ইত্যাদি ইহার বিকৃত উচ্চারণ।

† ইহারা স্থানীয় ভাষায় 'কাতাল' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

‡ চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা জায়গাকে তিপারাগণ 'বিতল' বলিয়া থাকে।

আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি ইহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করা শ্রেয়ঃ মনে করে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আহারাদি প্রচলিত নাই, কিন্তু এরূপ আহারের দ্বারা কাহারও জাতিনাশ হয় না।

তিপ্‌রাজাতি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, ইহারা প্রায়শঃ সবল শরীর; ইহাদের মুখ-মণ্ডল সাধারণতঃ গুম্ফ-শ্মশ্রুবিহীন, বাহু ও পদযুগল কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক রকমের স্থূল। বর্ণ ঈষৎ গৌর, নাসিকা কিছু চাপা। তিপ্‌রাজাতি সাধারণতঃ অন্যান্য পর্ব্বতীয় জাতির মত দুর্দ্দান্ত নহে। তবে শ্রেণী-ভেদে প্রকৃতিগত সাধারণ তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে রিয়াং শ্রেণীর তিপ্‌রাগণ অপেক্ষাকৃত উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন। পূর্ব্বে জমাতীয়াগণের উগ্রস্বভাব থাকিলেও বর্ত্তমানকালে তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তিপ্‌রা ও নওয়াতীয়াগণই ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নম্র ও মধুর স্বভাব। সকল শ্রেণীর তিপ্‌রাই সাহসী, অকপট এবং পরদুঃখ-কাতর। কোন প্রকারের দুষ্প্রবৃত্তি প্রায়ই তিপ্‌রাদিগের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। ইহারা স্বাবলম্বনশীল ও একতাসম্পন্ন।

বাসস্থান—তিপ্‌রাগণ পর্ব্বতোপরি বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ তিপ্‌রা বাঁশ দিয়া দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরিতলে বাস ও নিম্নতলে পালিত পশু-পক্ষী রক্ষা করে। কেহ কেহ বা একতল গৃহেও বাস করিয়া থাকে। ইহাদের গৃহের ছাদগুলি সাধারণতঃ ছনের দ্বারা আবৃত থাকে। এক এক বাড়ীতে অনেক পরিবার বাস করে। বাটীর অধিবাসিবৃন্দের সাধারণ অপরাধ এবং সামাজিক বিবাদের বিচার ও মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া বুদ্ধিমান্ মুরুব্বি বা মাতব্বর ব্যক্তি থাকে। ইহাদিগকে তিপ্‌রা-গণ "চৌধুরী" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সমস্ত তিপ্‌রাদের সাধারণ উপাধি "ত্রিপুরা"। ইহাদের মধ্যে যাহারা ত্রিপুরেশ্বরের সন্তোষপ্রদ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করে, রাজানুগ্রহে তাহারা প্রথমে 'বড়ুয়া' উপাধি, পরে ক্রমশঃ 'সেনাপতি' 'কবরা' ও 'ঠাকুর' উপাধি পাইয়া থাকে। এইরূপ বিভাগের নাম 'হদা'।

কৃষিকার্য্য—তিপ্‌রাগণ জুমক্ষেত্রে নানা-বিধ শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সমান ভাবে কার্য্য করে। বহু-সংখ্যক স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া জুমের জন্য নিরূপিত স্থানের বৃক্ষাদি জঙ্গল পৌষ ও মাঘ মাসে কাটিয়া ফেলে; পরে সূর্য্যোত্তাপে তত্রত্য তৃণলতাদি শুষ্ক হইলে চৈত্রমাসে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে।

বৈশাখ মাসে সেই স্থানকে বীজবপনো-পযোগী করিয়া ধান্য, কার্পাস, তিল ও নানাজাতীয় তরকারীর বীজ একসঙ্গে বপন করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহারা জুম পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসে ইহাদের ধান কাটা হয়। আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহারা তিল, কার্পাস উঠাইয়া থাকে। জুমে প্রত্যেক শস্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যথাসময়ে ঐ শস্য পরিপক্ক হইলে তিপ্‌রাগণ নিজেদের আবশ্যক অনুসারে রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করে।

'খঁজর পা', 'মিলক্‌বাঁটা' ও 'বাঁটা' নামক মসলাবিশেষ তিপ্‌রাদিগের জুমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দুই একজন রাজাত্মীয় ও রাজকর্ম্মচারীর চেষ্টায় তিপ্‌রাদিগের মধ্যেও হল-কর্ষণ দ্বারা চাষ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাঙ্গালীরা যে প্রণালীতে চাষ করে ইহারা তাহারই অনুসরণ করিতেছে। ইহাদিগের চাষে ধান্য, পাট, সরিষা, বেগুণ, লঙ্কা, তামাক, ইক্ষু, আলু, ধনিয়া, পিঁয়াজ, মাস, মুগ, অড়হর কলাই, তিল, কার্পাস, কচু, আদা, হরিদ্রা, ভুট্টা, (তিপ্‌রা-নাম 'মগদানা') তরমুজ, তিক্তকরলা, চিন্‌রা নামক ফুটি, কাঁকুড়ের মত একপ্রকার ফল, দরমফাই নামক একপ্রকার অম্লাস্বাদ ফল, চালকুমড়া, মিষ্টকুমড়া, ও ডেঙ্গর ডাঁটা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভাষা—তিপ্‌রাদিগের স্বতন্ত্র একটা ভাষা আছে, কিন্তু ইহাদের ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ বা স্বতন্ত্র কোন অক্ষর নাই।

বিবাহ—তিপ্‌রাদিগের মধ্যে প্রধানতঃ 'হিক্‌নানানী' ও 'কাইজগ্‌নানী' এই দুই প্রকারের বিবাহপ্রথা প্রচলিত। তবে বিধবা-বিবাহ ও পরিত্যক্তা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণও ইহাদিগের মধ্যে হইয়া থাকে; সুতরাং চারিপ্রকারে ইহাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ এই জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই।

হিক্‌নানানী বিবাহ—বরকন্যার পরস্পর অনুরাগবশতঃ এই বিবাহ তাহাদিগের স্বেচ্ছায় হইয়া থাকে। ইহাতে কোনরূপ ঘটকের প্রয়োজন হয় না কিংবা মন্ত্রপাঠ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয় না। সমর্থ হইলে সামাজিকগণকে বর বা কন্যাপক্ষ হইতে একটী ভোজ দেওয়া হয়।

কাইজগ্‌নানী বিবাহ—বাঙ্গালী-দিগের ন্যায় অভিভাবকগণের ইচ্ছানুসারে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বিবাহে মনোনীত বা নিরূপিত কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহের পূর্ব্বে বর একবৎসর কাল অবস্থান করে, এবং কন্যার পিতা বা অভিভাবকের সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যদি এই সময়ের মধ্যে বরের কর্ম্মকুশলতা ও সচ্চ-রিত্রতা দর্শনে কন্যার অভিভাবক তাহাকে কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করে, পক্ষান্তরে বর ও কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করে, তাহা হইলে বিবাহ না হইলে পাত্রের এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের কার্য্যের জন্য কন্যাপক্ষ তাহাকে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া থাকে। আর বিবাহ হইলে, তিপ্‌রাদিগের পুরোহিত (ওঝাই) 'রামপ্রা' বা 'লাম্‌প্রা' নামক দেবতার পূজা করে। এই পূজাতে দুইটী বাঁশ পুতিয়া তাহার উপরে একটী বাঁশ রাখে ও দুইটী বাঁশের চোঙ্গ উপরিস্থিত বাঁশের উপর সংস্থাপন করিয়া তাহার একটীতে মদ্য ও অপরটীতে জল রাখে; এবং মোরগ বা হাঁস প্রভৃতি বলি দিয়া পূজা হইলে ওঝাই বাঁশের চোঙ্গায় রক্ষিত জল বরকন্যার মস্তকে দেয়। ইহাই কাইজগ্‌নানী বিবাহের মাঙ্গলিক কার্য্য। ইহার পর কন্যা বরের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া কন্যার মাতার প্রদত্ত একপাত্র সুরার অর্দ্ধেক স্বয়ং পান করিয়া অপরাংশ বরের হস্তে দেয়। বর সেই উচ্ছিষ্ট মদ পান

করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইল। সামাজিক-দিগকে মদ্যাদি উপচারে ভোজপ্রদানও এই বিবাহের একটী অঙ্গ।

যদি কন্যার পিত্রালয়ে বরের বর্ষব্যাপী অবস্থান সময়ে উভয়ের প্রেম হয় এবং সেই প্রেমের পরিণামে বিবাহের পূর্ব্বেই কন্যার সন্তান-সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলেও এক বৎসর পরে বিবাহ হইবে, কিন্তু তাহাতে 'লাম্‌প্রা' দেবতার পূজা হইবে না। আনুষঙ্গিক অপর অনুষ্ঠানগুলিও রহিত থাকিবে। কেবলমাত্র কন্যার আনীত জলের ছিটা বর কন্যার মস্তকে প্রদান করিয়া তাহার সীমন্তে সিন্দুর দিয়া দিবে। এইরূপ হইলে ওঝাইএর কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে বর অন্যত্র প্রস্থান করে, এবং দুই দিন ও একরাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

বিধবার বিবাহ ও পরিত্যক্তার পত্যন্তর গ্রহণে উল্লিখিত উভয় প্রকার বিবাহের কোন ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হয় না।

তিপ্‌রাদিগের মধ্যে সামর্থ্যানুসারে একজন তিন চারিটা বিবাহ করিতে পারে। আবশ্যক বোধ করিলে ২।৪ জন অবিবাহিত স্ত্রীলোকও ঘরে রাখিতে পারে। এই রক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের গর্ভে সন্তান জন্মিলে তিপ্‌রা-গণ পুত্র কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে উৎপন্ন সন্তানগুলি বিষয়ের অতি সামান্য অংশ পাইয়া থাকে। এইরূপ রক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে তিপ্‌রাগণ 'কতই' বলিয়া থাকে।

ধর্ম্ম—তিপ্‌রাদিগের মধ্যে প্রধানতঃ চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা হইয়া থাকে। ইহারা ইহাদিগের পূজার সময় তিপ্‌রা ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে।

তিপ্‌রাগণ যে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা করিয়া থাকে সেগুলি অষ্টধাতুর ১৪টী মুণ্ড মাত্র।

তিপ্‌রাগণ চতুর্দ্দশ দেবতার নাম এইরূপ বলিয়া থাকে।

হরোমা হরিমা বাণী কুমারোগণপাবিধিঃ।
স্কান্দির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চতুর্দ্দশঃ॥

(শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, বিরিঞ্চি, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, প্রদ্যুম্ন ও হিমাদ্রি)

এই চৌদ্দটী দেবতার পূজা হইলে পর তিপ্‌রাগণ আর একটী লৌহময় মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। ঐ মূর্ত্তির এক হস্তে ঢাল, অপর হস্তে তরবারি। ইহার নাম 'বুড়াদেবতা'।

প্রতিদিন চৌদ্দ দেবতার পূজা হয় না। প্রত্যহ দুর্গা, শিব ও বিষ্ণু এই তিন দেবতার স্নান ও পূজা হইয়া থাকে। পূজার কতকগুলি নিয়ম আছে। প্রাতঃ-কালে প্রায় নয়টার সময় তিন দেবতাকে বাল্যভোগ দিতে হয়। বাল্যভোগে চাল, কলা, চিনি, সন্দেশ, ঘৃত, সুপারি, পান ও দুধ দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত তিন দেবতার ভোগের সঙ্গে চণ্ডীদেবীর একটী ভোগ দিতে হয়। এই ভোগে একটী কলা, একটী সন্দেশ, এক পোয়া চাল ও একটু ঘৃত দিবার নিয়ম। অতঃপর চণ্ডীপাঠ। তারপর একটী ছাগ (পাঁঠা) বলি দেওয়া হইয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরে চৌদ্দ দেবতার তিন দেবতার রাজভোগ। ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জন, ছাগমাংস, ও তিনটী ডিম্ব আবশ্যক।

অপরাহ্নে—আরতি।

নবমীর দিন দুইটী ছাগ এবং শুক্লাষ্টমীর দিন একটী ছাগ বলি দেওয়া হয়, এবং একটী খাসী অন্যত্র কাটিয়া তাহা দ্বারা ভোগ হয়। পূজাতে রোহিত মৎস্য (শোলমাছ) দেওয়ারও রীতি আছে।

চৌদ্দ দেবতার পূজার জন্য তিপ্‌রাদের একটী বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। পূজার জন্য একজন প্রাচীন পূজক থাকে। ইহাকে তাহারা 'চন্তাই' নামে অভিহিত করে। চন্তাইএর আদেশ অনুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। চন্তাই প্রধান প্রধান পূজার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। চন্তাইএর প্রতিনিধিকে ইহারা 'নারাণ' বা 'নারায়ণ' আখ্যায় অভিহিত করে।

চন্তাইএর অধীন দেওড়াই বা গালিম নিত্য পূজা সম্পাদন করে ও বলি দিয়া থাকে।

কার্য্যের সুবিধার জন্য গালিমগণ নিম্ন-লিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা—

১। খাবংতিনাই—ইনি মহা-দেবের সেবক।

২। ঋসক্ বা ঋজক্—দেবতা-দিগকে যখন নদীতে স্নান করাইতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন ইনি দেবতার অগ্রে 'উই উই' শব্দ করিতে করিতে গমন করেন। অর্চ্চিপূজার অধিবাসের দিন স্নান হয়।

৩। শিংকল খাইনাই—ইনি দেবতার তরবারিধারণকারী সিপাহী।

৪। দাকলোকতিনাই—বড় খড়্গ-ধারী সিপাহী।

৫। খামকল খাইনাই—ঢোল-বাদ্যকর।

৬। তকজাংখা খাইনাই—খাঁচা বাহক (খাঁচার ভিতরে সাতটী পারাবত থাকে)।

৭। বলকলোকনানাই বা বল্‌কলতিনাই—মশালধারী।

৮। লাইকলোক খলনাই—ইনি পাতা বিছাইয়া দেওয়াইবার কার্য্য করেন।

৯। মুড়িতাম নাই—শানাই বাদক।

১০। মুড়ি—ইনি খড়্গে ধার বা শান দিয়া দেন।

১১। মুদি—ইনি খড়্গে শান দিবার আদেশ দেন।

তিপ্‌রাদিগের উপাস্য দেবতা।

১। মহাদেব ও মাদেবী (পার্ব্বতী)—প্রধানতঃ তিপ্‌রাজাতি ইঁহাদেরই উপাসক। ইঁহাদের পূজা প্রাতঃকালেই হইয়া থাকে। পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও পারাবতের আবশ্যক।

২। লাম্‌প্রা দেবতা যুগল, (আকাশ ও সমুদ্র) (লাম্‌প্রাওয়াথক)

বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে এই দেবতা-যুগলের পূজা হইয়া থাকে। রোগশান্তির জন্যও ইঁহাদের পূজা হয়। ওঝাইগণ পূজার সময় ইঁহাদিগকে 'বিখাটা' ও 'আখাটা' এই দুই বিশেষ নামে অভিহিত

করে। 'লাম্‌প্রা' পূজায় হাঁস ও পারাবত চাই।

৩। সাঙ্গবংমা (হিমালয়)—চতুর্দ্দশ দেবতার মধ্যে প্রায়শঃই ইঁহার ও লাম্‌প্রার পূজা হয়। অন্য দেবগণের পূজা কদাচিৎ হইয়া থাকে। পূজায় হাঁস ও পাঁঠা দিতে হয়।

৪। তুইমা (গঙ্গা)—কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহার আরোগ্য কামনায় সন্নিহিত নদীতে ওঝাই কর্ত্তৃক তুইমার পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা দ্বারা নিরূপিত হয় যে, রোগীকে কোন্ দেবতা আক্রমণ করিয়াছেন। পরে রোগশান্তির জন্য পুনর্ব্বার নিরূপিত দেবতার পূজা হয়। এই দেবতার প্রকৃত নাম 'কালাক্ষিরাজ'। ইহা ভিন্ন অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ ভাবে তুইমার পূজা হয়। পূজায় হাঁস ও পাঁঠার ব্যবস্থা।

৫। মালুইমা—ধান্যের দেবতা, ধান্য প্রচুর পরিমাণে হওয়ার কামনায় এই দেবতার পূজা হয়। পূজায় মোরগ দিবার নিয়ম। এই দেবতাকে ওঝাইগণ 'লক্ষ্মী' বলিয়া থাকে।

৬। খুলুমা (কার্পাসের দেবতা) কার্পাস উৎপত্তির কামনায় ইঁহার পূজা হয়। এই দেবতার প্রকৃত নাম 'ধনসরী'; (ধান্যেশ্বরী) পূজায় মোরগ ব্যবস্থা।

৭। বুড়াছা—রোগের উপশম কামনায় ইহার পূজা হয়। এই পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও মোরগের ব্যবস্থা। ওঝাইগণ এই দেবতাকে 'কিসিনাক্রা' বলে।

৮।৯। বনিরাও ও তুমনাইরাও। দুই ভাই বুড়াছাএর পুত্র। বনিরাও সাধারণ নাম, ওঝাইদের নাম 'কলকুতু, 'ক্লকুতুদা'। 'তুমনাইরাও' সাধারণ নাম, ওঝাইদিগের প্রদত্ত নাম 'জমুদুবুদু'। পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও মোরগের ব্যবস্থা।

১০। বুরইরক—সাত ভগিনী। ৬টী বিবাহিতা, ১টী কনিষ্ঠা অবিবাহিতা। এই অবিবাহিতা ভগিনী মানব লইয়া ক্রীড়া করেন। ইঁহারা ডাকিনী যোগিনী বা সাতবোন-পরী নামে বিখ্যাত।

১১।১২। গরাইয়া ও কালাইয়া দুই ভাই। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বিশেষ সমারোহের সহিত ইঁহাদিগের পূজা হয়। এই সময়ে তিপ্‌রাগণ ৩।৪ দিন মদ্যপানে উন্মত্ত থাকে। এই পূজায় মোরগ আবশ্যক। ওঝাইগণ গরাইয়া দেবতাকে 'বিনাইগ্‌ঘ' বলে।

এতদ্ভিন্ন ইহারা হাঁস ও পাঁঠা বলি দিয়া 'মঙ্গলচণ্ডী', ভদ্রকালী, রক্ষাকালী ও ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা করে। মোরগ বলি দিয়া 'লকৃত্রাই বড়মুড়া'র পূজা হয়। মোরগ ও শূকর দিয়া 'বিসরী'র পূজা হয়। 'যমপীড়া,' 'কাইপীড়া,' ও 'দরখা' নামক দেবতার পূজাও হইয়া থাকে।

ইহারা সত্যনারায়ণ, ত্রিনাথ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) ও শনির পূজা করিয়া থাকে। এই ওঝাইগণ বংশানুক্রমে ইহাদিগের পৌরোহিত্য করে। প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে তিপ্‌রাগণ বার্ষিক পূজার অনুষ্ঠান করে। ত্রিপুরেশ্বরের 'কের' পূজা শেষ হইলে 'পাহাড়ীয়া'রা 'কের' পূজা

করে। এই পূজার সময় পিষ্টকাদি খাইবার নিয়ম আছে।

মৃত্যু।—ত্রিপুরাজাতীয় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণ শবদেহ শ্মশানে আনিয়া তাহার পায়ের কাছে একটা মোরগ মারিয়া কিছু চাউলের সহিত রাখিয়া দেয়; পরে দাহকার্য্য সম্পাদন করে। সাধারণতঃ বাঁশ ও বেতের চারিটা 'ঘুঘু' তৈয়ারী করিয়া মৃতের চরণতলে রাখিয়া দেওয়া হয়। শবদাহ করিয়া ইহারা শ্মশান পরিষ্কার করে। পরে একটা তুলসী, একটা আলো, কিছু অন্ন এবং একটা মোরগ বা পারাবত সেইস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়।

সেই চিতাস্থানে আত্মীয়গণ ক্রমাগত ৭ দিন পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির প্রীতিকামনায় একটা মোরগ মারিয়া রাখে ও কিছু চাউল দিয়া যায়। ৭ দিন পরে চিতাভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে চিতাভস্ম রক্ষা করে এবং বাড়ীর উঠানে তুলসীতলায় অস্থি রাখিয়া দেয়। চিতাভস্মের উপর একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মৃতব্যক্তির অস্ত্রশস্ত্রাদি সেই কুটীর মধ্যে সযত্নে রক্ষা করে। অস্থি যেখানে পুতিয়া রাখে সেখানে প্রাতঃকালে জল ও রাত্রিতে দীপ দেয়। এক বৎসরের মধ্যে অস্থি গঙ্গায় দিয়া আসে। যাহাদের সুবিধা না হয় তাহারা অন্যলোকের সহিত অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। অষ্টাহে অথবা ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নিরামিষ ভোজন করে। অশৌচের সময় তিপ্‌রারা 'ধড়া' নামক একটী ছোট নূতন বস্ত্র গলায় বাঁধিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইহাদের এরূপ রীতি ছিল না। শ্রাদ্ধের সময় ইহারা সাধ্যমত গাই-বাছুর ঘটী বাটী ইত্যাদি দান করিয়া থাকে।

ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মালা ধারণ করিয়া থাকে। যাহাদের মালা আছে তাহারা মাংস খায় না। মৎস্যমাত্র খাইতে পারে। ইহাদিগের গুরু আছে, তাহার নাম 'অধিকারী'। এই অধিকারীদিগের বাস নুরনগর পরগণার প্রস্তর্গত মেহারী গ্রামে।

উৎসব।—চৈত্রমাসে ইহাদিগের একটা উৎসব হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, কের পূজা, সরস্বতী পূজা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে ইহারা উৎসব করিয়া থাকে। 'বিনায়গ্‌ঘ' পূজার সময় মাত্র ইহারা নৃত্য করিয়া থাকে। নৃত্যকালে ছোট ছেলেরাই নাচিয়া থাকে।

ব্রত।—বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তিপ্‌রাগণ 'একাদশী' 'জন্মাষ্টমী' 'শিবচতুর্দ্দশী' ও 'রবিব্রত' করিয়া থাকে। একাদশীর দিন বিধবারা রাত্রিতে মাত্র খায়, দিনে কিছুই আহার করে না।

ইহাদিগের স্ত্রীলোকগণ তামাক ও মদ খাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পান ও দোক্তা খুব বেশী খাইয়া থাকে। ইহাদের বিধবাগণ মৎস্যাদি ভোজন করিলে নিন্দার্হ হয় না।

অলঙ্কার।

কর্ণভূষণ—১। ওয়াকুম (কর্ণের নিম্ন দিকে), ২। তৈয়া (কর্ণের উপর দিকে), ৩। ভেরী (ঝুমকা)।

নাকের গহনা—১। কৈলি।

কণ্ঠাভরণ—১। রাংবতাং, ২। হাসলি, ৩। কাঁটি, ৪। মালা (রামকলাগাছের দানা লইয়া প্রস্তুত)।

হস্তাভরণ—১। কাসর (ইহা পিতল বা রূপার তৈরী), ২। চুড়ি (শাঁখার), ৩। ইয়াসিতাম (অঙ্গুরীয়)।

পায়ের গহনা—১। খাড়ু (রূপার)

খেলা—সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যে পুরুষে তাস এবং স্ত্রীলোকে তাস ও সিকুই খেলিয়া থাকে। ছেলেরা লাট্টু খেলে। লাট্টুকে ইহারা চোর বলে। ইহারা চোর-চোর খেলে, ইহাদিগের ভাষায় তাহার নাম 'বুমার বুমা'। এতদ্ভিন্ন 'ঘুটি', (মারবেল) 'জিং' (এক প্রকার দমের খেলা) পাঁই (১৬ ঘরের খেলা), 'হারি' (জলক্রীড়া) 'বুমাকত', 'ডুধু' বালকগণ খেলিয়া থাকে। *

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নীলপাখী

তিলতিল	আগুন
মিতিল	কুকুর
আলো	বিড়াল
রুটী	বাপ
চিনি	মা
জল	বারলিংগট···প্রতিবেশিনী
	বারলিংগটের কন্যা

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিদায়-গ্রহণ

একটী প্রাচীর—তাহাতে একটী ক্ষুদ্র দ্বার। ভোর হইতেছিল।

তিলতিল, মিতিল, আলো, রুটী, জল, চিনি, এবং আগুন প্রবেশ করিল।

আলো। এখন আমরা কোথায়, বুঝতে পাচ্ছ কি?

তিলতিল। না ত।

আলো। এই পাঁচিল আর ওই ছোট্ট দরজা, দেখ দেখি চেয়ে—

তিলতিল। ঐ লাল পাঁচিল আর সবুজ দরজা?

আলো। হ্যাঁ; ও দেখে কিছুই মনে পড়ছে না?

তিলতিল। আমার যেন মনে হচ্ছে সময় আমাদের দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল—

আলো। মানুষগুলো কি বদ হয়ে যায়, যখন তারা স্বপ্ন দেখে। তখন নিজেদের হাতকেও তারা চিনতে পারে না।

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় কোন কোন বিষয়ে বঙ্গদেশের ও ত্রিপুরার 'আদমশুমারি এবং বিবরণাবলী হইতে সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি—লেখক।

তিলতিল। কে স্বপ্ন দেখছে, আমি?

আলো। তুমি কি আমি, কে জানে? ...দেখ, এই পাঁচিলের মধ্যে যে বাড়ী আছে, তা তুমি জন্মে অবধি কতবার যে দেখেছ—

তিলতিল। জন্মে অবধি কতবার দেখেছি?

আলো। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছ।...এটা সেই বাড়ী, যেখান থেকে আমরা একদিন সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছিলুম... ঠিক একবছর আগে।

তিলতিল। একবছর আগে! তাহলে···

আলো। থাম, থাম; ভাঁটার মত চোখ বার করে দেখছ কি?...এটা তোমার নিজেরই ঘর যে—তোমার বাপ-মা এই বাড়ীতেই আছেন।

তিলতিল। অ্যাঁ! তাই না কি!... সত্যিই ত!···এই যে ছোট দরজা!...বাবা মা এইখানেই আছে?..কাছে এসেছি তাহলে।...আমি এখনি যাই, মার কোলে বসে চুমু খাব।

আলো। একটু থাম।...এখন তাঁরা ঘুমুচ্ছেন···হঠাৎ ওঁদের জাগিয়ো না; তা ছাড়া সময় না হওয়া পর্য্যন্ত দরজা খুলবে না।

তিলতিল। সময়!···তাহলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, না?

আলো। না গো না; আর দু'চার মিনিট আছে।

তিলতিল। বাড়ী ফিরে এসে তুমি ভারী খুসী হয়েছ?...এ কি! কি হল তোমার?...অমন ফ্যাঁকাসে হয়ে গেলে কেন?...অসুখ করেছে না কি?

আলো। না, এ কিছু না; মনটা খারাপ হয়েছে।·· তোমাদের এবার ছেড়ে যেতে হবে কি না?

তিলতিল। ছেড়ে যাবে আমাদের?

আলো। হ্যাঁ; এখানে আর আমার কোন কাজ নেই ত। এক বছর পুরো হয়েছে।...পরী এবার তোমার কাছে নীলপাখী নিতে আসবে।

তিলতিল। কিন্তু নীলপাখী ত পাওয়া গেল না!...স্মৃতির দেশে যেটা পেলুম সেটা ত একেবারে কালো রঙের; রাত্রির বাড়ীরগুলো সব মরে গেল; জঙ্গলেরটা ধরতে পারলুম না। যদি মরে যায়, কিম্বা পালিয়ে যায়, কি রঙ বদলায়, তবে কি সে আমার দোষ?...পরী কি বলবে?

আলো। আমাদের সাধ্যমত আমরা করেছি। এখন বোধ হচ্ছে যে, হয় নীলপাখী নেই, না হয় তাকে ধরলে সে রঙ বদলে ফেলে।

তিলতিল। খাঁচাটা কোথায়?

রুটী। এই যে আমার কাছে।... এটা আমার জিম্মায় ছিল। এখন বেড়ানো শেষ হয়েছে—এখন এটা আমি তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।...যেমন অবস্থায় পেয়েছিলুম ঠিক তেমনি অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।... আমার কাজ শেষ হল। এখন জল আগুন চিনি এদের সকলের হয়ে আমি দু'কথা বলতে চাই।

আগুন। না, না; আমার হয়ে কিছু বলতে হবে না, আমার নিজের মুখ আছে।

রুটী। (বাগ্মীর ন্যায় বক্তৃতা জুড়িয়া

দিল) আমাদের সদাশয় শিশু বন্ধু দুটীর কাজ আজ শেষ হয়েছে। এখন আমরা অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খুব ব্যথিত প্রাণে আমাদের প্রিয়তম বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ কচ্ছি, আর সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে...

তিলতিল। কি! তোমরা আমাদের বিদায় দিচ্ছ?...তোমরাও তবে ছেড়ে যাবে না কি?

রুটী। যেতেই হবে।...বাইরে আমরা তোমাদের ছেড়ে যাব।...তোমরা আর আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনতে পাবে না।

আগুন। তাতে আর কি ক্ষতি হবে?

জল। চুপ্ চুপ্, গোল করো না!

আগুন। যখন তুমি কেট্‌লিতে, কুয়োতে, নদীতে, নলে আর ঝরণাতে তোমার বক্‌বকানি-ঢক্‌ঢকানি বন্ধ করবে তখনি আমি চুপ করব।

আলো। (ষষ্ঠি উত্তোলন করিয়া) ব্যস্, ঢের হয়েছে; এখন বিদায়ের সময়, এখনও কি ঝগড়া করবে?

রুটী। (আত্মম্ভরিতার সহিত) আমি ও রকম নই!...আমি বলছিলুম যে তোমরা আর আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পাবে না, কিম্বা আমাদের এই জ্যান্ত শরীরও আর দেখতে পাবে না। জিনিষের মধ্যে যে অদৃশ্য প্রাণ আছে তা তোমরা আর দেখতে পাবে না; কিন্তু আমি সিন্দুকের মধ্যে, টেবিলের উপর, তাকের উপর সর্ব্বদা থাকব। আমার কথা যদি স্পষ্ট বলতে হয় তবে সে এই যে আমি মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু আর তার চির-অনুচর।

আগুন। বাহবা! আর আমি?

আলো। এস, এস, আর সময় নেই ...শীগ্‌গির ঘণ্টা বাজবে, চট্‌পট্ নাও, ছেলেদের চুমু দাও।

আগুন। (বেগে অগ্রসর হইয়া) আমি আগে, আমি আগে। (ছেলেদের চুম্বন করিয়া) বিদায় তিলতিল, বিদায় মিতিল!...আমায় মনে রেখো।...কোন জিনিষে আগুন ধরাতে হলে আমায় স্মরণ করো।

তিলতিল। ওহোহো পুড়িয়ে ফেল্লে!

মিতিল। উঃ, আমার নাকটা ঝল্‌সে দিলে।

আলো। আগুন, তোমার উল্লাস একটু কম কর...মনে রেখো যে তুমি এখন তোমার চিমনির মধ্যে নেই।

জল। আহাম্মক!

রুটী। কি ইত্‌রামি!

আগুন। ঐ দেখ, আমি ঐ চিমনির মধ্যে থাকব।...আমায় ভুলো না। আমি উনুনের মধ্যে আর চিমনির মধ্যে সর্ব্বদা থাকব।...তোমাদের ঠাণ্ডা লাগলে মাঝে মাঝে বাইরে আসব। শীতকালে আমি গরম থাকব আর তোমাদের জন্য বাদাম পুড়িয়ে দেব।

জল। (ধীরে ধীরে ছেলেদের কাছে আসিয়া) আমি তোমাদের শুধু আরাম দেব—যখনই শ্রান্ত হবে, আমায় ডেকো।

আগুন। সাবধান, ভিজিয়ে দেবে।

জল। আমি অমন নীচ নই—তা ছাড়া মানুষকে আমি বড় ভালবাসি।

আগুন। হ্যাঁ, তাই তাদের ডুবিয়ে মার!

জল। নদীর পানে চাইলে, ঝরণার কাছে গেলে আমায় দেখতে পাবে...আমি সেইখানেই থাকব।

আগুন। সমস্ত দেশটা ও বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে।

জল। সন্ধ্যেবেলায় ঝরণার ধারে বসে কান পেতে শুনো, আমি কি বলি, বোঝবার চেষ্টা করো।

আগুন। ঢের হয়েছে...আমি সাঁতার জানি না।

জল। আজ যেমন পষ্ট করে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি তেমন ত আর পারব না; কিন্তু তোমাদের যে কত ভালবাসি, তা নদীর ধারে, ঝরণার পাশে গিয়ে বসলেই বুঝতেই পারবে।...ওহো, আর আমি কথা কইতে পারছি না... আমার চোখ জলে ভরে যাচ্ছে, স্বর বন্ধ হয়ে আসছে।

চিনি। মনের এক কোণে আমার জন্য একটু ঠাঁই রেখো, আর মাঝে মাঝে স্মরণ করো যে আমার সঙ্গে একদিন তোমাদের কি রকম মিষ্ট সম্পর্ক ছিল।... চোখে আমার সহজে জল বেরোয় না। কিন্তু এক ফোঁটা যদি বেরোয় তাহলে আমি একেবারে গলে মরে যাই।

রুটী। হা ভগবান!

তিলতিল। আচ্ছা, টাইলো আর টাইলেট কোথা গেল?...তারা কি করছে?

বিড়ালটাকে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে শুনা গেল।

মিতিল। ঐ যে টাইলেটের চীৎকার! ...কেউ তাকে মারছে।

বিড়ালটা দৌড়িয়া আসিল। তার চুল এলো-মেলো, বেশ ছিন্নভিন্ন। গালে একখানা রুমাল জড়ানো। রাগে সে ফোঁস ফোঁস্ করিতেছিল। কুকুর তাহাকে আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া তাহার উপর অবিশ্রাম লাথি-ঘুষি বর্ষণ করিতেছিল।

কুকুর। কেমন!...আরো চাও?...এই যে, এই নাও।

(প্রহার)

আলো, তিলতিল, মিতিল। (ইহাদের ছাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল) থাম্, থাম্, টাইলো; তুই পাগল হয়েছিস্ নাকি? আবার!...খবরদার বল্‌ছি!...ফের হাত তোলে! যা ওদিকে!

দুজনকে পৃথক করিয়া দিল।

আলো। কি হয়েছে?...অমন মারা-মারি কেন?

বিড়াল। ও-ই ত!...আমার অপমান কল্লে, আমার ল্যাজ ধরে টানলে, আমায় কামড়ালে, শেষ আমার খাবারে ধূলো দিলে।...আমি কিচ্ছু করিনি গো, কিচ্ছু করিনি।

কুকুর। (ভেঙ্গ চাইয়া) আমি কিচ্ছু করিনি গো, কিচ্ছু করিনি।...কিছু ত করেইছ, আরো কিছু করবার চেষ্টায় আছ তুমি।

মিতিল। (বিড়ালকে কোলে তুলিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আহা বেচারী! কোথায় লেগেছে রে? সর্ব্বাঙ্গে? আহা!...মুখপোড়া টাইলো, কেন ওকে অত মারলি বল্ দেখি!

আলো। (কুকুরের প্রতি রুক্ষভাবে) গোড়া থেকে তোমারই অন্যায় দেখছি বাপু!

বিশেষ এ সময়, এখন আমরা ছেলে দুটীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, এ সময় এই রকম বিদিকিচ্ছি ঝগড়া-মারামারি! ভারী বিশ্রী! ছিঃ!

কুকুর। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) ছেলে-দুটীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি কি রকম?

আলো। হ্যাঁ; আমাদের বেড়ানো শেষ হয়েছে—সময়ও শেষ হয়-হয়। আমাদের এখন আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে যেতে হবে; তাই বিদায় নিচ্ছি।...আর আমরা এদের সঙ্গে কথা কইতে পাব না।

কুকুর। (চীৎকার করিয়া তিলতিলের পদতলে আছড়াইয়া পড়িল) না, না; আমি তা পারবো না!...আমি চুপ করব না।...আমি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে কথা কইব।...আমি আর দুষ্টুমি করব না, খুব ঠাণ্ডা হয়ে থাকব।...আমি পড়তে শিখব, লিখতে শিখব, পিয়ানো বাজাতে শিখব, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব। রান্না-ঘর থেকে আর কোন জিনিষ চুরি করে খাব না, অনেক রকম খেলা দেখাব। তোমরা এবারটী আমায় মাপ কর।... বেরালের সঙ্গে আর ঝগড়া করবো না, বল ত ওর সঙ্গে আলাপ করে ফেলি। ওর চুমু খাই?

মিতিল। (বিড়ালের প্রতি) আর টাইলেট্! তোমার কি কিছু বলবার নেই?

বিড়াল। (কপটতার সহিত) আমি তোমাদের দুজনকেই ভালবাসি—তা সে যতখানি ভালবাসা যেতে পারে।

আলো। এস তিলতিল, এস মিতিল, আমি এই শেষবার তোমাদের চুমু নি!

তিলতিল ও মিতিল। (আলোকে জড়াইয়া ধরিয়া) না, না; যেয়ো না! তুমি যেয়ো না! আমাদের বাড়ীতেই থাক তুমি।...বাবা কিছু বলবেন না—মাকে বুঝিয়ে বলব, তুমি আমাদের কত ভালবাস—

আলো। তা যে হতে পারে না ভাই! ...এই ঘরের মধ্যে আর আমাদের এ অবস্থায় ঢোকবার যো নেই।

তিলতিল। কোথায় তাহলে তোমরা যাবে?

আলো। বেশী দূরে নয়! এই কাছেই!...নিস্তব্ধতার দেশে!

তিলতিল। না, না; তোমায় যেতে দেব না।...আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। মাকে আমি বুঝিয়ে বলব।

আলো। কেঁদো না ভাই, কেঁদো না বোন, আমি তোমাদের চোখে চোখে থাকব।...জলের মত আমার গলার স্বর নেই বটে কিন্তু আমার উজ্জ্বলতা আছে, তাইতে আমি কথা কই; তবে মানুষ তা বুঝতে পারে না, এই দুঃখ। মানুষের জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি তার গতিবিধি লক্ষ্য করি।...চাঁদের কিরণ ঝলমল করে, আকাশে নক্ষত্র মিটিমিটি করে, ভোর হয়, আলো জ্বলে,—মনে রেখো, এ-সবে শুধু আমারই ভাষা ফুটে ওঠে —আমি ওদের মধ্য দিয়েই কথা কই আর মানুষের প্রাণকে পুলকিত করি।

বাড়ীর ভিতরে ঘড়িতে আটটা বাজিতে গেল।

ওই শোন, আটটা বাজল।...ওই দরজা খুলছে! ··তবে বিদায়!...আসি ভাই, আসি বোন!...যাও তোমরা ভিতরে যাও!

সে তিলতিল ও মিতিলকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। দরজা বন্ধ হইয়া গেল। কুটী কাঁদিতে লাগিল। চিনি, জল, আগুন প্রভৃতি কাঁদিতে কাঁদিতে দক্ষিণ ও বামদিক দিয়া চলিয়া গেল। কুকুর মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জাগরণ

কাঠুরিয়ার গৃহাভ্যন্তর। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। জানালার ফাঁক দিয়া দিনের আলো আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়াছে। তিলতিল ও মিতিল নিজ নিজ ক্ষুদ্র শয্যায় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

তিলতিলের মা প্রবেশ করিলেন।

মা। (স্নেহ-মিশ্রিত তিরস্কারের স্বরে) ওঠ্ না রে, ও ছেলেরা! আর কত ঘুমুবি তোরা?...ওমা কি ঘেন্না!...এত বেলা হল, আটটা বেজে গেল, গাছপালা রোদে ভোরে উঠল,—এখনও ঘুম!

ছেলেদের বুকের উপর ঝুঁকিয়া আদর-ভরে তাহাদের চুম্বন করিলেন।

আহা, বাছারা আমার!···ছেলে ত নয়, যেন গোলাপ ফুল! (পুনরায় চুম্বন করিলেন) আহা, ছেলে জিনিষ কি মিষ্টি! ওঠ্, ওঠ্, ওরে দুপুর অবধি ঘুমোনো কি?...অসুখ করবে যে!

(তিলতিলকে ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়া)

ওঠ্, ওঠ্, ও তিলতিল!

তিলতিল। (ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল) অ্যাঁ, আলো! কোথায় গেলে ভাই! না, না, যেয়ো না!

মা। আলো যেয়ো না! ও আবার কি কথা! আলোয় চারদিক যে ভরে গেছে! বেলা যেন দুপুর!...দেখ বরং, আমি জানালা খুলছি।

তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দিলেন।

এই দেখ!···কি হয়েছে তোর?... চোখ খুলছিস্ না কেন?

তিলতিল। (চক্ষু রগড়াইয়া) মা, মা, তুমি?

মা। আমিই ত? তুই তবে কে মনে করেছিলি?

তিলতিল। হাঁ, ঠিক; তুমিই ত!

মা। কেন চিনতে পারছিস্ না, না কি?...আমি একরাত্রের মধ্যে বদলে যাইনি ত!

তিলতিল। আঃ, তোমায় দেখে বাঁচ-লুম! কদ্দিন, কদ্দিন পরে আবার তোমার কাছে ফিরে এলুম মা! ও মা একটা চুমু দাও!···আর একটা, আর একটা!...আঃ, আমার বিছানাটী কি নরম!...আবার বাড়ীতে এসেছি!

মা। কি হয়েছে রে?...অমন কচ্ছিস্ কেন?...উঠে বোস্ না?...অসুখ করেছে না কি!...দেখি, তোর জিভ্ দেখি!... নে, চল্, চল্, উঠে কাপড় ছাড়বি চল্!

তিলতিল। বা রে; আমি ত আমার সেই কামিজ পরেই রয়েছি!

মা। হ্যাঁ, পরেই ত রয়েছ!...ওঠ, কোট আর পাজামা পর, ঐ চেয়ারের ওপর রয়েছে।

তিলতিল। ঐ গুলোই কি পরে বেরিয়েছিলুম ?

মা। বেরিয়েছিলি কি রে ? কোথায় আবার গেছলি এর মধ্যে ?

তিলতিল। কেন সেই গেল বছর ?

মা। গেল বছর কি রে ?

তিলতিল। হ্যাঁ, সেই যে বড়দিনের দিন মা !...সেই যে আমি বেরিয়েছিলুম ?

মা। সে কি রে !...ঘর থেকে আবার বেরুলি কখন ?...কাল রাত্রে ঘুমিয়েছিলি ...আর আজ সকালে এসে আমি এই তুলছি !...সমস্ত রাত ধরে তাহলে সব স্বপন দেখেছিলি বুঝি ?

তিলতিল। তুমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না ?...গেল বছর আমি আর মিতিল, পরী, আলো, রুটী, চিনি, জল, আগুন এদের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম না ? আহা ! আলো মা বড্ড ভাল।...জল, আগুন, রুটী এরা কেবলই ঝগড়া করেছে ! ...তুমি রাগ করনি মা ?...তোমার বোধ হয় বড্ড দুঃখু হয়েছিল না মা—আমাদের দেখতে পাওনি বলে ? আচ্ছা, বাবা কি বল্লেন ? কি করি বল ? তাদের কথা ঠেলতে পাল্লুম না।

মা। ওরে, এ সব কি বক্‌ছিস্ ? হয় তোর অসুখ করেছে, না হয় এখনো ঘুম ছাড়েনি।

ধীরে ধীরে নাড়া দিয়া

তিলতিল জাগ্ দেখি, ও তিলতিল !

তিলতিল। মা আমি সত্যি কথাই বলছি।..আমার বোধ হয় তুমিই ঘুমুচ্ছ মা !

মা। আমি ঘুমুচ্ছি কি রে ?...ভোর ছ'টায় উঠে, বাড়ী ঘর পরিষ্কার করে, উনুনে আগুন দিয়ে, তোদের জাগাতে এলুম—

তিলতিল। আচ্ছা, তবে মিতিলকে জিজ্ঞাসা কর, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে ?...আঃ, আমরা কি গোঁয়ার্ত্তুমি করেই সে রাত্রে বেরিয়েছিলুম !

মা। মিতিলকে জিজ্ঞাসা করব কি রে ?

তিলতিল। সেও যে আমাদের সঙ্গে গেছলো।...দেখ মা, ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছিল।

মা। (অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া) ঠাকুর্দ্দা ? ঠাকুমা ?

তিলতিল। হ্যাঁ ; স্মৃতির দেশে তাঁদের দেখে এলুম মা।...আমরা সেই পথ দিয়ে গেছলুম কি না ! তাঁরা মরে গেছেন বটে, কিন্তু খুব ভাল আছেন।...ঠাকুমা আমাদের চমৎকার কুলের চাট্‌নি খেতে দিলেন।...ভাইদের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। বরাট্, জিম্, মাদ্‌লিন, পিয়োট্ পলিন, রিকেট্, সক্কলে সেখানে রয়েছে।

মিতিল। রিকেট্ এখনো চার পায়ে হেঁটে চলে মা।

তিলতিল। পলিনের নাকের উপর এখনো সেই মাংসর ঢিপিটা আছে।

মা। আচ্ছা, দেখ্ তোরা উঠে দাঁড়া ত।...আমার সামনে হেঁটে বেড়া দেখি।

তিলতিল ও মিতিল তাহাই করিল।

নাঃ, তা ত নয় !...তবে কি হবে গো !...এ্যাঁ—হা ভগবান !...তাদের মত এদেরও শেষ হারাব না কি ?

মা ভীত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া তিলতিলের বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন।

ওগো, শীগ্‌গির এদিকে এস, ছেলেদের অসুখ করেছে !...

তিলতিলের পিতা কুঠার হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।

বাবা। কি ? কি হয়েছে ?

তিলতিল ও মিতিল পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল।

তিলতিল ও মিতিল। বাবা, এই যে বাবা ! আমরা এসেছি।...বাবা তোমার হাতে এ বছর কি খুব বেশী কাজ ছিল ?

বাবা। ব্যাপার কি ? ওদের অসুখ করেছে বলে ত বোধ হচ্ছে না ?...বেশ ত সুস্থই দেখছি !

মা। (কাঁদিতে লাগিলেন) তুমি ওদের চোখ দেখে বুঝতে পারবে না।... তারাও ত এমনি ভাল ছিল ; শেষে কি যে হল আর বাছারা আমার পালিয়ে গেল।...কাল রাত্রে যখন শুইয়ে রাখি তখন বেশ ভালই ছিল, আজ সকালে গিয়ে দেখলুম, সব গোলমেলে।...ওরা বলছে কোথাকার কোন্ আলো-কে সঙ্গে করে রাত্রে বেড়াতে গেছলো।...বলছে ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমাকে দেখেছি...তারা মরে গেছে কিন্তু বেশ ভাল আছে। এ সব কি আবোল-তাবোল বকা বাবু ?

তিলতিল। ঠাকুর্দ্দার কিন্তু আজও সেই কাঠের পা আছে।

মিতিল। ঠাকুমা এখনো বাতে ভুগচেন।

মা। শুনচ ? যাও, দৌড়ে যাও, ওগো ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

বাবা। না, না ; কিছু হয় নি ; এই, তোরা এদিকে আয় ত।

বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল।

কে ?...ভিতরে এস।

প্রতিবেশিনী বারলিংগট প্রবেশ করিল। সে দেখিতে অবিকল পরী বেরীলুনের ন্যায় ; বৃদ্ধা এবং ভর দিয়া সে হাঁটিতেছিল।

বারলিংগট। সুপ্রভাত ! আজ বড় দিন। তোমাদের সকলকে বড়দিনের অভিবাদন জানাতে এসেছি।

তিলতিল। এই ত পরী বেরীলুন !

বারলিংগট। বড়দিনে একটু ভাল করে রাঁধব কি না তাই একটু আগুন চাইতে এসেছি।...আজ বড় ঠাণ্ডা।...ওঃ, হাড় যেন কনকনিয়ে দিচ্ছে ! সুপ্রভাত তিলতিল ; সুপ্রভাত মিতিল ; কেমন আছ তোমরা ?

তিলতিল। পরী বেরীলুন, নমস্কার।... আমরা তোমার নীলপাখীর কোন সন্ধান পেলুম না।

বারলিংগট। কি বলছে গা ওরা ?

মা। আমায় বাছা আর জিজ্ঞাসা করো না।...ওরা নিজেরাই জানেনা, কি বলছে। ...আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে অবধি এই রকম কচ্ছে।...কিছু কুপথ্যি করে এমন হয়েছে আর কি !

বারলিংগট। তিলতিল, আমায় চিনতে পারছ না ? আমি যে তোমার বারলিংগট পিসি—চিনতে পারছ না ?

তিলতিল। হ্যাঁ, পারছি চিনতে... আপনি পরী বেরীলুন।—আপনি কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন ?

বারলিংগট। আমি বে—রী—কি বল্লে ?

তিলতিল। বেরীলুন!

বারলিংগট। বারলিংগট?...তাই বল, বারলিংগট।

তিলতিল। বেরীলুন কি বারলিংগট যা খুসি বল...কিন্তু মিতিলও জানে।..

মা। মিতিলটারও এই দশা!

বাবা। থাম, থাম; ভয় নেই।... একটা কি দুটো চড় কসালেই সেরে যাবে।

বারলিংগট। না, না; এ সময় ও রকম করো না।...আমি জানি, কিসে অমন হল।...চাঁদের আলোয় ঘুমিয়েছিল আর কি! তাই ও রকম হয়েছে।... আমার ছোট মেয়েটা গো, যেটা অসুখে ভুগচে, তারও ও রকম হয়।

মা। ভাল কথা; তোমার মেয়েটী এখন কেমন আছে?

বারলিংগট! অমনি আর কি।... উঠতে পারে না।...ডাক্তারে বলে, মাথার ব্যামো।···কিন্তু আমি জানি, কিসে তার রোগ সারবে।...আজ সকালেও সে আমায় বলছিল...তার ধারণা—

মা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তা জানি।··· তিলতিলের ঐ পাখীটি সে চায়।...তিলতিল, দাও না বেচারীকে তোমার সে পাখীটি।

তিলতিল। কি মা?

মা। তোমার সেই পাখীটি!...কোন কাজেই ত সেটা আসে না...তার দিকে একবার চেয়েও ত দেখ না।...আর সে বেচারী ওটির জন্যে অস্থির। দাও ওটী তাকে।

তিলতিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমার পাখীটি!···আচ্ছা কোথায় সেটা এখানে!...এইটেই ত?...এর ভেতর ত দেখছি কেবল একটা পাখীই আছে।... আর গুলোকে বুঝি সে খেয়ে ফেলেছে! ···কিছু আশ্চর্য্য নেই!.. বাঃ রে, এ ত দেখছি নীল রঙের!...কিন্তু এটা ত আমার সেই ঘুঘু। আগেকার চেয়ে আরো নীল হয়েছে!...আমরা এই নীলপাখীই ত চাই!.. এত দূরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, অথচ এটী বাড়ীতেই ত রয়েছে!···কি আশ্চর্য্যি!... মিতিল, দেখ্‌ছ? আলো কি ভাববে বল দেখি?

চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া খাঁচাটা নামাইয়া আনিল এবং বারলিংগটের হস্তে প্রদান করিল।

এই নাও, তোমায় দিলুম। এটা ত নীল না হলেও এতেই চলবে।...তোমার ছোট্ট মেয়েটীকে শীগ্‌গির দাও গিয়ে।

বারলিংগট। সত্যি?...সত্যি আমায় এটা দিলে তাহলে? আহা, বেচারী কত সুখী হবে এখন! বেঁচে থাক বাছারা! ···(তিলতিলের মুখ চুম্বন করিল) আমি যাই...শীগ্‌গির তাকে দিই গে।

তিলতিল। হ্যাঁ শীগ্‌গির যাও।...নীল হলে ওটাও হয়ত আবার রঙ বদলে ফেলবে।

বারলিংগট পাখীটি লইয়া চলিয়া গেল।

তিলতিল। (চারিদিক দেখিয়া) বাবা, মা, বাড়ীটাকে তোমরা এ কি করেছ?... সাজিয়েছ? জিনিষ-পত্তর সব তেমনি আছে, কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাবা। সুন্দর দেখাচ্ছে, তার মানে কি?

তিলতিল। গেল বছর যখন [illegible] ছেড়ে যাই তখন ত এমন ছিল না!.. এখন ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে!

বাবা। গেল বছরে? যখন বাড়ী ছেড়ে যাস্?

তিলতিল। (জানালার কাছে গিয়া) ঐ দেখ জঙ্গল...কত বড়, আর কেমন সুন্দর।···সব যেন নতুন আর চমৎকার!

মিতিল। আমিও—আমিও—

মা। পাগলের মত তোরা আবোল-তাবোল ও কি বক্‌ছিস্?

বাবা। বক্‌তে দাও, বকতে দাও— ওদের কথায় কান দিয়ো না। ওরা খুসীর খেলা খেল্‌ছে।

বাহির দরজায় ঘা দিল

কে? এস, ভিতরে এস।

প্রতিবেশিনী বারলিংগট প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার ছোট মেয়েটী—সে অপূর্ব্ব সুন্দরী। তিলতিলের পাখীটি তার হাতে দিল।

বারলিংগট। আশ্চয্যি ব্যাপার দেখলে? মা। অসম্ভব!···ও হাঁটতে পারে?

বারলিংগট। শুধু হাঁটতে পারা?...ও এখন ছুটতে পারে, লাফাতে পারে, নাচতে পারে।...আমার হাতে পাখীটিকে দেখেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল।...সত্যি এটী তিলতিলের পাখী কি না দেখবার জন্যে জানলার কাছে আলোয় ছুটে এল।... আর তার পর?···তারপর একেবারে রাস্তায়!···যেন পরীর মত উড়ে এল... আমি কি ওর সঙ্গে কদম ফেলে চলতে পারি?

তিলতিল। (মেয়েটীর কাছে গিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া) ওহো, এ যে আলোর মতই অবিকল দেখতে!

মিতিল। একটু ছোট।

রুটীর সিন্দুকের কাছে গিয়া

ও রুটী, কোথায় তুমি? মিতিল, দেখ্‌ছ, এখন কেমন চুপ করে রয়েছে! ...এই যে টাইলো। বাহবা! ও টাইলো, কি রকম লড়াই বেধেছিল মনে আছে? সেই জঙ্গলের মধ্যে?

মিতিল। আর টাইলেট্ কোথায়? সে আমায় চেনে।...কিন্তু কথা কইতে পারবে না!

তিলতিল। রুটী-মশাই, বলি ও রুটী-মশাই!

মাথায় হাত দিয়া

তাইত! সে হীরেও নেই, সে টুপীও নেই!...যাক্ গে আর কি হবে!···এই যে আগুন! ভারি মজার লোক ত ও! জলকে ঠাট্টা করে কেবল রাগাত!

জলের কাছে গিয়া

জল-মশাই, সুপ্রভাত! এখনও কথা কইছে যে কিন্তু আগেকার মত আর কিছু বুঝতে পারছি না।

মিতিল। চিনিকে দেখতে পাচ্ছি না?

তিলতিল। হাঃ হাঃ কি মজা!··· আজ আমি খুব খুসী হয়েছি।

তিলতিল। তা বটে; তবে শীগ্‌গির বাড়বে ত?

বারলিংগট। কি বলছে ওরা?...এখনো কি ঘোর কাটে নি?

মা। অনেকটা ভাল।...কিছু খেলে-দেলেই সেরে যাবে।

বারলিংগট। (মেয়েটীকে তিলতিলের

কাছে আনিয়া) যাও, তিলতিলের সঙ্গে কথা কও, সোনার চাঁদ ছেলে—পাখীটিকে এক কথায় তোমায় দিয়ে দিলে! বেঁচে থাকো বাবা—রাজ্যেশ্বর হও।

তিলতিল সহসা ভীত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেল।

মা। ও আবার কি? ভয় পেলে নাকি?...এস, ওকে চুমু দাও।...তোমার আবার অত লজ্জা হল কবে থেকে?...আর একবার!...আর একবার!...ব্যাপার কি? ...দেখে মনে হচ্ছে তোমার কান্না আসচে!

তিলতিল বালিকাটীকে চুম্বন করিয়া জড়সড় ভাবে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দুইজনে নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পর তিলতিল পাখীটার মাথায় আস্তে এক ঠোক্কর মারিয়া কহিল।

তিলতিল। এটা কি চমৎকার নীল?

বালিকা। হ্যাঁ, এটী পেয়ে আমি ভারি খুসী হয়েছি।

তিলতিল। আমি এর চেয়েও নীল পাখী দেখেছি।...কিন্তু যেগুলো একেবারে নীল, তুমি যা-ই বলনা কেন, তাদের কিন্তু ধরতে পারা যায় না—ধরতে আমরা পারিওনি।

বালিকা। তা যাক্‌গে, এইটীই খুব ভাল।

তিলতিল। ওকে কিছু খাইয়েছ?

বালিকা। না। কি খায় এ?

তিলতিল। যা দেবে।...রুটী, গম, বার্লি, ফড়িং...

বালিকা। সত্যি?...কি করে খায়, বল না?

তিলতিল। কেন, ঠোঁটে করে,—দেখবে?...আচ্ছা দেখাচ্ছি, দাও—

তিলতিল নড়িয়া দাঁড়াইল এবং বালিকার হাত হইতে পাখীটি লইতে গেল। বালিকা তার হাতে পাখীটি দিতে যাইবে এমন সময় আলগা পাইয়া সে উড়িয়া পলাইল। বালিকা কাঁদিয়া উঠিল।

বালিকা। মা, মা; উড়ে পালিয়েছে! ...কি হবে!

তিলতিল। কেঁদো না, ভয় কি? আমি আবার ধরে এনে দেব।

(রঙ্গমঞ্চের সম্মুখস্থ হইয়া দর্শকগণের প্রতি)

আপনারা কেউ ঐ পাখীটিকে যদি ধরতে পারেন, তাহলে দয়া করে আমাদের দেবেন কি?...ওটিকে না পেলে আমাদের ভারি দুঃখ হবে।

যবনিকা

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

জাতীয় জীবনে নৈতিক অবনতি

যে সকল বৃত্তিকে আমরা নৈতিক গুণ বলি সেগুলি জীব-রাজ্যের নিম্নস্তরে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি আদিম মানব-সমাজেও সেগুলি বিরল (১)। নৈতিক গুণগুলি মানব-চিত্তে স্বভাবতঃই অন্তর্নিহিত ছিল, অথবা ক্রম-বিকাশের ফলে আবির্ভূত হইয়াছে,—সে-সকল দার্শনিক তর্ক তুলিবার স্থান ইহা নহে।

(১) Lubbuck—Origin of Civilisation—Charactor and Morals. Ch IX.

তবে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জাতি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের মধ্যেই নৈতিক গুণগুলি অধিকতররূপে বিকাশ পাইয়া উঠিতেছে। আদিম বর্ব্বর মানব-সমাজে নৈতিক গুণ নাই বলিলেই হয়; আর সভ্যতার দিকে যতই তাহারা অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের মধ্যে এই সকল উচ্চতর বৃত্তি পুষ্ট হইয়া উঠে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, সভ্যতার বিকাশের ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যেমন উন্নতি হয়, নৈতিক বৃত্তির তেমন হয় না। সভ্যতার ইতিহাসকার বাকলে বলিয়াছেন যে, চারিত্র-নীতির ক্রমবিকাশ ধরিতে গেলে মানব-সমাজে এ পর্য্যন্ত তাহা বড় বেশী হয় নাই। তাহা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির সময়ে যেমন ছিল, আধুনিক কালেও প্রায় তেমনই রহিয়াছে (২)। কিন্তু আদিম অসভ্য-সমাজের চারিত্রনীতির ধারণা ও সভ্য-সমাজের চারিত্র-নীতির আদর্শে কি বিস্তর প্রভেদ নাই? বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল অসভ্য মানব আছে, তাহাদের সঙ্গে সভ্য-সমাজের তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যায়। নিগ্রো, ফিজিয়ান, জুলু বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদের অপেক্ষা ইংরেজ বা ফরাসীর বুদ্ধিবৃত্তিই যে কেবল বেশী, তাহা নহে, জাতীয় চরিত্রও তাহাদের অনেক উন্নত। আবার বর্ত্তমান সভ্যজাতি-সকলের শৈশব অবস্থাতেও তাহারা নৈতিক গুণে বিশেষ গুণবান ছিল না—সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সেগুলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। ফলতঃ সভ্যতা বলিতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বুঝায় না, তৎসঙ্গে নৈতিক উন্নতিও সূচিত হয়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানব যেমন জ্ঞানের নূতন নূতন আদর্শ লাভ করিয়াছে, সেইসঙ্গে তাহার চারিত্র-নীতির আদর্শও বিচিত্র ও সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিয়াছে—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যখনই কোন জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়াছে, তখনই তাহাদের মধ্যে নৈতিক বৃত্তিরও উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। আবার যখন কোন জাতির অবনতি ঘটিয়াছে, তখনই তাহাদের মধ্যে নৈতিক বৃত্তিরও শিথিলতা দেখা গিয়াছে। প্রখর বুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা, উজ্জ্বল মেধা, ধারণা, শীলতা প্রভৃতি যেমন জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক,—সাহস, সংযম, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ প্রভৃতিও তেমনই। অন্যদিকে বুদ্ধির জড়তা, পল্লবগ্রাহিতা, অদূরদর্শিতা প্রভৃতি যেমন জাতীয় জীবনে অধঃপতনের সূচনা করে,—ভীরুতা, স্বার্থান্ধতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, লোভ, হিংসা প্রভৃতি নীচবৃত্তিও তেমনি ঐ-সকলের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাট রোমের ধ্বংসের প্রাক্কালে, তাহার জাতীয় জীবনে যে নানা দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় সর্ব্বজনবিদিত। ক্ষমতাদৃপ্ত রোম তখন বিলাস-লালসায় হাবুডুবু খাইতেছিল; ফলে তাহার জাতীয় জীবনে অবসাদ, উৎসাহ-

(২) Buckle's History of Civilisation.

হীনতা, কাপুরুষতা প্রভৃতি আসিয়া দেখা দিল। ব্যভিচার অন্তঃপ্রবিষ্ট কীটের ন্যায় তিলে তিলে দেশের ও সমাজের ক্ষয় সাধন করিতেছিল। নারীর সতীত্ব বা পুরুষের সংযম বলিয়া কোন কথাই ছিল না। পারিবারিক পবিত্রতা উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি রোমের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ প্রণয়ী-পরিবর্ত্তনের দ্বারা বৎসর গণনা করিত, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা সমাজের নিত্যসহচর হইয়া উঠিয়াছিল। আর, এইরূপে পৃথিবীবিজয়ী রোম যখন আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিতেছিল, তখনই বর্ব্বর গথেরা আসিয়া তাহার বুকে পাষাণ-ভার চাপাইয়া দিতে পারিয়াছিল। গ্রীস যখন উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিল,—যখন তাহার শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের মহিমা জগৎময় ঘোষিত হইতেছিল, তখন তাহার জাতীয় জীবনে অশেষ সদ্‌গুণেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আবার সেই গ্রীস যখন মাসিদনিয়ার ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্তপ্রায়, তখন তাহার জাতীয় জীবনে অনৈক্য, কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অত্যন্ত সাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, সমসাময়িক সাহিত্যেই তাহার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। যে হিন্দুরাজগণের বীরত্বে চীন, ব্রহ্ম, গান্ধার ও পারস্যের সীমা পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিত, তাঁহারা তখন "মদনোৎসবে" মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, রণক্ষেত্র ছাড়িয়া প্রেয়সীর অঞ্চলেই তাঁহারা স্থায়ী আশ্রয় লইয়াছিলেন; আর শত্রুর অস্ত্ররাশির পরিবর্ত্তে কামিনীদের নয়ন-বাণের সঙ্গেই তাঁহারা বেশী পরিচিত ছিলেন। মেগাস্থিনিস যে জাতির সত্য-প্রিয়তা ও সাধুতার জয়গান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন, তাহাদেরই মধ্যে তখন 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, দেশদ্রোহিতা তখন ভারতের হিন্দুসমাজকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছিল। নবম ও দশম এই দুই শতাব্দী ধরিয়া নীতিবর্জ্জিত ভারতবর্ষ কেবলই যুদ্ধ ও আত্ম-কলহে দুর্ব্বল হইতেছিল। ফলে নববলদৃপ্ত পাঠানেরা যখন ভারতবর্ষের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর তাহাদিগকে বাধা দিবার সামর্থ্য এতবড় ভারতবর্ষে আর-কাহারও ছিল না (৩)। মধ্যযুগে মূর-বিজিত, পরপদানত স্পেনেও আমরা ইহার প্রমাণ পাই (৪)। তৎকালে একদিকে অজ্ঞতা, কুসংস্কারপ্রিয়তা ও জড়তা প্রভৃতি যেমন স্পেনের জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই বিলাসিতা, কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি তাহার মধ্যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। Inquisition নামে ধর্ম্মের অজুহাতে ভীষণ অত্যাচারের প্রথা এই সময়ে স্পেনের মাটীতেই গজাইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক ও মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীদের ব্যভিচার স্পেনে যেমন বীভৎস

(৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের—"বাঙ্গলার ইতিহাস"—১ম ভাগ।
(৪) Buckle—History of Civilisation.

রূপে দেখা দিয়াছিল, এমন আর কোথাও নহে। সর্ব্বোপরি একটা দেশব্যাপী অবসাদ, নৈরাশ্য ও নির্জ্জীবতা এমন ভাবে স্পেনের বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল যে আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও স্পেন তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় নাই। আজও ইউরোপের মধ্যে স্পেনিসরাই সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ জাতি। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙ্গলার নৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তাহার চিত্র রহিয়াছে। আমরা কেবল বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতার কথাই বলিতেছি না। যে প্রতাপাদিত্য স্বদেশরক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বারবার প্রবল-পরাক্রান্ত মোগলের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও যিনি তাঁহার জীবনের ব্রত ছাড়েন নাই, ভারতচন্দ্র তাঁহাকেই অতি নীচভাবে গালাগালি দিয়াছেন এবং বিশ্বাসঘাতক ভবানন্দ ও আততায়ী মানসিংহের উচ্চস্তুতিতে শতমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। শব্দরচনাকুশল ভারতচন্দ্রের যশোগান প্রাচীনেরা যতই করুন, নব্যবাঙ্গালী উক্ত দেশদ্রোহী কবির এই গুরুতর অপরাধ কখনই মার্জ্জনা করিতে পারিবেনা। আর, যে সময়ে কবি দেশদ্রোহিতার জয়গান করিয়াছিলেন, সেই সময়েরই রাজনৈতিকেরা স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

জীবরাজ্যে নিম্নশ্রেণীর জীবদের মধ্যে প্রধানতঃ প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামই আত্ম-রক্ষা ও জাতিরক্ষার উপায়। কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর জীব মানবের সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ খাটে না। প্রতিযোগিতা ও জীবন-সংগ্রাম মানব-সমাজের পক্ষে কিয়ৎ-পরিমাণে প্রয়োজনীয় হইলেও, সহযোগিতা ও প্রেমই এ সমাজের বিশেষত্ব। আর মানব যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ততই তাহার মধ্যে সহযোগিতা ও প্রেমের ক্রিয়া বেশী দেখা যাইবে। যে সামাজিকতা, ধরিতে গেলে, মানবের মধ্যেই প্রথমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, সহযোগিতা ও প্রেমই সেই সামাজিকতার ভিত্তি (৫)। মানবের নৈতিক গুণাবলীও এই সহযোগিতা ও প্রেমের আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নৈতিক গুণাবলী যতই বিকাশ পাইতে থাকিবে, সামাজিকতা ততই দৃঢ়ভিত্তি হইবে, জাতিও ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। এইরূপে জীবতত্ত্বের হিসাবেও নৈতিক গুণাবলী জীবন-যুদ্ধে সফলতার সহায়ক। কেবল প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম নহে—সহযোগিতা ও প্রেমও জাতিরক্ষার প্রধান উপাদান (৬)। নীট্‌শের প্রচারিত তথাকথিত জর্ম্মান "কাল্‌চার" আধুনিক কালে প্রতিযোগিতা ও জীবন-সংগ্রামকেই বড় করিয়া ধরিয়াছে। তাহার ফলে হিংসা, মারামারি, কাড়াকাড়ি, যুদ্ধ, রক্তপাত—এককথায় দানবী শক্তির উন্মাদ লীলাই—জাতীয় উন্নতির চরম পন্থা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বীভৎস আদর্শের পরিণাম যে কি ভীষণ, ইউরোপের

(৫) Gidding's Sociology.
(৬) Kropotkin—Mutual Aid as a factor of Evolution.

বিরাট কুরুক্ষেত্রেই আজ তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু, সত্য অপরাজেয় ও অবিনাশী। সহযোগিতা ও প্রেমই যে মানব-সভ্যতার মূলসূত্র—এই যুদ্ধের ফলে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে,—এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রেম ও সহযোগিতা-মূলক নৈতিক গুণাবলী যে জাতির মধ্যে সম্যক্ বিকশিত হইবে তাহারাই শেষ-পর্য্যন্ত জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবে, আর যাহাদের মধ্যে এই সকল গুণের অভাব থাকিবে, তাহারাই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। একদিকে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি তাহার জাতীয় জীবনের শক্তি ক্রমশঃ অপহরণ করিতে থাকিবে, অন্যদিকে ব্যভিচার, অসংযম, পারিবারিক অপবিত্রতা প্রভৃতির ফলে বর্ণসঙ্কর ও জারজ সন্তান প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া বীজাশুদ্ধি ঘটাইবে এবং তাহার ফলে সমগ্র জাতীয় জীবন রুগ্ন ও দূষিত হইয়া উঠিবে।

আবার, যখন কোন জাতি সজীব এবং নৈতিক বলে বলীয়ান থাকে, তখন তাহার জাতীয় জীবনেরও একটা উন্নত আদর্শ থাকে—আর সেই আদর্শই সমগ্র জাতিকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। কিন্তু যখনই এই নৈতিক বলের হ্রাস হয়, জাতিও তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার ধ্বংস ঘটিতেও বড় বেশী বিলম্ব ঘটে না। প্রাচীন রোমের আদর্শ ছিল—বিধিবদ্ধতা। এই আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়াই রোম বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিল। কিন্তু রোমের জাতীয় জীবনে যখন দুর্নীতির কীট প্রবেশ করিল, তখন এই আদর্শেরও লোপ হইল, সঙ্গে সঙ্গে রোমেরও ধ্বংস ঘটিল। প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ ছিল সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য। উত্তরকালে যখন সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করিল, তখন গ্রীসেরও এই আদর্শচ্যুতি ঘটিল—গ্রীকজাতিও লুপ্ত-প্রায় হইয়া গেল। প্রাচীন ভারতের আর্য্য সমাজ যখন ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শকে উপলব্ধি করিয়াছিল, তখনই তাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান নীতি-ধর্ম্মে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের সাম্য, মৈত্রী ও করুণার মহান আদর্শও ভারত-বর্ষকে নবজীবন দান করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বিচার সন্ন্যাস-প্রচারের ফলে সেই মহান্ আদর্শের অবনতি ঘটিয়াছিল। ইহলোক ও ইহজীবনকে তুচ্ছ করিতে পরামর্শ দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উপদিষ্ট সন্ন্যাস, রাষ্ট্র ও সমাজ হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সমস্ত ভারত-বর্ষকে দুর্ব্বল, বীর্য্যহীন ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তুলিল। আবার সেই কঠোর সন্ন্যাসেরই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষদশায় এমন ঘোরতর দুর্নীতি ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা সমাজে প্রবেশ করে যে, বিষাক্ত জীবদেহের ন্যায় তাহা শীঘ্রই প্রাণহীন হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষযুগের বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি ও তৎপ্রভাবপুষ্ট তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানাদিই তাহার প্রমাণ (১)। মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের যে

(১) শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধধর্ম্ম—নারায়ণ—১৩২২

নৈতিক অধঃপতন ও শোচনীয় দুর্ব্বলতা দেখি, তাহাও ঐ সকলেরই পরিণাম। আধুনিক ইউরোপেও যে উদ্দাম বিলাস, যথেচ্ছাচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বাহুল্য দেখা যাইতেছে, তাহাও বড় আশাপ্রদ নহে। খৃষ্টধর্ম্মের সংযম ও আত্মত্যাগের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই ইউরোপের এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। যদি আধুনিক মহাযুদ্ধের সর্ব্বধ্বংসী অগ্নিতে সেগুলি পুড়িয়া ভস্মসাৎ না হয়, তবে প্রাচীন রোমের ন্যায় আধুনিক ইউরোপের জাতীয় জীবনও শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে।

আধুনিক বাঙ্গলার—তথা ভারতবর্ষের —জাতীয় জীবনে আমরা কি কোন মহৎ আদর্শ অনুভব করিতে পারিতেছি? সহ-যোগিতা ও প্রেমের আদর্শ কি সেখানে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছে? পরার্থপরতা, দেশপ্রেম, আত্মোৎসর্গ, তেজস্বিতা, সংযম ও তিতিক্ষা প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলী কি আমাদের জাতীয় জীবনে পূর্ব্বের চেয়ে বেশী দেখা যাইতেছে? বহুশত বৎসরের অবসাদের পর আজ যখন বিশ্বমানবের সভায় স্থান পাইবার জন্য আমাদের আগ্রহ জন্মিয়াছে, তখন এই হিসাব-নিকাশ আমাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি ও পল্লী-সংস্কার

কিছুদিন হইল, আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাসন-কর্ত্তার সহধর্ম্মিণী লেডী কারমাই-কেলের উৎসাহে দেশীয় শিল্প-সমিতি (Bengal Home Industries Association) নামক একটি সভার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সংশ্রবে নিউমার্কেটের নিকটে একটি বিপণীও খোলা হইয়াছে। শুনিতেছি, প্রতি জেলার সদরে একটি করিয়া এইরূপ বিপণী ও প্রদর্শনী স্থাপন করার চেষ্টা চলিতেছে। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণের যখন পৃষ্ঠপোষকতা আছে, তখন এ চেষ্টা যে নিতান্ত নিষ্ফল হইবে এমন কথা বলা যায় না। পল্লীস্থ সমবায়-সমিতিগুলির যোগে যদি এই সমিতি মফঃস্বল হইতে গৃহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে তৈয়ারীর পর distribution বা যথামূল্যে বিক্রয়ের জন্য আর দেশীয় শিল্পীদিগকে ভাবিতে হয় না। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা পল্লীশিল্পের উন্নতির পক্ষে বড় কম অন্তরায় নহে। এই প্রসঙ্গে উটজশিল্পের একটি সামান্য দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়িতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে মদনপুর ষ্টেশনের নিকটে "জঙ্গল" নামক গ্রামে কয়েকজন মুসলমান বংশখণ্ড-নির্ম্মিত খট্‌খটি নামক তাঁতের সাহায্যে মাছ ধরিবার নানা প্রকার 'ডোর' বা সুতা তৈয়ার করিয়া থাকে। মনে করুন স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণের চেষ্টায় এই ব্যবসায়ের কথা Indian Trades

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

Journal-এ স্থান পাইল এবং 'ডোরের' নানা প্রকার নমুনা সংগৃহীত হইয়া Commercial Museum বা গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ স্থায়ী শিল্প-সংগ্রহাগারে রক্ষিত হইল। কিন্তু Commercial Museum তো দোকান নহে এবং আমাদের দেশীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণও এ-সকল স্থান হইতে কোন রূপ খবর লইতে জানে না, তাই মাছ-ধরার সুতা যাহারা সাধারণতঃ বিক্রয় করিয়া থাকে সে-শ্রেণীর দোকানদারগণের নিকট নমুনা ও দর-দাম প্রভৃতির সংবাদ সহজে পৌছিতে পারে না। এই "ডোর"-নির্ম্মাতাগণের মুখে শুনিয়াছি, তাহারা মুগা ও রেশম ফরাস-ডাঙ্গা হইতে কিনিয়া আনে এবং নিজেদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে সুতা প্রস্তুত হইলে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহা বিক্রয়ের চেষ্টা করে।

ভাল "ডোর" পাইলে অনেক মৎস্য-শিকারী উপযুক্ত মূল্য দিতে অনিচ্ছুক নহেন, কিন্তু বিক্রেতা যদি স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে অল্প মূলধনে এরূপ ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে। জেলাস্থ শিল্পসমিতি যদি এই সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ভার লন এবং সমবায়-সংবদ্ধ হইয়া যদি এই শ্রেণীর গ্রাম্য শিল্পীরা একত্রে বহুল পরিমাণ কাঁচা মাল খরিদ করিতে পারে, তাহা হইলে সময় ও অর্থের অপব্যয় বহু পরিমাণে বাঁচিয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থায় আরও একটা সুবিধার সম্ভাবনা। বিক্রয়ের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে না হইলে যখন মাঠে আবাদের কাজ থাকে না, গ্রামের চাষী লোকেরাও তখন নিজেদের গৃহে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় অপর শিল্পীগণের সহিত একত্রে সেই অবসর-সময়েও কিঞ্চিৎ উপর্জ্জন করিতে পারে। ফলে কোন জেলা বা উপবিভাগের বিভিন্ন অংশে এই জাতীয় ব্যবসায়ের এক একটি কেন্দ্র সংস্থাপিত হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য তৈয়ারী মাল শিল্প-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট না দিয়া ব্যবসায়ীদিগের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহাতে লাভের কিয়দংশ মাঝের লোকের হস্তগত হওয়া অনিবার্য্য। হাতে-তৈয়ারী দ্রব্য কলের জিনিসের সহিত প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করিতে হইলে লাভ খুব অল্পই থাকে সুতরাং শিল্পীর জীবিকা-সংস্থানের দিকেও দৃষ্টি না রাখিলে চলে না।

আজকাল পল্লীগ্রামে যা-একটু ভাল অবস্থা দেখা যায় তা পাইকার মহাজন-শ্রেণীর। চাষীদিগকে পূর্ব্ব হইতে 'দাদন' দিয়া ইহারা একটা নির্দ্ধারিত দরে পাট, রেশম বা তামাক ক্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাই আবার উচ্চমূল্যে সহরের মহাজনদিগকে সরবরাহ করিয়া নিজেরা মাঝ হইতে দুপয়সা রোজগার করিয়া লয়। যদি কৃষকেরা কার্য্যসাধক "সংহতি" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক-একটি কৃষি-সমবায়-সমিতি স্থাপন করে, তাহা হইলে উক্ত সমিতির নিকট সস্তা সুদে ঋণ লইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাড়ের গুঁড়া * প্রভৃতি

* কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ হাড়ের গুঁড়ার ব্যবহার চালাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে গুঁড়া জোগাইয়া পরে দাম লইতেও আপত্তি নাই। কিন্তু অর্থাভাবে চাষীরা খরচে রাজি নহে এবং শিক্ষাগুণে নূতন যাহা-কিছু তাহাই তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

তেজালো সার-প্রয়োগে ফসলের পরিমাণ যেমন বাড়াইতে পারে, তেমনই আবার দাদনের দায় এড়াইয়া তৈয়ারী ফসল (distribute)-সমবায়-সমিতির সাহায্যে সহরে পাঠাইয়া সময়মত বিক্রয় করিতে পারিলে উপযুক্ত লভ্যাংশ হইতেও বঞ্চিত হয় না। Intensive cultivation বা কৃষিকার্য্যে অধিক মূলধন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী-প্রয়োগ এরূপ সমবায়-সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের দেশে কোনকালেই ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে যে লাভ পাইকারের কবলে যাইত, এ প্রণালী অবলম্বন করিলে শেষে তাহা চাষীদের হাতেই থাকিয়া যাইবে। বঙ্গদেশে মফঃস্বলের অনেকস্থানে Raffeisen (রাফি-সেন)-এর প্রণালীতে কো-অপারেটিভ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু সেগুলির কাজ টাকা কর্জ্জ দেওয়া মাত্র। এরূপ কাটতির সাহায্য করা সেগুলির উদ্দেশ্য নয়। পাশ্চাত্য দেশে যৌথ-ঋণ-দান-সমিতির সহিত যৌথ-বিক্রয়-সমিতির মিলন থাকায় কৃষকগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের চমৎকার সুযোগ ঘটিয়াছে।

সমবায় বিক্রয় অর্থাৎ যৌথ কাটতির ব্যবস্থা হইলে অন্যান্য বিষয়েও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে পারে—যথা Dairy farming বা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন। কারখানায় অন্যান্য কারবারের অপেক্ষা এ ব্যবসায়টির কৃষিকার্য্যের সহিতই সাদৃশ্য অধিক। অল্পদিন হইল ঢাকার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়া বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুর সমবায়-প্রথায় প্রতিষ্ঠিত কোন একটি Dairy firm পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এই যে ভেজাল ঘৃত লইয়া আজ গোলমাল চলিতেছে, তাহা শুধু দুই-একজন ধনী ব্যক্তি গোয়াবাগান হইতে দুই-একটি দুগ্ধবতী গাভী কিনিয়া ঘরে পুষিলেই মিটিয়া যাইবে না। দেশে যে পরিমাণ ঘৃতের প্রয়োজন, তাহা যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে ভেজাল গুপ্তভাবে চলিতে থাকিবে বলিয়া ভয় হয়। ইহার একমাত্র উপায়, সমবায় নীতি-অবলম্বনে উৎকৃষ্ট গাভী প্রভৃতি আনাইয়া দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে যৌথ-কারবার স্থাপন করিয়া—দুগ্ধ-জাত দ্রব্যাদি তৈয়ারী ও তাহার সংরক্ষণে বৈজ্ঞানিক বিধির যথারীতি প্রয়োগ। সুলেখক রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর গল্পচ্ছলে সময়ে সময়ে যে সকল উপাদেয় উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার মধ্যে কোনও ম্যালেরিয়াদিগ্ধ পল্লীতে এইরূপ একটি Co-operative dairy স্থাপনের হাস্যোজ্জ্বল চিত্র অনেকেরই স্মরণপথে উদিত হইবে। এ ক্ষেত্রে কবিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে কোনও বাধা নাই এবং যতদিন না হয় ততদিন এই ভেজালের অসুবিধা অল্প-বিস্তর ভোগ করিতেই হইবে বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্যের যুগে Dairy farming অজ্ঞাত ছিল না। তখন সরকার হইতে রাজভৃত্যগণের দ্বারা কিম্বা গোরক্ষক আভীর-গণকে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির অংশ দিয়া এ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা হইতই। সে সঙ্গে

গোজাতির বংশোন্নতির দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। Vide foot note (ক)। সমবায়-প্রণালীতে organized বা ব্যবস্থাপিত না হইলে পল্লীর গোপগৃহে উদ্বৃত্ত দুগ্ধ হইতে যে কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার সামান্য অংশও সহরে আসিয়া পৌঁছিবে কিনা সন্দেহ এবং পৌঁছিলেও টানের খুব সামান্য অংশই পূরণ করা চলিবে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ, শুধু কলিকাতায় প্রত্যহ আটশত মন ঘৃত খরচ হইয়া থাকে। ১৯১২ সালের যৌথ সমিতির আইন-অনুসারে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকায় এখন আর কোন অসুবিধা নাই। ইউরোপে কিরূপ অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই দৃষ্ট হইবে।

যৌথ ঋণদান—যৌথ সরবরাহ—যৌথ উৎপাদন
(সাধারণত দুগ্ধজাত দ্রব্য)

আয়রল্যাণ্ড	১৮৯৫ খৃঃঅঃ	১৮৯০ খৃঃঅঃ	১৮৮৯ খৃঃঅঃ
ইংল্যাণ্ড	——	১৯০০ খৃঃঅঃ	১৯০০ খৃঃঅঃ
সুইজারল্যাণ্ড	১৮৯০ খৃঃঅঃ	১৮৮৬ খৃঃঅঃ	——
ফ্রান্স	১৮৮৫ খৃঃঅঃ	১৮৮৪ খৃঃঅঃ	——

(Vide Foundations of Indian Economics. p. 434.)

আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে যে-সকল ধর্ম্মগোলা সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা এই co-operative শ্রেণীর অনুষ্ঠান বটে—কিন্তু ইহাতে কিছু অসুবিধাও দেখা যায়। বহুদিন ধরিয়া শস্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিলে আমাদের দেশের জল-বায়ুর প্রভাবে তাহা কতকাংশে নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

এ দেশেও যৌথ মতের ক্রমেই প্রসার হইতেছে; কারণ এ দেশের চাষীরাও এক জোটে কাজ করিতে অনভ্যস্ত নহে। কুষ্টিয়া অঞ্চলে দেখিয়াছি এক এক পল্লীর চাষীরা দলবদ্ধ হইয়া স্থানীয় সাহেব কোম্পানির কুঠী হইতে আখমাড়া কল ভাড়া করিয়া লয় এবং কার্য্য-শেষে ভাগে ভাগি করিয়া দেয়-টাকা চুকাইয়া দিয়া থাকে। বড় বড় কড়াই প্রভৃতি লোহার সরঞ্জামও এইরূপ একত্রে ভাড়া লওয়ার প্রথা আছে। কিন্তু ঋণ বা লোকসান সম্বন্ধে লেখাপড়ার মধ্যে পরস্পরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলেই অল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর কৃষকেরা প্রায়ই ভয় পাইয়া থাকে। মফঃস্বলে সমবায়-সমিতি স্থাপন কালে এই লইয়া অনেক সময় ধুরন্ধর গণকে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। একেই বিধি-উপবিধিগুলি অশিক্ষিত লোকের নিকট একটু জটিল বলিয়া বোধ হইবার কথা, তাহার উপর আবার ব্যক্তিগতভাবে

(ক) "In Kautilya's time dairy-farming was undertaken by the State in one of the two ways—either the State farms were directly worked by the Government Department or with the help of herdsmen for a share of the produce. Cattle breeding also engaged the attention of the State." Dr. P. N. Banerji. Public Administration in Ancient India. P. 253.

সকলেরই অসীম বা অনির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব (unlimited liability),—সুতরাং গ্রামের দুই-একজন লেখাপড়া-জানা সচ্চরিত্র ও অবস্থাপন্ন লোক মাথা দিয়া না দাঁড়াইলে এরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। একবার কিন্তু ইহার সুবিধা বুঝিলে সমিতির সভ্যগণ নিজেরাই এ তত্ত্ব-প্রচারে সহায়তা করিতে থাকিবেন, তখন দেখাদেখি নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে এরূপ সমিতি স্থাপনে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। যে সকল কেন্দ্র-সমিতি আছে, সাধারণত সেই গুলিই গ্রাম্য ব্যাঙ্কের টাকা সরবরাহ করিয়া থাকে। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা যদি সমিতিতে টাকা খাটায়, তাহা হইলে উহার কার্য্যের প্রসার আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ হাড়ভাঙ্গা সুদ ত সমিতির নিকট আদায় করা চলে না, তাই মহাজনেরা এ সমিতিগুলিকে সুনজরে দেখে না। ফরাসী দেশে ও বেলজিয়ম প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত—credit foncier নামক কতকগুলি ব্যাঙ্ক আছে। এ গুলিতে জমিজমা বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া যায় এবং সুদ লাভের উদ্দেশ্যে টাকা লগ্নি করাও চলে। আমাদের দেশে ইউনিয়নে গ্রামে গ্রামে বা দুই তিনটি নিকটস্থ গ্রাম লইয়া—সমবায়; ভিত্তিমূলে এইরূপ এক একটি যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে চাষীরাও মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার পায় এবং গ্রাম্য গৃহস্থগণও তাহাদিগের অল্প-স্বল্প সঞ্চিত টাকা—গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতার কথা অবগত হইলে সহজেই এই সকল ব্যাঙ্কে সুদে খাটাইবার উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রাখিতে পারে। চিরাগত উপায়ের পথ বন্ধ দেখিলে মহাজনেরাও তাহাদের মূলধনে লাভ-জনক নূতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানার পত্তন করিতে পারে।

অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য যে কত প্রয়োজন, তাহা ওয়েডারবার্ণ ও মহামতি রাণাডে-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বহুপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই চাষীগণকে কৃষিকার্য্যের জন্য কর্জ্জ দেওয়ার পদ্ধতি আছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তিনি ঋণের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ অধিক লইয়া কৃষকগণকে দয়াপরবশ হইয়া সাহায্য করিয়া থাকেন কি না? (সভাপর্ব্ব ৫ম) (Vide Dr. P. N. Banerjee. Public Administration in Ancient India. Chap. XVIII. P.257. চাষীদিগের সুবিধার জন্য প্রয়োজন হইলেই গবর্ণমেণ্ট ও "তাগাবী" প্রণালীতে টাকা ধার দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় জন কৃষক এক জোটে সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে—এই টাকা খুব সামান্য সুদে ধার লয়। তাহাদের সুবিধার জন্য সরকারের কর্ম্ম-চারীগণ অনেক সময় গ্রামে গিয়াই এই সব টাকা বিলি করিয়া আসেন এবং কিস্তিমত—ফসল-কাটার পর—গ্রামে গ্রামে গিয়া এই সকল টাকা আদায় করেন। ইহাতে দরিদ্র কৃষকদিগের যে কতদূর সুবিধা হয় তাহা আর বলিবার নয়।

গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে এই টাকা কর্জ্জ করার সুযোগ লোকে তাগাবী প্রথার ন্যায় গ্রামে বসিয়াই পাইতে পারিবে। নব-প্রতিষ্ঠিত সার্কেল প্রথায় এ সকল ব্যাঙ্কের আদায়-তহশিল ও হিসাবাদি-পরিদর্শনের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় না। উপস্থিত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ এই সকল ব্যাঙ্ক মফঃস্বল-ভ্রমণের সময় পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপদেশ-ক্রমে সার্কেল-অফিসারগণ নিজ নিজ সার্কেলের যৌথ সমিতিগুলির প্রতি সহজেই দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে প্রাথমিক স্কুলে "জমিদারী মহাজনী" শিক্ষা দেওয়া হইত; এখনও বোধ হয় এরূপ কোন পুস্তক নিম্নপ্রাথমিক পাঠ্যের তালিকাভুক্ত আছে। জমিদারী মহাজনীর সহিত যদি সমবায়-প্রথা ও যৌথ-সমিতির হিসাবাদি-রক্ষণ সম্বন্ধে কৃষক ও গ্রাম্য ব্যবসায়ীগণের সন্তানেরা বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পায়, তাহা হইলে পল্লীতে পল্লীতে কো-অপারেটিভ মত-প্রচার সহজ-সাধ্য হইয়া উঠে। শুনিয়াছি, কো-অপারেটিভ-সমিতি সমূহের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জে, এম, মিত্র মহোদয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কি কারণে এ বিষয়টি স্থগিত আছে, তাহা জানিতে পারি নাই। শিক্ষাবিভাগ হইতে এ সম্বন্ধে কোন আদেশ প্রচার হইতে বিলম্ব ঘটিলেও শিক্ষিত গ্রামবাসীগণ ও গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগকে যৌথ-সমিতির নিয়মাবলী বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের সহানুভূতি উদ্রেক করা যাইতে পারে। শুধু যৌথ-সমিতি বলিয়া নহে, পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি-ব্যাপারেও গ্রাম্য পাঠশালা হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানে স্থানে পলু পোষা (cocoon rearing) এবং লাক্ষা (lac) বা "লাহার" আবাদ আছে। জেলার যে অংশে পলু পোষা হইয়া থাকে সে অংশের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যদি grasserie, flacherie প্রভৃতি রেশম কীটের রোগের কথা সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে এই পতনোন্মুখ ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট সহায্য হয়। সেইরূপ আবার উক্ত জেলার উত্তরাংশে ধুলিয়ান, নিমতিতা অঞ্চলের লাক্ বা লাক্ষা-আবাদকারী কৃষকেরা যদি বাল্যকালে পাঠশালা হইতেই জানিতে পারে যে কুলগাছ ব্যতীত বাবলা ও অড়হর গাছেও লাক্ষার আবাদ চলিতে পারে—তাহা হইলে এ ব্যবসায়ের আরও অধিক প্রসার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সকল বিভিন্ন স্থানীয় অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আজ-কাল কোন কোন চিন্তাশীল অর্থতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন যে যেখানে যে প্রকার গ্রাম্য ব্যবসায় চলিত আছে, সেখানে সেই সেই ব্যবসায়-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী স্কুলই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত —"জাতি বিদ্যালয়" বা caste schools-এর পক্ষপাতী, কিন্তু তাহা অপেক্ষা জাতি-নির্ব্বিশেষে এইরূপ "শিল্প-বিদ্যালয়" (craft schools) স্থাপিত হওয়াই উচিত

বলিয়া মনে হয়। মুর্শিদাবাদে কারুকার্য্য-খচিত রেশমী বস্ত্র-বয়নোপযোগী তাঁত-নির্ম্মাণে যে সর্ব্বাপেক্ষা কারিগরী দেখাইয়াছিল সেই দুবরাজ জাতিতে "চামার" ছিল —তন্তুবায় নহে। কর্ত্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্কুল অনুমোদিত হইলে গ্রাম্য যৌথ-সমিতির লভ্যাংশ হইতে ইহার সাহায্য অনায়াসেই চলিতে পারে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে স্কুল হাসপাতাল প্রভৃতি সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানের উন্নতি-কল্পে যৌথ ব্যাঙ্কের লাভের নির্দ্দিষ্ট অংশ নিয়োজিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহা খুব অধিক না হইলেও নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবার নহে। গ্রামের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ যত অধিক হইবে এই সকল হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য দানের নির্দ্দিষ্ট অংশও সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে। এখন অনেক মহানুভব ব্যক্তি জীবন-সায়াহ্নে চরম-পত্রের দ্বারা (will) কষ্ট-সঞ্চিত বিত্ত হইতে নিজ নিজ গ্রামে চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছেন। থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে চাঁদা উঠাইয়া এবং চৌকিদারী পড়তার (assessment) উপর দুই তিন পয়সা হিসাবে স্বেচ্ছাদত্ত মাসিক দান সংগ্রহ করিয়াও যে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিকিৎসালয় চলিতে পারে, তাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং জেলা বোর্ড ও যৌথ সমিতির সাহায্য পাইলে এইরূপ পল্লী-পরিচালিত গ্রাম্য দাতব্য ডিস্‌পেনসারী কালে সংখ্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া রোগক্লিষ্ট গ্রামবাসীগণের যে যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, দীক্ষা, রোগ-নিবারণ, রাস্তা-ঘাটের ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া পল্লীর উন্নতি সংসাধিত হইতে থাকিবে। গ্রাম-ত্যাগী ভদ্রলোকেরাও সহরে আহার ও বাসস্থানের ব্যয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ কতকাংশে পুনরায় পল্লী-জননীর অঙ্কেই ফিরিয়া আসিবেন। গ্রামের রাস্তা-ঘাটের অবস্থা স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের উন্নতির উপর কি পরিমাণে নির্ভর করে তাহা অনেক স্থলেই চোখে দেখিয়াছি। যে স্থান হইতে ঘন ঘন মাল চালান দেওয়ার আবশ্যক থাকে, সেখানকার লোকেরা রাস্তায় পুল, পথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও মেরামতের উপর যথেষ্ট লক্ষ্য রাখে। কাদায় পাটের গাড়ী বসিয়া গিয়া উপযুক্ত সময়ে রেল ষ্টেশনে মাল পৌঁছিবার অসুবিধা ঘটিলে গ্রামবাসী ব্যবসায়ীগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চাঁদা তুলিয়া প্রয়োজনীয় পূর্ত্তকার্য্যের জন্য উক্ত টাকা জেলা বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে, সে জন্য আর কোন অনুরোধ-উপরোধের প্রয়োজন হয় না।

আধুনিক পল্লীগুলি আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। স্যর্ চার্লস মেটকাফ্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ধারার চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা আজকালকার দিনে কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এখন বাহির হইতে জিনিস-পত্র আমদানি না হইলে পল্লীর

অশন-বসনের সংস্থান হয় না এবং পল্লীজাত সামগ্রীও ভিন্ন স্থানে নীত না হইলে সেই সকল স্থানের অভাব পূরণ হয় না। পল্লীর সহিত বিশ্ব-জগতের যে অঙ্গাঙ্গীন যোগের কথা আমরা জানিতে পারিতেছি—সেই যোগের প্রধান উপকরণ—সভ্যতার শিরা-উপশিরা স্থানীয় রাস্তা প্রভৃতির সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

যৌথ ব্যাঙ্ক, গ্রাম্যশিল্পের কারখানা ও বিভিন্ন গ্রাম্য ব্যবসায় যতই বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য রেশমকীট-পালন প্রভৃতির যতই উন্নতি হইতে থাকিবে, প্রচুর উৎপন্ন দ্রব্যাদি-বহনের জন্য রাস্তা ও খালের উন্নতির দিকে ততই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখন যে সকল মরা নদী নানাবিধ জলজ উদ্ভিদে বোঝাই হইয়া অস্বাস্থ্যের আকর হইয়া রহিয়াছে রাজা প্রজার সমবেত চেষ্টায় সেগুলি ক্ষুদ্র নৌকা-গমনাগমনের উপযোগী খালে পরিণত হইতে পারিবে। যশোহর ও নদীয়ার ড্রেনেজ বিভাগে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, পরে হয়ত সেগুলি সুবিধামত কাজে লাগান যাইবে। সার্কেল প্রথার বহুল প্রচলনের সহিত যখন সার্কেল বোর্ড (Circle Boards), ও ইউনিয়ন কমিটি (Union Committee) দেশময় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, তখন গ্রামবাসী-দের স্বেচ্ছাদত্ত চাঁদা, ধনী মহাজনদিগের দান, ইউনিয়ন কমিটির ধার্য্য ট্যাক্সের আদায়ী টাকা ও জেলা-বোর্ডের সাহায্য হইতে রাস্তা-ঘাট ও গমনাগমনের সুবিধা-অসুবিধা-বিষয়ক অনেক পল্লী-প্রশ্নের সমাধান হইবে। স্থানীয় শিল্পানুযায়ী শিল্পবিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এই সকল যৌথ ব্যাঙ্কের সাহায্যে, গ্রামবাসীগণের চাঁদা ও সরকারের বৃত্তি পাইয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। বিস্তার সহিত লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে; গৃহ-সন্নিহিত সার গাদা বা আবর্জ্জনার স্তূপ এবং পচা পানা ও water hyacinth বোঝাই ডোবাগুলি আর সেরূপ দুর্গন্ধ বিস্তার করিবে না; লোকের বহুকালের জড়তাও ক্রমে কাটিয়া যাইবে। এখন সরকার বা জেলা-বোর্ডের কিম্বা কোন ধনী দাতার পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তি কূপ-প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ণয় করিতে আসিয়া মাল-মসলা আনয়ন সম্বন্ধে গ্রামবাসীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলে অনেকে উহা সে ব্যক্তির নিজের গরজ বলিয়াই মনে করে। কোন গ্রামে গিয়া শুনিয়াছি যে পল্লী-মধ্যস্থ একটি অনতি-বৃহৎ ডোবায় পর-পর তিনটি শিশু জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তথাপি গ্রাম-বাসীরা ডোবাটি ভরাট করা বা উহার চারি-দিকে কোনরূপ বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে নাই। পল্লীবাসীর এই জড়তা-প্রসূত কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-হীনতা বৈষয়িক অনুক্রমে বহির্জগতের কর্ম্মস্রোতের সংস্পর্শে আসিলে আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইতে থাকিবে। ক্রমশঃ অনাবশ্যক জঙ্গল কাটিয়া পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটাগুলি নানরূপ আনাজ-তরকারী উৎ-পাদনের জন্য ব্যবহৃত হইবে। একত্রে সার্কেল বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটি ও গ্রাম্য ব্যাঙ্কে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইলে লোকে

ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গ্রাম্য দলাদলি বিস্মৃত হইয়া হিতকর সাধারণ স্বার্থের দিকে মন দিতে শিখিবে। আইন-মতে যে সকল সামান্য মকর্দ্দমা মিটাইয়া দেওয়া যায়, সেগুলি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ও সার্কেল অফিসার এবং সমবায়-সমিতি ও ইউনিয়ন-কমিটির সভ্য-গণের সাহায্যে যথাসম্ভব মিটিয়া গেলে অনেক সম্পন্ন গ্রামবাসীর অর্থ অসদ্ব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়া লাভজনক অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈষয়িক উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সমবায় প্রথা-অবলম্বনে বিবিধ যৌথ অনুষ্ঠান-স্থাপনে যত্নবান হইতে হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার তাঁহার অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের মুখবন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন যে কবে কি শিল্প কিসে নষ্ট হইয়াছিল, শুধু তাহারই আলোচনা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কিম্বা সমবায় নীতি ও স্বেচ্ছা-প্রসূত উত্তম পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা-প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিলে আইরীস জাতীয়-জীবনের খারাপ দিকটাই আমাদের দেশে উদ্ভূত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

শাক্ত-সাহিত্য

বৈষ্ণব-যুগের পরবর্ত্তী কবিরাও দৈব পাশ একেবারে ছিন্ন করিতে পারেন নাই; দৈব সম্পর্ক তখনও গ্রন্থের একটা বিশেষ অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশে দেবতার কিছু না কিছু হাত থাকিবেই, নহিলে গ্রন্থের অঙ্গ-হানি ঘটিত। বৈষ্ণব-কবি শ্যামের প্রেমেই বিভোর, কানু বিনা অন্য কোন গীত গায়িবার তাঁহার অবসরই ছিল না। শ্যাম মানুষ হইলেও দেবতা; গোপরাজপুত্র হইয়াও তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর। বৈষ্ণব-সাহিত্য তাঁহারই লীলা-সঙ্গীত। সেই লীলা কেবল মানবীয় প্রাকৃত ঘটনাচক্রেই আবদ্ধ নহে, ইহাতে দৈব অতি-প্রাকৃতের সন্নিবেশও বহুল বিদ্যমান। শিশু শ্যাম ক্ষণমাত্রেই যুবত্ব লাভ করিতে পারেন, দৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেও ইচ্ছামাত্রেই অদৃশ্য হন, চুরি করিয়া নবনী খাইতে খাইতেই মুখ-ব্যাদানে উদরমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করেন।

এই অতি-প্রাকৃতের ব্যাখ্যা যাহাই হউক, এই দেব শ্যামেরই মুরলীর আহ্বানে বৈষ্ণব কবির সুপ্ত বীণা জাগিয়াছিল। সেই বীণা বাজাইয়া কবি কখনও গোপ-কুলের দ্বারে দ্বারে শিশুর মত খেলিয়াছেন, কখনও রাখালের সঙ্গে রাখালবেশে মাঠে মাঠে ধেনু চরাইয়াছেন, আবার কখনও-বা ক্রীড়ারতা গোপাঙ্গনার নূপুর-শিঞ্জিতের

তালে তমালের কুঞ্জে কুঞ্জে নাচিয়াছেন। তাঁহার কাব্যচিত্রে মানব-হৃদয়ের ভাব-বৈচিত্র্য অঙ্কিত হইয়াছে বটে, বাৎসল্য, সখ্য, প্রণয়, সুখ, দুঃখ, অভিমান কবির তুলিকায় অতি পরিস্ফুটরূপেই দেখা দিয়াছে কিন্তু এই চিত্রের কেন্দ্রস্থলে যিনি বিরাজমান, যাঁহাকে বেড়িয়া এই মানুষী বৃত্তিসমূহ বিকশিত ও বিবর্দ্ধিত, তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ দেবতা।

এইরূপ দৈব-সাহচর্য্যে পরবর্ত্তী কবিরাও কাব্য রচিয়াছেন। তবে এখানে পালা উল্‌টাইয়া গিয়াছে। শ্যামের স্থলে শ্যামাই বেশী করিয়া দেখা দিয়াছেন। তাই এখানে যমুনার জল-কল্লোলের পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে রণাঙ্গনের কোলাহলই শুনিতে পাই, বংশীগুঞ্জনের পরিবর্ত্তে অসির ঝনঝনাই ধ্বনিয়া উঠিয়া থাকে, ললিত নর্ত্তনের স্থলে ভৈরব তাণ্ডবই দেখা যায়। কিন্তু বৈষ্ণব কবির কাব্য আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত যেরূপ কল্লোল ও সঙ্গীতেই ভরপুর, পরবর্ত্তী শাক্ত কাব্যে ভীমার রণলীলা তদ্রূপ অবিরাম নহে। অবিরাম হয় নাই বলিয়াই রক্ষা; নহিলে বাঙ্গালী পাঠকের প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়িত। মুরলী-ধ্বনি সকল সময়েই মধুর, যদি-বা কখন ততটা ভাল নাও লাগে, তবু শুনিতে বড় কষ্ট হয় না। কিন্তু রণাঙ্গনের অবিরাম রণ-নির্ঘোষে শুধু বাঙ্গালীর কেন, সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। শ্যামাভক্ত কবিবৃন্দ শ্যামাকে নিয়ত রণ-সাজে না নাচাইয়া ভালই করিয়াছেন। সেরূপ করিলে অতটা বীররস হয় তো পাঠক হজম করিতেই পারিত না, আবার লেখকের লেখনীও যে গ্রন্থের মাঝামাঝি শুকাইয়া না যাইত, তাহারই-বা ঠিক কি!

তবেই দেখা যাইতেছে যে, পরবর্ত্তী কাব্যে দেবতা আছেন বটে, কিন্তু সে দেবতা বৈষ্ণবের দেবতার মত সর্ব্বগ্রাসী নহেন। কাব্যের সমস্তটা তিনি অধিকার করিয়া বসেন নাই। ইহাতে লাভ ও ক্ষতি দুইটাই লক্ষ্য করিবার মত। কাব্যের লাভ এইটুকু যে, ইহাতে বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে। ইহা অল্প লাভ নয়। মধু মিষ্ট হইলেও দিন-রাত কেহ তাই বলিয়া মৌচাক মুখে করিয়া থাকিতে পারেন না—যাঁহারা পারেন, জয়দেব তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন। বঙ্গের একজন আধুনিক কবি তাঁহার মধু-চক্র হইতে গৌড়জনের জন্য নিরবধি মধু পানের ব্যবস্থা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সে মধু জয়দেব-জাতীয় নহে; তাহা শুধু কালিন্দীতটবর্ত্তী কুসুম-কুঞ্জ হইতেই আহরিত হয় নাই। তাহাতে দেশী ও বিলাতী, মিঠে ও কড়া দুই আছে। শুধু খাঁটি মিঠে মধু'র পিয়াসী চিরদিন জয়দেবেরই শরণাপন্ন থাকুন। কিন্তু এতটা মধু সকলের ধাতুতে সয় না। অনেকেই একটু রকমারির পক্ষপাতী। কষায় ও অম্লের তো কথাই নাই, একটু-আধটু তিক্তও চলিতে পারে। তাই ইঁহাদের পক্ষে পরবর্ত্তী কবিদিগের নানারসের ঘটনা-বৈচিত্র্য বেশ রোচকই হইয়াছে। এই পরবর্ত্তী কবিদিগের প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের নাম করিলেই যথেষ্ট। ইঁহারাই এই শ্রেণীর কবিদের মুখপাত্র।

কাব্যগত লাভের কথাই এতক্ষণ বলা হইল, কবিগত ক্ষতির কথাও এখন একটু বলিতে হয়। সে ক্ষতি কবির ঐকান্তিকতার অভাব। চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাস যতটা বৈষ্ণব কবি, মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র কখনই ততটা শাক্ত কবি নহেন। বৈষ্ণব-কবির শ্যাম দৈব-উপলক্ষ মাত্র নয়, শ্যাম তাঁহার সর্ব্বস্ব। মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের শ্যামা যেন অঙ্গহানিত্ব ঘুচাইবার জন্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছেন। বৈষ্ণব-দিগের ঐকান্তিকী ভক্তি ইঁহাদের নাই, অন্ততঃ গ্রন্থে তাহার পরিচয় ততখানি পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা ভক্ত ও কবি, ইঁহারা শুধুই কবি। ইঁহাদের পরে একজন শক্তিপূজক জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঐ দুই আখ্যাই দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার সঙ্গীতে বৈষ্ণব-কবির লালিত্য না থাকিলেও কবিত্ব যথেষ্ট আছে। আর ঐকান্তিকতায় তিনি বৈষ্ণব-কবির চেয়ে কিছুমাত্র খাটো নহেন। ইনি শাক্ত সঙ্গীত-রচয়িতা রাম-প্রসাদ।

মনে রাখা উচিত আমরা ব্যক্তির নহে, কবিরই আলোচনা করিতেছি। ব্যক্তিগত জীবনে চণ্ডীদাস বা কবিকঙ্কণ, কে বেশী ভক্ত ছিলেন, তাহা দেখিবার আমাদের প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন থাকিলেও সম্ভবতঃ তাহা দেখিবার উপায়ও নাই, কারণ উভয়েরই খাঁটি জীবন-চরিত মেলা দুর্ঘট; তবে তাঁহাদের কাব্যদর্পণে তাঁহারা কি-ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছেন, ইহাই মাত্র দেখান হইল। লাভ ও ক্ষতির যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক রকমের। এখন দুইটির একটু তুলনা করিয়া দেখা যাক। আলোচ্য কাব্যে লাভ ও ক্ষতি দুই আছে, কিন্তু এ দুইয়ের পরিমাণ কিরূপ? লাভের তুলনায় ক্ষতি বেশী, না, ক্ষতির তুলনায় লাভ বেশী? এ কথাটার উত্তর দেওয়া কিছু শক্ত।

লাভ ও ক্ষতির কথা বলা অনেক সহজ, কিন্তু তুলনায় দুইটার পরিমাণ ঠিক করা তত সহজ নয়। এরূপ তুলনা-মূলক হিসাবে অনেক গোলযোগ আছে। আমরা লাভ দেখিয়াছি ঘটনা-বৈচিত্র্যে, ক্ষতি দেখিয়াছি ঐকান্তিকতার অভাবে। এক্ষণে যাঁহারা ঘটনা-বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী, তাঁহারা লভ্যটাই বেশী মনে করিবেন। আবার ভক্ত শাক্তের প্রাণে অবশ্য ক্ষতিটাই বেশী বাজিবে। ভক্ত বৈষ্ণব যেরূপ বৈষ্ণব-সাহিত্য উপভোগ করিবেন, ভক্ত শাক্তের পক্ষে মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র কখনই সেরূপ উপভোগ্য হইতে পারে না; প্রসাদী ভজনই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়।

কিন্তু সংখ্যায় এই পক্ষ খুবই কম। অপর পক্ষ প্রবল তো বটেই এবং তাঁহারাও যে একেবারে ভক্তি-বিরোধী, তাহাও বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদের যুক্তি আলাহিদা। ভক্তিপক্ষের ন্যায় তাঁহারা গ্রন্থমাত্রকেই ভক্তির ছাঁচে ঢালাই করা দেখিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে ভক্তি চিরদিন সাহিত্যের প্রধানতম অঙ্গ হইয়া থাকুক, কিন্তু তাই বলিয়া কি ভক্তের পদাবলী ছাড়া আর কোনপ্রকার সাহিত্যই বাঙ্গলায় গজাইতে পাইবে না? বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের অনুসরণে ভূরি

ছুরি শুধু শাক্ত পদ-কর্ত্তা জন্মিলেই কি বঙ্গসাহিত্য বড় পরিপুষ্ট হইত? বৈচিত্র্যই যে সাহিত্যের পরিপোষণে একটা বিশেষ উপকরণ! এই উপকরণ না থাকিলে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধিত হইতেই পারে না। বৈষ্ণব-যুগের সাহিত্য তাই এক হিসাবে অতি উচ্চস্থান লাভ করিলেও, পূর্ণাঙ্গ নহে। শুধু পরমার্থ-তত্ত্বেই সাহিত্য গড়িয়া উঠে না। সংসার, সমাজ, সাম্রাজ্যও সাহিত্যের অঙ্গীভূত হওয়া চাই। মুকুন্দ-রাম ও ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুকরণে শুধু শ্যামা-বিষয়ক পদাবলী সৃষ্টি না করিয়া যে সমাজ ও সংসারের বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের লাভ বৈ ক্ষতি হয় নাই। বৈষ্ণবদিগের একঘেয়ে সাহিত্যে এই বৈচিত্র্য-সমাবেশের জন্য ইঁহারা বাঙ্গালী-মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ, বৈষ্ণব-সুলভ ভক্তি-প্রবণতার অভাব-হেতু কখনই নিন্দনীয় নহেন।

এ কথায় সায় দিতে আমাদেরও তত আপত্তি নাই। ভক্তি অবশ্য স্বর্গীয় বস্তু। কিন্তু শুধু স্বর্গীয় বস্তুতে মর্ত্ত্য সাহিত্য গড়িলে চলিবে কেন? এখানে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য দুই থাকা চাই। বৈষ্ণব-দিগের সাহিত্যিক পরমার্থের মাঝে সংসার ও সমাজকে আনিয়া কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্র কেন নিন্দাভাজন হইবেন? তাঁহাদের কাব্যে যদি দেবতা সর্ব্বগ্রাসী না হইয়া থাকেন, যদি আগাগোড়া তাহাতে উগ্র ভক্তির প্রবাহ না ছুটিয়া থাকে, তাহাতেও নিন্দার কিছু দেখি না। কারণ সর্ব্বগ্রাসী দেবতা ও ভক্তিই সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র সাধন নহে। তথাপি নিন্দার কারণ আছে। কৃষ্ণনামের ধুয়ার রসে বিদ্যাসুন্দরকে আধ্যাত্মিক রকমে পাক করিয়া লইলেও, ভারতচন্দ্রের এ নিন্দা ঘোচে না।

নিন্দার কথা শুনিয়া কোন ভক্ত যেন রুষ্ট হইয়া না পড়েন! ভাষার বা ভাবের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা বলিয়া যে কিছুই নাই, অবশ্য এতটা উদার মত আমরা পোষণ করিতে পারি না। প্রকৃতি অবশ্যই কোন ব্যাপারেই শ্লীলতা বা অশ্লীলতার ছাপ লাগায় নাই। এটা সাদা ওটা কালো, এটা গরম ওটা ঠাণ্ডা, এটা কঠিন ওটা দ্রব, এ জ্ঞান স্থূলতঃ প্রকৃতি শিখাইতে পারে; কিন্তু এটা অশ্লীল ওটা শ্লীল—এ শিক্ষা প্রকৃতির পাঠশালায় বড় পাওয়া যায় না। তাই কেবলমাত্র প্রকৃতি-চালিত জীবসমূহে এই জ্ঞানের নিদর্শন নিতান্তই দুর্লক্ষ্য। কিন্তু মানব-সমাজ কেবল ত প্রকৃতি-সম্ভূত নয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের মত শ্লীল ও অশ্লীলের জ্ঞান মানব-সমাজ বিশেষ শিক্ষার বলেই অর্জ্জন করে। প্রাকৃতিক আদি মানবে ইহার লক্ষণ পরিস্ফুট না থাকুক, সকল সভ্য মানব-সমাজেই এই জ্ঞান লক্ষিত হয়। তবে অপর নানা জ্ঞানের মত দেশ কাল ও পাত্রভেদে ইহারও তারতম্য ঘটে। আমরা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী অশ্লীলতাকে নিন্দনীয় মনে করি, তা সে যত বড় কবির কাব্যেই ইহা দেখা যাক না কেন! তাই বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আমাদের কাছে নিন্দার্হ। কিন্তু এজন্য ভারতচন্দ্র তত্তা নিন্দনীয় না হইতেও পারেন।

এই অশ্লীলতার জন্য ভারতচন্দ্র ততটা নহেন যতটা তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী-সমাজ দায়ী। তখনকার সমাজের বাতাসটাই ছিল ঐরূপ। অনেকে বলিতে পারেন, তিনি সেই বাতাসের গতি ফিরাইলেন না কেন? অবশ্য বলিতে হইবে, ততটা শক্তি তাঁহার ছিল না। যে শিক্ষা ও সংসর্গের মাঝে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সে সকলকে অতিক্রম করা তাঁহার সাধ্যে কুলায় নাই। তিনি যে বিশেষভাবে খারাপ লোক ছিলেন, এ কথা নিশ্চিতই ভিত্তিহীন। বাইরণ যেরূপ নিজের উচ্ছৃঙ্খল গতিতে সামাজিক নীতিকে ঠেলিয়া লেখনী চালাইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা নিশ্চয়ই সেরূপ কোন ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা-মূলক নহে। ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা সামাজিক নীতির উল্লঙ্ঘন নহে, তাহার অনুসরণ। তাৎকালীন অশ্লীলতা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা গেল বটে, কিন্তু সে সময়ের ছোট বড় কোন কবিই ইহা হইতে বাদ যান না, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মুকুন্দরামও নন্।

পরবর্ত্তী কবিদিগের বৈষ্ণবী ভক্তির অভাব-সত্ত্বেও সাহিত্যে বৈচিত্র্য-সংঘটনের জন্য তাঁহাদের পক্ষ একপ্রকার সমর্থন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু নিন্দার কথাও তোলা হইয়াছিল। মাঝে হইতে একটু অশ্লীলতার আলোচনা আসিয়া পড়িলেও বাস্তবিক সে নিন্দা অন্য কারণেই তোলা গিয়াছে। সেই কারণটা এখন বলি। এই পরবর্ত্তী কবিদিগের—বৈষ্ণব-যুগের তুলনায়—দেবভক্তিতে হ্রস্বতা আছে; থাকুক, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা নিজের নিজের দেবতাকে খেলো করিবেন কেন? চণ্ডীদাসের ভাবোন্মাদ যদি ভারতচন্দ্রে না থাকে ত দোষ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের দেবতাকে ভারতচন্দ্র যদি যথাযোগ্য স্থানে সমারূঢ় না রাখেন, তবে সেটা দোষের বৈ কি! শ্যাম প্রেমের দেবতা, বৈষ্ণব শ্যামকে লইয়া প্রেমের কত উচ্চ আদর্শই না আঁকিয়াছেন! যশোদার উগ্র বাৎসল্য, রাখাল-বালকের একান্ত সখ্য, গোপাঙ্গনার আত্মহারা অনুরাগ সবই প্রেম-বৈচিত্র্যের এক-একটি উজ্জ্বল মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তির কোনটিতে যদি বৈষ্ণব কবি কালিমার দাগ দাগিয়া থাকেন, তবে তাহাও অনেক সময়ে আবার আধ্যাত্মিকতার তুলিকাস্পর্শে বহু পরিমাণে মুছিয়া যায়! আর যদি আধ্যাত্মিক দিকটা নাও ধরা হয়, তথাপি বৈষ্ণব নিজের বিশ্বাস-মতে নিজের প্রেমের দেবতার যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহা নিষ্কলঙ্ক না হইলেও বড় আবেগময়। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে বৈষ্ণবের শাস্ত্রগত প্রাচীন নজীরও আছে। সে নজীর শ্রীমদ্ভাগবত।

কিন্তু ভারতচন্দ্র কোন্ নজীরে শ্যামাকে ধরিয়া সুন্দরের গুপ্ত প্রেমের দূতীগিরি করাইলেন! শ্যামা শক্তির দেবতা, যুগে-যুগে অসুর-নাশিনী দুষ্ট-দলনী। ভারতচন্দ্র সেই শক্তিরূপিণীকে কোন্ উচ্চ কাজে লাগাইয়াছেন? তাঁহাকে দিয়া কোন্ অসুরবিনাশ করাইয়াছেন, কোন্ দুষ্টের দমন ঘটাইয়াছেন? ভারতচন্দ্রের শ্যামার প্রধান কাজ হইল কি না, চোরের জন্য সুড়ঙ্গ-কাটা! কেন, ইহার জন্য কি শুধু কতকগুলা মুষিক

পুষিলেই চলিত না? আর যদি দেবতারই প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে একটা ছোট-খাটো দেবতা বা উপদেবতা খাড়া করিলেই ত সব কাজ চুকিয়া যাইত! শুম্ভনিশুম্ভ-বিনাশিনীকে এ ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? ইহাতে আর এক কাজ হইল কি, না, রাজাকে ভয় দেখানো। কেন, রাজার কি দোষ? যে লোক এমন শয়তানী করিয়া তাঁহার সম্ভ্রান্ত কুল কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহাকে যে তিনি শাস্তি দিবেন এ তো ন্যায়বিচারের কথা। দুষ্কৃত-দলনী ন্যায়-বিধায়িনী মহাকালীর প্রকৃতি যে ভারতচন্দ্র একেবারে উল্‌টাইয়া দিলেন! কেহ হয়তো বলিবেন, এই দুষ্কৃতকারী যে শ্যামার ভক্ত! সেইটাই তো দুঃখ! কাব্যকার এমন দুষ্কৃত-কারীকে এমন দেবতার ভক্ত করেন কেন? স্মর তো একজন দেবতা বটেন, তাঁহাকে লইলেই তো কাজ চলিত, স্মরারিশক্তিকে আবার এখানে টানিয়া আনা কেন! আবার কেহ হয়তো বলিবেন, সুন্দর তো দুষ্কৃত-কারী নয়। শাস্ত্রে গান্ধর্ব্ব বলিয়া একটা পরিণয়-বিধান আছে। বিদ্যা, সুন্দরের সহিত সেই বিধান-মতে পরিণীতা। ভাল, শাস্ত্রবেত্তাকে জিজ্ঞাসা করি, এ ব্যাপারটা কোন্ যুগের? অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিতে পারেন। ভাল হোক, আর মন্দই হোক তখন ও-ব্যাপারটার চলন ছিল। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের সময়েও কি সেটা খাটে? কাব্যকার দায়ে পড়িয়া খাটাইতে গিয়া শুধু গোঁজামিলই দিয়াছেন। আর যদি বিধানটার তখন চলনও থাকিত, তবুও সুন্দরের ওরূপ লুকোচুরি ও সিঁধকাটা বড় পৌরুষের পরিচায়ক হইত না। ভারতচন্দ্রের আর সব ছাড়িয়া কেবল বিদ্যাসুন্দর কাব্যই ধরা গিয়াছে দেখিয়া কাহারো ক্ষোভের কারণ নাই। অন্যত্রই কি দেবতা কাব্যকারের হাতে বড়-বেশী দেবোপম হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন? মহাযোগী মহাদেবকে লইয়াও কাব্যকার বড় কম নকড়াছকড়া করেন নাই। যাক, ও-সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের কথা এই পর্য্যন্ত।

এখন কবিকঙ্কণই বা এ-সম্পর্কে কি করিয়াছেন, একটু দেখিয়া কথাটা শেষ করা যাক। অবশ্য, তিনি ভারতচন্দ্রের মত তাঁহার কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অতখানি খাটো করেন নাই। সেরূপ করিবার তাঁহার প্রয়োজনও হয় নাই। তাঁহার নায়ক-নায়িকা ভারতচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মত ততটা রোমান্টিক নয়। সিঁধ কাটিয়া তাঁহাদের মিলন ঘটাইতে হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সাদাসিধে গৃহস্থ লোক। তাঁহাদের মিলন, বিচ্ছেদ, প্রণয়, পরিণয় সবই প্রায় সাদাসিধে গার্হস্থ্য বিধানেই শেষ করা হইয়াছে। তাঁহাদের উপাস্য দেবীও প্রায় তাঁহাদেরই মত সাদা-সিধে, তবে দুই-একটা ঘটনায় তাঁহার সাদাসিধে মূর্ত্তির অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমে তাঁহার সাদাসিধে মূর্ত্তির স্থলে দিব্য প্রতাপ-শালিনী শক্তি-মূর্ত্তিও তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। দুই-একটা সামান্য যুদ্ধ-ব্যাপার ছাড়া তিনি একবার স্বর্ণ-গোধিকার রূপে কালকেতুর গৃহে দেখা দিয়াছেন, আর

একবার সাগর-বক্ষে কমলাসনে বসিয়া হাতি গিলিয়াছেন! শেষটি তাঁহার কমলে-কামিনী রূপ। এই রূপের অদ্ভুতত্ব এত-বেশী যে, ইহা বাস্তবিক কতটা শক্তির পরিচায়ক, তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন। বলা বাহুল্য, কবিকঙ্কণও তাঁহার দেবতাকে দিয়া বড়-বেশী মহৎ কাজ করাইয়া লন নাই।

মোটকথা এই, কবিদিগের কাব্য-ক্ষেত্র শক্তিরূপিণীর শক্তিবিকাশের পক্ষে যথেষ্ট-প্রশস্ত নহে। ইহার পরিধি বড়ই সঙ্কীর্ণ। সেই সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দেবতা যতটুকু করিতে পারেন, তাহাই করিয়াছেন, এখানে তাঁহার বিশেষ কোন উপাসকের একটা-কিছু উপকার করাই যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। এই উপকার করিতে যদি কাহারো কিছু অপকার করা হয় সেদিকেও তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। ন্যায়, অন্যায় যে কোন উপায়েই হোক, স্তাবককে তুষ্ট করাই যেন তাঁহার একমাত্র কাজ! এই কি মহাশক্তির মহতী লীলা? মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভূভারহারিণী শ্যামায় আর এই শ্যামায় যেন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-প্রভেদ! তাই বলি, দোষ-ত্রুটি-সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবি যেরূপ তাঁহার প্রেমের দেবতাকে সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন, শক্তি-দেবতার চিত্রাঙ্কণে শাক্ত কবি তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারেন নাই।

তবে ইঁহাদের সংসার ও সমাজের চিত্র মন্দ ফোটে নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্রের এ-চিত্র মুকুন্দরামের অপেক্ষা অনুজ্জ্বল। চিত্রের অঙ্কণে ও চিত্রের নির্ব্বাচনে,—দুইয়েই অনুজ্জ্বল। চিত্রাঙ্কণে অনুজ্জ্বল বলি কেন, না, তাঁহার কাব্যে অনেক ব্যক্তির চিত্র সন্নিবিষ্ট থাকিলেও এক হীরা-মালিনী ছাড়া আর কেহ তেমন পরিস্ফুট হয় নাই! আর নির্ব্বাচনের কথা তোলাই অনাবশ্যক, বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরের অতি-বড় ভক্তও কবির বিষয়-নির্ব্বাচনের তেমন তারিফ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। তাহা হইলেও প্রশংসার বিষয় তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। অমন ললিত শব্দের ঝঙ্কার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। তাছাড়া শব্দের গতিটুকু আগাগোড়া বেশ অবিরাম স্বচ্ছন্দ।

বাস্তবিক: এই শব্দকুহকেই ভারতচন্দ্র অনেককেই মজাইয়াছেন। এ মজান বড় সোজা মজান নয়। যাঁহারা মজেন, তাঁহাদের কানে কবির শব্দের তান এমন মধুবৃষ্টি করিতে থাকে যে, শ্রোতার সমগ্র চিত্ত যেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাঝে একেবারে সমাধিগত হয়, কবির অন্যান্য ত্রুটি ও দৈন্য দেখিবার আর তাঁহার অবসরই থাকে না। কবির এই শব্দের ঝঙ্কার যেন তাঁহার উপাখ্যানের অভিনয়ে হীরামালিনীর হাততালির মত। বাল্যকালে যাত্রায় দেখিয়াছি হীরা যখন হাততালি দিতে দিতে আসরে নামিত, তখন যেন একটা আমোদের তড়িৎ-প্রবাহ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইত। এটা হইল সাধারণ শ্রোতার লক্ষণ। আবার, যাঁহারা আসল সমঝদার অর্থাৎ যাঁহারা রসের রসিক তাঁহাদের যে কি অবস্থা ঘটিত, তাহা বুঝি বর্ণনার অতীত। তাঁহাদের হাতের হুকা হাতেই থাকিত, কাঁধ হইতে গামছাখানা খসিয়া পড়িত, বিকট ভ্রূভঙ্গী সহকারে চীৎকার করিয়া

তাঁহারা আমোদচঞ্চল তরুণ শ্রোতৃসমূহকে মৌন করিতে বেজায় বিব্রত হইয়া উঠিতেন। একটা সূচীপতনের শব্দও বুঝি তখন সেই আত্মহারা সমঝদারদের কানে বজ্রনাদের মতই ঠেকিত। এমনই হাততালির যাদু! ভক্ত পাঠকের কানে ভারতচন্দ্রের শব্দের তান ইহা অপেক্ষা বোধ হয় আরো-বেশী কুহকময়।

ভারতচন্দ্রের চিত্তহারী পদবিন্যাসে কাহার আপত্তি থাকিতে পারে? অমৃতে কাহার অরুচি? কিন্তু এই সুন্দর শব্দের সঙ্গে যদি সুন্দর ভাবের মিলন না ঘটে, তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা আক্ষেপের বিষয়। নয়নভুলানো মুক্তামালার যে শোভা, তাহার সার্থকতা কখন? না, যখন তাহা সুন্দরীর সুকুমার কণ্ঠে আশ্রয় পায়। কিন্তু একটা বানরীর গলায় পরাইলে কি সেই মুক্তামালার তেমন জলুস খোলে? চণ্ডীদাসের শব্দলালিত্য থাকিলেও, অবশ্যই তাহা ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নয়। তবুও চণ্ডীদাসের পদাবলী ভারতচন্দ্রের কাব্য অপেক্ষা কতটা বেশী মর্ম্মস্পর্শী! কেননা চণ্ডীদাস মহান্ ভাব-আলোকের আধার, ভারতচন্দ্র তাহার মহান অভাবের আধার।

ভারতচন্দ্রের বিষয়-নির্ব্বাচন লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। কেহ বলে, কাব্যগত উপাখ্যানের মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই, উহা কবির বিদ্বেষ-প্রণোদিত কল্পনার সৃষ্টি। কোন বিশেষ অবমাননার পরিশোধের জন্যই তিনি ঐরূপ গল্প রচিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়াছেন। কেহ বলে, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক উহাতে বিদ্বেষের কি নিদর্শন আছে? তাঁহার নায়ক-নায়িকারা ত শ্যামাদেবীর অনুগত ভক্ত, কবি তাঁহাদের জীবনে দেবীর মহিমাই প্রকটিত করিয়াছেন। অপর লোকের অপর মতও থাকিতে পারে। এই সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করা এখানে অসম্ভব। এরূপ কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী না হইয়াও কাব্যগত আলোচনা চলিতে পারে। যদি দেবীর মহিমা দেখানই ভারত-চন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে কবি-হিসাবে তাঁহার যে খুব প্রশংসা করা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইহা ছাড়া যদি বিদ্বেষের কোন গন্ধ থাকে, তবে শুধু কবি কেন, ব্যক্তি-হিসাবেও তাঁহার গৌরবের হানি ঘটে।

ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ উভয়েই সমাজকে কাব্যগত করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই কবির সমাজচিত্র বড়ই ভিন্ন। উজ্জ্বলই হউক আর অনুজ্জ্বলই হউক, ভারতচন্দ্র সমাজের উচ্চস্তরের চিত্রই বেশী আঁকিয়াছেন। রাজা, রাণী, রাজকন্যা, রাজকুমার ও রাজ-দরবার লইয়াই তাঁহার চিত্রপট, সমাজের সাধারণ বা নিম্নস্তরের দৃশ্য তাহাতে তত নাই। ভারতচন্দ্র ছিলেন তখনকার নামজাদা রাজ-সভার মার্কামারা রাজকবি। বিশেষ ব্যক্তিত্ব বল না থাকিলে এরূপ মার্কামারা কবি প্রায় একটু পেসাদার হইয়াই পড়েন। ভারত-চন্দ্রে যেন এই পেসাদারীর লক্ষণ একটু বেশীমাত্রায় ফুটিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রতিপালক রাজার মনোরঞ্জনার্থেই অপর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার কুৎসামূলক কাব্য লিখিয়াছেন।

এ কথা সত্য হইলে ইহা অবশ্যই পেশাদারির চূড়ান্ত! সত্য না হইলেও, তাঁহাকে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বলে একটা অচল অটল পুরুষ বলিয়া মনে হয় না। তিনি যদি তাহা হইতেন তবে রাজদরবারের প্রভাব তাঁহার উপর এতটা পড়িত না।

কবির বর্ণনায় তাঁহার প্রতিপালক রাজার চরিত্র চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার আমোদপ্রিয়তার দিকটা আয়তনে যেন কিছু বেশী ছিল। এবং সে আমোদটা যে অনেক সময় উচ্চ কলাসম্ভূতও ছিল না, জনপ্রবাদে আজও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রবাদে যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন বা মিথ্যা নাই তাহা বলি না, কিন্তু ইহার কোন অংশও যে সত্য নয়, এমন কথাই বা কেমন করিয়া মানা যায়! রাজার সম্পর্কে প্রচলিত গোপালভাঁড়ের সব গল্প বিশ্বাস নাই করিলাম, কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে আমোদের জন্য ভাঁড় পুষিতেন ইহা অবিশ্বাস করিবার কি বড় বেশী কারণ আছে? তখন রাজাদের এইরূপ ভাঁড় রাখা—একটা প্রচলিত প্রথা ছিল। এবং এই ভাঁড়ের সঙ্গে আমোদটাও যে খুব বিশুদ্ধ রকমের হইত না ইহাও ঠিক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে এইরূপ আমোদপ্রিয়তার অনুধীন ছিলেন, এ-কথার অনুকূল অপেক্ষা প্রতিকূল প্রমাণই বেশী। ভারতচন্দ্র এইরূপ আমোদ-প্রিয় রাজার পোষা কবি। পোষা ভাঁড়ের মত অতটা না হউক, তাঁহাকেও রাজার আমোদের জন্য কিছু-না-কিছু খোরাক যোগাইতেই হইত। তাঁহার কাব্যে আমোদপ্রিয় রাজদরবারের কৃত্রিমতার ছাপটি তাই বুঝি এমন সুস্পষ্ট লাগিয়া আছে! মুকুন্দরামেরও একজন অনুগ্রাহক রাজা ছিলেন। কিন্তু হয়তো তিনি রসের ততটা সমজদার ছিলেন না, অথবা মুকুন্দরামের ব্যক্তিত্ব বলিয়া জিনিষটা কিছু অটুট ছিল। যে কারণেই হউক মুকুন্দরামের ব্যক্তিচিত্র সাধারণ হইলেও, বেশ স্বাস্থ্য ও সবলতার পরিচায়ক,—কোন প্রকার কৃত্রিমতার প্রভাব তাহাতে পড়ে নাই। তাই ভারতচন্দ্রে রাজদরবারের আতরমাখা বদ্ধ বায়ুই আমাদের গায়ে লাগে, আর মুকুন্দরামের কাব্যশালা গৃহস্থের মুক্ত আঙ্গিনার পুষ্পসৌরভে ভরপুর।

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

আলেয়ার আলো

চব্বিশ

সুরেন্দ্রের কথা

আমাকে দেখে সরমা যে মোটেই খুসী হবে না, এ আমি খুব জানতুম! আমাকে সে কখনই ভালবাসত না—আমি মরে গেছি ভেবে সে একরকম নিশ্চিন্ত হয়েছিল—আবার বিবাহ করে' সে নূতন সংসার পাততে বসেছিল—এরি-মধ্যে হঠাৎ কোনখান্ থেকে দুষ্ট গ্রহের মত উদয় হয়ে আমি তার আশার বাতি একটি ফুৎকারে নিবিয়ে দিলুম, একি কম আপ্‌শোষের

কথা! ওঃ, খুব সময়ে এসে পড়েছি যাহোক —নইলে এবারে আমাকে সত্যি-সত্যিই পথে দাঁড়িয়ে মরতে হোত!

...উপরে উঠে যখন ঘরের ভিতরে ঢুকলুম, সরমা তখন জানলার একটা গরাদে ধরে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে মুখ তুলে, সে নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার মুখ মুখোসের মত স্থির—তার ভাব একটুও বদলালো না। তাতে বিস্ময় বা বিরক্তির একটা রেখাও পড়ল না!

তার মুখ দেখে আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কথা কইতে গেলুম, কিন্তু জিভ্ যেন আঁটকে গেল।

সরমাও কিছু বললে না।

স্তব্ধ ঘরের মধ্য থেকে ঘড়ীটা খালি যেন টিট্‌কিরি দিয়ে বলছিল, টিক্, টিক্, টিক্!... ...

এ নীরবতা আর ত সওয়া যায় না! এতদিন পরে স্বামী-স্ত্রীতে দেখা, এখন এমন নীরবতা শুধু অসহনীয় নয়, অশোভনও বটে! অতএব আমিই প্রথমে মুখ খুলে বললুম, "সরমা, আমি এসেছি।"

সরমা যেন শিউরে উঠল। তারপর সুধু বললে, "বোসো।"

আমি একখানা চেয়ারের উপরে গিয়ে গুম্ হয়ে বসে রইলুম। আবার সেই নীরবতা!... ...এবার আমার রাগ হোতে লাগল। আমি তার স্বামী, একরকম যমালয় থেকে ফিরে আসছি বললেই চলে, আজ এই প্রথম সাক্ষাতের সময়ে অন্তত কর্ত্তব্যের খাতিরেও তার একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, আমি কেমন আছি! রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন রি-রি করতে লাগল—কিন্তু, না, মনের রাগ এখন বাইরে জাহির করবার সময় নয়—তাহলে সব মাটি হবে—যে পূজার যে মন্ত্র!

মুখে হাসি টেনে এনে বললুম, "তুমি ভাল আছ ত?"

সুপ্তোত্থিতের মত সরমা বললে, "অ্যাঁ?"

—"ভাল আছ?"

—"আছি।"

—"অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাছে এস, এতদিন পরে দেখা!"

পুতুলের মত সে আমার কাছে এগিয়ে এল।

তার একখানা হাত আমার নিজের হাতে টেনে নিলুম—উঃ, কি ঠাণ্ডা তার হাত! তার মুখের পানে চেয়ে আমি বললুম, "সরমা, অনেকদিন তোমাকে দেখি নি,—তুমি দেখতে কী সুন্দর হয়ে উঠেছ! তোমাকে আর সেই সরমা বলেই যে চেনা যায় না!"

সরমা কিছুই বললে না।

আমি আস্তেআস্তে তার মুখখানা নিজের মুখের কাছে টেনে আনলুম। সে কোন বাধা দিলে না—কিন্তু, তার চোখ! সে চোখদুটো যেন মড়ার চোখের মত, কৃত্রিম কাচের চোখের মত একেবারে স্থির, নিস্পন্দ। অমন বড়বড়, টানা, সুন্দর চোখের চাহনি যে এত কঠোর হোতে পারে, না-দেখলে তার ধারণা হয় না। মনের কথা মনেই চেপে, মুখ নামিয়ে আমি

তার মুখচুম্বন করলুম। মনে হোল, আমার এ চুম্বন যেন কোন পাথরের মূর্ত্তির শীতল কঠিন ওষ্ঠাধরের উপরে গিয়ে পড়ল... ...

খানিক পরে বললুম, "সরমা, ভাগ্যে আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছি, নইলে তোমার কি হোত বল দেখি? তোমার সঙ্গে অন্য লোকের বিবাহ—"

আমার কথা শেষ না-হোতেই, হঠাৎ সরমার ভাবান্তর হোল! এতক্ষণ সে যেন জেগে-জেগে ঘুমোচ্ছিল—আমার কথায় তার সেই জড়তা ছুটে গেল। একবার আমার মুখের দিকে চেয়েই সে আমার মুঠোর ভিতর থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নিলে!

আমিও বাধা দেবার কোন চেষ্টা করলুম না—কারণ, আলিঙ্গন চুম্বন বা ভালবাসার দিকে এখন আমার একটুও নজর নেই! তবে যতটুকু না-হোলে নয়, ততটুকু করতে হবে বৈকি! নইলে চলবে কেন?

মেয়েমানুষের বুদ্ধির পরে আমার এক-রত্তি শ্রদ্ধা নেই। বাঙ্গালীর মেয়ে হচ্ছে পক্ষীর মত নির্ব্বোধ; দুটো ধান-ছোলা ছড়ালেই পাখী সব ভুলে খাঁচার ভিতরেই সুখের গান সুরু করে' দেয়; দুটো মন-রাখা মিষ্ট কথা বললেই রমণী তার সমস্ত নিজস্ব ভুলে অন্তপুরের অন্ধকারে বন্ধ থাকবে, তোমার পায়ের তলায় আপনাকে একেবারে বিলিয়ে দেবে! তুচ্ছ হার-তাগা-বালা পেলে তার মুখে হাসি আর ধরবে না;—সে একটিবারও তলিয়ে দেখবে না, এই গলার হার তার বগ্‌লোস্, এই চুড়ি-বালা তার হাতকড়ি, এই মল-পাঁয়জোর তার পায়ের বেড়ী! বাঙ্গালীর মেয়েরা এ যদি বুঝত, দেশে তাহলে এক নূতন বিদ্রোহ জেগে উঠত, ফ্রান্সের বাস্তিলের মত বাঙ্গলার অন্তপুরও ভূমিসাৎ হয়ে যেত!

সরমাও ত বাঙ্গালীর মেয়ে বৈ আর কিছু নয়! যতই সে লেখাপড়া শিখুক, টিয়াপাখীর মত যতই সে বুলি কপ্‌চাতে শিখুক,—আমি এ কথা কিছুতেই ভুলব না যে, সে বাঙ্গালীর মেয়ে! আমার বুদ্ধির ভিতরে ঢোকে, তার এত সাধ্য নেই! এখন সে আমাকে ভাল-না-বাসুক্, কিন্তু দুটো মিথ্যে খোসামোদে একটু পরেই সে আদরে গড়িয়ে আমাকে আত্মদান করতে বাধ্য হবে!

ভাল করে' গোড়া ফাঁদবার জন্যে আমি বেশ জোর দিয়ে-দিয়ে বললুম, "সরমা, বিদেশ থেকে ফিরে তোমাদের যে আমি কত খুঁজেছি, সে আর বলবার নয়! কাগজে তোমাদের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি —কিন্তু তখন ত জানতুম না যে, তোমার পিতা আর ইহলোকে নেই! না-জানি তাঁর মনে আমি কত কষ্টই দিয়েছি,—ভেবেছিলুম, দেখা হোলে পায়ে ধরে তাঁর কাছে মাফ চাইব, কিন্তু ভগবান আমাকে সে সুযোগও দিলেন না।"—এই বলে আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলুম।

কিন্তু সরমা নিরুত্তর হয়েই রইল।

—"সরমা, তোমার কাছেও আমি ক্ষমা চাইছি, বুদ্ধির ভুলে তোমাকেও আমি অনেক ব্যথা দিয়েছি, সেজন্যে আজ আমি

অনুতপ্ত। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, সরমা ?"

কিন্তু সরমা নিরুত্তর হয়েই রইল!

খুব দুঃখের স্বরে আমি বললুম, "হয়ত আমি ক্ষমা চাইবারও অযোগ্য! তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি হয়ত তার মার্জ্জনা নেই! মানুষ বলে যদি কোনদিন পরিচয় দিতে পারি তবে সেইদিন আমার ক্ষমা চাইবার দিন আসবে।"—

সরমার দিকে চাইলুম,—আমার দুঃখের স্বর যে তার মর্ম্ম স্পর্শ করেছে, তার মুখ দেখে একেবারেই তা মনে হোল না।

ঘরের ভিতরে খানিকক্ষণ পাইচারি করতে লাগলুম। তারপর সরমার সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, "দেখ, কথায় কথায় ক্রমেই বেলা বেড়ে যাচ্ছে। চিঠিতে আমি যা লিখেছিলুম, তোমার মনে আছে ত ?"

সরমা মুখ তুলে আমার দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল।

—"এখানে ত আমি থাকতে পারব না, তোমাকে আমার বাসায় যেতে হবে।"

সরমা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল।"

—আমি ত অবাক! এত-অল্পে কাজ হাঁসিল! দেখলে, মেয়েমানুষের মন কি পল্‌কা—একটু চালাকি করে' দুটো মিষ্টি কথা বলেছি আর দেখতে-না-দেখতে কেল্লা ফতে! সরমা যে-রকম একগুঁয়ে, তাতে ও যে এত-শীঘ্র এখান থেকে নড়তে রাজি হবে, তা আমি ভাবি-নি। মনে-মনে নিজের বুদ্ধির বড়াই করে' প্রকাশ্যে বললুম, "কিন্তু যাই বললেই ত যাওয়া হয় না সরমা, জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে নিতে যথেষ্ট সময় লাগবে যে!"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, কেমন যেন শ্রান্তস্বরে সরমা বললে, "যা সঙ্গে যাবার সব গোছানো আছে।"

—"গোছানো আছে! কখন্ গোছালে?"

—"তুমি আসবার আগেই!"

আমার মিষ্টকথায় সরমার মন ভোলে-নি,—সে তাহলে আমি আসবার আগে থাকতেই আমার সঙ্গে যাবে বলে প্রস্তুত হয়ে আছে! এ সত্যটা আমার গর্ব্বের পরে বড় কঠোর ঘা মারলে!

যতটা মনে করা গিয়েছিল, সরমা দেখছি ততটা সহজ মেয়ে নয়। একে খেলিয়ে হাত করতে হোলে আরো-বেশী সুতো ছাড়ার দরকার! আচ্ছা সরমা, তুমি যত-বড় সেয়ানা হওনা কেন, মনে রেখ আমি সেই পুরুষজাতিরই একজন—রমণীর যারা প্রভু, শাসনকর্ত্তা!

* * * *

শ্যামবাজারের বাসায় এসে সরমার ভাবগতিক দেখে, আমি ক্রমেই যেন বোকা বনে যাচ্ছি! প্রথমদিন এখানে এসেই সে আমার ঘরদোর এমন পরিষ্কার করে' গুছিয়ে ফেললে যে, দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে একরকম কইত না বললেই চলে; কিন্তু ঠিক যে-সমটিতে যা দরকার, সরমা হাতের কাছে সেটি এগিয়ে এনে দিচ্ছে! স্নান করে' উঠেই দেখি, আরসির কাছে রয়েছে কোঁচানো কাপড় জামা জুতো, চুল আঁচড়ে কাপড় পরতে-না-পরতে দেখি সরমা জলখাবারের

থালা আর পানের ডিবেটি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। জলযোগ করে' আমি বেরিয়ে যেতুম। তারপর যত বেলাতে যখনি বাড়ী ফিরতুম, দেখতুম গরম অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, যন্ত্রের মত সরমা কাজ করে' যেত—আপন মনে মৌনমুখে। এমন-কি, যখন কাজ-কর্ম্মের কোন দরকার নেই, তখনো সে যা-হোক একটা-কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকত!

কিন্তু, তবু সে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারলে না। ঐ যে তার নীরব ভাবহীন মুখ, ও-মুখকে আমি ঘৃণা করি। জানি, সে আমাকে ভালবাসে না—এমন-কি, কথাবার্ত্তায় মৌখিক ভালবাসাও সে আমাকে জানাতে পারত না,—ঐ কঠোর সরলতা আমার দু-চোখের বিষ।

আমিও যে তাকে কখনো ভালবাসতুম বা এখন ভালবাসি, তাও নয়। সত্য, সে অসীমা সুন্দরী; কিন্তু তার সৌন্দর্য্যকে আমি কামুকের মত ভোগ করতে চাই, প্রেমিকের মত গ্রহণ করতে চাই না। আইনত সে আমার স্ত্রী হোলেও, আমার আপনার নয়। পরপুরুষকে সে ভালবাসে—হয়ত পরে তাকে উপভোগও করেছে। আগে তাকে ভালবাসি-নি, এখন তাকে পাপিষ্ঠা বলে ঘৃণা করি।

ভালবাসব বলে তাকে ত আমার ঘরে আনি-নি! আমার চাই, টাকা! সরমার বাপ যে টাকা রেখে গেছে, সে টাকা যতদিন-না পাচ্ছি ততদিন আর আমার শান্তি নেই।

এখনো টাকার কথাটা তার কাছে তুলি-নি। সে যে কেমন মেয়ে, তা আমার জানতে বাকি নেই। আমি হচ্ছি পুরুষ, সরমার মত মেয়ের ধাত্ আমি বেশ বুঝি। আমি যে টাকার জন্যেই তাকে এনেছি—স্ত্রী বলে গ্রহণ করছি না, এটা ধরতে পারলে সে একেবার বেঁকে দাঁড়াবে; একবার বেঁকলে তাকে তখন সোজা করা ভারি শক্ত হবে।

কিন্তু আর ত চুপচাপ থাকা আমার পোষাচ্ছে না। হাতে সামান্য যা টাকা ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এল—এখন সরমার টাকা হস্তগত করতে না পারলে, বিপদে পড়তে হবে। কেমন করে', কি সূত্রে বেশ সহজভাবে সরমার কাছে টাকার কথাটা পাড়া যায়, এ-ক'-দিন এই নিয়েই ক্রমাগত ফন্দি আঁটা যাচ্ছে।

সেদিন সরমা ঘরের এককোণে বসে পাণ সাজছিল। আমার তখন পাণের কোন দরকার ছিল না, তবু তার কাছে গিয়ে বললুম,—"সরমা, দুটো পাণ দাও ত।"

সরমা দুটো পাণ তাড়াতাড়ি মুড়ে আমার হাতে দিলে।

আমি বললুম, "আচ্ছা সরমা, তোমাদের ও-বাসায় যে জিনিষগুলো পড়ে আছে, সেগুলো আনার কি হবে বল দেখি? অনেকদিন হয়ে গেল, পরের বাড়ী, খালি করে দিতে হবে ত?"

সরমা মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।"

—"তোমার বাবা ত ঐ বাড়ীতে মারা যান?"

—"হুঁ।"

—"তাঁর বয়স হয়েছিল কত ?"

—"ষাট্।"

—"তোমাদের দেশের বাড়ীতে এখন কে আছে ?"

—"কেউ নেই।"

—"তোমাদের জমি-জমাও ছিল শুনেছি, তার খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা আছে ত ?"

—"না।"

—"না! কি মুস্কিল, এতদিন আমাকে বল-নি কেন ? শুনেছি, তোমাদের নগদ টাকাও কিছু ছিল—"

—"হ্যাঁ, ব্যাঙ্কে আছে।"—সরমা হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। তার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা ব্যঙ্গের ভাব! সে কি আমার মনের কথা ধরে ফেলেছে ? আরে রামঃ! মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি হোলে আর ভাবনা কি ছিল!—যাক্, আজকে আর বেশী ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। পাখী এখনো ভাল করে' পোষ মানে-নি, ভয় পেলে এখনো শিক্‌লি কেটে উড়ে যেতে পারে।

কিন্তু, মনটা কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল। সরমার বাপ কত টাকা রেখে গেছে, ওদের স্থাপর সম্পত্তি কত আছে, এ সব জানবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল। যদিও আমি স্বামী সে স্ত্রী, আমি পুরুষ সে নারী,—তার উপরে আমার জোর আছে ষোলআনা, তবু কেন জানিনা, এ-সব কথা তাকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে আমার বাধো-বাধো বোধ হচ্ছে!... ... ভেবে-চিন্তে মনেমনে একটা মতলোব খাটানো গেল।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে রইলুম—ঘুমলুম না!

রাত যখন অনেক—আস্তে-আস্তে উঠলুম। টেবিলের উপরে নীলরঙের ডোমের ভিতরে আলোর মৃদু শিখাটা ঘুমন্তের মত স্থির হয়ে আছে। সেই আলোতে দেখলুম, সরমা ঘুমিয়ে পড়েছে—তার চোখের পাতা বন্ধ।

খুব সন্তর্পণে সরমার গায়ে হাত দিলুম, সে নড়ল না। তখন সাবধানে তার আঁচল থেকে রিংটি খুলে নিলুম।

টেবিলের পাশেই সরমার একটি 'ষ্টিল ট্রাঙ্ক' রয়েছে—সরমার ক্যাশবাক্স-টাক্স ওরই ভিতরে থাকে। মুরারিবাবুর কাগজপত্র নিশ্চয় ঐখানেই আছে। সেগুলোর উপরে একবার চোখ-বুলিয়ে নিলেই সব বুঝতে পারব।

নিঃশব্দে চাবি লাগিয়ে ট্রাঙ্কটি খুলে ফেললুম। তারপর ক্যাশবাক্সটি ভিতর থেকে বার করলুম।

ক্যাশবাক্সে চাবি লাগাতে যাচ্ছি—এমন সময় পিছন থেকে শুনলুম, "দাঁড়াও, ও বাক্স খুলো না!"

কে যেন একচাঁই বরফ পুরে আমার বুকের ভিতরের রক্তটা হঠাৎ জমাট্ করে দিলে! সেই অবস্থায়—হাঁটুর উপরে ক্যাশবাক্স নিয়ে, বিবর্ণ মুখে আমি চোরের চেয়েও নীচু হয়ে বসে রইলুম।

সরমা বিছানা ছেড়ে নেমে এল। তার পর—আমার লজ্জাকে যেন আরো বাড়িয়ে তোলবার জন্যেই—আলোর শিখাটা উস্কে দিলে। আমি মাথা হেঁট করলুম।

খুব শান্ত স্বরে সরমা বললে, "বাক্সটা দাও, তুমি যা চাও আমি বার করে দিচ্ছি।"

—ক্যাসবাক্সটা আমার কাছ থেকে নিয়ে সরমা সেটি খুলে ফেললে। তারপর একতাড়া কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

শুষ্ক স্বরে আমি বললুম,—"এ-সব কি ?"

ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করে' সরমা বললে, —"তুমি যা খুঁজছিলে। ওতে বাবার উইল, কোম্পানীর কাগজ আর ব্যাঙ্কের খাতা আছে। তোমার টাকার দরকার হয়েছিল, আমাকে বললেই পারতে ত!"

সরমার কাছে এই আমার দ্বিতীয় পরাজয়! উঃ, এ কী অপমান! আচ্ছা, আমারও দিন আসবে!

* * * *

অনেকদিন পরে আবার মদ ধরলুম! জানতুম মাতালকে সরমা অত্যন্ত ঘৃণা করে। তার ভয়েই এতদিন মদ খাই-নি—নইলে, একবার যে ভক্তিভরে সুরাদেবীর পূজা করেছে, দেবীর প্রসাদ থেকে সে কি আর-কখনো বঞ্চিত থাকতে পারে ? তাই দেবীর পূজা আবার ষোড়শোপচারে চলেছে—সরমাকে আর ভয় কি ? যে-জন্যে তাকে ভয় করতুম, তার সবই টাকা এখন আমার হাতে—আমারই হাতে! সরমা যদি এখন রাগ করে—করুক, চলে যায়—যাক্, আমাকে এখন কে পায় কে ?... ...

সেদিন বাইরের ঘরে বসে মদের রঙ্গে সন্ধ্যাবেলাটি গোলাপী করে' তুলছি,—এমনসময় একটি লোক এসে ঘরে ঢুকল। গেলাসটি হাত থেকে নামিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই তাকে চিনলুম। সে হরেন, সরমাকে নিয়ে আসবার দিনে, যে আমার সঙ্গে গোলমাল করেছিল।

তাকে দেখেই আমার মেজাজ চটে গেল। বিরক্তস্বরে বললুম, "আবার এখানে কি মনে করে ?"

হরেন একবার আমার মুখের দিকে, আর-একবার বোতলের দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করে' বললে, "মাভৈঃ সুরেনবাবু, মাভৈঃ! চঞ্চল হবেন না, আজ আমি শ্বেতপতাকা বহন করে এখানে এসেছি।"

—"তার মানে ?"

"আমি আপনার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে এসেছি।"

—"কিন্তু আমি তাতে রাজি নই! আপনার সেদিনকার ব্যবহারটা স্মরণ করে দেখুন। আমি অপমান ভুলি না।"

—"আপনার স্মৃতিশক্তি যে এতটা প্রখর তা জানতুম না। আর, আমি যে আপনাকে অপমান করেছিলুম, তাও ত মনে হচ্ছে না।"

—"আপনার না মনে হোতে পারে, কিন্তু আমার বেশ মনে হচ্ছে, সেদিন আপনি যে ব্যভারটা করেছিলেন তাকে কিছুতেই খাতির বলে মনে করা চলে না। অতএব—"

—"অতএব, ঐ মদের গেলাসটির ভিতরে আপনার ক্ষুব্ধ মনটিকে আর-একটিবার সিক্ত করে নিন দেখি, দেখবেন মনের সব

ময়লা একদম্ সাফ্ হয়ে যাবে"—এই বলে হরেন হাসতে-হাসতে মদের গেলাসটি আমার মুখের সামনে তুলে ধরলে।

হরেন দেখছি আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়। তার মতলোব্ কি? মদের গেলাসে চুমুক্ মেরে মুখে খানিকটা কাঁক্ড়ার ডিমের বড়া ফেলে দিলুম। তারপর বললুম, "এখন আপনার অভিপ্রায় কি স্পষ্ট করে বলুন ত! বেশী গৌরচন্দ্রিকা আমি পছন্দ করি না।"

হরেন বললে, "হ্যাঁ, এই বিংশ শতাব্দীর আবহাওয়ায় গৌরচন্দ্রিকার প্রথাটা বড্ড-সেকেলে হয়ে গেছে বটে! ও জিনিষটা এখন অনেকেই পছন্দ করেন না।"

—"কেননা, গৌরচন্দ্রিকা হচ্ছে দুষ্ট মতলোব্কে শিষ্ট করে তোলবার একটি বিশিষ্ট উপায়।"

—"আপনার কথা আমার বেশ মিষ্ট লাগছে, মশাই!"

—"কিন্তু আপনাকে আমার বেশ মিষ্ট লাগছে না—বুঝেছেন?"

—"আপনার দেখছি সরল বাঙ্গলা ভাষায় কথা কওয়া অভ্যাস; এর-মধ্যে আর্ট খুব কম বটে, কিন্তু ধার এত বেশী যে সহজেই চর্ম্ম ফুঁড়ে মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারে।"

কি আপদ! এ লোকটা যে কিছুই গায়ে মাখে না! তাইত, কি করতে এখানে এসেছে এ?

হরেন তার হাতের ছড়িটা মাটিতে ঠুকতে-ঠুকতে আবার বললে, "কিন্তু এও ত জানেন সুরেনবাবু, যে, একেলে সভ্যতায় বেশী-সরল হওয়ার মানে, বেশী-অসভ্য হওয়া!"

আমিও তাকে ঠেস্ দিয়ে বললুম, "হরেনবাবু, এটাও আপনার জানা উচিত ছিল যে, আমার এ ঘরটি কোম্পানীর বাগান নয়, এখানে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ—এ বৈঠকখানা।"

—"বৈঠকখানা না-বলে সরাবখানা বললেই বোধকরি সঙ্গত হয়।"

আমি তেরিয়া হয়ে বললুম, "আপনি কি বাড়ী বয়ে আমাকে আবার অপমান করতে এসেছেন?"

হরেন আমার রুক্ষস্বরের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলে না, অন্যমনস্কের মত হাতের ছড়িটা ঘোরাতে-ঘোরাতে সম্পূর্ণ অবহেলাভরে বললে, "আজ্ঞে না, আমি এসেছি আমার বোনের সঙ্গে দেখা করতে।"

—"তাহলে আপনি যত-শীঘ্র পারেন প্রস্থান করলেই ভাল হয়।"

—"অর্থাৎ—"

—"অর্থাৎ, আপনাকে আমি আমার শ্যালক-পদে অভিষিক্ত করতে সম্মত নই। আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে না।"

হরেনের কপালের উপরে একটা শির ফুলে উঠল। বুঝলুম, সে এবার চটেছে। কিন্তু, মনের রাগ মনেই চেপে সে উচ্চস্বরে হাস্য করে' বললে, "সুরেনবাবু, ভগ্নীপতি বলেই আপনার কথাকে আমি ঠাট্টাস্বরূপ গ্রহণ করলুম, নইলে মুখের ওপরে আমাকে অপমনে করে কেউ-কখনো পার পায় কি যাক্, যেজন্যে আমি এসেছি আপনাকে খুলে বলি। সরমা কেমন আছে?"

—"ভালই আছে।"

—"আর-এক কথা। আপনি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে অনুগ্রহ করে জেনে আসুন, মোহনের ভাড়া-বাড়ীতে যে-সব জিনিষ-পত্তর রয়েছে, সেগুলোর কি ব্যবস্থা হবে?"

—"বসুন, এ কথার উত্তর আমি এখনি এসে দিচ্ছি।"—এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

বাড়ীর ভিতরে যেতেই দেখলুম, উঠানের উপরে সরমা চুপ-করে' দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ভাব দেখেই বোঝা গেল, আমাদের কথাবার্ত্তা সে সমস্তই শুনেছে!

বিরক্ত হয়ে বললুম, "এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?"

সে কথার কোন জবাব না-দিয়ে সরমা বললে, "হরেনদাদাকে এখানে নিয়ে এস।"

ক্রুদ্ধস্বরে বললুম, "না।"

সরমা কাতরভাবে বললে, "উনি আমাদের কত উপকার করেছেন, তা তুমি জান না। দেখা না করে ফিরিয়ে দিলে তিনি কি ভাববেন বল দেখি! যাও, যাও, নিয়ে এস!"

বৈঠকখানা থেকে হরেন নিশ্চয়ই আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পাচ্ছে! অত্যন্ত চটে গিয়ে চাপা গলায় বললুম, "চল, ঘরের ভিতরে চল।"

সরমা মাথা নেড়ে বললে, "না, আমি হরেনদাদাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না—তোমার পায়ে পড়ি!"

রাগ আমার মাথায় চড়ে গেল! "কী! আমার কথা শুনবে না?"—এই বলে সরমাকে আমি বাড়ীর ভিতরদিকে জোর করে' ঠেলে দিলুম।

হঠাৎ ঠেলা পেয়ে সরমা তাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গেল। এবং সঙ্গেসঙ্গে "উহু"—বলে আর্ত্তনাদ করে' উঠল।

—তারপর, কোথা দিয়ে কী যে হোল কিছুই বুঝলুম না—সুধু এইটুকু মনে আছে, পিছন থেকে কে-একজন বাঘের মত আমার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং লোহার মত শক্ত দুখানা হাত দিয়ে আমাকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—একটা চীৎকার করে' আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম!

পঁচিশ

সরমার কথা

ওগো আমার ভগবান, আমার এই ক্ষুদ্র নারীজীবন নিয়ে তুমি কি নিষ্ঠুর খেলা খেলতে চাও, বলে দাও আমাকে, বলে দাও বলে দাও! অদৃষ্টের সঙ্গে আমার এই লুকোচুরি আরো-কতদিন যে চলবে, কে আমাকে চোখের ঠুলি খুলে তা দেখিয়ে দেবে?

কঠোর চাপে ক্রমেক্রমে নিষ্পেষিত করে' নিঃশেষিত-রস ইক্ষুদণ্ডকে যেমন ফেলে দেওয়া হয়, আমার এ জীবনকেও তেমনি নীরস করে' কে আজ সংসারের ধূলিধূসর পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে;—দুদিন-আগেকার সোনার স্বপন আমার মনে আজ দূর-অতীতের স্মৃতির মত নাগালের বাইরে সরে গেছে।... ...

বিধবার স্বামী ফিরে এসেছে! রূপ-

কথায় যা সম্ভব হয় না, আমার অদৃষ্টে আজ তাই সম্ভব হয়েছে! এ কী সৌভাগ্য! তোমরা বলবে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহুপুণ্যের জোরেই আমার ভাগ্য এমন সুপ্রসন্ন হয়েছে। কিন্তু এমন সৌভাগ্যের দিনেও আমাকে কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে, বোধকরি দুর্জ্জয় ক্রোধে স্বর্গে তেত্রিশ কোটির সিংহাসন টলে উঠবে এবং মর্ত্তে সামাজিক মানুষগুলি মনুসংহিতা খুলে আমার প্রতি অনন্ত নরক-ব্যবস্থা করতে বসবেন। হায়, তবু ত এ পোড়া চোখের জল কিছুতেই মানা মানছে না—থামতে চাইছে না!

স্বামীকে কখনো ভালবাসতে পারি-নি, কখনো পারব বলেও মনে হচ্ছে না। আগে তাঁকে যমের মত ভয় করতুম, এখন কিন্তু সে ভয় আর নেই। তাঁর ভালবাসায় আদরেই যে আমার ভয় ভেঙ্গেছে, তাও নয়; কেননা আমি জানি তিনিও আমাকে ভালবাসেন না।.. ... ডুবে মরবে বলে যে-জলকে লোকে ভয় করে, মানুষের এমন দিনও আসে যেদিন সে সাঁতার না-জেনেও নির্ভয় হয়ে সেই জলেরই অতলে তলিয়ে যায়! আমারও এখন তাই হয়েছে! যিনি আগে আমার কাছে মূর্ত্তিমান বিভীষিকার মত ছিলেন, নিঃশেষে আজ তাঁরই হাতে আত্মসমর্পনকে আমি আত্মহত্যা বলেই মনে করি। মরণকে যে ডরায় না—তার আবার ভয়!

স্বামী আমাকে মুখে খুব আদর-যত্ন করেন। আমাকে বোধহয় তিনি এখনো বিয়ের কনে বলে ভাবেন, তাই মৌখিক প্রেমে আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অরণ্যের যে সামান্য জীবজন্তু, ব্যাধের কপট আদর তারাও যে ধরে ফেলে! নকল প্রেম কি চেপে রাখা যায়? স্বামী যে কি চান, তাঁর চোখ যে কি খুঁজছে, আমি তা জানি গো জানি!

তারপর, সেদিন রাত্রে আমি ঘুমেয়েছি ভেবে তিনি যখন চোরের মত আমার বাক্স খুলতে গিয়েছিলেন, তখন আমার সকল সন্দেহই ঘুচে গেল। মুখে প্রেমের অভিনয়ে আমার ঘৃণা ধরে গিয়েছিল—সে কপট অভিনয়ের উপরে একেবারে যবনিকা ফেলে দেবার জন্যে,—স্বামী আমার যা চান, সেই দিন তখনি তা বাক্স থেকে বার করে দিলুম। টাকায় আমার দরকার নেই, টাকা নিয়ে তাঁর যা-খুসি করুন-গে।..... সুধু তিনি আমাকে একটু শান্তি দিন শান্তি!

* * * *

সেদিন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বাইরের ঘরে চেনা গলার স্বর শুনলুম। সেই সপ্রতিভ ভাবে জোরে-জোরে কথা, সেই উচ্চস্বরে প্রাণখোলা হাসি—এ হরেন-দাদার গলা! এ স্বর যে একবার শুনেছে সে আর-কখনো ভুলতে পারবে না।

এতদিন পরে হরেনদাদা আমাকে মনে করেছেন! আনন্দের আবেগে আমি আগেকার মতই ছুটে তাঁকে ডাকতে যাচ্ছিলুম—হঠাৎ নিজের অবস্থা মনে পড়ায় আপনাকে সামলে নিলুম।

তারপরেই শুনলুম, স্বামী ক্রুদ্ধস্বরে বলছেন, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।"

তার খানিক পরেই স্বামী ভিতরে এলেন। আমাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমি হরেনদাদাকে ডেকে আনতে বললুম। তিনি রেগে উঠলেন। আমি আবার তাঁকে মিনতি করে' হরেনদাদাকে আনতে বললুম। স্বামী অত্যন্ত চটে উঠে আমাকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যে একটা ঠেলা দিলেন,—আমি পা-পিছলে পড়ে গেলুম।

পড়ে উঠতে-না-উঠতে দেখি, হরেনদাদা ঝড়ের মত ছুটে এসে স্বামীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—তাঁকে মাটি থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি বাধা দেবার অবসরটুকুও পেলুম না!

তারপর আমার কাছে এসে হরেনদাদা বললেন, "আমি বাইরের ঘর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিলুম—রাস্কেল কিনা তোমার গায়ে হাত দেয়! সরমা, তোমার কি বড্ড লেগেছে?"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "হরেনদাদা, তুমি এ কি করলে? ছিঃ!"

—"কেন, অন্যায়টা কি করেছি?"

—"অন্যায় কর-নি? আমাদের ভিতরে এসে এমন করে দাঁড়ানোটা তোমার ভাল হয়-নি!"

হরেনদাদা তখন বোধহয় বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এই ব্যবহারের জন্যে আমাকেই পরে ভুগতে হবে। রাগে তিনি ফুলছিলেন, কিন্তু আমার কথায় তাঁর দেহ দেখতে দেখতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল; মাথা হেঁট করে' অনুতপ্ত স্বরে তিনি বললেন, "আমাকে মাফ কর সরমা, রাগের মুখে অতটা বুঝতে পারি-নি!"

আমি বললুম, "যাক্, যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই—তুমি এখন যাও—উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।"

আমি স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে লাগলুম।... ...

একটু পরে মুখ তুলে দেখি, হরেনদাদা তখনো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন,—আর, আর, তাঁর চোখদুটি অশ্রুজলে ছাপিয়ে উঠেছে!

প্রাণের আবেগ প্রাণেই চেপে বললুম, "যাও, যাও,—উনি যেন উঠে আর তোমাকে দেখতে না পান।"

হরেনদাদার মুখ দেখে বুঝলুম, যেতে তাঁর কোনমতেই পা উঠছে না—তবু, জোর-করে' পা টেনে তিনি দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন। অস্ফুট কাতর স্বরে বললেন, "তুই ভাল থাক্ বোন, সুখে থাক্—আর কিছু আমি চাইনা!"

একটা কথা মনে পড়ল। হরেনদাদার স্নেহ-ভালবাসায় আমারও চোখে জল আসছিল, কোনক্রমে অশ্রু সংবরণ করে' তাড়াতাড়ি বললুম,—"হরেনদাদা, দাঁড়াও।"

—"কি সরমা?"

আমি বললুম, "দেখ, তুমি এখানে এসেছিলে, আর কারুকে বোলো না!"

* * * *

সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর থেকে, আমার প্রতি স্বামীর ব্যবহার একেবারে বদলে গেল। আমার টাকাগুলি যেদিন থেকে তাঁর হস্তগত হয়, সেইদিন থেকেই তিনি আর-একরকমের মানুষ হয়ে গিয়ে-

ছিলেন; আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আর বড় কইতেন না, সর্ব্বদা মদ খেতেন, ইয়ার-বন্ধু নিয়ে অনেক রাত বাইরে-বাইরেই কাটাতেন। আমি তাঁর স্বভাব জানতুম—তাই এ-সবের জন্যে আগে-থাকতেই প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু সেদিনকার ঘটনার পর থেকে আমার উপরে তিনি রীতিমত অত্যাচার সুরু করলেন। আমার স্বভাব-চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে', যখন-তখন এমন-সব কথা বলতে লাগলেন—যে-সব কথা পাগলের মুখে শুনলেও ধৈর্য্য রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু সব যন্ত্রণা সয়ে, মনের বিদ্রোহিতা প্রাণপণে দমন করে' আমি মৌন হয়ে থাকতুম—তা-ছাড়া আর আমার উপায় কি? আমার বাপ নেই, মা নেই, দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, —পৃথিবীতে আমি কোথা যাব, কোথায়?

এমনি ভাবে আমার দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। মন দিয়ে স্বামীর সেবা না করতে পারলেও, দেহ দিয়ে যতটা পারা যায়, আমি তার ত্রুটি করতুম না;—কিন্তু আমার এ প্রাণপণ কর্ত্তব্য-পালনও স্বামীকে কিছুমাত্র নরম করতে পারলে না।

কিছুদিন পরে হঠাৎ আর-এক অঘটন ঘটল।

পাড়ায় পাড়ায় শঙ্খের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে সেদিনকার সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ অতীত হয়ে গিয়েছে। হাতে কোন কাজ ছিল না, ঘরের এককোণে বসে আপন-মনে নানান কথা ভাবছিলুম।

এমনসময়ে চারিদিকে সাড়া তুলে আমার স্বামী ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখ ও কাপড়-চোপড় দেখেই বুঝলুম, নেশার মাত্রাটা আজ অতিরিক্ত হয়ে উঠেছে।

স্বামী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে স্তিমিত চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর হঠাৎ বিশ্রী স্বরে একটা অট্টহাস্য করে' বললেন, "আজ এখানে কে এসেছিল জানিস?"

আমি জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর দিকে তাকালুম।

—"হুঁ, এসেছিল বেটা বাঘের ঘরে! দূর করে' তাড়িয়ে দিয়েছি!"

আমি মৃদুস্বরে বললুম, "কার কথা বলছ?"

—"কার কথা আবার! মোহন—মোহন—যে বেটা পরের বৌকে বিয়ে করতে চায়!"

আমার বুকের মাঝখানে কে যেন একখানা জ্বলন্ত কয়লা চেপে ধরলে। পাছে মুখের ভাব স্বামীর চোখে পড়ে সেই ভয়ে তখনি আমি ঘাড় হেঁট করলুম।

স্বামী বললেন, "হুঁ, বুঝেছি। তুইই চিঠি লিখে সে বেটাকে আসতে বলেছিস্!"

এ মিথ্যে, মিথ্যে! ভগবান জানেন, মোহনবাবুকে ভোলবার জন্যে দিনরাত আমি কী চেষ্টা করছি!

স্বামী আবার কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "আমার বাড়ীতে বসে এ-সব চলবে না! এই-সেদিন চিঠি লিখে তুই একটা গুণ্ডাকে আনিয়েছিলি—আমার বাড়ীতে ঢুকে সে আমাকেই মেরে গেল—তারপর, আজ আবার এই ব্যাপার! বড় চালাকি পেয়েছিস্, না?"

আমি দু-হাতে মাটি আঁকড়ে চুপ হয়ে রইলুম।

—"কথা ক'! বল্, এমন কাজ আর-কখনো করবি?"

আমি তখনো কথা কইলুম না।

স্বামী আমার দিকে আরো-এগিয়ে এসে বললেন, "জবাব দে বলছি—নৈলে এই বোতলের বাড়ি মাথা গুঁড়ো করে দেব!"

এতদিন খালি বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করছিলুম—আজ থেকে আবার প্রহারের ভয় দেখানো হচ্ছে! আর চুপ করে' থাকতে পারলুম না—চকিতে দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, "কী, তুমি আমাকে মারবে?"

মদের বোতলটা নিয়ে আস্ফালন করতে-করতে স্বামী চেঁচিয়ে বললেন,—"হ্যাঁ, মারব—মারব! বল্, তুই চিঠি লিখেছিস্ কিনা?"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঘৃণাভরে বললুম, "না!"

"মিথ্যেকথা!"

—"মিথ্যেকথা বল তোমরা—যারা কাপুরুষ, যারা স্ত্রীর গায়ে অকারণে হাত তুলতে লজ্জিত হয় না—যারা টাকার লোভে বিবাহের ছলে রমণীর সর্ব্বনাশ করে—যারা রমণীকে কুকুর-বিড়াল বলে মনে করে!"—অনেকদিনের ঘৃণা আর রাগ আজ আমার অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল!

স্বামী আমার কথা শুনে প্রথমটা থতমত খেয়ে দু-পা পিছিয়ে গেলেন; তার-পরে "কী, মুখের ওপরে আমাকে অপমান!" বলে চীৎকার করে' মদের বোতলটা উঁচিয়ে আমার উপরে লাফিয়ে পড়লেন! দু-চারবার মারতেই, বোতলটা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল—তিনি তখন লাথি মেরে গলা ধরে আমাকে ঘর থেকে বার করে' দিলেন—আমিও সেইখানে আচ্ছন্নের মত বসে পড়লুম—মাথা ফেটে রক্তের ধারায় আমার দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেল, —আমার চেতনাও ধীরেধীরে লুপ্ত হয়ে এল।

কতক্ষণ পরে জানিনা,—যখন জ্ঞান হোল, মনে হোল আমার গায়ে কে-যেন হুড়্হুড়্ করে' জল ঢেলে দিচ্ছে!

অত্যন্ত যন্ত্রণায় আস্তে আস্তে উঠে বসে দেখি—আকাশ মেঘে-মেঘে মেঘময়, ঘুট্ঘুটে অন্ধকারের ভিতরে থেকে-থেকে বিদ্যুতের চক্‌মকি ও বাজের হুড়োহুড়িতে চোক-কান যেন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে' অবিশ্রাম বৃষ্টি-ধারা এসে আমার আহত দেহের উপরে গড়িয়ে পড়ছে,—যেন জাগ্রৎ দেবতার করুণাভরা স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মত!

আমার গায়ে বোধহয় বোতলভাঙ্গা কাঁচ বিঁধে ছিল—কারণ, যেমন উঠে দাঁড়াতে গেলুম সর্ব্বাঙ্গে এমনি যাতনা হোল যে, আর্ত্তনাদ না-করে' থাকতে পারলুম না—

সঙ্গেসঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে আমার ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব, আমার নারী-জীবনের একমাত্র আশ্রয়, আমার পূজনীয় স্বামী-দেবতা বিকৃত জড়িত স্বরে চীৎকার করে' উঠলেন, "তুই এখনো যাস্-নি! বেরো—বেরো, দূর হ'!"

ওগো আমার পাষাণাধিক পাষাণ দেবতা, তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলুম!

... ...: বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়া বিশ্বভেদী হাহাকার করছিল; সেই দিশেহারা বাধাহারা ঝড়ের রুদ্রতালে আমারও পাগল হৃদয় আজ যেন দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল!

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

উচ্চশ্রেণী ভারতবাসীর সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ

এক্ষণে, উচ্চশ্রেণী ভারতবাসীদের সহিত ইংরেজদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

* *
*

ব্রাহ্মণ। অবশ্য, ম্লেচ্ছদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের, বিশেষত উচ্চবর্ণ্য ব্রাহ্মণ-দিগের প্রগাঢ় অবজ্ঞা; তাহারা কাছে আসিলে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে কলুষিত মনে করে। কিন্তু এই বৈদেশিকদের আধিপত্য হইতেই তাহাদের প্রভুত্ব প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে। রাজাদের দরবারে তাহাদের প্রভাব মাঝামাঝি রকমের। এখন তাহা-দের যেরূপ স্বাধীনতা এরূপ স্বাধীনতা তাহারা কস্মিনকালেও ভোগ করে নাই। কি মোহোন্তের মনোনয়নে, কি মঠ-মন্দিরাদিসংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কার্য্যপরি-চালনে এখন আর সরকার হস্তক্ষেপ করেন না। এই প্রভূত ধন-সম্পত্তি, মন্দিরাদির সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডার, ট্রষ্টিদের হাতে ন্যস্ত থাকে। ট্রষ্টিরা অন্ধভাবে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদিগের কথা শুনিয়াই চলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে, য়ুরোপীয় মতামতের বহুল প্রচার হইয়া, অনেকগুলি হিন্দুকে হয়তো স্বধর্ম্ম হইতে দূরে লইয়া যাইবে, ভক্তদিগের ভক্তি ও দানশীলতা কমাইয়া দিবে। কিন্তু আজিকার দিনে, নব-হিন্দুদিগের দল-সংখ্যা খুবই কম। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ—না বনিয়াদী উচ্চবংশীয়, না ধন-শালী। অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে ভিক্ষা দান করিয়া শাস্ত্রীয় নিয়ম-লঙ্ঘনের অপরাধ হইতে অব্যাহতি পায়। অতএব, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণদিগের আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই।

উচ্চবর্ণ্য ব্রাহ্মণ ও ইংরেজ—ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই

ইংরেজরা যেমন এই সকল ধর্ম্মান্ধদিগের নিকট হইতে দূরে থাকে, ব্রাহ্মণেরাও তেমনি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট কাপড় দূরে নিক্ষেপ করে; ইংরেজরা ঘরের চৌকাঠ মাড়াইলেই গোবর-জলের ছিটা দিয়া উহারা গৃহশুদ্ধি করে।

* *
*

ব্রাহ্মণদিগের বিপরীতে, রাজপুত, মারাঠা, হিন্দুস্থানী, পারসীক, তুর্ক, কি মোগল-বংশীয়—হিন্দু ও মুসলমান রাজারা, আমীর-ওমরাওরা, সম্রাটকে স্বকীয় অধিপতিরূপে সম্মান করে; উহারা ইংরেজ-দিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করে এবং ইংরেজপ্রদত্ত সম্মানলাভে তৃপ্তি লাভ করে। ইংরেজরা ব্রাহ্মণকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না, বেনিয়া ও ইংরেজি-ধরণে শিক্ষিত সরকারী কর্ম্মচারীকে অবজ্ঞা করে; কিন্তু আশৈশব nobilityকে মান্য করিতে অভ্যস্ত থাকায়, ভারতীয় আমীর-ওমরাও-দিগের সহিত উহারা সাধারণ লোকের মত ব্যবহার করে না। গর্ব্বিত পাঠান বা রাজপুত অশ্বারোহী তাহাদের জাঁকালো পরিচ্ছদ, তাহাদের সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র, তাহাদের প্রাচ্য অনুচরবৃন্দ—এই সমস্ত ইংরেজের মনে রোম্যান্টিক স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। কোন বিশেষ উৎসব-দিনে Westminister প্রাসাদে ইংলণ্ডাধিপতি যে সকল অনুচর-বর্গে পরিবৃত থাকেন, তন্মধ্যে হিন্দুরাজা-দিগকে দেখিয়া তিনি প্রীত হন; ভারত-বর্ষে "সহস্র-এক-রজনী"সদৃশ রাজদরবারের আড়ম্বরে ভাইস্-রয়ও পরমতৃপ্তিলাভ করেন। ইংরেজ-দোকানদার—যে কখন "লর্ডের" সম্মুখীন হয় নাই,—সে গর্ব্বিতভাবে ভারতীয় রাজার সহিত "সমানে-সমান-" ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে।

তাছাড়া, কোম্পানীর ঐতিহ্য-ধারা, সিপাহি-বিদ্রোহের স্মৃতি, রুসিয়ার দৃষ্টান্ত—এই সমস্ত ইংরেজের মনে এই প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়াছে যে, রাজা ও আমীর-ওম্‌রাওদিগের সহিত নৃপতির অনুরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক। কোন রাজা কোন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নিশান উঠানো হয়, তোপ-ধ্বনি করা হয়; অল্প-কিছু সরকারের হিতসাধন করিলেই উপাধি ও অলঙ্কারে তাহাকে বিভূষিত করা হয়। (১)

ভাইস্-রয়ের দরবারে এই নীতি-কৌশলটি যেরূপ বুঝিতে পারা যায় এমন আর কিছুতে নয়। বহুমূল্য জাঁকালো তাঁবুর ছাউনী, ইংরেজ ও ভারতীয় ফৌজ, দেশীয় রাজাদিগের অশ্বসৈনিকদল, মুখে 'লড়াকা' ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এইরূপ রাজপুত, আদব-কায়দা-দুরস্ত মুসলমান, রত্নালঙ্কার-সমাচ্ছন্ন রাজবৃন্দ। হাতী, উট, আরবী ঘোড়া, রজ্জু-বদ্ধ চিতা। সৈনিক, অশ্বারোহী

(১) India List এ (P.171.) তোপ-সেলামীর তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। সম্রাটের ১০১ তোপ; ভাইস্-রয়ের ৩১; নিজাম, বরোদা ও মহিশূরের ২১; ভূপাল, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, কাশ্মীর, কলট, কোল্হাপুর, উদয়পুর, ত্রিবাঙ্কুর, ১৯; অধিকাংশ রাজাদিগের ১১ কিংবা ৯এর বেশী নয়।

অনুচর, বাজপক্ষীরক্ষক, ভৃত্যাদি। বাঁকা-সিংওয়ালা সাদা গরুযোজিত শকটের সারি। জনতা :—সাদা কাপড়-পরা পুরুষ; ঝক্‌ঝকে রঙের পরিচ্ছদ-পরা রমণী; রমণীদের কণ্ঠ, পদ, বাহু অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন; নগ্ন বা নগ্নপ্রায় শিশুবৃন্দ;—এই সমস্ত, সোনালী ধূলারাশির মধ্যে অগ্নিময় সূর্য্যের কিরণে দীপ্যমান; পশুদের চীৎকার, মানুষের কোলাহল, স্ত্রীলোকদের উচ্চৈস্বরে কথোপকথন, অস্ত্র-শস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, কামানের আওয়াজ। (২)

মোগল সম্রাটদিগের ঐতিহ্য-ধারা ইংরেজরা বজায় রাখিয়াছেন। প্রাচ্যখণ্ডের জাঁক-জমক ইংরেজদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। অবশ্য এটা একটু বেশীমাত্রা; কেননা, আমীর-ওমরাওরা—মধ্য-এসিয়ার রীতিনীতির প্রভাবের প্রতিনিধিস্বরূপ, সামন্ততন্ত্র ও বহুপুরাকালের যুদ্ধ-যুগের নিদর্শনস্বরূপ; সমস্তই অতীতকালের, বর্ত্তমান কালে, উহারা তেমন কিছুই নহে, এবং ভবিষ্যতে উহারা একেবারেই নগণ্য হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) ১৯০২-০৩এর দরবারে, শোভাযাত্রার সারি এইরূপ গঠিত হয় :—অশ্বারোহী সৈন্য, অশ্ব-যোজিত তোপের গাড়ী, সোনালী পাড়-দেওয়া লাল কাপড়-পরা ১২জন তুরীবাদক, নকিবের দল, গোলাপী ও সোণালী রংএর উদ্দিপরা দেহ-রক্ষিবৃন্দ, নীল ও সোনালী পাড়-দেওয়া সাদা লম্বা-কোর্ত্তা-পরা cadet সৈন্য। জরির কাজ-করা প্রকাণ্ড রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত হাতীর উপর ভাইস্-রয় Duke of Connaught উপবিষ্ট। ১৫০ হাতী, অশ্বারোহী সৈন্য।

দিনগণনার আদিতত্ত্ব

সূর্য্যোদয় হইতেই দিন আরম্ভ হয় ও রাত্রিশেষে দিনের অবসান হয় এই ধারণাটী আমাদের এমনই সহজ সংস্কারে পরিণত হইয়া গিয়াছে যে দিনের গণনা অন্য কোন-রূপ হইতে পারে তাহা শুনিলে সহজে আমাদের বিশ্বাস হওয়ার কথা নহে। কিন্তু পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিলে বর্ত্তমান গণনার পরিবর্ত্তে প্রথমে অন্যরূপ গণনা থাকারই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সেমিটিক জাতির মধ্যে সূর্য্যোদয় হইতে না হইয়া সূর্য্যাস্ত হইতেই দিন-গণনার রীতি প্রচলিত দেখা যায়। ব্যাবিলনীয় দিগের এ সম্বন্ধে যুক্তি এই যে অপেক্ষাকৃত অল্পপূর্ণতাযুক্ত বস্তু হইতেই অধিক পূর্ণতা-যুক্ত বস্তুর বিকাশ হয়। এই নিয়মে চন্দ্র হইতেই সূর্য্যের বিকাশ হয়। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রের উদয় হয়। এই প্রকারে সন্ধ্যা চন্দ্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া দিনের আদি হইয়াছে। সন্ধ্যার পর রাত্রি ও তৎপর দিবা হয়, তাহাতে দিবা রাত্রিরই সন্তান হইয়া পড়ে। সুতরাং সন্ধ্যাই দিবসের আদি মাতা হয়। নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে আমাদের বক্তব্য বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইবে ;—

"It is worthy of note that, in consequence of the Babylonian idea of evolution in the creation of the world, less perfect beings brought forth those which were more perfect, and the sun was therefore the offspring of Nannara or Sin, the moon. In accordance with the same idea, the day, with the Semites, began with the evening, the time when the moon became visible, and thus becomes the offspring of the night." The Religion of Babylonia and Assyria (Religions Ancient and Modern Series). by Theophilus G. Pinches p 66.

উল্লিখিত যুক্তির কোন সারবত্তা থাকুক আর নাই থাকুক চন্দ্র ও রাত্রির সহিত যে আদিতে কালবিভাগের যোগ ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। চন্দ্রের এক নাম 'মাস'—এই নামানুসারেই ত্রিংশদ্দিনাত্মক কালের নাম "মাস" হইয়াছে। ইংরেজী মাস-বাচক month শব্দও চন্দ্রবাচক moon শব্দ-জাত বলিয়াই আভিধানিকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চন্দ্রের দুই পক্ষের দ্বারাই মাসার্দ্ধকাল 'পক্ষ' বলিয়া অভিহিত হয়। ইংরেজী পক্ষবাচক "Fortnight" শব্দের সহিত রাত্রির স্পষ্ট যোগই বিদ্যমান রহিয়াছে। "Fortnight" শব্দ চতুর্দ্দশ রাত্রি অর্থ প্রকাশ করে। পক্ষার্দ্ধবাচক কালের ইংরেজীতে যে 'sevennight' শব্দ পাওয়া যায়, তাহাতেও আমরা রাত্রিরই সম্বন্ধ দেখিতে পাই। কেবল তাহাই নহে, তিথিরূপ কালবিভাগের সহিতও চন্দ্র-গতিরই সম্বন্ধ। প্রতি তিথির স্থিতিকাল ষাইট দণ্ড। এই ষাইট দণ্ড প্রত্যেক দিনেরও মান। এই তিথিকে চান্দ্রদিন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে *। জ্যোতিষের সাবন গণনা এই তিথিমান অনুসারেই হয়। এই সাবন গণনায় ত্রিশ দিনে মাস এবং ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। "মাসমান" শব্দে বৎসর বুঝায়। ইহাও চন্দ্রের দ্বারা বৎসর গণিত হওয়ার অন্যতর প্রমাণ। চন্দ্র দুই পক্ষের পনর তিথি করিয়া ত্রিশ তিথিতে একবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। তাহাতেই প্রত্যেক তিথি এক এক দিনের সমান বলিয়া ত্রিশ দিনে এক সাবন মাস হয়।

"সাবন" শব্দ 'সবন' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'সবন' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞ'। যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন হইত বলিয়াই তিথির গণনা 'সাবন' নামে অভিহিত হইয়াছে †। বস্তুতঃ কেবল যজ্ঞে নহে, সমস্ত বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডেই আমরা কেবল তিথিরই উল্লেখ দেখিতে পাই। চন্দ্র এই প্রকারে একদিকে তিথির নিয়ামক হইয়া যেমন "তিথিপ্রণী" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনই অপরদিকে ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়ামক হইয়া "দ্বিজরাজ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

সেমিটিক জাতির মধ্যে সূর্য্যাস্ত হইতে দিন গণনার রীতি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে উল্লেখ পাইয়াছি বাইবেলেই আমরা তাহার মূল দেখিতে পাই। বাইবেলের সৃষ্টি অধ্যায়ে প্রথম সৃষ্টি-বর্ণনায়ই সায়ং-

* "তিথিনৈকেন দিবসশ্চান্দ্রমানে প্রকীর্ত্তিতঃ"।

† বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনোমতঃ"॥

কালই যে দিনের আদি তাহার স্পষ্ট আভাস আমরা প্রাপ্ত হই। যথা—

"And God called the light Day, and the Darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day." Genesis. Chap. I. 5.

"পরমেশ্বর আলোককে 'দিবা' বলিলেন ও অন্ধকারকে 'রাত্রি' বলিলেন, এবং সায়ং ও প্রাতঃ লইয়া প্রথম দিবস হইল।"

কেবল সৃষ্টির প্রথম দিনই যে সায়ং ও প্রাতঃ লইয়া হইল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে, পরবর্ত্তী দিন সকলও সায়ং ও প্রাতঃ লইয়া হওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

সায়ংকাল দিনের আদি বলিয়া উল্লিখিত হওয়ার কারণ বাইবেলের সৃষ্টি বর্ণনার প্রারম্ভেই পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্তই অন্ধকারময় ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথম দিন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে যে রাত্রিই বিদ্যমান ছিল তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। অভিধানে 'eve' ও 'evening' শব্দের 'পূর্ব্বরাত্রি' ও 'পূর্ব্ববর্ত্তী কাল' এই উভয়ার্থই স্বীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাইবেলের evening শব্দ বিশেষভাবে রাত্রির বাচক বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি এবং সায়ং বা রাত্রিই যে দিনের পূর্ব্বাংশ তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের বেদেও সৃষ্টির প্রথমে সমস্ত তমোব্যাপ্ত থাকারই বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাতেও রাত্রিই যে দিনের আদি তাহা সপ্রমাণ হয়। বেদে 'নক্তোষিস্' যে একত্র স্তুত হইয়াছে তাহা এক পূর্ণ দিনের বোধক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কারণ বেদের 'নক্তোষিস' বাইবেলের 'evening and morning'এর সম্পূর্ণ অনুরূপ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃত 'নক্তন্দিবং' শব্দে রাত্রি ও দিবাযোগে একদিন হওয়ার কথা যেন বিশেষরূপেই পরিস্ফুট। 'নক্তং' ও দিবা শব্দদ্বয়ের যোগে সমাহার দ্বন্দ্ব হইয়া 'নক্তন্দিবম্' এই একবচনান্ত পদ সিদ্ধ হওয়ায় উভয়ের যোগে একটী পূর্ণদিন গঠিত হওয়ার প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে। এখানেও আমরা রাত্রিকেই পূর্ব্বে পাইতেছি।

জ্যোতিষশাস্ত্রে উষাযাত্রার যে বিধান পাওয়া যায়—তাহাতে পূর্ব্বদিনের উষা পরদিনেই ধরিতে হয়। যথা—

"মঙ্গলের উষা বুধে পায়
যথা ইচ্ছা তথা যায়।"

ইহা হইতেও উষা যে দিবসের আদি-ভাগ না হইয়া শেষ ভাগ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে মধ্যরাত্রির পর হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিনের মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত দিন গণনার বিধান দৃষ্ট হয়। ইহাতেও রাত্রিতেই দিনের আরম্ভ হইয়া পড়ে। ঘটিকানুসারে ইংরেজী দিন গণনায়ও আমরা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রগণনার সম্পূর্ণ সাদৃশ্যই দেখিতে পাই।

আমাদের প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা হইতে রাত্রি হইতেই যে দিন গণনা প্রথম আরম্ভ হয় তাহা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে দিবা হইতেও দিন গণনা সম্বন্ধে কি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

রাত্রির বিশ্রাম ও জড়তার পর উষাতেই আমরা নবজীবনের সজীবতা অনুভব করি ও নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। সুতরাং উষা যে নূতন কালের প্রবর্ত্তিকারূপে বিবেচিত হইবে—তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। উষা সূর্য্যের অগ্রগামিনী। সূর্য্য দিবাকে উৎপন্ন করেন, তাহাতে তিনি "দিবাকর"। উষাতে এই দিবালোকের প্রথম স্ফুরণ হয় বলিয়া উষা দিবসের মুখস্বরূপ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। অমরকোষে তাহাতেই উষার 'অহর্মুখ' নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—"প্রত্যূষোঽহর্মুখং কল্যমুষঃ প্রত্যূষসী অপি।"

বৈদিক সময়ের আদিতে আর্য্যগণ সুমেরু ও উত্তর-কুরুতে যখন বাস করিতেন তখন উষা দীর্ঘব্যাপিনী হওয়ায় উষার প্রভাবই তাঁহারা অধিক অনুভব করিতেন—তাহাতেই বেদে উষার যেরূপ বর্ণনা ও স্তুতি পাওয়া যায়, সূর্য্যসম্বন্ধে তদপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, আর্য্যগণ ক্রমে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেই সূর্য্যের অধিক প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সূর্য্যকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়া দিনের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন এবং এই প্রকারেই সূর্য্য 'দিনকর' নামে পরিচিত হইয়া লেন। কিন্তু এইরূপে সূর্য্যকে "দিনকর" আখ্যা প্রদান করিলেও রাত্রিই যে দিনের আদি এই তত্ত্বটী আর্য্যগণ তখনও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তাহাতেই বেদে সূর্য্য রাত্রির সহিত দিবাকে প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

"বিশ্বামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যন্নরূপাণি সূর্য্য।"

ঋগ্বেদমণ্ডল, ৫০ সূক্ত।

"(সেই আলোক দ্বারা) রাত্রির সহিত দিবসকে উৎপাদন করিয়া এবং প্রাণীদিগকে অবলোকন করিয়া, তুমি বিস্তীর্ণ দিব্যলোক ভ্রমণ কর।"—রমেশবাবুর অনুবাদ।

এই প্রকারে সূর্য্যপ্রাধান্যের সহিত কালমান প্রবর্ত্তিত হইয়াই সূর্য্যোদয়ের সহিত দিনগণনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই সৌরমানেও বেদের উষাকেই দিনমুখ-রূপে পরিগণিত দেখা যায়। তবে প্রভেদ এই যে, যেস্থলে চান্দ্রমানে উষা দিনশেষ রূপে পরিগণিতা তৎস্থলে সৌরমানে উষা দিনাদিরূপে পরিণতা। এই উষা বিপরি-ণামের প্রকৃত রহস্য উষা শব্দের অভিধানেই যেন নিহিত রহিয়াছে। উষার একটী পর্য্যায় শব্দ আমরা অভিধানে "কল্য" পাইয়াছি। এই কল্য শব্দটীর 'গতদিন'ও 'আগামী দিন' এই দুইটী অর্থও স্বীকৃত দেখা যায়। এই অর্থদ্বয়ের দ্বারা দিন সম্বন্ধে উষার আদি ও অন্তরূপে গণনার সুন্দর ব্যাখ্যাই পাওয়া যাইতে পারে। উষাবাচক 'কল্য' শব্দের 'গতদিন' অর্থ ধরিলে 'উষা' দিনান্তরূপে পরিণত হয় আর 'আগামী দিন' অর্থ ধরিলে 'উষা' দিনাদিরূপে পরিণত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত দুই অর্থে 'কল্য' শব্দটী কোন অভিধানেই সংস্কৃত শব্দমধ্যে পরিগণিত দেখা যায় না। এক প্রকৃতিবাদ অভি-ধানেই সংস্কৃত শব্দরূপে ইহার পূর্ব্বোক্ত দুই অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের কথিত

ভাষায় ইহার 'কাল্' বা 'কালি' এই প্রকার রূপই দেখা যায়। বাঙ্গালা রচনায় ইহা পূর্ব্বোক্ত দুই অর্থেই সংস্কৃত বিশেষণ যোগে সাধু শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—'গতকল্য' 'আগামী কল্য'। ইহা হইতে মূলে যে ইহা সংস্কৃত শব্দ, তাহাই নিঃসন্দেহরূপে প্রতীয়মান হয়। ঊষার দিনারম্ভ রূপে পরিণত হওয়ার যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে প্রদান করিয়াছি, ইংরেজী ভাষায় আমরা তাহার অতি চমৎকার সমর্থনই প্রাপ্ত হইতে পারি। ঊষাবাচক ইংরেজী যে 'morning' শব্দ আমরা বাইবেলের সৃষ্টিবর্ণনায় প্রাপ্ত হইয়াছি সেই 'morning' শব্দের সহিত ইংরেজীও আগামী দিনের বাচক 'morrow' শব্দকে আমরা একই প্রকৃতিমূলক দেখিতে পাই ‡। ইহা হইতে পূর্ব্ব গণনায় যাহা ঊষান্তরূপে আগামী দিন ছিল—তাহাই যে ঊষাদিরূপে বর্ত্তমান দিনে পরিণত হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারে ঊষাযোগে দিন আরম্ভ হওয়াতেই ঊষার একনাম ইংরেজীতে দিবারই এক প্রাকৃতিক 'dawn' হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন

বাইশ বৎর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষে ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই-সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্যনির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই, যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; যাহা অসম্ভব ছিল,

‡ ঊষাবাচক morn শব্দ যে আগামী-কল্যবাচক To-morrow অর্থে ব্যবহৃত হয়, অভিধানে তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে Chambers's Twenteieth Century Dictionaryতে এ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি: "The morn (Scot.) to-morrow, The morn's morning, tomorrow morning."

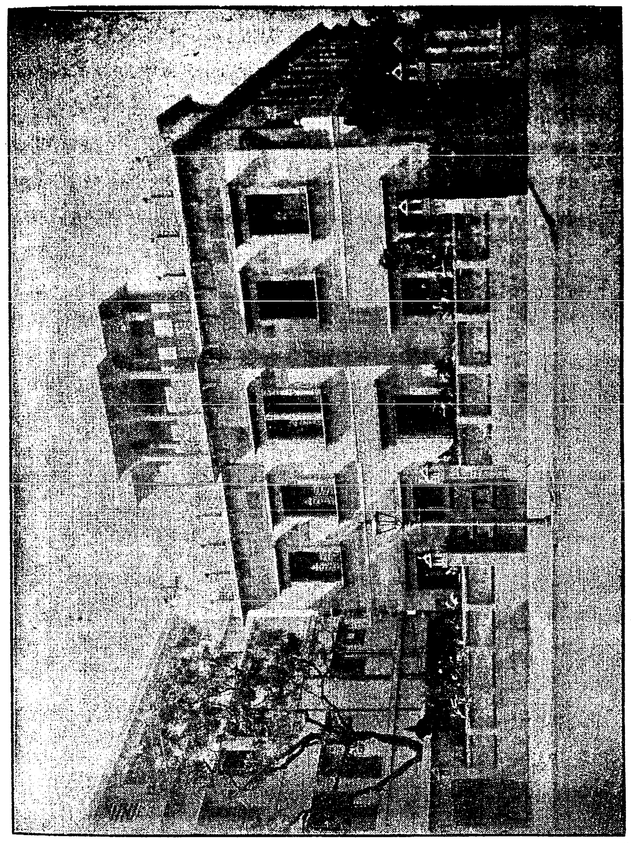

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিজ্জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা

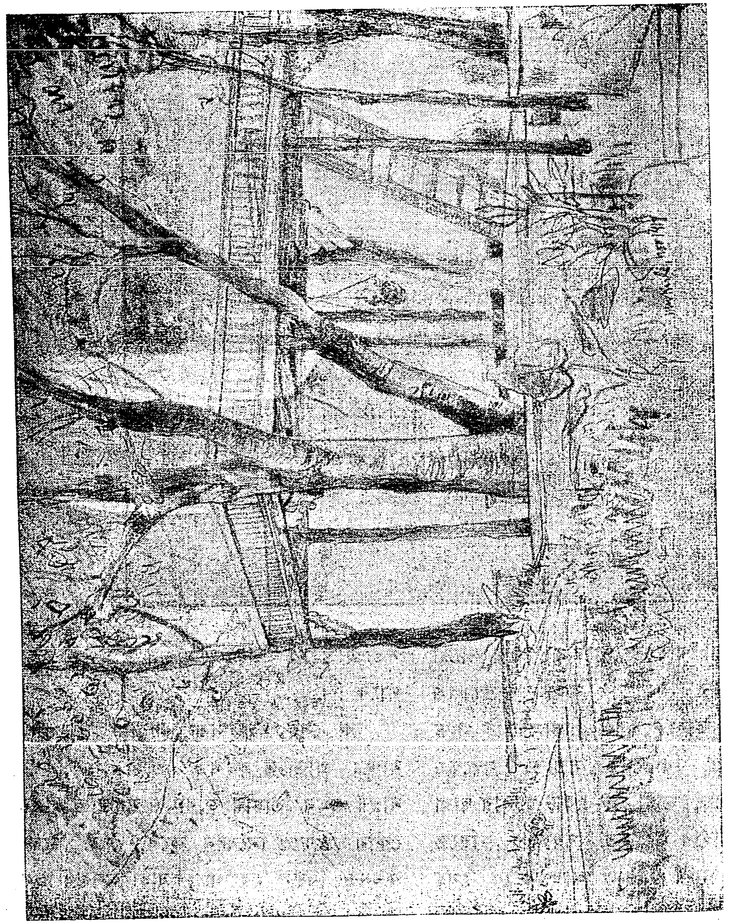

বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চাতের বাগানের মধ্যে বট ও অশথ গাছে অবলম্বিত মঞ্চ
শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

বিশ্বাসরাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্যসম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা, ব্যক্তিগত কথা তুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর।



বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চাতের বাগান।
বাগানের মধ্যে যে দুটি বড় গাছ একটি মঞ্চ অবলম্বন করিয়া আছে দেখা যাইতেছে তাহা অন্যত্র হইতে
ঔষধ-প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া তুলিয়া আনিয়া ঐস্থানে লাগানো হয়।

তিনি জনহিতকর নানাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে-সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখসম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল! সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহুদেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই-সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে এই-সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জর্ম্মানীতে আচার্য্য হর্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এ-দেশের কোন প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমান-কালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই-সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে।



আচার্য্য বসুর দার্জ্জিলিঙের গবেষণা-মন্দিরের ধ্যান-বিতান।

সেইদিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল! আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেদিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত-কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়া-লিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া চির-দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত-মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই-একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয়গণ্ডী ত্যাগ করিয়া

জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরো দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার অবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল এক-দিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই-সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী-পর্য্যটন

ভাগ্য ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে —তাহার নিয়ম,—উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্য্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচবৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরেজ একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন; উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল পরীক্ষা হইতে-ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং যে-সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষা-অনুসারে এই-সকল কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশসেবক! জানিতে পারিলাম, সেইদিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারত-সচিব মণ্টেগু। ইহার পর ভারতগভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালি-ফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জর্ম্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিক্রিয়া ফেফারের



বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া-ছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল, যে, এ-সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরিভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়-শিষ্য অর্জ্জুনের।

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে-স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়!

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে,

যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, যে, তাহার দুইটি চক্ষু একসময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণমাণ বিদ্যুৎ-উর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্ব্বাণ জীবনের বেদনা-চাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থির বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে, সেই বৃদ্ধি মাত্রা পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষ উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদ্য-স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষ-শরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে-সকল কারণে মানুষের স্নায়ু উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই-সকল কথা কল্পনা-প্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা



আচার্য্য বসুর দার্জ্জিলিঙের গবেষণা-মন্দির।

তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে-সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন-কি, মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোন বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুবেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই-সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানে বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার

উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে-সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতিবিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞান-বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ-কথা বিজ্ঞজনমাত্রেই বলিবেন। কিন্তু অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর-একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই-একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি যে-আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুইজন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্ব-প্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছু-দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম! গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই-সকল দেখিয়া মনে হয় আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান-অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেই-জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এ-স্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে-সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই-সকল নূতন সত্য এ-স্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত

পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এইস্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোন পেটেণ্ট লওয়া হইবে না; কারণ আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থ-লাভের উপায় নহে।

আমার আরো অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন, আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি-মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে-মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা; চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্ত-নাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তুষ্ণীম্ভূত, অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে! তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই-সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

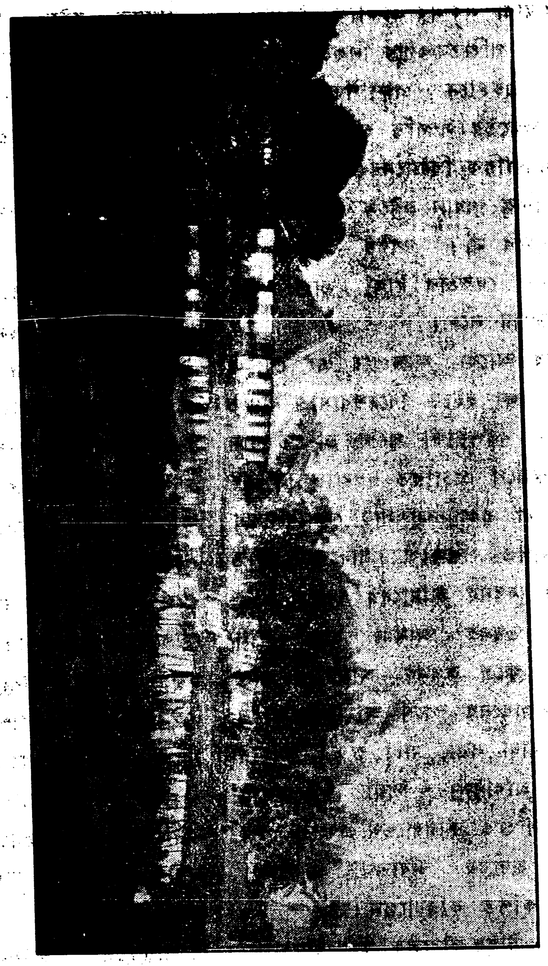

আচার্য্য বসুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী জিজ্ঞাসা-মন্দির।

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশ-বিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডে অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল

পার্থিব ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখ-মোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতের দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে। *

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

ফিরে-ফিরতি

পূজোর বাজারের মরসুম তখন শেষ হয়ে গেছে। কালীচরণ তার কাটা-কাপড়ের দোকানে এক ছোট্ট তক্তাপোষের উপরে বসে হিসেবের খাতা দেখছিল, এমন সময় তার ছেলে রমেশ এসে হাজির হ'ল। রমেশ দোকানের দিকে বড়-একটা ঘেঁসত না। আজ তাকে দোকানে আস্‌তে দেখে কালীচরণের মন ভারি খুসি হয়ে উঠল। এবার পূজোর বাজারে তার রীতিমত মুনফা দাঁড়িয়েছিল, তারই হিসেব দেখতে-দেখতে তার মন আনন্দে ফুলে উঠছিল; তার পর ছেলেকে

* বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ডি-এস-সি, সি-আই-ই, সি-এস-আই মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দির দেশ-জননীকে নিবেদন উপলক্ষ্যে পঠিত। এই প্রবন্ধের ব্লকগুলির জন্য আমরা "প্রবাসী"র নিকট ঋণী।

আজ দোকানে ঢুকতে দেখে সে-আনন্দের বাঁধ যেন ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি হিসেবের খাতা সরিয়ে, হাত-বাড়িয়ে বলে উঠল—"এস বাবা, এস!"

কালীচরণ বসেছিল দোকান-ঘরের পিছনে এক ছোট্ট অন্ধকার কুটুরীর মধ্যে। চারিদিকে কেবল সরু-মোটা লম্বা-বেঁটে নানারকম খাতার বস্তা; বসবার তক্তাপোষের উপরেও খাতার ডাঁই। তাতে এই ঘরের বাতাস এবং অন্ধকার জমাট ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল।

এই অন্ধকার কুটুরীর ভিতর প্রবেশ করতে রমেশের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠত। সেই জন্যে সে পারতপক্ষে ঐখানে ঢুকতে চাইত না। বাপ কখনো ডাক্‌লে সে দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়েই কথা শুনে পালাত। আজও সে সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কালীচরণ ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"এস, ভিতরে এস।"

অগত্যা রমেশকে ভিতরে প্রবেশ করতে হল।

কালীচরণ বল্লে—"দাঁড়িয়ে কেন? বস।"

তারপর সামনের খাতাগুলোকে একটু ঠেলেঠুলে জায়গা করে রমেশকে বসতে দিলে।

কালীচরণ চোখের চশমা ধীরে ধীরে খুলতে খুলতে বলতে লাগল—"দেখ রমেশ, আজ ক'দিন থেকে ভাবছি তোমায় একটা কথা বলব। আমি ত বুড়ো হলুম—এইবার তীর্থধর্ম্মে মন দি—কি বল?"

রমেশ ঘাড়হেঁট করে বসেছিল, বাপের প্রশ্ন থেমে যেতেই একবার মুখতুলে চাইলে, কিন্তু কোনো কথা তার মুখে জোগালো না।

বাপ বলতে লাগল—"তুমি এখন বড় হয়েছ, বুদ্ধিমান্ হয়েছ, নিজে সব বুঝে-নিয়ে এইবার আমায় রেহাই দাও। কি বল?"

রমেশ শুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চাইতে লাগল;—মুখে একটি কথাও ফুটল না।

কালীচরণ একটুখানি চুপ করে থেকেই আবার বলতে লাগল—"এর আর ভাবনা কিসের! বাপ ত আর চিরদিন থাকে না!"

রমেশের চোখ-মুখ কেমন ছম্‌ছমে হয়ে উঠল।

কালীচরণ তার পিঠের উপর হাত রেখে বলতে লাগল—"কোনো ভয় নেই তোমার—আমি খাতাপত্র সমস্ত পরিষ্কার করে রেখেছি। এখন কলের মতো সব চলছে। দিব্যি পায়ের উপর পা দিয়ে তুমি দোকান চালাতে পারবে।"

রমেশ তবুও মুখবুজে বসে রইল। কালীচরণ উৎসাহের ঝোঁকে ছেলের পিঠ-থাব্‌ড়ে বলে উঠল—"নাও, নাও, আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। এই খাতা-গুলো দেখতে আরম্ভ কর—এর থেকেই সব বুঝতে পারবে! যদি কোথাও খট্‌কা বাধে ঐ আমাদের বাগচীমশায় আছেন—ও বড় বিশ্বাসী লোক—ও তোমার সব ঠিক করে দেবে।"—বলেই কালীচরণ নিজের জায়গা ছেড়ে-উঠে রমেশকে ধরে সেইখানে বসিয়ে দিলে।

রমেশ মন্ত্রচালিতের মতো সেই খাতার বস্তার মধ্যে গিয়ে বসল। কালীচরণ খান-কতক খাতা টেনে বার করে বল্লে—"নাও এইগুলো দেখ।"

রমেশ ধীরে ধীরে একখানা খাতা তুলে নিয়ে দেখতে সুরু কল্লে। খাতার ভিতরকার জড়ানো-পাকানো অক্ষরগুলো তার চোখে ঠেকেই বেধে গেল,—মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে না। রমেশ কতকটা ভয়, কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে ঘরের চারিদিকটা চোখতুলে দেখতে লাগল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল—এ যেন কোন্-এক অদ্ভুত রাজ্যে সে এসে পড়েছে! এখানকার আলো বাতাস—এখানকার ভাষা পর্য্যন্ত যেন কেমন অদ্ভুত। তার মনে হচ্ছিল তাকে এখানে দেখে এখানকার আসবাবপত্রগুলো যেন একটা কৌতূহলে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে মনের মধ্যে কেমন-একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কালীচরণ এতক্ষণ তার ছেলের দিকে কেবলই চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ বলে উঠল—"ওগুলো হচ্ছে হাল-সনের খাতা। কি-করে একটু-একটু করে গায়ের রক্ত দিয়ে এই ব্যবসাকে জমিয়ে তুলেছি তা যদি দেখতে চাও তবে ঐ ওখানকার খাতাগুলো অবসর-মতো পেড়ে দেখো।"—বলে সে কড়িকাঠের কাছে একটা উঁচু তাক দেখিয়ে দিলে। সেখানটা ঘোর অন্ধকার। রমেশের মনে হ'ল সেখানে কালিঝুলি-মাখা কারা যেন সব বসে আছে! কালীচরণ আঙুল দেখাতেই তারা সবাই যেন ঘাড়-তুলে নীচের দিকে চাইতে লাগল!

কালীচরণ বল্লে—"দেখ বাবা, আজ আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। এতদিন ধরে মুখের রক্ত-তুলে যে-পরিশ্রম করে এসেছি —তা আজ মনে হচ্ছে—সার্থক হল। ওকি অমন-করে চুপ-করে বসে আছ কেন? তোমার জিনিষ তুমি দখল কর—প্রভুত্ব কর।"—বলেই কালীচরণ তার পাকানো চাদরখানি গলায় ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

(২)

তখনো সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি ছিল। আজ বিশবৎসরের মধ্যে কালীচরণ এক-দিনও এত সকাল-সকাল দোকান থেকে বেরুতে পায়নি। ভোরবেলা নাকে-মুখে দুটি গুঁজে সে ঐখানটিতে এসে বসত, আর রাত্রি যখন গভীর তখন বাড়ি ফিরে যেত। এমনি করে বিশ বছর তার কেটে গেছে। ঐ অন্ধকার ঘুল্‌ঘুলির বাইরেকার বাতাস-আলো কোথা দিয়ে কখন্ বয়ে গেছে তা টেরও পায়-নি। আজ এতদিন পরে বিকেলের আলোয় বেরিয়ে পড়ে তার মনটা ছাড়া-পাওয়া কয়েদীর মতো একটা প্রকাণ্ড হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। বাতাস এবং আলোর স্পর্শ একটা নতুন জিনিষ পাওয়ার মতন মনে হতে লাগল। অন্ধকার কুটুরীর মধ্যে বসে একটি-একটি করে বছরের হিসাব করে সে যে নিজেকে বার্দ্ধক্যের কোঠায় এনে ফেলেছিল আজ হঠাৎ শরতের হাওয়া লেগে মনে হ'ল সে ভুল! ঐ অন্ধকারের মধ্যে সে যে-কয়েকটা বছর কাটিয়েছে সে যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন। আজ সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। সে যে-যৌবন সম্বল নিয়ে ঐ ব্যবসায়ের কারাগারে প্রবেশ করেছিল সে-যৌবন যেন এতদিন তারই অপেক্ষায়

ঐ কারাগারের বাইরে দাঁড়িয়েছিল, আজ তাকে পেয়ে আবার অভ্যর্থনা করে নিলে। তার এতটা স্ফূর্ত্তি হতে লাগল যে সে প্রায়-দৌড়ে দোকান-পল্লীর ঘিঞ্জি সীমানা কাটিয়ে একেবারে খোলা মাঠের মধ্যে গিয়ে হাজির হল। তার মনে হতে লাগল ঐ শরতের হাওয়ার মতোই তার হৃদয়টা আজ হাল্কা, ফুর্‌ফুরে! সে মাঠের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরতে লাগল। তারপর বাড়ি ফেরবার সময় বৌবাজারের মোড় থেকে এক-গাদা ফুল কিনে নিলে। এই তার সৌখীনতার প্রথম অপব্যয়; কিন্তু আজ সেটাকে তার অপব্যয় বলে মনেই হল না।

(৩)

বাপ চলে গেলে রমেশ আরো খানিক-ক্ষণ হতভম্বের মতন বসে রইল। তার পর হঠাৎ মনে হ'ল—তাইত এখনো সে এখানে বসে কেন? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল; —এই তার বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার সময়। সে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই মনে হ'ল দোকান ছেড়ে ত তার যাবার যো নেই। সে আবার চুপ-করে বসল। কি করবে ঠিক না পেয়ে একখানা খাতা টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। কিন্তু তাতে মন বসল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল কোনোরকমে যদি সে ফাঁক পায় ত ছুটে পালায়! সে জানত বাপ আর আসবে না তবুও একবার সে বাগচীমশায়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁ হে! বাবা কখন আসবেন?"

বাগচীমশায় বল্লে—"তিনি বলে গেছেন আর আসবেন না। আপনিই এখন দোকানের মালিক।"

আমিই দোকানের মালিক!—আমিই দোকানী!—এই কথা মনে হওয়া মাত্র রমেশের সমস্ত শরীর শির্-শির্ করে উঠল। এই দোকানী-নামের উপর ছেলেবেলা থেকে তার একটা আন্তরিক লজ্জা ছিল। ছেলেবেলায় স্কুলের মধ্যে অমুক উকিলের ছেলে, অমুক ডাক্তারের ছেলে ইত্যাদি পরিচয়ের সঙ্গে সে নিজে দোকানীর ছেলে এই পরিচয় প্রকাশ করতে সে ভিতর থেকে কেমন-একটা কুণ্ঠা বোধ করত। সেইজন্য এই প্রসঙ্গ থেকে সে বরাবর পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াত। তার পর বড় হয়েও তার এ দুর্ব্বলতা ঘোচেনি। সেই জন্য দোকানের ত্রিসীমানায় আসতে তার লজ্জা হ'ত। তার মনে হ'ত যদি কোনো রকমে তার বাপের নাম-ওয়ালা দোকানের ঐ সাইন্-বোর্ডখানা বদলে যায় ত সে বাঁচে!

রমেশ মনে-মনে অনেক আশা রেখে-ছিল। দোকানের ঐ লজ্জা তাকে যতই পীড়িত করত ততই সজোরে ঐ ভবিষ্যতের আশাগুলোকে সে আকড়ে ধরত। এই সবেমাত্র সে বি-এ পাশ করেছে—এখনো এম-এ, এখনো ল বাকি। তারপর?—তার পর কত কি! মানসম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, লোকের শ্রদ্ধা, যশ—এ সবই ত পড়ে রয়েছে। যখনি কোনো প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতা শুনেছে তখনই মনে হয়েছে এমনিতর বক্তা হতে হবে। যখনি কোনো বিখ্যাত কবির কবিতা পাঠ

করেছে এবং সাদাদিকে তার প্রশংসা শুনেছে তখনই তার মনে এই লোভ জাগেছে যে এমনি প্রশংসা আমাকেও পেতে হবে। এইরকম কত আশা তার ছিল। আজ ঘরের ঐ অন্ধকারের উপর ভবিষ্যতের সেইসব আশার ছবি উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠে চোখের সামনে যেন মিলিয়ে গেল। একটা আক্ষেপ ও হতাশায় তার বুক ভেঙে পড়তে লাগল। যতবারই মনে হচ্ছিল সে একজন দোকানীমাত্র ততবারই নিজের প্রতি একটা ঘৃণায় তার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল। সেই ঘৃণা ক্রমে পাকিয়ে উঠে এমন তীব্র হয়ে উঠল যে সেই আগুনে বাপের প্রতি তার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভালোবাসা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন কেবলই মনে হতে লাগল বাপ হয়ে কত-বড় শত্রুতা সাধন না করলে!—জীবনের সর্ব্বস্ব থেকে বঞ্চিত করে কি-না পথের কাঙাল করে ছেড়ে দিলে! তার মনে হ'ল তার এই দুর্দ্দশা দেখে ঘরের সেই খাতা-পত্রগুলো, এমন-কি ধুলো-মাখা ভাঙা-চোরা আসবাবপত্রগুলো পর্য্যন্ত যেন টিটকারি দিচ্ছে। তাইতে সেই ছোট্ট কুটুরীর জমাট অন্ধকার মথিত হয়ে উঠে একটা তীব্র ঘৃণার বিষ চারিদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই বিষ প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে তার মর্ম্মে গিয়ে প্রবেশ করছিল। আজ তার প্রথম মনে হ'ল সে যে একজন সামান্য দোকানীর ছেলে—এর চেয়ে বড় পরিচয় তার নেই—তার জন্যে দায়ী তার বাপ! এত-বড় একটা দীনতার ছাপ মেরে বাপ যে তাকে এই সংসারে এনেছে—বাপের এই অপরাধ তার চোখে অসহ্য বলে ঠেকতে লাগল। ক্রোধে লজ্জায় তার সর্ব্বশরীর জ্বলতে লাগল।

ক্রমেই রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, —সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের জিনিষগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে আসছিল। রমেশের মনে হতে লাগল তার সমস্ত জীবনটা ঐ ঝাপসার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। চাকর এসে একটা ছোটো তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। তারই সাম্‌নে রমেশ চুপ করে বসে রইল। পিছনে দেয়ালের গায়ে তার দেহের ছায়া পড়ে মনে হচ্ছিল যেন একটা কালো দৈত্য সবেমাত্র ঘুম-ভেঙে উঠি-উঠি করছে। সেই ছায়ার দিকে হঠাৎ-একবার চোখ-পড়াতে রমেশ চম্‌কে উঠল।

ছোট্ট কুটুরীর সাম্‌নে দোকান-ঘরের গোলমাল ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে, শেষে চুপ হয়ে গেল। বাগচীমশায় খরিদ্দারের আশা ছেড়ে তখন হিসেবের খাতায় মন দিলেন। কেউ আল্‌মারির চাবি বন্ধ করতে, কেউ ছড়ানো কাপড়গুলো ভাঁজ করে গাঁট্‌রি বাঁধতে লাগল। সক-লেরই বাড়ি-যাবার তাগাদা, কেবল রমেশ নিশ্চল। সেই যে সে তক্তাপোষে বসেছিল আর ওঠেনি। ক্রমেই রাত হচ্ছে দেখে দোকানের লোকেরা উস্‌খুস্ করতে লাগল। শেষে তারা অধীর হয়ে রমেশের কাছে এসে বল্লে—"দাদাবাবু রাত অনেক হল —উঠুন।" রমেশ এক ধমক দিয়ে উঠল। তারা আরো-একটু অপেক্ষা করলে, তার পর চাবির গোছা রমেশের সাম্‌নে রেখে বল্লে—"তা'হলে আমাদের ছুটি দিন।" রমেশ

একটা ভীষণ গর্জ্জন করে বলে উঠল—"বেরো তোরা—বেরো!" তারা অবাক হয়ে রমেশের মুখের দিকে চাইতে লাগল। তারপর রমেশের তীব্র দৃষ্টি তখনো তাদের উপর রক্তবর্ণ হয়ে ঘুরছে দেখে আর দ্বিরুক্তি না-করে তারা আস্তে-আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

(৪)

কালীচরণ যখন ফুলের মালা হাতে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরল তখন তাকে দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। প্রতিদিন সে চোরের মতন রাতের অন্ধকারে বাড়ি প্রবেশ করে;—কখন্ আসে-যায় কেউ টের পায় না। সবাই ভাবলে আজ হল কি! কালীচরণের স্ত্রী অনেক দিন মারা গেছে। বাড়িতে ছিল তার এক বিধবা বোন। সে দাদাকে এত সকাল-সকাল আসতে দেখে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"দাদা তোমার অসুখ করেনি ত!"

দাদা বল্লে—"নারে, না!"

—"তবে এত সকাল-সকাল যে!"

—"আমি যে ছুটি পেয়েছি!"

—"ছুটি? সে কি দাদা!"

—"আরে, আর আমায় দোকানে বেরুতে হবে না।"

—"তবে দোকান চলবে কি করে?"

—"এখন থেকে রমেশ চালাবে।"

—"রমেশ ছেলেমানুষ—সে কি পারবে?"

—"দেখ, আর ভাবতে পারিনে। এতকাল ধরে কেবল ঐ ভাবনাই ভেবে এসেছি! যা-কিছু করেছি সে ত ঐ রমেশের জন্যেই। আমার নিজের জন্যে হ'লে কি এমন-করে বুকের রক্ত তুলে খা পারতুম? এখন ওর জিনিষ ওকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।"

—"তা বেশ করেছ দাদা, তো নিজের উপায় কিছু করে রাখলে?"

—"দেখ বিন্দি, আজ আর আ ভাবাস্‌নে! আজকে আমি সব ভা ঠেলে-ফেলে হাঁফ-ছেড়ে বসেছি। র কি তার বুড়ো-বাপকে দুমুঠো খেতে দি নারাজ হবে।"

—"না দাদা, আমি সে-কথা বলছিনা দোকান তুমি রমেশকে দিয়েছ, বেশ করেছ নগদ টাকা-কড়ি যা আছে তা কি হা রাখলে? বুড়ো-বয়েসে ছেলের হাত-তো হয়ে থাকবে কেন? পরে ত রমেশে সবই।"

—"দেখ বিন্দি, তুই আজ আমা জ্বালালি। সমস্ত হিসেবপত্র চুকিয়ে আজ আ নিশ্চিন্ত হয়ে দোকান থেকে বেরিয়েছি —তুই আবার তার জের টানতে আ করলি। আরে, নগদ টাকা কি আমা কিছু আছে? যা লাভ করেছি সে-স ত ঐ দোকানের গর্ভে ঢেলেছি, তা করলে ব্যবসা ফলাও হবে, কেন? ভবিষ্য রমেশকে সংসার চালাতে হবে ত? তা কোন্ দু-দশটা ছেলেমেয়েই না হবে। দে বিন্দি, এখন ওসব কথা যেতে দে; আ আর কোনো-ভাবনা ভাবতে চাইনা। এখ খাবারের জোগাড় কর দেখি—আমায় খি পেয়েছে।"

বিন্দি তাড়াতাড়ি উঠে দাদার জ খাবারের জায়গা করতে যাচ্ছিল, হ্যা

র মালার দিকে চোখ পড়াতে অবাক বলে উঠল—"দাদা, আজ এত ফুল ছ যে! কি হবে?"

তাই ত ফুলগুলো হবে কি! কিসের কিনলুম একথা কালীচরণের একবার ও হয় নি। সে শুধু মনের আনন্দে—র লোভে—ফুলগুলো কিনে ফেলেছিল। কে কি জবাব দেবে সে ভেবে পেলে সে বল্লে—"কী আর হবে! যা-হয় করনা!"

বিন্দি খুসি হয়ে বল্লে—"বেশ ফুল দাদা! লো আমার গোপালঠাকুরকে দিইগে।" লে সে চট্‌পট্ ফুলগুলো তুলে নিয়ে -ঘরের দিকে ছুটল।

(৫)

রমেশ তখনো চুপ-করে বসেছিল। যে তার বিশেষ-কিছু ভাবনা উঠ- তা নয়। কেবল ক্ষোভ, অভিমান, মানের ভাবগুলো স্ফীত হয়ে উঠে র মনের তারগুলোকে টেনে কড়-কড়ে র তুলছিল। একলাটি দোকান-ঘরের ধ্যে বসে-থেকে-থেকে এই কথা তার ন ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল যে এই দোকানের দোকানী ছাড়া আর- ছু নয়। দোকানটাকে তার মনে হতে গল একটা ভীষণ গারদ। এই গারদে তার বনকে চিরদিনের জন্যে বন্দী করে বাপ কে একলা ফেলে চলে গেছে।—বাপ তার জের মুক্তির জন্যেই এই শৃঙ্খলভার লের সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে।—স্বার্থপর াপ!

রমেশ চারিদিকে চেয়ে দেখলে—কেউ কোথাও নেই—সে একলা! তার মনে হতে লাগল এই নির্জ্জনতা, আর এই ভীষণ কারাগার ক্রমেই যেন দীর্ঘ হতে দীর্ঘ হয়ে উঠছে—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার সীমা দূরের দিকে ছুটে চলেছে। এ থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। সে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়াল।

রাস্তার জন-কোলাহল তখন থেমে গেছে। ঘরের প্রদীপ মিট্-মিট্ করে জ্বলছে। উঠে দাঁড়াতেই তার পিছনের সেই ছায়া-দৈত্যটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রমেশ তার সাম্‌নে খানিকক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হ'ল সে যেন মিটি-মিটি হাসছে—রমেশের অবস্থা দেখে ভারি মজা পেয়েছে। রমেশ তাড়া-তাড়ি মুখ-ফিরিয়ে দাঁড়াল। অমনি মনে হ'ল সেই ছায়াটা যেন ভ্রূকুটী করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই উপরের তাকের কালো-কিষ্টি খাতাগুলো যেন ফিস্-ফিস্ করে হেসে উঠল। রমেশ পাগলের মতো ছট্-ফট্ করতে লাগল। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সাম্‌নের খাতাগুলো নিয়ে ওলট-পালট করতে লাগল, —টেবিলের টানাগুলো ধরে টানাটানি করতে লাগল। এমনি-করে জিনিষপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে-করতে একখানা বড় খামে-মোড়া এক-তাড়া কাগজ তার হাতে এসে পড়ল। কৌতূহলের বশে নয়—উত্তেজনার বশে নাড়াচাড়া করতে-করতে সেই কাগজের লেখার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। এটি তার বাপের উইল।

রমেশ গোটাকতক লাইন পড়েই বুঝলে

তার বাপ এই দোকানের সর্ব্বস্ব তাকে দান করেছেন। হঠাৎ তার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে উঠল। এ ত দান করা নয়—এ অপমান করা! কে তাঁর কাছে এই দোকান ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল? যে-দোকানী-নামের অপমান তিনি চিরদিন গলার হার করে বহন করে এসেছেন সেই অপমানের হার তিনি ছেলের গলায় উপহার দিয়েছেন! আ মরি, মরি, কী উপহার! তাও আবার এমন-করে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা যে নিষ্কৃতি নেই! কারণ উইলে লেখা আছে—"ইহাতে আমার পুত্রের বিক্রয়াধিকার, দানাধিকার কিম্বা কোন প্রকারে হস্তান্তর করিবার অধিকার রহিল না।"

রমেশ উইলখানা দুই হাতদিয়ে ধরে, কুটিকুটি করে, পাশে কাপড়-ইস্ত্রী-করবার যে আগুনের গামলা ছিল তার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কাঠ-কয়লার আগুন প্রায় নিভে এসেছিল, খোরাক পেয়ে আর-একবার স্ফূর্ত্তিকরে জ্বলে উঠল। আগুনের এই স্ফূর্ত্তি নেশার মতন রমেশের মনে গিয়ে লাগল। রাগের আক্রোশ কোথায় গিয়ে পড়ে জায়গা না পেয়ে ঐ আগুনের গামলায় গিয়ে পড়ল। রমেশ তখন হাতের কাছে যা-কিছু কাগজ পেলে ঐ অগ্নিতে সমর্পণ করতে লাগল। শেষে হিসেবের খাতায় পর্য্যন্ত টান পড়ল। তার মনে হতে লাগল তার বাপ উইলে দোকানের সমস্ত অধিকার আটক রেখেছেন বটে কিন্তু এই একটা ফাঁকে মুক্তি আছে—সে এই অগ্নি!

সে যা হাতের কাছে পেলে ঐ আগুনে দিতে লাগল। তাতে আগুনের যত স্ফূর্ত্তি, রমেশেরও তত স্ফূর্ত্তি, আর তত স্ফূর্ত্তি ঐ কালো ছায়াটার! সে রমেশকে ইসারা করে আঙুল দেখিয়ে-দেখিয়ে বলছিল—দাও, দাও, আহুতি দাও, সর্ব্বস্ব আহুতি দাও!

দেখতে-দেখতে আগুন নানাদিকে শিখা বিস্তার করে উল্লসিত হয়ে উঠল। সমস্ত দোকানখানাকে গুষে খাবার জন্যে তার সহস্র জিহ্বা লক্-লক্ করতে লাগল। সে দোকানের যথা-সর্ব্বস্ব জিভ দিয়ে টেনে-টেনে ক্রমে নিজের উদরে পুরতে লাগল। শেষে এক মহা অগ্নিকাণ্ড! রমেশ ধোঁয়ায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

* * * *

পরদিন সকালে কালীচরণ যখন বার হচ্ছে, তখন বিন্দি বল্লে—"দাদা, এরই মধ্যে যে বেরুচ্চ? কাল যে বল্লে, আমায় নিয়ে কাশী যাবার সব ঠিক করবে আজ!"

কালীচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"কাশী এখন মাথায় থাকুন। এখুনি আমায় একবার ফায়ার-ইন্স্যুরেন্স অফিসে যেতে হবে।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আহ্বান

মোরে কে ডাকিছে অজানায়!
আকাশের চাহনিতে, বাতাসের
পরশ-লীলায়!
তাইতে আসন ছাড়ি মুগ্ধ আঁখি
মুক্ত জানালায়!

দাঁড়ায়ে রয়েছি আঙিনায়,
অলিন্দ-সোপান হতে একা নেমে,
ব্যাকুল হিয়ায়!
প্রসারিত আঁধারের আলিঙ্গনে,
সঁপি আপনায়!

ছাড়াইয়া তোরণ-সীমায়,
এসেছি পথের ধারে, পথ যেথা
ভরা জনতায়,
মহানন্দে আগুয়ান, তরঙ্গের
নৃত্যভরে ধায়!

ফিরিয়া চাহেনা কেহ হায়,
চলে সবে, চলে সবে, দূর হতে
সুদূরে মিলায়,
দ্রুত পদশব্দ যত, সমস্বরে
ডাকে, 'আয়' 'আয়'!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ছিটে-ফোঁটা

আমাদের গাঁয়ে শামলাং-এ একটি (মালার) কাঁসারী যুবক থাকতো; দেখতে ভারি সুন্দর, কালো-কুচ্‌কুচে পাথরের তৈরি মূর্ত্তিটির মত; আর তার মনটা ছিল স্বচ্ছ নীল আকাশের মত পরিষ্কার। সে আমাদের এই অসভ্য কোলেদের গাঁয়ের শিল্পী ছিল—গানও গাইতো তোয়লাও বাজাত। তাকে আমার ভারি ভাল লাগত। তারপর তার বিয়ে হ'ল। আমাদের বাড়ীতে সে তার বৌকে দেখিয়ে গেল—তার সেই দাম্পত্য-সুখের বুকভরা আহ্লাদ তার চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল। কিছুদিন পরে হঠাৎ শুনলুম যে তার বাপ—অর্থাৎ শ্বশুর, তার কাছ থেকে জোর করে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—আর, সে আহার-নিদ্রা, শিল্প-কলা, কাজকর্ম্ম সবতাতেই জলাঞ্জলি দিয়ে তার কুঁড়েটিতে চুপচাপ বসে আছে—কারও সঙ্গে দেখাও করে না কথাও কয় না। আমি এই সংবাদ পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করলুম। তার কুঁড়েটি গ্রামের মধ্যে সব-চেয়ে ছোট, কিন্তু সব-চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আঙ্গিনায় একটি বড় অশ্বত্থ-গাছ; সেটির আলবাল মাটি দিয়ে সুন্দর-

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভাবে লেপা। তার ঘরের আর-একটি বিশেষত্ব, দেয়ালে বাঘ হাতি প্রভৃতির মূর্ত্তি নানান রঙে আঁকাজোখা।

আমি ঘরে প্রবেশ করে তার হাপরের পাশে তার কাছে গিয়ে বসতেই সে একটু দুঃখের হাসি হাস্‌লে; তারপর আস্তে আস্তে তার মনের কথা সব খুলে বল্লে। আমি ভাল করে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে পুনরায় তাকে বিয়ে করতে বল্লুম। সে তখন আমায় বল্লে, "আমি তোমার কথা শুনব না। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, অতএব তার বাপ তাকে যেখানেই লুকিয়ে রাখুক, আমি বারো বৎসর তাকে আগে দেশে দেশে পথে পথে খোঁজ করে দেখব—তারপর অন্য কথা"। শেষে একদিন শুনলুম, তার যেমন কথা তেমনি কাজ। সে ঘর-দুয়োর ধান-চাল সঞ্চিত যা-কিছু ছিল, সব ফেলে কোথায় তার প্রিয়ার সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে তা কেউ জানেনা।

আমাদের মনে হয়—শিল্পিদেরও যাত্রা শিল্পলক্ষ্মীকে পাবার জন্যে এমনিতরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথঘাট বিচার করে তিথি-নক্ষত্র দেখে যাত্রা নয়—একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

* * * *

ভারতশিল্পের এই নবজীবনের যুগটি খুব সত্যিকারের যুগ। এটি নারকোলের মত; তার মালাটি যখন ভরে উঠবে তখন তার আশেপাশে জল আর একটুকুও থাক্‌বে না, সবটা একেবারে ভরে উঠবে। এইজন্যে অঙ্কুরোদ্গমের কালটাই আসল; এবং ফসল যখন ভরে উঠবে তখন আর ব্যাখ্যা বা সমালোচনার প্রয়োজন থাকবে না।

* * *

নিরেনব্বই জন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে আর্টিষ্ট নামে পরিচিত হলেই তাঁরা জান্‌তে চান, আমরা 'ফোটো-এনলার্জমেণ্ট' করতে পারি কি না। তাঁরা এটা বোঝেন না বা ভাবেন না যে, আর্টিষ্ট নির্জ্জীব ক্যামেরা-বাক্স নয়, ক্যামেরায় তোলা ছবির রূপটি তাঁর কাছে একেবারেই মূল্যবান নয় যতটা তার জীবন্ত চেহারাটা। এখানে আর্টিষ্ট যদি 'ফোটো-এন্‌লার্জমেণ্টে'র বদলে কেবলমাত্র চেহারাটা আঁকবার সুযোগ পান, তবে তাঁর কতকটা শিল্পনৈপুণ্য দেখাতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মোটের উপর মানুষের চেহারা দেখে আঁকাটা চরম বলে কোন বড় শিল্পীই মেনে নিতে পারেন না। এটা জানা উচিত যে, চেহারা দেখে দেখে আঁকার উপরেও শিল্পীর সৃজনী-শক্তি (Artistic Creation) বলে একটা জিনিষ আছে—এবং তার প্রতিই আর্টিষ্টের শ্রদ্ধা হচ্ছে সব-চেয়ে বেশী।

* *
*

সঙ্গীত-বিদ্যাটি যে অনন্ত (Infinite) এবং চিত্র-বিদ্যা যে সান্ত (Definite) এ বিষয়ের প্রমাণ পাশ্চাত্য শিল্পীদের বস্তুপ্রধান শিল্পগুলি দেখলেই পাওয়া যায়। তাঁরা Still-life বা জড়-চিত্র—অর্থাৎ সামনের জিনিষ—নিয়েই এমনি মশ্‌গুল

যে, দূরের দিকে তাঁদের নজর একরকম চলে না বল্লেই হয়। আবার, যখন প্রাচ্য চিত্রকরদের আঁকা—বিশেষতঃ জাপান ও চীনের অনন্ত-নীল আকাশের উপরে ভাসমান বলাকা-শ্রেণীর সুদূরে যাত্রা প্রভৃতির ছবি দেখি তখন আর চিত্রবিদ্যাকে সান্ত (definite) বলতে কিছুতেই ইচ্ছা হয় না—এখানে সে ভূমাকেই মনে পড়িয়ে দেয়। সঙ্গীত বাহ্যত শব্দপ্রধান হলেও যেমন তার মধুর রসটুকু মনের কোণে এক জায়গায় স্পন্দিত হতে থাকে, এই প্রাচ্য শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি দেখার-মত-করে দেখলে তাদের মধ্যে রেখার সমষ্টি ছাড়াও অনেক অদেখা জিনিষও কল্পনায় জেগে উঠতে থাকে। আমাদের এই নবীন শিল্প-সাধনার দিনে তাই কবির কথায় বলতে ইচ্ছা হয়—

"সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন সহজ হবি
কাছের জিনিষ দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি"

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

কাগজের হাতী

বা

নব্য দিঙ্‌নাগ্‌-প্রশস্তি

দূরে থেকে দেখে দিগ্‌গজ ব'লে
ভুল ক'রেছিনু প্রায় তারে,
কাছে এসে দেখি দিগ্‌গজ একি
নজ্‌গজে এ যে এক্‌বারে!
পথ জুড়ে চলে প্রতি পদে টলে
চ্যাচাড়ি-চেরাই-দন্ত রে,
ঘোড়া ভড়্‌কায় দেখে আচম্‌কা
ছেলে ভয় পায় অন্তরে।
আগে আগে চলে ময়ূরপঙ্খী
কাগজের হাতী ধায় পিছে,
প্রহ্লাদ-মারা শুঁড়ের বহর
কিন্তু সে ভুয়ো—সব মিছে।
ও শুঁড় কারেও মুড়ে তুলে কভু
পাটে তুলে রাজা কর্ব্বে কি?—
ও শুঁড় কখনো মহালক্ষ্মীর
অভিষেক-ঘট ধর্ব্বে কি?—
ও শুঁড়ে পাকড়ি বট-পাকুড়ের
পাতাটাও ছেঁড়া যায় না রে!
ও শুধু খাম্‌কা সমাস ভাঙিতে
পটু টেনিসন-টার্ণারে॥

কলম্‌গীর।

পর্-ঈ-তাউস্

ওপারে মুচিখোলার নবাবী নিলেমে চড়েছে, এপারে সবুজ ঘাসের ঢালুর উপরে দুই বন্ধুতে পা-ছড়িয়ে চড়ুই-ভাতির পরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি,—ঠিকে-গাড়ির ঘোড়া-গুলো হঠাৎ কাজের অবসরে এক-এক-বার যেমন ধুলোয় লুটোপুটি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নেয়।

সেদিন একটা ভাঙা খাঁচা জলের স্রোতে ভেসে চল্‌তে দেখে আমি অবিনকে তামাসা করে বলেছিলেম—"ওহে খাঁচাটা নবাবের চিড়িয়াখানার দিক থেকে যখন ভেসে আস্‌ছে তখন এটা পক্ষীরাজের খাঁচা হলেও হতে পারে। দেখ-না সাঁৎরে, যদি ওটাকে ধরতে পারো।" অবিন সাঁতার একেবারে না জানলেও সেদিন যে-কোরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর খাঁচাটা না তুলে, তাকে জেলে ডেকে জল থেকে তুলে আনার জন্যে আমার সঙ্গে যে-আড়িটা দিয়েছিল চিরদিন সেকথা আমার মনে থাকবে। এখন সে-কথা অবিন ভুলে গেছে কিন্তু পক্ষীরাজ তার সেই যৌবনের দুঃসাহস বোধ হয় ভোলেনি, তাই হঠাৎ আজ তার স্থূল-শরীর কাশীপুরের ঘাট থেকে জাহাজে আমাদের দর্শন দিতে এসে উপস্থিত! গোছা-গোছা ময়ূরের পালক-হাতে সে লোকটা! কী অদ্ভুত যে দেখতে তাকে তা আর কী বল্‌ব! ভণ্ডামির যত-রকম পালক হতে পারে সব-ক'টা দিয়ে সে আপনাকে সাজিয়েছে!

ছোট ছেলেতে পাখীর ছানা হাতে পেলে টিপে-টুপে পালক-ছিঁড়ে যেমন করে, অবিন ঠিক তেমনি এ লোকটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে। অবিনের গায়ে তুলো-ভরা ছিটের কালো কোট। এ-লোকটাকে ময়ূর-পুচ্ছে বিচিত্র দেখে আমার কথামালার দাঁড়-কাকের গল্পটা মনে পড়ল। আমার তুলনাটা ইংরিজিতে অবিনকে শুনিয়ে দিতেই সে-লোকটা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলো—"তোমার বন্ধুর কোটের নক্সাটা ভালো করে কি দেখা হয়েছে? ওটা যে আগাগোড়া ময়ূর-পালকে ভরা।"—বলেই লোকটা উতরপাড়ার ঘাটে লাফিয়ে পড়লো—গাঁজার বিকট গন্ধে জাহাজ ভরে দিয়ে। আমি অবিনের কোটের দিকে চেয়েই একেবারে ঘাড়হেঁট কল্লেম।

আকাশে একটা রাম-ধনুক ময়ূরের পালকের রং-ধরে দেখা দিয়েছে। আবার যখন মুখ-তুলে চাইলুম তখন সবপ্রথম ওইটেই আমার চোখে পড়লো। আমি অবিনকে সেটা দেখাবো বলে ডাকতে গিয়ে দেখি অবিন সেখানে নেই। আশে পাশে কোনো সহযাত্রী দেখলেম না। জাহাজের ডেক্ সমস্তটা খালি পড়ে আছে। তারি এককোণে আমাদের বাঁয়া-তবলা-জোড়া পড়েছিল। হঠাৎ সে-দুটো দেখি দুখানা কোরে পালকের ডানা মেলে কোরে পাখীর মত উড়ে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের খালি বেঞ্চিগুলো একে একে পালক গজিয়ে পক্ষীরাজের মতো লাফাতে লাফাতে ডেক্‌ময় ছুটোছুটি করতে করতে একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চম্পট দিলে।

আমাকে না-জানিয়ে বন্ধুরা সবাই হয় মাছের মতো, নয় পাখীর মতো পাখা না গজিয়ে কেমন করে এই মাঝ-গঙ্গা থেকে সরে পড়লেন, বেঞ্চগুলো আর ডুগ্‌ডুগি দুটো কেন এমন অদ্ভুত কাণ্ড করতে লাগলো—একথা যখন আমার মনে উদয় হয়েছে অমনি দেখি ষ্টিমারখানা দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড ডানা ছড়িয়ে দিয়ে সোজা সেই আকাশ-জোড়া ময়ূর-পুচ্ছের মতো রামধনুকের ফাটকটার দিকে উঠে চল্লো।

জল ছেড়ে শূন্যে খানিক ওঠবার পর দেখছি অবিন উপরতলার সারেঙের কুট্‌রী থেকে উঁকি মেরে অমার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে! তার পাশে সেই ময়ূরের পালক-ওয়ালা অদ্ভুত মানুষটা আমাদের! আমি এদের কোনো কথা বলেছিলেম কিনা মনে নেই, উত্তরে একটা খুব গম্ভীর গলায় শুনলেম—"পালকের যাদুঘরে চলেছি,—ময়ূর-পুচ্ছধারীদের সপ্তম স্বর্গে!"

স্বর্গ এবং যাদুঘর এর একটাতেও যাবার মতলবে আমি বাড়ি থেকে রওনা হইনি। তরী আমার বেরিয়েছে জোয়ার ঠেলে; ভাটা কাটিয়ে ঘরে ফিরবো—এই কথাই মনে ছিল। কাজেই আমি খুব চেঁচিয়ে বল্লেম—"জাহাজ ভেড়াও, আমি নামতে চাই।" কিন্তু জাহাজ তখন তার তরণীরূপ ছেড়ে পাগ্‌লা পক্ষীরাজ হয়েছে। আর চালাচ্ছেন তাকে সেই পালকধারী! কাজেই কোনো ঘাটেই যে সে না-দাঁড়িয়ে বরাবর রামধনুকের মটকায় গিয়ে হ্রেষাধ্বনি করে হঠাৎ থামবে তার আর বিচিত্র কি!

তিনটেতে আমরা পক্ষীরাজের পিঠ থেকে জ্বলন্ত উল্কার মতো কেন যে এতক্ষণ মহাশূন্যে ঠিক্‌রে পড়িনি এইটেই আশ্চর্য্য! ময়ূরের পালকের ডগায় মাছি যেমন, তিনটিতে আমরা তেমনি সাতরঙের একটু কিনারা প্রাণপণে আঁকড়ে শূন্যে দুলছি, এমন সময় আমাদের পাণ্ডা—সেই ময়ূরপুচ্ছধারী মানুষ-দাঁড়কাক—রামধনুর ডগায় স্থির হয়ে বসে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। সেখানে কি আশ্চর্য্য পাখীরাই ঘুরে বেড়াচ্ছে! রঙিন পালকের আলোতে সে-দিকটা কখনো দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নার মতো নীল, কখনো সকালের আকাশের মতো সোনালী, সন্ধ্যার আকাশের মতো রাঙা, জলের মতো ঝকঝকে রূপালী, ধানের ক্ষেতের মতো ঠাণ্ডা সবুজ। এই বা নতুন পাতার মতো টাট্‌কা, এই ঝরা পাতার মতো মলিন। রঙের খেলার সেখানে অন্ত নেই। তারি মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে একদল শিশু, পাখীর ঝরা-পালক উড়িয়ে-উড়িয়ে ছড়া-ছড়ি করে—তপোবনের শকুন্তলার মতো। আমি অবিনের গা টিপে বল্লেম—"ওহে এরাই হচ্ছে পরী।"

পাণ্ডা একটু হেসে বল্লেন—"আজ্ঞে না। এরা হলো রামধনুকের প্রাণ। এরা আছে বলেই রামধনুকে রং আছে। পরী দেখতে চান্ তো ঐ দিকটায়—যে দিকটায় পালকের যাদুঘর—যেখানে পালকের দাম আছে।"—এই বলে তিনি দক্ষিণে—প্রায় দক্ষিণ-দুয়ারের কাছাকাছি একটা জায়গা দেখিয়ে

বল্লেন—"ওই যে দেখছেন দুখানা ডানা বেঁধে হাত-দুটি বুকে রেখে, ওঁরা হলেন মানুষ, কেবল ডানার খাতিরে আমরা বলি ওঁদের এন্‌জেল্, আর কোনো তফাৎ মানুষের সঙ্গে নেই। আর ঐ দেখুন গরুড়কে। শুধু ডানা নয়, পাখীর ঠোঁটটা পর্য্যন্ত মুখোস করে' পোরে দাস্য-রসের রাজসিংহাসন আপনার রামা-চাকরের হাত থেকে বেদখল করে নিয়ে বসে আছেন। ওই ঠোঁট আর ডানা বাদ দিলে উনি মানুষমাত্র। আর ওই দেখুন বৃন্দাবনের শুক-সারী। এঁদের রাজা গরুড় তবু প্রভুর সেবার জন্যে মানুষের হাত দুখানা রেখেছেন; কিন্তু এই গরুড়ের চেলা সেবাদাস সেবাদাসীগুলি নিজেদের টিয়াপাখীর খোলসে সম্পূর্ণ মুড়ে ফেলে আসলটাকে একেবারেই গোপন করে' দিব্বি সুখে বিচরণ করছে। মানুষ যখন পালকের শিল্পে খুব বিচক্ষণ হয়ে ওঠেনি—অর্থাৎ তাদের গোঁজা পালক ও পাখ্‌না সহজেই লোকের কাছে ধরা পড়তো—এরা তখনকার জীবের আদর্শ। এ অংশটাকে যাদুঘরের পুরানো অংশ বলা যায়। এর পরেই ওদিকে ঐতিহাসিক যুগের জীবগুলো। ক্রুজেডারদের মতো পালক তারা কেবল মাথার ঝুঁটিতে রেখেছে, বাকি সমস্ত-দেহ লোহার সাঁজোয়া দিয়ে অনেকটা পাখীর ধরণে নিজেদের সাজিয়েছে। এই সময় থেকে ডানার চাল উঠে গিয়ে পালকের ঝুঁটি বাহাদুর-লোকমাত্রেরই মধ্যে ফ্যাশন হয়ে উঠলো। টুপিতে, পাগড়ীতে, মুকুটে, ঘোড়ার মাথায় পালক গোঁজার যুগ এটা। ময়ূরের পালক, বকের পালক, কাকের পালক, চিলের পালক,—উটপাখী, ঘোড়াপাখী, সবার পুচ্ছ এরা বহন করেছে,—নিজেদের পুচ্ছ খসিয়ে রেখে! তার পর আধুনিক যুগের জীব দেখ। এখানে একদল শীয়ে পুচ্ছ দেখা যায়। একদল দেখা যায় পালকের কলম পেশা। আর-একদল সম্পূর্ণ পালক গোপন করে' পালকধারীর রাজা হয়ে কেবল পালকের রং—গেরুয়া সাদা কালো ইত্যাদি গায়ে মেখে রাজত্ব করছে—কেউ আদালতে, কেউ বিদ্যালয়ে, কেউ ছাপাখানায়, কেউ ডাক্তারখানায়—প্রকাণ্ড পালকধারীদের কন্‌গ্রেসে কন্‌ফরেন্স স্ব-স্ব-দেশে। এর পরে যে-যুগ আসবে তার সোনার ডিম পালকের গদীর উত্তাপে এখনো সিদ্ধ হচ্ছে। এই ডিম ফুটে যে বার হবে তার পালক পিঁপড়ের পিঠের দুখানি ডানার মতো হঠাৎ গজাবে—এই-রূপই পণ্ডিতরা বলেন। আর সেই অদ্ভুত জীবের জন্মদিনের 'শোকোচ্ছ্বাস গাথা' লেখবার জন্যে ময়ূরের ডানার গেরুয়া রঙের পালকের কলমটা কানে গুঁজে যে আসবে তার স্মৃতিসভার বিজ্ঞাপন এখন হতে বিলি আরম্ভ হয়েছে দেখ।"

বড় বড় শিল্, পালক, ধুলো-বালি মুঠো-মুঠো ঝুড়িঝুড়ি আমাদের মাথায় মুখে চোখে পড়ছে। রামধনুক আঁকড়ে আর থাকা চলে না। এরি মধ্যেই তার সাত রং ফিকে হতে সুরু হয়েছে—সম্পূর্ণ গলতে সাত সেকেণ্ডও লাগবে না। এই ঝড়ের মুখে অবিন তার পালক-ছাপা কোটের বোতাম এঁটে, পাণ্ডাজী তাঁর ময়ূর-পালকের চামর বাগিয়ে উড়ে পড়বার জোগাড় করে দেখে আমি বল্লেম—"ওহে আমার উপায়! আমার তো পালক নেই। আছে মাত্র গায়ে এই কাশ্মীরের 'পরীতোষ' শাল। এর নাম পরী বটে কিন্তু এর পালক মোটেই নেই! একে নিয়ে তো ওড়া চলবে না?" "খুব চলবে। ওকে বুঝি বলে পরীতোষ? ওর পার্সি নাম হচ্ছে পর্-ঈ-তাউস্। ময়ূরের পেখমের গোড়াতে যে ছাই-রঙের নরম পালক লুকানো থাকে তাই দিয়ে এটা প্রস্তুত। বাদশারা তক্ত-তাউসে এই শালের বিছানা লাগাতেন। এখন আমরা গায়ে দিয়ে থাকি! ভয় নেই উড়ে পড়।"

মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শালখানা মুড়ি দিয়ে রামধনুকের মট্‌কা থেকে ঝুপ করে' আবার যে-জাহাজ সেই-জাহাজেই নেমে পড়লেম। চোখ খুলে দেখলেম যেখানকার সেইখানেই আছি—পূর্ব্বের মতো শ্রীঅবনীন্দ্র। রামধনুক আর পক্ষীরাজের সঙ্গে অবিনটা পালিয়েছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসকাবারি

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম

"আশ্বিন ও কার্ত্তিক" সংখ্যার 'নারায়ণে' বিপিনবাবুর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ অংশ বাহির হইয়াছে। এবারকার আলোচনায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি এতই নূতন নূতন দিক হইতে ভাবিয়াছেন এবং তাঁর ভাবনাগুলিকে এমন স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে স্থানে স্থানে তাঁর রচনা পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ দিকের পক্ষ লইয়া তাকে দাঁড় করাইতে হইবে এই লক্ষ্য থাকিলে লেখা কখনই এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না।

বিপিন বাবু এবার 'philosophic anarchism' অথবা দার্শনিক অরাজকতার কথা উত্থাপন করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করিতেছেন, এই দার্শনিক অরাজকতাই তার শেষ পরিণাম বলিয়াছেন। কথাটি অত্যন্ত খাঁটি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদ যাঁরা করেন,—যাঁরা সমাজ-তন্ত্রতা ও সমাজ-বোধ ব্যক্তিতন্ত্রতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের চেয়ে পূর্ণতর ও কল্যাণতর বলিয়া ইতিহাস হইতে নানা নজির পাড়িয়া তর্ক করিতে বসিয়া যান্, তাঁদের কারো কাছেই রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এহেন তাৎপর্য্য ধরা পড়ে নাই।

বিপিনবাবু লিখিতেছেন :—

"কোনও সংস্কার মানিব না, তিন হাজার বৎসরেরও নহে, ত্রিশ বৎসরেরও নহে—বেশ কথা। অন্তরে যে কর্ত্তাপুরুষ আছেন, কেবল তাঁহাকেই মানিয়া চলিব, বাহিরের কোনও কর্ত্তৃত্বের অধীনে

থাকিব না,—শাস্ত্রেরও নহে, গুরুরও নহে; এক জন রামমোহনেরও নহে, বারজন রামারও নহে; স্মৃতিরও নহে, সমিতিরও নহে;—অতি উত্তম কথা। এই সংকল্প লইয়া যে জীবনপথে ও সাধনপথে দাঁড়াইতে পারে এবং জীবনের সকল বিষয়ে বিশ্বের প্রতি যথাসাধ্য উদাসীন হইয়া, কেবল নিজের কাছে খাঁটি থাকিতে চাহে, তাহাকে মাথায় করিয়া লই। * * * *

"সংস্কারের প্রভুত্ব যদি নষ্ট করিতে হয়, তবে এতটা বুকের পাটা থাকা চাই যে, যে ঈশ্বর মানিবে না, পরকাল মানিবে না, নীতি মানিবে না, ধর্ম্ম মানিবে না,—কেবল নিজের নিকটে খাঁটী থাকিয়া জীবনপথে চলিবে এবং নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া অপরের স্বাধীনতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিবে না, এইটুকু মাত্র মানিয়া চলিবে,—তাহাকেও মাথায় করিয়া লইতে হইবে।

এরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কেহ কেহ অরাজকতা বলিতে পারেন। কিন্তু এ অরাজকতা প্রাকৃতজনের সমাজদ্রোহী অরাজকতা নহে। ইউরোপে ইহাকেই দার্শনিক অরাজকতা বা Philosophic Anarchism বলে। আর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল হইতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে আশ্রয় করিয়া আত্মমত প্রচার করিতেছেন, এই দার্শনিক অরাজকতাই তার শেষ কথা ও অপরিহার্য্য পরিণাম। এই দার্শনিক অরাজকতা বা Philosophic Anarchism হেয় বস্তু নহে। যেখানে এবস্তু বাহিরের আমদানী নয়, কিন্তু ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানে তাহাকে শ্রদ্ধাভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।"

বিপিনবাবু বলিতে চান যে, আমাদের দেশে ও আমাদের সমাজেই বহু প্রাচীন কাল হইতে এই দার্শনিক অরাজকতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ "ধর্ম্মের ও সাধনের কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে"। কেননা, বাহিরের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়িয়া তোমার অন্তরে যে পুরুষটি আছেন, তাঁকে জানো, তাঁকে পাও—এ উপদেশ কেবল আমাদের ধর্ম্মে নাকি পাওয়া যায়। অবশ্য জ্ঞানে হোক্, ভক্তিতে হোক্, কর্ম্মে হোক্, যে কোন মার্গে হোক্, সকল সাধনাতেই এই অদ্বৈত উপলব্ধি বা তাদাত্ম্য, কিম্বা সাযুজ্য-উপলব্ধি—ইহা আমাদের দেশে মোক্ষের চরম অবস্থা হইলেও, এ শ্রেণীর মোক্ষ-সাধনাকে ইউরোপীয় দার্শনিক অরাজকতা অথবা ঐকান্তিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সাধনার সমতুল্য মনে করাটা ভারি ভুল। কেননা, বিপিনবাবুই দেখাইয়াছেন যে "দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, বিবেকবৈরাগ্য সিদ্ধি যার হয় নাই, এই ঐকান্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্ম্মে তার সত্যা অধিকার জন্মে না।" অথচ Philosophic Anarchism কোন সাধনা বা মার্গ বা পদ্ধতির ধার ধারে না—কোন নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বও তার তত্ত্ব নয়।

প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি যে আশ্বিন ও কার্ত্তিকের সবুজপত্রে প্রকাশিত "আমার ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্ম্মজীবনের যে অভিব্যক্তির স্তরপর্য্যায় উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাতে একটি কথা এই পাওয়া গেছে যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম কোন সুনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বের মধ্যে আসিয়া থামিয়া যায় নাই—বিকাশমান ও বিচিত্রায়মান জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ ও বিচিত্রতা ক্রমশই নব নব রূপে দেখা দিতেছে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না; তিনি বলেন মানুষের সেই ধর্ম্মটিই তার নিজস্ব "যে ধর্ম্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি ক'রে তুল্‌চে।"

কিন্তু আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে বিপিনবাবুই দেখাইয়াছেন যে কি বেদান্ত-ধর্ম্মে কি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে 'সাধন-ধর্ম্ম' ও 'সমাজ-ধর্ম্ম'—এই দুয়ের মধ্যে একটা দ্বৈধ্য দাঁড়াইয়া গেছে। তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন, 'ইহাতে লোক-চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়'। আমাদের যুগগুরু রামমোহন রায় এই কারণেই বেদান্তের শিক্ষাকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ মায়াবাদের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা জন-সমাজের যথার্থ সামাজিক হইতে পারে না। এবং এই কারণেই তিনি হিন্দুধর্ম্মকে যেমন কাম্যকর্ম্ম ও পৌত্তলিকতা হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন—কেননা তাহাদের দ্বারা "texture of Society" সমাজের বাঁধুনিই আল্‌গা হইয়া পড়ে;—তেমনি বেদান্তসূত্রেরও নূতন করিয়া ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁর ভাষ্যে বেদান্ত-ধর্ম্মে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের স্থান আছে, নীতির স্থান আছে, কর্ম্মের স্থান পুরাপুরিই আছে। সুতরাং কি জ্ঞানমার্গে কি ভক্তিমার্গে, মোক্ষত্বের আদর্শ যদি এই হয় যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার রসে পূর্ণ হইয়া জীবনের বিচিত্র দিক্‌গুলিকেই একের মধ্যে পূর্ণের মধ্যে নিবিড়লীন করিবেন—তবে ত সে মোক্ষের আদর্শকে 'অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শন্' বা অবচ্ছিন্ন আদর্শ বলিবার জো নাই। কিন্তু রামমোহন রায় যে ভাবে বেদান্ত-ধর্ম্ম মানিতেন কিম্বা এখনকার কাল্‌চারে দীক্ষিত কোন ব্যক্তি যেভাবে বেদান্ত-ধর্ম্ম অথবা বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানিবেন, তার সঙ্গে আসল বেদান্ত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি অল্প—একথা স্বীকার করিতেই হইবে। যেমন ধরুন, অবতারকে 'নরনারায়ণ' বলিলে এবং যুগে যুগে যুগধর্ম্মে সেই নরনারায়ণ নানাজনের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ-আবির্ভূত হইতেছেন—এভাবে humanityর পূজাকে অবতারবাদ বলিলে তাকে অবতারবাদের নূতন ব্যাখ্যা বলিব—সত্যকার অবতার-বাদ বলিবনা।

সুতরাং যে অভিনব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আমদানি করিতেছেন, সে জিনিস প্রাচীনকালে এ-দেশে ছিলনা, এখনও নাই। যে জিনিসটা আমাদের দেশে সত্য সত্যই ছিল তাহা ধর্ম্মমতের এবং সামাজিক শ্রেণী ও আচারের pluralism বা অসংখ্যতা। মতবৈচিত্র্য শ্রেণীবৈচিত্র্য অনুষ্ঠানবৈচিত্র্য—এ সকল বৈচিত্র্যকে ভারতবর্ষ চিরকাল উদার ভাবে স্বীকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সমন্বয় গড়িবার চেষ্টাও পাইয়াছে। সেই চেষ্টায় ভারতবর্ষ এক একটা বড় বড় সংস্কার, এক একটা বড় বড় symbol গড়িয়া দিয়া তার আশ্রয়ে বহুলোককে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছে। কিন্তু সববৈচিত্র্য-পরখ-করা অথচ সর্ব্বসংস্কার-হরা যে ব্যক্তি-স্বারাজ্য বা দার্শনিক অরাজকতা—যেখানে কোন বিধিনিষেধ মানা একেবারেই নাই—সে বস্তু পূর্ব্বকালে কোথায় ছিল? এতো ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসের আদর্শ কোন মতেই নয়। অসংখ্যতার মধ্যে এ বস্তুর উদ্ভব হয় না, দ্বৈতের মধ্যেই এ'র যথার্থ উৎপত্তি। ইউরোপে সেই দ্বৈতের দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র প্রকট—একদিকে ষ্টেট্ অন্যদিকে

ইন্‌ডিভিডুয়াল্ বা ব্যক্তি; একদিকে ধনশক্তি অন্যদিকে জনশক্তি;—মাঝখানে বিচিত্র সমাজ-তন্ত্র বিচিত্র ব্যবস্থা বিচিত্র আচার-বিচারের কোন ল্যাঠাই নাই। সেই জন্য ইউরোপে দরকার—ব্যক্তি ও ষ্টেটের পরস্পরের সংঘর্ষ ঘুচাইবার জন্য পরস্পরের মাঝখানে সামাজিকতাকে বিচিত্র ভাবে গড়িয়া তোলা। তবেই একদিকে ষ্টেটের একতন্ত্র প্রভুত্ব ও তার ফলে কি অন্তর্যুদ্ধ কি বহিঃর্যুদ্ধ যেমন কমিবে, অন্যদিকে তেমনি anarchism প্রভৃতিও ঘুচিবে। এবং ভারতবর্ষে দরকার—ঐ নিবিড় অসংখ্য-তার উপদ্রব ও সামাজিক জটিল জালকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তার মধ্যে একদিকে রাষ্ট্রের ও অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান করিয়া দেওয়া।

বিপিনবাবু যে মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদের দেশে না থাকার জন্য আমাদের দেশের জনমণ্ডলীকে 'কৃপণ' করিয়াছে, তাদের মধ্যে 'সিভিক্‌ধর্ম্ম' জাগে নাই—সে কথা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকার কেন এদেশে থাকে নাই, সে কথাটা কি চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নয়? ভারতের ইতিহাসে ক্ষণে ক্ষণে রাষ্ট্রীয় শক্তি বড় আকারে দেখা দিলেও অচিরেও তার বড় বিকারও কেন ঘটিয়াছে? ক্ষত্রিয়শক্তি, বৈশ্যশক্তি কেন লোপ পাইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ-শক্তিও একপায়ে দাঁড়াইয়া বকবৃত্তি করিতে অপারগ হইয়া কেন শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অধঃপাতের চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে? তার কারণ কি এই নয় যে, যে 'সামাজিক সহানুভূতি ও সাহচর্য্য' দেখিয়া বিপিনবাবু মুগ্ধ, তার ভিতরে বিচিত্র সম্বন্ধ-জাল বিচিত্র কর্ত্তব্য ও দায় আছে বটে, কি ব্যক্তিত্বের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির কোন সুযোগ নাই? এই ব্যক্তিত্ব না থাকিলে নেশন গড়েনা, ষ্টেট্ গড়েনা; এই ব্যক্তিত্ব থাকিলে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বাধীন ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না; এই ব্যক্তি না থাকিলে রাজশক্তি গণশক্তিকে স্বীকার করে না এবং অভিজাতশক্তিও ক্রম গণশক্তির মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে চায় না।

ইউরোপের চাই communalism সমাজ-ধর্ম্ম; আমাদের চাই individualism বা ব্যক্তি-ধর্ম্ম। সেই ব্যক্তি-ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদে দেশের রোগের সেই মহৌষধ।

অনেকে মনে করেন যে, ব্যক্তি-ধ আমাদের সমাজে জাগ্রত হইলে তা আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারে উত্তীর্ণ করি দিবে। এটা কেন ভুলিয়া যাই যে, পুরু পুরুষানুগত সংস্কার যাহা হাড়ে মজ্জায় শতাব্দী ধরিয়া বসিয়া গেছে, তার পাশ মা কখনই শেষ পর্য্যন্ত কাটাইতে পারে উত্তরাধিকারের সূত্রে যাহা আমরা পাইয়াছি জাতি হিসাবে যে সকল লক্ষণে আমর আক্রান্ত, তা কি দুদণ্ডেই ঘুচে? ব্যক্তি যদি আমাদের সমাজে অত্যধিক মা দেখাও দেয়, যদি তাহা সাময়িক অ উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে লইয়াও যায়, আশঙ্কার কারণ নাই। কোন আন্দোলনই কোন দেশেই অত্যন্ত সুস্থ

আসে না। রেনেসাঁসের কালে ইউরোপের সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করে নাই? ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কালে করে নাই? সেই উচ্ছৃঙ্খলতাটাই কি চিরজীবী হইয়া আছে? মধ্যযুগীয় ষ্টেট্ ও চার্চ্চের একতন্ত্র প্রভুত্ব এখনও মরে নাই—সেইজন্য রেনেসাঁসের পর হইতে ষ্টেট্ ও চার্চ্চের সঙ্গে নবজাগ্রত ব্যক্তির পুরোপুরি বনিবনাও আজ অবধি হয় নাই। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর "Principles of Social Reconstruction" নামক নূতন বইটিতে পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যযুগের সংস্কার যথেষ্ট জড়িত হইয়া আছে—রাষ্ট্রের সর্ব্বময় প্রভুত্বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলে আমাদের অনেক বন্ধন শিথিল হইয়া ক্রমশ খসিয়া যাইবে, ইহা বিশ্বাস করি। কিন্তু ইহাও জানি যে, বন্ধন শিথিল করিবার জন্য অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষ বা রেনেসাঁস, অনেক সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন বা রেফরমেশন, অনেক লড়াই, অনেক বিপ্লব, অনেক নড়াচড়া আবশ্যক। শুধু রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়াই ইউরোপের দেশগুলি বড় হয় নাই—মনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞানের উন্মেষ, স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত, প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলন, এ সমস্তই সে-সকল দেশের মনকে সতেজ ও স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। সেই জন্যই ভোগের পথ দিয়াই ইউরোপ ত্যাগের পথে ছুটিয়াছে। আর আমরা? আমাদের মধ্যে একটুখানি সাহিত্যের উন্মেষ ছাড়া বিশেষ কোন চিত্তস্ফূর্ত্তি দেখা দেয় নাই। "রাষ্ট্রের শক্তি জাগুক্, শাস্ত্রের শাসন আপনি তার পথ করিয়া দিবে" সত্য বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের শক্তি জাগাইতে গেলেই জাতির মনন-শক্তিকে সর্ব্বতো-ভাবেই জাগানো চাই। নহিলে সে শক্তি কেহ হাতে তুলিয়া দিলেও, হাত হইতে খসিয়া পড়িতে পারে, একথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

আচার ও বিচার

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের "সবুজপত্রে" "আচার ও বিচার" প্রবন্ধের লেখক বলেন যে, "আচারকে বাদ দিয়া যদি শুধু বিচারের দ্বারাই সমাজের কাজগুলা চালান হইত তবে কার্য্যের ক্ষেত্র কখন তেমন ব্যাপক হইত না। কাজও তেমন জোরে চলিত না।...মানব সমাজে আচার ও বিচার দুয়েরই প্রয়োজন।...সমাজের পরিচালনায় বিচার রাজা, আচার তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ।"

সম্প্রতি আচার জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া শুধু বিচারের দ্বারাই সমাজের কাজ চালাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছে, এই ধারণাটাই লেখকের মনের মধ্যে বদ্ধ-মূল থাকায় আচার ও বিচারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রচনা করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, একটা প্রথা যখন সমাজে দেখা দেয়, তখন তার মূলে বিচার থাকেই। কিন্তু কাল-ক্রমে সেই প্রথাটা বিচারের এলাকা হইতে আচারের এলাকায় আসিয়া পড়ে। তখন "যে প্রথাটা প্রথমে মঙ্গলের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল আচারের জোর ও জবরদস্তিতে

সেটা ক্রমে মহা অনর্থের হেতু হইয়া উঠে।"

তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি কিছুমাত্র নূতন কথা নয়। কিন্তু আচারকে উঠাইয়া দিয়া বিচারের দ্বারাই সমাজের সকল কাজ চালাইবার মত অদ্ভুত প্রস্তাব কোথাও উঠিয়াছে বলিয়া আমি জানিনা। সমাজে জ্ঞানের আলো যখন জ্ঞানী-গুণীদের শিখরদেশ ছাড়িয়া নিম্ন-ভূমিতে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ ছড়াইয়া পড়ে, তখন যুক্তিহীন আচার-পালনের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ স্বভাবতই সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠে। অর্থাৎ তখন বিচার-পূর্ব্বক আচারকে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে হইবে, এই আদর্শটা দাঁড়ায়। তার অর্থ এমন নয় যে, আচারকে তুলিয়া দিয়া যার বিচার যেমন বলে সে তেমনি রীতিনীতি অবলম্বন করিবে। সেরূপ স্বেচ্ছাচারে কোন সমাজই টেঁকে না।

জড়বিজ্ঞানে বলে যে, শক্তির যেমন একটা conservation আছে, তেমনি তার রূপান্তর ঘটিতেছে। জড় জগতে এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্যেই শক্তির লীলা চলিয়াছে। সমাজতত্ত্বে শাস্ত্র, আচার, বিধি-বিধান প্রভৃতি সমাজের সেই conservationএর শক্তি। সামাজিক জীবন পরিবর্ত্তনশীল এ কথা সত্য; কিন্তু সে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বাপরবিচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালের পরম্পরা মাত্র নয়। আচার, শাস্ত্র, বিধি প্রভৃতির দ্বারা সে সকল সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একটা যোগসূত্র রক্ষা পায়।

"It is the letter that killeth"—অজ্ঞানী শাস্ত্রের মর্ম্মকে ধরিতে পারে না, তার শব্দকেই শিরোধার্য্য করে। তেমনি অজ্ঞানীর আচার-বশ্যতা আর সজ্ঞানীর আচার-পালনের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য। একে গতানুগতিক ভাবে আচারকে আশ্রয় করে, অন্যে বিচারপূর্ব্বক যে আচার অশুভকর তাকে বর্জ্জন এবং যে আচার শুভকর তাকে গ্রহণ করে। যে সমাজে অজ্ঞ লোকেরই প্রাধান্য সেই সমাজেই আচার আছে কিন্তু বিচার নাই; সুতরাং সে সমাজে উন্নতির স্রোত নূতন নূতন পরীক্ষা ও উদ্ভাবনের খাত কাটিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় না—মরা নদীর মত পাঁকে পঙ্কিল হইয়া পচিয়া উঠিতে থাকে।

আমাদের দেশে এযুগে রাজা রামমোহন রায় প্রথম অনুভব করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মে আচার জিনিষটা ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত বলিয়া ঐ দুই ধর্ম্মেই নীতির চেয়ে রীতিই বড় হইয়া উঠিয়াছে। পাপ হইতে বিরত হইলেও মানুষ শুদ্ধ হয় আবার তিথিবিশেষে স্নান করিলেও শুদ্ধ হয়—এ অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির চেয়ে বহিঃশুদ্ধির দিকেই মানুষের মন স্বভাবতই ঝুঁকিবে। সেইজন্য রাজা রামমোহন রায় শুদ্ধাশুদ্ধ, খাদ্যাখাদ্য, গম্যাগম্য বিচারের সঙ্গে পরমার্থের যে কোন সম্বন্ধই নাই, ইহা হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ করিয়া দিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মকে তিনি কাম্য কর্ম্ম, তামস কর্ম্ম, পৌত্তলিক আচার প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিতে ও লোকঃশ্রেয়-সাধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মুসলমান

ধর্ম্মকেও তিনি তার সরিয়ৎ, তার হারাম হালালাদি অর্থাৎ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার হইতে মুক্তি দান করিলেন।

ধর্ম্ম হইতে আচারকে পৃথক করিলে আচারের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। তখন আচার কেবলমাত্র লোকস্থিতি ও লোক-সংগ্রহের একটা উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। রাজা রামমোহন রায় এইদিক্ হইতেই আচারের সার্থকতা দেখিতে পাইতেন।

সবুজ পত্রের লেখক আচারের সঙ্গে বিচারের সামঞ্জস্য যেভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেভাবে সামঞ্জস্য খাড়া করা শক্ত। বিচার যদি প্রতি ব্যক্তিবিশেষের বিচার হয়, তবে ত আচার দেখিতে দেখিতে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। আচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার মত একটা আদর্শ বা principle থাকা চাই। রামমোহন রায় সে রকমের একটা আদর্শকে ধরিয়াছিলেন—তাহা তাঁর লোকঃশ্রেয়ের আদর্শ। তিনি লিখিয়াছেন, "যে যে উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয় তাহাই কেবল কর্ত্তব্য।" সুতরাং যে যে আচার পালনের দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃ ঘটিবেনা তাহা অসদাচার; যে যে আচার পালনের দ্বারা লোকের মঙ্গল ঘটিবে তাহা সদাচার। আচারের বিচার করিতে হইলে এই রকমের একটা মানদণ্ড থাকা নিতান্ত দরকার।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,—কলিকাতা। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, ১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা, শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য সাত টাকা। সুপার-রয়েল অপেক্ষাও বড় আকারে এবং সম্পূর্ণ-নূতন বিশিষ্ট অক্ষরে ছাপা ১৫৭৭ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ হইয়াছে। ইহাতে লেখ্য ও কথ্য সকল বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ,—এবং বহুস্থলে তাহাদের ব্যবহারও দৃষ্টান্ত-সহ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার উপর সমোচ্চার্য্য শব্দাভিধান, সংস্কৃত ধাতুসমূহ ও তাহাদের অর্থ, বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত, হিন্দী ও বিদেশী প্রবচন ও শব্দাদির অর্থ, প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রা, পরিমাণ, সংখ্যা ও পরিমাপ-বাচক শব্দাভিধান, বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রচলিত প্রবাদ বা উল্লেখের সহিত সংসৃষ্ট পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ব্যক্তির পরিচয়, বঙ্গীয় নর-নারীর প্রচলিত নাম-সংক্ষেপ ও ডাক-নাম-বোধক শব্দাভিধান, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের আরবী ও পারসী নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সঙ্গত বানান এবং অর্থ, বাঙ্গালা কাব্য, ইতিহাস-পুরাণাদি গ্রন্থ-উল্লিখিত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের উদাহরণ-সমেত ভৌগোলিক সংস্থান, বাঙ্গালায় প্রচলিত সংক্ষেপ শব্দসমূহের অর্থ, বাঙ্গালা গ্রন্থ-পত্রাদিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত উদাহরণাদির অর্থ, মেট্রিক বা ফরাসী দশমিক পরিমাণ-প্রণালী, মুদ্রা-বিনিময়ের হার, বিদেশী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর, প্রুফ সংশোধনের সঙ্কেতাদি অত্যন্ত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে সম্পাদকের অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিয়া আমরা তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি—এবং যতদূর দেখিয়াছি, গ্রন্থখানি

সম্পূর্ণ নির্ভুল। প্রকাশক ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। এই অমূল্য গ্রন্থের ছাপা কাগজ যেমন পরিষ্কার, বাঁধাইও তেমনি মনোরম ও মজবুত—অথচ মূল্য মোটে সাত টাকা মাত্র। বঙ্গভাষার প্রত্যেক লেখক ও পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থখানি অমূল্য। গৃহ-পঞ্জিকার মত এ গ্রন্থ বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক। এমন বিশদ অভিধান বাঙ্গালা-ভাষায় আর নাই—এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

মায়া। গীতিকাব্য। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত। বর্দ্ধমান, বন-নবগ্রাম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতা-গ্রন্থ; সমালোচনা করিতে ভয় হয়। কারণ, লেখক 'উন্মেষিকায়' লিখিয়াছেন, "যদি মায়ার আদর না হয়, তবে তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই; কারণ সংসারের আপাত-মধুর খণ্ড-সুখপূর্ণ ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া কেহই প্রায় নিত্য সুখের অনুসন্ধান করিতে রাজী নহেন। যদি কেহ তৃষিত তাপিত থাকেন, যদি কাহারো চিত্ত নিত্য সুন্দরের অপরূপ রূপের জন্য পাগল হইয়া উঠে, তিনি অবশ্য 'মায়া' হইতে একটু ক্ষীণ আভাস প্রাপ্ত হইবেন—সন্দেহ নাই। আর তাই সাধকের ক্ষীণ আভাস-প্রাপ্তির আনন্দই আমার একমাত্র সুখ, একমাত্র অভীপ্সিত বস্তু" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা সাধক নহি, তাই হয় ত এ কবিতাগুলির রস গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ কথা বলিতে বাধ্য যে সাহিত্যের বাজারে এ জিনিষের কোনো দর নাই।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, এল, এম, এস ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, এল, এম, এস প্রণীত। কলিকাতা, ৭৮ নং রসারোড (নর্থ) হইতে গ্রন্থকারদ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাথী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। নাম শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, এ গ্রন্থে বৈরাগ্য-সাধনের কোন সুগভীর তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সূত্র অবলম্বনেই এ গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থকারদ্বয় উভয়েই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে তাঁহারা যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বঙ্গীয় নর-নারীর স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে তাহা সহায়ক হইবে ভাবিয়াই সে সত্য তাঁহারা এ গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব ও শারীর-তত্ত্বের আলোচনায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। ভূমিকায় গ্রন্থকার-দ্বয় লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মচর্য্য বুঝিতে এবং বুঝাইতে হইলে কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা-দোষ অপরিহার্য্য। অনেকের মতে এ বিষয়ের শারীর-তত্ত্বালোচনা যুবকগণের নিকটে উপস্থিত করা উচিত নহে। কিন্তু জীবতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্বের অধ্যাপনা কলেজের সকল শ্রেণীতেই আরব্ধ হইয়াছে; ইহাতে সবই আছে, কেবল সংযমের কথাটা নাই। অন্যদিকে পেটেণ্ট ঔষধ এবং পেটেণ্ট চিকিৎসকগণের সহস্র সহস্র বিজ্ঞাপন হইতে অল্প-বয়স্ক বালকগণও জনন-তত্ত্বসম্বন্ধে অতি কুভাবে শিক্ষা পাইতেছে। যখন ঝড় নিবারণ করা সম্ভব নহে, তখন ঘর শক্ত করা বোধ হয় সুবুদ্ধির কার্য্য, অন্ততঃ অনেকের এইরূপ মত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে এ পুস্তক প্রচার করিতে সাহসী হইলাম।" গ্রন্থকারদ্বয়ের এ-সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না—ব্যাধি-প্রতিকার-কল্পে তাঁহাদের উপদেশ ও ব্যবস্থা সমাজকে তাহার মঙ্গলের জন্য মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। কোন রুচিবাগীশ যদি তাহাতে নাসিকা কুঞ্চন করেন, তবে তাঁহাকে সমাজের শত্রু বলিয়া ধরিতে হইবে। একটা মোটা কথা সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবে—যে এই রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করিয়া তাহার সম্বন্ধে সকল খুঁটিনাটি কথা জানা সকলেরই উচিত। যাঁহারা রুচির দোহাই তুলিয়া এ-সব কথায় কর্ণপাত করিবেন না, তাঁহারা ত মৃত—শব! অবরোধ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাগুলি অসংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেরই পরিচয় দেয়। এই গ্রন্থে বংশানুক্রম, সংযম প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয় যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উচ্ছ্বাস নয়—সুদৃঢ় যুক্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত।

গ্রন্থকারদ্বয়ের সহিত সর্ব্ববিষয়ে আমাদের মতের মিল নাই—না থাকিলেও এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে এই অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রত্যেক তরুণ নরনারীর, প্রত্যেক সংসারীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার-দ্বয়ের বহু মত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং বহুস্থলেই তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণীয়। তবে একটা কথা বলিবার আছে, কয়েক স্থলে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয়গুলি আরো বিশদ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-বিধির সহিত খাপ খাওয়াইয়া এবং সেকাল ও একালের বিধির তুলনা-মূলক সমালোচনার আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

কাকলী। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এল প্রণীত। কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাধারণ বাঁধাই আট আনা; উৎকৃষ্ট বাঁধাই দশ আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "এগুলি ভগবৎ-গীতি"। সুতরাং মামুলি প্রেমের কবিতা এ গ্রন্থে নাই। অনেকগুলি গান এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সব গানগুলির প্রশংসা করিতে না পারিলেও কতকগুলি গান পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি। লেখকের ভাব আছে, ভাষা চলনসই, তবে ছন্দ স্থানে স্থানে পঙ্গু—লেখকের কাঁচা হাতের পরিচয় বহুস্থলে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বহুস্থলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এমনি আসিয়া পড়িয়াছে—তবে আজকাল এমন রচনা অল্পই আছে, যাহা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-স্পর্শহীন—যে কয়েকটি গান তাঁহার গানেরই ভাবের প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ! লেখকের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

স্তবক ও কোরক। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কলিকাতা ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, গুণালঙ্কার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। নিউ-ব্রিটানিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। অক্ষম রচনার এমন নির্লজ্জ সমাবেশ বাঙলা গ্রন্থেও বড়-একটা দেখা যায় না। কবিতাগুলি রাবিশ—যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, আবার ছন্দও ঠিক তাহাদেরই অনুরূপ! এমন ত্রিবেণী-সঙ্গম কচিৎ দেখা যায়! অনেক স্থলে ছেলেমানুষি এতদূর গড়াইয়াছে যে দেখিয়া অবাক হইতে হয়! দৃষ্টান্তস্বরূপ "শনিবারের বারবেলা" কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। আপনার পরিচয় দিতে গ্রন্থকার ধৃষ্টতার কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখেন নাই। গ্রন্থের 'মুখপত্র'টুকু উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন,—"হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য বিচারপতি অনারেবল্ ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (Kt.) মহোদয়ের 'আশীর্ব্বাদ' ও বঙ্গের সেক্সপিয়ার নাট্যসম্রাট স্বর্গীয় ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'ভূমিকা' সম্বলিত "ভাব ও গাথা", "জ্ঞানাঞ্জন ১ম ভাগ", "জ্ঞানাঞ্জন ২য় ভাগ", "গুচ্ছ", প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা; ব্রিটিশরাজধানী লণ্ডন-নগরস্থিত গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, বৌদ্ধসমাজের একমাত্র মুখপত্র ও সমালোচন জগজ্জ্যোতিঃ-সম্পাদক শ্রীরমণী-রঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ M. R. A. S. বিরচিত" ইত্যাদি। তাহার উপর ভূমিকায় কোথায়, কবে তিনি গলায় ফুলের মালা পরিতে পাইয়াছিলেন, সে-কথাটুকুও বাদ যায় নাই। এইটুকুই এ গ্রন্থের মৌলিক বিশেষত্ব! জানিনা, হঠাৎ গ্রন্থকার বঙ্গীয় পাঠকবর্গের উপর এ "স্তবক ও কোরক" নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, কেন! একটি কবিতায় কবি লিখিতেছেন,

"তুমি প্রেমের বাহারে এ হৃদি-সেতারে
লহরে উঠিলে বাজিয়া।
আমি জীবনে মরণে স্বপ্নে জাগরণে
রবো তুমিময় হইয়া।"

ইহার রস-বোধে হতভাগ্য আমরা বঞ্চিত! তাহার উপর একটা জিনিস দেখিয়া অবাক হইয়াছি,—'বাজিয়া' ও 'হইয়া'র যিনি ছন্দ মেলান, তাঁহাকেও কবিতা লিখিতে হইবে! কেন?

প্রবাসীর প্রত্যাগমন। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কাব্যাকারে

লিখিত একটি সামাজিক গল্প। এ গ্রন্থের সমালোচনা করাও এক দুরূহ ব্যাপার। লেখক এক হাতে সমালোচককে বেদম পিটিয়াছেন, আবার অন্য হাতে তাঁহার শিরে অজস্র পুষ্প বর্ষণ করিয়াছেন। অনেক লেখক আছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ ছাপাইবার সখ আছে,—এবং সমালোচনার জন্য পত্রাদিরও দ্বারস্থ তাঁহারা হন; তবে গ্রন্থের অনুকূল সমালোচনা না হইলেই সমালোচককে একেবারে "পরশ্রীকাতর" বলিয়া গালি দেন। উচিত সমালোচনা সহিবার সামর্থ্য যাঁহাদের নাই, তাঁহারা গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য এত ব্যাকুল হন কেন? এই গ্রন্থের গ্রন্থকার দুই পাতা 'মুখবন্ধে' ঠিক এই কথাই লিখিয়াছেন। তথাপি বলিতেছি, এ কাব্যে কোন বিশেষত্ব নাই—রচনায় এমন আকর্ষণী শক্তি নাই যে আগাগোড়া ধৈর্য্য রাখিয়া কেহ পড়িতে পারে।

প্রাতিমোক্ষ ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। প্রকাশক, শ্রীগৌরীপ্রসাদ স্কুল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। কলিকাতা, ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না। বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বলাভের পর যখন দুই-চারিজন করিয়া লোক তাঁহার নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ছিল, তখন বুদ্ধদেব ইহার বহুল প্রচারের জন্য ভিক্ষুকগণকে বহুজনের হিতের জন্য বহুজনের সুখের জন্য দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে বলেন। ভিক্ষুগণও নানা দেশে ঘুরিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কাজেই পূর্ব্বে যেখানে ধর্ম্ম-সাধনায় কেবল বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত, ক্রমে সেখানে ভিক্ষুগণের অর্থাৎ সঙ্ঘেরও আশ্রয় গ্রহণ আরম্ভ হইল। ভিক্ষুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, উত্তম, অধম, যোগ্য, অযোগ্য, অধিকারী, অনধিকারী সকলেই যখন নির্ব্বিশেষে দলে-দলে সঙ্ঘ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন নৈসর্গিক নিয়মেই মানবের স্বাভাবিক ভ্রমপ্রমাদ ঘটিতে লাগিল; তাহারা নানারূপ অকার্য্য করিয়া ফেলিত। তখন বুদ্ধদেব উপাধ্যায়ের ব্যবস্থা করিলেন—তাহা হইতেই 'বিনয়ের' সূত্র-পাত। সঙ্ঘের পরিধি বাড়িলে নানা দেশের বিভিন্ন সঙ্ঘে আহার বিহার আচার ব্যবহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই নানাবিধ বিশৃঙ্খলা বাড়িতে লাগিল এবং বহুবিধ অনাচারও দেখা যাইতে লাগিল। তখন বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব সম্বন্ধে শরীর ও বাক্যের সংযম সম্বন্ধে শিক্ষার বিধান করিতে প্রযুক্ত হইলেন—এইরূপে নব-নব নিয়ম গঠিত হইতে লাগিল। এই সকল বিধি-নিষেধই 'বিনয়' নামে প্রসিদ্ধ। 'প্রাতিমোক্ষে' এই সকল বিধি-নিষেধেরই প্রধানভূত কতকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ যাহাতে বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে পারে, তজ্জন্যই প্রাতিমোক্ষের উৎপত্তি। এই গ্রন্থে শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে মূল পরে তাহার বঙ্গানুবাদ বিস্তীর্ণ টীকা ও বিবিধ পরিশিষ্ট-সমেত সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে। লেখক এই বঙ্গানুবাদে এমন একটু কৌতূহল সঞ্চারিত করিয়াছেন, যাহা অবিশেষজ্ঞ পাঠকের চিত্তকেও বেশ আকৃষ্ট করিবে। এই গ্রন্থের ভূমিকাটির বিশেষ মূল্য আছে—বৌদ্ধ সঙ্ঘাদি ও তাৎকালিক আচার-ব্যবহারের একটি সমগ্র ছবি এই ভূমিকায় সুন্দর ফুটিয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয় এ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

মুরলার ভুল। শ্রীমতী অনিলবালা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, বি, এ; রায় এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৩০।২এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি উপন্যাস। লেখিকার হাত অত্যন্ত কাঁচা; লিপি-কুশলতারও একান্ত অভাব। প্লটটিও আজগুবি ধরণের।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪১শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২৪ [১০ম সংখ্যা

ছাইভস্ম

সবাই বলছে সেটা হাঙর, কিন্তু আমি বলছি না, না, না! বালি-উত্তরপাড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় জেলেদের জালে এই যে জিনিষটা ধরা পড়েছে তা আমাদের জাহাজের লেট্-শুশুক-সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাহন, জীবন-শূন্য শুশুকের খালি মোষোক বই আর-কিছু হতেই পারে না। সুতরাং আমাদের উচিত ছিল ভূতপূর্ব্ব সব সভ্য মিলে খুব ঘটা-কোরে লেট্-সভার শ্রাদ্ধ করা। গঙ্গায় তখন তপসী মাছ যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল, এবং আমাদের মুখুয্যে-মশায় আমার খাতির ও শুশুকের প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে ভোজের দিনে বালি-উত্তরপাড়ায় যতরকম পটোল বাজারে আসে ও ক্ষেতে জন্মায় সব তুলে নেবার জন্যে কোমর-বেঁধে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু আমার সে-প্রস্তাবটা কেউ গ্রাহ্যই কল্লেন না। আমাদের লেট্-সভার সদ্গতি হল না;—উৎপাত সুরু হল—জলে স্থলে সভার সভ্যদের উপরে, দেশে বিদেশে আমাদের কজনের উপরে উৎপাত সুরু হল। হৃষীকেশে দু'জন সাহেব, কোথাও কিছু নেই, খামকা দুটো রুই কাৎলা ছিপে ধরে মৎস্যহিংসা করে' বসলো। এতে শুশুক-সভার সমস্ত হিঁদুসভ্য বিষম ব্যথা পেলেন। এদিকে আবার আমাদের বাঁড়ুয্যে-মশায় কুটিঘাটা থেকে উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত বেড়া-জাল ফেলেও আর তপসী মাছ গ্রেফ্‌তার করতে পাল্লেন না। সমুদ্র ছেড়ে গঙ্গার খালে তপস্যা করতে আসাটা যে মূর্খের মতো কাজ হয়েছে এটা তাদের কে যে বলে দিলে তা জানা গেল না।

তারপর, উত্তরপাড়ার মালিনীকে আমাদের মুখুয্যে অভিসম্পাতের ভয় দেখিয়েও তাঁর জন্যে নিত্য পটোল তুলতে রাজি করতে পারলেন না। নিমতলার অবিনাশবাবু আমার ছেলে-



অতিবিলম্ব

By M. A. Rahman Chu

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বেলায় বন্ধু হয়েও আমার নামে মানহানির মকদ্দমা আনবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। অজুহাত যে আমি 'ভারতী'তে ইদানিং যে-গল্পগুলো অবিন নাম দিয়ে লিখছি সেগুলো তাঁকেই উদ্দেশ করে' গালাগালি দেবার মতলোবে ছাপানো। অবিন যে 'অবনী'রই সূক্ষ্মশরীর, আর মুখে ছাড়া লিখে গালাগালি ও লিখে ছাড়া হাতে মারামারি যে আমার দ্বারা একেবারেই সম্ভব নয় এটা আমি কিছুতেই অবিনাশবাবুকে বোঝাতে পাচ্ছিনে।

শেষে, এই মাসে ঘোড়ালাভ আমার কুষ্টিতে পষ্ট-করে' লেখা রয়েছে। আমাদের লীলানন্দ স্বামিজীও বল্লেন এবারের ডার্বিতে জুয়াখেলার টাকাটা কাগজের দুখানা ডানা মেলে পক্ষীরাজের মতো আমারি দিকে আস্‌ছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার অশ্বমেধ পণ্ড করে ঘোড়াটা পথ-ভুলে অন্যের আস্তাবলে গিয়ে ঢুকলো!

এই সব উৎপাত দেখে আমার মন একেবারে উদাস হয়ে গেল। আমি অবিনকে কিছু না বলে-কয়ে জাহাজ ছেড়ে একেবারে নৈমিষারণ্যের দিকে বেরিয়ে পড়লেম—"বিফল জনম, বিফল জীবন!"—একতারাতে এই গান গাইতে গাইতে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াটা কিম্বা তার ডানার একটুক্‌রো কাগজও যদি তখন—যাক্ সে দুঃখের কথায় আর কাজ নেই।

কাশীর দশাশ্বমেধের ঘাটে সবে ডুবটি দিয়ে উঠেছি এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে হাত ধরে বল্লেন—"ব্যস্ করো বেটা, চলো হর-দোয়ারমে কুম্ভকা অস্নান করেঙ্গে।" কি জানি সন্ন্যাসীঠাকুরের কি শক্তি ছিল আমি জড়ভরতের মতো জল থেকে উঠে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে দেখি পায়ে ধুলো নেই! আমি তখনি বুঝলেম ঠিক লোক পেয়েছি। একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বল্লেম—"ছলনা করছ ঠাকুর? এখান থেকে হরিদ্বার একদিন এক-রাত্তিরের পথ; আর পাঁজিতে লিখছে আজ একটা-উন-পঞ্চাশে হল কুম্ভ!" সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—"বেটা, কুম্ভকা অর্থ ক্যা আগে তো সমঝ লেও!"

ঘাট থেকে সন্ন্যাসীর আস্তানা—মণিকর্ণিকার শ্মশান—বেশিদূর হবে না; কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে ঘটাকাশ যে অর্থে ভরা—পূর্ণকুম্ভর ঘড়ার মতো শুধু গঙ্গা-জলে ভরা নয়—সেটা ঠাকুর যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। যিনি ঘটাকাশ এক-নিমেষে অর্থে ভরিয়ে দিতে পারেন, আকাশকুসুমের মতো দেখালেও ডার্বি খেলার ঘড়াভরা অর্থলাভের সদুপায় যে তাঁরি দ্বারা হতে পারবে—আর কারু দ্বারা নয়—এটা আমার বিশ্বাস হলো। আমি ভক্তি-ভরে গদগদভাবে বাবার ঠিক পিছনে-পিছনে চল্লেম। কাগজের অর্থ নয়, রূপোর ভরা কুম্ভও নয়, চক্‌চকে আকবরি মোহরের ঢাকাই-জালা তখন আমার যেন চোখের সাম্‌নে উদয় হয়েছেন এমনি বোধ হতে লাগলো। আমি বাবাকে নির্জ্জনে আপনার মনের দুঃখু জানাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি, বাবা বোধ হয় এটা আগে থাকতেই

জানতে পেরেছিলেন, তাই আজ আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন তিনি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত কাশীর বাঙালি-টোলার অলিতে-গলিতে ঘিউ আর আটা ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু আমি জেনেছিলেম যে এবার ঠিক লোকের নাগাল পেয়েছি। সোনা করবার ভস্ম, গাছচালাবার মন্ত্র—এমনি একটা-কিছু এবার আর না হয়ে যায় না। কাজেই ক্ষিদেতে তেষ্টাতে ভিতরটা আমার শুকিয়ে উঠলেও আমার চোখকে আমি একটুও শুকোতে দিলেম না;—প্রেমাশ্রুতে বেশ করে ভিজিয়ে রেখে দিলেম।

যখন আশ্রমের দরজায়, তখন বাবা একবার আমার দিকে কটাক্ষ করে বল্লেন—"আউর ক্যা? কুম্ভু আউর উস্‌কা অর্থ তো মিল্ গিয়া। আভি ঘর যাও।" এখনো পরীক্ষা! ভাঁড়ারঘরের দরজার কাছে এনে বলা হচ্ছে ঘরে গিয়ে ভাত খাওগে! আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্লেম—"বাবা, অমন অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি এইখেনে পড়ে রইলুম, কৃপা করতেই হবে। বাবার কাছ থেকে কিছু চীজ না নিয়ে আমি নড়ছিনে। প্রাণ যায় সেও স্বীকার!" বাবা আমার কথার আর-কোনো জবাব না দিয়ে আটা আর ঘি মেখে রুটি সেঁকতে বসে গেলেন। আমার দিকে আর দৃক্‌পাতও কল্লেন না।

দুপুরের রোদে আমি একলা মুখ-শুকিয়ে এক গাছের তলায় বসে আছি, এমন সময় ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন—"বাবা, তোমার কাছে কিছু টাকা-কড়ি আছে?" কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাংলা কথা', টান-টোন সব বাঙালির মতো, কিচ্ছু বোঝার যো নেই যে তিনি পশ্চিমের খোট্টা! "পয়সা থাকলে কি আমার এমন দশা হয় বাবা!"—বলেই আমি চোখ মুছ্‌তে থাকলেম। বাবাজী তখন আমাকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বল্লেন—"তাতে আর দুঃখু কি! আমি বুঝেছি, তোমাকে এই কুম্ভমেলার দিনে একলা দশাশ্বমেধে ডুব দিতে দেখেই আমি বুঝেছি—থার্ডক্লাসের ভাড়াটা পর্য্যন্ত তোমার অভাব। তা কেঁদোনা বাবা, আমি এখনি তোমাকে কুম্ভস্থলে পাঠাব। এই ঘটিটায় ইঁদারা থেকে একটু জল আনো তো।"

আমার তখনো মোহ কাটেনি। হরিদ্বারে কুম্ভস্নান আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হয়, যখন কাশীতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি হিন্দু ইউনিভারসিটির ঘড়ির কাঁটা একটা-উনপঞ্চাশে পৌঁচেছে প্রায়! যেমন এইকথা মনে করা অমনি বাবা তাঁর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটি আমার কপালে ঠেকিয়ে দিলেন। ব্যস্ একেবারে হরিদ্বারে উপস্থিত! সেই পিতলের লোটাটি পর্য্যন্ত আমার হাতে হাতে হরিদ্বারে এসে হাজির! অবশ্য হরিদ্বার আমি এর পূর্ব্বে দেখিনি, কিন্তু বাবাকে দেখে যেমন বুঝে-ছিলেম ঠিক লোকটি পেয়েছি, এবারেও তেমনি বুঝলেম ঠিক জায়গাটিতে এসে পৌঁচেছি। শুধু তাই নয় মনে হ'ল যেন এইখানে আমি অনেকদিনই এসেছি; আর-পাঁচজনের মতো আমিও আজ এক-কোমর বরফ-জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গার স্তব আওড়াচ্ছি

আর থেকে-থেকে ডুব দিচ্চি। চারিদিকের লোকজন পাহাড়পর্ব্বত মন্দির-ঘাট সত্যির চেয়ে বেশি সত্যি হয়ে যেন আমার চোখে পড়তে লাগলো। এক রাজা হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর আর বন্ধু দু'তিন খানা পাল্কিশুদ্ধ আমার পাশে স্নানে নামলেন। পবিত্র জলের পরশ পেয়ে কাঠের পাল্কিগুলো বুঝি সোনার পাল্কি হয়ে যায়, আর হাতি-ঘোড়াগুলো বুঝিবা রাজা-রাজোড়া হয়ে দেখা দেয়—এই ভেবে আমি সেইদিকে চেয়ে আছি এমন সময় একটা মোটা-পেট পুলিশম্যান্ পিছন থেকে আমাকে ধমক দিয়ে বল্লে—"এ বাবু, ক্যা দেখ্‌তা? ভাগো হিঁয়াসে।"

আমি পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা কুল্‌কুচি করে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি চারিদিক থেকে যেখানকার যত পাণ্ডা "হাঁ—হাঁ কল্লে কি! গঙ্গায় কুলকুচি কল্লে! সবার স্নান মাটি হল!"—বলে তাদের নামাবলীর পাগড়িতে আমায় পিছুমোড়া করে বেঁধে কিল-চাপড় মেরে আমায় আধমরা করে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে ফেলে দিলে। তারপর কি হলো জানিনে, কতক্ষণই বা অজ্ঞান ছিলেম বলা যায় না, কিন্তু খানিক পরে চোখ-চেয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়তে গিয়ে দেখি আমি কাশীতে। বল্লে বিশ্বাস যাবেনা, আমার গা কিন্তু তখনো ভিজে ছিল, যেন সেইমাত্র স্নান করে উঠেছি! কাশীর হিন্দু-কালেজের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। একটা উন-পঞ্চাশ থেকে দুটো এরি মধ্যে হরিদ্বারে গিয়ে কুম্ভস্নান, রাজদর্শন, কুল্‌কুচি, মার-খাওয়া এবং পুনরায় কাশীতে ফিরে-আসা, সমস্তটা স্বপ্নে দেখতে গেলেও এর চেয়ে ঢের সময় লাগতো যে! বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেন—"বেটা, কুছ চোট লাগা?" আমি একেবারে গদগদস্বরে বল্লেম —"চোট লাগবে বাবা! আপনার কৃপায় একটি আঁচড়, কি একটি দাগ পর্য্যন্ত নেই দেখুন।"

এবারে আমি খুব শক্ত করে বাবার পা ধরে রইলেম। এত শক্ত যে আমাকে ছাড়িয়ে বাবার আর এক পাও নড়বার সাধ্য রইল না। ওঁর কাছে কিছু আদায় করে নেবো এই প্রতিজ্ঞা! আমার সম্বলের মধ্যে তখন বাঙালিটোলার বাসা-বাড়িখানি। আমি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও ভাড়াটেদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে বাবাকে এনে সেইখানে বসালেম। তেতালায় একখানা ছোট ঘর, তারি সামনে একটু ছাদ। সেইখানে গুরুদেবের উপদেশ-মতো আমি যোগাসন, প্রাণায়াম উৎসাহের সঙ্গে সুরু করে দিলেম। ফৌজের জমাদার, হাবেলদার, কাপ্তান, কমাঁদা—সবার যেমন রকম-রকম পোষাক, ইউনিভারসিটির নানা ডিগ্রীর যেমন রং-বেরঙের ঘাঘরা, তেমনি সন্ন্যাসীদের দলেও সিদ্ধির তারতম্য হিসেবে রকম-রকম গেরুয়া আর রকম-রকম ফ্যাসনের কৌপিন, পাগড়ি, জটা, তিলকের সাজসজ্জা আছে। আমি তখন যোগ-সাধনের ইন্‌ফেণ্ট ক্লাসে বা ইন্‌ফেন্‌ট্রী দলে সবে ভর্ত্তি হয়েছি। কাজেই আমার উর্দ্দি হল সাদা লুঙ্গী, সাদা পাঞ্জাবি কোর্ত্তা, মাথায় সাদা পাগ্, লম্বা ল্যেজ আর সেই

ল্যেজের গোড়াতে একটুখানি গেরুয়া পাড়; হাতে বাঁশের ছড়ি, পায়ে খড়ম, গলায় তেঁতুল-বিচির মালা, কপালে ছাই। সারা পাগড়ি-কোর্ত্তা-লুঙ্গী গেরুয়া হয়ে শেষে খালি গায়ের চামড়ায় গিয়ে পৌঁছোতে আমার অনেক বাকি। আমার যিনি গুরু তিনিও অতদূর এখনো অগ্রসর হতে পারেন-নি। কিন্তু তাই বলে হতাশ হলে চলবে না। বাবার উপদেশ মতো খুব উৎসাহের সঙ্গে সবটা গেরুয়া উর্দ্দি যত শীঘ্র পারি লাভ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ওদিকে বাবার সেবা করতে, সন্ন্যাসী খাওয়াতে, তীর্থ সারতে আমার জেবের সব গিনি-সোনা এক মোড়ক হরিতাল-ভস্মে ক্রমে পরিণত হয়েছে। আমার হাতে সেই ভস্মটুকু দিয়ে বাবা বল্লেন—"যাও বাবা, এখন সংসারে ফিরে যাও, সেখানে তোমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।" আফিসের কাজ, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, অনেক কাজই বাকি রেখে চলে এসেছি। কিন্তু সে যে হল অনেকদিন। কাজগুলো আমার জন্যে এখনো বসে আছে কিনা জানিনে। তাছাড়া হাতে আমার বাকি রয়েছে মাত্র সেই হরিতাল-ভস্মের মোড়ক। সেটাও সত্যি ভস্ম কিনা তারও পরীক্ষা করতে সাহস হচ্ছে না। অবিনকে তখন একখানা চিঠি লিখে সব খবর জানাবার ইচ্ছে হ'ল। আমি হরিতাল-ভস্মের মোড়ক বাবার কাছে বাঁধা রেখে ডাক-টিকিটের জন্যে দুটো পয়সা চাইতে গেলুম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"বাবা, আমরা মুক্তির মন্ত্র সাধন করি, কোন-কিছু বাঁধা রাখাতো আমাদের দ্বারা হতে পারে না। সন্ন্যাসী কি কখনো মহাজন হয় বাবা?"

বাবার মধ্যে মহাজনী যে এতটুকু নেই তাই দেখে ভক্তিতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমি 'বিফল জনম, বিফল জীবন' আর-একবার মনে মনে গাইতে গাইতে বাঙালিটোলার গলি পেরিয়েছি, এমন সময় অনেকদিনের পরে অবিনের সঙ্গে দেখা।

সে ঠিক তেমনি আছে—কোনো বদল হয়নি। কথায়-কথায় জানলুম সে গয়ায় চলেছে। আমাদের জাহাজের সেই লেট্ সভার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যতরকম সভা আছে ও নেই ব্রাহ্মণশূদ্র-নির্ব্বিশেষে সব ক'টার পিণ্ডদান করতে। আমারো তখন পিণ্ডি দেবার জন্যে হাত নিস্‌পিস্ করছিল কিন্তু কার সেটা আর বলে কাজ নেই।

গাড়িতে উঠে আমি অবিনকে বল্লেম —"ওহে গয়ার সাধুসন্ন্যাসীদের খুসি করবার মতো কিছু পকেটে এনেছো তো?" অবিন হাতের মোটা লাঠি-গাছা দেখিয়ে বল্লে—"যথেষ্ট!"

কাশী থেকে গয়া কত দূরই বা? কিন্তু সময় তো লাগছে অনেকটা!—এই ভাবতে ভাবতে চলেছি এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই অবিন চট্ করে আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। একটা ঝড় হ'য়ে প্ল্যাটফরমের সব আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে একটা সাদা মোটর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেঁপু দিচ্ছিল। অবিন আমায় নিয়ে তাতে উঠে বসলো।

মোটরখানা কোনো হোটেলের ভেবে আমি অবিনকে বল্লেম—"ওহে আমার এ বেশে তো হোটেলে ওঠা সম্ভব হবে না। কোনো ধর্ম্ম-শালায় গিয়ে থাকলে হয়-না?" অবিন আমার পিঠ-চাপড়ে বল্লে—"ধর্ম্মশালা থেকে অনেকদূরে এসে পড়েছি যে! এখনো বুঝি ওটার মায়া কাটাতে পার-নি?" বলতে বল্‌তে গাড়ি একটা ব্রীজ পেরিয়ে বাঁ-হাতে মোড় নিয়ে দাঁড়ালো। অবিন গাড়ি খুলে লাফিয়ে পড়লো। আমিও নাম্‌বো এমন সময় আমার পাগড়ীর ল্যেজটা গেল মোটরের একটা চাবিতে বেধে! ল্যেজের গেরুয়া অংশ তার সঙ্গে অনেকটা সাদা ফালিও ভাড়ার উপর বথশিশ-হিসেবে গাড়োয়ানকে দিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে নদীর ঘাটে শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডদান করতে বসে গেলুম। অনেকগুলো সভা, পিণ্ডি তো কম দিতে হলোনা? সব সারতে ভোর হল। শ্রাদ্ধ সেরে সূর্য্যের প্রণাম করতে গিয়ে দেখি আমাদের বড়বাজারের শ্রাদ্ধ-ঘাটে বসে আছি। সেই সিঁড়ি, সেই মার্ব্বেল-পাথর-মোড়া ঘরে তেমনি মিন্‌টান্ টালির বাহার! আমি তো অবাক্। সন্দেহ হলো যে হরিদ্বারে যাত্রাটার মতো এ যাত্রাটাও বুঝিবা অতিশয় সত্যি।

অবিনের দিকে চাইলেম, তারও চেহারাটা কেমন ঝাপসা বোধ হল,—যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখছি! কুয়াশাটা আমার মাথার ভিতরে কি বাইরে জমা হয়েছে সেটা বুঝতে না পেরে আমি কাপড় ছেড়ে ব্রহ্মতেলোয় হাত বোলাচ্ছি এমন সময় আমাদের জাহাজের বাবাজী এসে আমার সামনে "জয় সত্যনারাণ!" বলে হাত পাতলেন। আমি তাঁকে সত্যিই ষোলআনার একআনা দেব বলে জেবে হাত দিতেই আমার হাতে ঠেকল সত্যি-নারাণের কোন কাজেই যেটা লাগবে না হরিতাল-ভস্মের সেই মোড়ক—যেটা অবিনের চেয়ে, হরিদ্বারের চেয়ে, কাশী গয়া, কলকাতার মোটরগাড়ি, শ্রাদ্ধের মন্তর, বাবাজী, এমন কি আমার নিজের চেয়েও, সত্যি, সত্যি, সত্যি,—সত্যি ছাড়া মিথ্যে নয়।

আটটা-উনপঞ্চাশের জাহাজ বাঁশী বাজিয়ে পণ্টুনে লাগল। অবিন, আমি, বাবাজী এবং আরো প্রায় জন-পঞ্চাশ গিয়ে জাহাজের কেউ প্রথম, কেউ দ্বিতীয়, কেউ তৃতীয় শ্রেণী, কেউ-বা কোনো শ্রেণীই নয় দখল কল্লেম।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ত্তমান সাহিত্যে যুগ-ধর্ম্মের রূপ

চোখের সাম্‌নে এই যে জল-মাটী-আকাশ-বাতাস-আগুনে ভরা দুনিয়াখানা দেখা যাচ্ছে, এটার আপাদমস্তক যে পাঁচ-ভূতের কীর্ত্তিকলাপে বোঝাই করা, তদ্বিষয়ে আমরা সকলেই একরকম নিঃসংশয় হয়ে এসেছি; এখন যদি কিছু সন্দেহ থাকে তবে সে-সন্দেহ শুধু এক বিষয়ে, আর সে বিষয়টী হচ্ছে এই—"ভূতেদের কোনো বাবা আছেন কি না?' বস্তুতঃ, আমরা মানি আর নাই মানি, ঐ একটিমাত্র প্রশ্নেরই চারিদিকে আমাদের সংশয় ও বিশ্বাস দিন-রাত্রির মতন পালায় পালায় ঘুরে চলেছে।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এম্‌নি একটী ধারণার ধারা অন্তঃসলিলা বইছে, যে ও-ধরণের কোনো বাবা অতীতকালে হয়তো বা ছিলেন, কিন্তু এতকালে নিশ্চয়ই সদ্গতি লাভ করেছেন। ভগবান মরে ভুত হয়েছেন কি দশচক্রে পড়ে ভূত হয়েছেন, এ অবশ্য মহাসমস্যার কথা, তবে এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করে' লাভ নেই; তা ছাড়া সাদা কাগজে কালির আঁচড় পাড়তে বসেই ভগবানের নামে দোহাই পাড়াটা আজ-কালকার দিনে ঠিক দস্তুরমাফিক নয়, এমন-কি দৌর্ব্বল্যেরই পরিচায়ক।

ও-পরিচয় অবশ্যই আমি দিতে চাইনে; কিন্তু যে পত্তনটীর উপর মনোবিজ্ঞান তার অজস্র শাখা বিস্তার করে' দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেই 'অহং'টীকে ভূতেদের পিতৃস্থানীয় করে' দিলে আশা করি কেউ আপত্তি করবেন না। এই 'অহং'টী আমাদের অনেকের কাছেই 'অপদার্থ'-রূপে গণ্য হয়ে থাকে, কেননা পদার্থ-বিদ্যায় যাকে 'পদার্থ' বলা হয়, ও-জিনিষকে তার সংজ্ঞা-ভুক্ত করা চলে না। তবে, স্পষ্টই যখন দেখা যাচ্ছে যে ঐ অহংএর ঠেলায় এই বিশ্বজোড়া ভূতের রাজ্য চঞ্চল হয়ে উঠছে, তখন ও-বস্তুকে 'কিছু না' বলে' উড়িয়ে দেওয়াও তো যায় না!

কিন্তু সে যাই হোক্, এ-দেশের ষড়দর্শন মানুষের কল্যাণ-কামনায় যে-সমস্ত মন্ত্র আউড়ে আসছিলেন, তাকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র বলেই যদি ধরা যায় তবে সে-শ্রাদ্ধ ছিল ভূতের; অপর পক্ষে, একালের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা যে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বেরুচ্ছি তা' ভূতের শ্রাদ্ধের নিশ্চয়ই নয়, তাদের বাপেরই শ্রাদ্ধের। অহংপুরুষের পৌরুষ কারুর মাঝখান দিয়ে প্রকাশ পেতে দেখ্‌লেই আমরা যে সর্ব্বাগ্রে তার গলা টিপে ধরবার জন্যে দলবদ্ধ না হয়ে থাক্‌তে পারিনে, এ-সত্য কাগজে কাগজে এতই প্রত্যক্ষ যে তার প্রমাণ অনাবশ্যক।

কবিরা কিন্তু ঐ নবশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মহা-সমারোহময় শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যোগদান কর্‌তে প্রবল আপত্তি জানাচ্ছেন, কেননা তাঁদের মতে ভূতের বাবা তাঁর গুণধর পুত্রদের উৎপাতে আত্মহত্যা করেন নি, চাপা পড়েছেন মাত্র।

শ্রাদ্ধ-সভার সভাসদরা বলছেন—'প্রমাণ কি তা'র?'

কবির উত্তর—'প্রমাণ আমি প্রাণের মধ্যে পেয়েছি। নিয়মভঙ্গটা শীঘ্র শীঘ্র সেরে মনের গলা থেকে কাছা খুলে ফেল, তোমরাও অবিলম্বে সে প্রমাণ পাবে।'

বিজ্ঞ সভাসদবর্গ বল্‌ছেন—'খবর্দ্দার, নিয়মভঙ্গ করো না; কবির কথা অবিশ্বাস্য, অতএব শ্রাদ্ধের কাল যত পারো দীর্ঘ কর।'

২

কথাটা উঠেছে 'ব্যক্তি' আর 'সমাজ' নিয়ে। ব্যক্তিগত অধিকারকে সাম্‌নে ধরে

বঙ্গসাহিত্যের একদিক থেকে যে নবমত প্রচারিত হচ্ছে, আমাদের নব-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্য-কীর্ত্তি তার শুভফল-সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হচ্ছে, এবং Socialism-ভক্তেরা ঐ প্রচারের রূপটীকে Individualism নাম দিয়ে নানাপ্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

সমাজ-তন্ত্রে আর ব্যক্তিতন্ত্রে যেখানে বিবাদ বাধে সেখানে ধর্ম্মতন্ত্রের সালিশি অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে, কেননা ধর্ম্ম-জিনিষটা যে কি, তাই নিয়েই যে মানুষে মানুষে মতভেদ ও বুদ্ধিভেদ অনন্তসামান্য। সামাজিকরা বলেন, যা মানুষকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাই ধর্ম্ম; আর অসামাজিকরা বলেন, মানুষকে সমাজ থেকে যা' মুক্ত করে তাই ধর্ম্ম।

মনে পড়ে, বহুকাল আগে আমাদের এই গ্রামে একবার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিষম রকম দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল,—সে-দাঙ্গার উপলক্ষ্য ছিল 'গরু'। মুসলমান-ধর্ম্মতন্ত্রে ও-জীবটীর হত্যার ব্যবস্থা আছে এবং হিন্দু-ধর্ম্মতন্ত্রে তার রক্ষার বিধান আছে—এই বিশ্বাসকেই বড় করে' তুলে হিন্দু-ধার্ম্মিক ও মুসলমান-ধার্ম্মিক পরস্পরের মাথা লক্ষ্য করে' লাঠি উচিয়েছিলেন। দুটী প্রবল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবুদ্ধি যখন গরুর উপর ভর করে' দাঁড়ায়, তখন তা' যে গো-বুদ্ধিতেই পরিণত হয়, ঐ উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তটিই তার প্রমাণ।

এখন, যে-বুদ্ধির কথা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে পাড়া হয়েছে তা' ঠিক গরুকে না হলেও সমাজকে আশ্রয় করে' দাঁড়িয়েছে, এবং আমাদের নব-ধার্ম্মিকদলের ধর্ম্মবুদ্ধি ঐ জিনিষটিরই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আশা-আশঙ্কার পরিচয় দিচ্ছে।

আমরা নিজেরা Socialism বা Individualism এই উভয়বিধ ismএর কোনোটীরই বিশেষ পক্ষপাতী নই—কেননা ও-দুটীরই প্রতিষ্ঠাভূমিতে যা আছে তার নাম স্বার্থপরতা। এই স্বার্থবুদ্ধির উপর যতক্ষণ মানুষ বাস করে, ততক্ষণ তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্নই থেকে যায়; সকলের স্বার্থ এক নয়, এবং স্বার্থ কস্মিনকালেও দুনিয়া-শুদ্ধ লোকের এক হতেও পারে না—অতএব স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের ভিতর দিয়ে ঐ সকল ism-বাদীর ভবিষ্যৎ রক্তরেখাঙ্কিত হতে বাধ্য।

'সমাজ' হচ্ছে সেই জিনিস, যেখানে আমরা পরস্পরের পারিবারিক স্বার্থকে যথাসম্ভব সুবিধাজনক করবার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসা বা রফাছাড়ের বন্দোবস্ত করে' পাশাপাশি বাস করি, এবং Socialism হচ্ছে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে ঐ জাতীয় ব্যবস্থা বন্দোবস্তের নানারকম আইন-কানুন।

Individualismএর অর্থ অবশ্যই ব্যক্তিগত স্বার্থবাদ, অর্থাৎ পরস্পরের স্বার্থ-গত আদানপ্রদানের মাঝখানে নিজের স্বার্থটাই বড় করে' দেখা—অপর কথায় "চাচা আপন বাঁচা"—এই মতবাদ।

কোন লেখক-বন্ধুর পত্রে প্রকাশ—"সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় Individualism জিনিষটা পেটের অসুখে Castor oilএর মত"।

উক্ত উক্তিতে স্বীকৃত হয়েছে যে আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাটা একেবারেই আশাপ্রদ নয়, কেননা তার চতুর্দ্দিকেই স্বার্থ-বুদ্ধির পেটের অসুখ দেখা দিয়েছে। বন্ধুর ঐ রোগ নির্ণয়টুকু নির্ভুল—কিন্তু তিনি চান ও-রোগ তাড়নার জন্যে Socialismএর জয়ঢাক-শব্দে সাহিত্য-ক্ষেত্র শব্দায়মান করে' তুল্‌তে এবং সেটি একটি প্রকাণ্ড ভুল।

যে স্বার্থ-সন্ধান-চেষ্টা জনে জনে সর্ব্বনাশের কারণ, তা দলে দলে স্বীকৃত হলে যে, মানব-জগতে পৌষমাষের আরাম দেখা দেবে, এমন কথা এক পাগল ছাড়া অন্য কেউ মনে করতে পারে না। সুতরাং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় Individualism-এর প্রচার যদি Castor oil হয়, তবে Socialismএর প্রচারও বেলের মোরব্বা হবে না।

তবে কি Individualismএর প্রচার চল্‌তেই থাক্‌বে?

উত্তর—Individualismএর প্রচার কেউ কর্চ্ছেনই না। ব্যক্তির স্বার্থ-স্বাতন্ত্র্য নয়, কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্যই আধুনিক সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ শিখর থেকে প্রচারিত হচ্ছে, এবং বলা বাহুল্য যে 'আত্মা' বল্‌তে যা বোঝায়, তা সর্ব্বস্বার্থপারেরই বস্তু। এ প্রচারকে যদি কোনো ইংরাজী নামেই চিহ্নিত করতে হয়, তা হলে সম্ভবত Microcosm নামটী নিতান্ত অনুপযোগী হবে না।

৩

কিন্তু প্রচারের লক্ষ্যটা যে Individualismই, এ ধারণা এক-আধজনের নয়

—আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ মাষ্টার-মহাশয়েরাই এ বিষয়ে একমত, কারণ তাঁরা সকলেই Ibsen পড়েছেন। 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য' নাম কোনোখানে দেখ্‌লেই যে তাকে Ibsenism মনে করতে হবে, এমন ধারণা নিশ্চয়ই আমাদের পেয়ে বসতো না, যদি 'স্বার্থ' ও 'আত্ম' এই দুটী শব্দের স্পষ্ট ভাব-চিত্র আমাদের মানস-চক্ষের সম্মুখে থাকৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা-সাগরটা সাঁতরে পার হয়ে এলেও স্বার্থের ঠুলি আমাদের অনেকেরই চোখ থেকে খসে পড়ে না, বরং কারুর কারুর চোখে বরং বেশী করে'ই এঁটে বসে। ফলে আমাদের মাষ্টার-মহাশয়েরা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে-ভাবে বলা-কওয়া করতে থাকেন, তাতে দুনিয়ার হাঁড়ির খবর এত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় যে নাড়ীর খবরটার আর সন্ধানই পাওয়া যায় না!

এর কারণ স্পষ্ট। বর্ত্তমানে আমরা কলেজে যাই ভবিষ্যতের ভাত-কাপড়ের ভাবনায়, কিন্তু হৃদয়-মনের অনুশীলনের জন্যে ক্বচিৎ। ফলে, শিক্ষক সেজে যখন শেখা-বুলিকে লেখায় পরিণত করতে বসি তখন ঐ এক স্বার্থ-বুদ্ধির বাত-রোগকেই মানুষ থেকে সমাজে এবং বিধি থেকে বিধানান্তরে সঞ্চালিত করা ছাড়া অন্য কোনোরূপ কর্ত্তব্যের কল্পনাও করতে পারিনে!

বিশ্বের সঙ্গে দাঁতের যোগ দেহ-রক্ষার জন্যে যে অত্যাবশ্যক তাতে অবশ্যই সন্দেহ নেই, কিন্তু আঁতের যোগটাই যে গোলযোগ

এমন কথাও ঠিক নয়। প্রথমোক্ত যোগটি রক্ষা করবার জন্যে যে ফসল দরকার, তার চাষের পক্ষে মাঠের মাটীই যথেষ্ট; এ উদ্দেশ্যে মনকেও মাটী করে' সাহিত্য-ক্ষেত্রে লাঙল চালানো সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। কিন্তু এ সত্য মানা দূরে থাক্, রস-সাহিত্যের দরটা পর্য্যন্ত সম্প্রতি আমরা দাঁতের কষ্টি-পাথরেই যাচাই করতে ব্যস্ত হয়েছি এবং দন্তস্ফুট হচ্ছে না দেখে রসিক-সম্প্রদায়কে 'বস্তুতান্ত্রিক নয়' বলে নিন্দে কর্চ্ছি।

দাঁত ওঠবার আগেও যে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের আঁতের যোগ থাকে, তার প্রমাণ শিশুদের হাসি-কান্নায় ঘরে ঘরেই পাওয়া যায়; অপর পক্ষে, দাঁত পড়ে গেলেও যে ও-যোগ নষ্ট হয় না তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'বুড়োবুড়ির দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকায়'। চোখের উপর এ-সব নিত্য দেখেও কেন যে আমরা মাঝখানের ঐ দন্ত-রোগটাকে এ-বিশ্বের রাজাসনে বসাতে চাই তা' বলা শক্ত। কিন্তু বসাচ্ছি যে, এ-অপবাদ অস্বীকার করে' লাভ নেই; আমাদের ঐ শিক্ষকদলের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা দেশশুদ্ধ লোক আজ আত্ম-চর্চ্চার ঋষিক্ষেত্রকে পাশ কাটিয়ে ত-রাজ্যির ভূতের বোঝায় কুব্জপৃষ্ঠ ও ন্যুব্জদেহ হতে চলেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিঠের বোঝা স্বজাতির পেটের মধ্যে সজোরে প্রবেশ করিয়ে দিলে তারা যে হাঁসফাঁস করতে করতে 'সমাজের' খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়বে, এতে অবশ্য বিস্মিত হবার কারণ নেই। সেই জন্যেই সাহিত্যের বেনামীতে আজ আমরা চারিদিকে যা' দেখ্‌ছি তা' আসলে ঐ সমাজেরই সেবায়েৎ, আর ধর্ম্মের নামে যা পাচ্ছি তা' ও-বস্তুর পোষা-পুরুত ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

সাহিত্যিক বলে' সাধারণ্যে আপনাকে চালিয়ে দেবার জন্যে, অথবা ধার্ম্মিক বলে' লোকারণ্যে গণ্য হবার পক্ষে ও-পন্থায় অনুসরণ যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তাতে আর সন্দেহ কি! সমাজবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মনস্তুষ্টির জন্যে যা করা যায়, তার মস্ত সুবিধাটা এই যে তাতে লজ্জার ভয় থাকে না; কেননা, "দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ"।

কিন্তু লজ্জাটাকে কোনমতে পাশ কাটিয়ে চলাই যে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এমন কথা শুধু লজ্জার মাথা খেয়েই বলা চলে। তা' ছাড়া, ধর্ম্ম বা সাহিত্যের অর্থ নির্ণয় করতে হলে সমাজের ভোটই যে দরকার, এমন কথা তাঁরাই বল্‌তে পারেন যাঁদের আস্থা মাথার চেয়ে ধড়ের উপরই বেশী। দেশের ধর্ম্ম দেশের প্রতিভা-শালীদের মধ্যে নেই—ওজনে-ভারী জনে সংখ্যায় আছে এ-কথা মানা সম্ভব হ'ত যদি দেখতুম যে কুড়িজন শিশুর বুদ্ধি একত্র করলে একজন প্রাপ্তবয়স্কের অভিজ্ঞতার সমান হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ থেকে প্রতিভাবানদের তফাৎ করে' ধরলে শাঁসে জলে যে প্রকাণ্ড দেহটা পাওয়া যায়, তা কবন্ধ বই আর কি? এ হেন "সমাজ-কবন্ধের" গুণ-বর্ণনা করে' প্রবন্ধ লিখলে হাততালি দেবার লোক খুবই মেলে বটে, কিন্তু ও-অঙ্গের ঘাড়ে দশমুণ্ড একগা

হয়ে উঠ্‌লে যে মূর্ত্তিটা গড়ে ওঠে, তা' নিতান্তই 'দশানন'। এই রাক্ষস-রাজের কুড়িহাতে ধর্ম্মের নামে যে ঘট-স্থাপনা করা যায়, সে-ঘটে ধর্ম্মের দর্শনলাভ স্বভাবতঃই দুর্ঘট হয়ে ওঠে, কেননা ও-কার্য্য আসলে ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই ধর্ম্মঘট ছাড়া অপর-কিছু নয়।

৪

ধর্ম্মের যথার্থ আরম্ভ হচ্ছে একের 'অহং'এ, অনেকের 'গোলে-হরিবোলে' নয়। ও-বস্তু সামাজিকতাও নয়, লোক-লৌকিকতাও নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম্মের অপর একটী নাম হচ্ছে আত্মবোধ বা আপনাকে চেনা, কিন্তু সমাজের জনে জনে আমরা আত্মবিরোধই দেখতে পাই। লোক-পিছু চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে পরস্পরের মুখচেনাচেনি নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু আপনাকে চেনা অবশ্যই তাতে হয় না। আত্ম-পরিচয় নিতে গেলে নিজের মনের মধ্যে বিজনবাস করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, কেননা 'অহং'এর চরম বিকাশটী মনের অতিরিক্ত, অন্তর্ভুক্ত নয়; আর ঐ মনের বিদ্যাবুদ্ধিকে আত্মাধীন করে'ই আমরা আত্মপ্রবুদ্ধ হতে পারি। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অহংএর বেদীতেই ঐ অগ্নি-মন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম শিখা দেখা দেয়, এবং মনের ভূতগ্রস্ত দিকটাকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েই বিরাট অহংএর অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আত্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠাভূমিটী স্বচ্ছ করে' তোলে।

জীবন-ধর্ম্মে আর সাহিত্য-ধর্ম্মে যদি কিছু তফাৎ থাকে, তবে সে শুধু 'বিকাশের' আর 'প্রকাশের'। প্রথমটী যদি আত্ম-বিকাশ হয়, তবে দ্বিতীয়টী হবে আত্মপ্রকাশ। এ-কার্য্যে পরতন্ত্রতা হচ্ছে প্রতিবন্ধক এবং স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য আশ্রয়।

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত আত্ম-বিকাশ ও আত্মপ্রকাশ-ধর্ম্মকে ঘোষণা করাই হচ্ছে বর্ত্তমান-সাহিত্যের যুগধর্ম্ম। কঠিন-মৃত্তিকাপৃষ্ঠ পৃথিবীর গভীর তলদেশে যে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে, কূপই যেমন তাকে সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ করতে পারে, তেম্‌নি এই মানব-জগতের বিচিত্র চিত্ত-স্তরের গভীর তলদেশে যে অখণ্ড প্রাণের ধারা প্রবাহিত রয়েছে ব্যক্তিগত চিত্ত-বিশ্লেষণ-ফলেই তা' লভ্য হয়ে থাকে। সরোবর বা দীর্ঘিকা থেকে যেমন কূপের জল সংগৃহীত হয় না—পরন্তু খনিত সরোবর প্রভৃতিতেও কূপের উৎস-মুখেই বারিরাশি ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ব্যক্তির প্রাণ-শক্তিও সমাজ থেকে সংগৃহীত হয় না, কিন্তু ব্যক্তিরই প্রাণের বেগ সমাজকে সজীব ও সবল করে' তোলে। সমাজ যত-বড় ভারী জিনিষই হোক না কেন, ধার যদি কারুর থাকে তবে সে ব্যক্তিরই আছে। অতএব, আধুনিক মানব-সমাজের কর্ণছিদ্রে যাঁরা ঐ ব্যক্তি-মাহাত্ম্যের যুগধর্ম্মটী নির্দ্দেশ করতে দাঁড়িয়েছেন, সমাজ-ভারাচ্ছন্ন-সম্প্রদায়ের তিরস্কারে অবশ্যই তাঁরা বিচলিত হবেন না। যথার্থ মানব-কল্যাণের উপায়সম্বন্ধে যাঁরা বুদ্ধিমান হয়েও অবোধ, তাঁদের অপরাধকে মার্জ্জনা ও তিরস্কারকে শিরোধার্য্য না করলে এ-জগতের মধ্যে মানুষ গড়ে তোলবার চেষ্টা পেছিয়েই পড়বে।

সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় পরিণতি-দানের চেষ্টা নিশ্চয়ই Ibsenism নয়; যদি হয়, তবে এ-দেশের সব-চেয়ে দুর্দ্দান্ত Ibsen ছিলেন বৈদিক ঋষিরা।

"হোক্ সত্য যত বড়, মিথ্যা তাহা মোর কাছে
বুঝি নাই যারে

খুঁজে লব প্রাণ হ'তে তারে"—এই মন্ত্রই হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূলমন্ত্র, এবং তাঁরাই ও-সঙ্কল্পকে দোষের বল্‌তে পারেন যাঁরা পড়া-বুলিকে গড়া-বুলিতে পরিণত করে' তোলবার উপযুক্ত পাকযন্ত্রের অভাবে নিজেদের ঐ অভাবটাকেই সম্পদ বলে গণ্য করেন।

'আত্মা'-জিনিষটী যে নির্লিপ্ত, স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বাধীন—এ-কথা আমরা কেতাবে পড়ি ও বক্তৃতায় ছড়াই। কিন্তু মানুষের আত্মপ্রকাশে স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রলীলা দেখ্‌লেই আমরা শিউরে উঠে বলাবলি করি—"সর্ব্বনাশ হল, উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ ভাস্‌লো!" শৃঙ্খলের অর্থাৎ শিকলির উর্দ্ধে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে, এই ক্ষুদ্র আশঙ্কায় চিরন্তন শৃঙ্খলাকে আর আমরা তফাৎ করে' রাখবো না—কেননা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, মানুষের ঘরগড়া শৃঙ্খল এই চমৎকার বিশ্ব-শৃঙ্খলার কাছে কিছুই নয়। ঋতুর পর ঋতু, জন্মের পরে মৃত্যু, রাত্রির পরে দিন আমাদের হাতে-গড়া জীর্ণ-নীতির প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে' পরমানন্দে আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে এবং আমাদের ক্ষুদ্র ভয় ও তুচ্ছ দ্বিধাকে ব্যঙ্গ করে' involuntary দেহ-যন্ত্রগুলিরও আড়াল থেকে প্রাণ তার আপন নিয়মকে প্রকাশ করছে।

প্রাণের এই সর্ব্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাভূমিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ-বর্জ্জন করাতেই প্রত্যেক ক্ষুদ্র অহংএর যথার্থ আত্মপ্রতিষ্ঠা, কেননা স্বার্থ-স্বাতন্ত্র্য-বর্জ্জন আর আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-অর্জ্জন একই কথা। গোবিন্দকে যদি নমস্কার করতে হয় তবে সে এইখানে—এই স্বাতন্ত্র্যের অর্জ্জন-ক্ষেত্রে। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' কর্‌লে সামাজিক যজমানের চোখে ধুলো দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মৃতের তর্জ্জনী-সঙ্কেতে মোহপ্রাপ্ত হলে প্রাণের শঙ্খধ্বনি শোনবার কানটাও নিশ্চয় বধির হয়ে উঠবে।

৫

আমাদের শিক্ষার প্রধান দোষ হচ্ছে এই যে extreme nagativeকে অনায়াসেই আমরা extreme positive বলে ভুল করে' ফেলি, এবং তা' এই কারণে যে, ও-দুয়ের চেহারা প্রায় একই রকম। আলোকের কম্পন যখন মৃদুতম, তখন আমরা চোখে অন্ধকার দেখি,—যখন দ্রুততম, তখনও কাণা হয়ে থাকি। শব্দ-সম্বন্ধেও অবস্থা ঠিক ঐ একই রকম; অর্থাৎ ও-বস্তু যখন অতি-ক্ষীণ তখনও আমরা শুন্‌তে পাইনে—আর যখন অতি-উচ্চ তখনও কালা হয়ে থাকি।

আধুনিক শব্দ-শিল্পীদের মধ্যে যে দু'একটী প্রবলকণ্ঠ দেশের লোকের মনের কান কালা করে' দিচ্ছে তা' এই শেষোক্ত কারণে। তবু, ভরসার কথা এই যে ও-শব্দ, অবিলম্বেই দেশ শুনতে

পাবে,—এমন-কি, অনেকে ইতিমধ্যে গেয়েছেনও।

কিছুকাল আগে আমাদের ধারণা ছিল যে বিশ্বের জঞ্জালের দিকে মনকে বিক্ষিপ্ত করে' দিতে পারাই ভগবানের নিকটতর হবার উপায়—তাই কেন্দ্রটীকে নিজের বাইরে ধরে' এগুতে চাইছিলুম। আজ একটা দম্‌কা-হাওয়ার বিপরীত ধাক্কায় অকস্মাৎ সে দিকটা ঘুরে গিয়েছে—তাই যুগ-ধর্ম্মের মুখে নূতন এক মন্ত্রশক্তি বাণীময় হয়ে বল্‌ছে—"রোগটা ঠিক ঐ বটে, তবে চিকিৎসার পন্থাটা হচ্ছিল ভুল; মনকে বিশ্বে বিক্ষিপ্ত না করে' বিশ্বকে মনে সংক্ষিপ্ত করতে থাক,—ভগবানের নিকটতর হবার চেষ্টা ছেড়ে ভগবানকে নিকটতর কর্‌বার সাধনায় লেগে যাও, কেননা তাতেই যাবতীয় অন্যমনস্কতা আত্মমনস্কতায় পরিণত হবে।

জীবনের পরিপূর্ণতা বিশ্বপ্রকৃতির কোনো সুদূর-পারের কেন্দ্র থেকে আমাদের ডাক পাড়ছে না—আমাদেরই অভ্যন্তর থেকে বাইরের পরিধিটাকে সে কাঁপাচ্ছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুটী আদি-অন্তহারা সমান্তরাল সরল রেখারই মতন বৃত্তাকার।

বিশ্ববস্তুকে মানস-লোকে আকর্ষণ এবং মনের ছাপ্ লাগিয়ে লাগিয়ে অভিনব রস-মূর্ত্তিতে বিশ্বপথে বিকর্ষণ—এরই নাম হচ্ছে ব্যক্তিগত সাহিত্য-সাধনা এবং এই জাতীয় আত্মপ্রকাশ থেকেই সাহিত্য-সাধকদের জীবন-পদ্ম ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলতে পারবে; কিন্তু পরের মুখে ঝাল খেয়ে কাগজের পাতায় 'গোটা নাল' ভেঙে চলাতে নয়।

সকলেই যদি পরস্পরের মনের কথা বল্‌তে আরম্ভ করি, তা' হলেই আদানে-প্রদানে উচ্চ থেকে উচ্চতর ছাঁচে মনকে ঢালা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে—অতএব ব্যক্তিগত ভাবে স্ব-তন্ত্র ও স্বাধীন বিচার-চিত্র অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত-জীবনের এই সত্য-পরীক্ষা-গ্রহণ-ব্যাপারকে যাঁরা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চান্, তাঁরা মানব-কল্যাণের সহায় নন। একমাত্র বিচারের সর্ষে-পড়া প্রয়োগেই অহংএর ঘাড়ের ভূত তার পদানত হতে পারে, অন্য কোন উপায়েই নয়।

কিন্তু আমাদের Ibsen-ভীতিগ্রস্ত জনৈক প্রফেসার-লেখকের একটী উক্তি উদ্ধৃত করে' একজাতীয় চিত্ত-রোগের বীজটা দেখিয়ে দিচ্ছি—

"তবে কি বেদান্তের 'অভয়ের কথা' আমার চরমতম চিরন্তন সত্য? কে জানে! হয়তো যাহা জ্ঞানের' অনধিগম্য তাহাকে 'ভক্তি'তে লাভ করা যায়!"

'জ্ঞান' আর 'ভক্তি' যে দুটী পরস্পর-বিযুক্ত জিনিস, এ-ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু আসলে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগের মধ্যে একেবারেই গোলযোগ নেই, কেননা ও-তিনটীই পরস্পরসাপেক্ষ, এবং মনেরই তিনটী বিভিন্ন অবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। 'ভক্তি' বল্‌তে যা' বোঝায় তা' কোনো-কিছু লাভের উপায় নয়—পরন্তু ঐ জিনিষই হচ্ছে লভ্য ফল।

'মন' বল্‌তে আমরা যে চঞ্চল ও তরল পদার্থটীকে বুঝি, 'ভক্তি' বল্‌তে সেই

একই পদার্থের স্থির ও প্রগাঢ় অবস্থাকে বোঝায়। 'বুদ্ধি' বা বিবেক বল্‌তে যে জিনিষটা বুঝি তা ঐ মনকে জ্বাল দেবার অগ্নি ছাড়া আর কিছুই নয়—আর 'ক্রিয়া' হচ্ছে সেই জিনিষ যা' ঐ বুদ্ধির উত্তাপে মন-পদার্থে দেখা দেয়। 'মন'-জিনিষটার প্রাথমিক ধর্ম্ম হচ্ছে তারল্য—আমাদের হৃদয়ের বিচিত্র বৃত্তি সত্যসত্যই পৃথক পৃথক বিভাগ নয়, আমাদের স্বায়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ও-জিনিষ তরলপদার্থের ধর্ম্মানুসারে যখন যা সাম্‌নে পায় তারই আকার ধারণা করে বলেই তা বিচ্ছিন্ন দেখায় মাত্র—বিচারের উত্তাপে ক্রিয়াশীল হ'তে হ'তে 'মন' যখন চরম-স্পন্দনে উপনীত হয়ে অচঞ্চল ও একনিষ্ঠ হয় তখনই তা ভক্তের ভাব ও ভক্তি-পরিণাম লাভ করে।

মনোবৃত্তি হচ্ছে instinctive, এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীতেই এ-জিনিষ আছে। Argument হচ্ছে ঐ instinctএর দ্বিতীয় অবস্থা, এবং পশুধর্ম্মজয়ী মানুষের মধ্যেই তা দেখা দেয়। Inspiration হচ্ছে ঐ 'বিচার-সমুদ্রপারের আত্মপ্রতিষ্ঠ অবস্থা আর এই inspiration যাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁরাই ভক্ত। যথার্থ কবিই হচ্ছেন একমাত্র ভক্তিযোগী, 'দর্শন' তাঁদের দৃষ্টির ভিত্তিতে তো আছেই, তা' ছাড়া আরও এমন-কিছু আছে, যা' দার্শনিকের দৃষ্টিতে নেই; ভক্তিই হচ্ছে ঐ অতিরিক্ত কিছু। এই বস্তুই সর্ব্ববিচারের উপর লব্ধজয় নিত্যরস, অপরকথায় আত্মানন্দ।

ভক্তি দুর্ব্বলের ছল নয়, বিচার-বুদ্ধি-হীনের অন্ধতা নয়—ঐ বস্তুই দিব্য-চক্ষু এবং ঐ বস্তুই আপন নির্ভীক ও সতেজ, নিঃসংশয় ও অপরাহত-পরাক্রম প্রেরণ-শক্তিবলে সেই সমস্ত দুর্ব্বলের অজস্র বিরুদ্ধতা অবাধেই অতিক্রম করে' চলে যেতে পারে, যাঁরা নাকি 'অভয়ের কথা'র দোহাইটাও 'সভয়ে' না পেড়ে থাকতে পারেন না।

শুধু 'অভয়ের কথা' কেন, এ-দুনিয়ায় কোনো কথাই সত্য নয়; সত্য যা তা' ঐ 'অভয়'; সত্য যা, তা' সেই শক্তি ও দীপ্তি, অশ্রু ও হাস্য, নির্ভীকতা ও দৃঢ়বিশ্বাস, আনন্দ ও সরসতা—এক কথায় সেই প্রচণ্ডবেগ প্রেরণশক্তি যা কথার আড়ালটিকে আলোকিত করে' তোলে।

বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই প্রেরণ-শক্তির উদ্বোধন-গান সহস্রকণ্ঠে গায়িতে দাঁড়িয়েছে। এ-সঙ্গীতে সমাজধর্ম্ম বা দেশধর্ম্ম, মানবধর্ম্ম বা বিশ্বধর্ম্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু গঠিত হবে। ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই সমাজ, অতএব ব্যক্তিগত আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সমাজ-ধর্ম্মকে ঐক্যপ্রতিষ্ঠ করবে—ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই দেশ, সুতরাং ব্যক্তিগত আত্মবোধই দেশাত্মবোধে সত্য-প্রতিষ্ঠা পাবে—ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই মানবজগৎ, অতএব ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন লাভই বিশ্বমানবধর্ম্মে জয়ধ্বনি অর্জ্জন করবে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

আলেয়ার আলো

ছাব্বিশ

মোহনের কথা

হায় রে জীবন-সুরার তিক্তরস! ঐযে তোমার বিরাট পাত্রের মত বিশাল গগন এই বিচিত্র জগতের উপরে অনন্ত কাল ধরে উপুড় হয়ে আছে, ঐ দিগন্তব্যাপী সুরাপাত্র থেকে যে বিষাক্ত রসের বিস্বাদ ধারা বিশ্বের মুখে দিবারাত্র ঝরে পড়ছে আর পড়ছে,—কেন আমরা তৃষিত কণ্ঠে উন্মুখ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি—কেন আমরা বুঝছি না যে, ঐ ক্ষণিক, তরল গরল-ধারার মত্ততা ক্ষণপ্রভার মতই ক্ষণস্থায়ী? দীন, ক্ষুদ্র মানব আমরা,—আমরা সুধু অন্ধ নই,—আমাদের অনুভূতিও নেই, আমাদের এই বাহিরের জীবন, ভিতরের প্রচ্ছন্ন অসাড় জড়তার তুচ্ছ আবরণ-মাত্র!

জানিনা, এ জীবনটা কি? এর একদিকে সুখের রাগিনী, হাসির ফোয়ারা, আনন্দের নন্দন; আর-একদিকে দুঃখের হাহাকার, কান্নার অশ্রু, দুর্ভাগ্যের দাবদাহ; এরই মাঝে এই যে ভঙ্গুর মানব-জীবন অসহায় হয়ে পড়ে আছে, কী এর সার্থকতা? মানুষ নিয়ে এই যে গড়া আর ভাঙ্গার, ভাঙ্গা আর গড়ার চিরকাল-ব্যাপী অকারণ খেলা, স্রষ্টার কোন্ মহৎ, বিরাট, দুর্ব্বোধ উদ্দেশ্য এর-মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে?

এ বিশ্বখেলার যিনি নিষ্ঠুর ক্রীড়ক, তাঁর অদৃশ্য হস্ত জীবনের পিছনে মরণকে, যৌবনের পিছনে জরাকে, সুখের পিছনে দুঃখকে কখন্ পাঠিয়ে দেয় কেউ টের পায় না, তারা গুপ্তঘাতকের মত চুপিচুপি এসে ফুলশয্যায় চিতাভস্ম ছড়িয়ে দিয়ে যায়—আর, দুনিয়ার মালিক হয়ে তিনি বসে বসে অটলভাবে তাই দেখেন! তিনি ত কাঁদেন না—তিনি ত কাঁদেন না! 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য',—এ-কথা বলেছে কোন্ অবোধ? আশার আলেয়া দেখিয়ে যিনি দুর্ব্বল, নাচারকে নিরাশার কূপে ডুবিয়ে মারেন, তাঁকে আমি ধন্যবাদ দেব না!

একে, একে, একে ছয়মাস কেটে গেল,—নিরানন্দ, অন্ধকার, বিষাদবিস্বাদ দীর্ঘ ছয়মাস! খাই আর বিছানায় গিয়ে শুই,—কখনো ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি, কখনো জেগে দুর্ভাবনা ভাবি। বাড়ীর বাইরে পা বাড়াতে সাধ যায় না—পৃথিবীর লোকজন, চেঁচামেচি, হাসি আর গান, এ-সব আমার প্রাণকে যেন হৃদয়ের মাঝে মূর্চ্ছিত করে' দেয়।

সরমার কথা মনে হচ্ছে। স্বামীকে সে ফিরিয়ে পেয়েছে—কিন্তু সে স্বামী তাকে ভালবাসে না। তার দুঃখের কথা ভাবলে আমার দুঃখ কত ছোট হয়ে যায়! সরমার মন ত আমি জানি! সে আমাকে ... ...

এই মনের জ্বালা মনে চেপে রেখে,

অত্যাচারী, প্রেমহীন, কুচরিত্র পতির সংসারে তাকে দিনরাত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হচ্ছে। শুষ্ক সাগরের তাতল বালুগর্ভে একটি ফুটন্ত কুসুমের মত সরমা এখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে! সরমা, সরমা, দুঃখের উপরে দুঃখ সইতে কেন তুমি আমার পথে এসে দাঁড়িয়েছিলে? তোমার এ দুর্ভাগ্যের জন্যে হয়ত আমিই দায়ী, আমিই দায়ী!

যমুনার হাত দিয়ে সরমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম; এখানি তার যাবার দিনে লেখা।

আজ সন্ধ্যাবেলায় চিঠিখানি বার করে' আবার পড়লুম। সরমার আপন হাতে লেখা এই ক-টি লাইন ছাড়া তার আর-কোন স্মৃতিচিহ্ন ত' আমার কাছে নেই! লিখতে লিখতে সরমা যে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে, এ পত্রের ছত্রে ছত্রে—অস্পষ্ট লেখায় তারই স্পষ্ট ছাপ্ রয়েছে! তার অশ্রুজলে অভিষিক্ত এই লিপি আজ আমার মর্ম্মের অন্দরে যেন তারই হারিয়ে-যাওয়া স্পর্শটুকু আবার ফিরিয়ে আনছে!

সরমা লিখেছে:—

"মোহনবাবু,

অভাগীকে ভুলে যান। আমার ক্ষুদ্র জীবন আপনার যোগ্য নয়,—ভগবান তাই আমাকে আপনার পথ থেকে সরিয়ে দিলেন। এতদিন আপনার আশ্রয়ে ছিলুম, আপনার মহত্ত্বের ঋণ আমি কখনো শুধতে পারব না—আপনি আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

আশীর্ব্বাদ করুন, স্বামীর সংসারে গিয়ে আমি যেন আপনাকে ভুলতে পারি। এখন এর-চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমার কাছে আর ত কিছুই নেই!

সরমা।"

সরমা আমাকে ভুলতে চায়! কিন্তু আমি? আমি কখনো তাকে ভুলতে পারব কি? জানি, তার কথা ভাবাও আমার পাপ—কিন্তু এ পাপ সমস্ত নিষেধ ঠেলে আমার সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে' থাকবে যে! এ পাপই যে এখন আমার একমাত্র আনন্দ!

সরমা হয়ত এতদিনে আমাকে ভুলতে পেরেছে! নইলে আজ-পর্য্যন্ত তার কোন খবর পেলুম না কেন?

আচ্ছা, সে ভাল আছে ত? যাবার সময় তাদের বাড়ী যেমন তালাবন্ধ করে' গিয়েছিল, এখনো ঠিক তেমনি আছে। সে বাড়ীতে তার জিনিসপত্তর পড়ে রয়েছে—কৈ, সে-সব নিতেও ত কেউ আসে-নি! তাই ত, সরমার অসুখ করে-নি?

সেদিন সরমার জন্যে মনটা কেমন উতলা হয়ে উঠল! খালি মনে হোতে লাগল, সরমা ভাল নেই—সরমা ভাল নেই! হয় তার অসুখ করেছে, নয় স্বামীর সঙ্গে সে কলকাতা ছেড়ে গেছে।

আচ্ছা, তার ঠিকানা আমি ত জানি, একবার খোঁজ নিয়ে এলেই ত হয়! আমার খবর নেয়-নি বলে সরমাকে আমি দুষছি—কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক, তার পরাধীন! বরং এতদিনে তার কোন

খবর না-নেওয়া আমার পক্ষেই অনুচিত হয়েছে!

তখনি কাপড়-জামা পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম! তারপর শ্যামবাজারের দিকে অগ্রসর হলুম।

খুজতে-খুজতে যখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের —নং বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

বাড়ীখানা ছোটখাট,—দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

সরমার স্বামীর নাম ধরে ডাকব, কি ডাকব না—তাই ভাবছি, এমনসময় পিছন থেকে জড়িতস্বরে কে বললে, "ভরসন্ধ্যায় বাড়ীর সামনে এ কোন্ যোগী ভিখারীর মূর্ত্তি বাবা!"

ফিরে দেখলুম, একটা লোক রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে; নিশ্চয় মাতাল!

আমার মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে সে বলতে লাগল, "কি বাবা, তুমি কি মূকবধির-বিদ্যালয় থেকে আস্‌ছ? কথাও জাননা, শুনতেও পাও-না?"

কোথাকার কে এক মাতাল! বিরক্ত স্বরে বললুম, "যান মশাই যান, ভাল আপদ!"

—"এযে বেজায় বেতর বেতালা বেসুরো আওয়াজ দিচ্ছ বাবা! আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই গরমা-গরম্ বুলি শোনাচ্ছ, এযে দেখছি ভয়ঙ্কর মিলিটারি-মেজাজ!"

আমি সচমকে বললুম, "এটা কি আপনার বাড়ী?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পথে এস! মদ খেয়েচি বলে যে নিজের বাড়ীর ঠিকানা ভুলে যাব, আমাকে এমন বেহুঁস্ মাতাল পাওনি হে!"

—"মাফ করবেন মশাই, আমি ভেবেছিলুম এটা সুরেনবাবুর বাড়ী।"

—"অধীনের দণ্ডবৎ নাও মাণিক! বাড়ী চিনেছ আর বাড়ীর মালিককে চেন না, এতে যে নেশা চটে যাচ্ছে বাছা! বোতল ভরে ঢল্‌ঢলায়মান সুধা নিয়ে সুরেনবাবু যে তোমার সামনেই টল্‌টলায়মান বাবা!"

—"অ্যাঁ, আপনি! আপনিই সুরেন-বাবু!"

—"নাম শুনেই আঁৎকে ওঠ কেন হে! বিশ্বাস হচ্ছে না—আমাকে সনাক্ত করবার জন্যে আবার লোক ডাকতে হবে নাকি?"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এই সরমার স্বামী?

—"চুপ করলে চলবে না সোনার চাঁদ! আমার নাম ত শুনলে, এখন তোমার নামটি কি চট্‌পট বলে ফেলে দিকিন?"

তখনি সেখান থেকে চলে আসতে ইচ্ছা হোল, এ দুর্দ্দান্ত মাতালের সঙ্গে কি কথা কব! কিন্তু তারপরে ভাবলুম, এতটা যখন এসেছি, তখন সরমার খবরটাও অন্তত নিয়ে যাওয়া উচিত। এই ভেবে বললুম, "আমার নাম মোহনলাল রায়।"

সুরেন আমার নাম শুনেই চম্‌কে উঠল। তারপরে বললে, "মো-হ-ন-লা-ল! হুঁ, ও নাম যে চিনি! এখানে কি দরকার হে তোমার?"

—"আপনার স্ত্রী কেমন আছেন, তাই জানতে এসেছি।"

—"কী! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! আমি জল্‌জ্যান্ত বর্ত্তমান থাকতেই আমাকে মর্ত্তমান দেখিয়ে আমার স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে বাবা, তাতেও তোমার সাধ মেটেনি? আবার এখানে এসেছ আমার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে! ভাগো হিঁয়াসে, জল্‌দি ভাগো!"

—"মশাই—"

—"চোপ্‌রাও পাপিষ্ঠ, চোপ্‌রাও! দেখবি মজাটা!" এই বলে সে কাপড়ের ভিতর থেকে একটা মদের বোতল বার করে' সেটা উঁচিয়ে আমাকে মারতে এল।

ভাবলুম, পশুটাকে ধরে দি ঘা-কতক বসিয়ে! কিন্তু তখনি চোখের উপরে জেগে উঠল, সরমার কাতর মুখ! মনের রাগ মনেই চেপে আস্তে-আস্তে সেখান থেকে চলে এলুম।

* * * *

এ কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! এমন স্বামীর হাতে পড়ে সরমা কি আর বাঁচবে? এর-চেয়ে যে বৈধব্য ভালো! এতদিন আপন দুঃখেই ভেঙ্গে পড়েছিলুম, আজ কিন্তু সরমার দুঃখের কথা ভেবে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল! ওঃ, সেই ফুলের মত বিমল, শিশুর মত সরল, দেবীর মত সুন্দরী সরমা, তার কপালে এই ছিল!

বাইরে, কয়লার চেয়ে কালো, নিবিড় মেঘের বুক চিরেচিরে ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুতের তীব্র অগ্নিস্রোত বয়ে যাচ্ছে,—ঘনঘন বাজ ডাকছে, আর মনে হচ্ছে যেন বিরাট আকাশের বুকের উপর দিয়ে একটা বিশাল অদৃশ্য গোলা গড়্‌গড়্‌ শব্দে এ-কোণ-থেকে-ও-কোণ পর্য্যন্ত গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে!

এই দুর্য্যোগে সরমা কি করছে? ঘরে তার মাতাল স্বামী, প্রাণে তার জলন্ত আগুন, সে কি এখন ঘরের কোণে বসে গুম্‌রে-গুম্‌রে কেঁদে মরছে? সুরেনের আজ যে-অবস্থা দেখে এসেছি, আজ কি সে সরমাকে ঘুমুতে দেবে?

খোলা জানলা দিয়ে হঠাৎ সরমাদের খালিবাড়ীর দিকে চোখ পড়ল। সরমা যে ঘরে থাকত, সেই ঘরের জানলার উপরে আমার ঘরের আলোটা গিয়ে পড়েছে; সচকিতে দেখলুম, সরমার ঘরের জানলাটা খোলা! সে গিয়ে-পর্য্যন্ত জানলাটা বরাবরই বন্ধ দেখে আসছি—আজ কিন্তু এ কি ব্যাপার! জানলাটা কি ঝড়ের ঝাপটে আপনি খুলে গেল?

আশ্চর্য্য হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় দপ্‌দপ্‌ করে' দু-তিনবার বিদ্যুৎ ঝল্‌কে উঠল। সরমার অন্ধকার-ঘরের একদিক থেকে নয়—দুদিক থেকে বিদ্যুতের দীপ্তি-রেখা এসে পড়েছে! তাহলে সুধু ঐ জানলাটা নয়,—ও-ঘরের অন্যদিকের জানলা বা দরজাও খোলা আছে!

নিশ্চয় চোর এসেছে! ঘরের মধ্যে এখনো সরমার জিনিষপত্তর আছে, যদি চুরি করে? তাইত, দেখতে হোল একবার!

ছাতি ও লণ্ঠন নিয়ে বাগানের পথে সরমার বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

কেউ কোথাও নেই। কিন্তু উঠান পেরিয়ে সিঁড়িতে উঠতে দেখি, সদর দরজায় ভিতর থেকে খিল দেওয়া! না, আর কোন সন্দেহ নেই—খালিবাড়ী পেয়ে নিশ্চয় কেউ বদ মত্‌লোবে ভিতরে ঢুকেছে!

চারিদিকে চাইতে-চাইতে উপরে উঠলুম। সরমা যে ঘরে থাকত, সেই ঘরের সুমুখে গিয়ে দেখলুম, দরজাটা সত্যিই খোলা!

খুব সাবধানে ঘরের ভিতরে গেলুম। লণ্ঠনের আলোতে ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর—ঘরের মধ্যে চোখ পড়তেই দেখলুম, মেঝের উপরে উপুড় হয়ে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি নিথর ভাবে পড়ে রয়েছে। সে মূর্ত্তিকে চিনতে একটুও বিলম্ব হোল না—সরমা, সরমা—সে সরমা!

সরমা!… …এই নিশুতি রাত্রে, এই ঝড়-বৃষ্টিতে এই শূন্য অন্ধকার বাড়ীতে, সরমা! আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম—নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না! কেন এসেছে সে,—কেন অমন-করে' ওখানে পড়ে আছে, সরমার কি হয়েছে?

ভাল করে' দেখবার জন্যে লণ্ঠনটা উপরে তুলে ধরলুম। অ্যাঁ,—ও কি ও! সরমার কাপড়ে কালো কালো ও কিসের দাগ? রক্ত!… …অ্যাঁ, রক্ত, রক্ত! তার হাতে, কাঁধেও রক্ত যে জমাট্‌ বেঁধে আছে! তবে কি সরমা… … …

ভয়ে আমার বুক উড়ে গেল—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল! চেঁচিয়ে উঠলুম, "সরমা, সরমা!"

সরমা আস্তেআস্তে দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে বস্‌ল। আমার দিকে না-চেয়েই ক্ষীণস্বরে বললে, "মরিনি গো, মরিনি! কপাল যার পোড়া, যম তাকে পায়ে ঠেলে গো!"

আঃ, রক্ষে পাই! সরমা যে বেঁচে আছে সেটা বুঝে আমি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম!

অনেকক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে রইলুম। আমি ভাবছিলুম, সরমার এমন হোল কি করে'? সরমা কি ভাবছিল, তা সে-ই জানে!

বাইরে তেমনি ঝমঝম জল হচ্ছিল, হুড়্‌মুড়্‌ বাজ্‌ পড়ছিল, বাগানের নড়্‌বোড়ে গাছপালাগুলো টল্‌মল করে' টলছিল—জগতে আর জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। ঘরের ভিতরে আমি তখনো স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে,—আর, সুমুখে আমার প্রাণের প্রতিমা রক্তে রাঙ্গা হয়ে লুটিয়ে আছে! কী দৃশ্য! জীবনের সে মুহূর্ত্ত, অনন্ত মুহূর্ত্ত,—আমার মর্ম্মের মধ্যে তা চিরস্থির হয়ে আছে!

হঠাৎ আমার হুঁস্‌ হোল! এমন দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না—সরমা যে মারা পড়বে! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললুম, "সরমা, এ তোমার কি হয়েছে, তোমার গায়ে এত রক্ত!"

সরমার মুখের উপরে একরাশ এলো ভিজে চুল এসে পড়েছিল—দুহাতে সেগুলো সরিয়ে সে আমার দিকে মুখ তুলে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে! এই ক-মাসে তার

চেহারা কি ভয়ানক বদলে গেছে—এ যে মরা-মানুষের মুখ! তেমনি সাদা—তেমনি ভাবহীন! আমার গা-হাত-পা শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল!

সরমা বললে, "এত রক্ত কেন, এত রক্ত কেন? এ আমার অদৃষ্টের দান—আমার স্বামীসেবার পুরস্কার!"—যে স্বরে সরমা কথা কইলে, তেমন স্বর তার কণ্ঠে এই প্রথম শুনলুম!

দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ করে' বললুম, "কী! সুরেন তোমার এ দশা করেছে? সে তোমার গায়ে হাত তুলেছে?—দেখে নেব, আমি দেখে নেব তাকে!"

—"মোহনবাবু, নারীর যা পাবার আমি তা পেয়েছি! আমরা যে দুর্ব্বল, আমরা যে পুরুষের দাসী!"

—"সরমা, তোমার কি হয়েছে আমাকে বল!"

—"সে দুঃখের কথা কি হবে শুনে?"

—"না, বল, বল!"

সরমা খানিকক্ষণ নীরবে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে তার হতভাগ্য জীবনের যে কাহিনী আমাকে সে শোনালে, তা যেমন করুণ, তেমনি ভীষণ! শুনতে-শুনতে মনে হোতে লাগল, আমার বুকের হাড়গুলো যেন এক-একখানা করে' খসেখসে পড়ছে!

সংক্ষেপে তার কথা বলে সরমা চুপ করলে—আমিও মৌন হয়ে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

আবার মনে পড়ল, সরমা আহত। তাড়াতাড়ি বললুম,—"সরমা, আমি কি নির্দ্দয়! তোমার এই অবস্থা দেখেও হাত-গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! তোমার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে,—না? দেখি তোমার কোথায় লেগেছে!"

—"এ দেহের যাতনার চেয়ে যে মনের যাতনা অনেক বেশী! আমার কি হবে মোহনবাবু, আমি কি করব!"

—"কেন সরমা, তুমি এখানে যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে!"

—"তা হয় না। যে দিন যায়, আর ফেরে না।"

—"কেন ফিরবে না সরমা! সেই তুমি, সেই আমি, সেই সবই ত তেমনি রয়েছে!"

—"না মোহনবাবু, আমার আর সে জীবন নেই—আমি এখন নতুন মানুষ হয়েছি।"

—"কিন্তু আমার চোখে ত তুমি নতুন মানুষ নও—তুমি যে আমার সেই পুরাণো সরমা!"

—"সে মরেছে। মোহনবাবু, ভুল করবেন না—ও ভুলকেই আমি সব চেয়ে ভয় করি, ঐ ভুলের জন্যেই এখানে আমার থাকা অসম্ভব।"

—"তবে তুমি কোথায় যাবে?"

—"জানিনা। হয়ত স্বামীর কাছে ফিরে যাব। হয়ত পৃথিবীর বাইরে একটু ঠাঁই খুঁজে নেব। সে সাহস যদি না-হয় তবে আর-কোন উপায় আছে কিনা দেখব।"

—"একি বলছ সরমা!"

—"হ্যাঁ, হৃদয়কে বিশ্বাস করি না!"

—"তোমার হৃদয় অবিশ্বাসী হবে না সরমা,—আমি তোমাকে জানি।"

—"কিন্তু সমাজ তা বিশ্বাস করবে না, সমাজের অত্যাচার আমিও আর সইতে পারব না। তখন যে ভরসায় লোকের কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছি, সে ভরসা আজ কোথায়! মনের সঙ্গে আমি আর ত একলা যুঝতে পারব-না!"

—"তবে এলে কেন? এসে যদি চলেই যাবে, তবে—"

—"চুপ করুন মোহনবাবু, চুপ করুন! এ উচ্ছ্বাসের সময় নয়! আর আমাকে মজাবেন না, আপনি কাতর হলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"বল।"

—"মোহনবাবু, আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করেছি! জানবেন, এই কথার উপরে আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"—

আমি কোন উত্তর দিলুম না! সরমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ-চোখের এমন অস্বাভাবিক ভাব, এর-আগে আমি আর-কখনো লক্ষ্য করিনি!

আমার চোখের উপরে তার সেই স্থির-বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত দৃষ্টি রেখে, সরমা দৃঢ়স্বরে বললে, "মোহনবাবু, বলুন আমাকে ভুলবেন, বলুন আপনি বিবাহ করবেন!"

—"বিবাহ করব, বিবাহ?"

—"হ্যাঁ, বিবাহ!"

—"সরমা, সরমা!"

—"আপনি যদি বিবাহ করেন তাহলে আমি এখানে থাকতে পারি! আমার জন্যে কেন আপনার জীবন নষ্ট করবেন? আপনার প্রেমে আর-একটি জীবন সফল হবে, তার প্রেমে আপনার সকল অভাব পূর্ণ হবে।"

—"সরমা, আমায় ক্ষমা কর!"

—"মোহনবাবু, আমার কথা রাখুন!"

সরমার নির্দ্দয় কথা শুনে আমার চোখে জল এল! সকাতরে বললুম, "তুমি আমার কথা ভেবে দেখ, আমার মনটা বোঝ, আমার উপর দয়া কর!"

সরমার চোখ আবার জ্বলে উঠল। তীব্রস্বরে সে বললে, "দয়া করব,—আপনার উপরে দয়া করব! আমার কি সে অধিকার আছে মোহনবাবু! এখন বুঝছি, ভুল করে আমি এখানে এসেছি! চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আপনার এই বাড়ী তেমনি করে আমাকে টেনে এনেছে—আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে এসেছি, কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারি-নি—আপনাকে সামলাতে পারি-নি! যে বাড়ীর এত মোহ, সেখানে থাকলে আমি মরব—আমি মরব! তখন মনের ঝোঁকে যা বুঝিনি, এখন তা ভাল করেই বুঝতে পারছি! মোহনবাবু, আপনি যখন আমাকে ভুলতে পারবেন না, তখন আর-কি আমার এখানে থাকা উচিত? বলুন, আপনিই বলুন!"

—"সরমা—"

—"মোহনবাবু, কথা রাখুন—আমাকে বাঁচান!"

—"সরমা, এর-চেয়ে তুমি আমাকে প্রাণদণ্ড দাও—সেও আমার সুখের হবে!

কিন্তু, এই প্রাণ নিয়ে আবার বিবাহ-করা—বেঁচে মরে থাকা? ওঃ, সে হয়না সরমা, সে হয় না!"

সরমা আমার দিকে দু পা এগিয়ে এসে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি তাহলে আমার কথা রাখবেন না?"

—"তোমার আর সব কথা রাখতে পারি, কিন্তু ও-কথা রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব!"

—"অসম্ভব?"

—"হ্যাঁ, অসম্ভব—অসম্ভব!"—এই বলে আমি সকাতরে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললুম,—সরমার সে কঠিন দৃষ্টির সামনে আমি আর মুখ তুলতে পারছিলুম না।

সরমা একেবারে চুপ হয়ে গেল।

এমনি ভাবে কয়মুহূর্ত্ত মৃত্যুর মত একটা দুঃসহ নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। তারপর আমি বললুম, "সরমা, আমার উপরে তুমি রাগ কোরো না। বিবাহ করতে বলছ,—কিন্তু বিবাহ করলেই আমি কি তোমাকে ভুলতে পারব? তা যখন পারব না, তখন আমার দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে মিছামিছি আর-একটা জীবনকে নষ্ট করে লাভ কি বল?"

সরমা সাড়া দিলে না।

আস্তে-আস্তে মুখ তুললুম। ঘরের ভিতরে সরমা নেই!

বাইরে আকাশে তখনো অন্ধকার, বাজ তখনো গজ্‌রাচ্ছে, বিদ্যুৎ তখনো অগ্নিবাণ হানছে, বৃষ্টি তখনো সৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে।

সরমা কোথায়? তাড়াতাড়ি আলোটা তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ব্যাকুল চোখে দেখলুম, সদর দরজাটা খোলা!

সরমা কি আমার উপর রাগ করে' আবার স্বামীর কাছে ফিরে গেল? আমার মন যেন বলে উঠল না, না, না!

তবে? তবে কি ... ...

সে কথা মনে হবা-মাত্র আমি তীরের মত উপর থেকে নেমে রাস্তায় গিয়ে পড়লুম!

পথ দিয়ে কল্‌কল্ করে' জলস্রোত ছুটে চলেছে—যতদূর দেখা যায়, কোথাও জনপ্রাণী নেই!

তাইত, কি করি—কোথা যাই, সরমা কোন্‌দিকে গেছে? এর-মধ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেল? আমার গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই কি প্রাণপণে সে ছুটে পালিয়েছে?

এ-পথের এদিকটা গেছে সোজা গঙ্গামুখে। পাগলের মত ছুটতে লাগলুম। কিন্তু অনেক ছুটেও অনেকদূর গিয়েও সরমাকে দেখতে পেলুম না! তবুও ছুটছি আর ছুট্‌ছি!

এই ত গঙ্গার ধার! কৈ, কোথায় সরমা? ঝক্‌মকে বিদ্যুতের লক্‌লকে শিখায় গঙ্গার মেঘবর্ণ জল যেন জ্বলে-জ্বলে টগ্‌বগিয়ে ফুটে উঠছে,—তরঙ্গের পর তরঙ্গ অজগরের মত ফণা তুলে পাকিয়ে-পাকিয়ে ফোঁশ্‌ফোঁশিয়ে ছুটে চলেছে—ও জলস্রোত, না মৃত্যুস্রোত?

বিদীর্ণস্বরে ডাকলুম, "সরমা! সরমা! সরমা!"

ও-পার থেকে প্রতিধ্বনি টিট্‌কিরি দিয়ে উঠল!

গঙ্গার তীর ধরে আবার উন্মত্তের মত দৌড়তে লাগলুম—কানের পাশ দিয়ে বৃষ্টিশীতল উদ্দাম ঝোড়োহাওয়া হুহু হুহু করে' ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল—গঙ্গার পিছল মাটির উপরে কতবার পড়লুম, কতবার উঠলুম—কিন্তু তবু এ ছোটার বিরাম নেই!

এই ভীষণ নিশীথ তার তিমির-পক্ষ বিস্তার করে' জল-স্থল-আকাশকে আবৃত করে' ফেলেছে—এর মধ্যে আমার সরমা আজ একেবারেই বুঝি হারিয়ে গেল! এমন যে হবে, কে তা জানত! জানলে যে তখনি বলতুম, সরমা, আমি বিয়ে করব—তুমি যেওনা, তুমি যেওনা, তুমি যেওনা!

সে কি আমাকে দেখে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে? গঙ্গার তরঙ্গ-ধ্বনি, ঝড়ের হাহাকার, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝর্ঝরানি ডুবিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "সরমা, সরমা! ফিরে এস—আমি বিবাহ করব—তুমি ফিরে এস, ফিরে এস!"

কিন্তু সে প্রলয়োৎসবের মধ্যে কোথায় সরমা? উত্তরে বজ্রনাদে আমি যেন নিয়তির ঘন-ঘন অট্টহাস্য শুনতে পেলুম! আমার সরমাকে চুরি করে' রজনীর অন্ধকার গঙ্গার বিক্ষুব্ধ বক্ষের উপর থেকে ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে, আকাশের নিবিড় মেঘ ভেদ করে' ধীরে-ধীরে প্রাতঃ-সন্ধ্যার ম্লান আলোর ক্ষীণ আভাস ফুটে উঠছে!

দূরে—নিমতলার শ্মশানে সহসা একটা নূতন চিতা জ্বলে উঠল—আলো-আঁধারের মধ্যে তার লেলিহান জিহ্বা যেন আমার বুকের রক্তে রাঙ্গা হয়ে কেঁপে কেঁপে ক্রমেই ঊর্দ্ধপানে উঠতে লাগল। সেইদিকে পাষাণ-নেত্রে চেয়ে হাঁটুভোর জলে,—সব-হারা কাঙ্গাল আমি, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম।

* * * *

হঠাৎ মনে হোল, সরমা হয়ত তার স্বামীর কাছেই ফিরে গেছে! তখনি সেই খোঁজে চললুম। যেতে-যেতে ভোর হয়ে গেল।

কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না-করে' একেবারে সুরেনের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

—সুরেন একটা ঘরে বসে ছিল; আমার সেই জলে-ভেজা ধূলোকাদামাখা চেহারা দেখে সে আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কে তুমি?"

—"আমি মোহনলাল। সরমা এখানে এসেছে?"

—"কী! তুই মোহনলাল! আবার আমার বাড়ীতে—"

—"চুপ! বেশী কথা না! বল্ সরমা কোথায়!"

—"বলব না। বেরো এখান থেকে!"

বাঘের মত তার উপরে লাফিয়ে পড়লুম! দুহাতে তার গলা টিপে ধরে বললুম, "এখন বলবি?"

—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—জানি না! সে এখানে নেই।"

—"তুই মিথ্যা বলছিস্! তুই আমার

সরমাকে খুন করেছিস্! বল্ বলছি, নইলে আমিও তোকে খুন করব!"

—"ওঃ! গেলুম—গেলুম, ছেড়ে দাও—মরে গেলুম!"

—"বল্—বল্—"

—"সত্যি জানি না! সে চলে গেছে—কাল, কাল রাত্রে!"

—"আর আসে নি? ঠিক?"

—"না, আসে নি, আসে নি! আমাকে ছাড়, আমায় খুন কোরো না!"

সে হতভাগা পশুটাকে ঘরের এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলুম। সরমা!—তুমি বেঁচে আছ কি, বেঁচে নেই? ফিরে এস প্রিয়তমে, ফিরে এস,—তোমার মুখ-চেয়ে আমি বিবাহ করব—আমি, আমি—... ... ...

* * *

খুঁজছি, খুঁজছি আর খুঁজছি,—কিন্তু সরমার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। যেমন হঠাৎ তাকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, তেমনি হঠাৎ আবার তাকে পথেই হারিয়ে ফেলেছি,—আমার সে প্রান-জুড়ানো হারামণি আজ কোথায়? আশার ছলনায় ভুলে আমি গিয়েছিলুম আলেয়ার আলো ধরতে; কিন্তু ছুঁতে-না-ছুঁতে সে আলো নিবে গেছে, নিবে গেছে গো,—মনের মাঝে জেগে আছে শুধু তার অশ্রুময়ী স্মৃতিটুকু!

লোকে বলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! সংসারের ধরা-বাঁধা ধারার ভিতরে থাকতে পারি না বলেই কি সকলে আমাকে ক্ষ্যাপা ঠাউরে নিয়েছে? মনের কান্না মনেই লুকিয়ে আমি তাদের নাচ-গান-হাসিতে যোগ দিতে পারি না বলেই কি তারা আমাকে এই অপবাদ দিয়েছে! কিন্তু আমি ত পাগল নই,—পাগল যে তারাই! এই শ্মশানের ধোঁয়া-ভরা জগতে, দুঃখ-শোকের তুষানল যেখানে দিবারাত্র জ্বলছে, সেখানে যারা নাচতে-গাইতে-হাসতে পারে, তারাই কি উন্মাদ নয়? শ্মশানে এসে নাচ, গান, হাসি! এ যে নিষ্ঠুরতা! এখানে বসে কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ,—তোমাদের অশ্রুজলে বিশ্বের তপ্ত চিতাভস্ম স্নিগ্ধ হয়ে উঠুক!... ...

ঘনঘোর বাদল-রাতে ঘরের বাইরে বাজ্ যখন আকাশ তোল্‌পাড় করে' তোলে, ঝম্‌ঝম্ বর্ষাজলে নিশীথিনী যখন আর্দ্র হয়ে ওঠে, জান্‌লায়-জান্‌লায় উতলা বাতাস যখন ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে মরে, তখন ঘুমুতে-ঘুমুতে এখনো আমি চমকে ধড়্‌মড়্ করে' উঠে বসি! তখন মনে হয় সত্যই আমি পাগল হয়ে গেছি!

কোন-কোনদিন আমি শুনতে পাই, সরমাদের পোড়ো-বাড়ীর সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে কে-যেন ক্রমাগত কড়া নাড়ছে নাড়ছে নাড়ছে, কে-যেন দূর—বহুদূরের অজ্ঞাত লোক থেকে শ্রান্তপ্রাণে ক্লান্তচরণে ফিরে এসেছে, কে-যেন আর্ত্ত কাতর স্বরে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বারংবার ডাকছে—'দরজা খোলো, দরজা খোলো, দরজা খোলো গো!'

কোনদিন নিজের ঘরে বসেই দেখতে পাই, সরমার খালিঘরের দরজা-জানলা-গুলো দুম্‌দুম্ করে' খুলে গেল, কে-যেন একরাশ এলানো ভিজে চুল দুলিয়ে,

শোণিতাক্ত দেহে, রক্তরাঙ্গা কাপড়ে ভিতরে ঢুকে মেঝের উপরে দড়াম করে' আছড়ে পড়ল—তারপর সেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র-নাদের মধ্যে অন্ধকারকে স্তম্ভিত করে' ডুক্‌রে ডুক্‌রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বুকফাটা কান্না কাঁদতে লাগল!

উঃ! সে কান্না অ-হু! ছুটে গিয়ে আমি ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে' দিতে যেতুম—অমনি বিদ্যুতের তীক্ষ্ণধারে মেঘভরা আকাশ দুফাঁক হয়ে যেত—আর সেই ফাঁকে পরলোক থেকে ইহলোকে দু-হাত বাড়িয়ে মুরারিবাবু যেন বজ্রনাদে বলে উঠতেন,—'ওরে আমার মেয়ে দে, আমার মেয়ে দে—তোর ভয়েই সে পালিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে—ওরে দে রে, দে রে, আমার মেয়েকে এনে দে!'... ...

এ কী জীবন! সরমা, তোমাকে হারিয়ে আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি, এখন নিজের বুদ্ধিও হারাব নাকি?

* * * *

অনেকে আমাকে উপদেশ দিতে আসে—হায়রে কপাল! কেউ বলেন, বিয়ে কর, কেউ বলেন, বিদেশ ঘুরে এস, কেউ-বা বলেন, কাজ-কর্ম্মে মন দাও!

উপদেশ দেয় না খালি হরেন! সরমার কথা উঠলে সে আমার দিকে মৌনমুখে করুণ চোখে চেয়ে থাকে—সে যে আমার মরমের মরমী! আমি আপন মনে সরমার শত কথা বলে যাই, সে আমাকে বাধা দেয় না, বিরক্ত হয়ে উঠেও যায় না। বলতে-বলতে কোন-দিন আমি কেঁদে ফেলি, আর তারও চোখদুটি দরদে ভিজে ওঠে!

তার বুকে মুখ রেখে আমি ডাকি,—"বন্ধু!"

আমাকে দু-হাতে গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে সেও সজল চোখে বলে, "বন্ধু!"

—"আমার সরমা কোথা গেল ভাই?"

—"যেখানে শোক-তাপ নেই। ইহলোকে যাকে হারিয়েছ ভাই, পরলোকে হয়ত তাকে খুঁজে পাবে!"

... ...সেই পরলোকের আশায় দিনের পর দিন গুনছি। কতদিন—আর কতদিন?

শেষ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

যুগান্ত কাব্য নাট্য

কাব্যের দেবদেবীগণ।

শিব, শিবানী, নন্দী, ভৃঙ্গি, ইন্দ্র, যম, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ন্যায়, প্রেম ও তৎপত্নী শান্তি ও করুণা।

প্রথম দৃশ্য

কৈলাসধাম

তুষারাবৃত সমুচ্চ পর্ব্বত-দৃশ্যের নিম্নে মাঝে মাঝে ঝরণ প্রবাহিত। উপত্যকা-ভূমিতলে তরুলতার মধ্যে শিবমন্দির। ঈষদ্ধুমুক্ত তরু-দ্বারপথে ব্যাঘ্রাজিনধারী

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ধ্যানস্থ মহাদেবের মূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দর্শকদিগের নেত্রে পড়িতেছে। দ্বারদেশে এক পার্শ্বে বৃষ—অন্য পার্শ্বে সিংহমূর্ত্তি। সম্মুখের বিস্তৃত মঞ্চে ত্রিশূলধারী নন্দী ও ভৃঙ্গি কখনো স্থিরভাবে—কখনো পদচারণা পূর্ব্বক, স্তবগান গাহিতেছে। ভৃঙ্গি মাঝে মাঝে নীরবে অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছে।

গান

জয় হর শঙ্কর প্রভু পশুপতি,
জয় তারা শঙ্করা প্রকৃতি পার্ব্বতী,
লয়ঙ্কর মহাশিব, শিবাণী রক্ষেন দিব
মহেশ্বর মহামায়া—কারণ শকতি!
মহারুদ্র, বরাভয়া, দোঁহে এক সর্ব্বজয়া
অগম্য বুদ্ধি বিজ্ঞানে, ভক্ত-নেত্রে জ্যোতি।
ছত্র ধরে মহা ব্যোম নমে ইন্দ্র বায়ু যম,—
কালাকাল ছন্দে করে প্রণতি আরতি!
নমো তারা শঙ্করা রুদ্র পশুপতি।

শিবানীর প্রবেশ

নন্দী ভৃঙ্গি। নমস্তে ভবানী মাতা;
শি। শুন বৎসগণ,
নন্দী। বলিতে হউক আজ্ঞা;
ভৃঙ্গি। আনিব কি ধরি—
ধরা হতে বৃকাসুর কোন? বল মাতা!
থাকিত বাঁচিয়া যদি মহিষ দানাটা
কি হইত মজাখানা! আনিতাম ধরি
শিং ধরি হড় হড়ি, আর একবার
করিতে দলন তারে, মহিষমর্দ্দিনি।
শি। থাম বৎস, সে কথার এ নহে সময়।
নন্দি। থাম্ ভৃঙ্গি—
ভৃ। থাম্ তুই রাখ্ দাদাগিরি!
কেমনে ভুলি মা বল সুখের সেদিন!
দাও আজ্ঞা—
নন্দী। চুপ চুপ বচনবাগীশ।
ভৃঙ্গি। ঈষ্ ঈষ্ চুপ রব তোমার কথায়!
তুমি আজ নন্দী থাক, জাননা কে আমি!
মায়ের আদুরে ছেলে ধিঙ্গি ভৃঙ্গিবর!
নন্দী। বক' মা একটু, করে বড় বাড়াবাড়ি
ভৃ। মার প্রতি আজ্ঞাজারি! দেখ স্পর্দ্ধাখানা
কর্ত্তাদাদা হন্ যেন উনি আমাদের!
শি। স্থির হও বৎসগণ কোরোনা বিবাদ।
ভৃ। ওই ত ঝগড়া করে—কেন কথা কয়!
যা বলি তা বলি আমি, বলেছি মায়েরে,
ওর কি তাহাতে, কেন মিছে গালি পাড়ে!
বল মাগো দাও আজ্ঞা, লুটি ধরা বন;
যদি ভাগ্যে মিলে যায় তেমনি ভীষণ—
লম্বিত শৃঙ্গিত গুম্ফ মহিষ একটা!—
উঃ উঃ—হো হো—হা হা—!
ন। দেখ মা জননি,
ভৃঙ্গি তব হইয়াছে বড়ই বেয়াড়া!
একটু শাসন যদি না কর উহারে
চড়িবে মাথায় কিন্তু দুই দিন পরে,
এই আমি বলে ক্ষান্ত—;
শি। (সহাস্যে) দুর্দ্দান্ত ছেলেটী
একটু সংযত হও, শুন যাহা বলি;
ভৃ। হইনু নির্ব্বাক্ আমি,—আজি হতে মূক!
তোর বাক্যে নহে, ইহা মাতার আদেশ।
ন। ফের যদি কথা ক'স, আমি কিন্তু তবে—
ভৃ। কিন্তুটা কি শুনি দাদা! দেখ মাগো শুন
নন্দীটারে যদি তুমি সাজা নাহি দাও—
আমি কিন্তু অশ্রুজলে ভাসাব নয়ন।
শি। তুমি ত সুবোধ নন্দি, ছোট ভাইটিরে
কহিও না রূঢ় কথা। মিষ্ট ব্যবহারে—
শিষ্ট করি লও ওরে। কাঁদিও না বাছা
মন দিয়া দুইজনে, শোন যাহা বলি।
ন। (স্বগত) সুশান্ত ছেলেটি কিনা মোয়ামণ্ডা দিয়া

ভুলায়ে রাখিব! দোষ নন্দীটারই যত।
(প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা।
ভৃ। (নন্দীর কাণের কাছে) কেমন জব্দ!
শি। চলেছি ধরায়,—
তোমরা দুজনে দেখো দেব মহেশ্বরে;
ধ্যান ভাঙ্গায়োনা যেন কলহ বিবাদে!
নন্দী। নহেত শরৎ মাগো, প্রতিমা রচিয়া
ডাকেনা ত নরনারী তোমারে সাদরে—
অধিষ্ঠিত হতে তাহে, এ যে অসময়!
জানিনা ত কি কারণে যাবে সেথা এবে!
সঙ্গে তবে লও দাস অনুচরগণে।
ভৃ। একটু খেলিব রঙ্গে, লও মাগো সাথে।
পরম দাম্ভিক হের ঐ মানীজন
চলেনা চরণ গর্ব্বে—ধরা দেখে সরা!
পিছে হতে আচম্বিতে পদতলে ওর—
ঢালি দিব ঘটিভরা গোময় সলিল;
পড়িবে ধপাস করি—পিচ্ছল মাটীতে!
হা হা কি কৌতুক সুখ! ভাব নন্দীভায়া!
শি। না বৎস—
ভৃ। লও মা সাথে দুটি পায়ে পড়ি;
বরঞ্চ ফিরায়ে দিও দুই দণ্ড পরে।
ঐ যে প্রতাপশালী নৌকার আরোহী—
কাড়িয়া অন্যের ধন ছলে অত্যাচারে
ভরাখানা ভরি লয়ে স্বার্থের বোঝায়—
নিস্তরঙ্গ নদী-বুকে সুখে বেয়ে যায়—
দেখো মাগো চাও—
শি। দৃষ্টি সব-দিকে তোর!
ভৃ। ভয় নাই ডর নাই, নাহি অনুতাপ
মনে জানে বিনা বিঘ্নে হয়ে যাবে পার—
মহান প্রতাপী—
ন। (উঁকি মারিয়া) ঠিক বলিছে ত ভৃঙ্গি।
ভৃ। একবার দাঁড়াইয়া হালের উপর—
দোলাব তরণী তার ভীষণ দোলায়!
ন। বাজাব ডমরু আমি ঘোর বজ্র রবে।
ভৃ। বেশ ভাই বেশ কথা! তখন দেখিব—
কোথা থাকে প্রতাপীর দুর্দ্দম্য প্রতাপ!
রক্ত মুখ পাংশু হয়ে যায় কি না যায়!
ন। একবার মা মা বলি ডাকে কি না ডাকে!
ভৃ। হা হা হো হোঃ; দাও আজ্ঞা চলি
মাগো সাথে।
শি। খেলার এ কাল নয় ধ্যানমগ্ন দেব—
সে কথা ভুলো না। আমি মর্ত্ত্যে চলিলাম,
স্মরিছেন্ লক্ষ্মীবাণী আমারে কাতরে।
একা রহিলেন হেথা দেব ভোলানাথ
দেখিও দুজনে, আমি ফিরিব সত্বর।
ন। যথাদেশ, নমি মাতা, প্রাণ কিন্তু কাঁদে!
শি। আশীর্ব্বাদ, ভায়ে ভায়ে রহ সদ্ভাবে।
(প্রস্থান)
ভৃ। নন্দি-দাদা! হি হি! হা হা!
ন। ভাইটি আমার।
ভৃ। কোলাকুলি করি এস দাদা—
ন। এস ভাই।
ভৃ। স্ফূর্ত্তি একি মনে জাগে! তরল সুন্দর
মেঘরাশি যেন ঐ, জমি পদতলে
ঠেলিছে আমারে, নাহি থামিতে শকতি।
হাসিরাশি ঝর ঝর উথলে কৌতুকে।
থেকোনা গম্ভীর হয়ে এ সময় তুমি—
দুটি পায়ে ধরি দাদা!
ন। হাসিব কেমনে!
তুষার জমাট ঐ গিরিখানা যেন—
চাপায়ে মাথার পরে, মা গেলেন চলি।
ভৃ। খোকা তুমি দুগ্ধপোষ্য! একটি মুহূর্ত্ত
মা ছাড়া থাকিতে নার! বড় রাগ ধরে!
হাস দাদা হাস ভাই, এস দোঁহে নাচি!

ন। চলে না চরণ ভৃঙ্গি, হাসি নাহি আসে ;
হৃদয় উদাস শূন্য এ বসন্তে নব,—
শারদ আকাশ সম মন করে হুহু !
ভৃ। বনে না ত তাই ! কিন্তু অহং সোহং
খোলা যদি পাই ভায়া মুহূর্ত্তেরো তরে।
এক টানে টানি শুষি মুক্ত বায়ুরাশি
উধাও হইয়া উড়ি ঝড়ের দোলায়।
ন। আমার কে জানি আজি মনে পড়ে শুধু
দক্ষযজ্ঞ কথা সেই, প্রলয় বিপ্লব—
জননীর দেহত্যাগ—
ভৃ। নৃত্য মহেশের ?—
ওঃ কি সে মহোচ্ছাস উদ্দাম উল্লাস !
পুনঃ কোন লয়-যজ্ঞ আছে কি ধরায় ?
তাই কি গেলেন মাতা বিনা নিমন্ত্রণে ?
বল দাদা জান যদি, কোর না গোপন
এ হেন সংবাদ শুভ। কুসুম-পরাগে
আর হলুদ চন্দনে, কালো মুখখানা
তব রাঙ্গাইয়া তুলি।
ন। কি মিথ্যা বকিস !
ভৃ। সত্যি কথা বলি তবে, খুলে গেছে মন—
চাপিয়া রাখিতে নারি, দেখ নন্দী ভাই—
পিতার উপর বড় বেশী রকমের
প্রভুত্ব করেন যেন মাতা আজ কাল !
সদা তাঁরে রাখি বন্দী অঞ্চলের ছায়ে
জড় ভোলা করি তুলি, সমস্ত ক্ষমতা
নিয়েছেন নিজ করে ! ভাল নাহি লাগে !
ন। করিস মায়ের নিন্দা, এত বড় মুখ !
ভৃ। এ কি নিন্দা ! মিথ্যাবাদী ! আমি শুধু বলি
পিতা হতে মাতা বড় এ কেমনতর !
ন। বড় ছোট নাহি জানি—মায়ের মিলনে
পিতা শিবরূপ, রুদ্র সতী বিনা তিনি।
ভৃ। আমি ত তাহাই চাই, হাসি রঙ্গ খেলা
একটু নাহিক পেলে বাঁচিব কেমনে !
ন। তুমি চাও সুখী হতে বিশ্বের অসুখে
হতভাগ্য প্রেতাধম !
ভৃ। ফের গালাগালি !
এক টানে দন্তপাটি ফেলিব উপাড়ি—
তখন হইবে শিক্ষা,—
ন। বড় দম্ভ দেখি।
ভৃ। তোর না আমার ! দাঁড়া—করি চুরমার—
ন। বটে বটে আয়—দেখি বীরত্ব কেমন !
(উভয়ের মারামারি)
ভৃ। (নন্দীর নিকট হইতে পলাইয়া)
মাগো দেখ প্রাণ যায় ছেলের তোমার।
(নেপথ্যে ঠুংঠুং ঘণ্টার শব্দ)
(ভৃঙ্গি চমকিয়া)
মা এলেন বুঝি ! মোরে ক্ষমা কর দাদা ;
বলিও না কিছু তাঁরে রব চির দাস।
ন। (হাসিয়া) নিজ ঘরে আসিবেন
মাতা বুঝি ভূত-
ঘণ্টা বাজাইয়া ?
ভৃ। দেখ কে এসেছে তবে ;
একটু আরামে আমি পা ছড়ায়ে বসি।
(আঃ)
(পুনরায় ঘণ্টার শব্দ ও গান)
জয় জয় শম্ভো,—মহাদেব মহাদেব
ভোলা ভূতপতি পরম শরণ—
জয় জয় শম্ভো।
(গমনপরায়ণ নন্দী পশ্চাৎমুখ হইবামাত্র)
ভৃ। ন ভূত ভবিষ্য ওটা, অসৃষ্টি স্রষ্টার !
মহাদেব। নন্দীভৃঙ্গি—!
ন। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া)
ধ্যান ভঙ্গ হোল মহেশের !
হায় হায় ! মা আসিলে কি বলিব তাঁরে ?

ভৃ। (সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া)
তোর দোষে ঘটিল এইটি !
ম। নন্দী ভৃঙ্গি !
নন্দীভৃঙ্গি। ভগবন্ !
(উভয়ের নিকটে আগমন)
ম। শুনিছ না ঘণ্টার নিনাদ ?
ভৃ। আজ্ঞে, আসি নাই কাছে, ধ্যানভঙ্গ ভয়ে।
ম। কলহের বিরাম ত ঘটে নাই তাহে।
দুষ্টামিতে ভরা সব অলসের সেরা !
ভৃ। (নন্দীর কানে) যথা পিতা তথা পুত্র—
নন্দী। চুপ দুঃসাহসী।
শিব। যত দোষ ভবানীর, তাঁহার আদরে,
এক মুখে শত জিহ্বা। যা দুষ্ট ভূতেরা
নিয়ে আয় আহ্বানি দেবেরে !
নন্দী। যথাদেশ।
(প্রস্থান)
নেপথ্যে গান
জয় জয় শম্ভো, মহাদেব মহাদেব—
ভোলা ভূতপতি পরম শরণ—
জয় জয় শম্ভো।
পরাগতি, প্রলয়বান, ত্রিনয়ান,—
মহাকাল, অগ্নিভাল—
তুমি হর শঙ্কট সংহর—
জয় জয় শম্ভো !

দ্বিতীয় দৃশ্য

; শিবমন্দির সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইয়া গেল। রঙ্গমঞ্চ সুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। ন্যায়রাজের সহিত নন্দী ভৃঙ্গি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে মহাদেবের স্থান দেখাইয়া দিল। ন্যায়রাজ মহাদেবের নিকটে গমন করিলেন। ভৃঙ্গি তরুলতা মধ্যে থাকিয়া মাঝে মাঝে অঙ্গভঙ্গি সহকারে উঁকি মারিয়া দর্শকদিগের কৌতুক উদ্রিক্ত করিতে লাগিল। নন্দী স্তব্ধভাবে প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় তরুগাত্রে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়। (মহাদেবের নিকটে আসিয়া)
জয় জয় মহেশ্বর প্রণতি চরণে।
ম। শুভমস্তু মর্ত্ত্যেশ্বর, অধিষ্ঠ অজিনে—
ধর্ম্মরাজ-প্রতিনিধি ! কিন্তু কোথা তব
সূর্য্যোজ্জ্বল রাজদণ্ড, মহিম-মুকুট !
ব্রহ্মার সে মহাদান ?
ন্যা। নাই—কিছু নাই।
পরাজিত পরাহত পীড়িত লাঞ্ছিত
দেবারি দানব করে 'ন্যায়' তোমাদের !
ম। কি বিপদ ওহো ! তবু ন্যায়রাজ ইথে
হয়োনা অধীর তুমি। তুচ্ছ মেঘজালে,
জ্যোতির্ম্মালী হল বন্দী, দীপ্ত মহিমায়
পুনঃ প্রকাশের তরে ;—মনে রেখো ইহা।
এ শুধু কলির খেলা, দুদণ্ডের জয়।
ন্যা। ক্ষণ শুধু তুচ্ছ ক্ষণ—ওহে মহাকাল
অসীমেরি মাঝখানে। দু দণ্ডের ঝড়ে
ওলট-পালট বিশ্ব ; মৃত্যু সেত দেব
ক্ষণিকেরি ক্ষমতা মহান্। 'ন্যায়' আজ
জরজর মরমর অন্যায় আঘাতে ;
শাসনিতে ধরা-রাজ্য একান্ত অক্ষম ;—
যথা প্রজাপতি তারে করিলা স্থাপন।
ম। ধরা যাক রসাতলে—ন্যায়রাজ তবে,
স্বর্গে চলে এস তুমি স্বর্গের দেবতা।
ন্যা। ত্রিদিব প্রবেশে নাহি অধিকার মোর
অন্যায়ের দাস এবে পুণ্য-শক্তিহীন।
ম। এ বড় অন্যায় নীতি ত্রিদিব-রাজের !
যাও তবে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা-সখা তুমি,
অধিষ্ঠিত ধরাতলে যাঁহার কর্ত্তৃক।
ন্যা। আসিতেছি তথা হতে ;

ম। কি বলেন তিনি ?

ন্যা। স্রষ্টা তিনি বিনাশের সাধ্য নাহি তাঁর।
যদি দয়া করি —

(প্রেমরাজকে সঙ্গে লইয়া নন্দী ভৃঙ্গির দ্বারে আগমন এবং পূর্ব্বের ন্যায় অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁহাকে মহাদেবের নিকটস্থ হইতে বলিয়া তরুলতার মধ্যে দণ্ডায়মান)

প্রেম। (মহাদেবের নিকটে আসিয়া)
নমস্কার মহাপ্রভো !

ম। এস এস বিষ্ণুসখা, ত্রিদিব-দুর্ল্লভ,
ধরার আনন্দ ওহে ! পুলকিত প্রাণ—
তব দরশন লাভে ;—শত বসন্তের
প্রফুল্ল হিল্লোল তুমি ! কিন্তু কেন হায়—
পরিমলহীন আজি ! কোথা ফুল্ল ধ্বজা—
পুষ্পিত কুসুম তব গন্ধ ভরপূর !
আনন্দ-মূরতি কেন মলিন এমন ?

প্রে। কিছু নাই ! সর্ব্বস্বান্ত ; নিপীড়িত প্রেম
কলিরাজ সেনাপতি অপ্রেমের করে।

ম। এমনি প্রভাববান্ হইয়াছে কলি !
এ শুধু মৃত্যুর আগে ক্ষণিক চমক !
যাও সখে বিষ্ণুলোকে জানাও বিপদ !

প্রে। আসিতেছি তথা হতে,

ম। কি বলেন তিনি ?

প্রে। স্থিতিপতি তিনি নাহি বিনাশ-ক্ষমতা !

ম। যাও তবে ইন্দ্রলোকে। মর্ত্ত্যে যবে তব
হেন অনাদর প্রেম, থেকোনা তথায়।
নন্দন নন্দিত করি—বিরাজ ত্রিদিবে।

প্রে। নিরানন্দ মূর্ত্তিমান, প্রেমানন্দ আজি ;
অভাগা-জনার এই চরণ-পরশে
ত্রিদিবের মুক্তদ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে,—
কেমনে পশিব তথা !

ম। বড় অবিচার !
স্বর্গের প্রসাদ তুমি করুণা-জীবন !

প্রেম। বন্দিনী করুণা মোর অপ্রেমের গৃহে ;
রাজ্যহীন রাণীহীন আমি অভাজন ?

ন্যা। অশান্তি-নিলয়ে দাসী শান্তিও আমার,—
কৃপা কর বিত্তি-ভঞ্জন ?

ম। নন্দী ভৃঙ্গি !

(উভয়ের প্রবেশ)

যথায় করুণা শান্তি আছেন বন্দিনী
যাও তথা,—সুকৌশলে বন্ধন খুলিয়া
আন তাঁহাদের হেথা।

উভয়ে। যথাদেশ প্রভো।

(প্রণামপূর্ব্বক গমন।)

ম। (কণ্ঠবিলম্বিত শিঙ্গায় হাত দিয়া)
বাজাই প্রলয় শিঙ্গা ; যাক্ থেমে যাক্
বিশ্বের এ হাহাকার—প্রাণান্ত সংগ্রাম।
কিন্তু কেন স্তব্ধ হেন ব্রহ্মা নারায়ণ,
আছে কি কারণ কোন ? পূর্ণ নহে কাল।
কোথা দেবি ভগবতি তুমি ?

ন্যা। মর্ত্ত্যে তিনি।

প্রে। এসেছি কৈলাসধামে তাঁহার আদেশে।

ম। ভক্তগুলা যত তাঁর কাণ্ডজ্ঞান-হীন,
শক্ত শিক্ষা দিতে হবে ! যখন তখন
মা মা করি ডাকে ; শূন্য আমার ভবন।

(নন্দী ভৃঙ্গির প্রবেশ ও নমস্কারপূর্ব্বক)

ন। দেবাদেশে আনিয়াছি—

ভৃ। আমি মুক্ত করি
দেবী দুই জনে—

ম। কোথা তাঁরা নিয়ে আয় ;
দ্বারে রেখেছিল বুঝি দাঁড় করাইয়া ?
বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে হয়েছে নিঃশেষ !

(উভয়ের গমন)

ন্যা। আসিছেন দেবীগণ, আজ্ঞা হোক প্রভো
একটু আড়ালে থাকি—

প্রে। দেখিলে মোদের
ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন তাঁরা—

ম। তথা অস্তু !

(দুজনের উঠিয়া তরুলতা পার্শ্বে দণ্ডায়মান ও নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক)

ন্যা। একি ! শান্তি ! একি তুমি ! হায় ভগবন্
কেন না করিলে মোরে দৃষ্টিহীন আগে—!
নাহি রাজদণ্ড হায় ! বাহু শক্তিহীন
কেমনে লইব শোধ দিব প্রতিফল !
এস বজ্র ভীমবল হও আবির্ভাব—
তোমার জ্বলন্ত তেজে কর বলীয়ান—
ভস্মীভূত করে দিই পাপাত্মা দানবে।

প্রে। হা করুণারাণি—হেরি একি দশা তব!
ভেদী মর্ম্মস্থল হায় সমুদ্র আকারে
অশ্রু উথলিয়া ওঠে—কেমনে সম্বরি !

(শান্তি ও করুণার প্রবেশ)

উভয়ে। নমস্কার দেবদেব পরমশরণ।

ম। এস কন্যা এস শান্তি এস মা করুণা—
ধরা কর সুশাসন ধরার ঈশ্বরী
করি আশীর্ব্বাদ। সুধা-ঝারি নাহি হাতে
কেন শান্তি-রাণি তব ?

শান্তি। অশান্তি-দানবী
কলিরাজ-অনুচরী, সুধা-ভাণ্ড হরি
সমুদ্রে করেছে ক্ষেপ—হস্তহীনা আমি।

ম। মা করুণা রাণী—তুমি, কেন সে সময়
দগ্ধ না করিলে তব নয়নের তেজে
নিষ্ঠুর দানব-সৈন্যগণে ?

করু। দেবদেব,
উৎপাটিত চক্ষু মোর, আমি দৃষ্টিহীনা।

ম। অসহ্য অসহ্য ওহো ! যুগান্তের কাল
উপস্থিত সুনিশ্চয়।

(লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত ভগবতীর প্রবেশ)

ম। দেবি ভগবতি ?
কেমনে রয়েছ স্থির এত অত্যাচারে ?
কে উহারা দীনা নারী ?

পা। লক্ষ্মী-বাণী তব।

ম। ইন্দিরা ভারতী মোর এমন শ্রীহীনা !
কোথা লক্ষ্মীদেবী তব মোহন কুন্তল ?
কে দুরাত্মা স্পর্দ্ধা করি করেছে হরণ ?
রতন-মুকুট কোথা—মণি-আভরণ ?
শোভাময় স্বর্ণভাণ্ড ধনধান্য ভরা ?

ল। নাহি মোর নাহি কিছু। শ্রীসম্পদ সবি
সঁপিয়া দিয়াছি দেব—অন্যায়ের করে।
শোভাহীনা লক্ষ্মীহীনা আজি লক্ষ্মী তব।

ম। মাতা-বাণী, জ্ঞানবাণী উচ্চারিয়া দেবি
অজ্ঞানের কর্ণে, কেন না রক্ষিলে তুমি
ভগিনী লক্ষ্মীরে ! একি বীণা কোথা তব ?
পদ্মাসন কোথা ?

ক। নহি দেবী পিতঃ আর,
শক্তিহীনা বাণীহীনা সামান্যা রমণী !
মোর শুদ্ধ জ্ঞানবাণী শিখিয়া লইয়া
দুর্বাণী রচিয়া তাহে ভরি ঈর্ষানল—
আমারি উপর তারা করেছে পরীক্ষা—
হের অস্ত্রাঘাত !

(বক্ষঃ প্রদর্শন)

ম। থাম কন্যা আর নহে।
কোথা নন্দী ভৃঙ্গি—কোথা ভূত-প্রেতগণ ?
বাজায়ে প্রলয়-শিঙ্গা ঘোর বজ্ররবে
সংহার-মূরতি ধরি—হও অগ্রসর।
শিব আজি মহারুদ্র যুগান্ত তাণ্ডবে।

(মহাদেব তাণ্ডব-মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইবামাত্র দেব-

দেবীগণের অন্তর্ধান এবং ভূত-প্রেতগণের শিবকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে গান।)

চলরে চল সবে, হর হর শিব বম।
পেয়েছি আজ্ঞা—করি অবজ্ঞা ইন্দ্র বরুণ যম।
আয় দানব যক্ষ—ডাকিনী রক্ষ—
আজিকে মহোল্লাস!
লম্ফে ঝম্ফে, মহান দম্ভে—
বিশ্বে লাগাব ত্রাস!
মোরা পেয়েছি আজ্ঞা—না মানি প্রজ্ঞা,
না জানি শম দম,
আজি প্রলয় কাণ্ডে—নাশি ব্রহ্মাণ্ডে
খসাব সূর্য্য সোম!
চল্‌রে চল্ চল্—বলরে বল্ বল্
হর হর শিব বম—!

পটক্ষেপ।

তৃতীয় দৃশ্য

সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র পরিবৃত সুবিস্তৃত ব্যোমে তিনখানি আলোক-সিংহাসন ভাসমান। পার্শ্বের দুইখানি আসন শূন্য, মধ্যাসনে ব্রহ্মা আসীন; নিকটে ক্ষুদ্র দুই দীপাসনে যম ও ইন্দ্র উপবিষ্ট।

ইন্দ্র। (করযোড়ে)
মহেশে করুন্ ক্ষান্ত দেব ভগবন্!
মহাত্মা পুণ্যাত্মা কেহ না আসে ত্রিদিবে,—
ইন্দ্রত্ব করিব আমি কারে লয়ে আর!
শূন্য মোর ধাম—
যম। পূর্ণ যমের ভবন।
অকাল-মরণ যদি পৃথিবী-বাসীর
না কর বারণ ত্বরা, হইবে প্রমাদ।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

সকলে (উত্থানপূর্ব্বক)
নমো দেব নারায়ণ স্থিতির কারণ।
বিষ্ণু। নমস্তে ব্রহ্মন্ সখে, নমো ইন্দ্র যম।
(বিষ্ণুকে হস্তধারণে পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া)
ব্রহ্মা। আসন গ্রহণ কর যম ইন্দ্ররাজ!
বিষ্ণু। কেন স্মরিয়াছ সখে?
ব্র। এ দুর্দ্দিনে হরি—
যদি না স্মরিব তোমা কারে আর স্মরি?
বিশ্ব ত্রস্ত বিকম্পিত সৃষ্টি হয় লোপ;
তুমি বিনা হরবন্ধু কে বারে তাঁহারে?
বি। ব্রহ্মার অসাধ্য কার্য্য সাধিব কেমনে
আমি স্থিতিপতি বিষ্ণু? আমার পরশে
স্থিতিশীল হয় পাছে মহেশের গতি
এ আশঙ্কা জাগে।
ইন্দ্র। যাক্ তবে স্বর্গ মর্ত্ত্য
রসাতলে যাক্, দেখ নীরবে বসিয়া।
যম। প্রেতভূমি হোক বিশ্ব—আমি ধর্ম্মরাজ
নিজালয়ে হই বন্দী। হেন রাজ্যপদে
নাহি প্রয়োজন মোর। লও যমদণ্ড,
মুক্তি দাও ব্রহ্মা বিষ্ণু—করি অনুনয়।
ব্র। স্থির হও ইন্দ্র যম।
বি। হয়োনা নিরাশ।
শক্তিরে স্মরণ করি—এস সবে মিলি,
অবশ্য উদ্ধার পাব তাঁহার সহায়ে।
ব্র। এমন সহজ সত্য ছিলাম ভুলিয়া!
ধন্য তুমি! আপনারে মহাধন্য মানি—
সখারূপে হৃষিকেশ, লভিয়া তোমারে।
ইন্দ্র যম। সার্থক্ তোমার দেব দীনবন্ধু-নাম।

(সকলের স্তব)

ৎজগ-জননী ভবানী
শুনাও অভয়-সুবাণী
দুর্নীতি-ভারে অতি ভুবন কম্পমান!
সুরনরকিন্নরে, কাতরে তোমারে স্মরে
অকূলে তরী দান করি—
করগো পরিত্রাণ।

(ভবানীর প্রবেশ)

সকলে। (উঠিয়া)
নমস্তে বিশ্ববন্দিতে;
ভ। জয়স্তু—সুঅস্তি।
ব্র। প্রসন্ন হইয়া কর আসন গ্রহণ।
ভ। প্রসন্ন হউন সবে;—
সকলে। যথাদেশ দেবি।

(সকলের উপবেশন)

ব্র। বিশ্ব গায় ত্রাহি ত্রাহি শরণ-সঙ্গীত,
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ বিপত্তারিণি?
ভ। তুমি ব্রহ্মা সৃজনেশ, তুমি স্থিতিপতি
ত্রিলোক-ঈশ্বর দোঁহে, তোমরা থাকিতে
আমি কি করিব দেব, সামান্যা শকতি।
বি। বিনয়ের নহে কাল দেবি শক্তিরূপা।
ব্র। সৃজন পালন কভু হোত কি সম্ভব
আদ্যাশক্তি তুমি যদি না থাকিতে মূলে?
ই। অগতির গতি তুমি,—
য। কৃপা কর দেবি।
ব্র। শান্ত কর হরে। যদি কিছুক্ষণ আর
চলে হেন নৃত্য তাঁর, সৃষ্টি হবে নাশ।
ভ। ক্ষতি কিবা? দূর হোক আলস্য তোমার,
ঘুচুক জড়তা। কোন্ আদিযুগে সেই
সৃষ্টি করি একবার—রয়েছ বসিয়া
চেষ্টাহীন নির্ব্বিকার, সেত নহে ভাল;
স্ফূর্ত্তি আনন্দের কাল ইহা ত তোমার!
বি। ব্যঙ্গরূপা মূর্ত্তি দেখি মনে পাই ভয়!
ভ। এ বিশ্বজগৎ লয়ে একা তোমরাই
হাসিবে করিবে রঙ্গ? অন্যের তাহাতে
অধিকার নাই কোন? বেশ তাই হোক।
লয় শ্রান্ত শিব যবে নৃত্য-অবসানে
হইবেন ধ্যানমগ্ন,—লীলাচ্ছলে পুন
প্রলয়-পয়োধি-জলে, ব্রহ্মার সৃজিত
পদ্মদলোপরি বিষ্ণু—হয়ো ভাসমান্।
অপেক্ষা করিতে কিন্তু হবে ক্ষণকাল!
ব্র। একবার লয়কাণ্ড হয়ে গেলে শেষ,
ধ্বংসের গঠিতে পুন ব্রহ্মাও অক্ষম।
নিজের নিয়ম-পাশে নীতি-শৃঙ্খলায়
জড়িত পীড়িত হেন নিজে সৃষ্টিধর।
ভ। শক্তিরও নাহিক শক্তি, হে সৃজনপতি,
ফিরাইতে কালগতি, কহিনু নিশ্চয়।
যে মুহূর্ত্তে খর্ব্ব হবে কলির প্রভাব,
উচ্চ হতে নিম্নে হবে পাপের পতন,
দেবের চরণ-স্পর্শে হব অধিকারী,
থামাব তাঁহার নৃত্য রাখিব সংসার।
ব্র। কিছু না রহিবে আর রক্ষিতে তখন!
ভ। বেশত সে মন্দ কিবা! নূতন প্রথায়
গড়িবে ভুবন নব। দেখো প্রজাপতি
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ভেদ যেন রেখোনা এবার;
নিন্দেনা তোমারে যেন ধরাবাসী আর।
পুরাতন কালগর্ভে হউক বিলীন।
বি। ইচ্ছা তব পূর্ণ হোক্—হের গো পাষাণি
বিশ্বের প্রলয়রূপ কিবা মনোহর।
ভ। একি দৃশ্য! খসি পড়ে চন্দ্র সূর্য্য তারা
রোহিণী ভরণী মঘা রাশিগণ যত,
কক্ষচ্যুত ঘূর্ণ্যমান সপ্তর্ষি দেবর্ষি,
মহাকাশ মহাশূন্য ঘোর অন্ধকার!
আমারেও কি মায়া এ দেখাও রমেশ?
বি। চাও নিম্নে ধরাতলে, কি দেখিছ দেবি?
ভ। অসীম সমুদ্র গর্জ্জে ভীষণ নিনাদে।
কোথা স্থল-গিরি-নদী-তরু-লতাবন?
জীবজন্তু-নরনারী? কি করিছ দেব?
ভক্ত যে উহারা মোর প্রাণের সন্তান—
মা মা করি ডাকি সবে পড়িয়া ঘুরিয়া
তলাইয়া যায় নীচে! সহিব না ইহা!

ধরিয়া তোমার হাত ভীমামূর্ত্তি ধরি—
রক্ষিব সন্তান মম,—বিষ্ণু সাবধান!

বি। কি করিব আমি দেবি—তোমারি ইচ্ছায়
প্রলয়-পয়োধি-জলে মগ্ন চরাচর!
শূন্য মহাকালে তুমি শক্তি শূন্যরূপা
বিরাজিছ—একা শুধু; হের গো কালিকা।

ভ। আমার ভারতী লক্ষ্মী, গণেশ কার্ত্তিক
ডুবে যে মহান্ শূন্যে—আর না আর না—
সংহর প্রলয়-মূর্ত্তি—সম্বর সম্বর।

বি। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবেই ভবানি
এ প্রলয় হবে লয় মুহূর্ত্তে এখনি
নিবার হরের নৃত্য।

ভ। তথাস্তু স্থিতীশ,
সহায় হও হে তবে ব্রহ্মা নারায়ণ।

ব্র। বল কি আদেশ?

বি। সাধি সর্ব্বশক্তি দানে।

ভ। অকালে এ মোহ নৃত্য ভাঙ্গালে দেবের
ঘটিবে প্রমাদ বড়, বাড়িবে দ্বিগুণ
কলির প্রভাব।

বিষ্ণু। কহ কি তবে উপায়?

ভ। নব যুগ হে ব্রহ্মন্ কর প্রবর্ত্তন।
বিষ্ণু তুমি হয়ি তাহে মহা অবতার
বন্দী কর কলিরাজে। যত দেবগণ
হও সৈন্য অনুচর। আমি শক্তিরূপা—
পথ দেখাইয়া চলি, জাগাই শিবেরে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু। তথাস্তু ভবানি।

ইন্দ্র যম। জয় জয় বল জয়।

গান

জয় জয় বল জয়
সুর অসুর মানব দানব সবে।
দিগদিগন্ত ধ্বনিত করি অশনিমন্দ্রিত রবে-
জয় জয় সত্য সনাতন
জয় জয় ব্রহ্মা নারায়ণ
জয় জয় শিব-শক্তি—
গাহি, পুণ্য মঙ্গল আহবে।
ছিলাম শাপসুপ্ত
শক্তির বরে লভেছি চেতনা
হয়েছি প্রসাদ-মুক্ত।
এবে, আমরা প্রবল দৈব!
দুরিত মোদের ভ্রান্তি শ্রান্তি
মিলেছি শাক্ত শৈব!
দুর্জ্জয় ঐক্য-মন্ত্র উচ্চারি—
নবীন কল্পে আনিব ভবে।
জয় জয় বল সবে।

পটক্ষেপ।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের ন্যায় শিব তরুলতাচ্ছন্ন মণ্ডপে ধ্যানমগ্ন; সম্মুখের রঙ্গমঞ্চে ভৃঙ্গি নৃত্যপরায়ণ, নন্দী দি ভাবে তরুগাত্রে নির্ভর করিয়া তাহার দিকে চা দণ্ডায়মান।

ভৃ। (নাচিতে নাচিতে)
এ কি জ্বালা পা দুটা যে না মানে বারণ!
কে যেন চালায়ে মোরে গ্রহের মতন—
করিছে অস্থির?

ন। নাচ তবে আরো নাচ।

ভৃ। ঈষ, ভারী আজ্ঞাজারি! আমি নেচে
তামাসা দেখুন উনি! সেটি হইবে না;
তুমি নাচ আমি বসি তুড়ি দিই কষি।
(উপবেশন ও পায়ে হাত দিয়া)
বেদনা করিছে বড় টিপে দাও দাদা!
ছোট ভাইটিরে কর দয়া একটুকু।
এ হেন শান্তির দিনে কর শান্তি দান।

ন। নীরবে থাকিস যদি—

ভৃ। রাজি খুব রাজি;

টেপো দাদা ভাল ক'রে।
(নন্দীর পা টিপন)

ভৃ। আঃ কি আরাম!

ন। ফের কথা—ফের!

ভৃ। এই ক্ষান্ত হনু—শুধু—
দুটি ছোট্ট কথা দাদা বেশী কিছু নয়—

ন। সর্ত্ত ভঙ্গ হয়ে গেছে, উঠিনু আর না!
(পা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া)

ভৃ। বেশ ব'স, গল্প কর, বল দাদা বল—
ভূত প্রেত দৈত্য দানা পশু নর যবে
মেতে উঠেছিল সবে, তুমি কি তখনো
এমনি গম্ভীর স্থির ছিলে দাঁড়াইয়া
নৃত্যশীল প্রভুর পারশে!

ন। মনে নাই।

ভৃ। মনে নাই! বল তবু যাহা মনে আছে,—
বলিতেই হবে—

ন। বড় আবদার এ ত!
শোন তবে; শুণ্ডরূপে বিস্তারিয়া মুণ্ড
শুষিয়া সাগরখানা করিলাম গ্রাস
সিংহি হয়ে ভৃঙ্গি কায়া।

ভৃ। থাম' দাদা থাক্!
তোর সনে গল্প করা পণ্ড পরিশ্রম,
সুখ নাই এতটুকু! মনে কি করিস—
পূজা দিব তোরে মোরা ভোলা-চেলা বলে?

ন। পূজাটা তোরেই দেব ছেড়েদে আমারে।

ভৃ। তা হবেনা দাদাভাই, শুনিতেই হবে,—
পেয়েছি তোমারে হাতে অমনি কি ছাড়ি!
ঘুষাঘুষি মারামারি করি কথাগুলা
পেটের ভিতর, মোরে করিছে জখম—
বাহির করিয়া পাই ত্রাণ—,
বল্ তবে।

ন। তোর ত আরাম দিব্য—কিছু মনে নাই!
আমার যে মনে পড়ে প্রতি-পদক্ষেপ!
সুখ তরঙ্গিত প্রতি দেহ-সঞ্চালনা—
রণবাদ্য তালে তালে;—

ন। সৌভাগ্য তোমার!

ভৃ। চুপ কর্ বলিতে দে, শুনি সব কথা
তখন করিস পরে—ভাগ্য-আলোচনা—
এমন অস্থির পঞ্চ!

ন। শুনিতেছি বল!

ভৃ। শুনিতে হবেনা আর ফুরায়েছে কথা!

ন। এত শীঘ্র! বাঁচিলাম। হর হর বম।

ভৃ। তুমিত বাঁচিলে কিন্তু মরিলাম আমি!
উল্লাস বিঘোরে যবে—দিনু উল্লম্ফন
যোজন উপরে—কাটি গেল তাল লয়—!

ন। সত্যি নাকি তারপর?

ভৃ। হোল সর্ব্বনাশ!
হারানু সকল শক্তি, ইন্দ্রিয় বিকল!
ছুটিয়ে চলিল নীচে জড় দেহখানা;
পড়িয়া পাষাণ-লোহ-কঠিন মাটীতে
এখনি হইবে চুর্ণ, চক্ষু মুদিলাম!

ন। আহা মরি তারপর?

ভৃ। ঠেকিল চরণে
সুকোমল তৃণশয্যা; চাহিয়া দেখিনু—
শিবের দুয়ার পরে আছি দাঁড়াইয়া!

ন। বেশ বেশ বড় সুখী। ভৃঙ্গিহারা হ'লে
আমারও ঘটিত মৃত্যু!

ভৃ। কিন্তু বল দাদা
এ কেমন স্বপ্ন! হেন মহা-লয়কাণ্ড
মিথ্যা কি সকলি নন্দী,—শুধাই তোমারে?

ন। সত্য কিবা মিথ্যা দেখ নয়ন মেলিয়া;
ঐ বিরাজেন বিষ্ণু নবযুগ-বেশে,—
বন্দী করি কলিরাজে দেবগণ সাথে!
সর্ব্ব অগ্রে—শক্তিরূপা জগজ্জননী!

(উভয়ের নেপথ্যে দৃষ্টিপাত)

ভূ। একি দৃশ্য সুমহান্ কোন্ পুণ্যফলে
লভিনু এ দিব্য দৃষ্টি—খুলিল নয়ন!
প্রাণ ভরি গাহি সবে জয় জয় গান।

উভয়ে। সর্ব্ব বিশ্ব ঐক্যনাদে গাও জয় জয়।

(সহসা আলোকচ্ছটার মধ্যে দেবদেবীগণ চিত্রার্পিত মূর্ত্তিতে প্রকাশ। ব্রহ্মা ও মহাদেব উচ্চে আলোক-সিংহাসনে আসীন। সম্মুখে ধৃতখড়্গা ভগবতী নবযুগ-বেশী বিষ্ণু এবং বন্দী কলিরাজ, ইন্দ্র, যম, ন্যায় প্রেম, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শান্তি, করুণা এবং দিগবালা প্রভৃতি দেবদেবীগণ-পরিবৃত হইয়া দণ্ডায়মান।)

নন্দী ভৃঙ্গি ও দিগবালাগণের গান।

গান

হের ঐ নবযুগ উদীয়মান!
প্রীতিদীপ্তিময় দিব্য আলোকে
ঈর্ষা-তিমির অবসান।
সুরনর গাহে জয়গান।
সমীরণ পুলকে ভরা
শান্তি কান্তি রূপে জাগিছে ধরা;
ত্রিলোক-দেবতার পুণ্য আশীষ-ধার
দ্যুলোকে ভূলোকে ভাসমান,
বিশ্বভুবনে বাজে মঙ্গল-তান।

পটক্ষেপ।

সমাপ্ত

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

শিল্পচর্চ্চা

(ক্রপটকিন হইতে)

প্রাণধারণ বা কেবলমাত্র দিনযাপনের উপযোগী অন্ন, পানীয় ও আশ্রয় সংগ্রহই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়—তাতে তার সমস্ত শক্তিও ব্যয়িত হয় না। সাধারণ অভাব-পূরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নানাবিধ অভাব মনের মধ্যে বিশেষ ভাবে জেগে ওঠে—আমাদের অন্তরনিহিত সৌন্দর্য্যরুচির প্রেরণায়। আমরা প্রত্যহই দেখি প্রত্যেক নর-নারী আবশ্যকীয় জিনিষের অভাব সত্ত্বেও এমন দু-একটা জিনিষ কেনেন, যাতে দৈহিক বা মানসিক আনন্দ পাওয়া যায়। কোন নীতিবাগীশ বা সন্ন্যাসীর চোখে এই বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তি অসন্তোষের কারণ হতে পারে—এ-গুলিকে তাঁরা পাপের প্রবেশ-দ্বার মনে করতেও পারেন; কিন্তু বাস্তবিক এই-সব ছোটখাট খেলার জিনিষই জীবনের একঘেয়ে ভাবকে নষ্ট করে, তার মধ্যে বৈচিত্র্য এনে দেয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর নিজের রুচি-পরিতৃপ্তির ও অবকাশযাপনের কোন উপায় যদি না থাকত, তবে অবশ্যম্ভাবী দুঃখের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে কোন মানুষ বাঁচতে চাইত কিনা, সন্দেহ। প্রতি লোকের জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন এবং সমাজ যতই সভ্য হবে, ততই মানুষের স্বাতন্ত্র্য বাড়বে এবং তার ফলে প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও পরিতৃপ্তি ভিন্ন হবে। নীতির পুঁথি বা নীতিবাগীশের উপদেশের

উপর মানুষের উন্নতি নির্ভর করছে না এবং কখনও যে করবে এমনতর ভয় আমাদের নেই, কাজেই আশা করতে পারি যে আমাদের সমাজে শিল্পচর্চ্চার কোনো ত্রুটী হবে না।

সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধন করতে হলে অবশ্য প্রথমে সবার মুখে অন্ন যোগাতে হবে। বর্ত্তমানের সমাজ-ব্যবস্থায় সক্ষম কর্ম্মী কর্ম্ম-প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরছে, আশ্রয়হীনা নারী অসহায় শিশু মনের বেদনা জানিয়ে পথে পথে ঘুরছে—অর্দ্ধাশন ত কর্ম্মী-পরিবারের চিরসাথী। আবালবৃদ্ধবনিতা যত্ন-সহানুভূতি ত দূরের কথা, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত—পশু-জীবনের চেয়েও দুঃর্ব্বিসহ তাদের জীবন। এই সমস্ত অত্যাচার ও অন্যায় দমন করতেই আমরা বিদ্রোহ করছি। কিন্তু বিদ্রোহ এখানেই থামবে না, তাহলে আমাদের কাজ অসমাপ্ত থেকে যাবে। আমরা দেখছি যে মজুরের দল মানুষের সুখের জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করছে, কিন্তু মানুষের উদ্ভাবিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের সংবাদ তাদের জানা নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারজাত আনন্দের পথ তাদের সামনে রুদ্ধ, শিল্প ও শিল্পসৃষ্টির আনন্দ ও অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। এই-সব আনন্দের অধিকার আজ জনকয়েকের হাতে, কিন্তু আমরা এটিকে সাধারণের অধিকারভুক্ত করতে চাই। এই আনন্দ উপলব্ধির জন্যে মনের ও বুদ্ধির সম্যক পরিচালনা বিশেষ আবশ্যক। এগুলি অবকাশসাপেক্ষ—অথচ, অশন-বসন-আশ্রয়ের অভাবের সঙ্গে লড়াই করে অবকাশ মেলাই দায়। এই বাধা দূর করবার জন্যে আমরা প্রথমে সাধারণ অভাব মেটাবার চেষ্টা করব,—যাতে সবাই শিল্পচর্চ্চার উপযোগী যথেষ্ট অবকাশ পায়।

বর্ত্তমানে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক অশন, বসন ও আশ্রয়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, সেখানে শিল্পচর্চ্চাকে বিলাসিতা বলা চলে সন্দেহ নেই। অভাবের মাঝখানে বিলাসিতা মহা দোষের, কিন্তু যখন সমাজে অন্ন প্রচুর, তখন শিল্প-চর্চ্চা কোন অংশে নিন্দনীয় নয়। সব মানুষ একরকম হতে পারে না, কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে, সব সময়েই আমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন থাকবেন যাঁদের রুচি ও প্রবৃত্তি সাধারণের থেকে ভিন্ন হবে। সকলেই যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসে যাবে এমন কোন কথা নেই, যদিও এমন লোকের অভাব হবে না দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে চর্চ্চা করতে যে ভালবাসে। সাধারণ শিক্ষা একরকমের হলেও বিশেষ শিক্ষার পথও প্রশস্ত থাকবে। অধিকন্তু, রুচির মূল এক হলেও নানা লোকের নানা রুচি হওয়াই সম্ভব—কারও-বা মর্ম্মর-মূর্ত্তি কারও-বা ছবি ভাল লাগে, কেউ-বা একটা সেতার আর কেউ-বা একটা পিয়ানো পেলে আর কিছু চায় না।

বর্ত্তমানে মহাজনী বন্দোবস্তের ফলে অগাধ অর্থ না থাকলে সৌন্দর্য্য-রুচির পরিতৃপ্তিসাধন দুরূহ; এ অর্থ উপার্জ্জন

করতে হলে কঠোর দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম করতে হবে এবং সে অর্থসঞ্চয় সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। সকলের মনে কোন-না-কোন রকমের বিলাস-বাসনা আছে; সেটার পরিতৃপ্তি না হলে মনে অসন্তোষ জাগে এবং সমাজে গোল-যোগ বাড়ে। শিক্ষিত লোকই হোক, আর অশিক্ষিত কৃষকই হোক, সুন্দরের প্রতি টান সকলেরই আছে, যদি জোর করে সেটিকে দমন করবার চেষ্টা করি তাতে উল্টা ফল ফলবে। অধিকন্তু, শিক্ষিত জনের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করতে হলে শিক্ষা বন্ধ করতে হবে—অর্থাৎ সত্যের পথে না-এগিয়ে আমরা পিছিয়েই যাব। ইতিহাসের শিক্ষা যদি আমরা কাজে লাগাতে চাই, তবে সবের বিরুদ্ধে সাবধান হতে হবে। আমরা মনুষ্যত্বের দাবীতে বিদ্রোহ আরম্ভ করছি; মানুষের দৈহিক ও মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে আমাদের কাজের পরিসমাপ্তি।

অবশ্য স্বীকার করি যে, যখন চারিদিকে অভাব-অনশন, মর্ম্মন্তুদ যাতনা ও ব্যর্থ জীবনের সুগভীর নৈরাশ্যের কথা ভাবি, তখন এ প্রশ্ন মনে আনতে লজ্জা পাই—আমাদের সমাজে প্রাচুর্য্যের দিনে কেমন করে লোকের নানারকমের সখ ও খেয়াল চরিতার্থ করব? আমরা আগে-ভাগে উত্তর দিই—আগে ত সকলের অন্নের বন্দোবস্ত হোক পরে খেয়ালের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু তাড়াতাড়িতে এটা ভুললে চলবে না যে, মানুষ শুধু অন্নের কাঙাল নয়—দেহের ক্ষুধা ছাড়া তার মনের ক্ষুধাও আছে এবং তার দাবীও কম নয়—কাজেই আমরা তার আলোচনা করতে বাধ্য।

দৈনিক পরিশ্রমের ঘণ্টার হার নিয়ে অনেক তর্ক-বিচার বহুকাল থেকে হয়ে আসছে এবং অনেকের মতে পাঁচ ঘণ্টাই নির্দ্ধারিত হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম সমাজ-রক্ষার উপযোগী জিনিষ-উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। পাঁচ ঘণ্টা আমাদের সীমা হলেও সাধারণ মানুষ বছরে তিনশো দিন দশ ঘণ্টা পরিশ্রমে অভ্যস্ত। বাধ্য হয়ে পরের জন্যে খাটতে গিয়ে মানুষ শেষে কল হয়ে ওঠে, তার বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য নষ্ট ত হয়ই, বেশীরভাগ তার মনুষত্বও জখম হয়; কিন্তু কাজের মধ্যে যদি যথেষ্ট স্বাধীনতা ও আনন্দ থাকে, তবে দশ-বারো ঘণ্টা পরিশ্রমে সে কাতর হয় না। সমাজের কল্যাণে সে তার নিয়মিত সময়টুকু মাঠে বা কারখানায় বা অন্য কোন-রকমের কাজে ব্যয় করবে, কারণ তার উপর কেবলমাত্র সমাজের অভাবমোচন নয়, সাধারণের উন্নতি ও শান্তি নির্ভর করছে। বাকি সময়টুকু তার হাতে, এ-বিষয়ে সে পুরামাত্রায় স্বাধীন।

শিল্পসৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে বহু সমিতি গঠিত হবে, এবং এ-সব বিষয়ে যাদের কৌতূহল কম তারা নানারকম খেলা ও খেয়াল-সমিতি স্থাপন করবে—অবসর-টুকু সুন্দরভাবে যাপন করবার জন্যে। পরস্পরের মধ্যে নির্ব্বিচার মেলা-মেশায়, ভাবের আদান-প্রদানে ও

সহানুভূতিতে এটি সম্পূর্ণ সম্ভব। জ্ঞান এবং রস সাহিত্য প্রচারের জন্যে গ্রন্থকার-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে; গ্রন্থকার, ছাপাখানার কম্পোজিটর, প্রিণ্টার, চিত্রকলাবিদ ও খোদাইকার একত্র দলবদ্ধ হয়ে কোন বিশেষ চিন্তা প্রচারের চেষ্টা করবে। বর্ত্তমানে গ্রন্থকারের সঙ্গে ছাপাখানার কোন সাক্ষাৎ-যোগ নেই বল্লেই হয়, সামান্য যা আছে তা অর্থের এবং তাও আবার কর্ম্মী-জনের সঙ্গে নয়; ছাপাখানার কার্য্যাধ্যক্ষ বা সত্বাধিকারীর সঙ্গেই তার কারবার। কর্ম্মজীবনের সঙ্গে গ্রন্থকারের কোন সহানুভূতি নেই বল্লেও অত্যুক্তি হবে না; অবিরাম সীসা-ব্যবহারে যদি কম্পোজিটর সীসা-বিষে কষ্ট পায় বা কল-পরিষ্কারক বালক যদি রক্তশূন্যতা রোগে মারা যায়, তবে তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না—পৃথিবীতে তাদের স্থান পূরণ করবার মত হতভাগ্যের অভাব ত কোনদিন হয়নি! কিন্তু যেদিন দেশে অনশন-অভাবের দায় থাকবে না, যেদিন কেবলমাত্র জীবন-রক্ষার জন্যে কেউ দেহ-মন বেচবে না, যেদিন জনসাধারণ যথেষ্ট শিক্ষা ও অবকাশ লাভ করবে এবং মনোভাব প্রকাশ করবার মত শক্তিশালী হবে, সেদিন বর্ত্তমানের গ্রন্থকারকে তাদের শরণাপন্ন হতে হবেই, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-বার্ত্তাই হোক আর রসরচনাই হোক, জনসাধারণের সমবায় ভিন্ন সে-সব প্রকাশ ও প্রচারের আর কোন উপায় থাকবে না।

যতদিন বস্ত্রবয়ন, যন্ত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতি নানারকম হাতের কাজ ইতরজনোচিত বলে বিবেচিত হবে, ততদিন কেবলমাত্র আনন্দের জন্যে নিজের হাতে বই-ছাপান লোকের চোখে অদ্ভুত লাগতে পারে, কারণ আনন্দলাভের অন্য পথ অনেক আছে। যেদিন সমাজে সকলের দাবী সমান হবে, সেদিন কিন্তু আর হাতের কাজের নিন্দা থাকবে না, কারণ কোন-কিছুর বিনিময়ে কেউ কারও দাসত্ব করবে না—প্রত্যেকের কাজ প্রত্যেককে নিজের হাতে করতে হবে। গ্রন্থকার ও তাঁর ভক্তের দল সানন্দে ছাপাখানার কাজ করবে এবং সৃষ্টি করবার সুখ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে। কয়েকখণ্ড মুদ্রার জন্যে যে বালক-মজুর ছাপাখানায় পরিশ্রম করে, তার কাছে এটি মরণের যন্ত্র মনে হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু যে-সব লোক তাদের প্রিয় কবির বা লেখকের মহৎ চিন্তা-প্রচারে ব্রতী, তাদের কাছে এটি সুন্দর বলে মনে হবে—যন্ত্রের প্রতি স্পন্দন, প্রতি শব্দ আনন্দের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ বলে' মনে হবে।

এতে সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হবেনা। গৃহকোণের আরাম-শয্যা ছেড়ে দেশের সঙ্গে নিজের ও সমাজের কাজ করলে কবি কিছু অকবি হবেন না—কল-চালাতে, খনি খুঁড়তে বা রাস্তা তৈরি করতে নানা-রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশায় ঔপন্যাসিকের মানবজীবনের অভিজ্ঞতা বাড়বে বৈ কমবে না। স্বীকার করি, কয়েকখানা বই পূর্ব্বের চেয়ে আয়তনে ছোট হবে, কিন্তু তাতে কমকথায় বেশী বলা হবে। বাজে কথা কমই ছাপা হবে এবং যা ছাপা হবে তা সবাই পড়বে ও বুঝবে। দেশে

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গুণীর সমাদর বেড়ে যাবে, কারণ মার্জ্জিত ও শিক্ষিত লোকরাই তখন সাহিত্য-চর্চ্চা করবে। এতদিন ছাপাখানার সঙ্গে সাক্ষাৎ-যোগ না থাকায় যন্ত্রের উন্নতি বিশেষ-কিছু হয়নি; এবার থেকে তার উন্নতির সূচনা হবে।

বর্ত্তমানে প্রতি সভ্যদেশে হাজার হাজার বিদ্বজ্জনসভা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যসমিতি আছে। সভ্যদের স্বেচ্ছা-মিলনের ফলে সেগুলি জন্মলাভ করেছে এবং শিক্ষিত জনপদবর্গের সহানুভূতিতে সেগুলি পুষ্টিলাভ করছে। এক-একটি বিশেষ শাখা বা বিভাগ অবলম্বন করে জ্ঞান-বিস্তার ও আনন্দ-বিতরণের জন্যে তারা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করেন। সেখানে অর্থের কোন সম্বন্ধই নেই—পরস্পরের মধ্যে বিতরণ ও বিনিময়ে কাজ চলে, লেখকও নিজের আগ্রহে লেখেন, অর্থের বিনিময়ে নয়। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তক-পত্রিকা অর্থের বিনিময়ে ছাপাখানার ছাপবার জন্যে দেওয়া হয়, কারণ হাতের কাজের উপর শিক্ষিতজনের কিছু ঘৃণা আছে। তাঁদেরই সহানুভূতির ও চেষ্টার অভাবে যন্ত্রপাতির অবস্থা শোচনীয়। দেশে উদার ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে এগুলি সুচালিত হবে এবং বিদ্বজ্জন-সভা সাধারণের কাজে যোগ দিতে ইতস্তত করবেন না, এমনতর আশা আমরা রাখি। একক বা স্বতন্ত্র্য চেষ্টার চেয়ে সমবেত শক্তির প্রাধান্য কারুকে বুঝিয়ে দেবার দরকার হবে না। বর্ত্তমানে নানাদেশে সমবায়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চলছে, তাতে ভবিষ্যতে সে যে একটা মহাশক্তিতে পরিণত হবে, তা সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমানে লেখককে সংবাদপত্র-সম্পাদক, ছাপাখানার সত্বাধিকারী বা পুস্তক-প্রকাশকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়, ভবিষ্যতে লেখকের স্বাধীনতা বিশেষ বাড়বে, কারণ যাঁর নতুন-কিছু বলবার থাকবে তিনি সমজদার লোকের সাহায্যে সে-সব নিজেই প্রকাশ করতে পারবেন। এখন কতকগুলি লোক জ্ঞানের চর্চ্চা ও বিস্তারে মনযোগ দেবার শিক্ষা ও অবকাশ পায়, আমাদের কাম্য-সমাজে সকলেই সে সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে—তাতে বর্ত্তমানের চেয়ে সমজদার লোকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে।

সাহিত্যের ও সংবাদপত্রের চারদিকে যে ব্যবসার আবহাওয়া আছে, সেটা সত্বর নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে তার শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশী। অর্থশালী লোকের বা দলের খেয়াল বা লাভের জন্যে লোকে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করতে বাধ্য হবে না এবং জনসাধারণ সে-সব সভার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। যাঁরা দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ও খবরের কাগজের ভিতরের খবর জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের মতে সায় দেবেন। এতদিন তাঁরা অন্যায়কে নির্ব্বিবাদে সহ্য করেছেন, শক্তির অভাবে তাকে দমন করতে সাহস করেন নি, ভবিষ্যতে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বা শিল্পের সাধকেরা কেবলমাত্র ভক্ত ও রসিকের জন্যে আবিষ্কার ও সৃষ্টি করবেন—পরের মুখচেয়ে

তখন ভয় পাবার কোন কারণ থাকবে না। সকলবাধামুক্ত হয়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিপোষক হবে।

শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা তাঁরাই সুন্দর ভাবে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে করতে পারেন, যাঁরা কায়মনোবাক্যে স্বাধীন। যতদিন-না মানুষ শাসন-তন্ত্রের, ধনবান মহাজন বা অর্দ্ধশিক্ষিত মাঝারিদলের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, ততদিন তার কোন মঙ্গল নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই জানাশুনা আছে যে, শাসন-তন্ত্রের সাহায্য কোন কাজেরই নয়। তাতে উপকারের বদলে বরং সমূহ ক্ষতি হয়। একে ত শাসন-তন্ত্র শতের মধ্যে হয়ত একজনকে সাহায্য করতে পারে; তাও এই কড়ারে যে, পুরানো দস্তুরের বাঁধা পথে তাকে চলতে হবে—নতুন কথা বলবার অধিকার তার থাকবে না—স্বাধীনতার বদলে এ সাহায্য কেউ কি চাইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয় বা শাসন-তন্ত্র গঠিত সমিতির অধিকারের বাইরেই জগতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে। সারাজীবন অনশন ও নানা অভাব-অনটনের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করে যাঁরা মানুষের উন্নতিসাধন করেছেন শাসন-তন্ত্র তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে একটা আঙ্গুল পর্য্যন্ত তোলে নি। শাসনতন্ত্রের সাহায্যে শ্রীতশ্রদ্ধ হয়ে আমেরিকায় ও য়ুরোপে নানা সমিতি স্থাপিত হয়েছে এবং পরস্পরের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যে ও চেষ্টায় কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। এর-মধ্যে যা-কিছু গলদ আছে বিদ্রোহের পর স্বাধীন সমাজে মৈত্রী ও সহানুভূতির প্রসাদে সেগুলি দূরীভূত হবে।

যন্ত্রাদির উদ্ভাবনের পথে শাসনতন্ত্রের ও মহাজনী ব্যবস্থার বাধা বিস্তর; বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবও এ পথে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। নিজের লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশে কোন উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক কাজে হাত দেন না—দেশের উপকার ও আনন্দের জন্যেই তাঁর সাধনা তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন। মনের স্বাধীনতা যেখানে, চিন্তার অবাধ গতি যেখানে, সেখানেই শিল্পীর ও উদ্ভাবকের স্বর্গ এবং সামাজিক পরিবর্ত্তন সেই স্বর্গকে মর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা করছে। শিল্পী ও উদ্ভাবকের চেষ্টায় নানা যন্ত্রাগার স্থাপিত হবে এবং অবসর-সময়টুকু তাঁরা নিজেদের চিন্তাকে আকার দেবার চেষ্টা করবেন—সফল হোন বা বিফল হোন, কারও কাছে সেজন্য অনাবশ্যক জবাবদিহি করতে হবে না এবং বারবার চেষ্টার অধিকার থেকেও তাঁদের কেউ বঞ্চিত করবে না। অভাব ও বাধার সঙ্গে লড়াই করে যে-সাধনা, তার হাত থেকে তাঁরা পরিত্রাণ পাবেন, এটি নিতান্ত আকাশ-কুসুম বা অলীক স্বপ্ন নয়। য়ুরোপের অনেক রাজধানীতে এমনতর যন্ত্রাগার স্থাপিত হয়েছে এবং তার কাজ পুরাদমেই চলছে। তার মধ্যে ত্রুটী অবশ্যই আছে, কারণ শাসনতন্ত্র, সমাজ-ব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়, তার উপর পরস্পরের সহানুভূতিরও যথেষ্ট অভাব। এই সমস্ত বাধা দূর করে' মানুষের চেষ্টাকে সফল

করাই আমাদের বিদ্রোহের প্রধান কর্ত্তব্য।

চিত্র প্রভৃতি চারুশিল্পের অবনতি হয়েছে বলে অনেকে অনেক দুঃখ করেন, 'য়ুরোপীয় নবযুগে' যে বিরাট শিল্পের উদ্ভব ও উন্নতি হয়েছিল বর্ত্তমানে তার আদর্শ থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ইদানীং শিল্পকৌশলের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং হাজার হাজার মাঝারী শক্তিশালী লোক শিল্পের নানা বিভাগে ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে শিল্প যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, কারণ কলাকৌশলের যতই উন্নতি হোক, শিল্পীর সৃষ্টিতে প্রাণের প্রেরণার আভাস আমরা কদাচিৎ পাই। প্রাণের প্রেরণা আসবে কোথা থেকে, আমরা নিজের হাতেই সে পথ যে রুদ্ধ করেছি! জীবনে যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু বিরাট তার মধ্যেই আর্টের প্রেরণা আছে,—কিন্তু আমরা আজ সঙ্কীর্ণতার ও জড়তার অন্ধ উপাসক। আর্ট, সৃষ্টিরই নামান্তর এবং সৃষ্টিমাত্রই নূতন। কিন্তু হাজার হাজার কৌশলী শিল্পীর মধ্যে ক্বচিৎ দু-একজন হয়ত চিরনবীন, চির-সুন্দর প্রাণের আভাস জীবনে একবার মাত্র উপলব্ধি করেন, বাকী সকলেই নিতান্ত গতানুগতিক এবং পুরাতনের মোহে অন্ধ। প্রয়োজনের বাঁধা-পথে বা পুঁথির বাঁধা গতে এ প্রেরণা পাওয়া যায় না, জীবনের অকারণ পুলকের উৎস-মুখেই এর সন্ধান মেলে। কিন্তু সাধারণের এ সন্ধানে যাত্রা করবার মত আগ্রহও নেই সাহসও নেই। স্বার্থসাধনের পাষাণ চাপিয়ে মাঝারি [illegible] তার স্রোত বন্ধ করে দিয়েছে—স্বা[illegible] জীবন লাভের চেষ্টাই তাদের উদ্ধা[illegible] একমাত্র উপায়।

গ্রীক শিল্পী বা নবযুগের শিল্পী দল যা সৃষ্টি করেছেন, তার সঙ্গে দে[illegible] নাড়ীর টান ছিল, প্রাণের সাক্ষাৎ-যো[illegible] ছিল। দেশের আগম পুরাণ, সুমধু[illegible] চিন্তা-ধারা ও তার অন্তরনিহিত প্রাণচি[illegible] তাঁরা রেখায় ও রংয়ে বা পাষাণে ফু[illegible] তুলেছেন এবং প্রাণের সঙ্গে সাক্ষা[illegible] যোগ ছিল বলেই দেশবাসীর কা[illegible] তাঁদের হাতে-গড়া শিল্প সত্য-সুন্দ[illegible] প্রতিমা বলে পূজা পেয়েছে। শিল্পসৃ[illegible] সার্থকতা এইখানেই। গ্রীক শিল্প বা ন[illegible] যুগের শিল্প এখন সভ্যদেশের যাদুঘরে স্থা[illegible] পেয়েছে। সহরের বুকের উপর যাদের আস[illegible] ছিল, শত শত জনপদের যারা আনন্দের [illegible] পূজার সামগ্রী ছিল, আজ তারা মৃতের ক[illegible] কঙ্কালরাশির মধ্যে স্তূপীকৃত। তখনকার কা[illegible] দেশবাসীর মধ্যে মেলামেশার যথেষ্ট সুবি[illegible] ছিল, তার ফলে নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে [illegible] একটা একতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে সে[illegible] মিলন-ক্ষেত্রটি লোপ পেয়েছে। এখনকা[illegible] সহর যেন লোকের মেলা, এখানে পরস্পরে[illegible] মধ্যে আলাপ-পরিচয়ই নেই, মনের বিনিময় [illegible] স্বপ্ন-কথা; সহর এখন অর্থ-উপার্জ্জনে[illegible] স্থান; পরকে দাবিয়ে, পরের মুখের গ্রা[illegible] কেড়ে আত্মপ্রাধান্য আত্মপোষণ যাদে[illegible] মূলমন্ত্র, জীবনের লক্ষ্য, তাদের ম[illegible] সহানুভূতি, মনের মিল থাকবে কেমন করে[illegible] অর্থশালী মহাজন ও কলের মজুর হচ্ছে নেকড়[illegible]

বাঘ ও মেষশাবক; এই বিপর্য্যয় বিরোধী অবস্থায় উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকা অসম্ভব। উভয়ের এক মাতৃভূমি থাকতেই পারে না, আর চির-দাসের মাতৃভূমিও নেই, সব জায়গাই তার পক্ষে সমান—মাতৃভূমি তার, যে স্বাধীন, যে আত্ম-বিশ্বাসী।

আমাদের শিল্প বাবুয়ানার শিল্প, আমাদের সাহিত্য বিলাসীর সাহিত্য। এ সাহিত্যে, এ চিত্রে কর্ম্মজীবনের কাব্য তেমন জমে না, কর্ম্মজীবনের মূর্ত্তি তেমন ফোটে না। তার কারণ, শিল্পী কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য থেকে আপনাকে যথাসম্ভব দূরে রাখবার চেষ্টা করেন—তাঁর এ শুচি-বায়ুর ফলে তাঁর নিজের ত ক্ষতি হয়েছেই, বেশীর ভাগ, শিল্পের ক্ষতির পরিমাণও সামান্য নয়। কায়ক্লেশে প্রাণধারণের জন্যে দেহের রক্ত ও মনের স্বাধীনতা বিক্রয় করে কল-কারখানায়, মাঠে, খনিতে বাধ্য হয়ে পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দ নেই স্বীকার করি, কিন্তু স্বাধীনভাবে দশের উপকারে কাজ-করায় যে যথেষ্ট আনন্দ আছে এবং এই আনন্দের প্রকাশই যে যথার্থ কাব্য ও চিত্র, এ-কথা না-মানা চলে না। কর্ম্মক্ষেত্রে নরনারীর মিলন-সঙ্গীত কাব্যে গান করবেন, চিত্রে রেখা-সম্পাতে ফুটিয়ে তুলবেন তাঁরা,—যাঁরা কর্ম্মজীবনের দুঃখের সংঘাত ও সুখের আস্বাদ প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন, নিজের হাতে সামাজিক জীবনের নূতন মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন। এতদিন যে-সব চিত্র অঙ্কিত ও মূর্ত্তি খোদিত হয়েছে, তাদের মধ্যে ভাবাবেগের প্রাচুর্য্যই বেশী, বলিষ্ঠ প্রাণের ছাপ্ খুব কম। পটের ছবি বা পাষাণের মূর্ত্তি যদি পটকে, পাষাণকে অতিক্রম না করে, যদি প্রাণের আনন্দ ব্যক্ত না করে, তবে সে ব্যর্থ পরিশ্রমে লাভ কি?

এ-সব কেবলমাত্র সেই সমাজে সম্ভব, যেখানে জীবন-যাত্রা সহজ সরল ও সুন্দর,—শিল্প যেখানে মাঝারি দলের বিলাসের বস্তু নয়, জন-সাধারণের আনন্দের সামগ্রী। এই সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে হলে পুরাণো ব্যবস্থা দূর করতে হবে এবং আমাদের কাম্য সামাজিক পরিবর্ত্তন ঠিক সেই কাজটিই করতে চায়।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

প্রেম

হা-হুতাশের অন্ধকারে নেইক আমার কেউ সাথী,
প্রেমের সাধন করছি কেবল কেঁদে কেঁদে দিনরাতি!
কাম-কামনার ঊর্দ্ধলোকে পুণ্য প্রেমের বাসভূমি,
সেথায় আজো যাইনি আমি, মিছাই ফুলের গাল চুমি।

মিছাই কেবল গভীর রাতে আঁক্‌ড়ে ধরি জ্যোস্‌-নাকে,
জানিনে সে পালায় কিসে আলিঙ্গনের কোন্ ফাঁকে!
এমনি করে কত নিশীথ কেঁদে বেড়াই ময়দানে,
জানে গাছের রাতের ছায়া, জানে আমার মন জানে!

জ্যো'স্না রাতে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একলাটি,
আশায় আশায় রাত কাটানো, শেষে বোঝা সব মাটি!—
এইটি আমার চিরদিনের জেনে শুনে ভুল করা,
এত যে ভুল করছি তবু প্রেমের আশায় বুক ভরা!
প্রেমের পরিচয়টি নিতি পাই গো প্রতি নিশ্বাসে,
তাইতো তাকে পাবার আশায় আকুল গভীর বিশ্বাসে।
কাম-কামনার ধাপে ধাপে উঠছি ধীরে প্রেম-লোকে,
ভয়-ভাবনার ধার ধারিনে, ভয় করিনে দুখ-শোকে!

কাজ আছে গো কাজ আছে এই কামের ধূপ ও গুগ্‌গুলে,
কোকিল কেবল পরাণ মাতায়, মাতায় নাকি বুল্‌বুলে!
দেহের রূপের সুধা যদি প্রেমের ক্ষুধা নাশ করে,
চাইনে তেমন মিলন আমি, জ্বলবে আগুন অন্তরে!
কিসের পিছে ছুটছি মিছে, পাইনি তো প্রেম এক ছিটে!
পাবার আশাই যাচ্ছে বেড়ে, জীবন কোথা হয় মিঠে!
প্রেমের পূজা চলবে তবু প্রাণের কুসুম-চন্দনে,
ভোগ-লালসায় এই জীবনের কাটবে না দিন ক্রন্দনে!

কামের শুধু নই পিয়াসী ও প্রকৃতি সুন্দরী!
আপন-ভোলা প্রেমের লোভে গান গাহি লো গুঞ্জরি'!
যখন তোমার রূপের মাঝে পুলক লভি এক কণা,
তখন ওগো তখন আমি এক নিমেষে উন্মনা!
এক পলকের সুখের সাড়ায় হৃদয়-সারঙ্ ঝঙ্কৃত,
সেই ক্ষণিকের সুখটি কবে হবে জীবন-ব্যাপৃত!
হাল্‌কা সুখে প্রাণ বাঁচে না, এই পাওয়া তো কাল-গুণে;
তাই তো প্রেমের পাগল আমি যৌবনের এই ফাল্গুনে।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কুকী

পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় ৭৫৪৭ জন কুকী আছে। তন্মধ্যে ৩৭৭৭ জন পুরুষ, অবশিষ্ট ৩৭৭০ স্ত্রী। 'কুকী' ইহাদিগের, জাতীয় ভাষার শব্দ নহে। স্বভাষায় কুকীগণের জাতীয় নাম 'হ্রিয়েম্'। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর কুকী আপনাদিগকে লুছাই নামক এক পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম, উত্তরে প্রাচীন কাছাড় ও মেইতেই ভূমি, এবং দক্ষিণে আরাকান—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূমি কুকিজাতির আবাস-স্থান। ইহারা প্রধানতঃ ২৪ ভাগে বিভক্ত; যথা—

১। পাওতু বা পাইতু (পয়টু)।
২। বংছের।
৩। বেলঠুট্।
৪। থাংলুয়া।
৫। লাইফং।
৬। বংখই।
৭। মিজেল।
৮। নামতে।
৯। ছাল্যা।
১০। অমড়ই।
১১। চোটলাং (চোটলাং ও ফাটলেই। ত্রিপুররাজ্যের কুকিদিগের সহিত ইহাদিগের খুব কমই সম্পর্ক হইয়া থাকে। 'ফাট্‌লেই' শ্রেণী ত্রিপুরা জেলায় বাস করে।)
১২। খরেং।
১৩। বাইফেই।
১৪। চন্‌লেল্।
১৫। বল্‌তে।
১৬। বিয়েতে।
১৭। বালতে।
১৮। হ্রাং চস্।
১৯। রাংচিয়ে।
২০। ছাইলই।
২১। জংতে।
২২। পাট্‌লেই।
২৩। বেতন্থু।
২৪। পাইতে।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ৫ সম্প্রদায়ের কুকী ত্রিপুররাজ্যে বাস করিতেছে। কৈলাসহর বিভাগেই প্রধানতঃ এই রাজ্যের কুকীগণের বাস।

এই ২৪ শ্রেণীর ভাষা মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন নয়। প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে যে পার্থক্য ইহাদের মধ্যেও তাহাই। কুকিদিগের আচার ব্যবহার তিপ্‌রাদিগের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোন কোন অংশে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদের শ্রেণী-সমূহের মধ্যে পরস্পর আচারব্যবহার সম্বন্ধে কোনরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা প্রায় যাবতীয় পশুপক্ষীর মাংস খাইয়া থাকে এবং জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না। ইহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তবে পরকাল বা পুনর্জন্ম মানে না। কুকিদিগের সকল রকম ধর্ম্মানুষ্ঠানই

রোগশান্তি প্রভৃতি ঐহিক ফলের প্রত্যাশায় হইয়া থাকে। ইহারা মনে করে যে গবয়, ছাগী, কুক্কুট, প্রভৃতি বলিদান করিয়া পূজা করিলে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। ইহাদের কোন শ্রেণীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। দুই তিন শ্রেণী এক পর্ব্বতে কিংবা একশ্রেণী দুই তিন পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকে।

শিক্ষা। কুকিগণ প্রায়শঃই অশিক্ষিত, তবে ত্রিপুররাজ্যের কুকিগণ ক্রমশঃ শিক্ষা লাভ করিতেছে। কুকি বালকগণের শিক্ষার জন্য সম্প্রতি এ রাজ্যে কয়েকটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।

রাজা। তিন জন কুকি সর্দ্দার ত্রিপুররাজদরবার হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছে। কুকি-রাজত্রয় বঙ্গভাষায় আলাপ করিতে সমর্থ।

ধর্ম্ম—পাথিয়েন নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম কুকিদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করে। পাথিয়েন প্রচার করিল—"একজন এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ভিন্ন অন্যান্য অনেক আরাধ্য দেবতা আছেন"। পাথিয়েন সামাজিক নিয়মেরও প্রবর্ত্তন করে।

পরে তার্পা নামক আর এক ব্যক্তি প্রথম ধর্ম্মপ্রচারকের ধর্ম্মমত, কার্য্য-প্রণালী রীতিনীতি বজায় রাখিয়া পাথিয়েনের ধর্ম্মের কিছু সংস্কার সাধন করে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক নূতন নূতন নিয়মেরও প্রবর্ত্তন করে।

কুকিদিগের ধর্ম্ম তার্পা দ্বারা সংস্কৃত হইলেও বরাবর একভাবেই চলিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু আধটু বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছে তাহাদের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। হিন্দুগণ যেমন 'হরি' 'নারায়ণ' প্রভৃতি বলিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ তাঁহাকে 'লাচী' বলিয়া সম্বোধন করে।

কুকিগণ যখন তাঁহাদের আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া 'দারলঙ্' পর্ব্বতে বাস করিতে আরম্ভ করে সেই সময় পাথিয়েন তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করে। সে সাহসী যোদ্ধা বলশালী ও পরোপকারী ছিল। পাথিয়েন নিজে না খাইয়া বাড়ীর সকলকে আহার করাইত। কাহারও পীড়া হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। কাহারও কোন খাদ্যের অভাব হইলে যে কোন উপায়ে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিত। কুকিরা কাজেই তাহাকে পরমেশ্বরের ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। পাথিয়েন প্রথম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া কুকিরা তাহাদের দেব-দেবীর নামের পরে পাথিয়েনের নাম যোগ করিয়া দিত।

আরাধ্য দেবতা

১। কুকিদিগের আরাধ্য দেবতাদিগের মধ্যে 'লোচরী পাথিয়েন' একটি। 'লোচরী দেবতার' সপ্তমুণ্ড বলিয়া কুকিদের বিশ্বাস। ঐ দেবতার অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার পূজা বাড়ীতেই হইয়া থাকে। অবস্থানুসারে লোকে এই পূজায় হংস, মোরগ, বরাহ, মহিষ, গণ্ডার ও গবয় বলি দিয়া থাকে। এই পূজায় কোনরূপ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় না, কেবল কাঁচা বাঁশ দিয়া দুইটী নিশান উচ্চমঞ্চে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

২। 'তুই পাথিয়েন'—এই পূজা জলের নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। চাউল, সাদা রঙের মুরগী, সাদা রঙের 'পার্চ্চা' হংস এমন কি পারাবত পর্য্যন্ত এই পূজায় বলি দেওয়া হয়। কুকি ভাষায় 'তুই' শব্দে জল বুঝায়। এই পূজাপদ্ধতিতে আমাদের গঙ্গাপূজার সামান্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। 'যাপিতে পাথিয়েন'—এই পূজায়ও কোন প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় না তবে অবস্থানুসারে বলিদানের বিধি আছে—'যাপিতে' শব্দের অর্থ লছ্‌মী বা লক্ষ্মী। এই দেবী লক্ষ্মীস্বরূপা। ইনি কৃষিকার্য্যের সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, গৃহকর্ত্রী ও গৃহলক্ষ্মী। কুকিরা 'জুম্' করার পূর্ব্বে ও পরে যাপিতে পাথিয়েনের পূজা করিয়া থাকে।

৪। 'খুয় পাথিয়েন'—বাড়ীর সমস্ত লোক একত্র হইয়া এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বাড়ীর ভিতর একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই পূজা হয় এবং কুকিরা ছাগ, বরাহ, হংস, পারাবত, মহিষ, গণ্ডার ও গবয় বলি দিয়া থাকে। কুকিদের নিকট এই পূজাটী বড়ই আমোদজনক। ইহারা স্ত্রীপুরুষ পূজাস্থলে একত্র হইয়া মদ্য মাংসাদি ভোজন এবং নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকে। খুয় পাথিয়েন পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। বৎসরের মধ্যে যে কোন এক সময়ে এই পূজার অনুষ্ঠান হইলেই হইল।

কুকিদের নিকট এই পূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। দুই একজন কুকী ইহাকে 'কের পূজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু ইহার সহিত 'কের' পূজার কোনই সংশ্রব দেখা যায় না। পূজার কার্য্যপ্রণালী কতকটা কালী পূজার অনুরূপ। এই পূজায় কোন প্রতিমা থাকে না। কাঁচা বাঁশের নিশানে ফল ইত্যাদি ঝুলাইয়া কাঁচা বাঁশ সংযোগে উচ্চ মঞ্চে উড়াইয়া দেয়। দুইদিন পর্য্যন্ত 'খুয় পাথিয়েনের' পূজা হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় দিবসে এই পূজা শেষ হয়। পূজার দুই দিনের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের কেশরচনা (চুল আঁচড়ান) নিষিদ্ধ। পরিধানের কিংবা ব্যবহারের বস্ত্রাদি এবং ধান্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য রৌদ্রে দেওয়া নিষিদ্ধ। এই সময় কেহ সূতা কাটিতে কিংবা বস্ত্র বয়ন করিতে পারিবে না। অন্য বাড়ীর লোক পূজা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে পূজাবাড়ীর লোকও অন্য বাড়ীতে যাইতে পারে না। যদি কোন অনিবার্য্য কারণে পূজাবাটীর লোক অন্য বাড়ীতে আসে তাহা হইলে তাহাদিগকে জরিমানা দিতে হয়। অবস্থানুসারে টাকা পয়সা, আহার্য্য দ্রব্য এমন কি মদ্য পর্য্যন্তও জরিমানা স্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির উপর পূজার ভার ন্যস্ত থাকে, তাহার নিকটেই জরিমানা দাখিল করিতে হয়। সাধারণতঃ উজীর বা মোক্তারই এই ভার পাইয়া থাকে।

৫। 'শিবপূজা'—কুকিদিগের মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার পূজাকে ইহারা 'শিব

পূজা'—এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুগণের শিবপূজার সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। এই পূজা কুকিদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহাতে ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে।

জুম কাটার পূর্ব্বে পল্লীবাসী জন সাধারণ মিলিত হইয়া এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। গবয় বলি এই পূজার প্রধান উপকরণ।

এই বলির গবয়টীকে অতি নির্দ্দয়ভাবে বিনষ্ট করা হয়।

বধ্য গবয়ের সর্ব্বাঙ্গে চুণের ফোঁটা দিয়া পূজায় সমবেত কুকিগণ এক একটী চুণের ফোঁটাকে নিজ নিজ লক্ষ্য বলিয়া মনোনীত করে। পরে পূজান্তে কিয়দ্দূর হইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহারা গবয়ের দেহে নিজ নিজ বল্লম নিক্ষেপ করে। যাহার বল্লম লক্ষ্য ভেদে সমর্থ হয় সে ভাগ্যবান্ ও যাহার বল্লম লক্ষ্যভেদ করিতে পারে না সে দুর্ভাগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। লক্ষ্যভেদ কার্য্য শেষ হইলে অতি নিষ্ঠুরভাবে গবয়টীকে বিনষ্ট করিয়া তাহার মাংস সম্মিলিত ব্যক্তিগণ ভোজন করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন কুকিদের অনেক ছোট ছোট পূজা আছে। প্রত্যেক পূজায় কুকিরা নিজ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে। এই মন্ত্রগুলি তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। কুকিদিগের একটা স্বাতন্ত্র্য এই—তাহারা পীড়া হইলে কোন ঔষধ ব্যবহার করে না, রোগ-মুক্তির জন্য নানাবিধ পূজা করে এবং মোরগ, ছাগ, বরাহ, পারাবত প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। ইহাতেই তাহারা রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

এক শ্রেণীর কুকি কোন নির্দ্দিষ্ট দেব-দেবীর পূজা করে না।

জন্মোৎসবাদি

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে কুকিদিগের অশৌচ গ্রহণের বিধি নাই। ইহারা জাত-সন্তানের কল্যাণের জন্য কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে না।

অবস্থাভেদে দশ দিন হইতে তিন মাসের মধ্যে মাতা পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ মতে সন্তানের নাম-করণ হইয়া থাকে। কুকিগণ সেইদিন আত্মীয়-বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে এবং সকলে সমবেত হইয়া একসঙ্গে শিকারে গমন করে, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রী পুরুষ একত্র মদ্য মাংস ভোজন করিয়া থাকে।

রাজা, উজীর, মোক্তার, প্রভৃতি অবস্থা-পন্ন ব্যক্তির সন্তান হইলে রণবাদ্য ও নৃত্য-গীতাদি হইয়া থাকে।

বিবাহ

কুকিদের বিবাহ দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বিবাহ অভিভাবক ও পিতা মাতার নির্ব্বাচনে ও উদ্যোগে হইয়া থাকে। অপর প্রকার বিবাহে পাত্র পাত্রী উভয়ে গোপনে আলাপ করিয়া পরস্পরের মনোনয়ন স্থির হইলে তাহারা প্রকারান্তরে তাহা আপন আপন অভিভাবকের গোচর করে; অতঃপর অভিভাবকগণ একত্র হইয়া বিবাহ স্থির

করেন। বিবাহ কন্যার পিত্রালয়েই হইয়া থাকে। কুকিদের বিবাহ মাত্রে বর-পক্ষ হইতে পণ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। রাজকন্যার বিবাহ কালেও পণগ্রহণ করা হইয়া থাকে, পরন্তু এ ক্ষেত্রে পণের টাকা অধিক পরিমাণেই দিতে হয়। বিবাহের পণ ২০৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত দেওয়ার নিয়ম আছে। পাত্রের পক্ষ হইতে যদি বিবাহের দিন কোন কারণে পণের টাকা দেওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে পাত্র-পক্ষ ৫।৭ বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া দিলেও বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহের পর যেদিন বর-কন্যা এক শয্যায় শয়ন করিবে সেইদিন বরপক্ষ হইতে কন্যাকে নগদ টাকা অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্য যৌতুক দিতেই হইবে। বরপক্ষকে ইহা হইতে কোনওরূপে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। কন্যা বিবাহের পর যখন শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যাইতে পারে না। শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় কন্যার পিতামাতা বা অন্য অভিভাবককে স্বকীয় অবস্থানুসারে (কন্যার সহিত?) বস্ত্র-শয্যাদি দিতে হয়। যে পিতামাতা যত বেশীদিন কন্যার বস্ত্র নিজালয় হইতে যোগাইতে পারিবে, বৈবাহিকদিগের নিকট তাহার তত বেশী সম্মান হইবে। বৈবাহিক সম্বন্ধে কুকিগণের পক্ষে ইহা অতি সম্মানের বিষয়।

কুকিদের মধ্যে কোন ক্রমেই ১০ বৎসরের পূর্ব্বে কিংবা ২৫।৩০ বৎসর বয়সের পর কন্যার বিবাহ হয় না। সচরাচর কন্যা প্রাপ্তযৌবনা এবং জুমকার্য্য করিতে সমর্থ হইলেই বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পর কোন কারণবশতঃ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যাহার ইচ্ছায় বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে তাহাকে জরিমানা স্বরূপ অপর পক্ষকে নগদ ১৬৲ টাকা দিয়া বিবাহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লইতে হইবে। এইরূপে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে পর কন্যার স্থানান্তরে বিবাহ হইলে তাহাতে সমাজ প্রতিবন্ধক হয় না।

কুকিদিগের বিবাহের কোন বিশেষ দিন, মাস, বার প্রভৃতি কিছুই নাই। কন্যার বয়স অধিক হইলেও উভয়ের মনোনয়ন-প্রথায় বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহে কোনরূপ মন্ত্রপাঠ করিতে হয় না। কন্যার বাড়ীতে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন মিলিত হইয়া বর ও কন্যাকে সভাস্থলে আনয়ন করে, অতঃ-পর বর কন্যাকে মুখোমুখী করিয়া বসাইয়া উভয়ের মধ্যস্থলে একটী মদের কলসী রাখিয়া দেয়। ইহার পর যখন বর-কন্যা দুইটী নলের সাহায্যে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে তখন কন্যার পিত্রালয়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সে সেখানে উপস্থিত হইয়া বর-কন্যার দুই গুচ্ছ কেশ একত্র বাঁধিয়া দেয় এবং দম্পতীর মদ্যপান শেষ হইবার পূর্ব্বেই বর বা কন্যার সমবয়স্ক কেহ আসিয়া ঐ বন্ধন মোচন করে এবং তাহাদিগের সঙ্গে বসিয়া মদ্য মাংস খাইয়া থাকে। আহারান্তে

ঐ দিনই তাহাদিগের বাসরশয্যা হয়। যদি কোন কারণে যৌতুকাদির অভাব হয় তাহা হইলে ২।১ দিন পরেও বাসরশয্যা হইতে পারে।

সমাজ

কুকিদিগের মধ্যে যে কয়েকটী শ্রেণী আছে তাহাদের মধ্যে আহারাদি বিষয়ে কোনও বাধা নাই; সকলেই একত্র ও একপাত্রে পান ভোজন করিতে পারে। বিবাহ বিষয়ে শ্রেণী বিশেষের আপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ এক শ্রেণীর নাম 'ঠাঙ্গুর' (?)। ইহারা রাজার জাতি। আর এক শ্রেণীর নাম 'চেঙ্‌ই', ইহারাই কুকিদের পূর্ব্বতন রাজবংশীয় ছিল। ইহাদের সহিত ঠাঙ্গুরদের বিবাহাদি হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে এই বংশের অধস্তন পুরুষের নাম লালবুঙ্‌ ঠোমা বাহাদুর। তৃতীয় শ্রেণীর নাম 'পালিয়েন'। ইহারাও কুকিদিগের মধ্যে সম্মানিত বটে তবে রাজারা প্রায়ই ইহাদিগের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে সুন্দরী কন্যা থাকিলে রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। চতুর্থ শ্রেণীর নাম রিভুঙ্‌,—এই বংশের পূর্ব্বতন পুরুষ (পিতা) রাজা ছিলেন। কিন্তু মাতা সাধারণ ব্যক্তির ঘর হইতে গৃহীত। পঞ্চমশ্রেণী জাদেঙ নামে পরিচিত। ষষ্ঠশ্রেণীর নাম চেইহাঙ্‌, ইহাদের সম্মান রিভুঙদিগের অপেক্ষা কিছু কম।

সপ্তমশ্রেণী সাধারণ কুকী। ইহারা সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী; ধর্ম্মে ও রীতি-নীতিতে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

কুকিদের প্রত্যেক বাড়ীতে একজন উজীর কি মোক্তার থাকে; ইহারা প্রধান স্বরূপ হইয়া উক্ত বাড়ীর বিচার প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের বিচারাধীন থাকিয়া ইহাদের পরামর্শমতেই বাড়ীর সকলে কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। একজন রাজার দশ বারজন মোক্তার থাকে। একজনের অধিক উজীর থাকিতেও বাধা নাই।

এক রাজার জিম্মায় দশ বার খানা বাড়ী থাকে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন রাজার বংশ লোপ পায়, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীই রাজ্য পাইয়া থাকে।

কুকি রাজাদের পুত্রই সাধারণতঃ উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র না থাকিলে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাও না থাকিলে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য পায়। কুকিদের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণের পদ্ধতি অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই।

অধুনা কৈলাসহরের এলাকায় তিন জন কুকি রাজা এবং একজন কুকি সর্দ্দার আছে। রাজাদের নাম 'মুরচুঙ্গা রাজা' 'লালচুক্‌থামা রাজা বাহাদুর' ও 'বানকাম্পুই রাজার পুত্র 'ঙুরচাইলিএন'। সর্দ্দারের নাম 'লালবুঙঠোমা' বাহাদুর। এই চারিজনের অধীনে প্রায় ৪৮০ ঘর অধিবাসী। এক এক ঘরে ১২ হইতে ৩০ জন বাস করে।

রাজাদিগের মধ্যে মুরচুঙ্গা রাজার অধীনে জন-সংখ্যা অধিক, কিন্তু লালচুক্‌থামা রাজা বাহাদুর এবং বানকাম্পুইএর আরও অধিক। মুরচুঙ্গা রাজার অধীনে ১৭৫ হইতে ২০০ ঘর অধিবাসী লালচুকমার অধীনে ১৩০ ঘর এবং বানকাম্পুইএর অধীনে ১৭৫ ঘর।

রাজা ও সর্দ্দারগণের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। সাধারণ কুকিদের বিবাহে ইহারা পণের টাকার অংশ পায়। যাহারা কোন কারণবশতঃ রাজাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে তাহাদের বিবাহের পণের টাকাও পাইয়া থাকে। কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে ইহারা তাহার মালিক হয়। কুকিদের মধ্যে বিধবার কন্যা সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। যতদিন ঐ কন্যা বিবাহিত না হয় ততদিন রাজা তাহাকে প্রতিপালন করে। সম্পত্তি যাহা থাকে তাহা রাজাই গ্রহণ করে।

সাধারণতঃ কুকি বালিকার বিবাহে পণের টাকা যাহা পাওয়া যায় তাহা পিতা মাতা জ্যেঠা, খুড়া, মাতুল ও রাজা এই পাঁচজনের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়। মাতা কখনও পণের টাকার অধিকারী হইতে পারে না।

কন্যা বিধবা হইলে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে। প্রথম স্বামীর সম্পত্তি থাকিলে (পুনর্ব্বার বিবাহ হইলেও) সে তাহার অধিকারিণী হইবে। যদি প্রথম বিবাহের পুত্র থাকে, তাহা হইলে সেই পুত্রই সম্পত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু পুত্র থাকিলে সম্পত্তি পায় না। বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে কোনই অধিকার থাকে না।

কুকিদের মধ্যে চোর, বদমায়েস ও মিথ্যাবাদীর সংখ্যা নিতান্ত কম। রাজাই সাধারণতঃ কুকিদের অপরাধাদির বিচার করিয়া থাকে। রাজার বাড়ী দূরবর্ত্তী হইলে সামান্য সামান্য বিচার বাড়ীর মোক্তার অথবা উজীর সম্পন্ন করে, এবং দণ্ডলব্ধ অর্থ রাজার নিকট দাখিল করে।

পূর্ব্বে প্রথা ছিল যে, কোন বিবাহিত রমণী অন্যাসক্ত হইলে ভ্রষ্টা নারী ও লম্পট পুরুষকে বিচারার্থ সভায় আনয়ন করা হইত, পরে উভয়কে একত্র দণ্ডায়মান করাইয়া ভ্রষ্টা রমণীর স্বামীকে দিয়া তাহার কর্ণমূল ছেদন করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে ছেঙ্‌ নামক অস্ত্রদ্বারা লম্পট পুরুষটীকে বধ করা হইত। বর্ত্তমান লালচুক্‌থামা রাজা বাহাদুর এই লোমহর্ষণ প্রথা বন্ধ করিয়াছেন। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, দুষ্ট পুরুষ তাহার পুরুষানুক্রমে রাজার গোলাম হইয়া থাকিবে। তবে দুষ্টা স্ত্রীর এক কর্ণ কাটিয়া ফেলা হইবে। ইহার স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। তজ্জন্য স্বামীকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। কুকিদের মধ্যে ভ্রষ্টা রমণী অত্যন্ত নিন্দার পাত্র। পরম রূপবতী হইলেও ইহাকে কেহ গ্রহণ করে না। দুষ্টা পুরুষকেও কেহ গ্রহণ করে না; সেও সাধারণের ঘৃণাভাজন হইয়া থাকে।

কেহ কোন অবিবাহিত কন্যার সহিত কন্যার সম্মতিক্রমে সঙ্গত হইলে উভয়কে

পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয়। এরূপ স্থলে কন্যা অপ্রাপ্ত-বয়স্কা হইলে পুরুষের কর্ণযুগল ছেদন করাইয়া তাহাকে রাজার দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়। আর কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইলে দুষ্ট পুরুষের অবস্থানুসারে ১৬৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা হয় এবং তাহাকে মদ্য মাংসাদি উপচারে ভোজন করাইয়া পঞ্চাইতের সন্তোষ বিধান করিতে হয়।

বারবনিতা

কুকিদিগের মধ্যে বারাঙ্গনা আছে, কিন্তু বারাঙ্গনাগণ পল্লীমধ্যে স্থান পায় না; পল্লীর বহির্ভাগে তাহাদিগের জন্য পৃথক্ বাসস্থান নিরূপিত হয়।

অবিবাহিত বা বিপত্নীক যুবক কিংবা প্রৌঢ় ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ কিংবা বিবাহিত যুবক) বেশ্যালয়ে গমন করিলে সে সমাজে নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

মোক্তার বা উজীর

কুকি-সমাজে জাতিহিসাবে মোক্তার বা উজীর নিযুক্ত হয় না। বাড়ীর মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাজা মোক্তার বা উজীর নিযুক্ত করিয়া থাকে। তবে এই নির্ব্বাচনে বাড়ীর লোকদিগের সম্মতিও গ্রহণ করিতে হয়।

রাজদণ্ড নিবন্ধন যে অর্থ বাড়ী হইতে মোক্তারগণ গ্রহণ করে, তাহা তাহারা রাজার নিকট পাঠাইয়া থাকে। রাজা নিজের ইচ্ছানুসারে ইহার কিয়দংশ মোক্তার-দিগকে প্রদান করে।

পুরোহিত—কুকিদিগের মধ্যে কোন্ জাতি পুরোহিত (পূজক) হইবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; যিনি পূজার কার্য্য শিক্ষা করেন তিনিই পূজা করিতে পারেন। বিশেষতঃ নিজের কর্ত্তব্য পূজা নিজে করিতে পারিলে তাহাতেও ক্ষতি নাই। অনেক বাড়ীতে মোক্তারের প্রতি পূজার ভার ন্যস্ত হয় এবং মোক্তারই পৌরোহিত্য ইত্যাদি করিয়া থাকে।

পর্ব্বদিন—কুকিদিগের কোন পর্ব্ব নাই। সুতরাং নৃত্য গীতাদিরও কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। বাড়ীর মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি বন্য জন্তু অর্থাৎ বরাহ, শশক, গবয়, গণ্ডার, মহিষ, হস্তী, হরিণ ইত্যাদি শিকার করিয়া আনে, তবে সে বাড়ী প্রবেশ করিবা মাত্রই বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকে। 'গুঙ্' 'রশেম' 'ঢোল' 'দারতেঙ্' 'দারি' প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে থাকে এবং সকলে একত্র সমবেত হইয়া মদ্য মাংস প্রভৃতি ভোজন করে। যুদ্ধ জয়ান্তে যোদ্ধ গৃহপ্রত্যাগত হইলেও ইহারা এইরূপ নৃত্যগীতাদি করিয়া মদ্য মাংস ভোজন করে।

আমোদ-প্রমোদ

ইহাদের আমোদ প্রমোদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। অবসর পাইলেই বিশেষতঃ ভোজ উপলক্ষে ইহারা নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। নৃত্য করিবার উপযোগী ইহাদের কোন স্বতন্ত্র পোষাক নাই। বাঙ্গালীগণের

সাক্ষাতে নৃত্য গীতাদি করিতে হইলে পোষাক সামান্যরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। গান করিবার সময় কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহারা তাহারও গুণগ্রাম গাইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত কুকিদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

বাদ্যযন্ত্র

৮খানি বাঁশ ও বেত সংযোগে ইহারা লাউ দিয়া এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে। ইহার নাম 'রশেম'। কুকিদিগের যত প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে তন্মধ্যে ইহার শব্দই অতি মধুর।

বড় কাঁসরের মত বাদ্যযন্ত্রকে ইহারা 'গঙ্', 'গুঙ্' বা 'দারখুণ্ডঙ্' বলে। এই যন্ত্র ইহাদের নিজের তৈয়ারী, কোন স্থান হইতে কিনিয়া আনে না। ইহার শব্দ ১½/২ মাইল পর্য্যন্ত যায়। 'দারতেঙ্' বাঙ্গালী কাঁসীর মত।

'দাররিকু'—গঙের মত কিন্তু আকারে ছোট।

যুদ্ধ-সামগ্রী

কুকিদিগের প্রায় সকলেরই বন্দুক আছে, কুকিদের অপর যুদ্ধাস্ত্র চেম, টাকুয়াল দা, চাকলা (চেম) তীর (কুই বাঁশ দ্বারা তৈয়ারী)। তীর একটী লোহার ফলক। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী অস্ত্র আছে, সেগুলির নাম—চিলাই (বন্দুক), আদাং আবই চেমতে, চেমতে লুজুম, হেই (কুড়াল), ছাইতিরকুওই (অঙ্কুশ) ইত্যাদি।

কুকিগণ সাহসী, পরিশ্রমী ও দৃঢ়লক্ষ্য। ইহারা এক প্রকার সর্ব্বভুক্। প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর মাংসই ইহাদের ভক্ষ্য, সরীসৃপ-জাতিও কুকিদিগের প্রিয় খাদ্য। ত্রিপুরা-রাজ্যের কুকিদের এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিবার প্রণালী আছে। একটী কুকুরকে মারিয়া তাহার উদর মধ্যে কিছু চাল প্রবেশ করাইয়া দিয়া সেই কুকুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করে, সেই দগ্ধ কুকুরের উদর-মধ্যস্থ অন্নই তাহারা পিষ্টক রূপে খাইয়া থাকে। কুকিগণ অতিশয় মদ্যপায়ী। পল্লীর স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়া ইহারা মদ্যপান করে। জুম কাটার পরে ইহারা প্রায় দুই মাসকাল মদ্যপানাদি করিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া থাকে।

সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বর্ণের তারতম্য ব্যতীত চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাও স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু 'ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ।' দেশ কাল পাত্র ভেদে রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। স্ত্রীলোকের কোমর মোটা অথচ প্রশস্ত ও কর্ণের ছিদ্র বড় হইলে কুকিরা তাহাকে সুন্দরী বলিয়া থাকে। যাহার কর্ণের ছিদ্র যত বড় সে তত সুন্দরী। এই কারণে বাঁশের চোঙ্গা দিয়া কুকি-রমণী কাণের ছিদ্র বড় করিয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বে কুকিরা গৃহমধ্যে স্ত্রী পুরুষ উলঙ্গাবস্থায় থাকিত, উলঙ্গ হইয়া স্নানাহার করিত। ইহাতে তাহাদের কোন রূপ নিন্দা বা লজ্জার কারণ নাই। রাজাও অনেক সময়ে গৃহাভ্যন্তরে নগ্নাবস্থায়ই থাকিত। অবসর মত অথবা কোন অন্য জাতীয় লোক গৃহে প্রবেশ করিলে স্ত্রী-

লোকেরা এক হাত প্রস্থ একখানা বস্ত্র পরিধান করিত। পুরুষেরা একটা মোটা চাদর গায়ে দিত। এই কারণে না জানাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে কুকিজাতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত।

মৃত্যু

কুকিদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা অমানুষিকভাবে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অশৌচ-গ্রহণের প্রথা ইহাদিগের মধ্যে নাই। কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির স্বর্গ-লাভার্থ ইহারা আত্মীয় স্বজন সহ মিলিত হইয়া সমস্ত লোক মদ্যপান ও মাংসাদি-ভোজন করে। মৃত দেহ ঘরে রাখিয়াই ভোজনব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতঃপর যেস্থানে মৃত-ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে তন্নিকটবর্ত্তী কোন এক-স্থানে একটী মাচা তৈয়ারী করিয়া রাখে এবং মৃত ব্যক্তি আহার করিবে এই বিশ্বাসে মাচার উপর মৃতদেহের নিকট মদ্য মাংসাদি নিত্যই রাখিয়া দেয়। কুকিরা মৃতদেহ ৫ দিন হইতে ৯০ দিন পর্য্যন্ত ঘরে রাখে এবং প্রত্যহ খাদ্য সামগ্রী দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যত অধিক দিন মৃতদেহ ঘরে রাখিয়া এইরূপে আহার্য্য দিতে পারিবে, কুকি সমাজে তাহার সম্মান তত অধিক। সামর্থ্যানুসারে লোকে অল্পদিন বা অধিক-দিন মৃতদেহ বাড়ীতে রাখিয়া থাকে। অবস্থানুসারে এইরূপে ঘরে রাখিবার পর তাহারা মৃতদেহ কবরে সমাহিত করিয়া থাকে। কবরের স্থান পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন এবং অত্যন্ত গভীর হওয়া আবশ্যক এক-জন পূর্ণাবয়ব মনুষ্য কবরের জন্য খনিত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে যাহাতে উপর হইতে দেখা না যায় এইরূপ গভীর করিয়া কবর খননের ব্যবস্থা ইহারা পছন্দ করে।

মৃতদেহ কবরস্থ করিবার পর মৃতের জন্য আর আহার্য্য প্রদানের নিয়ম নাই। ইহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি নাই। কবর দিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কোন মন্ত্রতন্ত্রেরও ইহারা ধার ধারে না। কোন পুণ্যবান্ বা পাপীর অপমৃত্যু হইলে উহারা তাহার ঊর্দ্ধগতির জন্য মাত্র পানভোজন করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অথবা অগ্নিদগ্ধ হইয়া কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরের যে অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ঘরে আনিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়ম বজায় রাখিয়া কবর দেয়। মৃত ব্যক্তিকে কবর দিবার আরও এক প্রকার প্রথা আছে। রাজা, উজীর, মোক্তার অথবা অন্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্সের ভিতর নগ্নাবস্থায় প্রবেশ করাইয়া ঘরের কোন স্থানে মাচা পাতিয়া তাহার উপর মাটীর বিছানা করিয়া সবিশেষ যত্নে অগ্নি জ্বালাইয়া বাক্সটী এমন ভাবে ঝুলাইয়া রাখে যে তাহাতে অগ্নিদ্বারা বাক্সটীও নষ্ট হয় না এবং মৃতশরীর হইতে দুর্গন্ধও বাহির হয় না। এইরূপে তিনমাস অর্থাৎ ৯০ দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে ভোজনাদি করিয়া শেষে মহা সমারোহের সহিত মৃত-

দেহটীকে কবরস্থ করে। মৃতদেহ ঘরে থাকিতেও ঐ ঘরে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্য হইতে কোন বাধা নাই।

মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় সামর্থ্যানুসারে তৎসঙ্গে বন্দুক, দা, ঝুলা, নূতন বস্ত্র, ভাত-তরকারী, মদ্য, মাংস প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের জিনিষ ও কতক-গুলি টাকা অথবা কয়েকটী পয়সা পর্য্যন্তও কবরের মধ্যে দিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলেও ঐরূপ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সূতা-কাটার চরকা, সর্ব্বদা ব্যবহারের জিনিষ, কাপড়, বেম, (অর্থাৎ গাঁইছা) মদ্য, মাংস ইত্যাদি সঙ্গে দিয়া কবর দিয়া থাকে। এই প্রথা মাত্র রাজা-দিগের জন্য। অপরে এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারিলেও তাহাদের কোন অপমান নাই। রাজা কিংবা অন্য অবস্থাপন্ন লোকের অর্থাভাব, লোকাভাব, স্থান পরিবর্ত্তন, প্রভৃতি কোন আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইলে মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ বাক্সে পুরিয়া মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়। তাহাতেও তাহাদের সম্মানের কোন-রূপ হ্রাস বা পাতিত্যের কারণ নাই।

মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থান

যত প্রকার পশু পক্ষীর কঙ্কাল রাখা যায় ততই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়। পূর্ব্বকালে কোনও কুকিরাজা বা সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে বিদেশীয় লোকগণ ভয়ে ঐ রাজা বা সর্দ্দারের সমাধির নিকটবর্ত্তী স্থানেও গমন করিত না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

রুষিয়ার কবিতা

ভোরের বেলা

(ফেৎ)

একটুকু উস্‌খুস্,
একটা কি ফিস্‌ফাস্,
কার মৃদু নিশ্বাস !
কার নিদ্ টুট্‌ল !

ভেদ্ করে' আব্‌লুস্
ঘুট্‌ঘুটে রাত্রির
শান-দেওয়া সাত তীর
নিঃসাড় ছুট্‌ল।

হিম-হাওয়া বিল্‌কুল্
দুল্‌ছিল নিউরে
উঠ্‌ল সে শিউরে
শিউলির স্পর্শে;

বোল্ বলে বুল্‌বুল্,
আর পাখী দ্যায় শিস্,
চন্‌মনে চৌদিশ
ভরপূর হর্ষে।

সঙ্গিনী রাত্রির
শুকতারা রিম্‌ঝিম্‌
জাগ্রত রক্তিম
দীপ্তির সঙ্গে

গুল্‌গুলাবের ছোপ
লাল মেঘে লাগল,
ধূপছায়া জাগ্‌ল—
বর্ণের বর্ষা,

মোর প্রেম-পাত্রীর
ছায় চুমা চক্ষে
চক্ষেরি পক্ষ্মে
সুপ্তির ভঙ্গে।

মোর মানিনীর কোপ
অশ্রুতে ভাস্‌ল
চুম্বনে ফাঁসল
দশ দিক ফর্সা।

তুষার-নদীর জাগরণ

(বোরিস্‌ পেট্রোভ্‌স্কি)

গাংচিলেরা নদীর প্রেমে পাগল,—
ঘোম্‌টা তুলে নদী ঈষৎ হাসে ;
ঘুম্‌সুষমায় গড়া নয়ন-যুগল—
তায় পাখীদের অমল বিম্ব ভাসে।
জড়োয়া-জরির জাজিম্‌ 'পরে নদী
গা'টি গড়ায়, সূর্য্যি জড়ায় তারে,
তাতিয়ে তোলে মাতিয়ে নিরবধি
চান্‌কে তোলে চুম্বনেরি হারে !
ফুটে উঠে চুম্‌কি এলোকেশে,
ওঠে নদী ঘুমের ঘোরে হেসে !
খুব হুঁশিয়ার ঘুম-ভাঙা সুন্দরী !
দেখো দেখো সাম্‌লে থেকো—
আগুন না যায় ধরি' !

সিন্ধু-শকুন নদীর প্রেমে পাগল
উল্লাসে ঘুর্‌পাক্‌ দে' লাগায় চমক,
বুক পেতে সয় সকল ঢেউয়ের ধকল
ফুকারে তার অকূল জলের গমক !
"জাগো নদী ! মেল আঁখির পাতা,
আমরা তোমার প্রাণের স্বপন-ছবি ;
আমরা তোমার মন্‌-কামনার গাথা,
জাগো ! জাগো ! ডাক্‌ছে তোমায় রবি,
পাখ্‌না তুমি পাবে গো যার বরে,
সেই রবি ওই দাঁড়িয়েছে শিয়রে !
পাখার ভরে সাগর-দরশনে
চল্‌বে তুমি প্রেমে-পাগল
গাংচিলেদের সনে।"

নিবেদন

(লার্মণ্টভ্‌)

তফাৎ হয়ে যাই যদি-বা তবু মনের মন্দিরে
দেবী তোমার ওই প্রতিমা থাক্‌বে জেনো থাকবে গো,
শূন্যদিনে সুখের স্মৃতি—হায় সে ভোলা যায় কি রে ?
এই পীরিতি হিয়ায় নিতি জাগ্‌বে সে যে জাগ্‌বে গো।

অন্য দিনে অন্য আঁখি করলে দাবী এই হিয়া
ভাব্‌ছ তুমি ভুল্‌তে এ প্রেম পার্‌ব ? প্রাণে সইবে সে ?
বিগ্রহ আর মণিকোঠায় তফাৎ যদিই হয় প্রিয়া,
দেবী দেবীই, মণিকোঠা—মণিকোঠাই রইবে সে।

তবু

(নেক্রাসভ্‌)

ব্যর্থ মোদের হবে অনেক আশা,
অনেক সাধে পড়বে যে ছাই, জানি,
মানুষ ধূর্ত্ত,—ফন্দী জানে খাসা,
ভাঙ্‌লে বেড়ী গড়্‌বে নূতন, মানি ;
এক্‌শো-রকম গড়িয়ে শিকল, ধীরে,
ফিকির ক'রে জড়িয়ে দেবে ফিরে।

তথাস্তু, ভাই, মান্‌ছি সবি, তবু
এ কথাটাও স্পষ্ট আমার কাছে,
খুব বেশী দিন সইবেনা তাও কভু,
ভাঙার শক্তি—তাও মানুষের আছে ;
গড়্‌লে বেড়ী ভাঙ্‌বে বারেবার
এ বিশ্বাসে বুক বাঁধা আমার।

এ বিশ্বাসে বেঁধে সেতারটিরে
ঊষার আলোয় ধরেছি আজ তুলে,
অব্যাহতির আব্‌-হাওয়াতে ফিরে
সকল শিকল পড়্‌ছে খুলে খুলে !
ধ্রুব আশায় হে চিত্ত আমার
নবীন ঊষায় কর নমস্কার।

আপ্ত

(পুশ্‌কিন্‌)

ক্লান্তি-কাতর শরীর নিয়ে কণ্ঠে নিয়ে তৃষা
হারিয়ে দিশা ঘুর্‌তেছিলাম গহন অন্ধকারে,
ঝল্‌মলিয়ে ছ'খান ডানা ভেদ ক'রে মোর নিশা
দূত এল গো স্বর্গ হ'তে সেজে কিরণ-হারে !—
বুলিয়ে দিল চোখের পাতায় মম
আঙুল্‌গুলি স্বপ্ন-সোহাগ সম।

সেই পরশে সুপর্ণ শ্যেন-পাখীর আঁখি হেন
দিব্য আঁখি ফুট্‌ল আমার—ফুট্‌ল আচম্বিতে,
সেই পরশে দিব্য-শ্রবণ পেলাম আমি, যেন
কর্ণ-কুহর উঠ্‌ল ভ'রে স্বর্গায়কের গীতে।
গগন-ভরা গোপন আনা-গোনা—
সাগর-চারীর সঞ্চারও যায় শোনা !

পাহাড়-তলীর ঝোপে-ঝাড়ে বাড়্‌ছে যে-সব শাখা
শুন্‌ছি তাদের বেড়ে-ওঠার ব্যস্ত কোলাহল,
ডিম্ব-মাঝে বাড়ছে ভ্রূণ যুক্ত দুটি পাখা—
শুন্‌ছি তাদের শিউরে-ওঠা—আনন্দে চঞ্চল !
হঠাৎ নুয়ে দূত সে স্বর্গচারী
চোখে আমার রাখ্‌ল দু'চোখ তারি !

ওষ্ঠাধরে নির্নিমেষে দৃষ্টি দিয়ে হেসে
হঠাৎ সে মোর পাপ-রসনা উপ্‌ড়ে নিল জোরে,—
উপ্‌ড়ে নিল মন্দ মায়িক মন থেকে নিঃশেষে
স্বর্গদূতের দু'হাত ব'য়ে রক্ত পড়ে ঝ'রে।
ছিন্ন এ মোর ঠোঁট শেষে ফাঁক ক'রে
তক্ষকেরি জিহ্বা দিল ভ'রে !

তলোয়ারে বুক ভেদ ক'রে হৃৎপিণ্ড নিল ছিঁড়ে,
তার বদলে বসিয়ে দিল জ্বলন্ত অঙ্গার ;
রইনু প'ড়ে মরুভূমে তপ্ত বালুর নীড়ে
মড়ার আকার স্পন্দহারা কেবল সংজ্ঞা-সার।
এম্‌নি—কতকাল গেল না জানি
শুন্‌তে শেষে পেলাম অলখ্‌ বাণী।

"আপ্ত ! ওঠো, দ্রষ্টা শোনো প্রাপ্তি-পরম্‌-ক্ষণে
আজ্‌কে হ'তে আমার ইচ্ছা জাগ্‌ল তোমার মাঝে !"
হর্ষে, ভয়ে, কী বিস্ময়ে শুনি স্তব্ধ মনে
কর্ণে আমার বিশ্ব-ধাতার বাণী গভীর বাজে
আজো শুনি—"মশাল আমার নিয়া—
যাও—দুনিয়ার জাগাও যত হিয়া !"

সাঁচ্চা সল্লা

(ক্রাইলফ্‌)

"নেক্‌ড়ে বাঘের অত্যাচারে
ছাগল ভেড়া বাঁচবে না রে,
দারোগারে জানাই গিয়ে চল্‌ !"
দাড়ি নেড়ে বল্‌লে রামছাগল।
তাই না শুনে তাড়াতাড়ি
ছাগলগুলো চল্‌ল ফাঁড়ি
সঙ্গে সঙ্গে তুড়্‌-তুড়া-তুড়্‌
চল্‌ল ভেড়ার দল।

থানায় গিয়ে ধন্না দিয়ে
বেলাস্ত সব রয় দাঁড়িয়ে,
হুজুর শেষে এলেন সন্ধ্যেবেলা ;
কর্‌লে তখন রামছাগল এত্তেলা।

সব শুনে কন্‌ রূঢ় স্বরে
"কি হবে ছাই ডাইরী ক'রে ?—
লেখালিখি—কাজ কি ফ্যাসাদ ?—
কাজ কি ফ্যাচাং মেলা ?

তার চেয়ে শোন্‌ যুক্তি আমার—
ভাব্‌না কি ভয় থাক্‌বে না আর—
বুঝ্‌লি ?—তোদের বোঝাব বল্‌ কত,—
মূর্খ মেড়া বোকা ছাগল যত,—
শোন্‌ তবে,—ফের নেক্‌ড়ে বাঘে
কর্‌লে জুলুম—ধর্‌বি তাকে—
টুঁটি টিপে আন্‌বি থানায়
ইঁদুর-ছানার মত।"

কালো শাল

(পুশ্‌কিন্‌)

হুঁশ হারিয়ে তাকিয়ে থাকি, আঁধারে চোখ ছায়,—
কালোরঙের শাল সহসা দেখ্‌লে কারো গায়!
শিঠিয়ে ওঠে শুক্‌নো হৃদয় রক্ত সে হয় হিম,
হুতাশ-হাওয়ায় আম্‌লে পড়ে দুনিয়াটা নিঃসীম!
জীবনটা নিঃসঙ্গ আমার—নেই প্রীতি স্নেহ,—
আমিও ভালোবেসেছিলাম,—মান্‌বে কি কেহ?
সারা প্রাণের আবেগ দিয়ে—বেসেছি ভালো
আধেক রাতে হঠাৎ আমার নিবেছে আলো।

* * * *

মনে পড়ে বয়েস-কালের সহজ সে বিশ্বাস,—
মনে পড়ে গ্রীক-তরুণীর ভালোবাসার ভাষ।
আমিও ভালোবেসেছিলাম—হৃদয় প্রাণ দিয়ে,
সুন্দরী সে ছিল আমার সকল নন্দিয়ে।
রইল না সে সোনার স্বপন, সইল না সে সুখ,
কাল্‌ ইহুদী বুড়ো আমার দমিয়ে দিল বুক।

* * * *

পাঁচ ইয়ারে জট্‌লা ক'রে কাট্‌ছিল বেলা,
কাল্‌ ইহুদী হঠাৎ দিলে দুয়ারে ঠেলা,
জনান্তিকে বল্লে ডেকে "খুব দেখি ফুর্ত্তি
(তোমার) গ্রীক-রূপসী খেল্‌ছে হোথা প্রেম নিয়ে সুর্ত্তি।"
ধম্‌কে তারে হাঁকিয়ে দিলাম—লাগল কি ধান্দা!
বেরিয়ে 'পলাম সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাসী বান্দা।
বেরিয়ে প'লাম তীরের বেগে আরব-ঘোড়াতে
মায়া দয়া তল গেল সব ঈর্ষা-সংঘাতে।

* * * *

গ্রীক-মেয়েটার চেনা বাড়ী চিন্‌তে কী দেরী!
মনের ঝড়ে হাত-পা বিকল, সব ধোঁয়া হেরি।
আব্‌জানো দ্বার—ফাঁক দে' দেখি—চোখের উপর ঠিক
অধরে তার অধর মিলায় আর্ম্মানী সৈনিক!

চোখে হঠাৎ দেখ্‌লাম আঁধার—তলোয়ারেতে হাত—
চোরাই-চুমু শেষ না হ'তে চোরের মুণ্ডপাত।
লাথি মেরে থেঁৎলে ছুঁড়ে মুণ্ড-কাটা ধড়
পড়্‌ল দৃষ্টি পাঙাস-পারা গ্রীক-মেয়েটার 'পর।
মনে পড়ে তার কাকুতি—তার সে আর্ত্তনাদ—
সকল অঙ্গ রক্তে ভাসে—বাঁচতে তবু সাধ!
কে হাতিয়ার রুক্‌বে হাতে? লুটিয়ে প'ল দেহ,
সঙ্গে ম'ল অপঘাতে আমার প্রাণের স্নেহ।

* * * *

চট্‌কা ভেঙে ঝট্‌কা দিয়ে মোর-দেওয়া সেই শাল
খুলে নিলাম ধড় থেকে তার—থেমে নিমেষ কাল—
শালে মুছে অস্ত্র চ'লে এলাম তুরন্ত,
বান্দা দিলে ভাসিয়ে দুটোয় স্রোতে দুরন্ত।
সেই থেকে আর মাতানো-চোখ মাতায় না মোরে,
সেই থেকে সব ফুর্ত্তি গেছে, মন গেছে ক্ষ'রে।
সেই অবধি দেখ্‌লে পরে কালো রঙের শাল
হুঁশ হারিয়ে তাকিয়ে থাকি, চোখে আঁধার জাল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাসকাবারি

কংগ্রেস

এবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় কংগ্রেসের বৈঠক হইয়াছিল, সুতরাং বাংলা দেশের সকল লোকেরই মন সেই প্রসঙ্গ লইয়া চঞ্চল হইয়া আছে।

যদিচ এটা সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সাধারণের সম্মিলন-সভা, তবু মনে হয় যে, গোটাকতক প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন উপলক্ষ্যে সভামণ্ডপে দাঁড়াইয়া পাঁচ দশ মিনিট কাল ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার দ্বারা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের পরস্পরের পরিচয় লাভ অথবা চিন্তার আদান প্রদানের বাস্তবিক কতটুকু সুযোগ থাকে? কংগ্রেস-মণ্ডপে চক্‌কাটা সতরঞ্চের মত বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বেহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের প্রাদেশিক সভ্যদের বসিবার স্থান ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীর দ্বারা চিহ্নিত—তাদের একত্র পাশাপাশি বসিবারও বন্দোবস্ত হওয়ার উপায় নাই। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে

বিস্তর কন্‌ফারেন্সও বসিল, কিন্তু সবগুলির ধরণ-ধারণ ঐ একই রকমের। সেইজন্যই বারম্বার এই কথাই মনে হইয়াছিল যে, বাংলাদেশে যে ভারতের এতগুলি লোক অতিথি হইয়া আসিল, তারা বাংলাদেশের হৃদয়ের কতটুকু পরিচয় লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল!

অবশ্য বলা হইবে যে, রাষ্ট্রীয় সভার চেহারা সব দেশেই এই রকম—কংগ্রেস নিখিল ভারতের রাষ্ট্র-সভা, এখানে বাংলার বিশেষ পরিচয়ের জন্য সমস্ত ভারত উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যারা বাস্তবিক সুখে-দুঃখে, সামাজিক সম্বন্ধে, আচারে বিচারে এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে, তাদের সভাসমিতির যে ধরণ আমাদের সভাসমিতিতেও কি সেই ধরণটাই চলিবে? বাঙালী বেহারীকে কতটুকু জানে—বেহারীই বা বাঙালীর যথার্থ পরিচয় কতটুকু পাইয়াছে? সব দেশেই রাষ্ট্রবন্ধনের গোড়ায় আছে মানস বন্ধন—মনের সঙ্গে মনের যোগ। বাঙালীর মনটা কি, তাহা আজ আমরা কতকটা জানি—কারণ সাহিত্য, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, নানা শুভ অনুষ্ঠানে, সে মন আপনার পরিচয় আপনি দিতেছে। কিন্তু নিখিল ভারতের মনটা কি, তার পরিচয় তেমন প্রত্যক্ষ ত হয় নাই, সে যে এখনো অস্পষ্ট কুয়াশার লোকে স্বপ্নচারী হইয়া আছে। তাকে বাস্তব করিতে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল প্রদেশের লোকেরই ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা দরকার এবং মধ্যে মধ্যে এই রকমের বড় বড় সঙ্গীতি, বড় বড় 'মেলা' হওয়া চাই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে যে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন যে, দেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে যদি আমাদের কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সাদির যোগ সাধন করা দরকার মনে করি, তবে ঐরূপ বিদেশী ধাঁচার সভার আয়োজন না করিয়া, স্বদেশী ধাঁচার মেলার আয়োজন করা চাই। কথাটা আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার। এইতো ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের 'কুম্ভমেলা' অচিরেই বসিতেছে—সেখানে যত জনসমাগম হয় এত কংগ্রেসে হয় না। বীরভূমে 'জয়দেবের মেলা' উপলক্ষ্যে যত লোক জমে, এত কোন বৈদেশিক সভা-সমিতিতে জমেনা। যদি সেইরূপ একটা কংগ্রেস-মেলা বসিত, কংগ্রেসের রথী-মহারথীদের বড় বড় তাঁবু সেখানে পড়িয়া যাইত, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসমূহকে প্রাদেশিক ভাষায় যাহা বলা দরকার তাহা বলা হইত, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প-প্রদর্শনী প্রভৃতি নানাপ্রকারের চিত্তবিনোদন ও লোকশিক্ষা দুয়েরি উপযোগী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইত, তবে তখন কেবল যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত গুণীজনের মিলন ঘনিষ্ঠতর হইত তা নয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মিলনও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইত।

ভারতবর্ষের যে সকল লোকেরা ইংরাজী জানে না, তারা কি ভাবে বড় বড় 'মেলা'র আয়োজন করে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সাধারণের সেটা দেখাও উচিত এবং সেই জিনিসটাকে নিজেদের কার্য্যোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করাও উচিত।

শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতা

কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়া শ্রীমতী বেসান্ত যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তার মত এমন সারালো ও ধারালো বক্তৃতা ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসে কখনও পড়া হইয়াছে কিনা জানি না—অন্ততঃ গত দুই তিন বছরের কংগ্রেসে হয় নাই এটা সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ড যখন বেল্‌জিয়মের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে নামিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষের আশা হইয়াছিল যে এযুদ্ধে সে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া লড়িবার সুযোগ পাইবে। ইংলণ্ড তার ধন চাহিল, কিন্তু সৈন্য গড়িল না। অথচ ১৮৫৯ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সবশুদ্ধ ৩৭টি যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সিপাহিরা প্রেরিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যয়ভার ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইয়াছে। ভারতের ভাগ্যে সৈন্য-বিভাগের এই ব্যয়ভার ক্রমশ বাড়িয়াছে বই কমে নাই—যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়ের অনুপাতে ভারতের ব্যয়ের অনুপাত কুড়িগুণেরও বেশি ছিল। এসম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস হইতে ক্রমাগত প্রতিবাদ হইয়াছে—ইহা দেখানো হইয়াছে যে, সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়াধিক্যের জন্য ভারতবর্ষে লোকশিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা যে পরিমাণে হওয়া উচিত তাহা হইতে পারিতেছে না,—তবু এ সকল প্রতিবাদে বিশেষ কোন ফলই হয় নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ভারতবর্ষ সৈন্যবিভাগে এত অর্থ জোগাইয়াছে, সেই ভারতবর্ষকেই অস্ত্র-আইন প্রভৃতি নিষেধক বিধিপ্রচারের দ্বারা নির্বীর্য্য করিবার জন্য বিধিমতেই চেষ্টা হইয়াছে। বাঙালী বা মাদ্রাজী পাঞ্জাবীর চেয়ে যে সৈনিক হিসাবে নিকৃষ্ট, একথা বলার এখন আর উপায় নাই;—কিন্তু এই বাঙালীকেই এতকাল ধরিয়া বীর্য্য প্রকাশের কিছুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

সভানেত্রী একটি কথা তাই জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন এই যে, "ভারতবর্ষে ও ইউরোপে একপ্রভুতন্ত্র (autocracy) ও আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) যে পর্য্যন্ত না সমূলে বিনষ্ট হইবে সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ হইবে না।"

তারপরে তিনি ভারতে নূতন প্রাণের আবির্ভাবের কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপ:—

(১) এসিয়ার জাগরণ।

(২) বৈদেশিক শাসন সম্বন্ধে এবং সাম্রাজ্যের নূতন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদেশে আলোচনা।

(৩) শ্বেতকায় জাতিদিগের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্ত্তন।

(৪) বণিকদিগের অভ্যুদয়।

(৫) নারীজাতির জাগরণ।

(৬) জনসমূহের জাগরণ।

এবং এই প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধেই তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী বেসান্ত লিখিয়াছেন যে, শ্বেত-কায় জাতিদিগের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ভারত-বর্ষীয় লোকদের ধারণার যে ক্রমশ বদল হইয়াছে, তার কারণ থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও আর্য্যসমাজ ভারতের লোকদের

নিজ সভ্যতার বিশিষ্টতা ও মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ করিয়াছে এবং পশ্চিমকে সকল বিষয়ে অন্ধভাবে অনুকরণ করিতেও নিবৃত্ত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও নাম করিয়াছেন। অথচ থিওসফিক্যাল সোসাইটি, আর্য্যসমাজ ও বিবেকানন্দ-মিশনের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে, রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এবং তার পরে আর্য্য সমাজ ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির সমসম কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি, ভারতের সভ্যতার বিশিষ্টতা ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে ভারতবাসীকে যেভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তার উল্লেখ থাকা নিতান্তই উচিত ছিল। আর কারও নাম উল্লেখ না করিলেও রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, কেননা তিনিই আমাদের স্বাজাত্য-বোধের জনক। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ বলি, সমাজ-সংস্কারের আদর্শ বলি, ভারতবর্ষের সভ্যতার আদর্শ বলি—সকল আদর্শেরই প্রেরণা তাঁহা হইতেই প্রসূত। বিশ্বসভ্যতার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় আসন তিনিই সকলের আগে নির্দ্দেশ করিয়া গেছেন। তারপরে যখন শ্রীমতী বেসান্ত স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিলেন, তখন তাঁর উচিত ছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র-নাথেরও নাম করা। কেননা বিবেকানন্দের চেয়ে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার ব্যাপারে ইঁহাদের কৃতিত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এসকল ত্রুটি সত্বেও শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতায় দেশ সম্বন্ধে জানিবার ও ভাবিবার বিস্তর কথা আছে।

অনুন্নত জাতিদের দুর্দ্দশা নিবারণের প্রস্তাব।

এবারকার কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিশেষভাবে আলোচিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় কংগ্রেস-কর্ত্তারা মনে করিয়া-ছিলেন যে, ইংরাজ প্রভুরা স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রধান অন্তরায়রূপে যে জিনিসটাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে এবারকার কংগ্রেসের নীরব থাকাটা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ভারতবর্ষে ৬ কোটি অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জাতি থাকিতে আমরা স্বায়ত্তশাসনের দাবী করি কোন্ হিসাবে—এই কথাই আমাদের প্রভুরা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দেন্। অবশ্য আমাদের সমাজে ভেদ বিভেদ যতই থাকুক না কেন, তবু যে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন দরকার এটা আমাদের জানানোই চাই। কেননা স্বাধীনতা না থাকিলে দায়িত্ব-বোধও জাগেনা এবং দায়িত্ব-বোধ ও কর্ত্তৃত্ব-বোধ না জাগিলে সামাজিক দুর্নীতি ও দুর্দ্দশা নিবারণের চেষ্টাও পূরাপূরি দেখা দেয় না, এটা একবারে স্বতঃসিদ্ধ কথা এবং পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসই এ কথার সাক্ষ্য দিবে। সে যাহাই হউক, স্বায়ত্তশাসন পাইলে তবেই আমরা সমাজের উন্নতি-সাধনে মনোযোগী হইব, একথা কোন কাজের কথাই নয়। বরং যাতে স্বায়ত্তশাসন যথার্থই নিজায়ত্ত হয় ও সুগম

হয়, সে জন্য অন্যান্য বিষয়েও সচেষ্ট হওয়া এখন হইতেই দরকার।

এবার কংগ্রেসে তাই একটু নূতন ধরণের প্রস্তাব ছিল এই যে, প্রয়োজন ও ন্যায়ধর্ম্ম সকল দিক্ হইতেই ভাবিয়া দেখিলে অনুন্নত জাতিদের দুর্দ্দশা মোচন করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাব যাঁরা উত্থাপন ও সমর্থন করিলেন তাঁরা সকলেই ভিন্ন প্রদেশীয় লোক—কোন বাঙালীকে এ প্রস্তাবের সমর্থক রূপে দেখিলাম না। যাঁরা বক্তৃতা করিলেন তাঁরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"-প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই ভাবের কথাই বলিলেন। একজন বলিলেন যে, আমরা রাষ্ট্রব্যাপারে 'ব্যুরোক্রেসি' বা আমলা শাসনতন্ত্র দূর করিতে চাই, অথচ সামাজিক ব্যাপারে সামাজিক আমলাতন্ত্রকে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা করি, ইহার মত অসঙ্গত কাণ্ড আর কিছুই হইতে পারে না। রাষ্ট্র-ব্যাপারে স্বাধীনতা লাভ পরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে যারা স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইতেছে না, তাহাদিগকে সেই সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া ত সম্পূর্ণরূপেই আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন থাকি কেন?

কিন্তু দেখিলাম এই যে, ইংরাজ সর-কারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামান্য কথাও যেমন উন্মাদনা ও উত্তেজনার সঞ্চার করে, এ বিষয়ে তাহা করিল না। অত বড় সভা হইতে কোন সাধুবাদ বা সম্মতিসূচক করতালি পড়িল না। সমাজ সম্বন্ধীয় কথাগুলো যে আমাদের মুখরোচক নয়, তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল।

সোস্যাল্ কন্‌ফারেন্সে ডাক্তার রায়ের অভিভাষণ

কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছর হইতে সামাজিক কন্‌ফারেন্স বসিতেছে। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে এ সভাতেও কতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়া থাকে। প্রস্তাবগুলি সভার দ্বারাই গৃহীত হয় বটে, তবে যাঁরা সমর্থন করিবার জন্য হাত তোলেন, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁদের যে আগ্রহ আছে তার কোন মানে নাই। সুতরাং সে হিসাবে দেখিতে গেলে এ ধরণের একটা কন্‌ফারেন্স খাড়া করার বিশেষ সার্থকতা নাই—তার চেয়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সমাজের উন্নতি বিধানে উদ্যোগী একটা দল দাঁড় করাইতে পারিলে ভাল হইত।

এ বৎসর ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি ছিলেন—তাঁর সভাপতির অভিভাষণ তাঁরই উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি তাঁর অভিভাষণের গোড়াতেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন এই যে, "যখন স্বরাজ বা হোমরুলের কথা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যখন ভারতীয় জনগণের সকল শ্রেণীর লোকেরাই রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে বড় বড় নক্সা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, এবং যখন সম্মিলিত ভারতের স্বপ্ন আমাদের কল্পনাকে সম্মোহিত করিয়াছে, তখন কেন আমাদের মধ্যে নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়

হইতে প্রতিবাদ ঘোষিত হইতেছে? এমন একটা বিষয়েও আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয় কেন?"

এ প্রশ্নের উত্তরও তিনি পরিষ্কার করিয়াই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—"আমরা জাতীয় সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে যতই ভাগ করিয়া স্বতন্ত্র করিতে যাই না কেন, তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া আছে; আমরা ইচ্ছামত তাদের এক অংশকে অন্য অংশের চেয়ে বড় করিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত সমাজ-সংস্কারকে আমরা যেমনি অবহেলা করিয়া আসিয়াছি, তেমনি এই সময়ে সেই অবহেলার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় রথের চাকা-গুলাকে সুদ্ধ তাহা অবরুদ্ধ করিতে বসিয়াছে।"

গত দুই মাসের 'ভারতী'তে 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' নামক প্রবন্ধের প্রসঙ্গে আমরা ত এই কথাটাই অন্যান্য পাঁচ কথার মধ্যে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইলেই যে সমাজের সব সমস্যার মীমাংসা আপনিই হইয়া যাইবে, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কেননা আমাদের সমাজে উচ্চ ও নীচ জাতিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান আছে, সে ব্যবধানজনিত সংস্কারের প্রতিক্রিয়াটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে বাধ্য। যেমন ইংরাজ ত আপন দেশে স্বাধীনতার মর্য্যাদা খুবই বোঝে; কিন্তু এদেশে আসিলেই তার সে বোধটা লোপ পায় কেন? তার কারণ কি এই নয় যে, ইংলণ্ডের ডিমোক্রাসির বা গণতন্ত্রের আব্‌হাওয়ায় বর্দ্ধিত ইংরাজের স্বাধীনতার সংস্কার এখানকার ব্যুরোক্রেসির বা আমলা-তন্ত্রের আব্‌হাওয়ায় পড়িয়া ক্রমশ একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া যায়? তখন এখানকার এই নূতন অর্জ্জিত সংস্কারটাই পূরোদস্তর চলিতে থাকে। ঠিক তেমনিতর, আমাদের সমাজে জাতিভেদের যে সংস্কারটা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা স্বরাজ বা হোমরুলের সঙ্গে কোন মতেই খাপ্ খায় না। সুতরাং সে সংস্কারটা দূর করিবার জন্য আমরা যদি সচেষ্ট না হই, তবে স্বরাজই পাই আর যাই পাই, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এ সংস্কারের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইতে বাধ্য।

অথচ এ সময়ে লোকের মন হোম-রুলের কল্পনায় এমনি মাতিয়া আছে যে, এ সকল কথা কাহারও রুচি-রোচন হইবে না জানি। বরং উল্টা দিকে এই বিপদের সম্ভাবনা আছে যে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ আমাদের স্বায়ত্ত শাসন লাভের বিরুদ্ধে এ সকল কথাকে নজির স্বরূপে ব্যবহার করিতে থাকিবে। এরি মধ্যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ ডাক্তার রায়ের বক্তৃতা হইতে এই ধরণের নজির উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু তাদের ঐটুকু মুখবন্ধের সুযোগ দেওয়া হইবে ভাবিয়া এ সম্বন্ধে দেশের লোকের মুখ বন্ধ করা উচিত নয়। কেননা সময় আসিয়াছে যখন সত্যকে নির্ভীক ভাবেই স্বীকার করা দরকার।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইতে গেলে সামাজিক স্বাধীনতাও চাই, এ কথা বলার দ্বারা

এমন বুঝায় না যে, তবে বুঝি যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক ব্যাপারে আমাদের সমস্ত ভেদ বিভেদ দূর হইয়া না যাইতেছে এবং সকলের অধিকার প্রশস্ততর না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইবার দাবী আমাদের নাই। আমরা বরং এই কথাই বলি যে, স্বাধীনতা এখানে চাই, ওখানে চাই না—বাইরে চাই, ঘরে চাই না,—এতটুকু চাই, অত দূর পর্য্যন্ত চাই না, অনেক পরে চাই, এখন চাই না—এভাবে স্বাধীনতা পাওয়ার কোন অর্থই নাই। কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে অনেক পরাধীনতার লজ্জা আছে অনেক রকমের বন্ধন আছে; সেইজন্য কি বাহিরে পথ চলিবার স্বাধীনতাও আমি দাবী করিব না? তখন কি প্রতি-পদেই আমাকে বাধা দিয়া বলা হইবে যে, আগে ঘরের বন্ধন মোচন কর, পরে পথে বাহির হইও। কিম্বা যে ব্যক্তি ঘরে এত বন্ধনে জর্জ্জর, সে পথে বাহির হইলে পদে পদেই হোঁচট্ খাইতে পারে, অতএব তার আর বাহির হইয়া কাজ নাই? বরং এই কথাই কি বলা উচিত নয় যে, উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রশস্ত রাজপথে নানা যাত্রীদলের সঙ্গে যে একবার জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সে আর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া খোপের পর খোপ পিঞ্জরের পর পিঞ্জর তৈরি করিতে উৎসাহিত হয় না—সে সব সঙ্কীর্ণতাকে একেদমে ঘুচাইয়া না দিয়া থাকিতে পারে না? স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ এই কথা যদি আজ বলিত, তবে সেই কথাই তার মুখে শোভা পাইত। অতএব রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের চাই, কেননা সেই স্বাধীনতার অভাবেই আমাদের সামাজিক জীবন ও অন্যান্য জীবন সংকুচিত ও নিরুদ্ধ হইয়া আছে; পক্ষান্তরে সামাজিক স্বাধী-নতাও আমাদের চাই, কেননা সেই স্বাধী-নতার অভাবেই আবার আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন ও অন্যান্য বৃহত্তর জীবন আমাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছেনা। তার মানে দুই দিক্‌কার স্বাধীনতাই পরস্পরের অপেক্ষী—একের আবির্ভাবে অন্যেরও আবির্ভাব, একের তিরোভাবে অন্যেরও প্রায় তিরোভাব ঘটিয়া পড়ে।

ডাক্তার রায়ের অভিভাষণে তিনি বাংলাদেশের জাতিভেদ্ প্রথা সম্বন্ধে ঐতি-হাসিক দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া তার অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশ সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, সেই সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল কিম্বা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল বলা যায়। তিনি রিজ্‌লী সাহেব ও রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যের বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। আশা করি যে তাঁর অভিভাষণ বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইবে; তখন সকলেই ইহা পড়িবার সুযোগ পাইবেন।

ডাক্তার রায় লিখিয়াছেন যে, আমরা যখন তখন জাপানের উদাহরণ দেখাইয়া বলি যে, দেখ দেখি, ঐশীয় কোন জাতির পক্ষে উন্নতি লাভ করা কি এমনই অসম্ভব?

কিন্তু সামাজিক উন্নতি সাধনে জাপান যাহা করিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। জাপানেও অস্পৃশ্য জাতি ছিল এবং সেখানেও সামুরাইগণ ব্রাহ্মণেরই মত সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সামুরাইগণ আপনা হইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া জাপান-বাসী সকলকেই সমান অধিকার দিয়া এক করিয়া লইলেন—জাপানের জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিলেন। অথচ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জাপানে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, আজ বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য।

ডাক্তার রায় বাঙালীর মস্তিষ্কের অপ-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকবার লিখিয়াছেন—এবারেও সে বিষয়ে তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েন নাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইউরোপে যে সময়ে গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানের সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপের নৈয়ায়িকেরা উত্তর পশ্চিম কোণে বিশেষ মুহূর্ত্তে কাক ডাকিয়া উঠিলে সেটা শুভ কি অশুভ এবং তার ফলাফল কি হইতে পারে, তাহারই নির্ণয়ে মহা ব্যস্ত—বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের এর চেয়ে আর কি দৃষ্টান্ত হইতে পারে?

অবশ্য ডাক্তার রায়ের অভিভাষণের সমালোচনায় বোধ করি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন সমস্ত কথাই অত্যন্ত সত্য ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই—তবু তিনি সমাজের সকল প্রথা ও রীতি নীতিকে কেবলমাত্র সংস্কার-কের চোখ দিয়াই দেখিয়াছেন। বিস্তর ঐতিহাসিক নজির সংগ্রহ করিলেও সামাজিক প্রথাগুলিকে যথার্থ ঐতিহাসিকের চোখে অথবা সমাজতত্ত্ব-বিদের চোখে তিনি দেখেন নাই। আমাদের দেশে জাতিভেদ-প্রথা কোন সত্য ভিত্তির উপরে যখন প্রতিষ্ঠিত নয়, তখন তাহা এই বর্ত্তমান আকারে টিঁকিবে না, এটা শীঘ্র হোক্ বিলম্বে হোক্ আমাদের দেশের লোককে বলিতেই হইবে। কিন্তু এ প্রথার উৎপত্তির সময়ে কোন্ আদর্শ ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা জানা উচিত। অর্থাৎ, সমাজ গঠনের আদর্শে গুণকর্ম্মবিভাগের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা সমাজের শীর্ষে ইউরোপীয় সমাজের ধনকুলীন চাই, না ত্যাগী ও জ্ঞানতপস্বী ব্রাহ্মণ চাই—এ একটা মস্ত প্রশ্ন। সুতরাং এ সকল আদর্শের কথা বাদ্ দিলে হিন্দুসমাজের কোন প্রথা কোন আচার সম্বন্ধেই সুবিচার করা হয় না। তার পর, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যে শিক্ষার অভাবে নানা রকমের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, এটা যেমন সত্য কথা, এটাও তেমনি সত্য যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সমাজের ভিতর দিয়া নানা স্বাভাবিক উপায়ে, ব্রত দান ধ্যান ক্রিয়াকর্ম্ম যাত্রা কথকতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে সকল অমূল্য শিক্ষা অর্জ্জন করে, যে ধী ও শ্রী লাভ করে, সহস্র কেতাবী শিক্ষায় সে সকল সম্পদের অধিকারিণী তারা হইতেই পারিত না। এই যে নৈসর্গিক 'কাল্‌চার', ইহাকে 'একচোখো' সংস্কার অগ্রাহ্য

করিলেও ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে; একথা অস্বীকার করিতে পারি না। এই পুরাতনের বনিয়াদের উপরেই নূতন বাড়ীর পত্তন হইবে—আমাদের সম্পদ্ যেখানে যাহা আছে তাকে আহরণ করিয়া তবেই তাকে কালের উপযোগী করিয়া গড়িয়া পিটিয়া লওয়া সম্ভব।

কিন্তু ডাক্তার রায় যে স্পষ্ট কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র। সমাজের তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টায় অনেক সময় তথ্যগুলা চাপা পড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে সেই তথ্যগুলাকেও উঁচু করিয়া ধরা দরকার। কেননা, তাহা হইলেই তত্ত্ব নিরূপণের বেলায় sophistry'র চেষ্টাটা ম্লান হইয়া পড়ে। তত্ত্বের সাক্ষাৎ-কার লাভের মধ্যে একজন তত্ত্ববিদ্ করিয়া থাকেন, তিনি ধন্য—কিন্তু তর্ক—কুতর্কের —sophistry'র অত্যাচার—বাকী আমরা যারা ভোগ করি তাদের উদ্ধারের জন্য তথ্য চাই, অত্যন্ত নীরস-কঠিন তথ্য চাই—আর কিছুই না।

ভারতবর্ষে এক ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব

ভারতবর্ষে এক ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব সম্বন্ধেও এবার কলিকাতায় এক কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি মহোদয় মনে করেন যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা কহিবার ভাষা ইংরাজী না হইয়া হিন্দী হওয়া উচিত। কেননা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই হিন্দী ভাষা বুঝিতে পারে, মুসলমান আমলেও এই ভাষাই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ইংরাজী ভাষাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরা আলাপ করেন বলিয়া জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের আর যোগ থাকিতেছে না। বাস্তবিক ইংরাজী কয়জন লোকে বোঝে? তা ছাড়া ইংরাজীতে ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া আমরা ক্রমশ বিজাতীয় হইয়া পড়িতেছি, আমাদের মন অলক্ষ্যে ইংরাজী সভ্যতার দ্বারা অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সকল কারণে গান্ধি মনে করেন যে হিন্দীভাষা শিখিয়া ঐ ভাষাতেই ভারতের সকল প্রদেশের লোকদিগের পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলা উচিত।

হিন্দী ভাষা উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকেই বোঝে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তেলেগু-তামিল-কানাড়ী-ভাষী দক্ষিণ ভারতের লোকেরা এ ভাষা বোঝে না। বাঙালী ও ওড়িয়ারাও যে হিন্দী বোঝে তা বলা যায় না—হিন্দীর সঙ্গে বাংলার কতক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সহজ দুটো চারটে হিন্দী কথা বাঙালী বুঝিতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষটাকে গোটা ধরিলে এমন কোন ভাষাই নাই যাহা সমস্ত ভারতের লোকদের অধিগম্য বলা যায়।

ইংরাজী ভাষা যে আমরা শিখি, তাহা কেবল ইংরাজ আমাদের রাজা—অতএব ঐ ভাষা রাজভাষা—বলিয়া নয়। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদের মন বিশ্বমানব-মনের রাজ্যে প্রবেশ করিবার পরওয়ানা

পাইয়াছে। সুতরাং মনের ক্রিয়াটাকে যদি সচল রাখা আমাদের অভিপ্রায় হয়, 'কাল্‌চার' জিনিষটার প্রতি যদি আমাদের মনের অনুরাগ থাকে, তবে ইংরাজী না শিখিলে আর কোন ভাষা শিক্ষার দ্বারাই আমাদের মনের ধর্ম্ম পুরোপুরি বজায় থাকিবে না। কেননা, বিশ্বের জ্ঞানকে ইংরাজী ভাষা নিজের ভাণ্ডারের মধ্যে মজুত করিয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই আমরা কথাবার্ত্তায় ইংরাজী এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিতে বাধ্য হই—কেননা ইংরাজী ভাষার ধাত্রী-স্তন্যে আমাদের মন যে পুষ্ট। বাংলা ভাষা যে এই কয় বছরের মধ্যে এমন অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, বাংলা সাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যে আসন পাইয়াছে, তারও কারণ এই যে, ইংরাজীর ভাব-সম্পদ্‌কে বাংলাভাষাই সব চেয়ে বেশি আহরণ ও আত্মসাৎ করিয়াছে। এই আধুনিক বাংলাভাষাকে ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে 'ফেরঙ্গ'-ভাষা ও 'ফেরঙ্গ'-সাহিত্য বলিয়া যিনি যতই বিদ্রূপ করুন্, গঙ্গাকে যেমন গঙ্গোত্রীতে হটাইয়া লইয়া যাওয়া যায় না, তেম্‌নি এ ভাষা ও সাহিত্যের গতিকে এখন বাংলার মধ্যযুগে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। এই ভাষা পুরোহিত হইয়া বিশ্ব-মনের সঙ্গে বাঙালীর মনের যে পরিণয় সাধন করিয়াছে, তাকে অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সেইজন্য স্বভাবের নিয়মে আপনিই ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলি ও সাহিত্য-গুলি ইংরাজীর ভাবৈশ্বর্য্যে সম্পৎশালী হইয়া উঠিতেছে, অথচ তাদের নিজেদের বিশেষত্বও বিলুপ্ত হইতেছে না। কেননা দেখিতে পাই যে, ইংরাজীর ভাবকে তারা আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে, নিজেদের দেশীয় সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইতেছে। সেইজন্য আধুনিক বাংলাসাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এ কথাও যেমন সত্য, তাহা ইংরাজী সাহিত্য হইতে বিশিষ্ট ইহাও তেমনি সত্য। এই যে দেওয়া-নেওয়া, ইহাইত স্বাভাবিক। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার মধ্যে এই আদান-প্রদানের সম্বন্ধটা সজীব না হইলে, তারা-ত প্রত্যেকেই পরস্পর হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষের সভ্যতার যদি কোন বিশিষ্টত থাকে তবে তাহা এই যে, নানা জাতি নানা ধর্ম্ম রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানকে ভারতবর্ষ আত্মসাৎ করিয়া এক বিরাট সমন্বয়-সূত্রে বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছে। আর কোন সভ্যতাই এত বিচিত্রতাকে হজম করিতে পারে নাই। সেইজন্য ভারত-বর্ষের স্বাজাত্যের পরিকল্পনায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার স্থান আছে, তেমনি ইংরাজজাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতারও স্থান আছে। "পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা"—এইটেই ভারতের বিশেষ গৌরবের কথা।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলির সাহিত্যের সঙ্গে যেমন ইংরাজীর এক জৈব সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেছে, তেম্‌নি ভারতবর্ষে যদি কোন ভাষার সার্ব্বজাতিক ভাষা হইবার অধিকার থাকে, তবে সে অধিকার ইংরাজীরই আছে। কেননা এই ভাষার আশ্রয়ে আমরা যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরাই পরস্পরের ভাবের ও চিন্তার বিনিময় করিতে পারি তাহা নয়, আমরা এই ভাষার সূত্রে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বকে সামনে রাখিলে আমাদের বাণীর মধ্যে যে মহৎ উদারতা যে সার্ব্বভৌমিক সত্য, যে উজ্জ্বল আনন্দ দীপ্যমান হইয়া উঠে, শুধু ভারত-বর্ষকে সাম্‌নে রাখিলে তাহা হয় না। তখন অলক্ষিতে আমাদের চিন্তার মধ্যে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করে। এযুগে জগতের কাছে ভারতের বাণী যাঁরা বহন করিয়া লইয়া গেছেন, সেই রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—কোন্ ভাষায় সেই বাণীকে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন? ইংরাজী ভাষায় নহে কি?

অন্যের জীবন যথেষ্টপরিমাণে আত্মসাৎ করিলে কোন সভ্যতারই নিজের বৈশিষ্ট্য কোনকালেই নষ্ট হয় না, নিজের অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় না। রামমোহন রায়ই সকলের আগে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, অথচ তাঁর মত ভারতের অতীত গৌরব, ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য আর কেহই আমাদের জন্য উদ্ধার করিয়া যান্ নাই। ভারতবর্ষের জাতি-বৈচিত্র্যে ইংরাজও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে—ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ের মধ্যে ইংরাজেরও স্থান আছে—এই কথাটি যদি স্বীকার করি তবে ইংরাজীভাষাকে বাদ দিয়া মানসিক জড়ত্বলাভের জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

নব-হিন্দুদের সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

(ফরাসী হইতে)

যাহারা নব্যভারত গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহারা একদিন ভারতের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে তাহারা ঠিক্ সেই সব লোক যাহারা উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী, অসন্তুষ্ট, তাহাদিগকে অনেকে মনে করে—"হঠাৎ নবাব" ও স্বশ্রেণী-বহির্ভূত।

ইংরেজের সহিত ইহাদের কিরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, পৃথক্‌রূপে উভয়ের মনোভাব পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ ভারতবাসীর মনোভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, যাহা-কিছু ইংরেজী তাহাই ভাল এইরূপ মনে কর

নব-হিন্দুদের একটা বাতিকের মধ্যে ছিল :— ইংরেজী পোষাক পরা, ইংরেজী ধরণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, ইংরেজী ভাষায় কথা কওয়া, ইংরেজী ভাষায় লেখা। উহাদের সংখ্যা খুবই কম এবং উহারা নিতান্ত সামান্য শ্রেণীর লোক। পক্ষান্তরে কোম্পানীর শাসন আমলের ভিত্তি তেমন সুনিশ্চিত ছিল না; আমীর-ওমরা ও ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে যুঝিবার জন্য কোম্পানী, ইংরেজীভূত ভারতবাসীদিগের উপর নির্ভর করিল; তাহার পর, উদার মতামতের একটা "ফ্যাশান্" আসিয়া পড়িল, তখন উহারা ভারতকে সভ্য করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক হইল; এই সমস্ত কারণ, ইংরেজ ও নব-হিন্দুর মধ্যে সম্বন্ধটাকে সহজ করিয়া তুলিল।

কিন্তু ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহে ইরেজদের বিশ্বাস নষ্ট হইল; দিল্লী ও কানপুরের দারুণ কাণ্ডে উহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিল; ভয়াকুল হইয়া, উহারা বিদ্রোহী ও রাজভক্ত প্রজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিতে চাহিল না। উহাদের সংবাদপত্রাদি, সে সময়ের সমস্ত অত্যাচার ভারতবাসীদের স্কন্ধে চাপাইল, স্বকীয় সমাজ হইতে উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার পর বিজয়ের উন্মত্ততা। কোম্পানীর আমল হইতেই ইংরেজরা বিপদের আশঙ্কা করিত; ইংলণ্ডাধিপতি রাজার শাসন-আমলে উহারা বেশ অনুভব করিল, ভারতবাসী নিষ্পেষিত হইয়াছে, চিরকালের মতো নিষ্পেষিত হইয়াছে।

তথাপি শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মের ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। প্রতিবৎসর ইংরেজি-ধরণে শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; সরকারের অধীনে নিম্নপদ সকল অধিকার করিয়া উহারা আপনাদের শক্তিসামর্থ্য অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। দরিদ্র, বিলাতী বিলাস-সামগ্রীর দ্বারা উত্তেজিত, শিক্ষা-প্রসূত নূতন নূতন অভাবের তাড়নায় বিচলিত,—ইহারা যে সকল বেতনের পদ ইংরেজের জন্য রক্ষিত ছিল, সেই সকল বেতনের পদ পাইবার জন্য দাবী করিতে লাগিল। যে দেশে ত্রিশকোটি অধিবাসীর মধ্যে কেবল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের ৮০০ ফ্র্যাঙ্ক (ফ্র্যাঙ্ক= ৷৷০ আনা—এখন আরও বেশী) মাত্র বার্ষিক আয় সেই দেশে ২০, ৪০, ১০০,০০০ বেতনের পদ আছে।

সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার উদ্দেশে যে সমস্ত যুবকবৃন্দ সরকারী স্কুলে শিক্ষিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল না; যাহারা কাজে নিযুক্ত হইল তাহাদের মধ্যে অনেকে, একঘেয়ে জীবন-যাত্রা-পদ্ধতিতে ও স্বল্পবেতনে বিরক্ত হইয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিল। উক্ত উভয়দলই সাহিত্যের দিকে মুখ ফিরাইল, কিংবা সংবাদপত্র-সম্পাদক, সভা-সমিতি-পরিচালক, ও পুস্তিকা-প্রচারক হইয়া দাঁড়াইল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক খুব খ্যাতি লাভ করিল। অধিকাংশ লেখক বিফল-মনোরথ হইল; অনেক স্থলে নিয়তর বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া, আত্মীয়দের সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ভারত-বাসীগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, ইংরেজদের

কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া এই সকল শিক্ষাহীন, দুর্দ্দশাপন্ন, টোকো মেজাজের লোক, রাষ্ট্রনৈতিক ঝাদানুবাদের মধ্যে প্রচণ্ড উগ্রতা, কটু-কাটব্য, স্থূলরুচিতা, অন্যায্যতা আনিয়া ফেলিল, অন্তরে অপরিসীম বিদ্বেষ পোষণ করিয়া উহারা জনসাধারণকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে উহাদের এই প্রচণ্ড উগ্রতা, অকপটতার প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইল। অনেক সময়ে উহারা সেইসব সমাজ-সংস্কারককে আপনাদের দলে টানিয়া আনিল যাহারা স্বকীয় চরিত্র ও ক্ষমতার গুণে, আত্মরক্ষণে অসমর্থ নিতান্ত অজ্ঞ জনসাধারণের প্রকৃত রক্ষক হইবার উপযুক্ত।

* *
*

প্রথমে ভারতবাসীদের দোষ, তাহার পর ইংরেজের দোষ।

স্বকীয় গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশে, শ্রীযুক্ত প্রমথ বসু উহা সঙ্ক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"ভারতে, ইংরেজরা বাস করে না। ভারতকে উহারা এমন-একটি দেশ মনে করে যেখানে, কি বণিক, কি কারখানা-ওয়ালা, কি সরকারী কর্ম্মচারী সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য—অর্থোপার্জ্জন করা। বিশেষত আজিকার দিনে বাষ্পপোতের চলাচলের উন্নতি হওয়ায় এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে; কেননা, তিনমাসের ছুটিতেও তাহারা এক-দৌড়ে বাড়ী যাইতে পারে। তাছাড়া, তাহাদের মধ্যে অল্প লোকই হিন্দুজাতিকে সভ্যজাতির মধ্যে গণ্য করে, এবং ভারত-বাসীর সহিত সমানভাবে মেশামেশি করিবে বলিয়া তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না।"
(Hindu Civilization I. p. 4 XII.)

এই দোষারোপগুলি বিচার করিয়া দেখা যাক্। ইহা নিশ্চিত, ইংরেজ আগন্তুকের মধ্যে অধিকাংশ লোকই টাকা করিবার জন্যই কিংবা শুধু জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই ভারতে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, ভারতের কিংবা ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টে তাহাদের কোন 'গা' নাই। ইহাও নিশ্চিত, এই দোষটা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেকালে, উহারা বিশ ত্রিশ বৎসর ভারতেই থাকিত, দেশে ফিরিয়া যাইত না। এবং যেহেতু বড় বড় নগরে খুব অল্পসংখ্যক ইংরেজ বাস করিত, কাজেই তাহারা দেশীয় লোকের সহিত মেশামেশি করিতে বাধ্য হইত। আজিকার দিনে, বণিক ও রাজকর্ম্মচারীদিগের মনে সর্ব্বদাই ইংলণ্ডই জাগিতেছে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতি বৎসরেই, অনেকে তিন বৎসর কিংবা চারি বৎসরান্তে ইংলণ্ডে যাত্রা করে। শীতকালে পর্য্যটক ও রাজনৈতিকদিগের আমদানী হয়। সমস্ত বড় বড় নগরে ইংরেজরা আপনাদের মধ্যেই অবস্থিতি করে। ইংরেজের এক পৃথক্ অঞ্চলই আছে—Cantonment। ইংরেজের ক্লব্, ইংরেজের দোকান, ইংরেজের সংবাদপত্র, ইংরেজী কথাবার্ত্তা, ইংরেজদের একটা বিশেষ মতা-মত,—দেশীয় মতামতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। খ্যাতনামা হিন্দুদের গৃহে যাতায়াত করা, কুশিক্ষার নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজকর্ম্মচারীরা এই উভয় দলের মধ্যে মধ্যস্থত

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অবধি কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান ক্লব্ কোন রাজ-কর্ম্মচারীকে কখন গ্রহণ করে নাই। আজি-কার দিনে, যাহারা ত্রিশকোটি ভারতবাসীর শাসনকর্ত্তা হইবেন, সেই সব যুবকের মধ্যে অনেকে ভারতকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় ও ভারতবাসীর দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসে।

এই দুই জাতির মধ্যে বৈরতার আর এক কারণ:—হিন্দুদের অভ্যুন্নতি। এখন সর্ব্বত্রই চোখের সাম্‌নে দেখিতে পাওয়া যায়:—ভারতবাসীরা পরীক্ষা দিতেছে, সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেছে, কারখানা, ব্যাঙ্ক ও সওদাগরের কুঠী স্থাপন করিতেছে। যে সকল উদার-চিত্ত পুরাতন "অ্যাঙ্গো-ইণ্ডিয়ান," দেশীয় লোকদিগের মুরুব্বি হইতে ভালবাসেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন আছেন যাঁহারা, তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব আশ্রিত জনেরা তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের কাজের বিচার-আলোচনা করিলে, অথবা জজের আসনে বসিয়া কিংবা রাজ-কর্ম্মচারীর উচ্চপদে অবস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগের প্রতি হুকুমজারী করিলে বরদাস্ত করিতে পারেন? যে আইনের দ্বারা ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট য়ুরোপীয়কে গ্রেপ্তার কিংবা বিচার করিবার অধিকার পাইয়াছিল, সেই আইন ভারতীয় ইংরেজদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। এই আইনের প্রবর্ত্তক লর্ড রিপন, ইংরেজদের চক্ষুশূল হইলেন। কিন্তু লর্ড রিপনের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, কলিকাতা, এলাহাবাদ ও বোম্বায়ের যাত্রাপথে শতসহস্র হিন্দু উচ্চকণ্ঠে যেরূপ অভিবাদন করিয়াছিল ভারতে কোন নৃপতি সেরূপ অভিবাদন প্রজাবৃন্দ হইতে কখনো প্রাপ্ত হয় নাই। (১)

ভারতীয় ইংরেজ-মণ্ডলী অনেক সময়ে খুব তীব্রকটু অথচ ভদ্রোচিত ভাষায় স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে; তবু কখন কখন বিদ্বেষবশতঃ দেশীয়দিগের প্রতি অবমাননাও করিয়া বসে। এই প্রবন্ধে তাহা অনেক বার উদ্ধৃত হইয়াছে।

"Dept fordএর ৪০০ নির্ব্বাচক, কোন নব-সৃষ্ট এলাকার উদারনৈতিক উমেদার রূপে লালমোহন ঘোষকে বরণ করিতে ইচ্ছা করায়, তিনি তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই ৪০০ ক্রোধান্ধ নগণ্য লোক পাগ্‌লা-গারদের বাসিন্দা হইবার উপযুক্ত, আমাদের দেশের ভাগ্য তত্ত্বাবধান করা তাহাদের কর্ম্ম নহে। যদি একজন বাঙ্গালী বাবু পার্লেমেণ্টে প্রবেশ লাভ করে, তাহা হইলে পরিণামে "আর্য্যদিগের" ইহা একটা আকাঙ্ক্ষিত স্থান হইয়া উঠিবে। ইংরেজ জনসাধারণ এই ধৃষ্ট নূতনতার পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া কোথায় গিয়া থামিবে? একটা বনমানুষকে কাপড় পরাইয়া খাড়া করিয়া দাও, দেখিবে,

(১) একথা সত্য, (১৮৮৩) Ilbert Bill সংশোধিত হইয়াছিল: ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইংরেজ জুরী ভিন্ন ইংরেজের বিচার হইতে পারে না। কেবল প্রথম শ্রেণীর দেশীয় মেজিষ্ট্রেট্ ইংরেজকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, কেবল প্রথম শ্রেণীর দেশীয় জজই ইংরেজের বিচার করিতে পারে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল চলিতে পারে। হাইকোর্টে ইংরেজ-জজের সংখ্যাই অধিক।

কোন কৌন্সিলের এলাকায় তাহার নির্ব্বাচনের অনেক সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া এই ঘোষবাবু অপেক্ষা বনমানুষ ঢের বুদ্ধিমান। এই ঘোষবাবু ঢাকায় যে সব মনোভাব প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহার ডাক-নাম হইয়াছিল Pole-cat। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই ৪০০ নির্ব্বাচককে লইয়াই একটা নির্ব্বাচনের এলাকা নহে, শেষমুহূর্ত্তে যখন ইংরেজের দেশানুরাগ জাগিয়া উঠিবে, তখন ঘোষবাবু তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তখন রাস্তার মুটেমজুর রাগান্ধ হইয়া তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য তাঁহার বিলক্ষণ নাকাল করিবে। যে-সব ইতর বাঙ্গালী ইংরেজ-মহিলার পাণি গ্রহণ করিতে সাহসী হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা ন্যায়বিচার করিব, কিন্তু যে ইংরেজ-মহিলা একজন এ দেশী লোককে বিবাহ করিয়াছে তাহাকে বারাঙ্গনার ন্যায় প্রকাশ্যভাবে ধিক্কার করা উচিত,—সে রমণীর লজ্জা-শরম নাই; সে স্ত্রীজাতির কলঙ্ক, সে ইংরেজ-কুলের কুলাঙ্গার।" (Bengal Times. June, 1885)।

এই দুই জাতির মধ্যে, সামাজিক-সম্বন্ধে বিদ্বেষ ভাব কতদূর যাইতে পারে তা তো দেখাই যাইতেছে। এ রোগের কি ঔষধ নাই? কতকগুলি ইংরেজ বা ভারতবাসী সেরূপ মনে করেন না। M. Cotton, Sir William Hunter, M. Digby, Sir William Wedderburn—ইঁহাদের প্রণীত উদার ভাবের গ্রন্থাদি হইতে এবং Bright ও Gladstone প্রভৃতির বক্তৃতা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, এমন কতকগুলি ইংরেজ আছেন যাঁহারা ভারতবাসীদিগের মানসিক ও নৈতিক মূল্য বুঝিতে সমর্থ; পক্ষান্তরে মালাবারী, M. Ghose, M. Dutt প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, ইংলণ্ড ও ইংরেজ ভারতের জন্য যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকেই ইংলণ্ড ও ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভাগী

(আন্তন্ শেখভের গল্প হইতে)

বাসাবাড়ীর একটি ঘরে বসিয়া ষ্টিফেন ক্লস্‌কোভ্ 'অ্যানাটমি'র পড়া মুখস্থ করিতে-ছিল।

জানলার ধারে একটি যুবতী—দেখিতে রোগা, বয়স বছর পঁচিশ, নাম অনীতা। হেঁটভাবে বসিয়া সে একটি পিরাণের গলা সেলাই করিতেছিল। ক্লস্‌কোভ্ ডাক্তারী পড়ে, অনীতা তাহারই সঙ্গে থাকে।

সকাল হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, কিন্তু এখনো ঘর-দুয়ার গুছাইয়া পরিষ্কার করা হয় নাই। বিছানাটা লণ্ডভণ্ড—তাহার উপরে বালিশ, কাপড়-জামা, বই প্রভৃতি

হরেক-রকম জিনিষ এলমেলো ভাবে ছড়ানো রহিয়াছে।

ক্লস্‌কোভ্‌ নরদেহের পার্শ্বাস্থি সম্বন্ধে পাঠ মুখস্থ করিতেছিল। পড়িতে পড়িতে বই হইতে মুখ তুলিয়া সে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইল। তারপর আপন মনে বলিল, —"পাঁজ্‌রার এই হাড়গুলো হচ্চে পিয়ানোর চাবির মত। এগুলো ভাল করে বুঝতে হলে হয় মড়ার কঙ্কাল নয় জীবন্ত মানুষের দেহ নিয়ে পরীক্ষা করা দরকার —নৈলে সব গুলিয়ে যেতে পারে।...হুঁ, অনীতা—এদিকে এস ত!"

অনীতা সেলাই রাখিয়া উঠিয়া আসিল। ক্লস্‌কোভ্‌ তাহার সামনে বসিয়া তার পাঁজ্‌রার হাড়গুলো হাত দিয়া একে একে গুণিতে লাগিল।

"—তাইত, প্রথম হাড়খানা হাতে ঠেকে না কেন!—এই যে, এখানা নিশ্চয় দ্বিতীয় হাড়! হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তৃতীয়, আর এটা চতুর্থ! ঠিক! অনীতা, তুমি অমন শিউরে শিউরে উঠছ কেন?"

—"উঃ! তোমার আঙুলগুলো ভারি কন্‌কনে যে!"

—"তাতে হয়েছে কি, এতে ত আর তুমি মরে যাবে না! এস—হ্যাঁ, এই হচ্ছে তৃতীয় হাড়, এই হচ্ছে চতুর্থ! ... ...অনীতা, তুমি এত রোগা, তবুও তোমার গায়ের হাড়গুলো ভাল করে হাতে ঠেকছে না! এটা দ্বিতীয়—এটা তৃতীয় ... ...আরে ছ্যাৎ, সব যে ঘুলিয়ে যাচ্ছে! অনীতা, আমার পেন্সিলটা নিয়ে এস ত!"

ক্লস্‌কোভ্‌ পেন্সিল দিয়া অনীতার আদুড় বুকের উপরে সারি সারি কতকগুলো সরল রেখা টানিল।

"এতক্ষণে ঠিক হোল। এইবার আমি তোমাকে সহজেই পরীক্ষা করতে পারব! উঠে দাঁড়াও!"

অনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল—ক্লস্‌কোভ্‌ একমনে তাহার পাঁজ্‌রার হাড়গুলো পরখ করিতে লাগিল। এদিকে বেচারী অনীতার নাক, ঠোঁট ও হাতের আঙুলগুলো হাড়-ভাঙ্গা শীতে ক্রমেই যে শীঠাইয়া নীল হইয়া উঠিতেছে—পরীক্ষায় তন্ময় ক্লস্‌কোভ্‌ তাহা মোটেই খেয়ালে আনিল না। অনীতাও ভয়ে কিছু বলিতে ভরসা করিল না—বাধা দিলে পাছে তাহার পড়াশুনার কোন ক্ষতি হয়!

ক্লস্‌কোভ্‌ বলিল—"এতক্ষণে সব মোছা গেল। অনীতা, তুমি চুপচাপ বসে থাকো —দেখো, পেন্সিলের দাগ যেন উঠে না যায়! ততক্ষণে আমি পড়াটা আরেকটু এগিয়ে নি!"

ক্লস্‌কোভ্‌ আবার পাইচারি করিতে করিতে বই পড়িতে লাগিল।

অনীতা শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বুকময় পেন্সিলের লাইন—ঠিক যেন উল্কির দাগ! স্বভাবতই সে মৌনবতী—এখনো সে কোন কথা কহিল না, বসিয়া-বসিয়া আপন মনে কি যে ভাবিতে লাগিল, তা সেই জানে!

আজ ছ-সাত বছর সে এমনি করিয়া নানান ছাত্রের সঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে। সে-সব ছাত্র এখন পড়াশুনো সাঙ্গ করিয়া যে যার নিজের ধান্দায় চলিয়া গিয়াছে।

অভাগিনী অনীতার কথা এখন ভুলিয়াও কেহ ভাবে না বোধ হয়। তারা যে এখন নামজাদা লোক—কেহ ডাক্তার, কেহ চিত্রকর, কেহ প্রফেসর!... ...ক্লস্‌কোভ্‌ও একদিন তাহাকে একলা ফেলিয়া আর-সকলেরই মত চলিয়া যাইবে! কালে সেও হয়ত একজন মস্ত বড়লোক হইবে।

কিন্তু, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ জানে —বর্ত্তমানে ক্লস্‌কোভের ত দুর্দ্দশার সীমা নাই! পয়সার অভাবে এখন তাহার চা ও চুরুট পর্য্যন্ত জোটেনা। অনীতা সেলাইয়ের কাজ করিয়া যদি কিছু পয়সা আনিতে পারে, তবেই ক্লস্‌কোভের তামাক ও চা কিনিবার উপায় হইবে।

বাহির হইতে কে ডাকিল—"ওহে, আমি ভিতরে যেতে পারি কি?"

অনীতা তাড়াতাড়ি একখানি পশ্‌মী শাল টানিয়া আপনার খোলা বুকের উপর মেলিয়া দিল। ফেটিসভ্‌ ঘরের ভিতরে আসিল। সে চিত্রকর।

তার মাথার লম্বালম্বা চুল মুখ অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহারই মধ্য হইতে বন্য জন্তুর মত চাহিয়া ফেটিসভ্‌ বলিল, "ওহে, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। তোমার অনীতাকে একবার ঘণ্টা-খানের জন্যে ছেড়ে দিতে পারবে? আমি একখানা ছবি আঁকছি—কিন্তু 'মডেলে'র অভাবে কাজ এগোচ্ছে না।"

ক্লস্‌কোভ্‌ বলিল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! অনীতা, তুমি এখুনি যাও!"

অনীতা মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু আমার সেলাই এখনো শেষ হয়নি যে!"

"চুলোয় যাক্‌ সেলাই। আমার বন্ধু হচ্ছেন আর্টিষ্ট—আর্টের জন্যে উনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এ ত আর যে-সে কাজ নয়!"

অনীতা নীরবে জামা-কাপড় পরিতে সুরু করিল।

ক্লস্‌কোভ্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আঁকছ?"

—"একটি স্নানরতা সুন্দরী! বিষয়টা চমৎকার! কিন্তু বন্ধু, তুমি এমন নোংরা হয়ে থাক কেমন করে?"

—"কি করব বল, বাড়ী থেকে আমি মাসে মাসে মোটে উনিশ-কুড়ি টাকা পাই, তাতে কি আর ভদ্দরলোকের দিন চলে?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তা বটে! কিন্তু, তবু তুমি ইচ্ছে করলে আরেকটু মানুষের মত থাকতে পার ত! শিক্ষিত লোকের রুচি থাকা উচিত, তা না হলে চলবে কেন? এই স্থাখনা, তোমার বিছানা এখনো বাসি রয়েছে, আর ঘরের চারিদিকে এমনি ময়লা আর জঞ্জাল জমেছে যে, পা পাতবার জো নেই,—আরে ছোঃ ছোঃ!"

ক্লস্‌কোভ্‌ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা ঠিক বটে, কিন্তু অনীতা আজ এত ব্যস্ত ছিল যে, ঘর-দুয়োর গুছোবার একটুও সময় পায় নি।"

বন্ধুর সঙ্গে অনীতা চলিয়া গেলে, ক্লস্‌কোভ্‌ সোফার উপরে শুইয়া পড়িল এবং সেই অবস্থায় পড়া মুখস্থ করিতে

করিতে ঘুমের ঘোরে তাহার চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

ঘণ্টাখানেক পরে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অনীতা তখনো ফিরে নাই।

ক্লস্‌কোভ্‌ উঠিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল নানান কথা ভাবিতে লাগিল।

তাহার বন্ধুর কথা মনে হইল—'শিক্ষিত লোকের রুচি থাকা উচিত।'—বাস্তবিক, সে কি পশুর মতই আছে! আজ এই ঘরখানা তাহার চোখে ঠিক নরকের মত দেখাইতে লাগিল!

ক্লস্‌কোভের সামনে আশাভরা ভবিষ্যতের জ্বল্‌জ্বলে ছবি জাগিয়া উঠিল। তখন সে একজন গণ্যমান্য ডাক্তার,—রোগীরা তাহার প্রকাণ্ড ডাক্তারখানায় বসিয়া আছে,—এক ধনীর মেয়েকে সে বিবাহ করিয়াছে,—সাজানো-গুছানো ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া পরম আরামে সে চা পান করিতেছে!

এই উজ্জ্বল দিবাস্বপ্নের পাশে, অনীতার সাদাসিধা, এলমেল, ময়লা পোষাক-পরা, সকরুণ মূর্ত্তি কি বেমানান!..... ক্লস্‌কোভের মনে হইতে লাগিল, অনীতাকে আজই বিদায় করা দরকার!

এমনসময় অনীতা ফিরিয়া আসিল।

সে বাহিরের কাপড় ছাড়িতেছে,—

—ক্লস্‌কোভ্‌ গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখ অনীতা, একটা কথা আছে শোন, তোমার আর আমার একসঙ্গে থাকা চলবে না,—অর্থাৎ, তোমাকে আর আমার কোন দরকার নেই।"

আর্টিষ্টের ঘরে ছবির মডেল হইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনীতা কেমন হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার শীর্ণ মুখখানি এখন যেন আরো-বেশী রোগা দেখাইতেছিল। ... ...ক্লস্‌কোভের কথায় সে কোন জবাব দিল না—সুধু তার ঠোঁটদুখানি একটু কাঁপিয়া উঠিল।

ক্লস্‌কোভ্‌ বলিল, "আজই হোক্‌ আর দুদিন পরেই হোক্‌, আমার কাছে তোমার চিরদিন থাকা যখন আর চলবে না, তখন এ নিয়ে আর ভাবনা-চিন্তে মিছে! আর, তুমি ত বোকাও নও—সুতরাং, আমার কথা তুমি বুঝতেই পারছ!"

অনীতা আবার পোষাক পরিতে লাগিল। তারপর মৌনমুখে তাহার সেলাইয়ের টুকিটাকি জিনিষগুলি গুছাইয়া লইল। তার টেবিলের পাশে কাগজের মোড়কে খানিকটা চিনি ছিল; সেটুকু একখানা বইয়ের মলাটের উপরে রাখিয়া অনীতা কোমল স্বরে বলিল, "এই —এই—তোমার চিনি রইল"—বলিয়াই সে চোখের জল ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

ক্লস্‌কোভ্‌ বলিল, "কি বিপদ, তুমি কাঁদছ যে!"

অনীতা মাটির দিকে চাহিয়া শুদ্ধ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার অশ্রু-ভরা কণ্ঠে একটিও কথা বাহির হইল না।

ক্লস্‌কোভ্‌ ঘরের ভিতরে পাইচারি করিতে-করিতে বলিল, "তুমি আশ্চর্য্য করলে দেখচি! জানই ত, সময়ে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবেই,—চিরকালটা ত আর আমাদের একসঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না!"

অনীতার জিনিষ-পত্তর গুছানো শেষ হইল। ক্লস্‌কোভের দিকে ফিরিয়া সে বিদায় লইতে গেল—"আমি তবে আসি?"

এই কথাটাতে যেন ক্লস্‌কোভের চট্‌কা ভাঙিল;— ভবিষ্যতের স্বপ্নটা যেন জাগরণের মধ্যেও পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িতেছিল। সে মনে মনে বলিল, "অনীতা না হয় আরো কিছুদিন এখানে থেকেই যাক্‌। তারপরে তাকে সময়-মত যেতে বললেই হবে!"—তারপর নিজের এই দুর্ব্বলতায় নিজের উপরেই হঠাৎ চটিয়া গিয়া ক্লস্‌কোভ্‌ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "এস, এস, তুমি ওখানে দাঁড়িয়া রইলে কেন অনীতা? যেতে চাও—যাও; থাকতে চাও—থাকো! নাও, জামা খোলো, তুমি থাকতে পার!"

অনীতা তাহার বাহিরের পোষাক খুলিতে লাগিল, নীরবে—চুপেচুপে। তারপর লুকাইয়া চোখের জল মুছিয়া, একটি অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, জানলার ধারে আপনার জায়গাটিতে গিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল।

ক্লস্‌কোভ্‌ আবার তাহার ডাক্তারী বইখানা লইয়া পড়া সুরু করিয়া দিল—"দক্ষিণস্থ ফুস্‌ফুস্‌ ত্রিভাগে বিভক্ত, যথা—"

রাস্তায় একটা ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া উঠিল,—"খাবার চাই, খাবার!"

শ্রীরেণু রায়।

শীতের সকালবেলা

শীতের সকালবেলা,—আলো আজ
হয়েছে কৃপণ,
খোলে নাই দানছত্র তার;
উপাসী নয়ন তাই করে প্রাণপণ,
একবার চেয়ে, ফিরে চায় আর বার!

গেছে দিন,—নাই আর খুসি হয়ে'
মুঠো ভরে দান।
কাঙাল তো বোঝে না সে কথা;
অভাব প্রবল যার তারি অপমান,
শুধু চায়, ভুলে গিয়ে মানের মমতা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

আলেয়া। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌সের প্রকাশিত 'আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষোড়শ সংখ্যক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে লেখিকার রচিত 'আলেয়া', 'প্রত্যাখ্যান', 'নূতন পূজা' ও 'সুখী' নীর্ষক চারিটি 'বড় গল্প' সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলিকে ঠিক ছোট গল্প বলা চলে না; অথচ এগুলি উপন্যাসও নয়।

'নূতনপূজা' গল্পের প্লট ছোটগল্পের; কিন্তু রচনায় বাহুল্যদোষ প্রবল, ভাষা অত্যন্ত ফেনানো—তাহার ফলে ভারাক্রান্ত হইয়া ছোটগল্পের আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'আলেয়া' গল্পের ভাষা কটমট, প্লটও বিশেষত্বহীন। 'প্রায়শ্চিত্তের' প্লটে উপন্যাসের উপাদান ছিল, কিন্তু সেটিও লেখিকা 'সাঁটে' সারিয়াছেন। শেষটুকু টানিয়া বুনিয়া দেওয়ায় করুণ রস প্রাণে কোথাও একটু ছাপ রাখিতে পারে না। "দিদি" ও "অন্নপূর্ণার মন্দির"-রচয়িত্রীর হাতে রচনাগুলি আরও উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিবে বলিয়া আশা ছিল, কিন্তু আমরা "আলেয়া" পাঠে নিরাশ হইয়াছি।

অষ্টক। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট রচিত চারিটি গল্প "পক্ষীরাজ", "বোবার ডায়েরি" "অগ্নিশুদ্ধি" ও "স্নেহের সার্জ্জারী" এবং শ্রীমতী নিরুপমা দেবী-রচিত চারিটি গল্প "ব্রতভঙ্গ", "চাঁদের আলোর প্রাণী", "প্রত্যর্পণ" ও "অপমান না অভিমান ?,'—সর্ব্বসমেত এই আটটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। 'বোবার ডায়েরি' এবং 'অপমান না অভিমান' এই দুইটি গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে—গল্প দুটিতে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ এবং অভিনবত্ব আছে। "অগ্নিশুদ্ধি" গল্পের প্রারম্ভভাগ চমৎকার; বেশ একটি সামাজিক সমস্যা লেখক খাড়া করিয়াছিলেন, এবং হৃদয়ের দিক দিয়াই তাহার সমাধান মিলিবে ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু সহসা শেষের দিকে গোঁড়ামির চাপে পড়িয়া গল্পটি মাটী হইয়া গিয়াছে। লেখকের গোঁড়ামির রাশ জগবন্ধুকে হঠাৎ এমনি বেকায়দায় টান দিয়াছে যে শেষদিকটায় সে বেচারা একেবারে হেঁয়ালির অন্ধকূপে হুচট খাইয়া মরিয়াছে। "স্নেহের সার্জ্জারী"র রচনা-ভঙ্গী প্রাঞ্জল, সরল; কিন্তু প্লটে বিশেষত্ব নাই। নবীন ও মাধুরীর মিলনটুকু একেবারে থিয়েটারী ধরণের হইয়াছে। "অপমান না অভিমান ?" গল্পটি চমৎকার লাগিয়াছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ 'দরিদ্র বান্ধব ঔষধালয়' হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মণিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর এই ক্ষুদ্র জীবনীখানি প্রতিষ্ঠিত। লেখা ভাল, কোথাও গদ্গদ বাজে উচ্ছ্বাস নাই। ভাষা সরল, আড়ম্বরহীন।

নারীরত্ন। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুশান্তকুমার ঘোষ, ৫২ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি জনৈক হিন্দু-রমণীর জীবন-কাহিনী। পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। এক গৃহস্থ রমণী অবরোধের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া সংসারের ও সমাজের কত কাজ করিতে পারেন—সমাজের উপর তাঁহার নীরব আড়ম্বরহীন জীবন-ধারা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—এ সমস্ত বিষয় অত্যন্ত 'ঘরোয়া' রকমে সহজ ভাষায় এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এ গ্রন্থ-পাঠে আদর্শ শিক্ষা হয়। প্রত্যেক বালিকা-বিদ্যালয়ে এ গ্রন্থখানি পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। গ্রন্থের প্রধান গুণ, যাঁহার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাঁহার নামটুকু শুধু জানিতে পারা যায় তাছাড়া অপর কোন পরিচয় নাই—ঢক্কানাদ করিয়া আদর্শ খাড়া করিবার চেষ্টা আদৌ নাই—প্রকাশকের পক্ষে এ সংযম আজিকালিকার দিনে অল্প প্রশংসার কথা নয়। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
শ্রেণীক সং
শ্রেণী সং



পথের সাথী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৪১শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৪ [১১শ সংখ্যা

যুদ্ধ-গীতি *

রণরঙ্গিণী নাচে, নাচেরে
নাচে, ঐ নাচে !
রুন্ রুন্ ঠুন্ ঠুন্ নাচেরে
নাচে
রণ মাঝে।
ঝাঁজর ঝমঝম বাজেরে
বাজে, শুন বাজে !
ডম্‌ডম্ ডমরু আওয়াজে রে
বাজে, শুন বাজে !

গরজে তোপ কামান মাঝে
জগজননী সমর সাজে রে
নাচে !
আজি নাচে !
ঐ নাচে !
রণ মাঝে।
(বন্দে মাতরং)

২

অভয়ার ডঙ্কা বাজেরে
বাজে রণমাঝে
রক্ত-তপ্তকর হুঙ্কারে শঙ্খ
নিনাদে, জয়নাদে !
পায়ে পায়ে তালে তালে চল্‌রে চল্
সবে চল্ ! আগে চল্ !
মারিতে মরিতে চল্ চল্‌রে ত্বরিতে
দলে দল দলে দল !
গরজে তোপ কামান মাঝে
জগজননী সমর সাজে রে
নাচে !
আজি নাচে !
ঐ নাচে
রণমাঝে।
(বন্দে মাতরং)

* মেসোপটেমিয়া হইতে যুদ্ধযাত্রী বাঙ্গালী সৈনিকদের অনুরোধে যুদ্ধক্ষেত্রে গাহিতে গাহিতে যাইবার জন্য এই marching songটি রচনা করিয়া স্বরলিপি সমেত প্রেরিত হইয়াছে।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

৩

মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে চল ছুটে সবে
আহবে, আগে কে হবে!
বিজয় বা স্বরগের স্বাদ কেবা লবে
আহবে, আগে কে হবে!
আমি সে, আমি সে, আমি, আমি, আমি,
যেতে দে, আগে হতে দে!
রণরঙ্গে মার সঙ্গে হতে দে
আগে যেতে দে!

গরজে তোপ কামান মাঝে
জগজননী সমর সাজে রে
নাচে!
আজি নাচে!
ঐ নাচে
রণমাঝে!
(বন্দে মাতরং)

শ্রীসরলা দেবী।

স্বরলিপি

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

[স১ স১ ।। র১ –১ গ১ গ১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ । গ১ প১ ম১ গ১ ।
র ণ র – ঙ্গি নী না – চে – না – চে –

রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র১ –১ –১ –১ । –১ –১ গর১ সন্১ । ন্১ স১ র১ –১ ।
রে – না – চে – – – – – ঐ – না – চে –

–১ –১] –১ –১ ।। স১ গর১ গ১ –১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ । গ১ প১ ম১ গ১ ।
– – – – রুন্ – রুন্ – ঠুন্ ঠুন্ না – চে –

রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র১ –১ –১ –১ । –২ র১ গ১ । মী১ –১ প১ –১ । –৪ ।।
রে – না – চে – – – – র ণ মা – ঝে – –

স১ –১ স১ স১ । স১ স১ ন্১ স১ । ন্স র১ র১ –১ । র১ গর১ স১ র১ ।।
ঝাঁ – ঝ র্ ঝ ম ঝ ম বা – জে – রে – বা –

গ১ –১ –১ –১ । –১ –১ ম১ মগ১ । র১ ম১ গ১ –১ । –৪ ।। স১ –১ স১ –১ ।
জে – – – – – শু ন বা – জে – – ডম্ – ডম্ –

স১ স১ ন্১ স১ । র১ –১ র১ –১ । র১ গর১ স১ র১ । গ৪ । –২ ম১
ড ম রু আ ওয়া – জে – রে – বা – জে – শু

মগ১ । র১ ম১ গ২ । গ১ ধ১ ধ১ –১ ।। ধ১ –১ ধ১ ধ১ । ধ১ র্স১ নো১
ন বা – জে গ র জে – তো – প কা মা – ন

ধ১ । প১ মী১ ধপমীপ১ –১ । –১ –১ স১ স১ । র১ গ১ গ১ –১ । গ১
– মা – ঝে – – – জ গ জ ন নী – স

ম১ প১ ধপ১ । গ১ প১ ম১ গ১ । রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র৪ । –২ গ১
ম র – সা – জে – রে – না – চে – আ

রস১ । ন১ স১ –২ । –২ গ১ রস১ ।। ন্১ স১ র২ । –১ –১ র১ গ১ ।
জি না – চে – ঐ – না – চে – – র ণ

মী২ প২ । –২ –২ ।।
মা ঝে – –

স১ স১ র১ গ১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ । গ১ প১ ম১ গ১ । রগ১ রস১ ন্১
অ ভ য়া র ড – ঙ্কা – বা – জে – রে – বা

স১ ।। র৪ । –২ গ১ রস১ । ন্১ স১ র২ । –৪ ।। সগ২ গ১ গ১ ।
– জে – র ণ মা – ঝে – র ক্ত ত

–১ গ১ গ১ গ১ । গ২ গ১ গ১ । ম২ গ১ র১ ।। ন্১ স১ র৪ । –২ র১
– প্ত ক র হু ঙ্কা রে শ ঙ্খ নি না – দে – জ

গ১ । মী২ প২ । –৪ ।। স১ স১ স১ স১ । স১ স১ ন্১ স১ । র৩ র১ ।
য় না দে – পা য়ে পা য়ে তা লে তা লে চল্ রে

র১ গর১ স১ র১ ।। গ৪ । –২ ম্র১ মগ১ । র১ ম১ গ২ । –৪ ।।
চ ল্ স বে চ ল্ আ গে চ – ল্ –

স১ স১ স১ স১ । স১ স১ ন্১ স১ । র১ র১ র১ র১ । র১ র১ স১ র১ ।।
মা রি তে ম রি তে চ ল্ চ ল্ রে ত্ব রি তে দ লে

গ৪ । –২ ম১ মগ১ । র১ ম১ গ২ ।। গ১ ধ১ ধ১ –১ ।।
দ ল দ লে দ – ল গ র জে –

ধ১ –১ ধ১ ধ১ । ধ১ র্স১ নো১ ধ১ । প১ মী১ ধপমীপ১ –১ ।
তো – প কা মা – ন – মা – ঝে –

–১ –১ স১ স১ । র১ গ১ গ১ –১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ ।
– – জ গ জ ন নী – স ম র –

গ১ প১ ম১ গ১ । রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র৪ । –২ গ১ রস১ । ন্১ স১
সা – জে – রে – না – চে – আ জি না –

—৪। —২ গ১ রস১ ।। ন্১ স১ র২। —৪। —২ র১ গ১। মী২ প২। —২ —২ ।।
চে — ঐ — না — চে — — র ণ মা ঝে — —

স১ স২ র১। গ১ ম১ প১ প১। গ১ প১ ম১ গ১। র২ গর১ সন্১ ।।
মা ভৈ মা ভৈ — র বে চ ল ছু টে স বে —

ন্১ স১ র২। —২ গ১ রস১। ন্১ স১ র২। —৪ ।। গ১ গ২ গ১।
আ হ বে — আ গে কে হ বে — বি জয় বা

গ১ গ৪ গ২। গম১ প১ ম১ গ১। র১ গ১ র১ রস১। ন্১ স১ র২।
স্ব র গের স্বা দ কে বা ল — বে — আ হ বে

—৪ র১ গ১। মী১ মী১ প২। —৪ ।। স১ স১ স২। স১ স১ স২।
— আ গে কে হ বে — আ মি সে আ মি সে

র৪ র১ র১ র১। র১ র১ স১ র১। গ৪। —২ ম১ মগ১। র১ গ১ ম১।
আ মি আ মি আ মি যে তে দে — আ গে হ তে দে

—৪ ।। স১ স১ স২। স২ ন্১ স১। র২ র২। —২ স১ র১।
— র ণ র ঙ্গে মা র স ঙ্গে — হ তে

গ৪। —২ ম১ মগ১। র১ গ১ ম২ ।। গ১ ধ১ ধ১ —১ ।।
দে — আ গে যে তে দে গ র জে —

ধ১ —১ ধ১ ধ১। ধ১ র্স১ নো১ ধ১। প১ মী১ ধপমীপ১ —১।
তো — প কা মা — ন — মা — ঝে —

—১ —১ স১ স১। র১ গ১ গ১ —১। গ১ ম১ প১ ধপ১।
— — জ গ জ ন নী — স ম র —

গ২ প১ ম১ গ১। রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র৪। —২ গ১ রস১। ন্১ স১।
সা — জে — রে — না — চে — আ জি না —

—২। —২ গ১ রস১। ন্১ স১ র২। —৪। —২ র১ গ১। মী২ প২। —২ —২ ।।
চে — ঐ — না — চে — — র ণ মা ঝে — —

শ্রীসরলা দেবী।

পুশ্‌কিনের কবিতা

স্বপ্নময়ী

ঝাপ্‌সা ভোরের আলোয় এলে তুমি,
ভোরের আলোয় দেখেছি ওই ছবি,
ছেলেবেলাই গানের প্রসাদখানি
তোমার বরে পেয়েছে এই কবি।
স্বর্গ-পথে দেউটি-হাতে এসে
কী মালা মোর জড়িয়ে দিলে কেশে!

হিন্দোলাতে ঘুমিয়েছিলাম শিশু—
মর্ত্ত্যলোকের ধূলি-মলিন গেহে,
স্বর্গ হ'তে কখন্ এসে চুপে
আশীস্ তুমি কর্‌লে গভীর স্নেহে;
এলে যদি রও কাছে, বান্ধবী!
যে-অবধি মরে না যায় কবি।

প্রাণে কেবল ঢাল্‌লো স্বপন্-মধু,
পেলব ও হাত রাখো এ মোর মাথে,
লঘু তোমার পক্ষ-দুটি দিয়ে
ঢাকো আমায় ঢাকো দিবস-রাতে;
দুখের উদাস?—পাঠাও বনবাসে,
থাকো তুমি থাকো আমার পাশে।

মনকে আমার নাওগো তোমার করে',—
ভুলিয়ে রাখো সব্-ভোলানো সুরে,
পথ দেখিয়ে চল্ গো নিয়ে মোরে
জীবন-শেষের চির-জীবন-পুরে।
জ্বালো তোমার আঁধার-হরণ-বাতি
চিরযুগে জাগ্রত যার ভাতি।

মাদুলি

পাহাড়ে আর পোস্তা-গাঁথা গড়ের ভিতে যেথা
গাঁজলা-মুখো ঢেউএর হানাহানি,—
সন্ধ্যাবেলার কুয়াসাতে ফিঁকে চাঁদের আলো
চোখে যেথায় স্বপ্ন মিলায় আনি',—
রংমহলের আল্‌কোহলে মাতাল হ'য়ে যেথা
জীবন ফুঁকে ছায় গো তুরুক্‌গুলি,—
ইস্তাম্বুলি সেই মুলুকের এক যে যাদুকরী
দিয়েছিল আমায় এ মাদুলি।

হাতের পরে হাতাটি রেখে আঁখির পরে আঁখি
বলেছিল—"যত্নে রেখো এরে
ভালোবাসার কবচ এ যে রাখ্‌লে এ ধন বুকে
পড়্‌বেনাকো ফাল্‌তো ফ্যাসাদ ফেরে।
ঝড়-তুফানে এ মোর কবচ আস্‌বেনাকো কাজে—
জানিয়ে রাখি তোমায় খোলাখুলি,—
মৃত্যু এলে শিয়র-দেশে হয় তো গো বাঁচাতে
পারবেনাকো আমার এ মাদুলি।

গুপ্ত ধনের মালিক হ'তে পারবে না এর গুণে,
সোনার খনি মিল্‌বে না এর বলে;
দুষ্‌মনেরা পড়বেনাকো আপ্‌নি তোমার পায়ে
এই মাদুলি ধারণ করার ফলে।
স্মরণ-করা-মাত্র এসে মিল্‌বে না সহসা
মনটা যারে কাছে পেতে করছে ঝুলোঝুলি,
প্রবাসে মন কাঁদ্‌লে পরে তোমার আপন দেশে
পৌঁছে দিতে পার্‌বেনা মাদুলি।

কিন্তু যদি চটুল চোখের চাউনি চপল কভু
কাবু তোমায় করে যাদুর বলে,
অনুরাগের অরুণিমা নেইক যে অধরে
সে যদি ছোঁয় তোমার অধর ছলে,

প্রেমের যদি হয় অপমান মনের ভুলে কভু
দুখের সাগর মর্ম্মে ওঠে ফুলি',
অবিশ্বাসী হাসির ফাঁসী কণ্ঠ যদি রোধে
রক্ষা তখন করবে এ মাদুলি।"

ভগ্নহৃদয়

গোপন প্রাণের সাধের স্বপন সকল গেল মরে,
রইনু বেঁচে আমি ;
মুকুল-দশায় অনেক আশাই শুকিয়ে গেল ঝরে
অনেক মনস্কামই।
মৌন হিয়ায় খেদের হাহাধ্বনি—
রইল পুঁজি,—পাঁজরে কালফণী।

আপন বল্‌তে রইলনা কেউ তুল্‌তে ধরে' হাতে,—
জগৎ মরু-সম।
ছন্নছাড়া, আঙার-মাড়া আঁখি,
ভাব্‌ছি শুধু শেষের কত বাকী।

নগ্ন শাখার পাণ্ডুছবি শেষ-পাতাটির মত
উঠ্‌ছি কেবল কেঁপে,
জাড়ের বাদল ঝড়ের মাদল বাজিয়ে শতশত—
তুষার ঘোড়ায় চেপে—
পাহাড় হ'তে আস্‌বে কবে নেমে ?
কাঁপন আমার ফুরিয়ে যাবে থেমে।

উড়িয়ে নে যায় দুর্ণিয়তির দুরন্ত ঝঞ্ঝাতে
কবির মুকুট মম,

আমার ছবি

(পুশ্‌কিনের পনেরো-বছর বয়সের রচনা।)

আমার ছবি চাই, লিখেছ, তাই হবেগো তাই,
লকেট্-সাইজ্ দিই এঁকে, নাও, একটু ফারাক নাই।
ভালো-ছেলে নইক, বলে' রাখ্‌ছি গোড়াতে,
হাঁদা ছাড়া যা' বল তাই,—চট্‌বনা তাতে।
অথচ নই তর্কবাগীশ,—টোলের ধনুর্ধর,—
মাদ্রাসা কি মক্তবেতেও হইনি মাতব্বর ;
একটুকু খাম্‌খেয়ালি খুঁৎখুঁতে বেশ একটুক্,—
দুই মিলে যা হয় আমি তাই,—নেই কোনো ভুল্‌চুক্।
আকার কিছু দীর্ঘ, গায়ের রংটা কিছু লাল
কোঁকড়া রকম চুলগুলো আর ঢিলে রকম চাল।
একলা থাকা সয়না ধাতে—হাঁপিয়ে ওঠে মন,—
সব সময়েই নয় সাথী মোর কল্পনা স্বপন,—

সঙ্গ খুঁজি,—বাক্য-সভার চাইনে কচ্‌কচি,—
নিরালা আর লোকালয়ে সোনার জাল রচি।
ভালোবাসি এই দুনিয়া—চন্‌মনে সবক্ষণ,
মন খুসী হয় নৃত্য খেলায়,—কর্‌ব না গোপন।
ভালোবাসি মিষ্টি হাসি,—বল্‌বনাকো কার,—
চিন্তে বোধ হয় পার্‌ছ এখন ?—এই ছবি আমার।
বিধি আমায় যা গড়েছেন, দিয়েছেন যে বেশ—
সেই চেহারায় জাহির হ'তে নেই শরমের লেশ।
মস্কারাতে মাক্‌ড়া খাঁটি,—রং জমাতে জিন্,—
ফুর্ত্তিবাজের বাদ্‌শাজাদা—এই কবি পুশ্‌কিন্।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইংরেজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ

(ফরাসী হইতে)

ব্যক্তিগত জীবনক্ষেত্রে ভারতবাসী ও ইংরেজের যে মনোভাব তাহা হইতে সার্ব্বজনিক কর্ম্মক্ষেত্রে উহাদের মনোভাব কিরূপ হইতে পারে তাহার আভাস পূর্ব্ব হইতেই পাওয়া যায়। সকল দেশেই সামাজিক সমস্যাদির উপর রাষ্ট্রনীতির আধিপত্য পরিলক্ষিত হয় এবং এই সকল সমস্যার সমাধান, অনেকাংশে ধনী ও দরিদ্র, কর্ত্তা ও কর্ম্মীদের দৈনন্দিন সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে ; যে দেশ বৈদেশিকের শাসনাধীন, সে-দেশে স্বদেশীদের সহিত বিদেশীদের দৈনন্দিন সম্বন্ধের ভাবটা যেরূপ তদনুসারে স্বদেশীদিগের স্বাধীনতা পুনর্লাভের ইচ্ছা বাড়ে কিংবা কমে।

দরিদ্র, উদাসীন, আপন কাজে নিমগ্ন—ভারতের কৃষকেরা, হিন্দু কিংবা মুসলমান রাজার যেরূপ আজ্ঞাবহ, ইংরেজ রাজারও সেইরূপ আজ্ঞাবহ। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা নূতন ভাবের কথা কিছু শুনিলেই তাহার নিন্দা করে। অধিকাংশ মুসলমান কোরাণ ও চিরাগত প্রথার উপর নির্ভর করিয়া থাকে ; সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চপদ লাভ করাই মুসলমান আমীর-ওমরাওর একমাত্র বাসনা। কেবল নব-হিন্দু, পার্সী ও কতকগুলি মুসলমান, যাহারা ইংরেজি ভাবে শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত তাহাদেরই রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে ঔৎসুক্য দেখা যায়।

বহুশতাব্দী হইতে যে-হিন্দুরা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক, রাজা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, তাহারা যখন য়ুরোপের ইতিহাস পাঠ করিল তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না !

"Hindu Civilisation"-এর গ্রন্থকার প্রমথ বসু বলেন :—

"ইংরেজি শিক্ষা হইতে হিন্দুরা ঐতিহাসিক সাহিত্যের সহিত যখন প্রথম পরিচয় লাভ করিল, তখন উহারা জানিতে পারিল, অনেকগুলি সভ্যতম পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা কি-করিয়া প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; কি

করিয়া তাহারা অনিচ্ছু উৎপীড়নকারী প্রভুদিগের নিকট হইতে কতকগুলি গুরুতর অধিকার ছিনিয়া লইয়াছিল; কি করিয়া স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল, তাহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, এমন কি, তাহাদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুরা সেইসব রাজাদের কথা অবশ্য জানিত যাহারা আপন নিকট-আত্মীয়দের রক্তে হস্ত কলুষিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল; যাহারা উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষ অথবা অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত; কিন্তু রাজ্যের প্রজাবর্গ কোন গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হইয়াছে একথা তাহারা কখন শুনে নাই। এ কথা সত্য, তাহারা প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের সহিত বহুপূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিল, কিন্তু সে শাসনতন্ত্র নিছক স্থানীয় ধরণের। কোন গ্রামের চতুঃসীমার বাহিরে সেই গ্রামের শাসন-এলাকা কিংবা জাতের পঞ্চায়ৎ কখন প্রসারিত ছিল না। জাতীয় প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের কথাটা হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা হইতেই প্রথম অবগত হয়। তাহারা জানিতে পারিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি, প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণের মঞ্জুরী ব্যতীত এক পয়সাও আদায় করিতে পারেন না। এবং যে সকল উচ্চপদস্থ ইংরেজ, ভারতবর্ষের বৃহদায়তন রাজ্যের রাজাদিগকে সিংহাসনে বসাইতেছেন, সিংহাসন হইতে নামাইতেছেন, দণ্ডপুরস্কার বিধান করিতেছেন, তাঁহারা নিজ কার্য্যের জন্য ঐসকল প্রতিনিধিদিগের নিকট দায়ী! তাঁহাদের মধ্যে একজন ত ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত দুরাচারের জন্য বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাদ্‌শারা সরাসরিভাবে দুরাচারী শাসনকর্ত্তাদিগকে দণ্ডিত করিতেন ইহা তাহারা জানিত, কিন্তু প্রজাবর্গ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণের এ বিষয়ে কোন হাত আছে, একথা তাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। পাশ্চাত্যখণ্ডে জনতন্ত্রের অভ্যুদয়সম্বন্ধে তাহারা এই প্রথম জ্ঞান লাভ করিল এবং এই কথাটা তাহাদের মনে গভীররূপে অঙ্কিত হইল"।

তাছাড়া, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গদেশে প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হইবার ২০ বৎসর পরে, Sir Charles Treveylan জানিতে পারিলেন —য়ুরোপীয়ধরণে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতির তত্ত্ব সকল গ্রহণ করিয়াছে; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে স্কুল-আদি বিরল ছিল, সেখানে এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা—"বিদেশীকে দেশ হইতে তাড়াও;" এবং বঙ্গদেশ যেখানে শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেখানে প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্র পাইবার ইচ্ছা বলবতী।

তাহার পর হইতে শতসহস্র হিন্দু য়ুরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সভা-সমিতিতে সম্মিলিত হইবার অধিকার হইতে ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হইতে উহাদের রাষ্ট্র-নৈতিক মতামত দৃঢ়ীভূত হইয়াছে এবং বে-আইনী না করিয়া কিরূপে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন করিতে হয়, তাহা ইংরেজের নিকট উহারা শিক্ষা পাইয়াছে। অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পাইয়া হিন্দুরা স্বাধীন দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠান লাভ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছে; শাসন-বিভাগের অনেক পদে নিযুক্ত হইয়া, শাসন-বিভাগের সমস্ত পদ অধিকার করিবার জন্য উহাদের এখন উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেকালের গল্প

বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেকালের কয়েকজন সাহিত্যিকের সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটী গল্প প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য, যে সকল প্রাচীন ব্যক্তির মুখে গল্পগুলি শুনিয়াছি, এ-সকলের ভিত্তি তাঁহাদের উক্তির উপরেই প্রধানতঃ স্থাপিত, তাহা ছাড়া উহাদের সত্যতা অন্য কোনও উপায়ে প্রমাণিত করা একরূপ অসম্ভব।

(১) প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)।*

সত্যানুরাগ। এমন অনেক লোক



প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)

* ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র ৺হীরালাল মিত্রের স্থালক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত-মহাশয় এইরূপ অনেকগুলি গল্প বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ মন্দিরে প্যারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে আহূত প্রকাশ্য সভায় বিবৃত করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় সভার কার্য্যবিবরণীতে এগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

দেখা যায় যাঁহারা একবার যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হন বা যে-অভিমত প্রকাশ করেন, পরে ভুল বা অন্যায় বলিয়া বুঝিলেও তাহা সংশোধন করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু প্যারীচাঁদের সত্য-নিষ্ঠা এমন প্রবল ছিল যে, তিনি কখনও প্রয়োজন বুঝিলে আপনার ভ্রম-সংশোধনে বা মত-পরিবর্ত্তনে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। একবার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের কোন সভায় তিনি কোন প্রস্তাবের সমর্থন করেন; পরে সেই বিষয়ে অপর সদস্যগণ যখন তর্কবিতর্ক করেন, তখন প্যারীচাঁদ আপনার ভুল বুঝিতে পারেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের বিপরীত অপর-এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে প্যারীচাঁদ সেই বিপরীত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। ইহাতে উক্ত সভার সভাপতি তদানীন্তন ভাইস্-চান্সেলার, স্যর আর্থার উইলসন্ বিস্মিত হইয়া প্যারীচাঁদকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি প্রথম প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন, এখন উহার amendmentএরও সমর্থন করিতেছেন, এ কেমন ব্যাপার?" ইহাতে প্যারীচাঁদ অকুণ্ঠিতভাবে বলেন, "Am I not capable of amendment, Sir?" (শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের এই উক্তি এখনও তাঁহার মনে আছে।)

বাক্‌চাতুর্য্য। স্যর এশ্‌লি ইডেনের সহিত প্যারীচাঁদ মিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র যখন নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন স্যর এশ্‌লি সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে এদেশে আসিয়া তাঁহার নিকট শাসনকার্য্য শিক্ষা করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র যখন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ এবং সুপ্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন, তখন স্যর এশ্‌লি (উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া) উক্ত পত্রে নীলকরগণের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতেন। প্যারীচাঁদও প্রায়ই ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে লিখিতেন এবং সেই সূত্রে, স্যর এশ্‌লির সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। স্যর এশলি ইডেন যখন বাঙ্গলার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, তখন প্যারীচাঁদ কোনও ব্যক্তিকে কোন কার্য্যের জন্য তাঁহাদের নিকট সুপারিস করেন। স্যর এশ্‌লি চিরপ্রচলিত প্রথামত চীফ্ সেক্রেটারীকে সেই সুপারিস-পত্র পাঠাইয়া সেই সঙ্গে নিজেরও একখানি পত্র লিখিয়া দেন। তথাপি সেই ব্যক্তিকে বিফল-মনোরথ হইতে হয়। প্যারীচাঁদকে তিনি পুনরায় সুপারিসের জন্য অনুরোধ করিলে পরোপকারী প্যারীচাঁদ স্বয়ং স্যর এশ্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্যর এশ্‌লি তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্যারীচাঁদ সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে আপনি যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা 'শ্রী'-যুক্ত ছিল না, এবারে এক-খানি 'শ্রী'-যুক্ত পত্র দিতে হইবে।" স্যর এশ্‌লি প্যারীচাঁদের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় প্যারীচাঁদ বলিলেন, "কোনও জমিদার, তাঁহার প্রজারা কোন আবেদন-পত্র আনিলে তৎক্ষণাৎ সেই

আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার নায়েবের নিকট পাঠাইয়া দিতেন কিন্তু নায়েবের প্রতি তাঁহার গোপন আদেশ ছিল যে, 'শ্রী'-যুক্ত স্বাক্ষর ভিন্ন অন্য স্বাক্ষর গ্রাহ্য হইবে না। প্রজারা হৃষ্টচিত্তে নায়েবের নিকট যাইত কিন্তু 'শ্রী'-হীন আবেদন গ্রাহ্য হইত না। সুতরাং এবার আপনি 'শ্রী'-যুক্ত স্বাক্ষর দিন।" এই কথা শুনিয়া স্যর এস্‌লি হাসিতে হাসিতে স্বহস্তে উপযুক্ত আদেশপত্র লিখিয়া দেন। বলা বাহুল্য, সেবারে প্যারীচাঁদের মুখরক্ষা হইয়াছিল।

ধর্ম্মমতের উদারতা। ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ্ ইংরাজীশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেন। তৎকালে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সংকীর্ণ মতাবলম্বী ছিলেন কিন্তু প্যারীচাঁদ সকল প্রকার সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া সকল বিষয়েই উদার মত পোষণ করিতেন। প্যারীচাঁদের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যাহাতে "কুসংস্কার-কলুষিত (১) হিন্দুধর্ম্ম" সহজেই পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই আশায় ডাক্তার ডফ্ প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তাঁহাকে প্ররোচিত করিতেন। এমন-কি, গুজব রটিয়াছিল যে, প্যারীচাঁদ শীঘ্রই খৃষ্টান হইবেন। ডাক্তার ডফ একদিন আসিয়া প্যারীচাঁদকে খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। প্যারীচাঁদ নীরবে সমস্ত উপদেশ শুনিয়া প্রত্যুত্তরে ধীরভাবে বলিলেন: "দেখুন, আমাদের এই পাখা-টানা বেহারাটি অতি সচ্চরিত্র, একটিও মিথ্যা কথা বলে না, কখনও চুরি করে নাই। এর নৈতিক জীবন খুব উঁচু। কিন্তু এ লোকটি খৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত জানে না বা শুনে নাই। আপনি কি বলিতে চান যে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবে না?" প্যারী-চাঁদের উত্তর শুনিয়া ডাক্তার ডফ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন এবং আর কখনও

(১) এ-সম্বন্ধে Bengal Hurkaru (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ) বলেন;—"The Ryot's friend of yesterday has given circulation to an idle report, to the effect that a certain native gentleman of the highest respectability and who is connected with most of the literary and educational societies of Calcutta, was about to embrace Christianity with his entire family. The statement, we have been assured, is totally without foundation. It would have been as well if *Ryot's friend* had instituted enquiries, before he proceeded to put this tale before the world, because, although the individual in question can well afford to smile at the report, it is unpleasant to be brought before the public without even so much as a "by your leave".

৺কৃষ্ণদাস পাল এ-সম্বন্ধে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৬ই অক্টোবর তারিখের 'হিন্দুপেট্রিয়টে' লিখিয়াছিলেন;—"The Hurkaru contradicts the statement of the Ryot's friend that Babu Peary Chand Mittra the enlightened Secretary and Librarian of the Calcutta Public Library, was about to embrace Christianity with his entire family. We can only say that the Babu is an earnest man in the matter of religion".

প্যারীচাঁদের নিকট তাঁহার খৃষ্টান হইবার প্রসঙ্গ তুলেন নাই।

রসিকতা। টেকচাঁদ ঠাকুরের রসিকতার পরিচয় 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রচুর পরিমাণে আছে। এ-স্থলে দুই-একটি গল্প বলিয়া প্যারীচাঁদ-প্রসঙ্গের 'মধুরেণ' সমাপন করা যাইতেছে।

যখন শোভাবাজারের নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন, তখনও তাঁহার অগ্রজ রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হন নাই। একদিন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশনে দুই ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া প্যারীচাঁদ হাসিতে হাসিতে রাজা কমলকৃষ্ণকে বলেন, "রাজাবাহাদুর, এইবার ছোটভাই মহারাজকে প্রণাম কর!" উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

একবার ইটালীর দেবনারায়ণ দের পুত্রের বিবাহের পত্র-সভায় প্যারীচাঁদ দুই তিন দফায় দেবনারায়ণ বাবুকে টাকা দিতে অনুরোধ করিলে দেবনারায়ণবাবু বলিলেন, "প্যারীবাবু, আপনি তো বেশ মজার লোক! প্রত্যেক বার আমাকেই দিতে বলিতেছেন!" ইহাতে প্যারীচাঁদ বলিলেন, "বাপু, তুমি দেবে না ত দেবে কে? তোমার নামের আগে "দে", শেষে "দে" —সুতরাং তুমিই দেবে!" সভায় হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল।

(২) কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম)

কৌতুক ও ব্যঙ্গপ্রিয়তা। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধুনী কাব্যে' কালীপ্রসন্ন সিংহের রসভাষের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"রহস্য-কৌতুক হাসি রসিকতা-ভরা
হুতোম পেঁচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা।"

কালীপ্রসন্নের এই কৌতুকপ্রিয়তা অতি অল্পবয়স হইতেই দেখা গিয়াছিল। কালীপ্রসন্নের সতীর্থ ও প্রিয়সহচর, 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'-প্রণেতা, (অধুনা বিন্ধ্যাচলে কৃত-নিবাস) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়, একবার আমাদিগকে তাঁহার ছাত্রাবস্থার একটি গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটী এই,—কালীপ্রসন্ন যখন হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পড়িতেন, তখন তিনি "আন্দোলন-পত্র" নামক একটি দৈনিক পত্র বাহির করিতেন। তাহাতে অনেকেই লিখিতেন এবং কালীপ্রসন্ন তাহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রে অনেকের প্রতি বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি থাকিত। উহা শ্লেটের উপর 'হস্তদ্বারা মুদ্রিত' হইয়া দুই তিন ক্লাসের ছাত্রগণের মধ্যে চালাচালি করিয়া প্রচারিত হইত। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ হইতে তাঁহার সতীর্থ ও শিক্ষকগণও নিষ্কৃতি পাইতেন না। "আন্দোলন-পত্রে'র সম্পাদক-বিরচিত একটি কবিতা এখনও প্রতাপবাবুর স্মরণ আছে:—

Sturgeon সাহেবের classএ
পড়্‌তো লাহা।
তার নীচে ঈশ্বর সাহা॥
ঈশ্বর সাহার ছোট পেট।
তার নীচে জয়গোপাল সেট॥
জয়গোপাল সেটের লম্বা ঠ্যাঙ্গ।
তার নীচে বেণী ব্যাঙ্গ॥



কালীপ্রসন্ন সিংহ

* * *
তার নীচে বুনো কালো
বুনো কালো মারে বড়।
তার নীচে গুপী দড়॥
গুপী মিত্র, খাতায় চিত্র,
Blankও বুকে Blackও মার্ক॥
ইত্যাদি—(২)

কালীপ্রসন্নের ছাত্রাবস্থায় আর একটি গল্প পুরাতন 'সোমপ্রকাশ' হইতে আমার রচিত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক গ্রন্থে

(২) হিন্দুকলেজের পুরাতন রিপোর্ট হইতে এই সময়ের কয়েকজন শিক্ষকের নাম উদ্ধৃত হইল;—

মিষ্টার টি, এইচ, ষ্টার্জ্জন	বাবু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহা	,, বনমালী মিত্র
,, জয়গোপাল শেঠ	,, গোপীকৃষ্ণ মিত্র

উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সে গল্পটী পুনরুল্লেখ-যোগ্য :—

"কালীপ্রসন্নের বাল্যকালাবধি অতিশয় চতুরতা ছিল। পরিহাস অতিশয় ভাল-বাসিতেন। যেখানে মারামারি ও তামাসা, সেইখানেই তিনি অগ্রে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার একজন শিক্ষক বলেন, একদিবস তিনি অন্য অন্য ছাত্রের সহিত বহির্দৃশ্যমান প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, এমত সময় হঠাৎ পার্শ্বস্থিত এক বালকের মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। শিক্ষকের নিকটে অভিযোগ হইলে কালীপ্রসন্ন কাল্পনিক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আমি জাতিতে সিংহ, জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারিয়া একে আজ মারিয়াছি।"

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল পরলোক-গত মনমোহন দত্ত-মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত গল্পটি শুনিয়াছিলাম।

কালীপ্রসন্নের অন্যতম বন্ধু * * * পাল-মহাশয় দরিদ্রের সন্তান ছিলেন কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠেন, বড় বড় সভা-সমিতিতে যান, রাজা-মহারাজেরা তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন; কিন্তু পাল-মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি অনাবৃত দেহে বাজার হইতে জিনিষপত্র কিনিয়া আনেন, সংসারের সকল কাজই করিয়া থাকেন। একদিন কালীপ্রসন্ন দেখিলেন, তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া পাল-মহাশয় চাপকান আঁটিয়া ঘড়ীর চেইন ঝুলাইয়া কোথায় যাইতেছেন এবং পশ্চাতে আতপতাপে দগ্ধ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বাজার হইতে তরী-তরকারী কিনিয়া বাটী ফিরিতেছেন। কালীপ্রসন্নের চোখে এই দৃশ্য এত অসহ্য বোধ হইল যে, তিনি উপর হইতে গম্ভীরভাবে পালমহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "পাল-মহাশয়! পাল-মহাশয়! আপনি কোথা হইতে এমন ভাল ভাল চাকর পান? আমাদের চাকর-ব্যাটারা ত দিন-রাত পড়ে পড়ে ঘুমায়! আপনার চাকরটি ত' বেশ! দেখিতেছি, এই রৌদ্রে বারবার বাজারে আনাগোনা করিতেছে। বুড়া মানুষ—কম মোটটীও ত' বহিয়া লইয়া যাইতেছে না!" বলা বাহুল্য, পাল-মহাশয় ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং বৃদ্ধ যে তাঁহার পিতা, এ-কথাও কালীপ্রসন্নকে জানাইলেন। কালীপ্রসন্ন যেন কিছুই জানেন না এমনই ভাব দেখাইয়া তাঁহার ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বেশভূষায় আড়ম্বরহীনতা। পুণ্য-স্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কালীপ্রসন্ন আদর্শ পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা, পরোপকার-প্রবৃত্তি, সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস প্রভৃতি সমস্তই কালীপ্রসন্ন, বিদ্যা-সাগরের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তিনিও বিদ্যাসাগরের অনেক গুণেরই অনুকরণ করিয়াছিলেন। বেশভূষায় তিনি তাঁহারই মত আড়ম্বরহীন ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মত তিনিও ধুতির উপর সামান্য একখানি চাদর খুলিয়া গায়ে দিতেন। একবার একপ্রকার ঢাকাই উড়ানির

ফ্যাসান উঠে। উড়ানির মূল্য এত বেশী যে, খুব ধনী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও তাহা কিনিবার সামর্থ্য ছিল না। একবার সহরের একজন প্রসিদ্ধ ধনী সেইরূপ একখানি উড়ানি গায়ে দিয়া কালীপ্রসন্নের বাটীতে পূজার নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়া দেখেন যে, কালীপ্রসন্ন একখানি সামান্য দেশী চাদর গায়ে দিয়া বেড়াইতেছেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনের দিকে কালীপ্রসন্নের লক্ষ্য নাই, এমন সুন্দর শিল্পকার্য্যের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন না বলিয়া সেই ধনী ব্যক্তি কালীপ্রসন্নের নিকট অনুযোগ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় বিস্মিত হইয়া তিনি দেখিলেন, কালীপ্রসন্ন সেইরূপ উড়ানি অনেকগুলি ক্রয় করিয়াছেন এবং তাঁহার বাটীর সমস্ত সরকার ও ভৃত্যদিগকে সেই উড়ানি এক-একখানি দান করিয়াছেন!

(৩) রামনারায়ণ তর্করত্ন

("নাটুকে নারা'ণ")

বাক্‌চাতুর্য্য ও রসিকতা।

রামনারায়ণ কবিরত্নের নাটক ও প্রহসন গুলিতে তাঁহার রসরচনার ও বাক্‌চাতুর্য্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তর্করত্ন-মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য, সুলেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের নিকট তর্করত্ন মহাশয়-সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প শুনিয়াছিলাম। তাহার কয়েকটি এস্থলে বিবৃত করিতেছি :—

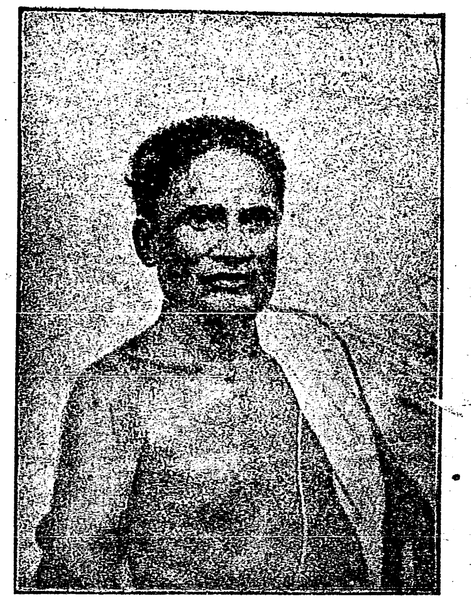

রামনারায়ণ তর্করত্ন

একসময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী আশু-তোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-বিদায় হইতেছিল। ছাতুবাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিতেছিলেন। একজন ব্রাহ্মণকে ছাতুবাবু তিনটাকা বিদায় দিলেন। তারপর তরুণবয়স্ক রামনারায়ণ তর্করত্ন-মহাশয়কে দুইটী টাকা দিলেন। তর্করত্ন-মহাশয় দুইটী টাকা পাইয়া ছাতুবাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আমার প্রতি পক্ষপাত '(৩) করিলেন! আমার প্রতিও নেত্রপাত করুন না?" ছাতুবাবু তর্করত্ন-মহাশয়ের বাক্‌-চাতুর্য্যে প্রীত হইলেন কিন্তু আমোদ করিবার জন্য বলিলেন, "তর্করত্ন-মহাশয়,

(৩) 'দুই'য়ে পক্ষ, 'তিনে' নেত্র।

ত্রিনেত্র কেবল মহাদেবেই সম্ভবে, মানুষের ত' ত্রিনেত্র নাই।"

ইহাতে তর্করত্ন মহাশয়, বলিলেন, "আপনাকে ত আমরা আশুতোষ বলিয়াই জানি। ত্রিনেত্র কেন? পঞ্চানন আশুতোষের পঞ্চমুখে পঞ্চদশ নৃত্য আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।" তর্করত্ন-মহাশয়ের এই বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া ছাতুবাবু তাঁহাকে পঞ্চদশ মুদ্রা বিদায় দিলেন এবং তদবধি তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতেন।

তর্করত্ন-মহাশয়ের নাটকাদি প্রকাশিত হইলে অনেক ধনী ব্যক্তি বহুব্যয়ে সেগুলি আপনাদের আবাসে অভিনয় করাইতেন। সকলেই তর্করত্ন-মহাশয়কে শ্রদ্ধা করিতেন। ধনীদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে তর্করত্ন-মহাশয় পদধূলি দিতেন। একদিন তিনি কলিকাতায় কোন এক বিখ্যাত ধনীর বাটীতে গিয়া দেখিলেন, সেই বাটীর একজন যুবক কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে নানাপ্রকার অখাদ্য ও অপেয় ভোজন এবং পান করিতেছেন। তর্করত্ন-মহাশয়কে দেখিয়া একজন তরলমস্তিষ্ক যুবক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আসুন, তর্করত্ন-মহাশয়, আসুন, আসুন, আমাদের সহিত একটু 'খানা' খান।" তর্করত্ন-মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওহে বাবুরা, তোমরা সহুরে লোক, তোমরা 'খানা' খাও। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, আমরা খানায় (পয়ঃপ্রণালীতে) মলমূত্রাদিই ত্যাগ করিয়া থাকি।" উপযুক্ত উত্তর পাইয়া যুবকগণ নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

একবার ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে তর্করত্ন-মহাশয় পদার্পণ করিলে, উপস্থিত ব্যক্তিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে কে আছিস্, তর্করত্ন-মহাশয় আসিয়াছেন, (বসিবার জন্য) চৌকী দে!" তর্করত্ন-মহাশয় ইহা শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হা কপাল, আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, চোর নহি, ডাকাতও নহি, আমাদেরও চৌকী দিতে হইবে?"

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিতও তর্করত্ন-মহাশয় রসিকতা করিতে ছাড়িতেন না। পুলিনবাবু বলেন যে, তাঁহার অন্যতম সহপাঠী "যাদবকিশোর গোস্বামী"কে তর্করত্ন-মহাশয় রহস্য করিয়া ডাকিতেন, যাদব কি-শোর (শূকর)। পড়ায় অমনোযোগী ছিলেন বলিয়া উমেশ নামক অপর এক ছাত্রকে সম্বোধন করিতেন, উ ভো মেষ!

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

লুকিবিদ্যে

টিকটিকি, গীরগিটি, মশা, মাছি, ঘুঘু, গায়ে-পড়া-আলাপী, ঘাড়ে-চড়া-বন্ধু,—এক কথায় সমস্ত পরকীয়া-সাধকদের দলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখা চলে এমন লুকিবিদ্যেটা আংটি কোরে কর্ত্তা আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুনে আমাদের কৌতূহলের সীমা রইল না। আমরা আংটির কেচ্ছা শোনবার জন্যে কর্ত্তাকে চেপে ধরলেম। কোন্ সূত্রে, কোন্‌খান থেকে, আংটিটা তাঁর আঙুলের গাঁটে এসে যে আটকে রইল সেটা জানাতে কর্ত্তা নারাজ। কাজেই কাণ্ডের আদিপর্ব্বের শেষ থেকে তিনি আরম্ভ করলেন—

"অন্যের দেশালাইয়ের বাক্স যেমন করে অজান্তে সময়ে-অসময়ে আমাদের পকেটে থেকে যায়, তেমনি করে রাং এবং সীসা এই দুই ধাতু দিয়ে গড়া লুকিবিদ্যের এ আংটি হাতে নিয়ে সুন্দরবনের অঘোর-পন্থীদের আড্ডা ছেড়ে হাঁটা-পথে অনেক ঘুরতে-ঘুরতে শেষে আমি তমলুকে এসে হাজির। তমলুক খুব একটা ভারি সহর। সেখানে আমি একবার ছেলেবেলায় আমার বড়মামার সঙ্গে গিয়েছিলুম। মামা তখন ফুরুস্ কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি। সাহেবটা যে পাজি ছিল তা আর কি বলবো! একবার এক কেরানি তার কাছে বাপ মরে বোলে ছুটি চাইতে সে বল্লে কিনা—"ইয়োর ফাদার হেজ্ নো বিজ্‌নেস টু ডাই হোয়েন্ বজেট প্রেসার ইজ গোয়িং অন্!" দেখো দেখি, বাপ্ মরে, তাকে কিনা এই কথা! সেকালের সাহেব দু-একটা ভালও ছিলো। টুনি—সে বড় মজার সাহেব ছিল। ধুতি পোরে সে কালী-পুজোর যাত্রা শুনতে যেত। তার পাখি শিকারে ভারি সখ। সেটার এক রোগ ছিল এই যে পাখিটাকে মেরেই আগে তার ল্যাজটা কেটে নেবে! সেইজন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল ল্যাজকাটা টুনটুনি। সে প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ফৌজের ডাক্তার হয়ে। তারপর মিউটিনির কিছু আগে একটা নীলকরের মেয়েকে বিয়ে কোরে কোন্ বড় মিলিটারি পোষ্টে বহাল হয়ে সাংহাই চলে যায়। সেইখেনে বসে লোকটা সাংহাই টু ইণ্ডিয়া একটা রেল খোলবার প্ল্যান হোম গর্ভমেণ্টকে পাঠায়। তখন চীনে মিস্ত্রী আসতো জাহাজে কোরে, আমরা দেখেছি। —ঐ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের দুধারে জুতোওয়ালা। সন্ধ্যাবেলা ছুরি-হাতে তারা ঘুরে বেড়াতো। যত সেলার আর চীনের আড্ডা ছিল ওই খানটায়! ব্যাটারা যে জুতো বানাতো বাপু, তেমন জুতো এখন পাওয়াই যায় না। ওই 'আচীন্'—ওর অনেক দিনের দোকান। আমার জ্যাঠার মামাশ্বশুর—তিনি ওই দোকান থেকে জুতো নিতেন। সেকালে তাঁর মতো সৌখিন ছিলনা। ওই যেখানটায় এখন রিপণ কালেজ হয়েছে, ওইটে ছিল তাঁর বৈঠকখানা। তাঁর বাগানে একটা

সাদা চাঁপার গাছ ছিল, তাই থেকে ও-পাড়াটার নাম হয়েছিল চাঁপাতলা! শুনেছি সেই চাঁপাফুলে তাঁর দোলমঞ্চ সাজানো হতো! দেলোয়ার খাঁর নাম শুনেছো তো? —ওই তারি ওস্তাদ তাঁর কাছে চাকর ছিল। ওই মিস্‌নারিরা ছিরামপুরের তাঁর বাগানখানা কিনে প্রথম ছাপাখানা বসায়। তখন সব কাঠের টাইপ্। রামধন বলে এক ব্যাটা যে কারিকর ছিল তার মতো পরিষ্কার অক্ষর কাটতে কেউ পারতো না বাপু! তার বংশের একটা ছোঁড়া এখন আমাদের পাড়ায় ওষুধের দোকান কোরে ডাক্তার হয়ে বসেছে। সবপ্রথম এদেশে বিলিতি ওষুধের ডাক্তারখানা খোলেন আমাদের নাকাসি-পাড়ার শ্যাম-ডাক্তার। সাহেবরা তাঁর ওষুধ ছাড়া খেত না। কবিরাজগুলো কিন্তু তাতে বড় চটে ছিল—চটবারই কথা!"

আমরাও কর্ত্তার গল্পের বহর দেখে যে না চটেছিলুম তা নয়। কথাটা আংটি থেকে কবিরাজি শাস্ত্র, সেখান থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস, মামাশ্বশুরের রূপবর্ণন, মিস্‌নারিদের জুয়োচুরি, ব্রাহ্মদের ভণ্ডামো, চৈতন্যদেবের কয় পার্ষদের সঠিক জীবন-বৃত্তান্তে এসে পৌঁছল। তারপর বুদ্ধের দাঁতের হিসেব থেকে ক্রমে যখন রাসমণির মন্দির যে-মিস্ত্রি বানিয়েছিল সে যে হিন্দু নয়—মুসলমান, এবং তার নাতির নাতি এখন পোর্ট-কমিশনারের এই জাহাজের খালাসী হয়েছে —এই রকম একটা জটিল সমস্যাতে এসে পড়লো তখন আমাদের জাহাজ প্রায় বড়বাজার পৌঁচেছে! আমি অবিনের গা-টিপে বল্লেম,—"ওহে লুকিবিদ্যেটা কি পুকুরেই থাকবে? আংটিটার তো কোনো সন্ধান পাচ্ছিনে!"

"তার পর আংটিটার কি হলো কর্ত্তা?" —বলেই অবিন চোখ বুজ্‌লে। গল্প চল্লো—

"লুকিবিদ্যে বড় সহজ বিদ্যে নয়। রাজা কেষ্টচন্দরের সভায় নবরত্নের এক রত্ন রসসাগর, তিনি লুকিবিদ্যে জানতেন। লর্ড ক্লাইবের জীনব-চরিতে এই রসসাগরের লুকি-বিদ্যের কথা লেখা আছে—"

লর্ড ক্লাইব থেকে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখান থেকে ব্লাক হোল ও সমস্ত বাংলার ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে গল্প ক্রমে রুমের বাদশার কত টাকা, রামমোহন সাহা কি দিয়ে ভাত খেতেন—এমনি সব ঘরাও খবর আবিষ্কার করতে করতে বড়বাজারের পণ্টুনের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চল্লো—আংটির দিক দিয়েও গেলনা! কর্ত্তার শেষ-বক্তব্য দেশের এক নমস্য ব্যক্তির নামে একটা কুৎসা। ভদ্রলোকটির খুব আত্মীয়রাও যে খবর ঘুণাক্ষরে জানেনা এমন একটা গোপনীয় সংবাদ চুপিচুপি জাহাজের সকলকে জানিয়ে এবং কাউকে বলতে মানা কোরে দিয়ে কর্ত্তা ডাঙায় পা দিলেন!

আমি অবিনকে বল্লেম—"ওহে, যথার্থই কর্ত্তা লুকিবিদ্যে জানেন। গল্পটা কিছুতেই ধরা গেলনা!"

অবিন খুব গম্ভীর হয়ে বল্লে—"আমি ওই জন্যেইতো ওঁর নাম দিয়েছি আবিষ্কর্ত্তা! নিজের খবর এর কাছে লুকোনো থাকে, আর পরের গোপনীয় খবর আবিষ্কৃত হয় এঁর কাছে ওই আংটির প্রভাবে। পরের ছোটখাটো

ব্যবহারের জিনিষ—চুরুট, দেশলাই, পান মায় তাদের ডিবে, এঁর পকেটে আপনি-গিয়ে প্রবেশ করে; পরের লাঠি, ছাতা, বই ইত্যাদির মতো সামগ্রী আপনি-গিয়ে হাতে ওঠে। পরের বিদ্যের ইনি পণ্ডিত; পরচর্চ্চায় ইনি অদ্বিতীয় পরকীয়া-সাধক; ইনি পরের যা-কিছু পার করবার কর্ত্তা,—আপনার কেউ নয় অথচ আমারও কেউ নয়।"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নারীর অধিকার

(ক্রুপটকিন হইতে)

মূলধনী মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেলে সমাজের শান্তি বাড়বে, কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যাবে এবং দেহ ও মনের উপর অহিতকর-জবরদস্তির দাসত্ব লোপ পাবে এমনতর আশ্বাস যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা এতদিন সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। এই হাসির মধ্যে অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস যতই থাক্ তাদের স্বার্থহানির ভয়টুকুই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁরা যতই অন্ধ হোন এ ক্ষেত্রে আজ-পর্য্যন্ত যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তা সাধারণের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। দিনের পর দিন পরিশ্রম করে' যারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তারা ভাল করে' জানে এ ব্যবস্থায় পরিশ্রমের কত লাঘব হয়।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারের মত কল-কারখানাও যে স্বাস্থ্যসুখের আবাসে পরিণত হতে পারে এবং তাতে সুফলও যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, এ কথা বোধ হয় নতুন করে' বুঝিয়ে দেবার দরকার হবে না। বেশ প্রশস্ত ও বায়ুচলাচল-যুক্ত কারখানায় কর্ম্মীরা স্ফূর্ত্তিতে কাজ করবার সুবিধা পায়; তাতে কাজের পরিমাণও বেড়ে যায়। সময় ও দৈহিক পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে যন্ত্রের উন্নতি সাধনের উপায় অবলম্বন খুব কঠিন ব্যাপার নয়। বর্ত্তমানে কল-কারখানা যে অস্বাস্থ্যকর ও দূষিত, তার কারণ কারখানার ব্যবস্থার মধ্যে কর্ম্মীর কোন হাত নেই, তার সঙ্গে প্রাণের কোন যোগ নেই। কাজেই কল-কারখানায় দেশের যতই সুবিধা হোক, তাতে মানব-শক্তির অপব্যয়ও যে হচ্ছে, এ-কথা কোন মতে অস্বীকার করা চলে না।

মানব-শক্তির অপব্যয় সম্বন্ধে সাধারণত অমনোযোগী হওয়া অধিকাংশ কারখানার বিশেষ লক্ষণ হলেও বর্ত্তমানে এমন কারখানার অভাব নেই যেখানকার সুচারু বন্দোবস্তের ফলে কর্ম্মীজন কাজের মধ্যে বেশ আনন্দ পায়। অবশ্য এ-কথা বিশেষ করে' মনে রাখতে হবে যে, চার-পাঁচঘণ্টার

বেশী কাউকে কাজ করতে হবেনা এবং প্রত্যেকের ইচ্ছা ও রুচি-অনুযায়ী কাজের বদল করবার যথেষ্ট অধিকার থাকবে। পুরানো বন্দোবস্ত-মত সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্যে মানুষের মন স্ফূর্ত্তি পেতে পারেনা; কারণ সেটা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

আমরা আশা করি, কেবলমাত্র কল-কারখানায় নয় খনিতেও এ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হবে। বর্ত্তমানে খনির অবস্থা নরকের মত ভীষণ হলেও নতুন বন্দোবস্তে ভবিষ্যতে সেটা বায়ুচলাচলযুক্ত হবে এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাপ ও শৈত্য রক্ষার ব্যবস্থা হবে। এতদিন সেই অন্ধকারের মধ্যে মানুষ আর জানোয়ার জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি করে' মরেছে, নানা রকম উৎপাতে কত অমূল্য জীবন অকালে হেলায় নষ্ট হয়েছে, এবার তার অবসানের সূচনা। যন্ত্রপাঁতির সাহায্যে শুধু শ্রম-লাঘব নয়, যাতে ভবিষ্যতে কোন বিপদ না ঘটতে পারে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখব। আমাদের আশা ও সাধনাকে স্বপ্ন ও ব্যর্থতা বলে উড়িয়ে দিলে কেবল-মাত্র অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হবে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ঐরূপ দু-একটি খনি আছে। উপস্থিত তার মধ্যে যা-কিছু ত্রুটি আছে, পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এ-বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে সময় নষ্ট করায় কোন লাভ নেই—'সোসিয়ালিষ্ট' দলের চেষ্টায় এ-সব কথার সবিস্তার আলোচনা বহুবার হয়েছে এবং এর আদর্শ ও কার্য্যকারিতার একটা নক্সা তাঁরা আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে কাজ করে' লোকে নিজেকে যেমন সুস্থ, নিরাপদ ও সুখী মনে করে, তেমনি কল-কারখানা ও খনি প্রভৃতিতেও যাতে সেরূপ হয়—সেই আদর্শে সেগুলিকে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের বন্দোবস্ত যত সুন্দর ও উপযোগী হবে কাজও সেই পরিমাণে প্রচুর ফলদায়ক হবে, এর অন্যথা হতে পারে না।

অভাবের তাড়নায় যে-কোন কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য না হলে, শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে পরের কাছে আত্মবিক্রয় দরকার না হলে, সমাজে সাধারণের জন্যে একযোগে কাজ করা কর্ম্মীর কাছে খেলা বা উৎসব বলে মনে হবে। কাজ ত দায় নয়, গ্রহ নয়, সে যে অসীম জীবন-শক্তির আনন্দময় বিকাশ! জৈব ক্রিয়ার মত সে যে জীবনের অঙ্গ। বর্ত্তমানের এই দেহ ও মনের-পক্ষে-অসুখকর-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকবে তারা, দাসত্ব যাদের অস্থিমজ্জায়, পরপ্রসাদ-লেহন যাদের জীবনের লক্ষ্য, আপনার উপরে যাদের কোন বিশ্বাস নেই, নিজের শক্তিতে যাদের শ্রদ্ধার অভাব! বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে সরিয়ে নিজেদের সুবিধামত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে তারা, যারা মানুষকে জানে, স্বাধীনতাকে পূজা করে। কেবলমাত্র নিজের বা আত্মজনের সুখ-স্বাধীনতা নয়, সমাজের জন্যই তারা পরিবর্ত্তনসাধনে প্রয়াসী হবে। প্রথম প্রথম মাত্র দু এক জায়গায় এ ব্যবস্থা চলবে, কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের সেই দিনের

প্রতীক্ষা করছি যেদিন আজিকার ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়মে পরিণত হবে।

এতক্ষণ আমরা বাইরের কথা বলেছি, কিন্তু ঘরের কথার বিশদ আলোচনাই এ প্রবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য। গৃহস্থালীর মধ্যে নতুন নিয়ম-প্রবর্ত্তন যে অবশ্য-বাঞ্ছনীয় —সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলে তা অবশ্যম্ভাবী। মানব-জাতির ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি জানেন, এ পর্য্যন্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সংসারের সকল কাজ, সকল দায়িত্বের ভার অবনত শিরে বহন করেছে মানব-সাধারণের দাসী—নারী! কেমন করে' তাঁদের কাঁধে এ ভার চেপেছে, কত অসহ্য অত্যাচার, কত অপমানের মধ্যে তাঁদের এই বাধ্য-পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, তার ইতিহাস-আলোচনার এ সময় নয়। বর্ত্তমানে নারী সমাজের যে পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিতা, তাঁকে সেখান থেকে উন্নত স্থানে বসাবার জন্যে আমরা কি করতে পারি এবং তাঁদের বিরক্তিকর ও মিথ্যা কর্ম্মভার দূর করবার সুচারু উপায় কি, তারই আলোচনা করা যাক্।

বাইরের কোন শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন, কিন্তু সেটা ঘরের দাসত্বের মত এত কঠিন নয়,—এ পথে বাধা বিস্তর। নারীর এই দাসত্ব-বন্ধন যে অচ্ছেদ্য, তার প্রধান কারণ সেটা সনাতন। কেবল বাইরের শক্তি নয়, মনের স্বাধীনতা ভিন্ন এ-থেকে মুক্তি লাভের কোন উপায় নেই। আজ যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণবিসর্জ্জনে উন্মুখ, নারীর অধিকার-আলোচনার পথে তাঁরা কাঁটার মত অগুন্তি প্রতিবাদ সাজিয়ে রেখেছেন। কারণ এ ব্যবস্থা অ-ভূতপূর্ব্ব। আমরা মুখে যতই বলি নারী আমাদের সহকর্ম্মিনী, সহধর্ম্মিণী, কিন্তু কাজের বেলায় তাদের কাছে কেবলমাত্র দাসোচিত বাধ্যতাটুকুই আমরা আশা করি এবং তার কোনরূপ অন্যথা হলেই চঞ্চল ও বিরক্ত হয়ে উঠি। যতদিন আমাদের মন থেকে এই মিথ্যা অন্ধ সংস্কার দূরীভূত করবার চেষ্টা না হবে, ততদিন এ অন্যায় কোন-না-কোন রকমে থাকবেই। কিন্তু সব-চেয়ে বড় আশার কথা এই যে, এতদিনে নারী আপনার অধিকার বুঝে নেবার জন্যে অগ্রসর এবং এতদিনের সংস্কারকে সমূলে উচ্ছেদ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁদের সে চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে পরে তার আলোচনা হবে।

আমাদের ব্যবস্থাকে সার্থক করে' তুলতে হলে, নর-নারীর সমান অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে গৃহস্থালীকে বিসর্জ্জন দিতে হবে,—এমন একটা কথা আমরা শুনেছি। অনেকে বলছেন, হোটেল খুলে বা ঐ-রকম কোন বন্দোবস্ত করে' নারীর দাসত্বের উচ্ছেদ-সাধনই প্রকৃষ্ট উপায়! হোটেল যদি কর্ম্মীজীবনের মিলন-কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তবে আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই; কিন্তু এ ব্যবস্থাটা যদি তাদের উপর চাপানো যায়, তবে সেটা কোনমতেই সুখের হবে না। এবং তারা যে এ বন্দোবস্ত স্বীকার করে' নেবে, এ-কথা আমরা মনে করি না। নিজেকে সকলের

কাছ থেকে একেবারে তফাৎ রাখাও নয়, কিম্বা আর-সবায়ের সঙ্গে হট্টগোল করাও নয়, কিন্তু ঐ দুটোর উপযুক্ত মিশ্রণই সাধারণের অভিপ্রেত। সাধারণ কারাগারের কষ্ট মানুষের কাছে যে অসহ্য হয়ে ওঠে, তার কারণ সেখানে নির্জ্জনতা নেই; আর নির্জ্জন কারাবাস যে অত্যাচার বলে মনে হয়, তার কারণ সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলা-মেশার কোন উপায় নেই। মানুষের জীবনে দুটোরই দাম আছে, কোন-একটাকে স্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব।

কেবলমাত্র হিসাব খতিয়ে যারা সংসারে বাঁচতে চায় তারাই হোটেলখানার কথা তুলবে। ভবিষ্যতের গৃহস্থালীর আদর্শ যাঁদের কাছে সুপরিস্ফুট, নর-নারীর স্বেচ্ছা-সমবায় ও পরস্পরের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি যাঁদের অভিপ্রেত, তাঁরাই জানেন মানুষের পক্ষে গার্হস্থ্য-জীবন কত সুন্দর, কত মহৎ। বিপদকে এড়িয়ে নয়, তার সামনে এগিয়ে যাওয়াই সুপরামর্শ। আজিকার সংসারে নারীর পক্ষে যা বন্ধন, নারীর চেষ্টায় ও পুরুষের সহানুভূতিতে ভবিষ্যতে তাই তার মুক্তির সহায়ক হবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

আবার আর একদল আছেন, যাঁরা সামঞ্জস্য করতে চান। তাঁরা হোটেল প্রভৃতির পক্ষপাতী নন। পুরুষেরা কলে-কারখানায় হাটে মাঠে কাজ করবেন আর নারী সংসারের সকল দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেবেন—তাঁরা এই কথাটাই প্রচার করছেন। তাঁদের কথা বলবার ধারা নতুন হতে পারে, কিন্তু কথাটা যে নিতান্ত পুরানো, একথা আমাদের অজ্ঞাত নেই। এককথায়, পূর্ব্বের মতই নারী সংসারে দাসীবৃত্তি করুন আর আমরা ক্রমেই এগিয়ে চলি। আমরা যে-সব কাজ যন্ত্র বলে মনে করি, সেই কাজ নারী হাতে করে' দিনের পর দিন করে' যান, এ-কথা বলতে পারেন তাঁরা, নিজেদের স্বার্থটুকুই জগতে যাঁরা সব-চেয়ে বড় জিনিষ বলে জেনেছেন।

কিন্তু মানুষের এই মুক্তি-ক্ষেত্রে নারী আজ তাঁর দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ভার-বাহী পশু-জীবনের প্রতি তাঁর সুগভীর ধিক্কার জন্মেছে। সন্তান-পালন-ব্রতে তাঁদের জীবনের যে কয় বছর ব্যয়িত হয় তার সকল ক্লেশ ও চেষ্টাই তাঁর জীবনের সব-চেয়ে বড় কাজ, এই কথাটা তাঁরা প্রচার করছেন। কেবলমাত্র আশ্রয় ও দেহ-ধারণের বিনিময়ে পুরুষের কাছে দাসত্ব-স্বীকারে তাঁরা নারাজ—সংসারের ভিতরের সকল রকমের বাধ্যতা থেকে মুক্তি-লাভের জন্যে নারী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কেবল কাগজে-কলমে আন্দোলন করে' তাঁরা ক্ষান্ত হন নি, তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় নারী আজ স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হবার সাধনায় ব্রতী। আমেরিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ ও বিস্তৃত আন্দোলনের ফলে সেখানে দাসী পাওয়া ভার। নারী আজ অন্ধকার রান্নাঘর ছেড়ে দেশের কাজে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু গৃহস্থালীর কাজ করবার মত দাসী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় একটা সমস্যা খুব জটিল হয়ে

উঠেছে—সবাই বলছে, ঘরের কাজ করবে কে? এর উত্তর এই:

যার অভাব, সে যদি নিজে সেটা মেটাবার উপায় না করে, তবে অপরে সেটা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারে না। স্বাধীনতা-কামী নারী এ কথাটা বিশেষ-ভাবে বুঝেছেন এবং তার ফলে সমস্যার সমাধান খুব সহজ হয়ে গেছে। আজ মার্কিন গৃহস্থালীর বারো-আনা কাজ যন্ত্র-পাতির সাহায্যে অল্পসময়ে প্রায় বিনা-পরিশ্রমে সম্পন্ন হচ্ছে। কয়েকটী উদাহরণে কথাটা পরিষ্কার করতে চাই।

একটা জুতার উপর ২০।৩০ বার একটা ব্রুস নিয়ে ঘষা খুবই হাস্যকর ব্যাপার, কিন্তু প্রত্যহ সকালে যে সকল নারীকে এই কাজ করতে হয় তাঁরা এটাকে অপমান-জনক বলেই মনে করেন। এখন এ অপমান ঘুচেছে। উদ্যোগী জনের চেষ্টায় একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে। বড় বড় হোটেলে, স্কুলে আজকাল এই যন্ত্রের বহুল প্রচার। তার পর বাসন মাজা! মেয়েদের কাছে এ-কাজটা কত বিরক্তিকর, কত ঘৃণ্য তা তাঁরাই জানেন। বাসনমাজা কলটি একটী স্ত্রীলোকের উদ্ভাবিত। সকলের পক্ষে এটী অনায়াস-লভ্য, কাজেই দাসীর সাহায্য-ব্যতিরেকে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অনেক বাসন একেবারে মাজা চলে।

এ সমস্ত কল তৈরী করা খুব কঠিন ত নয়ই, ব্যয়সাধ্যও নয়। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে মহাজনের লাভের জন্যই এ সব জিনিষ বেশী সস্তা হয়নি, ভবিষ্যতে এগুলি মানব-সাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠবে। কেবল যে যন্ত্র-পাতির সহায়তায় ঘরের কাজের দায় ঘুচবে তা নয়—এতদিন প্রতি পরিবার আলাদা করে' নিজেদের জন্যে যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করত, এবার পরস্পরের স্বেচ্ছা-মিলনের ফলে তা কম খরচেও সম্পন্ন হবে। নানা রকমের সমিতি স্থাপিত হবে এবং তাদের হাতে এক একটী বিশেষ কাজের ভার থাকবে। ছোট খাট কল তৈরী করে' আমরা নিশ্চিন্ত থাকবনা। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে নানারূপ উন্নতি সাধিত হবে এবং তার ফলে জীবন-যাত্রা আরও সুন্দর, সুখময় ও ফলপ্রদ হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে খুঁটীনাটীর বিশদ আলোচনার সময় নেই নতুবা বলা বাহুল্য গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম্মই এই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপেই করা সম্ভব।

এই সমস্ত বিরক্তিকর ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ নারী অবনত মুখে করে' এসেছেন, তার কারণ এসব ভাববার জন্য পুরুষের কোন দায়িত্ব ছিল না। নিজেদের কাজ ও উন্নতির স্বপ্নে তারা এতই বিভোর যে নারীর কথাটা তারা চিন্তা করবার সময় পায়নি অথবা নারীজনোচিত কাজকে তারা পুরুষোচিত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে! কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নারী নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে' তার দেহের কাপড়, আর পেটের অন্ন জুগিয়েছে অথচ এই দাসীত্বের পরিবর্ত্তে সে লাভ করেছে অজস্র লাঞ্ছনা, অসহ্য অত্যাচার! তাঁর এই আত্মত্যাগকে সে শ্রদ্ধা করতে পারেনি। তার ফল অবশ্য মানবসাধারণের

পক্ষেই সুখের হয়নি সে কথা বলা বাহুল্য। নারীকে পিছনে রেখেছি বলে তাঁরা যে এতদিন আমাদের পিছনেই টেনেছেন আমরা অন্ধতা-বশত তা বুঝতেও পারিনি। আমাদের সে অন্ধতা ঘুচেছে এইটাই বর্ত্তমানের সবচেয়ে বড় আশার কথা।

বিশ্ববিদ্যালয় ও আদালতের সদর ফটক ও রাজনৈতিক অধিকারের খিড়কী দরজা মুক্ত করে' দেওয়াই যে নারীকে মুক্তি দেওয়া, এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। সংসারের নানারকম অসম্ভব অকাজের দায় থেকে মুক্তিই তার প্রকৃষ্ট পন্থা। সংসারের দাসীত্ব থেকে তাঁর যতদিন না মুক্তি হবে ততদিন উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত কারণ উচ্চশিক্ষিতা ও অধিকার-প্রাপ্তা নারী অশিক্ষিতা নারীর পরে গৃহস্থালীর কাজ চাপাতে কুণ্ঠিত হবেন না। পুরুষ যেমন করে' এতদিন পুরুষের উপর প্রভুত্ব করেছে নারীও তেমনি করে আপনার প্রভুত্ব জাহির করবে। ভবিষ্যতের গৃহস্থালীর দিকে লক্ষ্য রেখে সামাজিক পরিবর্ত্তন-সাধনে যাঁরা প্রয়াসী, তাঁরা একথাটা যেন কোন রকমে ভুলে না যান। ভবিষ্যতে নারীকে এমন সুযোগ দিতে হবে যাতে সন্তান-পালন করেও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে যোগ দেবার তাঁর যথেষ্ট অবকাশ থাকে।

ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানের শত ত্রুটি, শত বাধার মধ্যেও এর সূচনার আভাস আমরা পেয়েছি। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আমরা যতই নিজেদের ভোলাবার চেষ্টা করিনা কেন, নারীর দাসীত্ব না ঘুচলে আমাদের এ বিদ্রোহ মিথ্যা! আমাদের আশা নিষ্ফল! নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের উন্নতির আশা বাঁধা নৌকার চলার মতই অসার কল্পনা মাত্র; এবং এ-কথাও সত্য যে, দাসত্বের নাগপাশবদ্ধ নারীসমাজ বন্ধন-মুক্ত পুরুষ-সমাজের বিরুদ্ধে একদিন বিদ্রোহে অগ্রসর হবেন। ভবিষ্যতের শান্তি যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে আশা করি আমরা এখন থেকে সাবধান হতে দ্বিধা করব না।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

তরুণা

ক

তাদের পরস্পরের প্রথম-পরিচয় হয়—ঘরেও নয় পথেও নয়, একেবারে গহন বনে! জায়গাটি খুব চমৎকার না-হইলেও, তাহাদের আলাপটি প্রথমদিনেই জমিয়া উঠিয়াছিল খুবই চমৎকার!

—অতএব, দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ দিনের কথা রাখিয়া, সেই প্রথমদিনের কথাটাই সবপ্রথমে বলিয়া লইতে চাই।...

গোমো-জংসনে হাওয়া বদ্‌লাইতে আসিয়া, প্রকৃতির রূপ দেখিয়া বসন্ত একেবারে

মোহিত হইয়া গেল। তুমি-আমি প্রকৃতিকে যে চোখে দেখি, বসন্ত ঠিক সে চোখে দেখিল না; কারণ, সে ছিল চিত্রকর—প্রকৃতিকে দেখিল সে শিল্পীর চোখে!

তার পরদিনেই সে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একটি মনের মত জায়গা বাছিয়া, 'চিত্রাধার'টিকে দাঁড় করাইল। তারপর পটের উপরে প্রকৃতিকে আকৃতি দিবার চেষ্টায় একমনে লাগিয়া গেল।

এম্‌নি-করিয়া প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তার ছবি-আঁকা কাজ চলিতে লাগিল।

খ

বসন্তের ছবি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর দু-একদিনেই তুলির কয়েকটি শেষ-স্পর্শে চিত্রখানি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

পশ্চিমের নীলসায়রে রবি-করের রঙিন ঢেউ তখন ক্রমেই মিলাইয়া আসিতেছে; দূরে আকাশভেদী 'পরেশনাথে'র নিথর শিখরে থানকয় ছোটছোট মেঘ পতাকার মত থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বসন্ত অনিমেষে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভাবিতে ছিল, চিত্রকরের হাতে যদি এমন যাদু থাকিত, যাতে-করিয়া ছবির মেঘও ঠিক অমনি ভাবেই কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিত, তাহাহইলে—

তাহাহইলে কি হইত সেটা ঠিকমত বুঝিতে-না-বুঝিতে পিছন হইতে হঠাৎ কামিনী-কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল,—"ও দাদা! ছাখ, ছাখ, কি চমৎকার ছবি!"

সচমকে পিছন ফিরিয়া বসন্ত বিস্মিত নেত্রে দেখিল, একটি তরুণী তাহার ছবির উপরে হেঁট্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাহার পিছনেই একটি যুবক,—সাহেবী পোষাকে।

যুবকটি আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"তরু, দিন-কে-দিন তুমি বড় অভদ্র হয়ে উঠ্‌চ!"

এই ভৎর্সনার স্বরে অপ্রস্তুত হইয়া তরুণী বসন্তের দিকে সসঙ্কোচে চাহিল, লজ্জায় তার গালদুটি রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বসন্তের দিকে ফিরিয়া যুবক বলিল, "মশাই, আপনি কে তা জানিনা, কিন্তু আপনার ছবি-আঁকায় ব্যাঘাত দিলুম বলে ক্ষমা-প্রার্থনা করছি।"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! দশ-জনকে ছাখাবার জন্যেই ছবি-আঁকা! আপনারা যে আমার ছবির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেছেন, এজন্যে আমিই ধন্য!"

বিনয়ে এই অচেনা চিত্রকরটিকে হারানো শক্ত দেখিয়া যুবক আর-কিছু না-বলিয়া ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চিত্রাধারের দিকে অগ্রসর হইল। ছবির এককোণে বসন্ত নিজের নাম-সই করিয়াছিল,—ছবি দেখিতে-দেখিতে যুবকের চোখ হঠাৎ সেই নামের উপরে পড়িল এবং তখনি মুখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "অ্যাঁ, মাসিক কাগজে প্রায়ই যাঁর ছবি দেখি, আপনি কি সেই বসন্তবাবু?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

—"আপনিই বসন্তবাবু!"—বলিয়া মহিলা-টিও দু পা আগাইয়া আসিলেন।

যুবক বিরক্ত স্বরে বলিল, "তরুণা, ফের!"

তরুণা থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি আবার পিছাইয়া গেল।

তারপর বসন্তের দিকে ফিরিয়া যুবক বলিল, "মশাই, আমার এই বোনটি কিছু অন্যায়-রকমের চঞ্চল! তার ওপর ও নিজেও কিছু-কিছু আঁকতে জানে বলে, আজ ওর ছেলেমানুষী যেন বেড়ে উঠেছে!"

তরুণার লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া বসন্ত বলিল, "উনিও ছবি আঁকেন বুঝি? শুনে সুখী হলুম!"

যুবক বলিল, "বসন্তবাবু, আপনাকে এর আগে আর-কখনো দেখি-নি বটে, কিন্তু তবু আমরা আপনাকে ভালরকমেই জানি—আর, বলতে-কি, আমরা আপনার ভক্ত!"

বসন্ত বলিল, "লেখক বা চিত্রকরদের ঐ এক মস্ত সুবিধে আছে, তাঁরা বিদেশ-বিভূঁয়েও পথে-ঘাটে-মাঠে—"

—"এমন-কি পাহাড়ে-পর্ব্বতে, গভীর জঙ্গলেও বন্ধু কুড়িয়ে পান, এই বলতে চান ত? হ্যাঁ বসন্তবাবু, আপনি আমাদের যথার্থই বন্ধু বটে!"

বসন্ত কৃতজ্ঞ স্বরে বলিল, "আমি যে আপনাদের এতটা আনন্দ দিতে পেরেছি, এ আমার ভাগ্যের কথা! কিন্তু আমাদের পরিচয়টা যেন অত্যন্ত একতরফা হোল বলে আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে!"

যুবক হাসিয়া বলিল, "অবশ্য, অবশ্য! আমি হচ্ছি রজতভূষণ সেন আর ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী তরুণা রায়—আমার ভগ্নী। এর-চেয়ে বেশী করে পরিচয় দিতে পারি, আমাদের এমন গুণ আর কিছুই নেই!"

গ

কয়ঘর রেলওয়ে কর্ম্মচারী ছাড়া গোমো-জংসনে লোকজন বড় বেশী নাই; বাঙ্গালী 'বায়ু-ভুক্'রা এখনো এই স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব জায়গাটিকে ভাল-করিয়া চিনিতে পারেন নাই, তাই পূজা বা বড়দিনের ছুটির সময়েও কলিকাতার অসংখ্য বুটের মস্-মসানিতে এবং অট্টহাসির হট্টগোলে গোমোর নীরব পার্ব্বত্য প্রকৃতি সরব হইয়া উঠে না!

কাজেকাজেই এমন নির্জ্জন বিদেশে পরস্পরের দেখা পাইয়া বসন্ত ও রজতভূষণ, দুজনেই বর্ত্তিয়া গেল; এবং তাদের আলাপটাও যথার্থ বন্ধুত্বে পরিণত হইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না।

সেদিন বৈকালের চায়ের বৈঠকে বসন্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা রজতবাবু, আপনার ভগ্নীর স্বামী কি করেন?"

চায়ের পেয়ালায় চিনি দিতে দিতে তরুণা হঠাৎ থামিয়া পড়িল—তার মুখের মৃদু হাসির রেখাটিও সেইসঙ্গে মিলাইয়া গেল।

রজত চায়ের পেয়ালাটা মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার ভগ্নীপতির কথা বলছেন?"

—তরুণা আর সেখানে দাঁড়াইল না, আস্তেআস্তে হেঁটমুখে চলিয়া গেল।

রজত আবার বলিল, "আমার ভগ্নীপতিটি একেবারেই মানুষ নয়, ব্যারিষ্টারী শিখতে বিলেতে গিয়ে সে আর ফেরবার নাম করে না।"—একটু থামিয়া কিছু ইতস্তত করিয়া বলিল, "বোধহয় আর ফিরবেও না!"

বসন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন?"

রজত বলিল, "শুনছি সে নাকি মেম বিয়ে করেছে!"

—"বলেন কি!"

—"হ্যাঁ। আমার বোনের অদৃষ্ট! বাইরে বালিকা হলেও তরুণার মনটা বোধহয় আর তরুণ নেই।"

বসন্ত একটা সিগারেট ধরাইয়া সামনের মাঠের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল—

—রজতও আর কিছু বলিল না।...

খানিক পরে পাণের ডিবা হাতে করিয়া তরুণা ফিরিয়া আসিল। বলিল, "বসন্তবাবু, পাণ খান।"

বসন্ত ব্যথিত দৃষ্টিতে একবার তরুণার দিকে চাহিয়া, ডিবা হইতে একটি পাণ তুলিয়া লইল।

বসন্তের সামনে একখানা বেতের মোড়ায় বসিয়া পড়িয়া তরুণা বলিল, "কাল্‌কে আপনি যে বললেন, আমাকে মডেল করে আপনি একখানি ছবি আঁকিবেন, তার কি হোল বসন্তবাবু?"

তরুণার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে-ভাবিতে বসন্ত বলিল, "না না—সে থাক্, তাতে আপনার কষ্ট হবে!"

তরুণা মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, কিছু কষ্ট হবে না!"

রজত বলিল, "বসন্তবাবু, আপনার ছবির মডেল হোতে তরুর যখন এতই সাধ, তখন আপনি ইতস্তত করছেন কেন?"

বসন্ত তখন রাজি হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে কাল সকাল থেকেই কাজে লাগব!"

তরুণা হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওহো, কি মজা! বসন্তবাবুর ছবির সঙ্গে আমিও অমর হব!"

যুবতী তরুণার সেই বালিকার মত সরল হাসি-হাসি মুখখানির দিকে বসন্ত মুগ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল!... ... ...

আজ একমাস ধরিয়া রোজই সে সকালে-দুপুরে বিকালে-সাঁঝে এই তরুণাকে দেখিতেছে, কিন্তু তার আসল স্বভাবটি কিছুতেই ধরিতে পারিল না! প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির মত তরুণাকে যেন কতক বোঝা যায়, কতক যায় না। সে যখন তার আঁকা ছবিগুলি একটু-আধটু সুধরাইয়া দেয়, তরুণা হয়ত তখন অত্যন্ত অসঙ্কোচে তাহার কাঁধের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অবাক্ হইয়া তার নিপুণ হাতের টানগুলি দেখিতে থাকে! তখন বসন্তই হয়ত ব্যস্ত হইয়া একটু সরিয়া বসিত, কিন্তু তরুণা তাতে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করিত না—তার মত যুবতীর পক্ষে যে এটা অশোভন, এ বুদ্ধি তার মাথায় ঢুকিত না! অথচ তাহার সমস্ত হাবভাবের ভিতরেই এমন একটি সহজ সরলতা থাকিত, যাতে-করিয়া তাকে কেউ বেহায়া বলিয়াও ভাবিতে পারিত না। ... ... কচিবয়সে বাপ-মা হারাইয়া একমাত্র ভাইয়ের হাতে সে মানুষ হইয়াছিল। রজত কিছু পাগ্‌লাটে ধরণের লোক; দুটি জিনিষকে সে সমান-অন্যায়, অসহ ও যুক্তিহীন ভাবিত—বিবাহ এবং বাঙ্গলা মাসিকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা!

এ দুটি জিনিষকে আজ-পর্য্যন্ত সে সন্তর্পনে তফাতে রাখিয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক না-থাকার দরুণ তরুণা পুরুষের মতই স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মেম-শিক্ষয়িত্রীর কাছে সে বই-মুখস্থ করিয়াছিল তোতাপাখীর মত, কিন্তু বাঙ্গালী-মেয়ের যেমন শিক্ষার দরকার তার কিছুই পায় নাই।... ...

বিবাহিত জীবন ভোগ করাও তরুণার কপালে ঘটে নাই। বিবাহের পরেই তার স্বামী রজতের টাকাতেই বিলাতে চলিয়া যান। স্বামীর হাতে লেখা একখানি মাত্র চিঠি তার হাতে আসিয়াছিল—তারপর হইতেই তিনি নীরব। এখন সে এই নীরবতার কারণ শুনিয়াছে—তার স্বামী এখন আর তার নয়, বিলাতে তিনি নূতন সংসার পাতিয়াছেন—হয়ত এতদিনে কতক-গুলি 'অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ানে'র 'ফাদার' হইয়াছেন! কিন্তু এ আঘাত তরুণার কোমল প্রাণে যে কতটা বাজিয়াছিল, তার হাসিখুসি ও নিশ্চিন্ত চঞ্চলতা দেখিয়া বাহির হইতে কেহই সেটা আন্দাজ করিতে পারিত না। নির্ঝরের তরল ধারার তলাতেই যে জমাট্ পাথর থাকে, সংসারের চোখে সে সত্য সহজে ধরা পড়ে না।

ঘ

যেখানে নিভৃত পাহাড়ের শীতল ছায়ায়, একখানি কালো পাথরের গায়ে নিকষে সোনার দাগের মত গুটিকয় শিশিরে-ভেজা হল্‌দে ফুল ফুটিয়াছিল এবং ঠিক তারই তলায়, বাধা পাইয়া নদীর জলতরঙ্গে কলরাগিণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, বসন্ত সেইখানটিতে লইয়া গিয়া তরুণাকে বসাইয়া দিল।

বসন্তের ছবির বিষয়, 'কায়া ও ছায়া।' নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া, এক রূপসী চপলজলে আপনার চঞ্চল রূপের লীলাচ্ছায়া দেখিয়া সরল পুলকে হাসিয়া উঠিতেছে—এই ছিল তার পরিকল্পনা।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এমন করে বসে থাকতে কষ্ট হবে না ত?"

—"না, না, না! কতবার বলব বসন্তবাবু!"

তরুণার রাগ দেখিয়া বসন্ত হাসিয়া বলিল, "বেশ, বেশ, তাহোলেই হোল!"—তারপর, সে ক্ষিপ্রহস্তে ভবিষ্য ছবির একটা মোটামুটি নক্সা আঁকিয়া লইতে লাগিল।

রজতও সঙ্গে আসিয়াছিল। সে মনে-মনে প্রমাদ গণিয়া বলিল, "এদের সময় ত দেখছি তোফা কেটে যাবে—কিন্তু আমি কি করি! আচ্ছা, এদিকে-ওদিকে পা-দুটোকে একটু চালিয়ে নিয়ে আসা যাক্!"—নানা জীবজন্তুর পদচিহ্ন-লেখা নদীর চরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া, রজত আঁকা-বাঁকা তীর ধরিয়া আপনমনে আগাইয়া গেল,—তরুণা বসিয়া-বসিয়া দেখিতে লাগিল, জলের ধারে একটা মহা গম্ভীর বক এক ঠ্যাং তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেও যেন তার মত নিজের ছবি তুলাইতে চায়!

ঙ

এম্‌নি ভাবে কয়েকদিন কাটিল। বসন্ত রোজ সকালে ও বিকালে একমনে ছবি

আঁকে, তরুণা একমনে বসিয়া থাকে, আর তাহাদের ধৈর্য্যের অসীম বহর দেখিয়া রজত মনে-মনে বেজায় গরম হইয়া ওঠে! "এই দুই আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়ে মাঝখান থেকে আমি-বেচারী স্রেফ্ মারা পড়ব দেখছি—উঃ, আর ত পারা যায় না!"

—এই বলিয়া রজত সেদিন বিরক্তিভরে দাঁড়াইয়া হাত ছড়াইয়া আগে একটা মস্ত হাই তুলিল, তারপর আমলকী-বনের ভিতর দিয়া, সামনের পাহাড়ে উঠিতে লাগিল।... ...

ছবি আঁকিতে-আঁকিতে বসন্ত বিভোর চোখে দেখিল, পাথরের উপরে আঁচল ছড়াইয়া তরুণা একগোছা বনফুল তুলিয়া, ঘাসের ডোরে আনমনে তোড়া বাঁধিতেছে; তার প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানি পড়ন্ত রোদে লাল-টুক্‌টুকে হইয়া উঠিয়াছে, চোখদুটি শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িয়াছে।

সেদিনকার মত সে ছবি-আঁকা শেষ করিবে ভাবিতেছে—এমনসময় তরুণা হঠাৎ সভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল, "মাগো—"

—"কি—কি হোল?"

—"সাপ—সা—" তরুণার আড়ষ্ট মুখ দিয়া আর বাক্য সরিল না।

—"সাপ!" বসন্তের হাত হইতে প্যালেট্ ও তুলি খসিয়া পড়িয়া গেল। একলাফে সে তরুণার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—তরুণাও আতঙ্কে অজ্ঞানের মত একেবারে দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের ভিতরে মুখ লুকাইল!

চকিতে পাথরের উপর একটা সাপ কালো বিদ্যুতের মত তীব্রবেগে বাহির হইয়াই মিলাইয়া গেল!... ... বসন্ত অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল;—সর্পভয়ে নয়, তরুণার সেই অভাবিত স্পর্শে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল!

অনেকক্ষণ পরে তরুণা চোখ চাহিয়া মুখ তুলিল—তখনো তার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে, দৃষ্টি স্তম্ভিত, দেহ থর্‌থর্ কাঁপিতেছে! থামিয়া-থামিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "সাপটা চলে গেছে?"

বসন্ত বিহ্বলের মত বলিল, "হুঁ!"

তখন তরুণার হুঁশ্ হইল,—নিজের অবস্থা বুঝিয়া সচমকে সে বসন্তকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল—তার ভয়ভরা পাঙ্গাশ মুখখানি গভীর লজ্জায় আবার আরক্ত হইয়া উঠিল! তরুণার খোঁপা খুলিয়া তার ধব্‌ধবে গৌর গ্রীবার উপরে এলাইয়া পড়িয়াছিল,—বসন্তের দিকে পিছন ফিরিয়া সে ফের নিজের চুল বাঁধিতে লাগিল।

বসন্ত তখনো নির্ব্বাক—নিজের বুকের অধীর স্পন্দন সে বুঝি শুনিতে পাইতেছিল! ... ... তরুণার অপূর্ব্ব স্পর্শটুকু তখনো তার দেহের ভিতরে শিরায়-শিরায় যেন তরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল!

ভাল-করিয়া শালখানা মুড়ি দিয়া তরুণা প্রায় আপনা-আপনি বলিল, "দাদা বুঝি এখনো পাহাড় থেকে নামেন-নি?"

বসন্ত কোন সাড়া দিল না।

অস্তাচলের ভাঙা মেঘে তখন যেন রক্তগঙ্গা বহিতেছে—তাহারই ভিতরে সূর্য্য কখন্ তলাইয়া গিয়াছে,—কেউ তা লক্ষ্য করে নাই। চারিদিক নীরব নির্জ্জন—শুধু অশ্রান্ত নদীর শান্ত কল্লোলের সঙ্গে মাঝে-

মাঝে দূর হইতে দু-একটা পাখীর স্বর ও গৃহগামী গাভীর ডাক হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে।

বনভূমির একান্ত স্তব্ধতায় তরুণার প্রাণটা কেমন দুপ্‌দুপ্‌ করিয়া উঠিল। শোনা যায়-কি-না-যায় এমনি স্বরে সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "বসন্তবাবু, চলুন বাড়ী যাই!"

যেন স্বপ্ন দেখিতেছে—ঠিক তেমনিভাবে চাহিয়া বসন্ত আস্তেআস্তে ডাকিল, "তরুণা, —তরুণা!"

নাম ধরিয়া বসন্ত এই তাকে প্রথম ডাকিল! তরুণা চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বসন্ত অপলক চোখে তার মুখপানে তাকাইয়া আছে—সে দৃষ্টির সামনে শিহরিয়া উঠিয়া সে আবার মাথা নীচু করিল। ··· ··· ··· সেও যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের মত দেখিল, বসন্ত ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল, তারপর তার কম্পমান হাতদুখানি নিজের দু-হাতে চাপিয়া ধরিল, এবং তার মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি আবেগভরে বলিল, "তরুণা, তরুণা, আমি তোমাকে ভালবাসি!" ··· ··· ··· বসন্তের হাতের ভিতরে আপনার অসাড় হাত রাখিয়া, এবং তার ঘনঘন তপ্তশ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া, তরুণা একেবারে এলাইয়া নদীর তীরে বসিয়া পড়িল—এবং অস্ফুট প্রতিধ্বনির মত তার কাণের কাছে রহিয়া-রহিয়া সেই একই কথা জাগিতে লাগিল—"আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি!" ··· ···

হঠাৎ একঝাঁক বক ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দ তুলিয়া তাহাদের মাথার উপর দিয়া সারে সারে উড়িয়া গেল!—

—সেই শব্দে স্বপ্ন হইতে তারা সচমকে জাগিয়া উঠিল, অত্যন্ত মলিন মুখে তরুণার হাত ছাড়িয়া বসন্ত তাড়াতাড়ি পিছনে সরিয়া দাঁড়াইল এবং তরুণা মাটির উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—হৃদয়ের উত্তেজনা আর সে সহ্য করিতে পারিল না!··· ··· ··· সে কান্না বসন্তের মাথা একেবারে হেঁট করিয়া দিল, সে যেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশাইয়া গেল! এত অল্পক্ষণে এমন অঘটন ঘটিতে পারে সে তা জানিত না! সে কি হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছিল?

একটু দূরে একটা শব্দ হইল। বসন্ত মুখ তুলিয়া দেখিল, পাহাড়ের উপর হইতে জঙ্গল সরাইয়া রজত নামিয়া আসিতেছে। ভয়ে অপমানে লজ্জায় কাঠ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল,—সে যে গুরুতর পাপ করিয়াছে এখনি সব প্রকাশ হইয়া যাইবে, তখন সে কি আর কোথাও মুখ দেখাইতে পারিবে?

আসিতে-আসিতে দূর হইতেই রজত বলিয়া উঠিল, "কি বসন্তবাবু, ছবি আঁকা হোল ত?"

রজতের গলা পাইয়া পলক না-পড়িতে তরুণাও উঠিয়া দাঁড়াইল। বসন্তের আকস্মিক আচরণে তরুণা যে আঘাতটা পাইয়াছিল, ততক্ষণে তা সামলাইয়া লইয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে দাদার দিকে ছুটিয়া গেল।

তরুণার দিকে চাহিয়া রজত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "হ্যাঁরে তরু—একি! তোর চোখে জল কেন?"

বসন্তের সামনে পৃথিবীর সমস্ত আলো হঠাৎ যেন দপ্‌-করিয়া নিবিয়া গেল!

দাদা তার চোখের জল দেখিতে পাইয়াছেন! তরুণা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল;—কিন্তু তার সে ভাব ক্ষণিকের জন্য,—পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিয়া দাদার হাত ধরিয়া বলিল,—"দাদা, দাদা, একটা মস্ত সাপ বেরিয়েছিল—আরেকটু হোলেই আমাকে কামড়ে দিত আর-কি, ভাগ্যে বসন্তবাবু ছিলেন, তাই—"

রজত তড়াক্‌ করিয়া তিনহাত-উঁচু এক লাফ মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্‌ কি রে! সাপ? অ্যাঁ! সাপে কামড়ালে মানুষ যে আর বাঁচে না, জানিস না বুঝি? সাপ—বলিস্‌ কি রে—কৈ, কোথায়?"

তরুণা হাসিতে-হাসিতে, সকৌতুকে বলিল, "সাপ কি আর তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চুপ মেরে বসে আছে দাদা, সে অনেকক্ষণ নিজের ধান্দায় চলে গেছে!"

তরুণার হাসিতে মহা চটিয়া রজত বলিল, "সবসময়ে তোর হাসি ভাল লাগে না, থাম্‌ বলচি তরু! সাপ বেরিয়েচে বলে হাসি! দিন-কে-দিন তুই যেন বেশী ছেলেমানুষ হয়ে উঠছিস!"

দাদার রাগ দেখিয়া তরুণার হাসি আরো বাড়িয়া উঠিল।

চ

পরদিন সকালে রজতের বাড়ীতে চায়ের বৈঠকে বসন্তের দেখা পাওয়া গেল না। ··· ···

বিকালে বসন্ত বসিয়া-বসিয়া চিন্তিতমুখে জিনিষপত্তর গুছাইতেছিল ও মোটমাট বাঁধিতেছিল, এমনসময়ে রজত ও তরুণা আসিয়া হাজির!

রজত বলিল, "হ্যাঁ বসন্তবাবু, হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছেন কেন বলুন দেখি? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েচে বুঝি? একি, এত মোট্‌-মাট বাঁধা হচ্ছে যে!"

বসন্ত বাধ'-বাধ' স্বরে বলিল, "কাল সকালের গাড়ীতে কলকাতায় যাব ভাবচি!"

—"অ্যাঁ, কলকাতায়! আমাদের খবর না-দিয়েই?"

তরুণা অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বসন্তবাবু, আপনি বেশ মানুষ ত! না—না, সে হচ্ছে না! আমাদের একলা ফেলে চোরের মত চুপিচুপি পলায়ন! এ অন্যায় বসন্তবাবু, এ অন্যায়!"

বসন্ত শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমাকে মাফ করুন—এ জায়গাটা আমার আর ভাল লাগচে না।"

তরুণা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, আপনার যাওয়া অসম্ভব! এখনো আমার ছবি শেষ হয়-নি, এখনো ছবিতে আমার নাকটা খ্যাঁদা হয়েই রয়েছে! নিন —উঠুন, রং-টং নিয়ে চটপট্‌ বেরিয়ে পড়ুন!"

বসন্ত অত্যন্ত দমিয়া গিয়া বলিল, "না না, ছবি আঁকতে যেতে আমি আর পারব না!"

রজত যেন ঠিক কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছে, এম্‌নি ভাবে হাসিয়া বলিল, "ও, আপনি বুঝি সাপের ভয়ে নদীর ধারে যেতে চাইছেন না? বসন্তবাবু, কুছ্‌ পরোয়া নেই, আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি—এই দেখুন, সাপ দেখেচি কি মেরেচি!"—এই বলিয়া রজত তার হাতের

মাথা-সমান-উঁচু মোটা বাঁশের লাঠিটা সগর্ব্বে তুলিয়া ধরিল।

তরুণা তার দাদার রকম-'সকম' দেখিয়া আর হাসি রাখিতে পারিল না। তারপর মুখে কাপড়-চাপা দিয়া কোনরকমে হাসি থামাইয়া, বসন্তের হাত ধরিয়া বলিল, "তবে আর কি, দাদা লাঠি-কাঁধে পাহারা দেবেন আর আপনি অকুতোভয়ে ছবি আঁকবেন! দাদা আজ সর্পবংশ সমূলে ধ্বংস করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছেন! নিন—নিন, উঠুন, আর দেরি করবেন না!"

খুবই ইতস্ততের সহিত বসন্ত উঠিল,—তরুণার প্রতি কথা, প্রতি হাসি তীরের মত তার বুকের মাঝখানে গিয়া বিঁধিতেছিল, তার মুখের দিকে লজ্জায় অনুতাপে সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না!

ছ

নদীর ধারে গিয়া রজত আগে তন্নতন্ন করিয়া—তরুণা যেখানে বসে সেখানটা—খুঁজিয়া দেখিল। তারপর মুরুব্বিআনার সহিত বলিল, "তরু, তুমি এখন বসতে পার, সাপ আর নেই। হুঁ, সাপ দেখেচি কি মেরেচি!"—বলিয়া লাঠি দিয়া সজোরে ঠকাস্ করিয়া পাথরের উপরে সাপের উদ্দেশে একটা আঘাত করিল!

তরুণা বলিল,"তুমি আজ যে প্রকাণ্ড লাঠি এনেচ দাদা, তাতে সুধু সাপ কেন, বাঘ-ভাল্লুক পর্য্যন্ত ল্যাজ তুলে এ মুল্লুক ছেড়ে পালাবে!"

—এই বলিয়া সে পাথরখানার উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল।

রজত ততক্ষণে চারিধারে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সাপ খুঁজিতে লাগিয়া গিয়াছে! যেখানে কোন-একটা গর্ত্ত-'টর্ত্ত' কিছু দেখে, সেইখানেই আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত লাঠিটা ভিতরে ঢুকাইয়া দেয় আর বলে, "আজ সাপ দেখেচি কি মেরেচি!" এম্‌নি করিতে-করিতে সে খানিক তফাতে চলিয়া গেল।

বসন্ত তখনো তুলি হাতে করিয়া অপরাধীর মত ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে।..... একবার ফিরিয়া দেখিল, তরুণা ঠিক কাল্‌কের মতই সহজভাবে বসিয়া ঘাসের ডোরে বনফুলের তোড়া বাঁধিতেছে!

অনুতপ্ত স্বরে বসন্ত বলিল, "আপনি কি—"

তরুণা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কাল আমাকে নাম ধরে ডেকে আজ ফের 'আপনি' কেন বসন্তবাবু? আমাকে 'তুমি' বলে ডাকুন!"

এ বিদ্রূপ, না কৌতুক? কিছুই না বুঝিয়া আরো কাতর হইয়া বসন্ত বলিল, "আমাকে—"

বাধা দিয়া দুষ্ট তরুণা বলিল, "থাক্ বসন্ত-বাবু, থাক্! আপনি কি বলতে চান আমি বুঝেছি—ক্ষমা করবার কথা বলবেন ত? দরকার কি!"—বলিয়া, সে সদ্য-বাঁধা ফুলের তোড়াটি নাকের-কাছে ধরিয়া একমনে তার গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।

বসন্ত সত্যসত্যই ক্ষমা চাহিতে যাইতেছিল; কিন্তু এই কথায় তার মুখ একেবারে বোবা হইয়া গেল। তার মনে হইল, তরুণা যেন একটি মূর্ত্তিমতী প্রহেলিকা—কোনদিক দিয়াই তার মনের ভিতরটা ধরিবার-ছুঁইবার যো নাই, এ কী আশ্চর্য্য!

বসন্ত হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া আছে,—এমনসময় তরুণা হাসিতে-হাসিতে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া তার কাছে উঠিয়া আসিল। আগে বনফুলের ছোট তোড়াটি যত্নের সহিত বসন্তের জামায় বোতামের ছেঁদায় ঢুকাইয়া দিল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কোমল অথচ ব্যথাভরা স্বরে আস্তে-আস্তে বলিল, "বসন্তবাবু, কাল্‌কের কথা ভেবে আপনি অমন কিন্তু হয়ে আছেন কেন? কী আর আপনি করেছেন? আমাকে ভালবাসেন, এই বলেছেন বৈ ত নয়? তাতে হয়েছে কি? কেন আপনি আমাকে ভালবাসবেন না—ভাই কি বোনকে ভালবাসে না!"—একটু থামিয়া, বসন্তের মুখের দিকে ছলছল চোখে চাহিয়া, তার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "আর আমাকে ভুলবেন না—ছোট বোনটি বলে মনে রাখবেন!"

বসন্তের চোখদুটি অশ্রুজলে ছাপিয়া উঠিল।

তরুণা আবার একছুটে পাথরের উপরে গিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "দাদা, ও দাদা! সাপ-টাপ্ কিছু পাওয়া গেল কি?... ...বসন্তবাবু, নিন নিন, তাড়াতাড়ি ছবি আঁকুন, ছবিতে আমার নাক এখনো খ্যাঁদা-খ্যাঁদা ভাথাচ্ছে—তুলি বুলিয়ে নাকটাকে শীগ্‌গির টিকলো করে তুলুন!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ত্রিপুরা-রাজ্যের কতিপয় জাতি

মণিপুরী

পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় ১৬,৩৮১ জন মণিপুরী বাস করে। ইহাদের মধ্যে ৮,৭১৭ জন পুরুষ এবং ৭,৬৬৪ জন স্ত্রী। মণিপুরীগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদিগের সাধারণ পদবী ভট্টাচার্য্য, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিদ্যানুসারে ইহাদিগের মধ্যে 'বিদ্যালঙ্কার' 'সার্ব্বভৌম' প্রভৃতি উপাধিও আছে। ক্ষত্রিয়গণ সিংহ উপাধি ধারণ করিয়া থাকে। শূদ্রের পদবী দে, দত্ত, কর, দাস ইত্যাদি, এবং বৈশ্যের পদবী দাসগুপ্ত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল শ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ এবং পরিত্যক্ত স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পঞ্জিকা দেখিয়া দিনস্থির করিয়া বিবাহ দিয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করে। সাধারণতঃ দিবাভাগেই বিবাহ-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে কখনও কখনও রাত্রিকালেও বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহে পণপ্রথা আদৌ নাই। বিবাহকালে সাম বা যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র পঠিত হয়। মণিপুরীদিগের বিবাহ দ্বিবিধ—ব্রাহ্ম ও গান্ধর্ব্ব। ব্রাহ্ম-বিবাহে মাতা-পিতা কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। প্রায়শঃ পাত্র, কন্যার বাড়ীতে গিয়াই বিবাহ করিয়া থাকে। তবে

অর্থবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা কন্যার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ দেওয়া অসুবিধা মনে করে তাহারা কন্যাকে নিজগৃহে 'তুলিয়া' আনিয়া বিবাহ করে। কন্যাপক্ষীয়দিগের অবস্থা ভাল না হইলে বরপক্ষীয়দিগের গৃহে বিবাহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

কন্যা অন্ততঃ পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ না করিলে ইহারা তাহাকে বিবাহযোগ্য মনে করে না। ৮।৯ বৎসর বয়সে কখনও কখনও কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা প্রশস্ত নয়।

মণিপুরীদের মধ্যে কেহ মরিলে মৃতদেহ প্রথমে ধৌত করিয়া দাহার্থ লইয়া যাইবার পূর্ব্বে গৃহে দুইটী পিণ্ড দিয়া থাকে। একটী পিণ্ড উঠানে দেওয়া হয়, বহির্দ্বারে আর একটী পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হয়।

দাহকালে ইহারা আর একটী পিণ্ড দিয়া থাকে তাহার নাম শ্মশানপিণ্ড। মণিপুরীগণ তিথি নক্ষত্র বিশেষভাবে মানিয়া চলে। অন্যান্য চাতুর্ব্বর্ণ্য আচার সম্পন্ন জাতির ন্যায় ইহাদেরও মৃতাশৌচ ও জননাশৌচ আছে। সন্তান জন্মিলে ইহারা ছয় দিবসে ষষ্ঠী পূজা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মণিপুরীরা অধিক পরিমাণে পান খাইয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা গৃহের বাহিরে যায় না বটে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া সকলের সহিত অবাধে বাক্যালাপাদি করিয়া থাকে। ইহারা পর্দার পক্ষপাতী নয়। ইহাদের মধ্যে কোন ব্রতাদির অনুষ্ঠান নাই। দেবতার মধ্যে মণিপুরীরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, সত্যনারায়ণ ও শনির পূজা করিয়া থাকে। ইহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র ও বৃন্দাবন ইহাদিগের ঈপ্সিত তীর্থ। ইহারা ঝুলন, দোল, রাস ও রথের উৎসব করিয়া থাকে। নবদ্বীপের গোস্বামিগণের নিকট ক্ষত্রিয় মণিপুরীরা দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। মণিপুরীরা তাস, ছতরং (দাবা), ছাগলকঞ্চি (পোলো) খোকঞ্চী (হকী), গিলা (হাডুডুর ন্যায় একপ্রকার খেলা) হাবি লিকন বা ছানেড়া (কড়ি) খেলিয়া থাকে। মণিপুরী স্ত্রীলোকগণ সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকে। ইহারা সূচের কাজ, জালবোনা, বস্ত্রবয়ন ও রেশমী কাজে বিশেষ পটু।

প্রথমব্রহ্মযুদ্ধের সময় হইতে মণিপুরীগণ ত্রিপুরারাজ্যে ঔপনিবেশিক রূপে বাস করিতে আরম্ভ করে। ত্রিপুরা রাজবংশে কন্যাদান করিয়া ইহাদের কেহ কেহ ধনশালী ও সম্মানভাজন হইয়াছে। 'মেথ্‌লী' মণি-পুরীদের নামান্তর। রাজবংশীয় ও সাধারণ মেথ্‌লী এই দুই প্রকার মণিপুরী ত্রিপুরারাজ্যে বাস করে। মণিপুরী ভাষায় মণিপুরীর নাম 'মেয়তেয় পাঙান্'।

(১) আসল বা খাই, (২) বিষ্ণুপুরী বা কালেসা এই নামে দুইটী বিভাগ মণিপুরীদিগের মধ্যে আছে তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী অপেক্ষাকৃত সম্মানিত।

মণিপুরী স্ত্রী-পুরুষ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে। সাধারণতঃ মণিপুরী গ্রামে সেই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ২।৪ গ্রামের লোকের ধর্ম্মোপাসনার নিমিত্ত একটী সাধারণ উপসনামন্দির থাকে। সেইস্থানে

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিয়া থাকে।

মণিপুরীদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত লোকও কিয়ৎসংখ্যক আছে।

চাকমা

ত্রিপুরারাজ্যে চাকমাদিগের সংখ্যা ৪,৩১০। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অধুনা ত্রিপুরা-রাজ্যের সোণামুড়া, বিলনীয়া ও উদয়পুর বিভাগে চাকমাগণ বাস করিতেছে। ইহাদিগের ভূতপূর্ব্ব বাসস্থান পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম। চীন-লুসাই অভিযানের সময় ইহাদিগের আদিম বাসস্থানে কুলিধরার ভয় হয়, সেই ভয়ে প্রায় দশ সহস্র চাকমা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরারাজ্যে আগমন এবং এখানেই বাস করে। পরে ইহাদিগের মধ্যে অনেকে আবার স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিল। অন্যূন ৬০ বৎসর হইবে ইহারা প্রথম বিলনীয়া অঞ্চলে আপনাদিগের বাসস্থান স্থির করে, পরে ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানেও বাস করিতেছে।

সম্প্রদায় বিভাগ

এখানকার চাকমাগণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীতে বিভক্ত।

১। মলীমা। ২। তন্যা। ৩। বরুয়া। ৪। উয়াছাং। ৫। বুমা। ৬। কোড়া। ৭। কুর্চ্যা। ৮। কতুয়া ইত্যাদি। প্রথমোক্ত তিন সম্প্রদায়ের লোকই ত্রিপুররাজ্যে বেশী।

ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদে সম্মানের কোনরূপ তারতম্য হয় না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পর ভোজন এবং বিবাহাদি প্রচলিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে 'দেওয়ান' উপাধিধারী ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্র, 'খিজা' 'তালুকদার' ও 'কারবারী' উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সম্মানের পাত্র, কিন্তু দেওয়ানের নিম্নে ইহাদিগের স্থান। চাকমা-রাজের প্রবর্ত্তিত এই উপাধি-গুলির সম্মান রাজ্যান্তরে আসিয়াও ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় বজায় রাখিয়াছে এবং এখনও ইহারা যোগ্যতানুসারে এই সকল উপাধি গ্রহণ করিতেছে।

চাকমাগণ নিরতিশয় ধূমপান করে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ধূমপানে অত্যন্ত আসক্ত। ইহারা চুরুটের পাইপের মত অতি ক্ষুদ্র হুকা ও বাঁশের হুকা ব্যবহার করে। মদ্যপানাদি ইহাদিগের সমাজে অপরাপর পর্ব্বতীয় জাতির তুলনায় অতি কম। স্ত্রীলোক মদ্যপান করে না। ইহারা যে-কোন প্রাণীরই মাংস ভোজন করে, এমন কি ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর মাংসও ইহারা বাদ দেয় না; 'ব্যাঙাচি' 'কাঠের পোকা' 'বোলতার চাক' প্রভৃতি ইহাদিগের উৎকৃষ্ট খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। সর্প, শুট্‌কি (শুষ্ক) মাছ, মাংসও ইহাদের উপাদেয় আহার্য্য।

চাকমাদিগের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়। ইহারা অধিকাংশ সময়ে অপরাধীর বিচার ও সামাজিক গোলযোগের মীমাংসার ভার দলপতির হস্তে অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। দলপতিও যথামতি তাহার সুমীমাংসা করে। চাকমাগণ খুব কমই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে।

ধর্ম্ম

ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মোচিত আচার ইহাদিগের মধ্যে একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না বলিলেই হয়। অপরাপর পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় ইহারাও নানাবিধ দেবদেবীর অর্চ্চনা এবং বহুবিধ পশুপক্ষী 'বলিদান' করিয়া থাকে। ত্রিপুরারাজ্যের চাক্‌মা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বৌদ্ধভিক্ষু বা 'বাওয়ালী' নাই। চট্টগ্রামের 'বাওয়ালী' আসিয়া কখনও কখনও ইহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

বিবাহ

চাক্‌মাদিগের মধ্যে বিবাহে কন্যাপণ গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। বরকন্যার অভিভাবকগণ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করে। ইহাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রথা নাই। সাধারণতঃ কন্যার ১৫—২০ এবং বরের ১৮—২২ বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বরপক্ষ হইতে কন্যার পিতা বা অভিভাবককে ৬০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পণ দিতে হয়। সাধারণতঃ বরকন্যার বয়সের মাত্র ২।৩ বৎসর পার্থক্য থাকে। যুবতী কখনও বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের সঙ্গে পরিণীত হয় না।

চাক্‌মাগণ সবল ও সুস্থকায়। কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ ব্যতীত অন্যরোগের প্রাদুর্ভাব ইহাদিগের মধ্যে নাই। সম্ভবতঃ পচা মাংস মাছ ইত্যাদি ভক্ষণের জন্যই এইরূপ মহারোগের প্রাদুর্ভাব ইহাদিগের মধ্যে প্রবল। ইহারা মহারোগগ্রস্তকে ঘৃণা করে এবং তাহার জন্য পৃথক্ বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া পরিবারস্থ যাবতীয় লোক তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করে। মহারোগিগণ কেবল দৈনিক আহার প্রাপ্ত হয়।

চাক্‌মা স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহারা 'পাছরা' পরিধান করে, অঙ্গে জামা, তদুপরি 'বক্ষোবন্ধনী' এবং মস্তকে উষ্ণীষের মত একখণ্ড কাপড় ধারণ করিয়া থাকে। পুরুষগণ সাধারণতঃ বিলাতী বস্ত্রই পরিধান করে। চাক্‌মা স্ত্রীগণ মুক্তার মালার ন্যায় স্ফটিকের মালা গলদেশে ধারণ করে। ইহারা সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ফুলের বিশেষ আদর করে। চাক্‌মাগণ জুমে শস্য উৎপাদন করে, অতি অল্পসংখ্যক লোক হল কর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন করে। ইহাদিগের জুমে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। ইহারা 'লং' 'কুন্দা' 'পালা' ইত্যাদি করিয়াও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। সঞ্চয়পরায়ণতার অভাব ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। চাক্‌মা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক পরিশ্রমী। অধিকাংশ কার্য্যের ভার স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ন্যস্ত করিয়া পুরুষগণ নিশ্চিন্ত থাকে। চাক্‌মাদিগের দাম্পত্যবন্ধন ও প্রেম অতি দৃঢ় ও মধুর। সাধারণ পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় কাষ্ঠসংগ্রহ, শস্যবপন ইত্যাদি কার্য্য অনেক সময় চাক্‌মা-দম্পতী একত্রও করিয়া থাকে।

মৃতসৎকার ইত্যাদি

চাক্‌মাদিগের মধ্যে মৃতদেহ মৃত্যুর ঠিক

পরেই পোড়ান হয় না। দূরস্থ জ্ঞাতি কুটুম্বগণের সম্মিলন-প্রত্যাশায় চাক্‌মারা ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত সযত্নে ইহা রক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপে শবরক্ষা করিবার জন্য ইহারা কাষ্ঠ দ্বারা একটী শবাধার প্রস্তুত করে, এই শবাধার দেখিতে অনেকাংশে 'কুন্দা' নৌকার ন্যায়। এই শবাধারে শবরক্ষা করিয়া তদুপরি তাহারা একখণ্ড তক্তা স্থাপন করে। ইহাতে শব হইতে ৩।৪ দিনের মধ্যে পূতিগন্ধ নির্গত হয় না। মৃতদেহ পোড়াইবার পূর্ব্বে চাক্‌মাগণ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দাহকার্য্যের সুবিধা করিয়া লয়।

কলেরা ও বসন্তরোগে কাহারও মৃত্যু হইলে চাক্‌মাগণ তাহার সৎকার করে না। নদীস্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া বা ভূগর্ভে প্রোথিত করা ইহার ব্যবস্থা।

কোন ধনবান্ বৃদ্ধ চাক্‌মার মৃত্যু হইলে একটী রথে করিয়া মহাসমারোহে শবদেহ শ্মশানে নীত হয়। রথের উপরে শবাধারে রক্ষিত শবদেহ স্থাপন করা হয়, মৃতব্যক্তির সম্মানার্থ তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণ রথে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। ঐ অর্থ, দাহকার্য্য শেষ হইলে বাওয়ালী, বাদ্যকর, রথ ও শবাধার নির্ম্মাণকারীদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়। মৃতের উত্তরাধিকারীর এই অর্থে কোন অধিকার থাকে না।

অপরাপর পর্ব্বতীয় জাতি হইতে পূজা প্রভৃতি বিষয়ে চাক্‌মাদিগের একটু বিশেষত্ব আছে; অন্য পর্ব্বতীয়গণ রোগমুক্ত হইলে অথবা অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিলে, পরে পূজা করিব এইরূপ মানৎ করে না, কিন্তু চাক্‌মাদিগের মধ্যে এইরূপ কামনা (মানৎ) করিয়া পূজা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

শিক্ষা ও বর্ণমালা ইত্যাদি

চাক্‌মাগণের কথ্য ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু ইহাদিগের পৃথক্ বর্ণমালা আছে। ইহাদিগের লেখার কার্য্য চাক্‌মা অক্ষরেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন কোন চাক্‌মা বাঙ্গালা লেখাপড়াও জানে; চাক্‌মাদিগের প্রত্যেক বৃহৎ পল্লীতে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পুস্তক আছে; ঐ সকল পুস্তক সুর-সহযোগে পঠিত হয় এবং পাঠকালে যথেষ্ট শ্রোতা পাঠকের চতুর্দ্দিকে সমবেত হয়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক শিক্ষিত চাক্‌মা আছে।

জুলাই

ইহারা প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কোন কোন শ্রেণীর ভাষার সহিত কুকি ও মণিপুরী ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হালাম, রিয়াং, নওয়াতিয়া, জুলাই জাতির সাধারণ নাম ত্রিপুরা শব্দের অপভ্রংশ তিপারা বা তিপ্‌রা এবং ইহাদিগের ভাষা সমুদয়ের নাম তিপ্‌রা ভাষা।

জুমকৃষি এবং জঙ্গল আবাদই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। বুড়াছা, লাম্প্রা প্রভৃতি ইহাদিগের উপাস্যদেবতা। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা উপস্থিত ও ভাবী বিপৎশান্তির উদ্দেশ্যে নিজ নিজ উপাস্য দেবতার নিকট কুক্কুট, ছাগী ইত্যাদি বলি দিয়া থাকে। ইহারা ছাগী, কুক্কুট, গোসাপ ইত্যাদির মাংস

ভক্ষণ করে। ইহাদিগের অধিকাংশ আচার ব্যবহারই হিন্দুধর্ম্মের অনুরূপ নয়।

একসময়ে রাজদ্রোহ অপরাধে কতিপয় ত্রৈপুর প্রজার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তদানীন্তন ত্রিপুর-রাজমহিষী দয়াপরবশ হইয়া ত্রিপুরপতির নিকট তাহাদিগের প্রাণ ভিক্ষা চাহেন। মহিষী সন্তানহীনা ছিলেন, রাজা মহিষীর প্রার্থনা পূরণ করিলে তিনি কারামুক্ত ব্যক্তিদিগকে এক বাটী দুগ্ধ পান করিতে দিয়াছিলেন। বাটীটী রৌপ্যনির্ম্মিত ছিল। দুগ্ধ দান করিবার পূর্ব্বে মহিষী তাহাতে আপন স্তন স্পর্শ করাইয়াছিলেন। ঐ দুগ্ধ পান করিলে তিনি বিদ্রোহীদিগকে বলিলেন, অদ্য হইতে তোমরা আমার পুত্রস্থানীয় হইলে। তিনি তাহাদিগকে কয়েকগাছি চুল চিহ্ন-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি তাহারা রাণীর জুলাই নামে পরিচিত হয়।

রিয়াং

ত্রিপুররাজ্যে রিয়াং অধিবাসীর সংখ্যা ১৫,১১৫; তন্মধ্যে পুরুষ ৭,৭৪৩ ও স্ত্রী ৭,৩৭২ জন। তিপ্রাদিগের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উগ্রস্বভাব। রিয়াংগণ ত্রিপুর-রাজ্যের সোণামুড়া ও বিলনীয়া বিভাগে বাস করে। ইহারা চতুর্দ্দশ দফায় বিভক্ত; নিম্নে উপাধিসহ দফাগুলির নাম লিখিত হইল।

দফা বা শ্রেণী		উপাধি
১।	তুই মুইয়াফাক	১। রায় ২। কারমা (প্রথম)
২।	মরছই	৩। চাপিয়া খাঁ ৪। য্যাকছুং (প্রথম)
৩।	মেচ্‌কা	৫। চাপিয়া ৬। য্যাকছুং (দ্বিতীয়)
৪।	আপেত	৭। কাচকাউ (প্রথম) ৮। দরকালিম।
৫।	চরকি	৯। কাচকাউ (দ্বিতীয়) ১০। দৈয়াহাজ্‌রা
৬।	মাসা	১১। হাজরা (১ম) ১২। কান্দা
৭।	রাইচাক্‌	১৩। দলৈ ১৪। খাসকালেম (১ম)
৮।	তখ্‌মা য্যাকচ	১৫। মুড়িয়া ১৬। খাসকালেম।
৯।	ওয়ারিং	১৭। দাওরা ১৮। কাংরেং
১০।	নকখ্যাম	১৯। কারমা (২য়) ২০। তুকরিয়া।
১১।	চম্প্রেং	২১। ছেয়াং ক্রাক্‌ ২২। খাণ্ডল
১২।	দরবং	২৩। ভাণ্ডারী ২৪। হাজরা (২য়)
১৩।	সগরায়	২৫। কান্দা হাজরা ২৬। কারমা (৩য়)
১৪।	রিয়াং	২৭। কাচকাউ (৩য়)

রিয়াংগণ প্রধানতঃ মেস্কা বা মেচ্‌কা এবং মছলই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, উল্লিখিত উপবিভাগগুলি এই দুই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। উক্ত চতুর্দ্দশ দফার মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে নিম্নলিখিত উপাধিভূষিত লোকগুলি প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রায় ও কাচ্‌ক ইহাদিগের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি। রায় উপাধিধারী ব্যক্তি

এক শ্রেণীর ও কাচ্‌ক উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অপর শ্রেণীর নেতা।

রায় ও তাহার অধীন সর্দারগণ

১। রায়—রাজা, রিয়াংদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রায় উপাধিবিশিষ্ট।
২। চাপিয়া খাঁ—ভাবী রায়।
৩। চাপিয়া—ভাবী চাপিয়া।
৪। দরকালিম—রায়ের পুরোহিত।
৫। দলই—রায়ের পেস্কার।
৬। ভাণ্ডারী—রায়ের দ্রব্যসমূহের রক্ষক।
৭। কান্দা—রায়ের সেবক ও ছত্র-দণ্ডধারী।
৮। দয়াহাজারী—ঢোলবাদক।
৯। মুরিয়া—সানাইবাদক।
১০। দুগ্‌রিয়া—কাড়াবাদক।
১১। দাওয়া—পূজার টলুয়া।
১২। ছিয়াক্রাক্‌—পূজার বলির মাংসাদি বিতরণ এবং চাপিয়াখাঁর ছত্রবহন করে।

কাচ্‌ক ও তাহার অধীন সর্দারগণ

১। কাচ্‌ক—উজীর।
২। ইয়াক্‌ছুং—নাজির।
৩। হাজ্‌রা—কাচ্‌কের সেবক।
৪। কাংরেং—কাচ্‌কের ছত্রধারী।
৫। কারমা—ইয়াক্‌ছুংএর সেবক।
৬। খান্‌কালিম—ইয়াক্‌ছুংএর ছত্রধারী।
৭। খান্দল—আহার্য্য-সংগ্রাহক।

ইহাদিগের সাধারণ নাম কতর দফা। কতর=প্রধান।

কতরদফার লোকগুলিকে ঘরচুক্তি খাজনা দিতে হয় না।

রিয়াংগণ অবস্থাদিতে ত্রিপুরজাতির অন্যান্য শ্রেণী হইতে নিকৃষ্ট। ইহারা অতিশয় মদ্যপায়ী। ইহারা জুমকৃষিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কদাচিৎ কেহ ব্যবসায়াদিও করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বিবাহাদি বিষয়ে ইহারা ইহাদিগের মূল জাতি ত্রিপুরার নিয়মের বশবর্ত্তী।

ইহাদিগের নেতৃবশ্যতা অতুলনীয়। জুমকাটা ও শস্যসংগ্রহের পূর্ব্বে ইহারা সমারোহের সহিত জাতীয় দেবতার পূজা করে। খাইন বা চাঁদা করিয়া এই পূজার টাকা সংগৃহীত হয়। পূজার শেষ সময় শুধু আমোদে পর্য্যবসিত হয় না। তৎকালে রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদিগের একটা বৈঠক বসে, তাহাতে তাহাদের সামাজিক অবস্থাদির বিচারের মীমাংসা হইয়া থাকে। খাইনের টাকা অতিরিক্ত হইলে তাহা জাতীয় ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়। এই টাকা হইতে কতরদফার লোক কিছু কিছু পাইয়া থাকে। অবশিষ্ট সর্ব্বজনীন মঙ্গল কার্য্যে ব্যয়িত হয়।

মগ

ত্রিপুরারাজ্যে মগের সংখ্যা ১,৪৯১। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৭১ এবং স্ত্রী ৭২০ জন। মগগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। আচার-ব্যবহারাদিতে ইহারা চাক্‌মাগণের অনুরূপ। ইহারা ত্রিপুররাজ্যের আধুনিক প্রজা।

জমাতিয়া

পার্ব্বত্য ত্রিপুররাজ্যে জমাতিয়া জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৪,৯১০, তন্মধ্যে পুরুষ ২,৬৬০ এবং স্ত্রী ২,২৫০ জন। ত্রিপুরজাতির

বিভক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে জমাতিয়া শ্রেণী সম্মান, সভ্যতা ও অবস্থাদিতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল বিষয়ে 'পুরাণ ত্রিপুরা'র নিম্নেই জমাতিয়াগণের স্থান। পরন্তু কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতায় ইহারা 'পুরাণ ত্রিপুরা' দিগকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইহারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান সৈনিকের কার্য্য করিত, তৎকালে জমাতিয়াগণ বড়ই উগ্রস্বভাব ছিল। ইহারা মূলতঃ বিভিন্ন জাতীয় হইয়াও ক্রমশঃ ত্রিপুরজাতির অন্তর্নিবিষ্টতা লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরেশ্বরের যে সৈন্যদল গঠিত হইত তাহা জমাৎ নামে পরিচিত ছিল, এই জমাৎ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ জমাতিয়া নামে অভিহিত হইত, তদনুসারে তাহাদিগের বংশধরগণও জমাতিয়া বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সুতরাং 'জমাতিয়া' কতকগুলি জাতির সংমিশ্রণে জাত হইয়াও একটী অভিনব জাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। জমাতিয়াদিগের মধ্যে পুরাণ ত্রিপুরা, নওয়াতিয়া, রিয়াং, কলই প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে জমাতিয়াগণ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিল। দুই-শতাধিক জমাতিয়ার মুণ্ডপাত করিয়া ত্রিপুরাধিপতি বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। তদবধি ইহারা শান্তস্বভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে জমাতিয়াগণ নিরতিশয় শান্তিপ্রিয়। বিবাদ-বিসংবাদাদি ইহাদিগের মধ্যে প্রায়ই উপস্থিত হয় না, কদাচিৎ উপস্থিত হইলেও রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্য ব্যতীতই ইহারা তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে।

পর্ব্বতবাসী অন্যান্য জাতি হইতে জমাতিয়াগণের আর্থিক অবস্থা ভাল। বর্ত্তমানসময়ে জমাতিয়াগণ জুমকৃষি পরিত্যাগ করিয়া গোরুর সাহায্যে হল কর্ষণ দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

জমাতিয়াগণ তাহাদিগের সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা সাধনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্বজাতির মধ্য হইতে উপযুক্ত দুই ব্যক্তিকে সর্দার বা দলপতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে এবং কি সামাজিক কি অন্যান্য বৈষয়িক সকল বিষয়েই এই দুই দলপতি বা সর্দারের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই দুই পরিচালকদ্বয় চলিত ভাষায় 'মুল্লুকের স র' নামে পরিচিত। নিরূপিত সময়ের অবসানে বা অপর কোন অনিবার্য্য কারণে পূর্ব্বের দলপতির পরিবর্ত্তন হইয়া অপরকে তৎপদে অধিরোপিত করা হয়। এই সমাজপতিদ্বয়ই তাহাদিগের বিবাহাদির মীমাংসা ও অপরাধীর দণ্ড বিধানাদি করিয়া থাকে।

নৃত্যগীতাদি

জমাতিয়া সম্প্রদায় স্বভাবতঃ সঙ্গীতানুরাগী। ইহাদের স্বর-মাধুর্য্যও যথেষ্ট। অধিকাংশ পল্লীতেই হরি-সঙ্কীর্ত্তনের একটী করিয়া দল আছে। ইহাদের সঙ্কীর্ত্তনশক্তি প্রশংসনীয়। সম্প্রতি তাহারা দুইটী যাত্রাদলের সৃষ্টি করিয়াছে। জমাতিয়া

দলপতি সংস্কৃত পদাবলী গান করিতেও সমর্থ।

ধর্ম্ম প্রভৃতি

ত্রিপুরা জেলার নুরনগর পরগণার অন্তঃপাতী মেহারী গ্রামের প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশীয়গণ কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইহাদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। ইহারা বৈষ্ণব জনোচিত তিলক ও মাল্যাদি ধারণ করিয়া থাকে। তীর্থ দর্শনাদিতেও ইহাদিগের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও ইহারা জাতীয় বন্যদেবদেবীর পূজাগুলি পরিত্যাগ করে নাই।

রিয়াংদিগের ন্যায় ইহারা 'খাইন' করিয়া টাকা আদায় করে এবং তদ্দ্বারা জাতীয় দেবদেবীর পূজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রচলিত পূজাগুলির মধ্যে শিবগৌরী পূজা, দুর্গাপূজা, ত্রিপুরাসুন্দরী পূজা ও গোমতী পূজা প্রধান। দুর্গাপূজা সর্ব্বাংশে বাঙ্গালীদিগের প্রবর্ত্তিত পূজার অনুরূপ। এই পূজা বাঙ্গালী পূজক দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বিবাহ

জমাতিয়াগণের বিবাহপ্রথা প্রশংসনীয়। কন্যাপণগ্রহণ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। পরন্তু এই প্রথাকে ইহারা অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে। বিবাহের জন্য নির্ব্বাচিত পাত্র, কন্যার পিত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক বিবাহ করে। বিবাহের সময় কন্যার পিতা সামর্থ্যোচিত যৌতুকাদি সহ কন্যাদান করিয়া থাকে।

দুই বৎসর কাল শ্বশুরগৃহে জামাতার অবস্থান করার প্রথা জমাতিয়া সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে। তবে বর ইচ্ছা করিলে, স্ত্রীকে লইয়া নিজগৃহে গমন করিতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যাপার কদাচিৎ হইয়া থাকে; কারণ এই রকম ঘটনা হইলে ইহা হইতে উভয় পক্ষের মনোমালিন্য হয়।

নওয়াতিয়া বা নোয়াতীয়া

ত্রিপুররাজ্যে নোয়াতীয়া জাতির সংখ্যা ১৪,৪৩৭ তন্মধ্যে পুরুষ ৭,৩৯১ ও স্ত্রী ৭,০৪৬। নোয়াতীয়াগণও জমাতিয়াগণের ন্যায় মিশ্রজাতি। ইহারা বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুর জাতির শাখা-বিশেষরূপে পরিণত হইয়াছে। নোয়াতীয়গণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দফায় বিভক্ত—

১। কেওয়া।
২। মুরাসিং।
৩। আছলং।
৪। গর্জ্জন।
৫। খালিচা।
৬। তংবাই।
৭। লাইতং।
৮। দেইলদাক্।
৯। আনা ও কিয়াথক্।
১০। তোতারাম।

এই রাজ্যে প্রথমোক্ত ছয় সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে।

ইহারা গোমতী নদীর দক্ষিণে ফেণী নদীর উত্তরে বাস করে। কেহ কেহ সম্প্রতি ফেনীনদীর দক্ষিণেও বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের আচার-ব্যবহার

অনেকাংশে জমাতিয়াগণের অনুরূপ। সম্প্রতি মুরাসিং প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক ক্রমশঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। জমাতিয়াগণের ন্যায় ইহাদিগের মধ্যেও হলকর্ষণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদিগের বিবাহ-প্রথা রিয়াংগণের ন্যায়।

আসামী

বর্ত্তমান কালে ত্রিপুর রাজ্যে আসামী অধিবাসীর সংখ্যা ৯৯ নিয়ানব্বই জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৫৭ জন ও স্ত্রী ৪২ জন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য আসামের আহোম বংশীয় এক রাজকন্যা বিবাহ করেন। সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া কতকগুলি আসামী এইখানে বাস করিয়া আসিতেছে।

হালাম

হালামগণ কুকি ও তিপ্‌রার মধ্যবর্ত্তী জাতি। (মতান্তরে হালাম এবং কুকিগণ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে যে সকল কুকি ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহারাই হালাম নামে অভিহিত হইয়াছে। হালামের অপর নাম মিয়োকুকি। হালাম ভিন্ন অন্য কুকিগণ অধুনা কাঁচা কুকি আখ্যায় পরিচিত।) ত্রিপুর রাজ্যে হালামগণের সংখ্যা (৩,২১৫ তন্মধ্যে পুরুষ ১,০৯০ স্ত্রী ১,১২৫) হালামগণ নিম্নলিখিত দফা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত—

(১) রাংখল—(রাং=রৌপ্যমুদ্রা) ইহারা গলদেশে রৌপ্য মুদ্রা পরিধান করে বলিয়া ইহাদের এইরূপ নাম হইয়াছে।

(২) কাইপেং বা কাইপেন—(কাঁই=বশ্যতা)। এই দফার লোকগণ সর্ব্বপ্রথমে ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে।

(৩) মরছম বা মুরছুম—(সত্যবাদী)। হালামগণের মধ্যে এই দফার লোক শ্রেষ্ঠ। ইহারা সর্ব্বদা সত্যবাদী বলিয়া খ্যাত।

৪। রুপনী—(যাতায়াতকারী)। ইহারা সর্ব্বদা রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিত বলিয়া ইহারা এই আখ্যায় অভিহিত।

৫। খুলং *

৬। দাপ বা ভাব *

৭। কলই বা কলয়—(হরিদ্রা)। কলয়গণ ত্রিপুরেশ্বরের ভোজনাগারের হলুদের বোঝা বহন করিত।

৮। চড়ই বা চড়াই। *

৯। মছবাং বা মসবাং। *

১০। লঙ্গাই বা লাঙ্গাই। *

১১। বংশের বা বংছের। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বস্ত্রের বোঝা বহন করিত।

১২। কর্ব্বং। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের শয্যাবাহী ভৃত্য ছিল।

১৩। মুতিলাংল। *

১৪। বং—(ঘাতক)। ইহারা যুদ্ধের সময় সমস্ত সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিত এবং সর্ব্বাগ্রে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিত।

১৫। ছাইমাল। ভীরু বলিয়া ইহাদিগের এই নাম।

* তারকা-চিহ্নিত সম্প্রদায়গুলি এবং তদতিরিক্ত খামাচেপ ও ছাকাচেপ এই দুই সম্প্রদায়ের হালামগণ কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর অঞ্চলে বাস করে। স্ব স্ব বাসস্থানের ও বংশের প্রধান ব্যক্তিগণের নামানুসারে উহাদের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

১৬। হাওয়া। যুদ্ধের সময় হাওয়ার ন্যায় গমন করিয়া ইহারা শত্রুদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং রাজ্যে সর্ব্বদা গুপ্তচরের কার্য্য করিত।

১৭। লুছুই-মুছই। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের ভোজনের জন্য হরিণ শিকার করিত।

১৮। বেতু—(বেদনা-নিবারক)—যুদ্ধের সময় ইহারা আহতদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিত।

ইহাদিগের একশ্রেণীর ভাষার সহিত অপর শ্রেণীর ভাষার ঐক্য নাই। কোন কোন ভাষার সহিত কোন ভাষার আংশিক সাদৃশ্য আছে।

ইহাদের প্রত্যেকের জাতি-বিষয়ক উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার শ্রেণী আছে।

হালামদিগের ত্রয়োদশ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রায় হয় না। কদাচিৎ কোন শ্রেণীর সহিত অপর কোন শ্রেণীর বিবাহ হইয়া থাকে।

হালামগণ গোমতীনদীর উত্তর এবং কৈলাসহরের দক্ষিণ এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের অপর নাম 'খীল হালাম'।

এই ত্রয়োদশ প্রকারের খীল ব্যতীত আরও ১০।১২ প্রকারের অতিরিক্ত হালাম আছে। তাহারা 'চড়ই' এই সাধারণ নামে অভিহিত। চড়ইদিগের ভাষাও স্বতন্ত্র। সমুদয় হালাম জাতির প্রত্যেক দফারই আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি প্রায়ই বিভিন্ন। দুই এক শ্রেণীর আচার-ব্যবহার অপর দুই এক শ্রেণীর অনুরূপ। হালামগণ আপনাদিগকে কুকি বলিয়া পরিচয় দিতে বড়ই ভালবাসে; কিন্তু প্রত্যুতঃ ইহারা কুকি নয়। ত্রিপুররাজ্যে হালামদিগের সংখ্যা ৫,৬০১। 'সাখাচেপ' খাঙ্গাচেপ ও লাঙ্গাই আখ্যায় পরিচিত হালামগণ পূর্ব্বকালে লুসাই জাতীয় কিরাত-রাজের অধিকারে বাস করিত। লুসাইগণ হালামদিগের উপর নিরন্তর অত্যাচার করিত বলিয়া পরে তাহারা 'রুপোবই তপোইবোং' নামক পর্ব্বতে (এই পাহাড় তৎকালে ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) উপনিবেশ স্থাপন করে। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত 'হায়চেফ' বা 'হাতুফ' পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে বহুদূরে অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতেই বেগবতী ধলেশ্বরী নদীর উৎপত্তি। এই সময় লুসাইপতি রুপোবই তপোইবোং পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্বকোণে অবস্থিত 'চাংছেন' পর্ব্বতোপরি বাস করিত। হতভাগ্য হালামগণ তাহাদিগের নূতন বাসস্থানে গিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহারা ত্রিপুররাজের অধিকৃত 'আইন কুওঙ' পর্ব্বতে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ণয় করিল; কিন্তু সেখানেও লুসাইগণ তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। হালামগণ আইনকুওঙ পরিত্যাগ করিয়া হায়চেফ পর্ব্বতে বসতি করিল। তদবধি পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর হালামগণ সেই পর্ব্বতে ত্রিপুররাজ্যান্তর্ভুক্ত অন্যান্য পর্ব্বতে ও অরণ্যে বাস করিতেছে। মহারাজ ডাঙ্গরফার শাসনকালে হালামগণ প্রথম ত্রিপুররাজ্যে আগমন করিয়াছিল।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে

জয়ন্তীদেশের রাজা ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের সময়ে বিজয়-মাণিক্য সাখাচেপ ও থাঙ্গাচেপ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হালামদিগকে আপন সৈন্যদলভুক্ত করিয়াছিলেন। অসভ্য হালামগণ রাজদ্রোহী না হয়, এইজন্য তৎকালে মহারাজ বিজয়-মাণিক্য বিতস্তি পরিমিত ধাতুনির্ম্মিত একটী হস্তী ও একটী ব্যাঘ্র তাহাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। হালামগণও রাজদত্ত উপহারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। অদ্যাপি হালামগণ দেবতাজ্ঞানে উক্ত রাজদত্ত ব্যাঘ্র ও হস্তীর পূজা করিয়া থাকে।

হস্তী ও ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে নিম্নলিখিত শব্দগুলি উৎকীর্ণ আছে—

পূর্ব্বাপর্য্যক্রমাদ্ ভবন্ত আত্মীয়া ইদানীং যদি বৈপরিত্যমাচরন্তি তদোপরি ধর্ম্মঃ শস্ত্র নাশো ভবিষ্যতি পশ্চাদ্‌গজশার্দ্দূলো॥

ইহার মধ্যে 'ভবি'পর্য্যন্ত গজপৃষ্ঠে ও অপরাংশ ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে খোদিত আছে। এই উপহার প্রাপ্তির বহুকাল পরে লাঙ্গাই সম্প্রদায়ের হালামগণ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট হইতে ধাতুনির্ম্মিত আরোহীসমেত একটী অশ্ব পাইয়াছিল। অশ্বপৃষ্ঠে বিজয় মাণিক্য, ছত্রমাণিক্য ও উপহারপ্রাপ্ত লাঙ্গাই সর্দ্দারের নাম খোদিত আছে।

রিয়াংগণের মত হালামদিগের মধ্যেও 'রায়' 'কাচ্‌ক' 'গালিম' ইত্যাদি উপাধিধারী লোক আছে। ইহারাই হালামদিগের সমাজপতি অর্থাৎ নেতা। হালামগণ পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। পর্ব্বতীয় জাতির রমণীগণের মধ্যে হালাম জাতীয় স্ত্রীই সুন্দরী।

ইহাদিগের নির্ম্মিত 'পাছরা' অতি সুন্দর। ইহারা বাঁশ ও বেত দিয়া বহুবিধ জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে পারে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

স্বীকার

কাশীর গঙ্গাতীরে ছোট বাড়ী; সম্মুখের বারান্দা হইতে ভাগীরথীর জল দেখা যায়, তাহার পাশের ঘরে গঙ্গার দিকে মুখ রাখিয়া রুগ্নার শয্যা বিছানো। রুগ্নার জীর্ণ দেহ, মৃত্যুচ্ছায়া-ম্লান মুখ, আশে-পাশে ঔষধাদির বিশেষ চিহ্ন নাই, তাহার পরিবর্ত্তে নিকটে-দূরে অন্তিম-ব্যবস্থারই আভাষ পাওয়া যায়।

গৈরিকধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া রুগ্নার সম্মুখে বসিলেন।

রুগ্না ডাকিলেন, "গুরুদেব——"

"কি মা? এই যে আমি।"

"আজ আর বিলম্ব নেই—নয়?"

"সে কি কেউ বল্‌তে পারে, রমা? তবে মিছে সময়ের হিসাব করবার প্রয়োজনই বা কি! নারায়ণ স্মরণ কর।"

"করছি বাবা, তাঁর কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু একটা কথা—" রুগ্নার মুখ উদ্বেগে বিকৃত হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "কথা বলতে তোমার কষ্ট হবে মা।"

"না বাবা, তবু আমায় বলতেই হবে যে। আপনার মুখে আমার শেষ পরিণামের বিচার না শুনলে মরণও বোধ হয় আমায় ছোঁবে না। বেশী নয়, তবু বলতে পারব কি? শক্তিতে কুলোবে কি? বাবা, আপনার চরণধূলি—"

"দিচ্চি, তার আগে একটু বেদানার রস খাও দেখি, তাতে বল—"

"সে বলের কথা বলিনি বাবা, সে শক্তি আমার খুব আছে এখনো। আমি ভাবছি—ভাবছি, সে কথা আপনাকে বলতে পারব কি না!"

"না যদি পার তাতে ক্ষতি কি, মা? তুমি এখন ইষ্ট দেবতার নাম কর।"

"আপনিই আমার ইষ্ট, তাই তো এ কথা বলতে যাচ্ছি। আপনি ত আমায় ছেলে বেলা থেকে জানেন, আচ্ছা, বলুন দেখি, জীবনে আমি কোন দুষ্কর্ম্ম কোন পাপ করেছি কি?"

"ভাল প্রশ্ন করেছ রমা, এ কথার উত্তরে তুমি তৃপ্তি পাবে। বাল্যকালে বিধবা তুমি, কিন্তু তোমার মত পবিত্র সংযত ত্যাগের জীবন ক'জন সন্ন্যাসীতেই বা পায়? তোমার মায়া, দয়া, ভক্তি, ব্রত উপবাস পুণ্য তীর্থভ্রমণ—"

রুগ্নার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। "ছেলে-ভুলোনো কথা কেন বলছেন, বাবা? এখন আমি তা শুনতে চাইনে। আমি জানি, আপনি জ্ঞানী পণ্ডিত, তার উপর আমার গুরু,—আমার যা কথা—"

তাঁহার মুখে কথা আট্‌কাইয়া গেল, গুরুরও মুখে গাম্ভীর্য্যের উদাস ছায়া-পাত হইল। ক্ষণকাল পরে শিষ্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "তোমার নিজের কথা? বুঝেছি মা। যেদিন তুমি আমার শিষ্যত্ব চেয়েছিলে রমা, তার অনেক আগে থেকেই আমি তোমায় জানতাম; তোমার অম্লান জীবনের মাধুর্য্য অনুভব করতাম,—তাই ত তা বিশ্বনাথের চরণে তুলে দেয়েছি। কিন্তু মা জানো ত, মানুষ দেবতাও নয়, অন্তর্যামীও নয়, তোমার কোন কথা যদি আমার না জানা থাকে—"

"আছে, তাই আছে। সেই কথাই আপনাকে শুনিয়ে যাব, আর বুঝে যাব যে এর পর আমি কোথায় যাচ্ছি—স্বর্গে না নরকে!"

"ও কি রমা, কি বলছ তুমি! বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ কর, তোমার কণ্ঠরোধ হচ্ছে।"

"না বাবা, তার জন্য নয়। আমার মনে হচ্ছে, বাবা বিশ্বেশ্বর ত সব জানেন—"

"তার মধ্যে আর কোন দ্বিধা এনো না মা, তোমার যা বলবার আছে, তাঁকেই জানাও, তিনি সব ঠিক করে নেবেন। তুমি কি জানো না যে—"

"সে-সবই জানি বাবা,—তাঁর কথা পরে বলছি—। কিন্তু আমার কথা—"

"না, না, ভুল করো না মা, আগে তাঁরই কথা বল। তুমি—"

পীড়িতা তাঁহার কম্পিত হাত দুখানি

জোড় করিয়া মাথায় ছোঁয়াইয়া বলিল, "কোন ভুল নয় বাবা। এ যে আমার তাঁরই কথা, বুঝি,—আপনি পদধূলি দিন আমায়, আমি বলি।"

২

উত্তেজনার ভাবটুকু কাটিলে রমা ধীরে ধীরে বলিলেন, "বেশী কথা নয়, বেশী দিনেরও কথা নয়, কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বে আমার গত জীবনের কথা ভাবতে ইচ্ছা হয়। আপনি আমার গুরু, আপনার কাছে কোন জিনিষকে বাড়িয়ে বলা বা মিথ্যা বলা যেমন অন্যায়, কিছুকে খাটো করে লুকোনোও তেমনি ভুল। ছেলেবেলায় কখন্ বিয়ে হয়েছিল বা বিধবা হয়েছিলাম, তা ঠিক্ স্মরণ নেই, কিন্তু জ্ঞানের পর থেকে আমার যা কর্ত্তব্য—সংসার বা সমাজ আমার কাছ থেকে যা চায়, তার সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা বা ভয় ছিল না। সাধারণতঃ নারী-জীবনের পক্ষে লোকে যাকে দুঃখ বলে থাকে, আমি ঠিক্ তার মধ্যেই এমন একটা চিরস্থিতির আশ্রয় পেয়েছিলাম, একটি অমর অক্ষয় সুখ আমার হৃদয়ে অঙ্কুর দিয়ে ক্রমে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল, যার ছায়ায় পৃথিবীর অন্য সব দুঃখ-জ্বালা স্বচ্ছন্দে জুড়িয়ে যেতে পারে। কর্ত্তব্য আমার পক্ষে ভার ছিল না, বরং তাকে ভাল বেসে বয়ে চলাই আমার প্রিয় অভ্যাস গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিল।"

তাঁহার শ্বাস ঘন দেখিয়া গুরু বলিলেন, "আজ তুমি কেন এ কথা বলছ মা? তোমায় কে না জানে? কত দুঃখীকে যে কাঁদিয়ে যাচ্ছ—"

ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসির সহিত রমা বলিলেন, "সে সব কোন কথাই নয়; শুনুন, শীঘ্র বলে নিই। আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম পূজা-আচ্চার মধ্যেও আমি আর-একটা জিনিষ ঠিক্ তাদেরি মত ভালবাস্‌তাম, জানেন কি? আমি সাহিত্য-চর্চ্চা করতাম, কবিতা পড়তে খুব ভালবাসতাম, বাবা।"

"তাও জানি। আর তুমিও বোধ হয় জান্‌তে যে যারা মানুষের মনের দুয়ার-জানলা বন্ধ করে বাইরের কিছু ভিতরে আসতে দিতে নারাজ, আমি সে-দলের নই!"

"জানি, আপনি শুধু আমার গুরু বলে নয়, আপনি যে মানুষের মন জিনিষটাকে খালি একটুক্‌রো জমাট্ বরফ্ বলে ধরে রাখেননি, সে যে রক্ত-মাংসের চাপে চাপে ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লাতে পারে—অথবা সে এই মাটীর পৃথিবীর অংশ একটু মাটীর ধর্ম্ম পেয়ে শুকিয়ে পাষাণ হয়ে গেলেও ক্বচিৎ একটা দুর্ব্বার জন্ম এড়াতে পারে না, এ আপনি ভোলেন নি; জানি, বুঝি—তাই তো এ কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছি। আমার দ্বারা যার স্থির মীমাংসা হয় নি, আপনি হয়তো তার মানে করে দিতে পারেন। আচ্ছা, আর অন্য কথা নয়—সেই কথাই বলি।

ছেলেবেলায় বিধবা হবার পর থেকেই, —কেউ ত আমায় শেখায়ওনি বোধ হয়, বাবা; বড় বেশী ছোট ছিলাম কি না, এগারো বৎসরের মেয়ে বিধবা পিসি জ্যেঠাইমারা পর্য্যন্তও আমায় বাঁধাবাধির কোন নিয়ম শেখাতে চেষ্টা করতেন না।

তবু—কিসের শিক্ষায় বা সংস্কারে তা জানি না, ঐ জ্ঞানশূন্য অবস্থাতেই আমি আমার সেই অবস্থাটিকে যেন আমার বুকের হাড়ের্ মধ্যে তুলে নিয়েছিলাম। বড় শোক বা দুঃখ ত নয়ই,—যিনি চলে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ত আমার পরিচয় ছিল না, কিন্তু সেই শিশু-জীবনের খেলা-ধূলা ঢেউয়ে-ভাসা হাল্‌কা প্রাণটা এক-দিনের ধাক্কায় এমন উল্টে পাল্টে গেল,—জলে-ডোবা জাহাজের শেষ মাস্তুল্‌টার মত বালির উপর জলের উপর আটকে শক্ত কাঠ উঁচু হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল,—ওঃ সে যেন কী! আমিই নিজে তার সব ভাব বুঝতে পারিনি বোধ হয়। সবাই বলত, আমার স্বামী স্বর্গে, আমি দেবতার স্ত্রী, তাই সাধারণ মেয়েদের চেয়ে আমার কর্ত্তব্য যেমন কঠোর, আমার আসনও তেমনি সবার উর্দ্ধে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা দিদিমা ঠাকুমারা অনেক কথা অনেক কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে আমায় এমনি অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, যেখানে বাবা মার কান্নার দুঃখটুকু বাদ দিলে, নিজের পক্ষে আত্ম-সম্মানের উচ্চ ঐশ্বর্য্যশালী অথচ বেদনা-বন্ধন-হীন আনন্দ-গর্ব্বের বিচিত্র দেবাসন-খানিই আমি দখল করে বসেছিলাম। বয়স বাড়তে বাড়তে যখন আমি সকলের প্রশংসা বা শ্রদ্ধা পেতে লাগলাম, তখন তাতে আমার আশ্চর্য্য বা আনন্দ বোধ হত না; আমি যে মানবীরূপে দেবী, আমি যা করছি তা যেমন আমার পক্ষে সহজ, তেমনি আমায় সম্মানের চক্ষে দেখাও তাদের কাছে সোজা না হবে কেন? হাসি পাচ্ছে, বাবা। এখন আমি সেদিনের কথা মনে করে হাসি, কিন্তু অনেকখানি বয়স পর্য্যন্ত এ হাসিটুকুও আমি হাসিনি, কারণ নিজেকে তখন সে সব চপলতার অতীত বলেই ধারণা ছিল। তবে তারি মধ্যে তরল সাহিত্যের মোহ-টুকু কোথা থেকে এসেছিল কি জানি! গল্প-উপন্যাস ইচ্ছা করে ঘৃণা করতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু নড়াতে পারতাম না ঐ কাব্যকে; বুঝতাম, তারা অনেক মাটীর জিনিষকেও সোনার রং মাখিয়ে চোখের সুমুখে ধরে, অনেকের কাঁচা মুগ্ধ দৃষ্টি তাতে ঝলসেও যায়, কিন্তু নিজের পরে তখন আমার এতখানি অটুট বিশ্বাস যে ভ্রমেও মানতে চাইতাম না যে অমনি কোন সামান্য জিনিষ আমার প্রস্ফুটিত জ্ঞান-নেত্রকে ভ্রান্ত করে দিতে পারে! আমি যে দেবী, আমার নিত্যকৃত দুঃসহ ক্লেশের অম্লান পুণ্যই আমার মনের সমস্ত আঁধার ঘুচিয়ে সত্যের পথ দেখাবে!

না বাবা, কিছু বলতে হবে না আপনাকে, আর নিজের কর্ম্মের গর্ব্ব নাই, তবে বিধাতার চিরদিনের দয়া, তাঁর আশীর্ব্বাদে ঐ পুণ্যকে এখনও আমি তেমনি বিশ্বাস করি! তার ইঙ্গিতেই ত এত কথা বলে যাচ্ছি। তা নয়, শুধু আমার অহঙ্কার যে তখন কত বড় ছিল, কেমন অনাহত ছিল, তাই জানাচ্ছি আপনাকে।

তারপর বহুদিন অমনিভাবেই কেটে গেল। পৃথিবীতে থেকে ভগবানের কায করছি, এই অভিমানের তৃপ্তিতে মরণের সাধ ছিল না, কিন্তু তখন যদি মরণ

আসতই তা হলে তার পক্ষে খুব অসময়ও হত না। চল্লিশ পার হয়ে গেছল; শরীরে রোগ ছিল, চোখের দীপ্তি অনেক খানিই নিবে এসেছিল। কিন্তু মেয়ে মানুষের চশমা পরাকে যারা অত্যন্ত সৌখীনতার চিহ্ন বলে মনে করে, তারাও আমার সেই নিস্তেজ চোখের কাচ-ঢাকা প্রখর দৃষ্টির সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যেত। আমার লেখাপড়া বই কাগজ—অনেক গিন্নী-বান্নী শ্রেণীর বিধবারা বিরক্তির চক্ষে দেখ্‌লেও ভয়ে কিছু বলতে পারতেন না, কারণ পুরোহিত-ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বদাই আমার তর্কে পরাস্ত হন ও মাঝের-পাড়ার স্মৃতিরত্ন খুড়া গ্রামে এলে বাড়ী এসে আমার সঙ্গে দেখা এবং আলাপ করে যান। যাঁরা আমার নিন্দুক, তাঁরাও নিন্দার পথ খুঁজে পেতেন না, কেন না নিষ্ঠায় আচারে প্রতিদিন আমিই তাঁদের খুঁৎ ধরে দিই। আমি জানতাম, যিনি যাই বলুন, তার অধিকাংশই তাঁদের মুখে,—সেখানে আমার কার্য্যই আমার প্রবল সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়, আমি তাঁদের ভয় করতে যাব কেন?"

"তার জন্য এত কথা বলছ কেন, রমা? অনুতাপের কথা এর মধ্যে কি আছে? মানুষের মনের মধ্যে অমনি কিছু উগ্র শক্তি না থাকলে সহজে সে সংসারের পথে চলে যেতে পারবে কেন?"

"শক্তি? হাঁ, আমিও তখন এই নামই দিতাম বটে। কিন্তু পরে বুঝেছি, শক্তি বা ভক্তি যে নামই দেওয়া যাক তার, কিন্তু ওর মধ্যে যদি আমি বলে কেউ সমঝদার লোক বসে থাকে, তবে সে ভাল সামগ্রীগুলিও—নারায়ণ!"

একটা টানা নিশ্বাসে রুগ্নার দুর্ব্বল বক্ষ-পঞ্জর কাঁপিয়া উঠিল। ব্যস্তভাবে গুরু বলিলেন, "একটু স্থির হও দেখি মা। তুমি বুঝতে পারছ না কিন্তু আমি দেখেছি—মৃত্যুর ধারণাটা যে সময় মানুষের প্রাণে স্থির বিশ্বাসের মত জেগে ওঠে, কোন উপায়ে তখন জীবনের ছোট-খাটো অপরাধগুলোও মনকে খুব বেশী রকম অনুতপ্ত করে তোলে। তুমি যা বলছ, তা ত কিছু দোষের নয়, রমা।"

"এখনও যে কিছু বলা হয়নি বাবা, এবার আসল কথা বলি। সবটুকু খুলে বলতে হবে, পারব কি অত বলতে? তবু—

সে বৎসর আমরা তীর্থে বেড়িয়ে ছিলাম, আপনার মনে আছে ত? আপনারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু বাড়ীর কাছে কার প্লেগ হয়েছিল নাকি—আপনি লিখে বারণ করলেন?"

"হাঁ, সে তো সেদিনের কথা।"

"পাঁচ বৎসর হয়েছে। এই পাঁচটি বৎসর—যাক্ সে কথা। আমাদের দেশের অনেক লোকই ছিলেন সে দলে, ধনী গরীব মেয়ে পুরুষ—সবাই মিলে যেখানে আমরা নামতাম, সেখানে দিব্যি সোর-গোল পড়ে যেত। দান-ধ্যান, পূজা, শ্রাদ্ধ—খুব ঘটার সঙ্গেই চলছিল। চিত্রকূট নর্ম্মদা গোদাবরীর পথ ধরে আমরা দ্বারকা গিয়ে আমেদাবাদের পথ ঘুরে ফিরছিলাম পুষ্করতীর্থ করব বলে।

তীর্থ সারা হলে যখন আজমীরে ফিরে

এলাম, উঃ, সেদিন কী ভীড়, বাবা! কোন্ সাহেব না কে কোথায় যাচ্ছিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার ঝেড়ে জবাব দিলে যে ফার্ষ্ট বা সেকেণ্ড ক্লাস দিতে তাঁর সাধ্য নাই। ইণ্টার বলে কোন ভদ্র বিড়ম্বনা সে ট্রেনে ত নাই—শুনে আমাদের সঙ্গী বড় লোকেরা হতাশ্বাস হয়ে বসে পড়লেন। পরের ট্রেনে বা তার পরদিন ফিরলেই হত, কিন্তু ব্যস্ত-বাগীশদের সে বুদ্ধি দেয় কে? বিশেষ টিকিট লগেজ সব প্রস্তুত, আর কি ফেরা হয়? গাড়ী দাঁড়াতে সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে একটা থার্ড ক্লাশে উঠে বস্‌লেন। শিকের বেড়া দেওয়া একটু অংশে ষ্টেশন মাষ্টার দয়া করে ফীমেল লেখা একটুক্‌রা কাগজ এঁটে দিয়েছিলেন, আমরা দু-চারটি মেয়ে তাতে ঢুকে পড়লাম। তীর্থে এসে এটুকু কষ্টে কেউ ক্ষুণ্ণ হন নি, বোধ হয়। আমার ত ভালই লাগল।

পাশের পুরুষ-কামরাটি লম্বা দোড়দার ঘর, একটু একটু কাঠের ঘের দিয়ে চার-পাঁচখানা ভাগ-করা। তাতেই কাঠের ছোট ছোট বেঞ্চ সাজিয়ে যাত্রীদের বসবার জায়গা। এত যাত্রীও কি উঠেছে তাতে! পেশোয়ারী কাবুলী থেকে রাজপুতানার সব শ্রেণীর সব জাতির লোককেই দেখে নিলাম সেদিন। শুধু পাগড়ীর পর পাগড়ী, কত বর্ণের, কত আকারের, আর কত ছাঁদের বাঁধনে বাঁধা সে শিরোভূষণগুলি!

আমাদের সাথীরা নিকটেই ছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও কাছে ছিলেন একদল মারাঠী। তাঁদের সঙ্গেও স্ত্রীলোক ছিল কিন্তু তাঁদের জন্য কোন মেয়ে-গাড়ী বা ঠেলাঠেলির দরকার হয় নি; তাঁরা পূর্ব্বে উঠে বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলেন, তারপর ক্রমশ সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সরে এসে কোণে পড়ে গেছেন, মানুষকে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য কোন ঝগড়া বা হাতাহাতি নাই সেখানে।

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এল। সবাই স্থির হয়ে স্থান দখল করে বসে'—পাছে আর কেউ উঠে পড়ে! এমন সময় একটু গোল উঠল—কোনো কুলীর সর্দ্দার হোক্ বা রেলের ছোট-খাটো কেউ হোক্ দুজনে মিলে একজন রোগা লোককে আমাদের কামরার দুয়ারে এনে হাজির করলে। সবাই হাঁক পেড়ে উঠল, "আর জায়গা নেই, গাড়ী ভরে গেছে,"—কিন্তু সে সব চীৎকার গ্রাহ্য না করে তারা সেই রোগাকে ঠেলে গাড়ীর মধ্যে তুলে দিলে! একজন বল্লে, "বেশীদূর নয়, এর ভাই বান্দীকুই-এ এসে ওকে নামিয়ে নেবে।"

আমাদের বাঙালীরা 'পুলিশ পুলিশ' করে চেঁচাচ্ছিলেন, তারা হাসতে হাসতে চলে গেল। গাড়ীও ষ্টেশন ছেড়ে দিলে।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা। শীতের রাত্রি, মেঘ করে আকাশের আঁধার ও বাতাসের ঠাণ্ডাকে যেন জমাট করে তুলেছিল। গাড়ীতে গা মেলবার ঠাঁই নাই, তারি মধ্যে যিনি লগেজ বা বাক্সর উপর পা ছড়াতে পেয়েছেন, তিনি নিজের কৃতিত্বে প্রফুল্ল। ও পাশে সেই রোগীটা কম্বলমুড়ি দিয়ে কাঠের মেজেয় পড়ে আস্তে আস্তে কোঁথাচ্ছিল। ঘরশুদ্ধ সবাই তার উপর রুষ্ট, তার কাছের মুলতানী ছোক্‌রাটা লাঠির গুঁতায় ক্রমশ তাকে কোণ-ঠেসা

করে ফেল্লে। কোণের বেঞ্চে আমাদের পাড়ার রক্ষা বুড়ী বসেছিল, ছোঁয়া যাবার ভয়ে সে প্রথমে মুল্‌তানীর সঙ্গে কোঁদল পরে সেখানে পরাস্ত হয়ে অজ্ঞান শক্তিহীন রুগ্নের উপরই নানা উপায়ে রোষবর্ষণ সুরু করলে। অন্য পাশ থেকেও তার মাথায় চুরুটের ছাই কমলালেবুর খোসা থেকে পালি তামাকের পিচ, সবই জমা হতে লাগল।

রাত্রি বেশী হয়ে উঠেছে, ঘুমে মাথা নুয়ে আসছে, হঠাৎ রক্ষা চেঁচিয়ে উঠল—"ড্যাক্‌রা আমার পোঁটলা বুচকী সব নোংরা করে দিলে!" ঘরখানায় সত্যই দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। রোগী তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান, কোন কথা বলতে পারছে না। আমাদের সঙ্গিনীরা বল্লেন, "সব কল্লা, আসল নষ্টামি!" মুল্‌তানী খোঁচা দিয়ে দেখতে লাগল। পেশোয়ারী সেই ময়লা জায়গার উপর দিয়েই নিজের প্রকাণ্ড বস্তা টেনে দূরে গিয়ে বসল, আর মথুরার আগরওয়ালা মত প্রকাশ করলেন, "ইস্‌কো হায়জাকা বেমারি হুয়া।"

কথাটা শুনেই আমাদের সংক্রামক-রোগ-ভীরু বাবুরা একসঙ্গে চম্‌কে উঠলেন। কলেরা কি আর কিছু—কেউ তার খোঁজ নেয় না, শুধু গোল্‌মাল আর ঠেলাঠেলি! পুরুষদের কি হবে এই ভয়ে আমাদের কুঠরীর মেয়েরা পর্দ্দা ফাঁক করে "ওগো, তোমরা এ ঘরে এসো" বলে ডাক্ দিতে লাগলেন। সবারি ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেই নিশ্চল অবসন্ন বস্তুটি কাপড়-ঢাকা-দেওয়া স্বয়ং মৃত্যু, আর সে এখনি লাফিয়ে উঠে যার-ঘাড়ে-খুসি লাফিয়ে পড়বে!

তারি মধ্যে যে লোকটা সব-চেয়ে সাহসী বা সব-চেয়ে মূর্খ, সবারি অনুরোধে পড়ে সে-ই রোগীটাকে ছুঁয়েছিল; তারপর ভয়ে হোক্ বা নির্ব্বুদ্ধিতায় হোক্ সে বলতে লাগল, "মানুষটা বেঁচে নেই!" কথাটা শুনেই সব হৈ-চৈ খানিকক্ষণের জন্য থেমে গেল। প্রকাণ্ড ঘরখানায় একটিমাত্র বাতি, তাতে উজ্জলতার চেয়ে ছায়ার ভাগই বেশী। ভয়ে কি ভাবনায় জানি না, আমার মনটাও কেমন হয়ে গেল। ভাবলাম, কি আশ্চর্য্য, এতগুলি লোকের মধ্যে কেউ একবার কাছে গিয়ে দেখচে না যে লোকটা সত্যি মরল কি না? আমার পাশের গৃহিণীকে বল্লাম, "দিদি, বাবুকে বলাওনা, মানুষটা বেঁচে আছে কি না কাউকে দিয়ে দেখান্।"

"এত রাত্রে কোন্ জাতের মড়া—কে ছুঁতে যাবে? কার মরণ-পালক উঠেছে?"

এমনি কতকগুলা বিরক্তির সঙ্গে তিনিও আমার আক্কেল্‌কে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। আমি আর কিছু বল্লাম না, মুখ ফিরিয়ে পাশের ঘরের কাণ্ড শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলাম। তার বেশী আর করবই বা কি? আমি মেয়ে মানুষ—আমার ইচ্ছা ত আমার ক্ষমতার মধ্যে নয়!

সবাই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে; আগ্রা ও মথুরার লোক কটা ত এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে বোধ হয় পরের ষ্টেশনেই তারা নেমে যাবে! বাবুরাও "বাঁদিকুই" কোথায়, কতক্ষণে পৌঁছুবে, এই প্রশ্নে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ এমন সময় এপাশ থেকে পরিষ্কার হিন্দীতে উত্তর হল, "বাঁদীকুই

আস্‌তে এখনও দেরী আছে, সবাই স্থির হয়ে বসুন এখন।"

চেয়ে দেখি, আমাদের পাশের সেই মারাঠীদলের মধ্যে যে বয়স্ক, লম্বা লোকটি চোখে চশমা এঁটে এতক্ষণ শুধু বই পড়ে যাচ্ছিলেন, তিনিই সে কথা বল্লেন। তার উত্তরে আমাদের কে একজন ভাঙ্গা হিন্দীতে বলে উঠলেন,—ততক্ষণ কি মড়া নিয়ে বসে থাক্‌তে হবে না কি?

তিনি এতক্ষণ বাবুর দিকে চেয়েছিলেন, এইবার একটু হেসে বাংলাতেই বল্লেন, "ব্যস্ত হবেন না, তারও উপায় করতে হবে। কিন্তু প্রথমে দেখা দরকার হচ্ছে যে লোকটা বেঁচে আছে কি না।" বলে তিনি সঙ্গের লোকদের দিকে ফিরে তাঁদের সঙ্গে অজানা ভাষায় কি কথা বলতে লাগলেন। খানিক পরে গাড়ী একটা ষ্টেশনে পৌঁছুলো। বাবুরা ও হিন্দীভাষীরা সমস্বরে 'পুলিশ-পুলিশ' করে চেঁচালেও সে অন্ধকার আড্ডায় কোন তক্‌মাধারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। দু-একটা ছেঁড়া কাপড়-পরা লোক এসেছিল, কিন্তু কুলীর প্রয়োজন নাই শুনে প্রস্থান করলে। ইত্যবসরে ট্রেন চলতে লাগল।

গাড়ীর লোকেরা আবার অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। রক্ষা পালিয়ে এসে আমাদের ঘরে ঢুকছিল কিন্তু গৃহিণীরা তাকে পর্য্যন্ত আসতে দিলেন না, কেন না সেও হয়ত মড়া ছুঁয়েছে, দ্বিতীয়ত তার কাপড়-চোপড় ত নিশ্চয় কলেরার ময়লায় ছোঁয়াপড়া,—সুতরাং—

ওদিকে বিপদ আরও বেড়ে যাচ্ছে, মুসল্‌মানী মেয়ে কটা ছেলে কোলে করে একপাশে সরে গেছল কিন্তু তাদের পুরুষেরা রাগে বিরক্তিতে এমন উদ্ধত অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল যে রোগা বা সেই মৃত দেহটাকে এখনি তারা বাহিরে টেনে ফেলে দেয় আর কি! এ পাশ থেকে সেই ভদ্রলোকটি ডেকে ডেকে বল্‌ছিলেন, "বাঁদিকুই এল বলে, তোমরা কেউ গোল করো না, সেখানে পৌঁছে সব ঠিক্ হয়ে যাবে।" কিন্তু সে কথা কে শোনে? সে পাশ থেকে সরে সরে সকলে মাঝখানে জমা হয়ে এমন আড়াল্ করে ফেল্লে যে দেহটার কি হল আর আমরা দেখতে পেলাম না।

ঘরখানা জুড়ে একটা বিষম ব্যাপার চলছিল, অতগুলো লোক সব দাঁড়িয়ে উঠে বড় গলায় কথা কচ্চে, কে কার কথা শোনে, তারও ঠিক নাই!

আবার একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াল। ছোট মানে মুখ বাড়িয়ে তার ঘর-দুয়ার কি একটা আলোও দেখতে পাইনি। তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে; আর শীত—কিম্বা ভয় ও উদ্বেগেও বুঝি—আমাদের বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমে গেছল। আমাদের নিজের পক্ষে এমন বিপদ আর কি হয়েছিল, বলুন, তবু মনে হচ্ছিল, এ রাত্রিটার বুঝি আর শেষ নাই, এ শীত যেন ভাঙ্গ্‌বে না কখনও!

গাড়ী থেকে গলা বাহির করে কে চেঁচাচ্ছিল, "এ কোন্ ষ্টেশন?"

দূর থেকে কি-একটা উত্তর এল, তার সঙ্গে এরা আরও চেঁচিয়ে বল্লে, "এটা কি বাঁদীকুই?"

আবার একটা শব্দ শোনা গেল, তা হাঁ কি না বোঝাও গেল না, কিন্তু গাড়ীর লোকেরা শুনলে এই বাঁদীকুই। কারণ সেই কথাটাই তাদের প্রয়োজন ছিল!

তারপর গোল ও লোকের চঞ্চলতা এত বেড়ে উঠ্‌ল যে স্থির করতে পারলাম না, সেখানে কি হচ্চে। বৃদ্ধা লোকটি মানুষ ঠেলে ওধারে যাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বোরখা-ঢাকা মুসল্‌মানী মেয়ে কটি রাস্তার উপর ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে আর তাদের প্রহরার হিসাবে পঞ্জাবী পুরুষদুটো এমনভাবে লাঠি বাগিয়ে প্রস্তুত যে শুধু ভদ্রতার শান্তির হিসাবেও সে ব্যূহ ভেদ করা দুষ্কর ব্যাপার!

তবু বুঝতে বাকি থাক্‌ল না যে তারা সেই লোকটাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিচ্চে। পেশোয়ারী আর সেই জাঠ-চাষা দুজন ধরাধরি করে তাকে দুয়ারের কাছে এনে ফেল্লে—বেশ বোঝা গেল। আমাদের বাবুরাও উৎসুকভাবে ঘাড় তুলে দেখছিলেন। মনে হল ভয়ের সঙ্গে তাঁদের মুখে বেদনারও আভাস দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ আমারও প্রাণের মধ্যে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল, যদি মানুষটা বেঁচে থাকে? যদি এটা বাঁদিকুই না হয়? কি ভয়ানক কাণ্ড—ওরা এ করছে কি!—দিদির হাত চেপে ধরে বল্লাম, "তীর্থ করতে এসে এ কি সর্ব্বনাশ হচ্চে দিদি, বাবুকে বলাও না—মানুষটা যে যায়!"

দিদিও ভয় পেয়েছিলেন, বল্লেন, "আমি কি করব ভাই, বাবুকে ডেকে দেবে কে?"

"আমি দিচ্চি, তুমি বল। বুঝচ না—ছেলে-পিলের মার এতে কি অকল্যাণ হচ্চে!"

তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। "ত্যাখ বোন, যা ভাল হয় কর।" বলে তিনি দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন। পর্দ্দা তুলে আমি ডাকতে উদ্যত, এমন সময় ধপ্ করে শব্দ হল—তার পর খস্-খস্ ঘড়-ঘড়্, যেন কি গড়িয়ে একটু নীচে পড়ে গেল। সর্ব্বনাশ, তারা তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে! কে একজন বল্লে, "তারের ওপারে খাদ ছিল তা ত জানি না, হাত ফসকে পড়ে গেল।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বল্লে, "যাক্, কাল সকালে পুলিশ এসে সব ঠিক্ করে নেবে।"

আর বেশী কথা নয়, গাড়ী তখন চল্‌তে সুরু করেছে। বাবা, বুঝে নিন, এমন ঘটনায় মেয়েমানুষের মনে কি হয়? দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, আমার যেন সেটুকুও শুখিয়ে গেল! চোখের সুমুখে এমন নির্দ্দয় কাণ্ড ঘটে যায়, বসে থেকে তার কোন উপায় পর্য্যন্ত করতে পারলাম না? নারী-জন্মটার উপর সেদিন কেমন ধিক্কার জন্মেছিল! আমার স্ত্রী-দেহটাকে কখনো কোন কারণে আমি ঘৃণা করিনি, কিন্তু সেদিন প্রথম বুঝলাম—যাক্। দিদি সেই কাবুলী মিন্সেটাকে হাজার গালি পাড়ছিলেন, আর আমার মনে হচ্ছিল, মিথ্যা, তাদের গালি দেওয়া ভুল। সামনে বসে আমাদের যে ঐ-সব ভদ্র আত্মীয়, তাঁরা সে মূর্খ জাঠ বা নিষ্ঠুর কাবুলীর চেয়ে কোন অংশে সহৃদয় নন্; সবাই মিলে চেষ্টা করলে তাদের ক্ষমতা কি যে এ কাজ কর্ত্তে পারে? এর জন্য যা পাপ বা মনস্তাপ

—শুধু বয়ে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে অপরাধী ঐ দুটো লোকের চেয়ে তাঁদেরি তা বেশী প্রাপ্য, কারণ তাঁরা শিক্ষিত, ভদ্র; ওঁদের ভয়ের মূর্ত্তি দেখে তারা আরও ভয় পেয়েছে; ওঁদের মনের ভাব অনুসরণ করেই তারা তাকে ফেলতে সাহস করেছে,—নিশ্চয়। আমাদের গৃহিণীরা "ভগবানের লীলায় এখানেই ওর মরণ লেখা ছিল" ইত্যাদি কথায় অদৃশ্য ভাগ্য-বেচারীকে টেনে এনে শেষ অপরাধী খাড়া করছিলেন; আমার কিছু ভাল লাগছিল না, আমি চুপ করে জানলার পাশে বসে রইলাম।

চোখ মেলে চিরে ফেল্লেও আঁধার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস, মাঝে মাঝে পাৎলা জলের কণা উড়ে মুখে লাগছিল। আমাদের ধর্ম্ম-গুস্তকে 'অন্ধতামস' বলে যে নরকের বর্ণনা পড়েছি—বারবার আমার তাই মনে পড়তে লাগল।"

রমা একটু থামিলেন। আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখেও তাঁহার মুখখানি এমন একটি উৎসাহের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত হইয়াছিল, যাহাতে বোধ হয় মরণই ভয় পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে! গুরুর মুখেও ঔৎসুক্যের স্তব্ধ ভাব! রমাকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এরি জন্য তুমি এত অনুতপ্ত হয়ে আছ মা?"

রমা চোখ মুদিয়া যেন কি স্মরণ করিতেছিলেন, তাঁহার কথায় চাহিয়া দ্রুতস্বরে বলিলেন, "না, না, তা কেন হবে? তার জন্য অনুতাপ করবার তো কিছু নাই। সেদিন সেখানকার পঞ্চাশখানা নিষ্ঠুর হাতের সঙ্গে ভগবানের নিজের দুখানি করুণার বাহুও যে নেমে এসেছিল, বাবা! নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে তাঁর কাজ শেষ করে গেছলেন তিনিই—আর তাতেই আমাদের অতগুলো লোকের সমস্ত পাপ-তাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে।"

পীড়িতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; ভয় পাইয়া গুরু বলিলেন, "কি মা, কি হল? কিছু—"

"না বাবা, ভালই আছি আমি, সে কথা মনে হলে মরণের অসহ্য কষ্টেও আমি সুখ পাই—তাই—" বলিয়া চোখের জলধারা বালিশে মুছিয়া রমা বলিলেন, "কিছুই ভুলিনি, অথচ মনে হচ্চে আর ঠিক্-ঠিক্ বলতে পারব না। তার পরের ঘটনা, হ্যাঁ, সব চুকে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদের মুরুব্বি বাবু এ-ঘরে উঁকি দিয়ে বল্লেন, "কোন ভয় নেই, তোমরা সব ভাল আছ ত?"

এবার দিদি একটু রাগের সঙ্গে গর্জ্জন করে বল্লেন, "সব্বাই ভাল আছে আর থাক্‌বেও, এখন তোমরা তো সে অনাথ মানুষটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এলে, যাও, ঠাণ্ডা হয়ে বসো গে।"

বিচলিতভাবে বাবু বলিলেন, "সে কি-রকম কথা হল? আমরা ফেলে দিলাম কিসে?"

দিদি সে কথায় কান্ না দিয়া বকিয়া চলিলেন, "মরা কি জ্যান্ত, তার ঠিক্ নেই—এই আঁধার রাত্রি, কেউ কোথাও নেই—অমন রুগ্ন,—হলই বা কলেরা, নিজেদের কারো হলে কি হত? কি বলে কেমন করে তাকে ফেলে দিলে?" দিদিকে

আমার তখন প্রণাম করবার ইচ্ছা হচ্ছিল। দিদির কথায় বাবুর মুখ শুখিয়ে উঠল।

একটু নীরব থেকে তিনি বল্লেন, "কোথাকার কে, তার জন্য আমি ঐ পঞ্জাবী গোঁয়ারদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে যাব নাকি? খুব মেয়েলী শাস্তর বার করেছ ত! কিন্তু ধৈর্য্য ধর, চেয়ে দেখনি তাই অত চেঁচাচ্ছ, সে একলা ভাগাড়ে যায় নি ত—তার সঙ্গে আরও একজন জলজ্যান্ত মানুষও নেমে গেল, দেখ্‌লে না?"

"কখন্—কে?" আমার মনের প্রশ্নটা দিদি ছাড়া আরও অনেকে উচ্চারণ করলে।

"চিনিনে, সেই যে লোকটা বাংলাতেও কথা কইতে পারে—ওদিকে তাকে নামাচ্ছিল সেই সময়ে এ পাশ দিয়ে সেও নেমে গেছে—আমি দেখেছি।" কথা কটা মুখে নিয়েই বাবু পিছিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বস্‌লেন।

"মাগো, সে আবার কে? অত আঁধারে নামল কি করে?" গাড়ীর গৃহিণীরা সভয় বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাহিলেন। আমার কিন্তু তখন—বাবা, লোকটির মুখ বা চেহারা কিছুই স্মরণ হচ্ছিল না। ভাল করে দেখিইনি হয় তো,—নাটক-নভেলে বা বিদেশী উপদেশের বই-এ যেমন সব ঘটনা পড়া যায়, অল্পবয়সী ছেলেদের বা মেয়ে-মানুষের মন যে-সব কথায় এক মুহূর্ত্তে ছল্-ছল্ করে ওঠে, এ যে চাক্ষুষ তাই!—একটু আগে একটা অসম্ভব রকম নিষ্ঠুরতা দেখে যেমন চম্‌কে গেছলাম, তারপর হঠাৎ তেমনি আশ্চর্য্য তেমনি নূতন —আঃ, কি নাম দেব তার? যা ঘটে গেল—ঠিক্ তার উল্টো! ঘৃণা, ভয়, স্বার্থ—সব কটারি বিপরীত সে যে! খালি মনে হচ্ছিল, মানুষ নয় মানুষ নয়।

সব চুপ হয়ে আছে তখন; একটা বড় রকম ধাক্কা পেয়ে পাশের কামরায় "বম্বে বারোদা মধ্যভারত,—রাজপুতানা ও মালবেরা" সব স্থির হয়ে বসেছিল। তাদের গল্পগুজব সব যেন থেমে গেছে, আমি আমার পুঁটুলিটি কোলে করে বাইরের আঁধার-পানে চেয়ে। একটু একটু তন্দ্রার ভাব আসছিল, আর চম্‌কে ভেঙ্গে যাচ্ছিল; বুকের মধ্যে রক্ত যেন ছল্‌কে উঠ্‌ছিল, আর কি-একটা মধুর ভাব—যেন সুস্বপ্নের মত,—বাবা, ক্ষণে ক্ষণে আমার মনে হচ্ছিল,···আমি আজ দেখেছি, আমার নারায়ণ—আমার হরি, আমার দেবতা! আজ আমি এই ছার নয়নে তাঁরই দর্শন পেয়েছি। তিনি এসেছিলেন, আমাদের পাশে সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন,—তাঁকে আমি দেখেছি। তাঁর অঙ্গের বাতাস এই গাড়ী-ভরা লোকের গায়ে লেগেছে,—যত অপরাধ করুক—তারা আজ পবিত্র, তাদের সঙ্গে আমিও ধন্য, আমার তীর্থযাত্রা আজ সার্থক!

মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখলাম, তাঁর আসনখানি শূন্য। সাধ হচ্ছিল, নামবার পূর্ব্বে যদি একবার ঐ কাঠের তক্তাটুকু মাথায় কপালে ছুঁইয়ে যেতে পারি! গাড়ীখানার উপরই যেন আমার মায়া জড়িয়ে এল, সেখান থেকে এখনি নামতে হবে ভেবে কান্না পাচ্ছিল। গাড়ী-ভরা লোক, ঐ নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর কটা, সবারি উপর আমার সমান ভালবাসা আসছিল। তাদের নিষ্ঠুরতার

উপলক্ষেই ত আমার গোলোকের দেবতা আজ মাটীর ধরায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন! হ্যাঁ, দেবতা,—আমি দেখেছি—তাঁকেই দেখেছি!"

"কি বলছ, মা?"

"আমি কি ভুল বুঝেছি বাবা? সত্য বলুন।"

গুরু নিশ্চলভাবে শিষ্যার কথা শুনিতে ছিলেন, তাঁহারও চোখের তারায় মোহের বিহ্বল ভাব! প্রশ্ন শুনিয়া মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "যা বল্‌ছিলে এতক্ষণ, তার পরে আবার এ প্রশ্ন কেন রমা?"

"কি জানি বাবা, তাঁর খেলার বিশেষত্ব এইখানেই। তিনি হাত বাড়িয়ে দেবেন, কিন্তু যাকে দেবেন, সে যে হাতে হাতে তা পায় না! এই খুঁজে মরা, ভুল বোঝা, হারিয়ে যাওয়া, ঘোর-ফেরের পাকে ফেলে মানুষকে তিনি চিরটা কাল কাঁদিয়ে আস্‌ছেন।"

রমার মুদিত চক্ষুর প্রান্ত দিয়া আবার দুইটি জলধারা নামিল। সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া গুরু বলিলেন, "থামখা প্রশ্ন কর মা, তোমায় শেখাবার মত আমার কিছুই নাই। কিন্তু তার পর? সে রোগী বা মারাঠী ভদ্রলোকটির খোঁজ পাওয়া যায় নি বোধ হয়? বলতে পারবে কি, না, শ্রান্তি বোধ হচ্চে? থাক্—"

একটু জোর হাসির সহিত রমা বলিলেন, "থাকবে কেন? এটুকু না বল্লে ত কিছুই বলা হল না। যা বল্লাম, সে তো শুধু উপলক্ষ গল্প, শেষ যার সঙ্গে আমার নিজের কথা জড়ানো,—তা আপনাকে না বল্লে চলবে কেন? শুনুন, কতক্ষণ, বোধ হয়, অনেকক্ষণ পরে গাড়ী বেশ একটা জাঁকালো ষ্টেশনে থামল। সে দেশের ধরণে তৈরি ভারী পাথরের মোটা থামওয়ালা প্রকাণ্ড ষ্টেশন। আলো বাতি লোকজন, যে-সব জায়গা ছেড়ে এলাম সন্ধ্যার পর থেকে—তার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। খানিক পরে শুনলাম, এই বাঁদিকুই।

নামটা শুনে যেন সবাই একটু চম্‌কে গেল। চুপ, চুপ! বাইরের গোলের সঙ্গে কেউ আপনার আওয়াজ মেলালো না! সবাই জেগে আছে—কিন্তু অনেকেই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এমনি ভাব দেখাতে লাগল। তা হোক্ তবু তারা যা এড়াতে চাচ্ছিল তার ভুল হল না! একটু পরেই দেখা গেল—একজন হিন্দুস্থানী লোক প্রায় প্রত্যেক কামরার দুয়ারে এসে কি জিজ্ঞাসা করছে। আমাদের ঘরের কাছে এসেও সে ঘরে কোন রোগী আছে কি না প্রশ্ন করলে। তখন সবারি যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল—এমনি বিরক্তভাবে ধমক্ দিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের বাবুরাই তার অগ্রণী, তাঁদের গুরুগম্ভীর আকৃতি ও চেন-ঘড়ির ঝক্‌মকে আভার চমকে দ্বিরুক্তি না করে লোকটি সরে গেল।

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে উঠছিল, দিদি বল্লেন, "মাগো, সবারি যেন ভীমরতি হয়েছে! মানুষটার যে কি হল—সে কথাটা ওকে বল্লেও না! আমার ইচ্ছে হচ্চে—"

ইচ্ছাটা তাঁর একার নয়। কিন্তু যাদের যাদের প্রাণে সে প্রবল ইচ্ছা দুয়ার ভাঙ্গবার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় তারা সব কটিই বাংলা দেশের রুদ্ধঘরের বদ্ধপাখী, ওকে ডেকে সাড়া দিতে গেলে এখনি

তাদের ঘরে বাইরে—যাক্, সে খুব বেশী কথা নয়।

এমনি সময় একজন ডাকপিয়ন গাড়ীর কাছ দিয়ে কি নাম ধরে ডেকে যাচ্ছিল; শুনে একজন মারাঠী উঠে বল্লেন, "টেলিগ্রাফ কি ?"

হাত বাড়িয়ে খাম তুলে পিয়ন বল্লে, "আপনিই কি—"

"হ্যাঁ, দাও।" তারপর সেখানা পড়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের সঙ্গীদের কি বলে তিনি প্লাটফর্ম্মে নেমে পড়লেন। আমার মনে চমক্ লাগ্‌ল, এ তাঁরই টেলিগ্রাফ্ নয় ত!

আবার সেই গরীব লোকটি কাছে এসে উপস্থিত, "আমায় ডাকলেন, হুজুর ?"

"হ্যাঁ, নারায়ণা ষ্টেশন জানো ?"

আশ্চর্য্য হয়ে সে বল্লে, "জানি।"

"সেইখানে তোমার ভাই আছে, এই ডাকগাড়ীতে উঠে তুমি সেখানে চলে যাও।"

"ডাকগাড়ীতে ? নারায়ণা ? সে সেখানে নামল কেন, মালিক ?"

"তার অসুখ বেশী হয়েছিল। যাও, আর দেরি নয়,—ট্রেন ছেড়ে যাবে।"

"এখন—এতরাত্রে—?"

"হ্যাঁ, ঐ যে গাড়ী দাঁড়িয়ে—যাও। হ্যাঁ, তোমার কাছে ভাড়ার পয়সা নেই বোধ হয় ?" বল্‌তে বল্‌তে লোকটাকে প্রায় টেনে নিয়ে তিনি অন্যধারে চলে গেলেন।

ষ্টেশনটায় গাড়ী-বদলের হাঙ্গাম ছিল, অনেক চাষাভুষো নেমে গেল, দু-চারজন উঠ্‌লও। আমাদের সাম্‌নেই ফিরতি ডাকগাড়ী ছুটে গেল। অনেকক্ষণ পরে চুরুট মুখে লাঠী ঘোরাতে ঘোরাতে সেই মারাঠী ভদ্রলোক ফিরে এলেন। এ গাড়ীও তখন ছেড়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণ দেখেছি আমাদের সাথী পুরুষেরা গাড়ীর অন্য আরোহীদের সম্বন্ধে নির্ব্বিকার ছিলেন; নিজেদের মধ্যে ছাড়া আর কারো সঙ্গে আলাপও করেননি। এবার কিন্তু স্বয়ং বড়বাবু মহাশয় এগিয়ে গিয়ে সেই ভদ্রলোকের কাছে দাঁড়ালেন। ইংরাজিতে কি কি কথা হল, হাসিমুখে মারাঠী তার উত্তর দিলেন। তার পর আমাদের শিকের কাপড় তুলে হাস্‌তে হাস্‌তে বাবু বল্লেন, "ওগো শুনলে ? তোমাদের সে পুষ্যিপুত্তুরটি বেঁচে আছে। তার ভাই সেখানে চলে গেল।"

তিনি যাচ্ছিলেন,—দিদি তাঁর গায়ের কাপড় চেপে ধরে বল্লেন, "শোন, শোন, আর কিছু খপর পেলে ? ওরা আরও সব কি বল্‌ছিল তোমায় ?"

"বেশী আর কি! বল্লে, বাবু তার দিয়েছেন, তার ভাইকে পাঠাতে।"

"বাবু! বাবু আবার কে এল এর মধ্যে ?"

"কি জানি, বাবুসাহেবই ত বল্লে। বড় লোক হলে ওরা ও বাবুই বলে বোধ হয়। সে-ই খরচ-পত্র রেখে গেছল শুন্‌লাম, মানুষটা ভাল বটে।"

"যা হোক এতক্ষণে তার ভালমানুষীর একজন সাক্ষী পাওয়া গেল! তুমি না বললে তার সব ভালটুকু পাঁকে পোঁতা থেকে যেত!" দিদি খুব হাস্‌ছিলেন, বাবুও একটু হেসে বল্লেন, "তোমরা রাগ করছিলে বটে কিন্তু আমারও ভারী ভাবনা হয়েছিল, জেনো। উপায় ছিল না—কি করব—তাই।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

দেশী ছবির মেলা *

এ-বছর দেশী ছবির মেলায় গিয়ে, এমন-কতকগুলি বিষয় চোখে পড়েছে, আর কোন বারে যা দেখতে পাইনি। বাঙ্গালীর প্রাণে দেশী ছবির রস যে ক্রমশ রীতিমত জমে আসছে, এবারে তের-চোদ্দ জন নতুন পটুয়ার দেখা পেয়ে ভালরকমেই সেটা বোঝা গেল। অবিশ্যি, এই নতুন দলের সবাই যে রং-রেখার খেলায় খুব-বেশী কারিকরি জাহির করতে পেরেছেন, তা নয়; হয়ত তাঁদের সকলকার ভিতরেই অল্পবিস্তর খুঁৎ আছে। কিন্তু এ-সব খুঁৎ আমোলে আনতে আমাদের মন সরছে না; কেননা, এই নূতন সাধকদের আগমনে মেলার মধ্যে এমন-একটু উৎসাহ, তারুণ্য ও জীবন সঞ্চার করেছিল, যার জন্যে আমরা এঁদের ভ্রম-প্রমাদ হাসিমুখেই এড়িয়ে যেতে পারি!

দেশী ছবিতে নিসর্গের শোভা বড়-একটা দেখা যায় না বলে অনেককে অভিযোগ করতে শুনেছি। আর এটাও ঠিক যে, এদেশী শিল্পীরা এতদিন নিছক নিসর্গ-চিত্র নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামান-নি। তাই অন্য-অন্য বারের মেলায় নিসর্গ-পট দেখবার সুযোগ আমরা খুবই কম পেয়েছি। কিন্তু এবারের মেলায় গিয়ে দেখি, নিসর্গ-চিত্রের সংখ্যা গুণ্‌তিতে অনেকগুলি। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও মুকুলচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই এবারে পটের উপরে বহিঃপ্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এঁদের আঁকা ছবিগুলির কোনখানিই মাছিমারা কেরাণীর মত যেমন-দেখা তেমনি-আঁকা নয়—এঁরা জড়কে চিত্রলোকে এনে, শিল্প-তন্ত্রের মন্ত্র পড়ে জ্যান্ত করে তুলেছেন এবং আকাশ-পৃথিবী, পাহাড়-প্রান্তর, নদ-নদী ও তরু-লতার মধ্যে বিশেষ ভাবের ইঙ্গিত দিতে সবিশেষ চেষ্টা করেছেন। এ-সব ছবির ভিতর দিয়ে প্রকৃতিকে চেনবার যতটা সুবিধা হয়, আসল নিসর্গ-দৃশ্য দেখলে ততটা হবে না—কারণ, বেশীরভাগ লোকেরই তেমন দেখবার মত চোখ নেই।

অবনীন্দ্রনাথের দুখানি নিসর্গ-পটে আমরা তুলির যে অবাক-করা কায়দা দেখেছি, তা কখনো ভুলব না;—এত-অল্প রেখায় ও এত-কম রঙে যে এত-বেশী ভাব জাগানো যায়, না-দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। গগনেন্দ্রনাথের রাঁচির প্রাকৃতিক দৃশ্যেও ভাবের বিচিত্রতা এবং আলোক-ছায়ার মাধুরী দেখে মোহিত হয়ে যেতে হয়।

এবারকার মেলার আর-একটি বিশেষত্ব, গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র। বছর-দুই আগে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা খানকয়েক ব্যঙ্গচিত্র এই মেলাতেই দেখেছিলুম, বোধহয়। সে-হিসাবে এবারকার ব্যঙ্গচিত্রগুলি একেবারে আন্‌কোরা নূতন না-হলেও, আর-সব দিক দিয়ে এগুলি অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র। গগনেন্দ্র-

* কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল্ আর্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নবম বার্ষিক প্রাচ্য-চিত্রকলা-প্রদর্শনী।



'ফাল্গুনীর ছবি'

অন্ধ বাউল

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

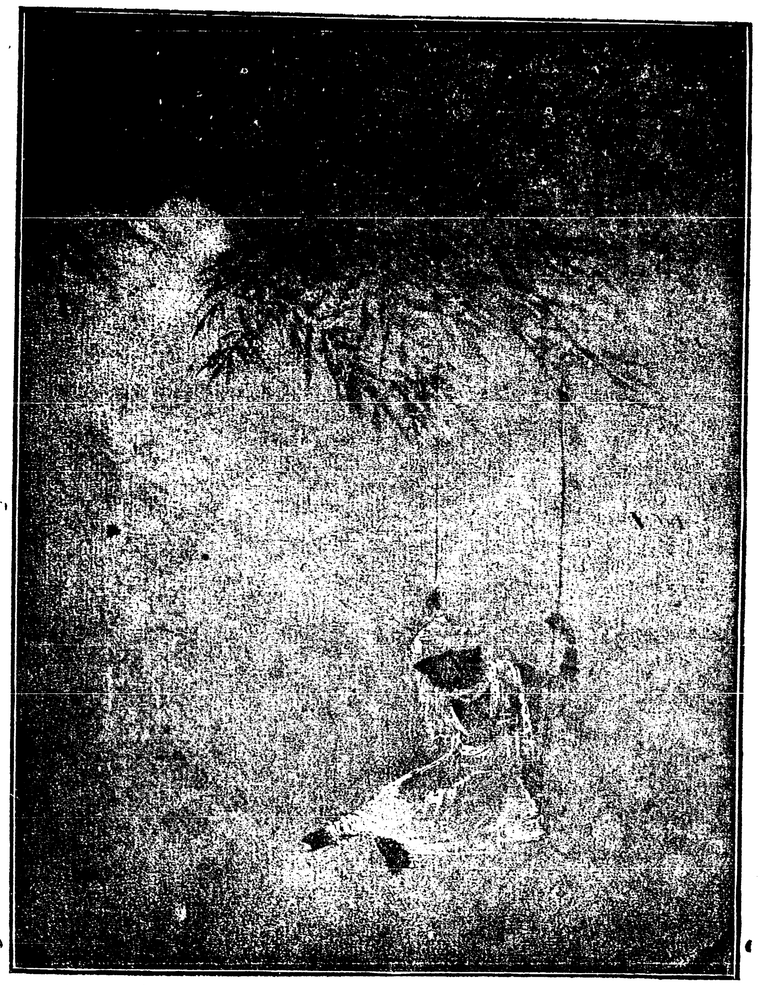

'ফাল্গুনীর ছবি'

দোদুল দোলা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

নাথের ব্যঙ্গচিত্রের বিশেষত্বের কথা কিছুদিন আগে 'ভারতী'তেই আমরা বিস্তৃতভাবে বলেছি—সুতরাং এখানে আর-কিছু না-বললেও চলবে।

সুধু গগনেন্দ্রনাথের নয়—তাঁর এক শিষ্যও এবারে সতেরোখানি ব্যঙ্গের ছবি মেলাতে পাঠিয়েছেন। এই নূতন ও তরুণ শিল্পীর নাম শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওস্তাদ-পটুয়া গগনেন্দ্রনাথের ছবির ভিতরে যেমন ভাবের গভীরতা ও রেখার আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল দেখা যায়, এই নবীন শিল্পীর কাছ থেকে যদিও ততটা আশা করা যায় না, তবু এ-কথা বলতে হবে যে, ব্যঙ্গচিত্রে গোড়া থেকেই দক্ষ হাত ও তীক্ষ্ণ চক্ষু নিয়ে ইনি আসরে নেমেছেন; ভবিষ্যতে ইনি যে খুব উঁচুদরের আর্টিষ্ট হবেন, বর্ত্তমানে তিনি তা ভালমতেই প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন;—কারণ, তাঁর ছবিগুলির হাসিখুসি ও রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে বেশ-একটি টাট্‌কা ভাব ও মৌলিকতা আছে।

* *
*

বাঙ্গলা চিত্রকলার বৈচিত্র্য ক্রমেই যে বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতির সদর-অন্দরের হাসি আর অশ্রু, আলো আর ছায়া, হাল্কা আর ভারি সকলরকম ভাবের আভাসই এখনকার চিত্রকরদের তুলির লিখনে জেগে উঠছে। সমঝদার শুনিয়ে পান না বলে রসিক ধ্রুপদিয়ার বিচিত্র গানের খেলা অনেক আসরেই বন্ধ হয়ে যায়। সমঝদার পড়ুয়ার অভাবে অনেক কবির কলমের মুখ থেকে কালি শুকিয়ে গেছে,—এমন-কি মনের খেদে অনেকে যে মরতেও ডরান-নি —সাহিত্যের ইতিহাসে সে প্রমাণও আছে! বাঙ্গালী শিল্পীরাও এদেশে বড়-বেশী সমঝদার রসিক পান-নি; কিন্তু এই অনাদর ও অবহেলার দরুণ তাঁরা যে ভেঙ্গে না-পড়ে আরো জোর-উদ্যমে শিল্পলক্ষ্মীর চরণ আঁকড়ে ধরেছেন, এতেই তাঁদের অসীম প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দেশের এককোণে বসে অবনীন্দ্র-নাথ কলাকমলার আরতির জন্যে যে ছোট্ট দীপটির শীষ উস্‌কে দিয়েছিলেন, তার আলো আর মিট্‌মিটে হয়ে সুধু সেই ঘরের দেওয়ালেই ঘুমন্ত ছায়াকে জাগিয়ে তোলে না,—শিল্পীর হাতের মায়াস্পর্শ পেয়ে সে আলো আজ প্রাতঃসন্ধ্যার উদয়-তোরণে সদ্যজাগ্রৎ সূর্য্যকরের মত দীপ্ত হয়ে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুঃখ এই যে এদেশকে তবু এখনো বারংবার ডাকাডাকি করতে হচ্ছে—'অন্ধ জাগো, অন্ধ জাগো! কিন্তু, তবু অন্ধ জাগে না, রূপসায়রের ধারে বসে মাথায় হাত দিয়ে সে ভাবে তার 'কি রাত্র, কিবা দিন'!

এবারের মেলায় আর-একটি জিনি অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়েছে। দেশীশিল্পে পুনর্জ্জন্মের সময়ে,—সে বড় বেশীদিনে কথা নয়,—যে-সব ছবি আঁকা হোত তা পোনেরোআনাই ছিল হয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক। তাদের ভিতরে একালে কথা, ভাব, দৃশ্য বা আদর্শের এই মস্ত অভাব ছিল। সে ছবিগুলি উঁচুদরের বর্ণকাব্য হোত, সন্দেহ নে

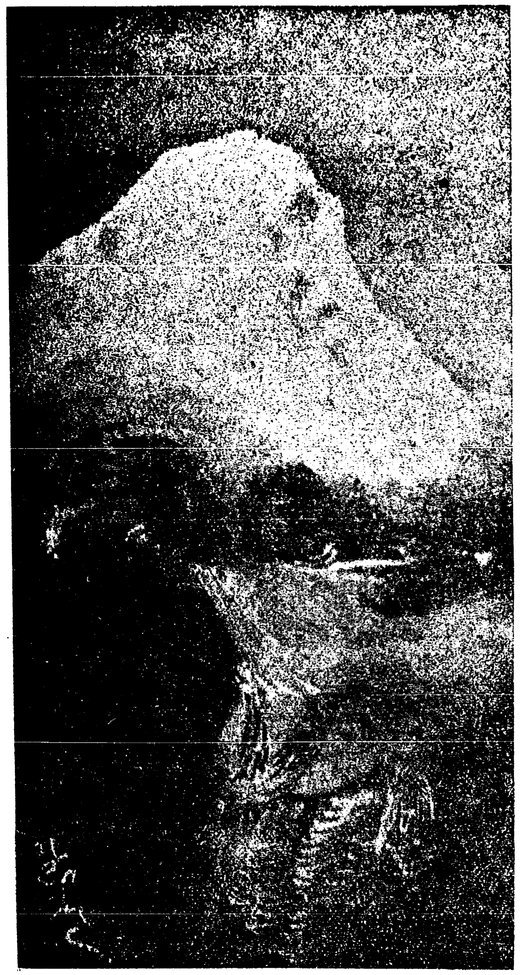

'ফাল্গুনীর ছবি'
গীত
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

কিন্তু তাদের ভিতরে একাল তার প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনতে পেত না। এখন এই বড় অভাবটি পূর্ণ হয়েছে। আজকাল দেশীশিল্পে একালের সুর যথেষ্ট পাওয়া যায়—এমন-কি শিল্পীরা এখন দেশের সাময়িক ছবি পর্য্যন্ত আঁকতে সুরু করেছেন, সমাজের সমস্যাগুলিকেও মূর্ত্তিমান করে তুলতে তাঁরা আর পিছ্‌পাও নন। এবারের প্রদর্শনীতে এমনিতর আধুনিক ছবি ছিল অনেক,—তার উপরে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, নৈসর্গিক এবং কাল্পনিক ও বাস্তবিক ছবির হাট নিয়ে এবারকার মেলাটি এমনি নিখুঁত হয়েছিল যে, কিছুতেই কেউ ছুৎ ধরে খুঁৎখুঁৎ করবার যুৎ পান-নি!

অনেকে বলতেন, "দেশী ছবি এত ছোট হয় কেন?"—শিল্পীরা দেখছি এবারে তাঁদেরও মুখবন্ধ করেছেন! এমন বড়বড়

দেশীচিত্রের পটও আর-কোনবারে এত-বেশী ছিল না। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল—এই দুই গুরু-শিষ্যে একসঙ্গে "ঋতুরাজ" নামে যে প্রকাণ্ড পটখানি এঁকেছেন, তা দেখে সকলেই বুঝেছেন, রূপে-গুণে আকারে-প্রকারে দেশী ছবিও কত সুন্দর ও বৃহৎ হোতে পারে! লম্বায়-চওড়ায় মস্তবড় না-হলে যে-সব 'সর্ট্-সাইটেড্' ক্রিটিক কিছু বড়-করে দেখতে পারেন না, এবার মেলায় গিয়ে তাঁরাও টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত করতে পারেন-নি!

* *
*

মেলায় ঢুকেই সামনে একখানি বড় আকারের ছবি দেখে বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। এ-ছবিখানির নাম হচ্ছে 'পথের সাথী'—এঁকেছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর। * একটি সাঁওতাল যুবা বাঁশী বাজাতে-বাজাতে পথ দিয়ে চলেছে, পাশে তার তরুণী প্রেয়সী।—ব্যস্, এত-বড় ছবিখানিতে হ-য-ব-র-ল আর কিছু নেই! চারিদিক ধূ-ধূ করছে;—মূর্ত্তিদুটির সামনে পথের ছোট্ট রেখাটি একটুখানি বেঁকে সেই সীমাহীনতায় ডুব দিয়ে কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। এরি-মধ্যে এই দুটি মূর্ত্তিকে মানিয়েছে ঠিক যেন প্রকৃতির বুকের দুলালের মত। সেই নিরিবিলি শূন্যতার মাঝখানে এদের দুজনকে দেখলে মনে হয়, এদের আর কেউ নেই, এ দুনিয়ায় এরা সুধু এ-ওর মুখ চেয়েই সংসারের পথ দিয়ে আপনমনে হেঁটে চলেছে। মূর্ত্তিদুটি দর্শকের দিকে পিছন ফিরে আছে বটে, কিন্তু তাতে-করে তাদের ভাবমাধুর্য্য নষ্ট না-হয়ে আরো-বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুবতীর এক পায়ে পাঁয়জোর, আর এক পায়ের আঙ্গুলে একটি চুট্‌কী; এথেকে তার সরল প্রাণের নারীসুলভ চপল ভাবটি খুব চমৎকার ফুটেছে। যুবক তার প্রেয়সীকে শুনিয়ে তন্ময় হয়ে বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে—আর চারিদিকের স্তব্ধতার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বাঁশীতে যে মেঠো সুরটি বেজে উঠেছে, তার সঙ্গিনীর সঙ্গে আমরাও যেন তা প্রাণের কাণে শুনতে পাচ্ছি!

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ বা নন্দলাল প্রভৃতি পাকা শিল্পীদের রপ্ত হাতের এর-চেয়ে ঢের ভাল ছবি দেখলেও আমাদের তাক্ লেগে যেত না; কেননা, তাঁদের কাছ থেকে একেবারে পয়লা নম্বরের জিনিষ আদায় করতে আমাদের মন আগে-থাকতেই তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু আর-সবাইকে জানিনা বলে তাঁরা যা দেন আমরা মুখ বুঁজে তাই-ই নি—খুব উঁচুদরের কিছু তাঁদের কাছ থেকে চাই-ও না, পাই ও না—অমনি পাঁচ-পাঁচি মাঝামাঝি হলেই তুষ্ট হয়ে যাই। তাই, এবারকার মেলার আর-সব ছবির চেয়ে এই ছবিখানিই আমাদের প্রাণে বিস্ময়ের একটি চমক লাগিয়ে দিয়েছে—নবীন শিল্পীর তুলিতে যে এত জোর ছিল, তা ত আমরা

* "পথের সাথী"র প্রতিলিপি 'ভারতী'র মুখপত্রে দেওয়া গেল। অতবড় ছবির প্রতিলিপি এত ছোট হওয়াতে আসলের রস অবশ্য নকলে জমে-নি; তবু দুধের স্বাদ বাঁরা ঘোলে মেটাতে চান, ছবিখানি তাঁদের ভালই লাগবে।

জানতুম না! শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের 'শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা" এবং 'বসন্ত' নামে ছবিদুখানিও সকলকার মনের মত হয়েছে।

মেলার সব ছবির বর্ণনা বা নাম করা এখানে পোষাবে না। তবে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'ফাল্গুনী'র ছবিগুলি আমাদের খুবই ভাল লাগল। তাঁর আঁকা আরো-কয়খানি ছবি এই মেলার সার্থকতা বাড়িয়েছে, যদিও সেগুলির প্রায় সব-ক-খানিই পুরাণো। তাঁর ছবিগুলি দেখলেই শিল্পীকে চেনা যায়—এমন বাঁধা ষ্টাইল খুব কম আর্টিষ্টেরই আছে। অবনীন্দ্রনাথের মত রং ফলাবার পটুতাও তাঁর আর কোন শিষ্যের কাজে দেখলুম না,—এ রং যে ছবির গায়ে লেপা রং, হাজার খুঁটিয়ে দেখলেও তা বোঝা যায় না;—ফোট-ফোট ফুলের পাপড়ীতে ধীরে ধীরে ভিতর হোতে যেমন আপনা-আপনি রং ধরে,—এ রং ছবির ভিতর থেকে তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে ওঠে!

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর "কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন" আর-একখানি চমৎকার ছবি। সুধু চমৎকার বললেই এ ছবির সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয় না—কারণ পৃথিবীর খুব বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ চিত্রের সঙ্গে সমশ্রেণীতেই অনায়াসে এ ছবিখানির নাম করা যেতে পারে। তাঁর "নাচে"র ছবিখানিও অপূর্ব্ব। এটি একটি নৃত্যচপলা দেবদাসীর মূর্ত্তি—তার বেশ-ভূষা ও সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে গতির লীলা বয়ে যাচ্ছে।

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দের আঁকা রবীন্দ্র-নাথের ছাব প্রদর্শনীর আর-একখানি অবশ্য-উল্লেখ্য চিত্র। তাঁর হাতের নক্সাগুলিও বাঙ্গলাদেশের শিল্পে একটি নতুন ধারা এনেছে।

এবারে আরো-বিস্তর উঁচুদরের ছবি দেখলুম; সেইসঙ্গে আধুনিক ভাস্করের গড়া কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তিও এই ছবির হাটে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করাতে, এই "দেশী ছবির মেলা" সকল দিক দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছিল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

কোরিয়ার কবিতা

ভগবানের চিড়িয়াখানা

(ফোঃ লোন্)

কহিল কুকুর দূর হ'তে এক সিংহে হেরে,—
"আমি করি অশ্রদ্ধা এরে।"
—"কি রে! তিরিক্ষি! কারণটা কি?" পুছে কাঠবিড়ালি।
—"মেয়েলি-ধাঁচায় চুল রাখে, ছাখ্,—ভাবন্ খালি!
(ছি, ছি) সিংহের জাত মেয়েলি নেহাৎ,— জান্‌লি, ক্ষুদ্র!
ন্যাড়া-মাথা নেড়ি কুকুরের দল মর্দ্দ শুধু!"

* * * *

হাড়গিলা বলে—নাচে-মশ্‌গুল্ ময়ূরে দেখে,—
"এর প্রতি কভু শ্রদ্ধা টেঁকে ?"
—"ইস্! কেন ? শুনি!" পুছে টুন্‌টুনি—ছিব্‌লে পাখী।
—"অশ্লীল নাচ—কুভাবের আঁচ,—বুঝিস্ তা' কি ?
(ওয়ে) ঠোঁটে করে' চাপে ব্যাং-খোর সাপে,—নোংরা অতি ;
কুঁড়োজালি নেই মোর মতো, নেই ধর্ম্মে মতি!"

* * * *

কহে উল্লুক হুকু-হুকু-রবে ভুবন ভরি'—
"কোকিলে ?—আমি না শ্রদ্ধা করি।"
পুছে কাণা-মাছি "অপরাধী পিক কী অপরাধে ?"
ডিগ্‌বাজী খেয়ে উল্লুক কহে "চটি কি সাধে ?—
(ওর) নাম হ'ল করে' মোদেরি নকল,—জানো তো,—তবু,—
ঢং করে' বলা হয় 'কুহু', 'হুকু' না বলে কভু!"

জলৌকা ও মহীলতা

(হ্বাং-হো-ফো-লিং)

কোরিয়ার কেঁচো কেওকেটা হ'ল
জাপানী জোঁকের সঙ্গ করে' ;
কোরিয়ার বুক কুরিয়া গড়িল
নিজ মনুমেণ্ট্ টঙ্ক করে'!
সে মনুমেণ্টে চড়িয়া, দম্ভে
ফণা-ধরা-ছাঁদে হেলায় গ্রীবা ;
ধরাখানা বুঝি সরার মতন
ভাখে সে,—আ মরি! ভঙ্গী কিবা!
জাপানী জোঁকেরা তারিফ করিছে
কহিছে "কেষ্ট-বিষ্টু তুমি,
তোমায় পয়দা করিয়া কেন না
হইল বন্ধ্যা কোরিয়া-ভূমি ?

জোঁকের বন্ধু তুমি কেঁচোরাজ!
তোমার তুলনা নাই ভুবনে,
জোঁকের চরম বিদ্যা আমরা
দানিব তোমায় করেছি মনে।
কেঁচোর অঙ্গে কেঁচো বসাইব
ওগো অনুপম! নকল-জোঁক!
বিস্ময়ে হবে সুবিস্ফারিত
কোরিয়ার আধ-মুদিত চোখ।"
কেঁচো বলে "এঁহে, না না, তা' তা' হেঁ হেঁ,
ভবদীয়া ভাষা মিষ্ট ভারি,
কদর কে বোঝে তোমরা নহিলে ?
ভবদীয় ঋণ শুধিতে নারি।

লীলা-ছলে বল 'বন্ধু' কেবল,
গোলাম যে মোরা জানি সে কথা ;
কেঁচো-মাটি মোর কেল্লা হইবে
পদধূলি যদি দাও একদা।
হলুদিয়া জোঁক! বলদিয়া জোঁক!
শোনো গো আমার মিনতি শোনো,
চীনে জোঁক আর ছিনে জোঁক ওগো
করজোড়ে করি নিমন্ত্রণ।"
টকাস্ করিয়া উঠিল গো-জোঁক,—
সেঁটে ধরে যারা গোরুর বাঁটে,—
"কোরিয়ার কোনো পোকা কি মাকড়
জুটিয়োনা যেন মোদের নাটে।"
কাচুমাচু কেঁচো কেঁচোতর হ'য়ে
বলে "না, না ;—তবে গুটি-পোকারে
বলেছিনু দুটো তুঁত-পাতা খেতে
বল যদি, দিই হাঁকিয়ে তারে।"
"এখনি, এখনি!" জাপানী জোঁকেরা
বলিয়া উঠিল সমস্বরে—
"রক্ত না পিয়ে রাঙা ডানা যার
গজায়, তারে কি ঢোকায় ঘরে ?"

স্পষ্ট

(ফোঃ লোম্)

না বুঝি কী বলে পিক, কী যে বলে শুক ;
বুঝি শুধু ব'সে ব'সে ছাতু-কলা খায়।
উড়িয়ে দে পাখীগুলো, শেয়াল ডাকুক,
"ক্যা হুয়া" সুস্পষ্ট কথা,—মানে বোঝা যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উপদেশের তাড়স্

(গল্প)

ব্যাপারটা খুবই সামান্য, কিন্তু তার হুল-ফোটানোর দাগ এখনো আমার মনের উপর দগ্-দগ্ করচে।

এন্‌জিনিয়ারিং কালেজ থেকে বেরিয়েই এক চাকরি পেলুম—বিদেশে। একটা নতুন রেলওয়ে-লাইন খোলা হচ্ছিল, তারই একটা কাজ।

আমি খাঁটি সহুরে ছেলে ; এ-পর্য্যন্ত এক শিবপুর ছাড়া বিদেশ কাকে বলে জানিনা। বিদেশের নামে উৎসাহে বুকটা যেমন লাফিয়ে উঠল, তেমনি আবার ভিতরে-ভিতরে কেমন গা-ছম্‌ছম্‌ও করতে লাগল। অজানার প্রতি মানুষের যেমন টানও আছে তেমনি ভয়ও আছে। ঐ দুটো দৈত্যকে বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে আমি বাড়ি-ছেড়ে রওনা হলুম।

রেলগাড়িতে অনেকগুলি ভদ্রলোককে দেখলুম। তার মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ। আমি তাঁকে চিনিনা; কিন্তু আমি গাড়িতে উঠতেই তিনি বলে উঠলেন—"এস ভাই, এস!"—বলে আমার হাত-ধরে তাঁর পাশে বসিয়ে দিলেন। লোকটি বোধ হয় ঘটক হবেন। কারণ নানারকম কৌশলে তিনি কেবলই এই খবরটা জানতে চাইছিলেন যে আমি-লোকটা বিবাহিত কি-না। যেমন ফাঁস হয়ে গেল যে আমার বিয়ের ফুল তখনো ফোটেনি, অমনি আমার কানের পাশে ঐ মধুকরটির গুঞ্জন রীতিমত জমে উঠ্‌ল। তিনি বোধ হয়, আমার আগাগোড়া-পরিচয়টা মুখস্থ করে নিচ্ছিলেন। কারণ কথার মধ্যে তিনি প্রায়ই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠছিলেন—"কি বল্লে তোমার বাপের নাম ভাই?—অমুক—না? তোমাদের বাড়ি অমুক জায়গায়?—না?" ইত্যাদি।

রেলগাড়ির সঙ্গী-হিসেবে লোকটিকে আমার নেহাৎ মন্দ লাগছিলনা;—তাঁর মধ্যে ভারি একটি মজা ছিল। তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার সঙ্গে এতটা মাখামাখি করে ফেল্লেন যে ওরই মধ্যে আমার উপর তাঁর দু-একবার মান-অভিমানও হয়ে গেল। ইনি নিশ্চয় সেই-দলের লোক, পরের প্রতি যাদের দরদ অতিমাত্রায় অতিরিক্ত;—তুমি চাও বা না চাও গায়ে-পড়ে তোমার উপকার তারা করবেই। আমি একে একলা, তায় এই প্রথম বিদেশ যাচ্ছি শুনে তাঁর মহা চিন্তা উপস্থিত হ'ল। তিনি বলতে লাগলেন—"তাই ত হে, তুমি একলা যাচ্ছ, আমার ভাবনা হচ্ছে! তোমাকে সঙ্গে করে আমি নিশ্চয় পৌঁছে দিয়ে আসতুম, হায়-হায়, যদি না—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি যে-রকম ভালোমানুষ এবং আন্‌কোরা লোক তাতে বিদেশে গিয়ে যে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাব সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যে বিদেশে যেতে হলে কি-কি জিনিষ জানতে হয় এবং কোন্‌-কোন্‌ বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার সে-সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমায় চিবিয়ে-চিবিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। তার মধ্যে যেটা তাঁর বিবেচনায় সবচেয়ে অমূল্য কথা সেটা হচ্ছে বিদেশে কি-করে চোর-ডাকাত চিনে নিতে হয় তারই তত্ত্ব। তাঁর ঐ অমূল্য তত্ত্বের অধিকাংশই আমার মন-থেকে এখন মুছে গেছে, নইলে জগতের হিতার্থে আজ সেগুলোকে আমি প্রচার করে দিতে পারতুম। তাঁর দেওয়া আর-একটি জিনিষও আমি হারিয়ে ফেলেছি। সেটা হচ্ছে সেই আশ্চর্য্য কষ্টিপাথর যার উপর মানুষকে কষে নিয়ে আবিষ্কার করা যায় তার চোরত্ব কতটুকু।

এসব জিনিষ খুইয়ে ফেল্লেও তাঁর কথার এই সারটুকু আমার মনে আছে যে, আমরা স্বদেশী চোরদের মুখ-চেনা বলে' আমাদের প্রতি তাদের একটু চক্ষুলজ্জা আছে। কিন্তু বিদেশী চোরদের তো তা নেই, সেই জন্যে বিদেশে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। আমার মনে পড়চে তিনি এ-কথাও বলেছিলেন যে, কেন তা বলা যায় না বটে, কিন্তু বিদেশের লোকমাত্রেই হয় চোর, না-হয় ডাকাত! সাধুলোক সেখানে দুর্লভ।

তাঁর এই মতটিকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্যে অভিজ্ঞতার থলি ঝেড়ে তিনি অনেক গল্প বার করতে লাগলেন। শেষে হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লেন যে তিনি এত চালাক যে আমাকেই তিনি একজন মস্ত ধড়িবাজ চোর বলে' ধরে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য পরীক্ষা করে বুঝলেন বটে যে তা নয়।

তিনি এত চোরের গল্প জানেন যে শুনলে মনে হয় লোকটা যেন "দারোগার দপ্তর" গ্রন্থাবলী আগাগোড়া মুখস্থ করে রেখেছে। চোর-ডাকাতের হাতে মানুষের কতরকম বিপদ এবং লাঞ্ছনা ঘটেছে ও ভবিষ্যতে ঘটতে পারে তার একটা বিশদ তালিকা তিনি মুখে-মুখে তৈরি করে ফেল্লেন। আমাকে ধরে বল্লেন—"নোট্‌বুকে টুকে রাখ হে! অনেক কাজে লাগবে।" আমি রাজি হলুম না দেখে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লেন—"আচ্ছা, মনে-করে রাখলেও চলবে।"

তাঁর এই একঘেয়ে চোরের কাহিনীতে গাড়ির সমস্ত বাতাস যেন ঘুলিয়ে উঠতে লাগল এবং চৌরতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশের ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। আমি তাঁর কাছ থেকে সরে পড়বার জন্যে উশ্‌খুশ্‌ করতে লাগলুম। তাই দেখে তিনি আমার হাতখানা চেপে ধরলেন এবং এমন-করে আমাকে আগ্‌লে রইলেন যে পালাবার ফাঁক রইলনা। এমন-কি কারুর পানে চাইলেও তিনি ধমক দিয়ে উঠছিলেন—"জানা নেই, শোনা নেই, যার-তার সঙ্গে ফস্‌-করে আলাপ করা কি! কার মনে কি আছে কে জানে!"

এইসব কথা তিনি আমাকে খুব আস্তে-আস্তে ফিস্‌-ফিস্‌-করে বলছিলেন। তার কারণটা কি তা বলবার সময় তিনি গাড়ির আর-সকলের মুখের দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে একবার চেয়ে নিয়ে বল্লেন—"চোরেরা যদি কোনোরকমে টের পায় যে আমি তাদের শিকার ছিনিয়ে নিচ্ছি তাহ'লে হয়ত তারা দলবেঁধে এই গাড়ির মধ্যেই আমাকে আক্রমণ করবে। কি জান বাপু, সাবধানের মার নেই!"

আমার কানে-কানে তাঁর শেষ-কথাটি হচ্ছে এই যে তিনি খবর পেয়েছেন সম্প্রতি অনেকগুলো চোর-ডাকাত জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—অতএব সাবধান!

আমার নামবার জায়গা ঝাগ্‌ড়া ষ্টেশনে যখন গাড়ি এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। একরকম ঠেলাঠেলি করেই বৃদ্ধ আমাকে তাড়াতাড়ি গাড়ি-থেকে নামিয়ে দিলেন। কি-জানি যদি গাড়ি ছেড়ে দেয়!

প্ল্যাটফর্ম্মে জনমানুষ নেই। গোটাচারেক কাঠের খোঁটার উপর ময়লা পরকোলার মধ্যে মিট্‌মিট্‌-করে আলো জ্বলছে।—মনে হতে লাগল কারা যেন ঘোলা-চোখের মরা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে দেখছে! একটা ঝাপ্‌সা অন্ধকার, ঘন কুয়াশার মতো, চারিদিক ঘিরে রয়েছে। তার স্পর্শে শুধু চোখের পাতা নয়, মনের ভিতরটাও কেমন ভেরে আসতে লাগল। ষ্টেশনের বাইরে ঘন-গাছের মাথায়-মাথায় পুরু আলকাৎরার পোঁচড়া পড়ে-পড়ে অন্ধকার ক্রমে জমাট বেঁধে উঠতে লাগল। এই সব

দেখে-শুনে আমার মনটা এমন দমে গেল, যেন কান্না পেতে লাগল। আমি জিনিষপত্র নামিয়ে গাড়ির হাতল ধরে চুপ-করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সেই বৃদ্ধ বন্ধুটি জানলা দিয়ে একটুখানি মুখ বার করে বল্লেন—"ইস! এ যে একেবারে বনালয় দেখছি!"

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। বিদেশ-বল্‌তে মনের মধ্যে যে স্বপ্নরাজ্য গড়ে রেখেছিলুম মুহূর্ত্তের মধ্যে সেটা চুরমার হয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল এ যেন কোন্ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে এলুম। গাড়ি ছাড়বার সময় বুড়োটি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লেন—"সাবধান! এখানে নিশ্চয় চোর ডাকাত আছে!"

তাঁর এই কথা শোনবামাত্র নিজেকে এমন একলা ও অসহায় মনে হ'তে লাগল যে আমি চারিদিক যেন শূন্য দেখতে লাগলুম। ধীরে-ধীরে গাড়ি ছেড়ে দিলে;—মনে হ'ল আমার সমস্ত বল-ভরসা ঐ গাড়িখানা নিজের গারদের মধ্যে পুরে নিয়ে চলে গেল। আমি কাতরভাবে সেই পলাতক গাড়িখানার দিকে চেয়ে রইলুম।

এখান থেকে বিশ মাইল গোরুর-গাড়ির পথে ভিটেমাটি। সেইখানে আমায় যেতে হবে। এখন গাড়ি ছাড়লে কাল ভোরে গিয়ে পৌছব। মনের রাশটার উপর একটা কড়া হ্যাঁচ্‌কা দিয়ে আমি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বাইরে এলুম। সেখানে খানদুই পেট-ফুলো গোরুর গাড়ি আকাশের দিকে পা-তুলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। গাড়োয়ানকে তখনই পাওয়া গেল বটে, কিন্তু গোরু খুঁজে বার করতে অনেক দেরী হ'ল। এর মধ্যে খাবারের পুঁটলি খুলে আমি কিছু খেয়ে নিলুম।

ছই-ঢাকা গাড়ির মধ্যে বিছানা পেতে, পাশে কাপড়ের ব্যাগটি রেখে আমি চুপ করে বসলুম। যাত্রা সুরু হল—সামনের ঘনঘোর অন্ধকারের দিকে! দুধারে শাল-বন, মধ্যে সরু পথ, তার উপর দিয়ে গাড়ি চলছিল। ক্রমে-ক্রমে গ্রামের যে দুটি-একটি আলো দেখা যাচ্ছিল তা মুছে গেল। কোথা-থেকে মাদলের আওয়াজ আসছিল তাও মিলিয়ে গেল। যা রইল সে কেবল অন্ধকার। যতই দূরের দিকে দৃষ্টি দিই, ততই দেখি অন্ধকার আরো জমাট! তখন আমার মনটা এম্‌নি করতে লাগল যে যেমন-করে-হোক কোনোরকমে এই অন্ধকারটা তীরবেগে পেরিয়ে এখনই একটা আলোর মধ্যে পৌছই। কিন্তু হায়, আমার বাহন! সে আমার মনের উপর মোচড়ের পর মোচড় দিয়ে-দিয়ে এই বিরাট অন্ধকারটিকে রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করতে-করতে, অগ্রসর হবার কোনো তাগিদ না রেখে, খোস্-মেজাজে, অতি ধীরমন্থরগতিতে চলতে লাগল।

সাম্‌নের দিক-থেকে যে আকাশটুকু দেখা যাচ্ছিল তার মধ্যে দেখলুম একটি শিশু-তারা আমারই মতো একলা ঐ অনন্ত অন্ধকার সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে;—আমারই মতো ভয়ে তার বুকখানি থর-থর্-করে কাঁপছে। সেইটিকে দেখে আমার মন যেন আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু চলবার পথে কোথায় যে

আমার এই নবীন বন্ধুটি হারিয়ে গেল তার সন্ধান পেলুম না। এতক্ষণ মনের মধ্যে যে আলোকটুকু পাচ্ছিলুম সেটুকুও নিভে গেল।

তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আমার মনে পড়তে লাগল আমার মায়ের মুখখানি, আমার ছোট বোন্‌দের জল্‌জলে চোখগুলি! তার পর ঘুরতে-ঘুরতে আমার চিন্তা এসে পৌছল রেলগাড়ির সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির উপর—যাঁকে আমি ঘটক-বলে' স্থির করে নিয়েছিলুম।

হঠাৎ দেখি গোরুর গাড়ি বন পেরিয়ে একটা জলার মধ্যে এসে পড়েছে। সেখানে চারিদিক খোলা পেয়ে বাতাসটা ছোটো ছেলের মতো মহা ফুর্ত্তির সঙ্গে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। হঠাৎ একটা কালো পাখী তার প্রকাণ্ড ডানা-দুখানা দিয়ে বাতাসের গায়ে চাপড় মেরে সাম্‌নে দিয়ে উড়ে গেল;—আমি তার শব্দে চমকে উঠলুম।

আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলুম—"এ জায়গাটার নাম কি রে?"

সে বল্লে—"ধড়ভাঙা!"

ধড়ভাঙা কথাটার মধ্যে কি যেন ছিল, হঠাৎ আমার বুকটা দুর্‌দুর্ করে উঠল।

এতক্ষণ ঘন-বনের মধ্যে দিয়ে আসছিলুম বলে' বোধ হয় চারদিকের আঁট্‌সাটে মনটা একরকম নিশ্চিন্ত ছিল; হঠাৎ এই ধূ-ধূ-করছে খোলা জায়গা দেখে মনে হল যেন কোন্ অকূলে পড়লুম। তখন ঐ ধড়ভাঙা-কথাটার ভিতরকার একটা অজানা ভীতি আমার বুকটাকে ঘন-ঘন দোলাতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন ধড়ভাঙার মতো কি-একটা বিপদ এরই আশেপাশে কোথায় লুকিয়ে আছে। হঠাৎ একবার সন্দেহ হল কে যেন আমার পিছু নিলে। আমার সন্দিগ্ধ চোখ এমনি-করে আশপাশ-গুলো দেখতে লাগল যে কিছুতেই তাকে বাগ্ মানাতে পারলুম না।

হঠাৎ কি মনে হল, আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁরে এখানে ডাকাতের ভয় নেইত?"

সে বল্লে—"ডাকাত কোথায় বাবু! আগে এখানে ডাকাতি হ'ত শুনেছি।"

আমি যেন তার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলুম না তাই সজোরে বলে উঠলুম—"দেখিস্! ঠিক বলছিস্ ত?"

বলেই আমার মনটা ছাঁৎ করে উঠল। বোধ হয় বুড়োর সেই চৌর-সন্দেহের নেশাটা তখন আমায় ধরেছে। আমার ভাবনা হ'তে লাগল গাড়োয়ানটার কাছে এমন-করে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা ঠিক হয়নি! এখানে ডাকাত না থাকতে পারে, কিন্তু এতে ওকে সাহসী করে' তোলা হল। আমি যে একা! ও-লোকটাও একা বটে, কিন্তু আমার চেয়ে ঢের বেশী জোয়ান;—ইচ্ছে করলে এখনই বেরাল-বাচ্ছার মতো আমার টুঁটি টিপে ধরতে পারে! এই নির্জ্জন স্থানে সেটা কিছুই শক্ত নয়। হাজার চীৎকার করলেও এখানে সাড়া দেবার কেউ নেই। এমন ঘটনা ত ঢের শোনা গেছে—বিশেষ যখন এ-বৎসর দুর্ভিক্ষ! চারিদিক দেখে-শুনে আমি নিজেকে এমন অসহায় মনে করতে লাগলুম যে আমার

দেহের সমস্ত শক্তি যেন কর্পূরের মতো উবে যেতে লাগল।

গাড়ি সোজাপথে আপন-মনে চলছিল। গাড়োয়ানটা ছইখানার একটা কিনারায় ঠেসান দিয়ে চুপ-করে বসেছিল। আমি কেবলই মনে করছিলুম—এই জলাটা কতক্ষণে পার হই! কিন্তু তার শেষ যে কোথায় তার কোনো ঠিকানা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ছিলুম।

আমি মনে-মনে নিজেকে-নিজে ধমক দিয়ে-দিয়ে বুকটাকে একটু চিতিয়ে নিলুম। তারপর তখনই স্থির করে ফেল্লুম যে-অন্যায়টা করে ফেলেছি সেটাকে শুধ্‌রে নিতে হ'বে। তখন সেই রেলগাড়ির বুড়োকে মনে-মনে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগলুম। সে সময় তাঁর কথাগুলোকে খুব-একটা ঠাট্টার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি সে-সব সত্যিই কাজে লেগে গেল। ভাগ্যিস্ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল! ভাগ্যিস্ তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন! নইলে আজ তো বেঘোরে প্রাণটি গিয়েছিল!

আমি গাড়োয়ানটাকে বল্লুম—"দেখ্, আমি ডাকাতের কথা জিজ্ঞাসা করছি কেন জানিস?—আমি ডাকাত ধরতে এসেছি!"

গাড়োয়ানটা কোনো কথা কইলে না, কেবল আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইতে লাগল।

আমি গলাটায় বেশ-একটু জোর দিয়ে বল্লুম—"আমাকে একলা মনে করিস্ নি। আমার সঙ্গে বিস্তর লোক আছে। তারা এই আশে-পাশে লুকিয়ে-লুকিয়ে চলেছে; একটা সিটি মারলেই হুড়-মুড় করে এসে পড়বে।"

গাড়োয়ানটা আমার দিকে কেমন-এক-রকম-করে চাইতে লাগল, তার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। মনে হ'ল সে আমার কথা বিশ্বাস করছে না। তাইতে আমার মনে আরো ভয় হতে লাগল। তাকে বিশ্বাস না-করালে ত চলবে না!

আমি বল্লুম—"ঐ যে আমার ব্যাগ্ দেখছিস, ওটার ভিতর বড়-বড় পিস্তল ঠাসা। ওর এক-একটা পিস্তলে ছ-ছটা-করে মানুষ মারা যায়। তা ছাড়া আমার বুক-পকেটে দুটো খুব ভালো পিস্তল আছে।"

পিস্তলের নাম শুনে গাড়োয়ানটা ভয় পেয়েছে মনে হল। তাহ'লে এতক্ষণে ওষুধ ধরেছে! এই ভয়টাকে আরো ঘন ও দৃঢ় করে তোলবার উপায় আমি মনে-মনে খুঁজতে লাগলুম।

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বল্লুম—"হুঁ! আমি খবর পেয়েছি এখানকার ডাকাতরা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান সেজে সওয়ারিদের লুঠ-তরাজ করে! নইলে আমার গোরুর গাড়িতে আসবার দরকার কি ছিল? আমি হাওয়াগাড়িতে আসতে পারতুম না!"

গাড়োয়ানের মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। কিন্তু সে এমন চঞ্চল হয়ে উঠল যে আমার সন্দেহ হল এইবার আমাকে আক্রমণ করে বুঝি! কিন্তু আমি নিজেকে দমতে দিলুম না। তাড়াতাড়ি একটা হাত আমার বুক-পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলুম। অমনি দেখি সে কেঁচোর মতো কুঁকড়ে গেছে।

এখন থেকে আমি ভারি সতর্ক হয়ে রইলুম। গাড়োয়ানটাকে মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের আড় করলুম না। কি জানি

যদি অন্যমনস্ক পেয়ে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে! বলা বাহুল্য, আমি তখনো ভিতরে ভিতরে কাঁপছি। কিন্তু সে-কাঁপুনি যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্যে স্নায়ু-গুলোকে দৃঢ় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম।

খানিক-ক্ষণ চুপ-করে কেটে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল গাড়োয়ানের ভয়টাকে জুড়োতে দেওয়া কিছু নয়। আমি তখন যেন আপনার মনেই বলতে সুরু করলুম—"ডাকাত যদি ধরতে পারি, তাহ'লে মজা টের পাইয়ে দিই, একেবারে পুলিপোলাও চালান!"

পুলিপোলাওর নাম শুনে গাড়োয়ানটা অস্ফুটভাবে আঁৎকে উঠল—দেখলুম। মনে-মনে ভাবলুম—এইবার ঠিক হয়েছে!

গোরুর মুখের দঁড়ি গাড়োয়ান ছেড়ে দিয়েছিল,—গোরুদুটো আপনিই চলছিল। এতক্ষণ সে ছইখানার পিঠে ঠেসান দিয়ে পড়েছিল, এইবার সোজা হয়ে বসল। পিঠটাকে খাড়া করে সে কেবলই রাস্তার দিকে দেখতে লাগল। আমার বুকটা আবার ছাঁৎ করে উঠল—তাই ত এ-রকম করে কেন!

আর-কিছু না পেরে আমি খপ্-করে তার হাতখানা ধরে ফেল্লুম। সে কোনো জোর দেখালেনা। কেন? এর মানে কি! সন্দেহে আমার বুকটা ধক্‌ধক্ করতে লাগল।

কি-করব ঠিক করতে না পেরে আবার খানিকক্ষণ চুপ-করে কেটে গেল। গাড়োয়ানটা যে ভয় পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ ছিলনা; কিন্তু শয়তানকে বিশ্বাস কি!

ছেলেবেলায় শুনেছিলুম, বাঘের চোখের উপর যদি সাহস করে চেয়ে থাকতে পারা যায় তাহ'লে বাঘ কিছু করতে পারেনা; কিন্তু যেই ভয়ে চোখের পাতাটি কোঁচ্‌কাবে অমনি সে থাবা মেরে বসবে। এই গল্পের নীতিটা যে তখন আমার মনের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল সে আমার কার্য্য থেকেই প্রমাণ হচ্ছে।

ভয়টাকে আরো ঘোরালো করবার একটা ফন্দি বুড়োর গল্প থেকে হঠাৎ মাথায় এল। আমি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, গলার স্বরটাকে খুব দৃঢ় করে বলে উঠলুম—"হুঁ, এই ত ঠিক মিলছে দেখছি!"

যেমন আমার কথা শেষ হওয়া অমনি মনে হ'ল আমার হাতের ভিতর থেকে তার হাতখানা যেন একবার একটু হ্যাঁচ্‌কা দিলে। আমি জোরে চেপে ধরলুম।

আমি বলতে লাগলুম—"এখানকার এক ডাকাত-গাড়োয়ানের ছবি আমার কাছে আছে। ডাকাতটা জানেনা যে তার ছবি বেরিয়ে গেছে। সে ভারি মাজা! সে যে-লোকটাকে খুন করে, মরবার সময় সে চোখ মেলে মরেছিল, তাইতে ডাকাতের ছবিটা সেই চোখেতে আট্‌কা পড়ে যায়। সে-ছবির নকল আমার কাছে আছে। তার সঙ্গে তোর মুখের চেহারাটা যেন—" বল্‌তে-বল্‌তে তার মুখখানা খুব তীব্র দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখতে আরম্ভ করেছি এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মতো একটা দম্‌কায় আমার হাত ছিনিয়ে লোকটা তড়াক্-করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট!

তারপর সেই জনমানবশূন্য অন্ধকার নির্জ্জন জলার মধ্যে চালকহীন গাড়িতে একলা আমি—আমার যে দুর্দ্দশাটা হ'ল তা আর বল্‌তে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু যখন আরম্ভ করেছি তখন শেষ করতেই হ'বে।

সেই প্রকাণ্ড লাফানির একটা ঝাঁকানি খেয়ে গোরুদুটো থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি একেবারে অবাক! কি যে হ'ল কিছু বুঝতে পারলুমনা। একবার মনে হ'ল বোধ হয় খুব ভয় পেয়েছে তাই পালালো। তারপর মনে হ'ল নিশ্চয় দলের লোক ডাক্‌তে গেছে। আমি ডাকাত ধরতে এসেছি এ-খবর ডাকাতদের দলের মধ্যে এতক্ষণ রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে—ডাকাত-ধরার মজাটা তারা এইবার আমাকে দেখাতে আস্‌বে।

কি যে করি কিছু ঠিক করতে পারলুম না। একবার চীৎকার করে তাকে ডাকলুম—"ওরে শোন্, শোন্!"

কিন্তু কে তখন শোনে!

ভাবলুম, একদিকে দৌড়ে পালাই। কিন্তু অন্ধকারে কোথায় গিয়ে পড়ব ভয় হ'তে লাগল। তারপর দৌড়-দেবার মতো শক্তি আমার তখন ছিল কি-না সন্দেহ। আমি সেই অন্ধকারে একলাটি গাড়ির মধ্যে কাঠ-হয়ে বসে রইলুম।

এমনি-করে বসে থেকে মনে হ'ল যেন আমার নিশ্বেস বন্ধ হয়ে আসছে। ভাবলুম গাড়িটাকে দিই চালিয়ে। চলার বাতাসে তবু মনের হাঁপানি কমবে।

অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু গোরু-দুটো আমার হাতে এক পা-ও নড়লনা। তখন লাঠি নিয়ে ঘা-কতক কসিয়ে দিলুম, তাতে অল্প-একটু চলেই আবার থেমে পড়ল। আবার লাঠি চালালুম, তাতেও সেই-সমান অবস্থা। আমার উৎসাহ ভেঙে গেল। তখন আমার মনে হতে লাগল এই নির্জ্জনতার কবরের মধ্যে যেন তিল-তিল-করে আমার সমাধি হচ্ছে। আমি হতাশ হয়ে গাড়ির মধ্যে শুয়ে পড়লুম। হায়, আমার অদৃষ্টে কথামালার মেষপালকের মতো বাঘ বাঘ বল্‌তে বল্‌তে শেষে কি সত্যই বাঘ এসে পড়ল! আমি চোখবুজে কেবলই দেখতে লাগলুম—সারিসারি ডাকাতের দল—কেবলই তারা আসছে,—পিঁপড়ের সারের মতো চলে-চলে আসছে।

কতক্ষণ শুয়ে পড়েছিলুম জানিনা, হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা কলরব শুনে চম্‌কে উঠলুম;—হাজার-হাজার লোক যেন হল্লা করতে-করতে এগিয়ে আসছে।

এই নির্জ্জন জায়গায় একসঙ্গে এত লোক কোত্থেকে আসবে? নিশ্চয় ডাকাতের দল! ব্যস্, এইবার আমার সব-শেষ!

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমি উঠে বসলুম। আত্মরক্ষার একটা তাড়না আগুনের ফুল্‌কির মতো একবার জ্বলে উঠে হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেল। কেবলই মনে হতে লাগল—হায় হায়, নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনলুম! একা গাড়োয়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুঝতেও ত পারতুম! তারপর যা হয় হ'ত। কিন্তু আমার মনগড়া ঐ পিস্তলের বস্তাকে ব্যর্থ করবার জন্যে ডাকাতের যে প্রকাণ্ড দলটি আসছে তাদের এখন ঠেকাই কি করে! পিস্তলের ফাঁকা-আওয়াজে

গাড়োয়ানের মনকে জব্দ করেছিলুম বটে কিন্তু এই অগণন জল্‌জ্যান্ত শত্রুদের মোটা মোটা লাঠিসোটাগুলোকে ত কথার ফাঁকা-আওয়াজে ফেরানো যাবে না। তবে উপায়?

এইবার আমার মনের রাশ একেবারে এলিয়ে গেল। ভাবনা-চিন্তার সমস্ত খেই যেন হারিয়ে ফেল্লুম। তখন কি যে হ'ল না হ'ল কিচ্ছু মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে আমি গাড়ি থেকে সুড়্‌সুড়্‌ করে নেমে গাড়ির তলায় গিয়ে সেঁধিয়েছিলুম; চারিদিককার ঐ খোলা জায়গার মধ্যে এই ঘের-দেওয়া স্থানটুকু ভারি নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল; এবং গাড়ির চাকা-দুখানা যেন সুদর্শন চক্রের মতো আমায় ঘিরে ছিল!...

যারা হল্লা করতে-করতে আসছিল, তারা আমার গাড়ির সাম্‌নে এসে থেমে পড়ল। মনে করলুম এখনই একটা মার্-মার্ কাট্-কাট্ শব্দ উঠ্‌বে। কিন্তু তা কৈ হল না। বোধ হয় সব-আগে আমাকে খুঁজছে! আমি গায়ের চাদরখানা টেনে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিলুম!...

দলের কতক লোক এগিয়ে চলে গেল বলে মনে হল; কতক লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভাবলুম এইবার এরা ব্যূহ রচনা করছে। শুনেছে আমার সঙ্গে বিস্তর লোক আছে, তাদের ঘেরাও করবার ফন্দি করছে। তাহ'লে আমার পালাবার পথটি পর্য্যন্ত আর রইলনা! ইস্, আমার প্রত্যেক মিথ্যাটি আমার কাছ থেকে সুদসুদ্ধ দাম আদায় না-করে ছাড়বে না দেখছি!...

লোকগুলোর ভাবগতিক আমি ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। সেইজন্যে একটা সংশয়ের মধ্যে পড়ে আমার মনের ভয়টা এত দোল খাচ্ছিল যে থেকে-থেকে যেন জ্ঞানের সীমাকেও ছাড়িয়ে যেতে লাগল।...

তারা মহা ব্যস্ত হয়ে কেবলই এদিক-ওদিক ঘোরা-ঘুরি করছিল, আর নিজেদের মধ্যে কি বলা-বলি করছিল—যেন কিসের খোঁজ করছে। সে আর কে? সে আমি!...

হঠাৎ কে-একজন গাড়ির তলায় উঁকি মেরে দেখেই চীৎকার করে উঠল। আমার মাথা-ঘুরে, গা ঝিম্-ঝিম্ করে, আমি একেবারে অবশ হয়ে পড়লুম।...

যখন একটু জ্ঞান হ'ল তখন মনে হ'ল কে যেন জিজ্ঞাসা করছে—"বাবু, চোট্ কি বেশি লেগেছে?"...

আমি বুঝলুম আমি প্রাণে মরিনি—বন্দী হয়েছি মাত্র!...

তারা ধরাধরি-করে আমাকে গাড়ির উপর তুল্লে। আমি চোখবুজে পড়ে রইলুম। হঠাৎ মনে হ'ল যেন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। ঐ আলোর সঙ্গে-সঙ্গে মনে একটু আশার উদয় হ'ল। আমি চোখ-চেয়ে উঠে বসলুম।

একটা ঝাঁক্‌ড়াচুলো লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় যাবেন বাবু?"

আমি প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য্য হলুম;—অর্থটা কি বুঝতে পারলুম না। আমাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাবে সে তো ওরাই জানে, আমি তার কি জানি!

আমি চুপ-করে আছি দেখে, সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় যাবেন কর্ত্তা?"

আমি ভাঙা-ভাঙা গলায় বল্লুম—"ভিটেমাটি।"

একজন বলে উঠল—"ওরে ওটা আমাদের নয়া নেস্‌পেক্‌টাবাবু!"

আর-একজন বল্লে—"চল্ বাবু, চল্। মোরাও যাব।"

আর-একজন বল্লে—"বাবু-গো, আমরা যে হোথাকার কুলি—কাজে বেরিয়েছি!"

আর-একজন বল্লে—"ওরে চল্ চল্—আর দেরি করিস্‌নে!"

এমনি হট্টগোলের মধ্যে একটা লোক তড়াক-করে আমার গাড়িতে লাফিয়ে উঠে গোরুর ল্যাজ-মল্‌তে সুরু করে দিলে।

আবার যাত্রা আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো গণ্ডগোল করতে-করতে চল্‌ল। রথারূঢ় বিজয়ী বীরের মতো সৈন্যপরিবৃত হয়ে আমি কর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম।

খানিক বাদে যে-লোকটা গাড়ি হাঁকাচ্ছিল সে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবু, আপনার গাড়োয়ান গেল কোথায়?"

আমি ধীরে-ধীরে বল্লুম—"সে আমায় একলা ফেলে পালিয়েছে।"

সে অবাক হয়ে বল্লে—"পালালো কেন বাবু?"

নিজের আহাম্মকিটা ঢাকবার জন্যে হয় ত একটা মিথ্যা বলবার দরকার ছিল, কিন্তু মিথ্যা রচনা করার জন্যে যে সাজা পেয়েছি তার পর আর মিথ্যে নিয়ে খেলা করবার প্রবৃত্তি হল না। আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম—"আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলুম!"

নতুন গাড়োয়ানটা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লে—"এখানকার লোকগুলো অম্‌নি-ধারা বোকা ম্যাড়া! ঠাট্টা বোঝেনা বাবু।"

আমি মনে-মনেই বল্লুম কে যে কার উপর ঠাট্টা করলে বোঝা গেল না।...

তার পর দুপুরবেলা আমার কাজ-কর্ম্ম যখন বুঝে নিচ্ছি তখন দেখি সেই ঝাঁকড়া-চুলো লোকটা আমার সেই গাড়োয়ানটাকে ধরে এনেছে। তাকে ধমক দিয়ে সে বলছে—"যা—বাবুর পায়ে ধর!"

ব্যাপারটা বোধ হয় আগাগোড়া ফাঁস্ হয়ে গিয়েছিল। কারণ কুলিগুলোর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পরস্পরে যেন হাসাহাসি করছে।

গাড়োয়ানটা আমার দিকে কাঁচুমাচু হয়ে চাইতে লাগল। আর, মিথ্যা যখন বল্‌বনা প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বল্‌তেই হবে আমিও যে তার দিকে খুব সহজ-চোখে চাইতে পারছিলুম তা নয়।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

সাহিত্যের দায়িত্ব

পৌষের 'উপাসনা'য় সম্পাদক 'সাহিত্যের দায়িত্ব' সম্বন্ধে ছোট একটু টিপ্পনি লিখিয়াছেন। বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে যেমন, সাহিত্যেও তেম্‌নি কতক-গুলি সাধারণ স্বীকার্য্য আছে; সেগুলি মানিতে কারও বড় একটা আপত্তি দেখা যায় না। যেমন ধরুন, রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য; অলঙ্কার শাস্ত্রের এই সাধারণ স্বীকার্য্যটি সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু রস বলিতে কে কি বোঝেন, তাহা তলব করিলেই ঐ সাধারণ স্বীকারের মধ্যে হরেক রকমের অর্থবিকার ঘটিতে দেখা যায়। অতএব মাম্‌লা—সাধারণ স্বীকার্য্য লইয়া নয়; সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ স্বীকার্য্যগুলাকে প্রয়োগ করিতে গেলে তাদের যে বিচিত্র অর্থান্তর ঘটে, সেই অর্থান্তর লইয়াই আসল মাম্‌লা।

সম্পাদক লিখিতেছেন, "জীবনই সাহিত্যের জন্মদান করে।...যে সাহিত্য জীবনের বিরোধী...সে ঝুটা সাহিত্য।" এ একটা সাধারণ স্বীকার্য্য। কিন্তু 'জীবন' বলিতে সম্পাদক যাহা বোঝেন, সাহিত্য-রসজ্ঞ মাত্রেই কি তাহাই বোঝেন? ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁর কাব্যারম্ভে বলিয়া-ছিলেন যে, তিনি জীবনের গান গাহিবেন —"of life immense in passion, pulse and power।" অথচ রাধাকমলবাবুর টিপ্পনি পড়িয়া বোধ হয় যে সাহিত্যে জীবনের সেই প্রবল 'passion'-অংশের যেন কোনই স্থান নাই। তার প্রমাণ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিটি:—"এমন রীতি ও নীতি বঙ্গসাহিত্যে এখন অনেক সময় প্রশ্রয় পাইতেছে, যাহা জীবনের বিরোধী—যেটা আশ্রয় করিলে যে জীবনের পথে মানুষ সেই আদিম কাল হইতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, সে পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আদিম বর্ব্বরতা হইতে আধুনিক সভ্যতায় পদার্পণ করিয়া মানুষ এটা অন্ততঃ ঠিক বুঝিয়াছে যে, পবিত্রতার আদর্শ খাট করিতে গেলেই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। মানুষ সেই আদর্শ বরং বড় করিয়া রাখিয়াই জীবনে উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং বড় আর্টিষ্ট কখনই পবিত্রতা ও অপবিত্রতাকে সমান চক্ষে দেখেন না।"

রাধাকমল বাবু সাহিত্যে 'পবিত্রতার আদর্শ' রক্ষা করা বলিতেই বা কি বোঝেন, তাহা তাঁর টিপ্পনি হইতে পরিষ্কার বোধগম্য হয় না। এইটুকু মাত্র বোঝা যায় যে, সাহিত্যে sex-passion অথবা মিথুন-রাগের চিত্র তাঁর পবিত্রতার আদর্শকে বোধহয় পীড়িত করে। অথচ ঐ মিথুন-রাগের রঞ্জনেই নিখিল সাহিত্য অনুরঞ্জিত। ঐ রঞ্জন দিয়া জীবনকে আঁকিবার বেলায়, কোন কবি, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক কোন সংকীর্ণ সমাজনৈতিক আদর্শকে চোখের সাম্‌নে খাড়া করিয়া রাখেন নাই।

তা যদি রাখিতেন, তবে সে সাহিত্যে জীবনই প্রস্ফুরিত হইত না। কেননা, নৈতিক আদর্শ জিনিষটা সমাজে চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল; তাহা কোথাও ধ্রুব হইয়া নাই। গ্রীকের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে মধ্যযুগের পোপেদের নৈতিক আদর্শের মিল ছিল না; আবার পোপেদের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে রেনেসাঁসের নৈতিক আদর্শের মিল ছিল না; আবার তখনকার নৈতিক আদর্শের সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপের নৈতিক আদর্শের ত মিল নাই। ঠিক্ তেমনি, ভারতবর্ষেও বৌদ্ধযুগের নৈতিক আদর্শ আর পৌরাণিকযুগের নৈতিক আদর্শের মধ্যে কি মিল আছে? বৌদ্ধরা শরীরের দাবী ইন্দ্রিয়ের দাবীকে যেমন অগ্রাহ্য করিয়াছে, পৌরাণিক যুগে ইন্দ্রিয়ের দাবী তেমনি স্বীকৃত হইয়াছে; এমন কি দেবতাদের লীলায় পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। তার সাক্ষী, ভুবনেশ্বর ও কণারকের মন্দিরের চিত্রাবলী। আবার সে যুগের আদর্শের সঙ্গে এ যুগের আদর্শের মিল নাই। সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সমাজনৈতিক আদর্শের এই বদল কালে কালেই ঘটিবে, সেই জন্যই সমাজ নৈতিক আদর্শকে 'সংকীর্ণ' এই বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি।

সাহিত্য-শিল্প পাদ্রী-পুরুতের শাসন চিরকালই অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে ও ভাবের স্বাধীন লোকে বিহার করিয়াছে; তাই তার কাছে সব চেয়ে বড় আদর্শ জীবনেরই আদর্শ। কিন্তু সে জীবন রাধাকমলবাবুর সংজ্ঞিত কৃত্রিম সংস্কার-গণ্ডিবদ্ধ জীবন নয়। তাহা "Life immense in passion, pulse and power"—তাহা আবেগময়, শক্তিময় ও স্পন্দমান নাড়ীবিশিষ্ট চঞ্চল জীবন। অর্থাৎ সকল সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া ফেলিলে যে অখণ্ড, বিচিত্র ও বেগবান্ জীবন আমাদের চোখের সাম্নে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, সেই জীবন। সাহিত্যেই তাই মানুষ conventionকে সব চেয়ে বেশি করিয়া অস্বীকার করিয়াছে; এই একটি মাত্র ক্ষেত্র, যেখানে convention বা সংস্কারের বাঁধন হইতে মানুষ মুক্তি কামনা করিয়াছে। এর উদাহরণের জন্য অন্য দেশের সাহিত্যে যাইবার দরকার নাই, ভারতবর্ষের সাহিত্যেই এর উদাহরণ মিলিবে।

রাম লক্ষ্মণ সীতার কথা ছাড়িয়া দি; মহাভারত ত হিন্দুর পঞ্চম বেদ—মহাভারতের মধ্যে যে নৈতিক আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সংস্কারগত নৈতিক আদর্শের সঙ্গে মেলে? দৃষ্টান্ত দিয়া দরকার নাই; কেননা—a word to the wise is sufficient—বিজ্ঞের পক্ষে ইঙ্গিতই যথেষ্ট নয় কি? তারপর সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য—কালিদাস প্রভৃতি কবিদের রচনা ধরা যাক্। মেঘদূত, শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, শৃঙ্গার রসাষ্টকম্, শৃঙ্গারতিলকম্, চৌরপঞ্চাশিকা, অমরুশতক, গীতগোবিন্দ পর্য্যন্ত—এতগুলি বাছা বাছা নাট্য ও কাব্যে রাধাকমল বাবু-কথিত পবিত্রতার বা হিন্দুসমাজ-নীতির আদর্শ রক্ষা পাইয়াছে কি? রসের মধ্যে যাহা আদি, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাই যে

অনাদি বা চিরন্তন রস। মানব সাহিত্যেও তাহাই বটে।

তার পর বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে পুনরায় কিছু লেখা দরকার হইবে। মোটের উপর এখানে একটি কথা বলিতে চাই এই যে, ঐ পদাবলী গোড়া হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মকে আশ্রয় করে নাই—সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের দ্বারা ঐ পদগুলির কি অর্থান্তর ঘটে, তাহা সাহিত্যিকের দেখিবার কথা নয়। ইউরোপীয় Troubadourগণ এক সময়ে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসেরই মত রাগাত্মিকা পদাবলী অর্থাৎ মিথুন-রাগাত্মিকা পদাবলী রচিয়া দেশ বিদেশে গাহিয়া বেড়াইতেন। তখন তাঁদের পদাবলীর মধ্যে আধ্যাত্মিক অর্থ কেহই বাহির করে নাই। ক্রমে দেখা গেল যে, রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের স্পর্শে সেই পদগুলির অর্থের বদল ঘটিতে লাগিল এবং তারা দেখিতে দেখিতে মিথুন-রাগাত্মক না হইয়া 'আধ্যাত্মিক' হইয়া উঠিল। Cambridge University Press হইতে প্রকাশিত The Troubadour নামক গ্রন্থটি পাঠ করিলেই ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঠিক সেই Troubadourদের মত বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদগুলিও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু গোড়ায় তাদের অর্থ সোজাই ছিল—তারা অত্যন্ত সহজ মিথুন-রাগের কাব্য ছিল। তারা যে "ভারতীয় জ্ঞানসাধনার শ্রেষ্ঠ সঙ্গতি" ছিল না, একথা জোর করিয়াই বলা যায়।

তারপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর? তারপর মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য? তারপর—আর বোধকরি তারপরের প্রয়োজন হইবে না। কেননা, তারপর যাঁদের নাম আসিবে, তাঁরা "আদিম বর্ব্বরতা হইতে আধুনিক সভ্যতায় পদার্পণ" করিয়াছেন বলিয়া, অর্থাৎ তাঁদের মিথুন-রাগের সাহিত্য আদিম সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশি মার্জ্জিত ও শ্রীসম্পন্ন বলিয়া লেখক তাঁদের উপর বেশি খাপ্পা। কালিদাসের মেঘদূতের ও কুমারসম্ভবের স্থানে স্থানে একালের রুচিহিসাবে যে অশ্লীলতার নমুনা পাওয়া যায়, তাহা বরং তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন, কেননা তাহা "ভারতীয় জ্ঞান-সাধনার শ্রেষ্ঠ সঙ্গতি", এই তাঁর ধারণা। কিন্তু হালের অত্যন্ত মার্জ্জিত রুচির সাহিত্যে সে রকমের অশ্লীলতা না থাকিলেও তাঁর মতে এসব সাহিত্যের 'নীতি ও রীতি' 'পবিত্রতার আদর্শ' হইতে বিচ্ছিন্ন—অতএব—'জীবনের বিরোধী'। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, আমি কোন নৈতিকতার সংকীর্ণ আদর্শের মাপকাঠির দ্বারা সে সকল প্রাচীন সাহিত্যের বিচার করিতে চাই না। কেন না, এ কালের রুচির দ্বারা সে কালের রুচির বিচার চলেনা।

সম্পাদকের টিপ্পনির শেষ অংশটুকু চমৎকার। তাহা উদ্ধার করিতেছি:—

"কালিদাসের কুমারসম্ভব, মুকুন্দরামের

চণ্ডী, চৈতন্য ভাগবত অথবা বৈষ্ণব পদাবলী লোকে দৈনিক জীবনে সাধনার অঙ্গরূপে নিত্য পাঠ করিয়া থাকে। কলেজের শেক্‌স্‌পীয়ার অথবা গেয়েটে বা রবিবাবুর কাব্যসাহিত্যের পাঠের মত নহে।"

কুমারসম্ভব আমার কাছে সম্প্রতি নাই। 'কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে অকাল বসন্তের বর্ণনা—'দৈনিক জীবনের সাধনার অঙ্গরূপে' নিত্য পাঠের ব্যবস্থা যদি হইল, তবে মেঘদূত বাদ গেল কেন? পূর্ব্ব মেঘের ৪২টা শ্লোকও নিত্য পাঠের মধ্যে পড়িবে ত?—সেটা এখানে উদ্ধার নাই করিলাম। আর কুমারসম্ভব ও মেঘদূত যদি 'স্ত্রী'পুরুষ সকলেরই জীবনের 'সাধনার' সহায় হয়, তবে শৃঙ্গার-তিলকম্ চৌরপঞ্চাশিকা প্রভৃতি কি দোষ করিল? অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে গীতগোবিন্দও পড়ে। যে অর্থেই গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণব পদাবলী পড়া যাক্ না কেন, ইন্দ্রিয়-লালসার চিত্র তাহাতে এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, সে সকলপদ নিত্য পাঠের দ্বারা ঐ সমাজ-নৈতিক "পবিত্রতার আদর্শের" কোন ব্যত্যয় ঘটিতেই পারে না। আমরা বলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের' 'দানখণ্ড'ও দৈনিক জীবনে সাধনার অঙ্গরূপে নিত্য পাঠ করা কর্ত্তব্য।

এ পর্য্যন্ত জানিতাম যে কালিদাস প্রভৃতির কাব্য লোকে কাব্যামোদের জন্যই পড়ে; অতঃপর শুনা গেল যে, ঐ সকল কাব্য লোকে দৈনিক জীবনের সাধনার অঙ্গ রূপেও নিত্য পাঠ করিয়া থাকে এবং ঐ সকল কাব্য পাঠে অত্যন্ত কৃত্রিম সংস্কার-গণ্ডিবদ্ধ পবিত্রতার আদর্শও নাকি রক্ষা পায়!

কোন ভাল কাব্য পাঠে পবিত্রতার আদর্শ যে নষ্ট হয়, এটা অবশ্য আমাদের বিশ্বাস নয়। নদীর জলে যতই আবিলতা থাক্ না কেন, তাহা পবিত্র; কারণ তাহাতে স্রোত আছে। জীবনের গতিবেগই জীবনের মলিনতাকে ভাসাইয়া লইয়া চলে, তাহা কোথাও জমিতে পায় না। এই তত্ত্বটিই বুঝাইবার জন্য মহাকবি গ্যয়টে "ফাউষ্ট" লিখিয়াছিলেন। কাব্য-উপন্যাসে জীবনের গতিবেগ আছে বলিয়াই, তাহা সকল আবিলতা সত্ত্বেও পূতসলিলা ধারার মত।

বাঙ্গলার গীতি-কবিতা

'বাঙ্গলার গীতি-কবিতা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 'নারায়ণে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। লেখক নাম দেন্ নাই। বোধ হয় ইহা সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের রচনা।

লেখকের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ-পালার মধ্যে একটি-মাত্র ধুয়া এই যে, 'বাংলার প্রাণ'কে ধরিতে হইবে; কারণ একালের 'ফেরঙ্গ সাহিত্যে'র আবির্ভাবে সেকালের চারপাঁচশো বৎসর আগেকার বাংলার প্রাণটা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া বড়ই আপ্‌শোষের কারণ হইয়াছে। অতএব, সেই শিলা-রূপী প্রাণটাকে 'ফেটিশ্' করিয়া তার কাছে শাঁকঘণ্টা বাজাইয়া যদি এ কালের প্রাণবান্ সাহিত্য-টাকে বলি দেওয়া যায়, তবেই বাংলার প্রাণ-রক্ষা ধর্ম্মরক্ষহয়া।

আমরা ত জানি যে, সকল বস্তুর সত্যা-সত্য নির্ণয়ের জন্য আধুনিক Comparative method বা তুলনামূলক প্রণালীর প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু লেখক তাকে আমল দিতে চান্ না বলিয়া বোধ হয়। কেননা, তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া-ছেন যে বিলাতী Lyric কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর পার্থক্য এমনি গুরুতর যে, বিলাতী সংস্কার একেবারে মুছিয়া না ফেলিলে বাংলার প্রাণরূপ বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। অর্থাৎ বাংলার সেকালের প্রাণটাও এমনি অদ্ভুত 'বিশ্ব'ছাড়া খাপ্‌ছাড়া প্রাণ যে, আর কোন দেশের বা সভ্যতার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে তার সারূপ্য মেলে না।

তিনি লিখিতেছেন:—

"বিলাতী গীতি-কবিতায় কবি বিশ্বের সকল পদার্থকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লন্। তাহাই প্রাণের ভাব-রসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ করেন। সে প্রকাশে তাঁহাদের নিজত্বের ছাপ দিয়া দেন্। তাহাতে হয় এই যে, প্রত্যেক রূপই কবির নিজের ভাবের ছাঁচে গড়া হয়।... ... কিন্তু এই যে গীতি-কবিতা, ইহা আমাদের দেশীয় নয়। ...

"আমাদের দেশে চণ্ডিদাস হইতে রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালারা কেহই এই গীতি-কবিতা লেখেন নাই। তাঁহারা রচিয়া গেছেন গান, সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা। দুজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হইয়া আনন্দরস ভোগ করিতেছেন।... ... ইহাই হইল বাঙ্গলা গীতি-কবিতার বা গানের প্রাণ।"

অর্থাৎ লেখকের মতে রাধাকৃষ্ণের নামে বেনামী করিয়া নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখিলে তাহা খাঁটি বাংলা গীতি-কবিতা হইবে; বেনামী না করিয়া লিখিলেই তাহা বিলাতী লিরিক্ হইবে। দেশী ও বিলাতী গীতি কবিতায় মোটের উপর এই তফাৎ।

'দুজনের প্রাণের খেলায়' কবি যদি শুধু হন্ 'দর্শক', তবে সে প্রাণের খেলা বা লীলাকে অপ্রাকৃত লীলাই বলিতে হয়। এই অপ্রাকৃত প্রেমলীলার কাব্যও যে ইউরোপীয় সাহিত্যে নাই তাহা নহে; দান্তের প্রসিদ্ধ কাব্য Vita Nuova বা Paradisoই এই অপ্রাকৃত প্রেমের কাব্য। তাছাড়া খৃষ্টান মধ্যযুগীয় মিষ্টিক বা মরমী কবিতায় এবং মধ্যযুগীয় ট্রুবাদোর-গায়কদের প্রেমের গানের আধ্যাত্মিক রূপান্তরে, ঐ অপ্রাকৃত প্রেমলীলার বৈষ্ণব গানের ঝুড়ি ঝুড়ি সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু বৈষ্ণব সাধনাকে অপ্রাকৃত সাধনা শুধু আমিই বলিনা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার 'নারায়ণে' বিপিন বাবু তাঁর 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' নামক প্রবন্ধে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন দেখিতেছি। তিনি লিখিয়া-ছেন:—

"এই সংসারের প্রত্যক্ষ সেবার, প্রেমের, রসের সম্বন্ধের মধ্যেই যে দেশকালের রঙ্গমঞ্চে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে, এ সংসারের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সম্বন্ধসকল যে সেই নিত্যরসলীলার নিত্য রস-সম্বন্ধের আদর্শেই প্রকাশিত হইতেছে, ভগবানের এই জাগতিক লীলায় আমরা প্রত্যেকে যে তাঁর লীলা-পরিকর—এ সকল কথা (বৈষ্ণবেরা) ধরিতে ও বুঝিতে পারিল না। ইহারাও ভগবানের প্রত্যক্ষ জাগতিক লীলাকে মায়িক ও অলীক বলিয়া বর্জ্জন করিয়া, সংসারের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া, "অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে" তাঁর "অপ্রাকৃত লীলা" ধ্যান ও কীর্ত্তন

করিতে লাগিল। এইরূপে এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত তত্ত্বাঙ্গে সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিয়াও, সাধনাঙ্গে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। বৈদান্তিকের কৈবল্যধামের স্থানে বৈষ্ণবের ব্রজধামের প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু মায়াবাদী বৈদান্তিক যে ভাবে এই সংসারকে মায়িক ও অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছিলেন, ভক্তবাদী বৈষ্ণবও তাহা করিতে লাগিল।"

আমি অবশ্য মনে করি যে, বাংলার প্রথম পদকর্ত্তারা অর্থাৎ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাই বেনামী করিয়া লিখিয়াছেন, কেননা তখনো গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—অপ্রাকৃত লীলার তত্ত্ব, দর্শক ভাবে দেখিবার কথা প্রভৃতি তখনো ফোটে নাই। বেনামী করিবার কারণ আর কিছুই নয়—রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীটাকে তাঁরা আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় Troubadour গায়কগণ যেমন প্রথমে ইন্দ্রিয়-লালসার গান রচনা করিতেন (কেহ কেহ প্রেমের উপরের সপ্তকের সুরও ধরিতে পারিয়াছিলেন)—তেম্‌নি ভাবেই বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের গানও এক সময়ে আমাদের দেশে জাগিয়াছিল। তার পর Troubadourদের গান রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের অতীন্দ্রিয় সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যেমন আধ্যাত্মিক রূপকে রূপান্তরিত হইল, পদাবলীও তেম্‌নি গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক রূপকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে পরে অন্য প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিব।

বাংলার প্রাচীন গীতি-কবিতার মত কবিতা ভূভারতে নাই, এর মত হাস্যকর কথা আর কিছুই হইতে পারে না। কবীর, নানকের গানও গান, তাহাতেও 'দুজনের প্রাণের খেলা'র কথা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে এবং বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে রস ও তত্ত্ব দুইদিক্ হইতেই বিচার করিলে তাহা উৎকৃষ্টতর, একথা কাব্য-রসজ্ঞ মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুফী কবিদের গানও গান, তাহাতেও 'দুজনের প্রাণের খেলার কথা আছে, এবং সে কাব্যও বৈষ্ণব পদাবলীর কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-ভোগের বর্ণনাপূর্ণ গানের চেয়ে কাব্যহিসাবে শ্রেষ্ঠতর।

সকল রসের 'সমরস', দেহে প্রাণে মনে 'একাত্ম অনুভূতি,' বা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতলীলা প্রভৃতি বৈষ্ণব তত্ত্ব যে খুব গভীর, তাহা এ দেশের তত্ত্বশাস্ত্র যাঁরা কিছুমাত্র নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাঁরা জানেন। কিন্তু এসব তত্ত্বের বাষ্পও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীর ভিতরে ত কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতাকে এই সব তত্ত্বের দিক্ হইতে ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাখ্যা অনেক সময়ই গায়ের জোরের ব্যাখ্যা হয়। তখন পদাবলীর স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যায়—তার যে প্রাণ পুরুষটাকে উদ্ধার করিবার জন্য লেখক ব্যস্ত, তারই প্রাণ-দণ্ডের বন্দোবস্ত করা হয়। কবীরের কবিতা পড়িলে বেশ বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষীয় তত্ত্বশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু

পরিচয় ছিল—কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যে অথবা জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কোন তত্ত্বের নাম গন্ধও কোথাও নাই। ইন্দ্রিয়লালসাকে এবং সময় সময় অতীন্দ্রিয় প্রেমকেও তাঁরা খুব উজ্জ্বল বর্ণে, মধুর ভাষায় ও ললিত ছন্দে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মবিশেষ তাকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে বলিয়াই যে সেই ধর্ম্মের চশমাতেই ঐ সকল কাব্যকে দেখিতে হইবে, এমন কথা আমি মনে করি না। Troubadour-সাহিত্য রোমান্‌ক্যাথলিক কি চক্ষে দেখিয়াছিল তাহা জানিবার দরকার নাই; সাহিত্যের তরফ হইতেই তাকে পড়িতে ও বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণব কাব্যকেও কাব্য হিসাবেই দেখিব, কোন ধর্ম্মের Hymnology হিসাবে নয়।

অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীকে সাহিত্যের দিক্ হইতে পড়িলে তার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় বলিয়াই যে তাহা কাব্য নয়, এমন কথা আমরা বলি না। কেননা, কাব্যের প্রধান বিষয়ই passion বা রাগ এবং বিশেষভাবে Sex-passion বা মিথুনরাগ। সুতরাং "ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত্ গাঁথা যায় কি?"—এ প্রশ্নের কোনই সার্থকতা দেখি না। কারণ, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হইলেই ইন্দ্রিয়কে পূর্ণভাবে স্বীকার করা চলে। সেইজন্য পৃথিবীতে যে সকল ভাগ্যবান কবি সেইভাবে ইন্দ্রিয়ের সুখকে গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁরা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের ভিতরে অরূপ অগন্ধ অস্পর্শ চিন্ময় সত্তার উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁদের কাব্যকে আমরা উচ্চ আসন দিয়া থাকি। তাঁদের মিথুন-রাগ পাশব মিথুন-রাগ নয়; তাহা ভাগবত মিথুন-রাগ, তাহা এক আশ্চর্য্য জিনিস। শেলি, ব্রাউনিং, হুইটম্যান্, ভিক্তর হুগোর কাব্যে এই ভাগবত মিথুন-রাগ ফুটিয়াছে বলিয়াই তাঁদের কাব্যের এত আদর। অন্য পক্ষে, গোতিয়ে, কীট্‌স্, হাইনে, বার্ণস্, মূর, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সুখকেই চরম করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া কবি-হিসাবে তাঁদের আসন নীচে। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দুই চারিটি পদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার সঙ্গে তুলনীয় হইবার যোগ্য; অবশিষ্ট পদ বার্ণস্, হাইনে প্রভৃতিদের কবিতার মত। একথা বলিলে ইন্দ্রিয়কে 'অস্বীকার' করা হয় না—সুতরাং "খৃশ্চানী নীতিকথা"র সঙ্গে এ কথার সাদৃশ্য যে কোথায় তাহা লেখক মহাশয়ই বলিতে পারেন।

সাহিত্যালোচনায় লেখক যেমন তুলনা মূলক প্রণালী (Comparative method) মানেন না, তুলনামূলক সমালোচনার (Comparative criticism) প্রয়োজন স্বীকার করেন না, তেম্‌নি ঐতিহাসিক ক্রমাভিব্যক্তির প্রয়োজনও খুব বেশি স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে আর মহাপ্রভুর আমলের বৈষ্ণব কবিতার যে কোন ভাবগত পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথার আঁচ তাঁর লেখায় কোথাও পাওয়া যায় না। বরং উল্টা দেখি তিনি

এক জায়গায় লিখিতেছেন, "কত বিপদ, কত সংঘাত ও বিপ্লবের মধ্যেও চণ্ডীদাস ও শ্রীচৈতন্য কেমন করিয়া বাঙ্গলার পরিপূর্ণ রসমূর্ত্তিটিকে নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন"—ইত্যাদি—যেন তাঁদের দুজনের সাধনা একই রকমের ছিল কিম্বা তাঁরা যেন সমসাময়িক ব্যক্তি।

অতএব, সাহিত্য-সমালোচনার কোন canon বা রীতিরই যিনি ধার ধারেন না, শুধু সকল বিষয়েই 'Sir oracle' হইয়া দম্ভসহকারে বলিতে থাকেন,—"হে বাঙ্গালী, জানিও, তাহা ছাড়া (অর্থাৎ আমি যাহা বলিতেছি তাহা ছাড়া) আর কোন পথ নাই,—নাই।···গ্রহণ কর! গ্রহণ কর!" ..."জানিও ইহাই বাঙ্গলার অভয় বাণী" ইত্যাদি, তাঁর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক, কেননা তর্কের পদ্ধতিকে ত তিনি খাতির করেন না। শুধু একটি কথা নিবেদন করিতে চাই যে, প্রকৃত Seer বা prophet-এর মুখে যে কথাটা শোভা পায়, নকল-প্রফেটের মুখে সেই কথাটাই অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া উঠে।

বাংলা সাহিত্যের এই নূতন হঠাৎ-নবী বাংলার গীতি-কবিতার আলোচনার উপসংহারে রাজা রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :—

"কিন্তু এই যে ফেরঙ্গ কবিতা বাঙ্গলার এবং মানুষের (?) খাঁটী মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গুরু রামমোহন রায়। "জবরদস্ত মৌলবী" রামমোহন বাল্য হইতে আরবী পারসী পড়িয়া যে ছাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ছাপে বাঙ্গলার ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-সংস্কারক রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মসমাজ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা একসঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে, সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিকতার উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন।··· ···

"তাই আমার মনে হয় যে, রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেন না বাঙ্গলার নিজস্ব যে বৈষ্ণব ভাব যাহা বাঙ্গলার প্রাণকে ধর্ম্মকে জাতিকে সমাজকে সকল রকমে বাঙ্গলার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া গুলাইয়া দিলেন। অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী রামমোহন তাহার বুদ্ধির অসামান্য প্রতিভার ঘোরতর মল্লযুদ্ধ দেখাইয়া গেছেন একথা অস্বীকার করিতে পারিব না। তবে এই কথা বলিতে আমি বাধ্য হইব যে, খ্রীষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুর হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না, বাঙ্গলার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না, বাঙ্গলার ভাবকে কখন ফেরঙ্গ করিতে পারিত না,—যদি তিনি, আমাদের দেশের সাধনাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজি সভ্যতা সাধনা এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন।"

রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে এই স্পর্দ্ধিত উক্তিকে ছেলেমানুষি বা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। যুক্তিরও ইহাতে একান্ত অভাব। রামমোহন রায় ইংরাজি শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তন করিয়া 'ফেরঙ্গ' যুগ আনিয়াছেন ও 'ফেরঙ্গ' সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তার ফলেই না আজ বাংলা সাহিত্য ইউরোপের কাছে জয়মাল্য পাইয়াছে এবং বিশ্বসাহিত্যে তার

গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে? এবং তার ফলেই না বিজ্ঞানে, দর্শনে শিল্পে, সমাজে—সর্ব্বত্র—ভারতীয় প্রতিভা বহু শতাব্দী পরে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে?—ইহা এমনি প্রত্যক্ষ সত্য যে ইহাকে যিনি গায়ের জোরে অস্বীকার করেন, তিনি যে ডালে বসিয়াছেন সেই ডালই কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করেন তাহাতো দেখাই যাইতেছে। রামমোহন রায় যদি "ইংরাজী সভ্যতা সাধনা দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন," তবে লেখকের পক্ষে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে এই সব নূতন ব্যাখ্যা ও আলোচনা করাও আজ সম্ভবপর হইত না। তাঁর সাধের চণ্ডীদাসের যুগে বা রামপ্রসাদ সেনের যুগে গানের উৎস যেমনি উচ্ছ্বসিত হোক্ না কেন, চিন্তার উৎস যে এযুগের মত নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের শত ছিদ্রমুখে উৎসারিত হয় নাই, এটা তো সুনিশ্চিত? এ সব হাস্যকর কথার উত্তর দিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

"আরব, পারস্য ও তুরস্কের মুসলমানী, দাক্ষিণাত্যি সভ্যতা ও বেদান্তমিশ্রিত খিচুড়ীর উপর ফেরঙ্গ ভাষা ও ফেরঙ্গ যুগ আনয়নকারী রামমোহনকে" বুঝিবার স্পর্দ্ধা লেখকের থাকিতে পারে, কেননা তাঁর লেখা পড়িয়াই বোঝা যায় যে তিনি ঐ সব সভ্যতার কোন খোঁজই রাখেন না এবং বেদান্ত সম্বন্ধেও কিছুই জানেন না—অন্ততঃ অমন প্রকাণ্ড হিমালয়-সমান প্রতিভার পরিমাপ করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। রামমোহন রায়কে সকল দিক্ হইতে বুঝিতে পারেন এমন একজন সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিতের লেখা হইতে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া আমি লেখকের উক্তি যে কতটা অজ্ঞতাপ্রসূত ও হাস্যকর তাহা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করি। সে পণ্ডিত আর কেহই নহেন—তিনি আচার্য্য ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনাচার্য্য। সকলেই জানেন যে, তিনি বৈষ্ণব তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে যেমন বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিয়াছেন কিনা বলা কঠিন। রোমনগরে আহূত Congress of the Orientalists মহাসভায় তিনি Vaishnavism and Christianity সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। ১৮।৬।২৭এ সেপ্টেম্বরের Queen পত্রে প্রকাশিত রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁরই রচিত একটি প্রবন্ধ হইতে আমি কয়েকটি অংশ উদ্ধার করিব। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :—

"For a right understanding and estimate of the Raja's thought and utterance, it is necessary to bear in mind the *two* essentially distinct but equally indispensable parts which the Raja played on the historic stage. There was Raja Ram Mohan Roy the cosmopolite, the Rationalist thinker, the representative man with a universal outlook on human civilization and its historic march; a Brahmin of the Brahmins, a hierophant moralising from the commanding height of some Eiffel Tower on the far seen vistas and outstretched prospects of the world's civilisation,

... ... For him, all idols were broken and the parent of illusions, Authority, had been hacked to pieces. ... ... For him, the veil of Isis was torn; the temple had been rent in twain and the Holy of Holies lay bare to his gaze! ... ...

"But there was another and equally characteristic part played by the Raja—the part of the Nationalist Reformer, the constructiue practical social legislator—the Renovator of National scriptures and Revelations. ... ... Yes, the Raja *carried on Singlehanded the work of Nationaeist Reform and Scripture Renovation and interpretation for three such different cultures and civilisations as the Hindu, the Christian and Mahomedan.*

... ... To this cosmopolitan or universalistic department of the Raja's work belongs the founding of the Brahmo Somaj which by its trust-deed was to be a meeting-house of *the worshippers of the one God, whether members of Hindu, Mahomedan, Christian or other communities.* The Raja's Somaj was a meeting-house, a congregation of worshippers, but had no direct social significance whatever".

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তির সারমর্ম্ম এই :—

রাজা রামমোহন রায়কে ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তাঁর মধ্যে যে দুটো দিক্ ছিল তাহা মনে রাখা চাই—এক, তাঁর সার্ব্বজাতিক দিক্; আর এক, তাঁর স্বাজাতিক দিক্। যেখানে রাজা সার্ব্বজাতিক, সেখানে তিনি সর্ব্বসংস্কারমুক্ত, ব্রাহ্মণোত্তম, সেখানে তিনি যেন এক সমুচ্চ ঈফেল স্তম্ভের চূড়ায় উঠিয়া তাঁর দৃষ্টির সাম্‌নে দিকে দিকে প্রসারিত নিখিলবিশ্বমানব-সভ্যতার সুদূরব্যাপী দৃশ্য ও সম্ভাবনার সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য রহস্যবিৎ পুরোহিতের মত বলিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু রাজার আর একটি বড় দিক্ তাঁর স্বাজাতিক দিক্—সেখানে তিনি শাস্ত্রের শাসনকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন, সামাজিক বিধিবিধানকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। এ কাজ যে শুধু হিন্দুশাস্ত্র ও সভ্যতা সম্বন্ধেই করিয়াছেন তা নয়—মুসলমান ও খৃষ্টান শাস্ত্র ও সভ্যতা সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কাজ তিনি করিয়াছেন।

আচার্য্য লিখিয়াছেন যে, তাঁর সার্ব্বজাতিক দিকের কাজের মধ্যে তাঁর ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের যে ট্রষ্টডীড্ তৈরি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, একটা স্বতন্ত্র 'সমাজ' করিবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, তিনি তাঁর ব্রাহ্মসমাজকে কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন একেশ্বরবাদী ধর্ম্মপন্থীদের একটা সাধারণ সম্মিলনের স্থান করিতে চাহিয়াছিলেন—তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, বা খৃষ্টানই হোক্ না কেন। অতএব, রাজা হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের 'খিচুড়ি' পাকান্ নাই; তিনি ঐ তিন ধর্ম্মেরই তত্ত্ব, সাধন, আচারাদির বিশিষ্টতার মধ্যেই সার্ব্বভৌমিক আদর্শ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াও এক মহা মিলন-মন্দিরে সকল

ধর্ম্মের লোকই মিলিতে পারে ভাবিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন—মুসলমানদের নকলে নয়। তিনি কোন ধর্ম্মকেই ভাঙেন নাই।

তারপর, রাজা বৈষ্ণব ধর্ম্ম বোঝেন নাই, সুতরাং বাংলা দেশকেও বোঝেন নাই,—বলা হইয়াছে। রাজা 'গোস্বামীর সহিত বিচারে' ভাগবত শাস্ত্র যে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নয়, এবং নিখিল হিন্দুশাস্ত্রেই, এমন কি ভাগবতেও, যে সাকার উপাসনার চেয়ে নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, গোস্বামীর মতের বিরুদ্ধে এই সকল কথা প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বিচারে তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, তন্ত্রই হোক, পুরাণই হোক্ যখন ইহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় তখন বুঝিতে হইবে যে, "এ সকল অধিদৈবত শাস্ত্র, ইহাতে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্য আর অন্যদেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য্য হয়।"

রাজা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রকে কি ভাবে বিচার করিয়াছেন তাহা না জানিলে তিনি কোন ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশেষের প্রতি সুবিচার করিতে পারিয়াছেন কি পারেন নাই, তাহা বলা চলেনা। সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্যেরই তুল্য মূল্য নয়; কোন্ শাস্ত্রকে কি ভাবে মানিতে হইবে এবং কতটা মানা চলে বা চলেনা তাহা রাজার শাস্ত্রমীমাংসা ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে। কিন্তু যিনি নিখিল হিন্দু শাস্ত্রের কোন শাস্ত্রই জানেন না, 'ফেরঙ্গ' সংস্কারে যিনি আপাদমস্তক জড়িত, এবং 'ফেরঙ্গ' স্বাদেশিক অহঙ্কার যাঁকে হিন্দুর ধর্ম্মের উদার মর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পথে বাধা হইয়া আছে, তিনি কেমন করিয়া বুদ্ধ-শঙ্কর-রামানুজের এযুগের উত্তরাধিকারী রামমোহনের শাস্ত্রমীমাংসা বুঝিবেন? হিন্দু সভ্যতা ও সাধনা সম্বন্ধে আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু অজ্ঞ—কিন্তু সে অজ্ঞতা লইয়া দম্ভ করিতে ত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই?

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন :—

"Not only the Vedas, but also the Smritis, Puranas and Tantras are employed as sacred authorities by the Raja quite in accordance with the Hindu canons of scriptural interpretation. While express Hindu doctrines such as Avatara (Incarnation and Partial Incarnation) are recognised and sacred authors admitted for the well-known Puranas etc, the Raja interprets them all so as to make them compatible with the purest rationalism. For example, incarnation is shown by Shastric authorities to be inapplicable to God, but only to the created and perishable gods and goddesses, and belief in the existence of the latter as higher degrees of finite beings is deprived of all religion or spiritual significance and thus reduced to harmeessness. A handbook of Hin-

duism, according to the Raja, giving the substance of his redactions of all Hindu scriptures (including Puranas and Tantras) his proofs and authorities and his interpretations, would prove extremely useful in the present age and may be prepared on the basis of his works."

তারপর আর একটি মাত্র কথা বলিয়া চুকিতে চাই। হিন্দুসভ্যতার বর্ণমালা-জ্ঞান যার আছে, সে কখনই একথা বলিতে পারেনা যে, হিন্দুর ধর্ম্মে জ্ঞানের পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা অথবা ভক্তির মার্গই শ্রেষ্ঠ মার্গ। অথবা শঙ্কর ভ্রান্ত কিম্বা রামানুজ ভ্রান্ত। হিন্দু সকল মার্গেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছে। মুক্তির পথকে সে বিচিত্র বলিয়াই জানে—খৃষ্টানের মত dogmatism হিন্দুর ধর্ম্মের প্রকৃতিগত নয়। তা যদি হইত, তবে গীতাশাস্ত্রের উদ্ভব এদেশে হইতেই পারিত না। সুতরাং "প্রাণের অনুভূতির কাছে তর্ক বিচার ও শাস্ত্রমীমাংসা গোপ্পদের সঙ্গে তুলনীয়" এ কথা খৃষ্টানী কথা, হিন্দুর কথা নয়। এদেশকে যে ব্যক্তি কিছুমাত্র বোঝে নাই, হিন্দুর সভ্যতার মর্ম্ম যে একেবারেই ধরিতে পারে নাই, একথা তারি কথা হইতে পারে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, এ,এফ,এস,এস, এফ, আর, ই, এস বিরচিত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী-গ্রন্থ। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় মুখবন্ধে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন; ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "রাজা দক্ষিণারঞ্জন সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিওর শিষ্য। ... সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ।" তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একজন প্রধান সভ্য ও বেথুন স্কুল স্থাপনে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। "সিপাহীযুদ্ধের পর অযোধ্যায় দুর্ব্বিনীত ভূম্যধিকারিগণকে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড ক্যানিঙ, ডাক্তার আলেকজাণ্ডার জকের পরামর্শে দক্ষিণারঞ্জনকে উক্ত প্রদেশে একখানি তালুক প্রদান করেন। ... তিনি লক্ষ্ণৌএ ক্যানিঙ্ কলেজ স্থাপন ও ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন ও নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সমাচার হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সংবাদ-পত্র-প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য কার্য্যদ্বারা উক্ত প্রদেশের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। ... কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি ধর্ম্মনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে রাজার মনের তেজস্বিতা, হৃদয়ের উদারতা, বর্ণনার সমীচীনতা ও আলোচনার দূরদর্শিতা সর্ব্বথা অনুকরণীয়। তিনি বহুবিধ বাধা বিঘ্ন ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে উৎপীড়নের অবহেলার ভয় উপেক্ষা করিয়া কিরূপে" জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, এই জীবনী গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণারঞ্জনের জীবন যেমন বিচিত্র তেমনি কর্ম্মময়; লেখকের রচনার গুণে জীবনীখানি উপন্যাসের মতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বাজে গল্প বা

কিম্বদন্তীর আশ্রয় না লইয়া প্রাচীন কাগজ-পত্রের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক ঘটনার সত্যাসত্য নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া লেখক যে-সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেগুলির আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। জীবনী-লেখকের পক্ষে সংযম ও নিরপেক্ষতা প্রধান গুণ; সে গুণের পরিচয় এ গ্রন্থে আমরা পাইয়াছি। একদিকে উপাদান-সংগ্রহে লেখকের যেমন প্রভূত পরিশ্রমও অধ্যবসায়, অপরদিকে তেমনি সত্য-নির্দ্ধারণও নির্ব্বাচন-ক্ষমতারও পরিচয় এ গ্রন্থে বহুস্থলে পাইয়াছি। দক্ষিণারঞ্জনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে। ফলে দক্ষিণারঞ্জনের জীবন-কথায় সেকালের একটি ছবিও বেশ পরিপূর্ণ সুন্দর রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানির কলেবর দীর্ঘ নহে; অল্প পরিসরে বহু জ্ঞাতব্য কথাই সুশৃঙ্খল ধারায় বর্ণিত হইয়াছে, ইহা লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। গ্রন্থে দক্ষিণারঞ্জনের ও বিস্তর প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি বহিরবয়বও সুন্দর।

চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ, শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মণিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। জাতিভেদ বা চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ যে গুণ-কর্ম্মানুযায়ী, মানুষেরই সৃষ্টি,—এই সত্য-প্রচার কল্পে এ গ্রন্থের সৃষ্টি। মানুষ নিজের চিত্তবৃত্তি লইয়াই কেহ ছোট, কেহ বড়। এই ছোট বড়'র নির্দ্দেশক আর সব মাপ-কাঠির কোনই মূল্য নাই —মানুষকে মানুষ বলিয়া মানাতেই মনুষ্যত্ব,—এই সকল সত্য নানা যুক্তি ও শাস্ত্রমতের সাহায্যে লেখক বুঝাইয়াছেন। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মিল আছে। উপবীত-ধারী নির্গুণ ব্রাহ্মণ উপবীতের জোরে সমাজে তরিয়া যাইবার আর বড় সুযোগ পাইতেছে না; গুণের সমাদর মানুষ করিতে শিখিয়াছে—তবে অন্ধ কুসংস্কার ও গোঁড়ামির আবর্জ্জনা এখনও পাহাড়-প্রমাণ সমাজের বুকে দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে হঠাইতে গেলে—একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সংস্কৃত শ্লোক চায়, শাস্ত্র চায়—বিবেকের বাণী এশ্রেণীর লোককে এতটুকু নাড়া দিতে পারে না—সেই শ্রেণীর লোকদিগের চোখ ফুটাইতে এ গ্রন্থের প্রয়োজন। লেখক শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই প্রমাণ করিয়াছেন, "অতি পুরাকালে ভূমণ্ডলে একমাত্র জাতি ছিল। সেই এক জাতি হইতে গুণ-কর্ম্ম-অনুসারে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস ও অবস্থান-জন্য বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।" "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥" ইহলোকে বর্ণের ইতর-বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ব্রহ্মময়, মানবগণ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। "সসর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্ম্মুখঃ। সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে॥" ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা রাজসোদ্রিক্ত হইয়া রাজ্য বিস্তার বলবীর্য্য-সঞ্চার ও সাত্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষা-বিধানে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় উপাধি লাভ করিলেন। যাঁহারা কৃষি, গোরক্ষা, সুজল ধন ও ধান্যের উপায় সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, তাঁহারাই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন; এবং যাহারা স্বভাবতঃই ধীসম্পদে দরিদ্র, শক্তি-সামর্থ্য-হীন, যুদ্ধে অপারগ ও অনভিজ্ঞ, অর্থ-উপার্জ্জনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অক্ষম, তাহারা শূদ্র হইল অর্থাৎ তাহারা আর্য্যগণের পরিচর্য্যা ও সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। শাস্ত্র হইতে লেখক আরও প্রমাণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে জাতি যেমন জন্মগত, গুণ-কর্ম্মগত নয়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। উৎকৃষ্ট বর্ণের হীন বর্ণত্ব প্রাপ্তি এবং হীন বর্ণের উত্তম বর্ণত্ব-প্রাপ্তির বিস্তর দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন। "যে গায়ত্রীদ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের সন্তান নহেন—ক্ষত্রিয়; তপস্যা-বলে উনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।" ভর্ম্মাশ্বের পুত্র মুদ্গল, মুদ্গলের পুত্র রাজা দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।" এমনি বিস্তর শাস্ত্রপুরাণোক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ লেখক করিয়াছেন।

এই সকল যুক্তি-তর্কের শেষে লেখক সমস্ত জাতিকে বলিয়াছেন, মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার কর—এক ভগবানের পুত্র বলিয়া ভ্রাতৃ-জ্ঞানে সকলকে বুকে টানো। এ গ্রন্থ-সঙ্কলনে লেখক যে অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করিয়াছেন, তাহা সার্থক হৌক্,—ইহাই আমাদের কামনা। তাহাতে দেশের মঙ্গল জাতির মঙ্গল—মনুষ্যত্বের মঙ্গল।

গিরিশচন্দ্র। বা গিরিশ-প্রসঙ্গ ও গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর সময়-নির্দ্দেশ-তালিকা-সম্বলিত গিরিশ-গীতাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৬৪।১ ও ৬৪।২ নং হুকিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, বাঁধাই পাঁচ সিকা মাত্র। এই গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের রচিত কয়েকটি গীত, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ কথা, তাঁহার রচনাবলীর সময়-নির্দ্দেশ-তালিকা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির মূল্য আছে। প্রকাশক মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে গিরিশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখক প্রচুর উপাদান পাইবেন।

নিবেদিতা। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, ২নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই গ্রন্থ প্রথম যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা ইহার প্রশংসা করিয়াছিলাম। এ গ্রন্থে রচনা-ভঙ্গী ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মনোজ্ঞ সমাবেশ দেখিয়া প্রকৃতই আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি। এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়া আজ আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি। বাঙালীর গৌরব, ভারতের গৌরব যে, নিবেদিতা বিদেশিনী হইয়াও আমাদের আপন জন। প্রাচ্য জ্ঞান, প্রাচ্য সভ্যতা, প্রাচ্য আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবতী এই বিদেশিনী মহিলাকে পাইয়া আমরা সে আদর্শ, সে জ্ঞানের মর্ম্ম বুঝিতে শিখিয়াছি। প্রাচ্য আদর্শ বজায় রাখিয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে নিবেদিতা এদেশীয় বালিকা ও নারীগণের শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের গৌরবের সামগ্রী, আশার মন্দির! এই গ্রন্থে নিবেদিতার কর্ম্ম-জীবনের বিচিত্র কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় মনোজ্ঞ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙালী মাত্রেরই উচিত, এ গ্রন্থ পাঠ করা। এ গ্রন্থের সমগ্র আয় নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সেবায় প্রদত্ত।

স্বেচ্ছাচারী। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস; 'ভারতী'তে গত বৎসর ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভারতী'তে এ উপন্যাসখানি যখন বাহির হয়, তখন অনেকেই ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। উপন্যাস খানির কয়েকটি চরিত্রে একটু নূতনত্ব আছে। কার্ত্তিকের স্বেচ্ছাচারিতা, অন্ধ বালিকা সরোজ ও সুকুমারীর প্রেম—উপভোগ্য হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের আলোচনায় লেখক নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তবে মণিশঙ্করকে লইয়া লেখক একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন—তাহার চরিত্র ফুটাইতে গিয়া অনেক স্থলে লেখক ছেলেমানুষীর পরিচয় দিয়াছেন—কার্ত্তিকের চরিত্রও মধ্য পথে হেঁয়ালির আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে—এই ত্রুটিটুকু স্বতন্ত্র গ্রন্থ-প্রকাশ-কালে পরিবর্জ্জন করিলে উপন্যাসখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার সময় লেখক এ কথাটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ।

হোলি-খেলা।

ভারতী

৪১শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৪ [১২শ সংখ্যা

"পাথর ফ্যট্ কর্ দরিয়া ছুটে!"

(ক)

রমেশের মতে গরম যখন চরম হইয়া উঠে এবং বিশুদ্ধ বাতাস না-পাইয়া প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়ি খাঁচা-ছাড়ি করিতে থাকে, বিকালে তখন গড়ের মাঠের 'কার্জন-পার্কে' গিয়া হা-করিয়া হাঁপ্ ছাড়াই, বাঁচিবার পক্ষে সব-চেয়ে প্রশস্ত এবং সহজ উপায়। অতএব, তারা কয়বন্ধুতে প্রত্যহ এই প্রশস্ত এবং সহজ উপায় অবলম্বন করিত।

সেদিনও তারা 'কার্জন-পার্কে' গিয়া জমিয়াছিল।

রমেশ ঘাসের উপরে উড়ানি বিছাইয়া শুইয়াছিল, যোগেশ একটা মৌরির বিঁড়ি বারংবার নিবিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্রমেই চটিয়া উঠিতেছিল, সুরেশ একমনে একখানা বিলাতী ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেছিল এবং উমেশ সকৌতুকে দূরের এক বেঞ্চের দিকে স্থিরচক্ষে তাকাইয়াছিল;—সেই বেঞ্চখানার উপরে ছ-জোড়া সাহেব-মেম বসিয়াছিল—তার মধ্যে যে সাহেবটি তাকিয়ার মত মোটা তাঁর মেমটি বাঁখারির মত রোগা, আর যে সাহেবটি বামনের মত বেঁটে তাঁর মেমটি প্রায় জিরাফের মত ঢ্যাঙা—এমন বিসদৃশ চার-চারটি চেহারা এক জায়গায় দেখিতে পাওয় সৌভাগ্য, বড় দুর্লভ!

হঠাৎ পিছন হইতে চেনাগলায় একজন বলিল, "ওহে, আমি যে তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলুম!"

সবাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখিল, পরেশ। অমনি একসঙ্গে প্রশ্ন হইল, "কিহে, তুমি না পুরী গিয়েছিলে?" "কবে ফিরলে হে?" "জায়গাটা কেমন লাগল?" "আর কোথাও গিয়েছিলে নাকি?"

পরেশ আগে সকলকার মাঝখানে আসিয়া বসিল। তারপর কোঁচানো উড়ানি-খানি খুলিয়া সাবধানে কোলের উপরে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

রাখিয়া বলিল, "ভাই, আমি চতুর্মুখ নই, সুতরাং একসঙ্গে তোমাদের চার-চারটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে একে একে বলচি শোন। হ্যাঁ, আমি পুরী গিয়েছিলুম। আজ সকালে ফিরেছি। জায়গাটা ভালই লাগল—দোষের মধ্যে আমাদের কালো রং সেখানকার জল-হাওয়ায় ঘোরতর হয়ে ওঠে। পুরী থেকে আমি কণারকে গিয়েছিলুম—"

রমেশ চম্‌কাইয়া বলিল, "অ্যাঁঃ, কণারকে!"

—"ওকি, কণারকের নামে তুমি অমন চম্‌কে উঠলে কেন?"

—"না, না, ও কিছু নয়, তুমি যা বলছিলে বল!"

—"সে হবে না! আগে বল তুমি চম্‌কালে কেন?"

—"সে অনেক কথা!"

—"তাহোক্—বল!"

—"শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে না!"

—"যদি ভাল লাগে আর মাসিকপত্রের ছোটগল্পের মত চর্ব্বিতচর্ব্বণ না-হয়, তাহলে আমরা উনিশবার জেল-ফেরতা দাগী চোরের কথাও বিশ্বাস করতে রাজি আছি!"

—"কিন্তু—কিন্তু—"

—"কিন্তু তুমি বড় বেশী ল্যাজে খেলচ রমেশ!"

অগত্যা বাধ্য হইয়া রমেশ তার কথা সুরু করিল:—

(খ)

"অনেকদিন আগেকার কথা; আমরা কয় বন্ধুতে কণারক দেখতে গিয়েছিলুম। কণারকের মন্দিরের কথা তোমরা অনেকেই জান, সুতরাং আমি আর মন্দিরের কথা বলতে চেষ্টা করব না।

কণারকের আশেপাশে মাঝে-মাঝে দু-চারখানি ছোটখাট গাঁ আছে; এ-সব গাঁয়ে লোকজন খুব কম, যারা থাকে তারা হচ্ছে চাষাভুষো ও গয়লা শ্রেণীর।

কণারক থেকে যেদিন আমাদের আসবার কথা, সেইদিন বৈকালে আমরা অম্‌নি একখানি গাঁয়ের ধার দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিলুম।

কৌতূহলী চোখে এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে আসছি, হঠাৎ একটা গাছতলায় পুতুলের মত কি-একটা নজরে ঠেকল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই এক পাথরের মূর্ত্তি—তার নীচের দিকটা বালিতে পুঁতে গিয়েছে।

মূর্ত্তিটি রমণীর—গড়ন দেখে মনে হোল কণারকের সেকেলে শিল্পীদেরই কেউ এটিকে গড়েছে! কেননা, তেমন রূপে-ভরা দেহ, হাসি-ভরা মুখ, ভাবে-ভরা চোখ বড় যে-সে কারিকরের কল্পনায় সম্ভব নয়,—উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্পের এটি একটি জলন্ত নিদর্শন।

এ-হেন মূর্ত্তি এখানে অযত্নে পড়ে আছে কেন, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাই ভাবছি, এমনসময়ে দেখি "আসুছন্তি ব্রজবাসী" বলে গান গাইতে-গাইতে, পাশ দিয়ে একজন গাঁয়ের লোক যাচ্ছে।

তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁরে, এ পুতুলটা এখানে পড়ে আছে কেন?"

উড়িয়া-ভাষায় সে যা বললে তার মর্ম্ম বুঝলুম এই যে, গাঁয়ের মধুসূদন শ্রীচন্দনের

বাড়ীতে এ মূর্ত্তিটা আগে ছিল, কিন্তু সে মরে যাবার পর তার ছেলেরা এটাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।

—"ফেলে দিয়ে গেছে? কেন রে?"

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে লোকটা বললে, কেন সে তা জানে না। তার মুখ দেখে মনে হোল, সে যেন কি লুকোচ্ছে!

—"আচ্ছা, তুই এই পুতুলের গা থেকে বালিগুলো সরিয়ে ফ্যাল্ দেখি! বখ্‌শীষ পাবি।"

লোকটা কেমন শিউরে উঠে তিনহাত পিছিয়ে গেল। তারপর, দংশনোদ্যত সাপের দিকে লোকে যেমন করে তাকায় তেমনি ভীরু চোখে মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বললে, সে পারবে না!

খাম্‌কা লোকটা আঁৎকে উঠল কেন? মূর্ত্তিটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিকে তার পাষাণ নয়ন তুলে সে যেন করুণ হাসি হাসছে; আপনার নীরব ভাষায় যেন বলছে, 'আমাকে উদ্ধার কর—এই আসন্ন সমাধি থেকে আমাকে উদ্ধার কর!'

লোভে আমার মনটা ভরে গেল। অপূর্ব্ব শিল্পের এই উজ্জ্বল রত্নটিকে যদি কলকতায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার বাড়ী আলো হয়ে উঠবে।

ফিরে দেখি, পিছনে সে লোকটা আর নেই, হন্‌হন্ করে তাড়াতাড়ি সে গাঁয়ের দিকে চলে যাচ্ছে।

বন্ধুরাও আমাকে ফেলে অনেকদূরে এগিয়ে গেছেন, চেঁচিয়ে ডাকতে সবাই ফের ফিরে এলেন।

সকলে মিলে বালি সরিয়ে মূর্ত্তিটিকে আবার টেনে তুললুম। সেটি একটি নর্ত্তকীর নগ্ন মূর্ত্তি; এতক্ষণ তার আধখানা বালির ভিতরে ঢাকা ছিল বলে তার অপরূপ রূপ ভাল করে বুঝতে পারি-নি, এখন তার সবটা দেখতে পেয়ে আমাদের চোখে যেন তাক্ লেগে গেল! কী সুন্দর তার দাঁড়াবার ভঙ্গী, কী অপূর্ব্ব তার হাত-পায়ের শ্রী-ছাঁদ! আর পাথরের মূর্ত্তি যে এতটা জীবন্ত হোতে পারে, আমি তা জানতুম না; মনে হোল, শিল্পী আর-একটু চেষ্টা করলেই এর মৌনব্রত ভঙ্গ হয়ে যেত!

ভেবেছিলুম, মূর্ত্তিটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে গেলে, গাঁয়ের লোকে নিশ্চয়ই উড়িয়া-ভাষায় যৎপরোনাস্তি রুদ্ররস প্রকাশ করবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কেউ টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না!

(গ)

"সন্ধ্যার পর আমরা কণারকের কালো দেউলের কালো ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে, সীমাহীন বালুকা-সাগরের তীরে এসে দাঁড়ালুম!

আমরা চারখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করেছিলুম। অন্য তিনখানা গাড়ীতে দু-জন করে লোক উঠল, কিন্তু আমার গাড়ীতে সেই মূর্ত্তিটি ছিল বলে আমি ছাড়া আর কারুর জায়গা হোল না।

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ঘুমন্ত সেই অনন্ত বালু-প্রান্তরকে চাকার শব্দে জাগ্রৎ করে, গরুর গাড়ীগুলো ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে চলতে লাগল। উপরে আকাশ, নীচে সেই ধূ-ধূ মরুভূম—চারিদিকে আর কিছুই নেই—না গ্রাম, না মানুষ, না গাছপালা!

সারাদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে দেহ-মন দুই কেমন এলিয়ে পড়েছিল—আস্তেআস্তে গাড়ীর ভিতরে দেহটাকে ছড়িয়ে দিলুম; আর, আমার পাশেই, নর্ত্তকীর সেই পাষাণ মূর্ত্তিটা, স্তব্ধ মৃত দেহের মত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল।...

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম ... ... সেই পাষাণী নর্ত্তকী যেন প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে! টানা টানা বিদ্যুৎভরা চোখ তুলে আমাকে তার পাশে দেখতে পেয়ে, কুন্দদন্তে অধর চেপে সে ফিক্ করে হেসে ফেললে, তারপর সামনের দিকে ধীরে-ধীরে তার দু-হাত বাড়িয়ে দিলে—আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে!

সেই জীবন্ত পাষাণীর আলিঙ্গন থেকে তাড়াতাড়ি যেমন সরে আসতে যাব—অম্‌নি চট্ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ কচ্‌লে উঠে বসে দেখি, পাথরের প্রতিমূর্ত্তিটা গাড়ীর ভিতরে পাত্‌লা অন্ধকারে আবছায়ার মত দেখা যাচ্ছে; হঠাৎ দেখলে মনে হয় সে মূর্ত্তি যেন এক ঘুমন্ত মানুষের! বাইরে, মড়ার মত হল্‌দে আধ-খানা চাঁদ একরাশ এলমেল কালো মেঘের উপরে স্তম্ভিত হয়ে আছে। গভীর রাত্রি অত্যন্ত স্তব্ধ;—কেবল, খুব দূর থেকে চিরজাগ্রত সমুদ্রের অশ্রান্ত হাহাকার বাতাসের ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভেসে-ভেসে আসছে!

হঠাৎ আমার কাণে একটা শব্দ গেল। গাড়ীর ভিতরে কে ফোঁশ্ করে একটা নিশ্বাস ফেললে! প্রথমে ভাবলুম, আমার ভ্রম। কিন্তু তারপর ভাল করে শুনে বুঝলুম,—না, ভ্রম নয়, ভিতর থেকে নিশ্চয় কারুর নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে!

গাড়োয়ান-ছোঁড়াটা তখন নেমে গাড়ীর আগে-আগে হেঁটে চলছিল।

প্রতিমূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে তেমনি স্থিরভাবে পড়ে আছে।—

ধাঁ-করে মনে হোল, কণারকের সেই গেঁয়ো-লোকটার রহস্যপূর্ণ আচরণ। বখ্‌শীষের লোভেও সে এই মূর্ত্তিটার গায়ে হাত দিতে রাজি হয়-নি! ... ... এ মূর্ত্তিটাকে নিয়ে কিছু গোলমাল আছে নাকি? নইলে, দেখতে যাকে এত সুশ্রী, তাকে গাছতলায় অমন-করে ফেলে-দেওয়া হয়েছিল কেন?

নিশ্বাস তখনো উঠছে, পড়ছে! শুধু তাই নয়—গাড়ীর ভিতরে বিছানার তলায় খড় বিছানো ছিল—সেই খড়গুলো হঠাৎ খড়্‌খড়্ করে উঠল—কে যেন এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরে শুল।

আমি ভূত মানি না। কিন্তু তবু কেন জানি না, আমার বুকের কাছটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করে উঠল! গাড়ীর ভিতরপানে চাইতে আর ভরসা হোল না, —খালি মনে হোতে লাগল, যেন কার দু-দুটো পাথুরে চোখের থম্‌থমে চাহনি ধারালো ছুরির কন্‌কনে ফলার মত ক্রমাগত আমার পিঠের উপরে এসে বিঁধছে আর বিঁধছে! শেষটা এমনি অস্বস্তি হোতে লাগল যে, আমি আর কিছুতেই সেখানে তিষ্ঠতে পারলুম না,—এক-লাফে সে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে অন্য এক গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। সেখানে আমার দুই বন্ধু শুয়ে

ঘুমোচ্ছিলেন; গুঁতোগুঁতি করে কোন-গতিকে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলুম।

... ...

... ...

ভোর হোল। প্রান্তর তখনো শেষ হয়-নি।

নিজের গাড়ীতে ফিরে আসতেই দেখি, আমার বিছানার উপরে একটা কুকুরছানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে, নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছে!

কাণ ধরে সেটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিলুম। ছানাটা কেঁউ-কেঁউ করে উঠতেই গাড়োয়ান-ছোঁড়া ছুটে এল। বললে, "বাবু, মের-না মের-না, ও আমার কুকুর!"

—"তোর কুকুর!"

—"হ্যাঁ বাবু, ওর মা মরে গেছে—তাই ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ীতেই থাকে!"

বুঝলুম, গেল রাত্রে গাড়ীতে কার নিশ্বাস শুনেছিলুম! কিন্তু, তবু—

(ঘ)

"কলকাতায় এসে নর্ত্তকীর সেই প্রতিমূর্ত্তিটিকে আমার বাইরের ঘরের একটি ছোট টেবিলের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

আমার স্ত্রী তাকে দেখবার জন্যে এক-দিন বাইরের ঘরে নেমে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাকে দেখে তিনি মতপ্রকাশ করলেন, "একে বাইরের ঘরে রাখা চলবে না!"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কেন?"

—"কেন আবার! ওর পরোনে যে কাপড় নেই! মাগো, কি লজ্জা!"

—"ওঃ, তাই! কিন্তু রমা, তুমি কি জাননা যে বড় শিল্পীরা যে-সব রমণীর মূর্ত্তি গড়ে নাম কিনেছেন, তার বেশীর-ভাগেরই গায়ে কাপড়-চোপড় নেই?"

—"কেন, তোমার বড় শিল্পীরা কি স্ত্রীলোককে এতই বেহায়া বলে মনে করেন?"

—"তা নয় রমা, তা নয়! অনাবৃত সৌন্দর্য্য যেমন স্বাভাবিক হয়, তেমন—"

—"থাক্ কথক-ঠাকুর, থাক্, তোমাকে আর সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে না, ও-সব হচ্ছে ভুয়ো কথা!"—এই বলে রমা আবার নর্ত্তকীর দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর ভঙ্গিভরে ব্যঙ্গ করে তার দিকে চেয়ে বললে, "মরে যাই, পরোনে কাপড় নেই—কালামুখীর দাঁড়াবার আবার ঢং দ্যাখ না—দি ঠাস্ করে গালে এক চাপড়!"—রমা মূর্ত্তির গালে সকৌতুকে একটি চড় বসিয়ে দিলে!

—কিন্তু সেইসঙ্গেই সে আর্ত্তনাদ করে দু পা পিছিয়ে গেল! আমি অবাক হয়ে দেখলুম, তার মুখ একেবারে পাঙ্গাশ হয়ে গেছে!

—"কি হোল রমা, অমন করে উঠলে কেন?"

—"আমার হাতে ও কাম্‌ড়ে দিয়েছে!"

—"কাম্‌ড়ে দিয়েছে! ক্ষেপে গেলে নাকি?"

—"ওকে চড় মারতেই ও-যেন আমাকে কটাস্ করে কাম্‌ড়ে দিলে! বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, হাত দিয়ে আমার রক্ত পড়ছে!"

তাইত, রমার হাত দিয়ে সত্যিই রক্ত

গড়াচ্ছে যে! হতভম্বের মত মূর্ত্তির দিকে চাইলুম—কিন্তু তখনি বুঝতে পারলুম আসল ব্যাপারটা কি! নর্ত্তকীর নাকের ডগাটি শিল্পী অত্যন্ত সূক্ষ্ম করে ক্ষুদেছে, রমার হাত তার উপরে গিয়ে পড়াতেই আঁচ্‌ড়ে গেছে আর-কি!

কিন্তু রমা বিশ্বাস করলে না। আমার মুখে সে আগেই শুনেছিল, এ মূর্ত্তিকে আমি কি-করে কেমন অবস্থায় পেয়েছিলুম। সে বললে, "একে যখন লোকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, তখন এ আপদকে ঘাড়ে করে বয়ে তোমার বাড়ীতে আনবার দরকার কি?"

স্ত্রীলোকদের কী কুসংস্কার! আমি হেসে বললুম, "যাও, যাও, আর পাগলামি করতে হবে না—হাতে জল দাও-গে যাও!"

ভয়ে-ভয়ে নর্ত্তকীর দিকে তাকাতে-তাকাতে রমা ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেল।

আমিও কিন্তু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নর্ত্তকীর দিকে চেয়ে রইলুম! রূপের-গরবে-ভরা হাসিমুখে, আমার দিকে দুখানি নিটোল বাহু বাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, —যেন কার অভিশাপেই সে আজ নিশ্চল পাষাণে পরিণত হয়ে নিস্তব্ধ, নইলে ঐ মুখের কলহাস্যরোলে এবং ঐ চরণের রুণুরুণু নূপুরনিক্কণে এখনি আমার এ ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত!

(ঙ)

"বিনোদকে তোমরা সকলেই জান বোধ হয়। এখন তার যে ভয়ানক দশা হয়েছে, তার জন্যে দায়ী কে জান? নর্ত্তকীর ঐ প্রতিমূর্ত্তিটা! বিনোদ যদি ঐ নর্ত্তকীর প্রতিমা না-দেখত, তাহলে ভাল আঁকিয়ে বলে দেশ-বিদেশে আজ তার নাম ছড়িয়ে পড়ত—সে একজন মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠত!..... বিনোদের শোচনীয় পরিণাম তোমাদের কারুর অজ্ঞাত নেই, কিন্তু তার আসল কারণ খালি আমিই জানি।

বিনোদ কলকাতায় থাকত না। কলকাতায় যখন আসত তখন আমার বাড়ীতেই এসে উঠত। আমি ছিলুম তার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

সেবারে কলকাতায় এসে দেবদাসীর এই মূর্ত্তিটা দেখে, সে আনন্দে একেবারে বিভোর হয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "রমেশ, এ যে অমূল্য রত্ন! বন্ধু, তুমি লাখটাকা পেলেও আজ আমি এত খুসী হতুম না!"—বিনোদ কাছে দূরে আশপাশ সুমুখ ও পিছন থেকে নানারকমে ঘুরে-ফিরে প্রতিমূর্ত্তিটা দেখলে। তারপর তার গায়ের পরে আপনার হাত রেখে আবার বললে, "এ সেই অতীতের বিশ্বকর্ম্মার গভীর সাধনার ফল, এ যুগের সাধ্য কি এমন প্রতিমা গড়তে পারে! দেখ বন্ধু, এর পাষাণ-দেহে কি অপূর্ব্ব সুষমা, হাত-পায়ের কি বিচিত্র ভঙ্গিমা!..... আমি যদি সম্রাট হতুম আর এ যদি মানুষ হোত, এর একটি চাহনির জন্যে আমি সাম্রাজ্য বিকিয়ে দিতুম! হায়, এ হচ্ছে পাষাণী—একে ভালবাসলেও প্রতিদানে এর প্রেম ত আমি পাব না! তবু দেখ, এই পাষাণও শিল্পীর হাতের

মায়াস্পর্শ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যেন এই কঠিন পাথরের আড়ালে-আড়ালে প্রাণের লুকানো ধারা চুপি-চুপি বয়ে যাচ্ছে —হাত দিলে যেন হাতে তার উত্তাপ পাওয়া যায়!"—

এই বলে বিনোদ সেই প্রতিমার বুকের উপরে হাত দিলে—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিদ্যুতাহতের মত হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

আচম্‌কা তার এই ভাবান্তর দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কিহে, ব্যাপার কি?"

বিনোদের মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হোল না। তারপর একবার সেই মূর্ত্তির দিকে, আর-একবার আমার দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে চেয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করে বললে, "একি সত্যি?"

—"কি সত্যি হে?"

—"দেখ রমেশ, এই মূর্ত্তির বুকে যেমনি আমি হাত রাখলুম অমনি আমার কি মনে হোল জান? মনে হোল ওর বুকের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা দুপ্‌দুপিয়ে নেচে উঠল!"

আমি উচ্চস্বরে হেসে বললুম, "মূর্ত্তিটা দেখে তোমার এত আনন্দ হয়েছে যে তুমি একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসে আছ!"

বিনোদ প্রতিমার বুকে আবার হাত দিয়ে একটু হেসে বললে, "তাই বটে—আমারি ভ্রম। কৈ, এখন ত আর তা মনে হচ্ছে না—এ বুক এখন স্তব্ধ, স্থির, মৃত্যুর মত শীতল!" তারপর থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললে, "হায়রে, পাষাণকে কি বাঁচানো যায়! তা যদি পারতুম, তাহলে আমরা,—শিল্পীরা, আজ শত শত নিখুঁত আদর্শ মানুষ গড়ে সমস্ত সংসারকে সুন্দর করে তুলতুম!"

(চ)

"আমার একটি বদ্‌ অভ্যাস আছে। রাত অন্তত দেড়টা-দুটো না বাজলে সহজে আমার ঘুম হয় না। প্রথম রাতটা আমি বই-টই পড়ে কাটিয়ে দি।

সে রাত্রে যখন পড়া সাঙ্গ করে উঠলুম, ঘড়িতে তখন দুটো বাজতে দশ মিনিট। আলো নিবিয়ে শুতে যাচ্ছি, এমনসময় বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পেলুম।

এত রাত্রে জেগে কে? একটু আশ্চর্য্য হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিনোদ। বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত সে অস্থিরভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সে রাত্রে গরমটা পড়েছিল কিছু অতিরিক্ত; ভাবলুম, গরমে বোধহয় তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই সে বাইরে বাতাস পাবার জন্যে বেরিয়ে এসেছে। এই ঠিক করে তাকে আর না-ডেকেই আমি শুয়ে পড়লুম।..... .....

পরদিন সকাল-বেলায় বিনোদের সঙ্গে যখন দেখা হোল, বললুম, "কিহে, কাল ভাল করে ঘুম হয়-নি বুঝি?"

সে বিস্মিত স্বরে বললে, "তুমি জানলে কি করে?"

আমি বললুম, "কাল রাত দুটোর সময় তুমি যখন বারান্দায় এসেছিলে আমি তখন জেগেছিলুম।"

বিনোদ আমার কাছে সরে এসে খুব মৃদুস্বরে বললে, "ভাই, কাল এক আশ্চর্য্য স্বপন দেখেছি।"

—"কি-রকম?"

—"নর্ত্তকীর মূর্ত্তিটার একটা নকল তুলতে-তুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখলুম, জানো? দেখলুম, প্রতিমা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল—যদিও তার দেহ যেমন ছিল তেমনি পাথরেরই রইল। এক-পা এক-পা করে আমার কাছে এগিয়ে এসে হাসতে-হাসতে সে বললে, 'তোমার কথা আমি শুনেছি, তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও,—না'? আমি বললুম, 'হ্যাঁ'।—'তাহলে আমিও তোমাকে ভালবাসব, আর কখনো ছাড়ব না'—এই বলে সে আমাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করলে! তার সেই শক্ত পাথরের হাতের চাপে আমার দম যেন আট্‌কে আসতে লাগল। আমি জোর করে যেমন তার হাত ছাড়াতে যাব অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর কিছুতেই আর ঘুম আসে না। সেই বিদ্‌কুটে স্বপ্নের কথা কোনমতেই আর ভুলতে পারলুম না—সেটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে মাথাটা এমনি গরম হয়ে উঠল যে, শেষটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। কাল সারারাত অনিদ্রায় কেটেছে।"

কণারকের প্রান্তরে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলুম, সেটাও অনেকটা এই ধরণের। আমার বুক কি-এক বিপদভয়ে গুর্‌গুর্‌ করে উঠল। তবে কি সত্যসত্যই এ মূর্ত্তিটার ভিতরে অস্বাভাবিক কিছু আছে? একটু উত্তেজিত স্বরে বললুম, "বিনোদ, ও ঘরে আর তুমি শুয়ো না!"

আমার স্বরে চম্‌কে উঠে বিনোদ বললে, "কেন বল দেখি?"

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললুম, "তুমি ও মূর্ত্তিটার কথা বড় বেশী ভাবছ। হয়ত আজও তুমি ওকে আবার স্বপ্নে দেখবে।"

বিনোদ হাসতে-হাসতে বললে, "দেখলুমই-বা, তাতে হয়েছে কি!—স্বপ্ন ত সত্য নয়!"

তাকে আমি আর-কখনো হাসতে দেখি-নি, সেই হাসিই তার শেষ হাসি!

(ছ)

"তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি—যে রাত্রির কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

সে রাত্রেও আমি টেবিলের সামনে বসে একখানা বই পড়ছিলুম। রাত তখন একটার কাছাকাছি। চারিদিকে স্তব্ধতা যেন থম্‌থম্‌ করছে।

কোথাও কিছু নেই,—হঠাৎ একটা ভারি জিনিষ-পড়ার শব্দ হোল—সঙ্গেসঙ্গে ভয়ানক এক আর্ত্তনাদ!—সে কী চীৎকার,—চারিদিকের গভীর নীরবতার মধ্যে সে আর্ত্তনাদ যেন আকুল ভাবে ঝাপ দিয়ে কোথাও থৈ না পেয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ডুবে গেল!

একলাফে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম!

আমার স্ত্রীও ধড়্‌মড়িয়ে জেগে, বিছানায় উঠে বসে সভয়ে বললে, "ও কী গো, ও কী!"

আবার আর্ত্তনাদ! এবার তত জোরে নয়—কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাভরা! এ যে বিনোদের স্বর!

আমি আর দাঁড়ালুম না, ঝড়ের মত বেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে গেলুম।

বাইরের ঘরের দরজা ঠেলতেই দড়াম্‌ করে খুলে গেল, ভিতরে ঘুট্‌ঘুট্‌ করছে অন্ধকার—মনে হোল, সে অন্ধকার হা-করে আমাকে গিল্‌তে আসছে!

শুনলুম, সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে অতি কষ্টে গেঁঙিয়ে-গেঁঙিয়ে বিনোদ বলছে, "ছাড়্‌, ছাড়্‌,—ওরে পিশাচী, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—ছে—" আর কথা বেরুল না,—কেউ যেন তাকে এত জোরে চেপে ধরলে, যে তার স্বর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

তোমরা বুঝবে না—সে যে কি-এক মহা ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ নেতিয়ে পড়ল; পারলে, তখনি আমি ছুটে পালাতুম—কিন্তু সে শক্তিও আমার ছিল না, ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে-কাঁপতে মাটির উপরে আমি দু-হাতে ভর্‌ দিয়ে বসে পড়লুম! অন্ধকার ঘরের ভিতরে কেমন একটা অস্পষ্ট ঝট্‌পটানি শব্দ হোতে লাগল—কেউ যেন কারুর সঙ্গে যোঝাযুঝি করছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুক্তিলাভ করতে পারছে না!... ... ক্রমে ক্রমে সেই ঝটপটানি শব্দটা থেমে এল—তারপর, সব চুপচাপ! আর-একটু তেমন ভাবে থাক্‌লেই আমি নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যেতুম, কিন্তু বাড়ীর যে যেখানে ছিল সবাই জেগে উঠে হৈ-চৈ করতে-করতে সে ঘরে ছুটে এল, আলো দেখে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।... ... ...

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, নর্ত্তকীর সেই প্রতিমূর্ত্তিটা টেবিলের উপর থেকে মাটিতে উপুড় হয়ে সটান্‌ পড়ে আছে, আর তারই তলায়, বিনোদের দেহ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে!

সবাই মিলে ধরাধরি করে, পাথরের সেই ভারি মূর্ত্তিটা বিনোদের উপর থেকে তুলে ফেললুম। বিনোদের বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, সে বেঁচে আছে।

তখনি ডাক্তার ডেকে আনা হোল।

* * * *

সেই মূর্ত্তিটার চাপে বিনোদের দেহ আষ্টেপৃষ্ঠে থেঁৎলে গিয়েছিল; অনেক কষ্টে সে প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। এখন তার কাছে গেলে সে ক্রমাগত বলতে থাকে, পাষাণীর সঙ্গে প্রেম করে বুক তার পাষাণ হয়ে গেছে!"

(জ)

রমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ শ্রোতারাও কেউ কোন কথা কহিল না।

তারপর যোগেশ আপনার নিবন্ত বিঁড়িতে খুব-একটা জোর-টান মারিয়া বলিল, "সে লক্ষ্মীছাড়া মূর্ত্তিটার কি হোল?"

রমেশ বলিল, "তাকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেলে দিয়েছি।"

সুরেশ বলিল, "সেটা নিশ্চয় ভৌতিক মূর্ত্তি, নইলে—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "না, আমি ভূত মানি না।"

—"তাহলে বিনোদের অমন দশা হোল কেন?"

—"মূর্ত্তিটা বোধহয় কোন গতিকে তার ঘাড়ের উপরে পড়ে গিয়েছিল। এর-মধ্যে ভৌতিক কি আছে?"

—"তবে সেটাকে ভাঙ্গলে কেন?"

—"তারই জন্যে আমার বন্ধুর অমন অবস্থা হোল, সেই রাগে। ... ... কিন্তু মূর্ত্তিটাকে ভাঙ্গবার সময়েও আর এক কাণ্ড ঘটে। চাকররা যখন হাতুড়ি দিয়ে মূর্ত্তিটার উপরে ঘা মারছিল, তখন হঠাৎ তার গা থেকে একখানা ভাঙ্গা পাথর ঠিক্‌রে একটা চাকরের কপালে গিয়ে এমনি জোরে লাগে যে, সে তখনি অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে যায়।"

উমেশ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, "কি ভয়ানক! তবু তুমি বলতে চাও, এটা ভৌতিক ব্যাপার নয়?"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, আমি ভূত মানি না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

কণারকে বৌদ্ধপ্রভাব

কণারকে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা Antiquities of Orissa গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রমহাশয়ই বোধ হয় প্রথম তুলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ ষ্টার্লিং প্রণীত উড়িষ্যার ইতিহাসে কণারক বিষয়ক প্রবন্ধে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে ধউলি বা ধবলগিরি পর্ব্বতের গাত্রে অশোক-অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। প্রাচীন কলিঙ্গমণ্ডলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-বিস্তৃতির ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইউয়েনচঙ্গ বা হুয়েন্‌সঙ্গ ভারতের এই অংশে তীর্থ ও দেবালয়াদি দর্শন করিতে আসিয়া Wou-yeau বা রাজা অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রায় দ্বাদশটি স্তূপ দেখিতে পান; ইহার সকলগুলিই নাকি তৎকালে অলৌকিক দৈবশক্তির বিকাশ-বাহুল্যে সবিশেষ প্রভাবান্বিত ছিল। (১)

তখন এ প্রদেশে শতসংখ্যক সঙ্ঘারামে প্রায় একহাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিত। সদ্ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মীগণ একত্রেই বসবাস করিত। Stanislaus Julien প্রণীত ইউয়েনচঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই প্রকাশিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার গ্রন্থে এ পুস্তকের ব্যবহার যথেষ্টই করিয়াছেন।

(১) "Hiouen Thsang found a dozen Stupas built by Wou-yeau (Asoka) on which were often-times refulgent the most extraordinary prodigies...hundred monasteries containing ten thousand monks who study the great translation—the heretics and men of the faith living pell-mell."

তার পর ফা-হি-য়ান প্রণীত Foe-ku-ki (ফো-কু-কি) গ্রন্থের মসিয়ে Reumsat Klaproth ও Landresse কৃত ফরাসী-অনুবাদের ইংরাজী অনুবাদ কলিকাতায় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়; সুতরাং ১৮৭৫ ও ১৮৮০ খৃঃ অব্দে Antiquities of Orissa গ্রন্থ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইবার সময় দেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভালরূপেই এ পুস্তকের যথাযোগ্য আলোচনা করিতেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থে চৈনিক পরিব্রাজকবর পাটলিপুত্রে বৌদ্ধগণের রথযাত্রা দেখিয়া ভারতবর্ষে আগমন-কালে খোটানে পরিদৃষ্ট বৌদ্ধ রথোৎসবের সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন। (১) বোধ হয়, এই বৃত্তান্ত-পাঠেই তদানীন্তন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণ রথযাত্রামাত্রকেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কণারকে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল, "অর্কক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিলে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শন লাভ ঘটে।" রথযাত্রার উদ্ভব যে করিয়া বা যে ভাবেই হৌক না কেন, খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে হিন্দুর বিস্তর আচার-অনুষ্ঠানে রথযাত্রার প্রচলন দেখিতে পাই। অগ্নিপুরাণের ৬০ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে পুস্তক-প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—"রথেন হস্তিনা বাপি ভ্রাময়েৎ পুস্তকং নরৈঃ।"

রথযাত্রা এখন জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও ধবলগিরি হইতে বড়জোর দুই তিন দিনের পথ সমুদ্রতীরবর্ত্তী সূর্য্যমন্দিরেও যে বৌদ্ধ প্রভাব আরোপিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? পূর্ব্ব হইতে কোন বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী থাকিলে একদেশদর্শিতা সহজেই আসিয়া পড়ে; তখন যেটুকু নিজমতবাদের সমর্থন করে কেবল সেইটুকুকেই মূল্যবান মনে করিয়া হয় বাকী অংশটুকু বর্জ্জন করিতে হয়, নতুবা স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া সোজা কথার বিকৃতার্থ-গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না! ধউলির সান্নিধ্য-বশতঃ একসময়ে খণ্ডগিরির গুহাগুলিও বৌদ্ধ কীর্ত্তিরূপে প্রচারিত হইত; পরে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২য় অব্দের হস্তি-গুম্ফাস্থ নৃপতি খারবেলের খোদিত লিপির (Actes du Sixieme congr. or. Vol III. p. 174-77) ও নবমুনিগুম্ফার জনৈক জৈন শ্রমণ শুভচন্দ্রের নামোল্লেখ এবং মঞ্চপুরি ও ললাটেন্দু কেশরী গুম্ফায় খোদিত খারবেলের অগ্রমহিষী বা প্রধানা মহিষীর এবং রাজা উদ্যোত কেশরী দেবের লিপিদ্বয়ের পাঠোদ্ধার-ফলে (Ep. Indic. Vol. XIII. p. 160-166) এক্ষণে প্রাচীন কীর্ত্তি-বহুল খণ্ডগিরিতে জৈন প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। রাজা অশোকের অভ্যুদয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় অব্দে; তাহার এক শতাব্দী পরে খৃঃ পূঃ ২য় অব্দ হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই এগার-বারো শত বৎসর ধরিয়া ধৌলীর অদূরবর্ত্তী কুমার ও কুমারী পর্ব্বতে (২) জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাদের স্থাপত্য-কলা ও

(১) কেহ কেহ বলেন, প্রব্রজ্যা-গ্রহণের পূর্ব্বে রাজকুমার গৌতম রথারোহণপূর্ব্বক উদ্যান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। রথযাত্রা এই ঘটনার স্মরণার্থে অনুষ্ঠিত হয়।

(২) কুমার ও কুমারীপর্ব্বত অস্তগিরি ও উদয়গিরির প্রাচীন নাম। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে এই নামদ্বয়টিই প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

ভাস্কর্য্যের স্থায়ী-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল হইতে দুই-এক শতাব্দীর মধ্যেই যদি এরূপ একটি ভিন্ন ধর্ম্ম নিজ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে খৃঃ ত্রয়োদশ অব্দে হিন্দু নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কণারক মন্দিরেই যে সর্ব্বপ্রকারে বৌদ্ধপ্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে ইহা কখনও জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ফার্গুসন সাহেবের গ্রন্থোক্ত বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-প্রণালী প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের কল্পিত শ্রেণী-বিভাগ আর মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। বৌদ্ধ স্তূপের ন্যায় জৈন স্তূপও দেখা যায় এবং জৈনগণের ভুগ্নতা-বিশিষ্ট (curvilinear) মন্দিরাদির ন্যায় হিন্দু মন্দিরাদিরও অভাব নাই। তাই শিল্পকলা বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, "Works of art and architecture should be classified with regard to their age and geographical position and not according to the creed." অর্থাৎ শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনাদির শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে ধর্ম্মমতাদির উপর নির্ভর না করিয়া যুগ, কাল ও ভৌগোলিক অবস্থানের কথাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমে কণারকের নাম হইতেই আরম্ভ

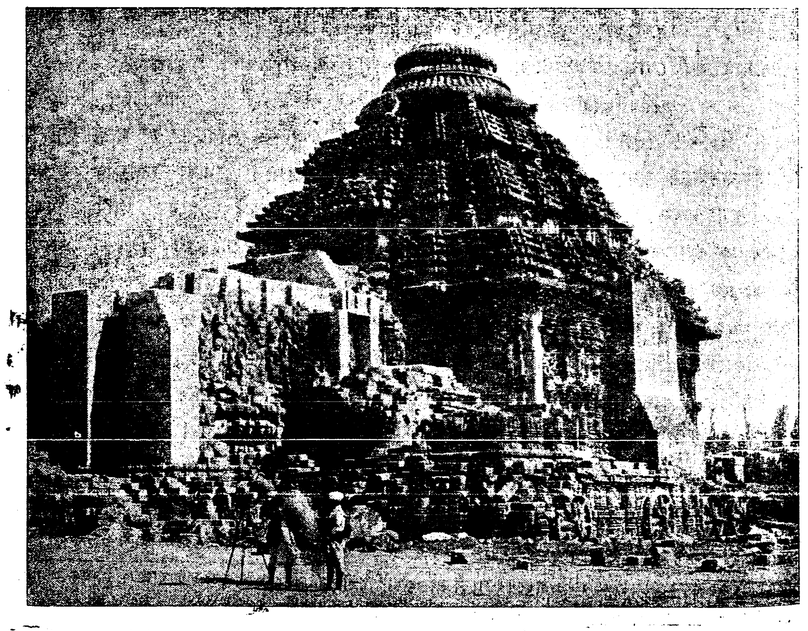

কণারক-মন্দির ; উত্তরদিক

করা যাক। রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেব প্রভৃতি গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে "কোণা কোণ" এই নামটি পাওয়া যায়; (J. A. S. B. 1896. p. 251) ইহা হইতে কোণার্ক শব্দ সাধারণতঃ 'কোণা'র অর্ক (সূর্য্য) এই অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। (Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon. p.28. Footnote) কিন্তু বৌদ্ধ-প্রভাব-বাদীরা বলিতে চান যে বুদ্ধদেবের অপর একটি নাম কোনাগমন বা কোনাকমন; এবং ইহারই অপভ্রংশে কোণা কোণা শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। (Bishunswarup's Konarak p. 85) 'কমন' বা 'গমন' শব্দ একবারে হ্রস্ব হইয়া 'কোণায়' পরিণত হওয়া কতদূর সহজ, তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরাই বলিতে পারেন; তবে একেবারে পূরামাত্রায় "বৌদ্ধ" মতবাদ প্রতিপন্ন করার জন্য অমরকোষ অভিধানে উল্লিখিত বুদ্ধদেবের নামান্তর অর্কবন্ধু শব্দের "বন্ধু" ফেলিয়া "অর্ক" টুকু কোণাগমনের 'কোণা'র সহিত জুড়িতে গেলে ছেলেবেলাকার সেই "কামারের মারে ফেলে" ইত্যাদি বালসুলভ হেঁয়ালির কথাই মনে পড়ে!

ইঁহারা কিন্তু বলিতে চান, যখন বুদ্ধের দুইটি বিভিন্ন নাম কাটিয়া তাহার দুইটিরই "মুড়া" মাত্র "জোড়া" দিয়া কোণার্ক পাওয়া যায়, তখন কণারক যে প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থান, তাহা প্রমাণের আর বাকী রহিল কি? ইহার উপর দ্বিতীয় প্রমাণ—"রথ"। কণারকে রথযাত্রা ত হইতই, তাহার উপর আবার মন্দিরটিও চক্রসংযুক্ত রথাকৃতি! যদি বলিতে চান, "সূর্য্যদেব ত সপ্তাশ্ব-সংযুক্ত রথেই বাহিত হন"(১) তাহাতেই বা আর আসিল-গেল কি? ইঁহারা তর্কে পরাভূত না হইয়া বলিবেন, সপ্তাশ্ব যে



অশ্বমূর্ত্তি

(১) "সসপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্য্যে দ্বিপদ্মধৃক্" অগ্নিপুরাণ, ৫১—১।

পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত হয় নাই, প্রাচীন কালে যে চারিটি মাত্র অশ্বই বিদ্যমান ছিল না, এ-কথাই বা কে বলিল ? পরবর্ত্তী-কালে এই সকল প্রস্তরময় অশ্ব প্রভৃতির সংখ্যা-পরিবর্ত্তন-বিষয়ক কোনরূপ সন্তোষ-জনক প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া উল্টা পদ্ধতিতে প্রমাণের ভার প্রতিপক্ষের উপর চাপাইয়া দিলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই নিরস্ত হইতে হয় !

কিন্তু আজিকার কালে সকলেই facts লইয়া ব্যস্ত, তাই ঐতিহাসিক বিতণ্ডায় শুধু কল্পনার দৌড়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। লোকে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "আচ্ছা মহাশয়, বৌদ্ধ তীর্থই যদি হইল, তাহা হইলে ভাস্কর্য্য নিদর্শনে তাহার প্রমাণ কোথায় ?"

বৌদ্ধপ্রভাব পোষকতা-কারিগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় ইহার চারি-পাঁচটি উদাহরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম প্রমাণ এই যে মন্দিরের সর্ব্বত্র অসংখ্য হস্তীমূর্ত্তিই দেখা যায়; এমন কি গর্ভ-গৃহের রত্নবেদীটিও হস্তী-চিত্র হইতে নির্ম্মুক্ত নহে। সুতরাং ইহাদের মতে (১) প্রাচীন বৌদ্ধস্থাপত্য নিদর্শনে দৃষ্ট এ-জাতীয় জান্তব চিত্র যে বৌদ্ধ প্রাধান্যেরই পরিচয় দিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? খৃঃ ১১১৭ হইতে ১২০৮ অব্দে নির্ম্মিত হৈশলেশ্বর মন্দিরেও গজ-আলম্বন প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে কারণে কেহই এ দেউলটিকে প্রাচীন "বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত উপাসনার স্থান" বলিয়া প্রচার করেন নাই। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত খাজুরাহের মন্দিরেও হস্তীমূর্ত্তি বিরল নহে। বুদ্ধদেব নাকি পূর্ব্বজন্মে হস্তিপকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতাও নাকি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন এক শ্বেত হস্তী তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভে প্রবেশ করিতেছে! সুতরাং আর যায় কোথা ? বেদীনিহিত একটি বালক ও একটি হস্তীর চিত্র অসঙ্কোচে জাতক-কাহিনী-সংক্রান্ত চিত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জাতক কাহিনীর চিত্রাবলীর মধ্যে যে কোন প্রকার পারম্পর্য্য রক্ষিত হইবে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয় এবং বরবুদুর প্রভৃতি স্থানের চিত্রগুলিও এই মতেরই সমর্থন করিতেছে। বেদীর একটি চিত্রকে শাম্ব ও সূর্য্যের মিলন বলিয়া ধরিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী অপর একটি ফলকের চিত্রটিকে জাতক কাহিনী-সংক্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করিলে স্বভাবতঃই মনে সন্দেহ জন্মে। মন্দিরস্থিত সুবৃহৎ গজসিংহ মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সেগুলি নাকি বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী কেশরী-রাজগণের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে।

(১) গয়ার বরাবর পাহাড়ে লোমশ ঋষির গুহার প্রবেশ-দ্বারের facade বা সম্মুখভাগে গজ আলম্বন দেখিতে পাওয়া যায়। (P. 20 History of Fine art in India and Ceylon), কঠিন quartzose gneiss প্রস্তরে পালিস করা গুহার দেওয়ালগুলি নির্ম্মাতাগণের বিশেষ কৌশলের পরিচায়ক। এই গুহা-শ্রেণী সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে "অজীবিক" সন্ন্যাসীদের জন্য নির্ম্মিত হয়। (V. A. Smith's History p. 145).

হৈশলেশ্বর মন্দিরের গাত্রে শার্দ্দূল আলম্বনে বহুবিধ শার্দ্দূলের চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ হৈশল বল্লালগণের লাঞ্ছন-স্বরূপ শার্দ্দূলচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ বাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইতেন। কণারকে যেরূপ হস্তী-শ্রেণীর ন্যায় নরশ্রেণী বা সাদী সৈন্যশ্রেণী দেখা যায়, হৈশলেশ্বর মন্দিরেও সেইরূপ অশ্বশ্রেণী ও নরশ্রেণী বিদ্যমান, তাই Vincent Smith মহোদয় শার্দ্দূলগুলিকে emblem বা লাঞ্ছন বলিয়া স্বীকার না করিয়া "canonical scheme of decoration" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। ডাঃ ফ্লিট-প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আনুমানিক খৃঃ একাদশ শতাব্দীর যযাতি-কেশরী বা মহাশিবগুপ্ত এবং জন্মেজয় বা মহাভবগুপ্ত এই দুইজন ব্যতীত মাদলাপঞ্জীর বংশাবলী-বর্ণিত অপর কেশরী-রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। (Ep. Indic Vol. III. p. 324. 336et. seq.) সুতরাং সোমবংশীয় নৃপতি-গণের লাঞ্ছনরূপে না হউক (১) অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত স্থাপত্য-বিষয়ক অলঙ্কার-রীতির অনুযায়ী বলিয়া হংস আলম্বনের ন্যায় (goose frieze) গজসিংহ মূর্ত্তিগুলিও উড়িষ্যার মন্দিরাদিতে স্থান পাইয়াছিল। বড় ঝাঁজি নামক যে জলজ উদ্ভিদের চিত্র কণারক মন্দিরের Pilasters বা উদ্গত স্তম্ভাদির গাত্রে পদ্ম-পত্রাদির অলঙ্কারের ন্যায় উৎকীর্ণ দেখা যায়, শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার স্থাপত্যেও সেইরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন; (M. Ganguli's Orissa. p. 100) কিন্তু ইহাতে এইটুকুমাত্র বুঝায় যে মকর-চিহ্ন প্রভৃতির ন্যায় এই জাতীয় স্থাপত্য-প্রণালীও বৌদ্ধযুগ হইতে চলিয়া আসিয়া ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশের হিন্দু-মন্দিরাদিতেও স্থান পাইয়াছে। অশোকস্তম্ভে হংস-আলম্বন বা হস্তীর চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সকল স্থলেই যে তাহা বৌদ্ধভাব জ্ঞাপন করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি ? কেহ কেহ মন্দির-গাত্রস্থ একক বা আলিঙ্গন-বদ্ধ এবং লীলায়িতপুচ্ছ (scroll work) রূপে অঙ্কিত নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তিগুলিও বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কাশ্যপ-সন্তান সহস্র-সংখ্যক নাগগণের জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত আছে। (M. Ganguly's Orissa p. 177-178) যক্ষ রাক্ষসের ন্যায় তাহারাও প্রায় demi-gods শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মনসা-পূজাকালে অনন্ত বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ প্রভৃতি অষ্ট নাগের নামও যথাক্রমে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। নাগগণ হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে নাগদিগের উল্লেখ দেখা যায় বলিয়া এবং

(১) মহাশিবগুপ্ত বা যযাতির মরঞ্জমুরা তাম্রশাসনে যে seal বা মুদ্রা দেখা যায়, তাহাতে গজলক্ষ্মী বা কমলাস্থিকা-মূর্ত্তি-অঙ্কিত শার্দ্দূলের চিহ্নমাত্র নাই। (J. B. O. R. S. March 1916) জন্মেজয়ের তাম্রশাসনে অঙ্কিত মুদ্রায় "a man in a squatting posture" বা উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তিমাত্র দেখা গিয়াছে। (Mr. B. C. Mozumdar's article in Ep. Indic. Vol XI p. 93 et. seq.)

সাঞ্চী ভারহুত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ স্থাপত্যে নাগমূর্ত্তি দেখা যায় বলিয়া যে হিন্দু মন্দিরের নাগমূর্ত্তিগুলিও বৌদ্ধধর্ম্ম-পরিচায়ক বলিয়া ঘোষিত হইবে, ইহা খুব সঙ্গত মনে হয় না। অবশ্য প্রাচীন রীতির বৌদ্ধ নাগমূর্ত্তিগুলির সহিত মধ্যযুগের (later Brahminical period) হিন্দু নাগমূর্ত্তির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। (M. Ganguly's Orissa p. 178) আমাদের বঙ্গদেশে একশ্রেণীর প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা গিয়া থাকে। বৌদ্ধ স্তূপের গাত্রেও এরূপ চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বঙ্গ-দেশীয় এ শ্রেণীর কোন শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে এরূপ চিত্র দেখিয়া দেবালয়টি শিবপূজার্থ ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে বৌদ্ধস্তূপ রূপে বিদ্যমান ছিল, এরূপ ধারণা করিলে যে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, জাতক-কাহিনীতে উল্লেখ-হেতু কণারকে নাগ বা হস্তীচিত্র দেখিয়া বৌদ্ধপ্রভাব-বাদীরাও সেইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। খোদিত চিত্রের নিম্নদেশে প্রাচীন শিল্পীগণ চিত্রের বিষয় বা নিজেদের নামধাম কিছুই লিখিয়া রাখিতেন না, তাই অনেক সময়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষেও বুঝিবার ভুল ঘটিয়া থাকে। আধুনিক কালে তাই দেখিতে পাই যে যে-চিত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-শিক্ষা-দান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ডাঃ কুমারস্বামীর ন্যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় শ্রেণীর মূর্ত্তিতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিত এখন তাহাই বৈষ্ণবগুরুর চিত্র বলিয়া মতপ্রকাশ করিতেছেন। (Vishwakarma, part VII. plate 72) চিত্রটির যে প্রতিলিপিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহা কেবল বৌদ্ধ চিত্রেরই নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে।



শিক্ষাদান

অপর একটি চিত্র লইয়াও এইরূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এটি স্থানীয় পাণ্ডাগণ পরশুরামের শরক্ষেপণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পক্ষান্তরে পণ্ডিত বিষণস্বরূপ বলেন, ইহা শরভঙ্গ নামক জাতক কাহিনীর চিত্র। বুদ্ধদেব শর-সন্ধান ও লক্ষ্যভেদ-প্রতিযোগিতায়

বিনা-শিক্ষায় অপর ধনুর্দ্ধরদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইহাই না কি এ চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। পরশুরাম যে শরনিক্ষেপ করিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, সে কথা হিন্দু শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে, সুতরাং যে মন্দিরের গাত্রে সীতার বিবাহ, মহিষাসুর বধ প্রভৃতি-পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত ছিল, যেখানে বিষ্ণু, বালগোপাল, বৃহস্পতি ও গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুদেব-দেবীগণের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেই মন্দিরেই যে বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর চিত্রাবলী অসংলগ্ন, পারম্পর্য্যবিহীনভাবে মধ্যে মধ্যে স্থান পাইবে, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ



বিষ্ণুমূর্ত্তি—কণারক

হয় না। এটি পরশুরামের চিত্র বলিয়া স্বীকার করায় আপত্তি থাকিলে শরক্ষেপণ-পারদর্শিতার secular চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেই বা বাধা কি? কোণার্ক মন্দির-গাত্রে সেরূপ secular শীকার-চিত্রেরও অভাব নাই।

আর একটি 'দণ্ডায়মান' মূর্ত্তির শিরোদেশে বিততফণ সর্পমূর্ত্তি দেখিয়া সেটিকে সমুচলিন্দ বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তি দুইটিকে শ্রেষ্ঠী পত্নী সুজাতা ও তাঁহার দাসী পুন্না বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় কণারক প্রবন্ধে আমি এ মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। ১৯০৩অব্দে যাদুঘরের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সর্পরাজ মুচলিন্দের সহিত একত্র-অবস্থিত যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, (Catalogue—No. 6290) তাহার সহিত এ-মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। সে নমুনায় বুদ্ধদেব মুচলিন্দের শিরোদেশে উপবিষ্ট। শুধু সর্প-চিহ্ন দেখিয়া বৌদ্ধ বা জৈনমূর্ত্তি বলিয়া স্থির করা সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নহে। এ চিত্রটি টি, গোপীনাথ রায় মহাশয়ের Iconography গ্রন্থে বর্ণিত মধ্যম ভোগস্থানক শ্রেণীর লক্ষ্মী ও পৃথ্বী দেবীর সহিত একত্র দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। কণার্ক মন্দিরের (plinth) পীঠভাগে গাছের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং ক্লোরাইট পাথরের সুন্দর চৌকাঠটির একাংশে মহালক্ষ্মীর শ্রীদেবীর মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে। গাছের ছবি থাকিলেই

যে তাহা বোধিদ্রুমের চিত্র হইতে হইবে তাহা নহে এবং খণ্ডগিরির জৈন ভাস্কর্য্যেও রেলিং-দিয়া-ঘেরা বৃক্ষাদির চিত্র দেখা যায়। মহালক্ষ্মী, শ্রী বা গজলক্ষ্মী (১) প্রভৃতি মূর্ত্তি বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দুগণের সাধারণ সম্পত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। (Mr. M. Chakravarty's Note on Dhaoli Udaygiri and Khandgiri-caves) সাঞ্চীস্তূপের মত খণ্ডগিরিতেও শ্রীমূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে, আবার পুরুষোত্তমে জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত লক্ষ্মী মন্দিরেও শ্রীমূর্ত্তি রহিয়াছে। ১৯০৪ সালের পুরাতত্ত্ব বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর মহোদয় উড়িষ্যার অপর অংশে অবস্থিত নরসিংহনাথ নামক মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য প্রণালী বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কণারক মন্দিরের জগমোহনের সহিত নবম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে নির্ম্মিত এ মন্দিরটির জগমোহনেরও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারও চৌকাঠ কাল পাথরের, সুন্দররূপে খোদাই করা এবং lintel বা সর্দ্দালের গাত্রে চামর-ধারিণী পরিচারিকাসহ পদ্মাসনা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি অঙ্কিত। দুইপার্শ্বে দুইটি গজ শুণ্ডের দ্বারা দেবীর মস্তকোপরি দুইটি কলস ধারণ করিয়া আছে। ডাঃ ভাণ্ডারকর Fergusson ও Burgess প্রণীত Cave-temples of India.. গ্রন্থের ৭১ পৃঃ ১নং প্লেট (ছবি) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কটকের প্রাচীন গুহায় ও দক্ষিণ উড়িষ্যার মন্দিরসমূহেও দ্বারদেশে যে "গজলক্ষ্মী"-মূর্ত্তি আছে, তাহা যে এ মন্দিরেও স্থান পাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? স্বস্তিক প্রভৃতি চিহ্নের ন্যায় শ্রীমূর্ত্তিও শুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই জন্যই মন্দিরাদির ভিত্তিগাত্রে বা দ্বার-দেশে তাহা খোদিত করার প্রথা। এ শ্রেণীর conventional design বা সর্ব্ব-জন-গৃহীত-রীতি কোন সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্য অনেকে উড়িষ্যার মন্দিরগুলির বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন, কণারকেও তাহার অভাব নাই। কেহ কেহ বলেন, এই বিকৃত রুচিপরিচায়ক মিথুন মূর্ত্তিগুলি বামমার্গাবলম্বী তান্ত্রিক মতের প্রবল প্রভাবের পরিচায়ক। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধগণ যাহাতে মন্দির-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে না চাহেন, সেই জন্যই এই সকল অশ্লীল চিত্রগুলি দেউল-বক্ষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাব-বাদীরা বলিয়া থাকেন যে এই সকল বিভিন্ন ভঙ্গীর যুগলমূর্ত্তি বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার মিলনের চিত্র। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে যে বজ্রপাতনিবারণার্থ মন্দির-গাত্রে মিথুন-মূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট করিবে। উৎকল-খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, "বজ্রপাতাদি ভীত্যাদি বারণার্থং যথোদিতং। শিল্পি শাস্ত্রেহপি মণ্যাদি বিন্যাসং পৌরুষাকৃতি॥" ইহার বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ অগ্নিপুরাণেও দেখা যায়, সৌধাদির শাখাশেষে

(১) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে গজলক্ষ্মী নামে পরিচিত মূর্ত্তিগুলি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "কমলাত্মিকা" মূর্ত্তি।

মিথুনমূর্ত্তি-সন্নিবেশ করিবার উপদেশ আছে। "মিথুনৈঃ পাদবর্ণাভিঃ শাখাশেষং বিভূষয়েৎ।" অগ্নি-পুঃ ১০৪-৩০। শ্রীযুক্ত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয় তাঁহার সিংহল ও ভারতীয় ললিতকলা বিষয়ক গ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (১) কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন, প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রানুযায়ী নবরসের চিত্রাদির মধ্যে আদি রসযুক্ত চিত্রগুলি "আদৌ" বলিয়া কিছু অধিক মাত্রায় স্থান পাইয়াছে। সে যাহা হউক ইহা যে বিশেষভাবে বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন, তাহা কখনই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। বিভিন্ন দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মমতাদি আলোচনা করিলে মনে হয়, পণ্ডিতবর Kraft Ebbing যথার্থই বলিয়াছেন; "Sexual feeling is really the root of all ethics and no doubt of æstheticism and religion." (Psycho-Sex. p. 2) মধ্য আমেরিকায় Stephens ও Catherwood সাহেবদ্বয়ের অনুসন্ধান-ফলে অনেক বৃহদাকার সৌধের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির কার্ণিশে ব্রীড়াজনক (membra conjuncta in coitu) চিত্রের অভাব নাই। (Squier's Serpent Symbol. p. 48) Westroph সাহেবও Panuco (পানুকো) প্রভৃতি নগরের মন্দিরে ও সাধারণ স্থানে লিঙ্গচিহ্ন খোদিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (Primitve Symbolism. p. 33) Squier এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে শৃঙ্গার ভাস্কর্য্যের ন্যায় এই যুগল মূর্ত্তি-গুলিতেও বিবিধ 'বন্ধ' প্রদর্শিত হইয়াছে (like those in India representing in various manners the union of the two sexes). মেক্সিকোতে সূর্য্যই প্রধান উপাস্য দেবতারূপে পরিগণিত হইত এবং এসিয়ার ন্যায় এখানেও সৌরোপাসনা লিঙ্গপূজার সহিত জড়িত ছিল। (Serpent Symbol p. 47). Dulaure পানুকো নগরে যে সকল খোদিত বা আলেখিত চিত্রাদি দেখিয়াছিলেন, Bertram সাহেব তাহার অনুরূপ চিত্রাদি Tlascalla নামক স্থানের দেবমন্দিরাদির (sacred edifices) গাত্রে অঙ্কিত দেখিতে পান। Tlascallar ক্রীক (Creek) জাতির মধ্যেও সৌরোপাসনা প্রবলভাবেই প্রচলিত ছিল; সুতরাং যে প্রভাব সার্ব্বভৌমিক, তাহাতে কেন যে ধর্ম্ম-বিশেষের মতবাদ আরোপিত হইবে, তাহাও বুঝিতে পারি না। শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ইতিহাস গ্রন্থের মুখবন্ধে মাননীয় স্যার জে, জি, উড্রফ মহোদয় লিখিয়াছেন, যে ডাক্তার মেটরলিঙ্ক গথিক্ গির্জ্জার (cathedrals) গাত্রে ও স্থানে স্থানে এরূপ চিত্রাদি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উড্রফ মহোদয় বলেন, শুধু ভাবপ্রবণতা বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে প্রাকৃত (natural) তথ্যের মীমাংসা হয় না। মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে যে কণারকের গর্ভগৃহস্থ সূর্য্য ও চন্দ্র-মূর্ত্তি রাজা

(১) "Such sculptures are supposed to be a protection against evil spirits and so serve the purpose of lightning-conductors" p. 190 foot-note.

পুরুষোত্তম দেবের পুত্র নরসিংহদেবের রাজত্ব-কালে পুরী বা পুরুষোত্তমে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণের সূর্য্য মন্দিরে যে মূর্ত্তি রহিয়াছে অনেকের মতে ইহাই সেই সূর্য্যমূর্ত্তি। ইহার সন্নিকটস্থ মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় বুদ্ধমূর্ত্তি বলিতে চান, কিন্তু Modern World পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হিমাংশু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবগ্রহ-প্রস্তর-নিহিত চন্দ্রমূর্ত্তির সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া এ মূর্ত্তিটিকে চন্দ্রমূর্ত্তি বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। কণারকে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রমূর্ত্তিও যে পূজিত হইত এ প্রবাদটিও ইহার পোষকতা করিতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সৌরোপাসনা (Heliolatry) ভারতে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই এবং পরে উহাই শিবোপসানায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল; যেহেতু সূর্য্য, শিবের আটপ্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তিরই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধপ্রভাব-বাদিগণ এই মতটি স্বপক্ষে প্রয়োগের সুবিধা বুঝিয়া ইহার সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন; কারণ সৌরোপাসনা যদি subsidiary cult বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বৌদ্ধমন্দির সৌরোপাসনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, এই মতটির সমর্থনেরও সুবিধা ঘটে। সৌরোপাসনা একসময়ে হিমালয় ক্রোড়স্থ কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড (১) মন্দির হইতে সমুদ্রতীরস্থ কোণার্ক পর্য্যন্ত বিস্তার

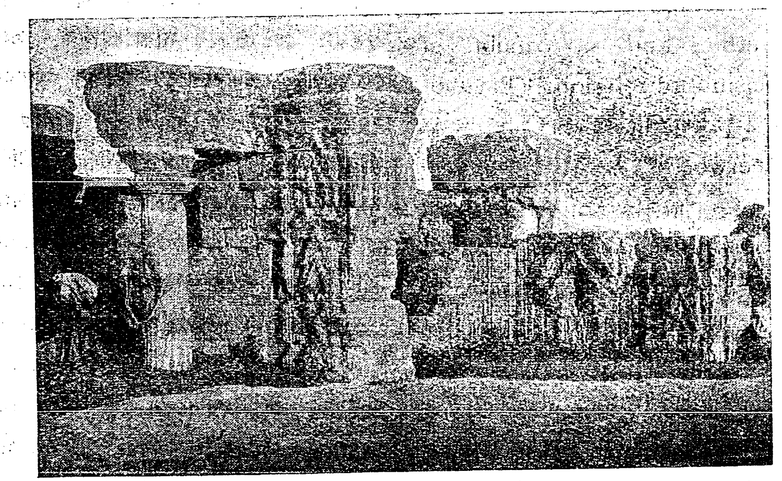

কাশ্মীর—মার্ত্তণ্ড-মন্দির

(১) মার্ত্তণ্ডমন্দির খৃ ৮ম শতাব্দীতে (৭২৪ হইতে ৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে) রাজা ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার gable, trefoil-arch, quasi-doric স্তম্ভশ্রেণী প্রভৃতির চিত্র দেখিয়া মনে হয় যে কোণার্ক মন্দির এ আদর্শে নির্ম্মিত হয় নাই। 'আইন-ই-আকবরী'র গ্রন্থকার আবুল ফজল বোধ হয় ভ্রমাত্মক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

লাভ করিয়াছিল। মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মধ্যভারতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সূর্য্য-মন্দিরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। (Report Arch. survey W. India Vol. IX p. 73-74) বঙ্গদেশেও সৌর প্রভাব বড় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেন-বংশীয় রাজা পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীমৎ কেশবসেন বা বিশ্বরূপ সেন আপনাকে "পরমসৌর" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। তাঁহার তাম্রলিপির প্রথম শ্লোকেই "নমো নারায়ণায়" শব্দের পরেই—

"বন্দেহরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকার
কারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুক্তিহেতুং"

প্রভৃতি বচনে সূর্য্য-বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। সূর্য্য-পূজা নারায়ণপূজায় কি শিবোপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা বিচার করিবার স্থান ইহা নহে, তবে এই শ্রেণীর শ্লোক ও সাধারণের মধ্যে "সূর্য্যনারায়ণ" প্রভৃতি প্রচলিত শব্দ হইতে সূর্য্যোপাসনা নারায়ণোপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার যাদুঘরে (মিউজিয়ম) রক্ষিত শিরোভাগে-পদ্মচিহ্নে-চিহ্নিত সূর্য্য-নারায়ণ-শিলা ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। কথিত আছে, মার্ত্তণ্ডমন্দিরে সূর্য্যমূর্ত্তিও বিষ্ণু নামেই স্থানীয় লোকের মধ্যে পরিচিত ছিল; (local name of Vishnu as Sun-God) কিছুকাল পূর্ব্বে ডাঃ ব্লক মালদহে একটি আদিত্যমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর একটি সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে অমর-কুণ্ডগ্রামের গঙ্গাদিত্য নামক অশ্বারূঢ় সূর্য্য-মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এ মূর্ত্তিটি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও স্থানে সূর্য্যমূর্ত্তি ষষ্ঠী প্রভৃতি নামে পূজিত হইতেছে। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চুঁচুড়ার সূর্য্য-মূর্ত্তি ৯৭ পৃষ্ঠা) পাটনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী পট্টনেশ্বরীর মন্দিরের বহিঃ-প্রাঙ্গণে একটি বৃহদায়তন সূর্য্যমূর্ত্তি রক্ষিত আছে দেখিয়াছি। ডাঃ ডি, আর ভাণ্ডারকর মহাশয় রাজপুতানা ভ্রমণ-প্রসঙ্গে সিরোহীর অন্তর্গত খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বসন্তগড়ের সূর্য্যমন্দিরের এবং যোধপুরের অন্তর্গত অসিয়া (Osia) নামক স্থানে অবস্থিত অষ্টম শতাব্দীর অপর একটি মন্দিরের বিবরণ (Progress Report Arch. Survey W. India 1905—6 p. 51—52) পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত করিয়াছেন। দুইটি মন্দিরই বহুল কারুকার্য্যে ভূষিত। যে সূর্য্য-পূজা এককালে এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা একবারে প্রভাবশূন্য subsidiary cult মাত্র হইলে কাশ্মীর হইতে মধ্যভারত পর্য্যন্ত কখনই এতগুলি সূর্য্য মন্দির নির্ম্মিত হইত না! কোণার্কের মন্দিরও যে সৌরোপাসনার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং এখানে সৌরোপাসনা যে রূপান্তরিত রথাকৃতি বৌদ্ধমন্দিরে পরগাছার ন্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া শৈবোপাসনায় পরিণত হয় নাই ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

কণারকের ভাস্কর্য্য-আলোচনা-কালে কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রাদির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন নাই। পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টাদিতেও ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও কণারকে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন মূর্ত্তি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। হ্যাভেল, ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয়গণও এ-সম্বন্ধে নীরব। তাঁহাদের ভাস্কর্য্য ও ললিতকলা বিষয়ক গ্রন্থাদিতে কণারকে বৌদ্ধপ্রভাব-সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র নাই। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচিত তথা-কথিত বৌদ্ধ নিদর্শনগুলিও বৌদ্ধপ্রভাবের নিঃসন্দেহ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং যতদিন প্রাচীন লিপি বা লেখ প্রভৃতি বিজ্ঞান-সম্মত প্রমাণ না আবিষ্কৃত হয়, ততদিন কোণার্কমন্দির বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট বা বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত বলিয়া বিবেচনা না করাই সঙ্গত।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

স্বরলিপি

গান

ওরে আমার, হৃদয় আমার
কখন তোরে প্রভাত কালে
দীপের মত গানের স্রোতে কে ভাসালে!
যেনরে তুই হঠাৎ বেঁকে
শুক্‌নো ডাঙায় যাস্‌নে ঠেকে,
জড়াস্‌নে শৈবালের জালে।

তীর যে হোথা স্থির রয়েছে
ঘরের প্রদীপ সেই জ্বালালো
অচল শিখা তাহার আলো
গানের প্রদীপ তুই যে গানে
চল্‌বি ছুটে অকূল পানে
চপল ঢেউয়ের আকুল তালে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II ম গা মা—পা। গা ধা—পমা I॥ মা ধা—া। ধা ধপা—র্সা I ধা র্সা
ও রে ০ আ মার ০ হৃ দয় ০ আ মার ০ ০ ০

র্স ধ স
পা।—া—ধা—পা I পর্সা র্সা—া। পা ধা—া I সা সা—া। রা রা
০ ০ ০ ০ ক খন ০ তো রে ০ প্র ভাত কা লে

ম
। I সা রা ।। গা গা—া I রা গা—া। মা পা—া I গা—া মা।
০ দী পের ০ ম ত ০ গা নের ০ স্রো তে ০ কে ০ ভা

ম ধ
পা ধা—া I না—া না। না না—া I র্সা—া—।—া । । II
সা লে ০ কে ০ ভা সা লে ০ ০ ০০ ০ ০ ০

ধ র্স র্স ণ
II র্মা র্মা—র্গা। র্রা র্সা । I না র্সা—া। না সা—পা I ধা পা—
যে ন ০ রে তুই ০ হ ঠাৎ ০ বেঁ কে ০ বেঁ কে

ধ প
ধা। পা পধা—পা I ধা—া ।।—।—।—। I পা—র্রা র্সা। পা ধা
০ বেঁ কে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ শুক্ ০ নো ডা ঙায়

ম ম ম
পমা I গা—া মা। গা মা—া I গা মা—া। গা মা—া I পা ধা
০০ যাস্ ০ নে ঠে কে ০ জ ড়াস্ ০ নে শৈ ০ বা লের

র্স র্স
। । না র্সা—া I না র্সা—া। না র্সা—া II সা—া সা। রা গা—া I
০ জা লে ০ জা লে ০ জা লে ০ তীর ০ যে হো থা ০

ধ ম ধ
I মা—ধা পা। গা মা—া I মা মা—পা। পা পা—া I পা ।—ধা।
স্থির ০ র য়ে ছে ০ ঘ রের ০ প্র দীপ ০ সেই ০ জ্বা

ণ ধ র
ধা পধা—পা I ধা ।—া। —।—।—। I মা মা—ধা। পা মা—গা I সা
লা লো ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ অ চল ০ শি খা ০ তা

ধ র্স
রা গা। গা মা । I র্মা র্মা র্গা। র্রা র্সা—া। না—া র্সা। । ।
হার ০ আ লো ০ গা নের ০ প্র দীপ ০ তুই ০ যে ০ ০

র্স র্স র্স ণ
। I র্মা র্মা—র্গা। র্রা র্সা—া I না ।—র্সা I না সা—পা I ধা পা
০ গা নের ০ প্র দীপ ০ তুই ০ যে গা নে ০ গা নে

ধা । পা পধা ণা। ধা—।—।। । । I ণা—র্রা র্সা। ণা ধা—
০ গা নে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ চল্ ০ বি ছু টে

পমা I গা মা—।। গা মা—। I গা মা—।। গা মা—।। পা ধা—।
০০ অ কূল ০ পা নে ০ চ পল ০ ঢেউ য়ের ০ আ কুল ০

না র্সা—। I না র্সা—।। না র্সা—। II II
তা লে ০ তা লে ০ তা লে ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আঁধিয়া

(গল্প)

আমার এই দুঃখের কাহিনী কাউকে শোনাব বলে' যে লিখতে বসেছি তা নয়। আমার মনের কথা মুখ-ফুটে বলতে না পেরে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দুঃখের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দুঃখ যে দূর হয়না তা সবাই জানে, কিন্তু তবু মানুষ চুপ করে থাকতে পারেনা। আমার কাছে যে কেউ নেই! কাকে বলি? তাই আপনার মনে নিজের কাহিনী লিখতে বসেছি।

মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন উৎসবের একটা ঝট্‌কা বাতাস নিয়ে শ্বশুরবাড়ী প্রবেশ করেছিলুম, শাঁখ, ঢাক, শানাইয়ের আওয়াজ আর চেঁচামেচির মধ্যে আমাকে বরণ ক'রে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আমায় ঘরে তুলে নিলে। আমাকে দেখে আমার শাশুড়ীর পছন্দ হল, তিনি বল্‌লেন, বেশ বৌ হয়েছে—চির-এয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাক।

আমার স্বামী আমার বিবাহে একটি পয়সাও নেননি; আর একটি পয়সাও না নেবার মতন লোক এতদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি বলেই ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে থুবড়ো-আইবুড়ী থাকতে হয়েছিল।

আমার নাম সুরবালা; বাবা আমায় সুরো বলে ডাকতেন। আমি তাঁর বড় আদুরে মেয়ে ছিলুম। বাপের বাড়ী বাবার সঙ্গে-সঙ্গেই গিয়েছে,—এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমার শ্বশুরবাড়ী বল্‌তে কিছু আছে কি না?

ছেলেবেলাতেই মা মারা গিয়েছিলেন। তাঁর কথা আমার মনে পড়ে না, বাবা একলাই দুজনের স্থান অধিকার করে আমায় মানুষ করছিলেন। তিনি সরকারী চাকরী করতেন; কখনো এখানে, কখনো সেখানে—এমনি করে তাঁকে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে হত। আমাকে ছেড়ে তিনি থাকতে

পারতেন না। তাঁকে ছেড়েও আমি থাকতে পারতুম না। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমাকেও ঘুরতে হত। চাকরী করা ছাড়া তাঁর একমাত্র কাজ ছিল আমায় লেখাপড়া শেখানো আর টাকা জমানো। তিনি বলতেন, "সুরো, তোর এমন জায়গায় বিয়ে দেবো যে—"

বাবার সদা-সহাস্য মুখের সেই কথাগুলো আজও মাঝে-মাঝে মনে পড়ে আর হাসি আসে।

জীবনের ধারা এইরকম শুভ্র, স্বচ্ছ, তরঙ্গহীন গতিতে বেশ একটানা বয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঘটনায় বিপরীত তরঙ্গ ছুটল।

একদিন বাবা আফিস থেকে ফিরে আসবার পর, রোজ যেমন যাই তেমনি হাসিমুখে তাঁর কাছে ছুটে গেলুম। দেখলুম তাঁর মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ, চোখদুটো লাল হয়ে রয়েছে। আমার হাতদুটো তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি গুমরে কেঁদে উঠে বললেন,—সুরো আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে মা—

জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে-ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা থাকত সেটা ফেল হয়ে গিয়েছে। তাঁর অনেক কষ্টে জমানো টাকা-গুলোর একটা পয়সাও ফিরে পাবার আশা নেই।

তাঁর চোখের জল জীবনে সেই একদিন মাত্র দেখেছি। এর আগে তাঁকে কখন সামান্য বিষণ্ণ হতেও দেখিনি। আমি চিরদিন হাসতেই দেখেছি,—খালি হাসি আর হাসি। এই হাসির আবহাওয়াতেই আমি মানুষ হয়ে উঠেছিলুম, চন্দ্রসূর্য্য, রাত্রিদিন, আকাশ-পৃথিবী চিরকালই আমাকে সহাস্য মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়ে এসেছে, দুঃখের সঙ্গে, কান্নার সঙ্গে আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। সেদিন বাবার চোখে জল দেখে আমার মনে কি ভাব এসেছিল এত দিন পরে ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারব না, তবে এই ছবিটা এখনো মনে আছে যে আমি যেন দেখতে লাগলুম তাঁর চোখের জলে আমার সেই হাসির রাজ্যটা ভাসতে ভাসতে দূরে মিলিয়ে গেল;—উপরের নীল আকাশ এমন গাঢ় হয়ে এল যে সে অন্ধকার ভেদ করে কাউকে চিনতে পারবার যো রইলনা, আর সেই অনন্ত অশ্রু-পারাবারের মধ্যে আমি একা—

ওঃ, মানুষের চোখে এত জলও থাকতে পারে!

সমস্ত রাত্রি ভাবনায় কেটে গেল, সে কত-রকমের ভাবনা! একটা থেকে আর একটা, আবার সেটা শেষ হবার আগেই আর-একটা, এমনি করে যেন একটা চিন্তার পৃথিবী আমার মাথার ভিতর পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আপন-হারা হয়ে বসেছিলুম, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই চমকে উঠলুম! মনে হল, সামনে থেকে কে যেন সরে গেল।

তখন বুঝতে পারিনি, সে কে? আজ মনে হয় সর্ব্বনাশের দূত এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছিল, শুধু বাবার জন্যে সে সাহস করে ঢুকতে পারেনি।

তখনো একেবারে ফর্সা হয় নি, মুমূর্ষু রাত্রির প্রাণটা তখনো আলো-ছায়ার একটা

সূক্ষ্ম রেখার উপর দোল খাচ্ছে, অবশ পা-দুটোকে কোনরকমে সোজা করে সে দুটোর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি, সামনে বাবা দাঁড়িয়ে।

তিনি বললেন—সারা রাত্রি জেগে এখানে বসে আছিস মা?

আমি আর কোন কথা বলতে না পেরে তাঁর বুকে মুখ রেখে কাঁদতে লাগলুম।

তিনিও আমায় জড়িয়ে ধরলেন; একটা কথা কানে গেল—"টাকাগুলো গেল বুঝি! তোর উপায় কিছু করে যেতে পারলুম না।"

কিছুক্ষণ পরে একটা আশীর্ব্বাদী চুমু আমার মাথার উপর দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন বাবা অফিসে গেলেন, বুঝতে পারিনি এই যাওয়াই তাঁর শেষ-যাওয়া। বিকেলবেলায় অফিসের লোকেরা তাঁকে কোলে করে বাড়ী নিয়ে এল, শুনলুম, তাঁর মূর্চ্ছা হয়েছে। ডাক্তার ডাকা হল। তিনি বললেন এ মূর্চ্ছা ভাঙবে না, আত্মীয়-স্বজন যদি কেউ থাকে ত এইবেলা খবর দিন, বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টার বেশী বাঁচবেন না।

সর্ব্বনাশ এত কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায় অথচ মানুষ তার গন্ধও পায় না!

* * * *

মামার বাড়ীতে আমায় বেশী কষ্টভোগ করতে হয়নি। প্রথমটা একটু কষ্ট মনে হত। তার কারণ কষ্ট কাকে বলে এর আগে একেবারেই জানা ছিল না, আজকের হিসেবের খাতায় সে দিনগুলোর সুখ-দুঃখের জমা-খরচ খতিয়ে দেখলে দেখতে পাই তখন সুখের মাত্রাই বেশী ছিল।

মামা আমার আপনার মামা নন, মার মাসতুত ভাই। বাবার মৃত্যুর আগে তাঁকে আমি বার-কয়েক দেখেছিলুম মাত্র। তাঁর সঙ্গে বাবার পত্র-ব্যবহার চলত। তিনি আমায় নিয়ে এলেন।

তিনি বেশ দিলখোলসা লোক ছিলেন। সামান্য চাকরী করতেন, যা মাইনে পেতেন তাতে কোনরকমে সংসার চলে। তার উপর আমার মত একটা ধাড়ী মেয়েকে এ-রকম ভাবে আশ্রয় দিয়ে ঘরে নিয়ে আসাতে মামী আমাকে সুনজরে দেখতে পারলেন না। কিন্তু ক্রমে সেটাও আমার সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

মামার বাড়ী আসার মাস কয়েক পরে প্রায় বছর দুই ধরে আমার জন্যে তাঁদের বড় অশান্তিতে কাটাতে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে আমার বিবাহ নিয়ে। টাকা না পেলে কেউ বিয়ে করতে চায় না! মামা মনে করেছিলেন, সুন্দরী মেয়ে, টাকা না হলেও চলবে, কিন্তু সুন্দরী মেয়ের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর অর্থের জোগাড় করতে না পারলে যে পাত্রের অভিভাবকের মন টলে না, এই অভিজ্ঞতাটা তাঁর আমার উপর দিয়েই হয়ে গিয়েছিল।

মামীর তাড়না আর গঞ্জনা সহ্য করতে করতে তিনি অস্থির হয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু এত অশান্তির মধ্যেও তাঁকে একটা কটু কথা বলতে শুনিনি। ধন্য তাঁর ধৈর্য্য! পরের মেয়ের জন্য এতটা সহ্য করতে পারে, এ-রকম লোকও দুর্লভ নয়।

তারপর সেইদিন সত্যি সত্যিই এল। শুনলুম, আমাকে দেখে একজন পছন্দ করেছেন। তিনি এক পয়সাও চান না, তাঁর অবস্থা ভাল, হাতে শুধু দুগাছা রুলি পরিয়ে নিয়ে যাবেন।

যখন এই খবর পেলুম, শুনলুম তিনি এক পয়সাও নেবেন না, শুদ্ধ আমাকেই চান, তাঁর দামটা আমার এই নিঃস্ব মামা বেচারাকে দিতে হবে না, কৃতজ্ঞতায় প্রাণটা তখন কানায় কানায় ভরে উঠল। মনে মনে তাঁকে নতি জানিয়ে বললুম—কে তুমি শুকতারার মত আমার দুঃখের রাত্রিতে এসে দেখা দিলে? তোমায় চিনিনা আমি, কিন্তু তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আমি পেয়েছি। হে দেবতা, আমায় নিয়ে যাও তুমি তোমার মন্দিরে, বড় দুঃখী আমি, ভালবাসার কাঙাল আমি—আমায় ভালবাসো।

আনন্দের আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়লুম। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, তন্দ্রা, নিদ্রার মধ্য দিয়ে কেমন করে কেটে গেল বুঝতে পারলুম না। সকালে উঠে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে সংসারের কাজে লেগে গেলুম।

স্বামীকে দেখলুম। তিনি পরম রূপবান না হলেও সুশ্রী বটে! ফুলশয্যার দিন তাঁর সঙ্গে প্রথম কথা হল। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে কথা, সে—যাক্, সেদিনকার কথা আর তুলব না।

শ্বশুরবাড়ী যখন এলুম, তখন প্রকৃতির বীণায় বসন্ত-রাগিণীর পুরোদমে মহড়া চলেচে! গাছে গাছে, ফলে ফুলে, পাখীর ডাকে বাইরে যেমন একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল, বাড়ীখানাও তেমনি নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়ার গোলে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল।

ঘর আর বাহির দুইয়ে মিলে আমায় অভিষেক করে সেবারকার বসন্তের রাণী বলে ঘরে তুলে নিলে।

শ্বশুরবাড়ীতে আমার পদার্পণের পর বাড়ীর চেহারা ফিরে গেল। আমার শাশুড়ী অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন; শুনলুম বিধবা হওয়ার পর তাঁর মুখে কেউ হাসি দেখেনি, আমি বাড়ী আসার পর তাঁকে সবাই হাসতে দেখলে!

আমার স্বামী সদা-প্রফুল্ল লোক। আনন্দের আস্বাদন আমি জীবনে এই যে প্রথম পেলুম তা নয়, কিন্তু এ যেন নতুন রকম! সামান্য সামান্য ঘটনা আমার প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের ঝড় তুলে দিয়ে যেত। বাতাস লাগলে আমার পা-থেকে মাথার প্রত্যেক চুলের গোড়াগুলো অবধি শিউরে উঠত। ফুলে এত রংয়ের বাহার, এতদিন ত লক্ষ্য করিনি! দীঘির জল এমন টলটলে জীবনে এর আগে ত তা দেখিনি! সন্ধ্যায় দিগন্তের ধার ঘেঁসে দিনের তরী সোনালি পাল উড়িয়ে অস্ত-অচলের উদ্দেশে চলে যেত, শুক্ল চতুর্দ্দশীর নিটোল গোল চাঁদখানা আমাদের কালো আয়নার মত দীঘিটার বুকের উপর পড়ে নির্জ্জনে নীরব প্রেমালাপ আরম্ভ করত, আমি আত্মহারা হয়ে দেখতুম, আর মনে হত ঠিক এমনধারা ত এর আগে কখনও দেখিনি!

আনন্দের প্রবাহ আমার মধ্যেই যে শুধু প্রবাহিত হচ্ছিল, তা নয়, দেখলুম আমাকে ছাড়িয়ে সেটা গ্রামময় তার রঙিন নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে।

বিকেলবেলায় আমি গা ধুয়ে ছাদের উপর অনেকক্ষণ বেড়াতুম। একদিন দেখি সামনের বাড়ীর একটা ছেলে আমাকে দেখচে। একটু লক্ষ্য করে বুঝলুম আমি যেন তাকে না দেখতে পাই এমনিভাবে একটা জানলার আড়ালে সে দাঁড়িয়েছে। সেই ম্যালেরিয়া-জীর্ণ চেহারাটা দেখে আমার মায়া হতে লাগল। সে কতদিন যে স্নান করেনি তার ঠিকানা নেই; হাঁ করে তন্ময় হয়ে আমাকে দেখছিল। দুই একদিন বাদে দেখলুম ছেলেটা স্নান করতে সুরু করেছে। আবার কিছুদিন পরে সেও আমার মত ছাদে বেড়াতে আরম্ভ করে দিলে। তার সেই শূয়ার-কুচি চুলে বেশ করে তেল দিয়ে টেরি বাগানো আর গুণ-গুণ করে গান গেয়ে ছাদে বেড়ানো দেখে আমার হাসি পেত।

বাড়ীর পিছনদিকে আর-এক জনেরা থাকত। সে-বাড়ীরও একটা ছেলে হঠাৎ সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করলে। বাপ্ রে বাপ, সে স্বর-সাধনা মনে পড়লে আজও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! দিনরাত্রি জানলার ধারে বসে হারমোনিয়ামে গলা ভাঁজা। নিশ্চয়ই বলতে পারি, যদি তার সাধনা সেই রকম ভাবে চলে থাকে তবে এত দিনে নিশ্চয় সে একজন গুরুগম্ভীর ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

রাস্তার ধারে একটা জানলা ছিল, আমি মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতুম। কিছু-দিন যেতে না যেতে দেখি পাড়ার লোক-গুলো জানলা-মুখী ব্রত নিলে। এমন তাদের তন্ময়তা যে একদিন সত্যিই একটা লোক গাড়ী চাপা পড়ে প্রাণটা হারাবার যো করেছিল। কিন্তু তবুও বিরাম নেই। উঃ, কী গভীর সাধনা!

কেউ কেউ বেশী সাহসী হয়ে মাঝে মাঝে জানলার ধারে এসে শিষও দিত। প্রথম প্রথম এদের ব্যাপার দেখে আমার বেশ মজা লাগত, কিন্তু ক্রমেই সেটা অসহ্য হয়ে উঠল। একদিকে সেই কদাকার চেহারাটার দিনরাত উঁকি-ঝুঁকি, পিছনদিকে সুর-সাধনার সেই বিকট চীৎকার, আর সাম্‌নে রাস্তার ধারে জানলার কাছে লোকের ভিড় দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। ক্রমেই তারা বেশী সাহসী হয়ে উঠতে লাগল। আমার ইচ্ছে হত বাইরে গিয়ে সব কটাকে ধরে আচ্ছা করে কান মলে দিয়ে আসি। কিন্তু আমার ত বাইরে যাবার উপায় নেই, আমি যে কুলবধূ!

ঘরের চারদিকের জানলাগুলো আমি দিনকয়েক বন্ধ করে রেখে দিলুম। একদিন আমার স্বামী বললেন, জানলাগুলো বন্ধ রেখে কি দম আটকে মারবে!

জানলা বন্ধ করার কারণ শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর সেই হাসিতে আমি থতমত খেয়ে কিছু বলতে পারলুম না। তিনি নিজের হাতে জানলাগুলো খুলে দিয়ে, আমায় একটা জানলার ধারে বসিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

আমাদের কয়েক ঘর সরিক ছিল, কিন্তু বিনোদ ছাড়া আর-কারো সঙ্গে আমার স্বামীর তেমন বনিবনাও ছিল না। সে সম্পর্কে তাঁর ভাই। বয়স দুজনের প্রায় সমান। বিনোদ যখন-তখন আমাদের বাড়ী আসত। বৌভাতের দিন থেকেই সে আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখাতে লাগল। আমি তার সামনে প্রথমে ঘোমটা খুলতুম না। সে একদিন আমার স্বামীকে বল্লে—"দাদা, বৌদি যদি অমন করে মুখ ঢেকে থাকেন, তাহলে আমি তোমার ঘরে আর আসছি না।" স্বামী একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে ঘোমটা খুলতে বললেন। আমি তাঁর ইচ্ছায় ঘোমটা খুললুম, কিন্তু বিনোদের চোখের দৃষ্টি আমার ভাল লাগল না। ইচ্ছে হচ্ছিল আবার ঘোমটাটা টেনে দিই কিন্তু তাহলে স্বামীর মান থাকে না, তাই ঘোমটা খুলেই রইলুম। বিনোদকে দেখে আমার মনে হতে লাগল, স্বামীর পাশে সে যেন একটা কীটাণুকীট!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যাকে সংসারে অতি তুচ্ছ বলে জানলুম, সেই আমার সব চেয়ে বড় শত্রু হল!

স্বামীর আজ্ঞাতেই বিনোদের সঙ্গে আমি কথা বলতেও সুরু করলুম। কথা আমি কইতুম না, কিন্তু দেখলুম তা না হলে স্বামীর আঁতে ঘা লাগে। আমাদের বাড়ীর কেউ বিনোদকে ভাল চোখে দেখত না, সবাই সন্দেহ করত যে আমার স্বামীটিকে কোন্‌দিন বা সে অধঃপাতে টেনে নিয়ে যায়। সেইজন্য সবাই তাকে ভয় করত, ঘৃণাও করত। আমাদের বাড়িতে তার এই অনাদরের জন্য স্বামীর মনে ভারি একটা ক্ষোভ ছিল। আমিও যদি তাঁর বিনোদকে অবহেলা করতে সুরু করি তবে সেটা তাঁর বুকে খুবই বাজবে, আমি বুঝলুম। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"বিনোদের উপর তোমার এত দরদ কেন? ও কি তোমার যোগ্য?" স্বামী বললেন—"দেখ সুরো, ও লক্ষ্মীছাড়া আমি জানি। কিন্তু ও যে আমার আশ্রয় নিয়েছে। ও বলে, ওর স্বভাবের জন্যে সবাই ওকে ত্যাগ করেছে, এখন আমিও যদি ত্যাগ করি তাহলে ও অধঃপাতের অতলে একেবারে তলিয়ে যাবে। ওর বিশ্বাস, আমাকে অবলম্বন করেই ও উঠে দাঁড়াবে।"

আমার স্বামীর এই দয়া দেখে আমার সমস্ত হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল। আমার মনে হল আমার এমন স্বামী—তাঁর কাজে আমি প্রতিবন্ধক হব?

বিনোদের সঙ্গে আমার এতটা ঘনিষ্ঠতা আমার শাশুড়ীর চোখে ভাল ঠেকেনি। তিনি মধ্যে-মধ্যে রাগ করে বকতে লাগলেন। শাশুড়ীকে অমান্য করবার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিতেও আমার প্রাণ কেঁদে উঠত। বিনোদকে নিয়ে আমি মুস্কিলে পড়লুম।

এ ছাড়া আরও মুস্কিল ছিল এই যে বিনোদের হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগত না। তাকে দেখলে মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা ঘিন্‌ঘিনে ভাব আমাকে পীড়া দিত। ঠাট্টার সম্পর্ক বলে সে সময়-সময় যে রকম ঠাট্টা করত তাতে

তার মুখদর্শন করা উচিত ছিলনা, এবং তার এমন-একটা গায়ে-পড়া স্বভাব ছিল যার জন্য তার কাছ থেকে চলে যাবার জন্যে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। ভাবতুম স্বামীকে সব খুলে বলি। মনে-মনে কথাটা নিয়ে তোলাপাড়া করতুম, তারপর সাজিয়ে-গুছিয়ে কথাটা যা দাঁড় করাতুম তা মনের মধ্যে আবৃত্তি করে এমন জঘন্য শোনাত যে স্বামীর সামনে তা বলতে পারতুম না। তিনি কি এ-সব বুঝতেন না? কে জানে? হয়ত পুরুষ-মানুষ বলে' আমাদের এই নারীবৃত্তি-গুলো অনুভব করবার শক্তি তাঁর ছিলনা। আমি তাঁকে একদিন বললুম—"দেখ, বিনোদ একটু বাড়াবাড়ি করচে না?" স্বামী আমার কথাটা বুঝলেন কি না জানিনা, তিনি সহজভাবে বললেন—"দেখ সুরো, বিনোদ বাড়াবাড়ি করে' করবে কি? তুমি যদি খাঁটি হও তাহলে দুনিয়ায় ভয় কাকে? তোমায় আমি বিশ্বাস করি। কাজেই বিনোদ কেন, বিনোদের চেয়ে সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর রাক্ষসকেও আমি ডরাই না।"

স্বামীর এই কথায় আমার মনের সমস্ত কুয়াশাটা যেন একমুহূর্ত্তে কেটে গেল। নিজের মধ্যে একটা শক্তির চেতনা অনুভব করতে লাগলুম। সত্যিই ত, আমি যদি খাঁটি হই ত ভয় কাকে! তারপর, আমার উপর স্বামীর কি প্রগাঢ় বিশ্বাস! আত্ম-অভিমানে আমার সমস্ত হৃদয় ফুলে উঠল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলুম—হে ভগবান, স্বামীর এই বিশ্বাস যেন চিরদিন অটুট রেখে মরতে পারি, আমাকে এই বর দাও।

আমার স্বামী তখন বাড়ী ছিলেন না, জমিদারীর কাজে তাঁকে বিদেশে যেতে হয়েছিল। তাঁকে বছরের মধ্যে বার-দুই এমনি করে বাইরে যেতে হত। হাতে কোন কাজ নেই, তিনি বাড়ী নেই, তাই ঘরে যাবারও তাড়া নেই। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে ছাদের উপর একটু বেড়াতে গেলুম।

সেদিন চাঁদ তার ফিরোজা রঙের ঘোমটাখানা দূরে ফেলে দিয়ে মনের আনন্দে তার সমস্ত কিরণ-কণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। পৃথিবী তারই পেলবস্পর্শ আরামে অবশ হয়ে উপভোগ করছিল। বাগানে বড় বড় গাছ আর কামিনীফুলের ঝাড়গুলো পাতায় পাতায় রূপালী দেয়ালী সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সেইগুলোর পাশে পাশে রোগা, মোটা নানান আকারের এক-একটা অন্ধকার দৈত্য উপুড় হয়ে বসে আছে—এক-একটা রাজ্যহীন রাজার মত।

চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, কোথাও একটু আওয়াজ নেই, আমি তন্ময় হয়ে চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের এই খেলা উপভোগ করতে লাগলুম।

হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া কোথা থেকে দৌড়ে এসে এই আধ-ঘুমন্ত পৃথিবীর মাথাটা ধরে বেশ জোরে একটা নাড়া দিয়ে তাকে সজাগ করে তুলে পালিয়ে

গেল। বড় বড় গাছগুলো মাথা নাড়া দিয়ে তাদের মর্‌মর্‌ ভাষায় একবার একটা আর্ত্তনাদ করে উঠল। মনে হল তাদের পাতার রূপোর প্রদীপগুলো পিছলে মাটির উপর গিয়ে পড়ল, ঝোপ-ঝাড়ের পাশে পাশে যে বিকটাকার দৈত্যগুলো এতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল কার ইঙ্গিতে সে-গুলো তাড়াতাড়ি উঠে একবার এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে আবার একজায়গায় স্থির হয়ে গিয়ে বসে পড়ল। রাত্রির সে নিস্তব্ধ ভাবটা আর ফিরে এল না। হঠাৎ এই রকমভাবে তার শান্তি ভঙ্গ হওয়াতে সে আর স্থির হতে পারলে না। আমি এতক্ষণ আনন্দে যে দৃশ্য দেখছিলুম তার পট পরিবর্ত্তন হওয়াতে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল, নীচে নেমে এলুম।

শোবার ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে বিছানার কাছে গিয়ে দেখি খাটের উপর মনুষ্যমূর্ত্তি! ঘরের মধ্যে মিট্‌মিট্‌ করে প্রদীপ জ্বলছিল। আমি ভয়ে এমন কাঠ হয়ে গেলুম যেন মাটির সঙ্গে আমার পা দুটো একেবারে গেঁথে গেল! আমার শোবার ঘরে স্বামীর লোহার সিন্দুক থাকত, তাতে জমিদারী থেকে টাকা এলে জমা হত। তিনি এবার জমিদারী থেকে যত টাকা পাঠাচ্ছিলেন আমি গুণেগেঁথে তার মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলুম। তিনি ফিরে এলে হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার সবপ্রথম নজর পড়ল সেই লোহার সিন্দুকের দিকে। দেখলুম, সেটার গায়ে এখনো হাত পড়েনি। এখনো সময় আছে ভেবে আমি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে চোর-চোর বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। লোকটা ছুটে এসে দরজা চেপে দাঁড়াল। তার মুখ দেখতে পেলুম—সে বিনোদ!

আমি অবাক হয়ে গেলুম। তাকে বললুম, "তোমার দাদা ত এখানে নেই—তুমি এত রাত্রে কেন?" বিনোদ হাসতে হাসতে বললে—"তোমার কাছে এসেছি।" আমি রেগে বললুম—"যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" সে এমন একটা কথা বললে যাতে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল। আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম—"পথ ছাড়, আমি বেরিয়ে যাই।"

বিনোদ দরজার গায়ে সজোরে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে পদাঘাতে ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। কিন্তু সেই অন্ধকারে তার চোখদুটো হিংস্র পশুর চোখের মত এমন ভয়ঙ্কর জ্বলছিল যে তার কাছে যেতে আমার ভয় করতে লাগল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাকে যতই দেখতে লাগলুম ততই একটা আতঙ্ক আমার সর্ব্বশরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাঘের সামনে পড়লে মানুষের কেমন ভয় হয় জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এ ভয় যেন সেইরকমের! প্রাণ-সংশয় হলে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের মন যেমনধারা হোক একটা অস্ত্রের জন্যে যেমন লোলুপ হয়ে ওঠে, আমিও অন্তর থেকে তেমনি একটা তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠলুম। দেয়ালে স্বামীর অনেকগুলো ছোরা-ছুরি টাঙানো ছিল। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়াতে আমি একখানা বড় ছোরা টেনে নিলুম।

ছোরাখানা হাতে পেয়ে মনে হল, একা

বিপদের মধ্যে, যেন হঠাৎ কোন আত্মীয় বন্ধুর দেখা পেলুম—মনটা একটু আশ্বস্ত হল।

আমি এবার খুব জোরের সঙ্গে বললুম—"যাও ঘর থেকে বেরিয়ে।"

বিনোদ হাসতে হাসতে বললে—"এরি মধ্যে যাব কি?"

আমি রেগে ছোরাখানা হাতে করে উঠে দাড়ালুম। তবু তার ভয় হল না, সে বললে—"জীবনে অমন ছোরা-হাতে মেয়ে-মানুষ ঢের দেখেছি।"

আমার ইচ্ছে হল এখনি ওর গায়ে ছোরাটা বসিয়ে দিই। কিন্তু হাত উঠল না। সে বোধ হয় আমার দুর্ব্বলতা বুঝতে পারলে। ধীরে ধীরে সে হাত-দুখানা বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার সেই বিশ্রী ভঙ্গী দেখে আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে যে কেমনধারা একটা ঝড় উঠল বলতে পারি না। আমার মনে হল এই ঝড়ে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা প্রলয় হয়ে গেল। তারপর আমি কি করলুম, কি না-করলুম কিছুই মনে নাই। কেবল মনে আছে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুর্ণির মধ্যে আমার হাত-পা মাথা চোখ সব ঘুরছে।...

সকালে যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি, বিনোদের দেহের রক্তের উপর আমি পড়ে আছি।

* * * *

হাজতে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এল না। মনে করেছিলুম, আমার স্বামী বোধ হয় ঠিক সময়ে ফিরতে পারেন নি, কিন্তু পরে জানলুম, তিনি এসেও আমার জামিনের জন্য চেষ্টা করেন নি।

বিচারে আমি বেকসুর খালাস পেলুম।

তখন শীত পড়েছে, বেলা ছোট। আদালত ভাঙ্‌বার পরেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আমি ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম, সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে, কি জানি কেন, সাহস হল না, বাগানের খিড়কী দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লুম। তখন অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে, আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় একটা ছোট কেরাসিনের আলো জ্বলছিল। ঝীর নাম ধরে ডাকলুম, কারো সাড়া পেলুম না! বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করচে। আরও দুই-তিনবার ডাকাডাকির পর ঝী ঘর থেকে বেরিয়ে এল, শুনলুম বাড়ীতে কেউ নাই, আমার শ্বাশুড়ী তাঁর বাপের বাড়ী চলে গেছেন। স্বামীও নিরুদ্দেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন?"

সে বল্লে—"লোকনিন্দের ভয়ে। তুমি যে কাণ্ড করেচ তাতে কি আর দাদাবাবুর মুখ দেখাবার যো আছে! চারদিকে একেবারে ছি ছি!"

আমি ঝীর কথা কানে তুললুম না। আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু সে ঝী, তাকে কি বলব? তার টিট্‌কারি আমি গ্রাহ্য করলুমনা। কারণ আমার মন এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও একটি আশার প্রদীপকে তখনো জ্বালিয়ে রেখেছিল। "আমি যদি খাঁটি থাকি তবে ভয় কিসের!"—স্বামীর সেই মন্ত্র, শুধু তখন

কেন,—এ-জীবনেই যে ভুলতে পারিনি। ভগবানের কাছে যে-বর চেয়েছিলুম তা ত তিনি পূর্ণ করেছেন—স্বামীর বিশ্বাসের উপর ত এতটুকু আঁচ লাগতে দিইনি! তবে আমার ভয় কিসের?

আমি জোর করে বললুম—"আমার ঘরের দরজা খুলে দে!"

দাসী বললে—"ঘরের চাবি ত আমার কাছে নেই।"

আমি বললুম—"তবে আমি থাকি কোথায়?"

দাসী বেশ একটু রুক্ষ স্বরে বল্‌লে—"থাকতে যদি চাও তবে বাগানের মধ্যে আমার এই খোড়ো ঘরটাতে থাক।"

আমি তখনকার মত সেই ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু আমার স্বামী গেলেন কোথা? দিনের পর দিন যায় তাঁর দেখা পাই না কেন? তাঁকে না দেখতে পেয়ে আমার প্রাণ যে আকুল হয়ে উঠল। বাগানে বসে-বসে ঐ শূন্য বাড়ীখানার দিকে চেয়ে কত কথাই ভাবতুম। ঐ ঘর শূন্য করলে কে? কতবার এ প্রশ্ন মনে উঠেছে। কিন্তু এর কোনো জবাব খুঁজে পাই নি।

এই বিজন-বাসে কারো দেখা পেতুম না, কেউ আমার কাছে আসত না, তার জন্যে আমার কোন দুঃখ ছিলনা। কিন্তু স্বামীর দেখা পাচ্ছি না এ যে অসহ্য বেদনা! আমি কেবল তাঁরই প্রতীক্ষা করতুম। কেবলি মনে হত—কেন তিনি আসচেন না?—কেন আসচেন না!

তারপর শীতের শেষ-দিনগুলো বসন্তের গায়ে ঢলে পড়ল। প্রকৃতির মহলে মহলে একটা প্রকাণ্ড উৎসবের আয়োজন পড়ে গেল। চারিদিকেই আনন্দ, কেবল দখিনের বাতাস আমাদের বন্ধ বাড়ীখানার কাছে এসে গুম্‌রে উঠত।

এমনি একটা দিনে দেখলুম আমার ঘরের জানলা খোলা হয়েছে। আমি আর চুপ-করে বসে থাকতে পারলুম না। বাড়ীর ভিতরে যাবার খিড়কীর কাছে ছুটে গেলুম। আশ্চর্য্য, সেখানে ত দরজা নেই। ভুল হয়েছে ভেবে মনের আবেগে পাঁচিলটা আঁচড়াতে লাগলুম। কিন্তু কোথাও দরজা পেলুম না। আমার অলক্ষ্যে সেখানে কবে যে পাঁচিল গাঁথা হয়ে গিয়েছে আমি কিছুই জানিনা! আমি ঝীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওখানে পাঁচিল গাঁথা হল কেন?"

সে বললে—"জানি না।"

আমি বল্‌লুম—"শীগ্‌গির যা, খবর নিয়ে আয়। আমি বাড়ী ঢুকবো কেমন করে?"

ঝী চলে গেল। আমি বসে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। মনে হল এতদিনে আমার বিরহের অবসান হল। আজ স্বামীর পায়ে একটি প্রণাম দিয়ে তাঁর ধূলো নিয়ে কয়েদখানার সংস্পর্শে আমার এই অশুচি দেহকে পবিত্র করে নেব। এই সব ভাবছি এমন সময় ঝী স্বামীর হাতের ছোট্ট একখানি চিঠি নিয়ে এসে দিলে। আমি তাড়াতাড়ি সেখানা হাতে তুলে নিলুম। তাতে এইটুকু লেখা ছিল—

—"আমি তোমায় ত্যাগ করি-নি, কিন্তু সমাজ নরহত্যার পাতকীকে গ্রহণ করতে নারাজ। কি করব!"

কি করব!—এই সামান্য একটা কথা যেন বজ্রাঘাতের মত আমার মাথায় এসে পড়ল। আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

স্বামী কেবলমাত্র বলেছেন—কি করব! তাঁর কি আর কিছুই বলবার নেই? আমাকে বলবার তাঁর সব কথা হঠাৎ এমনি-করেই ফুরিয়ে গেল? ওগো আমার দেবতা, তুমি যে মন্ত্র আমায় দিয়েছিলে তার অপমান তো আমি করিনি, তবে তুমি কেন বলেছ, কি করব? তুমি কি না করতে পার? তুমি ত আমার মত অবলা নও—তবে কেন অমন হতাশ হয়ে বল্লে, কি করব? ওগো আমার হৃদয়ের দেবতা, তুমি যা করবে, সে তো তোমারই হাতে। কিন্তু আমি যে তোমা ছাড়া জানিনা—তুমি বলে দাও আমি কি করব? আমার মন যে নিরুপায় হয়ে কেবল এই কান্নাই কাঁদচে—ওগো আমি কি করি?—কি করি?

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

উদারনৈতিক ভারতবাসীদিগের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন

(ফরাসি হইতে)

উদারনৈতিক ভারতবাসীর আন্দোলন, উত্তরোত্তর যেরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

প্রথমে, সভয়ে-আরব্ধ চেষ্টার যুগ। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণ, আচার-ব্যবহার সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন; অন্যদিকে হরিশচন্দ্র মুখার্জি ও রামগোপাল ঘোষ গবর্ণমেণ্টের অন্যায় শাসন হইতে রক্ষিত হইবার জন্য দাবী করেন। কুড়ি বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক সভা সংস্থাপিত হয়:—যথা, কলিকাতায় "British Indian Association" (১৮৫১); পুনার "সার্ব্বজনিক সভা" এবং বোম্বায়ের "Presidency Association"।

* *
*

আন্দোলনের দ্বিতীয় অবস্থা।

Cobden, Bright ও Gladstone-এর প্ররোচনা ও উদ্দীপনায়, ইংলণ্ডের উদার-নৈতিক পক্ষ উপনিবেশগুলি ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কেননা, কোন উপনিবেশই সাম্রাজ্যিক (Imperial) নীতি-বর্জ্জিত নহে; এবং সাম্রাজ্যিক নীতি, লোকের মনকে সামাজিক সংস্কার হইতে বিমুখ করে, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধার লাঘব করে। ভারতবাসীরা জানিতে পারিল, স্বয়ং ইংরেজরাই ভারতবাসীদিগকে স্বাধীন করিয়া দিতে সমর্থ ও সমুৎসুক। (১)

সিভিল-সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত M. Cotton ১৮৮৫ অব্দে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

"আমাদের কর্ত্তব্যের সহিত আমাদের স্বার্থের মিল আছে। যত শীঘ্র পারি, আমাদের ভারত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রথমে, য়ুরোপীয়দিগের ধন ও প্রাণ যাহাতে রক্ষিত হয়, যাহাতে ভারতের স্বাধীনতা ও সুশাসন বজায় থাকে তাহা দেখা কর্ত্তব্য...কারণ, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত যেরূপ "নাবালক"ত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে সেরূপ ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না; ভারতে আমরা যে-সকল কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা লঘুভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার আমাদের অধিকার নাই। যতদূর জানি, এমন কেহ নাই যিনি এখনি আমাদিগকে ভারত হইতে অপসৃত হইতে পরামর্শ দিবেন।

---

(১) সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রনীতি হইতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া উদারনৈতিক পক্ষ যে সকল ভয় ও সঙ্কোচ অন্তরে পোষণ করিয়াছিল, Spencer সেই সকল ভয় ও সঙ্কোচের রীতিমত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

"যুদ্ধ করিতে হইবে, যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে হইবে—এই চিন্তাটি ইংরেজদের মনোভাবে এই প্রকার পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। প্রথমে, যিনি এই পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন, সেই লুই নোপালিয়নের সময় হইতে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ভারতের বিদ্রোহ, চীনের যুদ্ধ, আবিসিনীয় ও আশান্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান (আরও কিছুকাল পরে, আফগান, জুলু ও ইজিপসীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) হয়। তাহার পর, আমাদের সামরিক বন্দোবস্তের উন্নতি, এই বন্দোবস্তের দরুণ আমাদের সামরিক ভাবের উদ্দীপন, পরয়াষ্ট্রেও এই একই ভাবের উদ্দীপন ... ... সমাজের সামরিক আদর্শে ফিরিয়া আসায় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে। প্রথমত, দস্যুবৃত্তির দিকে যে প্রবণতা জন্মিয়াছে, আমি তাহার নির্দ্দেশ করিব। প্রত্যেকবার আত্মরক্ষার্থ, আক্রমণের যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা হইতে নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে আক্রমণ করিতেও আর বড় বিলম্ব হয় না। এথিনায়দের মধ্যে, শত্রুর অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য, স্থল-যুদ্ধ ও নৌযুদ্ধের যে সুব্যবস্থা করা হয় তাহা হইতেই নগর-বিশেষের আত্মপ্রাধান্যের ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছিল। ফ্রান্সের শত্রুর আক্রমণ হঠাইবার জন্য, রেপব্লিকের যে সৈন্য গঠিত হয় সেই সৈন্য বিজয়ী হইলে, তাহারাই আবার পরদেশ আক্রমণে উদ্যত হইল। আমাদেরও সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। চীনে, ভারতে, পলিনেসিয়ায়, আফ্রিকায়, ভারত সন্নিকটস্থ দ্বীপসমূহে, আমাদের সাম্রাজ্য বাড়াইবার ঠিক্ পূর্ব্বে এই সকল হেতুই (আততায়ীর হেতু প্রদর্শনের অভাব হয় না) প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"

পরে, ফিজিদ্বীপ, সামোয়া, শেত্রে, পরক্ প্রভৃতি দখল করিয়া লইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, Spencer আবার এইরূপ বলিতেছেন:—

"কি পার্লেমেণ্ট সভায়, কি সংবাদপত্রাদিতে সর্ব্বত্রই এই মনোভাব। সুয়েজ খালের "অংশ" ক্রয়ের বাদানুবাদ-কালে, আমাদের প্রধান মন্ত্রী, ইজিপ্টের ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজরা সাম্রাজ্যকে বজায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়া, "সাম্রাজ্যের সীম বাড়াইতেও ভয় করিবে না" ... ...

ভারত যেমন নিজের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সূত্রকে ছিন্ন করিতে পারে না, ইংলণ্ডও তেমনি স্বকীয় অতীত হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। একটি শিশুকে প্রথমে গ্রহণ করিয়া তাহার পর তাহাকে ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যেরূপ, রক্ষণের কোন ব্যবস্থা না করিয়া এখনি ভারত হইতে আমাদের চলিয়া যাওয়াও সেইরূপ। আমি যে রাষ্ট্রনীতি সমর্থন করিতেছি তাহা বহুবৎসর পরে, বহু বংশ অতীত হইলে, তবে হয়ত আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু, আমাদের সমস্ত চেষ্টার লক্ষ্য স্বরূপ এই রাষ্ট্রনীতিকেই আমাদের চোখের সাম্‌নে সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, প্রাচ্য জাতিদিগের মধ্যে ভারত আবার তাহার পুরাতন পদগৌরব লাভ করিবে। যাহাতে ভারতের মুক্তি সহজসাধ্য হয়, সেইদিকে আমাদের সমস্ত কার্য্যকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

এই প্রকার বাক্য-বিন্যাস, লর্ড রিপণের উদারনৈতিক শাসন-প্রণালী, "ইলবর্টবিল"

এবং এখন আমরা দেখিতে পাই, সামরিক আয়োজন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, দেশবিজয়ের স্পৃহা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে,—এই সকল হইতে ইহাও দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই এই সামরিক আদর্শ ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ রাজ্যশাসনে ঃ—নাবিক-সভার কাজ সামুদ্রিক সচিব অধিকার করিয়াছেন; ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্ব ব্রিটিশ সচিব কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; "কৌন্সি" সমূহের নির্ব্বাচিত মণ্ডলী, ইংরেজ জাতির ক্ষতি করিয়া নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করে; রাষ্ট্রীয় কার্য্যের স্থান সামরিক কার্য্য আসিয়া দখল করিয়াছে; রাজধানীর ও মোফস্বল পুলিসের কর্ত্তারা সামরিক বিভাগের লোক, পূর্ত্তবিভাগে, শিল্পকলা-বিভাগে, সামরিক বিভাগের লোক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়; রেল-পথ-বিভাগে উহারাই পরিদর্শক হয়, ইত্যাদি। তাহার ফলে, শাসনকার্য্যে উপর-ওয়ালার প্রভুত্বের দাবী বেশী হইয়াছে, ব্যক্তির দাবী ক্রমশ খর্ব্ব হইয়াছে।"

Spencer সংক্রামক ব্যাধি-সম্বন্ধীয় ও দরিদ্রের সাহায্য-সম্বন্ধীয় নূতন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন ঃ—

রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের কোন সীমা নাই এই তত্ত্বের মৌন স্বীকৃতি হইতে রাষ্ট্রের বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে কাহারও কোন দ্বিধা হয় না—রাষ্ট্রের এই অসীম কর্ত্তৃত্বে ও বিচার-বুদ্ধিতে বিশ্বাস উভয়ই সামরিক আদর্শের নিজস্ব জিনিস্। ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখাই "টোরী"নীতির মূলতত্ত্ব; এবং রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতা বজায় রাখাই উদারনৈতিকতার মূলতত্ত্ব। শান্তির সময়ে, উদারনৈতিকেরা কোন বিশেষ ধর্ম্মজনিত অক্ষমতা ঘুচাইয়া দিয়া, অবাধ বাণিজ্যে মত দিয়া, মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত বারণ-বাধামূলক আইন সকল রহিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রসারিত করেন। কিন্তু এখন দেখ, সামরিক আদর্শ ফিরিয়া আসা অবধি, যাহারা পূর্ব্বে বহু সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল সেই উদারনৈতিকেরাই, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য এবং ব্যক্তির ক্ষমতা কমাইবার জন্য "টোরি" পন্থীদিগের সহিত রেষারেষি করিতেছে" (Principles of Sociology, 1. P. 568)। Spencerএর শেষ গ্রন্থ "Fact and Comments"এ Spencer এত দূর পর্য্যন্ত বলেন যে, ইংরেজদের এখন যেরূপ রীতি-নীতি ও মতামত দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয় আধুনিক ইংরেজের মধ্যে আবার বর্ব্বরতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

হইতে সমুত্থিত রাষ্ট্রনৈতিক বাদানুবাদ, ইংলণ্ডে উদারনৈতিক পক্ষের লোকপ্রিয়তা, গ্ল্যাডষ্টোনের প্রভাব-প্রতিপত্তি, Home-Ruler আইরিশদিগের প্রচেষ্টা—এই সমস্ত নব-হিন্দুদিগকে মাতাইয়া তুলিল। অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের পূর্ব্ব-আয়োজনস্বরূপ ভারতের জন্য, পার্লেমেণ্টের ন্যায় একটা নির্ব্বাচন-মূলক রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইল।

Hume প্রমুখ কতকগুলি ইংরেজ এই আন্দোলনকে যথাপথে চালাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন; ক্রমে এই আন্দোলন কংগ্রেস সংস্থাপনে পর্য্যবসিত হইল। যে-হেতু ইংলণ্ড ভারতকে পার্লেমেণ্ট দিতে অস্বীকার করিতেছেন, অতএব ভারত নিজেই নিজেকে পার্লেমেণ্টের অধিকার প্রদান করিবেন; অবশ্য এই পার্লেমেণ্টের "ভোট", আইনের মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইবে না; তাহা না হইলেও অন্ততঃ ভোটের দ্বারা ভারতবাসীদের দাবী কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যাইতে পারিবে।

কংগ্রেস প্রতিবৎসর এক একটি প্রধান নগরে সম্মিলিত হইয়া থাকে। সার্ব্বজনিক সভা-সমিতি হইতে, ম্যুনিসিপাল সভা হইতে, জিলার সভা হইতে, বর্ণমণ্ডলী ও ধর্ম্ম-মণ্ডলী হইতে, প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসে প্রেরিত হয়।

প্রথম কংগ্রেস (৭১ জন প্রতিনিধি) বসিয়াছিল বোম্বাই নগরে (১৮৮৫); সভাপতি ছিলেন W. C. Banerji; দ্বিতীয় কংগ্রেস কলিকাতায়; ৪৩১ জন প্রতিনিধি; প্রসিদ্ধ আন্দোলনকারী দাদা-ভাই নৌরোজি সভাপতি ছিলেন। তৃতীয় কংগ্রেস বসে মাদ্রাজে; ৬০৭ জন প্রতিনিধি; মুসলমান Hon'ble বদ্রুদ্দিন তয়াবজী সভাপতি ছিলেন (২)। চতুর্থ কংগ্রেস (আহমেদাবাদ)—১২৪৮ জন প্রতিনিধি; কলিকাতার একজন ইংরেজ বণিক M. Yule সভাপতি ছিলেন।

প্রথম সম্মিলনগুলি বেশ উৎরাইয়া যাওয়ায় হিন্দুদের মাথা ঘুরিয়া গেল; তাহাদের বিশ্বাস হইল, পার্লেমেণ্টের ন্যায় নির্ব্বাচন-মূলক রাষ্ট্রীয়-সভা বুঝি গঠিত হইয়াই গিয়াছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক M. Hume দুই চটি বই লিখিলেন; উহা দেশ-ভাষায় অনুবাদিত হইয়া মজুর ও চাষাদিগকে বিতরিত হইল। উহাদের মধ্যে একটি চটি, একজন উকীল ও একজন গ্রামের মোড়ল—এই উভয়ের কথোপকথনের আকারে লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এইরূপ কতকগুলি বাক্য আছে, যথা ঃ—

"মোড়ল।—আপনি কি বলিতে চান আমরা সরকারের সহিত লড়াই করিব? যদি আমরা সাহেবদিগকে খুন করি তাহা হইলে আমাদের কি দশা হইবে? একেবারেই অরাজকতা হইয়া উঠিবে। অবশ্য ইহা তোমাদের অভিপ্রায় নহে।

উকীল। ভগবান তাহা হইতে আমা-

---

(২) মুসলমানেরা সাধারণতঃ কংগ্রেসের প্রতিকূল—Life and Work f Syed Ahmed Khan দ্রষ্টব্য।

দিগকে রক্ষা করুন! সে মহাপাপ। এই বেচারা সাহেবদিগকে মারিয়া কি ফল? তাঁদের মধ্যে অনেকে ভাল লোক আছেন।"

গভর্ণমেণ্ট মনে করিলেন, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডকে মন্দ বলিলেও, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডের কথাটা উত্থাপন করাটাই আর কিছু না হোক্—সুবিবেচনার কাজ নহে। গভর্ণমেণ্ট প্রথমে ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতি উদাসীন ছিলেন, এখন হইতে স্পষ্ট বৈরী হইয়া উঠিলেন। ইহা সত্ত্বেও, প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক সঙ্কল্পে (Rsolution) ভোট দিতে নিবৃত্ত হইল না। তন্মধ্যে কংগ্রেসের কতকগুলি সঙ্কল্প ন্যায়সঙ্গত, কতকগুলি অকাল-পক্ক, আবার কতকগুলি উগ্রচণ্ড ও নিতান্ত অসঙ্গত।

এক্ষণে, এই সঙ্কল্পগুলির মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য, তাহার বিচার-আলোচনা করা যাক।

ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন-মূলক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা।—১৮৯২ অব্দের আইনের দ্বারা এই সঙ্কল্প অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু কংগ্রেস এই সম্বন্ধে আরও কতকগুলি সংস্কার দাবী করেন —যাহাতে ব্যবস্থাপক সভা প্রকৃত পার্লেমেণ্টে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বাচনের প্রণালী স্থির করাই কঠিন কার্য্য। ম্যুনিসিপ্যাল সভা ও ডিস্ট্রিক্ট্ সভার জন্য এমন একটা জন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যাহাতে করিয়া অধিবাসী-বর্গের কুড়ি ভাগ বাদ পড়িয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাভুক্ত এই নির্ব্বাচকদিগের অধিকাংশ ভোট দেয় না; এমন একজন বণিক পাওয়া অসম্ভব যে নাগরিক এলাকার প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছুক হইবে, এমন একজন ভূম্যধিকারী পাওয়া যায় না যে পল্লি-এলাকার প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছুক হইবে। (৩)

পঞ্জাব প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা ও হাইকোর্ট সংস্থাপন।—গভর্ণমেণ্ট প্রথম প্রস্তাবটি আপাতত স্থগিত রাখিয়াছেন।

বঙ্গদেশের ন্যায় সমস্ত প্রদেশে ভূ-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা।—এই প্রকার ব্যবস্থা রাজস্বমূলক সমস্ত নিয়মের বিরুদ্ধ হইবে।

শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দেওয়া।—এই সংস্কারে আরও ব্যয়বৃদ্ধি হইবে—অন্তত এক্ষণে উহাতে বেশী সুবিধা হইবে কি?

বিলাতের "প্রিভি-কৌন্সিলে"র পুনর্বিচার কার্য্যে উক্ত সভার সদস্যরূপে আইনজ্ঞ ভারতবাসীকে নিয়োগ করা।—কথাটা ন্যায়-সঙ্গত। তবে, এখন বিবেচনা করিতে হইবে, প্রিভি-কৌন্সিলে আপীল রহিত করিয়া দিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে ভাল হয় কি না?

অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারত-বাসীকে বাসস্থাপন করিতে অনুমতি দান।—ভারতবাসীরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশে বাসস্থাপন করিবার যে-অধিকার

(৩) সর্ব্বজনীন নির্ব্বাচনের অধিকার-মূলক পদ্ধতির অধীনে ভারতের কিরূপ দশা হইবে পণ্ডিচেরীর নির্ব্বাচন-কার্য্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দাবী করিয়াছে তাহা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তাহা হইলে উপনিবেশ রাজ্যগুলির সহিত ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ ও মনান্তর উপস্থিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে ইহার কোন উপায় নাই। (৪)

পুলিসের সংস্কার-সাধন।—সকল পক্ষেরই মতে, এই সংস্কার-কার্য্যটি অপরিহার্য্য।

ইংলণ্ড ও ভারতে এক সময়েই পরীক্ষা গ্রহণে সিভিলসার্ভিসের জন্য কর্ম্মচারী সংগ্রহ করা। এই সংস্কার বাঞ্ছনীয় বলিয়া পার্লেমেণ্ট সভা মত দিলেও, ভারত-সরকার বরাবরই ইহার প্রতিকূল।

ভারতের জন্য এবং ভারতীয় সৈন্য যে সকল অভিযান করে সেই সকল অভিযানের জন্য ইংরেজ সৈন্য রাখিতে ব্যয় হয়, সেই ব্যয়ভার ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য।—এ দাবীটায় নিশ্চয়ই একটু বাড়া-বাড়ি আছে। কারণ, ভারত রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্য যথেষ্ট নহে এবং কুড়ি বৎসরের মধ্যে যে সকল যুদ্ধে ভারত-সরকার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করাই সেই সকল যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতবাসীদিগকে অস্ত্র-ব্যবহারের অধিকার দান। এই অধিকার দিলে বিদ্রোহ ও ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিবে।

যাহাতে ভারতীয় যুবকগণ সামরিক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাদের জন্য সেইরূপ কতক-গুলি বিদ্যালয় স্থাপন করা; তাহা হইলে ইংরেজ সৈনিক-কর্ম্মচারীরা যে-সকল উচ্চ পদে ক্রমশ উন্নীত হয় সেই সকল পদ-সোপানে ভারতীয় সৈনিক কর্ম্মচারীও উঠিতে পারিবে।

তাহার পর, আর্থিক উন্নতির উপায় অবলম্বন করা। এই বিষয় সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাইবে।

বস্তুত, কংগ্রেসের অধিকাংশ সঙ্কল্প কার্য্যে যাহাতে পরিণত হয়, সেদিকে প্রতিনিধিদের তেমন একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল না। সরকারী ও বে-সরকারী সভা লইয়া যাহাতে কতকগুলি (Commissions) অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হয় মুখ্য-রূপে ইহাই তাহারা চাহিতেছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল, যদি তাহারা এই অনুসন্ধান-সমিতিতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে তাহা হইলে এই সুযোগে শাসন-কার্য্যকেও কতকটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিবে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের অনেকগুলি সঙ্কল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও,—পাছে ভারতে এক-প্রকার পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় কমিশন্ গঠনে অস্বীকৃত হইলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৪) Colored races restriction and regulation act দ্বারা (New Wales of the South 1896) ১৮৪৪ অব্দের চীনীয় সংক্রান্ত আইনের সর্ত্ত ও ক্ষমতা, সমস্ত এসিয়াখণ্ড ও অ্যাফ্রিকা-খণ্ডের লোক পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

স্বীকার

(৩)

"আমাদের ফেরবার সময় শীত শেষ হয়ে এসেছিল। হরিদ্বারের পথে ও-পাশের রোহিলখণ্ড রেল ধরে ক্রমশ দেশের দিকেই আসছিলাম। অযোধ্যার পর ফায়েজাবাদের ট্রেনে উঠে মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল কর্ত্তে হয়। বেশীক্ষণ সময় নাই, বেলাও শেষ হয়ে আসছিল। রাত্রিটা গাড়ীতে কাটাতে হবে,—বাবুরা খাবার সন্দেশ ও গৃহিণীরা ফল-মূলের সন্ধান করছিলেন; আর সময় পাব না ভেবে আমি একটু সন্ধ্যার উপায় হয় কি না ভাবছি, এমন সময় গাড়ী এসে পড়ল। বাবুরা বল্লেন, "আর না, চলে এস, মেল্ বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না। ভিড় হয়ে যাবে, শীগ্‌গির এগিয়ে চল।"

প্রত্যেক কামরার পানে চাইতে চাইতে তিনি খুব জোরে জোরে চলছিলেন; মুখের ঘোমটা তুলে আমি প্রায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাম, কিন্তু স্থূলাঙ্গী দিদি ও আরও দুটি ঘোম্‌টা-টানা মেয়ে আমাদের অনেক পেছিয়ে পড়েছিল।

ও-পাশে আরও একখানা গাড়ী লেগেছে, এটার লোক ওটায় চলেছে, কাজেই ভিড়ে অত-বড় প্লাটফর্ম্মখানিও যেন বোঝাই হয়ে গেল। ঠেলাঠেলি, আগে যাবার ঝোঁক, ধাক্কা, পুরুষেরাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মেয়েদের কথা বলাই বাহুল্য!

এমন সময় আমাদের সঙ্গের বিধবা বৌটির অস্ফুট চীৎকার ও সেই সঙ্গে দিদির গলায়—"আ মর্ মিন্সে, তুই কেরে? ওর গায়ে হাত দিস্ কেন? ওরে ও হারাণ, ছাখ্‌না" ইত্যাদি সভয় ধ্বনি শোনা যেতেই পিছনে চেয়ে দেখলাম—বিশ্রী ব্যাপার! একজন কালো পোষাক-পরা কে—ফিরিঙ্গী কি অমনি-কিছু হবে, সে সেই ছেলেমানুষ বৌটির পিছনে একেবারে গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়েছে, যেন পাশে আর জায়গাই নাই! আমাদের পাড়াগাঁয়ে ছেলেটি তাকে—"বাঃ সায়েব, সরে দাঁড়াও না" বলে ঠেলা দিলেও সে নড়চে না। আমি "ও রায়মশায় দেখুন" বলে ডেকে নিজেও আগাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এক-পাল মেয়ে, সঙ্গের পুরুষেরা কে কোথায় ভিড়ে মিশে গেছেন, তা দেখতে পেলাম না। "তোমরা ত দু-পা এগিয়ে হাঁট্‌তে জান না, তাইত মানুষে মেয়েমানুষ নিয়ে পথে বেরুতে চায় না। এই সাহেব, দেখতে পাচ্ছনা না কি?" বলে বড়বাবু ফেরবার চেষ্টায় কোনমতে গা-নাড়া দিচ্ছিলেন মাত্র; ভয়ে সরে সরে বৌটি প্রায় রাস্তার ধারে গাড়ীর কাছে এসে পড়েছে, আর একটু হলে পড়ে যায় আর কি—তবু সে পাজি লোকটা সরে যাচ্ছিল না, যেন কতই অন্যমনস্ক—এমনি ভাবে তার গা-ঘেঁসে চলেছিল। ভয়ে লজ্জায় আমার সে বুড়ো বয়সের রক্তও হিম হয়ে গেছল,

আর সে কচি মেয়েটির কথা একবার ভাবুন, বাবা।

কিন্তু সেই সময় একখানা হাত হঠাৎ পিছন থেকে এসে তার ঘাড়ে পড়ল। জোরে টান্, এক হেঁচকানিতে সে ছিট্‌কে সরে গেল। তারপরই—ইংরিজিতে কি সে বকুনি! এমন সতেজ স্বর, এমন প্রবল কথার টান্—যে, ষ্টেশনের অত হৈ-হৈ শব্দ ডুবিয়ে সে বকুনির আওয়াজ সবারি কানে পৌঁছুলো। ফিরিঙ্গীটাও ভয় পেয়ে গোলে কোথায় সরে পড়ল দেখা গেল না।

তিনি একজন বাঙালী, পাশের কামরায় বসেছিলেন, ব্যাপার দেখে নেমে এসেছেন। ইতিমধ্যে আমাদের বাবুরাও জুটে পড়লেন। অনেক কথা, এঁদের ধন্যবাদ, তার জন্য তাঁর বিনয়,—ইত্যাদির মধ্যে আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখছিলাম,—তাঁকে কোথাও আগে দেখেছি কি না?

সন্দেহ বেশীক্ষণ রইল না; গায়ে সাদা জামা, রেশমী উড়ানি, সম্পূর্ণ বাঙালী-বেশ বলেই চিনতে দেরি হয়েছিল। ইনি সেই তিনি, যাঁকে মারাঠীদের সঙ্গে দেখেছিলাম।

তাঁর পরিচয়ে বাবুরা এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত খুসি হয়ে উঠলেন। বৌমা ত তখনো "উনি আর-জন্মে আমার বাপ ছিলেন" বলে ফুলে-ফুলে কাঁদছিল। ভিড় প্রায় চলে গেছে, আমরা আস্তে আস্তে এগুচ্ছিলাম। সেই রোগা লোকটির সম্বন্ধে প্রশ্ন হলে শুনলাম—তার কলেরা নয়, সে মরেনি এবং বোধ হয় মরবেও না। তবে বহুদিনের পুরানো রোগী, খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে বটে। তার ভাই বাঁদিকুইয়ের পানিপাঁড়ে; ইনি সঙ্গে এসে তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেছেন, ডাক্তারকেও বলে এসেছেন, ইত্যাদি।

দিদি শিউরে উঠে আমার কানে কানে বল্লেন, "কি সর্ব্বনাশ—শুনলি? ব্রহ্মহত্যা হচ্ছিল!"

সে কথাটা আমার তেমন কাণে গেল না, রায় মহাশয় তখন সালঙ্কারে নিজের পরিচয় শেষ করে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, "নিজ কল্‌কাতাতেই মশায়ের বাড়ী?"

"হাঁ, তবে এলাহাবাদেই থাক্‌তে হয় প্রায়।"

"কি কাজ-কর্ম্ম করা হয়? উকিল, না—?"

"আজ্ঞে না, এই ছেলেদের পড়াই।"

"ওঃ!" বাবুর স্বরে মৃদু অবজ্ঞা। তিনি বল্লেন, "তা ও মারহাট্টাদের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

তিনি একটু হেসে বল্লেন, "তাঁরা আমার বন্ধু, তাঁদের নিমন্ত্রণে আমায় বরোদা যেতে হয়েছিল, তার পর তাঁরা দিল্লী গেলেন—আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম।"

"তার পর এখন বুঝি বাড়ী যাচ্ছেন—আপনার নাম?"

আমি তখন একটু আশ্চর্য্য হয়েই দেখছিলাম, তাঁর অনেকখানি বয়স, মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা, গঠন সবল হলেও মুখে-চোখে বার্দ্ধক্যের দাগ পড়েছে। কিন্তু নামের কথা উঠতেই সে প্রবীণ মুখে ছেলেমানুষের মত লজ্জার হাসি জেগে উঠল। "আমার নাম? সে আর এমন কি,—হয় তো জানেন, আমি—"

যেন সে মানুষই নয়, এমনি মৃদু স্বর, হাল্‌কা ভাব—বাবুও হেসে বল্লেন—"তার আশ্চর্য্য কি? কলকাতার মানুষ আপনি, আমিও প্রায় সেখানেই থাকি, তা জানা আর বেশী কথা কি? তবু বলুন দেখি, নামটি আপনার, দেখি, মনে হয় কি না।" বলে তাঁর মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তুলে ধরলেন।

"সাক্ষাৎ হয়-নি, বোধ হয় চিনতে পারবেন না। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ হালদার মশায়ের নাম শুনেছেন কি? আমি তাঁরই বড় ছেলে, লোকে আমায় শচীন হালদার বলে।"

আমাদের বড় বাবু তাঁর জমিদারী ও ব্যবসা-ছাড়া অন্যদিকে মন, কান ও দৃষ্টি দেবার প্রথম যে অবসরটুকু পেয়েছিলেন, তাতে সুদূর ভবিষ্যৎ পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয়ের আশাতেই এই তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন; বাইরের খবর কিছু রাখতেন না, জান্‌তেনও না। তাই সে নামটি শুনেও চিন্‌লেন না। তাঁর স্মরণ হল, শুধু হালদারদের কথা—"চোরবাগানের হালদাররা কি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তবে ছেলে পড়াতে এলাহাবাদে এসেছেন কেন?"

তিনি হেসে বল্লেন, "এমনি। তাতে সুবিধাও আছে অনেক,—উঠুন, মেয়েদের তুলে দিন,—ঘণ্টা বাজ্‌ল।"

"হাঁ, পাশের কামরায় রইলাম, আবার দেখা হবে।" বলে বিদায় নিয়ে এঁরা আগে চল্লেন, তিনিও হাত জোড় করে নমস্কার দিয়ে পিছিয়ে গেলেন।

গাড়ী চলতে লাগল। একটু শুয়ে পড়েছিলাম। এতদিন উৎসাহের উত্তেজনায় সর্ব্বাগ্রে খাড়া থাক্‌তাম আমিই,—গুছিয়ে নেওয়া, সাজিয়ে দেওয়া, রাত্রি জাগা—অন্যকে তুলে দেওয়া, এমন কি বাসা ও ট্রেনের সব শেষের সামান্য স্থানটুকুতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকাটিতে পর্য্যন্ত আমার দুঃখের নয়, বরং সম্মানেরই অধিকার ছিল। আজ আমার উৎসাহে কেমন ভাঁটা পড়ে এল। যার জন্য ক্লেশকে ক্লেশ বলে বোধ হয়নি এতদিন, তা শেষ হয়ে গেল বলে,—পথের অবসানে ঘরে ফিরে যাচ্ছি বলে, কিম্বা কি জানি কেন, আর নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না। মাথা ভেঙ্গে যাচ্ছিল, সর্ব্বাঙ্গে দারুণ অবসাদ। দিদি যত্ন করে আমায় একটা আসন আলাদা ছেড়ে দিচ্ছিলেন, সে বাড়াবাড়িটুকু হেসে উড়িয়ে আমি একপাশে গা গড়ালাম।

খানিক পরে বৌমা আমার পাশে এসে চুপি চুপি প্রশ্ন করলে—"কোন্ শচীন হাল্‌দার মাসিমা,—সেই তিনি, আমাদের শচীনবাবু না কি?"

"বোধ হয়,—কি জানি—"

"না, না, ঠিক্ তিনিই, মুখ দেখলেন না? ঠিক্ তাঁর ফটো—ইদানীংকার ছবির মত যে—?"

ভুল হয়নি, কিন্তু আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল যে, শচীন্ বাবুকে আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না কেন? বৌমা বল্লে, "আমাদের শচীন্ বাবু।" কথাটা ঠিক,—তাঁর নানা ভাবের নানা ছাঁদের লেখা গল্প বিশেষ কবিতা পড়ে পড়ে আমাদের বাংলা দেশটায় এমন

এক প্রকাণ্ড দল তৈরি হয়ে উঠেছিল, যারা যখন-তখন অসঙ্কোচে তাঁকে, "আমাদের শচীন্ হাল্‌দার" এমন কি "আমাদের শচী" বল্‌তেও একটু দ্বিধা বোধ করত না। ফটোর কথা উঠল বটে, কিন্তু সেটা প্রয়োজন ছিল না। তাঁর মুখ চোখ চেহারা—কেউ ভাব্‌ত না, মান্‌ত না, তবু লেখা পড়ে সেই কবিতার কল্পনার আকারে সবারি মনে তাঁর এমন একখানি ছবি আঁকা হয়ে গেছল, যার তলায় শুধু ঐ নামটি মাত্র লেখা চলে। হাত-পা নাড়া, কথা কওয়া—খাওয়া-শোয়া-বেড়ানো—অন্য আর-কিছু তার সঙ্গে মানায় না। সে শচীন হালদার—সকলেরই শচীন বাবু, এর মধ্যে যে কোন মানুষ আছে—সে স্ত্রী কি পুরুষ, তার হিসাব নেবার ইচ্ছা বা অবকাশও কেউ চাইত না!

আমিও তাঁকে জানতাম—মান্‌তাম, বরং—হাঁ, ছেলেবেলা থেকে নিজের নারীত্বের সম্বন্ধে আমি নিজেই আত্মবিস্মৃত ছিলাম। সত্যি বাবা, সে আমার বেশ একটু গর্ব্বের আর আনন্দের জিনিষ ছিল। লেখক-দলের মধ্যে যাঁর লেখা আমার পছন্দ হত, তাঁকেই মনে মনে বন্ধু বলে ধরে নিতাম। শচীন্দ্রনাথ! তাঁর বয়স কি রূপ কে ভেবে খুঁজে মরে? সুকুমার সুন্দর নামটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদরের বন্ধুটির মত চিরদিন আমি—"এটা যে আমাদের শচীর"—"শচীনের লেখা পড়ছ?" এমনি অবহেলার বা যাই-হোক্ ভাব ও ভাষা ব্যবহার করে এসেছি।

তাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না কেন? ফটো ত হাজার বার হাজার রকমের দেখেছি,—তবে? বিস্মিত হচ্ছিলাম—ভাবছিলাম,—হঠাৎ মনের মধ্যে একটা বড় আলো জ্বলে উঠ্‌ল। এ শুধু ছবি নয়, ছায়া নয়, কল্পনাও নয়,—একজন মানুষ—জাগ্রত জীবন্ত প্রত্যক্ষ প্রকাশিত দিব্য পুরুষ! একটি দিন দেখেই—শুধু আমি একা নই, অনেক পুরুষ অনেক নারীর চিত্তই একসঙ্গে তাঁর সুমুখে মাথা নুইয়েছিল। তাঁরই মূর্ত্তি তাঁরই চিন্তার সঙ্গে—আমাদের সেই আদরের শচীন্,—আঃ, তখনো পর্য্যন্ত যে আমি দুজনের অভেদ কল্পনাকে মনে স্থান দিতে পারছিলাম না! ইনি যে সে হতে পারেন, এমন আভাষটুকু পর্য্যন্ত আমার মনে উদয় হয়নি। প্রথমে সেই ট্রেণে ত আমি তাঁকে দেখিনি বল্লেই হয়, তবু এ ষ্টেশনে হঠাৎ দেখে, সেই সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহখানি যে ঠিক তাঁরই, এ আমার চিনতে ভুল হয় নি। যার যত ছবিই দেখা থাক্, কিন্তু সে সবল ঋজু বাহু যে তাঁর ছাড়া আর কারো সম্ভবে, তা আমার মনে আসেনি,—কেন কি জানি!

নরের মধ্যে উত্তম, পুরুষ-সত্তম তিনি। আমাদের কবির কোমল সুন্দর মায়াচিত্রখানি যেন তাঁর জ্যোতির মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। যাক্, আমি বাধা দিলাম না, চোখ বুজে পড়ে রইলাম। খুব অল্পক্ষণ, মিনিট কয়েক বোধ হয়, একটু ঘুমিয়েও ছিলাম। জেগে উঠে বসে দেখি, আঁধার হয়ে গেছে, সুমুখে সন্ধ্যার চাঁদ, চলন্ত ট্রেণে জোর বাতাস, কিন্তু তার

সঙ্গে এত বেশী আমের মুকুলের গন্ধ মিশেছে যে—

তন্দ্রা ভেঙ্গে আমার মনের ভাবটা কিছু ফিরেছে বোধ হল। শচীন্দ্রনাথের কবিতাগুলা যেন এক অখণ্ড মুক্তা-মালার মত চোখের সুমুখে দুল্‌তে দুল্‌তে ঘুর্‌তে সুরু কর্‌লে।

মুক্তার মালা? হাঁ, তারি মত মূল্যবান বটে কিন্তু তার সাদৃশ্য কি শুধু মণি-মুক্তার সঙ্গে হয়? সে যে আমাদের ফুলের মালা! এই বাংলা দেশে যেখানে যত ফুল ফোটে, বাগানের বেল, যুঁই, চামেলী, বনের ভাঁট, ছাতিম, কেয়া—বড় গাছের চাঁপা, ছোট ঝোপের সন্ধ্যামণি, গৃহস্থের উঠানের করবী হতে শর্ষে ক্ষেতের বিছানো সোনাগুলি পর্য্যন্ত,—সবগুলি যেন মিলিয়ে সাজিয়ে নিপুণ শিল্পীর হাতে গাঁথা সে কী বিচিত্র হার!

ফুল, শুধু ফুল! এইবার আমার সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবতার বিপুল দেহখানি যেন ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতে লাগল। মাথায়, গলায়, হাতে,—আর কিছু না, এবার আর কোন ফুল নয়, আমাদের পুরাণ-পুঁথির সেই "অম্লান পঙ্কজ-মালা", সেই "লীলা-কমল", সেই সহস্র-দলমেলা সূর্য্যালোকের ফুল!

সে নিজের হাতে এই ফুল তুলেছে—সাজিয়েছে। আহা, কি সুন্দর ঐ অমল-ধবল আসন-পদ্ম, আর তার চেয়েও কি রাঙা ঐ তার মানস-দেবতার পায়ের তলার হৃদয়-কমলটি! আমার মনে হচ্ছিল—থাক, সে কথার প্রয়োজন নাই।"

রমা একটু থামিলেন। তাঁহার মুখে আবার উত্তেজনার ভাব দেখা দিল। গুরু নীরবে চাহিয়াছিলেন; ক্ষণকাল পরে মৃদু হাসির সহিত রমা কহিলেন,—"প্রয়োজন নাই, তাই বা কে বল্লে? সেই কথাটুকু বল্‌বার জন্যই তো এত হাবড়-হাটী বকে যাচ্ছি। বাবা, আপনি হয় তো বুঝ্‌তে পেরেছেন? প্রথমটা আমিও খুব চম্‌কে উঠেছিলাম, তারপর অনেক ভেবে অনেক অনুভব করে দেখেছি, আসল হিসাবে আমার তাতে সঙ্কোচের কিছুই নাই। তবে কথা সত্য,—শচীনের নিজের হাতে গড়া আমার মনের সেই রাঙা পদ্মটিতে—আপনি তার লেখা পড়েছেন, বাবা?"

মৃদুস্বরে গুরু বলিলেন, "পড়েছি রমা।"

"তবে মুখ হেঁট করছেন কেন? তার লেখা, তার আদর্শ—ও বাবা, সত্যি বলুন, তবে কি আপনারও ধারণা এই যে আমি যা করেছি, তা পাপ?"

"তুমি ইচ্ছা করে কিছুই করনি মা, সুতরাং পাপ নয়, ভুল।"

"ভুল! সে কি? ভুল মোটে নয় বাবা। আমি জানতাম—কিন্তু সত্যি, প্রথমে আমিও এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। আঃ বাবা, সব-প্রথমটুকু যেন স্বপ্ন—মোহ! তাঁর সঙ্গে একগাড়ীতে চলেছি, সাম্‌নের চাঁদে তাঁরও দৃষ্টি পড়েছে, এই বাতাস তাঁর—

বিশ্রী! মোগলসরাই থেকে হাওড়া, পঞ্জাব মেলের দ্রুতগতি সময়ে ঐ একটি রাত্রির মধ্যে দুটিবার—আমার জীবনের মধ্যে মাত্র দুটি দুর্ব্বল ক্ষণ এসেছিল। একটি

ঐ অতর্কিত আনন্দ, দ্বিতীয়—সে কথাটুকুও বলি।

আবার কাপড় মুড়ি দিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম, একটু তন্দ্রার মত বোধ হচ্ছিল যেন। হঠাৎ দেখি, ট্রেন থেমেছে, দিদি ডাক্‌ছেন—"ও রমা ওঠ্‌না, ছাখ্‌, হাবু এয়েছে, বিজয় এয়েছে,—জামাই, ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুর, ওঠ্‌ ওঠ্‌।"

বুঝলাম, এই বাঁকিপুর। আমাদের অনেকগুলি প্রবাসী আত্মীয় ছেলেপুলে নিয়ে দেখা কর্ত্তে এসেছিলেন। নমস্কার, আশীর্ব্বাদ, প্রসাদ ও ফুল দেওয়া—গাড়ীখানা খুব জম্‌কে উঠেছিল তখন। আমাদের সেই বৌ আর তার বয়সী বালবিধবা মেয়েটি এক পাশের জানালায় ঘোমটা দিয়ে বসেছিল। হঠাৎ বৌটি এসে বল্লে,—"মাসিমা, শচীন বাবু!"

আমি বল্লাম,—"তাতে কি হল?"

"কিছু না, চা খাচ্ছেন।"

"সে আর আশ্চর্য্য কি!" বল্লাম বটে এ কথা, কিন্তু দৃষ্টি এড়ালো না,—নজর পড়ল, একটু-দূরে তিনি আরও-কয়েকজন লোকের সঙ্গে চা এবং আরও-কি খাচ্ছেন বটে।

ব্যাপার কিছু নূতন নয়! টেবিল চেয়ার পেয়ালা পিরীচ্‌ খাদ্য পানীয় ও মানুষ, তার মধ্যে আশ্চর্য্য-কিছু ছিল না ত, কিন্তু আমার চোখে সহসা তা কেমন অদ্ভুত ঠেক্‌ল! শচীন হাল্‌দার—না, আমার মনের সেই জ্যোতিঃ-কিরীট-ধারী নমস্য মহাপুরুষ, তিনি যে চোখের সাম্‌নে বসে সাধারণ মানুষের মত পেয়ালা থেকে চা ঢেলে খাচ্ছেন, প্লেট থেকে খাবার তুলে নিচ্চেন, পাশের চাপ্‌রাশির পানে চেয়ে কি কথা জিজ্ঞাসা করছেন—এ সবই যেন তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক, অদ্ভুত, সে যেন এক রকম কী—যেন অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে হল!

মানুষ, এই আমাদের মতই মানুষ! তিনি শচীন্দ্রনাথই হোন্‌ আর আমার আদর্শ দেবতাই হোন্‌—তবু মানুষ বটে! রক্ত-মাংসে গড়া দেহধারী মানুষ! আর তার পর? শুধু মানুষ বল্লেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছেনা ত, যাকে এতক্ষণ আমি তাঁর দীপ্তি বলে, শোভা বলে—দেখে আনন্দ বোধ কর্‌ছিলাম, এখন সেই আলোটাই শিখার মত এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালার স্পর্শ ছুঁইয়ে দিলে। ঐ যে বলিষ্ঠ-হৃদয় বলশালী লোকটি, উনি আর যাই হোন্‌, কিন্তু তারি সঙ্গে তাঁর প্রধান পরিচয় যে তিনি একজন পুরুষ!

কথাটা মনে হতেই আমার প্রাণ অর্থাৎ অন্তরের নারী-প্রকৃতিটি যেন চম্‌কে শিউরে উঠ্‌ল। একটু পূর্ব্বের সেই সময়-টুকু কি আনন্দে কি অপরূপ কল্পনায় ডুবে গিয়েছিলাম আমি! সাগরকে যারা ভালবাসে, তার নাম, তার বর্ণনা শুনে মনে ছবি এঁকে রাখে; তারা হঠাৎ চোখের সুমুখে সেই সীমাশূন্য নীলিমার অপূর্ব্ব রূপ দেখে যেমন প্রথমটা—"

রমা একটু স্তব্ধ হইলেন। তার পর আবার বলিলেন,—"এখন মনে পড়লে হাসি পায় বাবা, এত অল্প সময়ের মধ্যে দুটো পরস্পর-বিরোধী ভাব,—সে যেন কি অদ্ভুত! মুহূর্ত্তমধ্যে আমার নিজের ভিতর-

কার সমস্ত আগুন আমার নিজের পরেই জ্বলে উঠল। গাড়ীর কামরায় বসে তখন আমার সেখানটাকে নরক তুল্য মনে হতে লাগ্‌ল। নিজের মন, আপনার চোখকেও অবিশ্বাসী বলে ধারণা এসেছিল—সেই রাত্রিটুকুর জন্য। বড় বড় ষ্টেশনে অনেক-ক্ষণ গাড়ী দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু আর-সকলকে শোবার ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে আমি গিয়ে একেবারে মেজের উপর শুয়ে পড়েছিলাম। সে রাত্রির মধ্যে আর উঠিনি। চেয়েও দেখিনি যে আমার সঙ্গিনীরা কে কি কর্‌ছে।

ভোরের আলো দেখা দিতেই গাড়ী হাওড়ায় দাঁড়াল। শেয়ালদার গাড়ী ধরে আমাদের বাড়ী যাবার কথা। আমাদের মধ্যে দু-চার জনের আত্মীয়ের বাড়ী কল্‌কাতায়। তাঁরা দুদিন সেখানে বিশ্রামের কথা বল্লেন। আমি ঝোঁক্ ধরে বল্লাম—"না, আজই যাওয়া চাই আমার।" তখন আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, পারি ত এখনি কাশী চলে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করি। আমার সেই কথা শুনে দিদি বল্লেন, "তাই হবে, এর মধ্যে চল্, গঙ্গাস্নানটা সেরে নি।"

আমাদের গ্রামের কাছে গঙ্গা নেই; খুব বিশেষ তাড়া না হলে গঙ্গাস্নানের উপায় হয় না। তা-ছাড়া সত্যি সত্যি আমি আমার এই মা-জননীকে বড় ভালবাসি বাবা। তাই দিদির কথা শোনবামাত্র আমার বিচ্ছিন্ন মনটার উপর যেন একটা সুস্থতার আনন্দের হাওয়া বয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে কারো পানে না চেয়ে একেবারে তাঁর সেই অগাধ প্রচুর তরঙ্গায়িত জলরাশির কাছে এসে দাঁড়ালাম। সে কী তাপ-হরণ অমিয়-ক্ষরণ জল! তার পরশ পেয়ে যেন আবার নূতন জন্ম পেলাম আমি—"

রমার স্বর মৃদু হইয়াছিল, একটু বাধা দিবার অছিলায় গুরু বলিলেন, "এই ঠিক্ মা। তোমরা হিন্দুনারী, তোমাদের এই ভাবটিই সত্য। কোন আকস্মিক মোহের ক্ষণিক অন্ধতা, মনের চিরদিনের জ্বলন্ত পুণ্যের ভক্তির আলোতে এমনি করেই কেটে যায় যে। আর যা বল্‌ছিলে, সে সব শুধু কতকগুলো বাজে নাটক-নভেল্ বা তার চেয়েও সাংঘাতিক ঐ-এখনকার বিদেশী ছায়ার উন্মাদক ভাব-মাখা নূতন শ্রেণীর কাব্য পড়ার ফল।"

ব্যাকুলভাবে রমা বলিলেন, "না, না বাবা, না, অমন কথা বল্‌বেন না। আমার দৌর্ব্বল্যকে দোষ দি, তা বলে আর কিছুকে দোষী করা ভুল। তাই তো জিজ্ঞাসা করছিলাম যে শচীনের কাব্য আপনি পড়েছেন কি না? আমার ক্ষুদ্রতার সমস্ত দৈন্য নিয়ে জীবন শেষ করলাম। এবার তো সব গণ্ডী এড়াচ্ছি। শচীন্দ্রনাথের সেই অমৃত-সাগর থেকে পাত্র জল তুলে নিয়ে এখন তাঁরি কাছে যাচ্ছি—যাঁর কাছে সত্যের আনন্দের একটি বিন্দুও উপেক্ষার নয়।"

গুরু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সত্যের বিচার, সে যে বড় কঠিন জিনিষ মা।"

"নিশ্চয় বাবা, নিশ্চয়, তার কোন ভুল নেই। তারি শাণ-দেওয়া ধারের মুখে পড়েই তো সে রাত্রিটা অমন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে বুঝলাম, আমার জীবন, সংস্কার, অভ্যাস

ও শিক্ষার সঙ্গে সে সত্য যত-বড় আকার ধরুক না কেন, তার চেয়েও বড়—বিশাল—বিরাট সত্য আরও আছে। সেই দিনই যে আমি তাঁকেও দেখলাম বাবা! আনন্দের সত্য যে স্বয়ং এসে আমার বুকের সব আঁধার ঘুচিয়ে সূর্য্যের মত উদয় হলেন! গঙ্গাজলে ডুব দিয়ে যখন সেই সকালের সোনালি রোদের মধ্যে মাথা তুল্‌লাম, চোখের উপর, মুখের উপর, বুকের উপর ভগবানের সেই মূর্ত্তিমান জ্যোতি—জ্বলন্ত সূর্য্য হাস্‌তে লাগলেন—"

রমার চোখে জল আসিল, বহিয়া মুখে পড়িতে লাগিল। একটু থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "সেই গঙ্গাজলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল যেন আমার বুকের মাঝের এই ভাঙ্গা-গড়া তোল্-পাড়-ব্যাপারের মধ্যে আমার ভালবাসা শতদলের মত ফুটে উঠ্‌ল। সে যেন জলের উপর বহুদিন মাথা তুলে খাড়া ছিল, কিন্তু দলে-দলে আঁটা, চাপ্-ধরা—এমনভাবে বন্ধ ছিল যে জলকেও চিনত না, আকাশকেও দেখতে পেত না। আজ যেন সে প্রথম সূর্য্যালোক দেখে—নিজের বুকের গন্ধ নিজে পেয়ে মুক্তির মধ্যে বিকশিত—"

"রমা—"

"চম্‌কাবেন না বাবা, আমি সত্যি বল্‌ছি, সে দিন আমি যে সূর্য্যকে দেখলাম, সে আমার আগের দেখা অচেতন জড় অগ্নি-পিণ্ডমাত্র নয়; আমার মনে হল আমার চিরদিনের দিনমণি এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার বুকের মাঝের সেই ফোটা ফুলটির দলে-দলে, কেশরে-কেশরে তাঁর বর্ণ, তাঁর আভা—"

গুরুর মুখে দারুণ অস্থিরতা দেখা দিল। সবেগে তিনি বলিলেন, "এত ভুল বুঝেছ মা?"

রমার স্বর শ্রান্ত হইয়া আসিতেছিল; মৃদু স্বরে তিনি বলিলেন, "ভুল বুঝিনি, কিন্তু কি বুঝেছি তাও বোধ হয় আপনাকে বোঝাতে পার্‌ব না। আমি কার কথা বলছি, বুঝ্‌চেন না? শিশুকাল থেকে যাঁকে জলে-স্থলে, পাষাণে-পুত্তলে, পূর্ণঘটে আর শূন্য আকাশে—সর্ব্বত্র মাথা নুইয়ে এসেছি, আমি সেদিন তাঁরই দেখা পেয়েছিলাম বাবা—"

"একটু স্থির হও মা, এত কথায় তোমার অনিষ্ট হচ্চে।"

"হোক্, ক্ষতি নেই। একটু শচীনের কথা বল্‌ব কি, বাবা? এই পাঁচ বৎসরে আমি তাকেও অনেকবার ভেবেছি। কত অবিশ্বাস, কত সন্দেহ এসে আমায় পীড়া দিয়ে গেছে! তাই তো এই কাশী পালিয়ে আসা, আপনাকে এত কথা বলা। কিন্তু সত্যি তাকে ত আমি একটুও ঘৃণা করি না। তার কথা মনে করতে আমার আনন্দই আসে এখন। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। জন্মান্ধের চোখের তারার আবরণ যে চিকিৎসক টেনে তুলে দেন, যাঁর মুখ দেখে কাণা প্রথম-মানুষের ধারণা পায়, সে তাঁর উপর কৃতজ্ঞ থাকে না কি? এই দুর্ভাগ্য নারীজন্ম আমার! স্বামী, সন্তান—কারো জন্য ত বুকের এক ফোঁটা রক্তও

ক্ষয় হয় নি! প্রথম-মানুষ বলতে যেখানে একটুখানি ছুঁচ ফুট্‌ল, তার মুখে এত রক্তও কি বেরুল! আমার বুক শূন্য করে—ঝলকে ঝলকে—”

“একটু শান্ত হও মা—মিছে এত অনুতাপ করছ কেন?”

“অনুতাপ! কেন, কি জানি। বুঝি, এ অনুতাপও নয়। তাঁকে আমি চাইতাম, ডাক্‌তাম, তিনি আমার জীবনের কোন খোলা সোজা দরজা দিয়ে না এসে এমনভাবে এলেন কেন, বলুন দেখি? কান্না পায় না বুঝি? চিনেও চেনবার জো নাই, বুঝেও বোঝা যায় না—”

রুগ্নার শ্বাস ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল। তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠে গঙ্গাজল সিঞ্চন করিয়া গুরু বলিলেন, “আর কি, বল?”

“যদি কিছু দোষ থাকে আমার, আপনার চরণে যে সব নিবেদন করে যাচ্ছি—”

“ইংরাজি ভাবের অনুসরণ করছ মা? আমার কাছে এই ভ্রম-স্বীকার—বেশ, তাতেই যদি তোমার শান্তি হয়, তাই সত্য হোক্।”

“ইংরাজি-সংস্কৃত এখন আমি আলাদা দেখতে পাচ্ছি না যে বাবা। এক তিনি, —আমার সেই তিনি—সমস্ত তীর্থের দেবতা, আমার এই প্রাণ-ফাটা কান্নার—এই দুর্ব-বেশী-চাওয়ার দুর্ল্লভ মণি, দেশের বিদেশের যেখান দিয়ে হোক্ যেমন করে হোক্, তাঁকেই আমি চাই,—তাঁকে—বাবা, আমার সেই তাঁকে—”

“সত্যি, মানুষেই ভুল বোঝে। আমি যা বুঝতে পারছি না, সে প্রহেলিকাও ক্রমে সহজ হয়ে যাবে। তাঁর নামের শক্তি যে অমোঘ, তাঁর নাম কর মা।”

“তাঁর কি নাম, গুরু? পৃথিবীর সমস্ত শব্দ সমস্ত অক্ষর সবই কি তাঁর নাম নয়? আমার প্রাণ যে এই শেষ-কান্নার চীৎকারে চেঁচিয়ে মরছে, এর প্রত্যেক ধ্বনিটুকুও যে তাঁরি নাম, আমার বৈকুণ্ঠেশ্বর, আমার ত্রিজগদীশ্বর—আমার—আমার সব-কিছুরি ঈশ্বর—”

“মা, মা, বল গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম! বল তারক-ব্রহ্ম-রাম—বল—”

রুগ্নার দৃষ্টি স্থির হইয়া আসিতেছিল, কণ্ঠ মৃদু; তবু স্পষ্ট স্বরে তাঁহার ওষ্ঠে উচ্চারিত হইল—

“যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া
হৃদয় ছাপিয়া ভুবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে।”

সমাপ্ত

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

বসন্ত-বিলাস

আজি ফাল্‌গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ্ ফুট্‌ল?
কেন কিংশুক ফুল চীন বাস গায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল?
পিক পঞ্চম গায়,
বয় দক্ষিণ বায়,
নাচে ফুল-হিন্দোল ছন্দের দোল—ঘোম্‌টার জের টুট্‌ল।

হাসে সুন্দর মুখ, খঞ্জন চোখ, জাফ্‌রান্-রঙ্ অঞ্চল;
নাহি নৃত্যের শেষ, সঙ্গীত-রেশ, ফুল-বাণ সব চঞ্চল।
ওই আন্‌মন্ চম্পায়
মান স্বপ্নের আব্‌ছায়
কার যৌবন লোল হাস্যের রোল, রূপ-দর্পণ ঝল্‌মল্?

এল জ্যোৎস্নার রাত, বন্ধুর সাথ নন্দন-ফুল-শয্যা;
খেল' রঙ্গের ফাগ, চুম্বন-রাগ—লজ্জায় দাও লজ্জা।
মল্লীর সৌরভ
চুমে কুন্তল-গৌরব—
ওরে চায় প্রাণ মন আপ্‌নার জন, বন-ময় ফুল-সজ্জা।

ওরে কঙ্কণ-সুর ঝঙ্কার তোল্, আয় ফুল-মৌ পান কর্,
জাগে বংশীর তান, হর্ষের বান, রাত-ভোর গীত-নির্ঝর;
খোল্ কাঞ্চীর বন্ধন,
হোক্ উন্মদ ঘূর্ণন,
খসে' যাক্ ওড়্‌নার কাঞ্চন পাড়, কুঞ্জের ঝুল্‌নার 'পর।

ওরে খোল্ অর্দ্ধেক উন্মীল চোখ, অঞ্জন আর কাজ নেই,—
ওলো আল্‌তায় লাল পা'র তল যার মঞ্জীর তার বাজ্‌বেই;
আজি উৎসব-লগ্ন,
ভুজ- পল্লব নগ্ন,
জাগে বল্লভ্ তোর বক্ষের ঠাঁই, তন্দ্রার ঘোর ছুট্‌বেই।
?

বুকে তাল দেয় ওই রত্নের হার—ডুব দেয় সব অন্তর,
আঁকি' চন্দন-রস-আল্‌পন আজ ধ্যান কর্ প্রেম-মন্তর,—
সুর- মন্দার-গন্ধি,
প্রিয় পর্শন-বন্দী
ওই সুন্দর মুখ যৌতুক দিক্ উদ্বেল প্রাণ মন তোর।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌজাত্যবিদ্যা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ *

সৌজাত্যবিদ্যা প্রয়োগ-বিদ্যা। জীবতত্ত্ব এবং বিশেষরূপে তাহার শাখা—বংশানুক্রম-তত্ত্বের উপর ইহার ভিত্তি। জীবতত্ত্ব ও বংশানুক্রমতত্ত্ব যে-সকল নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছে—সেইগুলিকে সমাজক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই সৌজাত্যবিদ্যার কাজ।

সৌজাত্যবিদ্যার উদ্দেশ্য জাতির উৎকর্ষ বিধান (race-culture) করা। মানুষই জাতির প্রধান সম্পত্তি। যে-জাতির মধ্যে যথেষ্ট-পরিমাণ দেহ-ও-মনে-সবল মানুষের উদ্ভব হয় সেই জাতিই উন্নতির শিখরে আরোহণ করে; এবং যাহার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির আধিক্য দৃষ্ট হয় তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টির উপায় করা দরকার। আধুনিক সমাজসংস্কারকেরা অনেকেই এই কথাটা তলাইয়া বুঝেন না। পরিবেষ্টনী (Environment) ও ক্ষেত্র উভয়ই ভবিষ্যৎ-মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই; কিন্তু আধুনিক বংশানুক্রমতত্ত্বের হিসাব-মতে পরিবেষ্টনী অপেক্ষা ক্ষেত্রের প্রভাব অনেক বেশী।—কার্ল পিয়ার্সন বলেন প্রায় দশ-গুণ বেশী। (১) সুতরাং বিজ্ঞান-অনুযায়ী চলিতে হইলে পরিবেষ্টনী অপেক্ষা ক্ষেত্রের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু সকল-দেশেরই সমাজসংস্কারকেরা যে-সব বিষয় লইয়া সচরাচর আন্দোলন করেন, সেগুলির অধিকাংশই পরিবেষ্টনীর সঙ্গে জড়িত। এমন কি পরিবেষ্টনী সংস্কারের জন্য তাঁহারা যেরূপ উৎসাহ দেখান, ক্ষেত্র সংস্কারের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও মন দেন কিনা সন্দেহ। ফলে অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়।

বংশানুক্রমতত্ত্ব অনেকদিন হইল কতক-গুলি নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা জানি যে পিতামাতার গুণসমবায় হইতেই সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর উদ্ভব। যে-যে-গুণ পিতামাতার মধ্যে বর্ত্তমান, সন্তানের তাহাই মূলধন; তাহা অপেক্ষা নূতন-কিছু লইয়া তাহার কারবার করিবার উপায় নাই। কেবল তাহাই নহে। পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী ও তদূর্দ্ধ অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষের গুণাবলীও পিতামাতার মধ্য দিয়া সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হয়। এ-সব কথা আরও কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে "ভারতী"তে প্রকাশিত দুই-একটি প্রবন্ধে পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি। যাহাহউক মোটামুটি এই কথার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে দেহ-ও-মনে-উৎকৃষ্ট সন্তান পাইতে হইলে শুধু যে সেইরূপ উৎকৃষ্ট পিতামাতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা নহে, উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষের উপরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ জীববিজ্ঞানের মতে দুইতিন পুরুষ পরেও কোন কোন গুণ হঠাৎ নিম্নতন পুরুষে দেখা দেয়। (২)

সুতরাং জাতির উৎকর্ষ বিধান করিতে হইলে যখন সর্ব্বাগ্রে দেহ-ও-মনে-উৎকৃষ্ট মানুষ সৃষ্টির দরকার, তখন উহার জন্য চাই দৈহিক ও মানসিক রোগমুক্ত সৎবৃত্তিশালী পিতা-মাতা। কেবল তাহাই নহে, তাহার জন্য পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী প্রভৃতি উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদের গুণাবলীর প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। এককথায় ইহাকেই বলে ক্ষেত্র। ভবিষ্যৎ-সন্তানের উপর এই ক্ষেত্রেরই প্রভাব বেশী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেষ্টনীর প্রভাবও যে আছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আপাততঃ আমরা সেগুলির কথা কিছু বলিব না। ক্ষেত্রের কথা বলাই আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য।

এই ক্ষেত্রের সংস্কার করিতে হইলে পিতামাতানির্ব্বাচন—এককথায় বিবাহের দিকে সমাজকে বেশী করিয়া মনোযোগ দিতে হইবে। অর্থাৎ বর ও কন্যা উভয়ের উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কোন দৈহিক ও মানসিক বিকৃতি আছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। যে-সমস্ত দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে—তাহাদের কোন সূচনা উভয় পক্ষের মধ্যে পাইলে বিবাহ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে সদ্বংশ ও বিশুদ্ধ বীজ প্রভৃতির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থ, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি নীচ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিলে সমাজ ও জাতি দ্রোহিতা করা হইবে।

অনেক ভদ্রব্যক্তি এই কথা পড়িয়া হাসিয়া হয়ত বলিবেন যে বিজ্ঞানবিদ্যার এত বাগাড়ম্বর করিয়া এই অতি সাধারণ কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; উহা সকলেই জানে ও সকলেই ঐরূপ

(*) ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ "Eugenics"এর বাঙ্গলা "সুপ্রজনন তত্ত্ব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন হইল রবীন্দ্রনাথ ঐ অর্থে "সৌজাত্যবিদ্যা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম।

(১) Problems of Practical Eugenics—Karl Pearson.

(২) See Darwin—The Origin of Species.

করিয়া থাকে। কিন্তু একটু নিরপেক্ষ হইয়া ভাবিলেই দেখা যাইবে যে মানুষ মুখে যত বড়াই করুক না কেন, নিজেদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিদ্যার সাধারণ নিয়মগুলাও বড়-একটা মানিয়া চলে না। ঘোড়া, গরু, কুকুর, পাখী প্রভৃতি নানাবিধ পোষাপ্রাণী অথবা নানারূপ উদ্ভিদ জন্মাইতে মানুষ বিজ্ঞানবিদ্যার খুবই প্রয়োগ করিয়াছে,—বিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া ঐ সকলের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; কিন্তু নিজেদের জাতির উৎকর্ষসাধনের জন্য তাহার তুলনায় কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই বলিলেই হয়। এ-ক্ষেত্রে তাহার বিজ্ঞানবিদ্যা অনেকটা পুঁথিগতই রহিয়াছে। তাহা না হইলে আজ মানবসমাজে আমরা এত দুর্ব্বল, রুগ্ন, পঙ্গু, মানসিক-বিকারগ্রস্ত লোকের আধিক্য দেখিতে পাইতাম না। ধন, মান, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির দোহাই দিয়া, নানারূপ স্বার্থের প্ররোচনায়, কামের তাড়নায় প্রতিনিয়তই ত সমাজে অযোগ্যের বংশবিস্তারের সুবিধা হইতেছে ও সমাজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হইতেছে। আজ এই সভ্যতা ও বিজ্ঞানের যুগে আমরা যদি তাহার প্রতিকার করিতে না পারি, তবে বৃথাই আমাদের বিজ্ঞানের বড়াই।

আসল কথা সমাজ ও জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত-স্বার্থকে বলি দিতে এখনও মানুষ অভ্যস্ত হয় নাই। কিন্তু জাতির উৎকর্ষ বিধান করিবার প্রধান উপায় এই স্বার্থ-বলি। নিজের ক্ষুদ্র সুবিধা ত্যাগ করিয়া যাহাতে জাতি ও সমাজের শাশ্বত মঙ্গল হয় তাহাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। সেই উদ্দেশ্যে যদি সমাজকে ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহাও করিতে হইবে। যে-বিবাহ এ-যাবৎ প্রায় ব্যক্তিগত ব্যাপারই আছে, তাহাকে সত্যরূপে সামাজিক ব্যাপার করিয়া তুলিতে হইবে। ভবিষ্যতে সমাজই পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন করিবে, উৎকৃষ্ট সন্তানের যাহাতে উদ্ভব হয় তাহার উপায় করিবে। যাহারা যোগ্য তাহাদিগকেই কেবল বংশবিস্তারের অনুমতি দেওয়া হইবে; যাহারা অযোগ্য,—রুগ্ন, দুর্ব্বল, বা বিকারগ্রস্ত—তাহাদিগকে দূষিত বীজের দ্বারা সমাজ ধ্বংস করিতে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। ইউরোপের কোন কোন পণ্ডিত এমনও কল্পনা করিতেছেন যে ভবিষ্যতে প্রত্যেক দেশে Marriage Board বা বিবাহ-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইবে। সেই বোর্ড হইতে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া যাহাদিগকে সার্টিফিকেট দিবেন কেবল তাহারাই সমাজ ও জাতির মঙ্গলার্থে বিবাহ করিবার অনুমতি পাইবে। (৩) অবশ্য এ কল্পনা কার্য্যে কখনো পরিণত হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভবিষ্যতে জাতির উৎকর্ষের জন্য সমাজকে যে এখনকার চেয়ে বেশী-করিয়া বিবাহ-ব্যাপারের উপর দৃষ্টি দিতে হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে-সকল সমাজ এই বিষয়ে অমনোযোগী হইবে তাহারাই জীবনযুদ্ধে পিছাইয়া পড়িবে।

(৩) Thomson—Heredity.

Eugenics বা সৌজাত্যবিদ্যার এই সকল উপায় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি শোনা যায়। একটা আপত্তি এই যে যদি বিবাহ সম্বন্ধে সৌজাত্যবিদ্যার এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে তাহাতে জাতির উৎকর্ষ বিধান যতটা হউক আর নাই হউক, সমাজ হইতে মনুষ্যত্ব জিনিষটি লোপ পাইবে। যাহাদিগকে আমরা অযোগ্য বলিতেছি—সেই সকল শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা-গ্রস্ত লোকদিগকে এইরূপ কঠোরভাবে বর্জ্জন করিতে থাকিলে মানব-হৃদয়ের কোমল অংশটি আমরা হারাইয়া বসিব;—দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, অনুকম্পা প্রভৃতি বৃত্তি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে; জাতির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে এত বেশী দৃষ্টি দিতে গিয়া, ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব-বিকাশের একটি বিশেষ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিব। পশুপক্ষীপ্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, মানবসমাজে আমরা তাহাকে অত কঠোর করিয়া তুলিতে পারি না। বরং যাহাতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের এই কঠোরতা দূর করিতে পারি, তাহাই আমাদের মনুষ্যত্বের একটি সাধনার বিষয়।

একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এই আপত্তির কোন মূল্য নাই। কারণ সৌজাত্যবিদ্যা অযোগ্যকে সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিতে বা তাহাদিগকে বনবাস দিতে বলে না। সে বলে যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজে অযোগ্যের উদ্ভব আর না হয় তাহাই কর; যাহাতে অযোগ্যেরা বংশবিস্তারের সুবিধা না পায় তার দিকেই দৃষ্টি রাখ। অযোগ্যদের উপর যে দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, অনুকম্পা, ভালবাসা আছে তাহা বর্জ্জন করিতে সৌজাত্যবিদ্যা কখনই বলে না। বরং একটু দূরদৃষ্টির সহিত ঐ সকল বৃত্তির ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেয়। শুধু বর্ত্তমানের মানবের জন্য নয়, বর্ত্তমান ও অনাগত সমস্ত মানবের যাহা মঙ্গল, তাহার জন্য চিন্তা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

কিন্তু আর একটি আপত্তি এই হইতে পারে যে নিষ্কামভাবে শুধু সমাজের মঙ্গলের জন্য বৈজ্ঞানিক বিবাহ অসম্ভব। নরনারীর প্রেম বলিয়া একটা কথা আছে। সেই প্রেম সৌজাত্যবিদ্যার বা বংশানুক্রমের ধার ধারে না। সুতরাং বিবাহব্যাপারে এই প্রেমের কথাটিও ভাবিতে হইবে;—শুধু বংশানুক্রম লইয়া মাথা ঘামাইলেই চলিবে না। যেখানে বরকন্যার প্রেম হইবে সেখানে হয়ত সৌজাত্যবিদ্যা সার্টিফিকেট দিবে না; আর যেখানে বংশানুক্রমের নিয়ম মিলিয়া যাইবে সেখানে হয়ত দম্পতীর প্রেমের নামগন্ধও থাকিবে না। আর জীববিদ্যাতেও বলে যে দম্পতীর মনের মিল থাকা উৎকৃষ্ট সন্তান-উৎপাদনের পক্ষে একটি প্রধান কথা। যে দম্পতীর মধ্যে ভালবাসা নাই তাহাদের উৎপন্ন সন্তান দেহ ও মনে ভাল হইতে পারে না।

উপরোক্ত কথাগুলি কিয়ৎপরিমাণে সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু চিন্তা

করিলে বুঝা যাইবে যে, জাতির মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ সমস্যাও এড়ানো যাইতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই যে বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার প্রেম হয় তাহা নহে। বিবাহের পর পরস্পরের সাহচর্য্যেই অনেক স্থলে প্রেম জন্মায়। যাহাকে আমরা first love বা প্রথম-প্রণয় বলি তাহা যে সকল সময়েই স্থায়ী প্রণয়ে পরিণত হয়, তাহাও নহে। অনেক স্থলে তাহা যৌবনের মোহ মাত্র। সুতরাং জাতির মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমরা দেহ ও মনে সুস্থসবল দম্পতীর মিলন ঘটাইয়া দিই, তবে অনেক স্থলেই যে তাহাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইবে ও তাহাতে উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এরূপ হইতে পারে যে অযোগ্যদের মধ্যেও অনেক সময় গভীর প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে, বা একপক্ষ অযোগ্য, আর-এক পক্ষ যোগ্য এরূপ নরনারীর মধ্যেও প্রেম জন্মিতে পারে। সে অবস্থায় আমরা কি করিব? সেই প্রেমকে কি আমরা বাধা দিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় দিব? কবি ও প্রেমিকের এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে প্রেম ও কাম এক নহে। নরনারীর মধ্যে প্রেম হইলেই যে যৌনসম্মিলন হইবে এরূপ কোন কথা নাই। যদি অযোগ্য নরনারীর মধ্যে সত্যই প্রেম জন্মিয়া থাকে, বেশত তাঁহারা বিবাহ করিয়া মনের সুখে থাকুন, বৈজ্ঞানিক তাহাতে বাধা দিবেন না। কিন্তু তাঁহারা যেন রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান উৎপাদন করিয়া জাতির অমঙ্গল না ঘটান। তাঁহাদের দাম্পত্যসম্বন্ধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক হউক, দেহের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক না থাকে। কথাটা একটু অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে সভ্য-মানব বিশুদ্ধ প্রেমকে উচ্চাসনে বসাইয়া পূজা করিবার মন্ত্র প্রচার করিতেছেন তাঁহার নিকট হইতে বৈজ্ঞানিকের বোধ হয় এই দাবী করা অন্যায় হইবে না। সভ্যমানব সমাজ ও মঙ্গলের জন্যই সন্তান উৎপাদন করিবেন, কামের বশবর্ত্তী হইয়া করিবেন না, ইহা বোধ হয় বিজ্ঞানবিদ্যাগর্ব্বিত বিংশশতাব্দীতে আশা করা যাইতে পারে।

অনেকে আর-একটা কথা বলেন যে জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ ও মনের সুস্থতা ও সবলতার জন্য অত ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই,—ওটা বাড়াবাড়ি! জাতির প্রধান সম্পত্তি যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এই প্রতিভা প্রায়ই অতি সাধারণ পিতামাতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। আবার নানারূপ দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ হয়। এমন কি, প্রতিভা জিনিষটাই ধরিতে গেলে একটু অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতির ফল। নিতান্ত স্বাভাবিক দেহ ও মন যাহাদের, এমন লোকের মধ্যে প্রায়ই প্রতিভার স্ফুরণ হয় না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রতিভার জন্ম সমাজে অতি বিরল ব্যাপার। সব জাতির মধ্যেই শতাব্দীতে মাত্র দুই-এক জন প্রতিভা জন্মিয়া থাকেন। প্রতিভার জন্ম অনেকটা দৈবপ্রেরিত। সমাজের

অধিকাংশ লোকই প্রতিভাশালী নহে। এই সকল প্রতিভাহীন কিন্তু সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিমান লোকের উপরই জাতির ভরসা। তাই প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিয়া জাতির মধ্যে যাহাতে দেহমনে-সুস্থ যথেষ্ট পরিমাণ সাধারণ লোকের উদ্ভব হয় তাহা করাই উচিত। তাহাতেই জাতির উৎকর্ষ ও সমাজের কল্যাণ। সৌজাত্যবিদ্যার উদ্দেশ্য এই জাতীয় উৎকর্ষ ও সামাজিক কল্যাণ বিধান করা।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

সুরের বন্ধু

(গল্প)

সে ছিল অন্ধ। অন্ধ-ছেলের দ্বারা আর কি কাজ হ'বে? তাই তার বাপ-মা তাকে গান-বাজনা শিখ্‌তে দিলে।

সে খুব আনন্দের সঙ্গে সেতার-শেখা আরম্ভ করলে; কিন্তু ওস্তাদজি বল্লেন —"ছেলে বড় বেহুঁস্, বুদ্ধিশুদ্ধি ভারি কম;—? কখনো কিছু শিখতে পারবে না।"

এই শুনে অন্ধর ভারি দুঃখ হ'ল। সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে যেমন-করে পারি সেতারকে আমি দখল করবই! কিন্তু তাতে কোনো ফল হ'ল না। ওস্তাদজি বল্লেন, ওর কিছুই হচ্ছে না! সে অবাক হয়ে ভাবত কেন এমন হয়? গুরু যা বলেন সে তো তা মন দিয়ে শোনে, যা দেখিয়ে দেন তা তো হাজার-বার অভ্যাস করে—তবু কেন এমন হয়? বেপর্দ্দা-গুলোকে তো সে বাঘের মতো ভয় করে, তবে তারই গায়ে কেমন-করে গিয়ে হাত পড়ে? এবং তালগুলোর সঙ্গে সে যে এত ভাব করতে চায়, তবু তারা ধরা দেয় না কেন?

তার সঙ্গে ওস্তাদজির কাছে যারা এক-সঙ্গে শিক্ষা আরম্ভ করেছিল, তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে তাকে ছাড়িয়ে অনেক-দূর চলে গেল। নূতন দল এল, তারাও চলে গেল। সে কেবল একলা যেখানে ছিল সেইখানে পড়ে রইল। মধ্যে মধ্যে নূতন সতীর্থ আসে বটে কিন্তু সে দুদিনের জন্য;—কেউ তার সঙ্গী হয়ে থাকে না। অন্ধ তার এই দুর্ভাগ্যের কথা একলাটি বসে-বসে ভাবে, আর তার দুই চোখ জলে ভরে আসে।

একটিমাত্র রাগিণী ওস্তাদ তাকে সাধনা করতে দিয়েছিলেন। সেইটিকে নিয়েই সে পড়েছিল; কিছুতেই তাকে আয়ত্ত করতে পারছিলনা বলে' তার সেই এক সুরের সাধনা সমাপ্ত হচ্ছিল না। ক্রমে এই রাগিণী তার সেই নিঃসঙ্গ-জীবনে একমাত্র সঙ্গিনীর মতো হয়ে উঠল। কিন্তু সেও এমন দুষ্টু

যে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না;—একটুখানি কাছে এসে ছুটে পালায়, একটুখানি সঙ্গ দিয়ে ব্যাকুলতা জাগিয়ে লুকিয়ে পড়ে!

অন্ধ তার ঐ বন্ধুর জন্যে দিনে-দিনে পাগল হয়ে উঠল। পেতে-পেতে পাওয়া হয় না বলে তার পাবার লোভ ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। না-পেয়ে তার দুঃখ হ'ত বটে, কিন্তু এই দুঃখের মধ্যে একটি সুখের আবেশ ছিল। কারণ পাবার আশার মধ্যেই যে তার ঐ বন্ধুটি লুকিয়ে ছিল। তা-ছাড়া সে তো অন্য বন্ধুর মতো তাকে একেবারে ছেড়ে চলে যায়নি;—সে কাছাকাছিই আছে—কেবল লুকিয়ে বেড়ায় মাত্র। একদিন-না-একদিন তাকে যে ধরা যাবে এই অপার আনন্দ তার সমস্ত দুঃখটিকে সুখের সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিত।

ওস্তাদজি একদিন বল্লেন—"বাচ্ছা, ও সুর ছেড়ে দে! আমি তোকে একটা নতুন সুর দিই—তুই তারই সাধনা কর।"

অন্ধ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লে—"না গুরুজি, না। আমি ও-রাগিণীটিকে ছাড়তে পারব না—আমি নতুন সুর চাইনে!"

কত সাধ্যসাধনা করে ওস্তাদজির কাছ থেকে নতুন সুর আদায় করতে হয়, তিনি যেচে তাই দিতে চাইলেন, অন্ধ তা নিলেনা দেখে ওস্তাদজি রেগে বল্লেন—"বোকা কোথাকার!"

অন্ধ চুপ-করে রইল। আগে নতুন নতুন সুর পাবার জন্যে তার মনটা কি-রকম লালায়িতই না হ'ত! গুরুজি সতীর্থদের নতুন-নতুন সুর দিতেন, তাই নিয়ে তারা খেলা করত—বাহবা পেত; এর জন্যে তার মনে কত হিংসাই না হয়েছে। নিজের দুর্ভাগ্য দেখে তার ক্ষোভের অন্ত থাকত না। কিন্তু এখন তার নতুনের প্রতি কোনো লোভ হল না। তার মনে হতে লাগল সে জীবনের মধ্যে এমন-একটি বন্ধুর আভাস পেয়েছে যাকে বুকের আসন থেকে ঠেলে-দিয়ে নতুনকে সেখানে বসাতে প্রাণ কেঁদে ওঠে।

একলাটি সেতার-হাতে বসে সেই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপের জন্যে সে সাধ্য-সাধনা করত। হঠাৎ একটা ঝঙ্কারের মধ্যে যেই সেই বন্ধুর একটুখানি আবির্ভাব হ'ত, তার সমস্ত হৃদয়-মন আনন্দে শিউরে উঠত। মনে হ'ত তার বন্ধ-দৃষ্টি যেন খুলে গেছে। সে চকিতের মতো দেখতে পেত খুব দূর-আকাশের নীল পর্দ্দার ভিতর থেকে যেন কোন্ অপ্সরী-রাজ্যের সাদা আভাটি ফুটে বেরুচ্ছে। সুর-সুন্দরীরা হাওয়ার গায়ে রূপোলি-ওড়না ছড়িয়ে বিচিত্র লীলায় ভেসে চলেছে। তাদের গতির শব্দে নব-নব সুর ঝরে পড়ছে, এবং তার ভঙ্গীতে কত অপরূপ নাচের ছাঁদ ফুটে উঠছে!

এই দেখাটুকু পেত সে মুহূর্ত্তের জন্যে। তার পর আবার যে-অন্ধকার সেই অন্ধকার! তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে সেতারের পর্দ্দায় আঙুল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে তার বন্ধুটিকে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে বেড়াত—ওগো কোথায় আছ তুমি, ওগো কোথায় আছ তুমি!

এই ডাকে যারা সাড়া দিয়ে উঠত, তাদের মধ্যে কেউ ছিল তার অল্প-পরিচিত, কেউ ছিল একেবারে অপরিচিত। কেউ ধমক দিয়ে বলে উঠত—'মিছামিছি আমার ঘুম ভাঙাও কেন?' কেউ রেগে বলে উঠত—'অসময়ে আমার ডাক পড়ে কেন?'

কেউ তার স্পর্শে থাম্‌কা রাগে গোঁ-গোঁ করতে থাকত; কেউ লজ্জাবতী লতাটির মতো শিউরে-শিউরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত। কেউ তীরবেগে ছুটে চলে যেত, কেউ ধীরে ধীরে ফণা তুলে উঠে তার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করে ধরত। কেউ ছোটো-ছেলের মতো খিল্‌খিল্ করে হেসে পালাত; কেউ যুবতীর ঢল্‌ঢলে-লীলার বিদ্যুৎ ছুটিয়ে চলে যেত। কেউ কেঁদে-কেঁদে কি মিনতি জানাত। কেউবা কিছু বলতনা, শুধু দীর্ঘ-শ্বাস ফেলত। এম্‌নিতর কত কি হ'ত। এদের সবাইকে একে-একে ছাড়িয়ে সে বন্ধুর সন্ধানে এগিয়ে যেত। সে বেশী-কিছু পেতনা;—কখনো তার বন্ধুর একটুখানি আঁচোলের ছায়া তার মুখে আসে লাগত, কখনো-বা একটুখানি নিশ্বাস গায়ে এসে পড়ত। তাইতেই সে খুসী হয়ে উঠত।

এমনি-করে তার দিন কাটছিল। একদিন ওস্তাদের বাড়ি সেতার-হাতে সে বসে আছে, হঠাৎ কে এসে ভারি মিষ্টি তরুণ গলায় বল্লে—"অন্ধ, তোমার সেতার আমায় শোনাও।"

অন্ধর মনে হ'ল সেই গলার সুরের আঘাতে সেতারের সমস্ত তারগুলো যেন নৃত্য করে বেজে উঠল। যে-সুর তার হাতে বাজেনা—যার সাধনা তার জীবনের ব্রত, সেই রাগিণী যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে ফুটে উঠল। অন্ধ বলে উঠল—"দেবী! তুমি কেগো, তুমি কে?"

মেয়েটি বল্লে—"আমি কে তা তো প্রকাশ করতে পারব না। তুমি আমাকে দেখতে পাবেনা, জানতে পারবেনা, তাই তো তোমার সাম্‌নে বার হ'তে পেরেছি।"

অন্ধ বল্লে—"দেবী, তোমার ঐ গলার সুর তো কখনো শুনিনি—তুমি থাক কোথায়?"

মেয়েটি বল্লে—"অন্তঃপুরে।"

অন্ধ বল্লে—"অন্তঃপুরে? তবে আজ বাইরে এলে যে!"

মেয়েটি বল্লে—"আজ বাইরে এসেছি তোমার গান শুনব বলে।"

অন্ধ বল্লে—"আমার গান? আমি তো গাইতে জানিনা।"

মেয়েটি বল্লে—"তোমার মতন সুরের ওস্তাদ আর-কেউ আছে না কি!"

অন্ধ বল্লে—"দেবী, পরিহাস করছ? আমি অন্ধ—আমি সঙ্গীতের কিছুই জানি না।"

মেয়েটি বল্লে—"অন্ধ, মিথ্যা বোলোনা। তোমার সঙ্গীত আমি শুনেছি। সঙ্গীতের আমি কিছুই জানিনা, তবু অন্তঃপুরের বন্ধ-দুয়ার ঠেলে তোমার সেতারের ঝঙ্কার আমার কানে গিয়ে লাগে, আমি কাজ করতে-করতে আন্‌মনা হয়ে যাই। নিস্তব্ধ দুপুরবেলা যখন পা-ছড়িয়ে চুপ-করে বসে থাকি, তখন তোমার ঐ তারের কান্না এসে আমার মনকে উদাস করে দেয়। সন্ধ্যা-প্রদীপটি জ্বালবার সময় অন্ধকারের

সঙ্গে-সঙ্গে তোমার ঐ সুর ভেসে আসে আর আমার মনে হয় আমার বুকের মধ্যে যেন একটি সন্ধ্যা-তারা ফুটে উঠল। আজ সকালে তুমি কী তার টেনেছ বলতে পারিনা, আমাকে অন্তঃপুর থেকে টেনে এনে তবে ছাড়লে!"

অন্ধ বল্লে—"দেবী, এ তুমি কি বলছ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মেয়েটি বল্লে—"এখন কথা রাখো; সেতার শোনাও। আমার বেলা বয়ে গেল।"

অন্ধ বল্লে—"আমি একটিমাত্র সুর পেয়েছি, তাও আমার এখনো অভ্যাস হয়-নি। তোমায় আমি কি শোনাব?"

মেয়েটি বল্লে—"তাই শোনাও!"

অন্ধ তখন সেতার ধরলে। তার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল—"ওগো আমার বন্ধু, তুমি এসে আমায় এই বিপদ থেকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।"

প্রথম তারটির গায়ে আঙুল ছোঁয়াতেই অন্ধ যেন শুনতে পেলে কে বলে উঠল, 'আমি এসেছি বন্ধু, এসেছি।' অন্ধ তখন তারের গায়ে আঙুল সরিয়ে-সরিয়ে বলতে লাগল, 'কই বন্ধু, তুমি কই?' সুর বলতে লাগল, 'এই যে, আমি এই যে!' এমনি-করে বিচিত্র সুরের ভিতর দিয়ে, বন্ধুর নাগাল পাবার জন্যে, অন্ধ ছুটে চলতে লাগল। সেতারের অঙ্গ বেয়ে সুরের বৃষ্টি ঝরে-পড়তে লাগল। অন্ধ তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে, মেয়েটি তন্ময় হয়ে শুনছে;—মনে হতে লাগল পৃথিবীর আর-সব শব্দ যেন থেমে গেছে, কেবল এই সুরেরই স্রোত চলেছে।

মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—"অন্ধ, ধন্য তুমি ধন্য!"

হঠাৎ অন্ধর মনে হল তার বন্ধ-দৃষ্টি যেন খুলে গেছে;—আজ আর দূর-আকাশের গায়ে সেই অপ্সরারাজ্য নয়, আজ তার চোখের সাম্‌নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! অন্ধ সেতার থামিয়ে চীৎকার-করে বলে উঠল—"বন্ধু, তুমি এত সুন্দর! এমন রূপসী তুমি!"

মেয়েটি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"এ কি! তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ না কি?"

অন্ধ বল্লে—"পাচ্ছি বন্ধু, খুব পাচ্ছি। চোখ-ভরে দেখতে পাচ্ছি।"

মেয়েটি বল্লে—"ছি ছি ছি, কি লজ্জার কথা!"—বলে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

অন্ধর সমস্ত দৃষ্টি আবার অন্ধকার হয়ে এল। মেয়েটি যেখানটিতে বসেছিল সেই জায়গাটা হাতড়ে-হাতড়ে দেখে যখন দেখলে শূন্য, তখন তার উপর আছাড়-খেয়ে পড়ে সে কাঁদতে লাগল।

অন্ধর চোখের জল শুকিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মনের কান্না থামল না। সে যখনই সেতার হাতে করে বসে, তার আঙুলগুলো কেঁদে-উঠে সমস্ত সেতারটাকে কাঁদাতে থাকে। একদিন সে আপন-মনে বসে-বসে এমনি-করে সেতারটাকে কাঁদাচ্ছে, এমন সময় মেয়েটি এসে দূর থেকে বল্লে—"ওগো অন্ধ, তোমার ঐ কান্না থামাও। চোখের জল যে আর ধরে-রাখা যায় না!"

অন্ধ সেতার থামিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে বলে উঠল—"এস বন্ধু, এস, কাছে এস।"

মেয়েটি চম্‌কে উঠে বল্লে—"ছি, ছি, ছি! এ কি লজ্জার কথা! লোকে শুনলে নিন্দা করবে যে!"

অন্ধ অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

মেয়েটি বল্লে—"তুমি কি জাননা আমি এখানে লুকিয়ে আসি? আমার যে বাইরে আসবার যো নেই—আমি যে অন্তঃপুরে থাকি!"

অন্ধ বল্লে—"দেবী, তুমি এখানে কার কাছে আস? কেন আস?"

মেয়েটি বল্লে—"তোমার কাছে আসি।"

অন্ধ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল—"আমার কাছে? তবে কি তুমি আমার বন্ধু?"

মেয়েটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"তোমার বন্ধু আমি কেমন-করে হ'ব?"

অন্ধ বল্লে—"আমার বন্ধু নও, তবে যে আমার কাছে আস?"

মেয়েটি বল্লে—"সে তুমি অন্ধ বলে। তুমি আমায় দেখতে পাওনা, তাই কোনো লজ্জা নেই, তাইত আমি আসতে পারি!"

অন্ধ বল্লে—"যদি তাই হয় দেবী, তবে আমার এই অন্ধতা আজ সার্থক হল।"

মেয়েটি বল্লে—"আচ্ছা অন্ধ, তুমি যে বল্লে সেদিন আমায় দেখেছ—সে কেমন দেখেছ বল দেখি?"

অন্ধ বল্লে—"অপূর্ব্ব সুন্দরী!—তেমন কখনো দেখিনি!"

মেয়েটি বল্লে—"সত্যি? আচ্ছা বর্ণনা কর দেখি!"

অন্ধ ব্যাকুল হয়ে বল্লে—"দেবী, সে রূপ কি করে বর্ণনা করব? কিসের সঙ্গে তুলনা করব? আমি যে কিছুই দেখিনি!"

মেয়েটি বল্লে—"তবে তুমি সত্যই অন্ধ?"

অন্ধ বল্লে—"হ্যাঁ দেবী, আমি সত্যই অন্ধ!"

মেয়েটি তখন চুপিচুপি বল্লে—"একটা কথা কাউকে বলবেনা, বল?"

অন্ধ বল্লে—"না!"

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে—"বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু!"

অন্ধর মনের অলিগলির ভিতর এই কথাটি কেঁপে-কেঁপে ঝঙ্কার তুলতে লাগল। মেয়েটি চলে গেলে সে সেতার নিয়ে বসল। তার আঙুলগুলো আজ যেন নৃত্য করে উঠল। তার হাতের সেতার আজ আকাশে-বাতাসে আনন্দলহরী তুলতে লাগল।

মেয়েটি ফিরে এসে বল্লে—"বন্ধু, এ কি! এ নতুন-সুর তুমি কোথায় পেলে? এ সুর ত কখনো শুনিনি!"

অন্ধ বল্লে—"এ কি তোমার ভালো লাগল?"

মেয়েটি বল্লে—"বন্ধু, ভালো লাগল কি-না বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার প্রাণে গিয়ে লেগেছে, তাই আমি ছুটে এলুম!"

অন্ধ বল্লে—"তবে শোনো।"

মেয়েটি একটু শুনে বল্লে—"অন্ধ, তুমি যে আশ্চর্য্য করলে! এ নতুন সুর তোমায় কে শেখালে? এমন সুর তো কখনো শুনিনি!"

অন্ধ বল্লে—"বন্ধু, এ সুর কেউ তো শেখায়নি। এ-সুর যে তুমিই আমার মনে বাজিয়ে দিয়ে গেলে!"

মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল—"সত্যি?"

অন্ধ বল্লে—"হ্যাঁ দেবী, সত্যি!"

মেয়েটি বল্লে—"দেখ বন্ধু, তোমার সেতার শুনে আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সুরটি আমিও গলা-খুলে গাই, কিন্তু—"

অন্ধ বল্লে—"কিন্তু কি দেবী?"

মেয়েটি বল্লে—"লোকে তাহলে নিন্দে করবে!"

অন্ধ বল্লে—"নিন্দে করবে কেন?"

মেয়েটি বল্লে—"আমি যে অন্তঃপুরে থাকি। আমার কি গলা-খোলবার যো আছে!"

মেয়েটি চলে যাচ্ছে দেখে অন্ধ ব্যাকুল-হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বন্ধু, আবার কখন্ আসবে?"

মেয়েটি বল্লে—"কখন্ আসব তা তো বল্‌তে পারিনা বন্ধু—আমায় যে লুকিয়ে আসতে হয়।"

অন্ধ বল্লে—"আমি যখন তোমায় ডাকব, তুমি এস।"

মেয়েটি শিউরে-উঠে বল্লে—"ছি ছি ছি! অমন কাজ কোরোনা। তোমার গলা অন্তঃপুরে গেলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে!"

অন্ধ বল্লে—"বন্ধু, সে ভয় কোরোনা। আমি সেতারের সুর দিয়ে তোমায় ডাকব।"

মেয়েটি বল্লে—"সে বেশ হবে! তোমার সেতারের ডাক আমার ভারি ভালো লাগে। কিন্তু বন্ধু, তুমি ত ডাকবে, আমি উত্তর দেব কি করে?"

অন্ধ বল্লে—"তাইত বন্ধু, তুমি উত্তর দেবে কি করে?"

মেয়েটি দুঃখিত হয়ে বল্লে—"আমি পারবনা।"

দিন কাটতে লাগল। অন্ধ কখনো মেয়েটির দেখা পায়, কখনো পায়না। কখনো তার বুকফেটে কান্না উঠতে থাকে, কখনো তার হৃদয় আনন্দে গলে যায়। কখনো সে সেতারটিকে কাঁদায়, কখনো আনন্দের স্রোতে ভাসায়। এমনি করে তার দিন কাটে।

ওস্তাদজির সমস্ত শিষ্য ক্রমে-ক্রমে নামজাদা গাইয়ে-বাজিয়ে হয়ে উঠতে লাগল। কেবল অন্ধ একলা একদিকে পড়ে রইল; কেউ তার খবরও করলেনা। সে আপন-মনে আপনার মনের সুর সেতারে বাজাতে লাগল;—একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, এম্‌নি-করে তার নিজের সুর শাখা বিস্তার করতে লাগল—মধ্যে রইল সেই মেয়েটি। সে আসে-যায়, বাজনা শোনে, বাহবা দেয়। কখনো চুপ-করে চোখের জলটি ফেলে উঠে যায়, কখনো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে থাকে, কখনো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে থর্ থর্-করে কাঁপতে থাকে। অন্ধ এই সব ছবি তার সেতারে তুলে নেয়—তার আর সুরের অভাব হয় না।

একদিন ওস্তাদজি একটা জল্‌সা করলেন। তাতে নানা দেশের গুণী নিমন্ত্রিত হ'লেন। তাঁর শিষ্যরা কেউ সেতার, কেউ বীণ, কেউ তানপুরো নিয়ে বসল। অন্ধরও সেখানে ডাক পড়েছিল। হাজার হোক সেও তো একজন শিষ্য বটে!

একে একে সমস্ত শিষ্য নিজের নিজের বিদ্যা দেখালেন—সকলেই বাহবা পেলেন। ওস্তাদজির সুখ্যাতি চারিদিকে উঠতে লাগল—অমন গুরু না হলে, এমন শিষ্য হয়!

অন্ধ এক-কোণে চুপটি করে বসেছিল। সব-শেষে ওস্তাদজি বল্লেন—"অন্ধ, তুমি যা জানো এইবার শোনাও।"

অন্ধ বল্লে—"ওস্তাদজি, আমি যে কিছুই শিখতে পারিনি। কি শোনাব?"

ওস্তাদজি বল্লেন—"তুমি যা জানো, তাই শোনাও।"

অন্ধ ভয়ে-ভয়ে সেতার তুলে নিলে। তার মনে-মনে এই আশা জেগে উঠল যে, বন্ধু যখন তার বাজনার এত তারিফ্ করে তখন তার ভয় কিসের! সে ধীরে-ধীরে পর্দ্দার উপর হাত ঠেকালে। সেতার গুম্‌রে উঠলো। সবায়ের মনে হল যন্ত্রে বেসুরো তান উঠেছে। শ্রোতারা মুখ-টিপে-টিপে হাসতে লাগল। ওস্তাদজি দাঁতে দাঁত চেপে হিস্-হিস্-শব্দে বলে উঠলেন—ছি! ছি! ছি!

অন্ধর কানে সেই তীব্র শব্দ গেল। তার সমস্ত হৃদয়টা লজ্জায়, দুঃখে কাঁপতে লাগল। তখন তার আঙুলগুলো কাঁপতে-কাঁপতে তার সেই কান্নার তারের উপর গিয়ে আছাড়-খেয়ে পড়ল। তার পর তার মন যত কাঁদে, সেতারের তারগুলোও তত কাঁদে!

শ্রোতারা পরস্পরের মুখ-চাওয়া চাওয়ি করে বলতে লাগল—"এ কি, পাগল না-কি! যা-খুসি তাই বাজায়—কোনো হিসেব নেই।"

ওস্তাদজি রেগে বলে উঠলেন—"থাম্ থাম্। —তোর আর বাজাতে হবেনা। ছি-ছি-ছি, তোকে কেন আমি সাগরেদ্ করেছিলুম। তুই আমার নামের উপর একটা কলঙ্ক দেগে রাখলি!"

অন্ধ সেতার থামিয়ে পথ-হাতড়ে-হাতড়ে সভা ছেড়ে চলে গেল। তার পর তার সেই নির্জ্জন জায়গাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল।

—"একি অন্ধ, তুমি কাঁদচ?"—বলে মেয়েটি এসে সেইখানে দাঁড়াল।

অন্ধ কোনো কথা কইলেনা—ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মেয়েটি বল্লে—"বন্ধু, তোমার সেতার কৈ?"

অন্ধ বল্লে—"চুলোয় যাক্ আমার সেতার! সেতারে আমার কি হবে! আমার সেতার কে শুনবে!"

মেয়েটি বল্লে—"সে কি বন্ধু! আমি শুনব বলে যে আশা-করে বসে আছি!"

অন্ধ মাটি-ছেড়ে উঠে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"সত্যি!"

মেয়েটি বল্লে—"আমি কি তোমায় মিথ্যা বলি!"—বলে সেতারটি কুড়িয়ে এনে অন্ধর হাতে তুলে দিলে।

অন্ধ সেতারটা নিয়ে তার ছেঁড়া তারগুলো আবার বাঁধতে সুরু করলে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রম-বিভাগ

(ক্রপটকিন হইতে)

ধনবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমাদের মতের প্রভেদ বিস্তর। এতদিন তাঁরা যে ভিত্তির উপর তাঁদের মতগুলি গড়ে তুলেছিলেন তা যে নিতান্ত কাঁচা তা প্রমাণ করবার সময় এসেছে। যে নতুন আলোয় সমাজের সমস্ত আবর্জ্জনা আমাদের নজরে ধরা পড়েছে, সেই আলো আমরা এর উপরেও ফেলতে চাই—ভিতরের যা গলদ আছে তা প্রকাশ করবার জন্যে।

অর্থশাস্ত্রের যে-কোন বই পড়লে দেখা যায় যে সেটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম উৎপাদন বা ফসল নিয়ে আলোচনা—এখানে অর্থসৃষ্টির নানা উপায়ের সবিস্তার বিবৃতি আছে; তাছাড়া শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাঁতি ও তৎসাহায্যে অধিক পরিমাণে শিল্পদ্রব্য-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এবং মূলধন সম্বন্ধে নানা কথা আছে। বইয়ের শেষে খরচ-সম্বন্ধে আলোচনা —অর্থাৎ কেমন করে লোকের দরকার মেটে, অধিকন্তু অর্থসঞ্চয় ও অধিকার-প্রমত্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরা কি-ভাবে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন, এই সব ব্যাপারের বিশেষ বিবরণ আছে।

অনেকে এই কথাটাই যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে করেন যে দরকার-বোধের আগে জিনিষগুলো তৈরি করা চাই; নইলে অভাব মেটাব কেমন করে? কিন্তু আমরা বলি, জিনিষ তৈরি করা ভাল কিন্তু সেই জিনিষের অভাব-বোধটা সকলের আছে কিনা সেটা সব-আগে দেখা দরকার। অসভ্য মানুষ যে শীকারের পিছনে ছুটত এবং ক্রমশ সভ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির আবাদ ও যন্ত্রনির্ম্মাণ এবং নানারকমের কল-কারখানা তৈরি করলে সে ত এই দরকারেরই দায়ে! দরকারের বোধটা অভাব-মেটাবার জিনিষ-তৈরীর চেয়ে আগেই দরকার। প্রথমে প্রয়োজনীয়তার অভাব-বোধ এবং পরে সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যে জিনিষ তৈরীর উপায়-আলোচনা আমরা সবচেয়ে প্রশস্ত ও যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি বলে মনে করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই প্রণালীর অনুসরণ করব।

ধনবিজ্ঞান, নামে বিজ্ঞান হলেও এতদিন কিন্তু তার সেই নামের কোন সার্থকতা ছিল না। আমাদের নির্দ্ধারিত প্রণালীমতে বিচার করলে এটির অর্থ একেবারে নতুন হয়ে দাঁড়ায়—কতকগুলো তত্ত্বের অর্থহীন সমষ্টি হবার পরিবর্ত্তে এটি সত্য একটা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। এখন এর সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে—মানুষের দরকারের বিশিষ্ট আলোচনা এবং যতদূর সম্ভব মানবীয়-শক্তির কম অপচয়ে সেই দরকার মেটাবার উপায়। উদ্ভিদ বা জীবতত্ত্বে শারীর-বিজ্ঞানের যে কাজ, সমাজতত্ত্বে ধন-বিজ্ঞানের সেই কাজ; অর্থাৎ অভাবের অনুধাবন এবং তা মেটাবার উপায়-নির্দ্দেশ। এইখানেই এর বিজ্ঞান নামের সার্থকতা।

মানুষের অভাব আলোচনা করতে গেলে আমরা সাধারণত দেখি যে সকলেই বেশ স্বাস্থ্যকর ঘরের মধ্যে বাস করতে চায়;—ছোট অপরিষ্কার কুঁড়ের উপর তাদের কিছু মাত্র টান নেই, শ্রদ্ধা ত দূরের কথা। সকলেই চায় কমবেশী আরাম-দায়ক মজবুত ঘর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রত্যেকে এমন ঘর কেমন-করে পেতে পারে এবং পাবার পথে বাধাই বা কি? বলা বাহুল্য আমরা গোড়াতেই স্বীকার করে নিচ্চি যে প্রত্যেকেরই শক্তি আছে, কেউ অক্ষম বা দুর্ব্বল নয়।

আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে আসল ব্যাপার খুব জটিলও নয়, অদ্ভুতও নয়—কয়েক দিনের পরিশ্রমে সকলেই নিজের মনের মত ছোট ছোট বাড়ী তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু শতকরা নব্বইজন লোক এমন বাড়ী যে কোনদিনই পায়নি, তার কারণ মনিবের ছোট-বড় অভাব মেটাতে সাধারণলোকে সব সময়ে এমনি ব্যস্ত যে, নিজের মনের মত বাড়ী তৈরির তার না আছে অর্থ, না আছে অবসর! যতদিন বর্ত্তমান বন্দোবস্ত চলবে ততদিন তারা এই সুখের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং কুঁড়ের মধ্যে থেকে নিজের সুখের স্বপ্ন দেখেই সন্তুষ্ট হবে।

অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এইখানেই;—তাঁরা প্রতিবৎসর তৈরি-বাড়ীর হিসাব করে বলেন যে, যা আছে তাতে সকলের অভাব মেটানো অসম্ভব; এতে শতকরা দশজনের স্থান-সঙ্কুলান হতে পারে। কাজেই নব্বই জনকে কুঁড়ে ঘরে থাকতে হবেই। অথচ ঘর-তৈরির সমস্ত পরিশ্রম এই নব্বই জনকেও করতে হয়েছে!

এবার অন্নসংস্থানের কথা আলোচনা করা যাক। শ্রম-বিভাগের নানাগুণের প্রশংসা করে' অর্থনীতিবিদেরা উপদেশ দেন যে শ্রম-বিভাগ বজায় রেখে কাউকে মাঠে আর কাউকে কারখানায় কাজ করতেই হবে। তারপর কৃষিলব্ধ ফসল, কারখানায় তৈরি যন্ত্র ও শিল্প-সামগ্রী এবং পরিবর্ত্ত-প্রণালীর আলোচনা, বিক্রয়ের উপায়, লাভালাভ, মজুরি, রাজকর প্রভৃতি লক্ষ রকমের হিসাব-নিকাশের মধ্যে তাঁরা ডুব দেন এবং উপদেশের পরিণাম-সম্বন্ধে কোন কথাই মনে রাখেন না। তাঁদের সঙ্গে এ-সবের আলোচনা করে কোন ফল নেই। কারণ যতবারই তাঁদের প্রশ্ন করা যায় যে এত লোক থাকতে এবং এত লোকের সারাজীবনের হাড়ভাঙা খাটুনি সত্ত্বেও লোকের অন্নাভাবের কারণ কি? তাঁরা মোটা-সরু নানা সুরে এই শ্রম-বিভাগ প্রভৃতির দোহাই দেন বটে কিন্তু তাঁদের মোদ্দা কথাটা দাঁড়ায় এই যে অভাব মেটাবার পক্ষে উৎপন্ন ফসল যথেষ্ট নয়। কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু এতে আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তরই মেলে না। নিজের অন্নের অভাব, প্রত্যেক মানুষ তার নিজের পরিশ্রমে ঘোচাতে পারে কি-না এবং না-পারবার পক্ষে বাধাটা কি? —এইটেই দেখতে হবে।

বোধ করি সাধারণ লোকের মোটামুটি অভাবটা কি তা সকলের জানা আছে! এখন দেখতে হবে তারা সে অভাব ঘোচাতে পারে কি না এবং সে অভাব মিটিয়ে শিল্প-বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও আনন্দ-উপ-

ভোগের উপযুক্ত অবকাশ তারা পায় কি না? এ-সবের যথেষ্ট আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করেছি কিন্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং বাধার আলোচনা করি-নি বলে এটা কম দরকারি ভাবলে ভুল হবে।

মানুষের অত্যাবশ্যক জিনিষ তৈরি করবার ক্ষমতার অভাব নেই; সকলেই তা জানেন। কিন্তু সে শক্তি বাড়াবার আবশ্যক আছে কি না এ কথা নিয়ে কেউই মাথা ঘামাতে চায় না। আমরা বলি, ফসল উৎপাদনের পথে মানুষের শক্তি বাড়ালে ক্ষতি নেই, কিন্তু গলদ এড়িয়ে কাজ কি? আমাদের গলদ হচ্ছে এই যে, মানুষের উৎপাদন-শক্তি মানুষের আসল প্রয়োজনের কথা ভুলে অন্য সমস্ত বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত আছে। এ বিষয়ে আমাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ভুল পথে গেছে। উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাব মেটানো,—তা ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই।

একটা কথা নিয়ে অর্থতাত্ত্বিকেরা ভারি গোল করেন—কথাটি হচ্ছে 'ফসলের-বাহুল্য' অর্থাৎ এক-এক সময়ে প্রয়োজনের জিনিষ এত বাড়তি হয় যে আবশ্যকের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কথাটা কি সত্য? বাস্তব জীবনের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে অভাবের অনুযায়ী উৎপাদন কোনদিনই হয়নি—বাহুল্য ত স্বপ্ন-কথা! ঘরের কোণে বসে বাইরের খবর লেখার মধ্যে সত্যের যথেষ্ট অপলাপ থাকতে বাধ্য। নিতান্ত অন্ধ না হলে এমন-ধারা কথাটা কারো পক্ষে বলা সম্ভব হ'ত না।

মুচির বিনামা-হীনতার কথা নিতান্ত গল্প নয়। কর্ম্মীজনের জীবনে এ কথাটা বিশেষ করে খাটে। দেশের অভাব মিটিয়ে বেশী যা থাকে আগে আগে তাই অন্য দেশে দেশে পাঠান হ'ত কিন্তু এখন এ নিয়ম বদ্‌লে গেছে—এখন বাইরের মুখ চেয়েই জিনিষ-পত্র তৈরি হয়; কারণ কর্ম্মীজনের নিজেদের তৈরি জিনিষ কেনবার সঙ্গতি নেই, তার উপর আবার নানারকম কর, আর সুদ দিতে তার হাত খালি হয়ে যায়!

আমাদের জীবন-যাত্রার চালটা যে ক্রমেই বাড়ছে তা অস্বীকার করি না কিন্তু মজুরি করে যারা কোনরকমে দিনগুজরাণ করে, দিন কাটাবার মত অশন-বসনের অভাবেই সে কাতর; বাবুয়ানির কথা তোলাই একটা মস্ত অসঙ্গতি! অথচ বিজ্ঞেরা এই অতিরিক্ত ফসলের কথা নিয়ে ভারি ব্যস্ত! প্রকৃতপক্ষে এ জিনিষটার কোন অস্তিত্বই নেই—অভাব মিটিয়ে বেশী থাকা দূরে থাক্, অভাব যে কোনদিন সম্পূর্ণভাবে মিটবে তার কোনই সম্ভাবনা নেই।

আর একটা কথা আছে। অর্থশাস্ত্রে একটা সুপ্রমাণিত সত্য এই যে,—নিজের যা আবশ্যক তার চেয়ে মানুষ বেশী উৎপন্ন করে। একটা কৃষক-পরিবারের বছর-খানেকের পরিশ্রমে ও যত্নে উৎপন্ন ফসলে অনেক পরিবারের অভাব মেটে। কথাটা সত্য কিন্তু বিজ্ঞেরা এ অর্থ করেন না; তাঁরা বলেন তার যা ন্যায্য খরচ তার চেয়ে কৃষক বেশী ফসল ফলায় এবং আত্মসাৎ করে। এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। বরং এই কথা বলা উচিত যে শাসন-তন্ত্রের প্রাপ্য কর আর ভূস্বামীর খাজনা

দিয়ে নিজেদের মত কৃষাণের কিছুই থাকে না। অর্দ্ধাশন অনশনের সঙ্গে লড়াই করে তারা বেঁচে আছে এই মাত্র। আমরা ত রোজই দেখছি যে বর্ত্তমান শ্রম-বিভাগের ফলে মজুর-দল অশন-বসনের যে সংস্থান করছে মনিবের দল জোর করে তা ভোগ করছে—কর্ম্মীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে'। এ আশ্চর্য্য শ্রম-বিভাগের গুণগান করতে হলে অমানুষ হতে হয়!

আমরা যে-পথে অগ্রসর হতে চাইছি, তাতে সর্ব্বসাধারণের প্রধান প্রধান অভাব মেটাবার বন্দোবস্ত আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য করা হবে। উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য অভাব মেটানো, অলস মনিবের বাবুয়ানার ইন্ধন যোগানো নয়। মূলধনী মহাজনেরা নিজেদের সুবিধার জন্যে মজুর-দলকে খাটিয়ে নিচ্ছেন আর অর্থ-তাত্ত্বিকের দল তার ফল দেখে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ এবং প্রচার করছেন; কোন দিন তাঁরা এর যথার্থ বিচারের দিকে মন দেন নি।

কাজেই ফসলের বন্দোবস্তের সঙ্গে-সঙ্গে এই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষা ও সংস্কার প্রভৃতির মূলোচ্ছেদের বিশেষ দরকার আছে। শ্রম-বিভাগ বলে যে তত্ত্বটার উপরে নির্ভর করে বিজ্ঞেরা বই লেখেন, সে জিনিষের বিচার করবার সময় এসেছে। অর্থতাত্ত্বিকের একদেশদর্শিতা ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের একটা বিশিষ্ট উদাহরণ এই শ্রম-বিভাগ।

অর্থনীতিবিদেরা উপদেশ দেন যে লোকের শক্তি নানা দিকে বিক্ষিপ্ত (!) করার চেয়ে কোন-একটা বিষয়ে নিযুক্ত করা উচিত, তাতে কাজের খুব সুবিধা হয়। যেমন পেরেক গড়তে অনভ্যস্ত কামার যদি কোন দরকারে পেরেক গড়তে বসে, তবে দিনে দু'তিনশ' পেরেকের বেশী সে গড়তে পারে না; কিন্তু যদি সে এ-কাজে নিযুক্ত থাকত তবে দিনে দু'তিনহাজার পেরেক গড়তে তার কষ্ট হত না। কাজেই তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে প্রত্যেককে এক-একটা বিশেষ কাজে নিপুণ হতে হবে। বিশেষজ্ঞ হওয়া ধনাগমের যে একমাত্র উপায় এই কথাটা তোঁরা শেষপর্য্যন্ত সার্থক করে তুলতে চান, যেন শ্রম-বিভাগ না হলে সব শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে! সব কাজেই শ্রম-বিভাগের দরকার। পেরেক গড়তে হলে কেউ-বা তার মাথা গড়বে, কেউ-বা তলা গড়বে। কিন্তু যে বেচারা শুধু মাথা গড়বে, সে-কাজটা কিছুদিন পরে তার কাছে একঘেয়ে ও নিরানন্দময় হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। এবং অন্য কাজ না-শেখার দরুণ তাকে কারখানা-ওয়ালার অধীনে এবং মর্জ্জি-অনুসারে চলতেই হবে। তারপর এ-সব কাজে লোকের অভাব হবে না, কাজেই মজুরিও দিন-দিন কমতে থাকবে। অর্থতাত্ত্বিক কোনদিন এ-সব বাস্তব ব্যাপারের ধার ধারেন না; কর্ম্মীজনের সুখ-দুঃখের কোন খবরই তিনি জানেন না। জানলে শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে চীৎকারটা বহুদিন পূর্ব্বেই থেমে যেত।

এতদিন পরে তাঁরা এই সহজ কথাটা বুঝতে পেরেছেন এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা চলেছে। শ্রম-বিভাগের ফল এই দাঁড়িয়েছে যে ধনীরা আরও বেশী ধনী এবং

সহানুভূতি-হীন হয়ে উঠছেন এবং মজুর-দল আরও বোকা, জীবনীশক্তি-হীন এবং কপর্দ্দকহীন হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ হওয়ার ফলে জীবনের আর-সব পথ তাদের পক্ষে এক-রকম বন্ধ এবং বৈচিত্র্যের অবকাশ না থাকায় তাদের জীবন কল বা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

এই কথাটা ব্যক্তি-হিসাবে যতখানি সত্য জাতি-হিসাবেও ঠিক তাই। এক-একটা জাতি যেন এক-একটা বিশেষ কারখানার মজুর। কোন দেশ কাপড়, কোন দেশ ধান-চাল, আর কোন দেশ স্কুলমাষ্টার, ধাত্রী প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। কেবল দেশে দেশে নয়, সহরে সহরে দলে দলে এই বিভাগ চলছে—কাপড়ের তৈরি নানা জিনিষ নানা সহরের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। সবাই ভেবেছিলেন যে এমনি করে সব জিনিষ দেশ বা জাতি-বিশেষের একচেটে হয়ে গেলে অর্থাগমের পথ একেবারে প্রশস্ত হবে; কিন্তু শিল্পশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে তাঁদের এ-সাধে বাদ পড়েছে, তাঁদের আশা ধূলিসাৎ হয়েছে। এখন সব-দেশে বিভিন্ন কারখানায় নানা রকমের জিনিষ তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে, বিনা-কারণে পরের মুখ আর চাইতে হয় না।

শ্রম-বিভাগের মত fetish-এর সংখ্যা বর্ত্তমানে বড় কম নয়—সমাজে, রাষ্ট্রে, শিল্পে এই সমস্ত সংস্কারের সমূল উচ্ছেদ-সাধন না হলে আমরা পরিবর্ত্তন-সাধনে সফলকাম হতে পারব না। তরবারির আঘাতে বা বন্দুকের জোরে নয়—মানুষের কষ্ট-সঞ্চিত বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার শক্তিই আমাদের প্রধান সম্বল। শুধু কথায় কাজ হয় না বটে, কিন্তু কথা না হলেও কাজ চলে না—আমাদের হাতে যেমন কাজ করতে হবে, মুখেও তেমনি প্রচার করতে হবে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

আহ্বান

(হুগলীতে)

আজকের এই সভায় যারা উপস্থিত আমি তাদের সকলেরই অপরিচিত, অজানা, অচেনা। আমি আজ নূতন লোক হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আজ এই সভা আহূত হয়েছে সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার সংযোগ নূতন নয়। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এই কাজের সূত্রপাত বঙ্গশক্তি আমারই দ্বারা আরম্ভ করিয়েছিলেন।

আজ তোমাদের বীরত্বে উত্তেজনা দিতে এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এ সভা আহূত হয়েছে—ডাক্তার মল্লিক প্রভৃতি উদ্যোগীরা তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করতে এসেছেন এবং আমার মুখ দিয়ে সেই আহ্বানবাণী উচ্চারিত করবার জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছেন। কেন? কারণ আমার আহ্বান আজ হঠাৎ আহ্বান নয়। যতদিন আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিকশিত

হয়েছে ততদিন থেকে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। আর সে আমারও আহ্বান নয়। আমার দ্বারা চিৎরূপিণী জগজ্জননী শক্তির আহ্বান। যিনি অখিলের আত্মা, সৎ অসৎ যা-কিছুর মধ্যে যে শক্তি তা যিনি, সেই শক্তির শক্তি মহাশক্তি বাঙ্গালী জাতিকে আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠ দিয়ে আহ্বান করছেন।

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ঐ
সবাই এসেছে লইয়া নিশান
কইরে বাঙ্গালী কৈ!

দশদিক্‌রূপিণী আদ্যাশক্তির দশহস্তে দশখানি অস্ত্রময়ী মূর্ত্তি চিত্তপটে নিয়ে এস। সে অস্ত্রগুলির যে শক্তি তাও তিনি, সে অস্ত্র যে ধারণ করবে তোমরা বাঙ্গালী যোদ্ধারা, তোমাদের শক্তিও তিনিই হবেন। যে শক্তি মহামায়া এতদিন তোমাদের মায়ায় মোহে ভয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন সেই শক্তিই আজ তোমাদের মোহমুক্ত করবেন, রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা করবেন।

বাঙ্গালী, বাঙ্গালী,বাঙ্গালী! বাঙ্গালী বল্‌তে কি ভাবে তোমাদের মন মাতে? তোমাদের স্বরূপ কি? শুধু কি তোমরা বইয়ের কীট! শুধু এগ্‌জ্যামিন পাশ করতে জান আর কলম পিশে দুটি ভাত গিল্‌তে জান? এই কি বাঙ্গালীত্ব? তোমরা কি মানুষ নও? মানুষের সব রকম আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, দুরাশা তোমাদের পেয়ে বসে না? ইউনি-ভার্সিটির মেডেল নিতে চাও, Victoria Cross নিতে তোমাদের সাধ হয় না? আছে শরীরের এই খোলস,—থাকুক তা; তাতে বেদনা বোধ হয়—হোক্‌গে। কোষের ভিতর কোষ, কোষের ভিতর কোষ—তারও ভিতরে সূক্ষ্ম কোষে যে আসল সূক্ষ্ম প্রাণীটি রয়েছে, সে সব স্থূল-কোষের আলস্য মোহ, ভয় ও বেদনা বন্ধ ভেদ করে অসাধ্য সাধন করতে ছুটবে। সহস্র ধারে বর্ষমান মেশিন-গানের গোলারাশির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে বিচরণ করে কুশল ক্ষিপ্রতায় মৃত্যুর কবলস্থ সঙ্গীকে ছিনিয়ে নিয়ে আস্‌বে। তবে ত জগৎকে জানাবে যে বাঙ্গালীও মানুষ, যেমন পঞ্জাবী মানুষ, যেমন রাজপুত মানুষ, যেমন মারহাট্টা মানুষ! ছিলে ত মানুষ তোমরাও—অতি প্রাচীন কালের কথা না হয় ছেড়ে দিলুম—কিন্তু এই ক' পুরুষ আগে প্রতাপাদিত্য ও তাঁর উনিশ বছরের ছেলে উদয়াদিত্য মোগলদের সঙ্গে সম্মুখসমরে মরেছে। আরও কতজনের নাম শোনাব? গৃহাগত শত্রুর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা সবাই করেছে, তোমাদের আগে কেউ ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নি!

ইংরেজ আমল পড়তেই তোমরা বইয়ের ভারে ডুবে গেলে। কৃষীর ছেলেও হাল ছেড়ে বই ধরে, শিল্পীর ছেলেও আইনের পাশ দিতে ব্যস্ত, ব্রাহ্মণের ছেলে আধ্যা-ত্মিক সাধনা ভুলেই গেল, খালি পড়ে,—আর ক্ষত্রিয়ের জাতধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতটাই লোপ পেয়ে গেল।

বাঙ্গালা দেশে নাকি ক্ষত্ররক্তের টিক-টিকিটা পর্য্যন্ত আর নেই। অথচ আশ-পাশেই ষোলকলায় সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয় বর্ত্তমান। উড়িষ্যায় আছে ক্ষত্রিয়, বেহারে আছে,

খালি খাস বঙ্গেই অভাব। যা আছেন দু-এক ঘর বর্দ্ধমান ও রঙ্গপুরের রাজা ও তাঁদের কুটুম্বরা, তাঁরা নাকি অপেক্ষাকৃত অল্পদিন মাত্র বীরভূমি পঞ্জাব থেকে এদেশে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাই তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ম্মে না হোক নামে আজ পর্য্যন্ত ধুয়ে যায় নি। আর বাকী সবাই প্রতাপাদিত্য সীতারাম প্রভৃতি বারোভুঁইয়ার বংশধরেরা সেকালে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হলেও এখন কায়স্থ-সাগরগর্ভে লীন, কেননা তাঁরা আর অসি-জীবী নন মসীজীবী। বঙ্গের যে সেন-রাজার বংশধরেরা পঞ্জাবে রাজ্য স্থাপনা করায় আজও ক্ষত্রিয়, * তাঁদের বাঙ্গালী জ্ঞাতি সেনেরা—বল্লাল সেনের বংশধরেরা বদ্যি হতে পারেন, কায়স্থ হতে পারেন, সব হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ক্ষত্রিয় আর কিছুতেই বলা হবে না—তাঁরাও খালি বই পড়ছেন আর কলম চালাচ্চেন।

আপৎকালে ছাড় ভাই সবাই একবার বই—একবার জীবনের রাজপথে বেরিয়ে এস। দেখ সেখানে মনুষ্যত্বের কত নতুন দিক! ঘরে বসে যমের ভয় সত্যি ভয়। আজ টাইফইড, কাল যক্ষ্মা, পরশু কলেরা, তরশু বসন্ত—আবার তরশুর পরেও নিস্তার নেই—কেননা নরশুতে বোধ হয় বা প্লেগ। এই ত ভারতবর্ষকে আস্তে আস্তে আবার প্লেগ-দেবী ঘিরে ফেলছেন। বাঁকীপুর, কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, পঞ্জাব, করাচী, বম্বে, পুণা, যোধপুর, বিকানীয়র, নাগপুর, ইন্দোর ঘুরে ঘুরে পাকে পাকে এগিয়ে এগিয়ে আসছেন—আর এবার নাকি বড় বিষাক্ত টাইপ—বারো ঘণ্টার মধ্যে সন্নিপাত।—কখন্ বাঙ্গালাকে নাগপাশে জড়ান কি বলা যায়? তাই বলছি, ঘরে বসে মৃত্যু-ভয় সত্যিই ভয়, কেননা এখানে যমদূতেরা বেঁধে মারে। কিন্তু যে রণক্ষেত্রে কালের কাল মহাকাল স্বয়ং লীলা করছেন সেখানে ত মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। ক্রিকেট ফুটবল ত ঢের খেলেছ ভাই—একবার মহাকালকে আম্পায়ার বানিয়ে যুদ্ধের খেলাটা খেলে এস দিকিন। দেখ তুমি জয়ী হও, কি মৃত্যু জয়ী হয়। এ খেলার মজা এই যে হারজিৎ দুয়েতেই লাভ আছে,—এক একটা লটারির মত, যে নম্বরটাই তোল কিছু না কিছু পাওয়া যায়। যদি হও তুমি জয়ী, তবে তোমার ও তোমার মার গলায় মর্ত্ত্যের যশোমাল্য পড়বে, আর যদি মৃত্যু জয়ী হয় তবে স্বর্গের অমৃত ও নন্দনহার তোমার জন্যে তৈরি রয়েছে।

যে সময় আমি ভারতী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলুম তখনকার দিনে আমার সম্পাদকীয় নোটবুক থেকে মসলা সংগ্রহ করে বিদেশী ঘুষি বনাম দেশী কিলের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলুম।

সেদিন তোমাদের দেশী কিলটি পাকিয়ে তোলাবার জন্যে তখনকার প্রয়োজনমত ব্যবস্থাও করেছিলুম—বক্সিং গৎকা লাঠি তলোয়ার প্রভৃতি সব রকম বীর্য্যোদ্বোধক

* ১৩২৩ সালের মাঘমাসের ভারতীতে "বঙ্গীয় সেনরাজগণের 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

খেলা শেখাবার ক্লাব স্থানে স্থানে খুলে দিয়েছিলুম।

এখন জার্ম্মানের ঘুষি ভারতের কিনারায় এসে পৌঁচেছে। আমার মুষ্টিযোগে তোমাদের কিলটি মজবুত হওয়ার যেটুকু অভাব ছিল, আজ রাজবৈদ্য স্বয়ং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেটুকু পূরণ করে দিচ্ছেন—তোমাদের যুদ্ধবিদ্যা ও তোমাদের হাতে যুদ্ধাস্ত্র দান করছেন। ভেবোনা ইংরেজেরা স্বার্থপরবশ হয়ে স্বতন্ত্রতায় এই কাজ করছেন। তাঁরা স্বতন্ত্র নয়, ব্রিটিশজাতিও সেই মহাশক্তি-পরতন্ত্র, তাঁদের ভিতরেও যে শক্তি কার্য্য করছেন সে সেই জগৎনিয়ন্ত্রী আদ্যাশক্তি। সেই শক্তির দান আজ গ্রহণ করে ধন্য হও। মানুষ হওয়ার সুযোগ নাও। জগতের সভায় মানের আসন পাওয়ার যোগ্য হও। রবীন্দ্রনাথ দেশের জন্য মান এনেছেন কাব্য দিয়ে, জগদীশ বসু মান এনেছেন গবেষণা দিয়ে। তুমি আমি সবাই অমন কবিতার রত্নে পসরা ভরাতে পারব না, বৈজ্ঞানিক গবেষণার অত ধৈর্য্য ও অবসর সবায়ের হবে না। তবে তোমাদেরও যেদিকে পথ খোলা আছে সেইদিকে সার দিয়ে চল। সন্তানদের বীরত্বের গৌরবের জন্যে বঙ্গভূমি এখনও বুভুক্ষিতা—শুন তাঁর ক্রন্দন "ময় ভুখাহুঁ!

চিতোরের রাজপুত্রদের মত নগরলক্ষ্মীর ক্ষুধা মেটাবার জন্যে বেরিয়ে পড় সমর-প্রাঙ্গণে। এই হুগলী নগরের কজন সন্তান মার ক্ষুধার সামগ্রী আহরণে আজ ব্রতী হবে! কজন সৈন্য দলভুক্ত হবে!

কে উঠিবে আজ
কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে
জননীর লাজ?

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৮।

(কাশীপুরে)

দুশো বাঙ্গালী যোদ্ধার জন্যে নাকি আজ নগরে নগরে ফিরতে হচ্ছে? আজ যদি বেঙ্গলি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরোত যে অমুক কোম্পানির আফিসে একটা কেরাণীর পদ খালি আছে, এণ্ট্রেন্স ফেল্, এল্ এ ফেল হলে চল্‌বে—অমনি সাতশ দরখাস্ত একদিনে বড়বাবুর টেবিলে স্তূপাকার হত। গোলামী পেশায় প্রভূত আস্থা, আর প্রভুত্বের স্বাধীনতার আস্বাদে একেবারেই রুচিহীন! এমন উল্টা বুঝলি রাম!

এই সেই দেশ যেখানে চণ্ডীর পূজা আবহমান কাল থেকে চলে আস্‌ছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শক্তিমন্ত্র, অথচ সে মন্ত্র কার্য্যকালে একেবারে ব্যর্থ? ধিক্ সে পুরোহিতকে, ধিক্ তার পৌরোহিত্যে যার নিজের অন্তর সাগ্নিক না হওয়ায় এই এতকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে অন্ততঃ কিছুকোটি যজমানের অন্তরে অগ্নি জ্বালাতে পারে না।

দুতিন পুরুষ আগেও ত এই শক্তিমন্ত্র-বলে একভাগ বাঙ্গালী ডাকাতি করেছে আর আর-একভাগ ডাকাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেছে।

কোথায় গেল সে তেজ! ঝুড়ি ঝুড়ি

ইউনিভার্সিটির কেতাবের নীচে তা চাপা পড়ে গেল? আর সেই গুরুচাপের নীচে পড়ে গুরুঠাকুরের চাল ও কদলীর মাত্রা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গুরুমন্ত্রের তেজটুকুও লোপ পেয়ে গেল।

যে ইউনিভার্সিটি তোমাদের সুধু পোড়ো বানায়, কেজো বানায় না, যে বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের বিশ্বে বেরোবার দীক্ষা দেয় না, কোণে লুকিয়ে থাকার ডিগ্রী দেয়, তাকে বিদ্যালয় বলতে পারিনে, তা ঘোর অবিদ্যার আখড়া।

এই অবিদ্যার নেশায় ভোঁ থেকো না, একবার মনুষ্যত্বের আখড়ায় নাব, দুরূহকে দোসর কর, বিপদের সম্মুখীন হও, কঠিনকে আলিঙ্গন কর। সহজেতে তৃপ্ত থেকো না।

যে গবর্ণমেণ্ট তোমাদের অপৌরুষতার নেশা ধরিয়েছিলেন, সেই গবর্ণমেণ্টই আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত। আজ তোমাদের হাতে শুধু কলম নয়, বন্দুক দিতে প্রস্তুত। লও সেই ভূষণ, পুরুষালী সাজে সাজ, আমরা তোমাদের মায়েরা বোনেরা তোমাদের দেখে চক্ষু জুড়াই।

দেখ পঞ্জাবের একজন শিখকে তার বিদেশ-প্রত্যাগত বন্ধু জিজ্ঞেস করেন—"তোমার কয় ছেলে?"

শিখ উত্তর দিলেন—"চার ছেলে।"

বন্ধু বল্লে—"শুনেছিলাম নাকি পাঁচটি!"

শিখ বল্লেন—"চার ছেলের পর আর একটা সন্তান হয়েছে—কিন্তু সে খালি পড়াশুনা নিয়ে থাকে—তাকে ব্যাটাছেলে বলে গণ্য করিনে।"

শুধু পঞ্জাবের নয়, সব দেশের সব কালের মনের ভাবটিই ঐ। ব্যাটাছেলের যে একটা মাপকাঠি আছে, শুধু পড়িয়ে হলে সে মাপে অনেক খাটো থেকে যেতে হয়।

খাটো থাকবে কি প্রমাণ-মাপের ছেলে হবে ভাইরা সব?

একটা পুরাণ কাহিনী শুনাই।

"একবার কৃষ্ণ ও বলরামের অনুপস্থিতিকালে যদুকুলারি সৌভপতি শাল্ব, প্রভূত মনুষ্য হস্তী ও সৈন্যগণের সহিত দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। যদুকুমারগণ শাল্বরাজার সৈন্য আগত দেখিয়া বহির্নির্গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণের পুত্র, সমরস্থ, মহাবাহু, বীর প্রদ্যুম্ন শাল্বনিক্ষিপ্ত বাণসমূহে কণ্ঠমূলে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় অবসন্ন হইলেন। প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধক সৈন্যসকল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল এবং শত্রুপক্ষীয় সকলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিল। সুশিক্ষিত সারথি প্রদ্যুম্নকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বেগবান অশ্বদ্বারা রণভূমি হইতে অবসৃত করিল। রথ অতি দূরে অপগত না হইতেই সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া প্রদ্যুম্ন সারথিকে কহিলেন, "সূতপুত্র! তুমি কি হেতু রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করিতেছ? বৃষ্ণিবংশীয় বীরদিগের ত যুদ্ধ বিষয়ে এরূপ ধর্ম্ম নয়। তুমি কি মহা সংগ্রাম মধ্যে শাল্বকে দেখিয়া ভয়ে মোহিত হইয়াছ, না যুদ্ধ দর্শন করিয়া তোমার বিষাদ জন্মিয়াছে, তাহা সত্যরূপে আমাকে বল।"

সারথি কহিল—"হে জনার্দ্দন-নন্দন! আমি মোহিত বা ভীত হই নাই, পরন্তু শাল্বকে পরাজয় করা আপনার পক্ষে অতিশয় ভার বোধ করিয়াছি। হে বীর! পাপিষ্ঠ শাল্ব আপনার অপেক্ষা বলবান, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে লইয়া রণভূমি হইতে মন্দগতিতে নিঃসৃত হইতেছি। রথী শৌর্য্যসম্পন্ন হইলেও যদি রণস্থলে মোহিত হন, তবে তাঁহাকে রক্ষা করা সারথির কর্ত্তব্য। হে আয়ুষ্মন্! যেরূপ

আমাকে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; সেইরূপ আপনি রথী, আপনাকেও রক্ষা করা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই আমি সংগ্রামস্থল হইতে অবসৃত হইয়াছি। হে মহাবাহু রুক্মিণীনন্দন! আপনি একক, দানবেরা অনেক, অনেকের সহিত একের যুদ্ধ করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আমি রণাঙ্গন হইতে বহির্গত হইয়াছি।"

প্রদ্যুম্ন সারথির এই উত্তর শুনিয়া অমর্ষভরে বলিলেন—"রথ ফিরাও! আমি জীবিত থাকিতে কদাপি এরূপ আমাকে রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া গমন করিও না। যে ব্যক্তি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, 'আমি তোমার' এইরূপ কথনশীল, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, বিরথ, বিক্ষিপ্ত বা ভগ্নাস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করে, সেই ব্যক্তি কখনই বৃষ্ণিবংশজাত নয়। হে সৌতে! যেহেতু তুমি বৃষ্ণিকুলের যুদ্ধস্থলীয় আচার-ব্যবহার সমদায়ই জান, সেই হেতু পুনর্ব্বার যুদ্ধস্থল হইতে কোন ক্রমে এরূপ অপগমন করিও না।

দুরাধর্ষ মাধব আমাকে যুদ্ধভূমি হইতে অপগত, পৃষ্ঠে হত, রণপলায়িত জানিয়া কি বলিবেন?

কেশবাগ্রজ মদোৎকট বলদেব সমাগত হইয়া আমাকে কি কহিবেন?

মহাধনুর্দ্ধর পুরুষসিংহ সাত্যকিই বা আমাকে রণ-পলায়িত জানিলে কি কহিবেন?

শাম্ব, সমিতিঞ্জয়, চারুদেষ্ণ, গদ, সারণ, মহারাজ অক্রুর, ইহাঁরাই বা কি বলিবেন?

বৃষ্ণিবীরদিগের স্ত্রীগণ আমাকে শূর ও সতত পুরুষাভিমানী বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বা সকলে একত্র অবস্থিত হইয়া আমার প্রতি কি বলিবেন? তাঁহারা বলাবলি করিবেন, এই প্রদ্যুম্ন মহাযুদ্ধে ভীত হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিতেছে, ইহাকে ধিক্!

তাঁহারা এই কথা ভিন্ন আর সাধুবাদ করিবেন না! সৌতে! তাঁহাদের ধিক্কার বাক্য ও পরিহাস মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। আমি ভীত রণ হইতে পলায়িত ও পৃষ্ঠভাগে শরসমূহে আহত হইয়া কোন-ক্রমেই জীবনধারণ করিব না। ফিরাও! ফিরাও! শীঘ্র রথ ফিরাও!"

এই সেই বালক আধুনিক ক্রিকেট-ফুটবল-ম্যাচ-ক্রীড়কদিগের পূর্ব্বপুরুষ। বঙ্গের বালকগণ! এই যদুকুমারগণ, কুরুকুমারগণ, রঘুকুমারগণ তোমরাই! আত্মানং বিদ্ধি!" *

শ্রীসরলা দেবী।

২৪শে ফেব্রুয়ারি,
১৯১৮।

মাসকাবারি

"পত্রে"

মাঘের সবুজপত্রে সম্পাদক মহাশয় তাঁর এক পত্রে গত একশত বৎসরের পীতপত্রী-বাংলা-সাহিত্যকে বিলকুল ঝরাইয়া দিয়া সবুজপত্রী-ভাবী-সাহিত্যের নবোদ্গমের আশার ও আনন্দের কথা বলিয়াছেন। তিনি গত একশত বৎসরের বাংলা-সাহিত্যের একটা নিরিখ লইয়াছেন। বাস্তবিক, একশত বৎসরব্যাপী সাহিত্যের

* ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসের 'ভারতী'র "বাঙ্গালী-পাড়ায়" নামক মদীয় প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

বিচিত্র ধারাকে একটি ক্ষুদ্র "পত্র"-পুটের অঞ্জলির মধ্যে ধরিবার শক্তি তাঁর মত লেখকের পক্ষেই সম্ভবে; কেননা তাঁর দৃষ্টির "লেন্সে" বহুদূরের জিনিসও নিকট হইয়া দেখা দেয় এবং বিক্ষিপ্ত জিনিসও সংহত সীমায় ধরা দিয়া থাকে।

গত একশত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ধারার বাঁকে বাঁকে ও ঘাটিতে ঘাটিতে নানা ভাবের হাট বসিয়াছে ও নানা রসের মেলা জমিয়াছে। ইহার মধ্যে কত বিচিত্র আন্দোলনের ইতিহাসই রহিয়া গেছে। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, ভূদেব, বিবেকানন্দ—ইঁহারা কেহই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র নন্, ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটা বড় বড় আন্দোলনের নায়ক—এক একটা যুগধর্ম্মের উদ্বোধক। দেশের বড় বড় ভাব-যজ্ঞে সাহিত্যিকেরা যেমন উদ্গাতা মাত্র হন্, ইঁহারা তা নন্—ইঁহারা হোতাও বটেন। সেই জন্যই বিশুদ্ধ আর্টের আদর্শ-নিকষে ইঁহাদের সৃষ্টিকে যদি কষা যায়, তবে বোধ হয় ইঁহাদের বারোআনা সৃষ্টিই 'আর্টিষ্টিক' নয়, ইহা প্রতিপন্ন হইবে। বিশুদ্ধ আর্টের অনুশীলন যে অবস্থায় সম্ভব হয়, সেই অবস্থায় নিজেদের মনকে স্থাপিত করিবার অবসর ইঁহারা পান্ নাই—দেশের নানান্ সমস্যা ও নানান্ প্রয়োজন ইঁহাদের সমস্ত মনোযোগ দাবী করিয়াছে।

অথচ সৌন্দর্য্যকলা নিত্যকালের সামগ্রী —সাময়িক প্রয়োজন যখন অত্যন্ত গুরু হইয়া দেখা দেয়, তখন সৌন্দর্য্যকলার নিত্য রসের অনুভূতিটা ম্লান হইতে বাধ্য হয়। খুব আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যেও ইহার প্রমাণ-পরিচয় পাই। এ সাহিত্য ঠিক রসসাহিত্য নয়, এ সাহিত্য সমস্যা-সাহিত্য। এ কালের নানা জটিল সমস্যা এ সাহিত্যের ভিতর দিয়া আপনার মীমাংসা খুঁজিতেছে। উপন্যাস, নবন্যাস, নাটক, এমন কি গীতিকবিতাতেও সমস্যাই গিজ্‌গিজ্ করিতেছে; মানব হৃদয়ের নিত্যরসের কোন রূপ ক্বচিৎ ফুটিতেছে!

কিন্তু ইহার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। প্রমথবাবু ঠিকই লিখিয়াছেন যে, "জাতীয় জীবনের প্রত্যক্ষ দৈন্যের প্রতি অন্ধ হ'য়ে কাব্যরচনা করা মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব।" শুধু এ দেশে নয় বিদেশেও—নবজাতি ও নবসভ্যতা সংগঠনের বিরাট্ আয়োজন চলিতেছে। সেই বৃহৎ সৃজন-ব্যাপারে রাষ্ট্রবিৎ ও সমাজতত্ত্ব বিদের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদেরাও যোগ দিয়াছেন। সেইজন্যই একালে "আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্"—আর্ট আর্টেরই জন্য—এ নীতি টিঁকিবে কিনা সন্দেহ। কেননা আর্ট-সৃষ্টি ঐ বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টি বা সমাজ-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিতেছে। এ কালের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত ব্যাপারগুলিকে যখন কতকটা নির্লিপ্তভাবে দূরে স্থাপন করিয়া সমগ্র দৃষ্টিতে আর্টিষ্ট দেখিতে পারিবেন, তখনই আধুনিক সৃষ্টির মধ্যে নিত্যরসের আভাস জাগিবে। সেই পরিপ্রেক্ষণটি (perspective) না থাকার জন্য এ কালের অধিকাংশ কলাসৃষ্টিতেই সমস্যার বিচিত্রতা আছে বটে, কিন্তু রসের অখণ্ডতা নাই। কিন্তু তার কারণই এই যে আর্টের পরিধিটা হঠাৎ বিস্তৃত হইয়াছে; এ যুগে আর্ট-সৃষ্টি বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ আর্টের চর্চ্চা এখন আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের এ যুগের গুরু রামমোহন রায়ের রচনাবলীতে সেই বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টিরই আভাস পাই। সাহিত্যিক বলিলে যাহা বুঝায়, রামমোহন রায় তাহা ছিলেন না। পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে জড়াইয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড সভ্যতাসৃষ্টির নক্সা তৈরি করিয়াছেন, তার বিচিত্র মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। হিন্দু সভ্যতাটাকে তার বেদান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তার স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রকে সেই বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া লইয়াছেন; তারপর সেই ভিৎটাকে একালের উপযোগী করিয়া প্রশস্ত ও সংস্কারমুক্ত করিয়া গড়িয়াছেন। তার পর অর্থনীতি, ব্যবহারতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রভৃতি নব নব মানব-বিজ্ঞানগুলির (humanities) উপকরণের দ্বারা সেই ভিতের উপর নব সভ্যতার হর্ম্ম্য তৈরির দিকে মন দিয়াছেন। এম্‌নিতর ভাবেই, হিন্দু-সভ্যতার মতন খৃষ্টান ও মুসলমান সভ্যতারও নব সংগঠনের নক্সাও তাঁকে তৈরি করিতে হইয়াছে। এইতো তাঁর সৃষ্টি। এ সৃষ্টি কলাসৃষ্টি নয়, অনাসৃষ্টিও নয়—এ সৃষ্টি হাজার হাজার নূতন নূতন কলাসৃষ্টিকে সম্ভাবিত করিবার শক্তি রাখে। আর হইয়াছেও তাই। রামমোহন রায় প্রভৃতি, যে বড় সভ্যতা-সৃষ্টির আভাস দিয়া গেছেন, এ কালের সাহিত্য তাকেই বিচিত্র কলাসৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। তাঁরা যেসব সমস্যাকে তত্ত্বের দিক্ হইতে আলোচনা করিয়াছিলেন, আর্টে সেই সব সমস্যাই আবার নূতন নূতন রূপ লাভ করিতেছে। অতএব তাঁদের রচনা "আর্টিষ্টিক" না হইলেও তাহা আর্টকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এই কথাটুকু মনে রাখা দরকার।

এই কারণেই প্রমথবাবু গত একশত বৎসরের সাহিত্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি সায় দিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন:—

"প্রথমেই নজরে পড়ে যে সে-সাহিত্য নিরানন্দ। আজ একশ' বৎসর ধরে আমরা আমাদের সকল লেখায় সকল কথায় প্রকাশ করে এসেছি—শুধু অসন্তোষ। এর কারণ—আমরা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের সাংসারিক দৈন্য, আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কোন জিনিসই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। শুধু তাই নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এই সর্ব্বাঙ্গীন হীনতা আমাদের বুকের ভিতর অষ্ট-প্রহর কাঁটার মত বিঁধছে। তার ফলে আমাদের সাহিত্য হয়েছে শুধু আক্ষেপ ও আক্রোশের সাহিত্য। এ সাহিত্যে অবশ্য বৈরাগ্যেরও অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সব হয় মিছে, নয় বাজে।"

* * * *

"তার পর নজরে পড়ে যে এ সাহিত্য আর্টিষ্টিক নয়।

এর কারণ এ সাহিত্য মুখ্যতঃ এবং স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। গত একশত বৎসর ধরে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্যে একমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট থাকে নি। রাজা রামমোহন রায় থেকে সুরু করে

রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা সকলেই স্বজাতিকে মনে ও চরিত্রে শক্তিশালী করতে, রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমৃদ্ধিশালী করতে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁরাই যে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করেছেন, এ কথা বল্‌লে নেহাৎ বাজে কথা বলা হবে না। রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এ বিষয়ে প্রচেষ্টা ত সর্ব্বলোকবিদিত। তার পর বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জবানিতেই কবুল করেছেন যে স্বজাতির উন্নতিকল্পেই তিনি লেখনী ধারণ করেনঃ অর্থাৎ লেখা জিনিসটে এঁদের সকলের কাছেই ছিল জাতি-গঠনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়মাত্র। সাহিত্যকে এঁরা একটা means হিসেবেই দেখতেন, end হিসেবে নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরোপকার, গৌণ উদ্দেশ্য কাব্যসৃষ্টি। ফল যদি তার উল্টো হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাঁর হাত দিয়ে যা বেরিয়েছে তা যদি মুখ্যতঃ সাহিত্য হয়ে থাকে ত তার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষের অবাধ্য প্রতিভা তার সঙ্কীর্ণ সংকল্পকে অতিক্রম করে।"

প্রমথবাবুর প্রথম নজরটার সঙ্গে আমার নজরের অন্ততঃ, কতকটা পার্থক্য ঘটতেছে —গত একশত বৎসরে বাংলাসাহিত্যে শুধুই নিরানন্দ ও অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা মানিতে আমি রাজি নই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইতে কৈশোর পর্য্যন্ত যাঁরা ইহার লালনের ভার লইয়াছিলেন, তাঁদের বরং আশা ও উৎসাহের অন্ত দেখি না। রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যের মধ্যে এই উৎসাহের প্রাচুর্য্যটাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যের অবস্থা দেখিয়া এতটা উৎসাহ বোধ করিবার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার তাই মনে হয় যে, সে উৎসাহের মূল কারণ একটা নূতন-কিছু-রচনা করিবার আনন্দ। তখনকার কালে কোন জিনিসই অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হইবার সময় পায় নাই—দেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, প্রভৃতি সমস্তের মধ্যেই নব নব সম্ভাবনা দেশের মনস্বীদের মনকে কেবলি উদ্দীপ্ত করিয়াছে এবং নব নব সৃষ্টি ও উদ্যোগের দিকে প্রেরণ করিয়াছে। সেই-জন্য তখন বাস্তবিকই "আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের সাংসারিক দৈন্য ও আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা" সম্বন্ধে এখনকার মত আমরা কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারি নাই। তখন আমরা দৈন্য বুঝিলেও এবং সেজন্য বিলাপ করিলেও, সেটা সত্য দৈন্যবোধ ও সত্য বিলাপ হয় নাই—সেটা একটা ভাবুকতার অছিলা মাত্র ছিল।

অসন্তোষের সাহিত্য বরং এখন দেখা দিয়াছে। তার প্রকৃত আরম্ভ বঙ্কিমের পর হইতে, তার উৎকর্ষ রবীন্দ্রনাথে। জার্ম্মাণ দেশের Sturm und Drang অথবা storm and stress—ঝঞ্ঝাময় সাহিত্যের মত, একটা ভাবালোড়নময় অশান্তির সাহিত্য এইত সেদিন জন্মলাভ করিয়াছে। এ অসন্তোষ শিবের প্রলয়ের মত—এযে নব সৃষ্টিরই পূর্ব্ব সূচনা। তাই এ সাহিত্যে বেণুবীণার ঝঙ্কারের চেয়ে পাঞ্চজন্যের ভৈরব সঙ্গীতই অধিকতর ধ্বনিত। এ সাহিত্যের

সঙ্গে তাই পূর্ব্ব সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই তুলনা চলেনা। এর আনন্দ, 'ভাঙ্‌বারই আনন্দরে'।

ভূতপূর্ব্ব সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথবাবুর দ্বিতীয় কথাটাকে অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব সাহিত্য আর্টিষ্টিক নয়, সেই কথাটাকে—আমি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু আমি ত দেখিতে পাই যে, যে প্রলয় সাহিত্যের কথা একটু আগে বলিলাম, তার ভূমিকাই এতকাল ধরিয়া তৈরি হইতেছিল। এতকাল ধরিয়া জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রটার পরিমাণ-পরিমাপ চলিয়াছে। এবং সেই কারণেই অসন্তোষ আজ এমন প্রবল ভাবে জাগিবার অবকাশ পাইয়াছে। এই বাণীই "নববাণী" এবং সাহিত্যের মর্ম্মের মধ্যেও এই বাণীই আজ ধ্বনিত যে—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমা ছাড়া অল্পে আর আমাদের সুখ নাই, ভূমাকেই এখন হইতে জানিতে চাই।

বাংলাসাহিত্যের দরজায় তাই এখন আর দেশের সমস্যা নয়, বিশ্বসমস্যা কর হানিতেছে। ভূতপূর্ব্ব গদ্যসাহিত্যে বিদ্যা-সাগরের বিধবা বিবাহ, ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ, এমন কি বঙ্কিমের ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধাদিতে যে সব সমস্যার আলোচনা ছিল—সে আলোচনার সংকীর্ণ সীমায় বাংলাসাহিত্য আজ আর বদ্ধ নাই। এখন হইতে আধুনিক সাহিত্যে আমরা—

"Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act ;
Fancies that broke thro' language
and escaped"—

এমন সকল চিন্তা প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছি যেগুলিকে কোন সংকীর্ণ কর্ম্মের কোটরের মধ্যে ঠাসা যায় না, এবং এমন সকল ভাব ও কল্পনাকেও প্রকাশ করিতে বসিয়াছি, ভাষা যাহার নাগাল পায় না।

আমি মনে করি, সেই কারণেই পূর্ব্বের চেয়েএখনকার সাহিত্যে 'আর্ট' দেখা দিতেছে। কেননা, যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাকে প্রকাশ করিবার ভারই আর্ট লইয়া থাকে। ভাবনার মধ্যে যাহা অভাবনীয়, বচনের মধ্যে যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহাকেই ত আর্টের দরকার—সেই বাড়্‌তি জিনিস লইয়াই ত আর্টের কারবার।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

পরাজয়

শীতকাল। শনিবারের সন্ধ্যা। দিন ফুরাইয়াছে, সপ্তাহ-ও শেষ হইয়াছে। মনে হইতেছে যেন ইহার মধ্যেই রবিবার আসিয়া পড়িয়াছে। সহরে অফিসের বাবুরা একদিন নিশ্চিত বিশ্রাম পাইবার আশায় স্ফূর্ত্তি করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। কেহ পকেটে পয়সা আছে দেখিয়া পোস্তা হইতে কপি, কলাইশুঁটি, কমলালেবু কিনিতেছেন। ছেলেদের ও বুড়াদের কাল মহানন্দে খাওয়া চলিবে। অফিসের তাড়ায় রবিবার-ভিন্ন ত

আর কোনদিন আরাম করিয়া আহার হয় না। ধীরে-সুস্থে রহিয়া-বসিয়া ইচ্ছামত বেলা করিয়া আহার ও তৎপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গড়ানো, বাঙ্গালী কেরাণী-জীবনের এই বিশেষ দুর্ল্লভ ব্যাপারটি কেবল রবিবারেই ঘটিয়া থাকে। কোন কোন অল্পবয়স্ক কেরাণী বেলফুলের মালা-ক্রয়-রত ছোকরা-বাবুদের মতই উল্লসিত। আজ থিয়েটারে যাইতে হইবে। নূতন নাটকের আজ প্রথম অভিনয়-রজনী।

বাগবাজারের উত্তরে, গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড এক পাটের কল। মজুরেরা সাতদিন-অন্তর শনিবারে-শনিবারে সেখানে মাহিনা পায়। কলিকাতার রাস্তাগুলির মত সেখানে বিদ্যুৎ বা গ্যাসের আলো নাই, অফিস-প্রত্যাগত বাবুদের ও সান্ধ্যবায়ুসেবী যুবক-দের ভিড় নাই। শকটের শব্দে রাস্তাও কাঁপিতেছে না। কিন্তু কারখানা হইতে মাহিনা পাইয়া প্রফুল্লচিত্ত মজুরের দল ভিড় করিয়া বাহির হইতেছে। কারখানার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গলি মজুরের দলে ভরিয়া গিয়াছে; তাহাদের কোলাহল, বিদ্রূপচ্ছলে অশ্লীল গালি, কৌতুকচ্ছলে পরস্পর-মারামারি প্রভৃতির বিচিত্র শব্দে স্থানটি মুখরিত। মদের দোকানে লোক ধরে না।

মজুরদের এই ভিড়ের মধ্য দিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণকায়া এক রমণী অগ্রসর হইতেছিল। এই দারুণ শীতেও তাহার অঙ্গে উপযুক্ত আচ্ছাদন নাই। একটা অতি মলিন ঘাগ্‌রার উপর একটা ওড়না দিয়া সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে সে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার গমনের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, সে যে চলিতেছে এ কথাটাও যেন সে গোপন করিতে চায়। সে যেন লজ্জা ও দুঃখের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! কি তাহার উৎকণ্ঠা!

তাহার ব্যাকুল নয়ন ও দ্রুত-পদবিক্ষেপে তাহার মনের ভাবটি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, যেন সে কেবল ভাবিতেছে 'ঠিক সময়টিতে পৌছিতে পারিলে বাঁচি।' চারিদিকে মজুরের দল তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে; তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রসিকতা করিতেছে। অধিকাংশ মজুরেরাই তাহাকে চিনে। সে কুৎসিত বলিয়া সকলে তাহার নাম দিয়াছে, "বাঁদরী!" তাহাকে দেখিয়া মজুরেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "দেখ্-দেখ্, বাঁদরী তার স্বামীকে আন্‌তে যাচ্ছে।" এই বলিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিতেছে। তাহাতে রমণী তাহার গতিবেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে।

টিটকারিরও অভাব ছিল না। "ইস্-ইস্! তাকে আর এখন পাবে মনে করেছ না কি? সে এতক্ষণে হয়ত একেবারে সেইখানে—কি হয়ত সে-ই-খানে!"

অনেকটাপথ জোরে চলিয়া আসাতে তাহার অতিশয় কষ্ট হইতেছিল। রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সে কারখানার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সে স্থান জনশূন্য। কারখানার ফটক বন্ধ। কল থামিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীর চিম্‌নি হইতে ধোঁয়া উঠার মত কারখানার কল হইতে হুস্-হুস্ করিয়া বাষ্প বাহির হইতেছে। উঁচু চিম্‌নিগুলির উপর হইতে এখনও একটু-একটু ধোঁয়া উঠিতেছে।

মজুরদের খাটুনি থামিয়াছে, কিন্তু স্থানটির উত্তাপ এখনো জুড়ায় নাই বলিয়া মনে হইতেছে যেন জনহীন কারখানাটির জীবনী-শক্তির স্পন্দন এখনো একটু আছে। দরজা-জানলা সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেবল মাহিনা দিবার ঘরে বৃদ্ধ কেসিয়ারবাবু চোখে চশমা আঁটিয়া বাতির আলোকে প্রকাণ্ড হিসাবের খাতা খুলিয়া সে দিনের ক্যাস মিলাইতে ছিলেন। তাঁহার কাজও শেষ হইয়াছে। রমণী কারখানার সম্মুখে পৌছিতেই কেসিয়ারবাবু খাতা মুড়িয়া চসমা খুলিয়া চাপকানের প্রান্তে তাহা মুছিয়া খাপে ভরিয়া বাতি নিভাইয়া দিলেন। তাঁহার বাড়ী যাইবার সময় হইয়াছে।

রমণীটির দেরী হইয়া গিয়াছে!

সমস্ত মজুরেরা মাহিনা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সে এখন কি করিবে? তাহার স্বামীকে কোথায় পাইবে? এক সপ্তাহের সংসার-খরচ এইবেলা না লইতে পারিলে ত সমস্তই মদের দোকানে যাইবে।

টাকা-পয়সার যে বিশেষ দরকার। ঘরভাড়া বাকী আছে,বাড়ীওয়ালী শাসাইতেছে। ছেলেদের পরণে কাপড় নাই। চালও ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ শোধ দিবে বলিয়া এক টাকা ধার করিয়াছিল ... ...

রমণী আর ভাবিতে পারিল না। গঙ্গার ধারে উঁচু পোস্তার উপর রাস্তার পাশে সে বসিয়া পড়িল। তাহার নড়িবার আর ক্ষমতা ছিল না। শূন্য-দৃষ্টিতে সম্মুখের কলনাদিনী গঙ্গার অপর পারে কুয়াসায়-ঘেরা গাছগুলির মধ্য দিয়া পরিদৃশ্যমান একটি আলোকের দিকে চাহিয়া রহিল।

কারখানার কাছাকাছি মদের ও চাটের দোকান তখন খুব জাঁকাইয়া খোলা হইয়াছে। মদের দোকান আলোকময়। সেখানে আমোদের স্রোত বহিতেছে। কারখানা নীরব, জনশূন্য। তাহার প্রাণ এখন মদের দোকানে স্পন্দিত হইতেছে। নরকের গহ্বর-সদৃশ মদের দোকান মজুরে ভরা। সামনে কাঠগড়া। তাহা এককালে বার্ণিস্ করা ছিল। এখন তাহাতে নানা স্থানে দাগ ধরিয়াছে; বার্ণিস্ কোন্ কালে উঠিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে তাকের উপর থাকে-থাকে সজ্জিত নানা-প্রকার মদের বোতল। পথ হইতে চীৎকার, গান, গালাগালি, অশ্লীল রসিকতা, টাকা-পয়সার ঝন্‌ঝনানি, মদের গেলাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে অসাড় হাতে ভর দিয়া তক্তাপোষের উপর মজুরেরা বসিয়াছে। কেহ বা কাঠগড়ায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে; হতভাগারা ভুলিয়া গিয়াছে, যে এই দারুণ শীতে তাহাদের ঘরে ভাত চড়ে নাই, স্ত্রী-পুত্র শীতে কাঁপিতেছে।

মদের দোকানটির আলো সাম্‌নের রাস্তাটিকে পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াছে। পাশের বাড়ীগুলির জানালা-কবাট বন্ধ;—সেগুলির সম্মুখবর্ত্তী পথ অন্ধকার ও জনহীন। এই অন্ধকারের আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রমণী ভয়ে-ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক দারুণ অশান্ত উদ্বেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে।

ঐ যে তাহার স্বামী,—বিশালকায়, একটা ছিটের তুলা-ভরা জামা গায়ে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মুখের আশে-পাশে পড়িয়াছে। শারীরিক বলের গর্ব্বে সে উদ্ধত। সঙ্গীরা

তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে;—তাহার কথা শুনিতেছে। সে এমন সুন্দর কথা কয়, এমন মজার-মজার হাসির গল্প বলে। তার উপর আবার তার দরাজ হাত! কেহ মদের পয়সা দিতে না পারিলে নিজেই দিয়া দেয়।

অভাগিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছিল। মদের দোকানের উজ্জ্বল আলোয় তাহার স্বামীর ভাবভঙ্গী সে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিল। চারিদিকে সুরাপানে উন্মত্ত মজুরের দল, তার মধ্যে বসিয়া তাহার স্বামী অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। নিজের কথায় যেন সে নিজেই মাতোয়ারা। মজুরেরা আসিতেছে, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কেহ বা তক্তাপোষ চাপড়াইয়া গান ধরিয়াছে। তাহার স্বামী দেখিতে পাইল না যে ঐ সামনের পথে দুইটি বিষাদভরা ক্ষীণ পাণ্ডু নয়নের সাগ্রহদৃষ্টি তাহাকে ডাকিতেছে, তাহার দৃষ্টিপাতের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে!

রমণী দোকানে ঢুকিতে সাহস করিল না। প্রকাশ্য মদের দোকান—তার উপর সঙ্গীদের সহিত তাহার স্বামী বসিয়া রহিয়াছে। সে যে রমণী!

... ...

কি কুৎসিত সে! কিন্তু চিরদিন সে এরূপ ছিল না। তাহার পিতা কলিকাতার পুলিশের কন্‌ষ্টেবল্ হইতে জমাদার পর্য্যন্ত উঠিয়া ছিল। সে তাহার পিতার একমাত্র কন্যা। মা তাহার শৈশবেই মারা যায়। বাপের সে বড় আদরের মেয়ে। পাড়ায় বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ী সে খেলিতে যাইত। বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে স্কুলে পড়িত। তাহার আচার-ব্যবহার, হাবভাব সব বাঙ্গালীরই মত হইয়া পড়িয়াছিল। সাড়ী-সেমিজ-পরা ঢলঢলে কচি সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তখন কে বলিবে যে সে খোট্টার মেয়ে?

তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। তাহার শ্বশুর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের সর্দ্দার ছিল। তাহতে সে বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়াছিল। তাহার বিবাহে সে কি ধূমধাম! বাঙ্গালী বাবুদের বিবাহের মত একদল ইংরাজী বাজনা ও গ্যাসের আলো জ্বালাইয়াই বর আসিল। সে আজ দশ বৎসরের কথা।

তাহার পর তাহার শ্বশুরের মৃত্যু হইল। সঞ্চিত হাজার দু'য়েক টাকা—পাম্প সু, পাঞ্জাবী কিনিতে ও কুসংসর্গ-কুপ্রবৃত্তির সাহায্য করিতে অল্পদিনেই উড়িয়া গেল। শেষে এক বিস্তৃত খোলার চালের 'মাঠ্-কোটা'র একখানি ঘরে সে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার কোলে একটি ছেলে। পিতা পরলোকগত।

চারিদিকে ছোটলোকের বাস। পাশের ঘরগুলি ছোটলোকে ভরা। দিনরাত কলহ চীৎকার, অশ্লীল গালি। কেহ মদ খাইয়া আসিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছে। তাহার স্বামী মাতালের সঙ্গে মিশিয়া মদ্যপান করিতে শিখিয়াছে। মজুরি করে, কোনদিন টাকা আনে, কোনদিন মদের দোকানেই তাহা উড়াইয়া আসে। প্রতিবেশিনীদের দেখাদেখি অভাগিনী কেবল নীরবে কাঁদে। দুঃখ-কষ্টের আঘাতে মনের দুশ্চিন্তায় তাহার রূপ গেল। তাহার নাম হইল, "বাঁদরী।"

... ...

এখনও ছায়ামূর্ত্তিটি পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পথের আবর্জ্জনারাশির উপর তাহার পা পড়িতেছে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। বেগে বায়ু বহিতেছে। শীতে তাহার হাড় অবধি কাঁপিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার কাসি আসিতেছে। কতক্ষণ,—আরও কতক্ষণ সে অপেক্ষা করিবে!

দুই-তিনবার দোকানে ঢুকিবে বলিয়া সে অগ্রসর হইল; কিন্তু পা উঠিল না। শেষে মনে পড়িল তাহার সন্তান অনাহারে, —সপ্তাহের সমস্ত উপার্জ্জন বুঝি-বা মদের দোকানেই যায়! তখন আর সে থাকিতে পারিল না। মরিয়া হইয়া দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

দোকানের চৌকাঠও পার হয় নাই, এমন সময় এক বিকট হাসির শব্দে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। "ওরে দেখ্, দেখ্, বাঁদরী এসেছে রে!"

সত্যই সে অতি-কুৎসিত, বৃষ্টিতে তাহার ওড়না ভিজিয়া গিয়াছে, পায়ে কাদা। উপেক্ষায় অনাদরে বদন পাণ্ডুর, গালদুটি পাংশু। সত্যই সে রূপহীনা। লজ্জায়, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হতভাগিনী নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।

"দেখ্ দেখ্, বাঁদরী এসেছে রে।"

তাহার স্বামী লাফাইয়া উঠিল। নীচসংসর্গে মিশিলেও তাহার পূর্ব্বসংস্কার এখনো একেবারে দূর হয় নাই। 'জানানা'র সম্ভ্রম-রক্ষায় এখনও সে উদাসীন হইতে পারে নাই। "কি? এত বড় আস্পর্দ্ধা! 'জানানা' হয়ে এখানে আসা! দশজনের সামনে এই কুৎসিত মূর্ত্তি নিয়ে আমাকে অপমান করতে আসা! আমার মাথা হেঁট করবার মৎলব! আচ্ছা, দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!" সুরায় ও ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহার স্বামী ঘুসি বাগাইয়া তাহার দিকে ছুটিল। অভাগিনী প্রাণভয়ে পিছাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল, পলায়নের চেষ্টা করিল। মজুরেরা উপহাসের উচ্চধ্বনি তুলিয়া তাহাকে টিটকারি দিতে লাগিল।

সে দুই পা যাইতে না যাইতেই তাহার স্বামী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

চারিদিক অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই। হারে হতভাগিনী!

... ...

না, না। সামনা-সামনি হইতেই স্বামী তাহার চোখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া গেল। কি নৈরাশ্যপূর্ণ, আত্ম-সমর্পণের সে দৃষ্টি! তাহার স্বামীর দৃঢ়-মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল। সে এখন তাহার বশীভূত, অনুতপ্ত। রমণী তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রমণী মৃদুকণ্ঠে দুই-একটি কথা বলিতে লাগিল। সে ধ্বনি কোমল, বিষাদময়, ঈষৎ অস্পষ্ট।

প্রকৃতি গাঢ় তমিস্রার আবরণে তাহাদের চারিদিক ঢাকিয়া দিল। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* আল্‌ফন্‌স্ দোদের ফরাসী গল্পের আভাসে।

সমালোচনা

তরুতীর্থ। শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা। বিউটি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি গল্পের বহি। সাতটি ছোট গল্প এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে "তরুতীর্থ," "অসমা" ও "মুস্কিল আসান" এই তিনটি চমৎকার। ছোট গল্পের আর্ট সেগুলিতে বজায় আছে। "তরুতীর্থে" করুণ রসটুকু বেশ উথলিয়া উঠিয়াছে; তাহা একেবারে মর্ম্মে আঘাত করে—এতটুকু পীড়া দেয় না! 'অসমা' গল্পে সংসারের খুঁটিনাটি ঘটনার মধ্য দিয়া কাহার-ভৃত্য ও তাহার পত্নীর ছবিটুকু সুন্দর ফুটিয়াছে। 'মুস্কিল আসান' গল্পটিও বেশ উপভোগ্য। ষ্টেশনের কলরবের মধ্যে লেখিকা যে কন্যাদায়-গ্রস্ত বিপন্ন পরিবারের সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের সুখ-দুঃখের ধারা রেলগাড়ীর নানা কথাবার্ত্তায় ও ঘটনা-বৈচিত্র্যে পাঠকের চিত্তে বেশ দোল্ দিয়া গিয়াছে; এবং এই পরিবারের দুঃখে সহানুভূতি অত্যন্ত সহজভাবেই জাগিয়া উঠে। রচনায় কোন পল্লবিত আয়োজন নাই, বাগাড়ম্বর নাই; তিনটি গল্পেরই রচনায় লেখিকা সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। 'রাম কবচ' গল্পে বদ্ধ কুসংস্কারের মূলে যে আঘাতটুকু দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিপুণ; অথচ গল্পটী মাটী হয় নাই। "গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে," "ততোভ্রষ্ট", "দুধ-মা" এ তিনটি গল্পে তেমন বিশেষত্ব নাই। ছোট গল্পের আর্টও ইহাতে বজায় আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। লেখিকার ভাষা সরল—বাজে উচ্ছ্বাসের ছঙ্কার কোথাও নাই। তবে মাঝে মাঝে সংস্কৃত-বাঙলা ও প্রাকৃত-বাঙলা একত্র মিশিয়া স্থানে স্থানে রসভঙ্গ করিয়াছে। বাঙালী ও বেহারী নর-নারীর চিত্তের হর্ষবেদনা লেখিকা বেশ নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; বাঙলা সাহিত্যে সেটুকু উপভোগ্য। বহি-খানির ছাপা-কাগজ বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

আকার ইঙ্গিত। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ময়মনসিং ব্রাহ্মপল্লী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এ গ্রন্থে গ্রন্থকারের রচিত যে-সকল প্রবন্ধ 'সময়ে সময়ে সাপ্তাহিক এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত' হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সামাজিক—তবে বড় সংক্ষিপ্ত; এত সংক্ষিপ্ত যে বহুস্থলে লেখকের বক্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। এ গ্রন্থে মহিলাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে—বঙ্গমহিলার সাহিত্যচর্চ্চা, বঙ্গমহিলা—মানসিক, আধ্যাত্মিক, মহিলা-মঙ্গল, বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি। 'বঙ্গমহিলা—মানসিক' প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, 'স্ত্রীজাতির মানসিক শিক্ষায় অধিক যত্নবান হইতে হইবে; 'বঙ্গমহিলা-শারীরিক' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'বঙ্গমহিলার শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতির ভবিষ্যৎ আশা লুপ্ত হইবে"—ইত্যাদি। কথাগুলা ঠিক, সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ নাই; কিন্তু কি করিয়া কি হইবে লেখক তাহার কোন পন্থা নির্দ্দেশ করেন নাই। বহুস্থলেই প্রবন্ধগুলি উচ্ছ্বাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এ-সব সত্ত্বেও লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়; কারণ এ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে অনেকের এ-দিকে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি জাগিতে পারে।

মা। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি গানের বহি। অনেকগুলি গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—গানগুলি 'প্রসাদী পদচ্ছায়ায়' রচিত; ভাব আধ্যাত্মিক। রচনায় বিশেষত্ব নাই।

অঞ্জলি। চারুহাসিনী দেবী প্রণীত। বগুড়া। শ্রীহিরণ্যমোহন দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, কটন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ।

প্রদীপ ও চেরাগ। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত। প্রকাশক, র, রহমান, 'দি মুসলমান' বুক এজেন্সি, কলিকাতা। নিউ এজ্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি গল্পের বহি। "প্রদীপ ও চেরাগ", "মসজিদ ও মন্দির" এবং "দুষমন ও দোস্ত" এই তিনটি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সব গল্পগুলিতেই হিন্দু-মুসলমানকে সর্ব্বপ্রকার জাতিগত বিশেষ পার্থক্য ত্যাগ করিয়া এক-মনুষ্যত্বের গণ্ডীভুক্ত করিবার দিকে ইঙ্গিত আছে, সর্ব্বপ্রকার conventionalityর বিরুদ্ধে মৃদু শ্লেষবর্ষণ আছে। ছোটগল্পের আর্ট না থাকিলেও গল্পগুলি মোটের উপর মন্দ নয়। "প্রদীপ ও চেরাগ" গল্পের নায়ক মুসলমান, নায়িকা বালবিধবা এক দরিদ্রা বেহারী রমণী। কোন-রকম আজগুবি রসের আশ্রয় না লইয়া লেখক এ গল্পে স্বাভাবিকতাটুকু রক্ষা করিয়াছেন—তবে গল্পটি এমনি দীর্ঘ পল্লবিত হইয়াছে যে ছোটগল্পের আর্ট ত ইহাতে নাইই—তাহার উপর রসভঙ্গ-দোষও ঘটিয়াছে। "মসজিদ ও মন্দির" গল্পে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই ধর্ম্মের-মুখোস-পরা ভণ্ডের ছবি লেখক সুদক্ষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—প্লটটিও ভাল। "দোস্ত ও দুষমন্" গল্পে ধর্ম্মের আইন-কানুনের বাধাবন্ধহীন এক দরিদ্র মুসলমান বালকের সহিত ধনী হিন্দুগৃহের এক শিশুর সখ্য লেখক চিত্রিত করিয়াছেন; তবে এ গল্পেও ছোটগল্পের আর্ট সুরক্ষিত হয় নাই। লেখকের ভাষা ভাল —রচনায় তেজ আছে, প্রাণ আছে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুসলমানী বাঙলা বেখাপ্পা বসিয়া সুর কাটিয়া দিয়াছে। ব্যঙ্গে লেখকের হাত আছে। ছোটখাট দোষ-ত্রুটি সংশোধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধনা করিলে এই নবীন মুসলমান সাহিত্য-সেবীর রচনা ভবিষ্যতে সার্থক হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আপেল। শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, ৩৫-৬-২ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। দাম একটাকা। এখানি গল্পের বই—ইহাতে গল্প আছে চৌদ্দটি। লেখকের ভাষা ভারি পরিষ্কার ঝরঝরে, হাল্‌কা ও মিষ্ট—পড়িতে-পড়িতে কোথাও বাধিয়া যায় না; ছোটগল্পের ভাষা কেমন-ধারা হওয়া উচিত লেখক তাহা জানেন এবং বুঝেন। গল্পগুলির ভিতরে, আমাদের সব-চেয়ে বেশী ভালো লাগিয়াছে—"মাষ্টার"। শেষের দিকে না-ঠেলিয়া এটিকেই প্রথম স্থান ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিল; কারণ, অন্য-সব গল্পের চেয়ে এটির ভিতরেই খাঁটি ছোটগল্পের রসমাধুর্য্য অধিক পরিমাণে আছে। হতভাগ্য মাষ্টারের চরিত্রেও বেশ-একটি নূতনত্ব ও জীবন্তভাব আছে এবং লেখার গুণে এর-মধ্যে করুণ রসও যতদূর জমিবার, জমিয়াছে। "তিনসরিক"—ঠিক ছোটগল্প না-হইলেও, সরস এবং উপভোগ্য। "হাঁচ্যাতঙ্ক," "শরতের মেঘ", নির্লজ্জ", "ভাগ্যচক্র" ও "বৌদিদি" নামে গল্পকয়টি চলন-সৈ মাঝারি রকমের রচনা। "বিষধর" ও "ভাই" গল্পের প্লট্ এম্‌নি পচা যে, মনের উপরে একটুও দাগ কাটিতে পারে না! "বন্ধু", "স্মৃতির আদর" ও "পুনর্মূষিক",—এ গল্প-তিনটি জমিলেও জমিতে পারিত, কিন্তু লেখকের নিজের দোষে এগুলি কেমন-একরকম খাপ ছাড়া-গোছের হইয়া গিয়াছে। "বৈজ্ঞানিক বনাম কবি" ও "বাকীপূরণ" একেবারে অজল। এই গল্পপুস্তকে অনেক দোষ থাকিলেও, এ-কথা আমরা মানিতে বাধ্য যে, ছোটগল্পের আর্টের দিকে লেখকের দৃষ্টি আছে, আর-একটু মনোযোগী হইলে ভবিষ্যতে গল্পলেখায় তাঁহার হাত বেশ খুলিতে পারে।

Twelve Portraits বা বারোখানি মূর্ত্তি-চিত্র। শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে-অঙ্কিত এবং মাননীয় বিচারপতি স্যর জন জি, উড্রোফ মহোদয়-লিখিত ইংরেজী ভূমিকা-সংবলিত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমল হোম, ২০-১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এখানি ছবির বই; ইহাতে স্যর আশুতোষ, স্যর জগদীশচন্দ্র, স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, প্রফুল্লচন্দ্র, স্যর গুরুদাস, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ, এই বারোজন বিভিন্ন বিষয়ে বিখ্যাত বাঙালীর বড়বড় মূর্ত্তি-চিত্র

আছে। এ-ধরনের ছবির বই বাঙলাদেশে আর-কখনো বাহির হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। চিত্রকর শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে ভারতীয় চিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এই ছবির বইএ তাঁহার আর-একটি নূতন শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। য়ুরোপে ও আমেরিকায় Etching বা নক্‌সার অত্যন্ত আদর। মুকুলচন্দ্র আমেরিকা হইতে আর্টের এই বিভাগে শিক্ষালাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন—সুতরাং এদেশে এ-রকম নক্‌সা এই প্রথম। কাহারও মূর্ত্তি-চিত্র আঁকিতে হইলে, আদর্শের আকৃতি-সাদৃশ্য অপেক্ষা স্বভাবের স্বরূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারাই শিল্পীর পক্ষে যথার্থ গৌরবের কার্য্য। মানুষের হাড়ে-মাংসে গড়া বাহিরের দেহটাকে যাঁহারা দেখিতে চান, ফোটোগ্রাফার তাঁহাদের মনের আশ মিটাইতে পারে। কিন্তু ফোটোগ্রাফার মানুষকে দেখায়, মানুষের মনুষ্যত্বকে দেখাইতে পারে না;—সেইজন্যই আজ-পর্য্যন্ত আর্টিষ্টের অন্ন কেউ মারিতে পারে নাই। অবশ্য এমন উচ্চশ্রেণীর আর্টিষ্ট হওয়া সহজ কথা নয়; কেননা, মানুষের ভিতরের গোপনতাকে প্রকাশ করিতে হইলে অসাধারণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টির দরকার এবং সেইসঙ্গে চাই হাতের বিশেষ নিপুণতা। এই শক্ত কাজেও মুকুলচন্দ্রের হাত ও চোখ যে কতটা রপ্ত, সমালোচ্য ছবির বইখানি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রফুল্লচন্দ্র, গুরুদাস, সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ও বিপিনচন্দ্রের ছবিগুলিতে আদর্শের স্বরূপ এবং প্রকৃতিগত বিশেষত্ব যতদূর ফুটিবার, ফুটিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছাড়া অন্য ছবি-গুলিও চমৎকার হইয়াছে। আঁকা-হিসাবে সমস্ত ছবিই দেখিবার মত। শেষদিকে চিত্রিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকাতে অনেকেরই সুবিধা হইবে।

শ্রীহঃ—

অভিজ্ঞান

কামিনী ফুলের গাছ দুয়ারের ধারে,
ঘন পল্লবের ভারে ভরা একেবারে;
কবে এল নবীন যৌবন,
সে কথা তখনো তার জানে নাই মন,
শ্যাম বাসে বাঁধি বুক ছিল মূক হয়ে,
ফুল-ভাষে মনো আশা ওঠে নাই কয়ে!

দিনে-দিনে-ভরে-ওঠা সুধা চাঁদখানি,
বহু অমা-নিশীথের বহি মর্ম্মবাণী,
আকাশের নীলিমা সাগরে,
ধীরে বাড়াইয়া মুখ হরষের ভরে,
আলোকের শতদল করি উন্মীলন
দেখা দিল প্রভাতের পদ্মের মতন!

সুদূর সে আকাশের আলোর পরশে,
কামিনী শিহরি উঠি, জাগিল হরষে,
কি সৌরভে ভরে গেল মন,
অজানারে জানাইতে করে আয়োজন,
ফুটায়ে কোমল শুভ্র কুসুম-আবলি,
প্রতি পর্ণপুটে তার ধরিল অঞ্জলি!

প্রভাতে ডুবিল চাঁদ; সুনীল আকাশ
রাঙা হয়ে, বেদনারে করিল প্রকাশ
কামিনীর সারা অঙ্গ ভরি,
পুলকের ফুলসাজ কাঁপে থরথরি!
চিরিয়া পেলব প্রাণ, বিলায়ে সৌরভ,
অমল ফুলের দল ঝরে গেল সব!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।